উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র

সম্পাদনা

শান্তা শ্রীমানী

ভূমিকা

পবিত্র সরকার

বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড

৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

Upendra Kishor Rachana Samagra
Edited by Santa Srimani

Price Rs. One Hundred Forty Only.

প্রকাশক ☐ স্বপন বসাক, বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড
৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ☐ চন্দন প্রধান

অঙ্গবিন্যাস ☐ দেবাশিস মিত্র

অক্ষর বিন্যাস ☐ ডি এণ্ড বি ডাটা সার্ভিসেস, কলি ১২

মুদ্রক ☐ আর ডি এন্টারপ্রাইজ, কলি-৪৮

মূল্য ☐ একশ চল্লিশ টাকা

ভূমিকা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রায় পরিবারের বিখ্যাত তিন পুরুষের প্রথম পুরুষ। উপেন্দ্রকিশোর—সুকুমার—সত্যজিৎ এই পরম্পরার পুরোভাগে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। রায় পরিবারকে অবশ্য কেবল ওই তিনজন পুরুষ সম্পূর্ণ অধিকার করে নেই, আছেন আরও অনেক স্বনামধন্য পুরুষেরা, সারদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন, সুবিনয়, সুবিমল যেমন আছেন তেমনই আছেন স্বনামধন্যা নারীরাও—পুণ্যলতা চক্রবর্তী, সুখলতা রাও, লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ বা কল্যাণী কার্লেকার। কিন্তু স্রষ্টা হিসেবে এই শোভাযাত্রা যিনি শুরু করেছিলেন, তিনি উপেন্দ্রকিশোর।

সব মিলিয়ে ছোটোদের জন্য যে খানপনেরো বই লিখেছেন উপেন্দ্রকিশোর, এঁকেছেন অসংখ্য মজাদার ছবি—সে সবের মূল কথাটি তাঁর সমকালের ধর্ম ও সামাজিক পটভূমিকার সঙ্গে যুক্ত। শিশুকে জীবন শেখাও। এ শিক্ষা যেন একদিকে যুক্ত থাকে তার দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার সঙ্গে, আবার এ শিক্ষা যেন তাকে পৃথিবীর আধুনিকতম জ্ঞানবিজ্ঞানের খবরগুলি থেকেও বঞ্চিত না করে। ফলে তাঁর দুটি পদ। রামায়ণ একটি পদ-মহাভারত, পুরাণের গল্প, মহাভারতের অবান্তর গল্পগুলিতে এবং প্রচুর পুরাণের গল্প একদিকে যেমন শিশুকে এক সমৃদ্ধ ও বহুবর্ণময় ভারতীয় ঐতিহ্যের সন্ধান দিয়েছে, তেমনই তাকে প্রচ্ছন্নভাবে শিখিয়েছে ভালো আর মন্দ, ন্যায় আর অন্যায়, সংগত আর অসংগতের তফাত, শিখিয়েছে মনুষ্যের সত্যকার মহিমা বীরত্বে, দুঃখসহনে, দানে, ত্যাগে ও অহংকার বিসর্জনে। আবার টুনটুনির বই যে মনোহর সব লোককথার সংকলন করে শিখিয়েছেন কেমন করে বুদ্ধির সাহায্যে দুর্বল যে সে-ও অত্যাচারী সবলের উপরে টেক্কা দিতে পারে। এভাবেই টুনটুনি জিতে যায় বিড়ালের সঙ্গে, শেয়াল জিতে যায় বাঘের সঙ্গে, দুর্বল মানুষের বুদ্ধির কাছে বাঘ হার মানতে বাধ্য হয়। একদিকে ক্লাসিকের সাহায্যে মনুষ্যত্ব শিক্ষা, অন্যদিকে লোককাহিনির সাহায্যে অস্তিত্বরক্ষার কলাকৌশল শিক্ষা—এই দুটি শিক্ষাই এসেছে আনন্দময় গল্পবিবরণের সূত্রে। শিশুকে কখনোই 'এটা করবে, সেটা করবে না' বলে স্পষ্ট উপদেশ দেননি উপেন্দ্রকিশোর। এখানে পৌঁছে বুঝতে পারি বিদ্যাসাগরের সমকালের কঠোর ও প্রকাশ্য নীতিশিক্ষার লক্ষ্য আর জনপ্রিয় নেই—'সদা সত্য কথা বলিবে' 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়' ইত্যাদি সুবচনের আর তত প্রয়োজন বোধ করছেন না উপেন্দ্রনাথ।

সেই সঙ্গে সঙ্গেই উপেন্দ্রকিশোর 'সেকালের কথা' আর 'বিবিধ প্রবন্ধ'-তে বিজ্ঞানজগতের কত খবর, বিশেষ করে আদিম প্রাণীকুলের নানা চিত্তাকর্ষক সংবাদ দিয়েছেন, তাতে নীতিশিক্ষার বিশেষ কোনো প্রকট উদ্দেশ্য নেই, আছে জ্ঞানশিক্ষার লক্ষ্য।

অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের সময়ের শিক্ষাচিন্তার পটভূমিকা থেকে উপেন্দ্রকিশোরের সমকাল শিক্ষাচিন্তা পরিবর্তিত হয়েছে। লেখকরা তাঁদের সৃজনশীল কল্পনাকে শিশুর আনন্দময় অবকাশ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়েছেন। উপেন্দ্রকিশোরে শুরু, তারপরেই সুকুমার তাঁর বেহিসেবি উদ্দাম খেয়ালি সৃষ্টির রাজ্যে শিশুকে ডাক দেবেন, সেখানে নীতিমূলক কোনো উদ্দেশ্যের বালাই থাকবে না। তখন লেখকদের মনে এই আত্মবিশ্বাস নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে গিয়েছে যে, সমাজ দেখবে শিশুর চরিত্র গঠনের মূল বিষয়টি, শিক্ষাব্যবস্থা ও নানা পাঠ্য তাকে মানবিক আচরণবিধি শেখাবে। সাহিত্য সে পড়বে আনন্দের জন্য, কল্পনার বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারের জন্য, অবশ্যই জ্ঞানের জন্য।

বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড উপেন্দ্রকিশোরের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ করছেন, কাজটির মূল্য এখানেই যে, উপেন্দ্রকিশোরের ক্ষেত্রে যথেষ্টও কখনও যথেষ্ট নয়। তার উপাদেয় ও স্বাস্থ্যপ্রদ রচনাগুলি যত বেশি বাঙালি শিশুদের হাতে পৌঁছবে ততই ভালো। প্রকাশকদের মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হলে শিশু পাঠকদেরই উপকার হবে। হয়তো কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথের রচনার ক্ষেত্রেও এই ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করব।

বাঙালির ঘরে ঘরে উপেন্দ্রকিশোর পৌঁছে যান, অক্ষয় হয়ে থাকুন। পাঠ্য বইয়ের বোঝায় ভারাক্রান্ত শিশুদের মুখে তিনি হাসি ফোটাতে থাকুন।

পবিত্র সরকার

সূচীপত্র

U Ray

জন্ম ঃ মে ১০, ১৮৬৩ □ মৃত্যু ঃ ডিসেম্বর ২০, ১৯১৫

জীবনকথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্ম ১৮৬৩ সালের ১০ মে। ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামে। পিতার নাম কালীনাথ রায়চৌধুরী। উপেন্দ্রকিশোরের পূর্বনাম ছিল কামদারঞ্জন, পরে পাঁচ বছর বয়সে নূতন নামকরণ হয় উপেন্দ্রকিশোর।

১৮৮০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। পরে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউট থেকে বি. এ. পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৮৪ সালে যোগ দেন ব্রাহ্মসমাজে। ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বিধুমুখীদেবীকে বিবাহ করেন।

প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে, 'সখা' পত্রিকায়। ১৯১৩ সালে 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ করেন নিজের সম্পাদনায়।

এই সময় প্রকাশিত হতে থাকে কিশোরদের জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন লেখাগুলি। তাঁর লেখা 'টুনটুনির বই', 'গুপীগাইন বাঘাবাইন', 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত' শিশুসাহিত্যে এক অক্ষয় সৃষ্টি।

সঙ্গীত জগতেও তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। পাখোয়াজ, বেহালা, হারমোনিয়াম, বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। বেশ কিছু সঙ্গীত রচনা ও সুরসৃষ্টিও করেছেন। 'জাগো পুরবাসী' তাঁর রচিত বিখ্যাত ব্রাহ্মসঙ্গীত। ছবি আঁকাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ 'নদী' কবিতায় বেশ কয়েকটি ছবি এঁকেছেন। সীতাদেবী ও শান্তাদেবী সম্পাদিত 'হিন্দুস্থানী উপকথা'র ছবি তাঁরই আঁকা। মুদ্রণশিল্পকে উন্নত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। বিশেষ করে হাফটোন ব্লকের প্রচলন এদেশে তিনিই প্রথম করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইউ রায় এ্যান্ড সন্স' কোম্পানী ভারতে 'প্রসেস শিল্প বিকাশের সূত্রপাত ঘটায়।

নানা গুণের সমাহার তাঁর মধ্যে দেখা গেলেও শিশুসাহিত্যিক হিসাবেই তিনি অমর হয়ে আছেন। তাঁর সন্তান সন্ততিরা প্রত্যেকেই কৃতিজন — সুখলতা রাও, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, সুকুমার রায়, সুবিনয় রায় তাঁর সন্তান। পৌত্র স্বনামধন্য চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়।

১৯১৫ সালের ২০ ডিসেম্বর এই বরণীয় ব্যক্তিত্বের প্রয়াণ ঘটে।

টুনটুনির বই
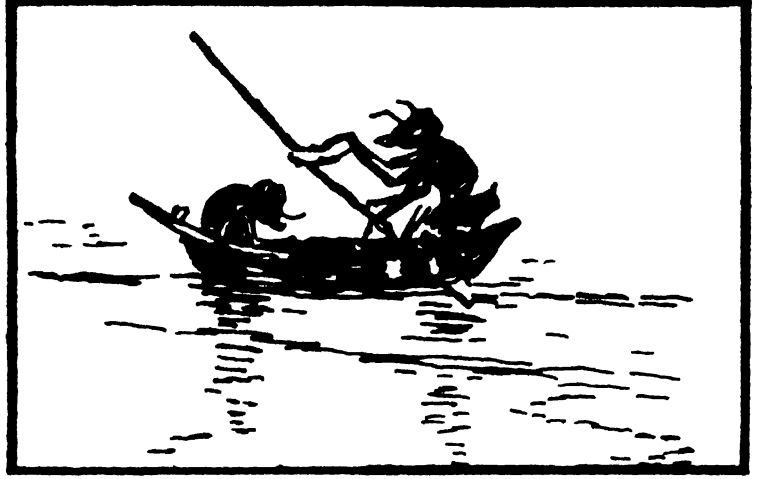
গ্রন্থকারের নিবেদন

সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহরূপিনী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। সেই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না। আশা করি আমার সুকুমার পাঠক-পাঠিকাদেরও এই গল্পগুলি ভালো লাগিবে।

— উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

টুনটুনি আর বিড়ালের কথা

গৃহস্থের ঘরের পিছনে বেগুন গাছ আছে। সেই বেগুন গাছের পাতা ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে টুনটুনি পাখিটি তার বাসা বেঁধেছে।
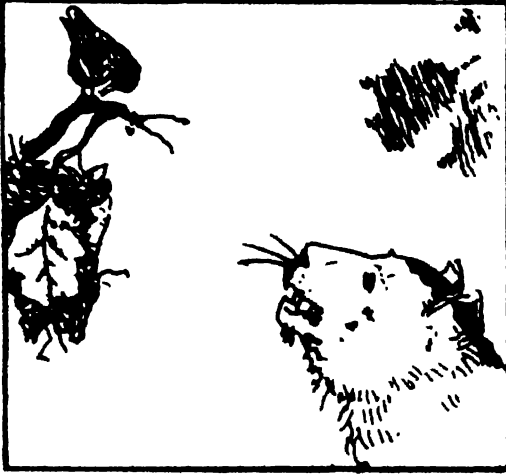
'প্রণাম হই মহারানী!'

বাসার ভিতরে তিনটি ছোট্ট ছোট্ট ছানা হয়েছে। খুব ছোট্ট ছানা, তারা উড়তে পারে না, চোখও মেলতে পারে না। খালি হাঁ করে আর চীঁ-চীঁ করে।

গৃহস্থের বিড়ালটা ভারি দুষ্টু। সে খালি ভাবে 'টুনটুনির ছানা খাব।' একদিন সে বেগুন গাছের তলায় এসে বললে, 'কি করছিস লা টুনটুনি?'

টুনটুনি তার মাথা হেঁট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বললে, 'প্রণাম হই, মহারাণী!'

তাতে বিড়ালনী ভারি খুশি হয়ে চলে গেল।

এমনি সে রোজ আসে, রোজ টুনটুনি তাকে প্রণাম করে আর মহারাণী বলে, আর সে খুশি হয়ে চলে যায়।

এখন টুনটুনির ছানাগুলি বড় হয়েছে, তাদের সুন্দর পাখা হয়েছে। তারা আর চোখ বুজে থাকে না। তা দেখে টুনটুনি তাদের বললে, 'বাছা, তোরা উড়তে পারবি?'

ছানারা বললে, 'হ্যাঁ মা, পারব।'

টুনটুনি বললে, 'তবে দেখ তো দেখি, ঐ তাল গাছটার ডালে গিয়ে বসতে পারিস কি না।'

ছানারা তখনই উড়ে গিয়ে তাল গাছের ডালে বসল। তা দেখে টুনটুনি হেসে বললে, 'এখন দুষ্ট বিড়াল আসুক দেখি!'

খানিক বাদেই বিড়াল এসে বললে, 'কি করছিস লা টুনটুনি?'
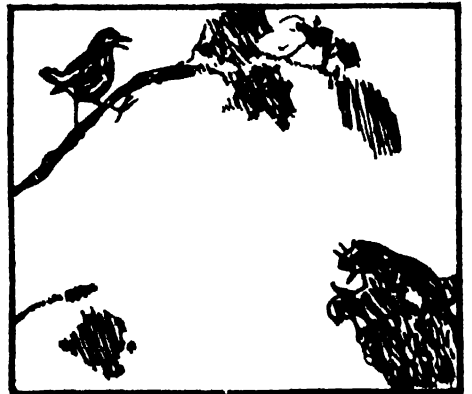
'দুর হ, লক্ষ্মীছাড়া বিড়ালনী'

তখন টুনটুনি পা উঠিয়ে তাকে লাথি দেখিয়ে বললে, 'দুর হ, লক্ষ্মীছাড়ী বিড়ালনী!' বলেই সে ফুড়ুক করে উড়ে পালাল।

দুষ্টু বিড়াল দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে গাছে উঠে, টুনটুনিকেও ধরতে পারল না, ছানাও খেতে পেল না। খালি বেগুন কাঁটার খোঁচা খেয়ে নাকাল হয়ে ঘরে ফিরল।

টুনটুনি বেগুন গাছে নামছে

টুনটুনি আর নাপিতের কথা

টুনটুনি গিয়েছিল বেগুন পাতায় বসে নাচতে। নাচতে-নাচতে খেল বেগুন কাঁটার খোঁচা। তাই থেকে তার হল মস্ত বড় ফোড়া।

ও মা, কি হবে? এত বড় ফোড়া কি করে সারবে?

টুনটুনি একে জিগগেস করে, তাকে জিগগেস করে। সবাই বললে, 'ওটা নাপিত দিয়ে কাটিয়ে ফেল।'

তাই টুনটুনি নাপিতের কাছে গিয়ে বললে, 'নাপিতদাদা, নাপিতদাদা, আমার ফোড়াটা কেটে দাও না!'

নাপিত তার কথা শুনে ঘাড় বেঁকিয়ে নাক সিঁটকিয়ে বললে, 'ঈস! আমি রাজাকে কামাই, আমি তোর ফোড়া কাটতে গেলুম আর কি!'

নাপিত আর টুনটুনি

টুনটুনি বললে, 'আচ্ছা দেখতে পাবে এখন, ফোড়া কাটতে যাও কি না।'

বলে সে রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করলে, 'রাজামশাই, আপনার নাপিত কেন আমার ফোড়া কেটে দিচ্ছে না? ওকে সাজা দিতে হবে!'

শুনে রাজামশাই হো-হো করে হাসলেন, বিছানায় গড়াগড়ি দিলেন, নাপিতকে কিছু বললেন না। তাতে, টুনটুনির ভারি রাগ হল। সে ইঁদুরের কাছে গিয়ে বললে, 'ইঁদুরভাই, বাড়ি আছ?'

ইঁদুর বললে, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বললে, 'তবে ভাত খাই, যদি এক কাজ কর।'

ইঁদুর বললে, 'কি কাজ?'

টুনটুনি বললে, 'রাজামশাই যখন ঘুমিয়ে থাকবেন, তখন গিয়ে তাঁর ভুঁড়িটা কেটে ফুটো করে দিতে হবে।'

তা শুনে ইঁদুর জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বললে, 'ওরে বাপরে! আমি তা পারব না।' তাতে টুনটুনি রাগ করে বিড়ালের কাছে গিয়ে বললে, 'বিড়ালভাই, বিড়ালভাই, বাড়ি আছ?'

বিড়াল বললে, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বললে, 'তবে ভাত খাই, যদি ইঁদুর মার।'

বিড়াল বললে, 'এখন আমি ইঁদুর-টিদুর মারতে যেতে পারব না, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।' শুনে টুনটুনি রাগের ভরে লাঠির কাছে গিয়ে বললে, লাঠি ভাই, লাঠি ভাই, বাড়ি আছ?'

ইঁদুর আব টুনটুনি

লাঠি বললে, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বললে, তবে ভাত খাই, যদি বিড়ালকে ঠেঙাও।'

লাঠি বললে, 'বিড়াল আমার কি করেছে যে আমি তাকে ঠেঙাতে যাব? আমি তা পারব না।' তখন টুনটুনি আগুনের কাছে গিয়ে বললে, 'আগুনভাই, আগুনভাই, বাড়ি আছ?'

আগুন বললে, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বললে, 'তবে ভাত খাই, যদি তুমি লাঠি পোড়াও।'

আগুন বললে, 'আজ ঢের জিনিস পুড়িয়েছি, আজ আর কিছু পোড়াতে পারব না।' তাতে টুনটুনি তাকে খুব করে বকে, সাগরের কাছে গিয়ে বললে, 'সাগরভাই, সাগরভাই, বাড়ি আছ?'

সাগর বললে, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বললে, 'তবে ভাত খাই, যদি তুমি আগুন নিবাও।'

সাগর বললে, 'আমি তা পারব না।' তখন টুনটুনি হাতির কাছে গিয়ে বললে, 'হাতিভাই, হাতিভাই, বাড়ি আছ?'

হাতি বললে, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বললে, 'তবে ভাত খাই, যদি সাগরের জল সব খেয়ে ফেল।'

হাতি বললে, 'অত জল খেতে পারব না, আমার পেট ফেটে যাবে।'

কেউ তার কথা শুনল না দেখে টুনটুনি শেষে মশার কাছে গেল। মশা দূর থেকে তাকে দেখেই বললে, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বললে, 'তবে ভাত খাই, যদি হাতিকে কামড়াও।'

হাতি আর টুনটুনি

মশা বললে, 'সে আবার একটা কথা! এখুনি যাচ্ছি! দেখব হাতি বেটার কত শক্ত চামড়া!' বলে, সে সকল দেশের সকল মশাকে ডেকে বললে, 'তোরা আয় তো রে ভাই, দেখি হাতি বেটার কত শক্ত চামড়া।' অমনি পীন্-পীন্-পীন্-পীন্ করে যত রাজ্যের মশা, বাপ বেটা ভাই বন্ধু মিলে হাতিকে কামড়াতে চলল। মশায় আকাশ ছেয়ে গেল, সূর্য ঢেকে গেল। তাদের পাখার হাওয়ায় ঝড় বইতে লাগল। পীন্-পীন্-পীন্-পীন্ ভয়ানক শব্দ শুনে সকলের প্রাণ কেঁপে উঠল। তখন—

হাতি বলে, সাগর শুষি।
সাগর বলে, আগুন নেবাই!
আগুন বলে, লাঠি পোড়াই!
লাঠি বলে, বিড়াল ঠেঙাই!
বিড়াল বলে, ইঁদুর মারি।
ইঁদুর বলে, রাজার ভুঁড়ি কাটি!
রাজা বলে, নাপতে বেটার মাথা কাটি!

নাপিত হাত জোড় করে কাঁপতে-কাঁপতে বললে, 'রক্ষে কর, টুনিদাদা! এস তোমার ফোড়া কাটি।'

তারপর টুনটুনির ফোড়া সেরে গেল, আর সে ভারি খুশি হয়ে আবার গিয়ে নাচতে আর গাইতে লাগল—টুনটুনা টুন্ টুন্ টুন্! ধেই! ধেই!

টুনটুনি আর রাজার কথা

রাজার বাগানের কোণে টুনটুনির বাসা ছিল। রাজার সিন্দুকের টাকা রোদে শুকুতে দিয়েছিল, সন্ধ্যার সময় তাঁর লোকেরা তার একটি টাকা ঘরে তুলতে ভুলে গেল।

টুনটুনি সেই চকচকে টাকাটি দেখতে পেয়ে তার বাসায় এসে রেখে দিলে, আর ভাবলে, 'ঈস! আমি কত বড়লোক হয়ে গেছি। রাজার ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরে সে ধন আছে!' তারপর থেকে সে খালি এই কথাই ভাবে, আর বলে—
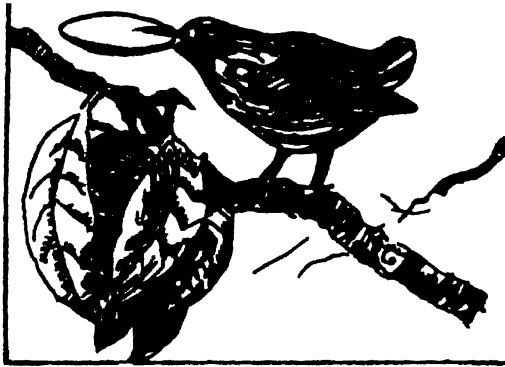
টুনটুনি টাকা নিয়ে তার বাসায় রাখছে

রাজার ঘরে যে ধন আছে
টুনির ঘরেও সে ধন আছে!

রাজা তাঁর সভায় বসে সে কথা শুনতে পেয়ে জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁরে? পাখিটা কি বলছে রে?'

সকলে হাত জোড় করে বললে, 'মহারাজ, পাখি বলছে, আপনার ঘরে যে ধন আছে, ওর ঘরেও নাকি সেই ধন আছে!' শুনে রাজা খিলখিল করে হেসে বললেন, 'দেখ তো ওর বাসায় কি আছে।'

তারা দেখে এসে বললে, 'মহারাজ, বাসায় একটি টাকা আছে।'

শুনে রাজা বললেন, 'সে তো আমারই টাকা, নিয়ে আয় সেটা।'

তখুনি লোক গিয়ে টুনটুনির বাসা থেকে টাকাটি নিয়ে এল। সে বেচারা আর কি করে, সে মনের দুঃখে বলতে লাগল—

রাজা বড় ধনে কাতর
টুনির ধন নিলে বাড়ির ভিতর!

শুনে রাজা আবার হেসে বললেন, 'পাখিটা তো বড় ঠ্যাটা রে! যা ওর টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

টাকা ফিরে পেয়ে টুনির বড় আনন্দ হয়েছে। তখন সে বলছে—

রাজা ভারি ভয় পেল
টুনির টাকা ফিরিয়ে দিল।

রাজা জিগগেস করলেন, 'আবার কি বলছে রে?'

সভার লোকেরা বললে, 'বলছে যে মহারাজ নাকি বড্ড ভয় পেয়েছেন, তাই ওর টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

শুনে তো রাজামশাই রেগে একেবারে অস্থির! বললেন, 'কি, এত বড় কথা! আন তো ধরে, বেটাকে ভেজে খাই!'

যেই বলা অমনি লোক গিয়ে টুনটুনি বেচারাকে ধরে আনলে। রাজা তাকে মুঠোয় করে নিয়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে রাণীদের বললেন, 'এই পাখিটাকে ভেজে আজ আমাকে খেতে দিতে হবে!'

বলে তো রাজা চলে এসেছেন, আর রাণীরা সাতজনে মিলে সেই পাখিটাকে দেখছেন।

রানীরা টুনটুনিকে দেখছেন

একজন বললেন, 'কি সুন্দর পাখি! আমার হাতে দাও তো একবার দেখি।' বলে তিনি তাকে হাতে নিলেন। তা দেখে আবার একজন দেখতে চাইলেন। তাঁর হাত থেকে যখন আর একজন নিতে গেলেন, তখন টুনটুনি ফস্‌কে গিয়ে উড়ে পালাল।

কি সর্বনাশ! এখন উপায় কি হবে? রাজা জানতে পারলে তো রক্ষা থাকবে না।

এমনি করে তাঁরা দুঃখ করছেন, এমন সময় একটা ব্যাঙ সেইখান দিয়ে থপ-থপ করে যাচ্ছে। সাত রাণী তাকে দেখতে পেয়ে খপ করে ধরে ফেললেন, আর বললেন, 'চুপ চুপ! কেউ যেন জানতে না পারে। এইটেকে ভেজে দি, আর রাজামশাই খেয়ে ভাববেন টুনটুনিই খেয়েছেন!'

সেই ব্যাঙটার ছাল ছাড়িয়ে তাকে ভেজে রাজামশাইকে দিলে তিনি খেয়ে ভারি খুশি হলেন।

তারপর সবে তিনি সভায় গিয়ে বসেছেন, আর ভাবছেন, 'এবারে পাখির বাছাকে জব্দ করেছি।'

অমনি টুনি বলছে—

বড় মজা, বড় মজা,
রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা!

শুনেই তো রাজামশাই লাফিয়ে উঠেছেন। তখন তিনি থুতু ফেলেন, ওয়াক তোলেন, মুখ ধোন, আরো কত কি করেন। তারপর রেগে বললেন, 'সাত রাণীর নাক কেটে ফেল।'

অমনি জল্লাদ গিয়ে সাত রাণীর নাক কেটে ফেললে।

তা দেখে টুনটুনি বললে—

এক টুনিতে টুনটুনাল
সাত রাণীর নাক কাটাল!

তখন রাজা বললেন, 'আন বেটাকে ধরে! এবার গিলে খাব! দেখি কেমন করে পালায়!'

টুনটুনিকে ধরে আনলে।

রাজা বললেন, 'আন জল!'

জল এল। রাজা মুখ ভরে জল নিয়ে টুনটুনিকে মুখে পুরেই চোখ বুজে ঢক করে গিলে ফেললেন।

সবাই বললে, 'এবারে পাখি জব্দ!'

বলতে বলতেই রাজামশাই ভোক্ করে মস্ত একটা ঢেকুর তুললেন।

রাজা টুনটুনিকে খেতে যাচ্ছেন

সভার লোক চমকে উঠল, আর টুনটুনি সেই ঢেকুরের সঙ্গে বেরিয়ে এসে উড়ে পালাল।

রাজা বললেন, 'গেল, গেল। ধর, ধর!' অমনি দুশো লোক ছুটে গিয়ে আবার বেচারাকে ধরে আনলো।

তারপর আবার জল নিয়ে এল, আর সিপাই এসে তলোয়ার নিয়ে রাজামশায়ের কাছে দাঁড়াল, টুনটুনি বেরুলেই তাকে দু টুকরো করে ফেলবে।

এবার টুনটুনিকে গিলেই রাজামশাই দুই হাতে মুখ চেপে বসে থাকলেন, যাতে টুনটুনি আর বেরুতে না পারে। সে বেচারা পেটের ভিতরে গিয়ে ভয়ানক ছটফট করতে লাগল!

খানিক বাদে রাজামশাই নাক সিঁটকিয়ে বললেন, 'ওয়াক্!' অমনি টুনটুনিকে সুদ্ধ তাঁর পেটের ভিতরের সকল জিনিস বেরিয়ে এল।

সবাই বললে, 'সিপাই, সিপাই! মারো, মারো! পালালো!'

সিপাই তাতে থতমত খেয়ে তলোয়ার দিয়ে যেই টুনটুনিকে মারতে যাবে, অমনি সেই তলোয়ার টুনটুনির গায়ে না পড়ে, রাজামশায়ের নাকে পড়ল।

নাক-কাটা রাজা

রাজামশাই তো ভয়ানক চ্যাঁচালেন, সঙ্গে সঙ্গে সভার সকল লোক চ্যাঁচাতে লাগল। তখন ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে পটি বেঁধে অনেক কষ্টে রাজামশাইকে

বাঁচাল।

টুনটুনি তা দেখে বলতে লাগল—

নাক কাটা রাজা রে
দেখ তো কেমন সাজা রে!

বলেই সে উড়ে সে দেশ থেকে চলে গেল। রাজার লোক ছুটে এসে দেখল, খালি বাসা পড়ে আছে।

নরহরি দাস

যেখানে মাঠের পাশে বন আছে, আর বনের ধারে মস্ত পাহাড় আছে, সেইখানে একটা গর্তের ভিতরে একটি ছাগলছানা থাকত। সে তখনো বড় হয়নি, তাই গর্তের বাইরে যেতে পেত না। বাইরে যেতে চাইলেই তার মা বলত, 'যাসনে! ভালুকে ধরবে, বাঘে নিয়ে যাবে, সিংহে খেয়ে ফেলবে!' তা শুনে তার ভয় হত, আর সে চুপ করে গর্তের ভিতরে বসে থাকত। তারপর সে একটু বড় হল, তার ভয়ও কমে গেল। তখন তার মা বাইরে চলে গেলেই সে গর্তের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখত। শেষে একদিন একেবারে গর্তের বাইরে চলে এল।
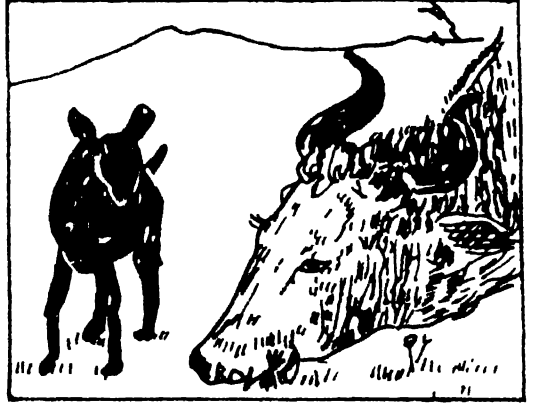
ষাঁড় আর ছাগলখানা

সেইখানে এক মস্ত ষাঁড় ঘাস খাচ্ছিল। ছাগলছানা আর এত বড় জন্তু কখনো দেখেনি। কিন্তু তার শিং দেখেই সে মনে করে নিল, ওটাও ছাগল, খুব ভালো জিনিস খেয়ে এত বড় হয়েছে। তাই সে ষাঁড়ের কাছে গিয়ে জিগগেস করল, 'হ্যাঁ গা, তুমি কি খাও?'

ষাঁড় বললে, 'আমি ঘাস খাই।'

ছাগলছানা বললে, 'ঘাস তো আমার মাও খায় সে তো তোমার মতো এত বড় হয়নি।'

ষাঁড় বললে, 'আমি তোমার মায়ের চেয়ে ঢের ঢের ভালো ঘাস অনেক বেশি করে খাই।'

ছাগলছানা বললে, 'সে ঘাস কোথায়?'

ষাঁড় বললে, 'ঐ বনের ভিতরে।'

ছাগলছানা বললে, 'আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে।' একথা শুনে ষাঁড় তাকে নিয়ে গেল।

সেই বনের ভিতরে খুব চমৎকার ঘাস ছিল। ছাগলছানার পেটে যত ঘাস ধরল, সে তত

ঘাস খেল।

খেয়ে তার পেট এমন ভারি হল যে, সে আর চলতে পারে না।

সন্ধে হলে ষাঁড় এসে বললে, 'এখন চল বাড়ি যাই।'

বাঘ শিয়ালকে সুদ্ধ নিয়ে পালাচ্ছে

কিন্তু ছাগলছানা কি করে বাড়ি যাবে? সে চলতেই পারে না।

তাই সে বললে, 'তুমি যাও, আমি কাল যাব।'

তখন ষাঁড় চলে গেল। ছাগলছানা একটি গর্ত দেখতে পেয়ে তার ভিতরে ঢুকে রইল।
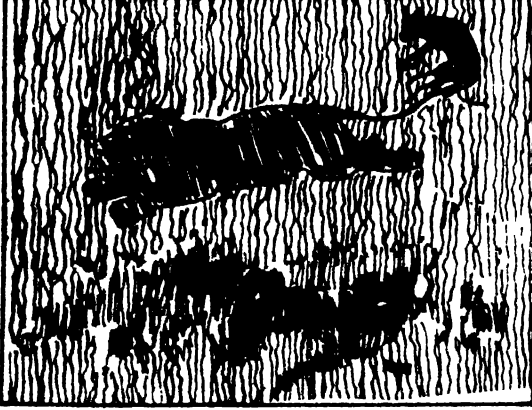
সেই গর্তটা ছিল এক শিয়ালের। সে তার মামা বাঘের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। অনেক রাত্রে ফিরে এসে দেখে, তার গর্তের ভিতর কি রকম একটা জন্তু ঢুকে রয়েছে। ছাগলছানাটা কালো ছিল, তাই শিয়াল অন্ধকারের ভিতর ভালো করে দেখতে পেল না। সে ভাবল বুঝি রাক্ষস-টাক্ষস হবে। এই মনে করে সে ভয়ে ভয়ে জিগগেস করল, 'গর্তের ভিতর কে ও?'

ছাগলছানাটা ভারি বুদ্ধিমান ছিল, সে বললে—

লম্বা লম্বা দাড়ি
ঘন ঘন নাড়ি।
সিংহের মামা আমি নরহরি দাস
পঞ্চাশ বাঘে মোর এক এক গ্রাস!

শুনেই তো শিয়াল 'বাবা গো!' বলে সেখান থেকে দে ছুট! এমন ছুট দিল যে একেবারে বাঘের ওখানে গিয়ে তবে সে নিশ্বাস ফেললে।

বাঘ তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিগগেস করলে, 'কি ভাগ্নে, এই গেলে, আবার এখুনি এত ব্যস্ত হয়ে ফিরলে যে?'

শিয়াল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'মামা, সর্বনাশ তো হয়েছে, আমার গর্তে এক নরহরি দাস এসেছে। সে বলে কিনা যে পঞ্চাশ বাঘে তার এক গ্রাস!'

তা শুনে বাঘ ভয়ানক রেগে বললে, 'বটে, তার এত বড় আস্পর্ধা! চল তো ভাগ্নে! তাকে দেখাব কেমন পঞ্চাশ বাঘে তার এক গ্রাস!'

শিয়াল বললে, 'আমি আর সেখানে যেতে পারব না, আমি সেখানে গেলে যদি সেটা হাঁ করে আমাদের খেতে আসে, তাহলে তুমি তো দুই লাফেই পালাবে। আমি তো তেমন ছুটতে পারব না, আর সে বেটা আমাকেই ধরে খাবে।'

বাঘ বললে, 'তাও কি হয়? আমি কখনো তোমাকে ফেলে পালাব না।'

শিয়াল বললে, 'তবে আমাকে তোমার লেজের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চল।

তখন বাঘ তো শিয়ালকে বেশ করে লেজের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে, আর শিয়াল ভাবছে, 'এবারে আর বাঘমামা আমাকে ফেলে পালাতে পারবে না।

এমনি করে তারা দুজনে শিয়ালের গর্তের কাছে এল। ছাগলছানা দূর থেকেই তাদের দেখতে পেয়ে শিয়ালকে বললে—

দূর হতভাগা! তোকে দিলুম দশ বাঘের কড়ি,
এক বাঘ নিয়ে এলি লেজে দিয়ে দড়ি!

শুনেই তো ভয়ে বাঘের প্রাণ উড়ে গিয়েছে। সে ভাবলে যে, নিশ্চয় শিয়াল তাকে ফাঁকি দিয়ে নরহরি দাসকে খেতে দেবার জন্য এনেছে। তারপর সে কি আর সেখানে দাড়ায়! সে পঁচিশ হাত লম্বা এক এক লাফ দিয়ে শিয়ালকে সুদ্ধ নিয়ে পালাল। শিয়াল বেচারা মাটিতে আছাড় খেয়ে, কাঁটার আঁচড় খেয়ে, খেতের আলে ঠোক্কর খেয়ে একেবারে যায় আর কি! শিয়াল চেঁচিয়ে বললে, 'মামা, আল! মামা, আল!' তা শুনে বাঘ ভাবে বুঝি সেই নরহরি দাস এল, তাই সে আরো বেশি করে ছোটে। এমনি করে সারারাত ছুটোছুটি করে সারা হল।

সকালে ছাগলছানা বাড়ি ফিরে এল।

শিয়ালের সেদিন ভারি সাজা হয়েছিল। সেই থেকে বাঘের উপর তার এমনি রাগ হল যে, সে রাগ আর কিছুতেই গেল না।

বাঘ মামা আর শিয়াল ভাগ্নে

শিয়াল ভাবে, 'বাঘ মামা, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি!' এখন সে আর নরহরি দাসের ভয়ে তার পুরনো গর্তে যায় না, সে একটা নতুন গর্ত খুঁজে বার করেছে।

সেই গর্তের কাছে একটা কুয়ো ছিল।

একদিন শিয়াল নদীর ধারে একটা মাদুর দেখতে পেয়ে, সেটাকে টেনে তার বাড়িতে নিয়ে এল। এনে, সেই কুয়োর মুখের উপর তাকে বেশ করে বিছিয়ে বাঘকে গিয়ে বললে, 'মামা, আমার নতুন বাড়ি দেখতে গেলে না?' শুনে বাঘ তখনি তার নতুন বাড়ি দেখতে এল। শিয়াল তাকে সেই কুয়োর মুখে বিছানো মাদুরটা দেখিয়ে বললে, 'মামা, একটু বস, জলখাবার খাবে।'

বাঘ কুয়োর ভিতর পড়ে যাচ্ছে

জলখাবারের কথা শুনে বাঘ ভারি খুশি হয়ে, লাফিয়ে সেই মাদুরের উপর

বসতে গেল, আর অমনি সে কুয়োর ভিতরে পড়ে গেল। তখন শিয়াল বললে, 'মামা, খুব করে জল খাও, একটুও রেখ না যেন!'

সেই কুয়োর ভিতরে কিন্তু বেশি জল ছিল না, তাই বাঘ তাতে ডুবে মারা যায়নি। সে আগে খুবই ভয় পেয়েছিল, কিন্তু শেষে অনেক কষ্টে উঠে এল। উঠেই সে বললে, 'কোথায় গেলি রে শিয়ালের বাচ্চা? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি। কিন্তু শিয়াল তার আগেই পালিয়ে গিয়েছিল, তাকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না।
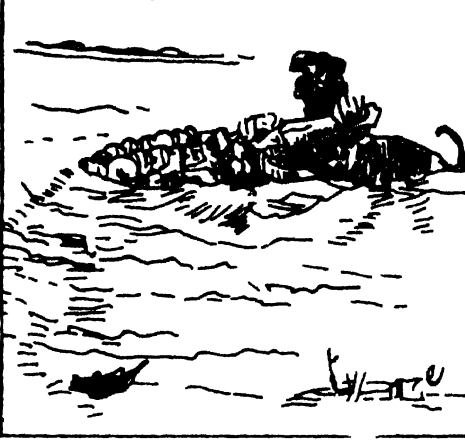
কুমিব বাঘকে কামডে ধবেছে

তাবপর থেকে বাঘের ভয়ে শিয়াল আর তার বাড়িতেও আসতে পায় না খাবার খুঁজতেও যেতে পারে না। দূর থেকে দেখতে পেলেই বাঘ তাকে মারতে আসে। বেচারী না খেয়ে না খেয়ে শেষে আধমরা হয়ে গেল।

তখন সে ভাবলে, 'এমন হলে তো মরেই যাব। তার চেয়ে বাঘ মামার কাছে যাই না কেন? দেখি যদি তাকে খুশি করতে পারি।'

এই মনে কবে সে বাঘের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বাঘের বাড়ি থেকে অনেক দুবে থাকতেই সে খালি নমস্কার করছে আর বলছে, 'মামা, মামা!'

শুনে বাঘ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'তাই তো, শিয়াল যে!'

শিয়াল অমনি ছুটে এসে, দুহাতে তার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'মামা, আমাকে খুঁজতে গিয়ে তোমার বড় কষ্ট হচ্ছিল, দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল। মামা, আমি তোমাকে বড্ড ভালোবাসি, তাই এসেছি, আর কষ্ট করে খুঁজতে হবে না, ঘরে বসেই আমাকে মার।'

শিয়ালের কথায় বাঘ তো ভারি থতমত খেয়ে গেল। সে তাকে মারলে না, খালি ধমকিয়ে বললে, 'হতভাগা পাজি, আমাকে কুয়োয় ফেলে দিয়েছিলি কেন?'

শিয়াল জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বললে, 'রাম রাম! তোমাকে আমি কুয়োয় ফেলতে পারি? সেখানকার মাটি বড্ড নরম ছিল, তার উপর তুমি লাফিয়ে পড়েছিলে, তাই গর্ত হয়ে গিয়েছিল। তোমার মতো বীর কি মামা আর কোথাও আছে?'

তা শুনে বোকা বাঘ হেসে বললে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ ভাগ্নে, সে কথা ঠিক। আমি তখন বুঝতে পারিনি।'

এমনি করে তাদের আবার ভাব হয়ে গেল

তারপর একদিন শিয়াল নদীর ধারে গিয়ে দেখল যে, বিশ হাত লম্বা একটা কুমির ডাঙায় উঠে রোদ পোয়াচ্ছে। তখন সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বাঘকে বললে, 'মামা, মামা,

একটা নৌকো কিনেছি, দেখবে এসো।'

বোকা বাঘ এসে সেই কুমিরটাকে সত্যি সত্যি নৌকো মনে করে লাফিয়ে তার উপর উঠতে গেল, আর অমনি কুমির তাকে কামড়ে ধরে জলে গিয়ে নামল।

তা দেখে শিয়াল নাচতে নাচতে বাড়ি চলে গেল।

বোকা জোলা আর শিয়ালের কথা

এক বোকা জোলা ছিল। সে একদিন কাস্তে নিয়ে ধান কাটতে গিয়ে খেতের মাঝখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে উঠে আবার কাস্তে হাতে নিয়ে দেখল, সেটা বড্ড গরম হয়েছে।

কাস্তে খানা রোদ লেগে গরম হয়েছিল, কিন্তু জোলা ভাবলে তার জ্বর হয়েছে। তখন সে 'আমার কাস্তে তো মরে যাবে রে!' বলে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল।

পাশের খেতে এক চাষা কাজ করছিল। জোলার কান্না শুনে সে বললে, 'কি হয়েছে?'

জোলা বললে, 'আমার কাস্তের জ্বর হয়েছে।'

তা শুনে চাষা হাসতে হাসতে বললে, 'ওকে জলে ডুবিয়ে রাখ, জ্বর সেরে যাবে।'

জলে ডুবিয়ে কাস্তে ঠাণ্ডা হল, জোলাও খুব সুখী হল।

তারপর একদিন জোলার মায়ের জ্বর হয়েছে। সকলে বললে, 'বদ্যি ডাক।' জোলা বললে, 'আমি ওষুধ জানি।' বলে, সে তার মাকে পুকুরে নিয়ে জলের ভিতরে চেপে ধরল। সে বেচারী যতই ছটফট করে, জোলা ততই আরো চেপে ধরে, আর বলে, 'রোস, এই তো জ্বর সারছে।'

কাস্তের জ্বর হয়েছে

তারপর যখন বুড়ি আর নড়ছে চড়ছে না, তখন তাকে তুলে দেখে সে মরে গেছে। তখন জোলা চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল, তিনদিন কিছু খেল না, পুকুর পাড় থেকে ঘরেও গেল না।

এক শিয়াল সেই জোলার বন্ধু ছিল। সে জোলাকে কাঁদতে দেখে এসে বললে, 'বন্ধু, তুমি কেঁদ না, তোমাকে রাজার মেয়ে বিয়ে করাব।'

শুনে জোলা চোখ মুছে ঘরে গেল। তারপর থেকে সে রোজ শিয়ালকে বলে, 'কই বন্ধু, সেই যে বলেছিলে?'

শিয়াল বললে, 'যখন বলেছি, তখন করাবই। আগে তুমি খানকতক খুব ভালো কাপড় বুনগে দেখি।' জোলা দুমাস খালি কাপড়ই বুনল। তারপর শিয়াল তাকে খুব করে সাবান

পাগড়ী এঁটে, চাদর জড়িয়ে ছাতা বগলে করে, শিয়াল

মেখে স্নান করতে বলে, রাজার কাছে মেয়ে চাইতে বেরুল।

কানে কলম গুঁজে, পাগড়ি এঁটে, জামা জুতো পরে, চাদর জড়িয়ে ছাতা বগলে করে, শিয়াল যখন রাজার কাছে উপস্থিত হল, তখন রাজামশাই ভাবলেন, এ খুব পণ্ডিত লোক হবে। তিনি জিগগেস করলেন, 'কি শিয়াল পণ্ডিত, কি জন্যে এসেছ।'

শিয়াল বললে, 'মহারাজ, আমাদের রাজার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন কি না তাই জানতে এসেছি।'

শিয়াল মিছে কথা বলেনি, সেই জোলার নাম ছিল 'রাজা'। কিন্তু রাজামশাই মনে করলেন বুঝি সত্যি সত্যিই রাজা। তিনি ব্যস্ত হয়ে জিগগেস করলেন, 'তোমাদের রাজা কেমন?'

শিয়াল বললে—

দেখতে রাজা বড়ই ভালো
ঘরময় তার চাঁদের আলো।
বুদ্ধি তার আছে যেমন
লেখাপড়া জানে তেমন।
এক ঘায় তার দশটা পড়ে
তার গুণে লোক খায় পরে।

সত্যি সত্যিই সে জোলা দেখতে ভারি সুন্দর ছিল, তাই শিয়াল বললে, 'দেখতে বড়ই ভালো।'

তার ঘরে চাল ছিল না বলে ভিতরে চাঁদের আলো আসত, তাই শিয়াল বললে, 'ঘরময় চাঁদের আলো।' কিন্তু রাজামশাই ভাবলেন, বুঝি সেটা তাঁর নিজের বাড়ির মতন খুব ঝকঝকে জমকালো একটা বাড়ি!

বুদ্ধি তার ছিল না, আর সে লেখাপড়াও জানত না। কাজেই শিয়াল বললে, 'বুদ্ধি তার আছে যেমন, লেখাপড়া জানে তেমন।' কিন্তু রাজা ভাবলেন, তার ভারি বুদ্ধি, সে ঢের লেখাপড়া জানে।

'এক ঘায়, তার দশটা পড়ে,' এ কথাও সত্যি। দশটা মানুষ নয় দশটা ধানের গাছ! সে চাষা ছিল, কাস্তে নিয়ে ধান কাটত। রাজামশাই কিন্তু ভাবলেন, সে মস্ত বড় বীর, তার এক ঘায় দশজন মানুষ মরে যায়।

সে ধানের চাষ করত আর কাপড় বুনত। ধান থেকেই তো ভাত হয় তাই লোকে খায়, আর কাপড় পরে। তাই শিয়াল বললে, 'তার গুণে লোক খায় পরে।' রাজামশাই কিন্তু

সেইরকম বুঝলেন না। তিনি ভাবলেন বুঝি সে ঢের গরীব লোককে খেতে পরতে দেয়।

কাজেই তিনি খুব খুশি হয়ে শিয়ালকে এক হাজার টাকা বকশিশ দিলেন, আর বললেন, 'এমন লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না তো কার সঙ্গে দেব? তোমার রাজাকে নিয়ে এস, আট দিনের পর বিয়ে হবে।'

শিয়াল সেই হাজার টাকার থলে বগলে করে, নাচতে নাচতে জোলার কাছে এল। এসে দেখে জোলা খালি কাপড়ই বুনছে। দুমাসে সে এত কাপড় বুনেছে যে সেই গ্রামের সকলের এক একখানি করে কাপড় হতে পারে।

শিয়াল সেই টাকার থলে থেকে দুটি করে টাকা আর এক একখানি কাপড় গ্রামের সকলকে দিয়ে বললেন, 'আট দিন পরে রাজার মেয়ের সঙ্গে আমাদের বন্ধুর বিয়ে হবে, আপনাদের নিমন্ত্রণ।' শুনে তারা ভারি খুশি হল। জোলা বোকা হলেও বড় ভালোমানুষ ছিল, তাই সকলে তাকে ভালোবাসত।

তারপর শিয়াল আর সব শিয়ালের কাছে গিয়ে বললে, 'ভাই সকল, আমার বন্ধুর বিয়ে, তোমাদের নিমন্ত্রণ। তোমরা গান গাইতে যাবে।' শুনে শিয়াল সব হোয়া হোয়া করে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব।'

তারপর শিয়াল ব্যাঙদের কাছে গিয়ে বললে, 'ভাই সকল, আমার বন্ধুর বিয়ে, তোমাদের নিমন্ত্রণ। তোমরা গান গাইতে যাবে।'

জোলা আর শিয়াল

সকল ব্যাঙ ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব।'

তারপর শিয়াল হাঁড়িচাঁচাদের কাছে, ঘুঘুদের কাছে, কুঁকো পাখিদের কাছে, উৎক্রোশ পাখিদের কাছে, বৌ-কথা-ক-দের কাছে, ময়ূরদের কাছে, চোখ-গেলদের আর ভগদত্তদের কাছে গিয়েও তেমনি করে নিমন্ত্রণ করে এল। তারা সবাই বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব।'

এসব কাজ শেষ হতে সাতদিন লাগল। তারপরের দিন রাত্রিতে বিয়ে। শিয়াল তার বন্ধুর জন্যে চমৎকার পোশাক ভাড়া করে এনে যখন সেই পোশাক তাকে পরিয়ে দিলে তখন সত্যিসত্যিই তাকে খুব বড় একটা রাজার মতন মনে হতে লাগল। যাদের নিমন্ত্রণ, তারা সবাই এল। যাবার সময় হলে, শিয়াল তাদের সকলকে নিয়ে রাজার বাড়ি চলল।

রাজার বাড়ি যখন এক ক্রোশ দূরে, তখন শিয়াল সকলকে ডেকে বললে, 'ভাই সকল, ঐ দেখ রাজার বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। তোমরা ঐ আলো দেখে খুব ধীরে ধীরে এস। আমি ততক্ষণ ছুটে গিয়ে রাজামশাইকে খবর দি।'

সবাই বললে, 'আচ্ছা।'

শিয়াল বললে, 'তবে একবার তোমরা সবাই মিলে গান ধর তো। দেখি কার কেমন গলার জোর।' অমনি পাঁচ হাজার শিয়াল মিলে চ্যাঁচাতে লাগল, 'হুয়া, হুয়া, হুয়া, হুয়া!'

বারো হাজার ব্যাঙ বললে, 'ঘোঁৎ, ঘোঁৎ, ঘেঁয়াও, ঘেঁয়াও!'

সাত হাজার শালিক বললে—

ফড়িং সঙ্গে সঙ্গে চারিজনং
চকিৎ কাট কাট কাট গুরুচরণ!

দু হাজার হাঁড়িচাঁচা বললে, 'ঘ্যাঁচা, ঘ্যাঁচা, ঘ্যাঁচা, ঘ্যাঁচা, ঘ্যাঁচা, ঘ্যাঁচা।'

চার হাজার ঘুঘু বললে, 'রঘু, রঘু, রঘু, রঘু, রঘু, রঘু!'

তিন হাজার কুঁকো বললে, 'পুৎ, পুৎ, পুৎ, পুৎ, পুৎ, পুৎ!'

উনিশ শো উৎক্রোশ বললে, 'হাঁ আঃ, হাঁ আঃ, হাঁ আঃ, ও হো হো হো হো!'

আর যত বৌ-কথা-ক, ময়ূর, ভগদত্ত আর চোখ-গেল, তারাও সবাই মিলে যার যার নিজের গান ধরতে ছাড়ল না।

তখন শুনতে কেমন হয়েছিল তা সেখানে থাকলে বোঝা যেত। রাজার বাড়ির লোকেরা দূর থেকে তা শুনে তো ভয়েই কাঁপতে লাগল। তারপর যখন শিয়াল রাজামশাইকে খবর দিতে এল, তখন তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'শিয়াল পণ্ডিত, ওটা কিসের গোলমাল?'
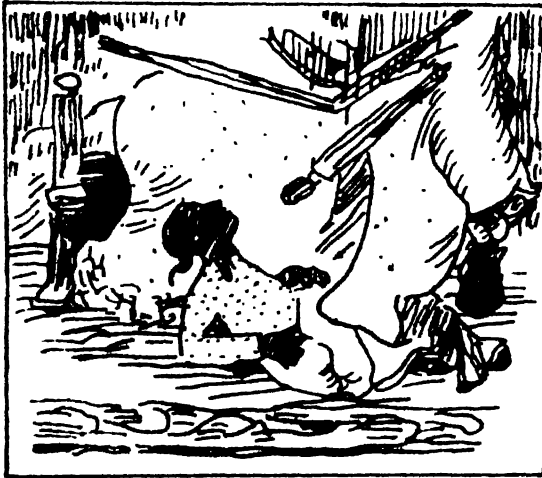
সবসুদ্ধ ভেঙে নিয়ে ধপাৎ

শিয়াল বললে, 'ওটা আমাদের বাজনা আর লোকজনের শব্দ।'

শুনে রাজা তো ভয়ে অস্থির হলেন। এত লোককে কোথায় বসাবেন, কি দিয়ে খাওয়াবেন, ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। তিনি শিয়ালকে বললেন, 'তাই তো, কি হবে?'

শিয়াল বললে, 'ভয় কি মহারাজ! আমি এখুনি গিয়ে লোকজন সব ফিরিয়ে দিচ্ছি। খালি রাজাকে আপনার কাছে আনব।'

রাজা তখন বড়ই খুশি হয়ে শিয়ালকে পাঁচ হাজার টাকা বকশিশ দিলেন। শিয়াল ফিরে এসে মাঠের মাঝখানে অনেক টাকার মুড়ি-মুড়কি, আর ছোট ছোট মাছ ছড়িয়ে দিয়ে বললে, 'তোমরা খাও।' অমনি তার সঙ্গের সব শিয়াল, ছোট ব্যাঙ আর পাখি মিলে কাড়াকাড়ি করে সে সব খেতে লাগল। শিয়াল তার গ্রামের লোকদের প্রাণ ভরে সন্দেশ খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। তারপর জোলাকে নিয়ে রাজার কাছে এল। আসবার সময় তাকে শিখিয়ে আনল, 'খবরদার! কথা বলো না যেন, তবে কিন্তু বিয়ে করতে পাবে না।'

রাজার বাড়ির লোকেরা বর দেখে কি যে খুশি হল, কি বলব! তারা খালি এইজন্য দুঃখ করতে লাগল যে, এমন সুন্দর বর, কিন্তু সে কথা কয় না কেন?

শিয়াল বললে, 'ওঁর মা মরে গিয়েছেন, সেই দুঃখে উনি কথা বলছেন না।' শুনে সবাই বললে, 'আহা!' কিন্তু আসল কথা এই যে, কথা বললেই কিনা জোলা ধরা পড়ে যাবে, তাই শিয়াল তাকে মানা করেছে।

খাবার সময় জোলাকে সোনার থালায় ভাত, আর একশোটা সোনার বাটিতে নানারকম তরকারি আর মিঠাই দিয়েছিল। সে এক একটি করে সবগুলো বাটি হাতে নিয়ে শুঁকে দেখল। শেষে তার কোনোটাই চিনতে না পেরে, মিঠাই, ঝোল, অম্বল, সব একসঙ্গে ভাতের উপর ঢেলে মেখে নিল। তারপর তার খানিকটা বই খেতে না পেরে, যা বাকি ছিল চাদরে বাঁধতে গেল।

সকলে শিয়ালকে বললে, 'তোমাদের রাজা কেন এমন? কখনো কিছু খায়নি নাকি?'

শিয়াল চোখ ঠেরে তাদের কানে কানে বলল, 'উনি একবার বই দুবার মেখে খান না, আর পাতে যা থাকে তা চাদরে বেঁধে, সেই চাদরখানি সুদ্ধ গরীবকে দেন। একজন গরীবকে ডাক!'

বলে সে খাবার বাঁধা চাদরখানি জোলার গা থেকে খুলে গরীবকে দিয়ে দিল।

শোবার সময় জোলার ভারি মুশকিল হল। হাতির দাঁতের খাটে বিছানা, তাতে মশারি খাটানো। সে বেচারা কোনোদিন খাটও দেখেনি, মশারিও দেখেনি।

আগে গিয়ে খাটের তলায় ঢুকল, সেখানে বিছানা নেই দেখে বেরিয়ে এল। তারপর মশারির চারধার খুঁজে তার দরজা টের না পেয়ে বললে, 'বুঝেছি, ঘরের ভিতর ঘর করেছে, তার দোর রেখেছে চালের উপর!'

বলে সে খাটের খুঁটি বেয়ে যেই মশারির চালে উঠতে গিয়েছে অমনি সবসুদ্ধ ভেঙে গিয়ে ধপাস! তখন সে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'ধান কাটতুম, কাপড় বুনতুম, সেই ছিল ভালো। রাজার মেয়ে বিয়ে করে মোর কোমর ভেঙে গেল।'

ভাগ্যিস সেখানে আর লোক ছিল না, কেবল রাজার মেয়ে ছিলেন, আর বাইরে শিয়াল বসে ছিল। রাজার মেয়ে অনেক কাঁদলেন, আর শিয়ালকে বকলেন। কিন্তু তাঁর ভারি বুদ্ধি ছিল, তাই এ কথা আর কাউকে বললেন না!

পরদিন রাজার মেয়ের কথায় শিয়াল গিয়ে রাজাকে বললে, 'মহারাজ, আপনার জামাই বলছেন, আপনার মেয়েকে নিয়ে তিনি নানান দেশ দেখতে যাবেন। তাই ছুটি চাচ্ছেন।'

রাজা খুশি হয়ে ছুটি দিলেন, আর লোকজন, টাকাকড়ি সঙ্গে দিলেন। তারপর রাজার মেয়ে জোলাকে নিয়ে আর এক দেশে গিয়ে বড় বড় মাস্টার রেখে তাকে সকলরকম বিদ্যে শেখাতে লাগলেন। দু-তিন বছরের মধ্যে জোলা মস্ত পণ্ডিত আর বীর হয়ে উঠল।

তখন খবর এল যে, রাজা মরে গেছেন, আর তাঁর ছেলে নেই বলে জামাইকে রাজা করে গিয়েছেন।

তখন খুব সুখের কথা হল।

কুঁজো বুড়ির কথা

এক যে ছিল কুঁজো বুড়ি। সে লাঠি ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে চলত, আর তার মাথাটা খালি ঠকঠক করে নড়ত। বুড়ির দুটো কুকুর ছিল। একটার নাম রঙ্গা, আর একটার নাম ভঙ্গা।

বুড়ি যাবে নাতনির বাড়ি, তাই কুকুর দুটোকে বললে, 'তোরা যেন বাড়ি থাকিস, কোথাও চলে টলে যাসনে।'

রঙ্গা-ভঙ্গা বললে, 'আচ্ছা।' তারপর বুড়ি লাঠি ভর দিয়ে, কুঁজো হয়ে যাচ্ছে, আর তার মাথাটা খালি ঠক ঠক করে নড়ছে। এমনি করে সে খানিক দূর গেল।

তখন এক শিয়াল তাকে দেখতে পেয়ে বললে, 'ঐ রে, সেই কুঁজো বুড়ি যাচ্ছে। বুড়ি, তোকে তো খাব!'

বুড়ি বললে, 'রোস, আমি আগে নাতনীর বাড়ি থেকে মোটা হয়ে আসি, তারপর খাস। এখন খেলে তো শুধু হাড় আর চামড়া খাবি, আমার গায়ে কি আর কিছু আছে?'

শিয়াল বলছে, 'বুড়ি, তোকে তো খাব!'

শুনে শিয়াল বললে, 'আচ্ছা, তবে মোটা হয়ে আয়, তারপর খাব এখন।' বলে শিয়াল চলে গেল।

তারপর বুড়ি আবার লাঠি ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে যাচ্ছে, আর তার মাথাটা ঠক ঠক করে নড়ছে। এমনি করে আরো খানিক দূর গেল।

তখন এক বাঘ তাকে দেখতে পেয়ে বললে, 'ঐ রে সেই কুঁজো বুড়ি যাচ্ছে। বুড়ি, তোকে তো খাব!'

বুড়ি বললে, 'রোস, আমি আগে নাতনীর বাড়ি থেকে মোটা হয়ে আসি, তারপর খাস। এখন খেলে তো শুধু হাড় আর চামড়া খাবি, আমার গায়ে কি আর কিছু আছে?'

শুনে বাঘ বললে, 'আচ্ছা, তবে মোটা হয়ে আয়, তারপর খাব এখন।' বলে বাঘ চলে গেল।

তারপর বুড়ি আবার লাঠি ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে যাচ্ছে, আর তার মাথাটা ঠক ঠক করে নড়ছে। এমনি করে সে আরো খানিক দূর গেল।

তখন এক ভাল্লুক তাকে দেখতে পেয়ে বললে, 'ঐ রে, সেই কুঁজো বুড়ি যাচ্ছে। বুড়ি, তোকে তো খাব!'

বুড়ি বললে, 'রোস, আমি আগে নাতনীর বাড়ি থেকে মোটা হয়ে আসি, তারপর খাস।

এখন খেলে তো শুধু হাড় আর চামড়া খাবি, আমার গায়ে কি আর কিছু আছে?'

শুনে ভাল্লুক বললে, 'আচ্ছা, তবে মোটা হয়ে আয়, তারপর খাব এখন।'

ভাল্লুক লাউ নেড়ে-চেড়ে দেখছে

এই বলে ভাল্লুক চলে গেল। বুড়িও আর খানিক দূর গিয়েই তার নাতনীর বাড়ি পৌঁছল। সেখানে দই আর ক্ষীর খেয়ে খেয়ে এমনি মোটা হল যে, কি বলব! আর একটু মোটা হলেই সে ফেটে যেত।
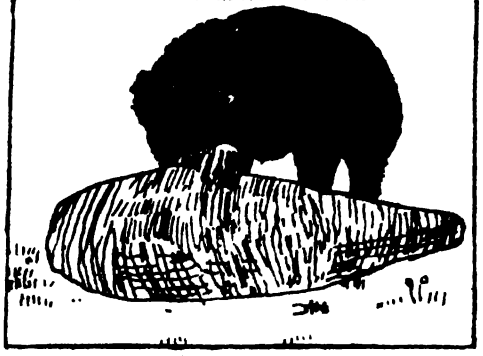
তাই সে তার নাতনীকে বললে, 'ওগো নাতনী, আমি তো বাড়ি চললুম। এবারে আর আমি চলতে পারব না। আমাকে গড়িয়ে যেতে হবে। আবার পথে ভাল্লুক, বাঘ আর শিয়াল হাঁ করে বসে আছে। আমাকে দেখতে পেলেই ধরে খাবে। এখন বল দেখি কি করি?'

নাতনী বললে, 'ভয় কি দিদিমা? তোমাকে এই লাউয়ের খোলটার ভিতরে পুরে দেব। তাহলে বাঘ ভাল্লুক বুঝতেও পারবে না, তোমাকে খেতেও পারবে না।'

বলে, সে বুড়িকে একটা লাউয়ের খোলার ভিতর পুরে, তার খাবার জন্যে চিঁড়ে আর তেঁতুল সঙ্গে দিয়ে, হেঁইয়ো বলে লাউয়ে ধাক্কা দিলে, আর লাউ গাড়ির মতন গড়গড়িয়ে চলল।

লাউ চলেছে আর বুড়ি তার ভিতর থেকে বলছে—

লাউ গড়-গড়, লাউ গড়-গড়,
খাই চিঁড়ে আর তেঁতুল,
বীচি ফেলি টুল্-টুল্।
বুড়ি গেল ঢের দূর!

পথের মাঝখানে সেই ভাল্লুক হাঁ করে বসে আছে, বুড়িকে খাবে বলে। সে বুড়ি-টুড়ি কিছু দেখতে পেলে না, খালি দেখলে একটা লাউ গড়িয়ে যাচ্ছে। লাউটাকে নেড়ে-চেড়ে দেখলে বুড়িও নয়, খাবার জিনিসও নয়। আর তার ভিতর থেকে কে যেন বলছে, 'বুড়ি গেল ঢের দূর!' শুনে সে ভাবলে বুড়ি চলে গিয়েছে। তখন সে ঘোঁৎ করে তাতে দিলে এক ধাক্কা আর সেটা গাড়ির মতন গড়গড়িয়ে চলল।

লাউ চলছে আর বুড়ি তার ভিতর থেকে বলছে—

লাউ গড়-গড়, লাউ গড়-গড়,
খাই চিঁড়ে আর তেঁতুল,
বীচি ফেলি টুল্-টুল্।
বুড়ি গেল ঢের দূর!

আবার খানিক দূরে বাঘ বসে আছে বুড়িকে খাবে বলে। সে বুড়িকে দেখতে পেলে না, খালি দেখলে একটা লাউ গড়িয়ে যাচ্ছে। সেটাকে নেড়েচেড়ে দেখলে, বুড়িও নয়, খাবার জিনিসও নয়। আর তার ভিতর থেকে কে যেন বলছে, 'বুড়ি গেল ঢের দূর।' শুনে সে ভাবলে বুড়ি চলে গিয়েছে। তখন সে ঘোঁৎ করে তাতে দিলে এক ধাক্কা, আর সেটা গাড়ির মতন গড়গড়িয়ে চলল।

লাউ চলছে আর বুড়ি তার ভিতর থেকে বলছে—

লাউ গড়-গড়, লাউ গড়-গড়,
খাই চিঁড়ে আর তেঁতুল,
বীচি ফেলি টুল্-টুল্।
বুড়ি গেল ঢের দূর!

আবার খানিক দূরে সেই শিয়াল পথের মাঝখানে বসে আছে। সে লাউ দেখে বললে, 'হুঁ! লাউ কিনা আবার কথা বলে। ওর ভিতরে কি আছে দেখতে হবে।' তখন সে হতভাগা লাথি মেরে লাউটা ভেঙেই বলে কিনা, 'বুড়ি তোকে তো খাব!'

বুড়ি বললে, 'খাবি বইকি! নইলে এসেছি কি করতে? তা, আগে দুটো গান শুনবিনে?'

শিয়াল বললে, 'হ্যাঁ, দুটো গান হলে মন্দ হয় না। আমিও একটু-আধটু গাইতে পারি।'

বুড়ি বললে, 'তবে ভালোই হল। চল ঐ ঢিপিটায় উঠে গাইব এখন।'

বলে বুড়ি সেই ঢিপির উপরে উঠে সুর ধরে চেঁচিয়ে বললে, 'আয়, আয় রঙ্গা-ভঙ্গা, তু-উ-উ-উ-উ!'

অমনি বুড়ির দুই কুকুর ছুটে এসে, একটা ধরলে শিয়ালের ঘাড় আর একটায় ধরলে তার কোমর। ধরে টান কি টান! শিয়ালের ঘাড় ভেঙে গেল, কোমর ভেঙে গেল, জিভ বেরিয়ে গেল, প্রাণ বেরিয়ে গেল—তবু তারা টানছেই, টানছেই, খালি টানছে।

উকুনে-বুড়ির কথা

এক যে ছিল উকুনে-বুড়ি, তার মাথায় বড্ড ভয়ানক উকুন ছিল। সে যখন তার বুড়োকে ভাত খেতে দিতে যেত তখন ঝরঝর করে সেই উকুন বুড়োর পাতে পড়ত। তাইতে সে একদিন রেগে গিয়ে, ঠাই করে বুড়িকে ঠেঙার বাড়ি মারলে। তখন বুড়ি ভাতের হাঁড়ি আছড়ে গুঁড়ো করে রাগের ভরে সেই যে নদীর ধার দিয়ে চলে গেল, আর তাকে বুড়ো ডেকে ফিরাতে পারলে না।

নদীর ধারে এক বক বসে ছিল, সে উকুনে-বুড়িকে দেখে বললে, 'উকুনে বুড়ি, কোথা যাস?'

উকুনে বুড়ি বললে—

স্বামী মারলে, রাগে তাই
ঘর গেরস্তী, ফেলে যাই।

বক বললে, 'তোর স্বামী মারলে কেন? কি হয়েছে?'

উকুনে বুড়ি বললে, 'আমার মাথা থেকে তার পাতে উকুন পড়েছিল।'

বক বললে, 'কেন, উকুন তো বেশ লাগে! তার জন্যে মারলে কেন? তুই আমার বাড়ি চল। শুনেছি তুই খুব ভালো রাঁধিস।' তাইতে উকুনে বুড়ি বকের বাড়িতে রাঁধুনি হল। তার রান্না বকের বেশ ভালো লাগত, আর পাতে উকুন পড়লে তো সে খুব খুশিই হত।

তখন, একদিন হয়েছে কি—বক এনেছে একটা মস্ত শোল মাছ। এনে সে উকুনে বুড়িকে বললে, 'উকুনে বুড়ি, মাছটা বেশ করে রাঁধ।'

বলে সে আবার নদীর ধারে চলে গেল। উকুনে বুড়ি মাছ রাঁধতে লাগল। রাঁধতে রাঁধতে বেচারা মাথা ঘুরে কখন কড়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছে কেউ জানতে পারেনি।

বক এসে দেখলে, উকুনে বুড়ি পুড়ে মরে আছে। দেখে তার এমনি দুঃখ হল যে, সে নদীর ধারে গিয়ে মুখ ভার করে বসে রইল, সাতদিন কিছু খেল না।

নদী বললে, 'ভালো রে ভালো, সাতদিন ধরে এমন করে বসে আছে, খায় দায়নি! এর হল কি? হ্যাঁ ভাই বক, তোর হয়েছে কি ভাই?'

বক বললে, 'আরে ভাই, সে কথা বলে কি হবে? আমার যা হবার তা হয়েছে।'

নদী বললে, 'ভাই, আমাকে বলতে হবে।'

বক বললে, 'যদি বলি, তবে কিন্তু তোর সব জল ফেনা হয়ে যাবে।'

নদী বললে, 'হয় হবে, তুই বল।'

তখন বক বললে,

উকুনে বুড়ি
পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন
উপোস রইল।

অমনি ফ্যান-ফ্যান করে দেখতে দেখতে নদীর জল ফেনিয়ে সাদা হয়ে গেল।

সেই নদীতে এক হাতি রোজ জল খেতে আসে। সেদিন সে জল খেতে এসে দেখে, একি কাণ্ড হয়ে আছে।

উকুনে-বুড়ি ও বক

হাতি বললে, 'নদী, তোর একি হল? তোর জল কি করে ফেনা হয়ে গেল?'

নদী বললে, 'তা যদি বলি, তবে কিন্তু তোর লেজটি খসে পড়ে যাবে।'

হাতি বললে, 'যায় যাবে, তুই বল।' তখন নদী বললে—

উকুনে বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,

নদীর জল ফেনিয়ে গেল।

অমনি ধপাস করে হাতির লেজটা খসে পড়ে গেল!

তারপর হাতি গাছতলা দিয়ে যাচ্ছে, গাছ তাকে দেখে বললে, 'বাঃ রে, তোর একি হল? লেজ কোথায় গেল?'

হাতি বললে, 'তা যদি বলি, তবে কিন্তু তোর পাতাগুলি সব এক্ষুনি ঝরে পড়বে।'

গাছ বললে, 'পড়ে পড়ুক, তুই বল।' তখন হাতি বললে—

উকুনে বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীব জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল।

অমনি ঝরঝর করে গাছের সব পাতাগুলি ঝরে পড়ে গেল। সেই গাছে এক ঘুঘুর বাসা ছিল সে তখন খাবার খুঁজতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে, ওমা একি হয়েছে! ঘুঘু বললে, 'গাছ, তোর একি হল? তোব পাতা সব কোথায গেল?'

গাছ বললে, 'তা যদি বলি, তবে কিন্তু তোর চোখ কানা হযে যাবে।'

ঘুঘু বললে, 'যায যাবে, তুই বল।' তখন গাছ বললে—

উকুনে বুডি পুডে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীব জল ফেনিযে গেল,
হাতির লেজ খসে পডল,
গাছেব পাতা ঝবে পড়ল।

অমনি টস্ করে ঘুঘুর একটা চোখ কানা হয়ে গেল।

কানা চোখ নিয়ে ঘুঘু মাঠে চবতে গিয়েছে, তখন বাজার বাড়ির বাখাল তাকে দেখে বললে, 'সে কি রে ঘুঘু, তোব চোখ কি হল?'

ঘুঘু বললে, 'তা যদি বলি, তবে কিন্তু তোমাব হাতে তোমাব লাঠিটা আটকে যাবে।'

রাখাল বললে, 'যায় যাবে, তুই বল।' তখন ঘুঘু বললে—

উকুনে বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস বইল,
নদীব জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল,
গাছের পাতা ঝরে পড়ল,
ঘুঘুর চোখ কানা হল।

অমনি চটাস করে রাখালের লাঠি তার হাতে আটকে গেল। সে কত হাত ঝাড়লে, কিছুতেই তাকে ফেলতে পারলে না। যখন গরু নিয়ে সে রাজার বাড়িতে ফিরে এসেছে, তখনো সে হাত ঝাড়ছে।

রাজার বাড়ির দাসী ভাঙা কুলোয় করে ছাই ফেলতে যাচ্ছিল। সে রাখালকে দেখে বললে, 'দুর হতভাগা! অমনি করে হাত ঝাড়ছিস কেন? কি হয়েছে তোর হাতে?'

রাখাল বললে, 'সে কথা যদি বলি, তবে কিন্তু আর ঐ কুলোখানা তোমার হাত থেকে নামাতে পারবে না, সেখানা তোমার হাতেই আটকে থাকবে।'

দাসী বললে, 'ঈস! আচ্ছা থাকে থাকবে, তুই বল।' তখন রাখাল বললে—

উকুনে বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল,
গাছের পাতা ঝরে পড়ল,
ঘুঘুর চোখ কানা হল,
রাখালের হাতে লাঠি আটকাল।

অমনি দাসী 'ওমা! এ কি গো! কি হবে গো! বলে কাঁদতে লাগল। সে অনেক করেও কুলো হাত থেকে নামাতে পারলে না।

পিঁড়িতে বাজা আটকাল

শেষে রাখাল ছোকরাকে গাল দিতে দিতে ঘরে গেল।

ঘরে গিয়ে দাসী হাত থেকে আর কুলো নামাচ্ছে না। রানী তখন থালা হাতে করে রাজার জন্যে ভাত বাড়ছিলেন। দাসীকে দেখে তিনি হেসে বললেন, 'দাসী তোর হয়েছে কি? কুলোটা হাত থেকে নামাচ্ছিসনে কেন?'

দাসী বললে, 'তা যদি বলি রানীমা, তবে কিন্তু ঐ থালাখানা আব আপনার হাত থেকে নামাতে পারবেন না, ওখানা আপনার হাতে আটকে যাবে।'

রানী বললেন, 'বটে! আচ্ছা বল দেখি কেমন আটকায়।'

তখন দাসী বললে—

উকুনে বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল,
গাছের পাতা ঝরে পড়ল,
ঘুঘুর চোখ কানা হল,
রাখালের হাতে লাঠি আটকাল,

দাসীর হাতে কুলো আটকাল।

অমনি রানীর হাতে থালাখানি আটকে গেল, কিছুতেই তিনি আর তা নামাতে পারলেন না। তখন আর কি করেন? আর একখানা থালায় করে রাজামশাইয়ের জন্যে ভাত বেড়ে নিয়ে চললেন।

রাজামশাই তাঁকে দেখেই বললেন, 'রানী, ঐ থালাখানা হাতে করে রেখেছ যে?'

রানী বললেন, 'তা যদি বলি, তবে কিন্তু তুমি এখান থেকে উঠে যেতে পারবে না, তুমি ঐ পিঁড়িতে আটকে থাকবে।'

শুনে রাজা হো-হো করে হাসলেন, তারপর বললেন, 'আচ্ছা তাই হোক, তুমি বল।' তখন রানী বললেন—

উকুনে বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল,
গাছের পাতা ঝরে পড়ল,
ঘুঘুর চোখ কানা হল,
রাখালের হাতে লাঠি আটকাল,
দাসীর হাতে কুলো আটকাল,
রানীর হাতে থালা আটকাল।

বলতে বলতেই তো রাজামশাই পিঁড়িতে খুব ভালোমতোই আটকে গেলেন। কত টানাটানি করলেন, কিছুতেই উঠতে পারলেন না। চাকরদের ডাকলেন, তারাও কিছু করতে পারল না। তখন সেই পিঁড়িসুদ্ধ তাঁকে চারজনে ধরাধরি করে এনে সভায় বসিয়ে দিলে!

তা দেখে সভার লোকদের তো ভারি মুশকিলই হল। তাদের ভয়ানক হাসি পাচ্ছে। তারা হাসি থামাতে পারছে না, হাসতেও পারছে না, পাছে রাজামশাই রাগ করেন। কেউ ভয়ে জিগগেস করতেও পারছে না বাজামশাইয়ের কি হয়েছে।

তখন রাজামশাই নিজেই বললেন, 'তোমরা বুঝি জানতে চাচ্ছ, আমি পিঁড়িতে কি করে আটকে গেলাম।'

তারা হাত জোড় করে বললে, 'হ্যাঁ, মহারাজ।'

রাজা বললেন, 'তা যদি বলি, তবে তোমরাও যে যার বসবার জায়গায় আটকে যাবে।'

তারা বললে, 'মহারাজ যদি আটকালেন, তবে আমরা আর বাকি থাকি কেন?' তখন রাজা বললেন—

উকুনে বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল,

গাছের পাতা ঝরে পড়ল,
ঘুঘুর চোখ কানা হল,
রাখালের হাতে লাঠি আটকাল,
দাসীর হাতে কুলো আটকাল,
রানীর হাতে থালা আটকাল,
পিঁড়িতে রাজা আটকাল।

বলতেই আর তারা যাবে কোথায়! এমনি করে তারা তক্তাপোশে আটকে গেল যে, আর তাদের উঠবার সাধ্য নাই।

ভাগ্যিস সেই দেশে এক খুব বুদ্ধিমান নাপিত ছিল, নইলে মুশকিল হয়েছিল আর কি। নাপিত এসে বললে, 'শিগগির ছুতোর ডাক।'

তখন ছুতোর এসে পিঁড়ি কেটে রাজামশাইকে ছাড়ালে, আর তক্তাপোশ কেটে সভার লোকদের ছাড়ালে। একটু একটু কাঠ তবু সকলের গায়ে লেগে ছিল, সেটুকু চেঁচে তুলে দিল।

রাণীর হাতের থালা, দাসীর হাতের কুলো আর রাখালের হাতের লাঠিও কেটে ফেলে দেওয়া হল।

পান্তাবুড়ির কথা

এক যে ছিল পান্তাবুড়ি, সে পান্তাভাত খেতে বড্ড ভালোবাসত।

এক চোর এসে রোজ পান্তাবুড়ির পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই বুড়ি লাঠি ভর দিয়ে রাজার কাছে নালিশ করতে চলল।

পান্তাবুড়ি পুকুর ধার দিয়ে যাচ্ছিল। একটা শিঙিমাছ তাকে দেখতে পেয়ে বললে, 'পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?'

পান্তাবুড়ি বললে, 'চোরে আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি!'

শিঙিমাছ বললে, 'ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেও, তোমার ভালো হবে।'

পান্তাবুড়ি বললে, 'আচ্ছা।'

তারপর পান্তাবুড়ি বেলতলা দিয়ে যাচ্ছে। একটা বেল মাটিতে পড়ে ছিল, সে বললে, 'পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?'

পান্তাবুড়ি বললে, 'চোরে আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।'

বেল বললে, 'ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেও, তোমার ভালো হবে।'

পান্তাবুড়ি বললে, 'আচ্ছা।'

তারপর পান্তাবুড়ি পথের ধারে খানিকটা গোবর দেখতে পেলে। গোবর বললে, 'পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?'

পান্তাবুড়ি বললে, 'চোরে আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।'

গোবর বললে, 'ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেও, তোমার ভালো হবে।'

পান্তাবুড়ি বললে, 'আচ্ছা।'

তারপর খানিক দূর গিয়ে পান্তাবুড়ি দেখলে, পথের ধারে একখানা ক্ষুর পড়ে রয়েছে।

ক্ষুর বললে, 'পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?'

পান্তাবুড়ি বললে, 'চোরে আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।'
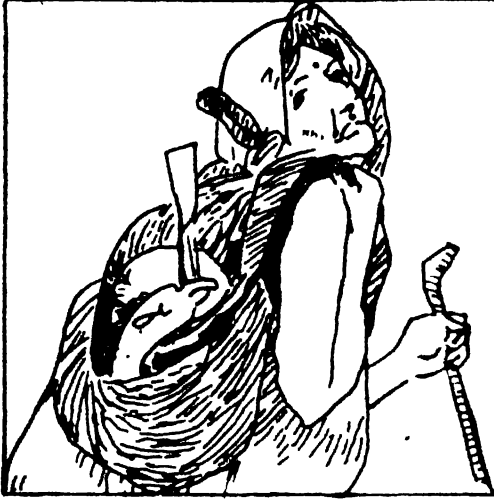
পান্তাবুড়ি

ক্ষুর বললে, 'ফিরে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিও, তোমার ভালো হবে।

পান্তাবুড়ি বললে, 'আচ্ছা।'

তারপব পান্তাবুড়ি বাজার বাড়ি গিয়ে দেখলে, রাজামশাই বাড়ি নেই। কাজেই সে আর নালিশ কবতে পেল না।

বাড়ি ফিরবার সময় তার ক্ষুর আর গোবর আর বেল আর শিঙিমাছের কথা মনে হল। সে তাদের সকলকে তার থলেয় করে নিয়ে এল।

পান্তাবুড়ি যখন বাড়ির আঙিনায় এসেছে, তখন ক্ষুর তাকে বললে, 'আমাকে ঘাসের উপর রেখে দাও।'

তাই বুড়ি ক্ষুরখানাকে ঘাসের উপর রেখে দিল।

তারপর যখন সে ঘরে উঠতে যাচ্ছে, তখন গোবর বললে, 'আমাকে পিঁড়ির উপর রেখে দাও।'

তাই বুড়ি গোবরটাকে পিঁড়ির উপর রেখে দিলে।

বুড়ি যখন ঘরে ঢুকল তখন বেল বললে, 'আমাকে উনুনের ভিতরে রাখ।' শুনে বুড়ি তাই করলে।

শেষে শিঙিমাছ বললে, 'আমাকে তোমার পান্তাভাতের ভিতরে রাখ।' বুড়িও তাই করলে।

তারপর রাত হলে বুড়ি রান্না-খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে রইল।

ঢের রাত্রে চোর এসেছে। সে তো আর জানে না, সেদিন বুড়ি কি ফন্দি করেছে। সে এসেই পান্তাভাতের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে দিল। সেখানে ছিল শিঙিমাছ। সে চোরের বাছাকে

এমনি কাঁটা ফুটিয়ে দিল যে তার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

শিঙিমাছের খোঁচা খেয়ে চোর কাঁদতে কাঁদতে উনুনের কাছে গেল। তার ভিতরে ছিল বেল। চোর যেই আঙুলে তাত দেবার জন্য উনুনে হাত ঢুকিয়েছে, অমনি পটাশ করে বেল ফেটে তার চোখেমুখে ভয়ানক লাগল।

তখন সে ব্যথা আর ভয়ে পাগলের মতো হয়ে, যেই ঘর থেকে ছুটে বেরুবে অমনি সেই গোবরে তার পা পড়েছে। তাতে সে পা হড়কে ধপাস করে সেই গোবরের উপরেই বসে পড়ল।

'ও, মাগো গেলুম গো!'

তারপর গোবর লেগে ভূত হয়ে, বেটা গিয়েছে ঘাসে পা মুছতে। সেইখানে ছিল ক্ষুর, তাতে ভয়ানক কেটে গেল। তাতে আর 'ও মা গো! গেলুম গো! বলে না চেঁচিয়ে বাছা যান কোথায়?

তা শুনে পাড়ার লোক ছুটে এসে বললে, 'এই বেটা চোর! ধর বেটাকে! মার বেটাকে! কান ছিঁড়ে ফেল!'

তখন যে চোরের সাজাটা!

চড়াই আর কাকের কথা

কাক আর চড়াই পাখিতে খুব ভাব ছিল।

গৃহস্থদের উঠানে চাটাই ফেলে ধান আর লঙ্কা রোদে দিয়েছে। চড়াই তা দেখে কাককে বললে, 'বন্ধু, তুমি আগে লঙ্কা খেয়ে শেষ করতে পারবে, না আমি আগে ধান খেয়ে শেষ করতে পারব?'

কাক বললে, 'আমি লঙ্কা আগে খাব।'

চড়াই বললে, 'আমি ধান আগে খাব।'

কাক বললে, 'যদি না খেতে পার, তবে কি হবে?'

চড়াই বললে, 'যদি না খেতে পারি, তবে তুমি আমার বুক খুঁড়ে খাবে। আর যদি তুমি না খেতে পার, তবে কি হবে?'

কাক বললে, 'তুমি আমার বুক খুঁড়ে খাবে।'

এই বলে তো দুজনে ধান আর লঙ্কা খেতে লাগল। চড়াই কুটকুট করে এক একটি ধান খায়, আর কাক খপ খপ করে একটি একটি লঙ্কা খায়। দেখতে দেখতে কাক সব লঙ্কা খেয়ে শেষ করলে, চড়াইয়ের তখন ধানের সিকিও খাওয়া হয়নি।

দুজনে ধান আর লঙ্কা খেতে লাগল

তখন কাক বললে, 'কি বন্ধু, এখন?'

চড়াই বললে, 'এখন আর কি হবে। বন্ধু হয়ে যদি আমার বুক খেতে চাও, তবে খাবে। তবে ঠোঁট দুটো ধুয়ে নিও, তুমি নোংরা জিনিস খাও।'

কাক বললে, 'আমি ঠোঁট ধুয়ে আসছি।' বলে সে গঙ্গায় ঠোঁট ধুতে গেল।
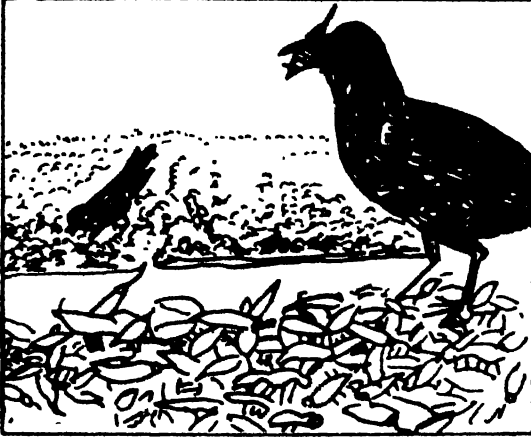
তখন গঙ্গা তাকে বললেন, 'তোর নোংরা ঠোঁট আমার গায়ে ছোঁয়াসনে। জল তুলে নিয়ে ঠোঁট ধো।'

তাতে কাক বললে, 'আচ্ছা, আমি ঘটি নিয়ে আসছি।' বলে সে কুমোরের কাছে গিয়ে বললে—

কুমোর, কুমোর! দে তো ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।

কুমোর বললে, 'ঘটি তো নেই। মাটি আন, গড়ে দি।' শুনে কাক মোষের কাছে তার শিং চাইতে গেল, সেই শিং দিয়ে মাটি খুঁড়বে। কাক বললে—

মোষ, মোষ! দে তো শিং,
খুঁড়ব মাটি, গড়বে ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।

শুনে মোষ রেগে তাকে এমনি গুঁতোতে এল যে সে সেখান থেকে দে ছুট!

তারপর সে কুকুরের কাছে গিয়ে বললে—

কুত্তা, কুত্তা! মারবি মোষ,
লব শিং, খুঁড়ব মাটি, গড়বে ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।

কুকুর বললে, 'আগে দুধ আন, খেয়ে গায়ে জোর করি, তবে মোষ মারব এখন।' শুনে কাক গাইয়ের কাছে গিয়ে বললে—

গাই, গাই! দে গো দুধ,
খাবে কুত্তা, হবে তাজা,
মারবে মোষ, লব শিং,

খুঁড়ব মাটি, গড়বে ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।

গাই বললে, 'ঘাস আন খাই, তারপর দুধ দেব।'

শুনে কাক মাঠের কাছে গিয়ে বললে—

মাঠ, মাঠ! দে তো ঘাস,
খাবে গাই, দেবে দুধ,
খাবে কুত্তা, হবে তাজা,
মারবে মোষ, লব শিং,
খুঁড়ব মাটি, গড়বে ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।

মাঠ বললে, 'ঘাস তো রয়েছে, নিয়ে যা না!'

তখন কাক কামারের বাড়ি গিয়ে বললে—

কামার, কামার! দে তো কাস্তে,
কাটব ঘাস, খাবে গাই,
দেবে দুধ, খাবে কুত্তা
হবে তাজা, মারবে মোষ, লব শিং,
খুঁড়ব মাটি, গড়বে ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।

কামার বললে, 'আগুন নেই। আগুন নিয়ে আয়, কাস্তে গড়ে দি।' তা শুনে কাক গৃহস্থদের বাড়ি গিয়ে বললে—

গেরস্ত ভাই, দাও তো আগুন,
গড়বে কাস্তে, কাটব ঘাস,
খাবে গাই, দেবে দুধ, খাবে কুত্তা,
হবে তাজা, মারবে মোষ, লব শিং,
খুঁড়ব মাটি, গড়বে ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।

তখন গৃহস্থ এক হাঁড়ি আগুন এনে বললে, 'কিসে করে নিবি?'

বোকা কাক তার পাখা ছড়িয়ে বললে, 'এই আমার পাখার উপরে ঢেলে দাও।'

গৃহস্থ সেই হাঁড়িসুদ্ধ আগুন কাকের পাখার উপর ঢেলে দিলে, আর সে বেটা তখুনি পুড়ে মরে গেল। তার আর চড়াইর বুক খাওয়া হল না।

চড়াই আর বাঘের কথা

গৃহস্থের ঘরের কোণে হাঁড়ি ঝোলানো ছিল, তার ভিতরে চড়াই-চড়নী থাকত।

চড়াই ডাল ভাঙছে

একদিন চড়াই বললে, 'চড়নী, আমি পিঠে খাব।'

চড়নী বললে, 'পিঠের জিনিসপত্র এনে দাও, পিঠে গড়ে দেব এখন।'

চড়াই বললে, 'কি জিনিস লাগবে?'

চড়নী বললে, 'ময়দা লাগবে, গুড় লাগবে, কলা লাগবে, দুধ লাগবে, কাঠ লাগবে।'

চড়াই বললে, 'আচ্ছা আমি সব এনে দিচ্ছি।' বলে সে বনের ভিতর গিয়ে, গাছের সরু-সরু শুকনো ডাল মট মট করে ভাঙতে লাগল।

সেই বনের ভিতর এক মস্ত বাঘ ছিল, সে চড়াইকে বলত 'বন্ধু'! ডাল ভাঙার শব্দ শুনে সে বললে, 'মট মট করে ডাল ভাঙছ, ওকি আমার বন্ধু?'

চড়াই বললে, 'হ্যাঁ, বন্ধু'।

বাঘ বললে, 'ডাল দিয়ে কি হবে?'

চড়াই বললে, 'কাঠ চাই, চড়নী পিঠে গড়বেন।'

শুনে বাঘ বললে, 'বন্ধু, আমি কখ্‌খনো পিঠে খাইনি আমাকে দিতে হবে।'

চড়াই বললে, 'তবে জোগাড় সব এনে দাও।'

বাঘ বললে, 'কি কি জোগাড় চাই?'

চড়াই বললে, 'ময়দা চাই, গুড় চাই, কলা চাই, দুধ চাই, ঘি চাই, হাঁড়ি চাই, কাঠ চাই।'

বাঘ বললে, 'আচ্ছা তুমি ঘরে যাও, আমি সব এনে দিচ্ছি।' চড়াই তখন ঘরে চলে এল, আর বাঘ দুলতে দুলতে বাজারে চলল। বাজারে গিয়ে বাঘ খালি একটিবার বললে, 'হালুম!' অমনি

বাঘ পিঠে গড়বার জিনিস নিয়ে আসছে

দোকানীরা 'বাবা গো! বাঘ এসেছে গো! পালা, পালা!' বলে দোকান-টোকান সব ফেলে ছুটে পালাল। তখন বাঘ সব দোকান খুঁজে ময়দা, গুড়, কলা দুধ, ঘি, হাঁড়ি আর কাঠ নিয়ে চড়াইয়ের বাড়িতে দিয়ে এল।
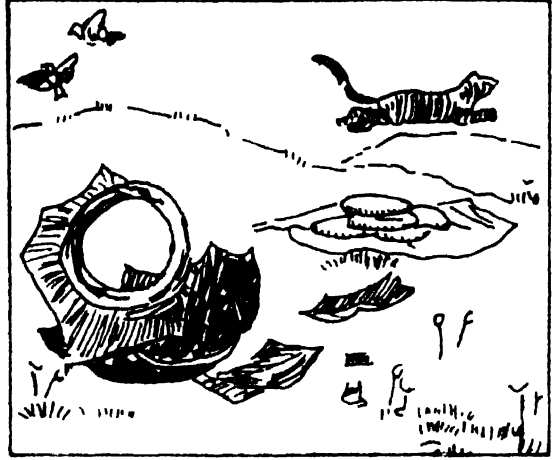
তারপর চড়নী চমৎকার পিঠে গড়ল, আর দুজনে মিলে পেট ভরে খেল। শেষে বাঘের জন্য একখানা পাতায় করে কতকগুলি পিঠে মাটিতে রেখে দিয়ে, দুজনে চুপ করে হাঁড়ির ভিতর বসে রইল।

হাঁড়ি ভাঙ্গার শব্দে বাঘ পালাচ্ছে

বাঘ এসে পিঠে দেখতে পেয়েই খেতে বসে গেল।

একখানা পিঠে মুখে দিয়ে সে বললে, 'বাঃ! কি চমৎকার!'

আর একখানা মুখে দিয়ে বললে, 'না, এটা তত ভালো নয়, খালি ময়দা দিয়ে গড়েছে!'

আর একখানা মুখে দিয়ে বললে, 'ছি! এটাতে খালি ভুষি আর ছাই। চড়াই বন্ধু, এ কি খাওয়ালে!'

আর একখানা মুখে দিয়ে বললে, 'উঃ হুঁ! এটাতে কিসের গন্ধ! গোবর দিয়েছে নাকি? চড়াই বেটা তো বড় পাজী।'

এমন সময় হয়েছে কি? চড়াই হাঁড়ির ভিতর থেকে নাম মুখ সিঁটকিয়ে বলছে, 'চড়নী, আমি হাঁচব।'

শুনে চড়নী ভারি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'চুপ, চুপ! এখন হাঁচতে হবে না, তাহলে বড় মুশকিল হবে।'

তাতে চড়াই চুপ করল। কিন্তু খানিক বাদেই আবার ভয়ানক নাক মুখ সিঁটকিয়ে হাঁচতে গেল। চড়নী তাকে থামাতে কত চেষ্টা করল, কিছুতেই থামিয়ে রাখতে পারল না।

বাঘ একটা বিশ্রী পিঠে খেয়ে বললে, 'থু! থু! এটা খালি গোবর দিয়েই গড়েছে, আর কিছু দেয়নি! যদি চড়াইয়ের নাগাল পাই, তাকে কামড়িয়ে চিবিয়ে খাব।'

তারপর আর একটা পিঠে মুখে দিয়ে সে সবে ওয়াক্-ওয়াক্ করতে লেগেছে, অমনি হ্যাঁ-চ্ছোঃ করে চড়াই ভয়ানক শব্দে হেঁচে ফেললে। সে শব্দে বাঘ যেই চমকে লাফিয়ে উঠতে যাবে, অমনি হাঁড়িসুদ্ধ দড়ি ছিঁড়ে, চড়াই আর চড়নী তার ঘাড়ে পড়ল।

বাঘ কিছুই বুঝতে পারলে না, কি বাজ পড়ল, না আকাশ ভেঙে পড়ল! সে খুব ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে সেখান থেকে ছুট দিল, আর তার ঘরে না গিয়ে থামল না।

দুষ্ট বাঘ

রাজার বাড়ির সিংহ দরজার পাশে, লোহার খাঁচায় একটা মস্ত বাঘ ছিল। রাজার বাড়ির সামনে দিয়ে যত লোক যাওয়া আসা করত, বাঘ হাত জোড় করে তাদের সকলকেই বলত, 'একটিবার খাঁচার দরজাটা খুলে দাও না দাদা!' শুনে তারা বলত, 'তা বইকি! দরজাটা খুলে দি, আর তুমি আমাদের ঘাড় ভাঙো।'

এর মধ্যে রাজার বাড়িতে খুব নিমন্ত্রণে ধুম লেগেছে। বড়-বড় পণ্ডিত মশাইয়েরা দলে দলে নিমন্ত্রণ খেতে আসছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ঠাকুর দেখতে ভারি ভালো মানুষের মতো ছিলেন। বাঘ এই ঠাকুরমশাইকে বারবার প্রণাম করতে লাগল।

ঠাকুরমশাই বাঘকে বুঝাচ্ছেন

তা দেখে ঠাকুরমশাই বললেন, 'আহা, বাঘটি তো বড় লক্ষ্মী! তুমি কি চাও বাপু।'

বাঘ হাত জোড় করে বললে, 'আজ্ঞে, একটিবার যদি এই খাঁচার দরজাটা খুলে দেন! আপনার দুটি পায়ে পড়ি।'

ঠাকুরমশাই কিনা বড্ড ভালোমানুষ ছিলেন, তাই তিনি বাঘের কথায় তাড়াতাড়ি খাঁচার দরজা খুলে দিলেন।

তখন হতভাগা বাঘ হাসতে হাসতে বাইরে এসেই বললে, 'ঠাকুর, তোমাকে তো খাব!'

আর কেউ হলে হয়তো ছুটে পালাত। কিন্তু এই ঠাকুরটি ছুটতে জানতেন না। তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এমন কথা তো কখনো শুনিনি! আমি তোমার এত উপকার করলাম আর তুমি বলছ কিনা আমাকে খাবে! এমন কাজ কি কেউ কখনো করে?'

বাঘ বললে, 'করে বইকি ঠাকুর, সকলেই তো করে থাকে।'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'তা কখনোই নয়! চল দেখি তিনজন সাক্ষীকে জিগগেস করি, তারা কি বলে।'

বাঘ বললে, 'আচ্ছা চলুন। আপনি যা বলছেন, সাক্ষীরা যদি তাই বলে, আমি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। আর যদি তারা আমার কথা ঠিক বলে, তবে আপনাকে ধরে খাব।'

সাক্ষী খুঁজতে দুজনে মাঠে গেলেন। দুই ক্ষেতের মাঝখানে খানিকটা মাটি উঁচু রেখে, চাষীরা একটি ছোট পথের মতন করে দেয়, তাকে বলে আল। ঠাকুরমশাই সেই আল দেখিয়ে বললেন, 'এই আমার একজন সাক্ষী।'

বাঘ বললে, 'আচ্ছা, ওকে জিগগেস করুন, ও কি বলে।'

ঠাকুরমশাই তখন জিগগেস করলেন, 'ওহে বাপু আল, তুমি বল দেখি, আমি যদি কারো ভালো করি সে কি উল্টে আমার মন্দ করে?'

আল বললে, 'করে বইকি ঠাকুর। এই আমাকে দিয়ে দেখুন না। দুই চাষার ক্ষেতের মাঝখানে আমি থাকি, তাতে তাদের কত উপকার হয়। একজনের জমি আর একজন নিয়ে যেতে পারে না, একজনের ক্ষেতের জল আর একজনের ক্ষেতে চলে যায় না। আমি তাদের এত উপকার করি, তবু হতভাগারা লাঙ্গল দিয়ে আমাকেই কেটে তাদের ক্ষেত বাড়িয়ে নেয়!'

বাঘ বললে, 'শুনলেন তো ঠাকুরমশাই, ভালো করলে তার মন্দ কেউ করে কি না!'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'রোসো, আমার তো আরো দুজন সাক্ষী আছে।'

বাঘ বললে, 'আচ্ছা, চলুন।'

মাঠের মাঝখানে একটা বটগাছ ছিল। ঠাকুরমশাই তাকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ আমার আর একজন সাক্ষী।'

বাঘ বললে, 'আচ্ছা, ওকে জিগগেস করুন। দেখি, ও কি বলে।'

ঠাকুরমশাই বললেন, বাপু বটগাছ, তোমার তো অনেক বয়েস হয়েছে, অনেক দেখেছ শুনেছ। বল দেখি, উপকার যে করে তার অপকার কি কেউ করে?'

বটগাছ বললে, 'তাই তো লোক আগে করে। ঐ লোকগুলো আমার ছায়ায় বসে ঠাণ্ডা হয়েছে, আর আমাকেই খুঁচিয়ে আমার আঠা বার করেছে। আবার সেই আঠা রাখবার জন্যে আমারই পাতা ছিঁড়েছে। তারপর ঐ দেখুন, আমার ডালটা ভেঙে নিয়ে চলেছে।'

বাঘ বললে, 'কি ঠাকুরমশাই, ও কি বলছে!'

তখন ঠাকুরমশাই তো মুশকিলে পড়লেন। আর কি বলবেন, ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। এমন সময় সেখান দিয়ে একটা শিয়াল যাচ্ছিল। ঠাকুরমশাই সেই শিয়ালকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ আমার আর একজন সাক্ষী। দেখি, ও কি বলে।'

তারপর তিনি শিয়ালকে ডেকে বললেন, 'শিয়ালপণ্ডিত, একটু দাঁড়াও। তুমি আমার সাক্ষী।'

শিয়াল দাঁড়াল, কিন্তু কাছে আসতে রাজী হল না। সে দূর থেকেই জিগগেস করল, 'সে কি কথা! আমি কি করে আপনার সাক্ষী হলুম?'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বল দেখি বাপু, যে ভালো করে তার মন্দ কি কেউ করে?'

শিয়াল বললে, 'কার কি ভালো কে করেছিল, আর কার কি মন্দ কে করেছে, শুনলে তবে বলতে পারি।'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল, আর আমি ব্রাহ্মণ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম—

এই কথা শুনেই শিয়াল বললে, 'এটা বড় শক্ত কথা হল। সেই খাঁচা আর সেই পথ না দেখলে, আমি কিছুই বলতে পারব না।'

কাজেই সকলকে আবার সেই খাঁচার কাছে আসতে হল। শিয়াল অনেকক্ষণ সেই খাঁচার

চারধারে পায়চারি করে বললে, 'আচ্ছা, খাঁচা আর পথ বুঝতে পেরেছি। এখন কি হয়েছে বলুন।'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল, আর আমি ব্রাহ্মণ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম।'

অমনি শিয়াল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললে, 'দাঁড়ান, অত তাড়াতাড়ি করবেন না, আগে ঐটুকু বেশ করে বুঝে নিই। কি বললেন? বাঘ আপনার বামুন ছিল, আর পথটা খাঁচার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল?'

শিয়াল খাঁচা বন্ধ করে দিচ্ছে

এই কথা শুনে বাঘ হো-হো করে হেসে বললে, 'দূর গাধা! বাঘ খাঁচার ভিতর ছিল, আর বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল!'

শিয়াল বললে, 'রোসো দেখি—বামুন খাঁচার ভিতর ছিল, আর বাঘ পথ দিয়ে যাচ্ছিল?'

বাঘ বললে, 'আরে বোকা, তা নয়। বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল, বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল।'

শিয়াল বললে, 'এ তো ভারি গোলমালের কথা হল দেখছি। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কি বললে? বাঘ বামুনের ভিতরে ছিল, আর খাঁচা পথ দিয়ে যাচ্ছিল?'

বাঘ বললে, 'এমন বোকা তো আর কোথাও দেখিনি! আরে বাঘ ছিল খাঁচার ভিতরে, আর বামুন যাচ্ছিল পথ দিয়ে।'

তখন শিয়াল মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললে, 'না। অত শক্ত কথা আমি বুঝতে পারব না!'

ততক্ষণে বাঘ রেগে গিয়েছে।

সে শিয়ালকে এক ধমক দিয়ে বললে, 'ও কথা তোকে বুঝতেই হবে! দেখ, আমি এই খাঁচার ভিতরে ছিলুম—দেখ—এই এমনি করে—'

বলতে বলতে বাঘ খাঁচার ভিতরে গিয়ে ঢুকল আর শিয়ালও অমনি খাঁচার দরজা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল। তারপর শিয়াল ঠাকুরমশাইকে বলল, 'ঠাকুরমশাই, এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি। আমার সাক্ষী যদি শুনতে চান, তবে তা হচ্ছে এই যে, দুষ্ট লোকের উপকার করতে নেই। এখন আপনি শিগগির যান, এখনো ফলার ফুরোয়নি।' বলে শিয়াল বনে চরতে গেল, আর ঠাকুরমশাই ফলার খেতে গেলেন।

বাঘ-বর

এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর ঘরে ব্রাহ্মণী ছিলেন, আর ছোট্ট একটি মেয়ে ছিল। কিন্তু তাদের খেতে দেবার জন্যে কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে ভিক্ষে করে যা আনতেন, এক বেলায় ভালো করে না খেতেই তা ফুরিয়ে যেত। সকল দিন আবার তাও মিলত না।

একদিন তাঁদের ছোট্ট মেয়েটি পাশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখল, সে বাড়িতে পায়েস রান্না হয়েছে, ছেলেরা পায়েস খাচ্ছে। দেখে সেই মেয়েটিরও বড্ড পায়েস খেতে ইচ্ছে হল। তাই সে বাড়ি এসে তার মাকে বললে, 'মা, আমাকে পায়েস করে দাও না, আমি পায়েস খাব।'

শুনে তো তার মা কাঁদতে লাগলেন। ভাতই ভালো করে খেতে পান না, পায়েস আবার কি করে করবেন?

কাক কিছু খেতে পেল না

এমন সময় ব্রাহ্মণ ভিক্ষে নিয়ে ফিরে এসে ব্রাহ্মণী কাঁদছেন দেখে জিগগেস করলেন, 'কাঁদছ কেন ব্রাহ্মণী, কি হয়েছে?'

ব্রাহ্মণী বললেন, 'মেয়ে পায়েস খেতে চেয়েছে, পায়েস কোত্থেকে দেব, তাই কাঁদছি।'

শুনে ব্রাহ্মণ বললেন, 'আচ্ছা, আমি দেখছি এর একটা কিছু করতে পারি কি না, তুমি কেঁদ না।' বলে তিনি তখুনি আবার বেরিয়ে গেলেন।

সেই গ্রামে একজন খুব ভালো জমিদার ছিলেন।

তিনি যেই শুনলেন, ব্রাহ্মণের মেয়ে পায়েস খেতে চেয়েছে, অমনি তাঁকে চমৎকার গোপালভোগ চাল, দু সের দুধ, চিনি আর মসলা দিলেন।

ব্রাহ্মণ তাতে খুব খুশি হয়ে, জমিদারকে আশীর্বাদ করে, ছুটে বাড়ি এসে ব্রাহ্মণীকে বললেন, 'এই নাও, তোমার পায়েসের জোগাড় এনেছি।'

সেই ব্রাহ্মণী কি লক্ষ্মী মেয়েই ছিলেন! তিনি এমনি সুন্দর রাঁধতেন যে, তেমন রান্না কেউ কখনো খায়নি। তিনি যখন পায়েস রাঁধতে লাগলেন, তখন তার চমৎকার গন্ধে আশেপাশে সকল লোক পাগল হয়ে উঠল!

একটা কাক সেই পায়েসের গন্ধ পেয়ে বললে, 'আহা! এমন চমৎকার জিনিস একটু না খেয়ে দেখলে চলছে না।'
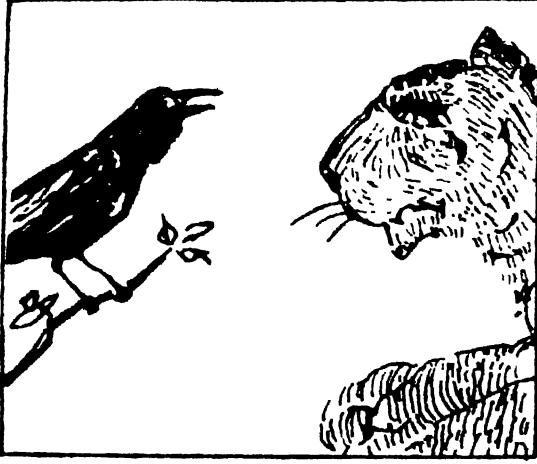
কাক বলছে, 'দেবে বইকি!'

বলেই সে ব্রাহ্মণের ঘরের চালে এসে বসল।

কাক অনেকক্ষণ ধরে ঘরের চালে চুপ করে বসে রইল। তারপর রান্নাঘরে একটু শব্দ হতেই সে বললে, 'ঐ! এবারে রান্না হয়েছে।'

খানিক বাদে আর একটু শব্দ হল, আর অমনি কাক বললে, 'ঐ! এবারে বাড়ছে।'

খানিক বাদে আর একটু শব্দ হল, অমনি কাক বললে, 'ঐ! এবারে খাচ্ছে!'

সত্যি সত্যি ব্রাহ্মণ আর তাঁর মেয়ে তখন খেতে বসেছিলেন। সে পায়েস এতই ভালো হয়েছিল যে তাঁরা দুজনেই তা প্রায় শেষ করে ফেললেন। ব্রাহ্মণীর জন্যে খুব কম রইল। তারপর ব্রাহ্মণীর খাওয়া যখন শেষ হল, তখন পাতে বা হাঁড়িতে পায়েসের একটু দাগ অবধি রইল না।

কাক এতক্ষণ বসে থেকেও যখন কিছু খেতে পেল না, তখন তার বড্ড রাগ হল। সে মনে মনে বললে, 'আমাকে এমন করে ঠকালে! এর শোধ নিতেই হবে।'

ব্রাহ্মণের বাড়ির কাছে একটি প্রকাণ্ড বন ছিল, সেই বনে মস্ত একটা বাঘ থাকত।

কাক দুষ্টু ফন্দি এঁটে সেই বাঘকে গিয়ে বললে, 'বাঘমশাই আমাদের ব্রাহ্মণ ঠাকুরের একটি সুন্দর মেয়ে আছে। আপনি এমন সুন্দর বর, আপনার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হলে বড় ভালো হয়।'

বাঘ বললে, 'বিয়ে ঠিক করে দেবে কে? আমি কথা কইতে গেলে তো তারা ছুটে পালাবে!'

কাক বললে, 'আপনার কিছু করতে হবে না, আমি সব করে দিচ্ছি। আগে আপনি ব্রাহ্মণকে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিন।'

বাঘ বললে, 'বেশ কথা! আমি গ্রামে গিয়ে কুত্তা মেরে বামুনের বাড়ি রেখে আসব।'

কাক তা শুনে জিভ কেটে বললে, 'না-না! তারা কুত্তা খাবে না! আপনার বাড়িতে যে লেবুর গাছ আছে, সেই গাছের লেবু পাঠিয়ে দিন। আমি লেবু নিয়ে যাব এখন।'

বলে সে কয়েকটা লেবু নিয়ে ব্রাহ্মণের বাড়িতে দিয়ে এসে বললে, 'বাঘমশাই, তারা তো লেবু খেয়ে ভারি খুশি হয়েছে। এমনি করে দিন কতক লেবু দিলেই মেয়ে বিয়ে দেবে।'

শুনে বাঘ আহ্লাদে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

এমনি করে কাক রোজ লেবু নিয়ে যায় আর বাঘকে এসে বলে, 'তারা মেয়ে বিয়ে দেবে।' আসলে সেটা মিথ্যে কথা, কিন্তু বাঘ মনে করে, ব্রাহ্মণ বুঝি সত্যি সত্যি মেয়ে

দেবে বলেছে।

তারপর একদিন বাঘ বললে, 'কই, লেবু তো ফুরিয়ে গেল, মেয়ে তো বিয়ে দিলে না!'

কাক বললে, 'দেবে বইকি! আপনি যখন চাইবেন, তক্ষুনি দেবে।'

বাঘ বললে, 'তবে তাদের বল গিয়ে যে, যদি কাল রাত্রে মেয়ে বিয়ে না দেয়, তাহলে তাদের সবাইকে চিবিয়ে খাব।'

বাঘ-বর

কাক তো তাই চায়। সে তক্ষুনি ব্রাহ্মণের বাড়ি গিয়ে বললে, 'ওগো শুনছ? কাল রাত্রে বাঘ আসবে, তোমাদের মেয়ে বিয়ে করতে। যদি বিয়ে না দাও, সকলকে চিবিয়ে খাবে।'

একথা শুনেই তো ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী বুক চাপড়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন!

কান্না শুনে গ্রামের লোক ছুটে এসে বললে, 'কি হয়েছে?'

ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'কাল বাঘ আসবে, আমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে। বিয়ে না দিলে সকলকে চিবিয়ে খাবে।'

শুনে গ্রামের লোক বললে, 'এই কথা! আচ্ছা, দেখা যাবে বেটা কেমন বিয়ে করে, আর না দিলে চিবিয়ে খায়! আপনার কোনো ভয় নেই, আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

বলে তারা বাঘের কাছে খবর পাঠিয়ে দিলে, 'বাঘমশাই, আপনার মতন এমন ভালো বর কি আর হবে! আপনি পোশাক পরে আসবেন, সভার মাঝে বসবেন, গান বাজনা শুনবেন, নিমন্ত্রণ খাবেন, তারপর বেশ ভালো মতো করে বিয়ে করে চলে যাবেন।'

তারপর তারা সকলে মিলে ব্রাহ্মণের উঠানে তিনশ উনুন কেটে তাতে তিনশো হাঁড়ি তেল চড়াল। কুয়োর উপর চমৎকার বিছানা করে রাখল। তারপর ঢাক ঢোল বাজিয়ে খুব সোরগোল করতে লাগল।

বাঘ সেই গোলমাল শুনে বললে, 'ঐ রে আমার বিয়ের ধুম লেগেছে।' তখন সে তাড়াতাড়ি জামা জোড় পরে, পাগড়ি এঁটে, নাচতে নাচতে এসে ব্রাহ্মণের বাড়ি উপস্থিত হল।

অমনি সকলে 'আরে, বর এসেছে! বাজা, বাজা!' বলে বাঘমশাইকে সেই কুয়োর উপরকার বিছানা দেখিয়ে দিলে। বাঘমশাই তো তাতে লাফিয়ে বসতে গিয়েই 'ঘেঁয়াও!' করে বিছানাসুদ্ধ কুয়োয় পড়েছেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সকলে মিলে সেই তিনশ হাঁড়ির গরম তেল, আর তিনশ উনুনের আগুন কুয়োয় এনে ঢেলেছে।

তারপর দেখতে দেখতে বোকা বাঘ পুড়ে ছাই হল, ব্রাহ্মণেরও আপদ কেটে গেল।

কাক তামাশা দেখবার জন্যে ঘরের চালে বসেছিল, পাড়ার ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে তার মাথা গুঁড়ো করে দিল।

বাঘের উপর টাগ

এক জোলা ছিল। তার একটি বড় আদুরে ছেলে ছিল। সে যখন যা চাইত, সেটি না নিয়ে কিছুতেই ছাড়ত না।

ঘোড়ার ডিম

একদিন এক বড় মানুষের ছেলে জোলার বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে জোলার ছেলে তার বাপকে ডেকে বললে, 'বাবা, আমার কেন ঘোড়া নেই? আমাকে ঘোড়া এনে দাও।'

জোলা বললে, 'আমি গরীব মানুষ, ঘোড়া কি করে আনব? ঘোড়া কিনতে ঢের টাকা লাগে।'

ছেলে বললে, 'তা হবে না। আমাকে ঘোড়া এনে দিতেই হবে।'

বলে, সেই ছেলে আগে নেচে-নেচে কাঁদল, তারপর গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল, তারপর উঠে তার বাপের হুঁকো কলকে ভেঙে ফেলল। তাতেও ঘোড়া কিনে দিচ্ছে না দেখে, শেষে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল।

তখন জোলা তো ভারি মুশকিলে পড়ল। ছেলে কিছুতেই খাচ্ছে না দেখে, সে ভাবল, 'এখন তো আর ঘোড়া কিনে না দিলেই হচ্ছে না। দেখি ঘরে কিছু টাকা আছে কি না।'

অনেক খুঁজে সে কয়েকটি টাকা বার করল। তারপর সেই টাকা কাপড়ে বেঁধে সে ঘোড়া কিনতে হাটে চলল।

হাটে গিয়ে জোলা ঘোড়াওয়ালাকে জিগগেস করল, 'হাঁ গা, তোমার ঘোড়ার দাম ক-টাকা?'

ঘোড়াওয়ালা বললে, 'পঞ্চাশ টাকা।'

জোলা কাপড়ে বেঁধে মোটে পাঁচটি টাকা এনেছে, পঞ্চাশ টাকা সে কোথা থেকে দেবে? কাজেই সে ঘোড়া কিনতে না পেরে মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে চলল।

এমন সময় হয়েছে কি—দুজন লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছে। তাদের একজন বললে, 'তোমার কিন্তু বড় মুশকিল হবে।'

তা শুনে আর একজন বললে, 'ঘোড়ার ডিম হবে।'

ঘোড়ার কিনা ডিম হয় না, তাই 'ঘোড়ার ডিম হবে' বললে বুঝতে হয় যে 'কিচ্ছু হবে না,' কিন্তু জোলা সে কথা জানত না। সে ঘোড়ার ডিমের নাম শুনেই ব্যস্ত হয়ে বললে, 'ভাই ঘোড়ার ডিম কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার?'

জোলার ঘোড়ার ছানা পালাচ্ছে

সেখানে একটা ভারি দুষ্টু লোক ছিল। সে জোলাকে বললে, 'আমার সঙ্গে এস, আমার ঘরে ঘোড়ার ডিম আছে।'

সে দুষ্টু লোকটার ঘরে ছিল একটা ফুটি। সে জোলাকে তার সঙ্গে বাড়ি নিয়ে, সেই ফুটিটা তার হাতে দিয়ে বললে, 'এই নাও ঘোড়ার ডিম। দেখ, কেমন ফেটে রয়েছে। এখুনি এর ভিতর থেকে ছানা বেরুবে। দেখো ছুটে পালায় না যেন!'

তখন জোলার আনন্দ দেখে কে!

সে জিগগেস করলে, 'এর দাম কত?'

দুষ্টু লোকটা বললে, 'পাঁচ টাকা।' জোলা তখুনি সেই পাঁচটা টাকা খুলে দিয়ে ফুটি নিয়ে ঘরে চলল। ফুটি ফেটে রয়েছে, ভিতরে লাল দেখা যাচ্ছে। জোলা ভাবলে, 'ঐ রে, ছানা যদি বেরিয়ে পালাতে চায়, তখুনি খপ করে ধরে ফেলব। তারপর গলায় চাদর বেঁধে তাকে বাড়ি নিয়ে যাব। যদি লাফায় তবু ছাড়ব না।'

এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে জোলা একটা নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল, আর ঠিক তখুনি তার ভয়ানক জল তেষ্টা পেল। জোলা ডাঙার উপর ফুটিটা রেখে জল খেতে গিয়েছে, এর মধ্যে যে কোথা থেকে এক শিয়াল সেখানে এসেছে, তা সে দেখতে পায়নি। তার জল খাওয়া হতে হতে, শিয়ালও ফুটি প্রায় শেষ করে এনেছে। এমন সময় জোলা তাকে দেখতে পেয়ে, 'হায় সর্বনাশ! আমার ঘোড়ার ছানা পালাল।' বলে তাড়া করলে!

শিয়ালকে ছুটে ধরা কি জোলার কাজ! সে শিয়াল তাকে মাঠের উপর দিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে, কোথায় নিয়ে গেল তার ঠিকানা নেই। শেষে জোলা আর চলতে পারে না। তখন ঘরে ফিরতে গিয়ে দেখে, পথ হারিয়ে গেছে।

তখন রাত হয়েছে, কাজেই আর ঘরে ফিরবার জো ছিল না। জোলা অনেক খুঁজে এক বুড়ির বাড়িতে গিয়ে, একটু শোবার জায়গা চেয়ে নিলে। বুড়ির দুটি বই ঘর ছিল না। তার একটিতে বুড়ি আর তার নাতনী থাকত। আর একটিতে জিনিসপত্র ছিল, সেইটিতে সে জোলাকে জায়গা দিলে।

একটা বাঘ রোজ রাত্রে বুড়ির ঘরের পিছনে এসে বসে থাকত। বুড়ি তা টের পেয়ে,

জোলা বাঘের পিঠে চড়েছে

রাত্রে কখনো ঘরের বাইরে আসত না, তার নাতনীকেও আসতে দিত না। কিন্তু নাতনীটি জোলার কাছে তার ঘোড়ার ডিমের কথা একটু শুনতে পেয়ে ছিল, তার কথা ভালো করে শুনবার জন্যে সে আবার তার কাছে যেতে চাইল। তখন বুড়ি তাকে বললে, 'না-না, যাস্ নে! বাঘে-টাগে ধরে নেবে!'

'বাঘে-টাগে' এমনি করে লোকে বলে থাকে। টাগ বলে কোনো জন্তু নেই। কিন্তু বাঘ তো আর সে কথা জানে না, সে ঘরের পিছনে বসে টাগের কথা শুনে ভারি ভাবনায় পড়ে গেছে। সে ঠিক বুঝে নিয়েছে যে, টাগ তার নিজের চেয়েও ঢের ভয়ানক একটা জানোয়ার বা রাক্ষস বা ভূত হবে। আর তখন থেকে তার বেজায় ভয় হয়েছে, আর সে ভাবছে, টাগ যদি আসে কোনখান দিয়ে সে পালাবে!

এমন সময় সেই জোলা ভোর হয়েছে কি না দেখবার জন্যে বাইরে এসেছে। এসেই সে বাঘকে দেখতে পেয়ে মনে করলে 'ঐ রে! আমার ঘোড়ার ছানা বসে আছে!

অমনি সে ছুটে গিয়ে, বাঘের নাকে মুখে গলায় কাপড় জড়িয়ে তড়াক করে তার পিঠে উঠে বসল!

বাঘ যে তখন কি ভয়ানক চমকে গেল কি বলব! সে ভাবল 'হায়-হায়! সর্বনাশ হয়েছে! নিশ্চয় আমাকে টাগে ধরেছে!' এই মনে করে বাঘ প্রাণের ভয়ে ছুটতে লাগল। কিন্তু চোখে কাপড় বাঁধা ছিল বলে ভালো করে ছুটতে পারল না।

জোলা তো গোড়া থেকেই তার পিঠে চড়ে বসে আছে, আর ভাবছে এটা তার ঘোড়ার ছানা! সে ঠিক করে রেখেছে যে একটু ফরসা হলেই পথ চিনতে পারবে, ঘোড়ার ছানাটাকে নিয়ে বাড়ি যাবে। ফরসা যখন হল, তখন জোলা দেখলে সে ঘোড়া মনে করে বাঘের উপর চড়ে বসেছে! তখন আর সে কি করে? সে ভাবলে যে এবারে আর রক্ষা নেই!

বাঘ ছুটছে আর বলছে, 'দোহাই টাগদাদা! আমার ঘাড় থেকে নামো, আমি তোমায় পুজো করব।' জোলা জানে না যে বাঘ তাকেই টাগ বলছে। জোলা খালি ভাবছে, সে কি করে পালাবে।

এমন সময় বাঘ একটা বটগাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। সেই গাছের ডালগুলি খুব নিচু, হাত বাড়ালেই ধরা যায়! জোলা খপ করে তার একটা ডাল ধরে ঝুলে গাছে উঠে পড়ল।

তখন জোলাও বললে, 'বড্ড বেঁচে গিয়েছি!'

বাঘও বললে, 'বড্ড বেঁচে গিয়েছি!'

কিন্তু খালি গাছে উঠলে কি হবে? তা থেকে নামতে পারলে তো হয়। সে হতভাগা বাঘটা সেখান থেকে ছুটে না পালিয়ে গাছতলায় বসে হাঁপাতে লাগল, আর চেঁচিয়ে অন্য বাঘদের ডাকতে লাগল। ডাক শুনে চার পাঁচটা বাঘ সেখানে এসে বললে, 'কি হয়েছে তোমার? তোমার চোখ বাঁধলে কে?'

বাঘ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'আরে ভাই, আজ আর একটু হলেই গিয়েছিলুম আর কি! আমাকে টাগে ধরে ছিল। অনেক হাত জোড় করে পুজো দেব বলতে তবে ছেড়ে দিয়েছে! সেই বেটা আমার চোখ বেঁধে রেখেছে পুজো না দিলে আবার এসে ধরবে।'

গাছের উপর ওটা কি?

এই কথা শুনে সব বাঘ মিলে, সেই গাছতলায় টাগের পুজো আরম্ভ করল। বড়-বড় মোষ আর হরিণ নিয়ে দলে দলে বাঘ আসতে লাগল। জোলা আর অত বাঘ কখনো দেখেনি। সে তো গাছে বসে কেঁপেই অস্থির!

জোলা কাঁপছে আর গাছের পাতা নড়ছে। বাঘেরা তাতে ব্যস্ত হয়ে চেয়ে দেখল, পাতার আড়ালে ছিল বলে জোলাকে চিনতে পারল না।

একজন বললে, 'ভাই, গাছের উপর ওটা কি?'

আর একজন বললে, 'দেখ ভাই, ওটার কি মস্ত লেজ!'

লেজ্ তো নয়, জোলার কাপড় ঝুলছিল। পাতার জন্যে ভালো করে দেখতে না পেয়ে বাঘেরা তাকেই লেজ মনে করেছে। সেই লেজ দেখে একটা বুড়ো বাঘ বললে. 'ওটা একটা খুব ভয়ানক জানোয়ার হবে, হয়তো বা টাগই হবে!' এই কথা শুনেই তো সব বাঘ মিলে 'ধরলে, ধরলে! পালা, পালা!' বলে সেখান থেকে ছুটে পালাল। তখন জোলাও গাছ থেকে নেমে বাড়ি গেল।

জোলাকে দেখে তার ছেলে বললে, 'কই বাবা, ঘোড়া কই?'

জোলা তার গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বললে, 'এই নে তোর ঘোড়া!'

তারপর থেকে সে ছেলে আর ঘোড়ার কথা বলত না।

বাঘের পালকি চড়া

বাঘ কিনা মামা আর শিয়াল কিনা ভাগ্নে, তাই দুজনের মধ্যে বড্ড ভাব।

শিয়াল একদিন বাঘকে নিমন্ত্রণ করল, কিন্তু তার জন্যে খাবার কিছু তয়ের করল না! বাঘ যখন খেতে এল, তখন তাকে বললে, 'মামা, একটু বস। আর দু-চারজনকে নিমন্ত্রণ করেছি, তাদের ডেকে নিয়ে আসি।'

এই বলে শিয়াল চলে গেল, আর সে রাত্রে বাড়ি ফিরল না। বাঘ সারা রাত বসে থেকে, সকালবেলা শিয়ালকে বকতে বকতে বাড়ি চলে গেল।

শিয়াল নিমন্ত্রণ খাচ্ছে

তারপর একদিন বাঘ শিয়ালকে নিমন্ত্রণ করল। শিয়াল এলে তাকে খেতে দিল মস্ত মস্ত মোটা মোটা হাড়। তার এক একটা লোহার মতো শক্ত। শিয়াল বেচারার চারটে দাঁত ভেঙে গেল, তবু সেই হাড়ের একটুও সে চিবিয়ে ভাঙতে পারল না। বাঘ ঐরকম হাড় খেতেই খুব ভালোবাসে। সে মনের সুখে পেট ভরে সব হাড় চিবিয়ে খেলে, আর বললে, 'কি ভাগ্নে, পেট ভরল তো?'

শিয়াল হাসতে হাসতে বললে, 'হ্যাঁ মামা, আমার বাড়িতে তোমার যেমন পেট ভরেছিল, তোমার বাড়িতেও আমার তেমনি পেট ভরেছে।' মনে মনে কিন্তু তার ভয়ানক রাগ হল আর সে বললে, 'যদি বাঘমামাকে জব্দ করতে পারি, তবে দেশে ফিরব, নইলে আর দেশে ফিরব না।'

এই মনে করে শিয়াল সে দেশ ছেড়ে আর এক দেশে চলে গেল। সে নতুন দেশে অনেক আখের ক্ষেত ছিল। শিয়াল সেই আখের ক্ষেতে থাকত আর খুব করে আখ খেত। যা খেতে পারত না, ভেঙে রেখে দিত।

চাষীরা বললে, 'ভালো রে ভালো, এমন করে আমাদের আখ কোন দুষ্টু শিয়াল ভেঙে রেখে দেয়? বেটাকে এর সাজা দিতে হবে।' বলে তারা ক্ষেতের পাশে এক খোঁয়াড় তয়ের করল।

কাঠ দিয়ে ছোট্ট ঘরের মতন করে খোঁয়াড় তয়ের করতে হয়। তার ভিতরে কোনো জন্তু ঢুকলে তার দরজা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। তাতেই সেই জন্তু খোঁয়াড়ের ভিতর আটকা

পড়ে।

চাষীরা যখন খোঁয়াড় তয়ের করছে, শিয়াল তখন হাসছে আর বলছে, 'আমার জন্যে, না মামার জন্যে? এমন সুন্দর ঘরে মামা থাকলেই ভালো হয়।'

তার পরদিনই সে বাঘকে গিয়ে বললে, 'মামা, একটি বড় নিমন্ত্রণ তো এসেছে। রাজার ছেলের বিয়ে, সেখানে আমি গান গাইব, আর তুমি বাজাবে। আর খাব যা, তার তো কথাই নেই! তারা পালকি পাঠিয়েছে, যাবে মামা?'

বাঘ বললে, 'তা আর যাব না! এমন নিমন্ত্রণটা কি ছাড়তে আছে! আবার তারা পালকিও পাঠিয়েছে!'

শিয়াল বললে, 'সে কি যে সে পালকি? এমন পালকিতে আর কখনো চড়নি মামা।' এমনি কথাবার্তা বলে দুজনে সেই আখের ক্ষেতের ধারে এল, যেখানে সেই খোঁয়াড় রয়েছে। খোঁয়াড় দেখে বাঘ বললে, 'খালি পালকি পাঠিয়েছে, বেয়ারা পাঠায়নি যে?'
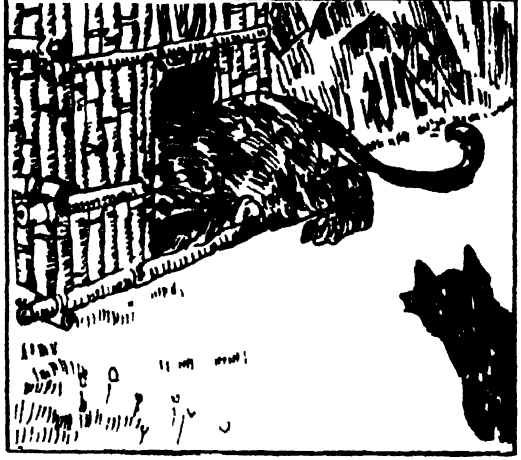
বাঘ খোঁয়াড়ের ভিতর ঢুকছে

শিয়াল বললে, 'আমরা উঠে বসলেই বেয়ারা আসবে এখন।'

বাঘ বললে, 'পালকির যে ডাণ্ডা নেই, বেয়ারারা কি করে বইবে?'

শিয়াল বললে, 'ডাণ্ডা তারা সঙ্গে আনবে।'

একথা শুনে বাঘ যেই খোঁয়াড়ের ভিতর ঢুকেছে, অমনি ধড়াস করে তার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন শিয়াল বললে, 'মামা, দরজাটা যে বন্ধ করে দিলে, আমি ঢুকব কি করে?'

বাঘ বললে, 'তোমার ঢুকে কাজ নেই। এবারের নিমন্ত্রণটা আমিই খাইগে।'

শিয়াল বললে, 'বেশ কথা মামা! খুব ভালো করে পেট ভরে নিমন্ত্রণ খেও। কম খেও না যেন!'

এই বলে শিয়াল হাসতে হাসতে তার দেশে চলে গেল।

তারপর চাষীরা এসে দেখল যে বাঘমশাই খোঁয়াড়ের ভিতর বসে আছেন। তখন তারা কি খুশি যে হল, কি বলব!

তারা সকলকে ডেকে বললে, 'আন খন্তা, আন বল্লম, আন যে যা পারিস! খোঁয়াড়ে বাঘ পড়েছে। আয় তোরা কে কোথায় আছিস।'

অমনি সকলে ছুটে এসে বাঘকে মেরে শেষ করল।

বুদ্ধুর বাপ

এক যে ছিল বুড়ো চাষী, তার নাম ছিল বুদ্ধুর বাপ।

বুদ্ধুর বাপের ক্ষেতে ধান পেকেছে, আর দলে দলে বাবুই এসে সেই ধান খেয়ে ফেলেছে। বুদ্ধুর বাপ ঠকঠকি বানিয়ে তাই দিয়ে বাবুই তাড়াতে যায়। কিন্তু ঠকঠকির শব্দ শুনেও বাবুই পালায় না। তখন সে রেগেমেগে বললে, 'বেটারা! এবার যদি ধরতে পারি, তাহলে ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি-বাঁধন দেখিয়ে দেব!'

বাবুই তাড়াচ্ছে

ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি-বাঁধন বলে কোনো একটা জিনিস নেই। বুদ্ধুর বাপ আর কোনো ভয়ানক গাল খুঁজে না পেয়ে ঐ কথা বলে। রোজই বাবুই আসে, রোজই বুদ্ধুর বাপ তাদের তাড়াতে না পেরে বলে, 'ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি-বাঁধন দেখিয়ে দেব!'

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি— একটা মস্ত বাঘ রাত্রে এসে বুদ্ধুর বাপের ক্ষেতের ভিতর ঘুমিয়ে ছিল, ঘুমের ভিতর কখন সকাল হয়ে গেছে, আর সে বাঘ সেখান থেকে যেতে পারেনি।

সেদিনও বুদ্ধুর বাপ বাবুই তাড়াতে এসে, ঠকঠকি নাড়ছে আর বলছে, 'বেটারা, যদি ধরতে পারি তবে ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি-বাঁধন দেখিয়ে দেব!'

ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি-বাঁধন শুনেই তো বাঘের বেজায় ভাবনা হয়েছে। সে ভাবলে, 'তাই তো! এটা আবার কি নতুন রকমের জিনিস হল? এমন বাঁধনের কথা তো কখনো শুনিনি!' যতই ভাবছে, ততই তার মনে হচ্ছে যে, এটা না দেখলেই নয়। তাই সে আস্তে-আস্তে ধানের ক্ষেতের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, বুদ্ধুর বাপকে ডেকে বললে, 'ভাই, একটা কথা আছে।'

বাঘ দেখে বুদ্ধুর বাপ যে কি ভয় পেল, তা কি বলব! কিন্তু সে ভারি বুদ্ধিমান লোক ছিল। সে তখুনি সামলে গেল, বাঘ কিছু টের পেল না। বুদ্ধুর বাপ বাঘকে বললে, 'কি কথা ভাই?'

বাঘ বললে, 'ঐ যে তুমি কি বলছ, ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি-বাঁধন না কি! সেইটে আমাকে একটিবার দেখাতে হচ্ছে।'

বুদ্ধুর বাপ বললে, 'সে তো ভাই অমনি দেখানো যায় না! তাতে ঢের জিনিসপত্র লাগে।'

বাঘ বললে, 'আমি সব জিনিস এনে দিচ্ছি। আমাকে সেটা না দেখালে হবে না।'

বুদ্ধুর বাপ বললে, 'আচ্ছা, তুমি আগে জিনিস আনো, তারপর আমি দেখাব।'

বাঘ বললে, 'কি জিনিস চাই?'

বাঘ থলে নিয়ে আসছে

বুদ্ধুর বাপ বললে, 'একটা খুব বড় আর মজবুত থলে চাই, এক গাছি খুব মোটা আর লম্বা দড়ি চাই, আর একটা মস্ত মুগুর চাই!'

বাঘ বললে, 'শুধু এই চাই? এসব আনতে আর কতক্ষণ?'

সেটা হাটের দিন ছিল। বাঘ গিয়ে হাটের পথের পাশে ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রইল। খানিক বাদেই সেই পথ দিয়ে তিনজন খইওয়ালা যাচ্ছে। খইওয়ালাদের থলেগুলি খুব বড় হয়, আর তার এক একটা ভারি মজবুত থাকে।

বাঘ ঝোপের ভিতর বসে আছে, আর খইওয়ালারা একটু একটু করে তার সামনে এসেছে। অমনি সে 'হালুম।' বলে লাফিয়ে এসে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াল। খইওয়ালারা তো খই-টই ফেলে, চেঁচিয়ে কোথায় পালাবে তার ঠিক নেই।

তখন বাঘ তাদের খইসুদ্ধ থলেগুলি এনে বুদ্ধুর বাপকে দিল। তারপর সে গেল দড়ি আনতে।

দড়ির জন্যে তার আর বেশি দূর যেতে হল না। মাঠে ঢের গরু খোঁটায় বাঁধা ছিল, বাঘ তাদের কাছে যেতেই তারা দড়ি ছিঁড়ে পালাল। সেই সব দড়ি এনে সে বুদ্ধুর বাপকে দিল। তারপর সে গেল মুগুর আনতে।

পালোয়ানেরা তাদের আড্ডায় মুগুর ভাঁজছে, এমন সময় বাঘ গিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। তাতেই তো 'বাপ রে, মারে!' বলে তারা ছুট দিল। তখন বাঘ তাদের বড় মুগুরটা মুখে করে এনে বুদ্ধুর বাপকে বললে, 'তোমার জিনিস তো এনেছি, এখন সেটাকে দেখাও।'

বুদ্ধুর বাপ বললে, 'আচ্ছা, তবে তুমি একটিবার এই থলের ভিতরে এস দেখি।'

বলতেই তো বাঘমশাই গিয়ে সেই থলের ভিতরে ঢুকেছেন। তখন বুদ্ধুর বাপ তাড়াতাড়ি থলের মুখ বন্ধ করে, তাকে আচ্ছা করে দড়ি দিয়ে জড়াল। একটু নড়বার জো অবধি রাখল না।

তারপর দু-হাতে সেই মুগুর তুলে ধাঁই করে সেই থলের উপর যেই এক ঘা লাগিয়েছে, অমনি বাঘ ভারি আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ও কি করছ?'
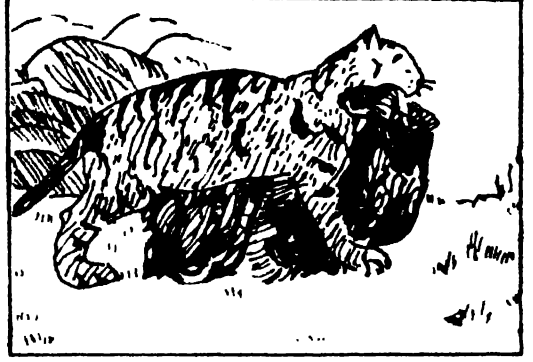
বুদ্ধুর বাপ বললে, 'কেন? হঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি-বাঁধন দেখাচ্ছি। তোমার ভয় হয়েছে নাকি?'

ভয় হয়েছে বললে তো বড় লজ্জার কথা হয়, তাই বাঘ বললে, 'না।'

তখন বুদ্ধুর বাপ সেই মুগুর দিয়ে ধাঁই-ধাঁই করে থলের উপর মারতে লাগল। চ্যাঁচালে পাছে নিন্দে হয়, তাই মার খেয়েও বাঘ অনেকক্ষণ চুপ করেছিল। কিন্তু চুপ করে আর কতক্ষণ থাকবে। দশ-বারো ঘা খেয়েই সে ঘেঁয়াও-ঘেঁয়াও করে ভয়ানক চ্যাঁচাতে লাগল। খানিক বাদে আর চ্যাঁচাতে না পেরে, গোঙাতে আরম্ভ করল। বুদ্ধুর বাপ তবুও ছাড়ছে না, ধাঁই-ধাঁই করে সে খালি মারছেই। শেষে আর বাঘের সাড়া শব্দ নেই দেখে সে ভাবলে, মরে গেছে। তখন থলে খুলে, বাঘটাকে ক্ষেতের ধারে ফেলে রেখে বুদ্ধুর বাপ ঘরে এসে বসে রইল।

মুগুর দিয়ে খালি মারছেই

বাঘ কিন্তু মরেনি। চার-পাঁচ ঘন্টা মড়ার মতো পড়ে থেকে, তারপর সে উঠে বসেছে। তখনো তার গায় বড্ড বেদনা, আর জ্বর খুব। কিন্তু রাগের চোটে সে-সবে সে মন দিলে না। সে খালি চোখ ঘোরায় আর দাঁত খিঁচায়, আর বলে, 'বেটা বুদ্ধুর বাপ! পাজি, হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া! দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি!'

সেই কথা শুনেই তো ভয়ে বুদ্ধুর বাপের মুখ শুকিয়ে গেল। সে তখুনি ঘরে দোর দিয়ে হুড়কো এঁটে বসে রইল। তিনদিন আর ঘর থেকে বেরুল না।

বাঘ সেই তিনদিন বুদ্ধুর বাপের ঘরের চারধারে ঘুরে বেড়াল, আর তাকে গালি দিল। তারপর করেছে কি—দরজার কাছে এসে খুব ভালো মানুষের মতন করে বলছে, 'আমাকে একটু আগুন দেবে দাদা? তামাক খাব!'

বুদ্ধুর বাপ দেখলে, কথাগুলি মানুষের মতো, কিন্তু গলার আওয়াজটা বাঘের মতো। তখন সে ভাবলে, আগুন দেবার আগে একবার ভালো করে দেখে নিতে হবে। এই ভেবে সে যেই দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেছে, অমনি দেখে সর্বনাশ—বাঘ! তখন আর কি সে দরজা খোলে! সে কোঁকাতে-কোঁকাতে বললে, 'ভাই বড্ড জ্বর হয়েছে, দোর খুলতে পারব না। তুমি দরজার নীচ দিয়ে তোমার লাঠিগাছটা ঢুকিয়ে দাও, আমি তাতে আগুন বেঁধে দিচ্ছি।'

বাঘ লাঠি কোথায় পাবে? সে তার লেজটা দরজার নীচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। অমনি বুদ্ধুর বাপ বঁটি দিয়ে খ্যাঁচ করে সেই লেজ কেটে ফেললে।

বাঘ তখন 'ঘেঁয়াও।' বলে বুদ্ধুর বাপের ঘরের চালের সমান উঁচু লাফ দিল। তারপর একটুখানি লেজ যা ছিল, তাই গুটিয়ে চ্যাচাতে চ্যাচাতে ছুটে পালাল।

তাতে কিন্তু বুদ্ধুর বাপের ভয় গেল না। সে বেশ বুঝতে পারল যে, এর পর সব বাঘ মিলে তাকে মারতে আসবে। সত্যি সত্যি সে তার পরদিন দেখলে, কুড়ি-পঁচিশটা বাঘ তার ঘরের দিকে আসছে। তখন সে আর কি করবে। ঘরের পিছনে খুব উঁচু একটা তেঁতুল গাছ ছিল, তার আগায় গিয়ে বসে রইল।

লেজ কেটে ফেললে

সেইখানে একটা হাঁড়ি বাঁধা ছিল। বুদ্ধুর বাপ তার পিছনে লুকিয়ে দেখতে লাগল বাঘেরা কি করে।

বাঘেরা এসেই সেই হাঁড়ির আড়ালে বুদ্ধুর বাপকে দেখতে পেয়েছে। তখন তারা তাকে গাল দেয়, ভেঙচায় আর কত রকম ভয় দেখায়! বুদ্ধুর বাপ চুপটি করে হাঁড়ি ধরে বসে আছে, কিচ্ছু বলে না।

তারপর বাঘেরা মিলে বুদ্ধুর বাপকে ধরবার এক ফন্দি ঠিক করলে। তাদের মধ্যে যার খুব বুদ্ধি ছিল সে বললে, 'আমাদের মধ্যে যে সকলের বড়, সে মাটিতে গুড়ি মেরে বসবে। তার চেয়ে যে ছোট, সে তার ঘাড়ে উঠবে। তার চেয়ে যে ছোট, সে আবার তার ঘাড়ে উঠবে। এমনি করে উঁচু হয়ে, আমরা ঐ হতভাগাকে ধরে খাব।'

বাঘের উপর বাঘ

তাদের মধ্যে সকলের বড় ছিল সেই ঠেঙাখেকো লেজকাটা বাঘটা। তার লেজের ঘা তখনো শুকোয়নি বলে সে বসতে পারত না, বসতে গেলেই তার বড্ড লাগত। কিন্তু না বসলেও তো চলবে না, যেমন করেই হোক বসতে হবে। এমন সময় একটি গর্ত দেখতে পেয়ে, সে সেই গর্তের ভিতরে লেজটুকু ঢুকিয়ে, কোনোমতে বসল। তারপর অন্য বাঘেরা এক একজন করে

তার পিঠে উঠতে লাগল।

এমনি করে, বাঘের পিঠে বাঘ উঠে, দেখতে দেখতে তারা প্রায় বুদ্ধুর বাপের সমান উঁচু হয়ে গেল। আর একটু উঁচু হলেই তাকে ধরে ফেলবে!

বুদ্ধুর বাপ বলছে, 'যা হয় হবে, একবার শেষ এক ঘা মেরেই নি!' এই বলে সে হাঁড়িটি খুলে হাতে নিয়ে বসেছে—সেই হাঁড়ি সকলের উপরকার বাঘটার মাথায় ভাঙবে।

এমন সময় ভারি একটা মজা হয়েছে! যে গর্তে সেই লেজকাটা বাঘ তার লেজ ঢুকিয়েছিল, সেই গর্তটা ছিল কাঁকড়ার। কাঁকড়া কাটা লেজের গন্ধ পেয়ে, আস্তে-আস্তে এসে তার দুই দাঁড়া দিয়ে তাতে চিমটি লাগিয়েছে। চিমটি খেয়ে বেঁড়ে বাঘ বললে, 'উঃ হুঃ! ঘোঁয়াও! হাল্লুম! আরে উপরেও বুদ্ধুর বাপ, নীচেও বুদ্ধুর বাপ!' বলতে বলতেই তো সে লাফিয়ে উঠল আর তার পিঠের বাঘগুলি জড়াজড়ি করে ধুপধাপ শব্দে মাটিতে পড়ে গেল। ঠিক সেই সময়ে বুদ্ধুর বাপও লেজকাটা বাঘের পিঠে হাঁড়ি আছড়ে ফেলে বললে, 'ধর। ধর বেঁড়ে বেটার ঘাড়ে ধর!'

এরপর কি আর বাঘের দল সেখানে দাঁড়ায়? তারা লেজ গুটিয়ে, কান খাড়া করে যে যেখান দিয়ে পারল ছুটে পালাল। আর কোনোদিন তারা বুদ্ধুর বাপের বাড়ির কাছেও এল না।

বোকা বাঘ

এক রাজার বাড়ির কাছে এক শিয়াল থাকত। রাজার ছাগলের ঘরের পিছনে তার গর্ত ছিল।

রাজার ছাগলগুলি খুব সুন্দর আর মোটা-মোটা ছিল।

তাদের দেখলেই শিয়ালের ভারি খেতে ইচ্ছে হত। কিন্তু রাজার রাখালগুলির ভয়ে তাদের কাছে আসতে পারত না।

তখন শিয়াল তার গর্তের ভিতর থেকে খুঁড়তে আরম্ভ করল। খুঁড়ে খুঁড়ে তো সে ছাগলের ঘরে এসে উপস্থিত হল, কিন্তু তবুও ছাগল খেতে পেল না।

রাখালের দল তখন সেখানে বসেছিল। তারা শিয়ালকে দেখতে পেয়েই ধরে বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে খোঁটায় বেঁধে তারা চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, 'কাল এটাকে নিয়ে সকলকে তামাশা দেখাব, তারপর মারব। আজ রাত হয়ে গেছে।'

রাখালেরা চলে গেছে, শিয়াল মাথা হেঁট করে বসে আছে, এমন সময় এক বাঘ সেইখান দিয়ে যাচ্ছে।

শিয়ালকে দেখে বাঘ ভারি আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কি ভাগ্নে, এখানে বসে কি করছ?'

শিয়াল বললে, 'বিয়ে করছি।'

বাঘ বললে, 'তবে কনে কোথায়? লোকজন কোথায়?'

শিয়াল বললে, 'কনে তো রাজার মেয়ে। লোকজন তাকে আনতে গেছে।'

বাঘ বললে, 'তুমি বাঁধা কেন?'

শিয়াল বললে, 'আমি কিনা বিয়ে করতে চাইনি, তাই আমাকে বেঁধে রেখে গেছে, পাছে আমি পালাই।'

বাঘ বললে, 'সত্যি নাকি। তুমি বিয়ে করতে চাচ্ছ না?'

শিয়াল বললে, 'সত্যি মামা। আমার বিয়ে করতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না।'

তা শুনে বাঘ ভারি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'তবে তোমার জায়গায় আমাকে বেঁধে রেখে তুমি চলে যাও না।'

শিয়াল বললে, 'এক্ষুণি। তুমি আমার বাঁধন খুলে দাও, তারপর আমি তোমাকে বেঁধে রেখে যাচ্ছি।'

বাঘ বললে, 'হীঃ, হীঃ, হিহি, হিহি!'

তখন বাঘের আনন্দ দেখে কে। সে অমনি এসে শিয়ালের বাঁধন খুলে দিল। শিয়ালও আর দেরি না করে, তাকে ভালো মতো খোঁটায় বেঁধে বললে, 'এক কথা মামা। তোমার শালারা এসে তোমার সঙ্গে হাসি-তামাশা করবে। তাতে বা তুমি চটো?'

বাঘ বললে, 'আরে না। আমি তাতে চটি? আমি বুঝি এতই বোকা।' এ কথায় শিয়াল হাসতে হাসতে চলে গেল। বাঘ ভাবতে লাগল, কখন কনে নিয়ে আসবে।

সকালবেলায় রাখালের দল এসে উপস্থিত হল। বাঘ তাদের দেখে ভাবল, 'এই আমার শালারা এসেছে, এক্ষুনি হয়তো ঠাট্টা করবে। আর তাহলে আমাকেও খুব হাসতে হবে।'

রাখালেরা এসেছিল শিয়াল মারতে। এসে দেখলে বাঘ বসে আছে। অমনি তো ভারি একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। কেউ কেউ পালাতে চায়, কেউ কেউ তাদের থামিয়ে বললে, 'আরে বাঁধা রয়েছে দেখছিস না? ভয় কি? কুড়ুল, খন্তা, বল্লম নিয়ে আয়।'

তখন একজন একটা মস্ত ইট এনে বাঘের গায়ে ছুঁড়ে মারল।

তাতে বাঘ বললে, 'হীঃ, হীঃ, হিহি, হিহি।'

আর একজন একটা বাঁশ দিয়ে গুঁতো মারলে।

তাতে বাঘ বললে, 'হীঃ, হীঃ হিহি, হিহি।'

আর একজন একটা বল্লম দিয়ে খোঁচা মারলে।

তাতে বাঘ বললে, 'উঃ হু, হুঃ। হোহো হোহো হোহো। —বুঝেছি তোমরা আমার শালা।'

আবার তারা বল্লমের খোঁচা মারলে।

তাতে বাঘ বেজায় রেগে বললে, 'দুত্তোর! এমন ছাই বিয়ে আমি করব না।' বলে সে

দড়ি ছিঁড়ে বনে চলে গেল।

বনের ভিতরে এক জায়গায় করাতীরা করাত দিয়ে কাঠ চিরত। একটা মস্ত কাঠ আধখানা চিরে রেখে, সেইখানে গোঁজ মেরে করাতীরা চলে গিয়েছে। এই সময় বাঘ বনের ভিতর এসে দেখে শিয়াল সেই আধচেরা কাঠখানার উপরে বসে বিশ্রাম করছে।

ফটাং করে লেজ দুইখান

শিয়াল তাকে দেখেই বললে, 'কি মামা, বিয়ে কেমন হল?'

বাঘ বললে, 'না ভাগ্নে, ওরা বড্ড বেশি ঠাট্টা করে। তাই আমি চলে এসেছি।'

শিয়াল বললে, 'তা বেশ করেছ। এখন এস, দুজনে বসে গল্প-সল্প করি।'

বলতেই বাঘ লাফিয়ে কাঠের উপরে উঠেছে, আর বসেছে ঠিক যেখানটায় কাঠটা খুব হাঁ করে আছে, সেইখানে। তার লেজটা সেই ফাঁকের ভিতর ঢুকে ঝুলে রয়েছে।

শিয়াল দেখলে যে, এবারে কাঠ থেকে গোঁজটি খুলে নিলেই বেশ তামাশা হবে। সে বাঘকে নানান কথায় ভোলাচ্ছে, আর একটু একটু করে গোঁজটিকে নাড়ছে। নাড়তে নাড়তে এমন করেছে যে, এখন টানলেই সেটা খুলে যাবে, আর কাঠ বাঘের লেজ, কামড়ে ধরবে। তখন সে 'মামা, গেলুম।' বলে সেই গোঁজসুদ্ধ মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

আর বাঘের যে কি হল সে আর বলে কি হবে? কাঠ লেজে কামড়ে ধরতেই তো সে বেজায় চেঁচিয়ে এক লাফ দিল। সেই লাফে ফটাং করে লেজ ছিঁড়ে একেবারে দুইখান। তখন বাঘও শিয়ালের সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

বাঘ বললে, 'ভাগ্নে, গেলুম! আমার লেজ ছিঁড়ে গিয়েছে।'

শিয়াল বললে, 'মামা, গেলুম! আমার কোমর ভেঙে গিয়েছে!'

এমনি করে দুজনে গড়াগড়ি দিয়ে এক কচুবনে ঢুকে শুয়ে রইল। বাঘ আর নড়তে চড়তে পারে না। কিন্তু শিয়াল বেটার কিচ্ছু হয়নি, সে আগাগোড়াই বাঘকে ফাঁকি দিচ্ছে।

সেই কচুবনের ভিতরে ঢের ব্যাঙ ছিল, শিয়াল শুয়ে শুয়ে তাই ধরে পেট ভরে খেল। বাঘ বেদনায় অস্থির, সে ব্যাঙ দেখতেই পেল না—খাবে কি! কিন্তু তার এমনি খিদে পেয়েছে যে, কিছু না খেলে সে মরেই যাবে! তখন সে শিয়ালকে জিগগেস করলে, 'ভাগ্নে, তুমি কিছু খেয়েছ নাকি?'

শিয়াল বললে, 'আর কি খাব? এই কচুই খেয়েছি। খেয়ে আমার পেট বড্ড ফেঁপেছে।'

বাঘও আর কি করে। সে কচুই চিবিয়ে খেতে লাগল। তারপর গলা ফুলে, মুখ ফুলে, সে যায় আর কি!

তা দেখে শিয়াল বললে, 'কি মামা, কিছু খেলে?'

বাঘ বললে, 'খেয়েছি তো ভাগ্নে, কিন্তু বড্ড গলা ফুলেছে। তোমার পেট ফেঁপেছে, আমার কেন গলা ফুলল?'

শিয়াল বললে, 'আমি কিনা শিয়াল, আর তুমি কিনা বাঘ, তাই।'

লেজের ব্যথায় আর গলার ব্যথায় বাঘ ষোলোদিন উঠতে পারলে না। এই ষোলোদিন কিছু না খেয়ে সে আধমরা হয়ে গিয়েছে।

বাঘ নিজের হাত-পা চিবিয়ে খাচ্ছে

এমন সময় সে দেখলে যে, শিয়াল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দিব্যি চলে যাচ্ছে। তাতে সে আশ্চর্য হয়ে জিগগেস করলে, 'কি ভাগ্নে তোমার অসুখ কি করে সারল?'

শিয়াল বললে, 'মামা, একটি ভারি চমৎকার ওষুধ পেয়েছি। আমি আমার হাত পা চিবিয়ে খেলুম আর তক্ষুনি আমার অসুখ সেরে গেল। তারপর দেখতে দেখতে নতুন হাত পা হল।'

বাঘ বললে, 'তাই নাকি? তবে আমাকে বলনি কেন?'

শিয়াল বললে, 'তুমি কি আর তোমার হাত পা চিবিয়ে খেতে পারবে? তাই বলিনি।'

এ কথায় বাঘ ভীষণ রেগে বললে, 'তুই শিয়াল হয়ে পারলি, আর আমি বাঘ হয়ে পারব না?'

শিয়াল বললে, 'তুমি দুটো ঠাট্টার ভয়ে অমন বিয়েটা ছেড়ে এলে। এখন যে হাত পা চিবিয়ে খেতে পারবে তা আমি কি করে জানব?' তখন বাঘ বললে, 'পারি কি না এই দেখ।' বলে সে নিজের হাত পা চিবিয়ে খেল। তারপর তিন-চার দিনের মধ্যেই ভয়ানক ঘা হয়ে সে মারা গেল।

বাঘের রাঁধুনি

এক বাঘের বাঘিনী মরে গিয়েছিল। মরবার সময় বাঘিনী বলে গিয়েছিল, 'আমার দুটো ছানা রইল, তাদের তুমি দেখো।'

বাঘিনী মরে গেলে বাঘ বললে, 'আমি কি করে বা ছানাদের দেখব, কি করে বা ঘরকন্না করব।'

তা শুনে অন্য বাঘেরা বললে, 'আবার একটা বিয়ে কর, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মেয়ে আর বাঘের ছানা

বাঘও ভাবলে, 'একটা বিয়ে করলে হয়। কিন্তু আর বাঘিনী বিয়ে করব না, তারা রাঁধতে-টাঁধতে জানে না। এবারে বিয়ে করব মানুষের মেয়ে, শুনেছি তারা খুব রাঁধতে পারে।'

এই মনে করে সে মেয়ে খুঁজতে গ্রামে গেল। সেখানে এক গৃহস্থের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল। বাঘ সেই মেয়েটিকে ধরে এনে, তার ছানা দুটিকে বললে, 'দেখ রে, এই তোদের মা।'

ছানা দুটো বললে, 'লেজ নেই, দাঁত নেই, রোঁয়া নেই, ডোরা নেই—ও কেন আমাদের মা হবে! ওটাকে মেরে দাও আমরা খাই!'

বাঘ বললে, 'খবরদার! অমন কথা বলবি তো তোদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করব!'

তাতে ছানা দুটো চুপ করে গেল। কিন্তু সেই মেয়েটিকে তারা একেবারেই দেখতে পারত না। আর কথায় কথায় খালি বলত, 'আর একটু বড় হলেই আমাদের গায়ে জোর হবে, তখন তোর ঘাড় ভেঙে তোকে খাব!'

সেই মেয়েটির দুঃখের কথা আর কি বলব! বাঘ যখন বাড়ি থাকে না, তখন সে তার মা-বাপ আর ভাইয়ের জন্য গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে। বাঘ এলে তার ভয়ে চুপ করে থাকে। এমনি তার দিন যায়।

আর তার মা-বাপ তো কেঁদে-কেঁদে অন্ধই হয়ে গেল। তার ভাইটিও দিন কতক খুব কাঁদলে, তারপর তার মা-বাপকে বললে, 'শুধু ঘরে বসে কাঁদলে কি হবে? আমি চললুম, দেখি বোনের সন্ধান করতে পারি কিনা।' এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে, খালি বনে বনে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে-ঘুরতে শেষে সেই বাঘের বাড়ি এসে তার বোনকে পেল।

বোনটি তো তাকে দেখেই কাঁদতে-কাঁদতে বললে, 'ও দাদা তুমি কেন এলে? বাঘ এলেই যে তোমাকে ধরে খাবে!'

ভাই বললে, 'খায় খাবে! আমি তোকে না নিয়ে ফিরছি না। এখন আমাকে লুকিয়ে রাখ, তারপর দেখব এখন।'

তখন তারা দুজনে মিলে রান্নাঘরে গর্ত খুঁড়ল। মেয়েটি সেই গর্তের ভিতরে তার ভাইকে বসিয়ে, শিল চাপা দিয়ে রাখল।

তারপরেই বাঘ এসে, তার ছানা দুটোকে নিয়ে খেতে বসল। ছানা দুটো ভালো করে খাচ্ছে না, খালি বলছে—

'বাবাগো বাবা, তোর কি শালা? মোর কি মামা?
মা'র কি সোদর ভাই?
শিলের তলে কুমকুম করে—তুলে দে না খাই!'

বাঘ সেদিন কার উপরে চটে এসেছিল, তাই ছানা দুটোর কথা শুনেই, ঠাস-ঠাস করে তাদের দুটো চড় মারল। তারা কি বলছে তা ভেবে দেখল না! খাওয়া শেষ হলে সে মেয়েটিকে বলল, 'আজ পিঠে করিস, বিকেলে খাব। দেখিস যেন ভালো হয়।' এই বলে সে আবার বেরিয়ে গেল।

মেয়ে আর ভাই পালাল

বাঘ চলে গেলে পর মেয়েটি শিলের তলা থেকে তার ভাইকে বার করল। তারপর দুজনে খাওয়া-দাওয়া সেরে, উনুন ধরিয়ে তার উপর কড়ায় করে তেল চড়াল। তারপর বাঘের ছানা দুটোকে কেটে, উনুনের উপর ঝুলিয়ে রেখে, তারা সেখান থেকে ছুটে পালাল।

বাঘের ছানা উনুনের উপর ঝুলছে, আর ঝ্যাৎ-ঝ্যাৎ করে রক্তের ফোঁটা তপ্ত তেলে পড়ছে।

বিকেলে বাঘ ফিরে এসে ঘরে ঢুকবার আগেই সেই শব্দ শুনতে পেল। শুনে সে বললে, 'বাঃ রে বা! ঐ পিঠে হচ্ছে। পিঠে যদি ভালো হয় তো ভালো, নইলে আমরা তিন বাপ-বেটায় মিলে রাঁধুনী হতভাগীকে ছিঁড়ে খাব!'

তারপর ঘরে ঢুকেই তো দেখল কিরকম পিঠে হচ্ছে! তখন বাঘ 'হালুম হালুম' করে ঘরময় খুঁজতে লাগল। কিন্তু গৃহস্থের মেয়েকে আর কোথায় পাবে! সে ততক্ষণে তার ভাইকে নিয়ে, মা-বাপের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আর গ্রামের সকল লোক ছুটে এসে তাদের নিয়ে কি আনন্দই যে করছে কি বলব!

বোকা কুমিরের কথা

কুমির আর শিয়াল মিলে চাষ করতে গেল। কিসের চাষ করবে? আলুর চাষ। আলু হয় মাটির নীচে। তার গাছ থাকে মাটির উপরে, তা দিয়ে কোনো কাজ হয় না। বোকা কুমির সে কথা জানত না। সে ভাবলে, বুঝি আলু তার গাছের ফল।

তাই সে শিয়ালকে ঠকাবার জন্যে বললে, 'গাছের আগার দিক কিন্তু আমার, আর গোড়ার দিক তোমার।'

মাটি খুঁড়ে দেখে কিছু নেই

শুনে শিয়াল হেসে বললে, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

তারপর যখন আলু হল, কুমির তখন সব গাছের আগা কেটে তার বাড়িতে নিয়ে এল। এনে দেখে তাতে একটাও আলু নেই। তখন সে মাঠে গিয়ে দেখল, শিয়াল মাটি খুঁড়ে সব আলু তুলে নিয়ে গেছে। কুমির ভাবলে, 'তাই তো। এবার বড্ড ঠকে গিয়েছি। আচ্ছা আসছে বার দেখব!'

তারপরের বার হল ধানের চাষ। এবারে কুমির মনে ভেবেছে আর কিছুতেই ঠকতে যাবে না। তাই সে আগে থাকতেই শিয়ালকে বললে, 'ভাই, এবারে কিন্তু আমি আগার দিক নেব না, এবার আমাকে গোড়ার দিক দিতে হবে!'

শুনে শিয়াল হেসে বললে, 'আচ্ছা, তাই হবে!'

তারপর যখন ধান হল, শিয়াল সে ধানসুদ্ধ গাছের আগা কেটে নিয়ে গেল। কুমির তো এবারে ভারি খুশি হয়ে আছে। ভেবেছে, মাটি খুঁড়ে সব ধান তুলে নেবে। ও কপাল। মাটি খুঁড়ে দেখে সেখানে কিছুই নেই। লাভের মধ্যে খড়গুলো গেল।

তখন কুমির তো বড্ড চটেছে, আর বলছে, 'দাঁড়াও শিয়ালের বাছা, তোমাকে দেখাচ্ছি। এবারে আর আমি তোমাকে আগা নিতে দেব না। সব আগা আমি নিয়ে আসব।'

সেবার হল আখের চাষ।

কুমির তো আগেই বলেছে, এবার আর সে আগা না নিয়ে ছাড়বে না। কাজেই শিয়াল তাকে আগাগুলো দিয়ে, নিজে আখগুলো নিয়ে ঘরে বসে মজা করে খেতে লাগল।

কুমির আখের আগা ঘরে এনে চিবিয়ে দেখলে, খালি নোন্তা, তাতে একটুও মিষ্টি নেই। তখন সে রাগ করে আগাগুলো সব ফেলে দিয়ে শিয়ালকে বললে, 'না ভাই, তোমার সঙ্গে আর আমি চাষ করতে যাব না, তুমি বড্ড ঠকাও!'

শিয়াল পণ্ডিত

কুমির দেখলে, সে শিয়ালের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছে না। তখন সে ভাবলে, 'ও ঢের লেখাপড়া জানে, তাতেই খালি আমাকে ফাঁকি দেয়। আমি মূর্খ লোক তাই তাকে আঁটতে পারি না।' অনেকক্ষণ ভেবে কুমির এই ঠিক করল যে, নিজের সাতটা ছেলেকে

শিয়ালের কাছে দিয়ে খুব করে লেখাপড়া শেখাতে হবে। তারপরের দিনই সে ছানা সাতটাকে সঙ্গে করে শিয়ালের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল। শিয়াল তখন তার গর্তের ভিতরে বসে কাঁকড়া খাচ্ছিল। কুমির এসে ডাকলে, 'শিয়াল পণ্ডিত, শিয়াল পণ্ডিত, বাড়ি আছ?'

কুমির তার সাত ছানা আর শিয়াল

শিয়াল বাইরে এসে বললে, 'কি ভাই, কি মনে করে?'

কুমির বললে, 'ভাই, এই আমার ছেলে সাতটাকে তোমার কাছে এনেছি। মূর্খ হলে করে খেতে পারবে না। ভাই, তুমি যদি এদের একটু লেখাপড়া শিখিয়ে দাও।'

শিয়াল বললে, 'সে আর বলতে? আমি সাতদিনে সাতজনকে পড়িয়ে পণ্ডিত করে দেব।' শুনে কুমির তো খুব খুশি হয়ে ছানা সাতটাকে রেখে চলে গেল।

তখন শিয়াল তাদের একটাকে আড়ালে নিয়ে বললে--

'পড় তো বাপু—কানা খানা গানা ঘানা,
কেমন লাগে কুমির ছানা?'

এই কথা বলে, সেটার ঘাড় ভেঙে, খেয়ে ফেললে।

পরদিন যখন কুমির তার ছানা দেখতে এল, তখন শিয়াল তাদের একেকটি করে গর্তের বাইরে এনে দেখাতে লাগল। ছয়টিকে ছয়বার দেখালে, শেষেরটা দেখালে দুবার। বোকা কুমির তা বুঝতে না পেরে ভাবলে, সাতটাই দেখানো হয়েছে। তখন সে চলে গেল, আর অমনি শিয়াল ছানাগুলোর একটাকে আড়ালে নিয়ে বললে—

'পড় তো বাপু—কানা খানা গানা ঘানা,
কেমন লাগে কুমির ছানা?'

এই কথা বলে, সেটার ঘাড় ভেঙে, খেয়ে ফেলল।

পরদিন কুমির তো ছানা দেখতে এল। শিয়াল একেকটি করে গর্তের বাইরে এনে, পাঁচবার পাঁচটাকে দেখাল, শেষেরটিকে দেখাল তিনবার। তাতেই কুমির খুশি হয়ে চলে গেল। তখন শিয়াল ঠিক আগের মতো করে আর একটা ছানাকে খেল।

এমনি করে সে রোজ একটি ছানা খায়, আর কুমির এলে তাকে ফাঁকি দিয়ে ভোলায়। শেষে যখন একটি ছানা বই আর রইল না, তখন সেই একটিকেই সাতবার দেখিয়ে সে কুমিরকে বোঝাল। তারপর কুমির চলে গেলে সেটিকেও খেয়ে ফেলল। তারপর আর একটিও রইল না।

তখন শিয়ালিনী বললে, 'এখন উপায়? কুমির এলে দেখাবে কি? ছানা না দেখতে পেলে তো অমনি আমাদের ধরে খাবে!'

কেমন লাগে কুমির ছানা।

শিয়াল বললে, 'আমাদের পেলে তো ধরে খাবে। নদীর ওপারের বনটা খুব বড়, চল আমরা সেইখানে যাই। তাহলে কুমির আর আমাদের খুঁজে বার করতেই পারবে না।'

এই বলে শিয়াল শিয়ালনীকে নিয়ে তাদের পুরনো গর্ত ছেড়ে চলে গেল।

এর খানিক বাদেই কুমির এসেছে। সে এসে 'শিয়াল পণ্ডিত, শিয়াল পণ্ডিত' বলে কত ডাকল, কেউ তার কথার উত্তর দিল না! তখন সে গর্তের ভিতর বার খুঁজে দেখল—শিয়ালও নেই শিয়ালনীও নেই! খালি তার ছানাদের হাড়গুলো পড়ে আছে।

তখন তার খুব রাগ হল, আর সে চারদিকে ছুটোছুটি করে শিয়ালকে খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে গিয়ে দেখল, ঐ! শিয়াল আর শিয়ালনী সাঁতরে নদী পার হচ্ছে।

অমনি 'দাঁড়া হতভাগা!' বলে সে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। জলের নীচে ছুটতে কুমিরের মতো আর কেউ পারে না, দেখতে দেখতে সে গিয়ে শিয়ালের পিছনের একটা পা কামড়ে ধরল!

শিয়াল সবে তার সামনের দু-পা ডাঙায় তুলেছিল, শিয়ালনী তার আগেই উঠে গিয়েছিল। কুমির এসে শিয়ালের পা ধরতেই সে-শিয়ালনীকে ডেকে বললে, 'শিয়ালনী, শিয়ালনী, আমার লাঠিগাছা ধরে কে টানাটানি করছে! লাঠিটা বা নিয়েই যায়!'

একথা শুনে কুমির ভাবলে, 'তাই তো, পা ধরতে গিয়ে লাঠি ধরে ফেলেছি! শিগগির লাঠি ছেড়ে পা ধরি।'

এই ভেবে যেই সে শিয়ালের পা ছেড়ে দিয়েছে, অমনি শিয়াল একলাফে ডাঙায় উঠে গিয়েছে। উঠেই বোঁ করে দে ছুট। তারপর বনের ভিতরে ঢুকে পড়লে আর কার সাধ্য তাকে ধরে।

আমার লাঠিগাছা ধরে কে টানাটানি করছে

তারপর থেকে কুমির কেবলই শিয়ালকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু শিয়াল বড্ড চালাক, তাই তাকে ধরতে পারে না। তখন সে অনেক ভেবে এক ফন্দি করল।

কুমির একদিন চড়ায় গিয়ে হাত পা
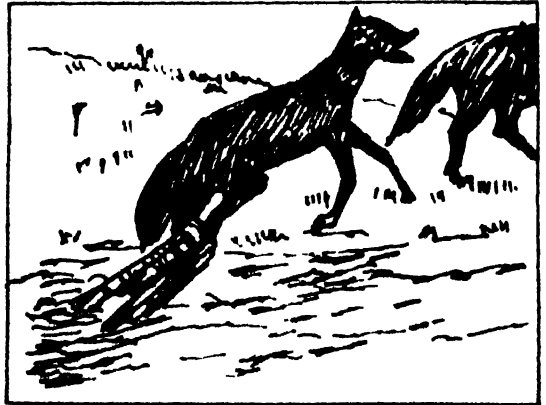
কুমির কেমন হয়ে পড়ে আছে

ছড়িয়ে মড়ার মতো পড়ে রইল। তারপর শিয়াল আর শিয়ালনী কচ্ছপ খেতে এসে দেখল, কুমির কেমন হয়ে পড়ে আছে! তখন শিয়ালনী বললে, 'মরে গেছে! চল খাইগে!' শিয়াল বললে, 'রোস, একটু দেখে নিই।' এই বলে সে কুমিরের আর একটু কাছে গিয়ে বলতে লাগল, 'না! এটা দেখছি বড্ড বেশি মরে গেছে! অত বেশি মরাটা আমরা খাই না। যেগুলো একটু একটু নড়েচড়ে আমরা সেগুলো খাই।' তা শুনে কুমির ভাবলে, 'একটু নড়িচড়ি, নইলে খেতে আসবে না।' এই মনে করে কুমির তার লেজের আগাটুকু নাড়তে লাগল। তা দেখে শিয়াল হেসে বললে, 'ঐ দেখ, লেজ নাড়ছে! তুমি তো বলেছিলে মরে গেছে!' তারপর আর কি তারা সেখানে দাঁড়ায়! তখন কুমির বললে, 'বড্ড ফাঁকি দিলে তো! আচ্ছা এবারে দেখাব!'
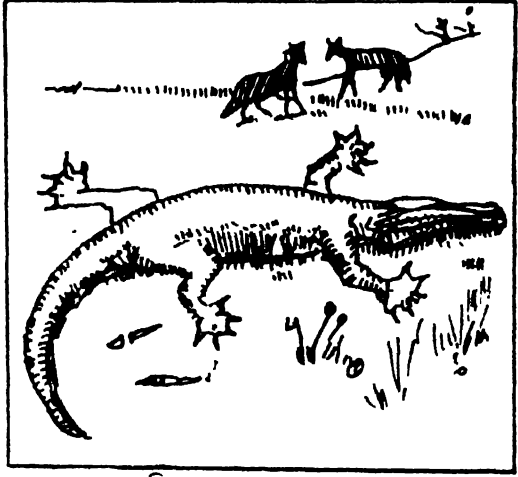
একটা জায়গায় শিয়াল রোজ জল খেতে আসত! কুমির তা দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে লুকিয়ে রইল। ভাবল শিয়াল জল খেতে এলেই ধরে খাবে। সেদিন শিয়াল এসে দেখল সেখানে একটাও মাছ নেই! অন্যদিন ঢের মাছ চলাফেরা করে। শিয়াল ভাবল, 'ভালো রে ভালো আজ সব মাছ গেল কোথায়? বুঝেছি, এখানে কুমির আছে!' তখন সে বললে, 'এখানকার জলটা বেজায় পরিষ্কার। একটু ঘোলা না হলে কি খাওয়া যায়? চল শিয়ালনী, আর এক জায়গায় যাই।' এ কথা শুনেই কুমির তাড়াতাড়ি সেখানকার জল ঘোলা করতে আরম্ভ করলে। তা দেখে শিয়াল হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়েছে!

আর একদিন শিয়াল এসেছে কাঁকড়া খেতে। কুমির তার আগেই সেখানে চুপ করে বসে আছে। শিয়াল তা টের পেয়ে বললে, 'এখানে কাঁকড়া নেই, থাকলে দু-একটা ভাসত।'

অমনি কুমির তার লেজের আগাটুকু ভাসিয়ে দিল। কাজেই শিয়াল আর জলে নামল না।

এমনি করে বারবার শিয়ালের কাছে ঠকে গিয়ে, শেষে কুমিরের ভারি লজ্জা হল। তখন সে আর কি করে মুখ দেখাবে? কাজেই সে তার ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে রইল।

সাক্ষী শিয়াল

একজন সওদাগর একটি ঘোড়া নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তার বড্ড ঘুম পেল। তখন সে ঘোড়াটিকে এক গাছে বেঁধে, সে গাছের তলায় ঘুমিয়ে রইল।

এমন সময় এক চোর এসে সওদাগরের ঘোড়াটিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

সওদাগর ঘোড়ার পায়ের শব্দে জেগে উঠে বললে, 'কি ভাই, তুমি আমার ঘোড়াটিকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?'
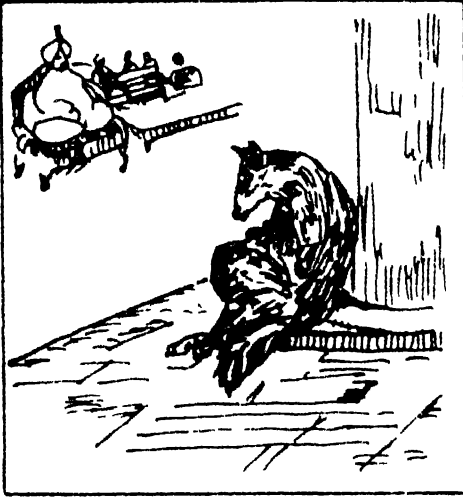
শিয়াল ঝিমুতে লাগল

চোর তাতে ভারি রাগ করে বললে, 'তোমার ঘোড়া আবার কোনটা হল?'

শুনে সওদাগর আশ্চর্য হয়ে বললে, সেকি কথা! তুমি আমার ঘোড়া নিয়ে চলে যাচ্ছ, আবার বলছ কোনটা আমার ঘোড়া?'

দুষ্টু চোর তখন মুখ ভার করে বললে, 'খবরদার! তুমি আমার ঘোড়াকে তোমার ঘোড়া বলবে না।'

সওদাগর বললে, 'কি? আমি আমাব ঘর থেকে ঘোড়াটাকে নিয়ে এলুম, আর তুমি বলছ সেটা তোমার?'

চোর বললে, 'বটে! এটা তো আমার ঐ গাছের ছানা। এক্ষুনি হল। তুমি বুঝে শুনে কথা কও, নইলে বড় মুশকিল হবে।'

তখন সওদাগর গিয়ে রাজার কাছে নালিশ করল, 'মহারাজ, আমি গাছে আমার ঘোড়াটি বেঁধে ঘুমুচ্ছিলুম, আর ঐ বেটা এসে তাকে নিয়ে যাচ্ছে।'

রাজামশাই চোরকে ডেকে জিগগেস করলেন, 'কি হে, তুমি ওর ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

চোর হাত জোড় করে বললে, 'দোহাই মহারাজ। এটি কখনোই ওর ঘোড়া নয়। এটি আমার গাছের ছানা। ছানাটি হতেই আমি তাকে নিয়ে যাচ্ছিলুম, আর ঐ বেটা উঠে বলছে কিনা ওটা ওর ঘোড়া, সব মিথ্যে কথা!'

তখন রাজামশাই বললেন, 'এ তো ভারি অন্যায়। গাছের ছানা হল, আর তুমি বলছ সেটা তোমার ঘোড়া। তুমি দেখছি বড় দুষ্টু লোক। পালাও এখান থেকে।' বলে তিনি ঘোড়াটা চোরকেই দিয়ে দিলেন।

সওদাগর বেচারা তখন মনের দুঃখে কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি ফিরে চলল। খানিক দূরে

গিয়ে এক শিয়ালের সাথে তার দেখা হল।

শিয়াল তাকে কাঁদতে দেখে বললে, 'কি ভাই? তোমার মুখ এমন ভার দেখছি যে! কি হয়েছে?'

সওদাগর বললে, 'আর ভাই, সে কথা বলে কি হবে? আমার ঘোড়াটি চোরে নিয়ে গেছে। রাজার কাছে নালিশ করতে গেলুম, সেখানে চোর বললে কিনা ওটা তার গাছের ছানা! রাজামশাই তাই শুনে ঘোড়াটি চোরকেই দিয়ে দিয়েছেন।'

মাথায় ঘোল ঢেলে চোরকে তাড়িয়ে দিচ্ছে

এ কথা শুনে শিয়াল বললে, 'আচ্ছা, এক কাজ করতে পার?'

সওদাগর বললে, 'কি কাজ?'

শিয়াল বললে, 'তুমি আবার রাজামশায়ের কাছে গিয়ে বল, মহারাজ, আমার একজন সাক্ষী আছে। আপনার বাড়িতে যদি কুকুর না থাকে, তবে সেই সাক্ষীটিকে নিয়ে আসতে পারি।'
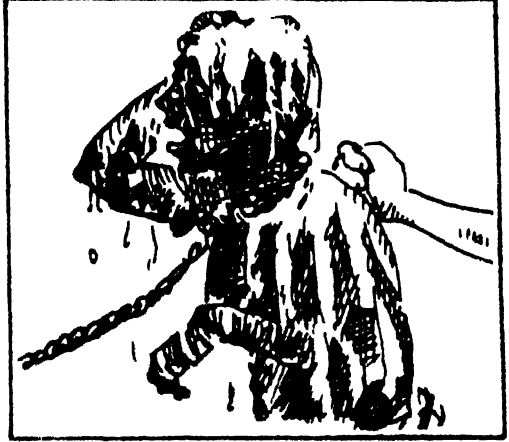
তখন সওদাগর আবার রাজার কাছে গিয়ে বললে, 'মহারাজ, আমার একটি সাক্ষী আছে, কিন্তু আপনার বাড়ির কুকুরদের ভয়ে সে আসতে পারছে না। অনুগ্রহ করে যদি কুকুর তাড়িয়ে দেবার হুকুম দেন, তবে আমার সাক্ষীটিকে নিয়ে আসতে পারি।'

তা শুনে রাজামশাই তখুনি সব কুকুর তাড়িয়ে দেবার হুকুম দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, এখন তোমার সাক্ষী আসুক।'

এসব কথা সওদাগর শিয়ালকে এসে বলতেই শিয়াল চোখ বুজে টলতে-টলতে রাজার সভায় এল। সেখানে এসেই সে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঝিমুতে লাগল। রাজামশাই তা দেখে হাসতে-হাসতে বললেন, 'কে, শিয়াল পণ্ডিত? ঘুমুচ্ছ যে?'

শিয়াল আধ চোখে মিট-মিট করে তাকিয়ে বললে, 'মহারাজ, কাল সারা রাত জেগে মাছ খেয়েছিলুম, তাই আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

রাজা বললেন, 'এত মাছ কোথায় পেলে?'

শিয়াল বললে, 'কাল নদীর জলে আগুন লেগে সব মাছ এসে ডাঙায় উঠল। আমরা সকলে মিলে সারা রাত খেলুম, খেয়ে কি শেষ করতে পারি!' এ কথা শুনে রাজামশাই এমনি ভয়ানক হাসলেন যে, আর একটু হলেই তিনি ফেটে যেতেন। শেষে অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন, 'এমন কথা তো কখনো শুনিনি! জলে আগুন লাগে, এও কি কখনো হয়? এ সব পাগলের কথা!'

তখন শিয়াল বললে, 'মহারাজ ঘোড়া গাছের ছানা হয় এমন কথাও কি কখনো শুনেছেন? সে কথা যদি পাগলের কথা না হয়, তবে আমার এই কথাটার কি দোষ হল?'

শিয়ালের কথায় রাজামশাই ভারি ভাবনায় পড়লেন।

ভেবেচিন্তে শেষে তিনি বললেন, 'তাই তো! ঠিক বলেছ! গাছের আবার কি করে ছানা হবে? সে বেটা তবে নিশ্চয় চোর।

তখনই হুকুম হল, 'আন তো রে সেই চোর বেটাকে বেঁধে!'

অমনি দশ পেয়াদা গিয়ে চোরকে বেঁধে আনলে। আনতেই রাজামশাই বললেন, 'মার বেটাকে পঞ্চাশ জুতো!'

বলতে-বলতেই পেয়াদারা তাদের নাগরা জুতো খুলে চটাস-চটাস চোরের পিঠে মারতে লাগল। সে বেটা পঁচিশ জুতো খেয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'গেলুম-গেলুম! আমি ঘোড়া এনে দিচ্ছি। আর এমন কাজ কখনো করব না!' কিন্তু তার কথা আর তখন কে শোনে। পঞ্চাশ জুতো মারা হলে রাজা বললেন, 'শিগগির ঘোড়া এনে দে, নইলে আরো পঞ্চাশ জুতো!'

চোর তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ঘোড়া এনে দিল। তারপর তার নিজ হাতে তার নাক কান মলিয়ে, মাথা চেঁছে, তাতে ঘোল ঢেলে হতভাগাকে দেশ থেকে দূর করে দেওয়া হল। সওদাগর ঘোড়া পেয়ে শিয়ালকে আশীর্বাদ করতে লাগল।

বাঘখেকো শিয়ালের ছানা

এক শিয়াল আর এক শিয়ালনী ছিল। তাদের তিনটি ছানা ছিল, কিন্তু থাকবার জায়গা ছিল না।

তারা ভাবলে, 'ছানাগুলোকে এখন কোথায় রাখি? একটা গর্ত না হলেও তো এরা বৃষ্টিতে ভিজে মারা যাবে।' তখন তারা অনেক খুঁজে একটা গর্ত বার করলে, কিন্তু গর্তের চারধারে দেখলে, খালি বাঘের পায়ের দাগ! তা দেখে শিয়ালনী বললে, 'ওগো এটা যে বাঘের গর্ত। এর ভিতরে কি করে থাকবে?'
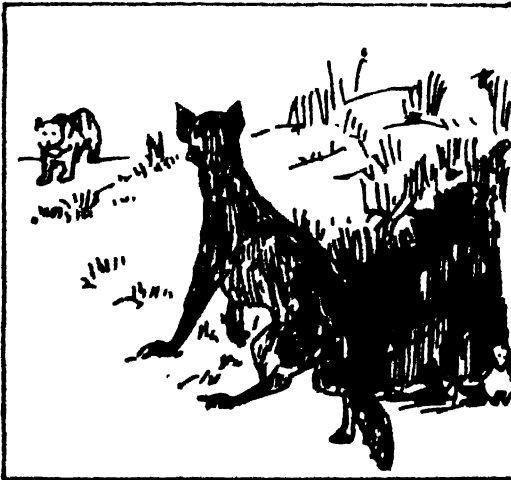
ঐ বাঘ আসছে

শিয়াল বলল, 'এত খুঁজেও তো আর গর্ত পাওয়া গেল না। এখানেই থাকতে হবে!'

শিয়ালনী বললে, 'বাঘ যদি আসে তখন কি হবে?'

শিয়াল বললে, 'তখন তুমি খুব করে ছানাগুলির গায় চিমটি কাটবে। তাতে তারা চেঁচাবে, আর আমি জিগগেস করব—ওরা কাঁদছে কেন? তখন তুমি বলবে—ওরা বাঘ খেতে চায়।'

তা শুনে শিয়ালনী বললে, 'বুঝেছি। আচ্ছা, বেশ!' বলেই সে খুব খুশি হয়ে গর্তের ভিতরে ঢুকল। তখন থেকে তারা সেই গর্তের ভিতরেই থাকে।

এমনি করে দিন কতক যায়, শেষে একদিন তারা দেখলে যে ঐ বাঘ আসছে। অমনি শিয়ালনী তার ছানাগুলোকে ধরে খুব চিমটি কাটতে লাগল। তখন ছানাগুলি যে চেঁচাল, তা কি বলব।

শিয়াল তখন খুব মোটা আর বিশ্রী গলার সুর করে জিগগেস করলে, 'খোকারা কাঁদছে কেন?'

বাঘের পিঠে বানর

শিয়ালনী তেমনি বিশ্রী সুরে বললে, 'ওরা বাঘ খেতে চায়, তাই কাঁদছে।'

বাঘ তার গর্তের দিকে আসছিল। এর মধ্যে 'ওরা বাঘ খেতে চায়' শুনে সে থমকে দাঁড়াল। সে ভাবলে, 'বাবা! আমার গর্তের ভিতর না জানি ওগুলো কি ঢুকে রয়েছে। নিশ্চয় ভয়ানক রাক্ষস হবে, নইলে কি ওদের খোকারা বাঘ খেতে চায়!'

তখুনি শিয়াল বললে, 'আর বাঘ কোথায় পাব? যা ছিল সবই তো ধরে এনে ওদের খাইয়েছি!'

তাতে শিয়ালনী বললে, 'তা বললে কি হবে? যেমন করে পার একটা ধরে আনো, নইলে খোকারা থামছে না।' বলে সে ছানাগুলোকে আরো বেশি করে চিমটি কাটতে লাগল।

তখন শিয়াল বললে, 'আচ্ছা, রোস রোস। ঐ যে একটা বাঘ আসছে। আমার ঝপাংটা দাও, এখুনি ওকে ভতাং করছি।'

ঝপাং বলেও কিছু নেই, ভতাং বলেও কিচ্ছু নেই—সব শিয়ালের ফাঁকি। বাঘের কিন্তু সেই ঝপাং আর ভতাং শুনেই প্রাণ উড়ে গেল। সে ভাবলে, 'মাগো, এই বেলা পালাই, নইলে না জানি কি দিয়ে কি করবে এসে!' বলে সে আর সেখানে একটুও দাঁড়াল না। শিয়াল চেয়ে দেখলে যে, সে লাফে লাফে ঝোপ জঙ্গল ডিঙিয়ে ছুটে পালাচ্ছে! তখন শিয়াল আর শিয়ালনী নিশ্বাস ছেড়ে বলে, 'যাক, আপদ কেটে গেছে!'

বাঘ তখনো এমনি ছুটেছে যে তেমন আর সে কখনো ছোটেনি।

একটা বানর গাছের উপর থেকে তাকে ছুটতে দেখে ভারি আশ্চর্য হয়ে ভাবলে, 'তাই তো, বাঘ এমনি করে ছুটছে, এ তো সহজ কথা নয়! নিশ্চয় একটা ভয়ানক কিছু হয়েছে!' এই ভেবে সে বাঘকে ডেকে জিগগেস করলে, 'বাঘ ভাই, বাঘ ভাই, কি হয়েছে? তুমি যে অমন করে ছুটে পালাচ্ছ?'

বাঘ হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'সাধে কি পালাচ্ছি? নইলে এক্ষুনি আমাকে ধরে খেত!'

বানর বললে, 'তোমাকে ধরে খায় এমন কোনো জানোয়ারের কথা তো আমি জানিনে।
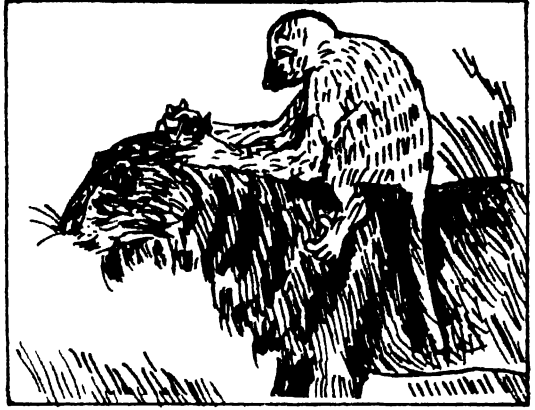
ও কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!'

বাঘ বললে, 'সেখানে থাকতে বাপু, তবে দেখতুম! দূরে থেকে অমনি করে সকলেই বলতে পারে!'

বানর বললে, 'আমি যদি সেখানে থাকতুম, তবে তোমাকে বুঝিয়ে দিতুম যে সেখানে কিছু নেই। তুমি বোকা, তাই মিছিমিছি অত ভয় পেয়েছ।' এ কথায় বাঘের ভারি রাগ হল।

সে বললে, 'বটে! আমি বোকা? আর তোমার বুঝি ঢের বুদ্ধি! চল তো একবার সেখানে যাই!'

বানর বললে, 'যাব বই কি, যদি আমাকে পিঠে করে নিয়ে যাও।'

বাঘ বললে, 'তাই সই। আমার পিঠে বসেই চল।' এই বলে সে বানরকে পিঠে করে আবার গর্তের দিকে ফিরে চলল।

শিয়াল আর শিয়ালনী সবে ছানাদের শান্ত করে একটু বসেছে আর অমনি দেখে বানরকে পিঠে করে বাঘ আবার আসছে। তখন শিয়ালনী তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে আবার ছানাগুলোকে চিমটি কাটতে লাগল, ছানাগুলিও ভূতের মতো চ্যাঁচাতে শুরু করল।

তখন শিয়াল আবার সেইরকম সুর করে বললে, 'আরে থামো, থামো! অত চেঁচিও না—অসুখ করবে।'

শিয়ালনী বললে, 'আমি বলছি, যতক্ষণ না একটা বাঘ এনে এদের খেতে দেবে, ততক্ষণ এরা কিছুতেই থামবে না।'

শিয়াল বললে, 'আমি যে ওদের মামাকে বাঘ আনতে পাঠিয়েছি। এখুনি সে বাঘ নিয়ে আসবে, তোমরা থামো!'

তারপর একটু চুপ করেই সে আবার বললে, 'ঐ, ঐ। ঐ যে তোদের বাঁদর মামা একটা বাঘ ধরে এনেছে! আর কাঁদিসনে; শিগগির ঝপাংটা দে, ভতাং করি!"

বানরের এতক্ষণ খুব সাহস ছিল। কিন্তু ঝপাং আর ভতাঙের কথা শুনে আর সে বসে থাকতে পারল না। সে এক লাফে একটা গাছে উঠে দেখতে দেখতে কোথায় পালিয়ে গেল।

আর বাঘের কথা কি আর বলব! সে যে সেইখান থেকে ছুট দিল দুদিনের মধ্যে আর দাঁড়ালই না।

তারপর থেকে আর শিয়ালের কোনো কষ্ট হয়নি। তারা মনের সুখে সেই গর্তে থেকে দিন কাটাতে লাগল।

আখের ফল

শিয়াল পণ্ডিত আখ খেতে বড় ভালোবাসে, তাই সে রোজ আখ খেতে যায়। একদিন সে আখের ক্ষেতে ঢুকে, একটি ভিমরুলের চাক দেখতে পেল। ভিমরুলের চাক সে আগে কখনো দেখেনি, সে মনে করল ওটা বুঝি আখের ফল।

শিয়াল কিনা পণ্ডিত মানুষ, তাই সে আখকে বলে 'ইক্ষু'। ক্ষেতকে বলে 'ক্ষেত্র', লাঠিকে বলে 'দণ্ড'।

ভিমরুলের চাক দেখে সে বললে, আহা, ইক্ষুর কি চমৎকার ফল! খেতে না জানি কতই মিষ্টি হবে?' এই মনে করে যেই সে ভিমরুলের চাক খেতে গিয়েছে, অমনি সব ভিমরুল বেরিয়ে কি মজাটাই তাকে দেখাতে লাগল! শিয়াল তো প্রাণের ভয়ে খালি ছোটে, আর বলে, 'ইক্ষুর ক্ষেত্রে আর যাব না!'
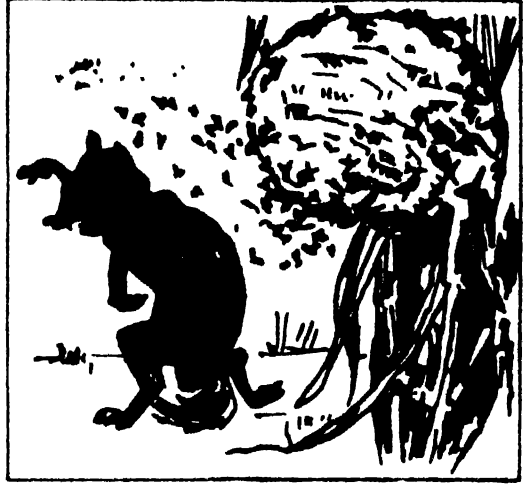
ইক্ষুর ক্ষেত্রে আর যাব না

খানিক বাদে ভিমরুলগুলো তাকে ছেড়ে গেল। তখন সে ভাবলে, 'ক্ষেত্রে তো রোজই যাই তাতে তো কিছু হয় না। ফল খেতে গিয়েই আমার বিপদ হল। তবে আর ক্ষেত্রে যাব না কেন? ফল না খেলেই হল।' এই ভেবে সে বলতে লাগল, 'যদি ইক্ষুর ক্ষেত্রে যাব, ইক্ষুর ফল আর না খাব!' দুদিন সে খালি এই কথাই বলে।

তারপর যখন বেদনা একটু কমে এল, তখন সে ভাবলে, 'ঐ ফলটার ভিতর পোকা ছিল, তারাই আমাকে কামড়েছে। আগে যদি ফলটাতে নাড়া দিতুম তবে পোকাগুলি বেরিয়ে যেত। তারপর ফল খেতে কোনো কষ্ট হত না! আহা, সে ফল খেতে না জানি কতই মিষ্টি! তবে আর ফল খাব না কেন? খাবার আগে পোকা তাড়িয়ে দিলেই হবে।' এই ভেবে সে বলতে লাগল, 'যদি ইক্ষুর ফল খাব, আগে দণ্ড দিয়ে নাড়া দিব!' বলতে-বলতে আখের ক্ষেতে গিয়ে সে তো লাঠি দিয়ে নাড়া দিয়েছে। অমনি আর যাবে কোথায়! ভিমরুলের দল এসে তাকে কামড়িয়ে আধমরা করে তবে ছাড়ল। সেই থেকে সে আর ইক্ষুর ফল খেত না।

হাতির ভিতরে শিয়াল

রাজার যে হাতিটা তাঁর আর সকল হাতির চেয়ে ভালো আর বড় আর দেখতে সুন্দর, সেইটে তাঁর 'পাটহস্তী'। সেই হাতিতে চড়ে রাজামশাই চলাফেরা করেন, আর তাকে খুব ভালোবাসেন।

একদিন রাজার পাটহস্তী মরে গেল। রাজা অনেকক্ষণ ভারি দুঃখ করলেন, শেষে বললেন, 'ওটাকে ফেলে দিয়ে এস।'

তখন সেই হাতির পায় বড়-বড় দড়ি বেঁধে পাঁচশো লোক টেনে তাকে মাঠে ফেলে দিয়ে এল।
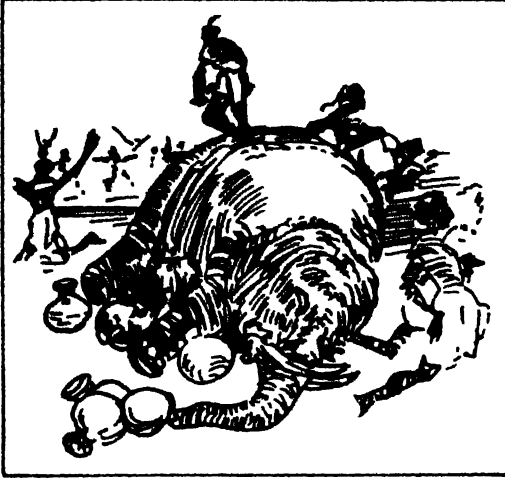
ঘি-টি ফেলে সবাই পালাচ্ছে

সেই মাঠের কাছে এক শিয়াল থাকত। সে অনেকদিন পেট ভরে খেতে পায়নি। মাঠে মরা হাতি দেখতে পেয়ে, সে খুব খুশি হয়ে এসে, তাকে খেতে আরম্ভ করল। তার এতই খিদে হয়েছিল যে, খেতে-খেতে সে হাতির পেটের ভিতরে ঢুকে গেল, তবুও তার খাওয়া শেষ হল না। এমনি করে দুদিন চলে গেল, তখনো সে হাতির পেটের ভিতরে বসে কেবল খাচ্ছেই। ততদিন রোদ লেগে চামড়া শুকিয়ে, হাতির পেটের ফুটো ছোট হয়ে গেছে, আর শিয়ালও অনেক খেয়ে মোটা হয়ে গেছে। তখন তো তার ভারি মুশকিল হল। সে অনেক চেষ্টা করেও হাতির পেটের ভিতর থেকে বেরুতে পারল না। এখন উপায় কি হবে?

এমন সময় তিনজন চাষী সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দেখতে পেয়েই শিয়ালের মাথায় এক ফন্দি জোগাল। সে হাতির পেটের ভিতর থেকে তাদের ডেকে বললে, 'ওহে ভাই সকল, তোমরা রাজার কাছে একটা খবর দিতে পারবে? আমার পেটে যদি পঞ্চাশ কলসী ঘি মাখানো হয়, তবে আমি উঠে দাঁড়াব।'

চাষীরা তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'শোন-শোন, হাতি কি বলছে! চল আমরা রাজামশাইকে খবর দিইগে।' তারা তখুনি রাজার কাছে ছুটে গিয়ে বললে, 'রাজামশাই, আপনার সেই মরা হাতি বলছে যে তার পেটে পঞ্চাশ কলসী ঘি মাখালে সে আবার উঠে দাঁড়াবে। শিগগির পঞ্চাশ কলসী ঘি পাঠিয়ে দিন।'

এ কথায় রাজামশাই যে কি খুশি হলেন, কি আর বলব! তিনি বললেন, 'আমার হাতি যদি বাঁচে পঞ্চাশ কলসী ঘি আর কত বড় একটা কথা। হাজার কলসী ঘি নিয়ে তার পেটে মাখাও।' তখুনি হাজার মুটে হাজার কলসী ঘি নিয়ে মাঠে উপস্থিত করল। দুহাজার লোক মিলে সেই ঘি হাতির পেটে মাখাতে লাগল। সাতদিন খালি 'আনো ঘি', 'ঢাল ঘি' ছাড়া সেখানে আর কোনো কথাই শোনা গেল না।

সাতদিনের পরে শিয়াল দেখলে যে, হাতির চামড়াও ঢের নরম হয়েছে পেটের ফুটোও ঢের বড় হয়েছে, এখন সে ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে আসতে পারে। তখন সে সকলকে ডেকে বলল, 'ভাই সকল, এইবার আমি উঠব। তোমরা একটু সরে দাঁড়াও নইলে যদি আমি মাথা ঘুরে তোমাদের উপরে পড়ে-টড়ে যাই!'

তখন ভারি একটা গোলমাল হল। যে যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই ধাক্কা মেরে বলছে, 'আরে বেটা, শিগগির সর! হাতি উঠছে, ঘাড়ে পড়বে।'

একথা শুনে কি কেউ আর সেখানে দাঁড়ায়? ঘি-টি সব ফেলে তারা পালাতে লাগল,

একবার চেয়েও দেখল না, হাতি উঠেছে কি পড়েই আছে। তা দেখে শিয়াল ভাবলে, 'এই বেলা পালাই।' তখন সে তাড়াতাড়ি হাতির পেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে দে ছুট।

মজন্তালী সরকার

এক গ্রামে দুটো বিড়াল ছিল। তার একটা থাকত গোয়ালাদের বাড়িতে, সে খেত দই, দুধ, ছানা, মাখন আর সর। আর একটা থাকত জেলেদের বাড়িতে, সে খেত খালি ঠেঙার বাড়ি আর লাথি। গোয়ালাদের বিড়ালটা খুব মোটা ছিল, আর সে বুক ফুলিয়ে চলত। জেলেদের বিড়ালটার গায় খালি চামড়া আর হাড় কখানি ছিল। সে চলতে গেলে টলত আর ভাবত, কেমন করে গোয়ালাদের বিড়ালের মতো মোটা হব।

শেষে একদিন সে গোয়ালাদের বিড়ালকে বললে, 'ভাই, আজ আমার বাড়িতে তোমার নিমন্ত্রণ।'

'আজ আমার বাড়িতে তোমার নিমন্ত্রণ'

সব কিন্তু মিছে কথা। নিজেই খেতে পায় না, সে আবার নিমন্ত্রণ খাওয়াবে কোথা থেকে? সে ভেবেছে, 'গোয়ালাদের বিড়াল আমাদের বাড়ি এলেই আমার মতন ঠেঙা খাবে আর মরে যাবে, তারপর আমি গোয়ালাদের বাড়িতে গিয়ে থাকব।'
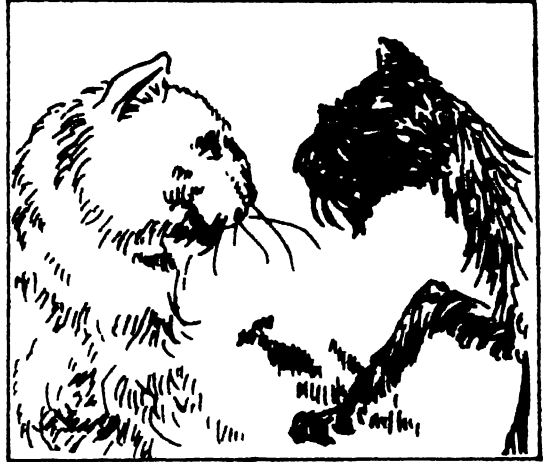
যে কথা সেই কাজ। গোয়ালাদের বিড়াল জেলেদের বাড়িতে আসতেই জেলেরা বললে, 'ঐ রে। গোয়ালাদের সেই দই-দুধ-খেকো চোর বিড়ালটা এসেছে, আমাদের মাছ খেয়ে শেষ করবে। মার বেটাকে!'

বলে তারা তাকে এমনি ঠেঙান ঠেঙালে যে, বেচারা তাতে মরেই গেল। রোগা বিড়াল তো জানতই যে, এমনি হবে। সে তার আগেই গোয়ালাদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়েছে! সেখানে খুব করে ক্ষীর-সর খেয়ে, দেখতে-দেখতে সে মোটা হয়ে গেল। তখন আর সে অন্য বিড়ালদের সঙ্গে কথা কয় না, আর নাম জিগগেস করলে বলে, 'মজন্তালী সরকার'।

একদিন মজন্তালী সরকার কাগজ কলম নিয়ে বেড়াতে বেরুল। বেড়াতে-বেড়াতে সে বনের ভিতরে গিয়ে দেখল যে তিনটি বাঘের ছানা খেলা করছে। সে তাদের তিন তাড়া লাগিয়ে বলল, 'এইয়ো। খাজনা দে!' বাঘের ছানাগুলো তার কাগজ কলম দেখে আর ধমক খেয়ে বড্ড ভয় পেল। তাই তারা তাড়াতাড়ি তাদের মায়ের কাছে গিয়ে বললে, 'ও মা,

শিগগির এস! দেখ এটা কি এসেছে, আর কি বলছে!'

মজন্তালী সরকার

বাঘিনী তাদের কথা শুনে এসে বললে, 'তুমি কে বাছা? কোত্থেকে এলে? কি চাও?'

মজন্তালী বললে, 'আমি রাজার বাড়ির সরকার, আমার নাম মজন্তালী। তোরা যে আমাদের রাজার জায়গায় থাকিস, তার খাজনা কই? খাজনা দে!'

বাঘিনী বললে, 'খাজনা কাকে বলে তা তো আমি জানিনে! আমরা খালি বনে থাকি, আর কেউ এলে তাকে ধরে খাই; তুমি না হয় একটু বস, বাঘ আসুক।'

তখন মজন্তালী একটা উঁচু গাছের তলায় বসে, চারিদিকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। খানিক বাদেই সে দেখল—ঐ বাঘ আসছে। তখন সে তাড়াতাড়ি কাগজ কলম রেখে, একেবারে গাছের আগায় গিয়ে উঠল।

বাঘ আসতেই তো বাঘিনী তার কাছে সব কথা বলে দিয়েছে, আর বাঘের যে কি রাগ হয়েছে কি বলব! সে ভয়ানক গর্জন করে বললে, 'কোথায় সে হতভাগা? এখুনি তার ঘাড় ভাঙচি!'

মজন্তালী গাছের আগা থেকে বললে, 'কি রে বাঘা, খাজনা দিবি না? আয়, আয়!'

শুনেই তো বাঘ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে 'হাল্লুম!' বলে দুই লাফে সেই গাছে গিয়ে উঠেছে। কিন্তু খালি উঠলে কি হয়? মজন্তালীকে ধরতে পারলে তো! সে একটুখানি হালকা জন্তু, সেই কোন সরু ডালে উঠে বসেছে, অত বড় ভারি বাঘ সেখানে যেতেই পারছে না। না পেরে রেগে-মেগে বেটা দিয়েছে এক লাফ, অমনি পা হড়কে গিয়েছে পড়ে! পড়তে গিয়ে, দুই ডালের মাঝখানে মাথা আটকে, তার ঘাড় ভেঙে প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে।

তা দেখে মজন্তালী ছুটে এসে তার নাকে তিন চারটে আঁচড় দিয়ে, বাঘিনীকে ডেকে বললে, 'এই দেখ, কি করেছি। আমার সামনে বেয়াদবি!'

এসব দেখে শুনে তো ভয়ে বাঘিনী বেচারীর প্রাণ উড়ে গেল। সে হাত জোড় করে বললে, 'দোহাই মজন্তালী মশাই, আমাদের প্রাণে মারবেন না! আমরা আপনার চাকর হয়ে থাকব।'

তাতে মজন্তালী বললে, 'আচ্ছা তবে থাক, ভালো করে কাজকর্ম করিস, আর আমাকে খুব ভালো খেতে দিস।'

সেই থেকে মজন্তালী বাঘিনীদের বাড়িতেই থাকে। খুব করে খায় আর বাঘিনীর ছানাগুলির

ঘাড়ে চড়ে বেড়ায়। সে বেচারারা তার ভয়ে একেবারে জড়সড় হয়ে থাকে, আর তাকে মনে করে, না জানি কত বড় লোক!

মজন্তালী বাঘ মেরেছে

একদিন বাঘিনী তাকে হাত জোড় করে বললে, 'মজন্তালী মশাই, এ বনে খালি ছোট ছোট জানোয়ার, এতে কিছু আপনার পেটে ভরে না। নদীর ওপারে খুব ভারি বন আছে, তাতে খুব বড়-বড় জানোয়ারও থাকে। চলুন সেইখানেই।'

শুনে মজন্তালী বললে, 'ঠিক কথা! চল ওপারে যাই।' তখন বাঘিনী তার ছানাদের নিয়ে, দেখতে-দেখতে নদীর ওপারে চলে গেল। কিন্তু মজন্তালী সরকার নদীর মাঝখানে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে! স্রোতে তাকে ভাসিয়ে সেই কোথায় নিয়ে গিয়েছে, আর ঢেউয়ের তাড়ায় তার প্রাণ যায় যায় হয়েছে!

মজন্তালী তো ঠিক বুঝতে পেরেছে যে, আর দুটো ঢেউ এলেই সে মারা যাবে। এমন সময় ভাগ্যিস বাঘিনীর একটা ছানা তাকে তাড়াতাড়ি ডাঙায় তুলে এনে বাঁচাল, নইলে সে মরেই যেত, তাতে আর ভুল কি?

কিন্তু মজন্তালী সরকার তাদের সে কথা জানতেই দিল না। সে ডাঙায় উঠে ভয়ানক চোখ রাঙিয়ে বাঘের ছানাকে চড় মারতে গেল, আর গাল যে কত দিল তার তো লেখাজোখাই নেই। শেষে বললে, 'হতভাগা মূর্খ, দেখ দেখি কি করলি! আমি অমন চমৎকার হিসাবটা করছিলুম, সেটা শেষ না হতেই তুই আমাকে টেনে তুলে আনলি—আর আমার সব হিসাব এলিয়ে গেল! আমি সবে গুণছিলুম, নদীতে কটা ঢেউ, কতগুলো মাছ আর কতখানি জল আছে। মূর্খ বেটা, তুই এর মধ্যে গিয়ে সব গোলমাল করে দিলি! এখন যদি আমি রাজামশাইয়ের কাছে গিয়ে এর হিসাব দিতে না পারি, তবে মজাটা টের পারি।'

এসব কথা শুনে বাঘিনী তাড়াতাড়ি এসে হাত জোড় করে বললে, 'মজন্তালী মশাই, ঘাট হয়েছে, এবারে মাপ করুন। ওটা মূর্খ, লেখাপড়া জানে না তাই কি করতে কি করে ফেলেছে!'

মজন্তালী বললে, 'আচ্ছা, এবারে মাপ করলুম! খবরদার! আর যেন কখনো এমন হয় না।' এই বলে মজন্তালী তার ভিজে গা শুকাবার জন্যে রোদ খুঁজতে লাগল।

ভারি বনের ভিতরে সহজে রোদ ঢুকতে পায় না। সেখানে রোদ খুঁজতে গেলে উঁচু গাছের আগায় গিয়ে উঠতে হয়। মজন্তালী একটা গাছের আগায় উঠে দেখলে যে, এই বড় এক মরা মহিষ মাঠের মাঝখানে পড়ে আছে। তখন সে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই মহিষটার গায়ে কয়েকটা আঁচড় কামড় দিয়ে এসে বাঘিনীকে বললে, 'শিগগির যা, আমি একটা মোষ

মেরে রেখে এসেছি।'

বাঘিনী আর তার ছানাগুলো ছুটে গিয়ে দেখলে, সত্যি মস্ত এক মোষ পড়ে আছে। তারা চারজনে মিলে অনেক কষ্টে সেটাকে টেনে আনলে, আর ভাবলে, 'ঈস! মজন্তালী মশায়ের গায়ে কি ভয়ানক জোর!'

হাসতে হাসতে পেট ফেটে গেছে

আর একদিন তারা মজন্তালীকে বললে, 'মজন্তালী মশাই, এ বনে বড়-বড় হাতি আর গণ্ডার আছে। চলুন একদিন সেইগুলো মারতে যাই।'

একথা শুনে মজন্তালী বললে, 'তাই তো, হাতি গণ্ডার মারব না তো মারব কি? চল আজই যাই।'

বলে সে তখুনি সকলকে নিয়ে হাতি আর গণ্ডার মারতে চলল। যেতে যেতে বাঘিনী তাকে জিগগেস করলে, 'মজন্তালী মশাই, আপনি খাপে থাকবেন না, ঝাঁপে থাকবেন?' খাপে থাকবার মানে কি? না—জন্তু এলে তাকে ধরে মারবার জন্যে চুপ করে গুড়ি মেরে বসে থাকা। আর ঝাঁপে থাকার মানে হচ্ছে, বনের ভিতরে গিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করে জন্তু তাড়িয়ে আনা।

মজন্তালী ভাবলে, 'আমার তাড়ায় আর কোন জন্তু ভয় পাবে?' তাই সে বললে, 'আমি ঝাঁপিয়ে যে সব জন্তু পাঠাব, তা কি তোরা মারতে পারিস? তোরা ঝাঁপে যা, আমি খাপে থাকি।'

বাঘিনী বললে, 'তাই তো, সে সব ভয়ানক জন্তু কি আমরা মারতে পারব? চল বাছারা, আমরা ঝাঁপে যাই।'

এই বলে বাঘিনী তার ছানাগুলোকে নিয়ে বনের অন্যধারে গিয়ে, ভয়ানক 'হাল্লুম-হাল্লুম' করে জানোয়ারদের তাড়াতে লাগল। মজন্তালী জানোয়ারদের ডাক শুনে, একটা গাছের তলায় বসে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

খানিক বাদে একটা সজারু সড়সড় করে সেইদিক পানে ছুটে এসেছে, আর মজন্তালী তাকে দেখে 'মাগো' বলে সেই গাছের একটা শিকড়ের তলায় গিয়ে লুকিয়েছে, এমন সময় একটা হাতি সেইখান দিয়ে চলে গেল। সেই হাতির একটা পায়ের এক পাশ সেই শিকড়ের উপরে পড়েছিল, তাতেই মজন্তালীর পেট ফেটে গিয়ে, বেচারার প্রাণ যায় আর কি।

অনেকক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করে বাঘেরা ভাবলে, 'মজন্তালী মশাই না জানি এতক্ষণে কত জন্তু মেরেছেন, চল একবার দেখে আসি।' তারা এসে মজন্তালীর দশা দেখে বললে, 'হায়-হায়! মজন্তালী মশায়ের এ কি হল?'

মজন্তালী বললে, 'আর কি হবে? তোরা যে সব ছোট-ছোট জানোয়ার পাঠিয়েছিলি। দেখে হাসতে-হাসতে আমার পেটই ফেটে গিয়েছে!'

এই বলে মজন্তালী মরে গেল।

পিঁপড়ে আর হাতি আর বামুনের চাকর

এক পিঁপড়ে ছিল আর তার পিঁপড়ী ছিল, আর তাদের দুজনের মধ্যে ভারি ভাব ছিল।

একদিন পিঁপড়ী বললে, 'দেখ পিঁপড়ে, আমি যদি তোমার আগে মরি, তবে কিন্তু তুমি আমাকে গঙ্গায় নিয়ে ফেলবে। কেমন পিঁপড়ে, ফেলবে তো?'

পিঁপড়ে বললে, 'হ্যাঁ পিঁপড়ী, অবশ্যি ফেলব। আর আমি যদি তোমার আগে মরি, তবে কিন্তু তুমি আমাকে গঙ্গায় নিয়ে ফেলবে। কেমন পিঁপড়ী, ফেলবে তো?'

পিঁপড়ী বললে, 'তা আর বলতে, অবশ্যি ফেলব।'

এমনি দুজনের কথাবার্তা হয়েছে, তারপর একদিন পিঁপড়ী মরে গেল। তখন পিঁপড়ে অনেক কাঁদল, তারপর ভাবল, 'এখন পিঁপড়ীকে তো নিয়ে গঙ্গায় ফেলতে হয়।'

এই ভেবে সে পিঁপড়ীকে কাঁধে করে নিয়ে গঙ্গায় চলল। সেখান থেকে গঙ্গা অনেক দূরে, যেতে অনেক দিন লাগে। পিঁপড়ে পিঁপড়ীকে নিয়ে সমস্ত দিন চলল। তারপর যখন সন্ধ্যে হল, তখন সে দেখল যে সে রাজার হাতিশালে এসেছে—সেই যেখানে তাঁর সব হাতি থাকে। পিঁপড়ের বড্ড পরিশ্রম হয়েছিল, তাই সে পিঁপড়ীকে নিয়ে সেইখানে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। সেইখানে মস্ত একটা হাতি বাঁধা ছিল, সেটা রাজার পাটহস্তী।
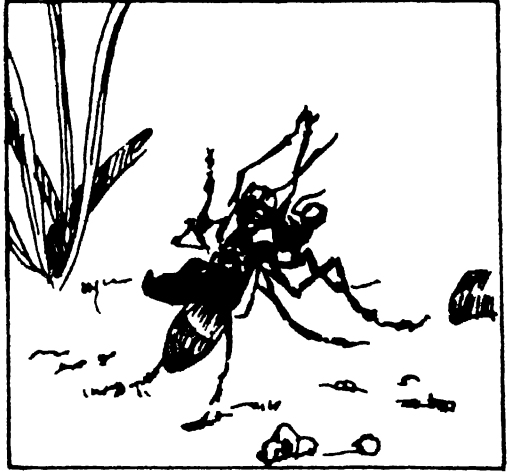
পিঁপড়ীকে কাঁধে করে নিয়ে গঙ্গায় চলল

হাতিটা শুঁড় নাড়ছিল, আর ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছিল, আর তাতে পিঁপড়ীকে সুদ্ধ পিঁপড়েকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কাজেই পিঁপড়ে রেগে বললে, 'খবরদার!' হাতি কিন্তু তা শুনতে পেল না। সে আবার নিশ্বাস ফেললে, আবার তাতে পিঁপড়েকে উড়িয়ে নিল। তাই পিঁপড়ে আরো রেগে খুব চেঁচিয়ে বললে, 'এইয়ো! খবরদার! ভালো হবে না কিন্তু! হতভাগা, পাজী।'

হাতি ভাবলে, 'ভালোরে ভালো, ওখান থেকে কে আমায় চি-চি করে গাল দিচ্ছে? আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।' এই বলে সে তার পা দিয়ে সে জায়গাটা ঘষে দিলে!

পিঁপড়ের তো এখন ভারি বিপদ। সে ভাবলে, 'মাগো, এই বুঝি পিষে গেলুম!' কিন্তু তারপরেই সে দেখলে যে সে পিষে যায়নি, হাতির পায়ের তলায় যে ছোট-ছোট গর্ত থাকে তারই একটায় ঢুকে সে বেঁচে গিয়েছে, আর পিঁপড়ীকেও ছাড়েনি।

'আমি ওটাকে একলাই নিয়ে যেতে পারি'

তখন আর তার আনন্দ দেখে কে? সেই গর্তের ভিতরে বসে সে হাতির পায়ের মাংস খুঁড়ে খেতে লাগল। যতক্ষণ না সে পিঁপড়ীকে নিয়ে একেবারে হাতির মাথার ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিল ততক্ষণ সে খুঁড়তে ছাড়েনি।

হাতির কিন্তু তাতে ভারি অসুখ হল। সে খালি মাথা নাড়ে, আর চ্যাঁচায় আর পাগলের মতন ছুটোছুটি করে। সকলে বললে, 'হায়-হায়! হাতির কি হল?' তারা কেউ জানে না যে, হাতির মাথায় পিঁপড়ে ঢুকেছে। যদি জানত তবে হাতির পায়ের তলায় খুব করে চিনি মাখাত, তাহলে সেই চিনির গন্ধে পিঁপড়ে তখুনি বেরিয়ে আসত। কিন্তু তারা তো আর তা জানে না! তারা বদ্যি ডাকল, ওষুধ খাওয়াল, আর তাতে হাতি মরে গেল।

সেদিন রাত্রে রাজামশাই স্বপ্ন দেখলেন যে, তাঁর হাতি যেন এসে তাঁকে বলছে, 'মহারাজ তোমার জন্যে আমি অনেক খেটেছি আমাকে নিয়ে গঙ্গায় ফেলবে।'

সকালে ঘুম থেকে উঠেই রাজামশাই হুকুম দিলেন, 'আমার হাতিকে নিয়ে গঙ্গায় ফেলতে হবে।'

তখুনি তিনশো লোক সেই হাতির পায়ে মোটা দড়ি বেঁধে, তাকে 'হেঁইয়ো! হেঁইয়ো!' করে টেনে নিয়ে গঙ্গায় চলল। ভয়ানক বড় হাতি, তাকে টানা মুশকিল। সেই লোকগুলি তাকে নিয়ে খানিক দূরে যায়, আর দড়ি ছেড়ে দিয়ে বসে হাঁপায়।

এমন সময় হয়েছে কি—সেইখান দিয়ে এক বামুন ঠাকুর যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে এক চাকর। সেই লোকগুলিকে বসে হাঁপাতে দেখে সেই চাকরটা বললে, 'ইঁদুরের মতো একটা হাতি, তাকে টানতে গিয়ে তিনশো লোক হাঁপাচ্ছে। আমি হলে ওটাকে একলাই নিয়ে যেতে পারি।'

এ কথা শুনেই তো সেই তিনশো লোক লাফিয়ে উঠল। তারা বললে, 'কি, এত বড় কথা! আমরা তিনশো লোক যা পারছিনে তুই একলাই তা করতে পারবি? আচ্ছা, এর বিচার না হলে তো আমরা আর হাতি টানছি না। চল বেটা, রাজার কাছে চল, দেখব তুই কেমন জোয়ান!'

তাতে সেই চাকর বললে, 'আচ্ছা চল না! আমি কি তোদের মতো জোয়ান?'

তখন মাঠে হাতি ফেলে রেখে তারা সকলে রাজার কাছে এসে বললে, 'দোহাই রাজামশাই,

এর বিচার হয়! আমরা তিনশো লোক আপনার হাতি টেনে হাঁপিয়ে গেলুম, আর এই বেটা বলছে কিনা সে একলাই সেটা নিয়ে যেতে পারে। এর বিচার না হলে আমরা আপনার হাতি ছোঁব না।'

একথা শুনে রাজামশাই বামুনের চাকরকে বললেন, 'কি রে, সত্যি কি তুই ঐ হাতি একলা নিয়ে যেতে পারিস?'

চাকর জোড়হাতে নমস্কার করে বললে, 'মহারাজের যদি হুকুম হয়, তবে পারি বইকি। কিন্তু আগে আমাকে পেট ভরে চারটি খেতে দিতে হবে।'

রাজা বললেন, 'দাও তো ওকে এক সের চাল আর ডাল তরকারি। আগে পেট ভরে খেয়ে নিক, তারপর হাতি নিয়ে যেতে হবে।'

তাতে সে চাকর হেসে বললে, 'মহারাজ, এক সের চাল তো ঝাড়ুওয়ালারা খায়—তাতে কি হাতি টানা চলে?'

রাজা বললেন, 'তবে তুই কি চাস?'

চাকর বললে, 'মহারাজ, বেশি আর কি চাইব? —এই মণ দুই চাল, দুটো খাসী আর এক মন দই হলেই চলবে।'

রাজা বললেন, 'আচ্ছা তাই পাবি, কিন্তু খেতে হবে সব।'

চাকর বললে, 'যে আজ্ঞে, মহারাজ!'

বামুনের চাকর সেই দু মণ চালের ভাত আর দুটো খাসী, আর এক মণ দই দিয়ে পেট ভরে খেয়ে তো আগে খুব এক চোট ঘুমিয়ে নিল। তারপর নিজের গামছাখানি দিয়ে সেই হাতিটাকে জড়িয়ে, বেশ করে একটি পুঁটুলি বাঁধল। তারপর পুঁটুলিটিকে লাঠির আগায় ঝুলিয়ে, সেই লাঠিসুদ্ধ সেই পুঁটুলি কাঁধে ফেলল। তারপর গণ্ডা দশেক পান মুখে গুঁজে গান গাইতে গাইতে গঙ্গায় চলল। তা দেখে রাজামশাই হাঁ করে রইলেন, আর তিনশো লোক হাঁ করে রইল, আর সকলে ছুটে বাড়িতে খবর দিতে গেল!

ততক্ষণে সে চাকর অনেক দূরে চলে গিয়েছে, আর খুব চনচনে রোদ উঠেছে। আরো অনেক দূর গিয়ে চাকর বললে, 'উঃ! কি ভয়ানক রোদ! আমার গলাটা বড্ড শুকিয়ে গেছে, একটু জল খেতে পেলে হত।'

বলতে-বলতেই সে দেখল যে খানিক দূরে একটি পুকুর রয়েছে, সেই পুকুরের ধারে গাছপালার আড়ালে একটি কুঁড়ে ঘর। চাকরটি পুকুরের ধারে তার পুঁটুলিটি রেখে, সেই ঘরের কাছে গিয়ে দেখলে সেখানে একটি ছোট মেয়ে বসে আছে।

সে সেই মেয়েটিকে বললে, 'বাছা, আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খেতে দেবে?'

মেয়েটি বললে, 'মোটে এক জালা জল আছে। তোমাকে যদি দিই, তবে বাবা মাঠ থেকে এসে কি খাবেন?'

একথা শুনে চাকর রেগে বললে, 'বটে! তুই একটু জল খেতে দিবিনে? আচ্ছা, দেখি এরপর তোরা কোত্থেকে জল খাস!'

এই বলে সে সেই পুকুরে নেমে, চোঁ-চোঁ করে তার জল খেতে লাগল। যতক্ষণ সেই পুকুরে জল ছিল, ততক্ষণ খালি চোঁ-চোঁ শব্দ শোনা গিয়েছিল। দেখতে দেখতে সে সেই এক পুকুর জল খেয়ে শেষ করল। জল খেতে-খেতে তার পেটটা ফুলে আগে ঢাকের মতো হল, তারপর হাতির মতো হল, শেষে একেবারে পাহাড়ের মতো হয়ে গেল। এমনি করে পুকুরের সব জল খেয়ে বামুনের চাকর দেখল যে, সে জল আর কিছুতেই তার পেটে থাকতে চাচ্ছে না। তখন সে আর কি করবে, তাড়াতাড়ি একটা বটগাছ গিলে ফেললে। সেই বটগাছ তার গলার মাঝামাঝি গিয়ে ছিপির মতো আটকে রইল—জল আর বেরুতে পারল না।

বামুনের চাকরের কাঁধে পুঁটুলি

তারপর বামুনের চাকর খুব খুশি হয়ে, সেই পুকুরের ধারে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। তার পেটটা তালগাছের চেয়েও উঁচু হয়ে উঠল, যেন একটা পাহাড়! সেই মেয়েটির বাপ তখন মাঠে কাজ করছিল। সে সেই পাহাড়ের মতো পেট দেখে ভাবল, 'বাবা, না জানি ওটা কি!' বলে সে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ছুটে এল।

সে বাড়িতে আসতেই তার মেয়ে বললে, 'বাবা, বাবা, দেখ কি দুষ্টু লোক! আমার কাছে জল চেয়েছিল। ঘরে এক জালা বই জল নেই, ওকে দিলে তুমি এসে কি খাবে? তাই আমি জল দিইনি বলে আমাদের পুকুরের সব জল খেয়ে ফেলেছে!'

বলতে-বলতে তারা দুজনে সেই চাকরের কাছে এল। সেখানে এসে সে মেয়েটি ভয়ানক নাক সিঁটকিয়ে বললে, 'উঃ হুঁহ! কি গন্ধ! দেখ বাবা, একটা পচা ইঁদুর না কি পুঁটুলিতে বেঁধে এনেছে!'

এই বলে সে এক হাতে নাকে কাপড় দিয়ে, আর এক হাতের দু আঙুলে সেই হাতিসুদ্ধ পুঁটুলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে পুঁটুলি পড়ল গিয়ে একেবারে সেই গঙ্গায়!

আর মেয়ের বাপ করেছে কি! কষে কোমর বেঁধে মুখ খামাটি করে মেরেছে বামুনের চাকরের পেটে এক লাথি! সে কি যেমন তেমন লাথি! লাথির চোটে, সেই বটগাছের ছিপিসুদ্ধ তার পেটের সব জল বেরিয়ে ঘর-বাড়ি, জিনিসপত্র, মেয়ে-টেয়ে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল! বাকি রইল খালি মেয়ের বাপ আর বামুনের চাকর। তখন তারা দুজনে মিলে কোলাকুলি করতে লাগল।

কোলাকুলি শেষ হলে সেই মেয়ের বাপ বললে, 'আরে ভাই, তোর মতন জোয়ান তো আর কোথাও দেখিনি! এক পুকুর জল খেয়ে সব শেষ করলি!'

বামুনের চাকর বললে, 'ভাই, তোর মতন জোয়ানও তো আমি আর কোথাও দেখিনি।

এক লাথিতে আমার পেট হালকা করে দিলি!'

এই কথা নিয়ে তখন তাদের মধ্যে ভারি তর্ক আরম্ভ হল। এ বলে তুই বেশি জোয়ান, ও বলে তুই বেশি জোয়ান। এখন কার কথা ঠিক, তা কে বলবে।

অনেক তর্ক করে তারা এই ঠিক করলে, 'চল একটা খুব বড় বাজারে গিয়ে দুজনে কুস্তি লড়ি, তাহলেই দেখা যাবে কে বেশি জোয়ান!'

এই বলে তারা দুজন কুস্তি লড়তে বাজারে চলেছে, এমন সময় এক মেছুনীর সঙ্গে তাদের দেখা হল। মেছুনী ঝুড়িতে করে মাছ নিয়ে বাজারে বেচতে যাচ্ছিল। তাদের দুজনকে দেখে জিগগেস করলে, 'হ্যাঁ গা, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

তারা বললে, 'বাজারে যাচ্ছি, কুস্তি লড়তে।'

তা শুনে মেছুনী বললে, 'বাজার তো ঢের দূর বাছা, এত কষ্ট করে তোরা সেখানে যাবি কি করতে? তার চেয়ে আমার ঝুড়ির ভিতর এসে কুস্তি কর। কুস্তি করতে করতে যার দিকে ঝুড়ি ঝুঁকে পড়বে, আমি জানব তারই হার হয়েছে।'

শুনে তারা দুজনে বললে, 'বাঃ, বেশ কথা! কুস্তিও করতে পাব, হাঁটতেও হবে না।'

এই বলে তারা মেছুনীর ঝুড়িতে ঢুকে কুস্তি আরম্ভ করল, আর মেছুনী সেই ঝুড়ি মাথায় করে বাজারে চলল।

এমন সময় এক কাণ্ড হয়েছে। সেই দেশে এক সর্বনেশে চিল থাকত। সে গরু, মহিষ, হাতি, ঘোড়া, যা পেত তাই ধরে গিলত। খালি সেই মেছুনীর কাছে সে জব্দ ছিল। মেছুনীর ঝুড়ি ধরতে এলেই, মেছুনী তাকে এমনি বকুনি দিত যে, সে পালাবার পথ পেত না। কিন্তু তাতে তার রাগ আরো বেড়ে যেত আর সে ভাবত যে, যেমন করেই হোক একদিন ঐ ঝুড়িটা কেড়ে নিতে হবে।

সেদিনও সেই চিল খাবার খুঁজতে বেরিয়েছে, দূর থেকে তার পাখার শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এক গোয়াল সাতশো মোষ মাঠে চরাতে এনেছিল। সে সেই শব্দ শুনে ভাবলে, 'সর্বনাশ! ঐ সেই চিল আসছে, আমার মোষ খেয়ে ফেলবে। এখন কি করি?'

এই ভেবে গোয়ালা সেই সাতশো মোষ ট্যাকে গুঁজে নিয়ে, ভোঁ-ভোঁ করে বাড়ির পানে ছুটল।

বাড়ির লোকে জিগগেস করল, 'কি হয়েছে? অত যে ছুটে এলে?'

সে বললে, 'ছুটব না! চিল আসছে যে, আমার মোষ খেয়ে ফেলবে।'

তারা বললে, 'তবে মোষ কোথায় রেখে এলে?'

সে বললে, 'রেখে আসব কেন? সঙ্গে এনেছি।'

তারা বললে, 'তবে কই মোষ?'

সে বললে, 'এই দেখ না।'

বলে সে ট্যাঁক খুলে দিল, আর সাতশো মোষ তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

তা দেখে তারা খুব খুশি হয়ে বললে, 'ভাগ্যিস তুমি ট্যাকে করে নিয়ে এসেছিলে, নইলে

আজ সব মোষ খেয়ে ফেলত।'

সেই চিল তো খাবার খুঁজতে বেরিয়েছে, আর মেছুনীর ঝুড়ির ভিতরে থেকে দুই পালোয়ান কুস্তি লড়ছে। মেছুনী খালি তাদের কথাই ভাবছে, চিলের কথা আর তার মনে নেই। ঠিক এমনি সময় চিল তাকে দেখতে পেয়ে ছোঁ মেরে তার মাথা থেকে ঝুড়ি নিয়ে পালাল।

সেই দেশের রাজার মেয়ে ছাতে বসেছিলেন। দাসী তাঁর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল।

রাজার মেয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখছেন, এমন সময় তাঁর চোখে কি যেন পড়ল।

রাজার মেয়ে চোখ বুজে বললেন, 'দাসী, দেখ দেখ, আমার চোখে কি পড়েছে!'

দাসী কাপড়ের কোণ পাকিয়ে, তাতে থুথু লাগিয়ে, তাই দিয়ে রাজকন্যার চোখের ভিতর থেকে ভারি চমৎকার একটি ছোট্ট কালো জিনিস বার করলে।

রাজার মেয়ের চোখে কি পড়েছে

রাজকন্যা বললেন, 'কি সুন্দর! কি সুন্দর! দাসী, এটা কি?'

দাসী বলতে পারলে না সেটা কি? বাড়ির ভিতরের সকলে দেখলে, কেউ বলতে পারলে না সেটা কি? রাজা এলেন, মন্ত্রী এলেন, তাঁরাও বলতে পারলেন না সেটা কি?

তখন রাজা বড়-বড় পণ্ডিতদের ডাকিয়ে আনলেন।

তাঁদের কাছে এমন সব কল ছিল, যা দিয়ে পিঁপড়েটাকে হাতির মতন দেখা যায়। সেই কলের ভিতর দিয়ে দেখে তাঁরা বললেন, 'এটা তো দেখছি একটা ঝুড়ি, তার ভিতরে কতকগুলি মাছ আছে, আর দুজন লোক কুস্তি লড়ছে।'

পিঁপড়ে আর পিঁপড়ীর কথা

এক পিঁপড়ে, আর তার পিঁপড়ী ছিল। পিঁপড়ী বললে, 'পিঁপড়ে আমি বাপের বাড়ি যাব, নৌকো নিয়ে এস।' পিঁপড়ে একটি ধানের খোসা ভাসিয়ে নিয়ে এল। পিঁপড়ী তা দেখে বললে, 'কি সুন্দর নৌকো! এস পিঁপড়ে, আমাকে বাপের বাড়ি নিয়ে চল।' পিঁপড়ে আর পিঁপড়ী ধানের খোসার নৌকোয় উঠে বসে, নৌকো ছেড়ে দিল। খানিক দূরে গিয়ে সেই নৌকো চড়ায় আটকে গেল। তখন পিঁপড়ে বললে, পিঁপড়ী, আমিও ঠেলি, তুমিও ঠেল।'

আমার কথাও ফুরিয়ে গেল।

❖

ছেলেদের রামায়ণ

গ্রন্থকারের নিবেদন

কয়েক বৎসব পূর্বে, 'ছেলেদেব বামাযণ' নাম দিয়া আমি একখানি ক্ষুদ্র শিশুপাঠ্য পুস্তক লিখি। উহারই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এখানি একখানি নতুন পুস্তক। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পব দেখা গেল যে, পুস্তকখানি শিশুদের উপযোগী করিতে গিয়া, বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত হওযাতে, মূল গল্পের সৌন্দর্য হানি ঘটিযাছে, এবং সেই দোষ পরিহার পূর্বক লিখিলে ইহাব কার্যকাবিতা বৃদ্ধি পাইবাব সম্ভাবনা; অতএব আবার নতুন করিয়া লিখিলাম।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয এই পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ দান ও সহাযতা কবিয়াছেন, সে ঋণ পরিশোধ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। পুস্তকের পাণ্ডুলিপি এবং প্রুফ তিনি আদ্যোপান্ত সংশোধন পূর্বক ইহার অনেক ত্রুটি দূর করিয়া দিয়াছেন।

তদ্ভিন্ন অনেক সহৃদয় মহাত্মা এই পুস্তক সম্বন্ধে আমাকে পরামর্শ দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। এ স্থলে আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি

২২ নং সুকিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা। — শ্রী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

১৮ই আশ্বিন, ১৩১৪।

আদিকাণ্ড

অনেক দিন আগে আমাদের এই ভারতবর্ষে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। সরযূ নদীর ধারে, অযোধ্যা নগরে তিনি রাজত্ব করিতেন।

সেকালের অযোধ্যা নগর আটচল্লিশ ক্রোশ লম্বা, আর বার ক্রোশ চওড়া ছিল। তাহার চারিদিকে প্রকাণ্ড দেওয়ালের উপরে লোহার কাঁটা দেওয়া ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল সাজানো থাকিত। সে অস্ত্রের নাম শতঘ্নী, কেন না তা ছুঁড়িয়া মারিলে একেবারে এক শত লোক মারা পড়ে।

তখনকার অযোধ্যা দেখিতে খুব সুন্দরও ছিল। ছায়ায় ঢাকা পরিষ্কৃত পথ, ফুলে ভরা সুন্দর বাগান, আর দামী পাথরের সাততলা আটতলা জমকালো বাড়িতে নগরটি ঝলমল করিত।

এই সুন্দর অযোধ্যা নগরে শাদা পাথরের বিশাল রাজপুরীতে শাদা ছাতার নীচে বসিয়া মহারাজ দশরথ তাঁহার রাজ্যের কাজ দেখিতেন। ধৃষ্টি, বিজয়, অকোপ, জয়ন্ত, সুমন্ত্র, সুরাষ্ট্র, ধর্মপাল আর রাষ্ট্রবর্ধন নামে তাঁহার আটজন মন্ত্রী এমন বিদ্বান বুদ্ধিমান আর ধার্মিক ছিলেন যে, তাঁহারা দেশে একটিও অন্যায় কাজ হইতে দিতেন না। সে দেশে চোর ডাকাত ছিল না। ভাল ছাড়া মন্দ কাজ কেহ করিত না। ভাল খাইয়া, ভাল পরিয়া, ভাল বাড়িতে থাকিয়া সকলেরই সুখে দিন কাটিত। রাজা দশরথ তাহাদিগকে এত স্নেহ করিতেন যে আর কোন রাজা তেমন করিতে পারিতেন না। দশরথকেও তাহারা তেমনি করিয়া ভালবাসিত।

হায়! এমন রাজা দশরথ, তাঁহার একটিও ছেলে ছিল না। ছেলে নাই বলিয়া তিনি ভারি দুঃখ করিতেন। একদিন তিনি মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, 'দেখ, আমি যজ্ঞ করিব। হয়ত তাহাতে খুশি হইয়া দেবতারা আমাকে পুত্র দিবেন।'

এ কথা শুনিয়া সকলে বলিল, 'মহারাজ, আপনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নিয়া আসুন। তিনি যজ্ঞ করিলে নিশ্চয়ই আপনার পুত্র হইবে।' এই মুনির হরিণের মত শিং ছিল, তাই লোকে তাঁহাকে ঋষ্যশৃঙ্গ বলিত। এমন ভাল মুনি কমই দেখা গেছে।

মন্ত্রীদিগের কথা শুনিয়া দশরথ বলিলেন, 'বড় ভাল কথা। ঋষ্যশৃঙ্গ যে আমার জামাই হন, কারণ তিনি আমার বন্ধু লোমপাদ রাজার মেয়ে শান্তাকে বিবাহ করিয়াছেন। আমি নিজেই তাঁহাকে আনিতে যাইব।'

লোমপাদ রাজার বাড়ি অঙ্গদেশে। দশরথ সেই অঙ্গদেশে গিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে লইয়া আসিলেন। তারপর যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

আগে হইল অশ্বমেধ যজ্ঞ। ঘোড়ার মাংস দিয়া এই যজ্ঞ করিতে হয়। প্রথমে একটা ঘোড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ঘোড়ার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অনেক লোকজনও চলিল, যাহাতে কেহ তাহাকে আটকাইতে না পারে। তাহারা ক্রমাগত এক বৎসর ঘোড়াটাকে নানা দেশ ঘুরাইয়া শেষে তাহাকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিল।

তত দিনে শত-শত কারিকর, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, মুটে, মজুর মিলিয়া সরযূর উত্তর ধারে যজ্ঞের জন্য চমৎকার জায়গা তৈয়ার করিয়াছে। সেখানে কত মুনি, কত ব্রাহ্মণ, কত রাজা আর অন্য লোকজন কত আসিয়াছে, তাহার লেখাজোখা নাই। মিথিলার রাজা জনক, অঙ্গ দেশের রাজা লোমপাদ, মগধের রাজা, পূর্বদেশের রাজা, সিন্ধু দেশের রাজা, সৌবীরের রাজা, সৌরাষ্ট্রের রাজা, আর কত বলিব! পৃথিবীর যত রাজার সঙ্গে দশরথের বন্ধুতা ছিল, সকলেই উপস্থিত।

ঘোড়া ফিরিয়া আসিলেই অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। যজ্ঞের কয়দিন সকলে কী আনন্দ করিয়া যে নিমন্ত্রণ খাইল, তাহা কী বলিব! যত চাহিয়াছে ততই খাইতে পাইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ভোজনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'মহারাজের জয় হউক।' ছেলেদের পেট ভরিয়া গেল, তবুও তাহারা বলিল, 'আরও খাইব।'

অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন, 'এরপর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলে মহারাজের ছেলে হইবে।'

তখনই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হইল। সেই যজ্ঞের আগুনের ভিতর হইতে একজন পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। তাঁহার শরীর পাহাড়ের মত উঁচু, রঙ কালো, চোখ লাল, দাড়ি গোঁফ সিংহের কেশরের মত, পরনে লাল কাপড়। তাঁহার হাতে রূপার ঢাকা দেওয়া সোনার থালা, তাহাতে চমৎকার পায়স। সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ দশরথকে বলিলেন, মহারাজ, ব্রহ্মা নিজে এই পায়স রাঁধিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা রাণীদিগকে খাইতে দাও, নিশ্চয় তোমার পুত্র হইবে।' এই বলিয়া তিনি কোথায় যে মিলাইয়া গেলেন, কেহ দেখিতে পাইল না।

দশরথের কী আনন্দ! এই পায়স রাণীদিগকে খাইতে দিলেই তাঁহার পুত্র হইবে। প্রধানা রাণী তিন জন—বড় কৌশল্যা, মেজ কৈকেয়ী, ছোট সুমিত্রা। দশরথ কী করিয়া তিন জনকে পায়স বাঁটিয়া দিলেন, বলিতেছি। প্রথমেই সেই পায়সের অর্ধেকটা লইয়া খানিক সুমিত্রার জন্য আর বাকি কৌশল্যার জন্য রাখিলেন, তারপর অন্য অর্ধেকেরও খানিকটা সুমিত্রার জন্য আর বাকিটা কৈকেয়ীর জন্য রাখা হইল। বেশ সহজ হিসাব।

তিন রাণীতে মিলিয়া মনের সুখে সেই পায়স খাইলেন। তাহার কিছুদিন পরেই তাঁহাদের দেবতার মত চারিটি ছেলে হইল— কৌশল্যার একটি, কৈকেয়ীর একটি, আর সুমিত্রার দুইটি।

দশরথের পুত্র হইয়াছে শুনিয়া যে সকলেই আনন্দিত হইল, তাহাতে আর সন্দেহ কী? ব্রাহ্মণ আর গরিব দুঃখীদের তো খুবই আনন্দ হইবার কথা, কারণ তাহারা অনেক টাকা-কড়ি পাইল।

ছেলে চারিটি এগারো দিনের হইলে পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনি তাঁহাদের নাম রাখিলেন। সকলের বড় ছেলেটি কৌশল্যার, তাঁহার নাম হইল রাম। তাহার পরেরটি কৈকেয়ীর, তাঁহার নাম হইল ভরত। আর দুটি সুমিত্রার, তাঁহাদের নাম হইল লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন।

ছেলে চারিটি যেমন সুন্দর, তেমনি বুদ্ধিমান, আর তেমনি তাঁহাদের মিষ্ট স্বভাব। ভাল ছেলের যতরকম গুণ থাকিতে হয় তাহার কিছুই তাঁহাদের কম ছিল না। অল্পদিনের ভিতরেই তাঁহারা যার-পর নাই বিদ্বান আর বীর হইয়া উঠিলেন। লেখায়, পড়ায়, যুদ্ধে, শিকারে কোন কাজেই তাঁহাদের মতন আর কেহ ছিল না।

ভাইকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহা রাম, লক্ষ্মণ, ভরত আর শত্রুঘ্নকে দেখিলে বুঝিতে পারিতে। তাহার মধ্যে আবার রামকে লক্ষ্মণ আর ভরতকে শত্রুঘ্ন আরও বেশি করিয়া ভালবাসিতেন। ইহাদিগকে দেখিলে সকলেই সুখী হইত। রাজা দশরথ যে কতখানি আনন্দিত হইতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

একদিন রাজা দশরথ পুরোহিত আর মন্ত্রীদিগকে লইয়া ছেলেদের বিবাহের পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময় বিশ্বামিত্র মুনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। মুনিদের ভিতরে বিশ্বামিত্রের মান বড়ই বেশি। তাঁহার মত তপস্যা খুব কম লোকেই করিয়াছে; তেমন ক্ষমতাও খুব কম লোকেরই আছে। তাহাতে আবার লোকটি বিলক্ষণ একটু রাগী। এরূপ লোককে যেমন করিয়া আদর যত্ন করিতে হয়, দশরথ তাহার কিছুই বাকি রাখিলেন না। তারপর তিনি বলিলেন, 'মুনিঠাকুর, আপনি যে আসিয়াছেন, ইহা আমার বড়ই সৌভাগ্য; আর ইহাতে আমি খুবই সুখী হইলাম। এখন আপনি কী চাহেন বলুন, আমি তাহাই দিতেছি।'

দশরথ ভাবিয়াছিলেন, মুনি টাকা-কড়ি চাহিবেন। কিন্তু মুনি যাহা চাহিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'মহারাজ, আমি যেজন্য আসিয়াছি তাহা শুন। আমি একটা যজ্ঞ করিয়াছিলাম, ইহার মধ্যে মারীচ আর সুবাহু নামে দুই রাক্ষস আসিয়া তাহাতে মাংস ঢালিয়া সব নষ্ট করিয়া দিয়াছে। শুনিয়াছি রাবণ নামে একটা ভয়ানক দুষ্ট রাক্ষস আছে, ইহারা তাহারই লোক। তুমি যদি দশ দিনের জন্য তোমার রামকে আমার সঙ্গে দাও, তবে সে রাক্ষসদুটাকে মারিয়া দিতে পারে। রাম ছাড়া আর কেহই এ কাজ করিতে পারিবে না। রাম এখন বড় হইয়াছে, আর বীরও যেমন-তেমন হয় নাই। রাক্ষসের সাধ্য কী যে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করে! তোমার কোন ভয় নাই। রামকে দিয়া আমার এ কাজটি করাইয়া দাও, ইহাতে ভাল হইবে।'

মুনির কথা শুনিয়াই তো দশরথ কাঁপিতে কাঁপিতে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। খানিক পরে একটু সুস্থ হইয়া তিনি বলিলেন, 'মুনিঠাকুর আপনার পায়ে পড়ি, আমি রামকে দিতে পারিব না। আমার রাম কি এ-সকল ভয়ানক রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে? না-হয় আমি নিজেই অনেক লোকজন লইয়া আপনার যজ্ঞে পাহারা দিব। রামকে ছাড়িয়া দিন।' ইহাতে বিশ্বামিত্র এমনই রাগিয়া গেলেন যে, তাঁহার রাগ দেখিয়া দেবতারা পর্যন্ত অস্থির।

যে সর্বনেশে মুনি, ইঁহার আরও বেশি রাগ হইলে কি আর রক্ষা ছিল! কাজেই তখন বশিষ্ঠ মুনি রাজাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, শীঘ্র রামকে আনিয়া দিন, ইহাতে রামের ভাল হইবে। বিশ্বামিত্র যেমন তেমন মুনি নহেন, ইঁহার সঙ্গে যাইতে রামের কোনও ভয় নাই। তাহার ভালর জন্যই বিশ্বামিত্র তাহাকে লইতে আসিয়াছেন।' বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া দশরথের আর ভয় রহিল না। তিনি তখনই রাম আর লক্ষ্মণকে আনিয়া দিলেন।

যুদ্ধের পোশাক পরিয়া, তীর ধনুক খড়্গ লইয়া, বিশ্বামিত্রের পিছু-পিছু দুই ভাইকে যাইতে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। রাজা আর রাণীরা তাঁহাদের মাথায় চুমা খাইয়া তাঁহাদিগকে

আশীর্বাদ করিলেন; আর সকলেই বলিল, 'তোমাদের ভাল হউক!'

খানিক দূরে গিয়া বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন, 'বাছা রাম, ঐ সরযূর জলে মুখ ধুইয়া আইস। আমি তোমাকে 'বলা' আর 'অতি-বলা' নামক মন্ত্র দিব। এ মন্ত্র জানিলে তোমার পরিশ্রম বা অসুখ হইবে না, কেহ তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, আর যুদ্ধে সকলেই তোমার কাছে হারিয়া যাইবে।' রাম নদীতে মুখ ধুইয়া মুনির নিকট মন্ত্র লইলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, যেন তাঁহার শরীরের তেজ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

রাত্রি হইলে তিন জনে সরযূর ধারে ঘাসের উপর ঘুমাইয়া রহিলেন। সকালবেলা উঠিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন। সেদিনকার রাত্রি কাটিল অঙ্গদেশে মুনিদের আশ্রমে। এইখানে আসিয়া সরযূ নদী গঙ্গাব সহিত মিলিয়াছে। পরদিন মুনিরা একখানি সুন্দর নৌকা আনিয়া তাঁহাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন।

বাম-লক্ষ্মণেব উপবে পাথব ছুঁড়িয়া মাবিতে লাগিল

ওপারে ভয়ানক বন। সেই বনে তাড়কা নামে একটা রাক্ষসী থাকে। তাহার গায়ে হাজার হাতির জোর। আগে এখানে সুন্দর দেশ ছিল , তাহাতে কতই লোকজন বাস করিত। এই তাড়কা আর তাহার পুত্র মারীচ সেই-সকল লোকজনকে খাইযা দেশটি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এখন সেখানে ভয়ানক বন, সে বনে মানুষ গেলেই তাড়কা তাহাকে ধরিয়া খায়।

বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন, 'বাছা, রাক্ষসীটাকে মারিতে হইবে।' রাম বলিলেন, 'আচ্ছা।' এই বলিয়া তিনি ধনুকের গুণ ধরিয়া খুব জোরে টঙ্কার দিলেন। ধনুকের গুণ জোরে টানিয়া হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে 'টং' করিয়া একটা শব্দ হয়, তাহাকেই বলে 'টঙ্কার'। রাম ধনুকে এমনি টঙ্কার দিলেন যে, তাহা শুনিয়া বনের জন্তুরা মনে করিল বুঝি সর্বনাশ উপস্থিত।

সে শব্দে তাড়কাও প্রথমে চমকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরেই সে হাত তুলিয়া, হাঁ করিয়া, ঘোরতর গর্জন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। তখন ধুলায় চারিদিক অন্ধকার করিয়া সে রাম-লক্ষ্মণের উপরে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল।

কিন্তু রামের বাণের কাছে সে পাথর কিছুই নয়। তিনি পাথর তো আটকাইলেনই, তাহার উপর আবার রাক্ষসীর লম্বা হাতদুটোও কাটিয়া ফেলিলেন। তবুও কিন্তু সে ছুটিয়া আসিতে ছাড়ে না। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ তাহার নাক আর কান কাটিয়া দিলেন। তখন সে হঠাৎ কোথায় যে মিলাইয়া গেল, কিছুই বুঝা গেল না। হাত নাই তবুও বড় বড় পাথর ছুঁড়িয়া মারে, কিন্তু কোথায় আছে দেখা যাইতেছে না।

তখন রাম কেবল তাহার শব্দ শুনিয়াই সেই শব্দের দিকে তীর ছুঁড়িতে লাগিলেন। এমন ভয়ানক তীর ছুঁড়িতে লাগিলেন যে রাক্ষসী তাহার জীবনে আর কখনও এত তীর খায় নাই।

লুকাইয়া থাকিবার জো কী! তীরের জ্বালায় অস্থির হইয়া শেষটা তাহাকে দেখা দিতেই হইল। আর রামও অমনি এক বাণে একেবারে তাহার বুক ফুটা করিয়া দিলেন। তখন ভয়ানক চিৎকার করিয়া তাড়কা মরিয়া গেল।

দেবতারা আকাশ হইতে রামের যুদ্ধ দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। আর বিশ্বামিত্রের তো কথাই নাই। তিনি রামকে কি বলিয়া আশীর্বাদ করিবেন আর কী দিয়া সুখী করিবেন, তাহাই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। সে রাত্রি তাঁহাদের সেই বনেই কাটিল। সকালে উঠিয়া বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন, 'বাছা, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাই তোমাকে কতকগুলি আশ্চর্য অস্ত্র দিব। এ-সকল অস্ত্র থাকিলে কেহই তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে না।'

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র পূর্বমুখে বসিয়া মনে মনে অস্ত্রদিগকে ডাকিতে লাগিলেন, আর অমনি নানারূপ আশ্চর্য এবং ভয়ঙ্কর অস্ত্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ইন্দ্রচক্র, ব্রহ্মশির, ঐষিক, ব্রহ্মাস্ত্র, ধর্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ, শুষ্ক অশনি, আর্দ্র অশনি, পৈনাক, নারায়ণ, শিখর, বায়ব্য, হয়শির, ক্রৌঞ্চ , কঙ্কাল, মুষল, কপাল, কিঙ্কিণী, নন্দন, মোহন, প্রস্বাপন, প্রশমন, বর্ষণ, শোষণ, সন্তাপন, বিলাপন, মাদন, মানব, তামস, সৌমন, সংবর্ত— আর কত নাম করিব! এ-সকল ছাড়া, আরও অনেকগুলি অস্ত্র, শক্তি, খড়গ, গদা, শূল, বজ্র ইত্যাদি বিশ্বামিত্রের ডাকে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা জোড়হাত করিয়া রামকে বলিল, 'রাম, আমরা এখন তোমার হইয়াছি, তুমি যাহাই বলিবে তাহাই করিব।' রাম একে-একে তাহাদের সকলের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, 'এখন যাও আমি যখন ডাকিব তখন আসিবে।' অস্ত্রেরা 'আচ্ছা তাহাই হইবে' বলিয়া যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানে চলিয়া গেল।

ইহার পর তাঁহারা একটা খুব সুন্দর স্থানে আসিলেন। সে স্থানটি দেখিয়া রাম বলিলেন, ' কী সুন্দর জায়গা! গুরুদেব, এখানে কে থাকেন?' বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'এই স্থানের নাম সিদ্ধাশ্রম। এখানে আগে কশ্যপ মুনি থাকিতেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী অদিতি দেবীর সহিত এক হাজার বৎসর এইখানে থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু নিজে তাঁহাদের পুত্র হইয়া জন্মেন। সেই ছেলের নাম বামন; তিনি অনেক আশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন। এখন আমি এই স্থানে থাকিয়া তপস্যা করি। এইখানে দুষ্ট রাক্ষসেরা আমাদের যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসে। সেই দুষ্টদিগকে তুমি মারিবে।'

এই কথা বলিতে না বলিতেই তাঁহারা আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর ঠিক হইল যে, পরদিন যজ্ঞ আরম্ভ হইবে।

যজ্ঞের দিন ভোরে উঠিয়া রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, 'মুনিঠাকুর, রাক্ষসেরা কখন আসিবে ঠিক করিয়া বলিয়া দিন।' বিশ্বামিত্র তখন চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, রাম লক্ষ্মণের কথায় কোন উত্তর দিলেন না। অন্য মুনিরা বলিলেন, 'রাজপুত্র, উনি মৌনে বসিয়া আছেন। উঁহাকে ছয় রাত্রি ঐরূপ চুপ করিয়া থাকিতে হইবে, কথা বলিতে পারিবেন না। এই ছয় রাত্রি তোমরা খুব সাবধান হইয়া তপোবন পাহারা দাও।' রাম লক্ষ্মণ তখনই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পাহারা দিতে আরম্ভ করিলেন। দিন নাই, রাত নাই, চোখে ঘুম নাই, খালি কখন রাক্ষস আসে সেইদিকেই তাঁহাদের মন।

এইরূপে পাঁচ দিন চলিয়া গেল। ছয় দিনের দিন তাঁহারা আরও বেশি করিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। এমন সময় দপ্ করিয়া যজ্ঞের বেদী জ্বলিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ভয়ানক শব্দ, আর যজ্ঞের জায়গায় রক্ত-বৃষ্টি। তখন রাম উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, মারীচ আর সুবাহুর সঙ্গে বড় বড় বিকটাকার রাক্ষসেরা দল বাঁধিয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিয়াছে।

তাহা দেখিয়া রাম মারীচের বুকে মানবাস্ত্র নামক বাণ ছুঁড়িয়া মারিলেন। বাণের চোটে সে বেচারা অজ্ঞান হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে একশত যোজন দূরে সমুদ্রে গিয়া পড়িল। তারপর রাম আগ্নেয়াস্ত্র ছুঁড়িলে তাহার ঘা খাইয়া সুবাহু সেইখানেই পড়িয়া মরিল। বাকি রাক্ষসগুলিকে মারিতে খালি বায়ব্য অস্ত্র ছাড়া আর কিছুর দরকার লাগে নাই। তখন মুনিগণের যে কি আনন্দ হইল, তাহা কি বলিব!

অনেক পরিশ্রমের পর সে রাত্রিতে লতা-পাতার বিছানায় রাম লক্ষ্মণ বড়ই সুখে ঘুমাইলেন। পরদিন সকালে মুনিরা বলিলেন, 'চল বাবা, মিথিলায় যাই। সেখানকার রাজা জনক যজ্ঞ করিবেন, তাহা দেখিতে হইবে। আর সেখানে একখান' ভয়ঙ্কর ধনুক আছে, তাহাতে এত জোর যে, দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস, মানুষ কেহই তাহাতে গুণ দিতে পারে নাই; সেই ধনুকখানাও দেখিতে হইবে।' এই বলিয়া মুনিরা মিথিলায় যাইবার জন্য জিনিসপত্র বাঁধিয়া লইলেন। জিনিস নিতান্ত কম ছিল না, একশতখানা গাড়ি তাহাতেই বোঝাই হইয়া গেল।

সবুজ শস্যের ক্ষেতের মধ্য দিয়া তাঁহাদের চলিবার পথ। সে পথে যাইতে রাম লক্ষ্মণের বড়ই ভাল লাগিতেছিল। সেদিনকার রাত্রিতে তাঁহারা শোণ নদের ধারে আসিয়া রহিলেন। তাহার পরের রাত্রি গঙ্গার ধারে, তাহার পরের রাত্রি বিশালা নগরে কাটিল। চারি দিনের দিন সকালবেলায় তাঁহারা দূর হইতে মিথিলার সুন্দর রাজপুরী দেখিতে পাইলেন। ঐ স্থানের নিকটেই একটি অতি সুন্দর আর খুব পুরাতন আশ্রম ছিল। তাহা দেখিয়া রাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুদেব, এটি কাহার তপোবন? এখানে কেন লোকজন নাই?'

বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'বাছা, এটি গৌতম মুনির আশ্রম। গৌতমের স্ত্রী অহল্যা একবার একটা নিতান্ত অপরাধের কাজ করাতে গৌতম তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন, "তুই এইখানে ছাইয়ের উপর পড়িয়া থাক্। তোকে কেহ দেখিতে পাইবে না। বাতাস ভিন্ন তুই আর কিছু খাইতে পাইবি না। এইরূপে তোর অনেক বৎসর কাটিবে। তারপর যখন দশরথের পুত্র রাম এইখানে আসিবেন, তখন তাঁহার পূজা করিস। তাহা হইলে আবার তুই ভাল হইবি, আর আমিও ফিরিয়া আসিব।" এই বলিয়া গৌতম কৈলাস পর্বতে চলিয়া গেলেন। রাম, তুমি একবার এই আশ্রমের ভিতরে আইস। তাহা হইলে অহল্যা আবার ভাল হইতে পারেন।'

গৌতমের আশ্রমে গিয়া তাঁহারা অহল্যা দেবীকে দেখিতে পাইলেন। এত দিন ধরিয়া তিনি কেবলই তপস্যা করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার শরীরের এমন আশ্চর্য তেজ হইয়াছে যে দেবতারাও তাঁহার দিকে তাকাইতে পারেন না। এতদিন গৌতমের শাপে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। এখন রাম আসিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে দেখিল। অহল্যাকে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণ তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় করিয়া লইলেন। অহল্যাও গৌতমের কথা মনে করিয়া রামকে পূজা করিলেন। এদিকে গৌতম মুনি হিমালয়ে থাকিয়া তপস্যার দ্বারা সকল কথাই জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং তিনিও তখন সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। এইরূপে অহল্যার

দুঃখের শেষ হইল। তারপর গৌতম আর অহল্যা দুজনে মিলিয়া মনের সুখে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন।

গৌতমের আশ্রম হইতে মিথিলা বেশি দূরে নয়। সেখানে গিয়া সকলে দেখিলেন যে, জনক রাজা অতি চমৎকার যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। কত মুনি, কত লোকজন, কত গাড়ি ঘোড়া সেখানে আসিয়াছে, তাহা গণিয়া উঠা ভার। বিশ্বামিত্র তাঁহাদের থাকিবার জন্য সেই ভিড়ের এক কোণে একটি নিরিবিলি জায়গা খুঁজিয়া লইলেন। ততক্ষণে রাজা জনকও খবর পাইয়া বিশ্বামিত্রকে আদর করিবার জন্য সেখানে আসিয়াছেন; সঙ্গে তাঁহার পুরোহিত শতানন্দ মুনি।

বিশ্বামিত্রকে নানারূপ সম্মানে তুষ্ট করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মুনিঠাকুর, আপনার সঙ্গের এই ছেলেদুটি কী সুন্দর' আহা, যেন দুটি দেবতার ছেলে! এ দুটি কোন্ রাজার পুত্র? আর কি জন্য এত কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছেন?' বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'মহারাজ, ইঁহারা অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। সিদ্ধাশ্রমে রাক্ষসদিগকে মারিয়া, তারপর গৌতমের আশ্রমে অহল্যার কষ্ট দূর করিয়া এখানে আসিয়াছেন। এখন ইঁহাদের সেই শিবের ধনুক দেখিবার ইচ্ছা'।

জনকের পুরোহিত শতানন্দ মুনি গৌতমের বড় ছেলে। তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার মাতা আবার ভাল হইয়াছেন, তখন তাঁহার মনে কী সুখই হইল! তিনি রামকে কতই স্নেহ দেখাইলেন আর বিশ্বামিত্রের কত প্রশংসা করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিশ্বামিত্রই বামকে আনিযা তাঁহার মায়ের দুঃখ দূর করিয়াছেন।

পরদিন সকালবেলায় বিশ্বামিত্র জনককে বলিলেন, 'মহারাজ, সেই ধনুকখানি বাম লক্ষ্মণ একবার দেখিতে চাহেন'।

জনক বলিলেন, 'ধনুকের কথা বলি শুনুন। এই ধনুক আগে ছিল শিবেব। শিব একবার দেবতাদের উপর চটিয়া গিয়া এই ধনুক হাতে তাঁহাদিগকে তাড়া করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবতারা অনেক মিনতি করাতে খুশি হইয়া ধনুকখানা তাঁহাদিগকেই দিলেন। দেবতাবা আবার রাজা দেবরাতের নিকট তাহা রাখেন। এই দেবরাত আমার পূর্বপুরুষ।

'ইহার পর একদিন আমি লাঙ্গল দিয়া যজ্ঞের স্থান চষিতেছিলাম। এমন সময় আমার লাঙলের মুখের কাছে পৃথিবী হইতে একটি পরমা সুন্দরী কন্যা উঠিল। সেই মেয়েটি এতদিন আমার ঘরে থাকিয়া এখন বড় হইয়াছে। লাঙলের মুখে উঠিয়াছিল বলিয়া আমি তাহার নাম রাখিয়াছি সীতা। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, এই শিবের ধনুকে যে গুণ দিতে পারিবে তাহাকেই এই মেয়ে দিব।

'তারপর কত রাজা আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা ধনুকে গুণ দিবে কি, তাহা তুলিতেই পারে না। তখন তাহারা ভয়ানক চটিয়া গিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। আমি অনেক কষ্টে, দেবতাদের সাহায্য লইয়া শেষে শত্রুদিগকে তাড়াই। এখন সেই ধনুক আমি রাম লক্ষ্মণকে দেখাইব। রাম যদি তাহাতে গুণ দিতে পারেন, তবে তিনি সীতাকে পাইবেন।'

তখন জনকের হুকুমে ধনুকখানা বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আনা হইল। আট চাকার গাড়ির উপরে, লোহার সিন্ধুকের মধ্যে ধনুকখানি রহিয়াছে। তাহা টানিয়া আনিতে পাঁচ হাজার জোয়ান কাহিল! রাম সেই ধনুক দেখিয়া কহিলেন, 'এটাতে গুণ দিতে হইবে নাকি?' বিশ্বামিত্র আর জনক বলিলেন, 'হ্যাঁ'।

এত বড় ধনুক তুলিতে রামের একটু কষ্ট হইলেও তাঁহার নিন্দার কথা ছিল না। কিন্তু কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং সে কাজটা তাঁহার খুব সহজই বোধ হইল। যেই ধনুক তোলা, অমনি তাহাতে গুণ চড়ানো। তারপর গুণ ধরিয়া এক টান দিতেই, ধনুক ভাঙিয়া একেবারে দুইখান! এমনি সহজে রাম সেই ধনুক ভাঙিলেন।

কিন্তু রাম তাহা সহজে ভাঙিলেন বলিয়া তো ধনুকখানি সহজ ধনুক ছিল না! আর সে ধনুক ভাঙার ব্যাপারখানাও যেমন তেমন ব্যাপার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না;কারণ, তাহার শব্দে বিশ্বামিত্র, জনক আর রাম লক্ষ্মণ ছাড়া সকল লোক চিৎপাত হইয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। তখন জনক বলিলেন, 'রামের গায়ে আশ্চর্য জোর! এমন আর কাহারও নাই। আমি ইহার সঙ্গেই সীতার বিবাহ দিব।'

তখনই পত্র লইয়া দূতেরা দশরথকে আনিতে অযোধ্যায় চলিল। দশরথও তাহাদের মুখে সকল কথা শুনিয়া আর বিলম্ব করিলেন না। পরদিনই বশিষ্ঠ আর অন্য-অন্য পুরোহিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া তিনি মিথিলা যাত্রা করিলেন। ধন-রত্ন, গাড়ি-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত, কত সঙ্গে লইলেন তাহার লেখাজোখা নাই। মিথিলায় পৌঁছিতে তাঁহাদের চারি দিন লাগিল।

রাজায় রাজায় দেখা হইলে একটা খুবই ধূমধাম হইয়া থাকে। সে আর কত বর্ণনা করিব? কিন্তু আসল কাজের কথাটা, রামের বিবাহের কথা। সে-বিষয়ের পরামর্শ কিরূপ হইয়াছিল, বলিতেছি।

জনক রাজার আর একটি মেয়ে ছিল, তাহার নাম উর্মিলা। তাহা ছাড়া, জনকের ভাই রাজা কুশধবজের দুটি মেয়ে ছিল, তাহাদের নাম মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এই চারিটি ভাইয়ের সঙ্গে সীতা, উর্মিলা, মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি এই চারিটি বোনের বিবাহ হইলে বেশ ভাল হয়, না? সুতরাং স্থির হইল যে, রামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত উর্মিলার, ভরতের সহিত মাণ্ডবীর, আর শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্তির বিবাহ হইবে।

সুন্দর সময়ে অগ্নিসাক্ষী করিয়া মহা ধূমধামে শুভকার্য শেষ হইল; সেদিন মিথিলায় কী আনন্দই হইয়াছিল! যেদিকে তাকাও কেবলই আলো, আর নিশান, আর ধূপ-ধূনা, আর মুনিঠাকুর, আর শঙ্খ-ঘণ্টা, আর ঢাক-ঢোল;আর হাতি ঘোড়া, আর মিঠাই সন্দেশ, আর ভিখারী বৈষ্ণব, আর হাসি তামাশা, ছুটাছুটি, ভোজন, ভোজন, কোলাহল, কোলাহল, কোলাহল।

পরদিন সকালে বিশ্বামিত্র হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। দশরথও অযোধ্যায় যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। জনক প্রত্যেক মেয়েকে কী দিয়াছিলেন শুনিবে? প্রত্যেক মেয়েকে তিনি এক-এক লক্ষ গরু দিয়াছিলেন। আর হাতি, ঘোড়া, সিপাহি, সোনা, রূপা, মণি, মুক্তা, রেশমী কাপড়, কম্বল ইত্যাদি কত যে দিয়াছিলেন, আমি তাহার হিসাব দিতে পারিব না। ইহার উপর আবার এক-এক শত করিয়া সখী, এক-এক শত দাসী, আর এক-এক শত চাকর। এইরূপে আদর যত্ন করিয়া জনক সকলকে বিদায় করিলেন। দশরথও মনের সুখে অযোধ্যায় চলিলেন।

এমন সময় দেখ কী সর্বনাশ উপস্থিত! পাখিরা চ্যাঁচাইতেছে, জন্তুরা ছুটিয়া পালাইতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে, ঝড় বহিতেছে, গাছ ভাঙিয়া পড়িতেছে, সূর্য ঢাকিয়া গিয়াছে, চারিদিক অন্ধকার। সকলে ভয়ে অস্থির, না জানি এর পর কী বিপদ হইবে!

বিপদ যে কি, তাহা জানিতেও বিলম্ব হইল না;কারণ তখনই পরশুরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে মানুষ পথ দিয়া চলিবার সময় এমন কাণ্ড হয়, তিনি যে কেমন ভয়ঙ্কর লোক

তাহা বুঝিতেই পার। তাঁহার শরীরটা যেন একটা পাহাড়, চোখদুটো যেন আগুনের গোলা! হাতে একখানি ধনুক আছে, তাহা সেই জনক রাজার ধনুকের চেয়ে নিতান্ত কম নহে। আর একখানা কুড়াল যে আছে, তাহার কথা কি বলিব! কুড়াল কাঁধে ফিরেন বলিয়া তাঁহার 'পরশু' অর্থাৎ 'কুড়ুলে' রাম নাম হইয়াছে (পরশু অর্থে কুড়াল)। এই কুড়াল দিয়া তিনি, একবার নয়, দুবার নয়, ক্রমাগত একুশবার ক্ষত্রিয়দিগকে কাটিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়াছেন। তাহাদের অপরাধ এই যে, কার্তবীর্যার্জুন নামক তাহাদের একজন তাঁহার বাপ জমদগ্নি মুনিকে মারিয়া ফেলে।

এতদিনে তাঁহার রাগটা একটু কমিয়া গিয়াছে। এখন আর ক্ষত্রিয় দেখিলেই তাহাকে ধরিয়া মারেন না। কিন্তু রামের উপর তিনি বড়ই চটিয়া গিয়াছেন। তিনি আসিয়া রামকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়াই বলিলেন 'তুমি নাকি বড় বীর হইয়াছ? শিবের ধনুক ভাঙিয়াছ? বটে! আচ্ছা, আমি এই আর-একখানি ধনুক আনিয়াছি। এখানিতে একবার তীর চড়াইয়া টান দেখি! যদি পার, তবে তোমার সহিত যুদ্ধ করিব।'

ইহা শুনিয়া দশরথের বড় ভয় হইল। তিনি মনে করিলেন, না জানি এই সর্বনেশে মানুষ রামের কী ভয়ানক অনিষ্টই করিবেন! তাই তিনি রামকে ছাড়িয়া দিবার জন্য পরশুরামকে অনেক মিনতি করিলেন। কিন্তু পরশুরাম কি তাহা শোনেন! তিনি রামকে বলিলেন, 'বিশ্বকর্মা দু-খানি বড় ধনুক প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তাহার একখানি তুমি ভাঙিয়াছ, আর একখানি এই আমার হাতে আছে। এখানি সেখানার চেয়ে কম নয়। এখন বলিতেছি, আমার এই ধনুকখানিতে তীর চড়াও, দেখি তুমি কেমন ক্ষত্রিয়!'

ক্ষত্রিয়কে 'দেখি তুমি কেমন ক্ষত্রিয়' বলিলে বড়ই অপমানের কথা হয়। সে তাহা কিছুতেই সহিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই তখন রাম বলিলেন, 'আচ্ছা তবে দেখুন।' এই বলিয়া তিনি ধনুকখানি লইয়া তাহাতে গুণ দিলেন। তারপর একটি বাণ তাহাতে চড়াইয়া বলিলেন, মুনিঠাকুর, আপনি ব্রাহ্মণ, আমার গুরুলোক; তাই এই বাণ আমি আপনার উপর ছুঁড়িতে ইচ্ছা করি না; কেন না, তাহা হইলে আপনি মরিয়া যাইবেন। তবে আপনি তপস্যা করিয়া যে সকল জায়গা পাইয়াছেন, আমি ইচ্ছা করিলে তাহা নষ্ট করিয়া দিতে পারি, না হয় আপনার আকাশে চলাফেরার পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারি। এখন বলুন ইহার কোন্‌টা করিব?

এতক্ষণে পরশুরামের সে রাগ নাই। তিনি খুবই জব্দ হইয়া গিয়াছেন। তাই তিনি নরম হইয়া বলিলেন, 'রাম, আমার তপস্যায় পাওয়া স্থানগুলিই না হয় নষ্ট করিয়া দাও, কিন্তু আমার পথ আটকাইও না। তোমার ভাল হউক। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি যে-সে লোক নহ।' সুতরাং রাম তীর ছুঁড়িয়া পরশুরামের তপস্যায় পাওয়া জায়গাগুলি নষ্ট করিয়া দিলেন; তাঁহার পথ আটকাইলেন না। তখন পরশুরাম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, আর আর সকলে অযোধ্যায় চলিয়া আসিল।

তারপর রাণীরা কত আদর করিয়া বউ ঘরে লইলেন সে আর বেশী করিয়া কি বলিব? সে সময় পূজা অর্চনা, গান বাজনা, আমোদ আহ্লাদ অবশ্যই হইয়াছিল। রাণীরা বউদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বসন ভূষণ কত কী দিয়াছিলেন, সে খবর কে রাখে!

আমি কেবল ইহাই জানি যে, ইহার কিছুদিন পরে ভরত আর শত্রুঘ্ন মামার বাড়ি বেড়াইতে গেলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড

রাজা দশরথের বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইয়াছে। এত বয়স হইলে কতখানি বুড়ো হয় বুঝিতে পার। কাজেই তিনি এখন আর রাজ্যের কাজের জন্য আগের মতন পরিশ্রম করিতে পারেন না। আর রামও এতদিনে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জোরে, সাহসে, —যত রকম গুণ হইতে পারে, সকল গুণেই—সকলের বড় হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা দেখিয়া দশরথ একদিন মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, 'আমি এখন বুড়ো হইয়াছি, আর কতদিনই বা বাঁচিব। তাই আমি মনে করিতেছি যে রামকে যুবরাজ করিয়া দেই।' এই বলিয়া তিনি মন্ত্রী পাঠাইয়া দেশ বিদেশে সংবাদ দিলেন, 'আমি একটা মস্ত সভা করিব।'

খবর পাইয়া পৃথিবীর যত ভাল ভাল রাজা আর বড় লোক সকলে দশরথের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সভায় দশরথ বলিলেন, 'দেখ, এতদিন আমি যতদূর পারিয়াছি রাজ্যের কাজ করিয়াছি। এখন আমার অনেক বয়স হইয়াছে, চুল পাকিয়া গিয়াছে, গায়ের জোর কমিয়া গিয়াছে। এই বুড়া বয়সে আমি আর রাজ্যের জন্য এত পরিশ্রম করিতে পারি না। আমার রাম এখন বড় হইয়াছেন, আর তাঁহার গুণের কথা তোমরা সকলেই জান। এজন্য আমি এখন তাঁহার হাতে রাজ্যের ভার দিতে চাহিতেছি। তাহাতে তোমবা কী বল?'

এ কথায় সকলে বলিল, 'মহারাজ, রামের গুণের কথা কী বলিব! পৃথিবীতে এমন আর নাই! দেশের লোক রামকে যে কত ভালবাসে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আপনি রামকে যুবরাজ করিয়া দিন, দেখিয়া আমাদের চক্ষু জুড়াক।'

তখন দশরথ বলিলেন, 'সুন্দর চৈত্র মাস আসিতেছে; বনে ফুল ফুটিয়াছে। আপনারা শীঘ্র আয়োজন করুন। এই সুন্দর সময়ে রামকে যুবরাজ করিতে হইবে!' এই কথা শুনিয়া সভার লোক এতই আনন্দিত হইল যে, তাহাদের কোলাহলে সভার ঘর ফাটে আর কি!

দশরথের কথায় মন্ত্রী সুমন্ত্র তখনি রামকে লইয়া আসিলেন। দশরথ পরম আদরের সহিত তাঁহাকে কাছে বসাইয়া বলিলেন, 'বাবা, তোমার যেমন গুণ, সকলে তোমাকে তেমনি ভালবাসে। এখন তুমি যুবরাজ হও, তাহা দেখিয়া সকলে সুখী হউক।' রামের যাহারা বন্ধু, তাহারা শুনিবামাত্র ছুটিয়া গিয়া কৌশল্যাকে খবর দিল। সে সংবাদে কৌশল্যা কিরূপ খুশি হইয়াছিলেন, আর তাহাদিগকে কত পুরস্কার দিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতেই পার।

স্থির হইল যে, পরদিনই রামকে যুবরাজ করা হইবে। সে সংবাদে অযোধ্যায় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। অযোধ্যার লোকেরা মনের আনন্দে আর ঘরের ভিতরে না থাকিতে পারিয়া পথে আসিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। গাড়ি ঘোড়া লইয়া আর চলিবার জো রহিল না। সকলের মুখে খালি রামের কথা! কেহ বলিতেছে, 'বাঃ, মহারাজ কী ভাল কাজই করিলেন!', কেহ বলিতেছে, 'মহারাজ চিরজীবী হউন।'

রাণী কৈকেয়ীর একটা দাসী ছিল। তাহার নাম ছিল মন্থরা;কিন্তু তাহার পিঠে একটা মস্ত কুঁজ ছিল বলিয়া সকলে তাহাকে কুঁজী বলিয়া ডাকিত। যেমন কদাকার চেহারা, তেমনি তাহার কুটিল মন ছিল। উহার ঐ মস্ত কুঁজটার ভিতরে বুঝি খালি হিংসা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কৈকেয়ী ঐ দাসীটিকে বাপের বাড়ি হইতে আনিয়াছিলেন, কাজেই তাহাকে বড় আদর করিতেন।

সকালবেলা লোকের কলরব শুনিয়া কুঁজী ছাতে উঠিয়া দেখিতে গেল কিসের গোলমাল। সেখানে গিয়া দেখিল যে, রাস্তায় চন্দনের জল আর পদ্মের পাপড়ি ছড়ানো হইয়াছে, নিশান উড়িতেছে, আর চারিদিকে কেবল গান বাজনা আর কোলাহল শুনা যায়। ইহাতে কুঁজীর মনে বড়ই ভাবনা উপস্থিত হইল। উহার কাছেই একটি ঝি রেশমী কাপড় পরিয়া হাসিমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। কুঁজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ গা, রামের মা কৌশল্যা কিসের জন্য লোককে এত টাকা দিতেছে? ও যে কৃপণ, তবুও এমন করিয়া টাকা দিতেছে, ব্যাপারখানা কী?' ঝি বলিল, 'কাল যে রাম যুবরাজ হইবেন।'

এই কথা শুনিয়া আর কি কুঁজী হিংসায় স্থির থাকিতে পারে? সে হিংসায় যে তার কুঁজ তখন ফাটিয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য! ফাটিলে ভালই ছিল। কৈকেয়ী তখন শুইয়া ছিলেন! কুঁজী সেখানে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তাড়া — কি তাড়া! 'বড় যে শুইয়া আছ? দেখিতেছ না যে তোমার সর্বনাশ হইয়া গেল? শীঘ্র উঠ!'

কুঁজীর রাগ দেখিয়া কৈকেয়ী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'কী হইয়াছে মন্থরা? আমার কোন বিপদ হইয়াছে কি? তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন?' মন্থরা দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিল, 'তোমার যাতে সর্বনাশ হয় তাহাই হইয়াছে! কাল মহারাজ রামকে যুবরাজ করিবেন!'

এ কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর এত আনন্দ হইল যে তিনি তখনই একখানা দামী গহনা কুঁজীকে পুরস্কার দিয়া ফেলিলেন। কুঁজী তাহা দূরে ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'কী বোকা! এমন বিপদে পড়িয়াও আবার আমোদ করিতেছ! রাম রাজা হইলে ভরতের সর্বনাশ হইবে না বুঝি? আর তুমিও বুঝে তখন কৌশল্যা রাণীর দাসী হইয়া থাকিবে না?'

কৈকেয়ী বলিলেন, 'মন্থরা, রাম বড়ই ধার্মিক, আর তিনি যখন বড় ছেলে তখন তাঁহারই তো রাজ্য পাওয়া উচিত। রাম আমাকে যেমন যত্ন করেন ভরতও তেমন করে না। আমি ভরতকে যেমন ভালবাসি, রামকেও তেমনি ভালবাসি। রাম রাজা হইলে দেখিবে, তিনি ভাইদিগকে কত সুখে রাখিবেন।'

কুঁজী লম্বা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'হায় হায়, এ কেমন মেয়ে গো! আমি তোমার ভালোর জন্য এত করি, আর তুমি আমার কথায় কানই দাও না! রাম রাজা হইলে নিশ্চয় ভরতকে তাড়াইয়া দিবে, না হয় মারিয়া ফেলিবে;আর সেই রামের যে মা, কৌশল্যা রাণী, তাহাকে তো এতদিন তুমি অগ্রাহ্যই করিয়াছ। সে কি তখন তাহার শোধ লইতে ছাড়িবে? তাই বলি,

এই বেলা যাহাতে ভরত রাজ্য পায় আর রাম বনে চলিয়া যায়, তাহার উপায় দেখ।'

হায় হায়, কুঁজী হতভাগী কেন পৃথিবীতে জন্মিয়াছিল? কৈকেয়ীর মন তো আগে মন্দ ছিল না! দুষ্ট কুঁজীই তো তাঁহার ভিতরে হিংসা ঢুকাইয়া দিল। কুঁজী যখন 'ভরতকে রাম মারিয়া ফেলিবে' বলিয়া ভয় দেখাইল, তখন কৈকেয়ী বলিলেন, 'মন্থরা আজই আমি রামকে বনে পাঠাইয়া ভরতকে রাজা করিব। এখন এই কাজটি কেমন করিয়া হইতে পারে বল।'

কুঁজী বলিল, 'সেকি! তুমি কি সব ভুলিয়া গিয়াছ? সেই যে দণ্ডক-বনের ভিতরে বৈজয়ন্ত নগরে সম্বর অসুর ছিল, দেবতাদের সঙ্গে তাহার ভয়ানক যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে আমাদের রাজা দেবতাদের সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, তোমাকে সঙ্গে নিয়াছিলেন। রাজা ভয়ানক অস্ত্রের ঘা খাইয়া যুদ্ধের জায়গাতেই অজ্ঞান হইয়া গেলেন, তখন তুমিই তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া আসিয়া বাঁচাইলে। তাহাতে তিনি তোমাকে দুইটি বর দিতে চাহিলেন;তুমি বলিলে, "যখন ইচ্ছা হয় লইব"। এ-সকল কথা তো তোমার মুখেই শুনিয়াছি। এখন কেন সেই বর চাহিয়া লও না? এক বরে রামকে বনে পাঠাও, আর এক বরে ভরতকে রাজা কর। তাহা হইলেই আপদ চুকিয়া যাইবে। এক কাজ কর। তুমি ময়লা কাপড় পরিয়া, মুখ ভার করিয়া, মেঝেতেই পড়িয়া থাক। রাজা আসিলে কথাটিও কহিবে না, খালি রাগ করিবে আর কাঁদিবে। রাজা তোমাকে যে ভালবাসেন! তোমার রাগ দেখিলে নিশ্চয়ই ভয় পাইবেন, আর যাহা চাও তাহাই দিয়া তোমাকে খুশি করিবেন। কিন্তু খবরদার! আগে রাজার মুখ দিয়া এই কথাটি বাহির করিয়া লইবে যে তুমি যাহা চাও তাহাই তিনি দিবেন। এইরকম করিয়া তাঁহাকে কথায় আটকাইয়া তারপর বর দুইটি চাহিবে। তাহা হইলে আর তাঁহার "না" বলিবার জো থাকিবে না।'

এইরূপ করিয়া কুঁজী কৈকেয়ীর মন একেবারে খারাপ করিয়া দিল। তখন তাঁহার মুখে কুঁজীর প্রশংসা আর ধরে না! এরপর ময়লা কাপড় পরিয়া, গহনা ভাঙিয়া, রাগের ভরে মেঝেতে শুইতে আর কতক্ষণ লাগে।

এদিকে রাজা দশরথ রামের সংবাদ লইয়া কৈকেয়ীর মহলে আসিয়া দেখেন—কৈকেয়ীর মুখে কথা নাই, গায়ে অলঙ্কার নাই, তিনি মেঝেতে পড়িয়া কেবলই কাঁদিতেছেন। কী সর্বনাশ! কৈকেয়ীর কী হইয়াছে? কে তাঁহার এমন দশা করিল? বেচারা বুড়া রাজা ব্যস্ত হইয়া এইরূপ কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে কৈকেয়ীর কী হইয়াছে: রাজা কত মিষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কৈকেয়ী, তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে? না কেহ তোমাকে কিছু বলিয়াছে? না তুমি কাহারও উপর রাগ করিয়াছ?' কৈকেয়ী কোন কথারই উত্তর দিলেন না।

শেষে রাজা বলিলেন, 'তোমার কি কিছু চাই? বল সেটা কোন্ জিনিস, এখনই তাহা দিতেছি।' তখন কৈকেয়ী বলিলেন, 'আগে প্রতিজ্ঞা কর দিবে, তবে বলিব।' রাজা বলিলেন, 'এই পৃথিবীতে রামের মতন আমি কাহাকেও ভালবাসি না। সেই রামের নাম লইয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি যাহা চাইবে তাহাই দিব।'

এ কথা শুনিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, 'দেবতারা শুনুন, রাজা কী প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। মহারাজ, সেই দেবাসুর যুদ্ধের কথা মনে কর। সেই যে তুমি ভয়ানক ঘা খাইয়াছিলে, আর আমি তোমাকে বাঁচাইয়াছিলাম। তখন যে আমাকে দুটি বর দিতে চাহিয়াছিলে, আর আমি

বলিয়াছিলাম দরকার হইলে লইব, আজ সেই দুই বর আমাকে দিতে হইবে। এখন তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি না দাও তবে আমি নিশ্চয় মরিয়া যাইব।'

নিষ্ঠুর কৈকেয়ী বুঝিয়াছিলেন যে রাজা একবার 'দিব' বলিলে আর প্রাণ গেলেও 'দিব না' বলিতে পারিবেন না। তাই এখন সময় বুঝিয়া বলিলেন, 'রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য সন্ন্যাসী সাজাইয়া দণ্ডক বনে পাঠাইতে হইবে, আর ভরতকে রাজা করিতে হইবে।'

হায়, কী নিষ্ঠুর কথা! সেই ভয়ানক কথা শুনিয়াই দশরথ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। খানিক পরে একটু জ্ঞান হইল। তখন তিনি ভয়ানক রাগের সহিত কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ওরে নিষ্ঠুর দুষ্ট কৈকেয়ী, রাম তোর কি করিয়াছে? রাম এমন করিয়া তোর সেবা করে, আর তুই কি না তাহার সর্বনাশ করিতে বসিয়াছিস? কোন দোষে আমি রামকে তাড়াইব? হায় হায়, রাম গেলে আমি বাঁচিব কেমন করিয়া!'

এইরূপে কৈকেয়ীকে বিস্তর গালি দিয়া, তারপর দশরথ অতিশয় কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, 'কৈকেয়ী, তোমার পায়ে পড়ি, এমন কথা মুখে আনিও না! রাম তোমার যেমন সেবা করে, ভরতও তো তেমন করে না। আর বড় ছেলেই যে রাজা হয়, তাহাও তো তুমি জান। আমার রামের কত গুণ! এমন রামকে তোমার জন্য এরূপ নিষ্ঠুর কথা আমি কী করিয়া বলিব?'

শেষে তিনি আবার বিনয় করিয়া বলিলেন, 'কৈকেয়ী, আমি বুড়া হইয়াছি, আর বেশীদিন বাঁচিব না। আমাকে দয়া কর! আমার আর যাহা আছে সকলই দিতেছি; তোমার পায়ে পড়ি রামকে ছাড়িবার কথা আমাকে বলিও না!'

দশরথ এইরূপে কত দুঃখ কত মিনতি করিলেন, কতবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর কৈকেয়ীর কিছুতেই দয়া হইল না। তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, একবার বর দিয়া আবার এমন করিয়া কাঁদিতেছ? তুমি তো খুব ধার্মিক দেখিতেছি লোকে শুনিলে বলিবে কী? তুমি যাহাই বল, ও-বর আমি কিছুতেই ছাড়িব না। রামকে যদি তুমি রাজা কর তবে তখনই আমি বিষ খাইয়া মরিব।'

আহা, বুড়া বেচারার কষ্ট! এমন দুঃখ আর কেহ কি কখন পাইয়াছে? রাজা কখনও কাঁদেন, কখনও কৈকেয়ীকে গালি দেন। কখনও বলেন, 'হায়, কৌশল্যা কী বলিবেন?' কখনও বলেন, 'হায় সীতার কী দশা হইবে?' কখনও আবার অজ্ঞান হইয়া যান। জ্ঞান হইলে আবার কখনও কৈকেয়ীকে বকেন, কখনও রামের জন্য দুঃখ করেন। একবার কৈকেয়ীর পা ধরিতে গেলেন, কিন্তু ততক্ষণ তাঁহার জ্ঞান রহিল না।

এইরূপ করিয়া সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। কৈকেয়ীর দয়া হওয়া দূরে থাকুক, তিনি আরও বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ, সত্য কথা বল বলিয়া যে বড় অহঙ্কার করিয়া থাক, এখন আমাকে বর দিবার বেলা তাহা কোথায় গেল?' রাত ভোর হইয়া গেল, তখনও সেই একই কথা, 'মহারাজ, প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এখন বর না দিয়া যাইবে কোথায়? শীঘ্র রামকে বনে পাঠাও, আর আমার ভরতকে রাজা কর!'

শেষে দশরথ বুঝিতে পারিলেন যে, আর রামকে বনে না দিয়া উপায় নাই। তখন তিনি বলিলেন, আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন আর কী বলিব? তোর যাহা ইচ্ছা কর। আমি কেবল একটিবার রামকে দেখতে চাই।'

ততক্ষণে সূর্য উঠিয়াছে, সেদিনকার কাজ আরম্ভ করিবার সময় হইয়াছে। রামকে যুবরাজ করিবার সকল আয়োজন প্রস্তুত। পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনি মন্ত্রী সুমন্ত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'সুমন্ত্র, সব প্রস্তুত, সকলেই আসিয়াছেন, সময়ও হইয়াছে, শীঘ্র মহারাজকে সংবাদ দাও।' সুমন্ত্র সংবাদ দিতে গেলেন। এদিকে যে সর্বনাশ হইয়াছে, তিনি তাহার কিছুই জানেন না। তিনি অন্যান্য দিনের মত গিয়া রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ, সব প্রস্তুত, এখন মহারাজের অনুমতি হইলেই রামকে যুবরাজ করা যায়।'

সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া রাজার দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তখন সুমন্ত্র চমকিয়া গিয়া দেখিলেন যে, রাজার চোখ লাল, আর তাঁহাকে বড়ই কাতর দেখা যাইতেছে। তিনি ইহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মনের দুঃখে কেবল জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজার কথা করিবার শক্তি নাই। তাহা দেখিয়া মিথ্যাবাদী কৈকেয়ী নিজেই কহিলেন, 'দেখ সুমন্ত্র, রাজার মনে কিনা বড়ই আনন্দ হইয়াছে, তাই রাত্রে তাঁহার ঘুম হয় নাই। এখন তিনি একটু ঘুমাইবেন। তুমি রামকে এইখানে লইয়া আইস।' একথায় সুমন্ত্র রামকে আনিতে গেলেন।

রাম তাঁহার নিজের বাড়িতে সীতার কাছে বসিয়া আছেন, এমন সময় সুমন্ত্র সেখানে গিয়া বলিলেন, 'যুবরাজ, মহারাজ আর রাণী কৈকেয়ী আপনাকে দেখিতে চাহেন; শীঘ্র সেখানে চলুন।' রাম তখনই তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসিলেন। আসিবার সময় পথের লোকেরা তাঁহার কতই প্রশংসা করিতে লাগিল, কতই আশীর্বাদ করিল।

রাজা দশরথ ভয়ানক দুঃখে অবশ হইয়া আছেন; কৈকেয়ী কাছে বসিয়া আছেন। এমন সময় রাম আসিয়া তাঁহাদের দু-জনকে প্রণাম করিলেন। দশরথ কেবল একটিবার তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'রাম!' আর কথা বাহির হইল না; খালি চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রামের মনে কী পর্যন্ত দুঃখ আর চিন্তা হইল, সহজেই বুঝিতে পার। তিনি কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, আমি কি না জানিয়া কোন দোষ করিয়াছি? বাবা কেন কথা কহিতেছেন না? তাঁহাকে কেন এমন কাতর দেখিতেছি? কোনও মন্দ সংবাদ আসিয়াছে কি? আপনি তো বাবাকে কিছু বলেন নাই?'

কৈকেয়ী বলিলেন, 'তোমার বাবার রাগও হয় নাই, কোন বিপদও হয় নাই। রাজার একটা কাজ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তোমার ভয়ে তাহা বলিতে পারিতেছেন না। রাজা যখন কাজটা করিবেন বলিয়াছেন, তখন তুমি কিন্তু তাহাতে কোনরূপ বাধা দিও না; তাহা হইলে যে পাপ হইবে!' রাম বলিলেন, 'মা, এমন কথা কেন বলিতেছেন? বাবা যে কাজ করিবেন বলিয়াছেন, আমি কখনই তাহাতে বাধা দিব না। বাবার কথা কি অমান্য করিতে পারি?'

তাহা শুনিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, 'কথাটি বাপু আর কিছুই নয়। তোমার বাবা আগে আমাকে দুটি বর দিবেন বলিয়াছিলেন, সেই বর আমি আজ চাহিয়াছি। একটা বর এই যে, তুমি মাথায় জটা লইয়া গাছের ছাল পরিয়া, চৌদ্দ বৎসরের জন্য দণ্ডক বনে যাইবে। আর একটা বর চাহিয়াছি যে এই যে সব আয়োজন হইয়াছে, তাহা দিয়া ভরতই রাজা হইবে। তুমি বাছা রাজ্যের লোভ ছাড়িয়া দাও। মহারাজের কষ্ট হইতেছে বলিয়া মুখে এ সকল কথা বলিতে পারিতেছেন না, তাই আমি বলিলাম। পিতার কথা তোমার রাখা উচিত।'

এ কথা শুনিয়া দশরথ দুঃখের নিশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু রাম একটুও দুঃখিত না হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা মা, তাহাই করিব। এমন কী কাজ আছে, বাবা বলিলে যাহা না করিতে পারি?

আজই ভরতকে আনিতে দূত পাঠাইয়া দিন। আমিও আজই বনে চলিয়া যাইতেছি। কিন্তু বাবা কেন, নিজে আমাকে এ কথা বলিলেন না?'

কৈকেয়ী বলিলেন, 'বেশ বেশ, ভরতকে আনিতে আজই ঘোড়ায় চড়িয়া লোক যাইবে। আর তুমিও দেখিতেছি বনে যাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছ। শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও! মহারাজের বড় লজ্জা হইয়াছে, তাই কথা বলিতেছেন না। কিন্তু তুমি যতক্ষণ চলিয়া না যাইতেছ, ততক্ষণ তাঁহার স্নানাহার নাই।'

এই কথা শুনিয়া দশরথ 'হায় হায়' করিতে করিতে আবার অজ্ঞান হইয়া গেলেন। বনে যাইবার কথায় রামের কোন কষ্টই হয় নাই, কিন্তু পিতার দুঃখে তিনি অস্থির হইলেন 'হায়, পিতার একটু সেবাও করিতে পারিলাম না, কারণ এখনই বনে যাইতে হইবে!' কাজেই কোন রকমে রাজাকে একটু তুলিয়া বসাইয়া তাঁহাকে সেখান হইতে চলিয়া আসিতে হইল।

কৈকেয়ীর ব্যবহারে লক্ষ্মণ রাগে অস্থির হইয়া উঠিলেন, কিন্তু রামের কিছুমাত্র দুঃখের ভাব দেখা গেল না। তিনি লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে কৌশল্যার বাড়িতে চলিলেন। সেখানে মেয়েরা সুন্দর সাজ পোশাক পরিয়া তাঁহারই জন্য আমোদ আহ্লাদ করিতেছিল। তাহা দেখিয়াও তাঁহার দুঃখ হইল না। তাঁহার মনে কেবল এই ভাবিয়া দুঃখ হইল যে, তিনি গেলে হয়ত তাঁহার পিতা মাতা মরিয়া যাইবেন।

রামের বনবাসের কথা ততক্ষণে অনেকেই শুনিয়াছে, আর সকলেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাজার নিন্দা করিতেছে। কিন্তু মা কৌশল্যা তখনও ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। রাম যুবরাজ হইবেন তাহাই তিনি জানেন;আর তাঁহারই জন্য মনের সুখে দেবতার পূজা করিতেছেন। এমন সময় রাম সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কৌশল্যা আনন্দে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, 'বাবা, আজ তুমি যুবরাজ হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, অনেক দিন সুখে বাঁচিয়া থাক। ধর্মে তোমার মতি হউক, আর সকলে তোমাকে ভালবাসুক।'

রাম বলিলেন, 'মা, তোমার বড় দুঃখের সময় আসিয়াছে। তুমি তো জান না, মা, আমি এখনই দণ্ডকবনে যাইব। মহারাজ ভরতকে রাজ্য দিবেন, আমাকে তপস্বীর বেশ ধরিয়া চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে যাইতে হইবে।'

আমরা অনেক সময়ে লোকের কষ্ট বুঝিতে পারি। কিন্তু হায়, আমাদের এমন কী সাধ্য আছে যে, মা কৌশল্যার প্রাণের কষ্ট বুঝিতে পারিব? তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন, সকলে সেবা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিল। জ্ঞান হইলে পর তিনি বলিলেন, 'বাছা রাম, তুমি যদি না হইতে তবে আমার এত কষ্ট হইত না। এখন তোমাকে হারাইয়া আমি কী করিয়া বাঁচিব? হায় হায়, আমার বুকটা কি লোহার, যে এত দুঃখেও ফাটিয়া গেল না? আমার কি মরণ নাই? আহা, যমের ঘরে বুঝি আমার মত দুঃখিনীর জন্য একটু জায়গা হইবে না। বাছা, তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেইখানে যাইব। আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া চল।'

কৌশল্যার দুঃখ দেখিয়া লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'মা, দাদা কিসের জন্য বনে যাইবেন? মহারাজ এখন বুড়া হইয়াছেন, তাঁহার কি মাথার ঠিক আছে? তাহা না হইলে কেন স্ত্রীর কথায় ভুলিয়া এমন লোককে বনে পাঠাইতেছেন? এমন রাজার কথা না শুনিলে কী হয়?'

তারপর তিনি রামকে বলিলেন, 'দাদা, একবার হুকুম দাও তো দেখি কে তোমাকে রাজ্য

না দেয়! না হয় অযোধ্যার সব লোককে মারিব। বাবাকেও মারিব! আমার প্রাণ থাকিতে কাহার সাধ্য দাদাকে ঠকাইয়া ভরতকে রাজ্য দেয়!'

আবার তিনি কৌশল্যাকে বলিলেন, 'মা, আমি কি ভয় করি? তুমি আর দাদা দেখ, আমি কী করিতে পারি! বুড়ো রাজাকে এখনই মারিব!'

ইহা শুনিয়া কৌশল্যা বলিলেন, 'শোন তো বাবা, লক্ষ্মণ কী বলিতেছে! বাবা, তুমি বনে যাইওনা! তাহা হইলে আমি কখনই বাঁচিব না। মাকে মারিলে তোমার পাপ হইবে।'

কৌশল্যার কষ্ট দেখিয়া রামের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'মা, কাঁদিও না। বাবার কথা আমি কী করিয়া অমান্য করিব? ভাই লক্ষ্মণ, তুমি আমাকে কত ভালবাস, তাহা কি আমি জানি না? তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝিতেছি। কিন্তু যাহাতে ধর্ম হয় তাহাই আমাদের করা উচিত। কাজেই বাবা যখন বলিয়াছেন, তখন আমায় বনে যাইতেই হইবে।'

তারপর হাত জোড় করিয়া রাম কৌশল্যাকে বলিলেন, 'মা, তুমি বাধা দিও না। চৌদ্দ বৎসর দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যাইবে। তারপর আবার তোমার কাছে আসিব।' কৌশল্যা বলিলেন, 'বাবা, কেবল রাজাই কি তোমার গুরু? আমি কি কেহ নই? আমাকে এত কষ্ট দিয়া তুমি কেমন করিয়া যাইবে?'

রাম বলিলেন, 'বাবা ধর্ম ঠিক রাখিবার জন্যই আমাকে বনে পাঠাইতেছেন। আমাদের কি উচিত তাঁহার কথা অমান্য করা? মা, আমাকে বনে যাইবার অনুমতি দাও, আর আশীর্বাদ কর, যেন চৌদ্দ বৎসর পরে আবার আসিয়া তোমার পায়ের ধূলা লইতে পারি। তোমার পায়ে ধরি মা, আমাকে বাধা দিও না।'

এইরূপ করিয়া রাম কৌশল্যাকে কত বুঝাইলেন, লক্ষ্মণকেও কত বুঝাইলেন, কিন্তু কৌশল্যা তবুও বলিলেন, 'বাবা, আমি এ দেশ ছাড়িয়া তোমার সঙ্গেই যাইব!'

রাম বলিলেন, 'দেখ মা, কৈকেয়ী ছল করিয়া বাবাকে কী ভয়ানক দুঃখে ফেলিয়াছেন! আমি তো বনে চলিলাম, তারপর তুমিও যদি আমার সঙ্গে যাও, তবে কি বাবা বাঁচিবেন? মা, এমন কথা মনে ভাবিও না। যতদিন বাবা বাঁচিয়া আছেন, ততদিন তাঁহার সেবা কর। চৌদ্দ বৎসর পরে নিশ্চয় আমি আবার আসিব।'

এইরূপে রাম অনেক বুঝাইলে পর কৌশল্যা বলিলেন, 'বাবা, কিছুতেই শুনিলে না? তুমি বনে যাইবেই? হায়, আমার কপালে বুঝি কেবল দুঃখই লেখা ছিল! তবে এস বাবা! আশীর্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক। হায়, আমার ভাগ্যে কি এমন দিন হইবে যে, তুমি আসিয়া আবার আমাকে মা বলিয়া ডাকিবে?'

সীতাও বিপদের কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই, কিন্তু রামের মুখ দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে একটা বিপদ হইয়াছে। রাম যখন বনে যাইবার কথা বলিলেন, তখন সীতা রাজ্য গেল বলিয়া কোন দুঃখ করিলেন না। তিনি কেবল বলিলেন, 'আমি তোমার সঙ্গে যাইব।' রাম অনেক নিষেধ করিলেন, বনে যত ক্লেশ যত ভয় আছে, তাহাদের কথা বলিয়া অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু সীতা তাহা শুনিবেন কেন? তিনি রামের গলা জড়াইয়া ধরিয়া এমন ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন যে, রাম কিছুতেই তাঁহাকে রাখিয়া যাইতে পারিলেন না। কাজেই তখন আর কী করেন। তিনি বলিলেন, 'তবে চল, আমি যেমন করিয়া থাকিব, তুমিও তেমনি করিয়া

থাকিবে। আমাদের যাহা কিছু আছে তাহা ব্রাহ্মণদিগকে, চাকব-বাকরকে, আর গরিব দুঃখীকে বিলাইয়া চল আমরা শীঘ্র বনে যাই।'

লক্ষ্মণ রামের আগেই সেখানে আসিয়াছিলেন। রাম সীতার কথাবার্তা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'দাদা, যদি যাইবেই, তবে আমি ধনুক বাণ লইয়া তোমার আগে আগে যাইব। আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।' রাম বলিলেন, 'সে কী ভাই, তুমি যদি যাও তবে মা কৌশল্যা আর মা সুমিত্রাকে কে দেখিবে?' লক্ষ্মণ বলিলেন, 'মা কৌশল্যার জন্য কোন চিন্তা নাই। আর তিনি এত লোককে খাইতে দিতেছেন, তিনি কি মা সুমিত্রাকে দুটি ভাত দিতে পারিবেন না? দাদা, আমাকে সঙ্গে লও। আমি রোজ তোমাদের ফলমূল আনিয়া দিব।'

সুতরাং লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইতে হইল। লক্ষ্মণ দেখিতে দেখিতে সকলের নিকট বিদায় লইয়া অস্ত্রশস্ত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত। তারপর যাহাকে যাহা দিতে হইবে রামের কথামত সকলকে তাহা দিতে লাগিলেন। চাকরেরা যাহা পাইল তাহাতে তাহাদের চিরকাল সুখে কাটিবে। তাহা ছাড়া আবার রাম তাহাদিগকে বলিলেন, 'যতদিন আমরা ফিরিয়া না আসি, ততদিন আমাদের বাড়িতেই থাক।'

সে দেশে ত্রিজট নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঠাকুরটি বুড়া যতদূব হইতে হয়, আবাব গরিব তাহার চেয়েও বেশি। সেই ব্রাহ্মণ রামের দানের কথা শুনিয়া কিছু ভিক্ষাব জন্য আসিয়া উপস্থিত। রাম তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া কহিলেন, 'ঠাকুর, আপনি এই লাঠিটা যত দূব ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারিবেন, তত দূর পর্যন্ত আমার যত গরু আছে সব আপনার।'

সেই বুড়া বামুনেব গায়ে কী জোরটাই ছিল! তখন তিনি কসিয়া কোমর বাঁধিয়া, 'হেঁই—হো' শব্দে লাঠিগাছটাকে একেবারে সরযূ পার করিয়া দিলেন। ততদূব অবধি গণিয়া দেখা গেল, এক লক্ষ গরু। রাম ইহাতে যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া সেই লক্ষ গরু তো তাঁহাকে দিলেনই, তাহা ছাড়া আরও অনেক ধন দিলেন।

এইরূপে সমস্ত ধন দান করিয়া রাম লক্ষ্মণ আর সীতা দশরথের সহিত দেখা করিবাব জন্য পথ দিয়া হাঁটিয়া চলিলেন। তাহা দেখিয়া সকলে বলিতে লাগিল, 'হায় হায়, যে রাম কখনও একা পথ চলেন নাই, যে সীতা কখনও ঘরের বাহির হন নাই, আজ কিনা তাঁহারা এমনভাবে পথ হাঁটিয়া চলিয়াছেন! দশরথকে নিশ্চয়ই ভূতে পাইয়াছে, নহিলে এরূপ হইবে কেন? এ দেশে আমরা আর থাকিব না। চল আমরা রামের সঙ্গে বনে চলিয়া যাই; কৈকেয়ী তাঁহার ছেলেকে লইয়া এইখানে পড়িয়া থাকুক!'

রামকে বিদায় দিতে দশরথের কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল, তাহা আর আমি লিখিয়া কত জানাইব? কৈকেয়ীর ছল বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বর দিয়া বসিয়াছেন, কাজেই এখন আর নিজে কী করিয়া 'না' বলেন। কিন্তু রাম তাঁহার কথায় বনে যান, ইহা তাঁহার একেবারেই ইচ্ছা নহে। তাই তিনি রামকে বলিলেন, 'বাছারে, তুমি আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া নিজে অযোধ্যার রাজা হও।' রাম বলিলেন, 'বাবা, আপনি আরও হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া সুখে রাজ্য করুন। আমি রাজ্য চাহি না। আমি বনে গিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রাখিয়া, তারপর আবার আপনার পায়ের ধূলা লইতে আসিব।'

আর একটি দিন রামকে রাখিতে পারিলেও হয়ত দশরথের মনে কতটা আরাম হইত। কিন্তু আর একটি দিনও তাঁহাকে রাখিবার উপায় নাই, কারণ সেইদিনই তাঁহার যাইবার কথা।

শেষে দশরথ সুমন্ত্রকে বলিলেন, 'রামের সঙ্গে অনেক সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র আর গাড়ি ঘোড়া দাও। শহরের লোকেরা তাঁহার সঙ্গে যাউক। লোকজন, টাকাকড়ি কিছুতেই যেন তাঁহার কষ্ট না হয়।'

ইহা শুনিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, 'মহারাজ, সবই যদি রামের সঙ্গে পাঠাইবেন, তবে আমার ভবতের রাজা হইয়াই বা কী লাভ?'

রাম বলিলেন, 'বাবা, এ সকল কিছুই চাহি না। আমার একখানা খন্তা, একটি পেঁটরা, আর খানকতক ছেঁড়া ন্যাকড়া হইলেই চলিবে।' এই কথা বলিতে বলিতেই কৈকেয়ী তিন টুকরা ন্যাকড়া লইয়া উপস্থিত। রাম, লক্ষ্মণ ভাল কাপড় ছাড়িয়া ন্যাকড়া পরিলেন। কিন্তু হায়, সীতা তো জানেন না কেমন করিয়া ন্যাকড়া পরিতে হয়! তিনি শুধু তাহা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুতরাং রামকেই নিজ হাতে সেই ন্যাকড়াখানা তাঁহার রেশমী শাড়ির উপরে জড়াইয়া দিতে হইল। তাহা দেখিয়া কাহার সাধ্য চোখে জল থামাইয়া রাখে।

তখন বশিষ্ঠ সীতাকে ন্যাকড়া পবাইতে বারণ করিয়া কৈকেয়ীকে অনেক বকিলেন। দশরথও বলিলেন, 'সীতাকে ন্যাকড়া পরাইতে হইবে এমন বর .তা আমি কখনও দিই নাই। সীতা সকল রকম ধনরত্ন সঙ্গে লইয়া যাউক।'

সকলেব শেষে বাম হাত জোড় করিয়া দশরথকে বলিলেন, 'মহারাজ, আমার দুঃখিনী মাকে দেখিবেন।'

এদিকে যাইবার সময উপস্থিত। সুমন্ত্র বথ সাজাইয়া প্রস্তুত। সুতরাং তিনজনে সকলকে প্রণাম কবিয়া বিদায় লইলেন। রাণী সুমিত্রা তখন লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, 'বাবা, তুমি রামের সহিত যাও। সকল সময় তাঁহার কাছে থাকিও। রাম ছাড়া তোমার আর কেহ নাই। রামকে মনে করিও যেন রাজা দশরথ, সীতাকে মনে করিও যেন আমি, আর বনকে মনে করিও যেন অযোধ্যা। যাও বাছা, মনের সুখে চলিয়া যাও।'

তারপর আগে সীতাকে সুন্দর কাপড় পরাইয়া বথে তুলিয়া দেওয়া হইল। পরে রাম লক্ষ্মণ অস্ত্রশস্ত্র, পেঁটরা, আর সীতার চৌদ্দ বৎসরের মতন কাপড লইয়া তাঁহার সঙ্গে উঠিয়া বসিলেন। রথ চলিতে দেখিয়া সকলে পাগলের মত হইয়া তাহাব সঙ্গে ছুটিল। যখন রথের সঙ্গে আর ছুটিতে পারে না, তখন তাহারা অতি কাতবভাবে সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিল, 'ও সুমন্ত্র, একটু আস্তে যাও! আমরা যে আর পারি না!'

রাম অনেক সহ্য কবতে পারিতেন, কিন্তু এতটা কী সহা যায়? নিজে দশরথ, এমনকি রাণীরা অবধি ছুটিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের কান্নায় বুঝি পাথরও গলিয়া যায়, মানুষ তো মানুষ! রাম অস্থির হইয়া সুমন্ত্রকে ক্রমাগত বলিতেছেন, 'জোরে চালাও!' কিন্তু সুমন্ত্র জোরে চালাইবেন কি? এদিকে যে রাজা নিজে বলিতেছেন 'রথ থামাও!' মা কৌশল্যা 'হা রাম! হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া এলোচুলে পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিতেছেন।

যাহা হউক, সুমন্ত্র যখন দেখিলেন যে রাম আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি রথ খুব জোরেই চালাইয়া দিলেন। কাজেই তখন আর রথের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে না পারিয়া প্রায় সকলকেই ফিরিতে হইল।

দশরথকেও অনেক কষ্টে ফিরানো হইল। কিন্তু যতক্ষণ রথের ধূলা দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ তাঁহাকে ঘরে আনা গেল না। রথের দিকে চাহিয়া তিনি সেইখানে মাটিতে বসিয়া

রহিলেন, আর দাঁড়াইবার শক্তি নাই। রথ চোখের আড়ালে চলিয়া গেল, আর বসিয়াও থাকিতে পারিলেন না।

একটু সুস্থ হইলে পরে দশরথ কৌশল্যার হাতখানি ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে চলিলেন—কৈকেয়ীর ঘরে নহে, কৌশল্যার ঘরে। কৈকেয়ী রাজাকে নিতে আসিলেন, কিন্তু রাজা বলিলেন, 'তুই আমাকে ছুঁইস না।'

কৌশল্যার ঘরে আসিয়া দশরথ সেই যে বিছানায় শুইলেন, তাহাই তাঁহার শেষ শয়ন। কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন চলিয়া গেল। রাত্রিতে অনেক কষ্টে কৌশল্যাকে বলিলেন, 'আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। আমার গায়ে হাত দাও!' কৌশল্যা রাজার কাছে আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া সুমিত্রা বলিলেন, 'দিদি, এত দুঃখ কেন করিতেছ? রাম কেমন বীর তাহা কি জান না? লক্ষ্মণও তাহার সঙ্গে গিয়াছে, তাহাদের কিসের ভয়? আবার তাহারা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিবে!' সুমিত্রার কথা শুনিয়া কৌশল্যা অনেক শান্ত হইলেন।

দশরথকে যখন ফিরাইয়া আনা হইল, তখনও অযোধ্যার অনেক লোক রথের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছিল। তাহারা কিছুতেই ফিরিতে চাহিল না। তাহাদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের গায়ে জোর নাই, মাথা কাঁপে, তবুও তাঁহারা যাইবেনেই। তাঁহাদের কষ্ট দেখিয়া রাম লক্ষ্মণ আর সীতা রথ হইতে নামিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, 'বাছা রাম, আমরা সঙ্গে যাইব।'

এইরূপে তাঁহারা তমসা নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ততক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছে। কাজেই সেখানেই রাত্রিতে থাকিবার আয়োজন হইল।

ভোরে উঠিয়া রাম দেখিলেন যে, অযোধ্যার লোকেরা তখনও ঘুমাইতেছে। তখন তিনি চুপি চুপি সুমন্ত্রকে উঠাইয়া বলিলেন, 'চল, এইবেলা আমরা চলিয়া যাই।' সুমন্ত্র রথ সাজাইয়া আনিলেন, কিন্তু রাম লক্ষ্মণ ও সীতা তাহাতে চড়িয়া আর বেশি দূরে গেলেন না। খানিক পরেই তাঁহারা রথ হইতে নামিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন, 'তুমি রথখানিকে উত্তর দিক হইতে ঘুরাইয়া আন।' শুধু রথ হালকা বলিয়া পথে কিনা তাহার দাগ পড়িবে না, তাই রাম শুধু রথখানিকে ঘুরাইয়া আনিতে দিলেন। তিনি জানিতেন যে ঐরূপ করিলে আর অযোধ্যার লোকেরা রথের চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। তাই তাঁহারা পথ ছাড়িয়া বনের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন, আর সুমন্ত্র শুধু রথখানিকে কিছু দূরে ঘুরাইয়া আনিয়া, অন্য এক স্থান হইতে আবার তাঁহাদের তিনজনকে তুলিয়া লইলেন।

এদিকে তমসা নদীর ধারে সেই লোকগুলি জাগিয়া দেখিল যে রাম নাই। তখন তাহার এই বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইল, 'হায় হায়, কেন ঘুমাইলাম? আমাদের ভাগ্যে কি এই ছিল? রাম কি শেষে এইরূপ করিয়া আমাদিগকে ফেলিয়া গেলেন?' কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারা রথের চিহ্ন দেখিয়া খানিক দূরে গেল। কিন্তু তাহার পরে রথ কোন্‌দিকে গিয়াছে আর কিছু বুঝিতে পারিল না। কাজেই তখন নিতান্ত দুঃখের সহিত তাহাদিগকে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতে হইল।

সমস্তদিন রথ চালাইয়া, রাম বিকালে শৃঙ্গবের নগরের নিকট গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটি সুন্দর ইঙ্গুদী গাছ দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'এই গাছতলায় আজ আমরা থাকিব।'

এই স্থানের রাজার নাম গুহ। তিনি রামের বন্ধু। রাম আসিয়াছেন শুনিবামাত্রই গুহ তাড়াতাড়ি অনেক লোকজন আর ভাল ভাল খাবার জিনিস লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামের থাকিবার জন্য সুন্দর বিছানা, ঘোড়ার জন্য ঘাস, কিছুই আনিতে তিনি বাকি রাখেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা যে, রামকে তাঁহাদের রাজা করিয়া সেইখানেই রাখেন।

রাম আদরের সহিত তাঁহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া বলিলেন, 'ভাই, তোমার ভালবাসাতেই আমার যার-পর-নাই সুখ হইয়াছে। কিন্তু তোমার জিনিস আমি কি করিয়া লইব?' — আমায় যে তপস্বীর মতন ফল মূল খাইয়া থাকিতে হইবে। আমাদের কিছুই দরকার নাই, কেবল ঘোড়াগুলিকে দুটি ঘাস দিতে বল।' কাজেই গুহ রামকে আর পিড়াপিড়ি করিলেন না। রাম সীতা জল মাত্র খাইয়া গাছতলায় শুইয়া রহিলেন।

রাত্রিতে রাম ঘুমাইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ জাগিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া গুহ মনের দুঃখে বলিলেন, 'রাজপুত্র, আমরাই জাগিয়া বন্ধুকে পাহারা দিব, আপনি ঘুমান।' লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদার এই দুঃখের সময় আমি কেমন করিয়া ঘুমাইব? ইহার পরে বাবা আর বেশী দিন বাঁচিবেন না। তখন মা কৌশল্যা আর সুমিত্রাও নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবেন।' লক্ষ্মণের আর গুহের ঘুম হইল না, সমস্ত রাত্রি তঁহাদের কাঁদিয়াই কাটিল।

পরদিন সকালে সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া আর গুহের নিকট বিদায় লইয়া রাম লক্ষ্মণ আর সীতা নৌকায় গঙ্গা পার হইলেন। বুড়া সুমন্ত্রের কি আর অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে পা চলে? রামের সঙ্গে যাইবার জন্য তিনি কতই না মিনতি করিয়াছিলেন! কিন্তু রাম বলিলেন, 'তুমি যদি অযোধ্যায় ফিরিয়া না যাও, তবে কৈকেয়ী মনে করবেন যে আমি বুঝি বনে যাই নাই। তাহা হইলে বাবাকে তিনি বড়ই কষ্ট দিবেন;তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও।' সুতরাং সুমন্ত্র আর রামের সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। তিনি একদৃষ্টে রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন আর রামকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

গঙ্গা পার হইবার পূর্বেই রাম লক্ষ্মণ বটের আঠায় জটা পাকাইয়া তপস্বী সাজিয়াছিলেন। গঙ্গা নদীর পরপারে বৎসদেশ। সেখানে হরিণ মারিয়া খাইয়া, তাঁহারা বর্ম পরিয়া ধনুর্বাণ হাতে বনের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এক রাত্রি তাঁহাদের সেই বনের ভিতরেই কাটিল। তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহারা প্রয়াগে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের নিকট গঙ্গার সহিত যমুনা আসিয়া মিলিয়াছে।

রাম লক্ষ্মণ ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিলে পর তিনি তাঁহাদিগকে অনেক আদর যত্ন করিলেন। ভরদ্বাজ রামকে তাঁহার আশ্রমেই রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সে স্থানের খুব কাছেই লোকজনের বাড়ি ছিল বলিয়া রামের সেখানে থাকিতে তত ভাল লাগিল না। তিনি ভরদ্বাজকে বলিলেন, 'দয়া করিয়া আমাদিগকে একটি নির্জন ভাল জায়গা দেখাইয়া দিন।' ভরদ্বাজ বলিলেন, 'তবে তুমি এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট পর্বতে গিয়া বাস কর। চিত্রকূট খুব সুন্দর আর নির্জন স্থান। সেখানে ফল ফুল, নদী ঝরনা, পাখি, হরিণ অনেক আছে। সে স্থানটি তোমাদের বেশ ভাল লাগিবে।'

তাহার পরদিনই তাঁহারা ভরদ্বাজকে প্রণাম করিয়া চিত্রকূট যাত্রা করিলেন। পথে যমুনা নদী পার হইতে হয়। নদীর ধারে শুকনা কাঠের অভাব নাই। খসখসের দড়িতে সেই কাঠ

বাঁধিয়া পার হইবার জন্য ভেলা প্রস্তুত হইল। ভেলার উপর আবার জামের আর বেতের ডাল দিয়া একটা গদি করিতেও বাকি রহিল না—সীতার বসিবার জন্য একটু মোলায়েম জায়গা তো চাই! এই কারিকুরিটি অবশ্য লক্ষ্মণের;সীতার সুবিধা করিতে তিনি সর্বদা ব্যস্ত। এই ভেলায় জিনিসপত্র- সুদ্ধ তাঁহারা নদী পার হইলেন।

তারপর আগে লক্ষ্মণ, মাঝখানে সীতা, পিছনে রাম—এরূপ করিয়া তাঁহারা পথ চলিতে লাগিলেন। পথের দুই ধারে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়া আছে;সীতা তাহা পূর্বে কখনও দেখেন নাই। তিনি তাঁহার মিষ্টি কথায় রামকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এটি কী ফুল?' অমনি লক্ষ্মণ তাহা তুলিয়া আনিয়া দেন।

এইরূপে এক দিন পথ চলিয়া তাঁহারা চিত্রকূট পর্বতের কাছে আসিলেন। সে স্থানটি অতি চমৎকার। তাহার কাছে মন্দাকিনী নামে অতিসুন্দর একটি নদী। সেই নদীর ধারে তাঁহারা কাঠ আর লতাপাতা দিয়া সুন্দর একখানা ঘর বাঁধিলেন। মণিমাণিক্যের কাজ করা মার্বেল পাথরের বাড়িতে থাকা যাঁহাদের অভ্যাস, এখন তাঁহাদের থাকিবার জায়গা হইল একটি কুঁড়ে। সেই কুঁড়ে ঘরখানিতে তাঁহাদের বেশ সুখেই দিন কাটিতে লাগিল।

সুমন্ত্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে দেখিয়া দশরথের দুঃখ আরও বাড়িয়া গেল। প্রথমে তিনি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন। জ্ঞান হইলে পর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুমন্ত্র, তুমি চলিয়া আসার সময় তাহারা কী বলিল? সুমন্ত্র বলিলেন, 'রাম আপনাদের সকলকে প্রণাম জানাইয়াছেন; আর বলিয়াছেন, "মাকে বলিও তিনি যেন সর্বদা বাবাব সেবা কবেন। ভবতকে বলিও, তিনি যেন রাজা হইয়া বাবাকে অমান্য না করেন।" লক্ষ্মণ রাগেব সহিত বলিলেন, "সুমন্ত্র, বাবা যখন দাদাকে বনে পাঠাইয়াছেন, তখন আর তাঁহার উপরে আমার একটুও ভক্তি নাই।" সীতা কিছুই বলেন নাই, তিনি কেবল হেঁটমুখে চোখের জল ফেলিয়াছেন, আর এক-এক বার রামের মুখের দিকে আর রথের দিকে তাকাইয়াছেন।'

ইহার পর রাজা দশরথ ক্রমেই অস্থির হইয়া পডিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তিনি আর অধিকক্ষণ বাঁচিবেন না। যখন তাঁহার বয়স অল্প ছিল, তখন তিনি একবাব অন্ধকার রাত্রিতে হাতি মনে করিয়া একটি অন্ধ মুনির ছেলেকে তীর দিয়া মারিযা ফেলেন। তাহাতে সেই অন্ধ মুনি দুঃখে মরিয়া যান, আর মরিবার পূর্বে দশরথকে এই বলিয়া শাপ দেন, 'তোমার এইরূপে পুত্রের শোকে প্রাণ যাইবে।'

মৃত্যুর সময় সেই কথা মনে করিযা দশরথ দুঃখ করিতে লাগিলেন। তারপর ক্রমে তাঁহার শরীর অবশ হইয়া আসিল। শেষে 'হা রাম! হা কৌশল্যা! হা সুমিত্রা! হা রে দুষ্ট কৈকেয়ী!' এই বলিতে বলিতে রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁর প্রাণ বাহির হইয়া গেল। রামকে বনে পাঠাইয়া ছয়দিন মাত্র দশরথ বাঁচিয়া ছিলেন।

রামের জন্য ক্রমাগত কয়েক দিন দুঃখ করিয়া করিয়া সকলে একেবারে অবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন;দশরথের মৃত্যুর সময় কেহই টের পান নাই। পরদিন দশরথকে জাগাইতে গিয়া সকলে দেখিলেন যে তিনি মরিয়া গিয়াছেন। তখন আবার কান্না আরম্ভ হইল।

এইরূপে দুঃখের উপর আবার দুঃখ আসিয়া সকলকে যে কিরূপ অস্থির করিয়াছিল, তাহা কী বলিব! এদিকে ভরত শত্রুঘ্নও বাড়ি নাই; তাঁহারা না আসিলে দশরথকে পোড়ানোও যাইতেছে না। সুতরাং তাড়াতাড়ি ভরত শত্রুঘ্নকে আনিতে লোক গেল। আর যতদিন তাঁহারা

না আসেন ততদিনের জন্য দশরথকে তৈলের কড়ার ভিতরে রাখিয়া সকলে তাঁহাদের পথ চাহিয়া রহিলেন।

ভরত মামার বাড়িতে সুখেই ছিলেন। এ সকল বিপদের কথা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। ইহার মধ্যে তিনি একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, রাজা দশরথ অত্যন্ত ময়লা হইয়া গিয়াছেন, আর একটা পাহাড় হইতে পড়িয়া যাইতেছেন। পাহাড়ের নিচে তৈল ছিল, তিনি সেই তৈলে ডুবিয়া গেলেন। তারপর গাধার গাড়িতে চড়িয়া তিনি দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিলেন।

এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া ভরতের মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল। তাই তিনি আর পরদিন বন্ধুগণের সহিত ভাল করিয়া আমোদ করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে অযোধ্যা হইতে লোক আসিয়া বলিল, 'রাজকুমার, আপনি শীঘ্র অযোধ্যায় চলুন। সেখানে এমন কিছু হইয়াছে যে আপনার দেরি হইলে ক্ষতি হইতে পারে।'

এইসকল শুনিয়া ভরত তাড়াতাড়ি অযোধ্যায় চলিয়া আসিলেন। অযোধ্যায় আসিয়া দেখেন যে, তাহার আর আগের মত চেহারা নাই; রাস্তায় লোকজন চলিতেছে না, দোকান পাট বন্ধ, আর সকলেরই মুখ অতিশয় মলিন। দশরথের ঘরে গিয়া দেখিলেন তিনি সেখানে নাই, সুতরাং সেখান হইতে কৈকেয়ীর ঘরে গেলেন।

কৈকেয়ী হাসিভরা মুখে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাল আছ তো? পথে কোন কষ্ট হয় নাই?' ভরত বলিলেন, 'আসিতে একটু পরিশ্রম হইয়াছে। কিন্তু মা, এত তাড়াতাড়ি কেন আমাকে ডাকিয়া আনিলে? বাবা কোথায়?' কৈকেয়ী বলিলেন, 'বাছা, তোমার বাবা মরিয়া গিয়াছেন।'

এ কথা শুনিয়া ভরত 'হায় হায়' করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তাঁহার জ্ঞান হইলে পর কৈকেয়ী বলিলেন, 'বাছা, তোমার বুদ্ধি হইয়াছে, তুমি কেন এত অস্থির হইতেছ?' ভরত বলিলেন, 'হায়! বাবা আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় গেলেন! মা, বাবার কী অসুখ হইয়াছিল মরিবার সময় তিনি কী বলিয়া গিয়াছেন?'

কৈকেয়ী বলিলেন, 'বাছা, মরিবার সময় তোমার বাবা বলিয়াছেন, "হা রাম! হা সীতা! হা লক্ষ্মণ" আর বলিয়াছেন যে, যাহারা রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতে দেখিবে তাহারাই সুখী।'

এ কথা শুনিয়া ভরত বলিলেন, 'মা, দাদা তবে এখন কোথায়?' কৈকেয়ী বলিলেন, 'তোমার দাদা সীতা আর লক্ষ্মণকে লইয়া বনে গিয়াছেন।' ভরত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দাদা কী জন্য বনে গিয়াছেন? তিনি এমন কী অন্যায় কাজ করিয়াছেন যে তাঁহাকে বনে পাঠানো হইল?'

কৈকেয়ী বলিলেন, 'তিনি কোন অন্যায় কাজ করেন নাই। আমিই রাজাকে বলিয়া তাঁহাকে বনে পাঠাইয়াছি। রাজা আমাকে দুটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। আমি এই দুই বর লইয়াছি যে, রাম বনে যাইবে, আর তুমি রাজা হইবে। এখন এ সব তোমার হইল, তুমি রাজা হইয়া সুখে থাক।'

ভরতকে সুখী করিবার জন্যই কৈকেয়ী এমন পাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভরত যে রামকে কতদূর ভালবাসিতেন, তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার কাজে সুখী হওয়া দূরে থাকুক, ভরত দুঃখে আর রাগে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এতই রাগ হইল যে, কৈকেয়ী

তাঁহার মা না হইলে হয়ত তিনি তাঁহাকে মারিয়াই ফেলিতেন।

ভরত বলিলেন, 'দাদা যদি তোমাকে এত মান্য না করিতেন, তাহা হইলে আমি তোমাকে এখনই তাড়াইয়া দিতাম! তুমি রাজার মেয়ে, আর তোমার এই কাজ! যাহা হউক, তুমি যাহা করিয়াছ তাহা আমি কখনই হইতে দিব না। আমি এখনই দাদাকে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছি। তোমার মত দুষ্ট স্ত্রীলোক আর এই পৃথিবীতে নাই! তুমি কেন আগুনে পুড়িয়া, না হয় গলায় দড়ি দিয়া মর না? না হয় বনেই চলিয়া যাও না?'

তারপর ভরত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমি রাজ্য চাহি না। দাদার রাজ্য আমি কেন লইব? আমি মামার বাড়ি গিয়াছিলাম, ইহার মধ্যে মা এত কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন, আমি ইহার কিছুই জানি না।' এই বলিয়া তিনি শত্রুঘ্নকে লইয়া কৌশল্যার সঙ্গে দেখা করিতে চইলেন।

কৌশল্যাও ভরতের গলা শুনিতে পাইয়া তাঁহার নিকটেই আসিতেছিলেন। পথে দুইজনের দেখা হইল। ভরতকে দেখিয়া কৌশল্যা বলিলেন, 'বাবা, এখন তুমি তো রাজ্য পাইয়াছ, তুমি সুখে থাক। আর এই দুঃখিনীকে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও।' এই কথায় ভরত কৌশল্যার পা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তখন কৌশল্যাও তাঁহাকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ভরতের কোন দোষ নাই।

দশরথ তখনও সেই কড়ার মধ্যে তৈলের ভিতরে আছেন। তাঁহাকে পোড়াইতে আর বিলম্ব করা যায় না। সুতরাং পরদিন বশিষ্ঠ অনেক কষ্টে ভরতকে একটু শান্ত করিয়া সেই কাজের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে দশরথকে পোড়ানো আর তাঁহার শ্রাদ্ধাদি সকলই হইয়া গেল।

ইহার পর একদিন ভরত আর শত্রুঘ্ন কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময় কুঁজী ভারি সাজ-গোজ করিয়া সখীদিগের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। গহনা পরিয়া, চন্দন মাখিয়া, তাহার মুখে হাসি আর ধরে না! বোধ হয় মনে ভাবিয়াছিল যে খুব বড়রকমের একটা কিছু পুরস্কার পাইবে। পুরস্কারটি কী হইল, বলি শুন।

যেই কুঁজী সেখানে আসিল, অমনি ভরত তাহাকে ধরিয়া শত্রুঘ্নের হাতে দিয়া বলিলেন, 'এই হতভাগীই সকল অনিষ্টের গোড়া! এখন ইহাকে যাহা করিতে হয় কর।' শত্রুঘ্নও পাপিষ্ঠাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া বেশ ভালমতই তাহাকে পুরস্কার দিতে আরম্ভ করিলেন। সখীরা তো ভয়ে দে ছুট। তখন ভরত বলিলেন, 'ভাই, ওটাকে মারিয়া ফেলিও না। স্ত্রীলোককে মারিয়াছ শুনিলে দাদা রাগ করিবেন।' সুতরাং শত্রুঘ্ন কুঁজীকে ছাড়িয়া দিলেন; কুঁজীও পলাইয়া বাঁচিল।

এইরূপ করিয়া দশরথের মৃত্যুর পর তের দিন গেল। তখন একজন রাজা না হইলে কাজই চলিতেছে না। সুতরাং সকলেরই ইচ্ছা এখন ভরত রাজা হন। কিন্তু ভরত বলিলেন, 'চল, দাদাকে লইয়া আসি। দাদাই রাজা হইবেন, আর আমি চৌদ্দ বৎসর বনে গিয়া থাকিব।' তখন সকলে মিলিয়া মহা আনন্দে ভরত শত্রুঘ্নের সঙ্গে রামকে ফিরাইয়া আনিতে চলিল। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া, মন্ত্রী, পুরোহিত, চাকর-বাকর, সিপাহী, সৈন্য, সকলেই চলিল। অযোধ্যার লোক কেহই পড়িয়া থাকিল না। রথে চড়িয়া, হাতি চড়িয়া, ঘোড়া গাধা উটে চড়িয়া, না হয় হাঁটিয়া, যে যেমন করিয়া পারিয়াছে সেইরূপ করিয়াই চলিয়াছে। এক লক্ষ ঘোড়সোয়ার, নয় হাজার হাতি, ষাট হাজার রথ, তাহা ছাড়া সিপাহী সান্ত্রী আর লোকজন

যে কত, তাহার ঠিকানা নাই। এমনি করিয়া তাহারা রামকে আনিতে চলিল।

তাহারা যখন গুহের দেশে আসিল, তখন গুহ এত সৈন্য আর লোকজন দেখিয়া প্রথমে একটু ভয় পাইলেন। তাই তিনি তাঁহার নিজের লোকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভরত কি রামের অনিষ্ট করিতে আসিয়াছেন? আমি থাকিতে তিনি তাহা পারিবেন না! চল, আমরা তাঁহার পথ আটকাই। আর যদি তাঁহার মনে কোন মন্দ ভাব না থাকে, তবে তাঁর কোন ভয় নাই।'

এই কথা বলিয়া তিনি ভরতের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। ভরতের কাছে যখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে ভরত রামকে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছেন, তখন তাঁহার মনে খুবই সুখ হইল।

গুহকে দেখিয়া সকলে রাম লক্ষ্মণ আর সীতার সংবাদ শুনিবার জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। বনে যাইবার সময় গুহের দেশে আসিয়া তাঁহারা কোথায় ছিলেন, কী খাইয়াছিলেন, কী কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, কোন কথাই না শুনিয়া তাহারা ছাড়িল না। রাম সীতা কুশ বিছাইয়া ইঙ্গুদী গাছতলায় ঘুমাইয়াছিলেন, সেই ইঙ্গুদী গাছতলায় সেই কুশ তখনও রহিয়াছে। গুহ সকলকে তাহাও দেখাইলেন।

পরদিন গুহের লোকেরা পাঁচশত নৌকা আনিযা ভরতকে গঙ্গা পার করিয়া দিল। গুহ নিজে ভরতের সঙ্গে চলিলেন। গঙ্গা পার হইয়া ভরদ্বাজের আশ্রমে পৌঁছিতে তাঁহাদের অধিক দিন লাগিল না। ভরত রামকে আনিতে যাইতেছেন শুনিয়া ভরদ্বাজ মুনি যে কতদূর সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা আর কী বলিব! ভরতকে তিনি বলিলেন, 'তোমার লোকজন-সুদ্ধ আমার এখানে নিমন্ত্রণ খাইয়া যাইতে হইবে।'

আর, কী আশ্চর্য নিমন্ত্রণই তিনি তাঁহাদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন! কেহ হয়ত বলিবে যে, মুনি এত টাকাকড়ি কোথায় পাইলেন যে ভরতের লোকদিগকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইলেন। কিন্তু কেবল টাকা হইলেই কি সব হইল? তপস্যার দ্বারা ভরদ্বাজ যাহা করিলেন, টাকায় তাহা হয় না। মুনির তপস্যার জোরে তাঁহার আশ্রমে কোরমা আর পায়সেব দিঘি হইল, সরবতের নদী বহিল।

ভরতের লোকেরা যে সে নিমন্ত্রণ খাইয়া অবাক হইবে তাহা আর আশ্চর্য কী? এরূপ নিমন্ত্রণ কি কেহ কোথাও খাইয়াছে? না এত আয়োজন কেহ ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে? নিজে দেবতারা আসিয়া ভরদ্বাজের আয়োজন করিয়াছিলেন;আর গন্ধর্বেরা আসিয়া সেখানে গান গাহিয়াছিলেন।

এইরূপে ভরদ্বাজের আশ্রমে নিমন্ত্রণ খাইয়া সকলে চিত্রকূট রওয়ানা হইলেন। ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা যমুনা নদীর দক্ষিণ ধার দিয়া খানিক দূরে যাও। তারপর বাম দিকে যে দক্ষিণমুখো পথ গিয়াছে, সেই পথে গেলে রামের সন্ধান পাইবে।'

সেই পথে অনেক দূর চলিয়া, শেষে তাঁহাদের মনে হইল যে হয়ত রাম আর বেশী দূরে নাই। তখন দুই-এক জন লোক বনের ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, এক জায়গায় ধোঁয়া উঠিতেছে। তাহাতে নিশ্চয় বুঝা গেল যে, সেই বনেই রাম আছেন। তখন ভরত সঙ্গের লোকদিগকে সেখানে দাঁড়াইতে বলিয়া নিজেই তাঁহাদিগকে খুঁজিতে চলিলেন।

এদিকে ভরতের লোকজন অনেক দূরে থাকিতেই রাম লক্ষ্মণ তাহাদের কলরব শুনিতে

পান, এবং উহা কিসের কলরব তাহা জানিবার জন্য লক্ষ্মণ একটা শাল গাছে গিয়া উঠেন। সেখান হইতে চারিদিক দেখিয়া তিনি রামকে বলিলেন, 'দাদা শীঘ্র আগুন নিভাইয়া ফেল, আর বর্ম পরিয়া তীর ধনুক লইয়া প্রস্তুত হও। ভরত আমাদিগকে মারিয়া ফেলিতে আসিয়াছে। আজ ভরতকে আর তাহার সকল সৈন্যকে মারিব, তবে ছাড়িব।'

এ কথায় রাম বলিলেন, 'ভাই, ভরত কি কখনও তোমার অনিষ্ট করিয়াছে? তবে কেন তাহাকে সন্দেহ করিতেছ?'

ইহাতে লক্ষ্মণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 'বোধহয় বাবা তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।' রাম বলিলেন, 'তাহা হইতে পারে। আমরা বনে থাকিয়া কষ্ট পাইতেছি, তাই বোধহয় বাবা আমাদিগকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। কিন্তু বাবার সঙ্গে তো সকল সময়েই প্রকাণ্ড শাদা ছাতা থাকে। সে ছাতা কই? তুমি শীঘ্র গাছ হইতে নামিয়া আইস।'

এদিকে ভরত খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমে রামের ঘরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। লতাপাতার ঘরখানি, তাহার ভিতরে রামের ধনুক দেখা যাইতেছে। আরও কাছে আসিলে দেখিলেন, রাম ঘরের ভিতর চামড়ার আসনে বসিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন; পরনে গাছের ছাল, মাথায় জটা। তাহা দেখিয়া ভরতের মনে কী কষ্টই হইল! তিনি ছুটিয়া চলিলেন, কিন্তু পৌঁছিবার আগেই পড়িয়া গেলেন। মুখ দিয়া কেবল 'দাদা' এই কথাটি মাত্র বাহির হইয়াছিল, আর কথা সরিল না। ততক্ষণে শত্রুঘ্নও কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া রামের পায়ে পড়িলেন। তারপর চারি ভাই গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তাঁহারা একটু শান্ত হইলে পর রাম বলিলেন, 'ভরত, বাবা এখন কোথায়? তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া কেন আসিলে?' ভরত বলিলেন, 'দাদা, বাবা তোমার জন্য দুঃখ করিতে করিতে স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। এখন আমরা তোমাকে লইতে আসিয়াছি। তোমার পায়ে পড়ি দাদা, আমাদের সঙ্গে চল!' এই বলিয়া ভরত রামের পা জড়াইয়া ধরিলেন।

দশরথের মৃত্যুর সংবাদে রাম কাঁদিতে কাঁদিতে ভরতকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'ভাই, বাবা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমারও করা উচিত, তোমারও করা উচিত। আমাকে যখন বনে পাঠাইয়াছেন, তখন আমি অযোধ্যায় কী করিয়া যাইব? আর তোমাকে যখন তিনি রাজা হইতে বলিয়া গিয়াছেন, তখন তুমিই বা কী করিয়া সে কথা অমান্য করিবে?'

তারপর দশরথের তর্পণ করিবার জন্য রাম মন্দাকিনী নদীর ধারে আসিলেন। তর্পণ শেষ হইলে আবার কান্না আরম্ভ হইল। সেই কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া ভরতের সঙ্গের লোকেরা আর দূরে বসিয়া থাকিতে পারিল না।

ততক্ষণে বেলা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল যাহা কিছু বেলা ছিল, তাহাও সকলের দেখাশুনা, প্রণাম, আশীর্বাদ ইত্যাদিতে কাটিয়া গেল। তারপর রাত্রি কেমন করিয়া কাটিল, তাহার কথা আর বেশী বলিয়া কী ফল? এত দুঃখ যাহাদের, তাহারা সে রাত্রি কেমন দুঃখে কাটাইয়াছিল, তাহা তোমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছ।

পরদিন রামকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা হইল। কিন্তু রাম কিছুতেই যাইতে চাহিলেন না। কেবল চেষ্টা করিলে কী হইবে? তাঁহাকে তো এ কথা বুঝাইয়া দেওয়া চাই যে, বনে যাওয়া উচিত নহে, অযোধ্যায় ফিরিয়া যাওয়াই ভাল; নহিলে তিনি যাইবেন কেন? ভরত অনেক মিনতি করিয়াছিলেন বটে, বশিষ্ঠও নানারূপ মিষ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন।

জাবালি নামক আর একজন পুরোহিত তাঁহার সহিত রীতিমত তর্কই জুড়িয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সকলকেই তাঁহার নিকট হার মানিতে হইল।

তখন ভরত বলিলেন, 'দাদা, যদি নিতান্তই না যাইবে, তবে তোমার পায়ের খড়ম দু-খানি আমাকে খুলিয়া দাও। এখন হইতে এই খড়মই আমাদের রাজা। আমরা ইহার চাকর। তোমার এই খড়ম লইয়া চৌদ্দ বৎসর তোমার মত গাছের ছাল পরিয়া, ফলমূল খাইয়া, অযোধ্যার বাহিরে তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। তাহার পরের বৎসরের প্রথম দিনে যদি তুমি ফিরিয়া না আইস, তবে আগুনে পুড়িয়া মরিব!'

রাম ভরতকে খড়ম দিয়া বলিলেন অবশ্য ফিরিব। ভাই, আমার মাকে দেখিও।' এই বলিয়া রাম ভরতকে বিদায় দিলেন। তারপর ভরত সেই খড়মকে হাতির উপর চড়াইয়া অযোধ্যায় লইয়া আসিলেন। সেখানে রাণীদিগকে রাখিয়া তিনি মন্ত্রী আর পুরোহিতদিগকে বলিলেন, 'দাদা যতদিন না আসেন, ততদিন আর অযোধ্যায় থাকিতে পারিব না। চলুন আমরা নন্দীগ্রামে যাই।'

নন্দীগ্রাম অযোধ্যার কাছেই। ভরত সেখানে গিয়া রামের খড়মকে সিংহাসনের উপর রাখিলেন। নিজে গাছের ছাল পরিয়া সেই খড়মের উপর ছাতা ধরিতেন, চামরের বাতাস করিতেন। রাজ্যের কোন কাজ আরম্ভ হইলে আগে খড়মের কাছে না বলিয়া কিছুই করিতেন না।

ভরত চলিয়া আসিলে পর রামের আর চিত্রকূটের কাছে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। তাই তিনি সীতা আর লক্ষ্মণকে লইয়া সেখান হইতে অত্রি মুনির আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

অত্রি আর তাঁহার স্ত্রী অনসূয়া দেবীর গুণের কথা কী বলিব! এমন ধার্মিক লোক অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহারা যে কত কাল যাবৎ তপস্যা করিতেছেন তাহা কেহ জানে না। অনসূয়া দেবী যার-পর-নাই বুড়া হইয়াছেন; তেমন বুড়া মানুষ রাম দেখেন নাই। সীতাকে অনসূয়া দেবীর এতই ভাল লাগিল যে, তিনি তাঁহাকে বর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সীতা বলিলেন, 'মা, আপনি যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। ইহার পর আবার বর লইয়া কী হইবে?'

কিন্তু অনসূয়া কি তাহাতে ভোলেন? আর কিছু না হউক, একখানি পোশাক, কতকগুলি অলঙ্কার, একছড়া মালা, আর গায়ে মাখিবার খানিকটা অঙ্গরাগ তিনি সীতাকে না দিয়া ছাড়িলেনই না। এইসকল জিনিস যে খুব সুন্দর ছিল, সে বিষয়ে তো কিছু সন্দেহই নাই; তাহা ছাড়া ইহাদের একটি আশ্চর্য গুণ এই ছিল যে, ইহারা কোন কালেও ময়লা হইত না।

এইরূপ আদরযত্নে অত্রি মুনির আশ্রমে এক রাত্রি থাকিয়া পরদিন সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম অন্য একটি বনে চলিয়া গেলেন। সে বনের নাম দণ্ডক বন।

অরণ্যকাণ্ড

দণ্ডক বনে অনেক মুনির আশ্রম ছিল। সেই সকল আশ্রমের মধ্যে এক রাত্রি থাকিয়া রাম সেখান হইতে আরও গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। বনবাসে আসিয়া অবধি এতদিনে তাঁহারা কোন রাক্ষস দেখিতে পান নাই। এইবার বেশ জমকালো রকমের একটা রাক্ষস তাঁহাদের সামনে পড়িল। বনের ভিতর সে দাঁড়াইয়া আছে, যেন একটা পাহাড়! চেহারার কথা আর কী বলিব। যেমন বিষম ভুঁড়ি, তেমনি বিদঘুটে হাঁ! তাহার উপর আবার গর্তপানা দুটো চোখ, গণ্ডারের চামড়ার মত চামড়া, আর পরনে রক্ত-চর্বি-মাখা বাঘছাল।

রাক্ষস মহাশয়ের তখন জলখাবার খাওয়া হইতেছিল। খাওয়ার আয়োজন বেশি নয়—গোটা তিনেক সিংহ, চারিটা বাঘ, দুটা গণ্ডার, দশটা হরিণ, আর একটা হাতির মাথা!

সে জলযোগে কাহারও কোন আপত্তি ছিল না, যদি হতভাগা সীতাকে লইয়া ছুট না দিত। সীতাকে লইয়া যাইতে দেখিয়া রাম 'হায় হায়!' করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদা, তুমি এত বড় বীর, তুমি কেন এমন করিয়া কাঁদিতেছ? এই দেখ, আমি রাক্ষস মারিয়া দিতেছি।'

তাহা শুনিয়া রাক্ষস বলিল, 'তোরা কে রে?' রাম বলিলেন, 'আমরা ক্ষত্রিয়। তুই কে?' রাক্ষস বলিল, 'আমার নাম বিরাধ;ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, অস্ত্র দিয়া কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না। তোরা শীঘ্র পালা!'

একথা শুনিয়া রাম বিরাধের গায়ে সাত বাণ মারিলেন। তখন সে সীতাকে ফেলিয়া, শূল হাতে বিকট শব্দে, হাঁ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে খাইতে আসিল। রাম লক্ষ্মণ যত বাণ মারেন, ব্রহ্মার বরে, তাহাতে তাহার কিছুই হয় না; সে গা-ঝাড়া দিয়া সব ফেলিয়া দেয়। এমন সময় রামের দুই বাণে তাহার শূলটা কাটা গেল। তারপরে দুই জনে খড়্গ লইয়া যেই তাহাকে আক্রমণ করিয়াছেন, অমনি সে দুজনকে কাঁধে ফেলিয়া দে ছুট।

তখন সীতা ভয়ানক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'ওগো রাক্ষস, তুমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমাকে খাও!' যাহা হউক, রাক্ষসের কাহাকেও খাইবার দরকার হইল না। কারণ, রাম লক্ষ্মণ তখনই তাহার দুই হাত ভাঙিয়া দিলেন, আর তাহাতে সে 'ভেউ ভেউ' করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

কিন্তু কী মুস্কিল! আপদ কিছুতেই মরিতে চায় না। দুইজনে তাহাকে কিল, লাথি, আছাড়, কত মারিলেন, মাটিতে ফেলিয়া থেতলা করিয়া দিলেন, খড়্গ দিয়া কাটিতে গেলেন, কিছুতেই তাহার মরণ নাই। তখন রাম বলিলেন, 'দেখ লক্ষ্মণ, এটা অস্ত্রে মরিবে না;চল এটাকে মাটিতে

পুঁতিয়া ফেলি।' এ কথা বলিয়া রাম সেই রাক্ষসের গলাটা পায়ে চাপিয়া ধরিলেন।

তখন রাক্ষস বলিতে লাগিল, 'বুঝিয়াছি, আপনারা রাম লক্ষ্মণ। আমি তম্বুরু নামে গন্ধর্ব ছিলাম, কুবেরের শাপে রাক্ষস হইয়াছি। কুবের আমাকে শাপ দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, দশরথের পুত্র রাম যুদ্ধ করিয়া আমাকে মারিলে, আমি আবার গন্ধর্ব হইয়া স্বর্গে যাইব।' এইরূপে নিজের পরিচয় দিয়া রাক্ষস বলিল, 'এখান হইতে দেড় যোজন দূরে শরভঙ্গ মুনি থাকেন। সেখানে গেলে আপনাদের ভাল হইবে। এরপর একটা গর্ত খুঁড়িয়া বিরাধকে পুঁতিলেই হয়। গর্ত খুঁড়িতে লক্ষ্মণেব অধিক কষ্ট হইল না, কিন্তু পুঁতিবাব সময় বিরাধ বড়ই চ্যাঁচাইয়াছিল।

তারপর তিনজনে শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গেলেন। রামকে দেখিতে শরভঙ্গের বড়ই ইচ্ছা। ইন্দ্র তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে আসেন, কিন্তু রামকে না দেখিয়া তিনি সেখানে যাইতে চাহেন নাই। রাম যে আসিবেন তাহা তিনি আগেই জানিতেন, আর শুধু তাঁহাকে দেখিবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

রামকে দেখা যখন হইয়া গেল, তখন আর এই পৃথিবীতে তাঁহার প্রয়োজন রহিল না। সুতরাং তিনি তখন রামের সম্মুখে নিজ হাতে আগুন জ্বালিয়া, তাহার ভিতরে গিয়া বসিলেন। তারপর দেখিতে তাঁহার সেই পুরাতন রোগা পাকা-চুল-দাড়িওয়ালা শরীর পুড়িয়া গিয়া, তাহার বদলে অতি সুন্দর আব উজ্জ্বল একটি বালকের মত চেহারা হইল। তখন তিনি রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'এখান হইতে তোমরা সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে যাইও, তাহাতে তোমাদের উপকার হইবে।' এই বলিয়া তিনি ব্রহ্মলোকে চলিযা গেলেন।

শরভঙ্গ মুনি স্বর্গে চলিয়া গেলে পর অন্য অনেক মুনি রামকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহাদের নিকট রাম জানিতে পারিলেন যে, রাক্ষসেবা তাঁহাদের উপর বড়ই অত্যাচার করে। তাহা শুনিয়া রাম বলিলেন, 'আপনাদের ভয় নাই, আমি রাক্ষস দূর করিয়া দিব।'

তারপর রাম লক্ষ্মণ আর সীতা সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে গেলেন। সুতীক্ষ্ণের ইচ্ছা ছিল যে, রাম আর অন্য কোথাও না গিয়া তাঁহার আশ্রমেই থাকেন। কিন্তু দণ্ডক বনের অন্যান্য মুনিদের সহিত দেখা করিতে রামের নিতান্ত ইচ্ছা দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা তবে যাও, কিন্তু দেখা হইয়া গেলে আবার আমার এখানে আসিবে।' রাম লক্ষ্মণ তাহাতে সম্মত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর দশ বৎসর ধরিয়া রাম লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যের তপোবন সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা যে মুনির নিকটেই যান তিনিই তাঁহাদিগকে কিছুদিন না রাখিয়া ছাড়েন না। কোথাও মাসেক, কোথাও চার পাঁচ মাস, কোথাও এক বৎসর, এইরূপে দশ বৎসর মুনিদের আশ্রমে আশ্রমে কাটাইয়া, শেষে তাঁহারা আবার সুতীক্ষ্ণের নিকটে আসিয়া কিছুদিন রহিলেন।

সকল মুনির সহিতই দেখা হইল, কিন্তু অগস্ত্য মুনির সহিত দেখা এখনও হয় নাই। রাম ভাবিলেন যে, এখন একবার তাঁহার সহিত দেখা করিলে বড় ভাল হয়। তাই তাঁহারা সুতীক্ষ্ণের নিকট বিদায় লইয়া অগস্ত্যের আশ্রমে গেলেন।

মুনিদের মধ্যে অগস্ত্য একজন অতিশয় বড় লোক। তাঁহার এক একটা কাজ বড়ই আশ্চর্য। একবার তিনি চুমুক দিয়া সমুদ্রটাকে খাইয়া ফেলেন। ইল্বল আর বাতাপি নামক দুইটা দৈত্যকে তিনি যেমন করিয়া মারেন, তাহা অতি চমৎকার।

ইল্বল আর বাতপি দুই ভাই ছিল। ইহাদের কাজ ছিল কেবল ব্রাহ্মণ মারিয়া খাওয়া। ইল্বল ব্রাহ্মণ সাজিয়া, সংস্কৃত কথা আওড়াইতে আওড়াইতে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইত।

কোন ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেই বলিত, 'আমার বাড়িতে শ্রাদ্ধ, আপনার নিমন্ত্রণ।' শ্রাদ্ধের কথা একেবারেই মিথ্যা; আসলে ফাঁকি দিয়া ব্রাহ্মণ বেচারাকে নিজের বাড়িতে আনা চাই।

দুরাত্মা, সেই ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দিয়া আনিয়া ভেড়া খাইতে দিত। সে আবার যে-সে ভেড়াও নয়, তাহার ভাই বাতাপি সেই ভেড়া সাজিত। সেই ভেড়ার মাংস রাঁধিয়া সে ব্রাহ্মণকে খাইতে দিত, আর খাওয়া হইলে ডাকিত, 'বাতাপি, বাতাপি'! বাতাপি তখন ভেড়ার মত 'ভ্যা ভ্যা' করিতে করিতে বেচারা ব্রাহ্মণের পেট চিরিয়া বাহির হইত। এইরূপে তাহারা অনেক ব্রাহ্মণ মারিয়াছিল।

এই দুই দৈত্যকে শাস্তি দিবার জন্য অগস্ত্য মুনি একবার তাহাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে গেলেন। ইল্বল তাঁহাকেও সেইরকম করিয়া ভেড়া রাঁধিয়া খাওয়াইল। সে জানিত না যে, এই সর্বনেশে মুনি তাহার ভাইকে একেবারে হজম করিয়া ফেলিবেন! খাওয়া শেষে ইল্বল ডাকিল, 'বাতাপি, বাতাপি!' অগস্ত্য বলিলেন, 'বাতাপি কোথা হইতে আসিবে? তাহাকে যে হজম করিয়া ফেলিয়াছি!' তাহা শুনিয়া ইল্বল অগস্ত্যকে মারিতে গেল, কিন্তু অগস্ত্য কেবল তাহার দিকে রাগের ভরে তাকাইয়াই তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

অগস্ত্য রামকে বিশ্বকর্মার তৈয়ারি একখানি ধনুক, ব্রহ্মদত্ত নামে একটা ভয়ঙ্কর বাণ, অক্ষয় তূণ নামক একটি তূণ, আর একখানি আশ্চর্য খড়্গ দিলেন। তূণটির এমন আশ্চর্য গুণ ছিল যে, তাহার ভিতরকার তীর কিছুতেই ফুরাইত না; এইজন্য তাহার নাম অক্ষয় তূণ। রাম সেই জিনিসগুলি লইয়া অগস্ত্যকে বলিলেন, 'মুনিঠাকুর, আমাদিগকে একটি সুন্দর জায়গা দেখাইয়া দিন, আমরা সেখানে ঘর বাঁধিয়া থাকিব।' অগস্ত্য একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'এখান হইতে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটী নামে একটি অতি সুন্দর বন আছে। সেখানে সুন্দর ফলমূল, মিষ্ট জল, হরিণ, ময়ূর ইত্যাদি সকলই পাওয়া যায়। তোমরা সেইখানে গিয়া সুখে বাস কর।' এ কথায় রাম অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া পঞ্চবটী যাত্রা করিলেন।

খানিক দূরে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, পথের ধারে বিশাল এক পাখি বসিয়া আছে। তাহাকে রাক্ষস ভাবিয়া রাম লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে হে?' সে বলিল, 'বাবা, আমি তোমাদের পিতার বন্ধু। আমার নাম জটায়ু। আমার দাদার নাম সম্পাতি, আমার পিতার নাম অরুণ। গরুড় আমাদিগের জ্যেঠামহাশয়।'

পাখি আরও বলিল, 'তোমরা আমার সঙ্গে এইখানে থাক, তাহা হইলে, তোমরা যখন ফল আনিতে যাইবে তখন আমি সীতাকে দেখিতে পারিব।' রাম লক্ষ্মণ তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার কথাবার্তা তাঁহাদের বড়ই মিষ্ট লাগিল।

সে স্থানটি বাস্তবিকই খুব সুন্দর। কাছেই গোদাবরী নদী; তাহাতে হাঁস, সারস প্রভৃতি নানারকমের পাখি খেলা করিতেছে। দুইধারে সুন্দর পাহাড়গুলি ফুলে ফলে বোঝাই হইয়া আছে। নদীতে হরিণ জল খাইতে আসে, আর বনের ভিতর ময়ূর ডাকে। ঘর বাঁধিয়া থাকিবার পক্ষে স্থানটি চমৎকার। এই সুন্দর স্থানে লক্ষ্মণ একটি সুন্দর ঘর বাঁধিলেন।

সেই ঘরটিতে তিনজনের বেশ সুখেই সময় কাটিতেছিল। কিন্তু সুখ কি চিরদিন থাকে? একদিন সূর্পণখা নামে একটা রাক্ষসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল, 'আমি রাবণ রাজার বোন, রামকে বিবাহ করিতে আসিয়াছি।' রাম তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইলেন না। তখন সে লক্ষ্মণকে বলিল, 'তুমি আমাকে বিবাহ কর।' লক্ষ্মণও রাজি হইলেন না। তাহাতে

সে হতভাগী হাঁ করিয়া সীতাকে খাইতে গেল। এত বাড়াবাড়ি করিলে কে সহ্য করিতে পারে? কাজেই তখন লক্ষ্মণ খড়্গ দিয়া তাহার নাক আর কান কাটিয়া দিলেন। সেই রক্তমাখা নাক কান লইয়া, রাক্ষসী হাত তুলিয়া চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে বনের ভিতর ঢুকিয়া গেল।

কাছেই জনস্থান বলিয়া একটা জায়গা। সেখানে সূর্পণখার আর এক ভাই থাকে, নাহার নাম খর। সূর্পণখা কাটা নাক কান লইয়া, সেই খরের সম্মুখে গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। ভগ্নীর নাক কান কাটা দেখিয়া খর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'একি সর্বনাশ! হায় হায়! কিসে তোমার এইরূপ হইল? তুমি কেমন সুন্দর ছিলে! যমের মত তোমার ভয়ানক চেহারা, আর গর্তপানা চোখ ছিল! কোন্ দুষ্ট তোমার এমন দশা করিল, শীঘ্র বল! তাহাকে এখনি উচিত সাজা দিতেছি!'

রক্তমাখা নাক কান লইয়া, রাক্ষসী হাত তুলিয়া

সূর্পণখা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'দশরথ রাজার দুটা ছেলে আসিয়াছে, তাহাদের নাম রাম আব লক্ষ্মণ। তাহবাই আমার এই দশা করিযাছে। আমার কোন দোষ নাই দাদা! আজ আমাকে তাহাদের রক্ত আনিয়া খাইতে দিতে হইবে।'

এই কথা শুনিয়া খর তখনই চৌদ্দটা রাক্ষসকে হুকুম দিল, 'তোমরা এখনই সেই তিনটা মানুষকে মারিয়া নিয়া আইস, সূর্পণখা তাহাদের রক্ত খাইবেন।' সেই হুকুম পাওয়ামাত্রই চৌদ্দটা রাক্ষস অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ছুটিল। সূর্পণখা তাহাদের সঙ্গে গিয়া রাম লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিল।

এদিকে রামও সীতাকে লক্ষ্মণের নিকট রাখিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। চৌদ্দটা রাক্ষস বিষম রাগে তাঁহার উপর চৌদ্দটা শূল ছুঁড়িয়া মারিল। রাম চৌদ্দ বাণে সেই চৌদ্দটা শূলকে কাটিয়া, নারাচ অস্ত্রে একেবারে রাক্ষসদিগেব বুক ফুটা করিয়া দিলেন। সে অস্ত্র তাহাদের পিঠ দিয়া বাহির হইয়া, মাটির ভিতরে অবধি ঢুকিয়া গেল। তাহা দেখিয়া সূর্পণখাও তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পালাইল।

সূর্পণখাকে আবার ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া খর বলিল, 'আবার কি হইয়াছে? তোমার সঙ্গে যাহারা গিয়াছিল, তাহারা কি সেই মানুষ তিনটাকে মারিতে পারে নাই?' সূর্পণখা বলিল, 'না, রামই তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছে। তুমি নিজে চল।' এই বলিয়া সে পেট চাপড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া, ঘোরতর শব্দে কাঁদিতে লাগিল।

তখন খর নিজেই তাহার ভাই দূষণকে লইয়া রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে চলিল। চৌদ্দ হাজার রাক্ষস শেল, শূল, মুষল, মুদগর, পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, তোমর, গদা, শক্তি, কুড়াল,

খড়্গা প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া গর্জন করিতে করিতে তাহাদের সঙ্গে চলিল। আকাশে দেবতারা ছুটিয়া দেখিতে আসিলেন, এবারে কী ভয়ানক যুদ্ধ হয়!

এদিকে রামও সীতাকে লক্ষ্মণের সঙ্গে একটা পর্বতের গুহায় লুকাইয়া রাখিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছেন। রাক্ষসেরা গর্জন করিতে করিতে আসিয়া রামের উপর প্রাণপণে অস্ত্র ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু রাম এমনই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে তাহারা কিছুতেই টিকিতে পারিল না। রামের বাণে তাহাদের হাতি, ঘোড়া, লোকজন যত ছিল সকলই একেবারে খণ্ড-খণ্ড হইয়া গেল।

কখন খরের ভাই দূষণ বড়ই রাগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। কিন্তু সে যে কেমন যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা আর বলিয়া কী হইবে। প্রথমেই তো রামের বাণে তাহার ঘোড়া গেল, সারথি গেল, ধনুক গেল। তখন সে লইল একটা পরিঘ। অমনি সেই পরিঘ-শুদ্ধ তাহার হাত দুটা কাটা গেল। তখন বেচারা মরিয়া গেল। তারপর আর তিনটা রাক্ষস আসিয়া ভালমতে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে না করিতেই মরিয়া গেল।

একলা রাম যুদ্ধ করিয়া চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে মারিলেন। অবশিষ্ট রহিল কেবল খর আর তাহার পুত্র ত্রিশিরা; ত্রিশিরা অতি অল্পক্ষণই যুদ্ধ করিয়াছিল; শেষে রহিল শুধু খর।

খর ভয়ানক যুদ্ধ জানিত। সে প্রথমে খুব তেজের সহিত যুদ্ধ করিয়া রামের ধনুক আর বর্ম কাটিয়া ফেলিল। কিন্তু রাম তখনই সেই অগস্ত্য মুনির ধনুকখানি লইয়া, ক্রমে তাহার রথ, সারথি, ঘোড়া, ধনুক সব চুরমার করিয়া দিলেন। তখন খরের এক গদা মাত্র বাকি, তাহাও কাটিতে রামের অধিক সময় লাগিল না। গদা কাটা গেলে খরের হাতে আর একখানিও অস্ত্র রহিল না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার তেজ যে কিছুমাত্র কমিল, তাহা নহে। অস্ত্র ফুরাইলে সে শালগাছ লইয়া যুদ্ধ করিল। শালকাছ কাটা গেলে, শুধু হাতেই মারিতে আসিল। শেষে রাম তাহার বুকে এক বাণ মারিয়া তাহার প্রাণ বাহির করিয়া দিলেন।

জনস্থানের যত রাক্ষস প্রায় সকলকেই রাম মারিয়া শেষ করিলেন। বাকি রহিল খালি অকম্পন নামে একটা। অকম্পন পলাইয়া লঙ্কায় গিয়া রাবণকে বলিল, 'মহারাজ, জনস্থানের যত রাক্ষস ছিল সকলই মরিয়া গিয়াছে। কেবল আমিই অনেক কষ্টে পলাইয়া আসিয়াছি।' তাহা শুনিয়া রাবণ আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'সে কী কথা অকম্পন! তাহারা কী করিয়া মরিল?'

অকম্পন বলিল, 'মহারাজ, অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম তাহাদিগকে মারিয়াছে। রাম যে কত বড় বীর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে একাই জনস্থান নষ্ট করিয়াছে। তাহার সঙ্গে আবার তাহার এক ভাই আছে, সেটার নাম লক্ষ্মণ।'

এ কথা শুনিয়া রাবণের রাগের আর সীমা রহিল না। সে তখনই রাম লক্ষ্মণকে মারিবার জন্য জনস্থানে যাইতে চাহিল। কিন্তু অকম্পন তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, 'মহারাজ কি রামকে যেমন-তেমন বীর ভাবিয়াছেন? আপনার সমস্ত রাক্ষস লইয়া গেলেও তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পারিবেন না। তবে, তাহাকে মারিবার একটা উপায় আছে। রাম তাহার স্ত্রী সীতাকে আনিয়াছে। সীতা এতই সুন্দর যে, তেমন আর কেহ দেখে নাই। আপনি যদি রামকে ফাঁকি দিয়া এই সীতাকে ধরিয়া আনিতে পারেন, তবে সেই দুঃখে রাম আপনিই মরিয়া যাইবে।' তাহা শুনিয়া রাবণ বলিল, 'আমি আজই যাইতেছি।'

এই বলিয়া সে, তাহার গাধায় টানা ঝকঝকে রথখানিতে চড়িয়া, সেই তাড়কার পুত্র

মারীচের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। মারীচ তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'মহারাজ যে এমন তাড়াতাড়ি করিয়া একলাটি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! ব্যাপারখানা কী?'

রাবণ বলিল, 'দশরথের ছেলে রাম জনস্থানের রাক্ষসদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছে। তাই আমি তাহার স্ত্রী সীতাকে ধরিয়া আনিতে যাইতেছি।' মারীচ বলিল, 'মহারাজ, এরূপ বুদ্ধি আপনাকে কে দিয়াছে? আপনি এইবেলা লঙ্কায় ফিরিয়া যাউন। রামের হাতে পড়িলে আপনার আর রক্ষা থাকিবে না!'

তাহা শুনিয়া রাবণ লঙ্কায় ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই দেখিল, সূর্পণখা, তাহার নাক কান কাটা। জনস্থানে রাক্ষসেরা মারা গেলে পর হতভাগী চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে লঙ্কায় চলিয়া আসিয়াছে।

সূর্পণখার কথা শুনিয়া রাবণ আবার মারীচের কাছে ফিরিয়া গেল। এবারে আর সে তাহার কোন কথাই শুনিল না। সে বলিল, 'মারীচ, আমার এ কাজটি করিয়া না দিলেই নয়। তুমি রামের আশ্রমে গিয়া, সোনার হরিণ সাজিয়া সীতার সম্মুখে নাচিয়া বেড়াইবে। তোমাকে দেখিলে নিশ্চয় সীতা তোমাকে ধরিবার জন্য রাম লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া দিবে। রাম লক্ষ্মণ আশ্রমের বাহিরে চলিয়া গেলে আর সীতাকে ধরিয়া আনিতে কিসের ভয়!'

মারীচ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে জোড়হাতে বলিল, 'মহারাজ, এক সময় আমার গায় হাজার হাতির জোর ছিল। আমি মনের সুখে দণ্ডকবনের মুনিদিগকে ধরিয়া খাইতাম, আর তাহাদের যজ্ঞ নষ্ট করিয়া বেড়াইতাম। আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ নষ্ট করিতে গেলাম, আর এই রাম ধনুক লইয়া আমাকে আটকাইতে আসিল। তখন সে ছোট্ট ছেলেমানুষ ছিল। আমি মনে করিলাম, ঐটুকু মানুষ আমার কী করিবে! কিন্তু সেই ঐটুকু মানুষই এমন এক বাণ আমাকে মারিল যে, আমি তাহার চোটে অজ্ঞান হইয়া এক সমুদ্রের জলে আসিয়া পড়িলাম। এমন লোকের সঙ্গে কি ঝগড়া করিতে যাইতে হয়? তাহার তো কিছু করিতে পারিবেনই না, মাঝখান হইতে আপনার প্রাণটি যাইবে'।

ঔষধ তিক্ত হইলে যেমন তাহা খাইতে ভাল লাগে না, মারীচের কথাও রাবণের কাছে সেইরূপ ভাল লাগিল না। সে বলল, 'একাজ তোমায় করিতেই হইবে। সোনার হরিণ, তাহার গায়ে রূপার চক্র, এমনি সাজ ধরিয়া তুমি সীতার সামনে গিয়া খেলা করিতে থাক। এমন হরিণটি দেখিলেই সীতা ভুলিয়া যাইবে, আর তোমাকে ধরিবার জন্য রামকে না পাঠাইয়া থাকিতে পারিবে না। রাম তোমার পিছনে পিছনে অনেক দূর আসিলে পর, তুমি রামের মতন গলায় চ্যাঁচাইবে, "হায় সীতা! হায় লক্ষ্মণ!" সে শব্দ শুনিলে, লক্ষ্মণ কি আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিবে? তাহাকে আশ্রম ছাড়িয়া রামের কাছে আসিতেই হইবে। তখন আর সীতাকে কে রাখে? মারীচ, এ কাজটি করিয়া দিলে আমার অর্ধেক রাজ্য তোমার। আর যদি না কর, তবে এখনি তোমার মরণ!'

কাজেই তখন আর বেচারা কী করে? রাবণের সঙ্গে সেই রথে চড়িয়া তাহাকে আসিতে হইল। সীতা তখন সাজি হাতে করিয়া ফুল তুলিতেছিলেন। এমন সময় সেই দুষ্ট রাক্ষস সোনার হরিণ সাজিয়া তাঁহার সামনে আসিয়া খেলা করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সীতা রাম লক্ষ্মণকে ডাকিলেন!

সোনার হরিণ দেখিয়াই লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদা, হরিণ কি কখনও সোনার হয়? এটা নিশ্চয়

সেই তাড়কার ছেলে মারীচের ফাঁকি। ঐ দুষ্ট অনেক সময় হরিণের সাজ ধরিয়া মুনিদিগকে মারিতে আসে।'

কিন্তু সীতা সেই হরিণ দেখিয়া এতই ভুলিয়া গেলেন যে লক্ষ্মণের কথা তাঁহার কানেই গেল না। তিনি রামকে বলিলেন, কী সুন্দর হরিণ! ওটি আমাকে ধরিয়া দিতেই হইবে। জীবন্ত ধরিতে পারিলে আমরা উহাকে পুষিব, আর দেশে যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। আর জীবন্ত ধরিতে না পারিলেও, উহার চামড়ায় সুন্দর আসন হইবে।'

লক্ষ্মণকে সাবধানে পাহারা দিতে বলিয়া রাম হরিণ ধরিতে চলিলেন। দুষ্ট রাক্ষস কতই ছল জানে! এক এক বার কাছে আসে, আবার বনের ভিতরে লুকায়, আবার খানিক দূর গিয়া গাছের আড়াল হতে উঁকি মারে। এরূপ করিয়া সে তাঁহাকে অনেক দূর হইয়া গেল। রাম যতক্ষণ মনে করিয়াছিলেন যে তাহাকে ধরিতে পারিবেন, ততক্ষণ ক্রমাগত তাহার পিছু-পিছু ছুটিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন যে আশ্রম হইতে অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছেন, তবুও তাহাকে ধরিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি একটা তীর ছুঁড়িয়া মারিলেন।

সেই তীরের ঘায় রাক্ষসের হরিণের সাজ ঘুচিয়া গেল। এখন তাহার প্রাণ যায়-যায়। মরিবার সময় সে বিকট রাক্ষস হইয়া ঠিক রামেরই মতন স্বরে 'হায় সীতা! হায় লক্ষ্মণ!' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া রাম বুঝিতে পারিলেন যে সর্বনাশ হইয়াছে। এ শব্দ সীতার কানে গেলে কি আর রক্ষা থাকিবে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি ব্যস্ত হইয়া আশ্রমের দিকে ফিরিলেন।

এদিকে সীতা আশ্রম হইতে সেই দুষ্ট রাক্ষসের কান্না শুনিতে পাইয়া রামের জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'হায় হায়! না জানি কী সর্বনাশ হইল! লক্ষ্মণ শীঘ্র যাও! নিশ্চয় তিনি রাক্ষসের হাতে পড়িয়াছেন!'

কিন্তু লক্ষ্মণকে রাম সীতার নিকট থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন, কাজেই তিনি সীতাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না। তখন সীতা লক্ষ্মণকে এই বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন 'বুঝিয়াছি, তাঁহাকে রাক্ষসে মারিয়া ফেলে ইহাই তুমি চাও। এমন ভাই তুমি!'

তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, "দাদাকে মারিতে পারে, ত্রিভুবনে এমন কেহ নাই। আপনি কেন আমাকে এইরূপ করিয়া বলিতেছেন? আপনাকে একলা ফেলিয়া যাওয়া কি আমার উচিত? আপনার কোন ভয় নাই। যে শব্দ শুনিয়াছেন উহা রাক্ষসের ফাঁকি। রাক্ষসদিগের সঙ্গে আমাদের এখন শত্রুতা; সুতরাং তাহারা আমাদের অনিষ্ট করিবার জন্য কতই চেষ্টা করিবেন। আপনি দুঃখ করিবেন না, স্থির হউন।'

কিন্তু সীতা আরও রাগিয়া বলিলেন, 'তবে রে নিষ্ঠুর দুষ্ট লক্ষ্মণ, রামের বিপদ হইলেই বুঝি তোর সুখ হয়? তোর মতন পাপী তো আর নাই! তোকে বুঝি ভরত পাঠাইয়াছে? না তুই নিজেই দুষ্ট বুদ্ধি আঁটিয়া রামের সঙ্গে আসিয়াছিস?'

এ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণের মনে যে কী কষ্ট হইল তাহা কী বলিব। তিনি বলিলেন, 'আপনাকে আমি মায়ের মতন ভক্তি করি। কিন্তু আপনি এমন শক্ত কথা আমাকে বলিতেছেন যে, আমার তাহা কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। যাহা হউক, এই আমি চলিলাম, বনের দেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন। সাবধান হইয়া ঘরে বসিয়া থাকুন, যেন দাদার সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া আবার আপনাকে দেখিতে পাই।' এই বলিয়া লক্ষ্মণ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়

বার বার ফিরিয়া তাকাইতে লাগিলেন, পাছে সীতার কোন অনিষ্ট হয়।

লক্ষ্মণ চলিয়া যাওয়া-মাত্রই সন্ন্যাসীর বেশে রাবণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে ছাতা লাঠি আর কমণ্ডলু, মাথায় টিকি, পায়ে জুতা, কপালে লম্বা ফোঁটা, মুখে ঘন-ঘন হরিনাম। দুষ্ট ক্রমে ঘরের দরজায় আসিয়া সীতার সহিত কথাবার্তা জুড়িয়া দিল; সীতা মনে করিলেন, বুঝি সে যথার্থই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী। কাজেই তিনি তাহাকে নমস্কার করিয়া, বসিবার জন্য কুশাসন আর পা ধুইবার জন্য জল আনিয়া দিলেন। তারপর তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর, ফলমূল আনিয়া দিই দয়া করিয়া কিছু আহার করুন।'

রাবণ এইরূপ সীতার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া শেষে বলিল, 'আমি লঙ্কার রাজা রাবণ। তুমি বনে থাকিয়া, এই তপস্বীটার সঙ্গে মিছামিছি এত কষ্ট কেন করিতেছ? আমার সঙ্গে লঙ্কায় চল। সেখানে তুমি যার-পর নাই সুখে থাকিবে।'

এই কথা শুনিয়া সীতা ভয়ানক রাগের সহিত বলিলেন, 'বটে রে দুষ্ট, তোর এত বড় কথা! এর উচিত সাজা তুই এখনি পাইবি!'

তখন রাবণ সন্ন্যাসীর সাজ ফেলিয়া তাহার নিজের চেহারায় দাঁড়াইল। সে যে কী বিকট মূর্তি, তাহা কী বলিব! দশটা মাথা, কুড়িটা হাত, কুড়িটা চোখ—দেখিলেই ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়! এইরূপ চেহারা করিয়া সে সীতাকে বলিল 'তুমি বুঝি পাগল, তাই আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? রামের মায়া ছাড়িয়া দাও। সেটা হতভাগা, তাহাকে ভালবাসা কি তোমার উচিত?'

এই কথা বলিতে বলিতেই রাবণের রথ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাবণও সীতার চুল ধরিয়া তাঁহাকে সেই রথে নিয়া তুলিতে আর বিলম্ব করিল না। সীতা রামের নাম ধরিয়া চিৎকার করিয়া কতই কাঁদিলেন, তাঁহার শরীরে যেটুকু জোর ছিল, তাহা লইয়াই প্রাণপণে ছুটিয়া পালাইবার জন্য কতই চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই ভয়ানক রাক্ষসের সঙ্গে তিনি পারিবেন কেন? রথ তাঁহাকে লইয়া আকাশে উড়িয়া চলিল। সীতা পশুপক্ষীকে, বনদেবতাদিগকে, গোদাবরী নদীকে ডাকিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ওগো, তোমরা দয়া করিয়া রামকে সংবাদ দাও। তাঁহার সীতাকে দুষ্ট রাবণ চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে!'

সে সময়ে বুড়া জটায়ু পক্ষী গাছে বসিয়া ঘুমাইতেছিল। সীতার কান্নার শব্দে সে জাগিয়া দেখিল যে, রাবণ তাঁহাকে লইয়া পালাইতেছে! তাহা দেখিয়া জটায়ু বলিল, 'বটে রে দুষ্ট রাক্ষস, আমি এখানে থাকিতেই তুই সীতাকে লইয়া পলাইবি? এখনই নখ দিয়া তোর মাথা ছিঁড়িয়া দিতেছি!'

তখন জটায়ু আর রাবণে বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাবণ জটায়ুকে ভয়ানক ভয়ানক বাণ মারে, আর জটায়ু নখের আঁচড়ে তাহার মাংস ছিঁড়িয়া নিতে ছাড়ে না। রাবণ জটায়ুর বুকে দশ বাণ মারিয়া মনে করিল এইবার পাখি মারবে। কিন্তু পাখি মরা দূরে থাকুক, বরং সে রাবণের ধনুকটা কাড়িয়া লইল, তাহার উপর আবার তাহাকে একটা প্রকাণ্ড লাথিও মারিল। তারপর রাবণ আবার নূতন ধনুক লইয়া আগের চেয়ে অনেক বেশী বাণ মারিল বটে, কিন্তু জটায়ু কি তাহাতে ডরায়? বাণ তো তাহার ডানার বাতাসেই উড়িয়া গেল। তারপর ধনুকখানি কাড়িয়া লইয়া তাহা মাড়াইয়া গুঁড়া করিতে কতক্ষণ লাগে!

এমনিতর ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া জটায়ু রাবণের রথ, ছাতা, সারথি, সহিস কিছুই আস্ত রাখিল

না। কিন্তু সেই বুড়া বয়সে বেচারা আর কত যুদ্ধ করিবে? সে শীঘ্রই কাহিল হইয়া পড়িল।

রাবণ দেখিল যে এইবেলা পালাইবার উত্তম সময়। সুতরাং সে হাতে একখানি খড়্গ আর বগলে সীতাকে লইয়া চুপি-চুপি চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া জটায়ু অমনি তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'দাঁড়া পাপী, যাইতেছিস কোথায়?' এই বলিয়া, হাতির পিঠে যেমন মাহুত চড়ে, সেইরূপ জটায়ু গিয়া রাবণের পিঠে চড়িল। তারপর তাহাকে ঠোকরাইয়া, আঁচড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া এমনি নাকাল করিল যে নাকাল যাহাকে বলে!

কিন্তু রাবণ সহজে মরিবার লোক ছিল না। ব্রহ্মা তাহাকে বর দিয়াছিলেন যে, তাহার শরীরের কোন জায়গা ছিঁড়িয়া গেলে তাহা তখনই জোড়া লাগিবে। জটায়ু তাহার বাম দিকের দশটা হাত ছিঁড়িয়া ফেলিতে না ফেলিতেই দেখিল যে, তাহার আর দশটা হাত বাহির হইয়াছে। এরূপ লোকের সঙ্গে কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায়? কাজেই শেষটা জটায়ু আর পারিল না। তখন সেই দুষ্ট রাক্ষস খড়্গ দিয়া বেচারার পা আর ডানা দুখানি কাটিয়া ফেলিল। জটায়ুর তখন প্রাণ যায়-যায়। এরপর আর সীতাকে কে রক্ষা করিবে? কাজেই তখন রাবণ তাঁহাকে লইয়া শূন্যে চলিয়া গেল।

সীতার দুঃখের কথা আর কী বলিব! হায় হায়! তাঁহার সেই কান্না কেহই শুনিতে পাইল না। সেই শূন্যের উপর হইতে সীতা এমন একটি লোক দেখিতে পাইলেন না যাহাকে ডাকিয়া বলিতে পারেন, 'আমাকে রক্ষা কর'। তিনি কেবল দেখিলেন যে, একটা পর্বতের উপর পাঁচটি বানর রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি তাঁহার সোনালী রঙের চাদরখানি আর গায়ের গহনাগুলি ফেলিয়া দিলেন। মনে করিলেন, হয়ত তাহা দেখিতে পাইয়া তাহারা রামকে বলিবে। রাবণ ইহার কিছুই টের পাইল না, কিন্তু বানরেরা তাহা চাহিয়া দেখিল।

এদিকে রাম সেই হরিণের-সাজ ধরা রাক্ষসটাকে মারিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিতেছেন, তাঁহার মনে ভয়ের আর সীমা নাই। এমন সময় দেখিলেন, লক্ষ্মণ অতিশয় দুঃখিতভাবে সেই দিকে দিয়া আসিতেছেন। লক্ষ্মণকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'সেকি লক্ষ্মণ, তুমি সীতাকে ফেলিয়া আসিয়াছ? না জানি কী সর্বনাশ হইয়াছে! সীতাকে হয়ত আর দেখিতে পাইব না!'

এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, সীতা নাই, খালি ঘর পড়িয়া রহিয়াছে। সীতা যে-সকল জায়গায় বেড়াইতেন, তাহার কোথাও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না।

হায় হায়! সীতা কোথায় গেলেন? তিনি কি কোথাও লুকাইয়া আছেন? না বনে ফুল তুলিতে গিয়াছেন? না নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন? কোথায় তিনি? গাছতলায়, নদীর ধারে, পাহাড়ের উপরে, কত জায়গায় রাম সীতাকে খুঁজিলেন, কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। গাছকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই সীতার সংবাদ বলিতে পারিল না।

তখন তিনি হাত পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'হায় রে, লক্ষ্মণ, কে আমাদের সীতাকে লইয়া গেল? সীতা তুমি বুঝি লুকাইয়া থাকিয়া তামাসা দেখিতেছ? শীঘ্র আইস, আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। তুমি চলিয়া গেলে যে আমি আর বাঁচিব না!'

লক্ষ্মণ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'দাদা, চল আরও ভাল করিয়া খুঁজি, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাকে পাইব।' কিন্তু রাম তবুও 'সীতা, সীতা!' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রামও কাঁদেন, লক্ষ্মণও কাঁদেন, আর চারিদিকে সীতাকে খোঁজেন।

এমন সময় তাঁহারা দেখিলেন, মাটিতে রাক্ষসের পায়ের দাগ রহিয়াছে, মাঝে মাঝে সীতারও পায়ের দাগ পাওয়া যায়। একটা ভাঙা রথ আর একটা ধনুক বাণের টুকরাও সেখানে পড়িয়া আছে।

এ-সকল পায়ের চিহ্ন কাহার? এত বড় পা রাক্ষস ভিন্ন আর কাহার হইবে? নিশ্চয় সীতাকে রাক্ষসে লইয়া গিয়াছে, না হয় মারিয়া খাইয়াছে!

এইরূপ ভাবিয়া রাম বলিলেন, 'আমার সীতাকে রাক্ষসে লইয়া গেল, আর দেবতারা বারণ করিলেন না। আজ যদি আমার সীতাকে তাঁহারা না আনিয়া দেন, তবে আমি সকল সৃষ্টি নষ্ট করিব!' লক্ষ্মণ তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'দাদা, রাগ করিও না। চল এখন ভাবিয়া দেখি এ কাজ কে করিয়াছে। সেই দুষ্টকে শাস্তি দিতেই হইবে।'

লক্ষ্মণের কথায় রাম একটু শান্ত হইলেন। তারপর তাঁহারা বনের ভিতর খুঁজিতে খুঁজিতে এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, জটায়ু রক্তমাখা শরীরে পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া রাম বলিলেন, 'এই দুষ্টই সীতাকে খাইয়াছে! এটা পাখি নয়, নিশ্চয় রাক্ষস! ঐ দেখ উহার বুকে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে!' এই বলিয়া রাম জটায়ুকে মারিতে গেলেন। তখন জটায়ু বলিল, 'বাবা, রাবণই আমাকে মারিয়া রাখিয়াছে, তুমি আর আমাকে মারিও না। সীতাকে লইয়া যাইতে দেখিয়া আমি তাহার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলাম, কিন্তু দুষ্ট আমার পাখা কাটিয়া সীতাকে লইয়া গেল।'

এই কথা শুনিয়া রাম তীর ধনুক ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, জটায়ুকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জটায়ুর তখন মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই;কথা কহিতেও কষ্ট হয়। তথাপি সে রামকে শান্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। প্রাণ যায় যায়, তবুও অনেক চেষ্টা করিল যাহাতে তাঁহাকে সীতার খবর দিয়া যাইতে পারে। কিন্তু হায়! বেচারা কথা শেষ করিবার সময় পাইল না। সবে বলিয়াছিল; 'রাবণ বিশ্বশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভাই', ইহার মধ্যেই তাহার কথা আটকাইয়া গেল।

রাম তাহাকে ধরিয়া দেখেন, প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন রাজা দশরথের মতন কোনও একজন গুরুলোকের মৃত্যু হইল। আপনার লোক মরিলে লোকে যেমন করিয়া তাহাকে পোড়ায়, আর তাহার জন্য কাঁদে, জটায়ুকেও সেইরূপ করিয়া পোড়াইয়া রাম তাহার জন্য কাঁদিলেন। তারপর দুই ভাই বনে বনে গুহায় গুহায়, সীতাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এমন সময় ভয়ানক শব্দে বন কাঁপিয়া উঠিল। রাম লক্ষ্মণ খড়্গ হাতে সেই শব্দের দিকে অনেক দূর গিয়া দেখিলেন, বিষম বিকটাকার একটা রাক্ষস বসিয়া আছে। সে-রকম রাক্ষসের নাম কবন্ধ; তাহার মাথা থাকে না। কী ভয়ঙ্কর জানোয়ার! যেন একটা হাত-পা-ওয়ালা কালো পর্বত! মাথা নাই, তাহার বদলে পেটটাই দাঁত খিঁচাইয়া হাঁ করিয়া আছে, আর তাহার ভিতর হইতে প্রকাণ্ড একটা জিহ্বা লক্‌লক্ করিয়া বাহির হইতেছে! চোখ একটি বৈ নাই, কিন্তু সেই একটা চোখ আগুনের মত উজ্জ্বল। একটা একটা হাত প্রায় দুই ক্রোশ লম্বা! সেই লম্বা হাত দিয়া সে সিংহ, হরিণ, হাতি যাহা পাইতেছে তাহাই ধরিয়া মুখে দিতেছে!

রাম লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকেও সে ধরিয়া ফেলিল। লক্ষ্মণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, 'দাদা, এইবার বুঝি প্রাণটা যায়!' কিন্তু রাম তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, 'ভয় কী? ব্যস্ত হইতেছ কেন?'

তখন সেই রাক্ষসটা বলিল, 'তোমরা কে হে? এখানে কী করিতে আসিয়াছ? হাতে ধনুক, বাণ, খড়্গ দেখিতেছি; গায়ে জোর আছে বলিয়া বোধ হয়। আর আমারও ক্ষুধা হইয়াছে। সুতরাং তোমাদিগকে খাইব।' কিন্তু সে তাহার প্রকাণ্ড মুখ অথবা পেট, যাহাই বল হাঁ করিয়া যেই রাম লক্ষ্মণকে খাইতে যাইবে, অমনি লক্ষ্মণ খড়্গ দিয়া তাঁহারা তাহার হাত দুইটা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন সে বেদনায় অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কে?' লক্ষ্মণ তাঁহাদের নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'তুমি কে? কবন্ধ হইলে কী করিয়া?'

রাম লক্ষ্মণের পরিচয় পাইয়া কবন্ধ বলিল, 'আমার বড়ই সৌভাগ্য যে আজ তোমাদিগকে দেখিতে পাইলাম, আর তোমরা আমার হাত কাটিলে। আমার নাম দনু। এক সময়ে আমি বড় সুন্দর ছিলাম, আর ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছিলাম যে অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিব। ইহার মধ্যে একদিন আমি রাক্ষসের সাজ ধরিয়া স্থূলশিরা নামক এক মুনিকে ভয় দেখাইতে গেলাম। তাহাতে মুনি আমাকে শাপ দিলেন, "তুই ঐরূপ হইয়াই থাক্!" শাপ দূর করিয়া দিবার জন্য আমি অনেক মিনতি করিলে, তিনি বলিলেন, "রাম যখন তোর হাত কাটিয়া তোকে পোড়াইবেন, তখন আবার তোর সুন্দর চেহারা হইবে।"

'এইরূপ করিয়া আমি রাক্ষস হইলাম। তারপর আবার একদিন আমি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলাম। তাহাতে ইন্দ্র তাঁহার বজ্র দিয়া আমাকে এমন শাস্তি দিলেন যে, আমার মাথা আর পা একেবারে পেটের ভিতর ঢুকিয়া গেল। কিন্তু তবুও আমি মরিলাম না। তখন আমি এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলাম, "হায় হায়! ব্রহ্মার বরে যে আমাকে অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে! এখন আমি খাইব কী করিয়া?" ইহাতে ইন্দ্র দয়া করিয়া আমাকে এই লম্বা হাতদুটা দিলেন। ইহা দিয়াই আমি এতদিন জীবজন্তু ধরিয়া খাইতেছি। রাম, তুমি আমাকে পোড়াইয়া ফেল। তাহা হইলে আমার আবার সুন্দর শরীর হইবে।'

তারপর রাম লক্ষ্মণ প্রকাণ্ড চিতা জ্বালিয়া কবন্ধকে তাহাতে পোড়াইলেন। সেই চিতার ভিতর হইতে সুন্দর চেহারা লইয়া কবন্ধ উঠিয়া আসিল; আর ঠিক সেই সময়ে একখানা হাঁসের টানা রথও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই রথে চড়িয়া কবন্ধ রামকে বলিল, 'সুগ্রীব নামে এক বানর আছে। তাহার বড় ভাই বালী তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়াতে সে এখন আর চারিটি বানর সঙ্গে করিয়া পম্পা নদীর ধারে ঋষ্যমূক পর্বতে ভয়ে ভয়ে বাস করে। সুগ্রীব যেমন বীর, তেমনি বুদ্ধিমান। তুমি তাহার সহিত বন্ধুতা কর। সে সীতার সন্ধানও করিতে পারিবে, তাঁহাকে পাইবার উপায়ও করিয়া দিবে।'

এ কথায় কবন্ধের নিকট বিদায় লইয়া রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে খুঁজিবার জন্য পম্পা নদী ও ঋষ্যমূক পর্বতের দিকে যাত্রা করিলেন।

পম্পার ধারে শবরী নামে একজন অতিশয় বুড়া তপস্বিনী বাস করিতেন। তিনি কেবল রামকে দেখিবার জন্যই এতদিন বাঁচিয়া ছিলেন। রামের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিলেন, 'রাম, তোমাকে যখন দেখিতে পাইয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আমি স্বর্গে যাইতে পারিব। তোমার জন্য এই ফলমূল আনিয়া রাখিয়াছি, তুমি দয়া করিয়া তাহা লও।'

এইরূপে রামকে আদর করিয়া, তাঁহার সম্মুখেই তিনি নিজের শরীর আগুনে পোড়াইয়া ফেলিলেন। তারপর সেই আগুনের ভিতর হইতে অতি সুন্দর বেশে বাহির হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

ম্পা নদী পার হইলে ঋষ্যমূক পর্বত। সেই ঋষ্যমূক পর্বতের নিকটে বানর দিগের রাজা সুগ্রীব আর কয়েকটি বানর সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সে দেখিল যে, দুইজন মানুষ সেই দিকে আসিতেছে।

এই দুইজন অবশ্য রাম ও লক্ষ্মণ ছাড়া আর কেহ নহেন। কিন্তু সুগ্রীবের মনে সর্বদাই বালীর ভয় লাগিয়া ছিল। বালী তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, আবার কখন হয়ত তাহার লোক আসিয়া তাহাকে মারিবে। এইজন্য রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়াই সে ভাবিল, বুঝি তাঁহারাও বালীরই লোক। তাই সে সঙ্গের বানরদিগকে ডাকিয়া বলিল, 'সর্বনাশ হইয়াছে, এই দুজন নিশ্চয়ই বালীর লোক!' এই কথা শুনিয়া অন্যান্য বানরদিগের মনেও ভারি ভয় হইল।

কিন্তু উহাদিগের মধ্যে হনুমান বলিযা একজন ছিল, সে বলিল, 'কিসের ভয়? বালী তো ঋষ্যমূক পর্বতে আসিতেই পারে না, আব ঐ লোকদুইটির সঙ্গেও তাহাকে দেখিতেছি না।' তাহা শুনিয়া সুগ্রীব বলিল, 'ও দুইজনকে দেখিয়া আমার বড়ই ভয় হইতেছে। উহারা বালীর লোক হইতেও পারে। হনুমান, তুমি একবার গিয়া জানিয়া আইস না, উহারা কিরূপ লোক, আর কেন এখানে আসিয়াছে!'

হনুমান তখন দাড়ি গোঁফ পরিয়া একটি ভিখারী সাজিল। তারপর রাম লক্ষ্মণের কাছে গিয়া মিষ্ট কথায় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, 'মহাশয়, আপনারা কে? কী জন্যই বা এখানে আসিয়াছেন? আপনাদের দেখিলে যেমন তেমন লোক বলিয়া বোধ হয় না! এমন সুন্দর চেহারা, হাতে চমৎকার অস্ত্র, আর শরীরে বোধ হইতেছে যেন কতই জোর! এই ঋষ্যমূক পর্বতে বানরের রাজা সুগ্রীব থাকেন। তাঁহার ভ্রাতা বালী তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়াতে তিনি মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সুগ্রীব খুব বীর, আর বড়ই ধার্মিক। তিনি আপনাদের সহিত বন্ধুতা করিতে চাহেন, এবং সেইজন্যই আপনাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহার মন্ত্রী, আমার নাম হনুমান। আমি পবনের পুত্র, জাতিতে বানর।'

হনুমানের কথা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'আমি সুগ্রীবকে খুঁজিতেছি, এমন সময় তাহার মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটিকে অতিশয় বিদ্বান, বুদ্ধিমান আর বীর বলিয়া বোধ হইতেছে; ইহার কথাগুলি কী মিষ্ট আর কেমন শুদ্ধ! এতক্ষণ কথা কহিল, তবুও একটা পাড়াগেঁয়ে কথা উহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। লক্ষ্মণ, তুমি ইহার সঙ্গে কথাবার্তা বল।'

তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, 'আমরাও সুগ্রীবকে খুঁজিতেছি। আমরা অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। ইঁহার নাম রাম, আমার নাম লক্ষ্মণ। আমি ইঁহার ছোট ভাই, সৎমার ছলনায় ইঁনি আমাকে

লইয়া বনে আসিয়াছেন। ইঁহার স্ত্রী সীতাদেবীও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ দুষ্ট রাক্ষস তাঁহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে, তাহার কিছুই জানি না। শুনিয়াছি তোমাদের রাজা সুগ্রীব খুব বুদ্ধিমান। হয়ত তিনি সেই রাক্ষসকে জানেন। তাই রাম তাঁহার সহিত বন্ধুতা করিতে আসিয়াছেন।'

হনুমান বলিল, 'সুগ্রীব অবশ্যই ইঁহার সহিত বন্ধুতা করিবেন, আর বানরদিগকে লইয়া সীতাকে খুঁজিবার সাহায্য করিবেন। বালীর ভয়ে তিনি বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, সুতরাং আপনাদের আসাতে তাঁহারও উপকার হইতে পারে।'

তারপর হনুমান রাম লক্ষ্মণকে পিঠে করিয়া সুগ্রীবের নিকট লইয়া গেল। সুগ্রীব রামের পরিচয় পাইয়া বলিল, 'রাম, তুমি পৃথিবীর মধ্যে সকলের বড় আর আমি বানর। তুমি আমার সহিত বন্ধুতা করিতে আসিয়াছ, আমার কী সৌভাগ্য!'

তখনই হনুমান দুইখানি কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালিল। সেই আগুনের সম্মুখে সুগ্রীব রামের সহিত কোলাকুলি করিয়া বলিল, 'তুমি আমার বন্ধু হইলে। এখন হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা, আমরাও তাহাই ইচ্ছা হইবে। যাহাতে তোমার সুখ হয়, তাহাতে আমারও সুখ হইবে, আর যাহাতে তোমার দুঃখ হয়, তাহাতে আমারও দুঃখ হইবে।' এইরূপে রাম আর সুগ্রীবের বন্ধুতা হইয়া গেল। তারপর তাঁহারা গাছের পাতার বিছানায় বসিয়া নিজ-নিজ সুখ-দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন।

রাম বলিলেন, 'বন্ধু, আমি বালীকে মারিয়া তোমার ভয় দূর করিব।' সুগ্রীব বলিল, 'বন্ধু, তুমি সাহায্য করিলে আমি যে আবার রাজ্য পাইব, তাহতে সন্দেহ কী? তোমার কষ্টও দূর করিয়া দিব। সীতা যেখানেই থাকুন, আমরা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবই করিব। কেহই তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না। সেদিন এইখান দিয়া রাবণ একটি মেয়েকে লইয়া যাইতেছিল। বোধহয় তিনিই সীতা। তিনি তোমার নাম ধরিয়া কাঁদিতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া গায়ের চাদর আর গহনা ফেলিয়া গেলেন। আমরা তাহা পর্বতের গুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছি, দেখিলে হয়ত চিনিতে পারিবে।'

এই বলিয়া সুগ্রীব সীতার সেই-সকল অলঙ্কার আর কাপড় আনিয়া রামকে দেখাইল। সীতার গায়ের চাদর, তাঁহার দুইখানি নূপুর, তাঁহার কেয়ুর আর কুণ্ডল—এ সকল দেখিয়া রাম চিনিতে পারিলেন। তখন তাঁহার দুঃখ যেন আরও বাড়িয়া গেল। সুগ্রীব তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিল, 'বন্ধু, দুঃখ করিও না। আমরা নিশ্চয়ই সীতাকে আনিয়া দিব।' এইরূপে দুই বন্ধুতে দুজনার দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন।

তারপর সুগ্রীব আর বালীর ঝগড়ার কথা উঠিল। একটা অসুর ছিল, তাহার নাম মায়াবী। সে দুন্দুভি নামক দানবের বড় ছেলে। একবার বালীর সঙ্গে মায়াবীর যুদ্ধ হয়। তখন বালীর তাড়া খাইয়া সে একটা প্রকাণ্ড গর্তের ভিতরে গিয়া ঢোকে। বালীও সুগ্রীবকে সেই গর্তের মুখে রাখিয়া সেই অসুরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরে ঢুকিল।

সুগ্রীব এক বৎসর সেই গর্তের মুখের কাছে বসিয়া রহিল কিন্তু বালী ফিরিল না। শেষে গর্তের ভিতর হইতে গরম রক্ত বাহির হইতে লাগিল, অসুরদিগের ভয়ানক গর্জন শোনা গেল। তাহাতে সুগ্রীব মনে করিল, বুঝি বালী মারা গিয়াছে। তখন সে অসুরের ভয়ে গর্তের মুখে এক প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিল। সেখানকার

লোকেরা বালী মরিয়াছে জানিয়া সুগ্রীবকে রাজা করিল।

ইহার পর বালী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সুগ্রীব রাজা হইয়াছে। তখন সে বলিল, 'আমি সুগ্রীবকে গর্তের মুখে রাখিয়া অসুর মারিতে গিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে হতভাগা আমার রাজ্য লইবার ফন্দি করিয়া আমাকে পাথর চাপা দিয়া আসিয়াছে!' এই বলিয়া সে সুগ্রীবকে অনেক কষ্ট দিয়া তাড়াইয়া দিল। তাহার কোন কথাই শুনিল না।

তাহার পর হইতে সুগ্রীব বালীর ভয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে আসিয়া বাস করিতেছে। মতঙ্গ মুনির শাপে বালী ঋষ্যমূক পর্বতে আসিতে পারে না। কাজেই সেখানে থাকিলে সুগ্রীবের ভয় অনেকটা কম থাকে।

রাম বালীকে মারিবেন শুনিয়া সুগ্রীব খুব সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু এ কাজ তিনি করিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে তাহার মনে সন্দেহ ছিল। বালী যেমন তেমন বীর ছিল না। সকালে উঠিয়া সে চার সাগরের জল দিয়া আহ্নিক করিত, পর্বতের চূড়া লইয়া গোলা খেলিত।

দুন্দুভি নামে মহিষের চেহারাওয়ালা একটা অসুর ছিল। সে এমন প্রকাণ্ড ছিল, আর তাহার গায়ে এতই জোর ছিল যে, কেহই তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহস পাইত না। দুন্দুভি সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেল; সমুদ্র হাতজোড় করিয়া বলিল, আমি পারিব না, হিমালয়ের কাছে যাও!' হিমালয়ের কাছে গেলে হিমালয় বলিল, 'আমি কি যুদ্ধ জানি? আমি অমনি হার মানিতেছি।' তখন দুন্দুভি বলিল, 'তবে আমি কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব শীঘ্র বল, নহিলে তোমাকে গুঁতাইয়া গুঁড়া করিব।' হিমালয়ে বলিল, 'কিষ্কিন্ধ্যায় বানরের রাজা বালী থাকেন। তাঁহার কাছে যাও। তিনি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবেন।'

দুন্দুভি তখনই কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া বালীর দরজার সম্মুখে ভয়ানক গর্জন করিতে লাগিল। গর্জন শুনিয়া বালী সেখানে আসিলে দুন্দুভি বলিল, 'তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব।' তখন বালী দুই হাতে তাহার দুইটা শিং ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপর তাহার লেজ ধরিয়া তাহাকে মাটিতে খালি আছাড়ের পর আছাড়—ঠিক যেমন করিয়া ধোপা কাপড় কাচে। এইরূপে সেটা মরিয়া গেলে পর তার লেজ ধরিয়াই ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাকে একেবারে চার ক্রোশ দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

সেই সময় দুন্দুভির রক্ত মতঙ্গ মুনির আশ্রমে গিয়া পড়ে। তাহাতে সেই মুনি বালীকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, সে সেখানে গেলেই মাথা ফাটিয়া যাইবে। মাথা ফাটিবার ভয়ে বালী আর সেখানে আসে না। দুন্দুভির হাড়গুলি তখনও ঋষ্যমূক পর্বতে পড়িয়া ছিল। সুগ্রীব রামকে তাহা দেখাইল। বালীর গায়ে কি যেমন-তেমন জোর ছিল! সাতটা বড় বড় শালগাছ একসঙ্গে ধরিয়া বালী তাহাতে এমনি নাড়া দিতে পারিত যে, সেই নাড়াতেই তাহাদের সমস্ত পাতা ঝরিয়া পড়িত।

কাজেই বালীকে সুগ্রীব এত ভয় করিত। আর সেইজন্যই রাম তাহাকে মারিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইল। তাহার ভয় দেখিয়া লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, কী করিলে তোমার বিশ্বাস হইবে যে দাদা বালীকে মারিতে পারিবেন?' সুগ্রীব বলিল, 'ঐ যে সাতটা তালগাছ দেখিতেছ, বালী তাহার এক একটাকে একেবারে এপিঠ ওপিঠ করিয়া ফুঁড়িয়া ফেলিতে পারেন। রাম যদি ঐ দুন্দুভির হাড় দুইশত ধনু দূরে ফেলিতে পারেন, আর বাণ মারিয়া একটা তালগাছ ফুটা করিতে পারেন, তবে বুঝিব তিনি বালীকে মারিতে পারিবেন।'

এই কথা শুনিয়া রাম হাসিতে হাসিতে পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া দুন্দুভির সেই পাহাড়ের মত হাড়গুলিকে ঠেলিয়া দিলেন, আর সেগুলি একেবারে চল্লিশ ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িল। কিন্তু তাহাতেও সুগ্রীবের সন্দেহ গেল না। সে বলিল, 'এখন কিনা হাড়গুলি শুকাইয়া হাল্কা হইয়া গিয়াছে, এখন তো এত দূরে ফেলিতে পারিবেই। বালী আস্ত মহিষটাকে ফেলিয়াছিলেন, সেটা তখন মাংস আর চর্বিতে ইহার চেয়ে কত ভারী ছিল! আচ্ছা, একটা তালগাছ ফুটা কর দেখি!'

তাহা শুনিয়া রাম একটা বাণ মারিলেন। সে বাণ একেবারে সেই সাতটা তালগাছকে ফুঁড়িয়া, পাহাড়টাকে সুদ্ধ ফুঁড়িয়া পাতালে ঢুকিয়া গেল। পাতালে গিয়াও কিন্তু সে থামিল না, থামিল আসিয়া রামের তূণে। তখন সুগ্রীব তাড়াতাড়ি রামের পায়ের ধূলা লইতে পারিলে বাঁচে। সে বুঝিতে পারিল যে, ভাল করিয়া রামের এক বাণ খাইলে বালী নিশ্চয় মরিয়া যাইবে।

তবে আর কিসের ভয়! এখন কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া বালীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইতে পারিলেই কাজ হইবে। সুতরাং সকলে মিলিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আসিল।

সেখানে আসিয়া সুগ্রীব কোমরে কাপড় জড়াইয়া, আকাশ ফাটাইয়া চিৎকার করিতে লাগিল, 'কোথায় গেল দাদা? আইস দেখি, একবার যুদ্ধ করি!' তাহা শুনিয়া রাগে বালীর রক্ত গরম হইয়া উঠিল। আর কি সে বসিয়া থাকিতে পারে! তখনই দাঁত কড়মড় করিতে করিতে ঝড়ের মতন আসিয়া উপস্থিত। তখন দুইজনে কী ভয়ানক যুদ্ধ হইল, তাহা কী বলিব! কিল আর চড়ের চোটে দুইজনের মুখ দিয়াই রক্ত উঠিতে লাগিল।

এদিকে রাম বড়ই ভাবনায় পড়িয়াছেন। বালী আর সুগ্রীব দেখিতে একই রকম। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে যুদ্ধের সময় বালীকে বাণ মারিবেন। কিন্তু এখন কোন্‌টা যে বালী, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিতেছেন না। বাণ মারিলে তাহাতে বালী না মরিয়া যদি সুগ্রীব মরিয়া যায়, তবে তো সর্বনাশ!

কাজেই তখন আর বাণ মারা হইল না। সে-যাত্রা সুগ্রীবকে কেবল অনেকগুলি কিল চড় খাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঋষ্যমূক পর্বতে পালাইয়া আসিতে হইল। সেখানে আসিয়া সে রামকে বলিল, 'বন্ধু, এই বুঝি তোমার কাজ! তোমার কথায় আমি বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া এতগুলি মার খাইলাম, আর তুমি চুপ করিয়া তামাশা দেখিলে!'

তখন রাম তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, 'বন্ধু, রাগ করিও না। আমি যে কেন বাণ মারি নাই, তাহা শোন। তুমি আর বালী দেখিতে ঠিক একই রকম। কাজেই তোমাদের কোন্‌টি কে, আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। বালীকে মারিতে গিয়া যদি তোমাকে মারিয়া ফেলিতাম, তাহা হইলে লোকে আমাকে কী বলিত? তুমি আবার যুদ্ধ করিতে যাও, আর এমন একটা কোন চিহ্ন লইয়া যাও যাহাতে আমি তোমাকে চিনিতে পারি। তাহা হইলে দেখিবে, এক বাণেই আমি বালীকে মারিয়া ফেলিব।'

এই কথা বলিয়া তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'লক্ষ্মণ, তুমি ফুল-শুদ্ধ ঐ নাগপুষ্পী লতাটি আনিয়া সুগ্রীবের গলায় বাঁধিয়া দাও।' লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন।

এবারে সুগ্রীবের মনে খুবই সাহস। সুতরাং সে আগের চেয়ে অনেক বেশী করিয়া চ্যাচাইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া বালীও বাহির হইয়া আসিতে আর বিলম্ব করিল না। রাগ দু-জনেরই সমান। দুজনেই বলে, 'ঘুঁষি মারিয়া তোর মাথা গুঁড়া করিয়া দিব!' আর যুদ্ধও যেমন-তেমন

হইল না। কিল, চড়, লাথি, গুঁতা, আঁচড়, কামড়, কোনটারই ত্রুটি নাই। তারপর আবার গাছ পাথর লইয়াও যুদ্ধ হইল। কিন্তু বালীর গায় জোর বেশী থাকাতে, শেষে সুগ্রীব কাবু হইয়া পড়িতে লাগিল।

এমন সময় রামের বাণ ভয়ানক শব্দে বালীর বুকে আসিয়া বিঁধিল। বাণের ঘায় বালীকে মাটিতে পড়িতে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণ তাহার নিকট ছুটিয়া আসিলেন। তখন বালী রামকে অনেক গালি দিল।

সে বলিল, 'তুমি কেমন লোক! চুরি করিয়া কেন আমার উপর বাণ মারিলে? সামনে আসিয়া যুদ্ধ করিতে, তবে দেখিতাম! আমাকে মারিয়া তোমার কী লাভ হইল?'

রাম বলিলেন, 'তুমি দুষ্ট লোক, তোমাকে মারতে আমার কোন অন্যায় হয় নাই। আমার বন্ধুর নিকট আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে তোমাকে মারিব, কাজেই তোমাকে মারিয়াছি।'

বালীকে মারিয়া বন্ধুর উপকার করিয়াছেন, কাজেই ইহাতে রামের মনে কষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু শেষে যখন বালীর স্ত্রী তারা আর তাহার পুত্র অঙ্গদ সেখানে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন সুগ্রীবও চক্ষের জল রাখিতে পারিল না।

মরিবার সময় বালীর ভাল বুদ্ধি হইয়াছিল। তখন সে সুগ্রীবকে ডাকিয়া বলিল, 'ভাই, বুদ্ধির দোষে অন্যায় করিয়াছি, ক্ষমা কর। আমার অঙ্গদকে তোমার নিকট রাখিয়া গেলাম। তাহাকে তুমি তোমার পুত্রের মত দেখিও।' এই বলিয়া সে নিজের গলার সোনার হার সুগ্রীবের গলায় পরাইয়া দিল। সেই সোনার হার বালীকে ইন্দ্র দিয়াছিলেন। তাহার গুণ অতি আশ্চর্য।

বালীর মৃত্যুর পর রাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা আর অঙ্গদকে যুবরাজ করিলেন। তারপর সীতাকে খুঁজিবার আয়োজন হইতে লাগিল। সুগ্রীব হনুমানকে ডাকিয়া বলিল, 'হনুমান, শীঘ্র বানরদিগকে সংবাদ দাও, যে সকল বানর খুব শীঘ্র চলিতে পারে, তাহারা দশ দিনের ভিতরে পৃথিবীর সকল বানরকে ডাকিয়া উপস্থিত করুক। মহেন্দ্র পর্বতে, হিমালয়ে, বিন্ধ্যাচলে, কৈলাসে আর মন্দর পর্বতে যে সকল বানর আছে, সমুদ্রের পারে, উদয় পর্বতে আর অস্ত পর্বতে, অঞ্জন পর্বতে, আর পদ্মাচলে কালো কালো হাতির মতন যে সকল বানর আছে, পর্বতের গুহার ভিতরে, সুমেরুর পাশে যে সকল বানর আছে; আর মহারুণ পর্বতে যে সকল ভয়ঙ্কর বানর আছে, আমাদের দূতেরা তাহাদের সকলকেই এখানে ডাকিয়া আনুক।'

তখনই চারিদিকে দূতসকল ছুটিয়া চলিল, আর দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর সকল বানর আসিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইতে লাগিল।

অঞ্জন পর্বত হইতে আসিল তিন কোটি বানর; কৈলাস হইতে আসিল এক হাজার কোটি, অস্তাচল হইতে দশ কোটি, হিমালয়ের বানর ফল খায়, কিন্তু সিংহের মত জোরালো—সেই বানর এক হাজার খর্ব, গর্জন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল; বিন্ধ্য পর্বতের কালো বানর এক হাজার কোটি আসিল; ক্ষীরোদ সমুদ্রের পারে যে সকল বানর নারিকেল খাইয়া থাকে, তাহারাও আসিল।

পৃথিবীর বানর আর আসিতে কেহ বাকি নাই। তাহা ছাড়া কিষ্কিন্ধ্যায় কত কোটি বানর আছে, তাহার হিসাব কে করিবে? বানরের পায়ের ধূলায় আকাশ অন্ধকার, সূর্য দেখা যায় না। কিষ্কিন্ধ্যাতে আর স্থান নাই। কত বানর আসিয়াছে, আর কত আসিতেছে! তাহাদের কেহ লাফায়, কেহ গর্জন করে, কেহ কেহ কুস্তি আরম্ভ করিয়াছে।

তারপর সুগ্রীব সীতাকে খুঁজিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইল। পূর্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে, উত্তরে, কোনখানেই লোক পাঠাইতে বাকি রহিল না। সুগ্রীব তাহাদিগকে বলিল, 'এক মাসের মধ্যে তোমাদের ফিরিয়া আসা চাই; না আসিলে প্রাণদণ্ড হইবে।'

এই-সকল বানরের মধ্যে হনুমানও ছিল। সুগ্রীব তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'হনুমান, তুমি জলে, শূন্যে, স্বর্গে সকল স্থানেই যাইতে পার, আর সকল স্থানের খবর জান। তোমার মতন বীর কে আছে? যাহাতে খুব ভাল করিয়া সীতার খোঁজ হয়, তুমি সেইরূপ করিবে।' হনুমানকে দেখিয়া রামও বুঝিয়াছিলেন যে, সে নিশ্চয়ই সীতার সংবাদ আনিতে পারিবে। তাই তিনি তাহার হাতে তাঁহার নিজের নাম লেখা একটি আংটি দিয়া বলিলেন, 'এই আংটি দেখিলেই সীতা তোমাকে আমার লোক বলিয়া জানিতে পারিবেন।' হনুমান জোড় হাতে আংটিটি লইয়া রামকে প্রণাম করিল।

তারপর বানরেরা সীতার খোঁজ করিবার জন্য গর্জন করিতে করিতে চারিদিকে ছুটিয়া চলিল। কেহ বলে, 'আমি রাবণকে মারিয়া সীতাকে আনিব।' কেহ বলে, 'আরে না! তোমরা থাক, আমিই সব করিব।' কেহ বলে, 'আমি পাহাড় গুঁড়া করিব।' কেহ বলে, 'আমি এক যোজন লাফাইব।' কেহ বলে, 'আমি দশ যোজন লাফাইব।' কেহ বলে, আমি দশ হাজার যোজন লাফাইব।'

এইরূপ করিয়া বানরেরা সীতাকে খুঁজিতে বাহির হইল। ক্ষুধা হইলে তাহারা ফল খায়; রাত্রিতে গাছেই ঘুমায়। এক মাস পর্যন্ত এমনি করিয়া খুঁজিয়া, তাহারা পৃথিবীর কোন স্থান দেখিতে বাকি রাখিল না। কত দেশে, কত বনে, কত পাহাড়ে যে তাহারা গিয়াছিল, তাহার শেষ নাই।

সমুদ্রে যে-সকল দ্বীপ আর পাহাড় আছে, সেখানে ভয়ঙ্কর কালো কালো জন্তু থাকে,—তাহাদের কান পর্দার মত হইয়া ঠোঁট অবধি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের একটা বৈ পা নাই কিন্তু তবুও তাহারা বাতাসের মত ছোটে— সেইখানে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

যেখানে পিঙ্গলবর্ণ কিরাতেরা থাকে—তাহারা কাঁচা মাছ খায়—সেইখানে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

বাঘমুখো মানুষের দেশে, যব দ্বীপে, স্বর্ণ দ্বীপে, রৌপ্য দ্বীপে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

ভয়ঙ্কর ইক্ষু সমুদ্রের ধারে বিকটাকার রাক্ষসেরা থাকে, তাহারা জন্তুর ছায়া ধরিয়া টানিয়া তাহাকে খায়। সেইখানে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

তারপর লাল সমুদ্র। সেখানে রাক্ষসেরা পাহাড়ের চুড়া ধরিয়া বাদুড়ের মত ঝুলিতে থাকে। সূর্যের তেজে তাহাদের মাথা গরম হইয়া গেলে তাহারা সমুদ্রের জলে পড়িয়া যায়; সেখান হইতে ঠাণ্ডা হইয়া আবার পাহাড়ে উঠিয়া ঝুলিতে থাকে। সেই লাল সমুদ্রে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

তারপর ক্ষীরোদ সমুদ্র। তারপর জলোদ সমুদ্র। সেখানে অতি বিশাল একটা ঘোড়ার মুখ হইতে ক্রমাগত আগুন বাহির হইতেছে, আর তাহা দেখিয়া সমুদ্রের জন্তুসকল ভয়ে চিৎকার করিতেছে। সেই জলোদ সমুদ্রে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

যেখানে সূর্য উদয় হয়, সেই সোনার পর্বতে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল। তাহার পরে কেবলই অন্ধকার; সেখানে কেহই যাইতে পারে না।

বৃষভ পর্বত দেখিতে ষাঁড়ের মতন, তাহাতে গন্ধর্বেরা থাকে। সেখানে নানারকম চন্দন গাছ আছে, কিন্তু তাহার কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে বড়ই বিপদ হয়। সেখানেও তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

চন্দনগিরি নামক পর্বতে একরকম পক্ষী থাকে, তাহার নাম সিংহ পক্ষী। তাহারা হাতি আর তিমিমাছ ধরিয়া খায়। সেই পক্ষীর বাসায় তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

সুমেরু পর্বত পার হইলে অস্তাচল; সেখানে সূর্য অস্ত যান। ততদূর পর্যন্ত তাহারা সীতাকে খুঁজিতে গিয়াছিল। তাহার পর কেবল অন্ধকার; সেখানে কেহই যাইতে পারে না।

উত্তরকুরু দেশের নদীতে সোনার পদ্ম ফোটে, আর তাহার তীরে মুক্তা ছড়ানো থাকে। সেই দেশে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

তাহার পরে উত্তর সমুদ্র। তাহার মাঝখানে সোমগিরি নামক সোনার পর্বত আছে। সূর্য না উঠিলেও, সোমগিরির আলোকেই পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সোমগিরি বড় ভয়ানক পর্বত, সেখানে বানরেরা যাইতে পারে নাই।

এইরূপ করিয়া তাহারা সীতাকে খুঁজিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইল না। এক মাস পরে আর সকলেই কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিল; কেবল হনুমান আর তাহার সঙ্গে যাহারা গিয়াছিল, তাহারা এখনও ফিরে নাই।

হনুমান, অঙ্গদ, তার, আর জাম্ববান, অনেক বানর লইয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল। তাহারা অনেক খুঁজিয়াও সীতাকে দেখিতে পাইল না। প্রথমে ভয়ানক একটা বনের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা কাহিল। তারপর সেখান হইতে যে জায়গায় আসিল, তাহা আরও ভয়ঙ্কর। সে পোড়া দেশে গাছপালা নাই, জীবজন্তু জন্মাইতে পায় না, নদীসকল শুকাইয়া গিয়াছে, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পাইবার জো নাই। কবে কন্ডু বলিয়া এক মুনি ছিলেন, এই হতভাগ্য দেশে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হয়। সেই পুত্রের শোকে কন্ডু মুনি দেশটাকে শাপ দিয়া তাহার এই দশা করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, সেখানেও তাহারা সীতার কোন সন্ধান পাইল না।

সেখান হইতে তাহারা আর একটা বনে গিয়া ঢুকিবামাত্রই একটা বিকটাকার অসুর তাহাদিগকে তাড়িয়া মারিতে আসিল। অঙ্গদ মনে করিল, বুঝি এটাই রাবণ। এই মনে করিয়া সে তাহাকে এক চড় মারিল যে, সে চড় খাইয়া আর তাহার উঠিয়া যাইতে হইল না। এক চড়েই অসুরের বাছা মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিয়া অস্থির।

কিন্তু এত খুঁজিয়াও সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না। এদিকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাহাদের প্রাণ যায়, আর চলিবার শক্তি নাই। এমন সময়ে তাহারা একটা প্রকাণ্ড গর্তের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গর্তের নাম ঋক্ষ বিল। তাহার ভিতর হইতে হাঁস, সারস প্রভৃতি পক্ষী উড়িয়া বাহির হইতেছিল। সে সকল পক্ষীর শরীরে জল দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে, নিশ্চয়ই এই গর্তের ভিতরে জল আছে।

এই মনে করিয়া তাহারা সেই গর্তের ভিতর ঢুকিল। গর্তের মুখের কাছে খানিক দূর পর্যন্ত ভয়ানক অন্ধকার, কিন্তু সেই অন্ধকারের পরেই একটি অতি সুন্দর এবং আশ্চর্য স্থান। সেখানকার সকলই সোনার। গাছপালাও সোনার, জলের মাছও সোনার, পদ্মফুলও সোনার। কেবল পদ্মের কাছে যে মৌমাছি উড়িতেছে তাহা মানিকের।

সেই স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা একটি তপস্বিনী দেখিতে পাইল। তাঁহার শরীরে এত

তেজ যে, দেখিলে মনে হয় যেন আগুন জ্বলিতেছে। তাহারা তপস্বিনীকে প্রণাম করিয়া জোড়হাতে বলিল, 'মা, আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এখানে আসিয়াছি। এ আশ্চর্য দেশ কাহার, আর এ সকল জিনিস কী করিয়া সোনার হইল, তাহা জানিতে আমাদের বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।'

তপস্বিনী বলিলেন, 'বাছা, এ স্থান ময় নামক দানবের তৈয়ারি। তোমরা এখানে কেন আসিয়াছ? ইহা যে অতি ভয়ঙ্কর স্থান।' এই বলিয়া তিনি নানারকম মিষ্ট ফল আর ঠাণ্ডা জল আনিয়া বানরদিগকে খাইতে দিলেন। বানরেরা তাহা খাইয়া তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিল।

এদিকে আর-এক নূতন বিপদ উপস্থিত। সেই গর্তের ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের এক মাস চলিয়া গেল, তবুও তাহারা বাহিরে আসিবার পথ পায় না। তাহা দেখিয়া সেই তপস্বিনী তাহাদিগকে বলিলেন, 'বাছাসকল, এ গর্তের ভিতর একবার আসিলে কেহই জীবন্ত বাহিরে যাইতে পারে না। যাহা হউক, তোমাদের কোনও ভয় নাই। তোমরা খানিক চোখ বুজিয়া থাক আমি তোমাদিগকে বাহিরে লইয়া যাইতেছি।' এই কথা শুনিয়া বানরেরা সেখানে চোখ বুজিয়া রহিল;তারপর চাহিয়া দেখিল যে, তাহারা বাহিরে বিন্ধ্য পর্বতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নিকটে সমুদ্র, তাহার গর্জন শোনা যাইতেছে।

গর্তের বাহিরে আসিয়া কিন্তু তাহাদের একটুও আনন্দ হইল না;বরং নানা চিন্তায় তাহাদের মন অস্থির হইয়া উঠিল। তাহাদের তখন বার-বার এই কথা মনে হইতে লাগিল, 'এখন দেশে গিয়া কী বলিব? এক মাস তো চলিয়া গেল;কিন্তু হায়, সীতার কোন সংবাদই পাওয়া গেল না! এখন কোন্ মুখে দেশে ফিরিব? সুগ্রীব আগেই বলিয়াছেন যে এক মাসের ভিতর না ফিরিলে তিনি মারিয়া ফেলিবেন। কাজেই আর কিসের ভরসায় বা দেশে ফিরিব? তাহার চেয়ে এইখানে না খাইয়া মরা অনেক ভাল।'

সুতরাং তাহারা স্থির করিল যে, তাহারা আর দেশে না গিয়া সেইখানেই না খাইয়া মরিবে। এইরূপে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তাহারা খাওয়া দাওয়া ছাড়িয়া দিয়া দক্ষিণ মুখে সমুদ্রের ধারে বসিয়া রহিল;তখন তাহাদের কান্না ছাড়া আর কোন কাজ রহিল না। তাই তাহারা রামের কথা, সীতার কথা, জটায়ু পাখির কথা আর নিজেদের দুঃখের কথা বলিয়া কেবলই কাঁদিতে লাগিল।

সেই বিন্ধ্য পর্বতের উপরে জটায়ুর দাদা সম্পাতি পাখি থাকিত। সে বানরদিগকে দেখিয়া বলিল, 'অনেক দিন পরে আমার জন্য এতগুলি খাবার জিনিস উপস্থিত হইয়াছে। আমার বড়ই ভাগ্য! এই-সকল বানরের এক-একটা মরিবে আর আমি খাইব।'

এইথা শুনিয়া অঙ্গদ হনুমানকে বলিল, 'ঐ দেখ যম নিজেই পাখি সাজিয়া আমাদিগকে লইতে আসিয়াছে। আমাদের প্রাণ গেল, তবুও রামের কাজ হইল না! জটায়ু যুদ্ধ করিয়া সীতার জন্য প্রাণ দিয়াছিল, জটায়ুই সুখী!'

জটায়ুর নাম শুনিয়া সম্পাতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'হায়! কে তোমরা আমার প্রাণের ভাই জটায়ুর মৃত্যুর কথা বলিতেছ? জটায়ু কেমন করিয়া মরিল? আমার পাখা পুড়িয়া গিয়াছে, আমি উড়িতে পারি না। তোমরা আমাকে ধরিয়া নামাও।'

সম্পাতির কথায় প্রথমে বানরদের বড় ভয় হইল, পাছে পাখিটাকে পাহাড় হইতে নামাইলে সে তাহাদিগকে ঠোকরাইয়া খাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু শেষে তাহারা ভাবিল, 'আমরা যখন

মরিতে বসিয়াছি, তখন ঐ পাখিটা আমাদিগকে খাইলে আমরা যাহা চাই তাহাই তো হইবে, আর বেশী কী।' তখন অঙ্গদ সম্পাতিকে পাহাড় হইতে নামাইয়া আনিল। তারপর নিজেদের পরিচয় দিয়া রামের বনবাসের কথা, রাবণের সীতাকে লইয়া যাইবার কথা, জটায়ুর মৃত্যুর কথা, সীতাকে খুঁজিবার কথা, এক-এক করিয়া সকলই তাহাকে বলিল।

অঙ্গদের কথা শুনিয়া সম্পাতি বলিল, 'তোমরা যে জটায়ুর কথা বলিতেছ, সে আমার ভাই। তাহাকে যে মারিয়াছে, তাহার শাস্তি দিই এমন শক্তি আমার আর নাই। ছেলেবেলায় আমরা দুই ভাই মিলিয়া ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় সূর্যের নিকট দিয়া আসিতে গিয়া তাহার তেজে জটায়ু অজ্ঞান হয়ে গেল। তাহাকে ঢাকিতে গিয়া আমিও পাখা পুড়িয়া এখানে পড়িলাম। সেই অবধি আমি এখানে পড়িয়া আছি জটায়ুর কী হইয়াছে আমি জানি না।'

ইহা শুনিয়া অঙ্গদ বলিল, 'রাবন কোথায় থাকে তুমি জান কি? সম্পাতি বলিল, 'একদিন রাবণকে আমি একটি মেয়েকে লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। সেই মেয়েটি 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া কাঁদিতেছিলেন। বোধহয় তিনিই সীতা। সামনের এই সমুদ্র একশত যোজন চওড়া; তারপর লঙ্কাদ্বীপ, সেই লঙ্কায় রাবণের বাড়ি। তোমরা এই সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় যাও। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি তোমরা সেখান হইতে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়া আসিতে পারিবে। বাবণ সীতাকে লইয়া যাইবার সময় আমাব পুত্র সুপার্শ্ব তাহার পথ আটকাইয়াছিল, কিন্তু রাবণ মিনতি করাতে ছাড়িয়া দিল। আমার পাখা নাই, আমি আর কী করিতে পারি? আমি কেবল মুখের কথা বলিয়াই রামের উপকার করিব। তোমরা আর বিলম্ব করিও না। যাহা করিলে বামের কাজ হইতে পারে তাহা কর।'

এই কথা বলিয়া সম্পাতি আবার বলিল, 'সীতাকে যে রাবণ লইয়া যাইবে, এ কথা নিশাকর নামে এক মুনি আমাকে অনেক দিন আগেই বলিয়াছিলেন। আট হাজার বৎসর আগে এখানে নিশাকর মুনির আশ্রম ছিল; ছেলেবেলায় আমি আব জটায়ু তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতাম। তিনিও আমাদিগকে বড়ই স্নেহ করিতেন। আমার যখন পাখা পুড়িয়া গেল, তখন তিনি বলিলেন, 'তুমি দুঃখ করিও না; তোমার আবার পাখা হইবে। তুমি এখান হইতে কোথাও যাইও না। আমি তপস্যা করিয়া জানিয়াছি যে, রাজা দশরথের পুত্র রামের স্ত্রী সীতাকে রাবণ চুরি করিয়া লইয়া যাইবে। সেই সীতাকে খুঁজিবার জন্য রামের দূতেরা এখানে আসিলে, তুমি তাহাদিগকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিও। তাহা হইলেই তোমার আবার পাখা হইবে।' সেই অবধি আমি তোমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিয়া এইখানে বসিয়া আছি। আমার অনেক দুঃখ, কিন্তু রামের এই কাজটি করিবার জন্য আমি সকল দুঃখ ভুলিয়া আছি। সুপার্শ্ব সীতার সাহায্য করে নাই বলিয়া আমি তাহাকে বকিয়াছিলাম।'

কী আশ্চর্য! এই কথা বলিতে বলিতে সম্পাতির সুন্দর লাল রঙের পাখা হইল। তখন সে বানরদিগকে ডাকিয়া বলিল, 'দেখ! মুনির বরে আমার আবার পাখা হইয়াছে, আর গায়ে যেন সেই আমার প্রথম বয়সের মতন জোর বোধ হইতেছে। তোমরা চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই সীতাব সন্ধান পাইবে।' এই বলিয়া সম্পাতি আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়া চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া বানরদিগের মনে যে আনন্দ ও আশা হইল, তাহা আর কী বলিব! তখন তাহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, সীতার খবর পাওয়া যাইবে।

কিন্তু কী করিয়া সীতার খবর পাওয়া যাইবে? একশত যোজন সমুদ্র ডিঙাইতে পারিলে তবে তো লঙ্কা! আর সেই লঙ্কায় গেলে তবে তো সীতার সন্ধান হয়! বানরেরা সমুদ্রের ধারে আসিয়া অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। এত বড় সমুদ্র পার হইয়া সীতার সংবাদ আনা বড়ই কঠিন দেখা যাইতেছে। এ কাজ কে করিবে?

তখন অঙ্গদ বলিল, 'তোমরা তো সকলেই খুব বীর। বল দেখি ভাই কে কত দূর লাফাইতে পার?'

অঙ্গদের কথা শুনিয়া তার বলিল, 'আমি দশ যোজন লাফাইতে পারি।' গবজাক্ষ বলিল, 'আমি কুড়ি যোজন পারি।' শরভ বলিল, 'আমি ত্রিশ যোজন পারি।' ঋষভ বলিল, 'আমি চল্লিশ যোজন পারি।' গন্ধমাদন বলিল, 'আমি পঞ্চাশ যোজন পারি।' মৈন্দ বলিল, 'আমি ষাট যোজন পারি।' দ্বিবিদ বলিল, 'সত্তর যোজন পারি।' সুষেণ বলিল, 'আশি যোজন পারি।' জাম্ববান বলিল, 'নববই যোজন পারি।' সকলের কথা শুনিয়া অঙ্গদ বলিল, 'আমি একশত যোজন সমুদ্র ডিঙাইতে পারি; কিন্তু ফিরিয়া আসিতে পারিব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে।"

তখন জাম্ববান বলিল, 'রাজপুত্র তুমি ইচ্ছা করিলে এক হাজার যোজন পার হইতে পার, কিন্তু নিজে তাহা করিতে যাইবে কেন? তুমি হুকুম দিবে, আমরা কাজ করিব। যে এ কাজের যোগ্য লোক, আমি তাহাকে ঠিক করিয়া দিতেছি।'

এই বলিয়া সে হনুমানকে বলিল, 'বাপু হনুমান, তুমি যে এত বড় বীর হইয়া এমন চুপ করিয়া এক পাশে বসিয়া আছ, তাহার কারণ কী? তুমি তো যেমন-তেমন লোক নহ!

বাস্তবিকই হনুমান যেমন-তেমন লোক ছিল না। যখন হনুমানের জন্ম হয়, তখন সূর্য উঠিতেছিল। লাল সূর্য দেখিয়া সে মনে করিল, বুঝি তাহা কোনরূপ ফল। তাই সে লাফাইয়া তাহা ধরিতে গেল। সূর্যের তেজে তাহার কিছুই হয় নাই, কিন্তু ইন্দ্র তাহাকে দেখিয়া বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। বজ্র খাইয়াও সে মরিল না, কেবল পর্বতের উপরে পড়িয়া তাহার বাঁ পাশের হনু অর্থাৎ দাড়ি ভাঙিয়া গেল। সেইজন্য তাহার নাম হইল হনুমান।

হনুমান পবন দেবতার পুত্র। ইন্দ্র হনুমানকে বজ্র মারাতে পবন রাগ করিয়া সমস্ত বাতাস বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহাতে সংসারে লোক নিশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। তখন দেবতারা দেখিলেন বড় বিপদ! কাজেই তাঁহারা পবনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য হনুমানকে বর দিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, 'কোন অস্ত্রে হনুমানের মৃত্যু হইবে না।' ইন্দ্র বলিলেন, 'তাহার নিজের ইচ্ছা ভিন্ন কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইবে না।'

বড় হইয়া হনুমান অসাধারণ বীর হইয়াছে। সে যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাইতে পারে, কিছুতেই তাহাকে আটকায় না। সেই হনুমানকে ডাকিয়া এখন জাম্ববান বলিল, 'বাছা, তুমি এ কাজটি করিলে আমাদের প্রাণ বাঁচে।'

তখন হনুমান বলিল, 'ঐ যে মহেন্দ্র পর্বত দেখা যাইতেছে, উহা খুব উঁচু আর মজবুত। ঐ স্থান হইতে লাফাইবার সুবিধা হইবে।' এই কথা বলিয়া সে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়া উঠিল।

মহেন্দ্র পর্বত দেখিতে খুব সুন্দর, আর বড়ও কম নহে। তাহাতে বড় বড় বন আছে, ঝর-ঝর শব্দে কত ঝরনা বহিতেছে, পাখিরা গাছে বসিয়া মনের সুখে গান গাহিতেছে। আর বাঘ, সিংহ, হাতি প্রভৃতি জানোয়ারেরা দলে দলে বনের ভিতর চরিয়া বেড়াইতেছে। হনুমানের

সঙ্গে সঙ্গে বানরের দল পর্বতে উঠিয়া ইহাদের সুখ ভাঙিয়া দিল। তখন তাহারা কে কোথায় পালাইবে তাহাই ভাবিয়াই ব্যস্ত। পাখিরা উড়িতে লাগিল, সাপগুলি গর্তের ভিতর গিয়া লুকাইল, অনেকে পর্বত ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সুন্দরকাণ্ড

হেন্দ্র পর্বতে উঠিয়া হনুমান একটি ছোট মাঠের উপর দাঁড়াইল। তারপর জোড়হাতে দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া সে লাফ দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে সময়ে তাহার শরীর এত বড় হইয়াছিল যে, তাহার ভার মহেন্দ্র পর্বতের সহ্য হইল না। সেই পর্বতের ভিতর হইতে তখন এমনি করিয়া জল বাহির হইয়াছিল যে, ভিজা গামছাকে নিংড়াইলে তাহার চেয়ে বেশি করিয়া জল বাহির হয় না। সেখানকার জীবজন্তুরা মনে করিল, বুঝি পৃথিবীর শেষ উপস্থিত। মুনিরা পর্বত ছাড়িয়া দূরে গিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন।

তারপর হনুমান দুই হাতে মাটিতে ভর দিয়া, লেজ মোটা করিয়া, শরীর কোঁচকাইয়া, পা গুটাইয়া এমনই ভয়ানক লাফ দিল যে, তাহার কথা মনে করিলেও যার-পর নাই আশ্চর্য বোধহয়। সেই লাফের চোটে পর্বতের গাছপালা অবধি তাহার পিছু-পিছু ছুটিয়া চলিল; সমুদ্রের জল গিয়া আকাশে উঠিল। তখন হনুমানকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন একটা পর্বত আকাশের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। সেজন্য দেবতারা তাহার কতই প্রশংসা করিলেন।

এদিকে সমুদ্র মৈনাক পর্বতকে ডাকিয়া বলিল, 'মৈনাক, তুমি তুমি শীঘ্র জলের ভিতর হইতে মাথা জাগাইয়া দাও। হনুমানের বোধহয় পরিশ্রম হইয়াছে; সে তোমার চূড়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিবে।'

মৈনাক পর্বত সমুদ্রের জলের নীচে থাকে। সমুদ্রের কথায় সে তখনই জল হইতে উঠিয়া হনুমানের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু হনুমানের বিশ্রামের কিছুমাত্র দরকার নাই। তাহার উপরে আবার তাহার বড় তাড়াতাড়ি। কাজেই সে মৈনাককে বুকের ধাক্কায় সরাইয়া দিল।

তখন মৈনাক বলিল, 'হনুমান, তুমি একটু আমার চূড়ায় দাঁড়াইয়া বিশ্রাম কর। আমার চূড়ায় মিষ্ট ফল আছে তুমি তাহা আহার কর। সত্য যুগে যখন সকল পর্বতেরই পাখা ছিল, তখন তাহারা যেখানে ইচ্ছা চলিয়া বেড়াইত, আর তাহাদের চাপে অনেক জীবজন্তু মারা যাইত। এইজন্য ইন্দ্র বজ্র দিয়া সকল পর্বতেরই পাখা কাটিয়া দেন। কিন্তু তোমার পিতা পবনদেব

দয়া করিয়া আমাকে সমুদ্রের জলে উড়াইয়া ফেলাতে, ইন্দ্র আমার পাখা কাটিতে পারেন নাই। হনুমান, তোমার পিতা আমার এই উপকার করিয়াছিলেন। তুমি কি আমার চূড়ায় একটু বিশ্রাম করিয়া আমাকে সুখী করিবে না?'

হনুমান বলিল, 'মৈনাক, তোমার কথা শুনিয়াই আমার মনে যার-পর নাই সুখ হইয়াছে। কিন্তু ভাই, আমি ব্যস্ত আছি, এখন বসিতে পারিব না; আমাকে মাপ কর।'

এই বলিয়া মৈনাককে ছুঁইয়া হনুমান আবার ছুটিয়া চলিল।

দেবতারা দেখিলেন যে, হনুমান বড়ই ভয়ানক কাজ করিতে চলিয়াছে। এ কাজ সে কবিযা আসিতে পারিবে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তাঁহাদের বড়ই ইচ্ছা হইল। তাই তাঁহারা নাগদিগের মাতা সুরসাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'সুরসা ঠাকরুন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটিবার হনুর পথটা আগলাইয়া দাঁড়ান তো! দেখি সে কেমন বীর!'

দেবতাদের কথায় সুরসা ভয়ঙ্কর রাক্ষসীর বেশে, হাঁ করিয়া হনুমানেব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হনুমান তাহা দেখিয়া নিজের শরীরটাকে দশ যোজন বড় করিয়া ফেলিল। সে মনে করিয়াছিল যে, এত বড় হইলে আর রাক্ষসী তাকে গিলিতে পারিবে না। কিন্তু রাক্ষসী তখনই তাহার দশ যোজনের জায়গায় বিশ যোজন হাঁ করিয়া বসিল।

কী বিপদ! হনুমান যতই বড় হয়, রাক্ষসী অমনি তাহার চেয়েও বড় হাঁ করে! দশ যোজন, বিশ যোজন, ত্রিশ যোজন, চল্লিশ যোজন, পঞ্চাশ যোজন, ষাট যোজন, সত্তর যোজন, আশী যোজন— হনুমান যতই বড় হইতেছে, রাক্ষসী তাহার চেয়ে বড় হাঁ করিতেছে! হনুমান মনে করিল, 'আর বড় হইয়া কী হইবে? অন্য উপায় দেখা যাক।'

তখন সে হঠাৎ বুড়া আঙুলটির মতন ছোট্ট হইয়া রাক্ষসীর পেটেব ভিতর ঢুকিযা, আবাব তখনই বাহির হইয়া আসিল। হনুমান খুবই তাড়াতাড়ি ছোট হইল, রাক্ষসীর মস্ত হাঁ-টাকে গুটাইয়া লইতে বোধহয় তাহার চেয়ে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। কাজেই হনুমানকে গিলা আব তাহার হয় নাই তারপর হয়ত আবার বুড়া আঙুলের মতন ছোট হনুমানটি কোনখান দিয়া ফসকিয়া গিয়াছে, রাক্ষসী তাহা টের পায় নাই। যেমন করিয়াই হউক, নাগেব মা ঠাকরুনকে হনুমান বড়ই ফাঁকিটা দিয়াছিল। সুরসাকে ফাঁকি দিয়া বেশী দূর যাইতে না যাইতে হনুমান একটা রাক্ষসীর হাতে পড়িল। এটার নাম সিংহিকা। হনুমান শূন্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার মধ্যে সিংহিকা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার ছায়া ধরিয়া বসিল। হনুমান হঠাৎ দেখিল যে, সে আর চলিতে পারিতেছে না, আর সমুদ্রের ভিতর হইতে একটা ভয়ানক রাক্ষসীও উঠিযা আসিতেছে। সে জানিত যে, এরকম ভয়ঙ্কর রাক্ষস আছে, তাহারা জন্তুর ছায়া ধরিয়া তাহাকে আটকাইয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং সে বুঝিতে পারিল যে, এটা সেইরকম রাক্ষসী।

তখন হনুমান তাহার শরীর বড় করিতে লাগিল। রাক্ষসীও অমনি ঘোরতর গর্জনের সহিত একেবারে আকাশপাতাল জোড়া ভয়ঙ্কর এক হাঁ করিয়া হনুকে গিলে আর কি! তাহা দেখিয়া হনুমান খুব ছোট হইয়া রাক্ষসীর পেটের ভিতর ঢুকিল। সুতরাং রাক্ষসী যে হনুকে খাইতে চাহিয়াছিল, সে কাজ তাহার হইয়াছিল বলিতে হইবে; তবে দুঃখের বিষয়, হজমটা তেমন ভাল করিয়া হয় নাই। কারণ, হনু তাহার পেটের ভিতর গিয়াই তাহার নাড়িভুঁড়ি সব ছিঁড়িয়া প্রাণ বাহির করিয়া দিল। কাজেই হনুকে হজম করিবার অবসর আর বেচারির রহিল না।

এতক্ষণে হনুমান লঙ্কার খুব কাছে আসিয়াছে; দূব হইতে সমুদ্রের তীরে সুন্দর সুন্দর

গাছপালা দেখা যায়। তখন হনুমান ভাবিল, 'এই প্রকাণ্ড শরীর লইয়া লঙ্কায় গেলে রাক্ষসেরা কি মনে করিবে?' সুতরাং নামিবার পূর্বে সে তাহার শরীরটাকে খুব ছোট করিয়া লইল।

সমুদ্র পার হইয়া হনুমান যেখানে নামিল সেটা পর্বত। এই পর্বতের নাম লম্ব পর্বত, ইহাকে ত্রিকূট পর্বতও বলে। এখান হইতে লঙ্কাপুরী বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নিজে বিশ্বকর্মা লঙ্কা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। উহা স্বর্গের মত সুন্দর, আবার তেমনি মজবুত। লম্ব পর্বতের উপরেই শহর, তাহার চারিদিকে সোনার দেওয়াল। বড় বড় সিংহ-দরজা আছে, তাহাও সোনার। শহরের চারিধারে রাক্ষসেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পাহারা দিতেছে।

দূর হইতে কিছুকাল লঙ্কার শোভা দেখিয়া তারপর হনুমান ধীরে ধীরে তাহার উত্তর দরজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তখনও বেলা ছিল বলিয়া পুরীর ভিতর ঢুকিল না। এত আলোর মধ্যে লঙ্কায় ঢুকিতে গেলে রাক্ষসেরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার কাজই মাটি করিয়া দিবে। তাই বাকি বেলাটুকু সে চুপি-চুপি বাহিরেই কাটাইল। তারপর যখন নগরে ঢুকিতে গেল, তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে। তখন যে সে শহরে ঢুকিল, তাহাও একটি বিড়ালছানার মত ছোট হইয়া।

লঙ্কার বাড়ি-ঘর যেমন বড় বড়, তেমনি সুন্দর। দরজা জানালা সোনার, রোয়াক পান্নার, সিঁড়িগুলি মানিকের। হনুমান এ-সকলের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে, এমন সময় একটা বিকট রাক্ষসী কোথা হইতে আসিয়া তাহার পথ আটকাইয়া বলিল, 'কে রে তুই বানর? এখানে কি করিতে আসিয়াছিস? সত্য বল্, নহিলে তোকে মারিয়া ফেলিব!'

হনুমান বলিল, 'বলিতেছি। আগে বল তুমি কে, আর কেনই বা এত রাগ করিতেছ।' রাক্ষসী বলিল, 'আমি এই স্থানের দেবতা, আমারই নাম লঙ্কা। এ স্থানের লোকেরা আমারই পূজা করে, আমি এখানে পাহারা দিই। আজ আমার হাতে তোর মরণ দেখিতেছি!'

হনুমান তাহাতে কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া বলিল, 'এই সুন্দর নগরটি একবার দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে!'

রাক্ষসী কহিল, 'আমাকে হারাইতে না পারিলে তুই নগর দেখিতে পাইবি না।'

হনুমান আবার মিনতি করিয়া বলিল, ঠাকরুন, আমি দেখিয়াই চলিয়া যাইব।'

এ কথায় রাক্ষসী রাগিয়া হনুমানকে এক চড় মারিল। কাজেই তখন হনুমানেরও রাগ হইবে না কেন? তবে রাক্ষসী স্ত্রীলোক বলিয়া, তাহাকে বেশি মারিতে হনুমানের ইচ্ছা হইল না। সে কেবল বাঁ হাতে আস্তে তাহাকে একটি কিল মারিল, তাহাতেই বেচারী মাটিতে পড়িয়া, মুখ সিঁটকাইয়া একেবারে অজ্ঞান! জ্ঞান হইলে সে বলিল, 'রক্ষা কর বাবা, আর না! ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন আমি যখন বানরের কাছে হারিব, তখন রাক্ষসদের বড় বিপদ হইবে। এখন সেই বিপদের সময় উপস্থিত দেখিতেছি। রাক্ষসদিগের আর রক্ষা নাই! এখন তুমি পুরীর ভিতর গিয়া যাহা ইচ্ছা কর।'

তখন হনুমান প্রাচীর ডিঙাইয়া লঙ্কার ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে ঘরে ঘরে তিল তিল করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোথাও সীতার দেখা পাইল না।

সে-সকল ঘরের কোথাও লোকজন গোলমাল করিতেছে, কোথাও পড়াশুনার শব্দ হইতেছে, কোথাও গুপ্তচরেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বসিয়া আছে। কোথাও সকলে মিলিয়া আমোদ করিতেছে, তাহাদের বাজনার শব্দ এমনি মিষ্ট যে, তাহাতে আপনা হইতে ঘুম আসিতে চায়।

হনুমান এইরূপ কত স্থান দেখিল, কিন্তু কোথাও সীতাকে দেখিতে পাইল না।

এক জায়গায় রাবণের পুষ্পক রথ রহিয়াছে। বিশ্বকর্মা তাহা ব্রহ্মার জন্য মণি-মুক্তা দিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা সেই রথ কুবেরকে দেন। কুবেরের নিকট হইতে রাবণ তাহা কাড়িয়া আনে। হনুমান সেই রথের উপর উঠিয়া দেখিল।

রাবণের বাড়িতে সকলে খাওয়া দাওয়া সারিয়া ঘুমাইয়াছে। সেখানে কত আশ্চর্য জিনিসই হনুমানের চোখে পড়িল! সোনার জানালা, মানিকের সিঁড়ি, হাতির দাঁতের মূর্তি, স্ফটিকের থাম—সকল আশ্চর্য! ইহার মধ্যে আবার সকলের চেয়ে আশ্চর্য রাবণের শুইবার স্থানটি, স্ফটিকের বেদী, তাহার উপরে নীলকান্ত মণির খাট, তাহাতে সোনালী কাজ-করা হাতির দাঁতের খুঁটি। কলের পুতুলসকল পাখা হাতে লইয়া সেই খাটে বাতাস করিতেছে।

রাণী মন্দোদরীকে দেখিয়া একবার হনুমান মনে করিল, 'এই বুঝি সীতা।' কিন্তু আবার ভাবিল, 'সীতা এমন সুখে ঘুমাইতেছেন, তাহা কখনই হইতে পাবে না। ইনি নিশ্চয়ই অন্য কেহ হইবেন।'

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে রাবণের খাবার ঘরে গেল। কত জন খাইতে খাইতে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সোনার থালা ঘটিতে, মণির কাজ করা স্ফটিকের বাড়িতে কতরকম খাবার জিনিস বহিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মাংসের ব্যঞ্জনই বা কতরকমের—হরিণের মাংস, শুয়োরের মাংস, মহিষের মাংস, গণ্ডারের মাংস, ভেড়া, ছাগল, মোরগ আর ময়ূরের মাংস, কিছুরই অভাব নাই। তাহা ছাড়া মাছ তো আছেই। হনুমান সকলই দেখিল।

সেখানে অনেক মেয়ে রহিয়াছেন। কেহ দেবতার কন্যা, কেহ নাগেব কন্যা; দেখিতে সকলেই সুন্দর। আবার বিকট চেহারা এবং ভয়ঙ্কর দাঁতওয়ালা রাক্ষসের মেয়েও অনেক আছে। কিন্তু সীতা কোথাও নাই।

হনুমান অনেক করিয়া খুঁজিল। ঘরের পর বাগান, বাগানের পর ঘর, কিছুই সে বাকি রাখিল না। কিন্তু দেখিল, সীতা কোথাও নাই। তখন মনের দুঃখে সে বলিল, 'হায় হায়! এত করিয়াও সীতাকে দেখিতে পাইলাম না! হয়ত রাবণ তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে, না হয় তিনি নিজেই মরিয়া গিয়াছেন। আমার এত পরিশ্রম সকলই বৃথা হইল। এখন আমি কোন্ মুখে ফিরিয়া যাইব? তাহার চেয়ে আমার মরিয়া যাওয়া ভাল!' তারপর আবার সে মনে কবিল, 'না, মরিব কেন? এখনও ত সকল স্থান দেখা হয় নাই। আরো ভাল করিয়া খুঁজি।'

এই বলিয়া সে আবার প্রাণপণে খুঁজিতে খুঁজিতে একটি অশোক বন দেখিতে পাইল। সেই বনে যাইবামাত্র তাহার মনে হইল, 'এইখানে বোধহয় সীতাকে দেখিতে পাইব। হয়ত এইদিক দিয়া তিনি আসিবেন।' এই মনে করিয়া সে একটি শিংশপা অর্থাৎ শিশু গাছের পাতার আড়ালে লুকাইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল।

এমন সময় একটি মেয়ে সেইদিক দিয়া আসিলেন। না খাইয়া তাঁহার শরীর ভয়ানক রোগা আর ময়লা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও তিনি দেখিতে আশ্চর্যরূপ সুন্দর। রাক্ষসীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে আর তিনি ক্রমাগত নিশ্বাস আর চোখের জল ফেলিয়া, কেবল যেন কাহার কথা ভাবিতেছেন। চুল বাঁধেন নাই, একখানি মাত্র হলদে রঙের ময়লা কাপড় পরিয়া আছেন। হনুমান তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল যে ইনিই সীতা। কারণ, তাহারা ঋষ্যমূক পর্বতে

থাকিয়া যে মেয়েটিকে দেখিতে পাইয়াছিল, ইনি তাঁহারই মতন দেখিতে।

ততক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তখন আর সীতার সহিত কথা বলিবার সুবিধা হইল না। তাই হনুমান আবার রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে সীতা বসিয়া বসিয়া কেবল কাঁদিতেছেন। ভয়ঙ্কর রাক্ষসীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহাদের কোনটা লম্বা, কোনটা কুঁজো, কোনটা কানা। কোনটার কান হাতির কানের মত চ্যাটালো; কাহারও কান আবার ঘোড়ার কানের মত সূচালো। কোনটার গলা হাড়গিলার গলার মতন লম্বা। কোনটার গায় এত লোম যে দেখিলে মনে হয় যেন কম্বল পরিয়াছে। কোনটার মুখ শুয়োরের মুখের মতন, কোনটার মুখ বাঘের মুখের মতন, কোনটার মুখ শেয়ালের মুখের মতন। কোনটার হাতির পায়ের মতন পা। এক-একটার আবার হাতির শুঁড়ের মতন শুঁড়ও আছে। কোনটার জিহ্বা লক-লক করিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে।

চারিধারে এই-সকল রাক্ষসী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের মাঝখানে সীতা সেই শিংশপা গাছের তলায় বসিয়া কেবলই কাঁদিতেছেন।

তারপর যখন অনেক রাত্রি হইল, তখন রাবণ সেখানে আসিল। সে আসিয়া সীতাকে খুশি করিবার জন্য কতই মিষ্ট কথা কহিল, আবার কত লোভও দেখাইল। কিন্তু সীতা তাহার কোন কথাই শুনিলেন না। তিনি তাহাকে বলিলেন, 'ওরে দুষ্ট, পাপ করাই বুঝি তোমার কাজ? তুমি যেমন লোক, রাম লক্ষ্মণ আসিয়া তোমাকে তেমনি সাজা দিবেন! যদি তুমি ভাল চাহ, এখনই আমাকে ফিরাইয়া দিয়া রামকে সন্তুষ্ট কর; নতুবা তোমার আর রক্ষা নাই। তুমি তো মরিবেই, তোমার লঙ্কায় আর একটি লোকও বাঁচিয়া থাকিবে না।'

এই কথায় রাবণ ভয়ানক রাগিয়া বলিল, 'আমি আর দুই মাস দেখিব। তাহার পরে যদি তুমি আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা না বল, তবে তোমাকে কাটিয়া রাঁধিয়া খাইব!' সীতা বলিলেন, 'আমার এমন ক্ষমতা আছে যে আমি তোমাকে এখনই ভস্ম করিতে পারি। কেবল রাম আমাকে অনুমতি দেন নাই বলিয়া চুপ করিয়া আছি। তুমি কুবেরের ভাই, আর নিজে এমন বীর। তুমি কেন রামকে ফাঁকি দিয়া আমাকে লইয়া আসিলে?'

রাবণ দেখিল যে সীতা কিছুতেই তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইতেছেন না। তখন সে রাক্ষসীদিগকে আরো বেশি করিয়া সীতাকে বুঝাইতে বলিয়া চলিয়া গেল।

রাবণ গেলে পরে রাক্ষসীরা আসিয়া সীতাকে বকিতে লাগিল। একজন বলিল, 'তোমার মতন এত বোকা ত দেখি নাই। এমন রাজা রাবণ, তাহাকে তুমি ভালবাসিতে চাহ না!' আর -একজন বলিল, 'আমার কথা শোন, তোমার জেদ ছাড়িয়া দাও। তাহা হইলে তুমি সকলের রাণী হইবে।' বিকটা বলিল, 'তুই অভাগী রাবণকে কেন ভালবাসিবি না।' দুর্মুখী বলিল, 'আমাদের কথা রাখ্, নহিলে তোকে মারিয়া ফেলিব!'

কিন্তু সীতা ইহাদের কোন কথাতেই কান দিলেন না। তাহা দেখিয়া রাক্ষসীরা নিজ-নিজ ঠোঁট চাটিতে চাটিতে কুড়াল লইয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। নিম্নোদরী বলিল, 'তোকে খাইব!' চন্দ্রোদরী বলিল, 'এটাকে মারিয়া ইহার যকৃত প্লীহা ও বুক সব চিবাইয়া খাইব!'

এইরূপ করিয়া রাক্ষসীরা সীতাকে মারিয়া খাইবার পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া সীতা বলিলেন, 'তোমরা আমাকে মারিয়া খাইয়া ফেল। আমার বাঁচিয়া কি কাজ?' রাক্ষসীরা বলিল, 'আর দুই মাস থাক্, তারপর তোর মাংস ছিঁড়িয়া খাইব।'

এমন সময়ে ত্রিজটা নামে এক বুড়ী রাক্ষসী সেখানে আসিয়া বলিল, 'তোমরা সীতাকে কষ্ট দিও না। আজ আমি বড় ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি। বোধহয় রাবণ মরিয়া যাইবে আর লঙ্কাও ছারখার হইবে। তোমরা সীতাকে বকিয়াছ, এখন ইঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহ। তাহা হইলে হয়ত তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।'

সীতা বলিলেন, 'ত্রিজটা, তোমার কথা সত্য হইলে আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিব।' এই কথা বলিয়া তিনি আবার কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর সেই শিংশপা গাছের নিকটে আসিয়া, এক হাতে গাছের ডাল ধরিয়া আর এক হাতে মাথার বেণী লইয়া বলিলেন, এই বেণী গলায় বাঁধিয়া মরিব।'

হনুমান শিংশপা গাছে বসিয়া সবই দেখিয়াছে, আর মনে মনে ভাবিতেছে কি করিয়া সীতাকে একটু শান্ত করিবে। চারিদিকে রাক্ষসীর দল, সীতার কাছে গেলে তাহারা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। কিন্তু যদি শীঘ্র তাঁহার সহিত কথা বলা না হয়, তবে হয়ত তিনি তাহার পূর্বেই মরিয়া যাইবেন! আবার, কথা কহিতে গেলে, যদি রাবণ মনে করিয়া তিনি চিৎকার করিয়া উঠেন, তবে সকল দিকই মাটি হয়। কাজেই এমন করিয়া কথা কহিতে হইবে, যাহাতে তিনি ভয় না পান।

এই ভাবিয়া সে সীতার আর একটু কাছে আসিয়া, আস্তে আস্তে মিষ্ট কথায় বলিতে লাগিল, 'মহারাজ দশরথের পুত্র রামচন্দ্র বনে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন লক্ষ্মণ ঠাকুর আর মা সীতা। দুষ্ট রাবণ রামকে ফাঁকি দিয়া সীতাকে লইয়া আসিল। রাম তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া সুগ্রীবের সহিত বন্ধুতা করিলেন। তারপর সীতার সন্ধান করিবার জন্য সুগ্রীব আমাদিগকে পাঠাইলেন। কত দেশে, কত বনে আমরা সীতা মাকে খুঁজিয়াছি। শেষে সম্পতি পাখির কথায় সাগর পার হইয়া, এখানে আসিয়া বুঝি মায়ের দেখা পাইলাম!' এই বলিয়া হনুমান চুপ করিল।

হনুমানের কথায় সীতা আশ্চর্য হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, একটি নিতান্ত ছোট বানর গাছের ডালে বসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছে। তাহার গায়ের রঙ অশোক ফুলের মত লাল, চোখ সোনালী, পরনে সাদা কাপড়। ইহা দেখিয়া প্রথমে সীতার বড় ভয় হইল। কিন্তু শেষে অনেক ভাবিয়া তিনি বলিলেন 'হে দেবতা বৃহস্পতি, হে ব্রহ্মা, হে ইন্দ্র হে অগ্নি, দোহাই আপনাদের! এই বানর যাহা বলিতেছে তাহা সত্য হউক!'

তখন হনুমান গাছ হইতে নামিয়া সীতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'আপনি কে মা? কেনই বা এই বনে থাকিয়া এত দুঃখ করিতেছেন? আপনি যদি রামের সীতা হন, তবে আমার কথার উত্তর দিন।' এই কথা শুনিয়া সীতা বলিলেন, 'আমি রাজা দশরথের পুত্রবধূ। আমার পিতার নাম জনক, স্বামী রামচন্দ্র। বিমাতার কথায় রাম বনে আসিয়াছিলেন;আমি আর লক্ষ্মণ তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলাম। সেখান হইতে দুষ্ট রাবণ আমাকে ধরিয়া লঙ্কায় আনিয়াছে। দুই মাস পরে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।'

হনুমান সীতার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিবার জন্য একটু একটু করিয়া কাছে আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে আবার সীতা ভয় পাইয়া বলিলেন, 'হায় ইহার সহিত কেন কথা বলিলাম? এ হয়ত সেই দুষ্ট রাবণই বানর সাজিয়া আসিয়াছে!'

তাহা শুনিয়া হনুমান জোড়হাতে তাঁহাকে অনেক বুঝাইল। রামের সহিত কেমন করিয়া তাহার পরিচয় হইয়াছে রাবণ সীতাকে লইয়া আসিবার পর রাম কি করিয়া দিন কাটাইতেছেন,

তাহারাই বা কেমন করিয়া সীতাকে খুঁজিয়াছে, এ সকল কথার কিছুই সে তাঁহাকে বলিতে বাকি রাখিল না। সকলের শেষে, রামের সেই আংটিটি তাঁহার হাতে দিল।

আংটি দেখিয়া সীতার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন আনন্দে তাঁহার সেই সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তারপর তিনি ব্যস্ত হইয়া হনুমানকে রামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 'রাম লক্ষ্মণ কেমন আছেন? তাঁহারা কেন আসিয়া রাবণকে মারিয়া ফেলিতেছেন না? সীতাকে না দেখিয়া রামের শরীর বেশি রোগা হইয়া যায় নাই তো?' এইরূপ কত প্রশ্নই তিনি করিলেন। রামের কথা যত জিজ্ঞাসা করেন, ততই তাঁহার আরো জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে।

হনুমান তার পর নানারূপ মিষ্ট কথায় তাঁহার কথার উত্তর দিয়া তারপর বলিল, 'মা আসুন, আপনাকে পিঠে করিয়া রামের কাছে লইয়া যাই।'

তাহা শুনিয়া সীতা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এতটুকু বানরটি হইয়া তুমি কি করিয়া আমাকে লইয়া যাইবে?' হনুমান বলিল, 'ইচ্ছা করিলেই মা, আমি ঢের বড় হতে পারি।'

এই বলিয়া সে দেখিতে দেখিতে পর্বতের মত বড় হইয়া বলিল, 'মা, আপনার আশীর্বাদে রাবণ আর তাহার লোকজন ঘরবাড়ি সুদ্ধ এই লঙ্কাটাকে আমি মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে পারি। আপনার কিছু ভয় নাই। আমার পিঠে উঠিয়া বসুন।' সীতা বলিলেন, 'তুমি যে পারিবে তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু সমুদ্রের উপর দিয়া যাইবার সময় আমি নিশ্চয়ই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইব। কাজেই আমার যাওয়া ঠিক নহে। তুমি শীঘ্র তাঁহাদিগকে এখানে লইয়া আইস।'

হনুমান বলিল, 'আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আচ্ছা, তবে আমাকে এমন একটা কিছু জিনিস দিন, যাহা দেখিয়া রামের বিশ্বাস হইবে যে, আমি যথার্থই আপনাকে দেখিয়া গিয়াছি।' একথায় সীতা তাঁহার মাথার মণি খুলিয়া হনুমানের হাতে দিলেন। হনুমান সেই মণি লইয়া, সীতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় হইল। যাইবার সময় তাঁহাকে অনেক সাহস দিয়া বলিল, 'মা, আপনার কোন চিন্তা নাই। শীঘ্রই আপনার কষ্ট দূর হইবে।'

সীতার নিকট বিদায় লইয়া হনুমান ভাবিতে লাগিল, 'সীতার সন্ধান তো পাইয়াছি। এখন রাক্ষসেরা কেমন যুদ্ধ জানে, তাহার কিছু খবর লইয়া যাইতে পারিলে মন্দ হয় না। আমি যদি এই সুন্দর অশোক বনটিকে নষ্ট করিয়া ফেলি, তাহা হইলে রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবে। তখন আমিও তাহাদের বিদ্যা বুঝিতে পারিব।'

এই বলিয়া হনুমান বিষম হুপ হাপ, দুপ্ দাপ্, মড মড শব্দে অশোক বন ভাঙিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে সেই বনের এমন দুর্দশা করিল যে আগুন দিয়া পিটাইলেও তাহার চেয়ে বেশি হয় না। এইরূপে সমস্ত বাগানটিকে ছারখার করিয়া সে একটি সিংহ-দরজার উপরে বসিয়া দেখিতে লাগিল, রাক্ষসেরা এখন কি করে।

এদিকে রাক্ষসেরা বন ভাঙার শব্দে সেখানে আসিয়া দেখিল যে হনুমান তাহার কাজ শেষ করিয়া সিংহ-দরজায় চড়িয়া গর্জন করিতেছে। তখন তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে গিয়া রাবণকে বলিল, 'মহারাজ, একটা ভয়ঙ্কর বানর আসিয়া অশোক বন লণ্ডভণ্ড করিয়াছে। বোধহয় সে রামের লোক। সে সীতার সহিত কথা কহিয়াছে আর তিনি যেখানে আছেন সে জায়গাটুকু ভাঙে নাই।'

এ কথা শুনিয়া রাবণ রাগে তাহার কুড়ি চোখ লাল আর কুড়ি পাটি দাঁত কড়্মড়্ করিয়া

তখনই হুকুম দিল, 'শীঘ্র ওটাকে বাঁধিয়া লইয়া আইস।' হুকুম পাওয়ামাত্রই বড় বড় রাক্ষসেরা মূষল, মুদ্গর হাতে মহা তেজের সহিত হনুমানকে বাঁধিয়া আনিতে চলিল। তাহাদিগকে দেখিয়া হনুমান সেই সিংহ-দরজার বিশাল হুড়কাটা হাতে লইয়া বলিল, 'জয় রামচন্দ্রের জয়!'

তারপর আর কয়েক মুহূর্তের বেশি বিলম্ব হইল না। ইহারই মধ্যে সে রাক্ষসগুলির মাথা গুঁড়া করিয়া, আবার সেই সিংহ-দরজায় উঠিয়া ভাল মানুষের মত বসিয়াছে—যেন সে কিছুই জানে না।

খানিক পরে তাহার মনে হইল যে ঐ যে পাহাড়ের মতন বড় বাড়িটা দেখা যাইতেছে সেটাকে ভাঙিতে পারিলে ত বেশ হয়! যেমন কথা তেমনি কাজ। অমনি সেই বাড়িটাকে চুরমার করিয়া হনু আবার সিংহ-দরজায় উঠিয়া বসিয়া আছে।

ততক্ষণে অসংখ্য পাহারাওয়ালা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হনুমানও আর কিছু না পাইয়া, সেই ভাঙা বাড়ির একটা সোনার থাম লইয়াই সে-সকল পাহারাওয়ালাকে পিষিয়া দিল।

এদিকে রাবণ জাম্বুমালীকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহার বুক পরিঘের ঘায় ভাঙিতে হনুমানের অধিক সময় লাগিল না। তারপর মন্ত্রীর ছেলেরা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। তাহাদিগকেও হনুমান কয়েকটি কিল চড়েই শেষ করিয়া, আবার সেই সিংহ-দরজায় উঠিয়া বসিয়া রহিল।

এইরূপে হনুমান লঙ্কায় যে কি ভয়ানক কাণ্ড বাধাইল তাহা কি বলিব! বড় বড় বীরেরা যুদ্ধ করিতে আসে আর হনু তাহাদিগকে গুঁড়া করিয়া দেয়। ঘোড়া দিয়া ঘোড়া মারে, হাতি দিয়া হাতি মারে, রাক্ষস দিয়া রাক্ষস মারে।

দুর্ধর, প্রঘস, বিরূপাক্ষ ভাসকর্ণ আর যূপাক্ষ, ইহাদের এক-একজন অসাধারণ যোদ্ধা। হনুমান দুর্ধরের রথের উপর খালি লাফাইয়া পড়িয়াই রথ আর ঘোড়া-সুদ্ধ তাহাকে থেৎলা করিয়া দিল। তারপর শালগাছ দিয়া বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষকে শেষ করা, পর্বতের চূড়া দিয়া প্রঘস ও ভাসকর্ণকে পেষা আর এটাতে ওটাতে ঠোকাঠুকি করিয়া সঙ্গের রাক্ষসগুলির মাথা ফাটান, এ-সকল ত হনুর পক্ষে কেবল খেলা! সে-কাজ সে চক্ষের পলকে সারিয়া আবার সেই সিংহ-দরজায় উঠিয়া বসিল।

ইহার পর রাবণের পুত্র অক্ষ আট ঘোড়ার রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে আসিল। সে খুবই যুদ্ধ করিতে পারিত আর প্রথমে অনেক বান মারিয়া হনুমানকে একটু ব্যস্ত করিয়াই তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহা অধিক সময়ের জন্য নহে। তাহার পরেই হনুমান এক চড়ে তাহার রথের আটটা ঘোড়াকে আর আট কিল মারিয়া রথখানিকে গুঁড়া করিয়া দিল। তখন অক্ষ রথ হইতে না নামিয়া আর যায় কোথায়? আর হনুও তখন তাহার পা ধরিয়া তাহাকে মাটির উপর এমনি এক আছাড় দিল যে তাহাতেই বেচারা একবারে চুরমার! তারপর হনুমান আবার সেই সিংহ-দরজায় উঠিয়া বসিয়া রহিল।

অক্ষের মৃত্যুর কথা শুনিয়া রাবণ তাহার বড় ছেলে ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। ইন্দ্রজিতের মতন যোদ্ধা লঙ্কায় আর কেহ ছিল না। কিন্তু সে আসিয়াও প্রথমে হনুমানের কিছু করিতে পারে নাই। আর, কি করিয়াই বা পারিবে? বাণ আসিবার আগেই হনুমান সরিয়া বসিয়া থাকে, কাজেই তাহা আর তাহার গায়ে লাগিতে পারে না। তাহা দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ রাগের

ভরে একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িয়া দিল। ব্রহ্মা তাহাকে সেই অস্ত্র দিয়াছিলেন। সে অস্ত্রকে কেহ আটকাইতে পারে না, কাজেই হনুমানও তাহাকে আটকাইতে পারিল না। আবার হনুমানকে ব্রহ্মা বর দিয়াছিলেন যে, কোন অস্ত্রেই তাহার মৃত্যু হইবে না। সুতরাং ব্রহ্মাস্ত্রও তাহাকে মারিতে না পারিয়া, খালি বাঁধিয়া ফেলিল।

ব্রহ্মাস্ত্রে বাঁধা পড়িয়া হনুমান ভাবিল, 'বেশ হইয়াছে! এখন এরা আমাকে রাবণের কাছে লইয়া যাইবে আর আমিও তাহার সহিত দুটা কথাবার্তা কহিতে পারিব।'

হনুমান বাঁধা পড়িয়াছে দেখিয়া রাক্ষসেরা আনন্দে নাচিতে লাগিল। তাহাদের উৎসাহ দেখে কে! তাহারা মোটা মোটা শনের দড়ি আনিয়া তাহাকে ত শক্ত করিয়া বাঁধিল, তাহাছাড়া তাহাদের যতদূর সাধ্য গালি দিতে আর ভ্যাঙচাইতেও ছাড়িল না। হনুমান কিছুই করে না, খালি চ্যাঁচাইতেছে।

এদিকে কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্রের বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে। কারণ, সে বাঁধন এমনি রকমের যে তাহার উপর আবার দড়ি দিয়া বাঁধিতে গেলে, তাহা আপনি খুলিয়া যায়। যাহা হউক, বাঁধন যে খুলিয়া গিয়াছে, এ কথা হনুমান রাক্ষসদিগকে জানিতে দিল না। ইন্দ্রজিৎ টের পাইল বটে, কিন্তু অন্য রাক্ষসেরা তাহার কিছুই বুঝিল না তাহারা মনে করিল, 'বাঃ খুব মজবুত করিয়া বাঁধিয়াছি!' তারপর বিস্তর টানাটানি আর 'হেঁইয়ো! হেঁইয়ো!' করিয়া তাহারা হনুমানকে মারিতে মারিতে রাবণের সভায় লইয়া চলিল।

সেখানে রাক্ষসেরা তাহাকে দেখিয়া কি আশ্চর্য হইল! কেহ বলিল, 'আরে, এ বানর কে? এটা এখানে কি করিতে আসিল?' কেহ বলিল, 'এটাকে শীঘ্র মারিয়া ফেল! কেহ বলিল, পোড়াইয়া ফেল!' কেহ বলিল, 'খাইয়া ফেল!' এই বলিয়া তাহারা হনুমানকে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

হনুমান কিছু বলে না। সে কেবল ক্রমাগত রাবণকে আর তাহার সভার ঘরখানি চাহিয়া দেখিতেছে। মণি-মানিকের কাজ করা স্ফটিকের সিংহাসনে রাবণ বসিয়া আছে। তাহার দশ মাথায় দশটি ঝকঝকে সোনার মুকুট। শরীরটি কুচকুচে কালো, তাহাতে রক্তচন্দন মাখানো, তাহার উপর সোনার হার। এক-একটা মুখ যেন এক-একটা জালা! তাহাতে আবার দাঁতগুলি ধারালো, আর ঠোঁটগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। হনুমান তাহাকে দেখিয়াই মনে মনে ভাবিল যে এ ব্যক্তি যেমন-তেমন বীর নহে!

এদিকে রাক্ষসেরা হনুমানকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছে—'তুই কোথা হইতে আসিয়াছিস?' 'এখানে আসিলি কি করিতে?' 'বন ভাঙিলি কেন?' 'কে তোকে পাঠাইয়াছে?' 'ঠিক করিয়া বল্, তাহা হইলে এখনই তোকে ছাড়িয়া দিব, মিথ্যা কহিলে মারিয়া ফেলিব!'

তাহা শুনিয়া হনুমান রাবণকে বলিল, 'রাজা রাবণ, আমি বানর। তোমাকে দেখিতে লঙ্কায় আসিয়াছিলাম, সহজে তোমার দেখা না পাইয়া বন ভাঙিয়াছি! তাহাতে রাক্ষসেরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিল, কাজেই আমিও তাহাদিগকে মারিয়াছি। আমি রামের দূত, পবনের পুত্র, আমার নাম হনুমান। তোমার ধনজন এত আছে, তোমার কি এমন অন্যায় কাজ করা উচিত? তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি, আমার কথা শোন সীতাকে রাখিও না, তাহা হইলে তোমার প্রাণ যাইবে। কি বলিব, রাম আমাকে অনুমতি দেন নাই, নহিলে আমি এখনই তোমার লঙ্কা গুঁড়া করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিতাম।'

তখন রাবণ তাহার লাল লাল কুড়িটা চোখ ঘুরাইয়া বলিল, 'কোথারে জল্লাদসকল, কাট্‌ত এটাকে!' কিন্তু বিভীষণ তাহাকে বারণ করিল।

বিভীষণ রাবণের ছোট ভাই, আর অতিশয় বুদ্ধিমান লোক। সে বলিল, 'মহারাজ, করেন কি? দূতকে কখনও মারিতে আছে? তাহাতে যে ভয়ানক পাপ। দূতকে চাবুক মারা যায়, তাহার মাথা মুড়াইয়া দেওয়া যায়, শরীরের কোন স্থান খোঁড়া করিয়াও মারা যায়, কিন্তু তাহাকে মারা কখনই হইতে পারে না। আর, এটাকে মারিয়া ফেলিলে খবর লইয়া কে যাইবে? তাহা হইলে রাম লক্ষ্মণই বা কি করিয়া এখানে আসিবে, আর রাক্ষসেরাই বা কি করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া, নিজেদের বাহাদুরি দেখাইবে!'

বিভীষণের কথা শুনিয়া রাবণ বলিল, 'বিভীষণ, ঠিক বলিয়াছে। ইহাকে মারিয়া কাজ নাই। এই দুষ্টের লেজ পোড়াইয়া দাও, তাহা হইলে দেশে গিয়া আর মুখ দেখাইতে পারিবে না!'

তখন রাক্ষসেরা বোঝা বোঝা নেকড়া আনিয়া হনুমানের লেজে জড়াইতে লাগিল। যত জড়ায় হনুমানের লেজ ততই বড় হয়, আর বেশি নেকড়া লাগে। লঙ্কার নেকড়া ফুরাইয়া যাইবার গতিক আর-কি! নেকড়া জড়ান হইলে, তাহাতে তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিল।

সেই লেজের আগুন দিয়া হনুমান যে কি কাণ্ড করিবে, তাহা আগে জানিলে রাক্ষসেরা এমন করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইত না। হনুমান প্রথমেই ত সেই জ্বলন্ত লেজটি ঘুরাইয়া রাক্ষসদিগকে মারিতে আরম্ভ করিল। যত মারে রাক্ষসেরাও ততই বেশি করিয়া তাহাকে বাঁধে, আর তাহাকে দেখিয়া ছেলে, বুড়ো, আর স্ত্রীলোকেরা হাততালি দিয়া হাসে। এইরূপ করিয়া রাক্ষসেরা লঙ্কার গলি গলি হনুমানকে লইয়া তামাশা দেখাইতে লাগিল। অবশ্য, এ খবর সীতার কাছে পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তাহা শুনিয়া সীতা মনে মনে বলিলেন, 'হে দেবতা অগ্নি, আমি যদি কোন পুণ্য কাজ করিয়া থাকি, তবে তুমি হনুমানকে পোড়াইও না।'

এদিকে হনুমান ভাবিতেছে, 'কি আশ্চর্য! আমার লেজে এত আগুন, তবু তাহাতে জ্বালা নাই কেন? আগুন যে আমার কাছে হিমের মতন লাগিতেছে! বুঝিয়াছি, আমার পিতা পবন, আর রাম, আর সীতা, ইঁহাদের দয়াতেই এইরূপ হইয়াছে।'

তখন সে মুহূর্তের মধ্যে তাহার শরীরটাকে খুব ছোট করিয়া ফেলিল। তাহাতে বাঁধনের দড়িগুলি আপনা হইতেই খুলিয়া পড়ায়, রাক্ষসেরা আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

তারপর একটা প্রকাণ্ড দরজার হুড়কা লইয়া রাক্ষসগুলির মাথা ভাঙিতে আর কতক্ষণ লাগে!

বাঁধন ঝাড়িয়া ফেলিয়া হনুমান ভাবিল, 'এখন কি করি? সমুদ্র ডিঙাইয়া, বন ভাঙিয়া, রাক্ষস অনেক মারিয়াছি। এখন এই লেজের আগুন দিয়া এই সকল ঘর দুয়ার পোড়াইতে পারিলেই কাজ শেষ হয়।'

যেই এই কথা মনে করা, অমনি এক লাফে একেবারে ঘরের চালে গিয়া উঠা। তারপর ঘর হইতে ঘরে, সেখান হইতে বাগানে, বাগান হইতে আবার ঘরের ছাদে, এইরূপ করিয়া হনুমান লঙ্কায় আগুন লাগাইয়া ফিরিতে লাগিল। আগে প্রহস্তের বাড়ি, তারপর মহাপার্শ্বের বাড়ি, তারপর বজ্রদংষ্ট্র, ইন্দ্রজিৎ, জাম্বুমালী, মকরাক্ষ, নরান্তক, কুম্ভ, নিকুম্ভ এইরূপ করিয়া একেবারে রাজার বাড়ি পর্যন্ত কিছুই বাকি রহিল না। আগুন যতই জ্বলিয়া উঠিল, বাতাসও

ততই ছুটিয়া চলিল আর হনুমানও ততই মনের সুখে গর্জন করিতে লাগিল।

সেদিন লঙ্কায় কি সর্বনাশই উপস্থিত হইয়াছিল! যেদিকে চাহিয়া দেখা যায়, সেই দিকেই আগুন দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার, রাক্ষসেরা যে পথ দেখিয়া পলাইবে, তাহারও জো নাই। চারিদিকে কেবল বাতাসের শোঁ-শোঁ, পোড়া কাঠ ফাটার পট-পট, বাড়ি ঘর পড়ার মড়-মড় আর রাক্ষসদিগের হায় হায়। কেহবা পাগলের মতন ছুটোছুটি করিতেছে আর বলিতেছে, 'হায় হায়! সর্বনাশ হইল!' 'বাবা গো! এটা কি আসিল!' ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ কত রাক্ষস যে পুড়িয়া মরিল, তাহার লেখাজোখা নাই।

এইরূপ করিয়া হনুমান লঙ্কায় আগুন লাগাইয়া ফিরিতে লাগিল

হনুমান তাহার লেজের আগুন সমুদ্রের জলে দিয়া সহজেই নিবাইয়াছিল। কিন্তু লঙ্কার সে সর্বনেশে আগুন কেহই নিবাইতে পারিল না। সেদিন আগুনের তামাশা দেখিয়া হনুমানের মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল।

কিন্তু তাহার আনন্দ অধিকক্ষণ রহিল না। এতক্ষণ সে লঙ্কা পোড়াইতে ব্যস্ত ছিল, তাই সীতার কথা তাহার মনে হয় নাই। তাহার কথা মনে হইবামাত্রই সে ভয়ে আর দুঃখে অস্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল, 'হায় হায়! কি করিলাম! সীতাকে-সুদ্ধ বুঝি পোড়াইয়া মারিলাম! এখন আমি রামের কাছে গিয়া কি বলিব?' যাহা হউক, তখনই আবার তাহার এ কথাও মনে হইল যে সীতা পুড়িয়া মরিবেন ইহা কি সম্ভব? যেন আকাশ হইতে কেহ বলিতেছে, 'কি আশ্চর্য! লঙ্কা পুড়িয়া ছারখার হইল, কিন্তু সীতার কিছুই হয় নাই!'

এ কথা শুনিয়া হনুমানের যে কি আনন্দ হইল তাহা কি বলিব! সে অমনি দুই লাফে গিয়া সীতার নিকট উপস্থিত। তারপর তাঁহাকে অনেক সাহস দিয়া আর তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া, সে সেখান হইতে বিদায় হইল।

লঙ্কার কাছেই অরিষ্ট পর্বত। হনুমান সীতার নিকট বিদায় লইয়া সেই পর্বতে গিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যে সেখান হইতে লাফ দিলে সমুদ্র পার হওয়ার সুবিধা হইবে।

এদিকে হনুমানের সঙ্গের বানরেরা সমুদ্রের ধারে অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা কেবল

ভাবিতেছে, কখন হনুমান ফিরিয়া আসিবে। এমন সময় দূর হইতে তাহারা তাহার গর্জন এবং শোঁ-শোঁ শব্দ শুনিতে পাইল। তাহা শুনিয়া জাম্ববান বলিল, 'নিশ্চয় হনুমান সীতার সন্ধান পাইয়াছে, নহিলে এত চ্যাঁচাইবে কেন?

জাম্ববানের কথায় বানরেরা আনন্দে লাফালাফি করিতে লাগিল। তাহাদের কেহ গাছে চড়ে, কেহ লেজ নাড়ে, কেহ কাপড় উড়ায়, আবার কেহ কেহ মাথা তুলিয়া খালি হনুমানের পথের দিকে চাহিয়া আছে। এমন সময় হনুমান ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসিয়া ঢিপ করিয়া সেইখানে পড়িল।

তাহাকে দেখিয়া বানরেরা আর কি তাহাদের আনন্দ সামলাইয়া রাখিতে পারে! তাহারা সকলেই অস্থির হইয়া উঠিল। কি করিয়া তাহাকে আদর আর সম্মান দেখাইবে, তাহাই যেন তাহারা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কেহ তাহার বসিবার জন্য গাছের ডাল বিছাইয়া দেয়, কেহ ফল মূল আনিয়া দেয়, কেহ কেহ কিচিমিচি কবে। অনেকে কেবল হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হনুমান আগে জাম্ববান অঙ্গদ প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিয়া, তারপর সীতার এবং লঙ্কার খবর সকলকে শুনাইল।

এতদিনে বানরদিগের মনে আবার সুখ আসিয়াছে। তাহাদের কাজ হইয়াছে, এখন সংবাদ লইয়া দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত। ফিরিবার পূর্বে একবার তাহারা মনে করিয়াছিল সীতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে; কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিল যে রামের অনুমতি ভিন্ন তাহা করা উচিত নহে। সুতরাং তাহারা তাড়াতাড়ি কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া চলিল। তিন দিন আগে তাহাদেব মনে যেমন ভয় আর দুঃখ ছিল, এখন তেমনি উৎসাহ আর আনন্দ।

তাহারা যখন কিষ্কিন্ধ্যার কাছে সুগ্রীবের মধুবনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের উৎসাহ আর থামাইয়া রাখিতে পারিল না। অঙ্গদ বলিল, 'তোমরা পেট ভরিয়া মধু খাও!' তাহা শুনিয়া বানরেরাও আর তিলমাত্র বিলম্ব করিল না। পেট ভরিযা মধু আব ফল ত তাহারা খাইলই, তাহার উপর আবার গাছপালা ভাঙিয়া বনের দুর্দশাব একশেষ করিল। তাহাদের না আছে মৌমাছির ভয়, না আছে পাহারাওয়ালার চিন্তা।

সুগ্রীবের মামা দধিমুখ সেই বনের প্রহরী ছিল। সে তাহাদিগকে কত বারণ করিল, কত ধমকাইল, দুই-একজনকে মারিলও। কিন্তু বানরেরা কি তাহাতে থামে? বরং তাহাবা উলটিয়া দধিমুখেরই নানারকম দুর্দশা করিল। তাহাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া, কিলাইয়া, লেজ ধরিয়া টানিয়া বেচারার আর কিছু রাখিল না।

তখন দধিমুখ আর তাহার লোকেরা বানরদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। কিন্তু যুদ্ধ করিয়া তাহারা পারিবে কেন? লাভের মধ্যে অঙ্গদের হাতে মার খাইয়া দধিমুখের হাড় ভাঙিবার গতিক হইল।

তখন বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে সুগ্রীবের নিকট গিয়া নালিশ করিল। সুগ্রীব তাহার কথা শুনিয়া বলিল, 'মামা তোমার কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। নিশ্চয় উহারা সীতার সন্ধান পাইয়াছে। তাহা না হইলে কি এমন পাগলামি করিতে পারে? মামা, তুমি দুঃখ করিও না; শীঘ্র গিয়া উহাদিগকে পাঠাইয়া দাও।'

দধিমুখও তাহা শুনিয়া ভাবিল, 'বা! তাই ত, উহারা নিশ্চয় সীতার খবর আনিয়াছে!' তখন কোথায় গেল তাহার বেদনা, কোথায় বা গেল তাহার কান্না। সে সকল দুঃখ ভুলিয়া অমনি

হনুমান প্রভৃতিকে আনিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তাহারা আসিলে রাম লক্ষ্মণ আর সুগ্রীব সকল কথাই শুনিতে পাইলেন। হনুমান রামকে সীতার সংবাদ বলিয়া সেই মণি তাঁহার হাতে দিল। রাম মণি হাতে লইয়া, বারবার তাহা দেখিতে লাগিলেন। তারপর তাহা বুকে চাপিয়া ধরিলেন আর তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

লঙ্কাকাণ্ড

রপর সকলে উৎসাহে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া লঙ্কায় চলিল। সকলের আগে চলিল নল। সে পথ পরীক্ষায় বড়ই পণ্ডিত। কোন্ পথ ভাল, কোথায় পরিষ্কার জল, কোথায় মিষ্ট ফল, নলের সব মুখস্থ আছে। নল যে পথে যাইতেছে, সেই পথ ধরিয়া অন্যেরা তাহার পিছু পিছু চলিয়াছে। হনুমান রামকে আর অঙ্গদ লক্ষ্মণকে পিঠে করিয়া লইয়াছে। অন্য বানরেরা গাছের ফল খাইয়া, ফুলের শোভা দেখিয়া, মনের সুখে দল বাঁধিয়া চলিয়াছে। এইরূপে তাহারা সেই মহেন্দ্র পর্বতের কাছে সমুদ্রের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে রাবণ রাক্ষসদের সহিত বসিয়া পরামর্শ করিতেছে। সে বলিল, 'বল দেখি এখন উপায় কি! বড়ই যে মুস্কিল দেখিতেছি! লঙ্কায় আসিয়া প্রবেশ করা ত যেমন-তেমন কঠিন কাজ নহে! সেই কাজ সামান্য একটা বানরে করিয়া দিয়া গেল, আমার ঘর বাড়িও ভাঙিল, এতগুলি রাক্ষসও মারিল! বল দেখি এখন কি করা যায়।'

রাক্ষসেরা বলিল, 'সে কি মহারাজ! আমাদের এত সৈন্য, এত অস্ত্র, আর আপনি এমন বীর! পৃথিবী, আকাশ, পাতাল সকলই আপনি জয় করিয়াছেন। বানর আর মানুষকে আপনার কিসের ভয়? আপনার নিজেরও যুদ্ধ করিতে হইবে না: একা ইন্দ্রজিৎই মানুষ আর বানর মারিয়া শেষ করিবেন।'

প্রহস্ত বলিল, 'আমি তাহাদিগকে মারিব।'

বজ্রদংষ্ট্র বলিল, 'আমি একটা বুদ্ধি করিয়াছি। জোয়ান জোয়ান রাক্ষসেরা ভরতের সৈন্য সাজিয়া উহাদের কাছে যাইবে। উহারা কিছুতে বুঝিতে পারিবে না। আর ইহার মধ্যে আমাদের লোকেরা এক সময় তাহাদিগকে বাগে পাইয়া মারিয়া শেষ করিবে।'

রাক্ষসেরা সকলেই এইরূপ বলিতেছে, তাহা দেখিয়া বিভীষণ বলিল, 'মহারাজ, যাহার জোর নাই, সে কি সাহস করিয়া লঙ্কায় যুদ্ধ করিতে আসে? রামের সীতা রামকে ফিরাইয়া দিন, নহিলে বড়ই বিপদ হইবে। আপনি রামের এত অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতেই ত রাম যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এ কাজ আপনার উচিত হয় নাই।'

তখনই বানরেরা গাছ পাথর আনিয়া সমুদ্রের ধারে ফেলিতে লাগিল

বিভীষণের কথা শুনিয়া রাবণ রাগের ভরে সভা হইতে চলিয়া গেল।

পরদিন আবার মস্ত সভা। সেদিনও খোসামুদে রাক্ষসেরা বলিল, 'মহারাজ, কোন ভয় নাই, যুদ্ধ করুন।' আর কেবল বিভীষণ বলিল, 'শীঘ্র সীতাকে ফিরাইয়া দিন।' সেজন্য রাবণ রাগের ভরে তাহাকে যত ইচ্ছা গালি দিয়া শেষে বলিল, 'হতভাগা, আর কেহ যদি এই কথা বলিত, তাহা হইলে এখনই তাহাকে কাটিয়া ফেলিতাম!'

তখন বিভীষণ বলিল, 'মহারাজ, আপনি আমার গুরুজন। আপনাকে বুঝাইতে পারি, আমার এমন সাধ্য কি? আমার অন্যায় হইয়া

থাকিলে ক্ষমা করিবেন। ভাল কথা বলিতে গেলাম, তাহাতে আপনার এত রাগ হইল। এখন আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন; আমি চলিলাম।' এই বলিয়া বিভীষণ আর চারিজন

রাক্ষস সঙ্গে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রাবণের সভা ছাড়িয়া বিভীষণ আর সেই চারিজন রাক্ষস সমুদ্র পার হইয়া রামের নিকটে চলিয়া আসিল। সেখানে সুগ্রীব আর অন্য অন্য বানরদিগকে দেখিয়া বিভীষণ বলিল, 'আমি রাবণের ভাই, আমার নাম বিভীষণ। আমি সীতাকে ফিরাইয়া দিবার কথা বলাতে, রাবণ আমাকে গালি দিয়াছেন। তাই আমি রামের কাছে থাকিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।'

এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব তাড়াতাড়ি রামের কাছে গিয়া সংবাদ দিল। বিভীষণকে সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। হনুমান ছাড়া বানরদিগের অন্য কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে নাই। তাই তাহারা সকলে বিভীষণকে জায়গা দিতে রামকে বারবার নিষেধ করিল। খালি হনুমান বলিল, 'উহার মুখ দেখিয়া ত উহাকে দুষ্ট লোক বলিয়া আমার বোধহয় না। ও যথার্থই আমাদের সহিত বন্ধুতা করিতে আসিয়াছে। উহাকে জায়গা দেওয়া উচিত।'

সকলের কথা শুনিয়া রাম বলিলেন, 'যে আশ্রয় চায় তাহাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত। সে যদি দুষ্টও হয়, তথাপি তাহাব এমন ক্ষমতা নাই যে আমার অনিষ্ট করে। তোমরা শীঘ্র তাহাকে ডাকিয়া আন।'

তখন বিভীষণ আসিয়া রামকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'রাবণ আমায় অপমান করিয়াছেন, তাই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। এখন আপনাব ইচ্ছা হয় আমাকে রাখুন, না হয় মারিয়া ফেলুন।'

রাম মিষ্ট কথায় তাহাব ভয় দূর করিয়া বলিলেন, 'বিভীষণ, আমি রাবণকে মারিয়া, তোমাকে রাজা করিব।' বিভীষণও বলিল, 'আমি প্রাণ দিয়া আপনার সাহায্য করিব।'

তখন রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'চল, আমরা এখানেই বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করি।' রাজা হইবার সময় স্নান করিতে হয়, সেই স্নানকে অভিষেক বলে। রামের কথায় লক্ষ্মণ তখনই সমুদ্রের জলে বিভীষণকে অভিষেক করিয়া তাহাকে লঙ্কার রাজা করিলেন।

তারপর সুগ্রীব আর হনুমান বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, সমুদ্র পার হইব কি করিয়া?' বিভীষণ বলিল, 'বাম যদি সমুদ্রেব পূজা করেন, তবে অবশ্য সমুদ্র পার হওয়া যাইবে।'

এ কথা শুনিয়া বানরেরা তখনই পূজার জোগাড় করিয়া, সমুদ্রের ধারে কুশাসন বিছাইয়া দিল। রাম তাহাতে বসিয়া সমুদ্রের পূজা আরম্ভ করিলেন। পূজা শেষ হইলে সমুদ্রকে প্রণাম করিয়া, তিনি সেই কুশাসনের উপর শুইয়া রহিলেন। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, চারি দিন রাম সেইখানে পড়িয়া আছেন, তবুও সমুদ্র তাঁহাব সংবাদ লয় না। তাহা দেখিয়া রাম বলিলেন, 'এত করিয়া পূজা করিলাম, আর তুমি গ্রাহ্যই করিলে না! তোমার এতই অহঙ্কার! আচ্ছা দাঁড়াও, তোমাকে শুষিয়া ফেলিতে কতক্ষণ লাগে!'

এই বলিয়া রাম ধনুক লইয়া তাহাতে ব্রহ্মাস্ত্র জু.. লেন। সে অস্ত্রের তেজে চন্দ্র সূর্য অবধি কাঁপিতে লাগিল আর সাগরও প্রাণের ভয়ে অমনি হাত যোড় করিয়া উপস্থিত হইল। তারপর সে রামের নিকট অনেক মিনতি করিয়া বলিল, 'এই নল বিশ্বকর্মার পুত্র। নল আমার উপর সেতু বাঁধিয়া দিলেই সকলে পার হইতে পারিবে। সেতু যাহাতে না ভাঙে, সেজন্য আমি এখন হইতে খুব স্থির হইয়া থাকিব।'

তখনই বানরেরা গাছ আর পাথর আনিয়া সমুদ্রের ধারে ফেলিতে লাগিল। নল কি আশ্চর্য

কারিকর! সেই গাছ পাথর দিয়া একশত যোজন লম্বা সুন্দর সেতু প্রস্তুত করিতে ছয় দিনের বেশি লাগিল না। সেই সেতুর উপর দিয়া সকলে পার হইয়া লঙ্কায় আসিল।

রাম লঙ্কায় আসিয়াছেন শুনিয়া রাবণ শুক আর সারণ নামক তাহার দুইজন মন্ত্রীকে চুপি চুপি তাঁহার সৈন্য দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। শুক সারণ বানর সাজিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সে ফাঁকিতে বিভীষণ ভুলিল না। সে তখনই তাহাদিগকে ধরিয়া রামের কাছে লইয়া গেল।

শুক, সারণ ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে এ-যাত্রা আর তাহাদের রক্ষা নাই; কেন না, শত্রুর লোক ঐরূপ চুরি করিয়া খবর লইতে আসিলে, তাহাকে মারিয়া ফেলাই দস্তুর। তাহারা রামের পায়ে পড়িয়া বলিল, 'আমরা রাবণের হুকুমে আপনার সৈন্য গণিতে আসিয়াছিলাম।'

তাহা শুনিয়া রাম হাসিয়া বলিলেন, 'তোমাদের কিছু ভয় নাই। যদি সৈন্য দেখা হইয়া থাকে, তবে নিশ্চিন্তে ঘরে চলিয়া যাও। আর যদি দেখা না হইয়া থাকে, তবে ভাল করিয়া দেখিয়া যাও।'

এ কথা শুনিয়া শুক, সারণ রামকে কত আশীর্বাদই করিল! তারপর তাহারা গিয়া রাবণকে বলিল, 'মহারাজ, যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই। ইহারা বড় ভয়ানক বীর! সীতাকে ফিরাইয়া দিন।'

রাবণ বলিল, 'তোমরা যে ভারি ভয় পাইয়াছ! বল দেখি, এই পৃথিবীতে এমন কে আছে যে আমাকে যুদ্ধ করিয়া হারাইতে পারে?' এই বলিয়া সে ছাদে উঠিয়া দেখিতে গেল, রামের সৈন্য কিরূপ।

সাদা সাদা মেঘ আসিয়া যেমন করিয়া আকাশ ঢাকে, তেমনি করিয়া বানরেতে লঙ্কার চারিদিক ছাইয়া গিয়াছে। এই-সকল সৈন্য দেখিয়া সারণ রাবণকে কহিল, 'মহারাজ, ঐ দেখুন নীল, বীর দশ হাজার যোদ্ধা সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছে। ঐ দেখুন বালীর পুত্র অঙ্গদ, উহার সঙ্গে অনেক কোটি সৈন্য। ঐ নল, যে সেতু বাঁধিয়াছে। ঐ শ্বেত, ঐ কুমুদ, ঐ চণ্ড, ঐ সংরম্ভ, ঐ শরভ, ঐ পনস, ঐ বিনত, ঐ ক্রথন, ঐ গবয়, ঐ হয়। ঐ জাম্ববান, দেখুন তাহার সহিত কত ভাল্লুক আসিয়াছে, ঐ রম্ভ, ঐ সন্নাদন, ঐ প্রমাথী, ঐ গবাক্ষ, ঐ কেশরী, ঐ শতাবলী!

'মহারাজ, ঐ যে শাল গাছের মতন বড় বড় বানর দাঁড়াইয়া আছে, উহারা সুগ্রীবের লোক। উহাদের বাড়ি কিষ্কিন্ধ্যায়; উহারা সকলেই বড় বড় বীর। উহাদের মধ্যে ঐ দুইজনার নাম মৈন্দ আর দ্বিবিদ। আর হনুমানকে বোধহয় চিনিতে পারিয়াছেন; ঐ যে বসিয়া আছে। হনুমানের কাছে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি রাম। তাঁহার কথা আর কি বলিব। যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমনি দয়ালু, তেমনি বিদ্বান, তেমনি ধার্মিক, আর তেমনি বীর। উঁহার পাশে ঐ লক্ষ্মণ বসিয়া, সোনার মত রঙ, কোঁকড়ান কালো চুল, চওড়া বুক। দেখিতে যেমন, গুণেও তেমনি। উঁহার মতন বীর কোথাও নাই। লক্ষ্মণের পাশে ঐ দেখুন বিভীষণ বসিয়া আছেন। শুনিয়াছি রাম নাকি তাঁহাকে লঙ্কার রাজা করিয়াছেন। ঐ সুগ্রীব, যাঁহার গলায় সোনার হার আর শরীর পাহাড়ের মতন বড়।

'মহারাজ, এক শত লক্ষে এক কোটি হয়। লক্ষ কোটিতে এক শঙ্কু, লক্ষ শঙ্কুতে এক মহাশঙ্কু, লক্ষ মহাশঙ্কুতে এক বৃন্দ, লক্ষ বৃন্দে এক মহাবৃন্দ, লক্ষ মহাবৃন্দে এক পদ্ম, লক্ষ পদ্মে এক মহাপদ্ম, লক্ষ মহাপদ্মে এক খর্ব, লক্ষ খর্বে এক সমুদ্র, লক্ষ সমুদ্রে এক মহৌঘ। রামের সঙ্গে এইরূপ হিসাবে (১০০০০০, ১০০০০, ১০০০, ১০০০০০, ১০০০, ১০০০০০,

১০০০, ১০০০০০, ১০০০, ১০০০০০০০০০০) একহাজার কোটি, একশত শঙ্কু, একহাজার মহাশঙ্কু, একশত বৃন্দ, একহাজার মহাবৃন্দ, একশত পদ্ম, একহাজার মহাপদ্ম, একশত খর্ব একশত সমুদ্র আর একহাজার মহৌঘ সৈন্য আসিয়াছে।'

এ-সকল দেখিয়া শুনিয়া রাবণের মনে খুবই ভয় হইল; কিন্তু সে তাহা শুক, সারণকে জানিতে দিল না। বাহিরে সে যার-পর নাই রাগ দেখাইয়া, শুক, সারণকে বকিয়া সেখান হইতে তাড়াইয়া দিল।

এরপর একদিন কি হইল শুন। লঙ্কায় বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে এক জাদুকর রাক্ষস ছিল। রাবণ তাহাকে দিয়া ঠিক রামের মাথার মতন একটা মাথা আর তাঁহার ধনুর্বাণের মতন ধনুর্বাণ প্রস্তুত করাইল। তারপর অশোক বনে গিয়া সেই মাথা আর ধনুক সীতাকে দেখাইয়া বলিল, 'এই দেখ, তোমার রামকে আমরা মারিয়া ফেলিয়াছি। রাত্রিতে যখন তাহারা ঘুমাইতেছিল তখন আমার সৈন্যেরা গিয়া তাহার মাথা কাটিয়াছে, আর বিভীষণকে ধরিয়া আনিয়াছে। লক্ষ্মণ পলাইয়াছে, সুগ্রীবের ঘাড় ভাঙিয়াছে, হনুমান জাম্ববান প্রভৃতি আর সকলে মরিয়া গিয়াছে। এখন আর রামের কথা ভাবিয়া কি করিবে?'

রাবণের কথা শুনিয়া আর সেই মাথা দেখিয়া সীতা ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় একটা দারোয়ান আসিয়া রাবণকে ডাকিয়া লইয়া গেল। রাবণ যাইতে না যাইতেই সেই জাদুর তৈয়ারি মুণ্ড আর ধনুক কোথায় যে মিলাইল, কিছু বুঝা গেল না।

বিভীষণের স্ত্রী সরমাকে রাবণ সর্বদা সীতার কাছে থাকিতে বলিয়াছিল। সরমা সীতাকে অত্যন্ত ভালবাসিত, আর সর্বদা তাঁহার কাছে কাছে থাকিত। রাবণ চলিয়া গেলে পরেও সীতা মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছেন দেখিয়া সরমা বলিল, 'সীতা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? রাবণের কথা সকলই মিথ্যা। যুদ্ধও হয় নাই, রামেরও কিছু হয় নাই। আমি নিজে তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি। রাক্ষসেরা বড়ই ভয় পাইয়াছে। রাম নিশ্চয় তাহাদিগকে মারিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন।' সরমা আর সীতা এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময় বানরদিগের গর্জন শুনা যাইতে লাগিল। সেই গর্জন শুনিয়া রাক্ষসেরা মনে করিল, বুঝি সর্বনাশ উপস্থিত।

রামের সৈন্য যেখানে ছিল, তাহার কাছেই সুবেল পর্বত। সেই পর্বতের উপর উঠিয়া বানরেরা যুদ্ধের আগের রাত্রি কাটাইল। সুবেল পর্বতের উপর হইতে লঙ্কার সকলই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই পরদিন সকালে উঠিয়া সকলে সেখান হইতে লঙ্কার শোভা দেখিতে লাগিল। সেই লঙ্কার উত্তর দরজার কাছে রাবণ নিজে দাঁড়াইয়া। তাহার দুই পাশে চামর দুলিতেছে, মাথার উপরে সাদা ছাতা, গলায় গজমতির মালা।

রাবণকে দেখিয়া সুগ্রীবের আর সহ্য হইল না। সে তখনই এক লাফে সেই পর্বতের উপর হইতে একেবারে লঙ্কার দরজার উপরে গিয়া পড়িল। আর-এক লাফে একেবারে রাবণের ঘাড়ে। ঘাড়ে পড়িয়াই হাসিতে হাসিতে তাহার মুকুটটি কাড়িয়া লইয়া মাটিতে এক আছাড়! তারপর দুইজনে মল্লযুদ্ধ। রাবণ সুগ্রীবকে ধরিয়া মাটিতে আছড়াইল, সুগ্রীবও রাবণকে আছড়াইল। কিল, চড়, লাথি দুইজনে দুইজনকে যে কত মারিল তাহার লেখাজোখা নাই। এইরূপে রাবণকে অপমান আর নাকাল করিয়া, সুগ্রীব এক লাফে আবার সুবেল পর্বতে চলিয়া আসিল। লজ্জায় তখন রাবণের মুখে আর কথাটি নাই!

তারপর রামের সৈন্য পর্বত হইতে নামিয়া লঙ্কার দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। লঙ্কার কোন দরজা দিয়াই তাহারা রাক্ষসদিগের বাহির হইবার পথ রাখিল না। উত্তর দরজায় রাবণ ছিল, রাম লক্ষ্মণ নিজে গিয়া সেই দরজা আটকাইলেন। মৈন্দ, দ্বিবিদ আর নীল পূর্ব দরজা আটকাইল। ঋষভ, গবাক্ষ, গয় আর গবয়কে লইয়া দক্ষিণ দরজায় রহিল। পশ্চিম দরজায় গাছ পাথর লইয়া নিজে হনুমান। উত্তর দরজা আর পশ্চিম দরজার মাঝখানে সুগ্রীব। এইরূপে সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। এখন রাবণ বাইরে আসিলেই হয়।

তখন রাম অঙ্গদকে রাবণের সভায় পাঠাইয়া দিলেন। রাবণ পাত্রমিত্র লইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় অঙ্গদ সেখানে গিয়া উপস্থিত। সেখানে গিয়া সে রাবণকে বলিল, 'আমি শ্রীরামের দূত, আমার নাম অঙ্গদ। আমার পিতার নাম বালী; তাঁহার কথা বোধহয় তোমার এখনও মনে আছে। রাম বলিলেন তুমি শীঘ্র বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ কর। তিনি তোমাকে বধ করিয়া বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিবেন।'

এখানে একটা হাসির কথা বলি। অঙ্গদ যে রাবণকে তাহার পিতার নাম বলিয়া 'তাঁহার কথা বোধহয় তোমার এখনও মনে আছে' বলিল, তাহার কারণ কি জান? রাবণ একবার বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া বড়ই নাকাল হইয়াছিল। রাবণ সকলকে যুদ্ধে হারাইয়া ত্রিভুবন ঘুরিয়া বেড়াইত আর কেহ তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহস করিত না। যুদ্ধ করিবার আর লোক না পাইয়া শেষে সে একদিন বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেল। বালী তখন সমুদ্রের ধারে চোখ বুজিয়া সন্ধ্যা করিতেছিল। রাবণ মনে করিল, এই বেলা উহাকে জড়াইয়া ধরিয়া জব্দ করি; চোখ বুজিয়া আছে, দেখিতে পাইবে না।' এই বলিয়া ত সে পিছন দিক হইতে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল; কিন্তু প্রাণপণে টানাটানি করিয়াও তাহাকে নাড়িতে পারিল না। ততক্ষণে বালী সন্ধ্যা সারিয়া, রাবণ মহাশয়কে পাখিটির মত খপ্ করিয়া বগলে পুরিয়া বসিয়াছে। বালী পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারি সমুদ্রের ধারে বসিয়া চারিবার সন্ধ্যা করিত। সবে তখন তাহার একবার সন্ধ্যা শেষ হইয়াছিল; সুতরাং সে রাবণকে বগলে করিয়াই আরও তিনবার সন্ধ্যা করিল। এদিকে সেই বগলের চাপে, গরমে ঘামে আর গন্ধে বেচারা চ্যাপ্টা হইয়া, সিদ্ধ হইয়া, দম আটকাইয়া, পেট ঢাক হইয়া নাকালের একশেষ! মরে নাই কেবল ব্রহ্মার বরে। তাই অঙ্গদ এখন বলিল, 'বোধহয় মনে আছে।'

তাহা শুনিয়া রাবণ বলিল, 'এই মূর্খকে এখনই টুকরা টুকরা করিয়া কাট্ ত রে!' এই কথা বলিতে বলিতেই চারিটা রাক্ষস আসিয়া অঙ্গদকে ধরিয়া ফেলিল। অঙ্গদও সেই চারিটা রাক্ষসকে বগলে লইয়া এক লাফে একেবারে ছাদের উপরে। সেখান হইতে রাক্ষসগুলিকে আছড়াইয়া ফেলিয়া আর ছাদখানিকে গুঁড়া করিয়া, আর-এক লাফে সে রামের কাছে আসিয়া হাজির।

ইহার পর দুই দলে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কত রাক্ষস আর কত বানর যে মরিতে লাগিল, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। চারিদিকে মার মার, কাট কাট, ধুপ ধাপ, ঘড় ঘড়, ঝন ঝন, ঠকাঠক, চটাপট ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল, রাত্রিতেও তাহার শেষ নাই। যুদ্ধের স্থানে মরা রাক্ষস আর বানরের পাহাড় হইয়া গেল, রক্তের নদী বহিয়া চলিল, তবুও যুদ্ধের বিরাম নাই।

এক স্থানে পাঁচটা সেনাপতি অসংখ্য রাক্ষস লইয়া বড়ই গর্জন করিতে করিতে রামের

সহিত যুদ্ধ জুড়িয়াছে। আবার দেখিতে দেখিতে রামের বাণ খাইয়া পাঁচজনেই পালাইবার পথ পাইতেছে না।

আর এক স্থানে অঙ্গদ আর ইন্দ্রজিতে যুদ্ধ। অঙ্গদ লাথি মারিয়া, ইন্দ্রজিতের সারথি আর ঘোড়া চ্যাপ্টা করিয়া দিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ দেখিল, সামনে থাকিয়া যুদ্ধ করিলে বড়ই বিপদ। কাজেই তখন সে মেঘের আড়ালে লুকাইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এইরূপ যুদ্ধ করিবার বর সে শিবের নিকট পায়। যখন সে মেঘের আড়ালে লুকাইয়া যুদ্ধ করিত, তখন কেহই তাহাকে দেখিতে পাইত না। কাজেই তখন তাহাকে কেহই মারিতে পারিত না; কিন্তু সে নিজে অন্য সকলকে বাণ মারিয়া অস্থির করিত।

মেঘের আড়ালে থাকিয়া দুষ্ট ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষ্মণের গায়ে নাগপাশ বান মারিল। সে বাণ ছুঁড়িবামাত্রই বড় বড় সাপ আসিয়া তাঁহাদিগকে জড়াইয়া ফেলিল। ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহারা তাহা আটকাইতে পারিলেন না।

এইরূপে সে রাম লক্ষ্মণকে সাপের বাঁধনে বাঁধিয়া তাঁহাদেব উপর এমনি নিষ্ঠুর বাণ মারিতে লাগিল যে তাঁহাদের শরীরে একটুও স্থান রহিল না যেখানে বাণ বিঁধে নাই। সেই ভয়ানক বাণের যন্ত্রণায় তাঁহারা অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ হাসিতে হাসিতে গিয়া রাবণকে বলিল, 'বাবা, রাম লক্ষ্মণকে মারিয়া আসিয়াছি।'

এদিকে সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ, হনুমান জাম্ববান প্রভৃতি সকলে রাম লক্ষ্মণকে ঘিরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বানরদিগের মধ্যে সুষেণ ভাল ঔষধ জানিত। সে বলিল, 'ক্ষীরোদ সাগরের তীরে বিশল্যকরণী আর সঞ্জীবনী নামক ঔষধ আছে. চন্দ্র আর দ্রোণ নামক পর্বতের উপরে সেই ঔষধ পাওয়া যায়। শীঘ্র তাহা হইয়া আইস।'

এমন সময় ভয়ানক ঝড় উঠিয়া গাছপালা ভাঙিতে লাগিল, অজগরেরা তাড়াতাড়ি গর্তের ভিতরে লুকাইতে চলিল, সমুদ্রের জন্তু আর আকাশের পক্ষীসকল ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। গোলমাল শুনিয়া সকলে চাহিয়া দেখিল, গরুড় আসিতেছে;তাহারই পাখার বাতাসে এরূপ কাণ্ড উপস্থিত। গরুড়কে দেখিয়াই ইন্দ্রজিতের সাপেরা ভাবিল, 'সর্বনাশ! আমাদের যম আসিয়াছে!' তখন তাহারা রাম লক্ষ্মণকে ছাড়িযা প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে। গরুড়কে সাপেরা বড়ই ভয় করে, কারণ সে সাপ দেখিলেই ধরিয়া খায়।

গরুড় রাম লক্ষ্মণের গায়ে হাত বুলাইয়া দিবামাত্রই, তাঁহাদের শরীরের সকল জ্বালা চলিয়া গেল, এমন-কি, বাণের দাগ পর্যন্ত রহিল না। তখন দুই ভাই আবার সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহাদের বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহাদের জোর আর সাহস দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

গরুড়কে দেখিয়া রাম বলিলেন, 'পাখি, তুমি কে? বড়ই ভয়ানক বিপদ হইতে তুমি আমাদিগকে বাঁচাইলে!' গরুড় বলিল, 'আমার নাম গরুড়, ইন্দ্রজিৎ তোমাদিগকে বাঁধিয়াছে শুনিয়া তাড়াতাড়ি এখানে আসিয়াছি। তোমাদিগকে আমি বড়ই ভালবাসি। এখন যাই, এই যুদ্ধে তোমরা নিশ্চয় জিতিবে।' এই কথা বলিয়া গরুড় চলিয়া গেল। রাম লক্ষ্মণকে সুস্থ দেখিয়া, বানরদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সে আনন্দে তাহারা কোলাহল করিয়া লঙ্কা কাঁপাইয়া তুলিল।

বানরের কোলাহল শুনিয়া রাবণ বলিল, 'রাম লক্ষ্মণ ত মরিয়া গিয়াছে, তবে আবার

বানরদিগের কিসের কোলাহল? দেখ ত বিষয়টা কি!' রাক্ষসেরা দেখিয়া আসিয়া বলিল, 'মহারাজ ইন্দ্রজিৎ যাহা করিয়াছিলেন সব মাটি! রাম লক্ষ্মণ নাগপাশের বাঁধন ছাড়াইয়া আবার উঠিয়া বসিয়াছে!' রাবণ তাহা শুনিয়া বলিল, 'বল কি? তবে ত সর্বনাশ!' এই বলিয়া সে রাম লক্ষ্মণকে মারিবার জন্য তাড়াতাড়ি ধূম্রাক্ষকে পাঠাইয়া দিল।

গাধার মুখ সিংহের আর বাঘের মতন হইলে সে জানোয়ার দেখিতে কেমনটি বিকট হয়? সেইরূপ গাধায় ধূম্রাক্ষের রথ টানিত। সেই রথে চড়িয়া ধূম্রাক্ষ যুদ্ধ করিতে চলিল। সঙ্গে বর্ম-আঁটা সিপাহী সৈন্য, হাতি ঘোড়া মুষল, মুদগর, পরিঘ, পট্টিশ, ভিন্দিপালের আর শেষ নাই। রাক্ষসদের যেমন গর্জন তেমনি রাগ! যেন এক-একটা ভীত আর কি! পশ্চিম দরজায় হনুমানের পাহারা; রাক্ষসেরা দাঁত কড়মড় করিতে করিতে মার মার শব্দে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রথমে হনুমানের দলের ছোট ছোট বানরদিগের সহিত রাক্ষসদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষসদিগের অস্ত্র ধনুক ভাণ, শেল, শূল, মুষল, মুদগর প্রভৃতি; বানরদিগের অস্ত্র গাছ আর পাথর। যুদ্ধের সময় বানর আগে নিজের নামটি বলে, তারপর 'জয়রাম' শব্দে গাছ পাথর উঠাইয়া ধাঁই করিয়া রাক্ষসের মাথা ফাটায়। কেহ বা কিল চড় মারিয়া তাহাদের ছাতি ভাঙিয়া দেয়, নখে আঁচড়াইয়া নাক, কান ছিঁড়িয়া আনে! এইরূপে মার খাইয়া রাক্ষসেরা কিছুতেই বানরদিগের সামনে টিকিতে পারিল না।

তাহা দেখিয়া ধূম্রাক্ষ এমনি তেজের সহিত বানরদিগকে তাড়া করিল যে তাহারা পলাইবার পথ পায় না। যাহা হউক, হনুমানের সামনে এত বাহাদুরি আর কতক্ষণ থাকে? হনুমান তাহাকে এমনি এক পর্বতের চূড়া ছুঁড়িয়া মারিল যে তাহাতে তাহার রথখানি একেবারে চুরমার হইয়া গেল। ইহার আগেই সে গদা হাতে করিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, তাই রক্ষা; নহিলে তাহাকেও রথের সঙ্গে যাইতে হইত। ততক্ষণে হনুমান গাছ দিয়া অন্যান্য রাক্ষসগুলিকে শেষ করিয়া দিয়াছে; কেবল গদা হাতে ধূম্রাক্ষই বাকি। সেটা বড়ই ভয়ঙ্কর গদা; তাহার গায়ে বড় বড় কাঁটা। কিন্তু ভয়ঙ্কর হইলেও, তাহা দিয়া সে হনুমানের কিছু করিতে পারিল না। বরং হনুমানই পর্বতের চূড়া দিয়া তাহার মাথা গুঁড়া করিয়া দিল।

ধূম্রাক্ষের পরে যে যুদ্ধ করিতে আসিল, তাহার নাম বজ্রদংষ্ট্র। বজ্রদংষ্ট্র অনেক যুদ্ধ করিয়া, শেষে অঙ্গদের হাতে মারা গেল।

বড় বড় রাক্ষসেরা যুদ্ধ করিতে আসে আর বানরেরা তাহাদিগকে মারিয়া শেষ করে। এইরূপে অকম্পন যুদ্ধে আসিয়া হনুমানের হাতে, নরান্তক দ্বিবিদের হাতে, কুম্ভহনু জাম্ববানের হাতে আর প্রহস্ত নীলের হাতে প্রাণ দিল। রাক্ষস মারিয়া বানরদিগের আনন্দের সীমা নাই; আর যুদ্ধে যাহারা জয়লাভ করিল, তাহাদের প্রশংসার শেষ নাই।

এদিকে লঙ্কায় আবার যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিল আর দেখিতে দেখিতে আবার অসংখ্য রাক্ষস যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল। এত রাক্ষস দেখিয়া রাম বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজা বিভীষণ, এত সৈন্য অত অস্ত্র লইয়া কে আসিল?'

বিভীষণ বলিল, 'ঐ যাহার রথের নিশানে সিংহের চেহারা দেখিতেছেন, সে ইন্দ্রজিৎ। আর ঐ যাহার খুব লম্বা চওড়া শরীর, তাহার নাম অতিকায়; সেও রাবণের পুত্র। ঐ যে হাতির গলায় ঘণ্টার শব্দ হইতেছে, তাহার উপরে মহোদর। ঐ যে লাল রঙের যোদ্ধা

ঘোড়ায় চড়িয়া আছে, তাহার নাম পিশাচ। শূল হাতে ষাঁড়ের উপর চড়িয়া যে আসিতেছে, উহার নাম ত্রিশিরা। যাহার নিশানে সাপের ছবি, সে কুম্ভ। আর যাহার হাতে পরিঘ রহিয়াছে, সে নিকুম্ভ। ঐ যাঁহার মাথায় মুকুট আর উপরে সাদা ছাতা, তিনি নিজে রাবণ।'

রাম বলিলেন, 'রাবণ আসিয়াছে? ভালই হইয়াছে! আজ সীতাকে চুরি করিয়া আনিবার শাস্তিটা উহাকে দিতে হইবে।'

রাবণকে দেখিয়া সুগ্রীব একটা পর্বতের চূড়া ছুঁড়িয়া মারিল। রাবণ সেই পর্বত কাটিয়া সুগ্রীবকে এমনই এক বাণ মারিল যে তাহাতে সে চিৎকার করিয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া জ্যোতিমুখ, গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ আর নল ছুটিয়া যুদ্ধ করিতে আসিল। কিন্তু তাহাদের সাধ্য কি যে রাবণের বাণের সম্মুখে টিকিয়া থাকে! বাণের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বানরেরা একেবারে রামের কাছে গিয়া উপস্থিত। তখন রাম নিজেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণ বলিলেন, দাদা, আমি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিব।'

এদিকে হনুমান ছুটিয়া গিয়া রাবণকে বলিল, 'আজ এই এক কিলে তোর প্রাণ বাহির করিয়া দিব!'

রাবণ বলিল. 'মার্ দেখি তোর কত জোর!' এই বলিয়া সে আগেই হনুমানের বুকে এক চড় মারিল। হনুমানের খুব লাগিল বটে, কিন্তু সে সামলাইয়া উঠিয়া রাবণের বুকে এক চড় মারিয়া তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া দিল। আবার রাবণ একটু সুস্থ হইয়া হনুমানের বুকে এমন এক কিল মারিল যে হনুমান সহজে তাহার চোট সামলাইয়া উঠিতে পারিল না।

ততক্ষণে রাবণ হনুমানকে ছাড়িয়া নীলের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। রাবণ বাণ মারে আর নীল গাছ পাথর মারে। ইহার মধ্যে নীল হঠাৎ খুব ছোট্টটি হইয়া কখন গিয়া রাবণের রথের নিশানে উঠিয়াছে। সেখান হইতে রাবণের মুকুটে, সেখান হইতে তাহার ধনুকের আগায়। এমনি করিয়া সে তাহাকে কি যে ব্যস্ত করিয়া তুলিল, তাহা বলিবার নহে। তাহা দেখিয়া বানরেরা যত হাসে, রাবণের রাগ ততই বাড়িয়া যায়। শেষে সে অগ্নিবাণে নীলকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া, লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

লক্ষ্মণ আর রাবণের অনেকক্ষণ খুব যুদ্ধ হইল। রাবণ বাণ মারে, লক্ষ্মণ তাহা কাটেন। আবার লক্ষ্মণ বান মারেন, রাবণ তাহা কাটে। একবার ব্রহ্মার দেওয়া একটা বাণ মারিয়া রাবণ লক্ষ্মণকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। কিন্তু লক্ষ্মণ তখনই আবার সুস্থ হইয়া রাবণের ধনুক কাটিয়া, তারপর তিন বাণে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া তবে ছাড়িলেন।

তারপর রাবণের আবার জ্ঞান হইলে সে একটা শক্তি হাতে লইল। এই শক্তিও ব্রহ্মা তাহাকে দিয়াছিলেন। ইহা অতি ভয়ানক অস্ত্র! লক্ষ্মণ বাণ মারিয়া তাহা কাটিলেন, তবুও সেটা আসিয়া তাঁহার বুকে বিঁধিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। তখন রাবণ তাড়াতাড়ি লক্ষ্মণকে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার সাধ্য কি যে তাঁহাকে নাড়ে! ততক্ষণে হনুমান আসিয়া তাহার বুকে এমনি এক কিল মারিল যে তেমন কিল আর সে কখনও খায় নাই; কিলের চোটে রাবণ রক্ত বমি করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া গেল।

এদিকে হনুমান লক্ষ্মণকে কোলে করিয়া রামের নিকট লইয়া আসিয়াছে। সেখানে তাঁহার বুক হইতে শক্তি খসিয়া পড়িবামাত্র তিনি সুস্থ শরীরে উঠিয়া বসিলেন। ততক্ষণে রাবণও

আবার উঠিয়া ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করাতে, রাম নিজেই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলেন। তাহা দেখিয়া হনুমান বলিল, 'আমার পিঠে চড়িয়া যুদ্ধ করুন।'

হনুমানের উপর রাবণের আগে হইতেই বিষম রাগ। কাজেই এবার তাহাকে বাগে পাইয়া সে খুব করিয়া বাণ মারিতে ছাড়িল না। কিন্তু খালি হনুমানকে বাণ মারিলে কি হইবে? রামকে আটকাইতে পারিলে তবে ত হয়! তাহার রথ ঘোড়া সারথি সকলই রাম কাটিয়া শেষ করিয়াছেন, এখন তাহার নিজের প্রাণটি লইয়া টানাটানি। ইহারই মধ্যে তাহার মুকুট গিয়াছে আর সে নিজে এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার আর ধনুক ধরিবারও ক্ষমতা নাই। তাহা দেখিয়া রাম বলিলেন, 'তোমার বড়ই পরিশ্রম হইয়াছে দেখিতেছি। আচ্ছা, আজ তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর, তারপর অন্য সময়ে দেখা যাইবে।' তখন রাবণ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া লঙ্কার ভিতর চলিয়া গেল।

এখন রাবণ করে কি? সিংহাসনে বসিয়া সে চিন্তা করিতেছে, চারিদিকে রাক্ষসেরা দাঁড়াইয়া। তাহাদের দিকে চাহিয়া রাবণ বলিল, 'এত করিয়া শেষটা কিনা আমাকে মানুষের কাছে হারিতে হইল! পূর্বে যখন তপস্যা করিতে গেলাম, তখন ব্রহ্মা বর দিতে আসিলেন। আমি বলিলাম, "দেবতা অসুর যক্ষ রাক্ষস ইহাদের কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না, এই বর আমাকে দিন।" ব্রহ্মা আমাকে সেই বরই দিলেন। মানুষের কথা তখন আমি ভাবি নাই, কাজেই বর লইবার সময় তাহার কথা বলি নাই। সেইজন্যই ত এই বিপদ! আমি কি জানি যে মানুষ এমন ভয়ানক হইতে পারে! তোমরা শীঘ্র গিয়া কুম্ভকর্ণকে জাগাও, সে যদি রাম লক্ষ্মণকে মারিতে পারে।'

কুম্ভকর্ণ রাবণের ভাই। রাবণের তিন ভাই ছিল; রাবণ বড়, তারপর কুম্ভকর্ণ, তারপব বিভীষণ। ইহারা বিশ্রবা মুনির পুত্র; ইহাদের মাতার নাম কৈকসী। বিশ্রবার আর এক পুত্রের নাম কুবের। রাবণ আর কুম্ভকর্ণ জন্মিবার পূর্বেই বিশ্রবা কৈকসীকে বলিয়াছিলেন, 'এদুটা ভয়ঙ্কর রাক্ষস হইবে।' কিন্তু বিভীষণের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'এটি ধার্মিক হইবে। আসলেও তাহারা তেমনি হইল। রাবণের আর কুম্ভকর্ণের জ্বালায় লোকে স্থির থাকিতে পারিত না। রাবণের চেয়ে কুম্ভকর্ণটা বেশি দুষ্ট ছিল। মুনিদিগকে পাইলেই সে দুষ্ট ধরিয়া খাইত।

একদিন কৈকসী কুবেরকে দেখাইয়া রাবণকে বলিলেন, 'দেখ্ দিখি ও কেমন ভাল; তুই বাছা এমনি হইলি কেন?' রাবণ বলিল, 'দেখ না মা, আমি ওর চেয়ে বেশি হইব!' এই বলিয়া সে কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণকে লইয়া তপস্যা আরম্ভ করিল।

সে কি যেমন তেমন তপস্যা! দশ হাজার বৎসর চলিয়া গেল, তবুও তাহাদের তপস্যা ফুরাইল না। দশ হাজার বৎসর তপস্যার পর ব্রহ্মা আসিয়া রাবণকে বলিলেন, 'রাবণ আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর লহ।'

রাবণ বলিল, 'এই বর দিন যে আমার মৃত্যু হইবে না।'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'এই বর দিতে পারিব না, অন্য বর চাহ।'

রাবণ বলিল, 'তবে এই বর দিন যে সর্প যক্ষ দৈত্য রাক্ষস আর দেবতা—ইহাদের কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না। ইহা ছাড়া মানুষ আর অন্য-অন্য যে-সকল জন্তু আছে তাহাদের ভয় আমার নাই।' ব্রহ্মা কহিলেন, 'আচ্ছা, তাহাই হউক। আর ইহা ছাড়া এই বরও দিতেছি

যে, তোমার যখন যেরূপ ইচ্ছা হইবে, তুমি সেইরূপ চেহারা করিতে পারিবে।'

তারপর ব্রহ্মা বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি বর চাহ?'

বিভীষণ বলিল, 'আমাকে দয়া করিয়া এই বর দিন যে আমার যেন সকল সময়েই ঈশ্বরেতে আর ধর্মেতে মতি থাকে।'

তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হইবে। আর তাহাছাড়া তুমি অমর হইবে।' এই বলিয়া তিনি কুম্ভকর্ণকে বর দিতে চাহিলেন।

এমন সময় দেবতারা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, 'দোহাই ঠাকুর, এই হতভাগাকে বর দিবেন না! ইহার জ্বালায় আমরা অস্থির হইয়াছি! এই দুষ্ট ইহারই মধ্যে সাতটা অপ্সরা, ইন্দ্রের দশ জন চাকর আর তাহা ছাড়া বিস্তর মুনি ঋষি খাইয়া ফেলিয়াছে। বর না পাইতেই এমন, বর পাইলে কি আর কাহাকেও রাখিবে?'

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মা তুমি শীঘ্র গিয়া উহার বুদ্ধি নাশ করিয়া দাও।'

ব্রহ্মার কথায় সরস্বতী তখনই কুম্ভকর্ণের মনের ভিতর গিয়া ঢুকিলেন আর তাহাতেই তাহার মাথায় এমনি গোল লাগিয়া গেল যে সে আর বুঝিয়া সুঝিয়া ব্রহ্মার সহিত কথা কহিতে পারিল না।

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কুম্ভকর্ণ, কি বর চাহ?'

কুম্ভকর্ণ বলিল, 'আমি দিনরাত খালি ঘুমাইতে চাহি।'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'বেশ কথা, তাহাই হউক।'

কুম্ভকর্ণের কথা অগস্ত্য মুনি এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার কথা বিভীষণ যাহা বলিয়াছে, তাহা অন্যরূপ। বিভীষণ বলে যে কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত দুষ্ট ছিল বলিয়া ব্রহ্মা নিজেই তাহাকে শাপ দিয়াছিলেন, 'তুই ছয় মাস ঘুমাইবি আর একদিন জাগিয়া থাকিবি।'

যাহা হউক, সে-অবধি কুম্ভকর্ণ কেবলই ঘুমায়। সেই কুম্ভকর্ণকে এখন রাক্ষসেরা জাগাইতে চলিল।

একটা পর্বতের গুহার ভিতরে কুম্ভকর্ণের শুইবার ঘর। ঘরখানি অতি সুন্দর। তাহার মেঝে সোনার আর দেয়ালের কারিকুরি অতি আশ্চর্য। গুহাটি এক যোজন চওড়া আর তাহার দরজাও তেমনি বড়। বড় দরজা না হইলে কুম্ভকর্ণ ঘরে ঢুকিবে কি করিয়া? তাহার শরীর এতই বড় যে বিছানায় শুইয়া থাকিলেও তাহাকে একটা পর্বতের মতন দেখা যায়। তাহার নাকের নিশ্বাসে ঝড় বহে; সেই ঝড়ের চোটে রাক্ষসেরা ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া যায়।

প্রথমে অনেক শুয়োর, হরিণ, মহিষ প্রভৃতি জন্তু আর কলসী কলসী রক্ত আনিয়া কুম্ভকর্ণের কাছে পাহাড়ের মতন করিয়া রাখা হইল। ঘুম হইতে উঠিয়া তাহার বিষম ক্ষুধা হইবে। তখন আর কিছু না পাইলে যাহারা জাগাইতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে ধরিয়াই হয়ত মুখে দিবে। কাজেই আহারের যোগাড়টি সকলের আগে আর বেশ ভালরকম হওয়া চাই।

তারপর তাহার গায় চন্দন লেপিয়া আর ঘরে ধূপ জ্বালাইয়া রাক্ষসেরা নানারকম শব্দ করিতে লাগিল। বড়বড় শঙ্খ, যাহার একটার আওয়াজ শুনিলে প্রাণ চমকিয়া যায়, তাহার কয়েক শত আনিয়া তাহারা একসঙ্গে বাজাইল। আবার কয়েক শত রাক্ষস মিলিয়া প্রাণপণে চিৎকার করিল। না জানি তখন ব্যাপারখানা কিরকম হইয়াছিল। রাক্ষসের চিৎকার ত সহজ

চিৎকার নহে, তাহার কাছে শঙ্খ কোথায় লাগে! সেই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আবার বাহু চাপড়াইবার ঘোরতর চটাপট শব্দ!

এই-সকল বিকট শব্দ তাহারা সকলে মিলিয়া একসঙ্গে করিয়াছিল। সে কি যেমন-তেমন কোলাহল! আকাশের পাখি তাহা শুনিলে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। এমনিতর শব্দ করিয়া তাহারা প্রাণপণে কুম্ভকর্ণের গায়ে নাড়া দিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম তাহাতে ভাঙিল না।

তারপর দশ হাজার রাক্ষস মিলিয়া তাহাকে প্রাণপনে কিল, গদার বাড়ি আর পাথরের গুঁতা মারিয়াও তাহাকে জাগাইতে পারিল না। বরং তাহাতে তাহার আরাম বোধ হওয়ায় সে এমনই নাক ডাকাইতে লাগিল যে তাহার নিশ্বাসের সামনে টিকিয়া থাকাই ভার!

তখন সকলে একসঙ্গে গর্জন করিয়া, শঙ্খ, ভেরী ও ঢাকের বাদ্য আর মুগুরের গুঁতা হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহার উপর আবার অনেক হাতি ঘোড়া আর উট আনিয়া তাহাকে মাড়াল। তাহাতেও যখন তাহার ঘুম ভাঙিল না, তখন তাহার চুল ছিঁড়িয়া কান কামড়াইয়া আর কানের ভিতর জল ঢালিয়া তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিল। শতঘ্নী আনিয়া তাহাকে মারিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণ কিছুতেই জাগিল না।

শেষে তাহারা একেবারে এক হাজার হাতি দিয়া তাহাকে মাড়াইতে আরম্ভ করিল। এইবার কুম্ভকর্ণের বোধ হইল যেন কেহ অতিশয় আদরে তাহার গা টিপিয়া দিতেছে। তখন সে চক্ষু মেলিয়া বসিয়া হাই তুলিল।

সেই হাই তোলা দেখিয়া কি আর কাহারও সেখানে দাঁড়াই থাকিতে ভরসা হয়? রাক্ষসেরা তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে সেই শুয়োর ও মহিষের ঢিপি দেখাইয়া দিয়াই, অমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া দূরে চলিয়া গেল। কুম্ভকর্ণও মাংসের পর্বত আর রক্তের কলসীসকল সামনে পাইয়া তাহা শেষ করিয়া দিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না।

রাক্ষসেরা এতক্ষণ ভয়ে-ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। যখন তাহারা দেখিল যে কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা কমিয়াছে, তখন তাহার কাছে আসিয়া নমস্কার করিল। তখনও কুম্ভকর্ণের চোখে ঘুম রহিয়াছে। সে খানিক রাক্ষসদিগের দিকে ঢুলু-ঢুলু চোখে বোকার মতন তাকাইয়া রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে জাগাইলে কেন! কোন বিপদ হইয়াছে নাকি?'

সেখানে মন্ত্রী যূপাক্ষ ছিল। সে হাত যোড় করিয়া বলিল, 'মানুষ আর বানর আসিয়া লঙ্কা ছারখার করিয়াছে!' তাহা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ বলিল, 'তবে আমি আগে সেই মানুষ আর বানরগুলিকে খাইয়া, তারপর দাদার সঙ্গে দেখা করিব।' রাক্ষসেরা কহিল, 'আগে রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া তারপর যুদ্ধ করিতে গেলেই ভাল হয়।' তখন কুম্ভকর্ণ রাবণের সঙ্গে দেখা করিতে চলিল।

যাইবার সময় তাহার সেই বিশাল শরীর আর বিকট চেহারা দেখিয়া বানরেরা যে কি ভয় পাইয়াছিল, তাহা কি বলিব! তাহাদের কেহ রামের কাছে গিয়া আশ্রয় লইল, কেহ ভয়ে মাটিতে শুইয়া পড়িল। অন্যেরা দুই লাফে কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিক নাই। তখন রাম বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওটা আবার কি হে? এরূপ জন্তু ত আর কখনও দেখি নাই! এটা রাক্ষস, না দৈত্য?'

বিভীষণ বলিল, 'ইনি বিশ্রবা মুনির পুত্র, নাম কুম্ভকর্ণ। ইনি জন্মিয়াই এত জন্তু ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করেন যে ইঁহার ভয়ে সকলে ইন্দ্রের নিকটে গিয়া উপস্থিত হয়। ইন্দ্র তখন

কুম্ভকর্ণকে বজ্র দিয়া মারিলেন। কুম্ভকর্ণও ঐরাবতের দাঁত ছিঁড়িয়া লইয়া, তাহার ঘায়ে ইন্দ্রকে অজ্ঞান করিয়া দিলেন।

'কুম্ভকর্ণের অত্যাচার দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, 'তুমি কেবল ঘুমাইবে।" ইহাতে পৃথিবীর লোক খুবই আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু রাবণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, "প্রভু, কুম্ভকর্ণ আপনার নাতির পুত্র। তাহাকে কি এমন করিয়া শাস্তি দিতে হয়? ইহার জাগিবার উপায় করিয়া দিন।" তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "আচ্ছা ও ছয় মাস ঘুমাইবে, তারপর একদিন জাগিয়া থাকিবে।" রাবণ আজ বড়ই ভয় পাইয়া সেই কুম্ভকর্ণকে জাগাইয়াছেন।'

এই কথা শুনিয়া রাম বানরদিগকে বলিলেন, 'তোমরা সাবধান হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক।' বানরেরা বড় বড় পর্বতের চূড়া হাতে করিয়া লঙ্কার দরজা আটকাইয়া রহিল।

এদিকে কুম্ভকর্ণ রাবণের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ, আমাকে কেন জাগাইয়াছেন? কি করিতে হইবে?'

রাবণ বলিল, 'ভাই, তুমি খালি ঘুমাও, কোন খবর ত রাখ না! ইহার মধ্যে দশরথের পুত্র রাম বানর লইয়া আসিয়া লঙ্কা ছারখার করিয়া দিল। বড় বড় বীরেরা তাহাদের হাতে মারা গিয়াছে। লঙ্কায় কি আর যোদ্ধা আছে! তাই তোমাকে জাগাইয়াছি। তুমি যদি ইহাদিগকে মারিতে পার, তবেই রক্ষা!'

তারপর সকল কথা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ বলিল, 'না বুঝিয়া শুনিয়া কাজ করিয়াছেন, তাহাতেই ত এত বিপদ! লোকে এত করিয়া আপনাকে বুঝাইল, আপনি তাহা শুনিলেন না। বিভীষণ যাহা বলিয়াছিল, সেরূপ করিলে কি এমন হইত?' তাহাতে রাবণ রাগিয়া বলিল, 'তোমার এত কথায় কাজ কি? যাহা বলিতেছি তাহাই কর। জান না, আমি তোমার দাদা? বড় যে উপদেশ দিতে আসিয়াছ।'

তাহা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ কহিল, 'আমি যাহা ভাল মনে করিয়াছি, তাহাই বলিয়াছি। দাদা হইলে কি আর তাহাকে ভাল কথা বলিতে নাই? যাহা হউক, আমি থাকিতে আপনার কিসের ভয়? এখনই আমি এগুলিকে মারিয়া দিতেছি।'

তখন রাবণ যার-পর-নাই খুশি হইয়া বলিল, 'ভাই তোমার মত বীর আর কে আছে? তাই ত ইহাদিগকে মারিবার জন্য তোমাকে জাগাইয়াছি। শীঘ্র যাও, শীঘ্র গিয়া রাম লক্ষ্মণ আর তাহাদের সৈন্যদিগকে খাইয়া আইস!'

তারপর রাবণ নিজ হস্তে কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধের পোশাক পরাইয়া দিল। তাহার সঙ্গে কত সৈন্য দিল তাহার সংখ্যা নাই। যখন কুম্ভকর্ণ গর্জন করিয়া শূল হাতে লঙ্কা হইতে বাহির হইল, তখন বানরেরা ত তাহাকে দেখিয়া 'বাবাগো' বলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দে ছুট! একবার দেখিয়া আর তাহারা দুইবার দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না।

অঙ্গদ কি সহজে তাহাদিগকে বকিয়া ফিরাইতে পারে! একবার অনেক কষ্টে তাহারা ফিরিয়াছিল; কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর জন্তুর সামনে টিকিয়া থাকা ত সহজ কাজ নহে! যম পাহাড় সাজিয়া যুদ্ধ করিতে আসিলে তাহাকেও দুচারটা পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে পারে, এমন সাহস হয়ত তাহাদের ছিল। কিন্তু এ আপদ যে যমের চেয়েও ভয়ঙ্কর! কারণ, এ হতভাগা বানর দেখিলেই মিঠাই মণ্ডার মতন তুলিয়া মুখে দেয়! যম ত তাহা করে না। যাহা হউক, এরূপ ভয় খালি ছোট মর্কটগুলাই পাইল, বড় বানরেরা নহে।

বড়দের মধ্যে দ্বিবিদ পাহাড় ছুড়িয়া অনেক রাক্ষস মারিল। হনুমানও পর্বতের চূড়া আর গাছ লইয়া কুম্ভকর্ণের সহিত কম যুদ্ধ করে নাই। কিন্তু কুম্ভকর্ণের শূলের কাছে তাহার গাছ পাথর কিছুই করিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া হনুমান রাগের ভরে একটা প্রকাণ্ড পর্বতের চূড়া দিয়া ঠুকিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া দিল। কুম্ভকর্ণও আবার একটু সুস্থ হইয়া, হনুমানের বুকে এমন এক শক্তির ঘা মারিল যে হনুমান বেদনায় চেঁচাইয়া অস্থির।

ইহার পর ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ আর গন্ধমাদন এই পাঁচজন মিলিয়া কুম্ভকর্ণকে মারিতে গেল। কিন্তু তাহারা কুম্ভকর্ণের কি করিবে! তাহারা প্রাণপণ করিয়া আঁচড়, কামড়, লাথি, কিল, গাছ, পাথর যত মারে কুম্ভকর্ণের তাহাতে বেশ আরামই বোধ হয়—যেন কেহ তাহার ঘামাচি মারিয়া দিতেছে। তারপর কুম্ভকর্ণ যখন তাহাদিগকে বগলে ফেলিয়া চাপিতে আর ঠুকিতে আরম্ভ করিল, তখন বেচারাদের দুর্দশার শেষ রহিল না।

হাজার হাজর বানর কুম্ভকর্ণকে একসঙ্গে আক্রমণ করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিল না। কুম্ভকর্ণ তাহাদিগকে ধরিয়া অমনি মুখে দেয়। অনেক বানর আবার তাহার মুখে ভিতর ঢুকিয়া নাকের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়াও আসে।

তারপর অঙ্গদ অনেক যুদ্ধ করিল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। একবার সে বুকে চড় মারিয়া কুম্ভকর্ণকে অজ্ঞান করিয়াছিল বটে, কিন্তু কুম্ভকর্ণও তখনই আবার লাফাইয়া উঠিয়া, এক কিলে অঙ্গদকে অজ্ঞান করিয়া দিল।

অঙ্গদকে অজ্ঞান দেখিয়া সুগ্রীব পাহাড় হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে পাহাড় যে কুম্ভকর্ণের গায়ে লাগিয়া গুঁড়া হইয়া গেল, তাহা বোধহয় বলিবার আগেই বুঝিয়াছ। তারপর শূল দিয়া সে সুগ্রীবকে এমনি এক ঘা মারিবার যোগাড় করিয়াছিল যে হনুমান তাড়াতাড়ি শূলটা ভাঙিয়া না ফেলিলে, হয়ত তখনই সুগ্রীবের বুক ফুটা হইয়া যাইত। শূল ভাঙার পরেও কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে সহজে ছাড়িল না। সে তাহাকে পর্বতের চূড়ার ঘায় অজ্ঞান করিয়া, রাক্ষসদিগকে দেখাইবার জন্য লঙ্কার ভিতর লইয়া গেল।

লঙ্কার ভিতরে গিয়াই সুগ্রীবের জ্ঞান হইয়াছে। তখন সে মনে করিল যে এইবেলা কুম্ভকর্ণকে জব্দ করিবার একটা উপায় করা চাই। যেই এই কথা মনে করা, আর অমনি দুই হাতে রাক্ষসের দুটি কান, দাঁতে তাহার নাকটি, আর দুই পায়ে তাহার দুই পাশের চামড়া একেবারে শিকড়-সুদ্ধ ছিঁড়িয়া তোলা। সে সময়ে কুম্ভকর্ণ কিরূপ চমকিয়া গিয়াছিল আর কেমন মুখ সিঁটকাইয়াছিল আর কি ভয়ানক চ্যাঁচাইয়াছিল আর সুগ্রীবকেই বা কতখানি ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি আছড়াইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা আর বলিবার দরকার নাই। আর সেই গোলমালে যে সুগ্রীবও দুই লাফে সেখান হইতে চলিয়া আসিল, তাহাও সহজেই বুঝিতে পার।

কুম্ভকর্ণের চেহারা একেই ত অতিশয় ভয়ানক, তাহার উপরে আবার এখন নাক কান নাই; সুতরাং তাহা আরও ভয়ানক হইবারই কথা। আবার বেদনায় সে এতই রাগিয়া গিয়াছে যে এখন আর রাক্ষস বানর বুঝিতে পারে না। রাক্ষসকেও ধরিয়া মুখে দেয়, বানরকেও ধরিয়া মুখে দেয়। কাজেই এবারে যে বানরেরা তাহাকে দেখিয়া আরও ভয় পাইল, ইহা আশ্চর্য নহে। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণকে বলিল, 'লক্ষ্মণ, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি যে সাহস করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু আমি এখন রামকে

মারিতে আসিয়াছি, তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।' এই বলিয়া সে রামের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

রামের বাণে তাহার হাতের গদা মাটিতে পড়িয়া যাইতে অধিক সময় লাগিল না। তখন আর তাহার অন্য অস্ত্র নাই; কাজেই সে পর্বতের চূড়া লইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে বড় বড় বানরেরা দল বাঁধিয়া তাহার ঘাড়ে গিয়া উঠিয়াছে। সে যুদ্ধ করিবে, না বানরগুলিকেই ঝাড়িয়া ফেলিবে, বুঝিতে পারিতেছে না।

কিন্তু রামের বাণ খাইয়াও কুম্ভকর্ণ সহজে কাহিল হইল না। যে বাণে বালী মরিয়াছিল তাহাও সে সহিয়া রহিল। ইহার মধ্যে কখন সে একটা লোহার মুদগর তুলিয়া লইয়াছে। সেই মুদগর ঘুরাইয়া সে রামের বাণও ফিরাইয়া দিতেছে, আবার বানরদিগকেও মারিতেছে। তাহা দেখিয়া রাম বায়ুবাণে সেই মুদগরসুদ্ধ তাহার হাতটি কাটিয়া ফেলিলেন। তখন কুম্ভকর্ণ বেদনায় চিৎকাব করিতে কবিতে, আর-এক হাতে একটা তালগাছ লইয়া রামকে মারিতে চলিল। রাম ইন্দ্রঅস্ত্রে সে হাতটাও কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তবুও সে ছুটিয়া আসিতে ছাড়িল না।

তারপর রাম অর্ধচন্দ্র বাণ মারিয়া তাহার পা দুইটা কাটিলেন। তবুও সে গড়াইতে গড়াইতে হাঁ করিয়া রামকে গিলিতে চলিয়াছে। তখন রাম অনেকগুলি বাণ মারিয়া তাহার মুখের হাঁ বন্ধ করিয়া দিলেন, তারপর ইন্দ্র-অস্ত্রে মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। কুম্ভকর্ণের মৃত্যু দেখিয়া বাক্ষসেরা ভয়ে চিৎকাব কবিতে লাগিল, আর দেবতা, গন্ধর্ব, মুনি, ঋষিরা যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া কোলাহলে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিলেন।

রাবণ যখন শুনিল যে কুম্ভকর্ণের মৃত্যু হইয়াছে তখন তাহার আর দুঃখের শেষ রহিল না। প্রথমে সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। জ্ঞান হইলে পর অনেক কাঁদিয়া শেষে বলিল, 'হায়, আমি না বুঝিয়া ভাই বিভীষণকে অপমান করিয়াছিলাম, তাহার শাস্তি এখন পাইতেছি! আমার সব গেল!' এই বলিয়া সে আবার অজ্ঞান হইয়া গেল।

রাবণের দুঃখ দেখিয়া তাহার পুত্র ত্রিশিরা বলিল, 'মহারাজ, আপনি এত দুঃখ করিতেছেন কেন? আমি রাম লক্ষ্মণকে মারিয়া দিতেছি।' তাহা শুনিয়া দেবান্তক, নরান্তক ও অতিকায় নামক রাবণের আর তিন পুত্র এবং মহোদর ও মহাপার্শ্ব নামে ইহাদের দুই খুড়া বলিল যে তাহারাও যুদ্ধ করিতে যাইবে।

ইহারা আসিযা প্রথমে ছোট ছোট বানরদিগকে বড়ই অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরেই অঙ্গদ, হনুমান, নীল আর ঋষভ আসিয়া অতিকায় ছাড়া ইহাদের আর সকলকেই মারিয়া ফেলিল।

অতিকায় তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট একটা রথ, অনেকগুলি অস্ত্র আর এমন একটা বর্ম পাইয়াছিল যে তাহাতে কিছুই বিঁধিতে পারিত না। সেই বর্মের নাম অক্ষয় কবচ। এই-সকলের জোরে অতিকায় লক্ষ্মণের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল। লক্ষ্মণ তাহাকে অনেক বাণ মারিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন বাণই সেই বর্ম ভেদ করিতে পারিল না। এমন সময় পবন আসিয়া লক্ষ্মণের কানে কানে বলিলেন, 'ব্রহ্মাস্ত্র মার, অন্য অস্ত্রে এ রাক্ষস মরিবে না, ইহার গায়ে অক্ষয় কবচ আছে।' এ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়িলেন। সে অস্ত্র আটকাইবার জন্য অতিকায় কত চেষ্টাই করিল, কত শক্তি, কত গদা, কত শূল ছুড়িয়া

মারিল, কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র কি তাহাতে থামে! দেখিতে দেখিতে অতিকায়ের মাথা তাহাতে কাটিয়া দুইখণ্ড হইয়া গেল।

ইহার পর আবার ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ করিতে আসিল। ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করে। চোরের মত আড়াল হইতে সে সকলকে বাণ মারিল, অন্যেরা তাহার কিছুই করিতে পারিল না। তাহার বাণ খাইয়া সকল বানর অজ্ঞান হইয়া গেলেন। ইহাতে রাক্ষসেরা যে খুবই খুশি হইল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহারা নাচিতে নাচিতে লঙ্কায় গিয়া কহিল, 'এবারে উহাদিগকে মারিয়া আসিয়াছি।'

এদিকে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান, সকলেই অজ্ঞান, কেবল বিভীষণ আর হনুমান অজ্ঞান হয় নাই। তাহারা দুইজন মশাল লইয়া সকলকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই অন্ধকার রাত্রিতে কোটি কোটি বানর যুদ্ধের জায়গায় পড়িয়া আছে ইহাদের ভিতর হইতে কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করা কি সহজ কাজ!

অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা এক জায়গায় জাম্ববানকে দেখিতে পাইল। বিভীষণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'জাম্ববান, তুমি কি বাঁচিয়া আছ?' তাহা শুনিয়া জাম্ববান অনেক কষ্টে উত্তর করিল, 'চক্ষে তীর লাগিয়াছে, চাহিতে পারি না। আপনার গলার শব্দে বোধ হইতেছে আপনি বিভীষণ। হনুমান বাঁচিয়া আছে ত?'

বিভীষণ বলিল, 'তুমি রাম লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে না, অন্য কাহারও কথা জিজ্ঞাসা করিলে না, আগেই হনুমানের কথা কেন?

জাম্ববান বলিল, 'হনুমান যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে কোন ভয় নাই; আর যদি সে মরিয়া গিয়া থাকে, তবে আর উপায় নাই।'

তখন হনুমান জাম্ববানকে প্রণাম করিল। হনুমানকে চিনিতে পারিয়া জাম্ববান বলিল, 'বাছা, তুমি ছাড়া এ সময়ে আমাদের আর কেহ নাই। তুমি চেষ্টা করিলে সকলকে বাঁচাইতে পার। হিমালয়ের পরে ঋষভ আর কৈলাস পর্বত। সেই দুই পর্বতের মাঝখানে ঔষধের পর্বত। সেখানে বিশল্যকরণী, মৃত্যুসঞ্জীবনী, সুবর্ণকরণী আর সন্ধানী, এই চারিরকমের ঔষধ আছে, শীঘ্র গিয়া তাহা লইয়া আইস।

হনুমান তখনই ঔষধ আনিতে চলিয়া গেল। হিমালয় পর্বত পার হইলে কৈলাস পর্বত, তাহার কাছে ঔষধের পর্বত। এতদূর যাইতে হনুমানের কিছুই বিলম্ব হইল না। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিল যে ঔষধ খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই কঠিন। ঔষধের গাছ ঝক্-ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহা সে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু কাছে আসিতেই তাহারা যে কোথায় লুকাইয়াছে কিছুই বুঝিবার জো নাই।

তখন হনুমান রাগিয়া বলিল, 'আচ্ছা দাঁড়াও! আমি পাহাড়সুদ্ধই লইয়া যাইতেছি।' এই বলিয়া গাছ, পাথর, হাতি গণ্ডার, সবসুদ্ধ সেই প্রকাণ্ড পাহাড় ধরিয়া সে এমনই বিষম টান দিল যে সেই টানে একেবারে পাহাড়ের গোড়া অবধি চড়্-চড়্ শব্দে উঠিয়া আসিল। তারপর সেটাকে মাথায় করিয়া ফিরিয়া আসা ত এক মুহূর্তের কাজ!

ঔষধ আনিয়া তাহা আর কাহাকেও খাওয়াইবার দরকার হইল না। সে এমনি আশ্চর্য ঔষধ যে তাহার গন্ধ পাইয়াই সকলে উঠিয়া বসিল— যেন তাহারা সবে ঘুম হইতে জাগিয়াছে। রাম লক্ষ্মণ উঠিলেন, বানরেরা সকলেই উঠিল। উঠিল না খালি রাক্ষসগুলি।

পাছে অনেক রাক্ষস মরিয়াছে দেখিলে বানরদের সাহস বাড়িয়া যায়, এজন্য রাক্ষস মরিলেই অন্য রাক্ষসেরা তাহাকে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিত। কাজেই ঔষধের গন্ধ তাহাদের নাকে পৌঁছাইতে পারিল না আর তাহারাও বাঁচিল না।

সকলে বাঁচিয়া উঠিল, কাজেই ঔষধের কাজ ফুরাইয়া গেল। তখন হনুমান আবার যেখানকার পাহাড়টি, সেইখানে তাহাকে রাখিয়া আসিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় দলে দলে বানর মশাল হাতে লইয়া লঙ্কায় গিয়া ঢুকিল। হনুমান সেবার লঙ্কার সকল স্থান পোড়াইতে পারে নাই, কিন্তু এবার আর কিছু বাকি রহিল না। রাক্ষসেরা বানরদিগকে বাধা দিবে কি, তাহারা নিজেরাই তখন পলাইতে ব্যস্ত। তাহাদের সে সময়কার চিৎকার একশত যোজন দূর হইতে শোনা গিয়াছিল।

একদিকে লঙ্কা ধক্‌-ধক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে আর একদিকে সেই রাত্রিতেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এবারে রাক্ষসদিগের সেনাপতি কুম্ভ নিকুম্ভ যূপাক্ষ শোণিতাক্ষ আর প্রজঙ্ঘ।

সে রাত্রিতে রাক্ষস আর বানরেরা ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু বানরদিগের সঙ্গে রাক্ষসেরা আঁটিতে পারিল না। অঙ্গদ, দ্বিবিদ আর মৈন্দ যূপাক্ষ, প্রজঙ্ঘ আর শোণিতাক্ষের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল।

কুম্ভ দেখিল যে বানরেরা রাক্ষসদিগকে মারিয়া শেষ করিতেছে। তখন সে ধনুর্বাণ লইয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সে সময়ে আর তাহার সামনে কেহ টিকিয়া থাকিতে পারিল না। মৈন্দ, দ্বিবিদ, অঙ্গদ, সকলেই তাহার বাণে অজ্ঞান হইয়া গেল। তাহার বাণে চারিদিক এমনি করিয়া ছাইয়া গিয়াছিল যে জাম্ববান আর সুষেণ আসিয়া, বাণের জন্য কিছুই দেখিতে পাইল না। তারপর সুগ্রীব আসিয়া অনেক গাছ পাথর ছুঁড়িয়া মারিল, কিন্তু তাহাতেও প্রথমে কুম্ভের কিছুই হইল না। তখন সুগ্রীব তাহার ধনুক কাড়িয়া লইল।

ধনুক গেলে কাজেই তখন কুস্তি। কুম্ভ আসিয়া সুগ্রীবকে জড়াইয়া ধরিল। সুগ্রীবও তাহার সহিত খুব একচোট কুস্তি করিয়া শেষে তাহাকে একেবারে সমুদ্রের জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু কুম্ভ তাহাতে হটিবার লোক নহে। সে সেইখান হইতে ভিজা কাপড়ে উঠিয়া আসিয়া সুগ্রীবের বুকে এক কিল মারিয়াছে। সুগ্রীবেরও কাজেই তখন সেই কিলের শোধ দেওয়া দরকার হইল। আর সেই শোধ দিতে গিয়া, সুগ্রীবের কিলে কুম্ভের প্রাণও বাহির হইয়া গেল। কাজেই তাহার আর যুদ্ধ করিতে হইল না।

এদিকে ভাইয়ের মৃত্যুতে নিকুম্ভ রাগে জ্বলিয়া একেবারে আগুন। তাহার হাতে একটা ভয়ানক পরিঘ। সেই পরিঘের ভয়ে কেহই তাহার নিকটে ঘেঁষিতে পারিতেছে না। সেই পরিঘ লইয়া সে হনুমানকে মারিতে আসিল। কিন্তু হনুমান কি পরিঘকে ভয় করিবার লোক? পরিঘকে হনুমান ভয় করা দূরে থাকুক, বরং সেটাই তাহার বুকে ঠেকিয়া গুঁড়া হইয়া গেল; আর তাহার এক কিলের চোটে নিকুম্ভের বর্ম ছিঁড়িয়া একেবারে খান-খান হইল।

এই সময়ে নিকুম্ভ কোন ফাঁকে তাড়াতাড়ি হনুমানকে ধরিয়া লইয়া এক ছুট দিয়াছিল। কিন্তু হনুমান তাহাতে ঠকিবে কেন? সে প্রচণ্ড এক কিল মারিয়া তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া গেল। তাহার পরেই দেখা গেল যে সে ঘোরতর গর্জনে নিকুম্ভকে মাটিতে ফেলিয়া, তাহার বুকে চড়িয়া বসিয়াছে। তখন নিকুম্ভের চিৎকার দেখে কে! যাহা হউক, তাহাকে অধিক

চ্যাচাইতে হইল না;কারণ, তাহার পরক্ষণেই হনুমান তাহার মাথাটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ইহার পর যে যুদ্ধ করিতে আসিল, সে সেই খরের পুত্র। তাহার নাম মকরাক্ষ। তাহার যুদ্ধের কথা আর কি শুনিবে? রাম তাহাকে হাসিতে হাসিতে যে-সকল বাণ মারিলেন, তাহাতেই সে বেচারার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

তখন রাবণ আর কাহাকে পাঠাইবে? ইন্দ্রজিৎ ভিন্ন আর লোক নাই। কাজেই ইন্দ্রজিৎ আবার যুদ্ধ করিতে আসিল। তাহার যুদ্ধ কিরূপ, তাহা তা জানাই আছে। সে চোরা-যুদ্ধ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে সে খুবই কষ্ট দিল।

তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদা ব্রহ্মাস্ত্র মারিয়া কেন একেবারে সকল রাক্ষস শেষ করিয়া দাও না? রাম বলিলেন, 'যে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে তাহাকেই মারা যায়; যাহারা যুদ্ধ করিতেছে না, তাহাদিগকে কি মারা উচিত? আচ্ছা, আজ ইন্দ্রজিতের রক্ষা নাই! আজ যদি সে মাটির নীচে গিয়াও লুকায়, তথাপি তাহাকে মারিবই।' এ কথা শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ তখনই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

খানিক পরে দেখা গেল যে একটি স্ত্রীলোককে রথে লইয়া ইন্দ্রজিৎ আবার আসিয়াছে। স্ত্রীলোকটি দেখিতে ঠিক সীতার মতন, কিন্তু আসলে তাহা রাক্ষসদের গড়া, মায়া, অর্থাৎ জাদুর পুতুল ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই মায়া সীতার চুলে ধরিয়া ইন্দ্রজিৎ তাহাকে খড়্গ দিয়া কাটিতে যাইতেছে, আর মায়া সীতা 'হা রাম!' বলিয়া চিৎকার করিতেছে। তাহা দেখিয়া হনুমান আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল, 'দুষ্ট, সীতাকে যদি মারিস, তবে তোকে এখনই যমের বাড়ি পাঠাইব!' কিন্তু হনুমান এ কথা বলিয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইবার পূর্বেই, ইন্দ্রজিৎ সে পুতুলটার মাথা কাটিয়া তাহাকে বলিল, 'এই দেখ্ তোদের সীতাকে কাটিয়া ফেলিয়াছি!'

তখন হনুমান রাগে দুঃখে অস্থির হইয়া রাক্ষসদের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু খানিক যুদ্ধ করিয়াই সে ভাবিল সীতা যখন মরিয়া গিয়াছেন তখন কিসের জন্য যুদ্ধ করিব? আগে রামকে গিয়া এই সংবাদ দিই, তারপর তিনি যাহা বলেন তাহাই করা যাইবে।'

ইন্দ্রজিৎ সীতাকে কাটিয়া ফেলিয়াছে, এ কথা শুনিয়া রাম দুঃখে নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িলেন। এমন-কি, সে সময়ে তাঁহাকে শান্ত করাই সম্ভব হইত না, যদি বিভীষণ সেখানে না আসিত।

বিভীষণ সকল কথা শুনিয়া রামকে বলিল, সীতাকে কাটিয়াছে, ইহা কখনই হইতে পারে না। যাহা কাটিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই মায়া সীতা। তোমরা সেটাকে যথার্থ সীতা মনে করিয়া কাঁদিতে বসিয়াছ, আর ততক্ষণে সেই দুষ্ট নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করিতে গিয়াছে। যজ্ঞ শেষ করিতে পারিলে আর কেহই তাহাকে যুদ্ধের সময় দেখিতে পাইবে না;কাজেই সকলে তাহার নিকটে হারিয়া যাইবে। যজ্ঞ শেষ না হইলে তাহার নিজেকেই মরিতে হইবে। পাছে বানরেরা যজ্ঞে বাধা দেয়, তাই সে এরূপ করিয়া তোমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। এই যজ্ঞ শেষ না হইতেই উহাকে মারিতে হইবে। লক্ষ্মণ, আমার সঙ্গে চল; তুমি ভিন্ন আর কেহ এ কাজ করিতে পারিবে না।' এই বলিয়া লক্ষ্মণকে লইয়া বিভীষণ যজ্ঞ আটকাইতে চলিল।

কিন্তু যজ্ঞ আটকাইতে গেলেই ত আর অমনি তাহা আটকাইয়া ফেলা যায় না। রাক্ষসেরা তাহা সহজে করিতে দিবে কেন? কাজেই সেখানে রাক্ষসদের সহিত লক্ষ্মণের ভয়ানক যুদ্ধ

বাধিয়া গেল। যাহা হউক, ইন্দ্রজিতের আর যজ্ঞ করা হইল না। রাক্ষস আর বানরের গর্জনে লঙ্কা কাঁপিতেছে, এই গোলমালের ভিতরে কি আর যজ্ঞ হয়! আর, এখনই গিয়া লক্ষ্মণকে না আটকাইলে তাই তিনি মুহূর্তের মধ্যেই সকলকে মারিয়া শেষ করিবেন। কাজেই তখন ইন্দ্রজিৎ ছুটিয়া না আসিয়া আর যায় কোথায়! আর সেইজন্যই যজ্ঞ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিতে হইল। প্রাণ বাঁচিলে তবে ত যজ্ঞ হইবে!

এদিকে হনুমান প্রকাণ্ড গাছ লইয়া রাক্ষসদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। রাক্ষসেরাও তাহাকে নানাবিধ অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিতে ছাড়িতেছে না। এমন সময় ইন্দ্রজিৎ আসিয়া হনুমানকে তাড়া করিল। তাহা দেখিয়া বিভীষণ লক্ষ্মণকে বলিল, 'ঐ ইন্দ্রজিৎ আসিতেছে, এই বেলা দুষ্টকে বধ কর!'

তখন লক্ষ্মণ আর ইন্দ্রজিতে কি যুদ্ধই না হইল! ইন্দ্রজিৎ রথের উপরে, আর লক্ষ্মণ হনুমানের পিঠের উপরে। দুইজনেই প্রায় সমান বীর, সুতরাং অনেকক্ষণ পর্যন্ত সমানভাবেই যুদ্ধ চলিল, কাহারও হার জিত নাই। অস্ত্রের ঘায় দুইজনের শরীর দিয়াই দর দর করিয়া রক্ত পড়িতেছে। অদ্ভুত-অদ্ভুত অস্ত্র সকল দুইজনেই ছুঁড়িতেছেন, আবার দুইজনেই কাটিতেছেন।

ইহার মধ্যে একবার ইন্দ্রজিতের রথের ঘোড়া আর সারথি কাটা যায়। আবার বাণের অন্ধকারের ভিতরে কখন ছুটিয়া গিয়া, সে আবার নূতন রথে চড়িয়া আসে। তারপর ক্রমাগত দুইবার তাহাকে ধনুক বদলাইতে হইয়াছে। খানিক পরে আবার লক্ষ্মণের ভল্লঅস্ত্রে ইন্দ্রজিতের নূতন রথের সারথি মারা গেল; আর বিভীষণ গদার ঘায়ে তাহার চারিটা ঘোড়া চুরমার করিয়া দিল। তখন ইন্দ্রজিৎ রথ হইতে নামিযা যে-ই বিভীষণকে একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিয়াছে, অমনি লক্ষ্মণ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে আরও অনেক যুদ্ধের পর শেষে লক্ষ্মণ তাঁহার ধনুকে অস্ত্র জুড়িলেন। ইন্দ্র যাহা দিয়া দৈত্যকে মারিয়াছিলেন, এ সেই অস্ত্র। তাহার চেহারা দেখিয়াই রাক্ষসদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। আর লক্ষ্মণ তাহা ছুঁড়িবামাত্রই ইন্দ্রজিতের মাথা কাটিয়া একেবারে দুইখান হইল।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে কেবল যে বানরেরাই আনন্দে 'জয় লক্ষ্মণ!' বলিয়া লেজ নাড়িল, তাহা নহে। স্বর্গ হইতে যেমন করিয়া ফুল পড়িল আর দুন্দুভির শব্দ শুনা গেল, তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝা গেল যে দেবতারাও ইহাতে কম খুশি হন নাই। দুঃখ হইল খালি রাক্ষসদেরই। তাহা ছাড়া আর কে না সুখী হইল?

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর কথা শুনিয়া রাবণ প্রথমে অনেক কাঁদিল। তারপর রাগে অস্থির হইয়া বলিল, 'ইন্দ্রজিৎ মায়া-সীতা কাটিয়াছিল, আমি সত্যসত্যই সীতাকে কাটিব!' মন্ত্রীরা বারণ না করিলে, সেদিন সে সীতাকে কাটিয়াই ফেলিত। মন্ত্রীদের কথায় অনেক কষ্টে রাগ থামাইয়া, সে বলিল, 'রাক্ষসগণ, আজ তোমরা গিযা কেবল রামকে ঘিরিয়া মার। তোমাদের হাতে আজ যদি বাঁচিতেও পারে, তবুও ইহাতে সে খুব দুর্বল হইয়া যাইবে। তাহা হইলে কাল আমি তাহাকে গিয়া মারিব।'

সেই রাক্ষসেরা যখন রামকে মারিতে গেল, তখন রাম এমনই যুদ্ধ করিলেন যে তেমন যুদ্ধ কেহ কখনও দেখে নাই। তিনি কোথায় আছেন তাহাই কেহ বুঝিতে পারিল না, এত তাড়াতাড়ি তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিন ঘণ্টার ভিতরে আঠার হাজার হাতি, দুই লক্ষ সৈন্য, দশ হাজার রথ, আর সওয়ারসুদ্ধ চৌদ্দ হাজার ঘোড়া তাঁহার বাণে খণ্ড খণ্ড

হইল। তখন আর-আর সকল রাক্ষস ভয়েই পলাইয়া গেল।

এখন আর কে যুদ্ধ করিতে যাইবে? রাবণ ছাড়া লঙ্কায় আর বড় বীর কেহ নাই। কাজেই সে অবশিষ্ট রাক্ষসদিগকে লইয়া, নিজেই যুদ্ধ করিতে আসিল। রাক্ষসেরা যত যুদ্ধ জানে, এবারে তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি করিল না। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! রাবণের সঙ্গে ছোটখাট বীর যাহারা আসিয়াছিল তাহারা অল্প সময়ের ভিতরেই মরিয়া গেল।

কিন্তু রাবণ নিজে এমনি ঘোরতর যুদ্ধ করিল যে বানরেরা তাহার সামনে দাঁড়াইতে পারিল না। যুদ্ধ যাহা হইল তাহার বেশির ভাগ রাম আর লক্ষ্মণের সঙ্গে। লক্ষ্মণ রাবণের ধনুক কাটিলেন আর সারথিকেও মারিলেন। ঘোড়াগুলির জন্য তাঁহার কিছু করিতে হইল না, কারণ বিভীষণ আগেই তাহাদের কর্ম শেষ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার জন্য রাবণ বিভীষণকে শক্তি ছুঁড়িয়া মারে, কিন্তু লক্ষ্মণ তাহা কাটিয়া ফেলাতে বিভীষণের তাহাতে কিছু হয় নাই।

তখন রাবণ আর একটা শক্তি লইল। সেটা এমনি ভয়ানক যে তাহার ভিতর হইতে ঝক্-ঝক্ করিয়া আলো বাহির হইতেছে। লক্ষ্মণ দেখিলেন, বিভীষণের এবার বড়ই বিপদ। কাজেই তিনি তাহাকে বাঁচাইবার জন্য রাবণকে খুব বেশী করিয়া বাণ মারিতে লাগিলেন।

তখন রাবণ কহিল, 'বটে! বিভীষণকে বাঁচাইতে চাহিস? আচ্ছা, তবে তোকেই ইহা দিয়া মারিব!' এই বলিয়া সে সেই শক্তি লক্ষ্মণের দিকেই ছুঁড়িয়া মারিল। সে অস্ত্র গর্জন করিতে করিতে আসিয়া বুকে বিঁধিবামাত্র লক্ষ্মণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন; তাঁহার বুক হইতে তাহা বাহির করিবার জন্য বানরেরা তখনই ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু রাবণ বাণ মারিয়া তাহাদিগকে তাহার কাছে আসিতে দিল না। তাহা দেখিয়া রাম নিজেই আসিয়া দুই হাতে সেই শক্তি টানিয়া তুলিলেন। রাবণ তাহার যতদূর সাধ্য তাঁহাকে বাণ মারিল, তিনি তাহা গ্রাহ্যও করিলেন না।

লক্ষ্মণের দুঃখে রামের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু সে দুঃখের দিকে তখন মন না দিয়া তিনি বলিলেন, 'লক্ষ্মণ এখন এইভাবেই থাকুক। আগে আমি এই দুষ্টকে শাস্তি দিতেছি।' এই বলিয়া তিনি রাবণকে বাণে বাণে এমনই জব্দ করিয়া তুলিলেন যে তাহার তখন লঙ্কায় পলাইয়া যাওয়া ভিন্ন আর বাঁচিবার উপায়ই রহিল না।

রাবণ পলাইয়া গেলে পর রাম লক্ষ্মণকে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন সুষেণ তাঁহাকে বলিল, 'আপনি শান্ত হইন; লক্ষ্মণ মরেন নাই। এখনও তাঁহার বুকের কাছে ধুক্-ধুক্ করিতেছে আর চক্ষু উজ্জ্বল রহিয়াছে।'

এইরূপে রামকে শান্ত করিয়া সুষেণ তখনই হনুমানকে দিয়া ঔষধ আনাইল। সে ঔষধের গন্ধে লক্ষ্মণ আবার ভাল হইয়া উঠিলেন।

এদিকে রাবণ আবার আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। রামের সহিত তাহার ভয়ানক যুদ্ধ চলিয়াছে, এমন সময় দেখা গেল যে মণি মুক্তার কাজ করা একখানি উজ্জ্বল রথ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতেছে। সেই রথের ঘোড়া ছয়টি সবুজ রঙের; তাহাদের শরীরে সোনার অলঙ্কার আর গলায় মুক্তার মালা। সেই রথের সারথি মাতলি হাত যোড় করিয়া রামকে বলিল, 'ইন্দ্র আপনার জন্য এই রথ, ধনুক, কবচ আর অস্ত্র পাঠাইয়াছেন। এই রথে চড়িয়া আপনি রাবণকে বধ করুন।' তাহা শুনিয়া রাম সেই রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সে যুদ্ধ যে কি ভয়ানক হইয়াছিল তাহা কি বলিব! রাবণ একবার ইন্দ্রের রথের নিশান

আর ঘোড়া কাটিয়া বাণে বাণে রামকে অস্থির করিয়া তুলিল। আবার তারপরেই রামের তেজ দেখিয়া তাহার মনে হইল, বুঝি এইবারেই তাহার প্রাণ যায়। সে সময়ে দেবতা, অসুর প্রভৃতি সকলে রাম রাবণের যুদ্ধ দেখিবার জন্য আকাশে উপস্থিত। অসুরেরা বলে, 'রাবণের জয় হউক!' দেবতারা বলেন, 'রামের জয় হউক!'

এদিকে রাবণ আগুনের মত তেজাল তিনমুখো একটা শূল ছুঁড়িয়া রামকে বলিল, 'এইবার তুই মরিবি!' কিন্তু রাম আর এক শূলে সেই শূল কাটিয়া, তারপর হাজার হাজার বাণে তাহাকে এমনি নাকাল করিয়া ফেলিলেন যে সে আর ধনুকখানিও ধরিয়া থাকিতে পারে না। তখন রাম দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, আর তাহার সারথি রথ ফিরাইয়া লঙ্কায় পলাইয়া গেল।

লঙ্কায় আসিয়া একটু সুস্থ হওয়ামাত্রই রাবণ সারথিকে গালি দিতে আরম্ভ করিল, 'ওরে নির্বোধ, তুই কি ভাবিয়াছিস আমার গায়ে জোর নাই? না কি আমার সাহস কম? দেখ্ ত হতভাগা, কি করিলি? রথ লইয়া পলাইয়া আসিলি, এখন লোকে আমাকে বলিবে কি?

সারথি বলিল, 'মহারাজ আপনার পরিশ্রম হইয়াছে আর ঘোড়াগুলিও বড় কাহিল। তাই একটু বিশ্রামের জন্য এখানে আসিয়াছি। এখন যেমন অনুমতি করেন তাহাই করি।' এ কথায় রাবণ খুশি হইয়া সারথিকে হাতের বালা পুরস্কার দিয়া বলিল, 'শীঘ্র যুদ্ধের জায়গায় চল্! শত্রুকে না মারিয়া আমি ঘরে ফিরিব না!' কাজেই সারথি আবার যুদ্ধের জায়গায় রথ ফিরাইয়া আনিল।

এবারে যে যুদ্ধ হইল তাহাই শেষ যুদ্ধ। কিন্তু রাবণ সহজে মরে নাই। মাথা কাটিলেও যে মরিতে চাহে না, তাহাকে মারা সহজ কি করিয়া হইবে? এক-একবার রাবণের মাথা কাটা যায়, আবার তখনই তাহার জায়গায় আর-একটা মাথা উঠে। এইরূপ করিয়া রাম একশত বার তাহার মাথা কাটিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহার মৃত্যু হইল না।

তখন মাতলি রামকে বলিল, 'আপনি ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ুন, নিশ্চয় রাবণ মরিবে।' এই অস্ত্র রাম অগস্ত্য মুনির কাছে পাইয়াছিলেন; ইহার সমান অস্ত্র আর জগতে নাই।

সে অস্ত্র ধনুকে জুড়িবার সময় পৃথিবী অবধি কাঁপিতে লাগিল, জীবজন্তুরা ত ভয় পাইতেই পারে। সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছুঁড়িবামাত্রই তাহা রাবণের বুক ভেদ করিয়া একেবারে মাটির ভিতরে ঢুকিয়া গেল। এবার রাবণের মৃত্যু আটকায় কার সাধ্য! মাথা কাটা গেলেও তাহার মাথা যোড়া লাগিয়াছিল, কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্রের ঘা খাইয়া আর তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল না। যে রাবণের তেজে দেবতারা পর্যন্ত অস্থির, সেই রাবণকে মুহূর্তের মধ্যে বধ করিয়া, রামের অস্ত্র তাঁহার তূণে ফিরিয়া আসিল।

রাবণের মৃত্যুতে সকলে কিরূপ সুখী হইল, বানরেরা কিরূপ লাফালাফি করিল আর লেজ নাড়িল, দেবতারাই বা কেমন করিয়া দুন্দুভি বাজাইলেন আর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, সে-সকল আর বেশি করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তখন যে একটা আনন্দের ঘটা হইয়াছিল, তাহা সহজেই মনে করিয়া লইতে পারি।

অবশ্য রাক্ষসেরা রাবণের জন্য অনেক দুঃখ করিয়াছিল। যে বিভীষণ তাহার নিকট অপমান পাইয়া এত রাগের ভরে চলিয়া আসিয়াছিল, সে বিভীষণও কি কাঁদে নাই? বিভীষণই সকলের আগে কাঁদিয়াছিল। হাজার হউক, ভাই ত! রাগ যতই থাকুক, রাবণের

মৃত্যুতে তাহা ভুলিয়া গিয়া সে কাঁদিয়া অস্থির হইল। রাম তাহাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

আহা! লঙ্কার রাণীরা তখন কি কাতর হইয়াই কাঁদিয়াছিল, সে কান্না শুনিলে বুঝি পাথরও গলিয়া যায়। তাহাদের ত আর কোন দোষ ছিল না; কাজেই তাহাদের দুঃখে কাহার না দুঃখ হইবে? তাহাদিগকে শান্ত করিবার ক্ষমতা কাহারও হইল না। শেষে তাহারা নিজেরাই একে অন্যকে বুঝাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রাম বিভীষণকে বলিলেন, 'ইহাদের দুঃখ আমি আর সহিতে পারিতেছি না; শীঘ্র রাবণকে পোড়াইবার আয়োজন কর।'

তখন সকলে মিলিয়া রাবণকে রেশমী পোশাকে সাজাইয়া, সোনার পাল্কিতে করিয়া, শ্মশানে লইয়া গেল। সেখানে চন্দনকাঠের চিতায় অনেক জাঁকজমকের সহিত তাহাকে পোড়ানো হইল। তারপর রাম বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিলেন।

তখন সকলে সীতার কথা বলিবার সময় হইয়াছে। দুঃখিনী সীতা এখনও সেই ময়লা কাপড়খানি পরিয়া, বিনা স্নানে, এলো চুলে, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে অশোক বনে দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার দুঃখের সময় কখন ফুরাইযাছে, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। এমন সময় হনুমান আসিয়া প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে রাবণের মৃত্যুসংবাদ দিল।

সুখ বা দুঃখ বেশি হইলে লোকে ব্যস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সেই সুখ বা দুঃখ যদি নিতান্তই বেশি রকমের হয়, তবে প্রায়ই ব্যস্ত হইবার অবসর থাকে না। তখন লোকে কেমন হতবুদ্ধির মত হইয়া যায়। হনুমানের কথা শুনিয়া, সীতাও অনেকক্ষণ সেইরূপ হইয়া রহিলেন। তারপর একটু সুস্থ হইয়া হনুমানকে বলিলেন, 'বাছা, যে সংবাদ তুমি দিলে, আমি দীন দুঃখিনী তাহার উপযুক্ত পুরস্কার কি দিব?'

কিন্তু হনুমান পুরস্কারের ধার ধারে না। সীতা যে সুখী হইয়াছে ইহাই তাহার পক্ষে ঢের, সে আর কিছু চাহে না। তবে, একটা কাজ করিতে পারিলে তাহার মনটা আরও খুশি হইত। দুষ্ট রাক্ষসীরা সীতাকে কিরূপ কষ্ট দিত তাহা সে নিজের চক্ষে দেখিয়াছে। সেই রাক্ষসীগুলির ঘাড় ভাঙিতে হনুমানের বড়ই ইচ্ছা ছিল। সীতার অনুমতি পাইলে, সে ইহাদের কি দশা করিত তাহা সে-ই জানে!

কিন্তু সীতার প্রাণে এতই দয়া যে যাহারা তাঁহাকে এত কষ্ট দিয়াছে, তাহাদিগকেও কোনরূপ কষ্ট দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তাই তিনি হনুমানকে বলিলেন, 'বাছা এমন কাজ করিও না! উহারা গরিব লোক, যাহা করিয়াছে রাবণের হুকুমেই করিয়াছে; আসলে উহাদের কোন দোষ নাই।'

তারপর সীতা রামের নিকট আসিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, যেরূপ আছেন ঠিক সেইরূপ মলিন বেশেই তিনি রামের কাছে আসেন। কিন্তু সকলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া, সুন্দর কাপড় আর অলঙ্কার পরাইয়া দিল। এতদিন পরে রামকে দেখিয়া তাঁহার মনে না জানি কতই সুখ হইয়াছিল। কিন্তু হায়! সে সুখ তাঁহার অধিকক্ষণ রহিল না।

সীতা আসিলে রাম তাঁহাকে বলিলেন, 'সীতা, তুমি রাক্ষসদিগের সঙ্গে এতদিন ছিলে। এখন তুমি আমাদিগকে আগেকার মতন ভালবাস কি না তাহা কি করিয়া বলিব? আমি রাবণকে মারিয়া তাহার উচিত শাস্তি দিয়াছি। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে চলিয়া যাও।'

সীতা কত দুঃখই সহিয়াছেন, কিন্তু রামের এই কথায় তাঁহার মনে যে দুঃখ হইল, সে

দুঃখ আর তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, ' 'হায় হায়, আমার আর বাঁচিয়া কি কাজ? লক্ষ্মণ, আগুন জ্বালিয়া দাও, আমি তাহাতে পুড়িয়া মরিব!'

তখন লক্ষ্মণ রাগে আর দুঃখে চিতা প্রস্তুত করিয়া আগুন জ্বালিয়া দিলেন, আর সেই আগুনে সীতা ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

আহা! সংসারের সকল সুখ দিলেও যে সীতার গুণের পুরস্কার হয় না, যাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য এত জনের প্রাণ দিতে হইল, সেই সীতার কিনা শেষে এই দশা!

কিন্তু কি আশ্চর্য! আগুনে সীতার মাথার একগাছি চুলও পুড়িল না। সকলে অবাক হইয়া দেখিল যে নিজে দেবতা অগ্নি সীতাকে কোলে করিয়া, চিতা হইতে উঠিয়া আসিতেছেন। সীতা দেখিতে সকালবেলার সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল; তাঁহার পরনে লাল কাপড়, গায় অলঙ্কার, গলায় মালা। অগ্নি সীতাকে রামের কাছে দিয়া বলিলেন, 'সীতার কোন দোষ নাই।' তখন রাম মনের সুখে পরম আদরের সহিত সীতাকে লইলেন।

এদিকে রাম সীতাকে দেখিবার জন্য দেবতারা সকলে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে দশরথও আসিয়াছেন। দশরথকে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণ প্রণাম করিলেন। দশরথ রামকে আদর করিয়া বলিলেন, 'বাছা, স্বর্গে বড় সুখে আছি, কেবল কৈকেয়ীর সেই কথাগুলি মনে হইলে আজও খুব কষ্ট হয়। আজ তোমাদিগকে দেখিয়া আমার সে কষ্ট দূর হইল। আমার জন্য তুমি এতদিন বনে থাকিলে, আর রাবণকে মারিয়া দেবতাদের উপকার করিলে এখন দেশে গিয়া সুখে রাজত্ব কর।'

রাম হাতযোড় করিয়া দশরথকে বলিলেন, 'বাবা, মা কৈকেয়ী আর ভাই ভরতের উপর আপনার যদি রাগ থাকে, তবে তাহা দূর করুন।' রামের এই কথায় দশরথ সম্মত হইয়া রাম সীতা আর লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

দশরথ চলিয়া গেলে পর ইন্দ্র রামকে বলিলেন, 'রাম, আমরা তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর লও।'

রাম বলিলেন, 'তবে আমাকে এই বর দিন যে আমার উপকার করিতে আসিয়া, যে-সকল বানর মরিয়াছে তাহারা আবাব বাঁচিয়া উঠুক। আর তাহাদের দেশের গাছে অনেক ফল আর নদীতে অনেক জল হউক।'

ইন্দ্র বলিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হইবে।' এই কথা শেষ হইতে না হইতেই, যত বানর যুদ্ধে মরিয়াছিল সকলেই আবার উঠিয়া বসিল—যেন এইমাত্র তাহাদের ঘুম ভাঙিয়াছে।

তারপর দেবতারা রাম লক্ষ্মণকে আদর করিয়া বলিলেন, 'এখন তোমরা মনের সুখে অযোধ্যায় চলিয়া যাও। সেখানে সকলেই তোমাদের জন্য দুঃখিত রহিয়াছে। আর সীতাও অনেক কষ্ট পাইয়াছেন, তাহাকে শান্ত কর।' এই বলিয়া দেবতারা আবার স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছিল; কাজেই রাম সকলকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। সে রাত্রি সকলের কি সুখেই কাটিল! এমন সুখের রাত্রি খুব কমই হইয়া থাকে।

রাবণ মরিল, বনবাসেরও দিন ফুরাইয়া আসিল। এখন অযোধ্যায় ফিরিবার সময়। তাহা দেখিয়া বিভীষণ রামকে বলিল, 'আমার ভাই রাবণ কুবেরের পুষ্পক রথখানি কাড়িয়া আনেন। এখন সেই রথ আপনারই। এই রথে এক দিনেই অযোধ্যায় যাইতে পারিবেন। কিন্তু আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আর একটি দিন আমার এখানে থাকিয়া যাউন।'

রাম বলিলেন, 'বন্ধু বিভীষণ, তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ। কিন্তু ভাই ভরত, মা কৌশল্যা, সুমিত্রা আর কৈকেয়ী প্রভৃতিকে দেখিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে। তুমি দুঃখ করিও না। আমি আর একদিনও থাকিতে পারিতেছি না, আমাকে এখনই বিদায় দাও।' তখন সারথি পুষ্পক রথ সাজাইয়া আনিল। রাম সীতা আর লক্ষ্মণের সহিত তাহাতে উঠিয়া, বিভীষণ, সুগ্রীব আর অন্যান্য বানর দিগের নিকট বিদায় চাহিলেন।

তাহারা সকলে হাতযোড় করিয়া বলিল, 'দয়া করিয়া আমাদিগকে আপনার সঙ্গে লউন। আমরা অযোধ্যায় গিয়া আপনার অভিষেক দেখিব, আর মা কৌশল্যাকে প্রণাম করিব।' এই কথায় রাম যার-পর-নাই সুখী হইয়া বলিলেন, 'তবে তোমরা শীঘ্রই রথে উঠ।'

তাহারাও রথে উঠিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না। সুগ্রীব উঠিল, বিভীষণ সপরিবারে উঠিল, অন্যান্য বানরেরা সকলে উঠিল—তাহাদের আনন্দের আর সীমা নাই। তাহাদের সকলকে লইয়া সেই হাঁসে-টানা পুষ্পক রথ শোঁ-শোঁ শব্দে আকাশে উড়িয়া চলিল।

রথ কিষ্কিন্ধ্যায় আসিলে পর সীতা রামকে বলিলেন, 'আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে যে বানরদিগের বাড়ির মেয়েদিগকে সঙ্গে করিয়া অযোধ্যায় লইয়া যাই।' সুতরাং কিষ্কিন্ধ্যার মেয়েরাও অনেকে পুষ্পক রথে উঠিয়া তাঁহাদের সঙ্গে অযোধ্যায় চলিল।

এইরূপে ক্রমে তাঁহারা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে রামের বনে থাকার চৌদ্দ বৎসর ফুরাইল।

রামকে দেখিয়া ভরদ্বাজ বলিলেন, 'বাছা, যাইবার সময় তোমাকে দেখিয়া আমার মনে যেমন ক্লেশ হইয়াছিল, আজ তোমাকে আবার দেখিয়া আমার মনে তেমনই আনন্দ হইতেছে। তুমি বর লও।' রাম বলিলেন, 'এই বর দিন যে অযোধ্যার পথে সকল গাছে যেন মিষ্ট ফল আর মধু পাওয়া যায়।'

মুনির বরে তখনই অযোধ্যার পথের-গাছ সকল মিষ্ট ফলে আর মধুতে ভরিয়া গেল। বানরেরা কত খাইবে!

তারপর হনুমানকে ডাকিয়া রাম বলিলেন, 'হনুমান, তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় যাও। সেখানে আমাদের সংবাদ দিবে আর সেখানকার সংবাদও লইয়া আসিবে। পথে শৃঙ্গবের নগবে আমার বন্ধু গুহ থাকেন, তাঁহাকে আমার কথা বলিও। তিনি তোমাকে অযোধ্যার পথ বলিয়া দিবেন।'

হনুমান তখনই মানুষের বেশ ধরিয়া শোঁ-শোঁ শব্দে আকাশে চলিল। পথে গুহের দেশ। সেখানে রামের সংবাদ দিয়া ভরতের নিকট পৌঁছিতে, তাহার অধিক সময় লাগিল না।

ভরত তখন নন্দীগ্রামে ছিলেন। অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ দূরে হনুমান তাঁহার দেখা পাইল। তাঁহারও তপস্বীর বেশ, মাথায় জটা আর পরিধানে গাছের ছাল। ফল-মূল খাইয়া থাকেন আর রামের খড়ম দুইখানিকে সম্মুখে রাখিয়া রাজ্যের কাজ করেন।

হনুমান তাঁহার কাছে আসিয়া হাত যোড় করিয়া বলিল, 'আপনারা যে রামের জন্য এত দুঃখ করিতেছেন, সেই রাম আপনাদের সংবাদ লইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। আর দুঃখ করিবেন না, শীঘ্রই তিনি সকলকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইবেন।'

এই কথা শুনিয়া ভরত আনন্দে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। সুস্থ হইলে পর তিনি হনুমানকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'তুমি দেবতা না মানুষ, দয়া করিয়া আমার এখানে আসিয়াছ?

আজ তুমি যে সংবাদ আমাকে শুনাইলে, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার আমি তোমাকে কি দিব? তুমি এক লক্ষ গরু আর একশতখানি গ্রাম লও!'

তারপর হনুমান কুশাসনে বসিয়া রামের সকল সংবাদ ভরতকে শুনাইয়া, শেষে বলিল, 'তিনি এখন ভরদ্বাজের আশ্রমে আছেন। কাল এইখানে আসিবেন।'

আজ যদি পৃথিবীতে সুখী কেহ থাকে, তবে সে এই অযোধ্যার লোক। সুখী কেন হইবে না? চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া যে রামের দুঃখে তাহারা চক্ষের জল ফেলিয়াছে, ভাল করিয়া খায় নাই, ভাল কাপড় পরে নাই, সেই রাম এতদিনে দেশে ফিরিতেছেন। তাই আজ সকলে পথঘাট পরিষ্কার করিয়া, বাড়ি ঘর সাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, বাজনা বাজাইয়া রামকে দেখিতে চলিল। পাল্কি চড়িয়া রাণীরা চলিলেন, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ভরত চলিলেন—তাঁহার মাথায় রামের সেই খড়মজোড়া।

যেই রামের রথ দেখা গেল, অমনি সকলে 'ঐ রাম!' শব্দে আকাশ ফাটাইয়া দিল।

তখন যে সকলের মনে খুবই আনন্দ হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর, সকলেই তখন যে রামকে প্রাণ ভরিয়া আদর করিবার জন্য ব্যস্ত হইবে, তাহাও আশ্চর্য নহে। যাহারা তাঁহার চেয়ে ছোট, তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লইল। রামও মা কৌশল্যা আর অন্যান্য রাণীদিগকে আর বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিলেন।

তারপর ভরত রামের সেই খড়মজোড়া তাহার পায়ে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'দাদা, তোমার রাজ্য আমাকে রাখিতে দিয়া গিয়াছিলে, এখন তাহা তুমি ফিরাইয়া লও। তোমার রাজ্য এখন আগেব চেয়ে দশগুণ বড় হইয়াছে।'

তারপর ক্ষুর হাতে ভাল ভাল ওস্তাদ নাপিতেরা আসিয়া রামের চৌদ্দ বছরের জটা চাঁছিয়া পরিষ্কার করিল। শত্রুঘ্ন রাম লক্ষ্মণকে স্নান করাইয়া নিজ হাতে তাঁহাদিগকে সাজাইয়া দিলেন। সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি আর যত লোক সঙ্গে আসিয়াছিল, কাহারও আদর যত্নের কোন ত্রুটি হইল না। নিজে মা কৌশল্যা যখন বানরের মেয়েদিগকে সাজাইলেন তখন কিরূপ আদর-যত্ন হইল বুঝিতেই পার।

অবশেষে বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিরা রাম সীতাকে মাণিকের পিঁড়ির উপর বসাইয়া তাঁহাদের অভিষেক করিলেন। সে অভিষেক কি চমৎকার হইয়াছিল, তাহা কি না দেখিলে বঝিতে পারা যায়? দেবতারা পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন, অন্য কথায় আর কাজ কি?

যত ভাল ভাল তীর্থ আছে, সকল তীর্থের জল দিয়া রামকে স্নান করানো হইল। স্নানের পর রাম রাজবেশে রত্নের পিঁড়িতে সভা আলো করিয়া বসিলেন। তাঁহার মাথায় সেই মনুর সময় অবধি যাহা অযোধ্যার রাজারা মাথায় দিয়া আসিতেছেন, সেই আশ্চর্য মুকুট। দুই পাশে সাদা চামর হাতে সুগ্রীব আর বিভীষণ; পিছনে সাদা ছাতাখানি লইয়া শত্রুঘ্ন। তখন ইন্দ্রের হুকুমে পবন আসিয়া তাঁহার গলায় স্বর্গের সোনার পদ্মের মালা আর আশ্চর্য মোতির হার পরাইয়া দিলেন।

এইরূপ করিয়া দেবতা গন্ধর্বের গান আর আনন্দ-কোলাহলের ভিতরে রাম অযোধ্যার রাজা হইলেন। তেমন রাজা আর কেহ কখনও দেখে নাই। আজও খুব ভাল রাজার কথা বলিতে হইলে লোকে বলে, 'রামের মতন রাজা!'

ছেলেদের মহাভারত

গ্রন্থকারের নিবেদন

মহাভারতের আখ্যানকে বালক-বালিকাদিগের উপযোগী করিতে গিয়া উহার স্থানে স্থানে আবরণের প্রয়োজন হইযাছে। মূল গল্প অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই কার্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। এ বিষয়ে যদি কেহ কোনো ত্রুটি দেখিতে পান, দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থপ্রণয়ন বিষয়ে আমি বিশেষভাবে ঋণী। লিখিবার সময় তাঁহার নিকট উৎসাহ পাইয়াছি, এবং পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত তিনি সংশোধন করিয়া দেওয়াতে পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। ইতি—

২২ নং সুকিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

২৩শে ভাদ্র, ১৩১৫

খন আমরা যাহাকে দিল্লী বলি, সেই দিল্লীর কাঁছে, অনেকদিন আগে, হস্তিনা বলিয়া একটা নগর ছিল।

এই হস্তিনার রাজা বিচিত্রবীর্যের ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু নামে দুই পুত্র ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বয়সে বড় ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অন্ধ ছিলেন। অন্ধ যে, সে রাজ্য পায় না। কাজেই, বয়সে বড় হইয়াও ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইতে পারিলেন না, রাজা হইলেন ছোটো ভাই পাণ্ডু।

রাজ্য না পাওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত হইয়াছিলেন বৈকি! তবুও যদি পাণ্ডুর ছেলে হওয়ার আগে তাঁহার ছেলে হইত, তবে সে দুঃখ তিনি সহিয়া থাকিতে পারিতেন, কারণ তাঁহাদের ছেলেদের মধ্যে যে বড়, তাহারই রাজ্য পাইবার কথা ছিল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের কপালে তাহাও হইল না, পাণ্ডুরই আগে ছেলে হইল। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা যখন বুঝিল, তাহারা রাজ্য পাইবে না, তখন হইতেই তাহাবা প্রাণ ভরিয়া পাণ্ডব (অর্থাৎ পাণ্ডুর ছেলে)-দিগকে হিংসা করিতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের মধ্যে দুর্যোধন সকলের বড়, তারপর দুঃশাসন, তারপর আরো আটানব্বুই জন। সবসুদ্ধ তাহারা একশত ভাই। ইহা ছাড়া দুঃশলা নামে তাহাদের একটি বোনও ছিল।

পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র। সকলের বড় যুধিষ্ঠির, তারপর ভীম, তারপর অর্জুন, তারপর নকুল ও সহদেব নামে দুটি যমজ ভাই। ইঁহারা এক মায়ের ছেলে নহেন। পাণ্ডুর দুই রানী ছিলেন। বড়র নাম কুন্তী, ছোটর নাম মাদ্রী। যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুন, ইহারা কুন্তীর ছেলে। নকুল সহদেব মাদ্রীর ছেলে। দুই মা হইলে কি হয়? ইঁহাদের মধ্যে যে ভালোবাসা ছিল তেমন ভালোবাসা এক মায়ের ছেলেদের ভিতরেও কম দেখা যায়।

এক-একজন দেবতা পাণ্ডুকে এই-সকল পুত্রের এক-একটি দিয়াছিলেন। ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে দিয়াছিলেন, পবন ভীমকে দিয়াছিলেন, ইন্দ্র অর্জুনকে আর অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবতা নকুল ও সহদেবকে। এইজন্য লোকে বলে যে যুধিষ্ঠির ধর্মের পুত্র, ভীম পবনের পুত্র, অর্জুন ইন্দ্রের পুত্র, নকুল সহদেব অশ্বিনীকুমারদিগের পুত্র। এই-সকল দেবতা ইঁহাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।

কিন্তু হায়! এই পৃথিবীতে অল্পদিনই ইঁহারা সুখে কাটাইতে পারিয়াছিলেন। পাণ্ডু ইঁহাদিগকে খুব ছোট রাখিয়াই হঠাৎ মারা গেলেন, মৃত্যুর সময় মাতা মাদ্রী তাঁহার কাছে ছিলেন, তিনি মনের দুঃখ সহিতে না পারিয়া পাণ্ডুর চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়া সেই দুঃখ দূর করিলেন। ইহার পর আর এমন কেহই রহিল না, যে আপনার বলিয়া মা কুন্তী আর পাঁচটি ভাইয়ের

দিকে চায়।

যাহা হউক, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের সঙ্গেই রহিলেন। একশো পাঁচটি ছেলের একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে পড়া, একসঙ্গে খেলা, সবই একসঙ্গে হইতে লাগিল।

খেলার সময় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ভীমের হাতে বড়ই নাকাল হয়। ভীমের জ্বালায় উহারা ভালো করিয়া খেলিতেই পায় না। খেলা আরম্ভ করিলেই ভীম কোথা হইতে আসিয়া তাহদের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিয়া দেন। ইহারা একশো ভাই, ভীম একেলা। তবুও উহারা কিছুতেই তাঁহাকে আঁটিতে পারে না। তিনি তাহাদিগকে আছড়াইয়া ফেলিয়া চুল ধরিয়া এমনি টান দেন যে, বেচারারা তাহাতে চ্যাঁচাইয়া অস্থির হয়। জলে নামিয়া খেলা করিতে গেলে, তিনি তাহাদের দশজনকে একসঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া ডুব দেন, আর তাহারা আধমরা না হইলে ছাড়েন না। বেচারারা হয়তো ফল পাড়িবার জন্য গাছে উঠিয়াছে, এমন সময় ভীম আসিয়া সেই গাছে লাথি মারিতে থাকেন। লাথির চোটে গাছ এমনি নড়িয়া উঠে যে, ফলের সঙ্গে সঙ্গে উহারাও মাটিতে পড়িয়া যায়। কাজেই উহারা ভীমকে বড়ই হিংসা করে, আর তাঁহার কাছে বড়-একটা ঘেঁষে না।

ভীমকে যতই দেখে, দুর্যোধনের মনে ততই ভয় হয়, আর ততই তাহার দুষ্টবুদ্ধি বাড়িয়া উঠে। সে কেবলই ভাবে, 'এই ভীমটাকে বড় হইতে দিলেই তো আমাদের সর্বনাশ! সুতরাং, এইবেলা এটাকে মারিয়া ফেলিতে না পারিলে চলিতেছে না। ভীম মরিলে আর চারিটা ভাইকে বাঁধিয়া রাখিলেই চলিবে।'

দুষ্ট বসিয়া বসিয়া খালি এইরূপ ভাবে। তারপর একদিন সে সকলকে বলিল, 'চল আজ গঙ্গাস্নানে যাই!' এই সহজ কথাটার ভিতর কি ফন্দি রহিয়াছে, তাহা তো পাণ্ডবেরা জানেন না, তাঁহারা কেবল জানেন গঙ্গায় ঝুটোপাটি করিয়া স্নান করিতে যারপরনাই আরাম। সুতরাং, স্নানের কথা শুনিয়াই সকলে যাইব!' 'যাইব!' বলিয়া প্রস্তুত হইলেন।

প্রমাণকোটিতে গঙ্গাস্নানের আয়োজন হইল। প্রমাণকোটি অতি চমৎকার স্থান। গঙ্গার ধারে বাগান আর সুন্দর বাড়ি। জলযোগের আয়োজন সেখানে ভালো মতই হইয়াছে। কাজেই ছেলেদের আনন্দের আর সীমা নাই। বেশি খুশি অবশ্য মিঠাই দেখিয়া। মিঠাই যে তাঁহারা কি আনন্দ করিয়া খাইলেন, সে কি বলিব! আবার শুধু নিজে খাইয়া তৃপ্তি হয় না, যেটা ভালো লাগে, সেটা ভাইয়ের মুখে তুলিয়া দেওয়া চাই।

তাহা দেখিয়া দুর্যোধন ভাবিল, 'এইবার আবার সুবিধা।' তারপর মিষ্ট মিষ্ট কথা বলিয়া, আর যারপরনাই আদর দেখাইয়া, হাসিতে হাসিতে দুরাত্মা বিষ মাখানো সন্দেশ ভীমের মুখে তুলিয়া দিল। ভীম কি জানেন? তিনি সন্দেশের সঙ্গে বিষ খাইয়া ফেলিলেন, কোনো সন্দেহ করিলেন না।

তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান চলিল। শেষে ঝুটোপাটিতে ক্লান্ত হইয়া আর সকলেই কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘরে গেলেন, গেলেন না শুধু ভীম। বিষের তেজে, আর তাহার উপর পরিশ্রমে, তিনি এতই দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে, গঙ্গার ধারে একটু না শুইয়া থাকিতে পারিলেন না।

সেইখানে ভীম কখন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, দুর্যোধন ছাড়া তাহা আর কেহই জানিতে পারে নাই, ভীম অজ্ঞান হইতেই সেই দুষ্ট, লতা দিয়া তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া তাঁহাকে জলে

ফেলিয়া দিল।

ভীম জলে ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু ভগবান যাঁহাকে রাখেন, হাজার দুষ্টলোক মিলিয়াও তাঁহাকে মারিতে পারে না। ভীম ডুবিলেন বটে, আর অন্য স্থানে পড়িলে তিনি মরিয়াও যাইতেন, তাহাতে ভুল নাই, কিন্তু তাঁহাকে যেখানে ফেলিয়াছিল, ঠিক সেইখান দিয়া ছিল পাতালে যাইবার পথ—যেখানে সাপেরা আর তাহাদের রাজা বাসুকি থাকেন। ভীম সেই পাতালের পথ দিয়া ডুবিতে ডুবিতে একেবারে সেই সাপের দেশে গিয়া পড়িয়াছিলেন। আর পড়িবি তো পড়— একেবারে কতকগুলি সাপের ঘাড়ে! সে বেচারারা তাঁহার চাপে তখনই চেপ্টা হইয়া গেল।

তখন যে ভারি একটা গোলমাল হইল, তাহা বুঝিতেই পার। সাপের দল মহারাগে আসিয়া ভীমকে যে কি ভয়ানক কামড়াইতে লাগিল, তাহা আর বলিবার নয়।

ইহাতে কিন্তু ভীমের ভালোই হইল, কেননা, ভীমকে যে বিষ খাওয়ানো হইয়াছিল, সাপের বিষই হইতেছে তাহার ঔষধ। কাজেই সাপের কামড়ে ভীমের গায়ের বিষ কাটিয়া গেল। ভীম চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া দেখেন, একি আশ্চর্য ব্যাপার! তখন তিনি দুই মিনিটের মধ্যে বাঁধন ছিঁড়িয়া কিল চড়ের ঘায় সাপের বাছাদের কি দুর্দশাই করিলেন! সে কিল যাহারা খাইল, তাহারা তো মরিয়াই গেল। যাহারা পলাইতে পারিল তাহারা উর্ধশ্বাসে তাহাদের রাজা বাসুকিকে গিয়া বলিল, "রাজা মহাশয়! সর্বনাশ! একটা মানুষের ছেলে আসিয়া সব মাটি করিল! আপনি শীঘ্র আসুন!"

এ কথা শুনিয়াই বাসুকি ছুটিয়া দেখিতে আসিলেন, ব্যাপারখানা কি। আসিয়া দেখেন— কি আশ্চর্য! এ যে ভীম! "আরে তাইতো! ও ভীম! তুমি যে আমার নাতির নাতি! এসো ভাই কোলাকুলি করি!" বলিয়া বাসুকি ভীমকে জড়াইয়া ধরিয়া কতই আদর করিলেন! আর ধনরত্নই-বা তাঁহাকে কত দিলেন!

শুধু তাহাই নহে, ইহার উপর আবার অমৃত। বাসুকির বাড়িতে অমৃতের ভান্ডার ছিল। চৌবাচ্চার পর চৌবাচ্চা সারি সারি সাজানো, তাহা ভরিয়া খালি অমৃত রাখিয়াছে। সাপেরা ভীমকে সেই অমৃতের কাছে নিয়া বলিল, "যত ইচ্ছা খাও!"

ভীম এক নিশ্বাসে এক চৌবাচ্চা খালি করিয়া দিলেন। তারপর আর-এক নিশ্বাসে আর-এক চৌবাচ্চা! আর-এক নিশ্বাসে আর-এক চৌবাচ্চা! এমনি করিয়া আট চৌবাচ্চা অমৃত খাইয়া দেখিলেন, আর পেটে ধরে না।

যেমন খাওয়া তেমনি বিশ্রামটি তো চাই! ভীম আট চৌবাচ্চা অমৃত খাইয়া, আটদিন যাবৎ কেবলই ঘুমাইলেন।

যুধিষ্ঠির স্নান করিয়া বাড়ি ফিরিবার সময় ভীমকে দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু সেজন্য তখন তাঁহার মনে বেশি চিন্তা হইল না। তিনি ভাবিলেন, হয়তো ভীম আগেই চলিয়া আসিয়াছেন। বাড়ি ফিরিয়া মাকে প্রণাম করিয়াই যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, ভীম যে আমাদের আগে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকে তো দেখিতেছি না। তুমি কি তাহাকে কোথাও পাঠাইয়াছ? "

এ কথা শুনিয়াই কুন্তী নিতান্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন, "সেকি কথা বাবা, আমি তো ভীমকে দেখিতে পাই নাই। হায় হায়, কি হইবে? শীঘ্র তার খোঁজ কর।"

তখনই বিদুরকে ডাকানো হইল। বিদুর যুধিষ্ঠিরের কাকা হন। এমন সরল সাধুলোক পৃথিবীতে খুব কমই জন্মিয়াছেন। বিদুর আসিলে কুন্তী সকল কথা তাঁহাকে জানাইয়া, শেষে বলিলেন, " বুঝি-বা দুর্যোধনই আমার ভীমকে মারিয়া ফেলিল। ও দুষ্ট ভীমকে বড়ই হিংসা করে!"

বিদুর বলিলেন, "বৌদিদি, চুপ, চুপ! আপনার এ কথা দুর্যোধন শুনিতে পাইলে বড়ই বিপদ ঘটাইবে। ভীমের জন্য আপনি কোনো চিন্তা করিবেন না। আমি ব্যাসদেবের মুখে শুনিয়াছি যে, আপনার ছেলেরা অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিবেন। ব্যাসের কথা কি মিথ্যা হইতে পারে? আপনার কোনো ভয় নাই, নিশ্চয় ভীম ফিরিয়া আসিবেন!" এই বলিয়া বিদুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কুন্তী আর তাঁহার পুত্রগণের মনের দুঃখ ঘুচিল না।

এদিকে ভীমও আটদিনের লম্বা ঘুমের শেষে জাগিয়া উঠিয়াছেন। অমৃত খাইয়া তাঁহার শরীরে দশহাজার হাতির বল হইয়াছে। সাপেরা তাঁহাকে স্নান করাইয়া সাদা কাপড় আর সাদা মালা পরাইয়া, পায়স রাঁধিয়া খাওয়াইয়া, পরম আদরের সহিত সেই প্রমাণকোটির স্নানের জায়গায় রাখিয়া গেল। সেখানে আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলিয়া আসিলেন।

মরা ছেলে বাঁচিয়া উঠিলে মা-বাপ যেমন খুশি হয়, ভীমকে পাইয়া সকলে তেমনি সুখী হইলেন। তারপর তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, বলিলেন," ভাই সাবধান! এ সব কথা যেন আর কেহ না জানে।"

তখন হইতে পাঁচ ভাই যারপরনাই সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন আর দুর্যোধনের মামা শকুনি কতরকমে তাঁহাদিগকে হিংসা করেন, তাঁহারা সে-সব জানিতে পারিয়াও চুপ করিয়া থাকেন। এইরূপ করিয়া দিন যাইতে লাগিল।

শিশুকাল হইতেই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের ছেলেরা ধনুর্বিদ্যা (অর্থাৎ ধনুক দিয়া তীর ছোঁড়া) শিখিতে আরম্ভ করে। যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন প্রভৃতি সকলেই একসঙ্গে কৃপাচার্য নামক একজন খুব ভালো শিক্ষকের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একদিন ছেলেরা শহরের বাহিরে একটা লোহার গোলা লইয়া খেলা করিতেছিল। খেলিতে খেলিতে গোলাটা একটা শুকনো কুয়ার ভিতরে পড়িয়া গেল, ছেলেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাহা তুলিতে পারিল না. গোলা তুলিতে না পারায় অপ্রস্তুত হইয়া তাহারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছে, এমন সময়, সেইখান দিয়া একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাইতেছেলেন। ছিপ্‌ছিপে কালো-হেন লোকটি, পাকাচুল, হাতে তীর-ধনুক। ছেলেদের দুর্দশা দেখিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দুয়ো! দুয়ো! তোমরা ক্ষত্রিয় হইয়া এই গোলাটা তুলিতে পারিলে না! দুয়ো! দুয়ো! আমাকে কি খাইতে দিবে বল, আমি গোলা তুলিয়া দিতেছি! গোলাও তুলিব, আর আমার এই আংটি কুয়ায় ফেলিতেছি তাহাও তুলিব।" এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার আংটিটিও কুয়ায় ফেলিয়া দিলেন।

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহাশয়, আপনি যদি গোলাটা তুলিতে পারেন তবে চিরকাল খাইতে পাইবেন।"

ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে একমুঠো শর লইলেন। তারপর তাহার একটি শর গোলায় বিঁধাইয়া, সেই শরের পিছনে আর-একটি শর বিঁধাইয়া তাহার পিছনে আবার আর-একটি—

এমনি কবিয়া কুয়াব মুখ অবধি লম্বা একটা কাঠি প্রস্তুত কবিযা ফেলিলেন। সেই কাঠি ধবিযা গোলা টানিযা তুলিতে আব কতক্ষণ লাগে?

ছেলেবা আশ্চর্য হইযা বলিল, "আচ্ছা, আংটিটি তুলুন তো।" ব্রাহ্মণ তীব ধনুক লইযা দেখিতে দেখিতে আংটিও তুলিয়া আনিলেন। ছেলেবা তো অবাক। তখন তাহাবা হাত জোড কবিযা তাঁহাকে প্রণাম কবিল, তাবপব বলিল, "আপনি নিশ্চয কোনো মহাপুরুষ হইবেন। বলুন আপনি কে? আব আমবা আপনাব কোন কাজ কবিব?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমাদেব আব কিছুই কবিতে হইবে না। তোমবা তোমাদেব ঠাকুবদাদা মহাশযেব নিকট গিযা বল যে, এইবকম এক বুডা আসিযাছে।"

অমনি সকলে ছুটিযা গিযা তাহাদেব ঠাকুবদাদা ভীষ্মেব নিকট সংবাদ দিল। ভীষ্ম সকল কথা শুনিযা বলিলেন, "বুঝিযাছি। দ্রোণাচার্য আসিযাছেন। এ আব কাহাবো কর্ম নহে।" ভীষ্মেব অনেকদিন হইতেই ইচ্ছা, ছেলেদিগকে দ্রোণাচার্যেব হাতে দেন, সেই দ্রোণাচার্য আপনা হইতেই আসিযা উপস্থিত। ইহাতে বডই আনন্দিত হইযা, ভীষ্ম তাঁহাকে পবম আদবেব সহিত বাডিতে লইযা আসিলেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, ইহাবা অতি মহৎ লোক ছিলেন। ইহাদেব খালি নাম আব পবিচয শুনিলেই হইবে না, ইহাদেব কথা আবো বেশি কবিযা জানা চাই।

দেবতাদেব মধ্যে আটজনকে আট বসু বলে। এই বসুবা একবাব তাঁহাদেব স্ত্রীদিগকে লইযা সুমেরু পর্বতেব কাছে একটি সুন্দব বনে বেডাইতে গিযেছিলেন। সেই বনে বশিষ্ঠ মুনিব আশ্রম ছিল। বশিষ্ঠেব একটি গাই ছিল, তাহাব নাম নন্দিনী। এমন সুন্দব গরু আব কখনো হয নাই, হইবেও না। যত দুধ চাই নন্দিনী তত দুধই দিত আব সে আশ্চর্য দুধ একবাব খাইলে দশ হাজাব বৎসব সুস্থ শবীবে বাঁচিযা থাকা যাইতো।

বসুদেব মধ্যে একজনেব নাম দ্যু। তাঁহাব স্ত্রীব বডই ইচ্ছা হইল, গাইটি লইযা যাইবেন। উশীনব বাজাব কন্যা জিতবতী তাহাব সখী। সখীকে একবাব এবই গরুব দুধ খাওযাইতে পাবিলে তিনি দশহাজাব বৎসব বাঁচিযা থাকিবেন। আহা, তাহা হইলে কি সুখেব কথাই হইবে।

দ্যুব স্ত্রী যতই এ কথা ভাবেন, ততই তাঁহাব গাইটিব জন্য মন পাগল হয, আব ততই তিনি তাঁহাব স্বামীকে পীডাপীডি কবেন, 'ওগো। লইযা চল। লইযা চল, গাইটি আব বাছুবটি।"

ইহাঁব কথায শেষে বসুবা আট ভাই মিলিযা বাছুবসুদ্ধ গাইটিবে চুবি কবিলেন।

বশিষ্ঠ ফলমূল আনিবাব জন্য বাহিব হইযাছিলেন, সুতবাং তিনি নন্দিনীকে লইযা যাইবাব সময দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু মুনিবা ধ্যানে সকল কথাই জানিতে পাবেন। কাজেই, তাঁহাব চোব ধবিতে বেশি বিলম্ব হইল না। তিনি বসুদিগকে এই বলিযা শাপ দিলেন, "তোবা দেবতা হইযা এমন কর্ম কবিলি, এজন্য তোবা মানুষ হইযা পৃথিবীতে জন্মাইবি।"

বসুদেব আটজনেব মধ্যে দ্যুবই অধিক দোষ ছিল, অন্যদেব দোষ তত নহে। তাই শেষে বশিষ্ঠ দয়া কবিযা বলিলেন যে, অপব সাতজন একবৎসব মানুষ থাকিযাই আবাব দেবতা হইতে পাবিবে, কিন্তু দ্যুব, যত বৎসব মানুষ বাঁচে, তত বৎসবই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে।

এখন বসুবা তো নিতান্তই সংকটে পডিলেন। মুনিব কথা মিথ্যা হইবাব নহে, কাজেই

মানুষ হইয়া জন্মিতেই হইবে। সুতরাং আর উপায় না দেখিয়া তাঁহারা গঙ্গাদেবীকে বলিলেন, "মা! পৃথিবীতে যদি জন্মিতেই হয় তবে যে-সে বাপ-মায়ের ছেলে হইয়া যেন আমরা না জন্মাই, এমনি করিয়া দাও। হস্তিনার রাজা প্রতীপের শান্তনু নামক অতিশয় ধার্মিক পুত্র হইবেন আমরা তাঁহারই পুত্র হইব। আর আমাদের মা হইবে তুমি নিজে। আমাদের জন্যে মা তোমাকে মানুষ হইয়া পৃথিবীতে যাইতেই হইতেছে। তোমার সঙ্গে আমাদের এই কথা রহিল যে, আমাদের জন্মের পরেই তুমি আমাদিগকে জলে ফেলিয়া দিবে।"

বসুগণের মিনতি দেখিয়া গঙ্গা তাঁহাদের কথায় রাজি হইলেন।

পরম ধার্মিক রাজা প্রতীপ গঙ্গার ধারে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া ভগবানের চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গাদেবী একটি সুন্দরী কন্যা হইয়া তাঁহার কোলে গিয়ে বসিলেন। প্রতীপ চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া দেখিয়া নিতান্ত আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে মা, বৌমার মতন আসিয়া আমার কোলে বসিলে? আমার পুত্র হইলে তোমাকে তাহার সঙ্গে বিবাহ দিব।"

গঙ্গা বলিলেন, "আচ্ছা দিবেন। কিন্তু আমার একটি কথা রাখিতে হইবে আমি যখন যাহা করিব, হাজার মন্দ বোধ হইলেও আপনার পুত্র তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন না, তাহার জন্য আমাকে তিরস্কার করিতে পারিবেন না।" রাজা এ কথায় সম্মত হইবামাত্র, গঙ্গা আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

প্রতীপের পুত্র হইলে, তাঁহার নাম শান্তনু রাখা হইল। শান্তনু দেখিতে যেমন সুন্দর ছিলেন, ধর্মে, বিদ্যায়, স্বভাবে এবং অন্য সকল গুণেও তেমনি। তাহা দেখিয়া প্রতীপ মনে সুখে তাঁহার হাতে রাজ্যের ভার দিয়া, তপস্যা করিবার জন্য বনে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, একটি দেবতার মেয়ে আমার বৌমা হইতে রাজি হইয়াছিলেন। তাঁহার দেখা পাইলে তুমি তাঁহাকে বিবাহ করিবে, আর তাঁহার মন বুঝিয়া সর্বদা চলিতে চেষ্টা করিবে। তাঁহার কোনো কাজে কখনো বাধা দিও না, বা অসন্তুষ্ট হইও না!"

যুদ্ধের কাজটা রাজাদের খুব ভালো করিয়াই শিখিতে হয়, আর সর্বদা তাহার অভ্যাস রাখিতে হয়। এইজন্য শিকার তাঁহাদের একটা খুব দরকারি কাজের মধ্যে। শান্তনু শিকার করিতে বড়ই ভালোবাসিতেন। একদিন শিকার করিতে করিতে তিনি গঙ্গার ধারে আসিয়া একটি পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। এমন সুন্দর মানুষ তিনি আর কখনো দেখেন নাই। তাঁহাকে তাঁহার এতই ভালো লাগিল যে, তিনি তাঁহার সঙ্গে কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না।

শান্তনু বলিলেন, "আপনি কি দেবতা, না দানব, না অপ্সরা, না যক্ষ, না মানুষ? আপনাকে আমার রানী করিতে পারিলে বড়ই সুখী হইব।"

সেই মেয়েটি আর কেহ নহেন, গঙ্গা। গঙ্গা বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার রানী হইব, কিন্তু আমার একটা নিয়ম আছে। আমার কোনো কাজে আপনি বাধা দিতে পারিবেন না, বা অসন্তোষ দেখাইতে পারিবেন না। যদি কখনো বাধা দেন, বা অসন্তুষ্ট হন, তবে তখনই আমি চলিয়া যাইব।"

শান্তনু এই নিয়মে রাজি হইয়া পরমাসুন্দরী রানী লইয়া ঘরে ফিরিলেন। তারপর তাঁহাদের দিন খুবই সুখে যায়।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা ভারি দুঃখের বিষয় হইয়া উঠিল। রাজার দেবকুমারের মতো সুন্দর এক-একটি ছেলে হয়, আর অমনি রানী তাহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেন। দুঃখে রাজার বুক ফাটিয়া যায়, তবুও কিছু বলিতে সাহস পান না, পাছে রানী বলেন, "আমি চলিলাম!"

একটি নয়, দুটি নয়, রানী ক্রমে সাতটি ছেলে এইভাবে জন্মের পরই গঙ্গায় ফেলিয়া দিলেন, সাতবার রাজা চুপ করিয়া দুঃখ সহ্য করিলেন। তারপর যখন আর-একটি ছেলে হইল, তখন রানী হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজার প্রাণে আর কত সহ্য হইবে? এই একটি ছেলেকে রাখিতে পারিলেও বুঝি তাঁহার প্রাণ একটু শীতল হয়! এই ভাবিয়া তিনি সকল কথা ভুলিয়া গিয়া এবারে রানীকে বাধা দিলেন। বলিলেন, "হায় হায়, এটিকে মারিও না, কেন তুমি এমন নিষ্ঠুর হইলে? এমন পাপ কি কবিতে আছে?"

রানী বলিলেন, "মহাবাজ, এই লও তোমার ছেলে। কিন্তু নিয়মের কথা মনে আছে তো? আমি চলিলাম, তোমাব মঙ্গল হউক !"

তখন গঙ্গা তাঁহাব নিজের কথা আর আটজন বসুব কথা রাজাকে বুঝাইয়া বলিয়া, আর ছেলেটি তাঁহাকে দিয়া, আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

সেই ছেলেটির নাম দেবব্রত আর গাঙ্গেয়, এই দুই নাম রাখা হইল। দেবব্রত খুব ছোট থাকিতেই শান্তনু তপস্যা করিতে বনে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গার ধারেই সেই বন। সেখানে অনেক বৎসর ধরিয়া শান্তনু তপস্যা করিলেন, ততদিনে দেবব্রতও বেশ বড হইয়া উঠিলেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এই পৃথিবীতে দেবব্রতের সমান কেহ রহিল না।

এমন সময়, একদিন দেবব্রত হবিণ শিকারে বাহির হইয়াছেন। আর একটা হরিণ তাঁর তীব খাইয়া পলায়ন করাতে, তাহাকে ধরিবার জন্য তিনি ভয়ংকর তীর ছুঁড়িয়া গঙ্গার জল প্রায় শুষিয়া ফেলিয়াছেন।

সেইখানে শান্তনু থাকেন। হঠাৎ গঙ্গাব জল কেন শুকাইয়া গেল, তাহা জানিতে গিয়া, দেবব্রতের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। কিন্তু দেবব্রত তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। যাহাই হউক, শান্তনুর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এটি তাঁহারই পুত্র। তাই তিনি গঙ্গাকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "আমার পুত্রকে আবার দেখাও।"

তখন গঙ্গা দেবব্রতকে শান্তনুর নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "মহারাজ,এই তোমার সেই পুত্র। আমি ইহাকে বড করিয়াছি। এই কুমার দেবতার অতিশয় প্রিয়পাত্র। বশিষ্ঠের নিকট সকল বেদ আর বৃহস্পতি ও শুক্রের নিকট সকল শাস্ত্র পড়িয়াছে। পরশুরাম ধনুর্বিদ্যা যত জানেন, সব ইহাকে শিখাইয়াছেন। ইহাকে লইয়া তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও।"

এমন সুন্দর পুত্র পাইয়া রাজা মনের সুখে আবার রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন, আর কিছুদিন পরেই তাঁহাকে যুবরাজ করিয়া দিলেন।

ইহার মধ্যে একদিন শান্তনু বনের ভিতরে বেড়াইতে গিয়া, দেবতার মতো সুন্দরী একটি কন্যা দেখিতে পাইলেন। সেই কন্যার দেহের এমনি অপরূপ সৌবভ যে, সমস্ত বন তাহাতে ভরিয়া গিয়াছে। রাজা আশ্চর্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

কন্যা বলিল, "আমি জেলের মেয়ে।"

মেয়েটির নাম সত্যবতী। আসলে সে জেলের মেয়ে নহে, জেলে তাহাকে একটা মাছের

পেটের ভিতরে পাইয়া মানুষ করিয়াছিল। লোকে জানে যে, সে সেই জেলেরই মেয়ে।

যাহা হউক, রাজা অবিলম্বে সেই জেলের কাছে গিয়া বলিলেন, "আমি তোমার মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহি।"

জেলে বলিল, "ইহার যে ছেলে হইবে, তাহাকে যদি অপনার সমস্ত রাজ্য দেন, তবে বিবাহ দিব, নহিলে দিব না।"

যদিও সেই মেয়েটিকে বিবাহ করিতে রাজার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, তথাপি দেবব্রতকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও রাজ্য দিতে তিনি কিছুতেই প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং সত্যবতীকে না লইয়া নিতান্ত দুঃখের সহিত তাঁহাকে ঘরে ফিরিতে হইল। সে দুঃখ এতই যে, তিনি তাহাতে দিন-দিন রোগা হইয়া যাইতে লাগিলেন।

দেবব্রত ভাবিলেন, 'তাইতো, বাবাকে কেন এমন দেখিতেছি?'একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কি হইয়াছে?"

রাজা বলিলেন, "আর কি হইবে বাবা! তোমার জন্যই ভাবি, তোমার পাছে কোনো অসুখ হয়, তাই আমার চিন্তা।"

দেবব্রত বুড়া মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রীমহাশয়, বাবার তো বড়ই অসুখ।" মন্ত্রী সকল কথাই জানেন, তিনি সেই জেলের মেয়ের কথা দেবব্রতকে বলিলেন।

এ কথা শুনিবামাত্র, অমনি দেবব্রত সবান্ধবে জেলের নিকট গিয়া বলিলেন, "আমার পিতার সহিত আপনার মেয়ের বিবাহ দিন।"

জেলে দেবব্রতকে অতিশয় আদর করিয়া বলিল, "রাজপুত্র আপনি যাহা বলিলেন, আমার পক্ষে তাহার চেয়ে সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে, এই বিবাহ হইলে শেষে একটা বিষম ঝগড়া ঝাঁটির কারণ হইবে। আপনার মতো বীরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কি আর কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে?"

দেবব্রত বুঝিলেন যে, পাছে রাজ্য লইয়া সত্যবতীর ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার ঝগড়া হয়, জেলে সেই ভয় করিতেছে। তিনি তখনই বলিলেন "আমার সঙ্গে আপনার নাতিদের ঝগড়া হইবার কোনো ভয় থাকিবে না। কারণ, আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি রাজ্য লইব না, আপনার নাতিই আমাদের রাজা হইবে।"

জেলে বলিল, "রাজপুত্র, আপনি অতি মহাশয় লোক—আপনি যে আপনার কথামত কাজ করিবেন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আপনার ছেলেরা তো এ কথায় রাজি না হইতে পারেন!"

দেবব্রত বলিলেন, "আমার যদি ছেলে না হয়, তবে তো আর সে রাজ্য চাহিতে আসিবে না! আমি আবার এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি বিবাহ করিব না।"

এ কথায় জেলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "তবে আপনার পিতাকেই মেয়ে দিব।"

এদিকে আকাশ হইতে দেবতারা দেবব্রতের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর তিনি যে ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার নাম দিলেন 'ভীষ্ম' অর্থাৎ ভয়ানক লোক। তখন হইতে সকলে তাঁহার 'দেবব্রত' নাম ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে 'ভীষ্ম' বলিয়াই ডাকিত।

জেলের অনুমতি লইয়া ভীষ্ম সত্যবতীকে বলিলেন "মা, রথে উঠুন ঘরে যাই!"

এইরূপে ভীষ্ম সত্যবতীকে আনিয়া পিতার সহিত বিবাহ দিলেন। শান্তনু তাঁহার এইকাজে কত সুখী হইলেন, বুঝিতেই পার। তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া বর দিলেন, "তোমার মরিতে ইচ্ছা না হইলে কিছুতেই তোমার মৃত্যু হইবে না।"

সত্যবতীর চিত্রাঙ্গদ আর বিচিত্রবীর্য নামে দুইটি পুত্র জন্মিবার পরে শান্তনুর মৃত্যু হয়। তখন চিত্রাঙ্গদ বড় হইয়াছেন, বিচিত্রবীর্য শিশু। ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজা করিলেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই এক গন্ধর্বের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হইল। বিচিত্রবীর্যের তখনো রাজা হওয়ার বয়স হয় নাই, ভীষ্ম তাঁহার হইয়া রাজ্যের কাজ দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে বিচিত্রবীর্যের বিবাহের বয়স হইল। এই সময়ে ভীষ্ম শুনিতে পাইলেন যে, কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা আর অম্বালিকার স্বয়ম্বর হইবে। স্বয়ম্বর, কিনা নিজে দেখিয়া বিবাহ করা। দেশ-বিদেশের রাজা ডাকিয়া মস্ত সভা হয়, কন্যা মালা হাতে সেই সভাতে আসিয়া যাঁহার গলায় সেই মালা পরাইয়া দেন, তাঁহার সঙ্গেই তাঁহার বিবাহ হয়। ইহারই নাম 'স্বয়ম্বর'। স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়াই ভীষ্ম ভাবিলেন যে, তিনটি মেয়েকে আনিয়া তাঁহার ভাইয়ের সহিত বিবাহ দিবেন।

কাশীরাজের বাড়িতে স্বয়ম্বরেব সভা আরম্ভ হইয়াছে, আর তাঁহার কন্যাদের রূপগুণের কথা শুনিয়া ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজাই তাঁহাদিগকে বিবাহ করিবার আশায় সেখানে আসিয়াছেন। এমন সময় ভীষ্ম তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি আমার ভাইয়ের জন্য এই মেয়ে তিনটিকে চাহিতেছি।" ক্ষত্রিয়ের মেয়েদের যে কেবল স্বয়ম্বর করিয়াই বিবাহ হয়, তাহা তো নহে, বিবাহ অনেকরকমেই হইতে পারে। তাহার মধ্যে জোর করিয়া মেয়ে লইয়া গিয়া বিবাহ দিতে পারিলেই লোকে খুব ভালো বলিয়া থাকে। সুতরাং এই দেখ, আমি জোর করিয়া মেয়ে লইয়া যাইতেছি। তোমরা পার তো আমাকে আটকাও।"

এই বলিয়া তিনি মেয়ে তিনটিকে রথে তুলিয়া লইয়া চলিলেন। রাজারা সকলে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাদিগকে রাখিতে পারিলেন না। সকলের শেষে রাজা শাল্ব প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীষ্মেব হাতে তাহারাও খুবই দুর্দশা হইল।

তারপর ভীষ্ম সেই তিনটি মেয়েকে যারপরনাই আদরের সাহত বাড়িতে আনিয়া বিচিত্রবীর্যের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দিবার আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় অম্বা বলিলেন, "আমি শাল্বকে ভালোবাসি, আর মনে মনে তাঁহাকেই বিবাহ করিয়াছি।"

এ কথায় অম্বাকে ছাড়িয়া দিয়া, অম্বিকা আর অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হইল। সেই অম্বিকার ছেলে ধৃতরাষ্ট্র, আর অম্বালিকার ছেলে পান্ডু।

ভীষ্ম এমনি মহাপুরুষ ছিলেন।

আর দ্রোণও নিতান্ত কম লোক ছিলেন না। দ্রোণ, অর্থাৎ কলসীর ভিতর জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দ্রোণ, তিনি ভবদ্বাজ মুনির পু- । দ্রোণ অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন, সকলরকম বিদ্যা, বিশেষত, ধনুর্বিদ্যা, খুব ভালোরূপেই শিখিয়াছিলেন। তারপর পরশুরামের নিকট তাঁহার সমস্ত অস্ত্র পাইয়া তিনি এমন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সামনে কেহ দাঁড়াইতেই পারিত না।

পাঞ্চাল দেশের রাজা পৃষতের পুত্র দ্রুপদের সহিত দ্রোণের ছেলেবেলায় বন্ধুতা হইয়াছিল। তখন দ্রুপদ দ্রোণকে বলিয়াছিলেন, "বন্ধু! আমি রাজা হইলে, সত্য করিয়া বলিতেছি,

আমার যাহা কিছু সব তোমারই হইবে।" সেই ছেলেবেলার কথা দ্রোণের মনে ছিল।

বড় হইয়া দ্রোণ কৃপাচার্যের ভগিনীকে বিবাহ করেন, এবং অশ্বত্থামা নামে তাঁহার একটি পুত্র হয়। দ্রোণ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, ছেলেকে দুধ কিনিয়া খাওয়াইবার শক্তি তাঁহার ছিল না। অন্য ছেলেদিগকে দুধ খাইতে দেখিয়া একদিন অশ্বত্থামা কাঁদিতে লাগিলেন। সেই ছেলেরা 'পিঠালি' গোলা জল আনিয়া তাঁহাকে বলিল, "এই দুধ খাও।" অশ্বত্থামা সেই পিঠালির জল খাইয়াই "দুধ খাইয়াছি" বলিয়া নাচিয়া অস্থির। তখন ছেলেরা হাততালি দিয়া বলিল, "ছি ছি! তোর বাপের পয়সা নাই, তোকে দুধ কিনিয়া দিতে পারে না!"

ইহাতে দ্রোণের মনে খুব কষ্ট হওয়ায়, তিনি দ্রুপদের সেই ছেলেবেলার কথাগুলি মনে করিয়া ভাবিলেন, 'একবার বন্ধুর কাছে যাই, এ দুঃখ দূর হইবে।'

দ্রোণ অনেক আশা করিয়া দ্রুপদের কাছে গেলেন। কিন্তু দ্রুপদ আর সে দ্রুপদ নাই, বড় হইয়া আর রাজ্য পাইয়া, তিনি আর-এক রকম হইয়া গিয়াছেন।

দ্রোণ বলিলেন,"বন্ধু! সেই যে তুমি বলিয়াছিলে, রাজা হইলে আমাকে কত সুখে রাখিবে, তাই আমি আসিয়াছি।"

দ্রুপদ বলিলেন, "বল কি, ঠাকুর? আমি রাজা, আর তুমি ভিখারি, তুমি নাকি আবার আমার বন্ধু! ছেলেবেলায় তোমাকে কি বলিয়াছি তাহা কে মনে রাখিয়াছে? চাহ তো না হয় তোমাকে একবেলা চারিটি খাইতে দিতে পারি।"

এইরূপ অপমান পাইয়া দ্রোণ সেখান হইতে হস্তিনায় চলিয়া আসিয়াছেন, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, 'ইহার শোধ লইতে হইবে।'

হস্তিনায় আসিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন প্রভৃতির গুরু হইলেন। তাঁহাদিগকে তিনি বলিলেন, 'বাছাসকল! আমি খুব ভালো করিয়া তোমাদিগকে ধনুর্বিদ্যা শিখাইব, কিন্তু শেষে তোমাদিগকে আমার একটা কাজ করিয়া দিতে হইবে।'

এ কথায় সকলেই চুপ করিয়া রহিল, কেবল অর্জুন বলিলেন, 'হ্যাঁ, গুরুদেব! আপনার কাজ অবশ্যই করিয়া দিব।'

আহা, এই কথাগুলি না জানি বুড়ার কাছে কতই মিষ্ট লাগিয়াছিল! তিনি অর্জুনকে জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জলে তাঁহাকে ভিজাইয়া দিলেন।

রাজপুত্রদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। দ্রোণের কাছে শিক্ষা পাইবার লোভে বাহিরেরও দু-একটি রাজপুত্র আসিলেন। আর-একটি ছেলে আসিলেন, তাঁহার নাম কর্ণ। লোকে বলে, কর্ণ অধিরথ নামক এক সারথির ছেলে।

কর্ণের সঙ্গে প্রথম হইতেই অর্জুনের শত্রুতা হইয়া গেল। কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে বড়ই রেষারেষি করেন, আর দুর্যোধনের সঙ্গে জুটিয়া যুধিষ্ঠির আর তাঁহার ভাইদিগকে অপমান করেন।

যাহা হউক, অর্জুনের সমান কেহই শিখিতে পারিল না। শিখিবার জন্য তাঁহার যত্ন দেখিয়া দ্রোণ বলিলেন, 'তোমাকে এমনি ভালো করিয়া শিখাইব যে, তোমার সমান আর পৃথিবীতে কেহ থাকিবে না।'

ছেলেদের শিক্ষা বেশ ভালো করিয়াই হইল। দুর্যোধন আর ভীম গদা খেলায় খুব মজবুত হইলেন, নকুল সহদেব খড়্গ, রথ চালাইতে যুধিষ্ঠির, আর ধনুকে যে অর্জুন, তাহা বুঝিতেই

পার। ভীম আর অর্জুনের ক্ষমতা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আর হিংসায় বাঁচে না।

ইঁহাদের পরীক্ষা লইবার জন্য দ্রোণ চুপিচুপি এক কারিগরকে দিয়া একটা নীল পক্ষী প্রস্তুত করাইলেন। তারপর সেটাকে এক গাছের আগায় রাখিয়া, রাজপুত্রদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'তোমরা তীর-ধনুক লইয়া প্রস্তুত হও। এক-একবার এক-একজনকে আমি তীর ছুঁড়িতে বলিব। আমার কথা শেষ হইতে না হইতে তাহাকে ঐ পাখিটার মাথা কাটিয়া ফেলিতে হইবে।'

সকলের আগে যুধিষ্ঠিরের ডাক পড়িল। যুধিষ্ঠির ধনুক উঠাইয়া পাখির দিকে তাকাইয়া প্রস্তুত। দ্রোণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দেখিতেছ?'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'গাছ দেখিতেছি, আপনাদের সকলকে দেখিতেছি, আর পাখিটাকে দেখিতেছি।'

ইহাতে এই বুঝা গেল যে, যুধিষ্ঠিরের নজর ঠিক হয় নাই, তিনি এদিক-ওদিক তাকাইতেছেন। কাজেই এই কথা শুনিয়া দ্রোণ মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, 'তবে তুমি পারিবে না। তুমি সরিয়া দাঁড়াও।'

এইরূপে এক-একজন করিয়া সকলেই আসিলেন, সকলেই লজ্জা পাইয়া ফিরিয়া গেলেন।

শেষে আসিলেন অর্জুন। তাঁহাকেও দ্রোণ ধনুক উঠাইয়া পাখির দিকে তাকাইতে বলিয়া, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দেখিতেছ?'

অর্জুন বলিলেন, 'আমি কেবল পাখিই দেখিতে পাইতেছি, আর তো কিছু দেখিতেছি না।'

দ্রোণ বলিলেন, 'সমস্তটা পাখিই দেখিতে পাইতেছ?'

অর্জুন বলিলেন, 'না, পাখির কেবল মাথাটুকু দেখিতেছি, আর কিছু না।'

এইবার দ্রোণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তবে তীর ছোড়'।

কথাটা ভালো করিয়া শেষ হইতে না হইতেই অর্জুন তীর ছাড়িয়া দিলেন কাটা মাথুসুদ্ধ পাখিও মাটিতে পড়িয়া গেল।

এমন আশ্চর্য শিক্ষা কি সকলের হয়? দ্রোণের আনন্দ আর ধরে না। তিনি অর্জুনকে বুকে চাপিয়া মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, 'আমার পরিশ্রম সার্থক হইল। অর্জুন আমার কাজ করিয়া দিতে পারিবে।'

আর-একদিন স্নানের সময় দ্রোণকে কুমিরে ধরিল। সে ভয়ংকর কুমির দেখিয়া রাজপুত্রদের বুদ্ধিসুদ্ধি কোথায় যে চলিয়া গেল, তাঁহারা খালি ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া আছেন, নড়িবার-চড়িবার ক্ষমতা নাই। অর্জুন ইহার মধ্যে ঝক্ঝকে পাঁচটি বাণ মারিয়া কুমিরকে খণ্ড-খণ্ড করিয়াছেন।

দ্রোণ ইচ্ছা করিলেই কুমির মারিয়া চলিয়া আসিতে পারিতেন। কিন্তু রাজপুত্রদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহা না করিয়া, কেবল ডাকিতেছিলেন, 'রাজপুত্রগণ! আমাকে বাঁচাও!' অর্জুনের বুদ্ধি আর সাহস দেখিয়া তিনি তাঁহাকে 'ব্রহ্মশিরা' নামক একটি আশ্চর্য অস্ত্র পুরস্কার দিলেন।

এটি বড় ভয়ংকর অস্ত্র। তাই দ্রোণ, অর্জুনকে সেই অস্ত্র ছাড়িবার আর থামাইবার সংকেত শিখাইয়া, তারপর সাবধান করিয়া দিলেন, 'দেখিও, যেন মানুষের উপরে এ অস্ত্র কদাচ ছাড়িও না, তাহা হইলে সব ভস্ম হইয়া যাইবে। কোন দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ হইলেই এ

অস্ত্র ছাড়িতে পার।'

অর্জুন গুরুকে প্রণাম করিয়া, জোড়হাতে অস্ত্রখানি লইলেন।

এমনি করিয়া রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা শেষ হইল। সকলেই বড়-বড় বীর হইয়াছেন এখন সকলকে ডাকিয়া ইঁহাদের বিদ্যার পরীক্ষা দেখাইবার সময় উপস্থিত। পরীক্ষার আয়োজন খুব ধুমধামের সহিত হইতে লাগিল। এক দিকে প্রকাণ্ড মাঠে শত-শত রাজমিস্ত্রী খাটিতেছে, আর-এক দিকে পরীক্ষার সংবাদ লইয়া দূতেরা দেশ-বিদেশে ঢোল পিটাইয়া ফিরিতেছে। লোকের উৎসাহের আর সীমা নাই। বুড়া ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত বলিলেন, 'এতদিনে অন্ধ বলিয়া আমার মনে দুঃখ হইতেছে, এমন খেলা আমি দেখিতে পাইলাম না।'

পরীক্ষার দিন উপস্থিত। লোকজন যে কত আসিয়াছে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। নিশানে, ঝালরে, মণি-মুক্তায় সভাটি ঝলমল্ করিতেছে। খেলার জায়গা, অস্ত্র রাখিবার জায়গা, বাজনদারদের জায়গা, স্ত্রীলোকদের বসিবার জায়গা, রাজারাজড়াদের বসিবার জায়গা, সাধারণ লোকদের বসিবার জায়গা, সব এমন সুন্দর করিয়া সাজানো আর গুছানো যে দেখিলে আশ্চর্য বোধ হয়। লোকের কোলাহল আর বাজনার শব্দ মিশিয়া সমুদ্রের গর্জনকে হারাইয়া দিতেছে। সভার মধ্যে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, কৃপাচার্য এবং আর-আর সকলে বসিয়াছেন। মেয়েদের জায়গায়, কুন্তী, গান্ধারী (দুর্যোধনের মা) প্রভৃতি সকলে দাসী চাকরাণী লইয়া উপস্থিত। এমন সময়ে দ্রোণাচার্য তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামাকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গভূমি অর্থাৎ খেলার জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চুল সাদা, দাড়ি সাদা, ধুতি সাদা, চাদর সাদা। বুকের উপরে সাদা পৈতা, গলায় সাদা ফুলের মালা, গায় শ্বেত চন্দন।

তারপর সকলের আগে দেবতার পূজা হইলে, চাকরেরা অস্ত্র-শস্ত্র আনিয়া রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিল।

এদিকে রাজপুত্রেরা সাজগোছ করিয়া প্রস্তুত! প্রত্যেকের পরনে সুন্দর দামী পোশাক, কোমরে কোমরবন্ধ, আঙ্গুলে আঙ্গুলপোষ (অর্থাৎ আঙ্গুল বাঁচাইবার জন্য চামড়ার ঢাকনা), হাতে ধনুক, পিঠে তূণ। যুধিষ্ঠির সকলের বড় বলিয়া সকলের আগে, তারপর যিনি যত ছোট, তিনি তত পিছনে, এমনি করিয়া তাঁহারা রঙ্গভূমির দিকে আসিতে লাগিলেন। রাজপুত্রদের সুন্দর পোশাক আর উজ্জ্বল চেহারা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইল। তারপর তাঁহারা নানারকম অস্ত্র ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলে, অনেকে খুব ভয়ও পাইল।

সেদিন দুর্যোধন আর ভীমের গদার খেলা বড়ই অদ্ভুত হইয়াছিল। এমন খেলা আর কেহ দেখে নাই। তাঁহারা বাহবাও পাইয়াছিলেন যতদূর হইতে হয়। এদিকে তাঁহাদের হাতির মতো গর্জন শুনিয়া দ্রোণ একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার পরই হয়তো ইঁহারা চটিয়া গিয়া মুস্কিল বাধাইবেন। কাজেই তাড়াতাড়ি ইঁহাদিগকে থামাইয়া দিতে হইল।

তারপর অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া লোকের আনন্দ আর ধরে না। কেহ বলে, 'আরে ঐ অর্জুন!' কেহ বলে, 'ইনি ভারি যোদ্ধা!' কেহ বলে, 'ইনি বড়ই ধার্মিক!'

অর্জুন কি আশ্চর্য খেলাই দেখাইলেন। একবার অগ্নিবাণে ভীষণ আগুন জ্বালিয়া তিনি সকলের ত্রাস লাগাইয়া দিলেন। তারপরেই আবার বরুণবাণে জলের বন্যা বহাইয়া আগুন নিভাইয়া ফেলিলেন, এখন সকলে তল না হইলে বাঁচে! তখনই আবার বায়ুবাণ ছুটিল, অমনি জল উড়িয়া গিয়া সব পরিষ্কার ঝরঝরে! পর্জন্যাস্ত্রে তারপরের মুহূর্তেই মেঘ আসিয়া

আকাশ অন্ধকার করিয়া ফেলিল!

ভৌমাস্ত্র মারিয়া তিনি মাটির ভিতর ঢুকিয়া গেলেন। পর্বতাস্ত্র মারিয়া কোথা হইতে বিশাল এক পর্বত আনিয়া ফেলিলেন। তারপর যখন অন্তর্ধান অস্ত্র মারিলেন, তখন আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

আর কত বলিব? অর্জুন সকলকে অবাক করিয়া তবে ছাড়িলেন।

এইরূপে খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, বাজনা থামিয়াছে, সকলে বাড়ি যাইবে, এমন সময় ফটকের কাছে ও কিসের গর্জন? সকলে বলে, 'একি, বাজ পড়িল? না পর্বত ফাটিল?'

বাজও পড়ে নাই, পর্বতও ফাটে নাই। উহা কর্ণের হুঙ্কার, আর কিছুই নহে। কর্ণকে যেমন-তেমন লোক মনে করিও না। কেহ বলে তিনি সূর্যের পুত্র, কেহ বলে তিনি অধিরথ নামক সারথির পুত্র। কিন্তু আসলে তিনিও কুন্তীরই পুত্র, অধিরথের কেহ নহেন। কুন্তী কর্ণের মা হইয়াও তাঁহার প্রতি মায়ের কাজ করেন নাই, জন্মিবার পরেই তিনি তাঁহাকে ফেলিয়া দেন।

সেই শিশুটিকে অধিরথ কুড়াইয়া পাইয়া তাহার স্ত্রী রাধার নিকট আনিয়া দিল, আর দুজনে মিলিয়া পরম যত্নে তাঁহাকে মানুষ করিতে লাগিল। নিজেদের ছেলেপিলে নাই, তাই এমন সুন্দর শিশুটিকে পাইয়া তাহারা ভাবিল যেন দেবতা দয়া করিয়া তাহাদিগকে একটি পুত্র দিলেন, তখন হইতেই লোকে ভাবে যে কর্ণ অধিরথ আর রাধার ছেলে। কর্ণও ইহাদিগকে পিতা-মাতার মতন মান্য করেন আর ভালোবাসেন। তিনি জানেন না যে তিনি যুধিষ্ঠিরদের ভাই।

জন্মাবধিই কর্ণের কানে কুণ্ডল আর পরনে কবচ (অর্থাৎ বর্ম বা যুদ্ধের পোশাক) ছিল। দেখিতে তিনি খুব উঁচু, খুব সুন্দর আর ফরসা, গায় সিংহের মতন জোর। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে 'ইনিকে?' 'ইনি কে?' বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

কর্ণ বড়ই অহংকারী। আর জানই তো, অর্জুনের সঙ্গে তাঁহার কেমন শত্রুতা। তাই তিনি অর্জুনের প্রশংসা সহিতে না পারিয়া রাগের ভরে নিজের ক্ষমতা দেখাইতে আসিয়াছেন। আর যথার্থই তাঁহার ক্ষমতা কম ছিল না, কারণ, অর্জুন যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই তিনিও করিয়া দেখাইলেন। তারপর তিনি বলিলেন, 'আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিব।' ইহাতে সভার মধ্যে ভারি একটা হুলস্থুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। একদিকে দুর্যোধন কর্ণকে প্রশংসা করিতেছেন, আর পাণ্ডবদিগকে অপমানের কথা বলিতেছেন, অপর দিকে অর্জুন তাহা সহিতে না পারিয়া রাগে কাঁপিতেছেন, একটা খুনাখুনি বুঝি না হইয়া যায় না। নিজের দুই পুত্রের এমন ভাব দেখিয়া ভয়ে আর দুঃখে কুন্তী ইহার মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন।

এমন সময় কৃপাচার্য কর্ণকে বলিলেন, 'বাপু, যুদ্ধ যে করিবে, তাহা তো বুঝিলাম, কিন্তু রাজার ছেলে তো আর যাহার তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে না, আগে বল দেখি, তুমি কোন্ রাজার বংশে জন্মিয়াছ, আর তোমার বাপ-মায়েরই-বা কি নাম?'

কৃপের কথা শুনিয়া লজ্জায় কর্ণের মাথা হেঁট হইল। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন বলিল, 'রাজা হইলেই তো যুদ্ধ হইতে পারে, আচ্ছা আমি এখনই কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজা করিয়া দিতেছি!' তখনই জল আসিল, ব্রাহ্মণ আসিল, আর তখনই কর্ণকে স্নান করাইয়া, ছাতা ধরিয়া, খই

ছড়াইয়া, চামর দোলাইয়া, সোনা আর ফুল দিয়া, জয়-জয় শব্দে রাজা করিয়া দেওয়া হইল। কর্ণ ইহাতে চিরদিনের তরে দুর্যোধনের বন্ধু হইয়া গেলেন।

এদিকে সেই সারথি অধিরথ সংবাদ পাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে পাগলের মতন সেখানে ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই কর্ণ তাঁহার সেই রাজার সাজসুদ্ধ উঠিয়া তাড়াতাড়ি প্রণাম করিতে গেলেন, কিন্তু অধিরথ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া নিজের চাদর দিয়া পা ঢাকিয়া রাখিলেন। তারপর 'বাপ! বাপ!' বলিয়া কর্ণকে আদর করিতে করিতে বুড়া চক্ষের জলে তাহার গা ভিজাইয়া দিলেন।

তাহা দেখিয়া ভীম বলিলেন, 'সারথির ছেলে, তুই অর্জুনের হাতে প্রাণটা কেন দিতেছিস? ততক্ষণ রাশ ধরগে যা!'

তখন রাগে কর্ণের ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। দুর্যোধন পাগলা হাতির মতো ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'কর্ণ রাজা হওয়াতে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, আসিয়া যুদ্ধ কর!'

ভাগ্যিস তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, নহিলে কি হইত, কে জানে? সন্ধ্যা হওয়ায় কাজেই সকলকে ঘরে ফিরিতে হইল, বিপদও কাটিয়া গেল।

শিক্ষা শেষ হইলে গুরুকে দক্ষিণা দিতে হয়। রাজপুত্রদেরও শিক্ষা শেষ হইয়াছে, এখন দক্ষিণা দিবার সময়। দ্রোণ রাজপুত্রদিগকে বলিলেন, 'তোমরা পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদকে ধরিয়া আনিয়া দাও। ইহাই আমার দক্ষিণা।'

সে কথায় রাজপুত্রেরা তখনই দ্রোণকে লইয়া দ্রুপদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চলিলেন। দুযোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, ইঁহাদিগকে পাণ্ডবদের আগে যুদ্ধ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত দেখা গেল। ইচ্ছা যে বাহাদুরিটা তাঁহাদেরই হয়। পাণ্ডবদের তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না, কাজেই তাঁহারা দ্রোণের সঙ্গে একটু পিছনে থাকিলেন। কিন্তু দুর্যোধনেরা অনেক যুঝিয়াও বেশি কিছুই করিতে পারিলেন না, এবং পাঞ্চালেরাই যেন 'মার্-মার্' করিয়া আরো তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাদের গর্জন এমনই ভয়ংকর হইয়া উঠিল যে, তাহা শুনিয়া অর্জুন আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

দ্রোণকে লইয়া পাণ্ডবেরা যুদ্ধে নামিলেন, কিন্তু দ্রুপদের লোকেরা তবুও ভয় পাইল না। ভীমের গদায় কত হাতি ঘোড়ার মাথা ফাটিল, রথ চুরমার হইল, সৈন্য পিষিয়া গেল। অর্জুনের বাণেও কত হাতি ঘোড়া সিপাহী সৈন্য কাটিল, তাহার লেখাজোখা নাই। কিন্তু দ্রুপদ কাবু হওয়া দূরে থাকুক, বরং ভীম অর্জুনকে প্রশংসা করিয়া আরো ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেনাপতিরাও কম যুদ্ধ করিলেন না।

যাহা হউক, অর্জুনের হাতে ক্রমে সকলেরই জব্দ হইতে হইল। শেষে রহিলেন কেবল দ্রুপদ, তাহারও ধনুক নিশান সারথি, সব গিয়াছে। তখন অর্জুন ধনুক-বাণ ফেলিয়া, তলোয়ার হাতে সিংহনাদ পূর্বক, এক লাফে তাঁহার রথে উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদ মন্ত্রীসহ ধরা পড়িলেন তাঁহার লোকজন পলাইয়া গেল, কাজেই যুদ্ধও মিটিল। ভীমের কিন্তু এমন একটুখানি যুদ্ধ একেবারেই ভালো লাগিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আরো অনেকক্ষণ যুদ্ধ করেন।

দ্রুপদকে দ্রোণের নিকট উপস্থিত করা হইলে, দ্রোণ তাঁহাকে বলিলেন, 'দ্রুপদ! তোমার রাজ্যও গিয়াছে, নগরও গিয়াছে, তোমার প্রাণ অবধি আমাদের হাতে। এখন আমাদের

বন্ধুতার খাতিরে তুমি কি চাহ বল?'

তারপর তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ভয় নাই, আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষমা করাই আমাদের স্বভাব। তাহা ছাড়া শিশুকাল হইতে তোমাকে ভালোবাসি, এখনো তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুতাই করিতে চাহি। তোমার রাজ্য এখন আমার হাতে, আমি তাহার অর্ধেক তোমাকে দিয়া অর্ধেক রাখিব। কেননা, আমার একটু রাজ্য না থাকিলে আবার তুমি বলিবে যে, 'তুই গরিব, তোর সঙ্গে বন্ধুতা করিব না। এখন হইতে গঙ্গার দক্ষিণধারে তোমার, উত্তরধারে আমার জায়গা হইল। কি বল?'

দ্রুপদ আর কি বলিবেন? এইটুকু যে পাইয়াছেন, ইহাই তো ঢের বলিতে হইবে। কাজেই তিনি সবিনয়ে দ্রোণকে ধন্যবাদ দিয়া দুঃখের সহিত ঘরে ফিরিলেন। সেই অবধি তাঁহার এই চিন্তা হইল যে, কি করিয়া দ্রোণকে মারিতে পারা যায়।

ইহার পর এক বৎসর চলিয়া গেলে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করিলেন। যুধিষ্ঠির এমনি ধার্মিক, সরল, দয়ালু আর শান্ত ছিলেন যে, তাঁহার গুণে রাজ্যের সকল লোক মোহিত হইয়া গেল। এদিকে ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব মিলিয়া বাহিরের শত্রুদিগকে এমনি শাসনে রাখিলেন যে, তাহারা আর মাথা তুলিতে সাহস পায় না। আর তাহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে এমনি হিংসা হইল যে, রাত্রিতে তাঁহার আর ঘুম হয় না।

শেষে আর না থাকিতে পারিয়া তিনি তাঁহার মন্ত্রী কণিককে ডাকাইয়া বলিলেন, 'মন্ত্রি! এই পাণ্ডবদের বাড়াবাড়ি তো আর আমি সহিতে পারিতেছি না। বল দেখি ইহার কি উপায়?'

কণিক বলিলেন, 'মহারাজ, ইহারা আর বেশি বড় না হইতেই এইবেলা ইহাদিগকে মারিয়া ফেলুন।'

একদিকে কণিকের এইরূপ পরামর্শ, আর-একদিকে দুর্যোধনের পীড়াপীড়ি।

রাজ্যের লোকেরা খালি যুধিষ্ঠির যুধিষ্ঠিরই বলে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, ভীষ্ম রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, কাজেই সকলে এমন গুণবান যুধিষ্ঠিরকে পাইয়া তাঁহাকেই রাজা করিতে চাহিতেছেন। এ-সকল কথা যেন কাঁটার মতো দুর্যোধনের বুকে গিয়া বিঁধিতে লাগিল। তিনি কর্ণ, শকুনি (দুর্যোধনের মামা) দুঃশাসন প্রভৃতিকে লইয়া পরামর্শ করিলেন যে, পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিতে হইবে।

এইরূপ যুক্তি আঁটিয়া দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 'বাবা! আর তো সহ্য হয় না। আপনি আর ভীষ্ম থাকিতে ইহারা নাকি যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে। পাণ্ডবদের কাছে হাত জোড় করিয়াই কি শেষটা আমাদের থাকিতে হইবে? তাহা হইলে আর নরকে যাওয়ার বাকি কি রহিল? বাবা। এ অপমান হইতে কি রক্ষা পাওয়া যায় না?'

দুর্যোধনের কথায় ধৃতরাষ্ট্রের মন আরো খারাপ হইয়া গেল। তখন দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন, ইঁহারা বলিলেন, 'মহারাজ! একটিবার যদি বুদ্ধি করিয়া ইহাদিগকে বারণাবত নগরে পাঠাইতে পারেন, তবেই আমাদের আপদ দূর হয়!'

ধৃতরাষ্ট্রের ইহাতে খুবই মত, ভয় শুধু এই যে, পাছে ইহাতে রাজ্যের লোক চটিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে মারিতে আসে। তাহাতে দুর্যোধন বলিলেন, 'ভয় কি? টাকাকড়ি তো সব আমাদেরই হাতে! আমরা টাকা দিয়া সকলকে বশ করিব। একটিবার কুন্তী আর তাহার

পাঁচটা ছেলেকে বারণাবতে পাঠাইয়া দিন। তারপর আমরা সব হাত করিয়া লইতে পারিলে যেন উহারা ফিরিয়া আসে।'

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'আমারও তো তাহাই মনে হয়। কিন্তু কাজটা কিনা ভালো নয়, তাই ভয় করি, পাছে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ ইঁহারা চটিয়া মুস্কিল বাধান।'

দুর্যোধন বলিলেন, 'ভীষ্মের কাছে তো আমরা যেমন, পাণ্ডবেরাও তেমনি। অশ্বত্থামা আমারই পক্ষের লোক, কাজেই তাঁহার বাবা দ্রোণ আর মামা কৃপাচার্যও আমাদের পক্ষেই থাকিবেন। তারপর একা বিদুর আর আমাদের কি করিবেন?'

এইরকম তাঁহাদের পরামর্শ হয়, আর এদিকে টাকা দিয়া লোকজনকে বশ করিবার চেষ্টাও চলে। তারপর একদিন ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শে তাঁহাদের লোকেরা সভায় বসিয়া বলিতে লাগিল, 'বারণাবত যে কি চমৎকার জায়গা, কি বলিব। আর সেখানকার শিবের মন্দিরে এই সময়ে বড়ই ধুমধাম, দেশ-বিদেশের লোক পূজা করিতে আসিয়াছে।'

এ-সকল কথা শুনিয়া পাণ্ডবদের বারণাবত যাইতে খুব ইচ্ছা হইল। তাহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'বাছাসকল! শুনিতেছি এটা নাকি বড়ই সুন্দর স্থান, পৃথিবীতে এমন স্থান আর নাই। তা তোমাদের ইচ্ছা থাকিলে, তোমরা সপরিবারে একবার সেখানে গিয়া পরম সুখে কিছুদিন বাস কর। তারপর আবার ফিরিয়া আসিও।'

ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্টবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরের বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু কি করেন, চারি দিকেই ধৃতরাষ্ট্রের লোক, পাণ্ডবদের হইয়া দু কথা বলিবার কেহ নাই। কাজেই তিনি রাজি হইলেন। তারপর তিনি ভীষ্ম, বিদুর দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, গান্ধারী আর ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রভৃতি সকলের নিকট গিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন, 'জ্যেঠামহাশয়ের কথায় আমরা বারণাবত চলিলাম, আপনারা আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন।'

তাঁহারা সকলেই বলিলেন, 'ভালোয় ভালোয় ফিরিয়া আসিও। তোমাদের যেন কোনো অনিষ্ট না হয়।'

পাণ্ডবদের বারণাবত যাওয়া স্থির হইয়াছে দেখিয়া দুর্যোধনের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি গোপনে পুরোচন নামক তাঁহাদের একজন মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পুরোচন, তোমার মতো আর আমাদের বন্ধু কে আছে? এই যে রাজ্য দেখিতেছ, ইহা যে কেবল আমরাই, তাহা নহে — তোমারও। বাবা আজ পাণ্ডবদিগকে বারণাবত পাঠাইতেছেন। তুমি খুব গাড়ি হাঁকাইয়া উহাদের ঢের আগেই সেখানে চলিয়া যাও। সেখানে গিয়া শহরের একপাশে, নির্জন স্থানে, গাছপালার আড়ালে একটি সুন্দর বাড়ি করিবে। গালা, ধুনা, চর্বি, তেল, শণ্, কাঠ এমনি সব জিনিস দিয়া বাড়িটি প্রস্তুত হওয়া চাই, যাহাতে আগুন ছোঁয়াইবামাত্রই তাহা দপ্-দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। সাবধান। যেন বাড়ি দেখিয়া কেহ টের না পায় যে তাহাতে এমন কোনো জিনিস আছে। তারপর কুন্তীকে তাহার পাঁচ ছেলে সুদ্ধ নিয়া সেই বাড়িতে রাখিবে। দিন কতক খুব আদর দেখাইয়া উহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া নিবে, শেষে একদিন রাত্রিকালে পাণ্ডবেরা নিশ্চিন্তে ঘুমাইবার সময় দরজায় আগুন দিয়া তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারিবে। তাহা হইলে লোকে ভাবিবে, হঠাৎ আগুন লাগিয়াছে, আমাদের কেহ সন্দেহ করিবে না।'

দুষ্ট পুরোচন এ কথায় 'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে পাণ্ডবদের যাত্রার সময় উপস্থিত, রথ প্রস্তুত। পাণ্ডবেরা গুরুজনকে প্রণাম, সমান বয়সীদের সঙ্গে কোলাকুলি, ছোটদিগকে আশীর্বাদ আর প্রজাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া রথ ছাড়িয়া দিলেন। বিদুর প্রভৃতি কয়েকজন লোক অতিশয় দুঃখের সহিত কিছুদূর তাঁহাদের পিছু পিছু চলিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণেরা ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র দুষ্টলোক তাই এমন কাজ করিল। পাণ্ডবেরা তো কোনোদিন তাহাদের কোনো ক্ষতি করে নাই। আর ভীষ্মকেই-বা কি বলি? তাঁহার চোখের সামনে এমন অধর্ম হইল, আর তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আইস আমরাও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে চলিয়া যাই।'

যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'দেখুন, জ্যেঠামহাশয় আমাদের গুরুলোক, তাঁহার কথা শুনিয়া চলাই আমাদের উচিত। আপনারা আমাদের পরম বন্ধু, আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া এখন ঘরে ফিরুন। ইহাতে শেষে আমাদের উপকার হইবে।'

এ কথায় তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে আশীর্বাদ করিয়া ঘরে ফিরিলেন। বিদুর এতক্ষণ চুপিচুপি আসিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া, সময় বুঝিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'বাবা যুধিষ্ঠির! বিপদ আসিলে বুদ্ধিমান লোকে তাহা এড়াইবার চেষ্টা করেন। গর্তের ভিতরে থাকিলে আগুনে পোড়াইতে পারে না। লোহার অস্ত্র নয়, কিন্তু তাহাতে শরীর কাটে, তাহার কথা যে জানে, শত্রুরা তাহাকে মারিতে পারে না। অন্ধ হইলে পথ দেখিতে পায় না, ব্যস্ত হইলে বুদ্ধি ঠিক থাকেনা। এইটুকু বলিলাম, বুঝিয়া লও। চলাফেরা করিলেই পথ জানা যায়, নক্ষত্র দিয়া দিক ঠিক করা যায়, আর নিজের মন বশে থাকিলে ভয়ে কাবু হইতে হয় না।'

এই কথাগুলি বিদুর যে কিরকম একটা ভাষায় বলিলেন, কেহ তাহার অর্থ বুঝিতে পারিল না! কেবল যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'বুঝিয়াছি।' সকলে চলিয়া গেলে কুন্তী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা! বিদুর যে কি বলিলেন, আর তুমিও বলিলে 'বুঝিয়াছি' আমি তো তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'মা! দুর্যোধন নাকি আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিতে চাহে। তাই কাকা আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন, আর সর্বদা পথ-ঘাটের খবর লইতে, আর ভালো হইয়া চলিতে বলিলেন!'

তারপর কিছুদিন পথ চলিয়া তাঁহারা বারণাবতে পৌঁছিলেন। তাহাদিগকে পাইয়া সেখানকার লোকদিগের খুবই আনন্দ হইল। পাণ্ডবেরা নিতান্ত গরিবদেরও বাড়ি বাড়ি গিয়া দেখা করিলেন। পুরোচন তো প্রথমেই আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে জুটিয়াছে। তাঁহাদিগকে পাইয়া যেন কত খুশি! দুষ্টের মুখে হাসি আর ধরে না, কুমিরের মতন তাহার দাঁত খালি বাহির হইয়াই আছে। পাণ্ডবদিগকে সে আগে অন্য একটা সুন্দর বাড়িতে খুব আদরের সহিত দশদিন রাখিয়া তারপর তাঁহাদিগকে সেই গালার বাড়িতে নিয়া উপস্থিত করিল। সে বাড়িতে গিয়াই যুধিষ্ঠির চুপিচুপি ভীমকে বলিলেন, 'ভাই! আমি চর্বি আর গালার গন্ধ পাইতেছি। এ বাড়িটা নিশ্চয়ই গালা, চর্বি, শুকনো বাঁশ প্রভৃতি জিনিসের তৈরি। দুষ্ট আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য এইখানে আনিয়াছে। বিদুর কাকা ইহার কথা জানিতে পারিয়াই আমাকে ওরূপ বলিয়াছিলেন।'

এ কথা শুনিয়া ভীম বলিলেন, 'তবে আসুন আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'না আমাদের এখানে থাকাই ভালো। এখন চলিয়া গেলে উহারা আর কোনো ফন্দি করিয়া আমাদিগকে মারিবে। তাহার চেয়ে এই ঘর পোড়াইবার সময় উহাদিগকে ফাঁকি দিয়া আমরা পলাইয়া গেলে লোকে ভাবিবে, আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিয়াছে। আর এ কথা শুনিলে ভীষ্ম, দ্রোণ ইহাঁরাও ইহাদের উপর খুব বিরক্ত হইবেন। এখন হইতে খুব শিকার করিয়া বেড়াইলে আমরা পথ-ঘাট সবই জানিতে পারিব, আর পলাইবার সময় কোনো মুস্কিলও হইবে না। আজই এই ঘরের ভিতরে একটা গর্ত খুঁড়িয়া, আমরা তাহার মধ্যে থাকিব, তাহা হইলে আর আগুনের ভয় থাকিবে না।'

ইহার মধ্যে একদিন একটি লোক চুপিচুপি যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া বলিল, 'বিদুর মহাশয় আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি প্রাণ দিয়া আপনাদের কাজ করিব। আপনারা আসিবার সময় তিনি ম্লেচ্ছ ভাষায় আপনাকে কিছু বলেন, তাহার উত্তরে আপনি বলেন যে, 'বুঝিলাম' এই কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবেন যে আমি যথার্থই বিদুরের লোক। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে পুরোচন এই ঘরসুদ্ধ আপনাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার যুক্তি করিয়াছে। এখন কি করিতে হইবে বলুন, আমি খুব গর্ত খুঁড়িতে পারি।

লোকটিকে দেখিয়াই যুধিষ্ঠির বুঝিতে পারিলেন যে, এ ব্যক্তি খুব সরল ও ধার্মিক। তিনি তাহাকে বলিলেন, 'আমি বেশ বুঝিয়াছি, তুমি ভালো লোক, আর কাকা তোমাকে পাঠাইয়াছেন। এখন যাহাতে আমরা এ বিপদে রক্ষা পাই তাহাই কর।'

সেই লোকটি ঘরের মধ্যে নর্দমা কাটিবার ছল করিয়া এক প্রকাণ্ড গর্ত খুঁড়িয়া ফেলিল। পাণ্ডবেরা দিনের বেলায় শিকার করিয়া বেড়াইতেন, রাত্রিতে সেই গর্তের ভিতরে সাবধানে লুকাইয়া থাকিতেন। গর্তের মুখ এমনভাবে লুকানো ছিল যে, না জানিলে তাহা টের পাওয়া অসম্ভব। উহার কথা খালি পাণ্ডবেরা জানিতেন, আর যে গর্ত খুঁড়িয়াছিল সে জানিত, আর কেহই জানিত না। ক্রমে সেই কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী আসিল, যেদিন পুরোচনের সেই গালার ঘরে আগুন দেওয়ার কথা। সেদিন কুন্তী অনেক ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। একটি নিষাদী, অর্থাৎ ব্যাধজাতীয় স্ত্রীলোক ও তাহার পাঁচটি পুত্র লইয়া সেখানে খাইতে আসিল। গরিব লোক, ভালো খাবার পাইয়া এতই খাইল যে তাহাদের চলিয়া যাইবার শক্তি নাই। কাজেই তাহারা ছয়জন সেইখানে রহিল।

এদিকে ক্রমে ঢের রাত হইয়াছে, আর খুব বাতাসও বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, পুরোচনও নিদ্রায় অচেতন। সেই সুন্দর সুযোগ পাইয়া ভীম তখনই তাড়াতাড়ি তাহার ঘরের দরজায় আগুন লাগাইয়া দিলেন। তারপর বাড়ির চারিদিকে বেশ ভালোরূপে আগুন ধরাইয়া, পাঁচ ভাই মায়ের সঙ্গে সেই গর্তের ভিতর দিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। পুরোচন আর পাঁচপুত্র সমেত সেই নিষাদী পুড়িয়া মারা গেল।

আগুনের শব্দে শহরের লোকের জাগিতে অনেকক্ষণ লাগিল না। তাহারা আসিয়া 'হায় হায়' করিতে করিতে পুরোচন আর দুর্যোধনকে গালি দিতে লাগিল। পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্যই যে পুরোচন দুর্যোধনের কথায় এই ঘর প্রস্তুত করিয়াছিল, একথা আর তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না। তাহারা বলিল, 'দুষ্ট নিজেও পুড়িয়া মরিয়াছে, বেশ হইয়াছে! যেমন কর্ম তেমন ফল।'

এতক্ষণ পাণ্ডবেরা কি করিতেছেন? তাঁহারা প্রাণপণে বনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু চলা কি যায়? একে ভয়ে অস্থির, তাহাতে রাত জাগিয়া দুর্বল। অন্ধকার রাত্রি, ঝড় বহিতেছে। তাঁহারা পদে পদে হুঁচট খাইতেছেন, পা আর চলে না। তখন ভীম আর উপায় না দেখিয়া মাকে লইলেন কাঁধে, আর নকুল সহদেবকে কোলে। তারপর যুধিষ্ঠির আর অর্জুনের হাত ধরিয়া লইয়া ঝড়ের মতন ছুটিয়া চলিলেন।

এদিকে বিদুর পাণ্ডবদিগের সাহায্য করিবার জন্য আর-একজন খুব পাকা লোক পাঠাইয়া দিলেন। সে খুঁজিতে খুঁজিতে গঙ্গার ধারে আসিয়া দেখিল যে, তাঁহারা নদী পার হইবার চেষ্টায় জল মাপিতেছেন। তখন সে সেই ম্লেচ্ছ ভাষার ঘটনার কথা বলিতেই তাহার প্রতি পাণ্ডবদের বিশ্বাস জন্মিল। তারপর একটি সুন্দর নৌকা আনিয়া তাঁহাদিগকে বলিল, 'চলুন আপনাদিগকে পার করিয়া দিই।'

নৌকা বাহিতে বাহিতে সেই লোকটি তাঁহাদিগকে বলিল, 'বিদুর মহাশয় আপনাদিগকে অনেক আশীর্বাদ জানাইয়াছেন, আর বলিয়াছেন, আপনাদের কোনো ভয় নাই, শেষে আপনাদেরই জয় হইবে।'

পাণ্ডবেরা বলিলেন, 'কাকাকে আমাদের প্রণাম জানাইবে।'

এইরূপ কথাবার্তায় নৌকা অপর পারে উপস্থিত হইলে, লোকটিকে বিদায় দিয়া পাণ্ডবেরা আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

এদিকে সকালবেলায় বারণাবতের লোকেরা পাণ্ডবদিগকে খুঁজিতে আসিয়া গালার ঘরের ছাইয়ের ভিতরে পুরোচন আর সেই নিষাদী আর তাহার পাঁচ ছেলের পোড়া হাড় পাইল। তাহারা নিষাদীর কথা জানিত না, কাজেই এই হাড় কুন্তী আর পাঁচ পাণ্ডবের মনে করিয়া তাহার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'চল আমরা দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্রকে গিয়া বলি, 'তোমার সাধ পূর্ণ হইয়াছে, পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিয়াছ।'

ইহার মধ্যে সেই যে লোকটি গর্ত খুঁড়িয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি ছাই উল্টাইবার ছল করিয়া সেই গর্ত কখন বুজাইয়া দিয়াছিল, কাজেই তাহার কথা কেহ জানিতে পারিল না।

ধৃতরাষ্ট্র শুনিলেন যে, পুরোচন আর পাণ্ডবেরা জতুগৃহের (গালার ঘরের) সঙ্গে পুড়িয়া মারা গিয়াছেন, তখন তিনি মনে মনে খুবই খুশি হইলেন, কিন্তু বাহিরে দেখাইলেন যেন পাণ্ডবদের দুঃখে তাঁহার বুক একেবারে ফাটিয়া গেল! তিনি কাঁদেন আর বলেন, "হায় হায়! শীঘ্র উহাদের শ্রাদ্ধ কর। হায় হায়! ঢের টাকা খরচ কর! হায় হায় একটি নদী খোঁড়াও! হায় হায়! পাণ্ডবেরা ভালো করিয়া স্বর্গে যাউক!"

আর-একজন লোক এমনি কপট কান্না কাঁদিয়াছিলেন, কিন্তু সে অন্য কারণে। বিদুর তো জানেনই যে পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া আছেন, কাজেই তাঁহার কেন দুঃখ হইবে? কিন্তু দেশসুদ্ধ লোক পাণ্ডবদের জন্য 'হায় হায়' করিয়া কাঁদিতেছে, ইহার মধ্যে তিনি চুপ করিয়া থাকিলে তো ভারি সন্দেহের কথা হয়। কাজেই তিনি আসল কথা জানিয়াও লোকের সন্দেহ দূর করিবার জন্য একটু কাঁদিলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা গঙ্গা পার হইয়া আবার ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন। তখনো রাত্রি প্রভাত হয় নাই, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার আর ভয়ংকর বন। পিপাসায়, পরিশ্রমে আর ঘুমে ভীম ছাড়া আর সকলেই নিতান্ত কাতর। যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'ভীম! ভাই, আর যে পারি না। এখন উপায়?'

ভীম বলিলেন, 'ভয় কি দাদা? এই যে আমি আপনাদিগকে লইয়া যাইতেছি।' এই বলিয়া তিনি পূর্বের ন্যায় সকলকে বহিয়া লইয়া ছুট দিলেন।

ভীম সেদিন কি ভয়ানক বেগেই চলিয়াছিলেন। তাঁহার দাপটে গাছ ভাঙ্গে, মাটি উড়ে, আর যুধিষ্ঠিরেরা তো প্রায় অজ্ঞান! বনের পর বন পার হইয়া যাইতেছেন, তবুও তাঁহার বিশ্রাম নাই। রাত চলিয়া গেল, তারপর সমস্তটা দিন চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় একটা বনের ভিতরে আসিয়া ভীম থামিলেন। ক্রমে ঘোর অন্ধকার আসিল, ঝড় উঠিল, চারিদিকে বাঘ ভাল্লুক ডাকিতে লাগিল, কিন্তু পাণ্ডবেরা আর কিছুতেই চলিতে পারেন না, কাজেই সেখানে বিশ্রাম করা ভিন্ন আব উপায় নাই।

এমন সময় কুন্তী বলিলেন, 'আর তো পারি না! পিপাসায় যে প্রাণ গেল!' মায়ের দুঃখ ভীমের সহ্য হয় না, অথচ সে পোড়া বনে জল বা ফলমূল কিছুই নাই। কাজেই তিনি আবার সকলকে লইয়া আর-একটা সুন্দর বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় তাঁহাদিগকে রাখিয়া তিনি বলিলেন, 'এইখানে তোমরা বিশ্রাম কর। ঐ সারসের ডাক শুনা যাইতেছে, জল কাছেই পাইব।'

ভীম সারসের ডাক শুনিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে দুই ক্রোশ দূরে একটা জলাশয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে স্নান আর জলপানের পর আর সকলেব জন্য জল লইয়া আসিয়া দেখেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

হায়! রাজরানী, রাজার ছেলে, তাঁহারা কিনা আজ মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছেন! দুঃখে ভীমের চোখে জল আসিল। তখন শত্রুদিগের হিংসার কথা ভাবিয়া তিনি বাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, 'দুষ্ট দুর্যোধন! তোর বড় ভাগ্য যে দাদা আমাকে বলেন না। নহিলে আজই তোদের সকলকে যমের বাড়ি পাঠাইতাম।' বলিতে বলিতে ভীমের ঝড়ের মত নিশ্বাস বহিতে লাগিল।

এত কষ্টের পর সকলে ঘুমাইয়াছেন, কাজেই তাঁহাদিগকে জল খাওয়াইবার জন্য জাগাইতে ভীমের ইচ্ছা হইল না। তিনি জল হাতে করিয়া সেখানে পাহারা দিতে লাগিলেন।

সেই বনের কাছে, এক প্রকাণ্ড শাল গাছের উপরে, হিড়িম্ব নামে একটা বিকট রাক্ষস থাকিত। তাহাব তালগাছের মতো বিশাল দেহে ভয়ানক জোর, আগুনের মতো চোখ, জালার মতো মুখ, মূলার মতো দাঁত, গাধার মতো কান, ঝাঁকড়া তামাটে চুল-দাড়ি, বেলুনের মতো প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। অনেকদিন মানুষের মাংস খায় নাই, তাই পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া তাহার মুখে জল আর ধরে না। সে খালি মাথা চুলকায়, আর হাই তোলে, আর বারবার তাঁহাদিগকে চাহিয়া দেখে। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া সে তাহার বোন হিড়িম্বাকে বলিল, 'বাঃ! কি এ মিঠঠারে গন্ধো! ও বোহিন্, ঝট্ কোরে ধোরে লিয়ে আয়! মোরা খাবো! আর পেটমে ঢাক পিট্টায়কে নাচ্ছবো!'

হিড়িম্বা তাহার কথায় পাণ্ডবদের কাছে আসিল। কিন্তু রাক্ষসের মেয়ের প্রাণেও দয়া-মায়া খুব থাকিতে পারে। পাণ্ডবদিগকে মারিবার কোনো চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং সে আসিয়াই ভীমকে সকল কথা জানাইয়া বলিল, 'শীঘ্র সকলকে জাগাও। আমি তোমাদিগকে রাক্ষসের হাত হইতে বাঁচাইয়া দিতেছি।'

ভীম বলিলেন, 'আমি রাক্ষস-টাক্ষসকে ভয় করি না। ইঁহারা অনেক পরিশ্রমের পর

ঘুমাইয়াছেন, ইঁহাদগকে কি এখন জাগানো যায়? নাহয় তোমার ভাইকে পাঠাইয়া দাও, আমার তাহাতে আপত্তি নাই।'

এদিকে রাক্ষসের আর বিলম্ব সহ্য না হওয়ায়, সে নিজেই আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে হিড়িম্বা নিতান্ত ভয় পাইয়া বলিল, 'শীঘ্র তোমরা আমার পিঠে উঠ, আমি এখনো তোমাদিগকে লইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতে পারি।'

ভীম বলিলেন, 'তোমার কোনো ভয় নাই, আমার গায় ঢের জোর আছে মানুষ বলিয়া আমায় অবহেলা করিও না!'

হিড়িম্বা বলিল, 'ঐ দুষ্ট মানুষকে ধরিয়াই মারিয়া ফেলে, তাই আমি ভয় পাই। তোমাকে অবহেলা করিতেছি না।'

এ-সকল কথা শুনিয়া রাক্ষসের কিরূপ রাগ হইল, বুঝিতেই পার। সে ভীমকে আগে মারিবে, না হিড়িম্বাকেই আগে মারিবে ঠিক করিতে পারিতেছে না। হাউ-মাউ করিয়া সে বন মাথায় করিয়া তুলিল!

ভীম বলিলেন, 'মাটি করিল! আরে চুপ চুপ! হতভাগা, ইঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া দিবি?'

রাক্ষস ষাঁড়ের মতন শব্দ করিয়া বলিল, 'মুহি তো তোদ্ধেরর্কে খাবো, ওহার্র্ লোকের ঘুম ভেঙ্গিবেক কেনে?' এই বলিয়া সে দুই হাত ছড়াইয়া ভীমকে ধরিতে গেল।

ভীম তাহার হাত দুটা ধরিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে খানিক দূরে লইয়া গেলেন।

তখন বন তোলপাড় গাছপালা চুরমার করিয়া দুজনে কি বিষম যুদ্ধই আরম্ভ হইল। পাণ্ডবদের আর নিদ্রা যাওয়া হইল না। হিড়িম্বা সেইখানে বসিয়াছিল। কুন্তী চক্ষু মেলিয়া তাহাকে দেখিয়া যারপরনাই আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা! তুমি কি এই বনের দেবতা, না কোনো অপ্সরা? এমন সুন্দর তো আমি কখনো দেখি নাই! তুমি কে, কিজন্য আসিয়াছ?'

হিড়িম্বা বলিল, 'মা! আমি রাক্ষসের মেয়ে, আমার নাম হিড়িম্বা, আমার দাদা হিড়িম্ব আর আমি এই বনে থাকি। আপনাদিগকে দেখিয়া দাদা বলিল, উঁহাদিগকে ধরিয়া আন্, খাইব।' আপনারা ঘুমাইতেছিলেন, আর আপনাদিগকে পিঠে করিয়া এখান হইতে কোনো ভালো জায়গায় লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না। শেষে আমার দেরি দেখিয়া দাদা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দেখুন, আপনার সেই ছেলেটির সঙ্গে কেমন যুদ্ধ চলিতেছে!'

এ কথা শুনিবামাত্র যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল আর সহদেব ভীমের নিকট ছুটিয়া চলিলেন। অর্জুন ভীমকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দাদা! পরিশ্রম হইয়াছে কি? ভয় নাই; আমি তোমায় সাহায্য করিতেছি।'

ভীম বলিলেন, 'ভয় নাই ভাই! হতভাগাকে কাবু করিয়া আনিয়াছি!'

অর্জুন বলিলেন, 'শীঘ্র উহাকে মারিয়া ফেল। নহিলে দুষ্ট আবার কোনো ফাঁকি-টাঁকি দিয়া বসিবে, ইহারা বড়ই ধূর্ত। তুমি নাহয় একটু বিশ্রাম কর, আমি উহাকে মারিতেছি।'

ইহাতে ভীম তখনই ক্রোধভরে রাক্ষসকে তুলিয়া সাংঘাতিক এক আছাড় দিলেন। তারপর উহার দেহটাকে মট্ করিয়া ভাঙ্গিতেই উহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। মরিবার সময় রাক্ষসটা এমনি ভয়ানক চ্যাঁচাইতেছিল যে কি বলিব!

অমন ভীষণ স্থানে না থাকাই ভালো, আর বোধ হইল যেন কাছেই নগর আছে। সুতরাং রাক্ষস মারিবার পরেই পাণ্ডবেরা তাড়াতাড়ি সে স্থান ছাড়িয়া চলিলেন। হিড়িম্বাও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল।

হিড়িম্বাকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া ভীম বলিলেন, 'রাক্ষসেরা বড়ই দুষ্ট উহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই। তোর ভাইকে মারিয়াছি, আয়, তোকে মারি!'

এ কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'ছি ভীম! এমন কাজ করিতে নাই। স্ত্রীলোককে মারা বড় পাপ।'

ভীমের রাগ দেখিয়া হিড়িম্বা নিতান্ত দুঃখের সহিত জোড়হাতে কুন্তীকে বলিল, 'মা, আমার কোনো দোষ নাই। আপনার ভীমকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি, আর আশা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন। আমাকে রক্ষা করুন।'

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'ঠিক কথা। ভীম! তোমার ইঁহাকে বিবাহ করা উচিত।'

ততক্ষণে ভীমের রাগ চলিয়া গিয়াছে, আর দাদার কথা তিনি কখনো অমান্য করেন না। কাজেই তিনি হিড়িম্বাকে বিবাহ করিলেন।

ভীম আর হিড়িম্বার ঘটোৎকচ নামক এক পুত্র হইয়াছিল, তাহার কথা আরো শুনিতে পাইবে। ঘটোৎকচ ধার্মিক, বিদ্বান আর অসাধারণ বীর ছিল। জন্মমাত্রেই ঘটোৎকচ বড় মানুষের মতন করিয়া ভীমকে বলিল, 'বাবা, এখন যাই। দরকার হইলে, যখন ডাকিবেন তখনই আসিব।' এই বলিয়া সে সকলকে প্রণাম করিয়া তাহার মায়ের সহিত উত্তর দিকে চলিয়া গেল।

তারপর পাণ্ডবেরা গাছের ছাল পরিয়া আর মাথায় জটা পাকাইয়া তপস্বীর বেশে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হরিণ শিকার করিয়া খাওয়া, বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি পড়া, আর মায়ের সেবা করা, ইহাই তখন তাঁহাদের প্রধান কাজ ছিল। এইরূপে মৎস্য, ত্রিগর্ত, পাঞ্চাল, কীচক প্রভৃতি নানা দেশে ঘুরিয়া শেষে একদিন তাঁহারা ব্যাসদেবকে দেখিতে পাইলেন। ভীষ্ম যেমন ইঁহাদের ঠাকুরদাদা, ব্যাসও তেমনি। কাজেই পাণ্ডবদিগকে ব্যাস অনেক আদর করিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি সব জানি। যদিও আমার কাছে তোমরা আর দুর্যোধনেরা দুইই সমান, তথাপি ইহাদের ব্যবহার দেখিয়া এখন আমি তোমাদিগকে অধিক ভালোবাসি, আর তোমাদের উপকারের জন্যই এখানে আসিয়াছি। আমি আবার না আসা পর্যন্ত তোমরা ঐ নিকটের নগরটিতে গিয়া বাস কর।'

এই বলিয়া ব্যাস পাণ্ডবদিগকে একচক্রা নামক একটি নগরে পৌঁছাইয়া দিয়া, কুন্তীকে বলিলেন, 'মা, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তোমার পুত্রেরা সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া পরম সুখে দিন কাটাইবে।'

ব্যাস তাহাদিগকে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। এক মাস পরে তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা রহিল।

সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে পাণ্ডবেরা বাস করিতে লাগিলেন। দিনেরবেলা পাঁচ ভাই ভিক্ষা করিয়া আর নানা স্থান দেখিয়া বেড়ান। সন্ধ্যা হইলে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসেন। ভিক্ষার জিনিসগুলির সমান দুই ভাগ হয়। ইহার এক ভাগের সমস্তই ভীম খান, অপর ভাগ আর পাঁচজনে বাঁটিয়া খান। এইরূপে দিন যায়।

ইহার মধ্যে একদিন কি হইল শুন। সেদিন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল আর সহদেব ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। ভীমের সেদিন যাওয়া হয় নাই, তিনি মায়ের কাছেই রহিয়াছেন। ইহার মধ্যে হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণের বাড়ির ভিতরে ভয়ানক কান্না উঠিল।

কান্না শুনিয়া কুন্তী ভীমকে বলিলেন, 'না জানি ব্রাহ্মণের কি ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে! ইনি আমাদিগকে এত স্নেহ করেন, আমরা কি ইঁহার কোনো উপকার করিতে পারি না, বাবা?'

ভীম বলিলেন, 'মা, তুমি জানিয়া আইস, বিষয়টা কি? সাধ্য হইলে অবশ্য ব্রাহ্মণের উপকার করিব।' কথা শেষ হইতে না হইতেই আবার সেই কান্না। তখন কুন্তী ব্যস্তভাবে ছুটিয়া বাড়ির ভিতর গিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ স্ত্রী কন্যা আর পুত্র লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছেন, 'হায়, কেন বাঁচিয়া আছি? বাঁচিয়া থাকায় কি সুখ? আমি আগেই এখান হইতে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম, গিন্নি! তুমিই তো দিলেন না! তোমার বাপের বাড়ি বলিয়া এ স্থান ছাড়িতে তোমার কষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে দেখ এখন কি কষ্ট উপস্থিত! হায় হায়! আমি কাহাকে ছাড়িব? আর তোমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া নিজেই-বা কি করিয়া যাইব? তাহার চেয়ে চল আমরা সকলেই একসঙ্গে মরি।'

তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'ওগো তুমি এমন কথা বলিও না। তোমরা থাক, আমি যাই! তুমি গেলে আমরা কেহই বাঁচিব না। কিন্তু আমি গেলে তুমি মেয়েটিকে আর ছেলেটিকে মানুষ করিতে পারিবে।'

বাপমায়ের কথা শুনিয়া মেয়েটি বলিল, 'মা, বাবা, তোমরা কেন কাঁদিতেছ? আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কর। দেখ বাবা, আমাকে আর তোমরা কয়দিন রাখিতে পারিবে? বিবাহ হইলে তো আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইব। তাহাই যদি হইল, তবে এখনই কেন আমি যাই না? তোমরা কেহ গেলে কি ভাইটি বাঁচিবে? ভাবিয়া দেখ, আমি গেলে সকল দিকই রক্ষা হয়।'

তখন ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী মেয়েটিকে জড়াইয়া ধরিয়া আরো ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন।

ছোট ছেলেটি ইহার মধ্যে কোথায় একগাছি খড় কুড়াইয়া পাইয়াছে, সেই খড় দেখাইয়া সে সকলকে বলিল, "থি! তাঁদে না! এই দান্দা দে আমি নাখচ্ মাল্‌বো!" শিশুর কথায় সেই দুঃখের ভিতরেও সকলের হাসি পাইল।

কুন্তী এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন। উঁহাদিগকে একটু হাসিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কিজন্য কাঁদিতেছেন? আপনাদের কিসের দুঃখ বলুন, আমাদের সাধ্য থাকিলে তাহা দূর করিব।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা, আমাদের দুঃখ কি মানুষে দূর করিতে পারে? এই নগরের কাছেই বক বলিয়া একটা রাক্ষস থাকে। সে আমাদিগকে বাঘ ভাল্লুক আর শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করে, কিন্তু তাহার বদলে আমাদিগকে তাহার খাবার জোগাইতে হয়। রোজ একটি মানুষ, বিশ খারি ভাত আর দুটা মহিষ তাহার নিকট যাওয়া চাই। সে সেই ভাত মহিষ আর মানুষ সব খাইয়া শেষ করে। আমাদিগকে পালা করিয়া এক-একদিন এক-এক বাড়ি হইতে এ-সকল জিনিস পাঠাইতে হয়। যে না পাঠায়, দুষ্ট তাহার ছেলেপিলেসুদ্ধ সব মারিয়া খায়। এদেশের রাজা আমাদের কোনো খবর নেন না, তাই রাক্ষসের হাতে আমাদের এই দুর্দশা।

আজ আমার পালা। আমার টাকা নাই যে একজন মানুষ কিনিয়া পাঠাইব। আপনার লোক কাহাকেই-বা কেমন করিয়া পাঠাই! তাই মনে করিয়াছি, আমরা সকলে মিলিয়া তাহার কাছে গিয়া একেবারে সকল দুঃখ দূর করিব।"

কুন্তী বলিলেন, "ঠাকুর! আপনার কোনো চিন্তা নাই। আমার পাঁচ ছেলের একটি আজ রাক্ষসের নিকট যাইবে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তাহা কি হয় মা? আপনারা একে ব্রাহ্মণ[১], তাহাতে অতিথি। আপনাদিগকে কিছুতেই আমি রাক্ষসের কাছে যাইতে দিব না।"

কুন্তী বলিলেন, "আপনার ভয় কি? রাক্ষস আমার ছেলের কিছুই করিতে পারিবে না। সে আরো বড় বড় রাক্ষস মারিয়াছে। কিন্তু ঠাকুর এ কথা কাহাকেও বলিবেন না। তাহা হইলে লোকে খামখা আসিয়া আমার ছেলেদিগকে কুস্তি শিখাইবার জন্য বিরক্ত করিবে।"

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। কুন্তীর প্রতি তাহাদের কিরকম ভক্তি হইল বুঝিতেই পার। এদিকে কুন্তী আসিয়া ভীমকে সকল কথা বলাতে ভীম উৎসাহের সহিত রাক্ষসের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

যুধিষ্ঠির ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে এই সংবাদে বড় ভয় পাইলেন। তিনি বলিলেন, "মা! তুমি কি পাগল হইয়াছ যে, ভীমকে এমন কাজে পাঠাইতে রাজি হইলে? ভীমের যদি কিছু হয়, তবে আমাদের কি দশা হইবে?"

কুন্তী বলিলেন, "ভীমের গায় দশ হাজার হাতির জোর। সে যে-সকল কাজ করিয়াছে তাহা দেখ নাই? এসব কথা জানিয়া শুনিয়াও ব্রাহ্মণের উপকাব না কবা ভালো বোধ হয় না।"

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মা তুমি ঠিক বলিয়াছ, ভীমের যাওয়াই উচিত।"

পরদিন ভোরে ভীম রাক্ষসের খাবার লইয়া বনে গিয়াছেন। সেখানে গিয়া তিনি ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় হে! বক কাহার নাম?" "ও বক! খাবে নাকি এসো গো!" ডাকিতেছেন, আর এদিকে নিজেই ভাত খাইয়া শেষ করিতেছেন। ডাক শুনিয়া রাক্ষস দাঁত কড়মড় করিতে করিতে হাজির! কি বিকট চেহারা! এক কান হইতে আর এক কান পর্যন্ত তাহার খালি দাঁত!

একেই তো রাগিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আবার আসিয়া দেখে ভীম তাহার ভাত প্রায় শেষ করিয়াছেন। কাজেই বুঝিতেই পার। সে গর্জন করিয়া বলিল, "মোর ভাতটি খাইছিস্? তোকে যোম ঘর পেঠ্‌ঠাইব নি?"

কিন্তু তাহার কথা কে শোনে? ভীম খালি হাসেন আর খান। রাক্ষস হাত তুলিয়া ভয়ানক শব্দে ভীমকে মারিতে চলিল। ভীম তখনো হাসেন আর খান। রাক্ষস দুই হাতে ধাঁই ধাঁই করিয়া প্রাণপণে তাঁহার পিঠে চাপড় মারিতে লাগিল। তিনি তবুও খালি হাসেন আর খান! তখন রাক্ষস এক প্রকাণ্ড গাছ তুলিয়া লইয়া ভীমকে মারিতে আসল। ততক্ষণে ভীমেরও ভাত কয়টি শেষ হইয়াছে। তখন তিনি ধীরে-সুস্থে হাত মুখ ধুইয়া, হাসিতে হাসিতে রাক্ষসের হাত হইতে গাছটি কাড়িয়া লইলেন। তারপর দুজনের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধ

[১] পাণ্ডবদিগের কিনা তপস্বীর বেশ ছিল, তাই ব্রাহ্মণ ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছিলেন। আসলে ইঁহারা যে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ নহেন, তাহা তো জানই।

করিতে করিতে যখন আর গাছ রহিল না, তখন আরম্ভ হইল কুস্তি। দিন গেল, রাত্রিও যায়-যায়, তবু যুদ্ধ চলিয়াছে।

এইরূপে ক্রমে রাক্ষসকে কাবু করিয়া, শেষে ভীম তাহাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন। তারপর তাহার পিঠে হাঁটু দিয়া, গলা আর কোমরের কাপড় ধরিয়া এমনি বিষম টান দিলেন যে, সেই টানেই তাহার মেরুদন্ড একেবারে দুইখান! তখনই চিৎকার আর রক্তবমি করিতে করিতে রাক্ষস মরিয়া গেল।

বকের চিৎকারে তাহার লোকজন সব ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভীম তাহাদিগকে বলিলেন, "খবরদার! আর মানুষ খাইতে পাইবি না। তাহা হইলে তোদের এমনি দশা করিব!"

তাহারা বলিল, "ওরে ববাপ্পো! মোরা আর কখ্খনু মানুস খাবো নি"।

তখন হইতে উহারা ভদ্রলোক হইয়া গেল, আর মানুষ খায় না।

এদিকে ভীম রাক্ষস মারিয়া চুপিচুপি চলিয়া আসিয়াছেন। সকালবেলা সকলে উঠিয়া দেখিল, রাক্ষস মরিয়া পাহাড়ের মতো পড়িয়া আছে। সংবাদ পাইয়া একচক্রার ছেলে বুড়ো পুরুষ মেয়ে সকলে ছুটিয়া তাহা দেখিতে আসিল। কিন্তু এমন ভয়ানক কাজ কাহার? সকলে বলিল, "দেখ কাল কাহার পালা গিয়াছে।"

পালা সেই ব্রাহ্মণের, আর কাহার হইবে? সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলুন তো ঠাকুর, কিরকম হইয়াছিল।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ঠিক কিরকমটি হইয়াছিল, তাহা তো জানি না। আমরা কান্নাকাটি করিতেছিলাম, এমন সময় এক মহাপুরুষ আসিয়া দয়া করিয়া আমাদিগকে বলিলেন, 'তোমাদের কোনো ভয় নাই, আমিই রাক্ষসেব কাছে যাইব।' বোধহয় সেই মহাপুরুষ রাক্ষস মারিয়া থাকিবেন।"

এ কথায় সকলে অতিশয় আহ্লাদের সহিত নিজ নিজ ঘরে গিয়া দেবতার পূজা দিতে লাগিল।

ইহার কয়েকদিন পরে এক ব্রাহ্মণ পান্ডবদিগের ঘরে আসিয়া রাত্রিতে থাকিবার জন্য একটু জায়গা চাহিলেন। ব্রাহ্মণটি অনেক দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন। পান্ডবদিগের যত্নে তুষ্ট হইয়া তিনি সেই-সকল দেশের অনেক আশ্চর্য কথা তাঁহাদিগকে শুনাইতে লাগিলেন। সেই ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, শীঘ্রই পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদের মেয়ে কৃষ্ণার স্বয়ম্বর হইবে।

কৃষ্ণার কথা অতি সুন্দর। দ্রুপদ রাজার কথা তো আগেই শুনিয়াছ, দ্রোণের নিকট তিনি কেমন সাজা পাইয়াছিলেন তাহাও জান। সে সময়ে মুখে তিনি দ্রোণের সহিত বন্ধুতা করেন, কিন্তু মনে মনে সেই অবধি দ্রোণকে মারিবার উপায় খুঁজিতে থাকেন।

দ্রোণকে মারা যে সহজ কথা নহে, আর যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে মারা যে একেবারেই অসম্ভব, এ কথা দ্রুপদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাই তিনি স্থির করিলেন যে, কোনো মুনিকে ধরিয়া ইহার উপায় করিতে হইবে।

কল্মাষী নদীর ধারে অনেক মুনি তপস্যা করেন। সেইখানে খুঁজিতে খুঁজিতে দ্রুপদ যাজ আর উপযাজ নামক দুই ভাইকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা বড়ই ধার্মিক আর উঁহাদের

ক্ষমতাও অসাধারণ। দেখিয়া দ্রুপদ মনে করিলেন যে, 'ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে আমার কাজ হইবে।'

দ্রুপদ অনেক কষ্টে যাজ ও উপযাজকে পাঞ্চাল দেশে আনিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। মুনি বলিলেন, "এই যজ্ঞে তোমাব পুত্রও হইবে এব কন্যাও হইবে।"

এই বলিযা অগ্নিতে ঘৃত ঢালিবামাত্রই তাহার ভিতব হইতে, আশ্চর্য মুকুট আর বর্ম পরা পরম সুন্দর এক কুমাব ঝক্‌ঝকে বথে চড়িয়া গর্জন করিতে করিতে বাহির হইযা আসিল, তাহার হাতে ধনুর্বাণ আর ঢাল তলোয়ার। তখন আকাশ হইতে দেবতারা বলিলেন, "এই রাজপুত্র দ্রোণকে মাবিবে।"

.বাক্ষস বক্তবমি কবিতে কবিতে মবিয়া গেল

এদিকে আবার যজ্ঞের বেদী হইতে এক কন্যা উঠিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শবীরের বঙ কালো, কিন্তু এমন অপরূপ সুন্দর কন্যা কেহ কখনো দেখে নাই। কালো কোঁকডানো চুল, পদ্মফুলের পাপড়ির মতো সুন্দর উজ্জ্বল দুটি চক্ষু, ভ্রু দুটি যেন তুলি দিয়া আঁকা। শরীরেব সদ্যফোটা পদ্মের গন্ধে, এক ক্রোশ পর্যন্ত ছাইয়া গিয়াছে। দেবতা ছাড়া মানুষ কখনো এমন সুন্দর হয় না। কন্যা জন্মিবামাত্র আকাশ হইতে দেবতারা বলিলেন, "এই কন্যা কৌরবদিগের ভয়ের কারণ হইবে।"

ছেলেটির নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন আর মেয়েটির নাম কৃষ্ণা, বাখা হইল। কৃষ্ণাকে লোকে দ্রৌপদী অর্থাৎ দ্রুপদের কন্যা বলিয়াই বেশি ডাকিত। এই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া, পান্ডবদিগের তাহা দেখিতে যাইবার ইচ্ছা হইল। তাহা দেখিয়া কুন্তী বলিলেন, "চল বাবা আমরা সেইখানে যাই। এখানে আমরা অনেকদিন রহিয়াছি। বেশিদিন এক জায়গায় থাকা ভালো নহে।" সুতরাং স্থির হইল, তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইয়া মায়ের সঙ্গে পাঞ্চাল যাত্রা করিলেন।

গঙ্গার ধারে সোমাশ্রয়ায়ণ নামে এক তীর্থ আছে, সেখানে আসিয়া পান্ডবদিগের রাত্রি হইল। তখন পথ দেখাইবার জন্য অর্জুন মশাল হাতে আগে আগে চলিলেন।

সেখানে এক গন্ধর্ব সপরিবারে স্নান করিতেছিল। সে পান্ডবদিগকে ধমকাইয়া বলিল,

"এইয়ো! এদিকে আইস! জান আমি কে? আমি কুবেরের বন্ধু অঙ্গারপর্ণ। আমার ক্ষমতা এখনি দেখিতে পাইবে। মানুষ হইয়া এখানে আসিয়াছ, তোমাদের সাহস কেমন?"

অর্জুন বলিলেন, "এই, তোমরা বুদ্ধি যেমন! এটা গঙ্গার ধার, তোমার কেনা জায়গা তো নয়, এখান দিয়া সকলেই যাইতে পারে। জোর বুঝি খালি তোমারই আছে, আমাদের নাই!"

ইহাতে তো গন্ধর্ব ভারি চটিয়া একেবারে ধনুক বাগাইয়া তীর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। অর্জুন তাড়াতাড়ি হাতের ঢাল আর মশাল ঘুরাইয়া তীর ফিরাইয়া দিলেন। তরপর ধনুকে আগ্নেয়াস্ত্র জুড়িয়া মারিতেই গন্ধর্ব মহাশয়ের রথ পুড়িয়া ছাই, আর তিনি নিজে মুখ থুবড়িয়া মাটিতে পড়িয়া একেবারে চক্ষু বুজিয়া অজ্ঞান! তখন অর্জুন তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত করিলেন।

এদিকে গন্ধর্বের স্ত্রী কুম্ভীনসীও যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছেন। কাজেই যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন, "ভাই উহাকে ছাড়িয়া দাও।"

তখন অর্জুন গন্ধর্বকে বলিলেন, "কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কাজেই তোমার আর কোনো ভয় নাই, নিশ্চিন্তে ঘরে চলিয়া যাও।"

তাহা শুনিয়া গন্ধর্ব বলিল, "আমি হার মানিলাম। ইহাতে আমার কোনো দুঃখ নাই বরং সুখের কথা। শত্রুকে কাবু করিয়া এমনভাবে দয়া কি যে-সে লোকে করিতে পারে?"

এই বলিয়া গন্ধর্ব অর্জুনকে চাক্ষুষী-বিদ্যা নামক এক আশ্চর্য বিদ্যা শিখাইয়া দিল। ত্রিভুবনের মধ্যে যে বস্তুই দেখিতে ইচ্ছা হইবে, এই বিদ্যা জানা থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া পান্ডবদিগকে সে একশতটি এমন আশ্চর্য ঘোড়া দিল যে, তাহারা কখনো কাহিল বা বুড়া হয় না, তাহাদের কোনো অসুখ বা মৃত্যু নাই, তাহাদের সমান ছুটিতেও কেউ পাবে না।

অর্জুন এই-সকলের বদলে গন্ধর্বকে ব্রহ্মাস্ত্র দিলেন, আর স্থির হইল যে ঘোড়াগুলি এখন গন্ধর্বের নিকটেই থাকিবে, পান্ডবদিগের দরকার হইলে তাঁহাদের নিকট আসিবে।

এইরূপে গন্ধর্ব আর অর্জুনে বন্ধুতা হইয়া গেল। গন্ধর্বের নাম অঙ্গারপর্ণ আর চিত্ররথ দুইই ছিল। চিত্ররথ বলিল, "এখন হইতে আমার চিত্ররথ নাম ঘুচিয়া দগ্ধরথ নাম হউক।"

চিত্ররথ অতিশয় পন্ডিত লোক, পান্ডবেরা তাহার নিকট অনেক নূতন কথা শিখিলেন। পান্ডবদের একটি পুরোহিতের প্রয়োজন ছিল। তাই তাঁহারা চিত্ররথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি কাহাকে পুরোহিত করি?"

চিত্ররথ বলিলেন, "ধৌম্যকে পুরোহিত কর, এমন লোক আর পাইবে না। উৎকোচক নামক তীর্থে গেলে তাঁহার দেখা পাইবে।"

সুতরাং পান্ডবেরা উৎকোচক তীর্থে ধৌম্যের সন্ধানে চলিলেন। তাঁহাকে পুরোহিত করিয়া তাঁহাদের যে কত উপকার হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না। এখন হইতে তাঁহাদের দলে ধৌম্য সমেত সাতজন লোক হইল। সাতজন মিলিয়া তাঁহারা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দেখিতে চলিলেন।

পথে কয়েকটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। তাঁহারাও স্বয়ম্বরেরই যাত্রী। তাঁহারা পান্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আজ্ঞে, আমরা একচক্রা হইতে আসিতেছি।"

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে চলুন! আজ পাঞ্চাল দেশে বড় ধুমধাম হইবে, আমরা তাহা দেখিতে চলিয়াছি। সেখানকার রাজা যজ্ঞসেনের[১] মেয়ের স্বয়ম্বর। সেই মেয়ের গায়ের গন্ধ পদ্মের মতন। এক ক্রোশ দূর হইতে তাহা টের পাওয়া যায়। কত রাজা, কত পন্ডিত, কত মুনি সেখানে আসিবেন, তাহার সীমা নাই। গান বাজনা, বাজি, কুস্তির কথা আর কি বলিব! পেট ভরিয়া ফলার পাইব, চোখ ভরিয়া তামাশা দেখিব, তারপর পুঁটলি ভরিয়া দান-দক্ষিণা লইয়া ঘরে ফিরব। চলুন আমরা একসঙ্গেই যাই আপনাদিগকে যেমন সুন্দর দেখিতেছি, চাই কি সেই মেয়ে আপনাদের কাহাকেও মালা দিয়া বসিতে পারে! "

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "যে আজ্ঞা! আমরা আপনাদের সঙ্গে চলিলাম।"

পাঞ্চালদেশে উপস্থিত হইয়া পান্ডবেরা এক কুমারের বাড়িতে বাসা লইলেন। সেইখানে তাঁহারা থাকেন, আর ভিক্ষা করিয়া খান।

দ্রুপদের ইচ্ছা অর্জুনের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ হয়। সুতরাং যাহাতে অর্জুন ছাড়া আর কেহ দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে না পারে তিনি তাহার এক আশ্চর্য উপায় স্থির করিলেন।

একটা ভয়ংকর ধনুক, তাহাকে কেহই বাঁকাইতে পারে না, সেই ধনুক বাঁকাইয়া তাহাতে গুণ পরাইতে হইবে। তারপর সেই ধনুকে তীর চড়াইয়া খুব উঁচুতে ঝুলানো একটা জিনিসকে বিঁধিতে হইবে। পথের মাঝখানে আবার একটা কলের মতন আছে, সেটার ভিতব দিয়া তীর গেলে তবে সেই জিনিসটাতে পৌঁছাইতে পারে।

এতখানি কাজ করিয়া যে লক্ষ্য (অর্থাৎ যে জিনিসটাকে বিঁধিবার কথা, তাহা) বিঁধিতে পারিবে, সে দ্রৌপদীকে পাইবে। দ্রুপদ বুঝিয়াছিলেন যে, অর্জুন ছাড়া আর কাহারো সে ক্ষমতা নাই, কিন্তু তিনি এ কথা কাহাকেও বলিলেন না।

স্বয়ম্বরের সংবাদ পাইয়া পৃথিবীতে যত বাজা আর রাজপুত্র আর যোদ্ধা আর বড়লোক সকলেই আসিয়া পাঞ্চাল দেশে উপস্থিত হইয়াছেন। কর্ণ, দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ কেহই আসিতে বাকি নাই। ব্রাহ্মণ পন্ডিত আর মুনি ঋষিতে পাঞ্চাল দেশ ছাইয়া গিয়াছে। দেবতারা পর্যন্ত না আসিয়া থাকিতে পারেন নাই।

স্বয়ম্বরের স্থানটি যে কি সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছে, তাহা না দেখিলে বলা কঠিন। বড়-বড় জমকালো ফটক, কাজকবা উঁচু পাঁচিল, রংবেরঙের ঝালর, নিশান, পর্দা আর চাঁদোয়া, এই-সকলের একটা খুব ঘটা মনে করিয়া লও। আর মনে কর, ইহার চারিধারে খাল, তাহাতে জল টলমল করিতেছে, পদ্মফুল ফুটিয়াছে, হাঁস চরিতেছে আর লাল মাছ খেলিতেছে। রাজারাজড়ার জন্য উঁচু উঁচু জায়গা হইয়াছে, তাহাতে বসিয়া তাঁহারা ভালো মতো দেখিতে পাইবেন। সাধারণ লোকেরও ভালোমতোই দেখিবার ইচ্ছা, কিন্তু তাহাদের জন্য আর কে উঁচু জায়গা রাখিবে? কাজেই তাহারা গাছে উঠিয়া রাজাদের চেয়েও ভালো দেখিবার জোগাড় করিল। যাহারা দেখিবার বেশি সুবিধা পাইল না, তাহারা খালি গোলমাল করিয়াই সাধ মিটাইতে লাগিল। উহাদের গলার শব্দই বেশি হইয়াছিল, না বাজনার শব্দই বেশি হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত।

পনেরোদিন খালি গান-বাজনাই চলিল। ষোল দিনের দিন দ্রৌপদী স্নানের পর আশ্চর্য পোশাক এবং অলংকার পরিয়া সোনার মালা হাতে সভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি

[১] দ্রুপদের আসল নাম যজ্ঞসেন।

গোলমাল থামাইয়া, বাজনা থামাইয়া সারা সভাটি চুপচাপ।

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সভার মাঝখানে আনিয়া গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আপনারা সকলে শুনুন। এই ধনুর্বাণ আর ঐ লক্ষ্য আপনারা দেখিতেছেন। ঐ যে একটা কলের মতন, তাহাতে ছিদ্র আছে, তাহাও দেখুন। ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া পাঁচটি তীর মারিয়া লক্ষ্য বিঁধিয়া মাটিতে ফেলিতে হইবে। এ কাজ যিনি করিতে পারিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে পাইবেন।"

সভার সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এত রাজারাজড়ার মধ্যে না জানি কে আজ দ্রৌপদীকে লইয়া যায়। সেই সভায় কৃষ্ণ আর বলরামও উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, পান্ডবেরা পাঁচ ভাই ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বসিয়া আছেন। ইহাতে যারপরনাই আনন্দিত হইয়া তিনি চুপিচুপি বলরামকে এ কথা জানাইলেন। কিন্তু তাঁহারা দুভাই ভিন্ন আর কেহই পান্ডবদিগকে চিনিতে পারিল না। তাহারা তামাশা দেখিতেই ব্যস্ত ছিল।

এদিকে বাজনা বাজিতেছে, আর রাজাদিগের মধ্য হইতে এক-একজন করিয়া লক্ষ্য বিঁধিয়া বিদ্যার পরীক্ষা দিতে যাইতেছেন। হায় হায়! সে সর্বনেশে ধনুক কাহারো হাতে বাগ মানিতে চাহে না; বরং তাহার ধাক্কায় রাজামহাশয়েরাই ঠিকরাইয়া পড়েন। বড়-বড় রাজা পর্যন্ত কেহ চিৎপাৎ হইয়া, কেহ ডিগবাজি খাইয়া, কাহারো পাগড়ি উড়িয়া গিয়া, নাকালের একশেষ। তাঁহাদের মুখে আর কথাটি নাই।

এমন সময় কর্ণ আসিয়া দেখিতে দেখিতে সেই ধনুকে গুণ আর তীর চড়াইয়া লক্ষ্য বিঁধিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহা দেখিয়া পান্ডবেরা মনে কবিলেন, এই বুঝি লক্ষ্য বিঁধিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া যায়।

কিন্তু কর্ণকে দেখিয়া দ্রৌপদী বলিলেন, "সারথির ছেলের গলায় মালা দিতে পারিব না. কাজেই কর্ণকে লক্ষ্য না বিঁধিয়াই ফিরিয়া যাইতে হইল।"

সেদিন রাজামহাশয়দের যে দুর্দশা! শিশুপালের তো হাঁটুই ভাঙ্গিয়া গেল! জরাসন্ধ গুঁতা খাইয়া চিৎপাৎ! তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে সেই যে তিনি সেখান হইতে চলিলেন, আর একেবারে নিজের ঘরে না পৌঁছিয়া থামিলেন না। শল্যেরও প্রায় সেই দশা!

অর্জুন এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, রাজামহাশয়দের দুরবস্থা দেখিয়া এইবার তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অর্জুনকে লক্ষ্য বিঁধিতে যাইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা তাঁহাদের বসিবার হরিণের ছাল ঘুরাইয়া চিৎকার আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ যে আবার বিরক্তও না হইলেন এমন নহে। তাঁহারা বলিলেন, "আরে কর কি ঠাকুর? থামো, থামো! এ ব্যক্তি দেখিতেছি আমাদের সকলকে অপদস্থ করাইবে। বড় বড় রাজারা যাহা পারিল না, সেটা ইহার না করিলেই নয়। বেচারার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে আর কি!"

তাহা শুহিয়া আর অনেকে বলিলেন "তোমরা ব্যস্ত হইয়াছ কেন? ইহাকে যাইতে দাও ব্রাহ্মণে না করিতে পারে এমন কাজ আছে? ইনি কোনো মহাপুরুষ হইবেন। দেখিতেছ না, ইহার কেমন চেহারা? ও! গায় কি তেজ! কাঁধ কি চওড়া! হাত কি লম্বা! এমন সুন্দর আর

একটা মানুষ এখানে খুঁজিয়া বাহির কর দেখি। ইনি নিশ্চয় পারিবেন। তোমরা চুপ করিয়া দেখ। ঐ তিনি ধনুকে গুণ চড়াইতেছেন"।

অর্জুন ধনুকের কাছে একটু থামিয়া ব্রাহ্মণদিগের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন. তারপর তিনি দেবতাকে স্মরণ করিয়া ধনুকখানি হাতে লইলেন। সে ধনুকে গুণ চড়ানো কি আর অর্জুনের কাছে একটা কঠিন কাজ? তিনি চক্ষের পলকে গুণ চড়াইয়া, পাঁচটি তীর হাতে লইলেন। তারপর দেখিতে দেখিতে লক্ষ্য বিঁধিয়া মাটিতে পড়িল। সকলে দেখিয়া অবাক!

তখন আকাশ হইতে দেবতারা জয় জয় শব্দে অর্জুনের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন আর ব্রাহ্মণদিগের কথা কি বলিব! হরিণের ছাল, কুশাসন, চাদর, কোঁচা কিছুই তাঁহারা ঘুরাইতে বাকি রাখিলেন না। তারপর বাজনদারেরা যে তাহাদের সকলগুলি ঢাক, ঢোল, সানাই, কাড়া আর কাঁসি একসঙ্গে মিলাইয়া একটা কান্ড করিয়াছিল, তাহা যদি শুনিতে!

সেই আনন্দ কোলাহলের ভিতরে দ্রৌপদী হাসিতে হাসিতে অর্জুনকে মালা দিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এদিকে কিন্তু রাজামহাশয়দের মুখ ভার আর চোখ লাল। তাঁহারা নিজে যে সকলেই সেদিন কি অদ্ভুত বিদ্যা দেখাইয়াছেন, সে কথা আর তাঁহাদের মনে নাই। তাঁহারা থাকিতে ব্রাহ্মণ কেন মেয়ে লইয়া গেল, তাই তাঁহাদের রাগ! "এমন কথা? আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া অপমান করিল? অ্যাঁ বলেন কি মহাশয়?"

"তাইতো! এমন কথা? অপমান করিল? অ্যাঁ!—মার্! মার্! দ্রুপদকে মার্ আর ঐ হতভাগা মেয়েটাকে পোড়াইয়া ফেল্?"

এই বলিয়া সকল রাজা একজোটে দ্রুপদকে আক্রমণ করিতে আসিল। দ্রুপদ আর উপায় না দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অর্জুন ইহার পূর্বেই ধনুক-বাণ লইয়া প্রস্তুত। ততক্ষণে ভীমও একটা বড়গোছের গাছ উপড়াইয়া ডাল-পাতা ঝাড়িয়া বেশ মজবুত একটি লাঠি প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন।

এদিকে এ-সকল কান্ড দেখিয়া কৃষ্ণ বলরামকে বলিতেছেন, "দাদা , এ ধনুক অর্জুন ভিন্ন আর কেহই এমন করিয়া বাগাইতে পারে না আর এমন করিয়া গাছ ভাঙ্গিয়া লাঠি তয়ের করাও ভীম ছাড়া আর কাহারো কর্ম নহে। আর ঐ তিনজন নিশ্চয় যুধিষ্ঠির নকুল আর সহদেব। শুনিয়াছিলাম, পিসীমা (অর্থাৎ কুন্তী, ইনি কৃষ্ণ বলরামের পিসীমা) আর পান্ডবেরা জতুগৃহ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এখন দেখিতেছি তাহা সত্য।"

বলরাম বলিলেন, "পিসীমা বাঁচিয়া আছেন শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।"

রাজারা যুদ্ধ করিতে আসিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের বড়ই রাগ হইল। তাঁহারা হরিণের ছাল আর কমণ্ডলু ঘুরাইয়া ভীম অর্জুনকে বলিলেন, "তোমাদের কোনো ভয় নাই। আমরা তোমাদের হইয়া যুদ্ধ করিব।"

অর্জুন তাহাতে একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা দাঁড়াইয়া দেখুন, আমরাই ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছি।"

তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কর্ণ অর্জুনকে আর শল্য ভীমকে মারিবার জন্য দাঁত কড়মড় করিতে করিতে ছুটিলেন, আর অন্য সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তাড়া করিলেন।

কর্ণও খুব রাগিয়া তীর মারেন, অর্জুনও তেমনি তেজের সহিত তাঁহাকে সাজা দেন।

তাঁহা দেখিয়া কর্ণ বলিলেন, "আপনি কে ঠাকুর? আমার মনে হয় আপনি স্বয়ং ধর্নুবেদ বা পরশুরাম বা সূর্য বা বিষ্ণু মানুষ সাজিয়া আসিয়াছেন। আমি রাগিয়া দাঁড়াইলে ইন্দ্র আর অর্জুন ছাড়া কেহ তো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে না।"

অর্জুন বলিলেন, "আমি ধনুর্বেদও নহি, পরশুরামও নহি। আমি সাদা-সিধা ব্রাহ্মণ, গুরুর কাছে অস্ত্র শিখিয়া তোমাকে সাজা দিতে আসিয়াছি।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "আপনার ব্রাহ্মণের তেজ, আপনার সঙ্গে আমি পারিব কেন? এই বলিয়া তিনি যুদ্ধ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।"

এদিকে শল্য আর ভীমে মল্লযুদ্ধ চলিয়াছে। এক-একটা কিল পড়ে যেন পাহাড় ভাঙ্গি য়া পড়ে। ক্রমাগত কেবল ধুপ্‌ধাপ্‌, টিপঢাপ, ঠকাঠক্‌, চটাপট্‌ ছাড়া আর কথাই নাই। এমন সময়ে ভীম শল্যকে তুলিয়া এক আছাড় দিলেন, আর তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, ভীম শল্যকে এমনি কাবু করিয়াও তাহাকে মারিলেন না।

এ সকল কান্ড দেখিয়া রাজামহাশয়েরা ভয়ে জড়সড়। তাঁহারা আর যুদ্ধ করিবেন কি, এখন কোনো মতে ভীম আর অর্জুনের প্রশংসা করিয়া মানে মানে ফিরিতে পারিলে বাঁচেন। কাজেই তাঁহারা বলিলেন, "বাঃ! ইঁহার খুব যুদ্ধ করিয়াছেন! যে সে লোক তো কর্ণ আর শল্যকে আঁটিতে পারে না। ইঁহারা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ হাজার দোষী হইলেও তাঁহাকে মাপ করিতে হয়। ইঁহাদের সহিত আমাদের যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই, যদিও দরকার হইলে অবশ্য আমরা একটা কান্ড-কারখানা করিয়া ফেলিতে পারিতাম!"

তাহা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "রাজামহাশয়েরা ঠিক বলিয়াছেন। ইঁহারা উচিত মতেই রাজকন্যাকে পাইয়াছেন, ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনাদের কাজ নাই।"

কাজেই তখন রাজারা চলিয়া গেলেন।

এদিকে কুন্তী সেই কুমারের ঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন, "পুত্রেরা কেন এখনো ভিক্ষা লইয়া ঘরে ফিরিল না? দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্রের লোকেরা কি তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল, না রাক্ষসেরা তাঁহাদের কোনো অনিষ্ট করিল?"

এমন সময় ভীম আর অর্জুন আসিয়া বাহির হইতে বলিলেন, "মা! আজ ভিক্ষায় গিয়া বড় সুন্দর জিনিস আনিয়াছি।"

কুন্তী ভিতরে ছিলেন, দেখিতে পান নাই। তিনি বেশি না ভাবিয়াই বলিলেন, "যাহা পাইয়াছ, তাহা তোমাদের সকলেরই হউক।"

বলিতে বলিতেই দেখেন ওমা! কি সর্বনাশ! এতো সাধারণ জিনিস নহে, এযে রাজকন্যা!

এখন উপায়? কুন্তী যে 'সকলেরই হউক' বলিয়া বসিয়াছেন, এখন উপায় কি? এ কথা মিথ্যা হইয়া গেলে কুন্তীর পাপ হয়। সত্য হইতে হইলে পাঁচ ভাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে হয়।

পান্ডবেরা বলিলেন, "তাহাই হউক। দ্রৌপদীকে আমরা সকলে মিলিয়া বিবাহ করিব, তবু মায়ের কথা মিথ্যা হইতে দিব না!"

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্তা ঠিক হইয়াছে, এমন সময় কৃষ্ণ আর বলরাম সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। কৃষ্ণকে দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কি আশ্চর্য আমরা এখানে লুকাইয়া

রহিয়াছি, তোমরা আমাদের কথা কি করিয়া জানিলে?"

কৃষ্ণ বলিলেন, "আগুন কি কাপড়ে চাপা থাকিতে পারে? যে কান্ড-কারখানা আজ হইয়াছে, আপনারা নহিলে আর কে তাহা করিবে? কি ভাগ্য যে আপনারা সেই দুষ্টদের হাত হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছেন!"

এইরূপ খানিক কথাবার্তা কহিয়া কৃষ্ণ আর বলরাম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এখানকার ঘটনা তো এইরূপ। ওদিকে দ্রুপদ আর তাঁহার লোকেরা না জানি কি করিতেছেন। তাঁহাদের মনে খুবই চিন্তা, তাহাতে আর ভুল কি? দ্রৌপদী কাহার হাতে পড়িলেন, যে দুজনে তাঁহাকে লইয়া গেল, তাহারা কে, কিরূপ লোক, কিছুই জানা নাই। এমন অবস্থায় আপনার লোকেরা মন কি স্থির থাকিতে পারে? কাজেই ধৃষ্টদ্যুম্ন কয়েকটি লোক লইয়া চুপিচুপি সেই দুজনের পিছু পিছু চলিলেন। চল আমরাও ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাই।

ঐ সেই দুজন দ্রৌপদীকে লইয়া চলিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা অনেকেই উহাদের সঙ্গে যাইতেছেন। যে লক্ষ্য বিঁধিয়াছিল, দ্রৌপদী যেন খুব আহ্লাদের সহিত তাঁহার আসনখানি বহিয়া চলিয়াছেন উহারা কোথায় যায়, দেখিতে হইবে।

তাইতো উহারা যে কুমারের বাড়ি ঢুকিল! আচ্ছা দেখা যাউক এরপর কি করে। সেখানে আরো কাহারা আছে। তিনজন পুরুষমানুষ। ঠিক ইহাদেরই মতো তাহাদেরও চেহারা, নিশ্চয় ইহাদের ভাই হইবে। আর ঐ বুড়া স্ত্রীলোকটি কে? তাহার শরীরে কেমন তেজ দেখিয়াছ? খুব বড়ঘরের মেয়ে, তাহতে সন্দেহ নাই, বোধহয় ইহাদের মা, নহিলে ইহারা আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিবে কেন?

দ্রৌপদীকে সেই স্ত্রীলোকটির কাছে রাখিয়া উহারা কোথায় বাহির হইয়া গেল? বোধহয় ভিক্ষায়।

ঐ তাহারা ভিক্ষা লইয়া ফিরিয়াছে, আর দেখ, ছোট চারিজন তাহাদের ভিক্ষার জিনিস তাহাদের বড় ভাইটির সামনে আনিয়া রাখিতেছে উহারা নিশ্চয় খুব ধার্মিক লোক! দেখ না, সকলের আগে ভিক্ষার জিনিস দেবতাকে দিল। আর দেখ কেমন দাতা, উহার ভিতর হইতে আবার ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা দিতেছে!

আচ্ছা উহারা তো সাতজন লোক, কিন্তু ভিক্ষার জিনিস মোটে দুইভাগ করিল কেন? ওহ! দেখিয়াছ? একভাগের তাবতই ঐ ষন্ডাটি একলা নিল! তা উহার যেমন শরীর, আহারটি তো তেমনই চাই। কম খাইলে কি আর এত বড় গাছ লইয়া রাজামহাশয়দিগকে এমন সাজাটি দিতে পারিত? উহার ওটুকু চাই। বাকি অর্ধেকের ছয়ভাগ হইল, আর ছয়জনে খাইবে।

বাঃ! ভিখারির খাওয়া-দাওয়া তো বেশ সহজ! ঐ শেষ হইয়া ইহারই মধ্যে সব পরিষ্কার। ছোট দুটি ভাই কুশ বিছাইতেছে। বিছানাও বেশ পরিষ্কার, কুশের উপর হরিণের ছাল, বেশ তো! পাঁচ ভাই দক্ষিণশিয়রী হইয়া শুইল। উহাদের মা উহাদের মাথার কাছে, আর ঐ দেখ দ্রৌপদী পায়ের কাছে শুইলেন। কিন্তু দেখিলে? পায়ের কাছে শুইয়াই কেমন সুখী।

শোন, শোন! উহারা কি কতাবার্তা বলে। যুদ্ধের কথা, অস্ত্রশস্ত্রের কথা। কি সুন্দর কথাবার্তা! ইহারা নিশ্চয় ক্ষত্রিয় আর বড়লোক! চল যাই, রাজাকে বলি গিয়া।

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও তাহার দলের লোক চলিয়া আসিলেন।

এদিকে দ্রুপদ যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া আছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিলে বাবা? আমাদের কৃষ্ণা কাহার হাতে পড়িল? সে লোকটি কি অর্জুন হইবে? আহা! কৃষ্ণা আমার কোনো ছোটলোকের হাতে পড়ে নাই তো?"

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন, "বাবা! কোনো চিন্তা করিবেন না। কৃষ্ণা যে সে লোকের হাতে পড়ে নাই। উহারা নিশ্চয় ক্ষত্রিয় আর খুবই বড়লোক হইবেন, তাহাতে ভুল নাই। শুনিয়াছি পান্ডবেরা নাকি সেই আগুনে পোড়া হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। আমার মনে হয় ইঁহারাই পান্ডব!"

আহা! কি আনন্দের কথা! ইঁহারা কি তবে পান্ডব? যাহা হউক ইঁহাদিগকে উচিত আদর দেখাইতে হইবে। তখনই রাজপুরোহিত ছুটিয়া সেই কুমারেব বাড়িতে চলিলেন। সেখানে আসিয়া যখন যুধিষ্ঠিরের নিকট সকল কথাই জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার আনন্দ দেখে কে!

ইহার মধ্যে রাজবাড়ি হইতে সোনার রথ লইয়া লোক উপস্থিত। সেই রথে চড়িয়া সকলে রাজবাড়ি আসিলেন। সেখানে কতরকম জিনিস দিয়া যে তাঁহাদিগকে আদর করা হইল, তাহার সীমা নাই। আর আহারের আয়োজনের কথা কি বলিব? তেমন মিঠাই সন্দেশ আমি কখনো দেখি নাই। পান্ডবেরা দামী পোশাক পরিয়া সোনার থালায় সেই-সকল মিষ্টান্ন আহার করিলেন। যে সকল জিনিস তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া আর কিছু তাঁহারা লইলেন না। ইহাতে নিশ্চয় বুঝা গেল যে ইহারা ক্ষত্রিয়, তথাপি দ্রুপদ তাঁহাদিগকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "আপনারা কে, আমরা তাহা জানি না। আপনারা নিজের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে সুখী করুন।"

এ কথায় উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ! আপনি কোনো চিন্তা কবিবেন না। আমরা ক্ষত্রিয়, মহাত্মা পান্ডুর পুত্র। কুন্তীদেবী আমাদের মাতা। আমি সকলের বড়, আমার নাম যুধিষ্ঠির। ইহার নাম ভীম। ইনি অর্জুন, যিনি লক্ষ্য বিঁধিয়াছিলেন; মা আর দ্রৌপদীর সঙ্গে যে দুটি আছেন, তাঁহাদের নাম নকুল আর সহদেব।"

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া দ্রুপদ আহ্লাদে কিছুকাল কথা কহিতে পারিলেন না। তারপর কথাবার্তায় সকল ঘটনা জানিতে পারিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন, "তোমাদেব রাজ্য নিশ্চয় তোমাদিগকে লইয়া দিব!"

তারপর বিবাহের কথা। পাঁচ ভাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন শুনিয়া তো সকলে অবাক। এমন কথা তো কখনো শুনে নাই। এও কি হয়?

সকলে এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময় ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা কেন ব্যস্ত হইয়াছ? এ কাজে কোনো মুস্কিলই নাই। দ্রৌপদীর সহিত যে ইহাদের বিবাহ হইবে, ইহা তো শিব অনেকদিন আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন। আর-এক জন্মে দ্রৌপদী এক মুনির কন্যা ছিলেন। যাহাতে খুব গুণবান লোকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, এই জন্য সেই কন্যা শিবের তপস্যা করেন। শেষে যখন শিব বর দিতে আসিলেন, তখন কন্যা ব্যস্ত হইয়া ক্রমাগত পাঁচবার বলিলেন, 'সকল গুণ যাঁহার আছে, এমন লোকের সহিত আমার বিবাহ হউক।' শিব বলিলেন, 'তুমি পাঁচবার

এ কথা বলিলে, কাজেই পাঁচজনের সহিত তোমার বিবাহ হইবে।' সেই কন্যা এখন দ্রৌপদী হইয়াছেন। আর শিবের আজ্ঞা, কাজেই পাঁচজনের সহিত তাঁহার বিবাহ হইতেই হইবে।"

তারপর বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। কত লোক, কত বাদ্য, কত গান, কত সাজ, কত আলো, কত পূজা, কত আনন্দ! হাতি ঘোড়া, রত্ন অলংকার, দাস দাসী প্রভৃতি যৌতুকই (অর্থাৎ দ্রুপদ পান্ডবদিগকে যাহা দিলেন)-বা কত! যাহারা দেখিতে আসিয়াছিল, এত আয়োজন আর এমন সুন্দর বর-কন্যা দেখিয়া তাহাদের চক্ষু জুড়াইয়া গেল, আর দামী পোশাক আর অলংকার উপহার পাইয়া তাহাদের মন খুশি হইয়া গেল।

দুর্যোধন আর তাঁহার দলের লোকেরা দেখিলেন যে, পান্ডবদিগকে তাঁহারা পোড়াইয়া মারিয়াছেন বলিয়া মনে মনে এত সুখ বোধ করিয়াছিলেন, সেই পান্ডবদিগের সহিতই দ্রৌপদীর বিবাহ হইয়াছে। যিনি লক্ষ্য বিঁধিয়াছিলেন তিনি অর্জুন আর যিনি শল্যকে আছড়াইয়াছিলেন, তিনি ভীম ছাড়া আর কেহ নহেন।

তখন তাঁহাদের যে দুঃখ! তাঁহারা এত চেষ্টা করিলেন, তবুও পান্ডবেরা মরিলেন না, কি অন্যায়! সেই পুরোচনটা নিতান্তই গাধা ছিল, তাহারই বুদ্ধির দোষে পান্ডবেরা বাঁচিয়া গিয়াছেন!

ক্রমে এই সংবাদ বিদুরের নিকট পৌঁছিল। তাহা শুনিবামাত্রই তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ! স্বয়ম্বর সভায় কৌরবেরাই জিতিয়াছে।"

অবশ্য পান্ডবেরাও তো কৌরব, কাজেই বিদুর ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, 'কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বিদুর কি সুখের সংবাদই শুনাইলে! শীঘ্র দুর্যোধন আর দ্রৌপদীকে এখানে নিয়া আসুক।'

বিদুর বলিলেন, 'মহারাজ, পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে পাইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ভালো আছেন, আর সেখানে তাঁহাদের অনেক বন্ধু জুটিয়াছে!'

এই সংবাদে ধৃতরাষ্ট্রের মনে খুবই দুঃখ হইল। কিন্তু তিনি সামলাইয়া গিয়া বলিলেন, 'তা ভালোই হইয়াছে। আমি আমার নিজের ছেলেদের চেয়েও পাণ্ডবদিগকে ভালোবাসি। আমার ছেলেগুলি বড় দুষ্ট, উহারা পাণ্ডবদের হাতে খুবই সাজা পাইবে।'

বিদুর বলিলেন, 'মহারাজ, সকল সময়ই যেন আপনার এইরূপ বুদ্ধি থাকে।'

এই কথাবার্তার কথা জানিতে পারিয়া দুর্যোধন আর কর্ণ গোপনে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 'আপনি বিদুরের কাছে শত্রুর প্রশংসা করিলেন কেন? উহাদিগকে এইবেলা জব্দ না করিতে পারিলে যে শেষে আমাদের বিপদ হইবে।'

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'আমারও সেই মত। কেবল বিদুরের কাছে মনের কথা লুকাইবার জন্য পাণ্ডবদের প্রশংসা করি। ও তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। সুযোদন! তুমি কি করিতে চাহ, বল।'

সুযোধন কে, বুঝিলে?—দুর্যোধন। বাপ কিনা ছেলেকে আদর করিয়া মিষ্ট নামে ডাকিয়া থাকে, তাই ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বলিতেন, 'সুযোধন'।

দুর্যোধন পাণ্ডবদিগকে মারিবার জন্য কতরকম উপায়ের কথাই ভাবিয়া রাখিয়াছেন—

'পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া বাঁধাইয়া দিলে উহারা নিজেরাই কাটাকাটি করিয়া মরিবে।'

'দ্রুপদকে ধন দিয়া বশ করিলেও কাজ চলিতে পারে।'

'গুণ্ডা লাগাইয়া ভীমকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে তো আর কথাই নাই।'

'আর কিছু না হয়, তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া এখানে আনিয়া মারিবার ফন্দি করিলেও মন্দ হয় না।'

এ-সকল পরামর্শ কর্ণের তত ভালো লাগিল না। তাঁহার ইচ্ছা, এখনই যুদ্ধ করিয়া পাণ্ডবদিগকে বধ করেন।

যাহা হউক, ধৃতরাষ্ট্র ইঁহাদের কথায় নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ আর বিদুরকে ডাকাইলেন।

ভীষ্ম আর দ্রোণ দুইজনেই বলিলেন, 'পাণ্ডবদিগকে অর্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সহিত বন্ধুতা করা উচিত, নহিলে বিপদ হইবে।' কিন্তু একথা কর্ণের একেবারেই পছন্দ হইল না। রাগের চোটে ভদ্রতা ভুলিয়া গিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ! ইঁহারা আপনার টাকা খান, অথচ কি পরামর্শ দিলেন দেখুন। ইঁহারা কেমন লোক, আর আপনার কেমন বন্ধু, ইহাতেই বুঝিয়া লইবেন।'

বিদুর বলিলেন, 'মহারাজ! ভালো কথা কেবল বলিলে কি হয়, তাহার মতো কাজ হইলে তবে তো উপকার হইবে। ভীষ্ম দ্রোণ ইহারা এক-একজন কিরূপ মহাপুরুষ, ভাবিয়া দেখুন। দুর্যোধন, কর্ণ শকুনি ইহারা গোঁয়ার, ইহাদের কথা শুনিয়া চলিলে আপনার সর্বনাশ হইবে, এ কথা আমি বলিয়া রাখিতেছি।'

কাজেই তখন ধৃতরাষ্ট্র আর কি করেন? তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ আর বিদুরের মতেই মত দিয়া বলিলেন, 'বিদুর! তুমি গিয়া ইহাদের সকলকে আদরের সহিত লইয়া আইস।'

বিদুর এই সংবাদ লইয়া পাঞ্চালদেশে যাইতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। অনেকদিন পরে পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া তাঁহার যেমন সুখ হইল পাণ্ডবদেরও তাঁহাকে দেখিয়া তেমনি, বরং তাহার চেয়ে অধিক, সুখ হইল। দ্রুপদ, কৃষ্ণ, বলরাম ইঁহারা বিদুরকে যারপরনাই সম্মান দেখাইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ভালো বুদ্ধি হইয়াছে, ইহা তো বেশ সুখেরই বিষয়। কাজেই পাণ্ডবেরা দ্রুপদের অনুমতি লইয়া বিদুর, কৃষ্ণ আর বলরামের সঙ্গে হস্তিনায় আসিলেন। আহা নগরের লোকগুলির তাঁহাদিগকে দেখিয়া যে আনন্দ! তাহারা যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

তারপর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'বাবা যুধিষ্ঠির! তোমরা অর্ধেক রাজ্য লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস কর, তাহা হইলে আর দুর্যোধনের সহিত তোমাদের কোনোরূপ ঝগড়া হইবে না।' সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণামপূর্বক পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে আসিয়া অর্ধেক রাজ্য লইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

খাণ্ডবপ্রস্থ দেখিতে দেখিতে হস্তিনার চেয়েও বড় আর সুন্দর হইয়া উঠিল। মঠ-মন্দির, লোকজন, হাট-বাজার, দীঘি-পুকুর-বাগানে এমন শোভা আর অতি অল্প স্থানেই দেখা যায়।

এইরূপ সুখে তাঁহাদিগকে খাণ্ডবপ্রস্থে রাখিয়া কৃষ্ণ আর বলরাম দ্বারকায় (যেখানে তাঁহাদের বাড়ি) চলিয়া গেলেন।

ইহার মধ্যে কি হইল শুন।

পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই আর দ্রৌপদী, ইঁহাদের নিজেদের মধ্যে ব্যবহার অতিশয় মিষ্ট ছিল। দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁহারা যারপরনাই ভদ্রতা করিয়া চলিতেন। তিনি তাঁহাদের কোনো একজনের

সহিত কথাবার্তা কহিবার সময় কখনো আর-একজন গিয়া তাহাতে বাধা দিতেন না। এমন-কি, তাঁহাদের নিয়ম ছিল যে, যদি তাঁহাদের কেহ এরূপ অভদ্রতা করেন, তবে তাঁহাকে বারো বৎসর সন্ন্যাসী হইয়া বনে বাস করিতে হইবে।

ইহার মধ্যে একদিন এক ব্রাহ্মণের গোরু চোরে লইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ তো খাণ্ডবপ্রস্থে আসিয়া মহাকান্না জুড়িয়াছেন, 'হে পাণ্ডবগণ! আমার গোরু চোরে লইয়া গেল! হায় হায়! আমার গোরু চোরে লইয়া গেল!'

ব্রাহ্মণের কান্না শুনিয়া অর্জুন বলিলেন, 'ভয় নাই ঠাকুর! এই আমি চোরকে সাজা দিতেছি।'

এই বলিয়া তিনি অস্ত্র আনিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল যে, অস্ত্রের ঘরে দ্রৌপদী আর যুধিষ্ঠির কথাবার্তা কহিতেছেন। তখন অর্জুন ভাবিলেন যে, 'এখন গিয়া ইঁহাদের কথাবার্তায় বাধা দিলে অভদ্রতা হইবে, আর বারো বৎসরের জন্য বনে যাইতে হইবে বটে, কিন্তু চোখের সামনে ব্রাহ্মণের গোরু চোরে লইয়া যাইতেছে, ইহা সহ্য হইবার নহে। বরং বনেই যাইব, তথাপি ব্রাহ্মণের গোরু চোরে নিতে দিব না।'

এই মনে করিয়া তিনি অস্ত্র লইয়া চোর ধরিতে বাহির হইলেন। চোরকে মারিয়া ব্রাহ্মণের গোরু আনিয়া দিতে তাঁহার বেশি বিলম্ব হইল না। ব্রাহ্মণ গোরু পাইয়া চিৎকারপূর্বক অর্জুনকে প্রশংসা আর আশীর্বাদ করিতে করিতে ঘরে ফিরিলেন।

তারপর অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া বলিলেন, 'দাদা, নিয়ম যে ভাঙ্গিল! এখন অনুমতি করুন, বনে যাই।'

যুধিষ্ঠির তো শুনিয়াই অবাক! তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'সে কি ভাই, তোমার তো কিছুমাত্র অভদ্রতা হয় নাই। আর তুমি ব্রাহ্মণের কাজ করিতে গিয়াছিলে, সুতরাং একটা নিয়ম থাকিলেও তোমার না গেলেই দোষ হইত। আমি তো তোমার দাদা, আমার কথা তো মান্য কর, আমি বলিতেছি তোমার বনে যাওয়ার দরকার নাই। লক্ষ্মী ভাই! তুমি কোনো চিন্তা করিও না।'

অর্জুন বলিলেন, 'দাদা! আপনিই তো কহিয়াছেন, মিথ্যা বলিয়া ধর্ম-কর্মও করিবে না। নিয়ম করিয়া তাহা ভাঙ্গিলে অন্যায় কাজ করা হইবে, আমি অস্ত্র ছুঁইয়া বলিতেছি, আমি তাহা পারিব না।'

কাজেই যুধিষ্ঠির আর বিদায় না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। অর্জুন তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বারো বৎসরের জন্য বনে চলিয়া গেলেন।

অর্জুন বনে থাকার সময় অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন তিনি গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিতেছেন, এমন সময় নাগরাজ কৌরবের কন্যা উলুপী তাঁহাকে ধরিয়া জলের ভিতর দিয়া একেবারে তাঁহাদের দেশে (অর্থাৎ পাতালে) নিয়া উপস্থিত করেন। তারপর যতক্ষণ না অর্জুন উলুপীকে বিবাহ করিতে রাজি হন, ততক্ষণ তিনি তাঁহাকে আসিতে দেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরে অর্জুন মণিপুর[১] যান, আর সেখানকার রাজার কন্যা চিত্রাঙ্গদার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

ইহার পরে অর্জুন গঙ্গার ধারে আসিয়া পাঁচটি তীর্থ দেখিতে পাইলেন। তীর্থগুলি খুব

[১] এই মণিপুর উড়িষ্যার কাছে ছিল।

সুন্দর, অথচ তাহাতে লোকজন নাই। ইহাতে তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহার কারণ কি?' তাহা শুনিয়া কয়েকজন মুনি বলিলেন, 'এই পাঁচ তীর্থে পাঁচটা কুমির আছে, কেহ জলে নামিলেই তাহারা তাহাকে ধরিয়া খায়। তাই এখানে কেহ স্নান করিতে আসে না।'

এ কথা শুনিয়া অর্জুন কুমির দেখিতে চলিলেন। মুনিরা অনেক নিষেধ করিলেও শুনিলেন না।

এই পাঁচ তীর্থের একটাতে গিয়া অর্জুন স্নান করিবার জন্য যেই জলে নামিয়াছেন, অমনি এক প্রকাণ্ড কুমির আসিয়া তাঁহার পা কামড়াইয়া ধরিয়াছে। আর অর্জুনও সেই মুহূর্তেই কুমিরকে ধরিয়া টানিতে টানিতে একেবারে ডাঙ্গায় আনিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু একি আশ্চর্য! ডাঙ্গায় আসিয়াই কুমির আর কুমির নাই, সে পরমসুন্দরী একটি কন্যা হইয়া গিয়াছে। অর্জুন তো দেখিয়া অবাক। তিনি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহার অর্থ কি? তুমি কে?'

কন্যা বলিল, 'মহাশয়, আমি অপ্সরা। আমার নাম বর্গা। আমরা চারিটি সখী আছে, তাহাদের নাম—সৌরভেয়ী, সমীচি, বুদ্বুদা আর লতা। আমরা এক তপস্বীকে অমান্য করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি রাগিয়া আমাদিগকে কুমির করিয়া দেন। তপস্বী বলিয়াছিলেন যে, কোনো মানুষ আমাদিগকে জল হইতে টানিয়া তুলিতে পারিলেই আমাদের শাপ দূর হইবে। তাই আমরা পাঁচজন এই পাঁচ তীর্থে বাস করি, আর মানুষ জলে নামিলেই তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাই। কিন্তু এ পর্যন্ত আর কেহ আমাদিগকে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিতে পারে নাই, কাজেই আমবাও এতদিন কুমির থাকিয়া গিয়াছি। আজ আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন। এখন আমার সখী চারিটিকে দয়া করিয়া উদ্ধার করুন।'

অর্জুন তখনই আর চারি তীর্থে গিয়া সেখানকার চারিটি কুমিরকে টানিয়া তুলিলেন। পাঁচটি অপ্সরা পাপের দায় হইতে রক্ষা পাইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

ইহার পর নানা প্রকার তীর্থ দেখিতে দেখিতে অর্জুন ক্রমে প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইলেন। এই তীর্থ কৃষ্ণের রাজ্যের মধ্যে। কৃষ্ণ অর্জুনের সংবাদ পাইয়া সেখানে আসিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন।

বলরাম এবং কৃষ্ণের একটি ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম সুভদ্রা। সুভদ্রার সহিত যেমন করিয়া অর্জুনের বিবাহ হইয়াছিল, সে এক আশ্চর্য কথা। রূপেগুণে সুভদ্রার মতো মেয়ে অতি কমই দেখা যায়। তাঁহাকে দেখিয়া অর্জুনের বড়ই ভালো লাগিল।

কৃষ্ণ অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে চাহেন। ইহাতে তাঁর মনে অতিশয় আনন্দ হইল, কারণ, অর্জুনকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, আর জানিতেন যে, সুভদ্রার সহিত বিবাহ দিবার জন্য এমন গুণবান লোক আর পাওয়া যাইবে না।

এখন এ বিবাহ কিরূপে হইতে পারে, কৃষ্ণ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়দের বিবাহের নানারূপ নিয়ম আছে, কন্যাকে বলপূর্বক লইয়া গিয়া বিবাহ করা তাহার মধ্যে একটি। কৃষ্ণ বলিলেন, 'এ নিয়মটি আমার বেশ লাগে। কেন, ইহাতে বুঝা যায় যে বর খুব বীরপুরুষ আর কন্যার জন্য সে অনেক বিপদ আর পরিশ্রম সহ্য করিতে প্রস্তুত।'

সুতরাং স্থির হইল যে, যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পাইলে অর্জুন সুভদ্রাকে জোর করিয়া বিবাহ করিবেন।

যুধিষ্ঠিরের অনুমতি সহজেই পাওয়া গেল, এখন বিবাহ হইলেই হয়। এ বিষয়ের সকল কথা কৃষ্ণ আর অর্জুন দুজনে ঠিক করিলেন, দ্বারকার আর কেহ জানিতে পারিল না।

ইহার মধ্যে একদিন সুভদ্রা রৈবতক পর্বতে দেবতার পূজা করিতে গিয়াছেন। অর্জুন দেখিলেন এই তাঁহার সুযোগ। তিনি তাড়াতাড়ি যুদ্ধের বেশে অস্ত্র-শস্ত্র হাতে সুন্দর রথে চড়িয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুভদ্রার পূজা-অর্চনা শেষ হইয়াছে, এখন দ্বারকায় ফিরিতে হইবে, এমন সময় অর্জুন আসিয়া তাঁহাকে রথে তুলিয়া দে ছুট। সঙ্গের লোকেরা তখন মহাকোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। কেহ দ্বারকায় সংবাদ দিতে যায়, কেহ প্রহরীদিগকে ডাকে, আর সকলে খালি হাউ-মাউ আর ছুটাছুটি করে!

এদিকে দ্বারকার বড়-বড় বীরেরা রাগে অস্থির। 'এত বড় আস্পর্ধা! আমাদিগের এমন অপমান?' এই বলিয়া তাঁহারা সকলে বর্ম-চর্ম লইয়া রথ সাজাইয়া প্রস্তুত! বলরাম তো এতই রাগিয়াছেন যে, সেইদিনেই-বা সকল কৌরব মারিয়া শেষ করেন।

এমন সময় কৃষ্ণ বলিলেন, 'তোমরা যে চটিয়াছ, বল দেখি অর্জুনের কি দোষ? ক্ষত্রিয়েরা তো এইরূপ বিবাহকেই খুব ভালো বিবাহ মনে করে, অর্জুন তাহাই করিয়াছেন। অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিবেন ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত সুখেরই কথা। আর তিনি বীরপুরুষ, সুতরাং জোর দেখানো তাঁহার মতো লোকের উপযুক্ত কাজই হইয়াছে। তোমরা যে ইহাতে অপমান মনে করিতেছ, অপমান কিসে হইবে, জান? যদি অর্জুন সুভদ্রাকে লইয়া দেশে চলিয়া যায়, তবেই অপমান। আর সে কেমন বীর, তাহাও তো জান। জোর করিয়া তাহাকে কিছুতেই আটকাইতে পারিবে না। আমার কথা যদি শুন, তবে এই বেলা তাঁহাকে মিষ্ট কথায় খুশি করিয়া ফিরাও। তাহাকে ঘরে আনিয়া আদর করিয়া বিবাহ দাও। তাহা হইলে আর অপমানের কথা থাকিবে না, আনন্দের কথা হইবে।'

কৃষ্ণের কথায় যাদবেরা[১] তাড়াতাড়ি অর্জুনকে মিষ্ট কথায় ডাকিয়া ফিরাইলেন। তারপর ধুমধামের সহিত তাঁহার আর সুভদ্রার বিবাহ হইল।

বিবাহের পর অর্জুন দ্বারকা হইতে পুরুষতীর্থে যান। এইরূপে ক্রমে তাঁহার বারো বৎসর বনবাস শেষ হওয়াতে তিনি সুভদ্রা এবং কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে চলিয়া আসিলেন। সেখানে কয়েকদিন খুব আনন্দেই কাটিল। তারপর কৃষ্ণ ছাড়া যাদবদিগের আর সকলে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর একদিন কৃষ্ণ আর অর্জুন, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতিকে লইয়া যমুনার ধারে বেড়াইতে যান। সেখানে সকলেই আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ আর অর্জুন খানিক দূরে একটি নির্জন স্থানে বসিয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

এমন সময় জটাধারী (অর্থাৎ মাথায় জটা আর গাছের ছাল পরা) আর পিঙ্গল বর্ণের দাড়ি-গোঁফওয়ালা এই লম্বা এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার

[১] অর্থাৎ কৃষ্ণ যে বংশে জন্মিয়াছেন সেই বংশের লোকেরা; ইহাদের পূর্বপুরুষের নাম ছিল যদু। তাই ইহারা সকলে যাদব।

রঙ কাঁচা সোনার মতো, আর তেজ প্রভাতের সূর্যের মতো।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, আমার একটু বেশি করিয়া খাওয়া অভ্যাস। আপনাদের নিকট আমি কিছু জলযোগের প্রার্থনা করি।'

কৃষ্ণ আর অর্জুন বলিলেন, 'আপনি কি খাইতে চাহেন বলুন, আমরা আনিয়া দিতেছি।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মিঠাই মন্ডা, ভাত ব্যঞ্জন আমি কিছুই খাই না! আমি খান্ডব নামক বনটিকে খাইব, আপনারা তাহারই উপায় করিয়া দিন।"

কি অদ্ভুত জলযোগ! আর ব্রাহ্মণটিও যে কম অদ্ভুত নহেন, তাহা তাঁহার পরিচয় শুনিলেই বুঝিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি অগ্নি। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, খান্ডব বনটাকে খাই! কিন্তু সেই বনে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক নাগ আর তাহার পরিবার থাকাতে, আমি সেখানে গেলেই ইন্দ্র বৃষ্টি ফেলিয়া আমাকে নিবাইয়া দেন। তাই আমি আপনাদের নিকট আসিয়াছি। আপনারা যদি বৃষ্টি থামাইয়া আর বনের জন্তুগুলিকে আটকাইয়া রাখিতে পারেন, তবে আমার কিঞ্চিৎ ভোজন হয়।"

ব্যাপারখানা কি জান? শ্বেতকী বলিয়া এক রাজা ছিলেন, তাঁহার প্রধান কাজ ছিল কেবল যজ্ঞ করা। সে কি যেমন-তেমন যজ্ঞ? তাঁহার যজ্ঞে খাটিয়া খাটিয়া মুনিরা রোগা হইয়া গেলেন, ধোঁয়ায় তাঁহাদের চোখে ছানি পড়িল, শেষে আর না পারিয়া তাঁহারা রাজার কাজই ছাড়িয়া দিলেন।

ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শ্বেতকী শিবের তপস্যা আরম্ভ করাতে, শিব বলিলেন, "তুমি বারো বৎসর ক্রমাগত অগ্নিকে ঘি খাওয়াইয়া খুশি কর, তারপর দেখা যাইবে।"

রাজা ক্রমাগত বারো বৎসর অগ্নিকে ঘি খাওয়াইলেন। তাহাতে শিব সন্তুষ্ট হইয়া দুর্বাশা মুনিকে দিয়া তাঁহার যজ্ঞ করাইয়া দিলেন।

রাজার যজ্ঞ হইল বটে, কিন্তু এত ঘি অগ্নির সহ্য হইল না। তাঁহার পেট ভার হইল, ক্ষুধা মরিয়া গেল, কাজেই তখন বেচারা ব্যস্তভাবে ব্রহ্মার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "এত ঘি খাইয়াছ, তাই তোমার মন্দাগ্নি হইয়াছে (অর্থাৎ ক্ষুধা চলিয়া গিয়াছে)। এখন খুব খানিকটা মাংস খাও গিয়া, তবেই সারিয়া যাইবে। খান্ডব বনে অনেক জন্তু থাকে, সেটাকে পোড়াইতে পার তো তোমার কাজ হয়!"

অগ্নি তখনই খান্ডব বনে চলিয়া আসিলেন। সেখানে আসিয়া তাঁহার কিরূপ দশা হইয়াছিল, তাহা শুনিয়াছ। তিনি কেবল ইন্দ্রের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু সেই বনের জন্তুরাও তাঁহাকে কম নাকাল করে নাই। সেখানকার হাতি-গুলি শুঁড়ে করিয়া জল ঢালিয়া তাঁহাকে নিবাইয়া দিল। অন্য জন্তুরাও তাঁহার কতই দুর্গতি করিল। সাতবার সেই বন পোড়াইতে গিয়া, সাতবারই তিনি এইরূপে জব্দ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

শেষে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, " তুমি কৃষ্ণ আর অর্জুনের কাছে যাও, তাঁহারা চেষ্টা করিলে ইন্দ্রকেও আটকাইতে পারেন, জন্তুদিগকেও থামাইয়া রাখিতে পারেন!" তারপর কি হইয়াছে তোমরা জান।

অগ্নির কথা শুনিয়া অর্জুন বলিলেন, "আমার তেমন ভালো ধনুক বা রথ নাই, আর কৃষ্ণের হাতেও অস্ত্র নাই। আমাদিগকে এ-সকল জিনিস আনিয়া দিলে আমরা অপনার কাজ করিতে প্রস্তুত আছি।"

এ কথায় অগ্নি বরুণের নিকট হইতে গাণ্ডীব নামক ধনুক, অক্ষয় তূণ ও কপিধবজ নামক রথ আনিয়া অর্জুনকে দিলেন। সেই রথের উপরে এক ভয়ংকর বানরের মূর্তি থাকাতে উহার 'কপিধ্বজ' নাম হয়। অতি আশ্চর্য রথ, বিশ্বকর্মার তৈরি, ঘোড়াগুলি গন্ধর্বের দেশের! আর ধনুকের কথা কি বলিব? নিজে ব্রহ্মা উহা প্রস্তুত করেন। অর্জুন সে ধনুকের গুণ চড়াইবার সময় তাহার ভীষণ শব্দে ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিল।

অগ্নি অর্জুনকে এই-সকল জিনিস আর কৃষ্ণকে সুদর্শন নামক একখানি চক্র (অর্থাৎ চাকার ন্যায় অস্ত্র) আর কৌমদকী নামক একটি গদা দিলেন। সে চক্রকে কিছুই আটকাইতে পারে না। যাহাকে মারিবে, তাহার আর রক্ষা নাই। চক্র তাহাকে বধ করিয়া আবার হাতে ফিরিয়া আসিবেই আসিবে। অস্ত্র পাইয়া কৃষ্ণ আর অর্জুন অগ্নিকে বলিলেন, "আচ্ছা, তবে এখন আপনি গিয়া বন পোড়াইতে থাকুন। আমরা আপনার সাহায্য করিতেছি।"

অমনি খান্ডব বনের চারিদিকে ভয়ানক আগুন জ্বলিয়া উঠিল। খান্ডব দহনেব (অর্থাৎ খান্ডব পোড়ানোর) ন্যায় ভয়ানক অগ্নিকান্ড খুব কমই হইয়াছে। আগুনের শিখা হড়্-হড়্ ঘড়্-ঘড়্ গর্জনে আকাশ ছুঁইয়া ফেলিল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে পর্বতাকার কালো ধোঁয়া উঠিয়া দিনকে অমাবস্যার রাত্রির মতো করিয়া দিল। জীব-জন্তু সকলে চিৎকার করিতে করিতে উধর্বশ্বাসে ছুটিয়াও কৃষ্ণ আর অর্জুনের ভয়ে পলাইতে পারিল না। কৃষ্ণের চক্র এমনি যে, কোনো জন্তু বাহিরে দেখা দিতে না দিতেই সে তাহাকে কাটিয়া দুইখান করে। অর্জুনের তীর এমনি যে, ফড়িংটিকে পযন্ত উড়িয়া পলাইতে দেয় না। তাঁহার রথ সে সময়ে এমনি বেগে সেই বনের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, উঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া দেখিতেই পাওয়া যায় না। কত জন্তু, কত পাখি যে পুড়িয়া মরিল, তাহা ভাবিয়াও শেষ করা যায় না! খাল-বিলের জল টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল, মাছ, কচ্ছপ, কুমির সকলই সিদ্ধ হইয়া গেল। আগুনের শব্দ আর জন্তুদিগের চিৎকার মিলিয়া ঝড় বজ্রপাত আর সমুদ্রের গর্জনকেও হারাইয়া দিল।

আগুনের তেজে দেবতারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিলেন, "হে ইন্দ্র! আজ অগ্নি কিজন্য পৃথিবীকে ভস্ম করিতে গিয়াছেন? আজ কি সৃষ্টির শেষ দিন উপস্থিত?"

তাঁহাদের কথায় ইন্দ্র অমনি উনপঞ্চাশ পবন আর ঘোরতর কালো মেঘ সকলকে লইযা আগুন নিবাইতে চলিলেন। কিন্তু সে আগুনের তেজে তাঁহার মেঘ-বৃষ্টি আকাশেই শুষিয়া গেল। মেঘ হারিলে ইন্দ্র মহামেঘদিগকে ডাকিলেন—যাহারা মনে করিলে ব্রহ্মান্ড তল করিয়া দিতে পারে। কিন্তু সেই সাংঘাতিক মেঘও অর্জুনের বাণে উড়িয়া গেল।

সেই বনে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক সাপের বাড়ি। তক্ষক তখন বাড়ি ছিলেন না, কিন্তু তাহার স্ত্রী-পুত্র ছিলেন। তক্ষকের পুত্র অশ্বসেনের মা তো পুড়িয়া মারাই গেলেন। ইহার মধ্যে ইন্দ্র একবার ফাঁকি দিয়া অর্জুনকে অজ্ঞান করিতে পারিয়াছিলেন, তাই রক্ষা নহিলে অশ্বসেনকেও তাঁহার মায়ের সঙ্গেই যাইতে হইত।

বৃষ্টি করিয়া, বাজ ফেলিয়া, পর্বত ছুঁড়িয়া কিছুতেই ইন্দ্র কৃষ্ণ আর অর্জুনকে জব্দ করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রের পর্বত অর্জুনের বাণে ফাটিয়া খন্ড খন্ড হইল, তখন বোধ হইল, যেন আকাশের গ্রহগুলি ছুটিয়া পড়িতেছে!

দেবতাদের বড় খোলা মন। তাই ইন্দ্র যখন দেখিলেন যে তিনি কিছুতেই কৃষ্ণ আর অর্জুনকে আঁটিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

তখন খান্ডব বন পোড়াইতে কোনো বাধাই রহিল না। সেই ভয়ানক আগুনের হাত হইতে কেবল ছয়টি প্রাণী রক্ষা পাইয়াছিল।

এই ছয়টির একটি অবশ্য অশ্বসেন, আর-একটি ময় নামক দানব। এই ব্যক্তি হাত জোড় করিয়া অর্জুনকে এমনি মিনতি করিতে লাগিল যে, অর্জুন দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

আর চারিটি প্রাণী চারিটি বকের ছানা। ইহাদিগকে অগ্নি দয়া করিয়া পোড়ান নাই।

খান্ডব বন খাইয়া অগ্নির অসুখ ছাড়িয়াছিল কি না, তাহা মহাভারতে লেখা নাই। সে যাহা হউক, তিনি ভোজন শেষ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। ইন্দ্র যে কৃষ্ণ আর অর্জুনের উপর খুব খুশি হইয়াছিলেন, এ কথা তো আগেই বলিয়াছি। তিনি বলিলেন, "তোমরা যাহা করিলে দেবতারাও তাহা করিতে পারেন না। এক্ষণে তোমরা কি বর চাও?"

তাহাতে অর্জুন বলিলেন, "আমাকে সকলরকম অস্ত্র দিন, এই আমার প্রার্থনা।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তুমি তপস্যা করিয়া শিবকে তুষ্ট কর। তাহা হইলেই আমি অস্ত্র দিব।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জুনের সহিত আমার বন্ধুতা যেন চিরদিন থাকে।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তথাস্তু।" (অর্থাৎ "তাহাই হউক")।

তারপর অগ্নি, কৃষ্ণ আর অর্জুনের অনেক প্রশংসা করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, আর কৃষ্ণ, অর্জুন এবং ময়দানব যমুনার ধারে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

সভাপর্ব

অগ্নি আর ইন্দ্র চলিয়া গেলে পরে ময়দানব জোড়হাতে অর্জুনকে বলিলেন, "আপনি আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, অনুমতি করুন, আমি আপনার কি উপকার করিব?"

অর্জুন বলিলেন, "তুমি কৃষ্ণের কোনো কাজ করিয়া দাও, তবে আমাদেব উপকার হইবে।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন একটা সভা-ঘর করিয়া দাও যে আর কেহ তেমন করিতে না পাবে।"

ময় সন্তোষেব সহিত এ কথায় রাজি হইল। তারপর কৃষ্ণ আব অর্জুন তাহাকে সঙ্গে করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট লইযা গেলেন। সেখানে অবশ্য তাহাব আদব যত্নেব কোনো ত্রুটি হইল না।

তাবপব সভা-গৃহেব আযোজন আবম্ভ হইল। সভাটি যে কিরূপ তাহা ইহাতেই বুঝিতে পারিবে যে, সেটি পাঁচহাজার হাত লম্বা ছিল। এমন সভাব আয়োজন কি যেখানে সেখানে মিলে? এ দেশে সে-সব জিনিস জন্মায়ই না। বহুকাল পূর্বে দানবরাজ বৃষপর্বা যজ্ঞেব জন্য কৈলাস পবর্তেব উত্তরে এই ময়কে দিযাই এক অতি আশ্চর্য সভা প্রস্তুত করান। যুধিষ্ঠিরের সভার জন্য ময় সেই সভার মণি-মুক্তা আর স্ফটিক লইয়া আসিল। সেখানে বিন্দু সরোবর নামে একটি সরোবরেব ভিতরে বৃষপর্বার সোনাব গদা আর বরুণের দেবদত্ত নামক বিশাল শঙ্খও ছিল।

ময় ভীমের জন্য সেই গদা আর অর্জুনের জন্য বরুণের শঙ্খটিও আনিতে ভুলিল না।

চৌদ্দ মাসে সভা-ঘর প্রস্তুত হইল। সে সভা কিরূপ সুন্দর হইয়াছিল তাহা আমি কি বলিব! ইঁটের বদলে তাহা স্ফটিক দিয়া গাঁথা। সেই স্ফটিকের উপরে সূর্যের আলোক পড়িয়া না জানি কেমন ঝক্-ঝক্ করিত! সেখানে বাগান তো ছিলই, তাহার গাছপালা ছিল সোনার, ফুল মণি-মাণিক্যের। আর ভিতরের সাজ কাজ, সে-যে কি আশ্চর্যরকমের ছিল, তাহা বুঝাইব কি, আমিই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি তো গরিব মানুষ, বড়-বড় রাজাদেরই তাহাতে ধোঁকা লাগিয়া গিয়াছিল। স্ফটিকের পুকুর দেখিয়া তাঁহারা তাহাকে পুকুর বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা গিয়াছিলেনতাহার উপর দিয়া হাঁটিতে। তারপর একটা হাসির কাণ্ড হইয়া গেলে তবে বুঝিলেন যে উহা জল।

এমনি সুন্দর বাড়ি, এমনি সুন্দর বাগান, আর তাহাতে তেমনি সুন্দর মাছের খেলা, ফুলের গন্ধ আর পাখির গান। বুঝিয়া লও, সভাটি কেমন ছিল। আটহাজার বিকট রাক্ষস সেই সভায় পাহারা দিত।

সভা দেখিয়া পান্ডবেরা খুশি হইবেন তাহা আশ্চর্য কি? তেমন সভা খালি স্বর্গেই আছে, পৃথিবীতে তেমন আর কেহ দেখে নাই। পৃথিবীর রাজা-রাজড়া, মুনি-ঋষি, ইঁহারা সকলেই সে সভা দেখিতে আসিলেন। স্বর্গ হইতে নারদ, পারিজাত, রৈবত, সুমুখ,ধৌম্য প্রভৃতি দেবর্ষিরা অবধি সভা দেখিতে আসিবার লোভ সামলাইতে পারিলেন না।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের আর ব্রহ্মার সভার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য সংবাদ শুনাইলেন। ইহা ছাড়া মহারাজ পান্ডুরও দু-একটি সংবাদ ছিল। স্বর্গ হইতে আসিবার সময় মহারাজ পান্ডুর সহিত তাঁহার দেখা হয়। তখন পান্ডু তাঁহাকে বলেন, "মহর্ষি! আপনি পৃথিবীতে যাইতেছেন, যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন, যেন রাজসূয় যজ্ঞ করে। রাজসূয় যজ্ঞের গুণে রাজা হরিশ্চন্দ্র ইন্দ্রের সভায় কত সুখে বাস করিতেছেন। যুধিষ্ঠির সে যজ্ঞ করিলে আমিও সেইরূপ সুখে সেখানে থাকিতে পাইব।"

নারদ যুধিষ্ঠিরকে এই সংবাদ দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

রাজসূয় অতি কঠিন যজ্ঞ। পৃথিবীর তাবৎ রাজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তাহার দ্বারা এই যজ্ঞ করিতে হয়, সুতরাং এই যজ্ঞে বাধা দিতে অন্য রাজারা বিধিমতে চেষ্টা করে। নিজের বল-বুদ্ধি আর বন্ধু-বান্ধব খুব বেশিরকম না থাকিলে ইহা করা সম্ভবই হয় না। কাজেই রাজসূয়ের কথা শুনিয়া পান্ডবেরা বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। এ যজ্ঞ না করিলেই নয়, অথচ কাজটি ভারি কঠিন।

বল-বুদ্ধি পান্ডবদের যথেষ্ট, বন্ধু-বান্ধবেরও অভাব নাই। যুধিষ্ঠিরকে সকলে প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসে। ভীম অর্জুনের সাহস আর ক্ষমতায় প্রজার সকল ভয় দূর হইয়াছে, শত্রুরা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। নকুলের ন্যায়বিচারে আর সহদেবের মিষ্ট ব্যবহারে লোক মোহিত। সুতরাং এ সকল বিষয়ে পান্ডবদের বেশ ভরসার কথাই ছিল। মন্ত্রীরা একবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞ করিতে উৎসাহ দিলেন।

কিন্তু ইঁহাদের কথায় যুধিষ্ঠিরের চিন্তা দূর হইল না। পরামর্শ দিবার একটি লোক আছেন—কৃষ্ণ। তিনি বলিলে তবে একাজে হাত দেওয়া যায়। এই ভাবিয়া যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে আনাইলেন।

কৃষ্ণ আসিলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তুমি কি বল? আর সকলে তো খুবই উৎসাহ দিতেছে, কিন্তু ইহাদের কথায় আমার ভরসা হয় না। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমি বুঝিব ঠিক।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "মহারাজ! আপনি রাজসূয় করিবার উপযুক্ত লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে ভয়ের একটা কথা আছে। মগধের রাজা জরাসন্ধের এখন অসাধারণ ক্ষমতা। পৃথিবীর সকল রাজাকে সে পরাজয় করিয়াছে। শিশুপাল উহার সেনাপতি, সেও একজন অসাধারণ যোদ্ধা। তারপর বক্র, ভগদত্ত, শল্য, পৌন্ডক, ভীষ্মক, প্রভৃতি অনেক বড় যোদ্ধা উহার বন্ধু। উহার ভয়ে কত শত রাজা যে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এমন-কি, আমরা নিজে ইহার ভয়ে মথুরা ছাড়িয়া দ্বারকায় আসিয়া বাস করিতেছি। অনেক রাজাকে ধরিয়া আনিয়া দুষ্ট তাহার দুর্গের ভিতরে বন্দী করিয়াছে। এ

ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার রাজসূয় হওয়া অসম্ভব। ইহাকে আগে মারিয়া বন্দী রাজাদিগকে ছাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করুন, নহিলে রাজসূয় করিতে পারিবেন না।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এই জরাসন্ধকে লইয়া তো বড় মুস্কিল দেখিতেছি, তুমি নিজে উহাকে এত ভয় কর, আমাদের সাহস কিসে হইবে? তুমি, বলরাম, ভীম আর অর্জুন, এই চারিজনের কেহ কি উহাকে মারিতে পার না?"

ইহা শুনিয়া ভীম বলিলেন, "কৃষ্ণের বুদ্ধি আছে, আমার বল আছে, আর অর্জুনের সাহস আছে। আমরা তিনজনে মিলিয়া জরাসন্ধকে বধ করিব।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "জরাসন্ধ ছিয়াশিটি বড়-বড় রাজাকে আনিয়া ছাগলের মতো বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আর চৌদ্দটিকে আনিতে পারিলেই একশতটি হয় তখন উহাদিগকে বলি দিবে। এই-সকল রাজাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করা উচিত হইতেছে। যে জরাসন্ধকে মারিয়া এ কাজ করিতে পারিবে, সে সম্রাট হইতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমি সম্রাট হওয়ার লোভে তোমাদিগকে এমন বিপদে ফেলিতে পারিব না। আমার রাজসূয়ে কাজ নাই।"

এই সময়ে অর্জুন সেখানে আসিলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা ভালো ভালো অস্ত্র পাইয়াছি, আমাদের বলও যথেষ্ট আছে। এ-সব থাকিতে শত্রুর সামনে চুপ করিয়া থাকা ভালো নহে। আমরা যুদ্ধ করিব।"

জরাসন্ধ মগধের রাজা, উহার পিতার নাম বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের দুই রানী ছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত উঁহাদের সন্তান না হওয়ায় রাজার মনে বড় দুঃখ ছিল। ইহার মধ্যে একদিন মহর্ষি চণ্ডকৌশিক রাজবাড়ির নিকটে এক আম গাছের তলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এ কথা শুনিবামাত্র রাজা মুনির নিকটে গিয়া তাঁহার অনেক সেবাপূর্বক নিজের দুঃখের কথা জানাইলেন। তখন মুনি ধ্যানে বসিতেই গাছ হইতে একটি সুন্দর আম তাঁহার কোলের উপর পড়িল। সেই আমটি রাজাকে দিয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ, রানীরা এই আম খাইলেই তোমার পুত্র হইবে।"

দুই রানী সেই আমটিকে ভাগ করিয়া খাইলেন। ইহাতে তাঁহাদের দুজনের দুটি ছেলে হইল বটে, কিন্তু সে অতি অদ্ভুতরকমের ছেলে। তাহাদিগকে মানুষ বলা যায় না, আধখানা মানুষ বলিতে হয়। একখানা করিয়া পা, একটি মাত্র হাত, একটি চোখ, একটি কান, আধখানি মাথা, আধখানি শরীব। এমন ছেলে দিয়া কি হইবে? কাজেই তাহাদিগকে কাপড়ে মুড়িয়া চৌমাথায় ফেলিয়া দেওয়া হইল।

জরা নামে এক রাক্ষসী সেই দুইখানি অর্ধেক ছেলে কুড়াইয়া পায়। রাক্ষসী ভাবিল, দুটাকে এক সঙ্গে জড়াইয়া লইলে বহিবার সুবিধা হইবে। এই ভাবিয়া যেই সে দুই অর্ধেক একত্র করিয়াছে, অমনি তাহা জুড়িয়া একটি ছেলে হইয়া গেল। বজ্রের মতো শক্ত প্রকাণ্ড খোকা, রাক্ষসী তাহাকে কি সহজে বহিয়া নিতে পারে? সে খোকা আস্ত হইয়াই হাতের মুঠি মুখে ঢুকাইয়া ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাইতে আরম্ভ করিল!

খোকার সেই ভয়ংকর চিৎকার শুনিয়া রাজা, মন্ত্রী, লোকজন সকলে সেখানে ছুটিয়া আসিল। রাক্ষসীও ছেলেটি অমনি রাজাকে দিয়া বলিল, "এই নাও, তোমার ছেলে।"

সেই ছেলেই জরাসন্ধ (অর্থাৎ জরা যাহাকে জুড়িয়াছিল)। বড় হইয়া সেই বড়ই

ভয়ংকর লোক হইয়াছে। হংস আর ডিম্ভক নামক দুইবীর তাহার বন্ধু ছিল। এই তিনজন একত্র হইলে ত্রিভুবন জয় করিতে পারিত।

হংস আর ডিম্ভকের ভালোবাসার কথা বড় সুন্দর। হংস নামক আর একজন লোকের মৃত্যুর কথা শুনিয়া ডিম্ভক ভাবিল, বুঝি তাহার বন্ধুই মরিয়া গিয়াছে। সেই দুঃখে সে যমুনায় ডুবিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। সে সংবাদ পাইয়া হংসও যমুনায় ডুবিয়া মারা গেল।

মগধের চারিধারে বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামে পাঁচটি প্রকান্ড পর্বত থাকাতে সৈন্য লইয়া গিয়া সে দেশ জয় করা একেবারে অসম্ভব তাহার উপরে আবার জরাসন্ধ নিজে এমন বীর আর তাহার এত সহায়। এইজন্য কৃষ্ণ বলিলেন যে, উহাকে অন্য উপায়ে মারিতে হইবে। কৃষ্ণ, ভীম আর অর্জুন এই তিনজন সাধারণ লোকের মতো মগধ দেশে গেলে সহজেই জরাসন্ধের দেখা পাওয়াব কথা। তখন ভীম যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মারিবেন।

এইরূপে পরামর্শের পর তিনজনে স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা ক্রমে কুরুজাঙ্গল দেশে, তারপর গন্ডকী, সরযূ নদী পার হইয়া কোশলায়, সেখান হইতে মিথিলায়, মিথিলা হইতে মালয়, তারপর চর্মন্বতী, গঙ্গা আর শোন পার হইয়া শেষে মগধে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরের সিংহদ্বারের পাশেই একটি সুন্দর চৈত্য (জয়স্তম্ভ) আর তিনটা বিশাল দুন্দুভি (ডঙ্কা) ছিল। সেখানে আসিয়া তাঁহাদের প্রথম কাজই হইল সেই জিনিসগুলিকে চুরমার করা। তারপর তাঁহারা খুব খুশি হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজপথের দুইধারে ময়রা, সওদাগর, মালাকর প্রভৃতির দোকান ছিল, তাহা হইতে জোর করিয়া মালা লইয়া তাঁহারা গলায় পরিলেন! এ-সকল কান্ড দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, না জানি ইঁহারা কে!

এইরূপে ক্রমে তাঁহারা জরাসন্ধের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ ভাবিয়া অনেক আদর-যত্ন করিল। কিন্তু ভীম আব অর্জুন তাহার কোনো কথার উত্তর দিলেন না। কৃষ্ণ বলিলেন, "ইহাঁদের নিয়ম আছে, এখন কথা কহিবেন না। দুই প্রহর রাত্রির সময় আপনার সহিত ইঁহাদের কথাবার্তা হইবে।"

রাত্রি দুই প্রহরের সময় জরাসন্ধের সহিত কথাবার্তা আরম্ভ হইলে জরাসন্ধ বলিল, "আপনাদের পোশাক স্নাতক ব্রাহ্মণের মতো। কিন্তু স্নাতক ব্রাহ্মণেরা তো এমন সময়ে মালা-চন্দন পরেন না। আপনাদের হাতে ধনুর্গুণের দাগ দেখিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়াই বোধ হয়। অথচ আপনারা ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়াছেন, আবার চৈত্যটি ভাঙিয়াছেন! আমি আদর-যত্ন করিলাম তাহারও আপনারা ভালো করিয়া উত্তর দেন নাই! যাহা হউক, আপনারা কিজন্য আসিয়াছেন?"

কৃষ্ণ বলিলেন, "স্নাতক তো ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যেরাও হইতে পারে, আমাদিগকে ব্রাহ্মণ মনে করিবার প্রয়োজন কি? মালা পরিলে দেখায় ভালো, তাই আমরা মালা পরিয়াছি। গায়ের জোর দেখানো ক্ষত্রিয়ের উচিত কাজ, তাই কিছু দেখাইয়াছি, আপনার দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে আজই আরো ভালো করিয়া দেখিতে পাইবেন। শত্রুর ঘরে আসিয়া তাহার নিকট হইতে আদর লওয়া আমরা ভালো মনে করি না, তাই আপনার আদর-যত্নের উত্তর দেই নাই।"

এ কথায় জরাসন্ধ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি করিয়া আপনাদের শত্রু হইলাম তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না! আপনাদের বোধহয় ভুল হইয়া থাকিবে।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে ধরিয়া বলি দিতে আনিয়াছ, সুতরাং তুমি সকল ক্ষত্রিয়েরই শত্রু। তাই তোমাকে বধ করিতে আসিয়াছি। আমরা ব্রাহ্মণ নহি! আমি বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ, আর ইঁহারা দুজন মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র। এখন, হয় এই-সকল রাজাদিগকে ছাড়িয়া দাও, না হয় আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যমের বাড়ি যাও।"

জরাসন্ধ বলিল, "আমি যাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছি, তাহাদিগকে লইয়া আমার যাহা খুশি করিব। আমি কাহাকেও ভয় করি না। আমি একেলা দুই তিন মহারথীর (খুব বড় বীরের) সহিত যুদ্ধ করিতে পারি।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "আমাদের কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে?"

জরাসন্ধ ভীমকে দেখাইয়া বলিল, "ইহার সহিত।"

তখন পুরোহিত আসিয়া স্বস্ত্যয়ন (জরাসন্ধের মঙ্গলের জন্য দেবতার পূজা) করিলে, জরাসন্ধ বর্ম আঁটিয়া, চুল বাঁধিয়া, বলিল, "আইস ভীম! যুদ্ধ করি।"

তারপর দুজনে কি ভয়ানক যুদ্ধই আরম্ভ হইল! যতরকম কুস্তির প্যাঁচ আছে, সমস্তই দুজন দুজনের উপর খাটাইলেন। ঝড়ের মতন করিয়া তাঁহাদের নিশ্বাস বহিতে লাগিল. কপালে কপালে ঠেকিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল।

তেরো দিন এইরূপ যুদ্ধের পর চৌদ্দ দিনের রাত্রিতে জরাসন্ধ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ বলিলেন "আহা! বড় কাহিল হইয়া পড়িয়াছ! ভীম, আর মারিও না, তাহা হইলে মরিয়া যাইবে! "

আসল কথা ভীমকে জানাইয়া দেওয়া যে জরাসন্ধ কাহিল হইয়াছে। তাহা বুঝিতে পারিয়া ভীম বলিলেন, "হতভাগা এমনি কাপড় জড়াইয়াছে যে উহাকে বধ করা কঠিন দেখিতেছি।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমার জোর একবার ভালো করিয়া দেখাও না।"

তখন ভীম আগে জরাসন্ধকে শূন্যে তুলিয়া একশত পাক ঘুরাইলেন। তারপর হাঁটু দিয়া তাহার পিঠ ভাঙ্গিলেন। শেষে দুই পা ধরিয়া তাহাকে দুই ভাগে চিরিয়া ফেলিলেন। সে সময়ে জরাসন্ধের চিৎকারে অতি অল্প লোকই টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল।

আর সেই বন্দী রাজাদের কথা কি বলিব? তাঁহারা দারুণ অপমান আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, ইহার মধ্যে হঠাৎ তাঁহাদের সকল দুঃখ দূর হইয়া গেল। তাঁহারা কৃষ্ণ, ভীম আর অর্জুনের অশেষ স্তুতি করিয়া জোড়হাতে বলিলেন, "এখন আপনাদের এই ভৃত্যেরা আপনাদের কি সেবা করিবে, অনুমতি করুন।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে চাহেন, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া তাহাতে সাহায্য করিবেন।"

রাজারা পরম আনন্দের সহিত এ কথায় সম্মত হইলেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব কৃষ্ণ আর ভীমার্জুনকে বিস্তর ধনরত্ন উপহার দিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন,"আমিও যজ্ঞে সাহায্য করিব।" তাঁহারা তাঁহাকে মগধের সিংহাসনে বসাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিলেন।

তারপর যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ হইল। রাজাদিগের নিকট হইতে কর আনাই প্রথম

কাজ। এজন্য মহাবীর চারি ভাই অসংখ্য সৈন্য লইয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলিলেন। অর্জুন উত্তরে, ভীম পূর্বদিকে, সহদেব দক্ষিণে, নকুল পশ্চিমে।

অর্জুন ক্রমে কুলিন্দ, কালকূট, আনর্ত, শাকলদ্বীপ প্রভৃতি জয় করিয়া শেষে প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার রাজা ভগদত্ত কিরাত, চীন ও সাগরপারী সৈন্য লইয়া আটদিন তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। তারপর অর্জুনের ক্ষমতা আর সাহসে আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "আমি ইন্দ্রের বন্ধু! লোকে বলে, আমার ইন্দ্রের সমান ক্ষমতা। কিন্তু তবুও তো তোমাকে কিছুতেই আটিতে পারিতেছি না! তুমি কি চাও?"

অর্জুন বলিলেন, "আপনি ইন্দ্রের বন্ধু, সুতরাং আমার গুরু লোক। আপনাকে কি আমি কিছু বলিতে পারি? আপনি স্নেহ করিয়া কিছু কর দিন।"

ভগদত্ত অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "কর তো দিবই। আর কি করিতে হইবে বল।"

এইরূপে ভগদত্তকে বশ করিয়া, অর্জুন আবার উত্তর দিকে চলিলেন। অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, উলূক, কাশ্মীর, ত্রিগর্ত, দারু, কোকনাদ, বাহ্লিক, দরদ, কাম্বোজ, লোল, পরম, ঋষিক প্রভৃতি কত দেশ জয় হইল, করই-বা কতরকম আদায় হইল। হিমালয় পর্বতের ওপারে কিম্পুরুষবর্ষ, হাটক প্রভৃতি কোনো দেশ হইতেই কর না লইয়া ছাড়া হইল না। তারপর অর্জুন উত্তর কুরুদেশে উপস্থিত হইলেন, সে অতি অদ্ভুত দেশ, সেখানে কোথায় কি আছে, কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং যুদ্ধ কি করিয়া হইবে? সেখানে তিনি উপস্থিত হইবামাত্র পর্বত প্রমাণ প্রহরীগণ আসিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিল, "আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিয়াছি যে আপনি সামান্য মানুষ নহেন। ইহাতেই আপনার এ দেশ জয় করা হইয়াছে। এখন আপনার কি চাই বলুন, আমরা তাহাই দিতেছি।"

অর্জুন বলিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য আমাকে কিছু কর দিলেই হইবে, আমি আর কিছু চাহি না।"

এই কথা শুনিয়াই উহারা নানারূপ আশ্চর্য কাপড় আর হরিণের ছাল প্রভৃতি আনিয়া অর্জুনের নিকট উপস্থিত করিল। এইরূপে ক্রমে সমস্ত উত্তর দিক জয় করিয়া অর্জুন কত ধনরত্ন যে দেশে আনিলেন, তাহার লেখাজোখা নাই।

ভীম পূর্বদিকে গিয়া, পাঞ্চাল, বিদেহ, গন্ডক, দশার্ণ, অশ্বমেধ, পুলিন্দ, চেদী, কুমার, কোশল, অযোধ্যা, গোপালকক্ষ, মল্ল, প্রভৃতি অল্পদিনের ভিতরেই জয় করিয়া ফেলিলেন। ভল্লাট, শক্তিমান, বৎসদেশ, ভর্গ প্রভৃতি আরো কত দেশ দেখিতে দেখিতে তাঁহার বশে আসিল। কর্ণকেও যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কর আনিতে বাকি রইল না। এইরূপে মণি-মুক্তা, চন্দন, কাপড়, কম্বল, সোনা, রূপা প্রভৃতি নানারূপ জিনিস আনিয়া ভীম ভান্ডার বোঝাই করিয়া ফেলিলেন।

সহদেবও সমস্ত দক্ষিণদিক জয় করিয়া কর আনিলেন। কিষ্কিন্ধ্যার বানরদিগের সহিত তাঁহার ক্রমাগত সাতদিন যুদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি বানরেরা হটে নাই বা ভয় পায় নাই। কিন্তু সহদেবের যুদ্ধ দেখিয়া তাহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইল। আর সহদেবকে অনেক ধনরত্ন দিয়া বলিল, "এ-সব লইয়া তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। তোমার ভালো হউক।"

দক্ষিণে যাইতে যাইতে সহদেব শেষে সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হন। সেইখানে লঙ্কা,

বিভীষণ তখনো সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। এখানে কোনোরূপ যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নাই, কারণ, বিভীষণ সংবাদ পাইবামাত্র আহ্লাদের সহিত বোঝায় বোঝায় মহামূল্য মণি-মুক্তা দিয়া সহদেবকে বিদায় করিলেন।

নকুলও পশ্চিমদিক হইতে কম কর আনেন নাই। একহাজার হাতি সে সকল ধন অতিকষ্টে বহিয়া আনিয়াছিল।

যজ্ঞের সময় ক্রমে যতই কাছে আসিল, ততই নানা দেশের রাজারা, মুনিরা আর ব্রাহ্মণেরা দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ ইহার পূর্বেই আসিয়া, সকলরকম আয়োজন আরম্ভ করাইয়াছেন। রাজাদিগের নিকট নিমন্ত্রণ গিয়াছে, পুরোহিতেরা প্রস্তুত হইয়াছেন, যজ্ঞের জন্য চমৎকার স্থান প্রস্তুত হইয়াছে, ভোজনের ঘটা লাগিয়া গিয়াছে।

নকুল হস্তিনায় গিয়া জোড়হাতে, মিষ্ট কথায়, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দুর্যোধন প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারাও আনন্দের সহিত যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন। অন্য রাজারাজড়া কত আসিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। ইহাঁদের জন্য সুন্দর বাগানে ঘেরা, মণি-মুক্তার কাজ করা, সোনার দরজা জানালা দেওয়া বিশাল বিশাল পুরী পূর্বেই বহুমূল্য আসন, গালিচা, পালঙ্ক প্রভৃতি দিয়া সাজানো ছিল। মিঠাই মন্ডার তো কথাই নাই। আর সুগন্ধের কথা কি বলিব। ফুলের গন্ধ, চন্দনের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, লুচি সন্দেশের গন্ধ!

এক-একজন এক-একটা কাজে বিশেষ মজবুত, তাঁহাদের উপরে সেই সেই কাজের ভার পড়িয়াছে। দুঃশাসনের উপর খাবার জিনিস দেখাশুনার ভার, অশ্বত্থামার উপর ব্রাহ্মণদিগের আদর-যত্নের ভার, সঞ্জয়ের উপর রাজাদিগের সেবার ভার। ভীষ্ম, দ্রোণ কাজের হুকুম দিবেন, কৃপাচার্য ধন রত্ন রক্ষা করিবেন। উপহার আসিলে দুর্যোধন লইবেন, আর নিজে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ দিগের পা ধোওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

ক্রমে যজ্ঞের পূজা অর্চনার কাজ শেষ হইয়া গেল। মহারাজ যুধিষ্ঠির, যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

তারপর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "রাজাদিগকে এবং যাঁহারা অর্ঘ্য (মান্য দেখাইবার জন্য উপহার) পাইবার উপযুক্ত, তাঁহাদিগকে এক-একটি করিয়া অর্ঘ্য আনিয়া দাও। তারপর এখানে যিনি সকলের চেয়ে বড় তাঁহাকে আর-একটি অর্ঘ্য দিতে হইবে।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "সকলের বড় বলিয়া অর্ঘ্য কাহাকে দিব?"

ভীষ্ম বলিলেন, "কৃষ্ণই সকলের চেয়ে বড়। তাঁহার সমান মান্য লোক এখানে আর কেহই উপস্থিত নাই।"

তারপর ভীষ্মের কথায় সহদেব কৃষ্ণকে অর্ঘ্য আনিয়া দিলেন। কিন্তু চেদীর রাজা শিশুপালের ইহা কিছুতেই সহ্য হইল না। তিনি যুধিষ্ঠিরকেই-বা কত বকিলেন, ভীষ্মেরই-বা কত নিন্দা করিলেন, আর কৃষ্ণকেই-বা কত অপমানের কথা বলিলেন। তারপর আর-আর রাজাদিগকে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেও ছাড়িলেন না।

রাজাদের মধ্যে অনেকে শিশুপালের সঙ্গে জুটিয়া যজ্ঞ ভাঙিবার আর কৃষ্ণকে মারিবার জন্য পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, ইঁহারা শিশুপালকে বুঝাইয়া থামাইতে পারিলেন না, তাহাতে সহদেব রাগিয়া বলিলেন, "যে কৃষ্ণের সম্মান সহ্য করিতে না পারে,

আমি তাহার মাথায় পা তুলিয়া দিই।”

এইরূপ তর্ক আরম্ভ হইয়া ক্রমে বিষম কান্ড উপস্থিত হইল। কৃষ্ণের উপর শিশুপালের অনেকদিন হইতেই রাগ ছিল, আর তিনি নানারকমে তাঁহাকে অপমান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কৃষ্ণ এতদিন তাহা সহিয়া থাকিবার কারণ এই যে,তিনি শিশুপালের মায়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'আপনার পুত্রের একশত অপরাধ ক্ষমা করিব।'

শিশুপালের একশত অপরাধ ইহার পূর্বেই হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আর তাঁহাকে ক্ষমা করিবার কোনো কারণ নাই।

শিশুপাল ভয়ানক অপমানের কথা বলিয়া কৃষ্ণকে গালি দিতে দিতে শেষে বলিলেন, “আইস! আজ তোমাকে আর পান্ডবদিগকে যমের বাড়ি পাঠাইতেছি।”

তখন কৃষ্ণ সভার সকলকে বলিলেন, “আমি অনেক সহিয়াছি, কিন্তু এতগুলি রাজার সম্মুখে এমন অপমান আমি কিছুতেই সহিতে পারিব না।”

তাহা শুনিয়া শিশুপাল হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে আরো বেশি অভদ্রভাবে কৃষ্ণকে গালি দিতে লাগিলেন।

এমন সময় চাকার মতন একটা অতি ভয়ংকর জিনিস সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল! কৃষ্ণ তাহাকে হাতে করিয়া লইলেন। ইহা কৃষ্ণের সেই সুদর্শন চক্র নামক অস্ত্র, কৃষ্ণ তাহাকে মনে মনে ডাকাতে অমনি ছুটিয়া আসিয়াছে। আজ আর শিশুপালের রক্ষা নাই।

চক্র হাতে লইয়া কৃষ্ণ সকলকে বলিলেন “এই দুষ্টের একশত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, আর ক্ষমা করিব না। এই দেখুন ইহাকে বধ করিলাম।”

এ কথা বলিবামাত্রই চক্র ছুটিয়া গিয়া শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিল। সভার সকল লোক পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিল, কাহারো মুখে কথা সরিল না।

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হইল। তারপর রাজারা দেশে চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া গিয়াছেন, দুর্যোধন আর শকুনি তখনো যান নাই, তাঁহারা সভা দেখিতেছেন। এমন সভা দুর্যোধন আর কখনো দেখেন নাই, যত দেখেন, ততই তাঁহার ধাঁধা লাগিয়া যায়। ইহারই মধ্যে কয়েকবার তিনি স্ফটিকের মেঝেকে জল মনে করিয়া কাপড় গুটাইয়াছেন, আবার জলকে স্ফটিক ভাবিয়া, কাপড়-চোপড়সুদ্ধ তাহাতে হাবুডুবুও খাইয়াছেন। সকলে হাসিয়াছে ও যুধিষ্ঠিরের চাকরেরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অন্য কাপড় আনিয়া দিয়াছে।

স্ফটিকের দেওয়াল, তাহাকে দুর্যোধন মনে করিলেন, বুঝি দরজা। তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইতে গিয়া মাথায় ঠকাস্ করিয়া এমনি লাগিল যে, একেবারে মাথা ঘুরিয়া পড়িবার গতিক। তারপর বেচারার আর ভালো করিয়া চলিতেই ভরসা হয় না, খালি 'কানা মাছি ভোঁ ভোঁ'র মতন হওয়াতে হাত বুলাইতে বুলাইতে পা বাড়াইতেছেন। এমনি করিয়া শেষে একবার একেবারে বাহিরে গিয়া ধপাস্! তারপর দরজা দেখিলেই আগে থাকিতে দাঁড়ান।

বাস্তবিক এমন করিয়া নাকাল হইলে বড্ড রাগ হয়! অথচ সে রাগ দেখাইবার জো নাই, কারণ তাহাতে লোকে আরো হাসে। কাজেই দুর্যোধন জিব ঠোঁট কামড়াইয়া কোনোমতে রাগ হজম করিয়া সেখান হইতে বিদায় হইলেন। এদিকে কিন্তু হিংসায় তিনি জ্বলিয়া মরিতেছেন। পথে শকুনি তাঁহাকে কত কথা বলিয়াছেন, তিনি কিছুরই উত্তর দেন নাই। শেষে শকুনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে দুর্যোধন, কথা কহিতেছ না যে?'

দুর্যোধন বলিলেন, 'মামা! কথা কহিব কোন লজ্জায়? আমার কি আর বাঁচিয়া লাভ আছে? যে শত্রুকে মারিতে এত চেষ্টা করিলাম, তাহারই কিনা শেষে এত বাড়াবাড়ি!'

শকুনি বলিলেন, 'সে কি কথা দুর্যোধন? উহারা নিজের গুণে বড় হইয়াছে, তাহাতে তোমার দুঃখ কেন? ইচ্ছা করিলে তুমিও তো ঐরূপ করিতে পার।'

দুর্যোধন বলিলেন, 'মামা! যুদ্ধ করিয়া উহাদের সভা আর রাজ্য কাড়িয়া লই।'

শকুনি বলিলেন, 'কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ আর ধৃষ্টদ্যুম্ন ইঁহাদিগকে দেবতারাও যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন না। তুমি কি করিয়া করিবে? ইঁহাদিগকে জব্দ করিবার অন্য উপায় আছে।'

দুর্যোধন বলিলেন, 'কি উপায় মামা?'

শকুনি বলিলেন, 'যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলায় বড় সখ, অথচ তিনি ভালো খেলিতে জানেন না। আবার, পাশা খেলায় ডাকিলে তাঁহার 'না' বলিবারও জো থাকিবে না। একটিবার আনিয়া তাঁহাকে খেলিতে বসাইতে পারিলে, আমি ফাঁকি দিয়া তাঁহার রাজ্য-পাট সব জিতিয়া লইতে পারি। আমার মতো পাশা পৃথিবীতে কেহ খেলিতে জানে না। আগে তুমি তোমার বাবাকে বলিয়া খেলার অনুমতি লও, তারপর আমি সব ঠিক করিয়া দিব।'

দুর্যোধন বলিলেন, 'আমার বাবাকে বলিতে সাহস হয় না, আপনি বলুন।'

শকুনি বাড়ি আসিয়াই ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 'দুর্যোধন তো বড়ই রোগা হইয়া যাইতেছে! আপনি সে খবর নেন না?'

অমনি ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া দুর্যোধনকে বলিলেন, 'আহা! বাছার তো তবে বড়ই অসুখ হইয়াছে! কি অসুখ তোমার বাবা?'

দুর্যোধন বলিলেন, 'বাবা! আমার ভয়ানক অসুখ হইয়াছে! আপনার চেয়ে পাণ্ডবেরা বড় হইয়া গেল, এ কথা ভাবিলে কি আর আমি ভালো থাকিতে পারি? উহাদের বাড়িতে রোজ দশহাজার লোক সোনার থালায় পোলাও খায়। উহাদের মতো এত ধন ইন্দ্রেরও নাই, যমেরও নাই, বরুণেরও নাই, কুবেরেরও নাই। কাজেই আমার যারপরনাই ভয়ানক অসুখ হইয়াছে।'

তখন শকুনি বলিলেন, 'আমি পাশা খেলিয়া উহাদের সব ধন জিতিয়া দিতে পারি। ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে বা পাশায় ডাকিলে তাহার 'না' বলিবার জো থাকেনা। যুধিষ্ঠিরকে আমরা পাশায় ডাকিলে তাহাকে আসিতেই হইবে। অথচ সে খেলিতে জানে না, কাজেই আমি ফাঁকি দিয়া তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইতে পারিব।'

এ কথায় ধৃতরাষ্ট্র সহজে রাজি হন নাই। তাঁহার নিজেরও এ কাজটা ভালো লাগিল না, তারপর বিদুরকে ডাকিলে, তিনিও বারবার নিষেধ করিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের পীড়াপীড়িতে ধৃতরাষ্ট্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আর তাঁহার নিজের মনেও পাণ্ডবদের প্রতি যথেষ্ট হিংসা ছিল। কাজেই তিনি শেষে বলিলেন, 'হাজার থাম আর একশত দুয়ারওয়ালা একটা খুব জমকালো সভা প্রস্তুত করাও।'

সভা অল্পদিনের মধ্যেই প্রস্তুত হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বলিলেন, 'বিদুর! শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।'

বিদুর বলিলেন, 'মহারাজ! ইহা তো ভালো কথা হইল না। পাশা খেলা বড় অন্যায়।

উহাতে বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে।'

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'কি হইবে? আমরা তো থাকিব। তুমি শীঘ্র যাও।'

বিদুর আর কি করেন? তিনি কাজেই ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে পাশা খেলিতে ডাকিয়াছেন, তুমি চল।'

এ কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'কাকা, পাশ খেলা কি ভালো? আপনি কি অনুমতি করেন?'

বিদুর বলিলেন, 'আমি অনেক নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি আমাকে পাঠাইলেন। এখন তোমার যাহা ভালো মনে হয়, কর।'

যুধিষ্ঠির অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আমাকে যখন পাশা খেলিতে ডাকিয়াছে, তখন আর না গিয়া উপায় নাই। কিন্তু উহারা বড় ধূর্ত। খেলার সময় ফাঁকি দেয়। না যাইবার উপায় থাকিলে আমি কখনই যাইতাম না।'

পরদিন ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতিকে লইয়া যুধিষ্ঠির বিদুরের সহিত হস্তিনায় আসিলেন। তাহাব পরের দিন সকালে খেলা হওয়ার কথা। এই খেলা পণ অর্থাৎ বাজি রাখিয়া হয়। খেলিবাব পূর্বে কথা থাকে যে, 'আমি হারলে তোমাকে এই জিনিস দিব, আর তুমি হারিলে আমাকে এই জিনিস দিবে।' এইভাবে যথা সময়ে খেলা আরম্ভ হইল।

যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা দেখিবার জন্য সভায় লোকের বড়ই ভিড় হইয়াছে। অনেক রাজা, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত এবং সাধারণ লোক সেখানে উপস্থিত। পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই সভার মাঝখানে বসিয়াছেন, তাঁহাদের সামনেই শকুনিকে সর্দার করিয়া দুর্যোধনের দল। শকুনি বলিলেন, 'যুধিষ্ঠির, সকলে বসিয়া আছেন, খেলা আরম্ভ কর।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'তোমরা সরল ভাবে খেলা করিও, ফাঁকি দিও না যেন।'

শকুনি বলিলেন, 'যাহাব বেশি বুদ্ধি সেই ফাঁকি দেয়। ইহাতে দোষের কথা কি হইল? তোমার যদি ভয় থাকে, তবে নাহয় খেলিও না।'

যুধিষ্ঠিব বলিলেন, 'ডাকিয়াছ যখন, তখন খেলিতেই হইবে। কাহার সহিত খেলিব, বল।'

এ কথায় দুর্যোধন বলিলেন, 'পণের জিনিস সব আমি দিব, কিন্তু আমার হইয়া মামা খেলিবেন।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'একজনের হইয়া আর-একজনের খেলা অন্যায়। যাহা হউক, খেলা আবম্ভ কর।'

খেলা আরম্ভ হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র সভায় আসিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতিও দুঃখিত ভাবে তাঁহার সঙ্গে আসিলেন।

তারপর যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে বলিলেন, আমার এই গলার হার পণ রাখিলাম, তুমি কি রাখিলে?

দুর্যোধন বলিলেন, 'আমারও ধনরত্ন অনেক আছে। এখন তুমি বাজি জিতিলেই হয়।'

এই কথা বলিতে বলিতেই অমনি শকুনি পাশা ফেলিলেন, 'এই দেখ, জিতিলাম।' সকলে দেখিল বাস্তবিকই শকুনির জিত।

ইহাতে যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আইস, আবার খেলিতেছি। এবারে এক লক্ষ আট হাজার

সোনার কুম্ভ, আর আমার ভাণ্ডারের সকল ধনরত্ন পণ রহিল।'

শকুনি তখনই 'এই জিতিলাম' বলিয়া সে-সব জিতিয়া লইলেন। তাঁহার ফাঁকি কেহ ধরিতে পারিল না।

হায় হায়! পাশায় কি সর্বনাশ হইল! যুধিষ্ঠির যত হারেন, ততই তাঁর জেদ চড়িয়া যায়, আর ততই তিনি বলেন, 'আরো খেলিব!' ধূর্ত শকুনির জুয়াচুরি কাহারো ধরিবার সাধ্য নাই। পণ রাখিবামাত্রই তিনি 'এই জিতিলাম' বলিয়া পাশা ফেলেন, আর যুধিষ্ঠির হারিয়া যান।

এইরূপে ক্রমে তাঁহার দাসী গেল, চাকর গেল, হাতি গেল, ঘোড়া গেল, রথ গেল, সৈন্য গেল—সব গেল।

সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 'মহারাজ! মরিবার সময় রোগী ঔষধ খাইতে চাহে না, আমার কথাও হয়তো আপনার ভালো লাগিবে না। দুর্যোধন যে মারা যাইবার জোগাড় করিতেছে, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? পাণ্ডবেরা একবার ক্ষেপিয়া দাঁড়াইলে ছেলেপিলে চাকরবাকর সুদ্ধ যমের বাড়ি যাইতে হইবে। এই বেলা দুর্যোধনকে সাজা দিয়া পাণ্ডবদিগকে তুষ্ট করুন। একে তো পাশা খেলায় এত দোষ, তাহাতে শকুনি, এমন জুয়াচোর, উহাকে শীঘ্র চলিয়া যাইতে বলুন।'

এ কথায় দুর্যোধন ক্রোধভরে বিদুরকে গালি দিতে আরম্ভ করিলে বিদুর বলিলেন, 'তোমাদের ভালোর জন্যই দুটো কথা বলিয়াছিলাম। দেখিতেছি তাহা তোমার পছন্দ হয় নাই। কাজ কি বাপু, তোমার যাহা খুশি তাহাই কর। তোমাকে নমস্কার।'

কাজেই আবার খেলা চলিল। যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আর ধার্মিক এই পৃথিবীতে ছিল না, সেই যুধিষ্ঠির পাশার ধাঁধায় পড়িয়া শেষে অবোধ মাতালের মতো কাজ করিতে লাগিলেন।

ধন গেলে গাই বাছুর, তারপর লোকজন, তারপর রাজ্য। এইরূপে সর্বস্ব হারিয়া ফকির হইয়াও চৈতন্য নাই। শেষে একটি-একটি করিয়া ভাইদিগকে হারিতে লাগিলেন।

কি দুর্দশা! শেষে শকুনিই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'পাশা খেলিতে গিয়া লোকে এমন পাগলামি করিতে পারে, এ কথা তো স্বপ্নেও জানিতাম না।'

কিন্তু ইহাতেও যুধিষ্ঠিরের দুর্গতির শেষ হয় নাই। ভাইদিগকে হারিয়া শেষে নিজেকে পর্যন্ত হারিলেন, তথাপি তাঁহার জেদ থামে না।

ভাবিতেও দুঃখ আর লজ্জা হয়, যখন আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না তখন দয়া, ধর্ম, সদাচার সকল ভুলিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'এবার দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম।'

এ কথা শুনিবামাত্র সভার লোক 'ছি! ছি!' করিয়া উঠিল, রাজাগণের চোখে জল আসিল, লাজে দুঃখে আর অপমানে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপের শরীর ঘামিয়া গেল, বিদুর হেঁট মুখে বসিয়া সাপের মতন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

ভালোলোকেদের মনে এইরূপ কষ্ট আর নির্লজ্জ ধৃতরাষ্ট্র আনন্দে অস্থির হইয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'জয় হইল নাকি? জয় হইল নাকি?'

কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতি তখন কিরূপ আনন্দ করিতেছিলেন তাহা ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারেই বুঝিতে পার।

ধূর্ত শকুনি যখন পাশা ফেলিয়া দ্রৌপদীকে অবধি জিতিয়া লইলেন অমনি দুর্যোধন

বিদুরকে বলিলেন, 'শীঘ্র দ্রৌপদীকে লইয়া আইস, হতভাগী আমার চাকরানীদের সঙ্গে গিয়া ঘর ঝাঁট দিক।'

বিদুর বলিলেন, 'মুর্খ! তোমার যে মরিবার গতিক হইয়াছে, এ কথা না বুঝিতে পারিয়াই তুমি এরূপ বলিতেছ। এমন কথা নিতান্ত নীচ লোক ছাড়া আর কেহ বলে না।'

ইহাতে দুর্যোধন বিদুরকে গালি দিয়া একটা দরোয়ানকে বলিলেন, 'তুই দ্রৌপদীকে লইয়া আয়! তোর কোন ভয় নাই।'

দরোয়ান দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল, 'যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় আপনাকে দুর্যোধনের নিকট হারিয়াছেন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, ধৃতরাষ্ট্রে ঘর ঝাঁট দিতে হইবে।'

এ কথায় দ্রৌপদী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'তুই একি পাগলের মতো কথা বলিতেছিস! রাজারা কি স্ত্রীকে পণ রাখিয়া খেলা করে? যুধিষ্ঠিরের কি আর জিনিস ছিল না?'

দরোয়ান বলিল, 'যুধিষ্ঠির আগে ধনদৌলত, তারপর ভাইদিগকে, তারপর নিজেকে হারিয়া, শেষে আপনাকে হারিয়াছেন।'

দ্রৌপদী বলিলেন, 'তুই সভায় গিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি আগে নিজেকে, কি আমাকে হারিয়াছেন।'

দারোয়ান আবার সভায় আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল, 'দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আপনি কাহাকে আগে হারিয়াছেন? আপনার নিজেকে, না দ্রৌপদীকে?'

যুধিষ্ঠির চুপ করিয়া রহিলে, এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তখন দুর্যোধন বলিলেন, 'দ্রৌপদীর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, এখানে আসিয়া করুক।'

দারোয়ান নিতান্ত দুঃখিত হইয়া আবার দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল, "মা! এবার দেখিতেছি কৌরবদের সর্বনাশ হইবে। দুষ্ট দুর্যোধন আপনাকে সভায় ডাকিয়াছেন।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "বাছা, ভগবানই সব করেন। এ সময়ে আমি যেন ধর্ম রাখিয়া চলিতে পারি। তুমি আর একটিবার সভায় গিয়া ধার্মিক গুরুজনদিগকে জিজ্ঞাসা কর, এখন আমার কি করা উচিত। তাঁহার যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

দারোয়ান সভায় দ্রৌপদীর কথা বলিলে, সকলে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। দুর্যোধনের ভয়ে কাহারো মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সেই দুষ্ট আবার বলিল, "তুই দ্রৌপদীকে এখানে লইয়া আয়।"

দরোয়ান দুর্যোধনের চাকর, তথাপি সে তাঁহার কথায় কান না দিয়া আবার সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি দ্রৌপদীকে কি বলিব?"

তখন দুর্যোধন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ বেটা দেখিতেছি বড়ই ভীতু! দুঃশাসন, তুমি গিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া আইস।"

বলিবামাত্র সেই দুষ্ট দুই চোখ লাল করিয়া দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল, "আমরা তোমাকে জিতিয়াছি। চল! সভায় চল!"

দুঃশাসনের ভাবগতিক দেখিয়া দ্রৌপদী ভয়ে তাড়াতাড়ি গান্ধারী প্রভৃতির নিকট আশ্রয় লইতে গেলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার পূর্বেই দুরাত্মা তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিতে টানিতে তাঁহাকে সভায় লইয়া চলিল। তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কত মিনতি করিয়া বলিলেন, "দুঃশাসন, তুমি আমাকে এমন করিয়া সভায় লইয়া যাইও না!" কিন্তু হায়! সে

দুষ্টের মনে কিছুতেই দয়া হইল না। সে দাঁত কড়মড় করিয়া বলিল, "তোকে জিতিয়া লইয়াছি! এখন তো তুই আমাদের দাসী। চল্!" এই বলিয়া দুরাত্মা আরো নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল।

হায় হায়! তখন কেহই সেই দুরাত্মার মাথা কাটিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসিলেন না! দ্রৌপদী "হা কৃষ্ণ! হা অর্জুন!" বলিয়া কত কাঁদিলেন, সকলই বৃথা হইল।

এইরূপে দুঃশাসন তাঁহাকে সভায় উপস্থিত করিলেও কেহই তাহাকে নিষেধ করিলেন না। তখন দ্রৌপদী বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম, আমার স্বামী তাহার মতোই কাজ করিয়াছেন, তাঁহার দোষ কি? কিন্তু এই দুরাত্মা আমাকে অপমান করিতেছে, দেখিয়াও যখন সভার সকলে চুপ করিয়া আছেন, তখন বুঝিলাম যে কুরুবংশের লোকেরা ধর্ম ভুলিয়া গিয়াছে, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ইঁহাদের আর কিছু তেজ নাই।"

দ্রৌপদীর অপমানে পাণ্ডবেরা ক্রোধে অধীর হইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মুখে কথা নাই। এদিকে সেই পাষণ্ড দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে তাঁহাকে অজ্ঞানপ্রায় করিয়া 'দাসী! দাসী!' বলিয়া হাসিতেছে, আর কর্ণ, শকুনি বলিতেছেন 'বেশ! বেশ!'

ভীষ্ম দ্রৌপদীকে বলিলেন, "যুধিষ্ঠির তোমাকে পণ রাখিয়া খেলিতে পারেন কি না, এ কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি অতিশয় ধার্মিক, কখনো অধর্মের কাজ করেন নাই। তিনি নিজেই শকুনির সহিত খেলিতে আসিয়াছেন, আর তোমাব অপমান দেখিয়াও চুপ করিয়া আছেন। কাজেই আমি বুঝিতেছি না, কি বলিব।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "উঁহাকে দুষ্টেরা ডাকিয়া আনিল, তথাপি কি করিয়া বলিতেছেন যে উনি নিজেই খেলিতে আসিয়াছেন? আর তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া হারাইয়াছে! আপনাদের অনেকেরই পুত্র আর পুত্রবধূ আছেন, তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আমার কথার বিচার করুন।" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে থাকিলে দুঃশাসন তাঁহাকে আরো অপমান করিতে লাগিল।

তখন ভীম আর সহিতে না পারিয়া বলিলেন, "দেখ যুধিষ্ঠির! তোমার দোষেই দ্রৌপদীর এত অপমান হইল। যে হাতে তুমি পাশা খেলিয়াছ, সে হাত আজ পোড়াইয়া ফেলিব! সহদেব! শীঘ্র আগুন আন!"

অর্জুন তখনি ভীমকে বুঝাইয়া বলিলেন, "কর কি দাদা! চুপ চুপ! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম রাখিতে গিয়াই উনি এরূপ করিয়াছেন, তাহা কি বুঝিতেছ না?"

ভীম বলিলেন, "ধর্ম রাখিতে গিয়াছিলেন বলিয়াই তো এতক্ষণ উহার হাত পোড়াই নাই।"

এমন সময় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিকর্ণ বলিলেন, "আপনারা চুপ করিয়া আছেন কেন? দ্রৌপদীর কথার বিচার করুন। আমার তো বোধহয় যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদীকে ওরূপ করিয়া পণ রাখার কোনো ক্ষমতা ছিল না! সুতরাং তিনি হারিলেও দ্রৌপদীর তাহা মানিয়া চলার কথা নহে।"

এ কথায় সভার লোক চিৎকার করিয়া বিকর্ণের প্রশংসা আর শকুনির নিন্দা করিতে লাগিল। কিন্তু কর্ণ বিকর্ণকে গালি দিয়া, দুঃশাসনকে বলিলেন, "দুঃশাসন, তুমি ইহাদের সকলের গায়ের কাপড় কাড়িয়া লও।"

এ কথা বলিবামাত্র পাণ্ডবেরা নিজ নিজ চাদর কয়খানি ছাড়িয়া দিলেন। দ্রৌপদীর

গায়ের কাপড় দুঃশাসন নিজেই কাড়িয়া লইতে গিয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! দেবতার কৃপায় সে সময়ে তাঁহার গায় এতই কাপড় হইল যে, দুঃশাসন প্রাণপণে টানিয়াও তাহা শেষ করিতে পারে না। সে যত টানে, ততই লাল, নীল, হলদে, সোনালি, নানা রঙের হইয়া কাপড় বাড়িয়া যায়। শেষে অপ্রস্তুত হইয়া হতভাগা বসিয়া পড়িল।

এদিকে এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া সভায় ঘোরতর কলরব উপস্থিত হইয়াছে। রাজাগণ দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে করিতে দুঃশাসনকে গালি দিতেছেন, আর ভীম রাগে অস্থির হইয়া কাঁপিতেছেন। তারপর সভাব সকলকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা সকলে শোন! আমি ভীষণ যুদ্ধে এই দুরাত্মা দুঃশাসনের বুক চিরিয়া তাহার রক্ত খাইব, তবে ছাড়িব। যদি না খাই, তবে যেন আমার স্বর্গলাভ না হয়।"

এমন সময় বিদুর হাত তুলিয়া সকলকে থামাইয়া বলিলেন, "দ্রৌপদী এমন করিয়া কাঁদিতেছেন, তবুও আপনারা কথা কহিতেছেন না, একাজটা কি ভালো হইল? শীঘ্র ইহার কথার বিচার করুন।"

তথাপি সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। তখন কর্ণের কথায় আবার দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে ঘরে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা দ্রৌপদীকে কত অপমান, আর পান্ডবদিগকে কতপ্রকার বিদ্রূপ করিল, তাহা বলিয়া আর তোমাদিগকে কষ্ট দিব না। যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল আর সহদেব সমস্তই চুপ করিয়া সহ্য করিলেন। কিন্তু ভীম রাগী লোক, তিনি তাহা সহিতে পারিবেন কেন? যখন যুধিষ্ঠিরকে অপমান করিয়াও দুর্যোধনের মন উঠিল না, তখন হাসিতে হাসিতে আবার দ্রৌপদীকে পা দেখাইলেন—আবার তাহা দেখিয়া কর্ণ হাসিতে লাগিলেন— তখন ভীম আব কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না' তিনি ভয়ংকর শব্দে সভা কাঁপাইয়া বলিলেন, "আমি যদি গদা দিয়া এই দুষ্টের উরু না ভাঙ্গি , তবে যেন আমার স্বর্গে যাওয়া না হয়!"

এতক্ষণে আর কাহারো বুঝিতে বাকি রহিল না যে এ-সকল ঘটনার ফল বড়ই ভয়ংকর হইবে। তখন ধৃতরাষ্ট্র প্রাণের ভয়ে আর নিন্দার ভয়ে দুর্যোধনকে তিরস্কার করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন, "মা! তুমি আমার বধূগণের সকলের বড় বল, তুমি কি চাহ।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "যদি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তবে যুধিষ্ঠিরকে ছাড়িয়া দিন।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তাহাই হইবে। তুমি আর কি চাহ, বল!"

দ্রৌপদী বলিলেন, "ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেবকে তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্র সুদ্ধ ছাড়িয়া দিন।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তাহাই হইবে। তুমি আর কি চাহ বল!"

দ্রৌপদী বলিলেন, "আমি আর কিছুই চাহি না। ইঁহারা মুক্তি পাইলেই আমার সব পাওয়া হইল।"

তারপর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "মহারাজ! এখন আমাদিগকে কি অনুমতি করেন?"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তোমার মঙ্গল হউক। তুমি রাজ্যধন সমস্ত লইয়া গিয়া সুখে রাজত্ব কর।"

এইরূপে যুধিষ্ঠির সেখান হইতে বিদায় হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুর্যোধন, কর্ণ আর শকুনির ইহা সহ্য হইবে কেন? তাঁহারা বলিলেন, "এত কষ্ট করিয়া যাহা জিতিলাম,

এত সহজেই তাহা লইয়া যাইবে? এ কখনই হইতে পারে না।"

দুষ্ট লোকে না করিতে পারে এমন কাজ নাই। তিন দুষ্ট মিলিয়া তখনই আবার ধৃতরাষ্ট্রের মত ফিরাইয়া দিলেন, স্থির হইল, আবার যুধিষ্ঠিরকে পাশায় ডাকিতে হইবে। এবারের পণ বনবাস। যে হারিবে সে হরিণের ছাল পরিয়া তেরো বৎসর বনবাস করিবে। এই তেরো বৎসরের শেষ বৎসর অজ্ঞাতবাস, অর্থাৎ এমনভাবে লুকাইয়া থাকা, যেন কেহ সন্ধান না পায়। সন্ধান পাইলে আবার বারো বৎসর বনবাস। বনবাসের পরে অবশ্য আবার আসিয়া রাজ্য পাইবার কথা রহিল। কিন্তু দুর্যোধন স্থির করিয়া রাখিলেন যে, একবার পান্ডবদিগকে তাড়াইতে পারিলে আর তাঁহাদিগকে রাজ্যে ঢুকিতে দিবেন না।

ডাকিলেন যখন খেলিতে হইবে, তখন কাজেই যুধিষ্ঠিরকে আবার আসিতে হইল, আর সেই ধূর্ত শকুনির ফাঁকিতে হারিয়া তেরো বৎসরের জন্য বনেও যাইতে হইল! যাইবার সময় দুষ্টেরা সকলে মিলিয়া পান্ডবদিগকে কম বিদ্রূপ করে নাই। পান্ডবেরা তখন কিভাবে চলিতেছেন, দুর্যোধন কতই ভঙ্গিতে তাহার নকল করিলেন।

তাহাতে ভীম বলিলেন, "মূর্খ! তোমার বিদ্রূপে আমাদের কোনো ক্ষতি হইবে না। আমি আবার বলিতেছি, যুদ্ধের সময় তোমাকে বধ করিব, আর দুঃশাসনের বুক ভাঙ্গিয়া রক্ত খাইব।"

অর্জুন বলিলেন, "আমি কর্ণকে মারিব। হিমালয়ও যদি নড়িয়া যায়, সূর্যও যদি নিভিয়া যায়, তথাপি আমার এ কথা মিথ্যা হইবে না। "

সহদেব শকুনিকে বলিলেন, "দুষ্ট! তুই নিশ্চয় জানিস, আমি তোকে বধ করিব।"

যুধিষ্ঠির সকলের নিকট, এমন-কি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিকটেও বিনয়ের সহিত বিদায় চাহিয়া বলিলেন, "আবার আসিয়া আপনাদের সহিত দেখা করিব।" লজ্জায় কেহ তাঁহার কথায় উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু মনে মনে সকলেই তাঁহাকে অনেক আশীর্বাদ করিলেন। বিদুর বলিলেন, "কুন্তী বনে গেলে বড় ক্লেশ পাইবেন, তাঁহাকে আমাব নিকটে রাখিয়া যাও।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমাদের পিতা নাই, আপনিই আমাদের পিতার মতন। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই হউক। আমাদিগকে আর কি উপদেশ দেন?"

বিদুর বলিলেন, "তোমাদের মতো ধার্মিক লোককে আর বেশি উপদেশ কি দিব? আশীর্বাদ করি, তোমাদের ভালো হউক।"

কুন্তীর নিকট বিদায় লইবার সময় সকলেরই খুব কষ্ট হইয়াছিল, বিশেষত কুন্তীর। তাঁহার কান্নায় বুঝি তখন পাষাণ গলিয়াছিল।

এইরূপে সকলের নিকট বিদায় হইয়া পান্ডবেরা দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত বনবাসে যাত্রা করিলেন।

দুষ্ট দুঃশাসনের টানে দ্রৌপদীর মাথার বেণী খুলিয়া গিয়াছিল, সে বেণী আর তিনি বাঁধেন নাই, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, এই দুরাত্মাগণের উচিত শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহা আর বাঁধিবেন না।

পান্ডবেরা চলিয়া গিয়াছেন, ধৃতরাষ্ট্র বিদুর প্রভৃতিকে লইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ নারদ অন্যান্য অনেক মুনির সহিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,

"আজ হইতে তেরো বৎসর পরে, চতুর্দশ বৎসরে, দুর্যোধনের দোষে ভীমার্জুনের হাতে কৌরবদের সকলের মৃত্যু হইবে।"

এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন, আর ধৃতরাষ্ট্র বসিয়া নিজের দুর্বুদ্ধির কথা ভাবিতে লাগিলেন।

বনপর্ব

ণ্ডবেরা সকলের নিকট বিদায় লইয়া, অস্ত্র হাতে ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিতে লাগিলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চৌদ্দজন চাকরও সপরিবারে গাড়ি চড়িয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। তখন অনেক ধার্মিক ব্রাহ্মণ কৌরবদিগের উপরে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই দুষ্টগণের রাজ্যে বাস করিতে নাই, আমরাও পাণ্ডবদিগের সঙ্গে যাইব।"

এই-সকল ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আনন্দও হইল, কষ্টও হইল। নিজেদের এইরূপ অবস্থা, কি খাইবেন তাহার ঠিক নাই, তাহার মধ্যে রোজ এতগুলি ব্রাহ্মণের আহার যোগান তো সহজ কথা নহে, তাই যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদিগকে এত স্নেহ করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন, কিন্তু বনের ভিতরে আপনাদিগকে কি দিয়া খাওয়াইব, তাহা ভাবিয়া আমি অস্থির হইতেছি। আমাদের সঙ্গে আসিলে আপনাদের ক্লেশ হইবে, আপনারা ঘরে ফিরিয়া যান।"

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, আমরা আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আমাদের আহারের জন্য আপনার কোনো চিন্তা নাই, আমরা নিজে ভিক্ষা করিয়া খাইব।"

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠির ধৌম্যকে বলিলেন, "ইঁহাদিগকে খাইতে দিবার শক্তি আমার নাই, অথচ ইহাদিগকে ছাড়িতেও পারিতেছি না! এখন উপায় কি, বলুন।"

ধৌম্য বলিলেন, "মহারাজ, সূর্যের পূজা করুন, ইহার উপায় হইবে।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির সূর্যের পূজা আরম্ভ করিলে, সূর্যদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি তোমার পূজায় তুষ্ট হইয়া এই থালি-খানা আনিয়াছি। আমার আশীর্বাদে এবং এই থালির গুণে, বারো বৎসর তোমার অন্নের চিন্তা থাকিবে না। প্রতিদিন, দ্রৌপদী যতক্ষণ না আহার করিবেন, ততক্ষণ এই থালির নিকট ফল, ফুলুরি, মাংস, মিঠাই যত চাও ততই পাইবে। তেরো বৎসর পরে তোমরা রাজ্য ফিরিয়া পাইবে।" এই বলিয়া তিনি আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

সে আশ্চর্য থালি পাইয়া আর যুধিষ্ঠিরের কোনো চিন্তা রহিল না। বারো বৎসর পর্যন্ত, যতক্ষণ দ্রৌপদীর খাওয়া না হইত, ততক্ষণ উহা নানারূপ খাবার জিনিসে পরিপূর্ণ থাকিত। যত লোকই আসুক না কেন, উহা শেষ করিতে পারিত না। কিন্তু দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ

হওয়া মাত্রই সব ফুরাইয়া যাইত।

পান্ডবেরা প্রথমে যে বনে বাস করেন, তাহার নাম কাম্যক বন। সেইখানে একদিন বিদুর আসিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে বিদুরকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের ভয় হইয়াছিল, বুঝি-বা আবার পাশা খেলিবার ডাক আসে। কিন্তু বিদুর সেজন্য আসেন নাই। পান্ডবদিগের সহিত বন্ধুতা করার কথা বলাতে, ধৃতরাষ্ট্র রাগিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, "তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। খালি পান্ডবদের হইয়া কথা বল, তোমার মন বড় কুটিল।" তাই বিদুর পান্ডবদিগকে খুঁজিতে খুঁজিতে কাম্যক বনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

এদিকে বিদুর চলিয়া আসাতে ধৃতরাষ্ট্র বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। বিদুরকে তিনি ভালোবাসিতেন, আর বিদুরের মতন একজন বুদ্ধিমান লোক পান্ডবদের দলে গেলে তাঁহাদের বল খুবই বাড়িয়া যাইবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার যথেষ্ট হিংসাও হইয়াছিল। সুতরাং তিনি সঞ্জয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "সঞ্জয়! শীঘ্র বিদুরকে ফিরাইয়া আন, নহিলে আমি বাঁচিব না।"

কাজেই আবার বিদুরকে ফিরাইয়া আসিতে হইল। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন বলিলেন, "ঐ দেখ, আপদ আবার আসিয়াছে। বন্ধুসকল! শীঘ্র একটা কিছু কর, নহিলে এ কখন বাবাকে দিয়া পান্ডবদিগকে ফিরাইয়া আনে তাহার ঠিক কি!"

কিন্তু কর্ণের এ কথা পছন্দ হইল না, তাঁহার ইচ্ছা, পান্ডবদিগকে এখনই গিয়া মারিয়া আসেন। কারণ, এখন তাঁহাদের দুঃখের অবস্থা, সহায় নাই, আর মনে কষ্ট, কাজেই তেজ কম। এইবেলা তাঁহাদিগকে মারিবার খুব সুবিধা।

এ কথায় সকলেই যারপরনাই উৎসাহের সহিত রথ সাজাইয়া পান্ডবদিগকে মারিতে চলিয়াছিল, ইহার মধ্যে হঠাৎ ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া তাহাদিগকে থামাইয়া দিলেন।

এদিকে কাম্যক বনে পান্ডবদের কিরূপে দিন যাইতেছে? বনটি বড়ই ভয়ানক। রাক্ষসের ভয়ে মুনি-ঋষিরা সেখান হইতে পলাইয়া গিয়াছেন। পান্ডবেরা সেখানে গিয়াই দেখিলেন, ভয়ানক একটা রাক্ষস হাঁ করিয়া তাঁহাদের পথ আগলাইয়া গর্জন করিতেছে। দ্রৌপদী তো তাহাকে দেখিয়াই চক্ষু বুজিয়া প্রায় অজ্ঞান!

যুধিষ্ঠির রাক্ষসটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, " তুমি কে? তোমার কি কাজ করিতে হইবে বল।"

রাক্ষস বলিল, "আর্‌রে মুহি

দাঁড়াও তোমাকে সাজা দিতেছি

কিড়্মিঢ়্ রে! মোর নাম কিড়্মিঢ়্ আছে! বগের ভাই। তোহ্রা কে বটেক্? তোন্দের্‌কে মুহি মজ্জাসে খাবো!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কীর্মির! আমরা পান্ডুর পুত্র। আমাদের নাম যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, আর সহদেব।" ভীমের নাম শুনিয়াই রাক্ষস বলিল, "হঁ—অ—অ? ব্ভীম? কোন্ বেটা ব্ভীম্ রে? ওহার্‌কেই তো মুহি আগ্‌গেমে খাবো। বেট্টা মোর ভাইটাকে মারিলেক।"

ভীমের তাহাতে ভয় পাওয়ার কোনো কথাই নাই, তিনি ইহার পূর্বেই একটা গাছ লইয়া প্রস্তুত আছেন। তারপর যুদ্ধটাও খুব জমাটরকমই হইল, তাহার কথা আর বাড়াইয়া বলিবার দরকার নাই। এ রাক্ষসটা খুব জোয়ান, হাত দিয়া, দাঁত দিয়া, পাথর ছুঁড়িয়া, সে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিল। শেষে ভীম তাহার হাত-পা মোচড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বন্ বন্ শব্দে ঘুরাইতে আরম্ভ করিলে সে চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে অজ্ঞান হইয়া গেল। তারপর তাহার গলায় ভীমের হাতের দুই টিপ পড়িতেই কার্য শেষ।

পান্ডবদের বনবাসের সংবাদে সকলে নিতান্তই দুঃখিত হইলেন। কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যদুবংশের আর পাঞ্চাল দেশের আত্মীয়েরা এবং আরো অনেকে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে কৌরবদিগকে অনেক ধিক্কার দিলেন। উঁহারা সকলেই বলিলেন, "এই দুষ্টদিগকে মারিয়া আমরা আবার যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিব।"

মুনি-ঋষিরা সর্বদাই পান্ডবদিগকে দেখিতে আসিতেন। সাধারণ লোকেরাও দলে দলে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সেই বনেই থাকিয়া যাইত।

কাম্যক বনেই যে তাঁহারা আগাগোড়া ছিলেন, তাহা নহে, কখনো কাম্যক বনে, কখনো-বা নানান্ তীর্থে, এইরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহারা সময় কাটাইতেন। একস্থানে অধিক দিন থাকিলে ফল-মূল মিলানো কঠিন হয়, শিকারও ফুরাইয়া যায়, কাজেই ঘুরিয়া বেড়াইবার বিশেষ দরকার ছিল।

বনে থাকায় খুবই কষ্ট তাহাতে সন্দেহ কি? আর শত্রুদিগকে সাজা দিবার ইচ্ছাও সকলেরই হয়। সুতরাং দ্রৌপদী যে পাণ্ডবদিগের দুঃখ দেখিয়া কাতর হইবেন, আর শত্রুদিগকে তাড়াইয়া নিজের রাজ্য লইবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে বার বার পীড়াপীড়ি করিবেন, ইহা আশ্চর্য নহে। এ-সকল সময়ে ভীম সর্বদাই দ্রৌপদীর কথায় সায় দিতেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহাতে ব্যস্ত না হইয়া, মিষ্ট কথায় তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, উহারা অন্যায় কাজ করিয়াছে বলিয়া পাণ্ডবদিগেরও তাহা করা উচিত নহে। ক্ষমা করাই যথার্থ ধর্ম, রাগের বশ হইয়া কাজ করিলে ধর্ম নষ্ট হয়।

তাহা ছাড়া, যুধিষ্ঠির বেশ জানতেন যে, দুর্যোধনের পক্ষে কর্ণ প্রভৃতি বড়-বড় যে-সকল বীর আছেন, তাঁহাদিগকে ইচ্ছা করিলেই হারাইয়া দেওয়া যায় না। ইহার জন্য বিশেষ আয়োজন চাই। তাই তিনি ভীমকে বলিতেন, 'ভাই! কর্ণ যে কত বড় যোদ্ধা, এ কথা ভাবিয়া আমার ঘুম হয় না।'

এ কথা উত্তর দেওয়া ভীমের পক্ষেও সহজ ছিল না। তাই তিনি মুখভার করিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন।

এই সময় ব্যাসদেব পাণ্ডবদিগকে দেখিতে আসেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'তোমাকে প্রতিস্মৃতি নামক বিদ্যা শিখাইয়া দিতেছি। তুমি অর্জুনকে ইহা শিখাইবে। ইহার গুণে তিনি

মহাদেব, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের প্রভৃতি দেবতাকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া সহজেই বড়-বড় অস্ত্রলাভ করিতে পারিবেন।'

এই বিদ্যা পাইয়া পাণ্ডবদের মনে খুবই আশা হইল। যুধিষ্ঠিরের নিকট ইহা শিখিবার পর অর্জুন তখনই তপস্যায় বাহির হইতে আর বিলম্ব করিলেন না। কবচ, গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণ প্রভৃতি লইয়া তপস্যায় বাহির হইলেন। যাত্রা করিবার সময় সকলে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন, 'তোমার সিদ্ধিলাভ হউক।'

তারপর হিমালয় আর গন্ধমাদন পর্বত পার হইয়া ইন্দ্রকীল নামক পর্বতে উপস্থিত হইলেন। এমন সময় কোথা হইতে একটি কৃষ্ণকায় তপস্বী আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কে হে তুমি, ধনুর্বাণ লইয়া এখানে আসিয়াছ? এখানে ধনুর্বাণ দিয়া কি করিবে? উহা ফেলিয়া দাও।'

অর্জুন ইহাতে ধনুক বাণ না ফেলায় তপস্বী খুশি হইয়া বলিলেন, 'বাছা, বর লও। আমি ইন্দ্র।'

অর্জুন জোড়হাতে ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'আপনার নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতে আসিয়াছি। দয়া করিয়া সেই বর দিন।'

ইন্দ্র বলিলেন, 'আগে শিবকে সন্তুষ্ট কর, তারপর অস্ত্র পাইবে।' এই বলিয়া ইন্দ্র চলিয়া গেলেন, অর্জুনও হিমালয়ের নিকটে আসিয়া শিবের তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

ক্রমাগত চারিমাস ধরিয়া তিনি অতি ভয়ংকর তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রথম মাসে তিনদিন অন্তর আহার করিতেন, দ্বিতীয় মাসে ছয়দিন অন্তর, তৃতীয় মাসে পনেরো দিন অন্তর। চতুর্থ মাসে কেবল বাতাস ভিন্ন আর কিছুই খান নাই, অঙ্গুষ্ঠমাত্র ভর করিয়া উর্ধ্ব হস্তে, সারাটি মাস দাঁড়াইয়া, কেবলই তপস্যা করিয়াছিলেন।

এদিকে সেখানকার মুনি-ঋষিগণের মনে বড়ই ভাবনা উপস্থিত! অর্জুনের সেই ভয়ানক তপস্যার তেজে ইহারই মধ্যে চারিদিক ধোঁয়ার মতো হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা সকলে ব্যস্তভাবে শিবের নিকট গিয়া বলিলেন, 'প্রভো! আমরা অর্জুনের তপস্যার তেজ সহিতে পারিতেছি না। ইঁহাকে শীঘ্র থামাইয়া দিন!'

মহাদেব কহিলেন, 'তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমি আজই অর্জুনকে সন্তুষ্ট করিয়া দিতেছি।' সুতরাং মুনিরা নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

ততক্ষণে শিব আর দুর্গাও কিরাত-কিরাতিনীর বেশে অর্জুনের তপস্যার স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভূতগুলিও নানা সাজে সঙ্গে চলিয়াছে।

এদিকে আবার কোথাকার একটা দানব শূকর সাজিয়া অর্জুনকে মারিতে আসিয়াছে, অর্জুনও গাণ্ডীব টানিয়া তাহাকে বধ করিতে প্রস্তুত। এমন সময় ব্যাধের বেশে মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'আরে থামো ঠাকুর! আমি আগে নিশানা করিয়াছি (ধনুক উঠাইয়াছি)।'

সামান্য ব্যাধের কথা অর্জুনের গ্রাহ্যই হইল না। তিনি তাহা তুচ্ছ করিয়া শুকরের উপর তীর ছুঁড়িলেন। ব্যাধও ঠিক তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এক তীর ছুঁড়িল। এখন এই কথা লইয়া দুজনে ভয়ানক তর্ক উপস্থিত।

অর্জুন বলিলেন, 'আমার শিকারে তুমি কেন তীর ছুঁড়িতে গেলে? দাঁড়াও, তোমাকে সাজা দিতেছি।'

ব্যাধ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আমি আগে নিশানা করিয়াছিলাম, আমার তীরেই শূকর মরিয়াছে! তুমি দেখিতেছি বেয়াদব! দাঁড়াও তোমাকে সাজা দিতেছি।'

এ কথায় অর্জুন বিষম রাগিয়া ব্যাধের উপরে কতই বাণ মারিলেন। ব্যাধ বাণ খাইয়া খালি হাসে, আর বলে, 'আরো মার্! দেখি তোর কত অস্ত্র আছে!'

অর্জুনের যত বড়-বড় বাণ আর ভারি-ভারি অস্ত্র ছিল, তিনি তাহার কোনোটাই ছুঁড়িতে বাকি রাখিলেন না। ব্যাধ বাণ খায়, আর কেবলই হাসে। অর্জুনের এমন যে অক্ষয় তূণ, ক্রমে তাহাও খালি হইয়া গেল। কিরাত তাহার সকল বাণ গিলিয়া খাইয়া তখনো হাসিতেছে! বাণ ফুরাইলে অর্জুন গাণ্ডীব দিয়াই কিরাতকে মারিতে গেলেন, সে সর্বনেশে মানুষ তাহাও কাড়িয়া লইল। তারপর খড়্গ লইয়া দু হাতে কিরাতের মাথায় মারিলেন, খড়্গ দুখানা হইয়া গেল! সকল অস্ত্র শেষ হইলে গাছ পাথর ছুঁড়িতে লাগিলেন, তাহাতেও কিছু ফল হইল না। শেষে ভয়ানক রাগের ভরে কিরাতকে জড়াইয়া ধরিতে গেলে, সে তাঁহাকে ধরিয়া এমনি চাপিয়া দিল যে, তাহাতে তিনি একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

জ্ঞান হইলে অর্জুন মাটির শিব গড়িয়া, ফুলের মালা দিয়া তাহার পূজা করিতে বসিলেন। সেই ফুলের মালা অর্জুনের গড়া শিবে না পড়িয়া, একেবারে সেই কিরাতের মাথায় গিয়া উপস্থিত! তাহা দেখিয়া অর্জুনও তাড়াতাড়ি তাহার পায়ে গিয়া পড়িলেন। কারণ, তখন আর তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, 'এ ব্যাধ নয়, স্বয়ং শিব।' অর্জুন বলিলেন, "প্রভো, না জানিয়া যুদ্ধ করিয়াছি, অপরাধ ক্ষমা করুন।"

মহাদেব বলিলেন, "অর্জুন! আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই লও, তোমার গাণ্ডীব। তোমার তূণও আবার অক্ষয় হইল। তুমি যথার্থ বীর পুরুষ, এখন বর লও।"

অর্জুন বলিলেন, "দয়া করিয়া আমাকে আপনার পাশুপত নামক অস্ত্র দান করুন।"

তখন মহাদেব তাঁহাকে সেই অস্ত্র দিয়া, তাহা ছাড়িবার এবং থামাইবার মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন. সেই ভয়ংকর অস্ত্রের তেজে তখন ভূমিকম্প আর বজ্রপাতের মতো শব্দ হইয়াছিল।

অর্জুনকে অস্ত্র দিয়া মহাদেব চলিয়া গেলে পর, বরুণ, কুবের, যম আর ইন্দ্রও সেখানে আসিয়া তাঁহাকে নানারূপ অস্ত্র দিলেন। যমের দণ্ড, বরুণের পাশ, প্রভৃতি অতি আশ্চর্য এবং ভয়ংকর অস্ত্র। এ অস্ত্রসকল তো অর্জুন পাইলেনই, তারপর স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রের এবং দেবতাদিগের নিকটে কত আদর কত মান্য, কত শিক্ষা পাইলেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইন্দ্রের নিকটে যে-সকল আশ্চর্য অস্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা অর্জুন নিবাত কবচ নামক দৈত্যদিগকে বধ করেন। তাহাতে দেবতাদের অনেক উপকার হয়। ইহা ছাড়া চিত্রসেন নামক গন্ধর্বের নিকট শিক্ষা করিয়া, তিনি সংগীত বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন, আর ইহাতে তাঁহার কত উপকার হইয়াছিল, তাহা শীঘ্রই দেখিতে পাইবে। এইরূপে স্বর্গে তাঁহার পাঁচ বৎসর পরম সুখে কাটিয়া যায়।

এদিকে কাম্যক বনে পাণ্ডবেরা অর্জুনের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত দুঃখিতভাবে দিন কাটাইতেছেন। তিনি কোথায় কিভাবে আছেন, কত দিনে ফিরিবেন, কিছুই তাঁহাদের জানা নাই, সুতরাং দুঃখ হইবার কথা। মাঝে মাঝে কোনো ধার্মিক মুনি-ঋষি আসিলে, তাঁহার

সহিত কথাবার্তায় কয়েকদিন তাঁহাদের মন একটু ভালো থাকে। একবার বৃহদশ্ব মুনি অসিয়া তাঁহাদের নিকট কিছুদিন রহিলেন। ইনি আশ্চর্যরকম পাশা খেলা জানিতেন। এই সুযোগে তাঁহার নিকট খুব ভালো করিয়া সেই খেলা শিখিয়া লওয়ায়, যুধিষ্ঠিরের অনেক উপকার হইল।

ইহার কিছুদিন পরে লোমশ মুনি স্বর্গ হইতে অর্জুনের সংবাদ লইয়া কাম্যক বনে আসেন। তাঁহার নিকটে সকল কথা শুনিয়া অর্জুনের সম্বন্ধে পান্ডবদের ভয় দূর হইল।

লোমশ বলিলেন যে, 'অর্জুন পান্ডবদিগকে নানারূপ তীর্থ দেখিয়া বেড়াইতে বলিয়াছেন।' সুতরাং তাঁহারা লোমশ মুনির সঙ্গেই তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। ভারতবর্ষের প্রায় কোনো তীর্থই তাঁহারা দেখিতে বাকি রাখিলেন না। প্রভাস নামক তীর্থে কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। সেই সময়ে যদুবংশের সকলে পান্ডবদিগের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যত শীঘ্র পারেন তাঁহারা কৌরবদিগকে মারিয়া পান্ডবদিগকে রাজা করিবেন। তাঁহারা তখনই যুদ্ধ আরম্ভ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কৃষ্ণ অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাদিগকে থামাইয়া রাখিলেন। কারণ, পান্ডবেরা নিজের কথামত বনবাস শেষ না করিয়া কিছুতেই রাজ্য লইতে সম্মত হইতেন না।

এইরূপে তীর্থ দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাঁহারা কৈলাস পর্বতে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ-সকল স্থান অতি ভয়ানক। একে তো পর্বতের উপর দিয়া চলাই খুব কঠিন, তাহাতে আবার যক্ষ রাক্ষসেরা ক্রমাগত সেখানে পাহারা দেয়। সুতরাং ভয়ের কথাই বটে, এ সময়ে ভীম সকলকে সাহস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি? চলিতে না পারিলে আমি পিঠে করিয়া লইব।"

পান্ডবেরা গন্ধমাদন পর্বতে উঠিবামাত্র ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হইল। ঘোরতর গর্জনে হাওয়া চলিয়াছে, পাথর ছুটিয়া আসিতেছে, চারিদিক অন্ধকার, প্রাণ থাকে কি যায়। ভীম অনেক কষ্টে দ্রৌপদীকে লইয়া একটা গাছ ধরিয়া রহিলেন। অন্যেরাও কেহ গাছ ধরিয়া, কেহ উইটিপি আঁকড়াইয়া, কেহ-বা গুহার ভিতর ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। এত শ্রম আর কষ্টের পর দ্রৌপদীর আর চলিবার শক্তি রহিল না। তাঁহার দুঃখে অন্য সকলেরও দুঃখের একশেষ হইল। তখন ভীম মনে মনে ঘটোৎকচকে ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র ঘটোৎকচ অনেক রাক্ষস-সহ আসিয়া বলিল, "বাবা! কেন ডাকিতেছ? কি করিতে হইবে?"

ভীম বলিলেন, "বাছা! দ্রৌপদী চলিতে পারিতেছেন না, তাঁহাকে বহিয়া লইয়া চল।"

ঘটোৎকচ তখনই দ্রৌপদীকে আর তাহার সঙ্গের রাক্ষসেরা অন্য সকলকে কাঁধে লইয়া চলিল। ইহাদের সাহায্য না পাইলে পান্ডবদিগের খুবই কষ্ট হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহারা তাঁহাদিগকে অনেক কঠিন স্থান পার করিয়া বদরী নামক তীর্থে পৌঁছাইয়া দিল। এই স্থানের নিকট হইতেই অর্জুন স্বর্গে গিয়াছিলেন, আর এখানেই তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা। সুতরাং পান্ডবেরা এইখানে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইহার মধ্যে একদিন কোথা হইতে এক আশ্চর্য পদ্মফুল আসিয়া দ্রৌপদীর নিকট পড়িল। সে ফুলের এমনি চমৎকার গন্ধ যে তাহা নাকে ঢুকিবামাত্র প্রাণ ঠান্ডা হইয়া যায়। দ্রৌপদী ফুলটি পাইয়া ভীমকে বলিলেন, "কি চমৎকার ফুল! আমাকে এইরূপ আরো অনেকগুলি ফুল আনিয়া দিতে হইবে। আমি কাম্যক বনে লইয়া যাইব।"

এ কথায় ভীম আহ্লাদের সহিত তখনই ফুল আনিতে চলিলেন, ফুলটি ঈশান কোন (অর্থাৎ উত্তর -পূর্ব কোণ) হইতে হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়াছিল সুতরাং ভীম বুঝিতে পারিলেন যে, ঐদিকে গেলে আরো ফুল পাওয়া যাইবে। সেদিকে অনেক দূর গিয়া তিনি একটা প্রকান্ড সরোবরে উপস্থিত হইলেন। সরোবরে স্নান করিয়া তিনি আবার ফুলের খোঁজে চলিয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন যে মস্ত একটা বানর তাঁহার পথের উপরে শুইয়া আছে।

বানরটাকে তাড়াইবার জন্য ভীম সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বানর তাহা বড়-একটা গ্রাহ্য করিল না। সে খালি একটু মিটি-মিটি চাহিয়া বলিল, "আহা! এমন চ্যাঁচাইও না, একটু ঘুমাইতে দাও, আমার অসুখ করিয়াছে।"

ভীম বলিলেন, "আমি পান্ডুব পুত্র। লোকে আমাকে পবনেব পুত্রও বলে। আমার নাম ভীম। তুমি কে?"

বানর একটু হাসিয়া বলিল, "আমি বানর।"

ভীম বলিলেন, "পথ ছাড় নহিলে সাজা পাইবে।"

বানর বলিল, "বড় অসুখ করিযাছে, উঠিতে পারি না। আমাকে ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যাও।"

ভীম বলিলেন, "সকল প্রাণীর শবীরেই ভগবান আছেন, তোমাকে ডিঙ্গাইলে তাঁহার অমান্য করা হইবে। আমি তাহা পারিব না।"

বানর বলিল, "বুড়া হইযাছি, উঠিতে পাবি না। আমার লেজটা সরাইয়া পাশ দিয়া চলিয়া যাও।"

ভীম মনে মনে বলিলেন, 'বটে! আচ্ছা দাঁড়াও, এই লেজ ধবিয়া তোমাকে ধোপার কাপড় কাচা দেখাইতেছি।'

এই মনে কবিযা তিনি বাঁ হাতে বানরের লেজ ধরিলেন. কিন্তু তাহা নাড়িতে পারিলেন না! তারপর দু হাতে ধরিযা টানিলেন. তবুও নাড়িতে পারিলেন না। প্রাণপণ করিয়া টানিলেন, তাঁহার চোখ বাহির হইয়া আসিবার গতিক হইল, ভ্রূ আব কপাল ভয়ানক কোঁচকাইয়া গেল, মুখ কালো হইয়া উঠিল, গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল— তবুও লেজ নড়িল না। তখন তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইযা জোডহাতে বলিলেন, "মহাশয়. আমাব অপরাধ হইয়াছে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি কে?"

বানর বলিল, "আমি পবন পুত্র, আমার নাম হনুমান।"

তখন ভীম তাড়াতাড়ি হনুমানের পায়ের ধূলা লইতে পারিলে বাঁচেন। হনুমান বড় ভাই, ভীম ছোট ভাই, কাজেই দুজনে দুজনকে দেখিয়া যার পবনাই আনন্দিত হইলেন। ভীম বলিলেন, "দাদা শুনিযাছি সমুদ্র পার হইবাব সময় আপনার বড় ভয়ংকর চেহারা হইয়াছিল। সেই চেহারটি আমি একবার দেখিতে চাই।"

হনুমান বলিলেন, "ভাই, ও চেহাবা দেখিয়া কাজ নাই, তুমি ভয় পাইবে।"

কিন্তু ভীম ছাড়িবেন কেন? তাঁহাব যে বীর বলিয়া বেশ একটু অহংকার আছে। কাজেই শেষটা হনুমানকে সেই চেহারা দেখাইতে হইল।

কি ভয়ংকর বিশাল চেহারা! কোথায়-বা তাহার মাথা, কোথায় বা তাহার লেজ। সে শরীর বন ছাড়াইয়া, পর্বত ছাড়াইয়া আকাশ পর্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিল। জ্বলন্ত সোনার মতো তাহার তেজে ভীমের চক্ষু আপনা হইতেই বুজিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া হনুমান বলিলেন,

"আর কাজ নাই, তাহা হইলে ভয় পাইবে।"

ভীম বলিলেন, "সত্যি দাদা, আমি আর তাকাইতে পারিতেছি না। এখন ওটাকে গুটাইয়া লউন।"

তখন হনুমান তাঁহার শরীর ছোট করিয়া ভীমের সহিত কোলাকুলি করিলেন, তারপর বলিলেন, "ভাই ঘরে যাও। দরকার হইলে আমাকে ডাকিও, আমি উপস্থিত হইব। যুদ্ধের সময় তুমি সিংহনাদ করিলে আমি তাহা বাড়াইয়া দিব, আর অর্জুনের রথের চূড়ায় বসিয়া এমন চিৎকার করিব যে, তাহাতেই শত্রু আধমরা হইয়া যাইবে।"

হনুমান ভীমকে এই কথা বলিয়া, আর তাঁহাকে পদ্মফুলের সন্ধান বলিয়া দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কৈলাস পর্বতের উপরে কুবেরের সরোবরে এই ফুল ফোটে। ফুলগুলি সোনার, তাহার বোঁটা বৈদূর্যমণির, আর তাহার গন্ধের কথা তো পূর্বেই বলিয়াছি। কুবেরের শত শত রাক্ষস প্রহরী সরোবরে পাহারা দেয়। ইহারা ভীমকে নিষেধ করিয়া বলিল, "হারে ই কিমন লোক বটেক্? কুবেবর্ র্ মহারাজ্জকু বলিলেক্ নি, পুছ্ছিলেক্ নি, আউ ফুল লেবেকে চলিলেক্।"

ভীম বলিলেন, "কোথায় তোদের কুবের মহারাজ , যে তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব? আমার নাম ভীম, পাণ্ডুর পুত্র। আমরা ক্ষত্রিয় কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করি না। পাহাড়ের উপরে ফুল ফুটিয়াছে তাহা তোদের কুবেরের যেমন, আমারও তেমনি, জিজ্ঞাসা আবার কাহাকে করিব?"

এই বলিয়া ভীম জলে নামিলেন। আর রাক্ষসেরাও অমনি "ধর! মার! কাট! বাঁধ! খা!" বলিতে বলিতে তোমর পট্টিশ হাতে দাঁত কড়মড়াইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল! কিন্তু ভীমের গদা যে কেমন জিনিস তাহা তাহারা জানিত না! সেই গদা ঘুরাইয়া ভীম যখন নিমেষের মধ্যে একশোটা রাক্ষসের মাথা ফাটাইয়া ফেলিলেন, তখন আরগুলি অস্ত্র-শস্ত্র ফেলিয়া চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে উর্ধ্বশ্বাসে কুবেরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। কুবের তাহাদের নিকট সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি জানি, ভীম দ্রৌপদীর জন্য ফুল নিতে আসিয়াছে। উঁহার যত ইচ্ছা ফুল লইয়া যাইতে দাও।"

সুতরাং রাক্ষসেরা আর ভীমকে বাধা দিল না, তিনি সাধ মিটাইয়া ফুল লইলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা ভীমের বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ঘটোৎকচের সাহায্যে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কুবেরের কথায় কিছুদিন তাঁহাদিগকে সেই স্থানে থাকিতে হইল। তারপর সেখান হইতে বিদায় লইয়া আবার বদরিকাশ্রমে আসিয়া তাঁহারা অর্জুনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ভীম আর-একটা রাক্ষস মারেন। এটার নাম জটাসুর। হতভাগা এমনি চমৎকার ব্রাহ্মণ সাজিয়া আসিয়াছিল যে, পাণ্ডবেরা তাহাকে রাক্ষস বলিয়া চিনিতেই পারেন নাই। তাঁহারা তাহাকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া আদরের সহিত সঙ্গে রাখিয়াছেন, আর ইহার মধ্যে দুষ্ট কোন্ সুযোগে একদিন যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব আর দ্রৌপদীকে লইয়া ছুট দিয়াছে। তাহার সাজাটাও ভীমের হাতে সে তেমনি করিয়া পাইল!

তারপর ক্রমে অর্জুনের ফিরিবার সময় কাছে আসিলে, পাণ্ডবেরা আবার গন্ধমাদন পর্বতে যান। ইহার কিছুদিন পরেই ইন্দ্রের রথে চড়িয়া অর্জুন স্বর্গ হইতে তাঁহাদের নিকটে

আসিযা উপস্থিত হইলেন। অর্জুনকে পাইয়া পাণ্ডবদেব এবং দ্রৌপদীব সুখেব সীমা বহিল না।

ইহাব পবে আবাব পাণ্ডবেবা কাম্যক বনে ফিবিযা আসিলেন। ফিবিবাব সময অবশ্য পথে অনেক ঘটনা হইযাছিল, কিন্তু তাহাব কথা বিশেষ কবিযা বলিবাব দবকাব নাই। কেবল ভীম একটা সাপেব মুখে পডিয়া কিরূপে নাকাল হইয়াছিল, তাহা একটু শুন।

বদবিকাশ্রম হইতে যাত্রা কবিয়া কিছুদিন পবে পাণ্ডবেবা সুবাহু নামক এক কিবাত বাজাব দেশে আসিযা উপস্থিত হন। এই স্থানে যামুন নামক একটা পর্বত আছে, তাহাব কাছে বনেব ভিতবে নানাবকম শিকাব মিলে। ভীম খুবই উৎসাহেব সহিত শিকাব কবিযা বেডান। ইহাব মধ্যে একদিন এক ভযংকব সাপ তাঁহাকে ধবিযা বসিযাছে। ধবিবামাত্রই ভীমেব বল সাহস সব কোথায যেন চলিযা গেল, তিনি কিছুতেই সাপেব বাঁধন এডাইতে পাবিলেন না।

সাপটা আবাব মানুষেব মতো কথা কয। সে বলিল যে বহুকাল পূর্বে পাণ্ডবদেবই বংশে সে নহুস নামে বাজা ছিল, অগস্ত্য মুনিব শাপে এখন সাপ হইযাছে। ভীমেব পবিচয পাইযা সে বলিল, "দেখিতেছি, তুমি আমাবই বংশেব লোক। কিন্তু তথাপি তোমাকে না খাইযা থাকিতে পাবিতেছি না।"

ভীমেব কপাল ভালো যে, সেই সমযে যুধিষ্ঠিব তাঁহাকে খুঁজিতে খুজিতে সেখানে আসিযা উপস্থিত হইলেন। ভীমেব দশা দেখিযা তো তিনি একেবাবে অবাক। তিনি তাঁহাকে ছাডিযা দিবাব জন্য সাপকে অনেক মিনতি কবিলেন, কিন্তু সে তাহাতে বাজি হইল না। শেষে যুধিষ্ঠিব জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কি হইলে তুমি ভীমকে ছাডিতে পাব?"

সাপ বলিল, "আমাব কথাব উত্তব দিতে পাব তো ইহাকে ছাডিযা দিই, কেননা, তাহা হইলে আমাব শাপ দূব হইবে।

যুধিষ্ঠিব তাহাতেই সম্মত হইলেন। কিন্তু সে সর্বনেশে সাপ আবাব এমনি ভযানক পণ্ডিত যে ব্রহ্মাণ্ডেব যত উৎকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিযা সে যুধিষ্ঠিবকে ব্যস্ত কবিযা তুলিল। যাহা হউক, সে তাঁহাকে ঠকাইতে পাবিল না শেষে খুশি হইযা বলিল, "তোমাব বিদ্যা দেখিযা আমি খুব সন্তুষ্ট হইযাছি, সুতবা তোমাব ভাইকে খাইব না।"

বাস্তবিক যুধিষ্ঠিব না আসিলে সেদিন সাপেব হাতে পডিযা নিশ্চয ভীমেব প্রাণ যাইত।

পাণ্ডবেবা কাম্যক বন হইতে দ্বৈত বনে গিযা একটি সুন্দব সবোববেব ধাবে এক কুঁডে ঘবে বাস কবিতে লাগিলেন। ইহাব মধ্যে কি এক ঘটনা হইল শুন। দুষ্ট লোকেবা সাধুদিগকে কেবল ক্লেশ দিযাই সন্তুষ্ট হয না, ক্লেশটা কেমন হইতেছে, তাহা আবাব দেখিতে চাহে পাণ্ডবেবা নিতান্ত কষ্টে বনবাস কবিতেছেন, এ কথা দুর্যোধন প্রভৃতিবা শোনেন, আব তাহাদেব খালি দুঃখ হয, আহা উহাবা কেমন কষ্ট পাইতেছে, তাহাব তামাশাটা একবাব দেখিতে পাইলাম না, আব আমাদেব জাঁকজমকটাও উহাদিগকে দেখাইতে পাবিলাম না। যতই তাঁহাবা এ কথা ভাবেন, ততই তাঁহাদেব মনে হয যে, এ কাজটা না কবিলেই চলিতেছে না। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হইতে পাবে? ধৃতবাষ্ট্র কি সহজে তাঁহাদিগকে দ্বৈত বনে যাইতে দিবেন?

অনেক ভাবিযা চিন্তিয়া শেষে তাঁহাবা ইহাব এক উপায স্থিব কবিলেন। দ্বৈত বনে দুর্যোধনেব অনেক গোয়ালা প্রজা বাস কবে, বাজাব গোরু-বাছুব বাখাব ভাব তাহাদেব

উপরে। এ সকল গোরুর খবর নেওয়া রাজার একটা কাজ, সুতরাং এই কাজের ছল করিয়া দুর্যোধন দ্বৈত বনে যাইতে চাহিলে ধৃতরাষ্ট্রের অমত হইবে না।

এই প্রস্তাব শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে বলিলেন, "ওখানে গিয়া কাজ নাই। ওখানে পাণ্ডবেরা আছেন, কি জানি, যদি কোনো কথায় তাঁহাদের সহিত ঝগড়া হয়। "

এ কথায় শকুনি বলিলেন, "রাম রাম! আমরা কি তাহাদের কাছে যাইব? আমরা গোরু দেখিয়া আর দূরে দূরে একটু শিকার করিয়াই চলিয়া আসিব উঁহাদের সঙ্গে আমাদের দেখাই হইবে না।"

কাজেই ধৃতরাষ্ট্র শেষে রাজি হইলেন। হুকুম পাওয়ামাত্র হাতি ঘোড়া, লোকজন, সৈন্য-সামন্ত, সাজিয়া প্রস্তুত। একলক্ষ গোরু দেখিতে হইবে, তাহার জন্য দশলক্ষ লোক পৃথিবী কাঁপাইয়া দ্বৈত বনে যাত্রা করিল। রাজপুত্রেরা নিজে গিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না, আবার পরিবারদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

গোরু দেখার কাজ দেখিতে দেখিতেই শেষ হইয়া গেল, শিকারেও খুব বেশি সময় লাগিল না। তারপর ক্রমে তাঁহারা সেই সরোবরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যাহার ধারে পাণ্ডবদিগের আশ্রম। সে সময়ে সেই সরোবরে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন সপরিবারে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গের মেয়েদের স্নানের সুবিধার জন্য সরোবরটিকে বেড়া দিয়া ঘেরা হইয়াছিল।

গন্ধর্বের দরোয়ানেরা দুর্যোধনের লোকদিগকে সরোবরে যাইতে নিষেধ করে, দুর্যোধন আবার তাহা শুনিয়া গন্ধর্বদিগকে তাড়াইয়া দিবার হুকুম দেন। এইরূপে ক্রমে দুই দলে গালাগালি হইয়া শেষে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

কৌরবদের সাহস খুব ছিল, আর কর্ণ, দুর্যোধন ইঁহারা যোদ্ধাও কম ছিলেন না, কাজেই প্রথমে তাঁহারা গন্ধর্বের লোকদিগকে বেশ একটু জব্দই করিয়া তোলেন। কিন্তু তারপর যখন চিত্রসেন নিজে অসংখ্য গন্ধর্ব লইয়া ক্রোধভরে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তখন কৌরবদের আর দুর্দশার সীমাই রহিল না। সৈন্যেরা তো প্রাণপণে তাহাদের মা-বাপের নাম লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিলই, এমন যে কর্ণ, তিনিও শেষে আর দুর্যোধনের দিকে না চাহিয়াই তাহাদের পিছু পিছু পলায়ন করিলেন।

আর দুর্যোধন? সে লজ্জার কথা আর কি বলিব? গন্ধর্বেরা তাঁহাকে আর তাহার ভাইদিগকে তাঁহাদের সমস্ত জাঁকজমক সুদ্ধ সপরিবারে বাধিঁয়া লইয়া চলিল।

এদিকে যাহারা পলাইয়াছিল, তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে পাণ্ডবদিগের নিকট আসিয়া দুর্যোধনের দুর্দশার কথা জানাইল। তাহাদের কথা শুনিয়া ভীম বলিলেন, "বাঃ! আমরা অনেক কষ্টে যাহা করিতাম, গন্ধর্বেরাই আজ আমাদের সে কাজ করিয়া দিল। যেমন দুষ্ট তাহাদের তেমনি সাজা হইয়াছে।"

যুধিষ্ঠির তখন একটা যজ্ঞ করিতেছিলেন। ভীমের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ছি, ভীম। এমন সময় কি এরূপ কথা বলিতে আছে? উহাদের অপমান হইলে তো আমাদেরই বংশের অপমান। তাহা ছাড়া উহারা এখন আমাদের আশ্রয় চাহিতেছে। তুমি, অর্জুন, নকুল আর সহদেব শীঘ্র গিয়া উহাদিগকে ছাড়াইয়া আন। আমি যজ্ঞে ব্যস্ত আছি নহিলে আমি নিজে যাইতাম।" কাজেই তখন অর্জুন, নকুল আর সহদেব ছুটিয়া চলিলেন।

তাঁহারা প্রথমে মিষ্টকথায় গন্ধর্বদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। গন্ধর্বেরা তাহা না শুনাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, আর অর্জুনের সহিত খানিক যুদ্ধ করিয়া তাহাদের এমনি দুর্দশা হইল যে, বেচারদের টিকিবারও সাধ্য নাই, পলাইবারও পথ নাই, মাটি ছাড়িয়া আকাশে উঠিয়াও স্থির হইবার জো নাই। ইহা দেখিয়া তাহাদের রাজা বিষম রাগে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অর্জুনের কাছে বলিলেন, "অর্জুন! আমি যে তোমার বন্ধু চিত্রসেন।"

তখন অর্জুন দেখেন সত্যিই তো, এ যে চিত্রসেন—সেই স্বর্গে যাঁহার নিকট গান বাজনা শিখিয়াছিলেন। অমনি যুদ্ধ ছাড়িয়া দুই বন্ধুতে কোলাকুলি আরম্ভ হইল।

তারপর অর্জুন বলিলেন, "একি বন্ধু কৌরবদিগকে কেন বাঁধিয়া আনিলে?"

চিত্রসেন বলিলেন, "হতভাগারা তোমাদিগকে অপমান করিতে আসিয়াছিল, তাই ইন্দ্রের কথায় ইহাদিগকে বাধিয়া দেওয়া হয়।"

অর্জুন বলিলেন, "তাহা হইবে না! দুর্যোধন আমাদের ভাই, যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত ইচ্ছা, ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।"

চিত্রসেন বলিলেন, " এমন দুষ্টকে কখনই ছাড়া উচিত নহে' চল আমরা গিয়া যুধিষ্ঠিরকে সকল কথা বলি, তারপর তিনি যাহা বলেন, তাহাই হইবে।"

যুধিষ্ঠির যে উহাঁদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, তাহা বোধহয় আর না বলিলেও চলে। তাঁহাদের দুষ্টবুদ্ধির কথা শুনিয়া তিনি কেবল বলিলেন, "ভাই আর কখনো এমন সাহস করিও না, এখন সুখে বাড়ি যাও।"

হায় রে মহারাজ দুর্যোধন! যে পান্ডবদিগকে জব্দ করিবার জন্য এত জাঁকজমকের সহিত আসিলেন, এখন সেই পান্ডবদের কৃপায় প্রাণ লইয়া তিনি চোরের মতন ঘরে ফিরিতেছেন। আর ঘরে ফিরিবেনই-বা কোন্ মুখে? তাহার চেয়ে বরং মৃত্যুই তাহার ভালো বোধ হইল। সঙ্গের লোকদিগকে তিনি বলিলেন, 'আমার আর বাঁচিয়া কাজ কি? তোমরা ঘরে যাও, দুঃশাসন রাজা হউক, আমি এইখানেই পড়িয়া মরিব।'

দুঃশাসন তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কর্ণ আর শকুনি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'সে কি দুর্যোধন, তোমার কিসের লজ্জা? পাণ্ডবেরা তোমার রাজ্যে বাস করে, কাজেই তাহারা তোমার প্রজা, সুতরাং আপদ-বিপদে তোমাকে রক্ষা করা তো তাহাদের কাজ হইল! ইহাতে তাহাদেরই বাহাদুরী কি, আর তোমারই-বা লজ্জার কথা কি?'

তবুও সহজে দুর্যোধন শান্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে বুঝাইতে দুটি দিন লাগিয়াছিল।

দুষ্টলোকের সাজা হয়, কিন্তু তাহাতে তাহার শিক্ষা হয় না। দুর্যোধন কোথায় ইহার পর হইতে পাণ্ডবদিগের সহিত ভালো ব্যবহার করিবেন, না তাঁহার হিংসা আরো বাড়িয়া চলিল।

ইহার মধ্যে একদিন দুর্বাশা মুনি দশহাজার শিষ্য সমেত হস্তিনায় আসিলেন। এমন বিষম বদরাগী সর্বনেশে মানুষ এই পৃথিবীতে আর জন্মায় নাই। কথায় কথায় তিনি যাহাকে তাহাকে শাপ দিয়া বসেন! রাত দুপুর হউক-না কেন, 'খাইব' বলিতেই খাবার আনিয়া উপস্থিত করিতে না পারিলে নিশ্চয় শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন। আবার তাড়াতাড়ি আনিতে পারিলে হয়তো বলিবেন, 'খাইব না'। সঙ্গে সঙ্গে দুটা গালি দেওয়াও আশ্চর্য নহে।

দুর্যোধন প্রাণপণে এই দুর্বাশা মুনির সেবা করিয়া তাঁহাকে যারপরনাই খুশি করিয়া ফেলিলেন। দুর্বাশা বলিলেন, 'আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি চাহ?'

দুর্যোধন বলিলেন 'আপনি যদি দয়া করিয়া একটিবার দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হইবার পর, আপনার এই দশহাজার শিষ্য লইয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমে আহার করিতে যান, তবেই আমার ঢের হয়, আমি আর কিছু চাহি না।'

দুর্বাশা বলিলেন 'আচ্ছা, আমি অবশ্য যাইব।'

এই বলিয়া দুর্বাশা চলিয়া গেলেন আর দুর্যোধনও এই ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন যে, 'দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হইলে আর পাণ্ডবেরা দুর্বাশাকে খাইতে দিতে পারিবে না, সুতরাং মুনি তাঁহাদিগকে শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন।'

ইহার পর একদিন সত্যসত্য দুর্বাশা গিয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, থালায় আর খাবার নাই। সে যাত্রা কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে রক্ষা না করিলে তাঁহাদের বড়ই বিপদ হইত। একজনেরও ভাত নাই, অথচ দশহাজার শিষ্য লইয়া মুনি উপস্থিত। এখন উপায়? যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে স্নান-আহ্নিক করিবার জন্য গঙ্গায় পাঠাইয়া দিলেন আর দ্রৌপদী মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'হায় হায়! স্নান করিয়া আসিলে ইহাদিগকে কি খাওয়াইব?'

উপায় না দেখিয়া দ্রৌপদী মনে মনে কৃষ্ণকে ডাকিলেন। কৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নহেন, তিনি দেবতা, কাজেই দ্রৌপদীর দুঃখের কথা জানিতে পারিয়া সেই মুহূর্তেই উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ আসিয়াই বলিলেন 'দ্রৌপদী, বড় ক্ষুধা হইয়াছে, কিছু খাইতে দাও।'

দ্রৌপদী লজ্জিত হইয়া বলিলেন থালায় তো কিছুই নাই, কি খাইতে দিব।

কৃষ্ণ বলিলেন, 'অবশ্য কিছু আছে থালাখানি আন তো।'

কাজেই দ্রৌপদী থালা আনিয়া উপস্থিত করিলেন। উহার একপাশে তখনো এক কণা শাক-ভাত লাগিয়াছিল। কৃষ্ণ সেই এক বিন্দু শাক-ভাত মুখে দিয়া বলিলেন 'ইহাতেই বিশ্বাত্মা তুষ্ট হউন। তারপর ভীমকে বলিলেন, 'মুনিদিগকে ডাক।'

এ সকল কথা বলিতে যত সময় লাগিল, কাজেও তাহার চেয়ে বড় বেশি লাগে নাই মুনিরা ততক্ষণে সবে স্নান শেষ করিয়াছেন ইহার মধ্যে হঠাৎ তাঁহাদের পেট ভরিয়া গেল। সকলে আশ্চর্য হইয়া মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। পেটে আর একটি হজমিগুলিরও স্থান নাই। এদিকে যুধিষ্ঠির হয়তো কত কষ্ট করিয়া আহারের আয়োজন করিয়াছেন, তাহার নিকট গিয়া কি করিয়া মুখ দেখাইবেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া দুর্বাশা বলিলেন, 'এ যাত্রা আমরা বড়ই বেল্লিক হইয়া গেলাম। এখন যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইতে অতিশয় লজ্জাবোধ হইতেছে, চল এখান হইতেই পলায়ন করি।' কাজেই বিপদ কাটিয়া গেল।

এই সময়ে পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে বাস করিতেছিলেন। সেখানে আর-একটা ঘটনা হয়, তাহার কথা এখন বলিতেছি।

দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলাকে যে বিবাহ করিয়াছিল, তাহার নাম জয়দ্রথ। এই হতভাগা একদিন অনেক সৈন্য আর বন্ধু-বান্ধব লইয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমের নিকট দিয়া যাইতেছিল। পাণ্ডবেরা তখন শিকার করিতে গিয়াছেন, দ্রৌপদীর নিকট এক ধৌম্য ছাড়া আর কেহই নাই। দ্রৌপদীকে দেখিবামাত্র জয়দ্রথ 'কেমন আছ? সব ভালো তো?' বলিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিল।

একজন ভদ্রলোক বাড়িতে আসিলে তাহার আদর যত্ন না করিলে নয়। কাজেই দ্রৌপদী

জয়দ্রথকে বসিবার জায়গা আর পা ধুইবার জল দিয়া বলিলেন, 'জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করুন। পাণ্ডবেরা শীঘ্রই আসিবেন।' কিন্তু জয়দ্রথ বসিবার জন্যে আসে নাই। দুষ্ট ভাবিয়াছে, পাণ্ডবেরা আসিবার পূর্বেই দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করিবে।

সে প্রথমে দ্রৌপদীকে অনেক মিনতি করিল, তারপর লোভ দেখাইল, শেষে ভয় দেখাইতেও ছাড়িল না। দ্রৌপদী রাগে, ভয়ে, ঘৃণায় তাহাকে গালি দিতে দিতে ধৌম্যকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু দুরাত্মা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া দ্রৌপদীকে টানিয়া লইয়া চলিল দ্রৌপদী তাঁহার গায় হাত দিতে বার বার নিষেধ করিলেন। তাহা শুনিল না দেখিয়া ভয়ানক রাগের ভরে তাহাকে টানিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু সেই দস্যুর সহিত যুদ্ধ করা কি তাঁহার কাজ? পাপিষ্ঠ ধৌম্যের সম্মুখেই তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইয়া চলিল।

ধৌম্য পুরুত মানুষ তিনি আর কি করিবেন? তিনি তাহাকে গালি দিতে দিতে রথের পিছু পিছু চলিলেন।

এদিকে পাণ্ডবদিগের আর শিকার ভালো লাগিতেছে না আর তাঁহাদের মনেও যেন কেমন একটা ভয় আসিয়াছে — যেন তাঁহাদের কোনো বিপদ উপস্থিত। তাঁহারা তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরিয়া দেখিলেন, দাসী ধাত্রেয়িকা কাঁদিতেছে। সে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগকে সকল কথাই জানাইল। পাঁচ ভাই তাহা শুনিয়া আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করিলেন না।

কোথায় সে দুরাত্মা? আজ তাহার মাথাটা না জানি কয় টুকরা হয়। পাঁচ ভাই গর্জন করিতে করিতে রথ হাঁকাইয়া চলিয়াছেন। কোথায় সে দুরাত্মা? ঐ ধুলা উড়িতেছে। ঐ পথে দুষ্ট পলায়ন করিতেছে। ঐ শুন ধৌম্যের গলার শব্দ। মার মার! কাট, কাট! হতভাগাদের একটাও বুঝি আর মাথা থাকিবে না। ইহার মধ্যে কত সৈন্য কাটা গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই একটা প্রকাণ্ড হাতি শুঁড় উঠাইয়া নকুলকে মারিতে আসিল, নকুল খড়্গ দিয়া তাহার দাঁতসুদ্ধ শুঁড় কাটিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু দুরাত্মা জয়দ্রথ কোথায়? ঐ দেখ পাষণ্ড দ্রৌপদীকে ফেলিয়া পলাইতেছে। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ধৌম্য আর নকুলকে রথে তুলিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সেই দুরাত্মা পলাইয়া গেল নাকি? কোথায় যাইবে? ভীম আর অর্জুন যাহার পিছু ছুটিয়াছেন তাহার কি আর পলাইবার জো আছে? এখনই তাঁহারা পাপিষ্ঠের চুলের মুঠি ধরিবেন। আর তাহাকে কি আস্ত রাখিবেন?

যুধিষ্ঠিরও ভাবিতেছেন যে, ভীমার্জুনের হাতে পড়িলে আর হতভাগা আস্ত থাকিবে না। তাই তিনি বলিতেছেন, 'উহাকে মারিও না যেন, তাহা হইলে দুঃশলার আর জ্যাঠাইমার বড়ই কষ্ট হইবে।'

কিন্তু সে দুরাত্মা গেল কোথায়? দুষ্ট বনের ভিতরে লুকাইয়াছিল। সেইখানে গিয়া ভীম তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে কি আছড়ান আছড়াইলেন! আছাড় খাইয়া উঠিতে না উঠিতেই আবার তাহার মাথায় বিষম লাথি। তারপর বুকে হাঁটু দিয়া, উঃ কি ভয়ানক সাজা! হতভাগা চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে শেষে অজ্ঞান হইয়া গেল।

অর্জুন দেখিলেন যে, জয়দ্রথ মারা যায়, তাই তিনি ভীমকে তাড়াতাড়ি যুধিষ্ঠিরের কথা মনে করাইয়া দিলেন। তখন ভীম তাহাকে আর মারিলেন না বটে, কিন্তু অর্ধচন্দ্র বাণ দিয়া তাহার মাথার খানিক মুড়াইয়া আর পাঁচ জায়গায় পাঁচটি ঝুঁটি রাখিয়া তাহাকে এমনি উৎকট

সঙ সাজাইলেন যে, দেখিলে বুঝিতে! তারপর তাহাকে দুই ধমক দিয়া বলিলেন, 'খবরদার! ভুলিস না যেন—সকলের কাছে বলিবি তুই আমাদের গোলাম।'

জয়দ্রথ কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাতেই রাজি।

এইভাবে তাহাকে আনিয়া যুধিষ্ঠিরের সামনে উপস্থিত করা হইল। তাহার চেহারা দেখিয়া কি আর কেহ হাসি থামাইয়া রাখিতে পারে? যুধিষ্ঠির অবধি হাসিয়া অস্থির! ভীম বলিলেন, 'মহারাজ, এই হতভাগা আমাদের গোলাম হইয়াছে! এখন ইহাকে ছাড়িব কিনা, দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করুন।'

সাজাটা যে ভালোরকমই হইয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই! কাজেই উহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই মত হইল। যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'যাও এমন কাজ আর করিও না।'

সেখান হইতে বিদায় হইয়াই জয়দ্রথ শিবের তপস্যা আরম্ভ করিল। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া যখন শিব বর দিতে আসিলেন তখন সে বলিল, 'আমি পাঁচ পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজয় করিব।'

শিব বলিলেন, 'তুমি চারিজনকে পরাজয় করিবে, কিন্তু অর্জুনকে পারিবে না। অর্জুনকে পরাজয় করিবার শক্তি দেবতাদিগেরও নাই।' এই বলিয়া শিব চলিয়া গেলেন, জয়দ্রথ বাড়ি ফিরিল।

এই সময়ে আর-একটা ঘটনা ঘটে। কর্ণ কেমন বীর ছিলেন, তাহা শুনিয়াছ। কর্ণ কানে অতি আশ্চর্য কুণ্ডল আর শরীরে কবচ (বর্ম) লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই কুণ্ডল আর কবচ শরীরে থাকিতে তাঁহাকে মারিবার ক্ষমতা কাহারো ছিল না। অর্জুনকে ইন্দ্র বিশেষ স্নেহ করিতেন, আর কর্ণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহার বড়ই বিপদের আশংকা দেখিয়া দুঃখিত থাকিতেন। তাই তিনি ভাবিলেন, 'এই কুণ্ডল আর কবচ লইয়া আসিব।'

কর্ণ গঙ্গায় স্নান করিয়া সূর্যের স্তব করিতেন। সে সময়ে কেহ তাঁহার নিকট কিছু চাহিলে, তিনি তাহাকে ফিরাইতেন না, এই তাঁহার নিয়ম ছিল। একদিন ঠিক এইরূপ সময়ে, ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র যে কর্ণকে ফাঁকি দিয়া কুণ্ডল আর কবচ আনিতে যাইবেন, এ কথা সূর্যদেব আগেই জানিতে পারিয়া কর্ণকে সাবধান করিয়া দেন, আর উহা দিতে নিষেধ করেন। কিন্তু কর্ণ কখনো নিয়ম ভঙ্গ করিতেন না, কাজেই তিনি বলিলেন, 'আমার যখন নিয়ম আছে, তখন না দিয়া পারিব না।'

এ কথায় সূর্য বলিলেন, 'তাহাই যদি হয়, তবে কুণ্ডল আর কবচের বদলে ইন্দ্রের নিকট হইতে 'এক পুরুষ-ঘাতিনী' নামক শক্তি চাহিয়া লইবে।'

কর্ণ প্রথমে ইন্দ্রকে সামান্য ব্রাহ্মণ মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুর, আপনার কি চাই?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তোমার ঐ কুণ্ডল আর কবচ আমাকে দাও।'

কর্ণ কুণ্ডল আর কবচের বদলে কত কিছু দিতে চাহিলেন—ধনরত্ন, গোরু বাছুর, এমন-কি, রাজ্যের কথা পর্যন্ত বাকি রাখিলেন না। ব্রাহ্মণ কি তাহা শোনেন? তিনি কেবলই বলেন, 'আমার ঐ কুণ্ডল আর কবচটি চাই।'

তখন কর্ণ বুঝিতে পারিলেন, এ ব্রাহ্মণ যে-সে ব্রাহ্মণ নহে, স্বয় ইন্দ্র। কাজেই তিনি

বলিলেন, 'আমি যদি কুণ্ডল আর কবচ দিই তাহা হইলে আমাকে আপনার 'এক-পুরুষ ঘাতিনী' শক্তি দিতে হইবে।

ইন্দ্র বলিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হউক। এই আমার 'এক-পুরুষ-ঘাতিনী' শক্তি তোমাকে দিতেছি, কিন্তু ইহার একটা নিয়ম আছে। যেখানে আর কোনো অস্ত্রেই কাজ হইবার নহে, কেবল সেই স্থলেই এ অস্ত্র ছুঁড়িলে নিশ্চয় মৃত্যু। যেখানে-সেখানে ছুঁড়িয়া বসিলে ইহা তোমারই গায়ে পড়িবে। এ অস্ত্রে এক জনের বেশি লোক মরে না। সেই একজন শত্রু যত বড় যোদ্ধাই হউক, তাহাকে মারিয়া আমার শক্তি আমার নিকটে চলিয়া আসিবে।

কর্ণ তাহাতেই রাজি হইয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে শক্তি লইলেন, এবং নিজের কুন্ডল আর কবচ তাঁহাকে খুলিয়া দিলেন।

ইন্দ্র কর্ণের কুন্ডল আর কবচ লইয়া গিয়াছেন, এ কথা শুনিয়া দুর্যোধনের দলের যেমন দুঃখ হইল, পান্ডবেরা তেমনই আনন্দ পাইলেন।

এই সময়ে পান্ডবেরা কাম্যক বন হইতে দ্বৈত বনে চলিয়া আসেন। ইহার কিছুদিন পরে একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা হইয়াছিল।

কাঠে কাঠে ঘষিলে আগুন বাহির হয়। এই উপায়ে পূর্বকালের মুনি-ঋষিরা অনেক সময় আগুন জ্বালিতেন। যাঁহাদের গৃহে প্রত্যহ অগ্নির পূজা হইত, তাঁহাদের যখন-তখন আগুনে জ্বালিবার একটা ব্যবস্থা না রাখিলেই চলিত না। তাঁহাদের সকলেরই 'অরণী' নামক দুখানি কাঠ থাকিত। এই কাঠ দুখানি ঘষিয়া তাঁহারা আগুনে জ্বালিতেন।

ইহার মধ্যে হইয়াছিল কি—দ্বৈত বনের এক তপস্বী ব্রাহ্মণ একটা গাছে তাঁহার অরণীটি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। একটা হরিণ আসিয়া সেই গাছে গা ঘষিতে আরম্ভ করে। ঘষিতে ঘষিতে ব্রাহ্মণের অরণীখানি কেমন করিয়া তাহার শিঙে আটকাইয়া যায়, তাহাতে হরিণও ভয় পাইয়া সেই অরণীসুদ্ধ বেগে পলায়ন করে।

তখন ব্রাহ্মণটি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পান্ডবদিগকে তাঁহার অরণী আনিয়া দিতে বলায়, পাঁচ ভাই মিলিয়া সেই হরিণের পিছু পিছু তাড়া করিলেন। কিন্তু তাহাকে তাঁহারা ধরিতে বা মারিতে তো পারিলেনই না, লাভের মধ্যে এই হইল, যে, পিপাসা আর পরিশ্রমে তাহাদের প্রাণ যায়-যায়। তখন তাঁহারা বিশ্রামের জন্য একটা গাছের তলায় বসিয়া নকুলকে জল আনিতে পাঠাইলেন।

নিকটেই একটি জলাশয় ছিল। নকুল তাহাতে নামিয়া জল খাইতে যাইতেছেন, এমন সময় এক যক্ষ আকাশ হইতে তাঁহাকে বলিল, "বাছা নকুল। ও জল আগে আমি দখল করিয়াছি। আমার কথার উত্তর দিয়া, তবে জল খাও।"

নকুল যক্ষের কথা গ্রাহ্য না করিয়া জল তুলিয়া মুখে দিলেন। সে জল পান করিবামাত্র তাঁহার মৃত্যু হইল।

এদিকে যুধিষ্ঠির নকুলের বিলম্ব দেখিয়া, সহদেবকে বলিলেন, "নকুলের কেন এত বিলম্ব হইতেছে? তুমি শীঘ্র তাহার অনুসন্ধান কর।"

সহদেব নকুলকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই জলাশয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মৃতদেহ দেখিবামাত্র কাঁদিয়া অস্থির হইলেন, তারপর ভয়ানক পিপাসা হওয়াতে, তিনিও জলাশয়ে নামিয়া জল খাইতে গেলেন। তখন সেই যক্ষ তাঁহাকেও বাধা দিয়া বলিল, "আগে আমার কথার উত্তর

দাও তারপর জল খাইতে পাইবে।"

যক্ষের সে কথা অমান্য করিয়া সহদেব যেই জল খাইলেন অমনি তাঁহারও মৃত্যু হইল।

এইরূপে ক্রমে সহদেবকে খুঁজিতে আসিয়া, অর্জুন, এবং অর্জুনকে খুঁজিতে আসিয়া ভীম সেই যক্ষের নিষেধ অমান্য করিয়া জলাশয়ের জল খাওয়ায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

সর্বশেষে যুধিষ্ঠিরও তাহাদের অন্বেষণে সেই জলাশয়ের ধারে আসিয়া তাঁহাদের মৃত শরীর দর্শনে অনেক দুঃখ করার পর, জল পান করিতে উদ্যত হওয়ায়, একটা বক তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, "বাছা যুধিষ্ঠির! আমিই তোমার ভাইদিগকে মারিয়াছি। আমার কথার উত্তর দিয়া তবে জল খাও।"

বকের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এ সকল মহাবীরকে বধ করা পাখির কর্ম নহে! আপনি কে?"

তখন সেই বক তালগাছ প্রায় বিশাল যক্ষরূপ ধরিয়া বলিল, "আমি যক্ষ। তোমার ভ্রাতারা আমার কথা অবহেলা করিয়া জল পান করাতে, তাহাদিগকে বধ করিয়াছি। তুমি আগে আমার কথায় উত্তর দিয়া, তারপর জল খাও।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আপনার প্রশ্ন কি বলুন, যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।"

এ কথায় যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে অনেক প্রশ্ন করিল, যুধিষ্ঠির তাহার সকল গুলিরই উত্তর দিলেন সকল প্রশ্নের কথা লিখিবার স্থান এ পুস্তকে নাই, দু-একটি কথা মাত্র বলিতেছি।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "পৃথিবীর চেয়ে ভারি কে? স্বর্গের চেয়ে উঁচু কে? বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী কে? তৃণের চেয়েও কাহার সংখ্যা বেশি?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মাতা পৃথিবীর চেয়ে ভারি, পিতা আকাশের চেয়ে উঁচু, মন বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী, আর চিন্তার সংখ্যা তৃণের চেয়েও বেশি।"

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "কে ঘুমাইলে চোখ বোজে না? কে জন্মিয়া নড়ে চড়ে না? কাহার হৃদয় নাই? কে নিজের বেগেতেই বড় হয়?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মাছ ঘুমাইলে চোখ বোজে না, ডিম জন্মিয়া নড়ে-চড়ে না, পাথরের হৃদয় নাই, নদী নিজের বেগের দ্বারা বড় হয়।"

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "সুখী কে? আশ্চর্য কি? পথ কি? সংবাদ কি?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "যাহার ঋণ নাই, আর নিজের ঘরে থাকিয়া দিনের শেষে যে চারিটি শাক-ভাত খাইতে পায়, সেই সুখী। প্রতিদিন জীবের মৃত্যু হইতেছে, তথাপি যে, লোকে চিরদিন বাঁচিতে চায়, ইহাই আশ্চর্য। মহাপুরুষেরা যে পথে যান, তাহাই পথ। সময় যেন পাচক, সে যেন প্রাণীদিগকে দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিতেছে ইহাই সংবাদ।"

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ বলিল, "তোমার ইচ্ছামত একটি ভাইকে বাঁচাইতে পার।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তবে দয়া করিয়া নকুলকে বাঁচাইয়া দিন।"

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "ভীম আর অর্জুনকে ছাড়িয়া তুমি নকুলকে বাঁচাইতে বলিলে, ইহার কারণ কি?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মাতা কুন্তীর এক পুত্র আমি জীবিত রহিয়াছি, এখন নকুল বাঁচিলে মাতা মাদ্রীরও একটি পুত্র থাকে, এইজন্য আমি নকুলকে বাঁচাইতে বলিয়াছি।"

এ কথায় যক্ষ অতিশয় তুষ্ট হইয়া, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব চারিজনকেই বাঁচাইয়া দিল। তারপর সে নিজের পরিচয় দিয়া বলিল, "বাছা! আমি ধর্ম। তোমার মহত্ত্ব দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি বর লও।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তবে সেই ব্রাহ্মণ যাহাতে তাঁহার অরণীখানি পান, তাহা করুন।"

ধর্ম বলিলেন, 'তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমিই হরিণ সাজিয়া অরণী হরণ করিয়াছিলাম, ব্রাহ্মণ তাহা পাইবেন। এক্ষণে তুমি অন্য বর চাহ।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমাদের বনবাসের বারো বৎসর শেষ হইয়াছে, ইহার পরে আর-এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। সে সময়ে যেন কেহ আমাদিগকে চিনিতে না পারে, দয়া করিয়া এই বর দিন।"

ধর্ম বলিলেন, "বাছা! তোমরা ছদ্মবেশ না করিয়াও যদি পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াও, তথাপি তোমাদিগকে কেহ চিনিতে পারিবে না। এখন আর একটি বর চাহ।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার যেন পাপে মতি না হয়, সর্বদা যেন ধর্মপথে চলিতে পারি।"

ধর্ম বলিলেন, "এ সকল তো তোমার আছেই, এখন তাহা আরো বেশি করিয়া হইবে।" এই বলিয়া তিনি আকাশে মিলাইয়া গেলেন। তাহার পূর্বে ব্রাহ্মণের অরণীখানি ফিরিয়া দিতে ভুলিলেন না।

এইরূপে পাণ্ডবদিগের বনবাসের বারো বৎসর কাটিয়া গেল। আর একটি বৎসর ভালোয়-ভালোয় কাটিলেই তাঁহাদের দুঃখের শেষ হয়। কিন্তু এই শেষের বৎসরটি অতি ভয়ানক বৎসর। এই সময়টুকু এমনভাবে কাটাইতে হইবে, যেন কেহই তাঁহাদের খবর জানিতে না পারে, জানিতে পারিলে আবার বারো বৎসর বনবাস। এ সময়ে দুর্যোধনের লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। এই-সকল ধূর্তকে ফাঁকি দিয়া, একটা বৎসর কিরূপে কাটানো যায়, সকলে মিলিয়া সাবধানে তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

বিরাট পর্ব

জ্ঞাতবাসের সময় উপস্থিত। এই একটি বৎসর বড়ই বিপদের সময়। কোন্ দেশে কি ভাবে থাকিলে এ বিপদে রক্ষা পাওয়া যায়?

পাঞ্চাল, চেদী, মৎস্য, সুরাষ্ট্র অবন্তী প্রভৃতি অনেক ভালো ভালো দেশ আছে। ইহাদের মধ্যে মৎস্য দেশের রাজা বিরাট অতি ধার্মিক লোক। ধার্মিকেরা ধার্মিকের আশ্রয় ছাড়িয়া আর কোথায় থাকিবে? সুতরাং পাণ্ডবেরা বিরাটের নিকটেই কোনোরূপ কাজ লইয়া থাকা স্থির করিলেন।

যুধিষ্ঠির সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা

কে কি কাজ করিতে পারিবে বল তো?" এ কথার উত্তরে অর্জুন বলিলেন, "আপনি কি কাজ করিবেন?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ সাজিয়া বিরাটের সভাসদ (অর্থাৎ সভার লোক) হইব। বলিব, আমার নাম কঙ্ক, খুব পাশা খেলিতে পারি। আরো জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, 'আমি যুধিষ্ঠিরের বন্ধু ছিলাম।' এখন ভীম বল তো, ' তুমি কি বলিবে?' ভীম বলিলেন, 'আমি রাঁধুনি ব্রাহ্মণ সাজিয়া যাইব। পরিচয় চাহিলে বলিব, আমার নাম বল্লভ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পাচক ছিলাম, একটু-আধটু পালোয়ানীও জানি।' সে দেশের রাঁধুনিদের চেয়ে ঢের ভালো ব্যঞ্জন রাঁধিয়া, আর এই-বড় কাঠের বোঝা বহিয়া আনিয়া, হুকুম পাইলে দু-একটা পালোয়ান বা খ্যাপা হাতিকেও ঠ্যাঙাইয়া আমি রাজাকে খুশি রাখিব।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আচ্ছা অর্জুন কি করিবে?" অর্জুন বলিলেন 'আমি রাজবাড়ির মেয়েদের সঙ্গীতের শিক্ষক হইয়া থাকিব। এ-সব লোকে স্ত্রীলোকের পোশাক পরে, আমিও তাহাই পরিব। ধনুকের গুণের ঘষায় হাতে যে দাগ হইয়াছে, বালা পরিয়া তাহা ঢাকিব। স্ত্রীলোকের মতন কাপড় পরিব মাথায় বেণী রাখিব, কানে কুণ্ডল দুলাইব, কথাবার্তাও স্ত্রীলোকের মতন করিয়া কহিব। তাহা হইলেই আর কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না। পরিচয় চাহিলে বলিব, আমাব নাম বৃহন্নলা, আমি দ্রৌপদীর নিকট ছিলাম।'

তারপর যুধিষ্ঠির নকুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নকুল! তুমি কি করিবে?'

নকুল বলিলেন, 'আমি বলিব, আমার নাম গ্রন্থিক, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঘোড়াশালের কর্তা ছিলাম। ঘোড়ার কথা আমার মতন কেহই জানে না।'

তারপর যুধিষ্ঠির সহদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সহদেব কি করিবে?'

সহদেব বলিলেন, 'আমি গোরু দেখা-শোনার কাজ লইব। বলিব আমাব নাম তন্ত্রিপাল। আমি গোরু সম্বন্ধে সকলরকম কাজ বিশেষরূপে জানি।'

সকলের শেষে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, ' দ্রৌপদী তো কখনো কোনো ক্লেশের কাজ করেন নাই, তিনি এই এক বৎসর কি করিয়া কাটাইবেন?'

দ্রৌপদী বলিলেন, "আমি বিরাট রাজার রানী সুদেষ্ণার নিকট কাজ লইব। জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, আমি সৈরিন্ধ্রী (অর্থাৎ যে চুল বাঁধা, মালা গাঁথা ইত্যাদি কাজ করে,) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বাড়িতে দ্রৌপদীর নিকট ছিলাম।"

এইরূপে সকল পরামর্শ স্থির করিয়া পাণ্ডবেরা সঙ্গের লোকদিগকে বিদায় দিলেন। চাকরদিগকে বলিলেন, 'তোমরা দ্বারকায় চলিয়া যাও।' ধৌম্যকে বলিলেন, 'সারথী, পাচকগণ, আর দ্রৌপদীর দাসীকে লইয়া আপনি রাজা দ্রুপদের বাড়িতে গিয়া থাকুন।'

তারপর তাঁহারা উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও মুনিদিগের আশীর্বাদ লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

অবশ্য আমরা জানি, তাঁহারা মৎস্যদেশে গিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও বর্ম ছিল।

পাহাড়ের আড়াল দিয়া, বনের ভিতর দিয়া, বহু কষ্টে, অতি সাবধানে পথ চলিয়া পাণ্ডবেরা ক্রমে দশার্ণ, পাঞ্চাল, শূরসেন প্রভৃতি দেশ অতিক্রম পূর্বক শেষে বিরাট নগরের কাছে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের মনে এই চিন্তা হইল যে, এই-সকল অস্ত্র লইয়া

নগরের ভিতরে গেলে, লোকে আমাদিগকে চিনিয়া ফেলিবে। সুতরাং এইগুলিকে একটা ভালো জায়গায় লুকাইয়া রাখা আবশ্যক।

সেইখানে একটা শ্মশানের পাশে পাহাড়ে উপরে প্রকাণ্ড শমী গাছ ছিল। অর্জুন বলিলেন, 'এই গাছে অস্ত্র-শস্ত্র রাখিলে কেহই জানিতে পারিবে না।'

সেই শমী গাছে উঠিয়া, নকুল তাঁহাদের সকলের ধনুক, তূণ, শঙ্খ, বর্ম, খড়্গ প্রভৃতি বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। তারপর শ্মশান হইতে একটা মড়া আনিয়া তাহাও ঐ গাছে বাঁধিলেন। মড়া বাঁধিবার কারণ এই যে, তাহা হইলে গন্ধে, আর ভূতের ভয়ে, কেহ আর সে গাছের নিকটে আসিবে না।

তারপর তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যেকের আর-একটি করিয়া নাম রাখিলেন। যুধিষ্ঠির 'জয়', ভীম 'জয়ন্ত', অর্জুন 'বিজয়', নকুল 'জয়ৎসেন', সহদেব 'জয়দ্বল' এগুলি হইল তাঁহাদের গোপনীয় নাম. অর্থাৎ এ-সকল নামের কথা আর কেহ জানিতে পারিল না। কাজেই ইহার কোনো-একটা নাম লইলে কেহ বুঝিয়া ফেলিবারও ভয় রহিল না।

মহারাজ বিরাট পাত্রমিত্র সমেত সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের বেশে, পাশা হাতে ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া, বিরাট সভার লোকদিগকে বলিলেন, 'উনি কে আসিতেছেন? গরিবের মতো পোশাক বটে, কিন্তু চেহারা দেখিলে মনে হয় যেন কোনো রাজা হইবেন।'

যুধিষ্ঠির আস্তে আস্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন. 'মহারাজের জয় হউক। দুঃখে পড়িয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। দয়া করিয়া আশ্রয় দিলে বড় উপকার হয়।'

বিরাট বলিলেন, 'তুমি কে বাপু? কোথা হইতে আসিতেছ? কি কাজ করিতে পার?'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম কঙ্ক। রাজা যুধিষ্ঠিরের বন্ধু ছিলাম। আমি পাশা খেলায় বিশেষ দক্ষ।'

বিরাট যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়াই ভালোবাসিয়াছিলেন, তাহাতে আবার তাঁহার নিজের পাশা খেলার খুব সখ। কাজেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে আদর করিয়া কাছে রাখিলেন। সকলকে বলিয়া দিলেন 'ইনি আমার বন্ধু, তোমরা আমাকে যেমন মান্য কর. ইহাকে তেমনি মান্য করিবে।'

তারপর রসুয়ে বামুনের সাজে ভীম আসিয়া উপস্থিত, হাতা-বেড়ি হাতে, সিংহের মতন চেহারা। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই বিরাট ভারি আশ্চর্য হইয়া গেলেন। রাজার হুকুমে কয়েকজন লোক ছুটিয়া ভীমের পরিচয় লইতে গেল। ভীম তাহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া, একেবারে রাজোর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন. 'মহারাজ. আমার নাম বল্লভ, আমি পাচক, অতি উত্তম ব্যঞ্জন রাঁধিতে পারি, আমাকে রাখিতে আজ্ঞা হউক।'

বিরাট কহিলেন, 'তোমার চেহারা দেখিয়া তো তোমাকে রাঁধুনি বলিয়া মনে হয় না!'

ভীম বলিলেন, 'মহারাজ! আমি রাঁধুনিই বটে, আপনার চাকর। পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রধান পাচক ছিলাম। মল্ল-মল্ল পালোয়ানীও জানি। মহারাজ আমার কাজ দেখিলে সন্তুষ্ট হইবেন।'

এইরূপে ভীম বিরাট রাজ্যের রসুই মহলের কর্তা হইয়া, পরম সুখে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে দ্রৌপদী একখানি ময়লা কাপড় পরিয়া সৈরিন্ধ্রীর বেশে রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন।

পথের লোক এমন সুন্দর মানুষ আর কখনো দেখে নাই। তাহারা আশ্চর্য হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তিনি বলেন, 'আমি সৈরিন্ধ্রী, কাজ খুঁজিতেছি।' কিন্তু তাঁহার এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না।

রানী সুদেষ্ণাও ছাদ হইতে দ্রৌপদীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ডাকাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রৌপদী বলিলেন, 'আমার স্বামী পাঁচজন গন্ধর্ব। কোনো কারণে তাঁহারা এখন বড়ই দুঃখে পড়িয়াছেন, আর আমি সৈরিন্ধ্রীর কাজ করিয়া দিন কাটাইতেছি। আগে আমি সত্যভামা আর দ্রৌপদীর নিকট কাজ করিয়াছিলাম। এখন আপনার নিকট আসিয়াছি, দয়া করিয়া আশ্রয় দিলে এখানে থাকিব।'

সুদেষ্ণা আহ্লাদের সহিত দ্রৌপদীকে সৈরিন্ধ্রীর কাজে নিযুক্ত করিলেন। দ্রৌপদী বলিলেন, 'মা, আমি কখনো উচ্ছিষ্ট ছুঁই না, বা কোনো নীচ কাজ করি না। আমার গন্ধর্ব স্বামীরা যদিও দুঃখে পড়িয়াছেন, তবুও তাঁহারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করেন। কেহ আমার অপমান করিলে, তাঁহারা তাহাকে মারিয়া ফেলেন।'

এইরূপে ক্রমে অর্জুন, সহদেব আর নকুল এক-একজন করিয়া বিরাট রাজার নিকট কাজ লইলেন। অর্জুন হইলেন রাজকুমারী উত্তরার গানের শিক্ষক। সহদেব আর নকুল হইলেন গোশাল আর ঘোড়াশালের কর্তা। অর্জুন এখন স্ত্রীলোকের মতন পোশাক পরেন, আর বাড়ির ভিতরেই থাকেন। ভীমও তাঁহার কাজ সারিয়া রান্নার মহলের বাহিরে আসিবার অবসর পান না। কাজেই তাঁহাদের কথা কেহ জানিতেও পারিল না।

এইরূপে দিন যায়। পাণ্ডবদের কাজ দেখিয়া বিরাট তাঁহাদের সকলের উপরেই বিশেষ সন্তুষ্ট। ভীম ইহার মধ্যেই জীমূত নামক একটা পালোয়ানকে হারাইয়া রাজার নিকট অনেক পুরস্কার পাইয়াছেন। সুতরাং মোটের উপরে তাঁহারা সুখেই আছেন বলিতে হইবে।

কিন্তু হায়! দ্রৌপদীর সময় নিতান্তই কষ্টে কাটিতে লাগিল। সুদেষ্ণা তাঁহাকে খুবই স্নেহ করিতেন, কিন্তু সুদেষ্ণার ভাই কীচক তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই অপমান করিত। দ্রৌপদী তাহা সহিতে না পারিয়া তাহাকে কত গালি দিতেন, কত মিনতি করিতেন, কত ভয় দেখাইতেন। দুরাত্মা তথাপি আরো বেশি করিয়া তাঁহাকে অপমান করিত।

একদিন সুদেষ্ণা কিছু খাবার আনিবার জন্য দ্রৌপদীকে কীচকের বাড়িতে পাঠান। সেদিন তাঁহার প্রতি সে এত অভদ্রতা করে যে, তিনি রাগ থামাইতে না পারিয়া তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেন। তারপর ভয়ে তিনি ছুটিয়া একেবারে রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হন।

পাপিষ্ঠ সেইখানে তাঁহার পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া, তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া, তাঁহার গায়ে লাথি মারিল। সেখানে যুধিষ্ঠির আর ভীম উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মনে ইহাতে কি ভয়ানক ক্লেশ হইল বুঝিতে পার। ভীম রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমাগত একটা গাছের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির দেখিলেন সর্বনাশ উপস্থিত। ভীম হয়তো তখন ঐ গাছ লইয়া সভার সকলকে গুঁড়া করিবেন। তাই তিনি ভীমকে শান্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "কি পাচক ঠাকুর, কাঠের জন্য গাছের দিকে তাকাইতেছ? কাঠের গাছ বাহিরে গিয়া খোঁজ।"

সভার লোকেরা কীচকের অনেক নিন্দা করিতে লাগিল, কিন্তু রাজা তাহাকে কিছু বলিলেন না। কীচককে তিনি বড়ই ভয় করিতেন। সে তাঁহার সেনাপতি ছিল, তার জোরেই তিনি রাজা করিতেন। বাস্তবিক বিরাট কেবল নামেই সে দেশের রাজা ছিলেন, দেশ শাসন করিত কীচক।

দ্রৌপদীর কষ্ট দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "সৈরিন্ধ্রী! ঘরে যাও তোমার গন্ধর্ব স্বামীরা সময় বুঝিয়া হয়তো ইহার বিচার করিবেন।"

এ কথায় দ্রৌপদী চোখের জল মুছিয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন। সেখানে সুদেষ্ণা তাঁহার নিকট সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি যদি বল তবে দুষ্টকে এখনই কাটিয়া ফেলি।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "আমার যাঁহারা আছেন, তাঁহারাই তাহাকে বধ করিবেন।"

রাত্রিতে দ্রৌপদী চুপিচুপি ভীমের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীম আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছেন! এতক্ষণ যে কীচককে মারেন নাই, সে কেবল লোকে জানিতে পারার ভয়ে। নির্জন স্থানে তাহাকে পাইলে আর তিনি এক মুহূর্তও দেরি করিতেন না।

রাজবাড়ির মেয়েদের সঙ্গীতের ঘরটি ঠিক এইরূপ নিরিবিলি স্থান ছিল। সে স্থানে দিনের বেলায় মেয়েরা নাচ-গান করিত, রাত্রিতে কেহ সেখানে থাকিত না। কোনো কারণে সেদিন ভোর রাত্রে কীচকের একেলা সেই ঘরে যাওয়ার দরকার ছিল। ভীম তাহা জানিতে পারিয়া তাহার আগেই চুপিচুপি সেখানে গিয়া, চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলেন।

অনেক রাত্রে কীচক সেখানে আসিয়াছে। অন্ধকারে ভীমকে দেখিয়া সে মনে করিল, বুঝি দ্রৌপদী সেখানে শুইয়া আছেন। তাই দুষ্ট তাঁহার সঙ্গে তামাশা আরম্ভ করিল। সে বলিল, "বাড়ির লোক বলে, আমার মতন সুন্দর মানুষ আর নাই।"

তাহাতে ভীম বলিলেন, "আর আমার এই হাতখানির মতো মোলায়েম হাতও আর কো-থা-ও নাই!"

এই বলিয়াই তিনি সেই দুষ্টের চুলের মুঠি ধরিলেন। তারপর কি হইল বুঝিয়া লও।

কীচকও যেমন-তেমন বীর ছিল না, সে খানিক্ষণ খুবই যুদ্ধ করিল। কিন্তু ভীমের কাছে তাহার বড়াই আর কতক্ষণ খাটিবে? সেই 'মোলায়েম' হাতের চড় ভালো মতে খাইয়া আর তাহার বেশি কথা কহিতে হইল না। তখন ভীম সেই দুষ্টকে ধরিয়া তাহার এমনি সাজা করিলেন যে, তাহার হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া, হাত-পা আর মাথা পেটের ভিতর ঢুকিয়া, একতাল মাংস মাত্র অবশিষ্ট রহিল। আজও কেহ কাহাকেও নিতান্ত ভয়ানক সাজা দিলে, লোকে বলে, 'কীচক বধ করিয়াছে।'

তারপর দ্রৌপদীকে ডাকিয়া কীচকের দশা দেখাইয়া ভীম চুপিচুপি নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। লোকে দ্রৌপদীর নিকট শুনিল যে, তাঁহার গন্ধর্ব স্বামিগণের হাতেই কীচকের সাজা হইয়াছে।

এই ঘটনার সংবাদে কীচকের ভাইয়েরা সেখানে আসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে শ্মশানে লইয়া চলিল। তাহারা তাহাকে লইয়া ঘরের বাহিরে আসিবার সময় দ্রৌপদী সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দুষ্টেরা বলিল, "এই হতভাগীর জন্যই তো আমাদের দাদার প্রাণ গেল। চল তাঁহার সঙ্গে ইহাকেও নিয়া পোড়াই।"

বিরাট এই-সকল দুষ্ট লোককে বড়ই ভয় করিতেন, সুতরাং তিনি উহাদের কথায় রাজি হইলেন।

হায় হায়! যাঁহার পায়ের ধূলা পাইলে লোকে আপনাকে ধন্য মনে করিতে, দেবতারা পর্যন্ত যাঁহাকে সম্মান দিয়া চলিতেন, সেই দ্রৌপদী দেবীর কপালে কিনা এতই দুঃখ আর অপমান ছিল! দুরাত্মারা তাঁহাকে কীচকের সঙ্গে শ্মশানে লইয়া চলিল, একটি লোকও তাহাদিগকে বারণ করিল না। দ্রৌপদী কেবল এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "হে জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়দ্বল তোমরা কোথায়? আমাকে রক্ষা কর!"

ভীম তাঁহার ভয়ানক কার্য শেষ করিয়া সবে গিয়া একটু নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় দ্রৌপদীর সেই কান্না তাঁহার কানে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি পোশাক বদলাইয়া একটা গোপনীয় পথে শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দশ ব্যাম (পঁয়ত্রিশ হাত, সাড়ে তিন হাতে এক ব্যাম) লম্বা প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল, সেই গাছ তুলিয়া লইয়া তিনি যখন ঘোরতর গর্জনে সেই দুরাত্মাদিগকে তাড়া করিলেন, তখন তাঁহাকে নিতান্তই ভয়ংকর দেখা গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্রই "বাবা গো, ঐ গন্ধর্ব আসিতেছে!" বলিয়া দ্রৌপদীকে ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল। কিন্তু পলাইয়া আর কতদূর যাইবে? ভীম সেই গাছ দিয়া দেখিতে দেখিতে তাহাদের মাথা গুঁড়া করিয়া দিলেন। উহারা একশত পাঁচজন ছিল, তাহারা একটিও প্রাণ লইয়া ঘরে ফিবিতে পারিল না।

তারপর দ্রৌপদীকে শান্ত করিয়া ভীম পুনরায় ঘরে চলিয়া আসিলেন।

এদিকে দেশের সকল লোক গন্ধর্বের ভয়ে নিতান্তই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজে রাজা আসিয়া রানীকে বলিলেন, "এই মেয়েটি আমাদের এখানে থাকিলে তো বড়ই ভয়ের কথা দেখিতেছি। ইহাকে বল, সে অন্যত্র চলিয়া যাউক।"

দ্রৌপদী ঘরে ফিরিবামাত্রই সুদেষ্ণা তাঁহাকে এ কথা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া দ্রৌপদী বলিলেন, "মা, আর তেরোটি দিন দয়া করিয়া অপেক্ষা করুন, তারপর আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব। এই সময়ের মধ্যেই আমার স্বামিগণের দুঃখ দূর হইবে।"

দুঃখ দূর হওয়ার অর্থ বোধহয় বুঝিয়াছ। অর্থাৎ আর তেরো দিন গেলেই অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর শেষ হইবে।

অজ্ঞাতবাসের সময় ফুরাইয়া আসিল। এতদিন দুর্যোধনের দলের লোকেরা কি করিতেছিলেন? তাঁহারা দেশ-বিদেশে লোক পাঠাইয়া প্রাণপণে পাণ্ডবদিগকে খুঁজিয়াছেন, কিন্তু কোনোমতেই তাঁহাদের সন্ধান করিতে পারেন নাই! দূতেরা ফিরিয়া আসিয়া খালি এক কথাই বলে, "মহারাজ, কত খুঁজিলাম, কোথাও পাণ্ডবদিগকে দেখিতে পাইলাম না।"

দূতগণের কথা শুনিয়া কৌরবেরা যারপরনাই চিন্তিত হইলেন। যাহা হউক, দূতেরা এই একটা ভালো সংবাদ আনিল যে বিরাটের সেনাপতি কীচক মারা গিয়াছে। এই কীচকের জন্য সকল রাজাই বিরাটকে ভয় করিয়া চলিতেন। দুর্যোধনের সভায় তখন ত্রিগর্ত দেশের রাজা সুশর্মা উপস্থিত ছিলেন। বিরাট কীচকের সাহায্যে এই সুশর্মাকে বার বার পরাজয় করাতে, ইহার মনে বিরাটের উপরে চিরকালই ভারি রাগ ছিল। এখন কীচক মারা যাওয়াতে সুশর্মা ভাবিলেন যে, সেই-সকল পরাজয়ের শোধ লওয়ার উত্তম সুযোগ উপস্থিত। তাই তিনি, এই বেলা বিরাটের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার ধনরত্ন ও গোরুবাছুর কাড়িয়া

লইবার জন্য কৌরবদিগকে খ্যাপাইয়া তুলিলেন।

কৌরবদিগের মধ্যে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতির মতো লোক থাকিতে কি আর অন্যায় কাজের জন্য তাঁহাদিগকে খ্যাপাইয়া তুলিতে বেশি সময় লাগে? সুশর্মা কথাটা পাড়িতে না পাড়িতেই স্থির হইল যে, তিনি তখনই বিরাটের গোয়ালাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার গোরু চুরি করিতে যাইবেন, কৌরবেরা তাহার পরের দিনই দলবল সমেত গিয়া সেই সৎকার্যের সহায়তা করিবেন। এমন সুযোগ পাইয়া সুশর্মা আর একটুও সময় নষ্ট করিলেন না।

বিরাট সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় এক গোয়ালা উর্দ্ধশ্বাসে সেখানে আসিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজ! ত্রিগর্ত দেশের লোকেরা আমাদিগকে পরাজয় করিয়া হাজার হাজার গোরু লইয়া গিয়াছে।"

যেই এ সংবাদ দেওয়া, অমনি রাজ্যময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। চারিদিকে কেবলই 'সাজ, সাজ! ধর, ধর! মার, মার!' শব্দ। সিপাহী, সৈন্য, রথ, হাতি, ঘোড়া, সব সাজিয়া প্রস্তুত হইল, নিশান উড়িতে লাগিল। মেঘের গর্জনের ন্যায় রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। তাহার সহিত অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ মিশিয়া গেল।

যোদ্ধারা বর্ম আঁটিয়া অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত। নিজে বিরাট সাজিয়াছেন, তাঁহার ভাই শতানিক সাজিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙখও সাজিয়াছেন। আর আর যোদ্ধারা তো কথাই নাই। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল আর সহদেবকেও রাজা যুদ্ধের পোশাক পরাইয়া উত্তম-উত্তম অস্ত্র দিয়া চমৎকার রথে চড়াইয়া সঙ্গে লইয়াছেন।

বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় দুই দলের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অন্ধকারের সহিত সেই যুদ্ধ আরো ঘনাইয়া আসিল।

দুঃখের বিষয়, আয়োজনের ঘটা যেমন হইয়াছিল, আসল যুদ্ধটা তেমন করিয়া হইতে পারে নাই। প্রথমে কয়েক ঘন্টা খুবই যুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরেই দেখা গেল যে, সুশর্মা বিরাটের সারথিকে মারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। তখন বিরাটের সৈন্যগণ রণস্থল ছাড়িয়া, যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

এদিকে যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিতেছেন, "ভীম, দেখিতেছ কি? বিরাটকে তো লইয়া গেল! শীঘ্র তাঁহাকে ছাড়াইয়া আন! এতদিন যাঁহার আশ্রয়ে সুখে বাস করিলাম, এসময়ে তাঁহার উপকার করা উচিত।"

ভীম বলিলেন, "হাঁ নিশ্চয়। এই দেখুন না, আমি এই গাছ দিয়া—"

গাছের নাম শুনিয়া যুধিষ্ঠির ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না না! গাছ লইয়া নয়। তাহা হইলেই তোমাকে চিনিয়া ফেলিবে। তুমি সাধারণ লোকের মতো অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যাও। নকুল তোমার সঙ্গে যাউক।"

ভীম তাহাতেই রাজি হইয়া চলিয়া গেলেন। হাতে গাছ না থাকিলেই কি! ভীম তো! বিরাটকে তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই!" তাহা শুনিয়া সুশর্মা পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটা কি অদ্ভুত মানুষ ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসিতেছে! দেখিতে দেখিতে সেই অদ্ভুত মানুষের গদার ঘায় তাঁহার হাতি, ঘোড়া, সিপাহী প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল।

সুশর্মা আর উপায় না দেখিয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ আর

করিবেন কি, তাহার পূর্বেই ভীমের গদার ঘায় তাঁহার রথের ঘোড়া আর সারথি চুরমার হইয়া গিয়াছে। ততক্ষণে সহদেব প্রভৃতিও ভীমের সাহায্য করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, নিজে বিরাটও ভরসা পাইয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন।

সুশর্মা ভাবিলেন, 'বড় বিপদ! এই বেলা পালাই!'

কিন্তু হায়! যুদ্ধের সময় ভীমের সম্মুখ হইতে পালাইবার যেমন দরকার হয়, কাজটি তেমনি কঠিন হইয়া উঠে! সুশর্মা কয়েক পা যাইতে না যাইতেই ভীম তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া বসিলেন। তারপর আছাড়, কীল চড় প্রভৃতি কোনো সাজাই বাকি রহিল না-- বাকি রহিল খালি প্রাণ বাহির করিয়া দেওয়া।

তখন বিরাটের গোরু ও সুশর্মাকে লইয়া সকলে এক জায়গায় আসিয়া মিলিলেন। সেখানে যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছামত সুশর্মাকে কিছু মিষ্ট উপদেশ দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই ঘটনায় বিরাট যে পান্ডবদের উপর নিতান্তই সন্তুষ্ট হইলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। তিনি বলিলেন, "আপনাদের কৃপায় আজ আমার প্রাণ, মান সবই বজায় রহিল। এখন বলুন আপনাদিগকে কি দিয়া সন্তুষ্ট করিব?"

এ কথার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ যে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন ইহাই আমাদের যথেষ্ট পুরস্কার। আপনি সুখে থাকুন।"

তারপর যুদ্ধ জয়ের সংবাদ লইয়া দূতেরা বিরাট নগরের দিকে ছুটিয়া চলিল। অন্য সকলে সে রাত্রি যুদ্ধক্ষেত্রে কাটাইয়া পরদিন বাড়ি ফিরিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিরাট নগরে অনেক বড়-বড় ঘটনা ঘটিতেছিল। বিরাট দলবল লইয়া ত্রিগর্ত দেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, বাড়িতে রাজপুত্র উত্তর আর কয়েকজন কর্মচারি ছাড়া আর কেহ নাই। ইহার মধ্যে দুর্যোধন অসংখ্য সৈন্য আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি বড়-বড় বীর সমেত আসিয়া মৎস্য দেশে উপস্থিত। তাঁহারা আসিয়াই বিরাটের গোয়ালাদিগকে ঠেঙ্গাইয়া একেবারে ষাট হাজার গোরু লইয়া প্রস্থান করিলেন। গোয়ালারা মার খাইয়া চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে আসিয়া রাজবাড়িতে খবর দিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, তখন রাজবাড়িতে আর যোদ্ধা ছিল না, ছিলেন কেবল রাজপুত্র উত্তর। তিনি বাড়ির ভিতর হইতে এই সংবাদ শুনিয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট বাহাদুরি লইবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "কি করি, একজন সারথি নাই। ভালো একজন সারথি পাইলে, আমি ভীষ্ম-টিষ্মকে মারিয়া, এখনই গোরু ছাড়াইয়া আনিতাম। কৌরবেরা দেশ খালি পাইয়া গোরু চুরি করিয়া নিতেছে আমি সেখানে থাকিলে দেখিতাম, কেমন করিয়া নেয়।"

এ কথা শুনিয়া অর্জুন চুপিচুপি দ্রৌপদীকে কি যেন শিখাইয়া দিলেন, তারপর দ্রৌপদী আসিয়া উত্তরকে বলিলেন, "রাজপুত্র, আপনাদের বৃহন্নলা নামক ঐ হাতি হেন সুশ্রী ওস্তাদটি আগে অর্জুনের সারথি ছিলেন, উনি তাঁহারই শিষ্য, আর যুদ্ধেও তাঁহার চেয়ে বড় কম নহেন। পান্ডবদের ওখানে থাকার সময় তাঁহার কথা আমি বেশ করিয়া জানিয়াছি। এমন সারথি আর কোথাও নাই।"

উত্তর বলিলেন, "তাহা তো বুঝিলাম, কিন্তু আমি নিজে উঁহাকে কেমন করিয়া আমার সারথি হইতে বলি?"

দ্রৌপদী বলিলেন, "আপনার ভগ্নী উত্তরা বলিলে, উনি নিশ্চয় রাজি হইবেন। আর

উঁহাকে সঙ্গে নিলে আপনারও যুদ্ধে জিতিয়া আসা নিশ্চিত।"

উত্তরাকে অর্জুন নিজের কন্যার মতো স্নেহ করিতেন, তাঁহার আব্দার তিনি কিছুতেই না রাখিয়া পারিতেন না। উত্তরের কথায় রাজকুমারী যখন অর্জুনের নিকট আসিয়া, মধুর স্নেহ আর আদরের সহিত, তাঁহাকে সারথি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন তখন আর তাঁহার "না" বলিবার উপায় রহিল না। আর তাঁহার না বলিবার ইচ্ছাও ছিল না। সুতরাং তিনি উত্তরার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুত্রের নিকট চলিলেন। উত্তর তাঁহাকে বলিলেন, "বৃহন্নলা! আমি কৌরবদের হাত হইতে গোরু ছাড়াইয়া আনিতে যাইব। তুমি আমার সারথি হইবে?"

অর্জুন বলিলেন, "আমি গাইয়ে-বাজিয়ে মানুষ, সারথি-ফারথি হওয়া কি আমার কাজ? নাচিতে বলিলে বরং চেষ্টা করিতে পারি।"

উত্তরা বলিলেন, "আগে তো সারথির কাজটা চালাইয়া দাও, শেষে নাচিবে এখন।"

এইরূপে হাসি তামাশার ভিতরে অর্জুন সারথির সাজ পরিতে লাগিলেন।

ভঙ্গির আর সীমা নাই। যেন কতই আনাড়ি, জন্মেও যেন বর্ম চোখে দেখেন নাই, সেটাকে উল্টা করিয়া পরিয়াই বসিলেন। মেয়েরা তো তাহা দেখিয়া হাসিয়া কুটিপাটি।

যাহা হউক, শেষে সাজগোজ করিয়া দুজনই রওয়ানা হইলেন। যাইবার সময় উত্তরা বলিলেন "ভীষ্ম, দ্রোণ, এদের পোশাকগুলি কিন্তু আনা চাই আমরা পুতুল সাজাইব।"

তাহাতে অর্জুন হাসিয়া বলিলেন, "তোমার দাদা যদি উঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারেন, তবে আনিব।"

এইরূপে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। উত্তরের উৎসাহ আর ধরে না, তিনি ক্রমাগতই বলিতেছেন, "কোথায় গেল কৌরবেরা? বৃহন্নলা, শীঘ্র চল! এখনই গোরু ছাড়াইয়া আনিব!"

অর্জুন রথ চালাইতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। খানিক পরেই তাঁহারা সেই শ্মশানে আর শমী গাছের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে কৌরবদের সৈন্য দেখা যাইতেছিল, যেন সাগরের জল, পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে!

সেই সৈন্যের দল দেখিযাই ভয়ে উত্তরের মুখ শুকাইয়া গেল! তিনি বলিলেন, "ও বৃহন্নলা! আমাকে এ কোথায় আনিলে? আমি ছেলেমানুষ, এত এত সৈন্য আর ভয়ানক বীরের সহিত কেমন করিয়া যুদ্ধ করিব? ওমা! আমার কি হইবে? আমাকে ঘরে নিয়া চল!"

অর্জুন বলিলেন, "সে কি রাজপুত্র! এত বড়াই করিয়াছিলেন, সে-সব এখন কোথায়? এখন খালি হাতে ফিরিলে লোকে বলিবে কি? আমি তো গোরু না লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিব না।"

উত্তর বলিলেন, "গোরু যায়, সেও ভালো! গালি খাই, সেও ভালো! আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না।"

এই বলিয়া রজপুত্র রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দে ছুট!

কি বিপদ! বুঝি বেচারা সবই মাটি করে। কাজেই অর্জুনকেও তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে হইল। ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার মাথার লম্বা বেণী এলাইয়া গেল, গায়ের চাদর হাওয়ায় উড়িতে লাগিল।

এদিকে কৌরবের লোকেরা এ-সকল ঘটনার অর্থ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। উত্তরকে পালাইতে আর অর্জুনকে ছুটিতে দেখিয়া, প্রথমে কেহ কেহ হাসিয়াছিল। কিন্তু

তাহার পরেই তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "এ ব্যক্তি কে? স্ত্রীলোকের মতো কতকটা চেহারা বটে, কিন্তু আবার পুরুষের মতোও দেখিতেছি। মাথা, ঘাড়, আর হাত ঠিক অর্জুনের মতো। এ ব্যক্তি নিশ্চয় অর্জুন, নহিলে এমন তেজীয়ান চেহারা কাহার? আর এমন সাহসই-বা কাহার যে একেলা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে?"

এদিকে অর্জুন একশত পা গিয়াই উত্তরের চুল ধরিয়াছেন। তখন যে উত্তরের কান্না! "ও বৃহন্নলা! শীঘ্র ঘরে চল! তোমাকে মোহর দিব, হীরা দিব, ঘোড়া দিব, রথ দিব, হাতি দিব, আমাকে ছাড়িয়া দাও!"

অর্জুন তাহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, "রাজপুত্র, তোমার কোনো ভয় নাই। তুমি যুদ্ধ করিতে না চাহ আমার সারথি হও। আমি যুদ্ধ করিয়া গোরু ছাড়াইব।"

এইরূপে উত্তরকে শান্ত করিয়া অর্জুন তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে দ্রোণ ভীষ্মকে বলিতেছেন, "ভীষ্ম! আজ কিন্তু অর্জুনের হাতে আমাদের রক্ষা নাই। যুদ্ধে শিবকে খুশি করিয়াছে, তারপর এতদিন ক্লেশ পাইয়া রাগিয়া আছে, ও কি আমাদিগকে সহজে ছাড়িবে?"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "আমার আর দুর্যোধনের যে ক্ষমতা, অর্জুনের তাহার একআনাও নাই।"

দুর্যোধন বলিলেন, "এ যদি অর্জুন হয়, তবে তো ভালোই হইল। অজ্ঞাতবাস শেষ না হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই আবার বারো বৎসর ইহাদিগকে বনবাস করিতে হইবে।"

ইহাদের এইরূপ কথাবার্তা চলিয়াছে। ততক্ষণে অর্জুন উত্তরকে লইয়া সেই শমীগাছের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। শমীগাছের তলায় আসিয়া তিনি বলিলেন, "রাজপুত্র, গাছে উঠিয়া ঐ অস্ত্রগুলো নামাও।"

এ কথায় উত্তর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ও গাছে মড়া বাঁধা রহিয়াছে, ছুঁইলে অশুচি হইবে যে।"

অর্জুন বলিলেন, "উহা মড়া নহে, অস্ত্র। মড়া ছুঁইতে আমি তোমাকে কেন বলিব?"

অর্জুন বলিলেন, "এ-সব অস্ত্র পাণ্ডবদিগের।"

পাণ্ডবদিগের নাম শুনিয়া উত্তর আরো আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "এ-সব যদি পাণ্ডবদিগের অস্ত্র হয়, তবে তাহারা এখন কোথায়?"

অর্জুন বলিলেন, "তাঁহারা তোমাদের বাড়িতেই আছেন। আমি অর্জুন, তোমার পিতার যে কঙ্ক নামে সভসদ আছেন, তিনি যুধিষ্ঠির, বল্লভ নামক ঐ যন্ডা পাচকটি ভীম, গ্রন্থিক নামক যে লোকটি ঘোড়াশালে কাজ করে সে নকুল, আর গোশালার-কর্তা তন্ত্রিপাল সহদেব, তোমাদের বাড়িতে যিনি সৈরিন্ধ্রীর কাজ করেন, তিনি দ্রৌপদী।"

উত্তরের নিকট এ-সকল কথা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের ন্যায় মহাপুরুষেরা তাঁহাদের বাড়িতে সামান্য চাকরের মতো বাস করিতেন, এ কথা কি সহজে বিশ্বাস হয়? কাজেই উত্তর অর্জুনের কথা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "শুনিয়াছি অর্জুনের দশটি নাম আছে, আপনি যদি সেই অর্জুন হন, তবে সেই দশটি নাম আর তাহাদের অর্থ

বলুন দেখি।"

অর্জুন বলিলেন, "অর্জুন মানে সাদা, নির্মল। আমি নির্মল কাজ করি, এইজন্য আমি অর্জুন। দেশ জয় করিয়া ধন আনি, তাই আমি ধনঞ্জয়। যুদ্ধে আমি সর্বদাই জয়লাভ করি, তাই আমি বিজয়। আমার রথের ঘোড়াগুলি সাদা, তাই আমি শ্বেতবাহন। আমার জন্মের দিন উত্তফাল্গুনী নক্ষত্র ছিল, তাই আমি ফাল্গুনী। দৈত্যদিগকে হারাইয়া ইন্দ্রের নিকট কিরীট, অর্থাৎ মুকুট পুরস্কার পাইয়াছিলাম, তাই আমি 'কিরীট'। যুদ্ধের সময় আমি বীভৎস অর্থাৎ নিষ্ঠুর কাজ করি না, তাই আমি বীভৎসু। আমি সব্য অর্থাৎ বাম হাতেও ডান হাতের ন্যায় তীর ছুঁড়িতে পারি, তাই আমি সব্যসাচী। ভয়ানক শত্রুকেও আমি জয় করিয়া থাকি তাই আমি বিষ্ণু আর রঙ কালো বলিয়া আমি কৃষ্ণ।"

তখন উত্তর জোড়হাতে অর্জুনকে নমস্কার করিয়া, বিনয়ের সহিত বলিলেন, "মহাশয়। আমি না জানিয়া আপনার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি আমাকে ক্ষমা করুন।"

অর্জুন বলিলেন, "আমি তোমার উপর কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হই নাই। ভয় পাইও না, অস্ত্র গুলি রথে তোল, তোমার গরু ছাড়াইয়া দিতেছি"।

এতক্ষণে উত্তরের খুবই সাহস হইয়াছে, কারণ অর্জুন সঙ্গে থাকিলে আর কিসের ভয়? এরপর আব সারথির কাজ করিতে তিনি কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না।

তারপর অর্জুন হাত হইতে বালার গোছা খুলিয়া, ঝকঝকে সোনালি কবচ আঁটিয়া পরিলেন। সাদা কাপড় দিয়া মাথার বেণী বেশ করিয়া বাঁধিলেন। শেষে সেই সুন্দর রথে চড়িয়া, নানারূপ অস্ত্র মনে মনে ডাকিবামাত্র তাহারা উপস্থিত হইয়া জোড়হাতে বলিল, 'আমরা আসিয়াছি, কি করিতে-হইবে অনুমতি করুন।'

অর্জুন বলিলেন, 'তোমরা যুদ্ধের সময় আমার সঙ্গে থকিয়া আমার কাজ করিবে।'

এইরূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া, অর্জুন গান্ডীবে টঙ্কার ও তাঁহার বিশাল শঙ্খে ফুঁ দিবামাত্র, উত্তর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রথের ভিতরে বসিযা পড়িলেন।

তাহা দেখিয়া অর্জুন বলিলেন, 'কি হইয়াছে? ভয় পাইতেছ কেন?'

উত্তর বলিলেন, 'উঃ! আমার কান ফাটিয়া গেল! মাথা ঘুরিয়া গেল! শঙ্খের আর ধনুকের শব্দ এমন ভয়ানক হইতে পারে তাহা তো আমি জানিতাম না!'

যাহা হউক শেষে উত্তরের ভয় গেল।

এদিকে সেই ধনুকের টঙ্কার আর শঙ্খের শব্দ শুনিয়া, কৌরবদের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, উহা অর্জুনেরই ধনুক আর শঙ্খ। দুর্যোধনের তখন ভারি আনন্দ। তিনি ভাবিলেন যে, অর্জুন সময় ফুরাইবার পূর্বেই দেখা দিয়াছেন, সুতরাং পান্ডবদিগকে আবার বারো বৎসর বনবাস করিতে হইবে।

কর্ণের খুবই উৎসাহ। তিনি ভাবিলেন যে, অর্জুনকে মারিয়া একটা নিতান্তই বাহাদুরির কান্ড করিবেন।

যাঁহারা একটু শান্ত আর ধার্মিক, তাঁহারা বলিলেন, 'আজ অর্জুনের হাতে বড়ই বিপদ দেখা যাইতেছে সকলে সাবধানে থাকুন!'

এইরূপে নানারকম কথাবার্তা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, 'অজ্ঞাত বাসের এখনও বাকী আছে।' কেহ বলিতেছেন, 'না বাকী নাই, তাহা হইলে অর্জুন কখনই এমন করিয়া আসিতেন

না।' শেষে ভীষ্ম ভালমত হিসাব করিয়া বলিলেন, 'আমি দেখিতেছি, পাণ্ডবদের তের বৎসর পূর্ণ হইয়া পাঁচ ছয় দিন বেশী হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের যাহা করার কথা ছিল, তাহা ভালরূপেই করিয়াছেন, তাহাতে ভুল নাই।'

তারপর ভীষ্মের কথায় সৈন্যদিগকে চারিভাগ করিয়া এক ভাগের সহিত দুর্যোধন নিজেকে বাঁচাইবার জন্য হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। এক ভাগ গরু লইয়া চলিল আর দুই ভাগ লইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি অর্জুনকে আটকাইতে প্রস্তুত হইলেন।

এমন সময় অর্জুনের দুটি বাণ আসিয়া দ্রোণের পায়ের কাছে পড়িল। আর দুটি বাণ তাঁহার কানের কাছ দিয়া চলিয়া গেল। দ্রোণ হইলেন অর্জুনের গুরু। এতদিন পরে দেখা হইল, প্রণাম করিয়া দুটি কুশল মঙ্গল তো জিজ্ঞাসা করা চাই। এত দূরে থাকিয়া সে কাজ আর কীরূপে হইবে? তাই অর্জুন গুরুর পায়ের কাছে বাণ ফেলিয়া তাঁহাকে প্রণাম জানাইলেন আর কানের কাছে বাণ পাঠাইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আর এই সব কাজের অর্থ বুঝিতে পারিয়া দ্রোণের বিশেষ আনন্দ হইল।

এদিকে অর্জুন যখন দেখিলেন যে, দুর্যোধনের পলায়ন করিবার চেষ্টা, তখন তিনি উত্তর কে বলিলেন, 'আগে ঐ হতভাগার কাছে চল।'

অর্জুনের রথকে দুর্যোধনের দিকে ছুটিতে দেখিয়া কৃপ দ্রোণকে বলিলেন, 'আব গুরুর ভাবনা ভাবিয়া কাজ নাই! ঐ দেখ, দুর্যোধনের এখন বড়ই বেগতিক!'

অর্জুন দুর্যোধনের দিকে চলিয়াছেন, তাঁহাকে আটকাইবার জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। কিন্তু অর্জুনকে আটকায় কাহার সাধ্য! যে তাঁহার সামনে আসিতেছে, তাহারই তিনি দুর্দশার একশেষ করিতেছেন। কেহ পলাইতেছে , কেহ মারা যাইতেছে। অনেকে ভ্যাবাচাকা লাগিয়া মার খাইতেছে।

অর্জুনকে আটকাইতে গিয়া কর্ণের এক ভাই মারা গেল। কর্ণ তাহাতে ভীষণ রাগের সহিত আসিয়া অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। দু-জনে কিছুকাল এমনি ভয়ানক যুদ্ধ হইল যে, তাহার আর তুলনা নাই। শেষে দেখা গেল যে, হাতে, মাথায়, উরুতে, কপালে আব ঘাড়ে বিষম বাণের খোঁচা খাইয়া কর্ণ উর্ধ্বশ্বাসে পলাযন করিতেছেন।

এইরূপে একে-একে সকলেই অর্জুনের হাতে নাকাল হইতে লাগিলেন। কর্ণ পলাইলে আসিলেন কৃপ, কৃপ পলাইলে দ্রোণ। দ্রোণকে অর্জুন অস্ত্র মারিতে চাহেন নাই। কিন্তু দ্রোণ বাণ মারিতে আরম্ভ করিলে অর্জুনকেও যুদ্ধ করিতে হইল। তাহার ফলে দ্রোণও বেশ ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। ইহার মধ্যে অশ্বত্থামা আসিযা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করাতে প্রস্থান করিয়া রক্ষা পাইলেন।

তারপর কর্ণ আবার আসিয়াছিলেন আর তাঁহার সাজাও তেমনি হইয়াছিল। এবার বুকে সাঙ্ঘাতিক বাণ খাইয়া তিনি রণস্থলেই অজ্ঞান হইয়া যান। তারপর কোনমতে উঠিয়া পলায়ন করেন।

এইরূপে কত লোক অর্জুনের কাছে জব্দ হইল, তাহা কত বলিব? সকলে একসঙ্গে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। নিজে ভীষ্ম অজ্ঞান হইয়া গেলেন, তখন সারথি রথ হাঁকাইয়া তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

দুর্যোধন দুবার অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন। প্রথম বার পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে

অর্জুন অনেক ঠাট্টা করায় রাগের ভরে আবার আসেন। এবারে ভীষ্ম প্রভৃতি সকলে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া অর্জুনের উপরে বাণ মারিতে আরম্ভ করিলে অর্জুন অতি চমৎকার উপায়ে তাঁহাদিগকে জব্দ করেন। এবার কাহাকেও মারিবার চেষ্টা না করিয়া, তিনি 'সম্মোহন' নামক অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। সেই আশ্চর্য অস্ত্র ছাড়িয়া শঙ্খে ফুঁ দিবামাত্রই, সকলে অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। তখন উত্তরার সেই কথা মনে করিয়া, তিনি উত্তরকে বলিলেন, 'তুমি শীঘ্র গিয়া দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা আর দুর্যোধনের গায়ের কাপড়গুলি লইয়া আইস। সাবধান ভীষ্মের কাছে যাইও না। তিনি এই অস্ত্র থামাইবার সঙ্কেত জানেন, হয়তো তিনি অজ্ঞান হন নাই।'

অর্জুনের কথা যে ঠিক, তাহার পরিচয় হাতেই পাওয়া গেল। কর্ণ, দুর্যোধন, প্রভৃতির কাপড় আনিয়া, উত্তর ভালো করিয়া রথে বসিতে না বসিতেই, ভীষ্ম উঠিয়া আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু অর্জুনের দশ বাণ খাইয়া বুড়ার আর যুদ্ধ করিতে হইল না।

এদিকে দুর্যোধন জাগিয়া উঠিয়াই ভারি চোটপাট আরম্ভ করিয়াছেন, "আপনারা কিজন্য অর্জুনকে এত সহজে ছাড়িয়া দিতেছেন? শীঘ্র উহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিন।"

তখন ভীষ্ম হাসিয়া বলিলেন, "দুর্যোধন, এতক্ষণ তোমার বুদ্ধি কোথায় ছিল? অজ্ঞান হইয়া যখন গড়াগড়ি খাইতেছিলে, তখন অর্জুন ইচ্ছা করলেই তো তোমাদের কর্ম শেষ করিয়া দিতে পারিত! সে ধার্মিক লোক, তাই দয়া করিয়া তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাই ঢের, এখন প্রাণ থাকিতে ঘরে ফিরিয়া চলো। "

আর কি দুর্যোধনের মুখে কথা আছে! তাঁহার মাথা হেঁট হইয়া গিয়াছে, লম্বা নিশ্বাস বহিতেছে। এদিকে অর্জুন বাণের দ্বারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া, আর-এক বাণে দুর্যোধনের মুকুটটি দুইখান করিয়া গোরু লইয়া শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে ঘরে ফিরিলেন।

ফিরিবার সময় পথে অর্জুন উত্তরকে বলিলেন, 'সাবধান! ঘরে ফিরিয়া কিন্তু আমার নাম করিও না। আমরা যে তোমাদের এখানে আছি, তাহা যেন তোমাদের লোকেরা না জানিতে পারে।'

তারপর সেই শমী গাছের নিকটে আসিয়া অর্জুন আবার বৃহন্নলার বেশে, রাজপুত্রের সারথি হইয়া বসিলেন। গোয়ালারা তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে বসাইয়া, তাড়াতাড়ি নগরে সংবাদ পাঠাইল যে, "যুদ্ধে জিতিয়া গোরু ছাড়ানো হইয়াছে।"

এদিকে রাজা বিরাট দেশে ফিরিয়া, মেয়েদের নিকট শুনিলেন যে, উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া, কৌরবদিগের নিকট হইতে গোরু ছাড়াইয়া আনিতে গিয়াছেন। এই সংবাদে তাঁহার মনে কিরূপ চিন্তা ও ভয় হইল, তাহা বুঝিতেই পার। তিনি তাড়াতাড়ি সৈন্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র তাহাকে খুঁজিতে যাও। হায় হায়! একে ছেলেমানুষ, তাহাতে বৃহন্নলা সারথি, সে কি আর এতক্ষণ বাঁচিয়া আছে?"

এ কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ, কোনো ভয় নাই। বৃহন্নলা যখন সারথি তখন দেব, দানব যক্ষ প্রভৃতি সকলে মিলিয়াও রাজকুমারের কিছু করিতে পারিবে না।"

এই সময় সংবাদ আসিল, "যুদ্ধ জিতিয়া গোরু ছাড়ানো হইয়াছে।" তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "বৃহন্নলা যাহার সারথি তাহার তো জয় হইবেই।"

এই সংবাদ শুনিয়া বিরাটের কি আনন্দ হইল! তিনি দূতগণকে পুরস্কার দিয়া, তখনই নগরে একটা ভারি ধুমধামের ব্যবস্থা করিলেন।

তারপর সৈরিন্ধ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাশা আন, আমি কঙ্কের সহিত পাশা খেলিব।"

পাশা আসিল, খেলা আরম্ভ হইল। রাজার মন আজ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি পাশা খেলিতে খেলিতে বলিলেন, "কঙ্ক আজ আমার পুত্র কৌরবদিগকে হারাইয়া দিয়াছে!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ! বৃহন্নলা সারথি, হারাইবেন না তো কি?"

এ কথায় রাজা তো একেবারে চটিয়া লাল! 'কি? আমার পুত্র কি উহাদিগকে হারাইতে পারে না, তুমি যে বারবার কেবল বৃহন্নলা বৃহন্নলা করিতেছ? খবরদার! প্রাণের মায়া থাকে তো আর এমন বেয়াদবি করিও না!'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এ-সকল বীরকে কি বৃহন্নলা ছাড়া আর কেহ হারাইতে পারে?"

ইহার পর রাজা আর রাগ থামাইতে না পারিয়া, যুধিষ্ঠিরের মুখে পাশা ছুঁড়িয়া মারিলেন। পাশার ঘায় যুধিষ্ঠিরের নাক দিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িয়া তাঁহার অঞ্জলি ভরিয়া গেল। দ্রৌপদী তাড়াতাড়ি সোনাব গামলায় জল আনিয়া, তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দ্বারী আসিয়া বলিল, "রাজকুমার বৃহন্নলার সহিত দরজায় উপস্থিত হইয়াছেন।" তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "শীঘ্র তাহাদিগকে এখানে লইয়া আইস।"

যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে সর্বনাশ উপস্থিত, অর্জুন আসিয়া তাঁহার সেই অবস্থা দেখিলে, আর বিরাটকে আস্ত রাখিবেন না। কাজেই তিনি দ্বারীর কানে কানে বলিয়া দিলেন,'বৃহন্নলা যেন এখন এখানে না আসে। সুতরাং উত্তর একাই সেখানে আসিলেন। '

উত্তর যুধিষ্ঠিরের মুখে রক্ত দেখিয়াই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! এমন অন্যায় কাজ কে করিল? ইঁহাকে কে আঘাত করিল?"

রাজা বলিলেন, 'আমি করিয়াছি! আমি যতই তোমার প্রশংসা করি, ততই এ বামুন খালি বৃহন্নলার কথা বলে। কাজেই শেষে আমি উহাকে মারিয়াছি।'

উত্তর বলিলেন, "ব্রাহ্মণ রাগিলে সর্বনাশ হইবে। শীঘ্র ইঁহাকে সন্তুষ্ট করুন।"

এ কথায় রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'মহারাজ, আমি ইহার পূর্বেই ক্ষমা করিয়াছি।'

যুধিষ্ঠিরের রক্ত পরিষ্কার হইলে বৃহন্নলা সেখানে আসিয়া রাজাকে নমস্কার করিলেন। রাজা বৃহন্নলার সামনেই উত্তরকে বলিতে লাগিলেন, 'বাবা তুমি আমার নাম রাখিয়াছ। তোমার মতন পুত্র কি আর কাহারো হয়! এতগুলি মহা মহা বীরের সহিত না জানি কেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলে!'

উত্তর বলিলেন, "বাবা! আমায় কিছুই করিতে হয় নাই। এক দেবপুত্র আসিয়া আমার হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই কৌরবদিগকে তাড়াইয়া গরু ছাড়াইয়া আনিয়াছেন।"

এ কথা শুনিয়া বিরাট বলিলেন, "তবে তো সেই দেবপুত্রর পূজা করিতে হয়! তিনি কোথায়?"

উত্তর বলিলেন, "তিনি কাল পরশু আবার আসিবেন।"

যুদ্ধের সংবাদে সকলেই খুব খুশি হইল। আর উত্তরা সেই কাপড়গুলি পাইয়া যে কত খুশি হইল। তাহা আর লিখিয়া কি বুঝাইব?

এইরূপে অজ্ঞাতবাস শেষ হইল। পাঁচ ভাই উত্তরকে লইয়া পরামর্শ করিলেন যে, আর দুদিন পরে তাঁহারা নিজের পরিচয় দিবেন। কিরূপ করিয়া পরিচয় দেওয়া হইবে, তাহাও স্থির হইল।

যেদিন পরিচয় দিবার কথা, সেদিন পাণ্ডবেরা স্নানের পর সুন্দর সাদা পোশাক আর অলঙ্কার পরিয়া , বিরাটের সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। বিরাট সভায় আসিয়া দেখেন, একি আশ্চর্য ব্যাপার! সভাসদ কঙ্ক সাজগোজ করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তিনি বিরক্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি কঙ্ক! আমার সিংহাসনে কেন বসিতে গেলে?"

এ কথায় অর্জুন হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রের সিংহাসনেও বসিতে পারেন। আপনার সিংহাসনে বসাতে তাঁহার অন্যায় কি হইল?"

বিরাট বলিলেন, 'ইনিই যদি রাজা যুধিষ্ঠির হন তবে তাঁহার ভ্রাতাগণ আর দ্রৌপদী দেবী কোথায়?'

এ প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন একে-একে সকলেরই পরিচয় দিলেন। তারপর উত্তর অর্জুনের অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, 'যে দেবপুত্র কৌরবদিগের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া গরু ছাড়াইয়াছিলেন, তিনি এই অর্জুন।'

সকল কথা শুনিয়া বিরাটের যেমন আশ্চর্য বোধ হইল, তেমনি তিনি আনন্দিতও হইলেন। পান্ডবদিগকে যতপ্রকারে আদর দেখানো সম্ভব মনে হইল, তিনি তাহার কিছুই বাকি রাখিলেন না। তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, 'আমার কি সৌভাগ্য!' বিশেষত, অর্জুনের প্রতি তাঁহার যে কিরূপ স্নেহ হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, নিজের কন্যা উত্তরার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।

কিন্তু এ কথায় অর্জুন রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'আমি উত্তরার গুরু, তাহাকে সর্বদা আমার কন্যার মতো ভাবিয়া স্নেহ করিয়াছি। ইনিও আমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছেন; তাঁহার সহিত কি আমার বিবাহের কথা হইতে পারে? আমার পুত্র অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হউক।'

এই প্রস্তাবে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, বীরত্বে অভিমন্যুর মতো এমন সুপাত্র আর হয় না। কাজেই, সুন্দর দিন দেখিয়া, মহাসমারোহে অভিমন্যু আর উত্তরার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে নানা দেশ হইতে বিরাট এবং পাণ্ডবদিগের আত্মীয়-স্বজন আর রাজারা আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণ, বলরাম, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি কেহই আসিতে বাকি ছিল না।

উদ্যোগপর্ব

ভিমন্যু আর উত্তরার বিবাহের পরে, বিরাটের বাড়িতে রাজা এবং যোদ্ধাদিগের মস্ত এক সভা হইল। বিবাহে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বড়-বড় বীর এবং সকলেই পাণ্ডবদিগের বন্ধু। ইঁহারা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, এখন কি উপায়ে পাণ্ডবেরা নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইতে পারেন। সেই কপট পাশা খেলায় হারিয়া, পাণ্ডবেরা বারো বৎসর বনবাস আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞা করেন। সে প্রতিজ্ঞা তাঁহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। তথাপি দুরাত্মা দুর্যোধনের দল এখন বলিতেছে যে, তেরো বৎসর না যাইতেই তাঁহাদের সন্ধান পাইয়াছে। আসলে তাহাদের রাজ্য ছাড়িয়া দিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। তাই পাণ্ডবদিগের বন্ধুগণ স্থির করিলেন যে, যদি সহজে উহারা রাজ্য ছাড়িয়া না দেয়, তবে যুদ্ধ করিয়া তাহা আদায় করিতে হইবে।

এদিকে দুর্যোধন প্রভৃতিও চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না। পাণ্ডবেরা যে তাঁহাদের রাজ্য সহজে ছাড়িবেন না, একথা তাঁহারা বেশ জানিতেন। সুতরাং দুই দলেই যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইল। একদিকে যেমন সৈন্য-সামন্ত এবং অস্ত্রশস্ত্রের জোগাড় হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমন বড়-বড় বীরদিগকে ডাকিয়া নিজেদের দলে আনিবার চেষ্টারও ত্রুটি হইল না।

কৃষ্ণের সাহায্য পাওয়া একটা মস্ত কথা। সেজন্য দুর্যোধন আর অর্জুন প্রায় এক সময়েই দ্বারকায় যাত্রা করেন, একই সময়ে সেখানে উপস্থিত হন। কৃষ্ণ তখন নিদ্রায়। দুর্যোধন আগেই তাঁহার শয়নঘরে গিয়া, তাঁহার মাথার নিকটে একটি বড় আসন অধিকার করিলেন; পরে অর্জুন আসিয়া বিনীতভাবে কৃষ্ণের পায়ের কাছে বসিলেন।

ঘুম ভাঙ্গিলে প্রথমে পায়ের দিকেই চোখ পড়ে। কাজেই কৃষ্ণ জাগিয়া আগে দেখিলেন অর্জুনকে, তারপর দেখিলেন দুর্যোধনকে। দুজনকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিজন্য আসিয়াছ?"

দুর্যোধন হাসিমুখে বলিলেন, "যুদ্ধে আপনার সাহায্য চাহিতে আসিয়াছি। আর আমি আগে আসিয়াছি, কাজেই আমার কথাই আপনাকে রাখিতে হইবে।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "আপনি আগে আসিয়াছেন সত্য। আর আমি আগে অর্জুনকে দেখিয়াছি, একথাও সত্য। সুতরাং আমি দুজনকেই সাহায্য করিব। একদিকে নারায়ণী সৈন্য নামক আমার অতি ভয়ংকর এক অর্বুদ সৈন্য থাকিবে, অপরদিকে আমি শুধু হাতে থাকিব, কিন্তু যুদ্ধ করিব না। এই দুয়ের মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা নিতে পার। অর্জুন বয়সে ছোট, সুতরাং তাহাকেই আগে জিজ্ঞাসা করি। বল তো অর্জুন, ইহার কোন্‌টা তোমার পছন্দ হয়?"

অর্জুন বলিলেন, "আমি সৈন্য চাহি না, আপনাকেই চাহি।"

কাজেই অর্জুন পাইলেন কৃষ্ণকে, আর দুর্যোধন পাইলেন এক অর্বুদ সৈন্য। দুজনেই মনে করিলেন, 'আমি খুব জিতিয়াছি।'

সেখান হইতে দুর্যোধন বলরামের নিকট গেলেন। কিন্তু বলরাম বলিলেন, "আমি তোমাদের কাহাকেও সাহায্য করিব না, তোমরা প্রস্থান কর।"

এদিকে কৃষ্ণ আর অর্জুন স্থির করিলেন যে যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হইবেন।

শল্য কি করিয়াছিলেন শুনিবে? সে হাসির কথা, শল্য পাণ্ডবদিগের মাতুল, মাদ্রীর ভাই। তিনি, পাণ্ডবদিগের সাহায্য করিবার জন্য, বিস্তর সৈন্য লইয়া তাঁহার রাজ্য মদ্রদেশ হইতে যাত্রা করিলেন। পথে দুর্যোধন, তাহাকে হাত করিবার জন্য, তাঁহার এতই সমাদর করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে দেবতারও মন ভুলিয়া যায়। যেখানেই শল্য বিশ্রাম করিবেন, সেইখানেই দুর্যোধন চমৎকার একটি বৈঠকখানা করিয়া রাখিয়াছেন। বৈঠকখানাগুলি দেখিয়া শল্য ভাবিলেন, 'বাঃ। পাণ্ডবেরা আমার কতই যত্ন করিতেছে!' এ যে দুর্যোধনের চাতুরি, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিলেন না। একটা বৈঠকখানার কারুকার্য তাঁহার বড়ই ভালো লাগায়, তিনি বলিলেন, ইহার কারিগরকে ডাক, বকশিস দিব।" অমনি নিজে দুর্যোধন কারিগর সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত! শল্য তাঁহাকে বলিলেন. "কারিগর বল, তুমি কি পুরস্কার চাও? আমি তাহাই দিতেছি।"

দুর্যোধন বলিলেন, "মামা। আপনাব কথা যেন মিথ্যা না হয! আমি এই চাই যে, আপনি আমার দলে আসিয়া সেনাপতি হউন।"

সে-সকল লোক কথায় বড় খাঁটি ছিলেন। শল্যের আর পাণ্ডবদিগের সাহায্য করা হইল না। দুর্যোধনকে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা তুমি ঘরে যাও, আমি যুধিষ্ঠিরের সহিত দেখা করিয়া আসিতেছি।"

যুধিষ্ঠিবেব সহিত দেখা হইলে, শল্য তাহাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "তোমাদের দুঃখেব শেষ হইযাছে, এখন তোমাদের শত্রুদিগকে মারিয়া সুখে রাজ্য কর।" তারপর পথে দুর্যোধনের ফাঁকিতে পড়িয়া যেসকল কথা বলিযা আসিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। সে কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মামা! আপনি আপনার কথা রাখিয়া ভালোই করিয়াছেন ঃ কিন্তু আমাদের একটি উপকাব করিতে হইবে। কর্ণ আর অর্জুনের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আপনি কর্ণের সারথি হইয়া, এমন উপায় করিবেন, যাহাতে তাহার তেজ কমিয়া যায়।"

শল্য বলিলেন, "সে বিষযে তোমরা কোনো চিন্তা করিও না। আমার যতদূর সাধ্য তোমাদের উপকার নিশ্চয় করিব।"

এইরূপে বড়-বড় বীরগণ ক্রমে দুই দলের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

পাণ্ডবদিগের দলে প্রথমে আসিলেন সাত্যকি। ইনি অসাধারণ যোদ্ধা, কৃষ্ণের আত্মীয় এবং অর্জুনের ছাত্র ও বন্ধু। ইঁহার সঙ্গে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য আসিল। তারপর চেদি দেশের রাজা মহাবীর ধৃষ্টকেতু এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া আসিলেন। তারপর মগধের রাজা জরাসন্ধের পুত্র জয়ৎসেন এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া আসিলেন। তারপর মহাবীর পাণ্ড্য এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া আসিলেন।

তারপর দ্রুপদ, বিরাট ইঁহারাও অনেক লক্ষ যোদ্ধা আর সৈন্যের জোগাড় করিলেন। এইরূপে পাণ্ডবদের পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল।

দুর্যোধনের দলে—ভগদত্তের এক অক্ষৌহিণী, ভূরিশ্রবার এক অক্ষৌহিণী, শল্যের এক অক্ষৌহিণী, কৃতবর্মার এক অক্ষৌহিণী, জয়দ্রথের এক অক্ষৌহিণী, কম্বোজের রাজা সুদক্ষিণের এক অক্ষৌহিণী, ইহা ছাড়া দক্ষিণাপথ, অবন্তী প্রভৃতি নানা দেশ হইতে আরো পাঁচ অক্ষৌহিণী, সবশুদ্ধ এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল।

এইরূপে দুই দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আর অল্পদিনের মধ্যেই ভয়ংকর মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইবে, রক্তে দেশ ভাসিয়া যাইবে, ঘরে ঘরে কান্না উঠিবে। দেশের যত ক্ষত্রিয় বীর, প্রায় সকলেই যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। হায়! আর অল্পদিন পরে হয়তো উহাদের কেহই বাঁচিয়া থাকিবে না।

যুদ্ধ কি ভয়ংকর কাজ, আর ক্ষত্রিয়ের কর্ম কি কঠিন! মানুষকে মারিয়া মানুষ মনে করিবে যে, 'ধর্ম করিলাম!' কয়েকজন লোক একটা রাজ্য লইয়া ঝগড়া করিতেছে, তাহার জন্য দেশশুদ্ধ লোক কাটাকাটি করিয়া মরিবে!

এমন যুদ্ধ কে সহজে করিতে চায়? পাণ্ডবেরা তো তাহা চাহেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছিলেন "আমাদের সমুদয় রাজ্য না দেয়, কেবল আমরা নিজ হাতে যেটুকু জয় করিয়া লইয়াছিলাম তাহাই দেউক। তাহাও যদি না দেয়, পাঁচজনকে পাঁচখানি গ্রাম মাত্র দিলেও আমরা সন্তুষ্ট হই।"

কিন্তু দুষ্ট লোকে লোভে পড়িলে কি আর তাহার ভালো মন্দ জ্ঞান থাকে? কত লোক দুর্যোধনকে বুঝাইল, কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য হইল না। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, সঞ্জয় প্রভৃতি সকলে মিলিয়া কত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যে ইচ্ছা করিয়া শুনিবে না, তাহার কাছে কথা বলিয়া কি ফল? কর্ণ শকুনি প্রভৃতিরা, দুর্যোধনকে ক্রমাগত যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহ দিয়া, এমন করিয়া তুলিয়াছেন যে, তিনি আর কাহারো কথায় কান দিতে চাহেন না।

ধৃতরাষ্ট্র মুখে দুর্যোধনের নিন্দা করিয়াছিলেন, আর পাণ্ডবদিগের সহিত বন্ধুতা করার কথা বারবার বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহা সরলভাবে বলেন নাই, কাজেই তাঁহার কথায় কোনো ফল হয় নাই।

সকলের শেষে কৃষ্ণ এই যুদ্ধ থামাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার কথা রাখা দূরে থাকুক, দুর্যোধন তাঁহাকে অপমান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। রাজ্য দিবার কথায় রাজি করিতে না পারিয়া, কৃষ্ণ দুর্যোধনের নিকট পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচখানি গ্রাম মাত্র চাহিলেন। তাহার উত্তরে দুর্যোধন বলিলেন কি যে, "খুব সরু ছুঁচের আগায় যতটুকু জায়গা বিঁধে, তাহার অর্ধেকও বিনা যুদ্ধে দিব না!"

ইহার উপরে আবার বুদ্ধিমানেরা কৃষ্ণকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন! কিন্তু তাঁহার চেহারা দেখিয়া, আর কাজে তাহা করিতে সাহস হয় নাই। তিনি ধমকের চোটে দুষ্টদিগকে জব্দ করিয়া, সেখান হইতে চলিয়া আসেন।

আসিবার পূর্বে কৃষ্ণ কর্ণকে নির্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "কর্ণ, তুমি কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছ? জান কি, পাণ্ডবেরা তোমার ছোট ভাই? তুমি এখনই আমার সঙ্গে চল, তোমার ভাইদের সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিই। পাণ্ডবেরা তোমাকে চিনিতে পারিলে, তোমায় মাথায় করিয়া রাখিবেন। তখন এই পৃথিবীর রাজা হইবে তুমি, আর পাণ্ডবদের প্রধান কাজ হইবে, তোমার সেবা করা, আর তোমার আজ্ঞা পালন করা। তুমি আর অর্জুন দুভাই মিলিয়া এই পৃথিবীতে কত বড়-বড় কাজ করিবে আর তাহা দেখিয়া আমাদের চক্ষু

জুড়াইয়া যাইবে।"

কর্ণ বলিলেন, "কৃষ্ণ! তোমার সকল কথাই সত্য। কিন্তু তুমি আমাকে কি মনে করিয়াছ? দুর্যোধনের অনুগ্রহে আমি রাজ্য পাইয়া সুখে বাস করিতেছি। এই দুর্যোধনকে আমার ভরসায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিয়া, আমি তাহাকে ছাড়িয়া যাইব? লোকে তো জানে, আমি অধিরথ সারথির পুত্র। এখন যুদ্ধের আরম্ভেই যদি আমি পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিতে যাই, তবে সকলে বলিবে আমি কাপুরুষ। না কৃষ্ণ! তোমার কথা আমি রাখিতে পারিব না!"

বনবাসে যাইবার সময় কুন্তীকে পাণ্ডবেরা বিদুরের বাড়িতেই রাখিয়া যান। কৃষ্ণও যুদ্ধ থামাইবার চেষ্টায় আসিয়া এবারে বিদুরের বাড়িতেই ছিলেন। কাজেই তাঁহার নিকট কুন্তীর কোনো কথাই জানিতে বাকি থাকে নাই।

কৃষ্ণ চলিয়া যাইবার পবে, যুদ্ধের কথা ভাবিয়া কুন্তীর প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। পুত্রগণ যুদ্ধ করিয়া একজন আর একজনকে মারিবে, মার প্রাণে একথা কি সহ্য হইতে পারে? তাই তিনি মনে করিলেন তিনি নিজে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

কর্ণ বোজ গঙ্গায় স্নান করিয়া সূর্যের স্তব কবিতেন। স্নানেব সময় কুন্তী গঙ্গার ধারে গিয়া, এই স্তবের শব্দে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন, এবং তাঁহারই ছায়ায় বসিয়া, স্তব শেষ হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্তবের শেষে কর্ণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জোড়হাতে কহিলেন, "হে দেবি, আমি অধিরথ এবং রাধার পুত্র কর্ণ, আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনার কি চাহি?"

কুন্তী বলিলেন, "বাছা, তুমি আমারই পুত্র। বাধার পুত্র তুমি কখনই নহ, সারথির ঘরে তোমার জন্মও হয় নাই। নিজের ভাইদিগকে না চিনিতে পারিয়া, কেন বাবা তুমি দুর্যোধনের সেবা করিতেছ? তোমার ভাইদের কাছে তুমি আইস। যেমন কৃষ্ণ বলরাম দুভাই, তেমনি আমার কর্ণ আর অর্জুন হউক। পাঁচ ভাইয়ের প্রভু হইয়া সুখে রাজ্য কর। সারথির পুত্র বলিয়া যেন তোমার দুর্নাম না থাকে।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "আপনাব কথায় আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না। জন্মকালে আপনি আমাকে ফেলিয়া দিযাছিলেন; মায়েব কাজ আমার প্রতি কিছুই করেন নাই। এখন যে আমাকে স্নেহ দেখাইতেছেন, তাহাও কেবল আপনার পুত্রদিগের উপকারের জন্য। এমন অবস্থায়, আমি আপনার কথায় দুর্যোধনকে ছাড়িতে যাইব কেন? তবে, আপনি কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তাই এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ইহাদেব কাহারো আমি কোনো অনিষ্ট করিব না। কিন্তু অর্জুনকে ছাড়িতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নহি। যুদ্ধে হয় আমি তাহাকে মারিব, না হয় সে আমাকে মাবিবে। আপনার পাঁচ পুত্রই লোকে জানে, তাহার অধিক পুত্র আপনার থাকা ভালো নহে।"

এই বলিয়া কর্ণ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কুন্তীও কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিলেন।

যুদ্ধ আর কিছুতেই থামিল না। সুতরাং তাহার আয়োজন বিধিমতে হইতে লাগিল। কুরুক্ষেত্রের প্রকাণ্ড মাঠের ভিতর দিয়া হিরণ্বতী নদী বহিতেছে। সেই নদীর ধারে যুধিষ্ঠির তাহার সৈন্য সাজাইতে লাগিলেন। দুর্যোধনের লোকেরাও তাহারই সামনে আসিয়া শিবির প্রস্তুত করিল। দেখিতে দেখিতে সেই মাঠের চেহারা এমনি বদলাইয়া গেল যে, তাহাকে চেনা ভার। খাল পুকুর, রাস্তা, তাঁবু ইত্যাদিতে সে মাঠ নগরের মতো হইয়া গিয়াছে। তাহার

ভিতরে মিস্ত্রী, মজুর, পাচক, বৈদ্য, কিছুরই অভাব নাই। আটা, ঘি, ডাল, চাউল, ঔষধপত্র, কাঠ, কয়লা ইত্যাদি কোনো দরকারি জিনিষেরই ত্রুটি দেখা যায় না।

আর অস্ত্রের কথা কি বলিব? মানুষের বুদ্ধিতে মানুষকে মারিবার যতরকম উৎকট উপায় হইতে পারে, সকলই প্রস্তুত। রাশি রাশি তোমর (লোহার কাঁটা পরানো ডাণ্ডা) আছে;ইহার ঘায় হাড় গুঁড়া এবং বুক ফোঁড়া এক সঙ্গেই হইতে পারে। ভালো মত এপিঠ-ওপিঠ করিয়া ফুঁড়িতে হইলে তাহার জন্য শক্তির (লোহার বল্লম) আয়োজন যথেষ্ট হইয়াছে। পাশ (ফাঁস) আছে আঁটি আঁটি। এ জিনিস শত্রুর গলায় লাগাইয়া টানিলে, বুঝিতেই পার। আর যদি শত্রুর চুলে ধরিয়া টানিয়া তাহাকে কাবু করিতে হয়, তাহার জন্য অসংখ্য 'কচ-গ্রহ-বিক্ষেপ' (লম্বা লাঠির আগায় সাংঘাতিক আঠা) রহিয়াছে। কিংবা যদি আঁকশি লাগাইয়া তাহাকে টানিবার দরকার পড়ে, সে আঁকশিরও ঐ পর্বতাকার ঢিপি! এ অস্ত্রের নাম 'কর-গ্রহ-বিক্ষেপ'। বালি তৈল আর ঝোলা গুড়ের অন্তই নাই। এসব জিনিস গরম করিয়া শত্রুর গায় ঢালিয়া দিতে হইবে; তাহার জন্য এই বড়-বড় হাতাও আছে। মুখ বাঁধা ভারী ভারী হাঁড়ির ভিতরে ভয়ানক ভয়ানক সাপ। শত্রুর ভিড়ের মধ্যে এই সকল হাঁড়ি ফেলিয়া দিতে পারিলে বেশ কাজ দেয়! ধূপ-ধূনা জ্বালাইয়া ফেলিতে পারিলেও মন্দ হয় না, তাহার ঢিপি পর্বত প্রমাণ, কুল কাঁটার মতন বাঁকানো কাঁটা পরানো ভয়ানক বল্লম, তাহার নাম 'অঙ্কুশ তোমর', এ অস্ত্র শত্রুর পেটে বিঁধাইয়া টানিলে পেটের ভিতরের জিনিস তখনই বাহির হইয়া আসে।

ইহা ছাড়া ঢাল, তলোয়ার, খাঁড়া, বর্শা, লাঠি, গদা, তীর, ধনুক প্রভৃতি সাধারণ অস্ত্র যে কত আছে, তাহার তো হিসাবই হয় না। দা, কুড়াল, খুন্তি, কোদাল, এমনকি লাঙ্গল পর্যন্ত বাদ যায় নাই।

এসকল অস্ত্র বোধহয় সাধারণ সৈন্যদের জন্য। বড়-বড় ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা এসকল অস্ত্রের কোনো কোনোটা ব্যবহার করিতেন না, এমন নহে; মোটের উপর তাঁহাদের যুদ্ধ-কৌশল ইহা অপেক্ষা অনেক উঁচুদরের। আর তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্রও যে অতি আশ্চর্যরকমের, তাহাও আমাদের দেখিতে বাকি নাই।

সকল আয়োজন শেষ হইলে দুর্যোধন জোড়হাতে ভীষ্মকে বলিলেন, "হে পিতামহ! আপনি যুদ্ধবিদ্যায় শুক্রের সমান পণ্ডিত, আপনি আমাদের সেনাপতি হউন। আপনার পশ্চাতে আমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে যাইব।"

ভীষ্ম বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক। তোমাকে কথা দিয়াছি, সুতরাং তোমার হইয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব; কিন্তু আমাব কাছে তোমরা যেমন, পাণ্ডবেরাও তেমনি। এইজন্য আমি কখনো তাহাদিগকে বধ করিতে পারিব না। তোমার অপর শত্রু আমি রোজ হাজার হাজার মারিব।

কর্ণের বড়ই লম্বা-চওড়া কথা কহিবার অভ্যাস, সেজন্য তিনি ভীষ্মের নিকট অনেক বকুনি খান, কাজেই দুজনের মধ্যে একটু চটাচটি আছে। তাহার উপরে আবার দুর্যোধনের দলের রথী এবং মহারথীদিগের নাম করিতে গিয়া, ভীষ্ম কর্ণকে অর্ধরথ (অর্থাৎ আধখানা রথী) বলাতে এই বিরোধ আরো বাড়িয়া গেল।

শেষে ভীষ্ম বলিলেন, "কর্ণ আমার সঙ্গে বড়ই রেষারেষি করে, আমি তাহার সঙ্গে মিলিয়া যুদ্ধ করিতে পারিব না।" তাহাতে কর্ণ বলিলেন, "আমিও ভীষ্ম থাকিতে এ যুদ্ধে

হাত দিতেছি না। উনি মারা যাউন, তারপর আমি অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব।"

এইরূপে দুর্যোধনের পক্ষে ভীষ্মকে সেনাপতি করিয়া, অন্যান্য যোদ্ধারা তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

পাণ্ডবদিগের পক্ষে দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী ও জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, এই সাতজনকে সেনাপতি করা হইল; ধৃষ্টদ্যুম্ন হইলেন প্রধান সেনাপতি। ইঁহাদের আবার পরিচালক হইলেন অর্জুন।

এই সময়ে দুর্যোধন একদিন উলুক নামক এক দূতকে বলিলেন, "তুমি পাণ্ডবদিগকে আর কৃষ্ণকে, খুব করিয়া গালি দিয়া আইস।"

কিরূপ গালি দিতে হইবে, তাহাও দুর্যোধন অবশ্য বলিয়া দিলেন; তত কথা লিখিবার স্থান নাই। আর থাকিলেই বা তাহা লিখিয়া দরকার কি? ভালো কথা হইত তবে না হয় লিখিতাম। দুর্যোধনের হুকুম পাওয়া মাত্র উলুক পাণ্ডবদিগের নিকট গিয়া, তাঁহার কথাগুলি অবিকল মুখস্থ বলিয়া দিল।

এই সকল গালির উত্তরে পাণ্ডবেরা বলিলেন, "উলুক! দুর্যোধনকে বলিবে যে তাহার উচিত সাজা পাওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আর বেশি বিলম্ব নাই।"

উলুক চলিয়া গেলে পাণ্ডবেরা সৈন্য ভাগ করিয়া গুছাইতে লাগিলেন। বড়বড় সেনাপতিগণ কে কোন্ কোন্ দলের কর্তা হইবেন, এ সকল ঠিক করাই সকলের প্রথম কাজ। এ কাজ শেষ হইয়া গেলে আর আয়োজনের কিছুই বাকি রহিল না; এখন শত্রু আসিলেই হয়।

দুর্যোধনের দলেও অবশ্য এইরূপ আয়োজন চলিতেছিল। দুই পক্ষের যোদ্ধাদিগের কে কেমন বীর, ভীষ্ম দুর্যোধনকে তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার জন্য আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব। কৃষ্ণই হউন, আর অর্জুনই হউন, কাহাকেই আমি সহজে ছাড়িব না। উহাদেব মধ্যে কেবল শিখণ্ডীব গায়ে আমি অস্ত্রাঘাত করিতে প্রস্তুত নহি, আব সকলের সহিতই যুদ্ধ করিব।"

এ কথায় দুর্যোধন আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কেন? শিখণ্ডীর গায়ে আপনি যে অস্ত্রাঘাত কবিবেন না, তাহার কারণ কি?"

ভীষ্ম বলিলেন, "স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, তাই মারিব না।"

দুর্যোধন বলিলেন, "শিখণ্ডী তো দ্রুপদের পুত্র। সে স্ত্রীলোক হইল কিরূপে?"

ভীষ্ম বলিলেন, "শিখণ্ডীর কথা তবে বলি, শুন। আমার ভাই বিচিত্রবীর্যের সহিত বিবাহ দিবার জন্য আমি কাশীরাজার তিনটি কন্যাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে জোর করিয়া লইয়া আসি। ইহাদের বড়টির নাম অম্বা। অম্বা বলিল, 'আমি মনে মনে শাল্বকে বিবাহ করিয়াছি।' কাজেই আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া আব দুটি মেয়ের সহিত ভাইয়ের বিবাহ দিলাম।

"অম্বা শাল্বের কাছে গেল, কিন্তু আমি তাহাকে জোর করিয়া আনায় অপমান বোধ করিয়া, আর হয়তো কতকটা আমার ভয়েও, সে তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। এইরূপে সেই কন্যা নিতান্ত দুঃখে পড়িয়া ভাবিল, 'এখন কোথায় যাই? শাল্ব অপমান করিল, পিতার ঘরে গেলেও তাহারা আমাকে ঘৃণা করিবে। হায়! ভীষ্মই আমার এই দুঃখের কারণ? উহাকে শাস্তি দিতে পারিলে তবে আমার মন শান্ত হয়।' এই মনে করিয়া সে কত দেশ যে ঘুরিল, কত মুনি-ঋষির নিকট নিজের দুঃখের কথা বলিয়া কাঁদিল। শেষে আমার

গুরু পরশুরাম, তাহার প্রতি দয়া করিয়া আমায় শাসন করিতে আসিলেন। তাঁহার সহিত আমার ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে তিনি আমাকে হারাইতে না পারিয়া, অম্বাকে বলিলেন, 'আমি তো অনেক যুদ্ধ করিলাম, কিন্তু ভীষ্ম আমাকে হারাইয়া দিল। আমার আর ক্ষমতা নাই, তুমি চলিয়া যাও।'

"তারপর অম্বা, অনেক তপস্যা করিয়া, আমাকে মারিবার জন্য শিবের নিকট বরলাভ করে। সেই বরের জোরে সে এখন শিখণ্ডী হইয়া জন্মিয়াছে। আমি জানি, এ সেই অম্বা— এ পুরুষ মানুষ নহে। কাজেই আমি ইহার গায়ে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিব না।"

যুদ্ধের পূর্বে দুর্যোধন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদামহাশয়, আপনি একেলা যথাসাধ্য যুদ্ধ করিলে কত সময়ের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সকল সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে পারেন?"

ভীষ্ম বলিলেন, "আমি ইচ্ছা করিলে এক মাসে পাণ্ডবদের সকল সৈন্য মারিতে পারি।"

এই কথা একে একে দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা আর কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলে, দ্রোণ বলিলেন, "আমিও এক মাসে পারি।"

কৃপ বলিলেন, "আমার দুমাস লাগে।"

অশ্বত্থামা বলিলেন, "আমার দশদিন লাগে।"

কর্ণ বলিলেন, "আমি পাঁচদিনেই উহাদের সকল সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে পারি।"

কর্ণের কথা শুনিয়া ভীষ্ম হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অর্জুনের সঙ্গে কিনা এখনো দেখা হয় নাই, তাই তুমি এমন কথা বলিতেছ।"

যুধিষ্ঠিরের চরেরা ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির এই সকল কথা শুনিয়া তাহা যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া বলাতে, তিনি অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অর্জুন, তুমি কতক্ষণে কৌরবদিগের সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে পার?"

অর্জুন বলিলেন, "কৃষ্ণ সহায় থাকিলে, আমি এক নিমিষে সকল শেষ করিয়া দিতে পারি। শিব আমাকে পাশুপত নামক যে অস্ত্র দিয়াছিলেন তাহা আমার নিকট আছে। ইহা দিয়া তিনি প্রলয়ের সময় সকল সৃষ্টি নাশ করেন। এ অস্ত্রের সংকেত ভীষ্মও জানেন না, দ্রোণও জানেন না, কৃপ, অশ্বত্থামা বা কর্ণও জানেন না। এ সকল বড়-বড় অস্ত্র সাধারণ যুদ্ধে ব্যবহার করিতে নাই। আমরা সাদাসিধা যুদ্ধ করিয়াই জয়লাভ করিব।"

কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমভাগে, দুর্যোধনের শিবির হইয়াছিল। যুদ্ধের দিনের, নির্মল প্রভাতে, তাঁহার লোকেরা স্নানান্তে মালা আর সাদা কাপড় পরিয়া অসীম উৎসাহ ভরে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মাঠের পূর্বভাগে পশ্চিমমুখ হইয়া যুধিষ্ঠিরের দলও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সহস্র সহস্র ঢাক আর অযুত শঙ্খ মহাঘোররবে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে।

ভীষ্মপর্ব

দ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্বে এইরূপ নিয়ম হইল যে, যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলিয়া যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়াছে, যে আশ্রয় চাহিতেছে, আর যে অন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত, এরূপ লোককে কেহ বধ করিবে না। যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময় দুই দলের লোকই বন্ধুর মতো ব্যবহার করিবে। গালির উত্তরে শুধু গালিই দিবে, অস্ত্রাঘাত করিবে না। যুদ্ধের স্থান হইতে কেহ বাহির হইয়া গেলে, আর তাহাকে মারিবে না। রথী রথীর সহিত, হাতি হাতির সহিত, ঘোড়া ঘোড়ার সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, এইভাবে যুদ্ধ

হইবে। মারিবার সময় বলিয়া মারিবে। অচেতন লোককে, আর সারথি, সহিস, অস্ত্রবাহক, বাজনদার ইহাদিগকে কখনো প্রহার করিবে না।

এই সময়ে, ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত জানিয়া, ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিতে আসিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের তখন নিতান্তই দুঃখের অবস্থা। পুত্রগণের ব্যবহার, আর যুদ্ধের ভীষণ ফলের কথা ভাবিয়া তিনি আর কূল কিনারা পাইতেছেন না। এমন সময় ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "যাহা হইবার, তাহা হইবেই; তুমি দুঃখ করিও না। যদি যুদ্ধ দেখিতে চাও, আমি তোমাকে চক্ষু দিতে পারি।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আত্মীয়গণের মৃত্যু আমি দেখিতে পারিব না। আপনার কৃপায় যুদ্ধের সকল সংবাদ যেন শুনিতে পাই।"

এ কথায় ব্যাস সঞ্জয়কে দেখাইয়া বলিলেন, "তোমার এই সঞ্জয়ের নিকট তুমি সকল কথাই শুনিতে পাইবে। আমার বরে, যুদ্ধের কোনো সংবাদই ইহার অজানা থাকিবে না। দেখা হউক, অদেখা হউক, সকল ঘটনাই, এমনকি, লোকের মনের কথা পর্যন্ত, সে জানিতে পারিয়া তোমাকে শুনাইবে। যুদ্ধের ভিতর গিয়াও সে সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিবে; অস্ত্রে তাহার কোনো অনিষ্ট হইবে না।"

এই কথা বলিয়া ব্যাসদেব আবার ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "এ কাজটা ভালো হইতেছে না; তুমি ইহাদিগকে বারণ কর। তোমার রাজ্যের এতটা কি প্রয়োজন যে, তাহার জন্য এমন পাপ করিতে যাইতেছ? পাণ্ডবদের রাজ্য তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমি তো যাহাতে ধর্ম হয় তাহাই চাই, কিন্তু উহারা যে আমার কথা শুনে না।"

এইরূপ কথাবার্তার খানিক পরে ব্যাসদেব সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে পাণ্ডব ও কৌরবদিগের সৈন্য সকল যুদ্ধক্ষেত্রে সামনাসামনি ব্যূহ বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে; যুদ্ধ আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই।

'ব্যূহ' বাঁধা কাহাকে বলে জান? সৈন্যেরা তো যুদ্ধের সময় তাহাদের ইচ্ছামত এলোমেলোভাবে দাঁড়াইতে পায় না; তাহাদিগকে কোনো একটা বিশেষ নিয়মে, বেশ জমাটরূপে গুছাইয়া দাঁড় করাইতে হয়। এইরূপ কায়দা করিয়া দাঁড়ানোর নাম 'ব্যূহ'। এক একরকম ব্যূহের এক একরকম নাম; যেমন 'চক্র' ব্যূহ, 'গরুড়' ব্যূহ ইত্যাদি।

পাণ্ডবদিগের ব্যূহ দেখিয়া দুর্যোধন দ্রোণকে বলিলেন, "গুরুদেব! দেখুন, পাণ্ডবদের কত সৈন্য; ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদের ব্যূহ নির্মাণ করিয়াছে। উহাদের দলে খুব বড় বীর আছে; তেমনি আমাদেরও তাহার চেয়ে বেশি আছে। তাহা ছাড়া, আমাদের সৈন্য ঢের, উহাদের সৈন্য কম। আমাদের ব্যূহের মাঝখানে ভীষ্ম রহিয়াছেন; তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যূহে ঢুকিবার পথে পথে আপনারা সকলে আছেন।"

এ কথা শুনিয়া ভীষ্ম সিংহনাদপূর্বক তাঁহার শঙ্খে ফুঁ দিলেন। সেই শঙ্খের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার শঙ্খ, শিঙ্গা, ঢাক প্রভৃতি বাজিয়া রণস্থলে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিল।

ইহার উত্তরে পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইতে, কৃষ্ণের 'পাঞ্চজন্য', অর্জুনের 'দেবদত্ত', ভীমের 'পৌণ্ড্র', যুধিষ্ঠিরের 'অনন্তবিজয়', নকুলের 'সুঘোষ', আর সহদেবের 'মণিপুষ্পক' নামক মহাশঙ্খের ভয়ংকর শব্দের সহিত, দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রভৃতি সকলের

শঙ্খের শব্দ মিলিয়া আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া কৌরবদিগের আতঙ্ক জন্মাইয়া দিল।

তখন অর্জুন গাণ্ডীব হাতে করিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, "একবার দুই দলের মাঝখানে রথ লইয়া চলুন, কে কে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে—দেখিয়া লই।"

এ কথায় কৃষ্ণ দুই দলের মাঝখানে রথ লইয়া গেলে, অর্জুন দেখিলেন যে, খুড়া, জ্যাঠা, মামা, ভাই, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, বন্ধু, প্রভৃতি যত ভক্তি মান্য, স্নেহ এবং ভালোবাসার পাত্র, সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত; রাজ্যের জন্য সকলেই কাটাকাটি করিয়া প্রাণ দিতে আসিয়াছে। ইহা দেখিয়া দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণকে বলিলেন, "হায়! আমি কাহাকে মারিয়া রাজ্য লইতে আসিয়াছি! এমন রাজ্য পাইয়া ফল কি? এইরূপ ভয়ানক পাপ করার চেয়ে, শত্রুর হাতে মারা যাওয়াই তো ভালো।"

এই বলিয়া তিনি গাণ্ডীব ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সেদিন কৃষ্ণ সঙ্গে না থাকিলে, আর কি অর্জুনের যুদ্ধ করা হইত? তাঁহার মনের দুঃখ দূর করিয়া, তাঁহা দ্বারা যুদ্ধ করাইতে, কৃষ্ণকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দেন, তাহাতে 'ভগবদগীতা' নামক অমূল্য পুস্তকই হইয়া গিয়াছে; বড় হইয়া তোমরা তাহা পড়িবে। যাহা হউক, কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের মন শান্ত হওয়াতে, আবার তাঁহার যুদ্ধের উৎসাহ আসিল।

এমন সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির, বর্ম আর অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক রথ হইতে নামিয়া কিসের জন্য ভীষ্মের রথের দিকে হাঁটিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব আর অন্যান্য বীরেরাও তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছেন; কিন্তু ইঁহাদের কেহই যুধিষ্ঠিরের কার্যের অর্থ বুঝিতে পারিতেছেন না। ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব বলিলেন, "দাদা! যুদ্ধ আরম্ভ হয় হয়, এমন সময় আপনি আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়াছেন?"

যুধিষ্ঠির তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু কথা বলিলেন না। তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাদিগকে বলিলেন, "উনি যুদ্ধারম্ভের পূর্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিতে চলিয়াছেন, ইহাতে উঁহার জয়লাভ হইবে।"

এদিকে কৌরবপক্ষের লোকেরাও যুধিষ্ঠিরকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া, নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বলিল, 'কাপুরুষ! ভয় পাইয়াছে!' কেহ বলিল, 'তাই ভীষ্মের পায়ে ধরিতে চলিয়াছে!' কেহ বলিল, 'এমন ভাই থাকিতে এত ভয়, ছিঃ!'

যাহা হউক, যুধিষ্ঠির ততক্ষণে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "দাদামহাশয়! আপনার সহিত যুদ্ধ করিব, অনুমতি দিন আর আশীর্বাদ করুন।"

ভীষ্ম বলিলেন, "আশীর্বাদ করি ভাই, তোমার জয় হউক! তুমি না আসিলে হয়তো আমার রাগ থাকিত, কিন্তু তুমি আসাতে বড়ই সুখী হইলাম। বল, তোমার আর কি চাই। ভাই, মানুষ টাকার দাস। দুর্যোধনের টাকায় আমি আটকা পড়িয়াছি, কাজেই তোমার হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিব না। আর যাহা চাও তাহাই দিব।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আপনাকে কি করিয়া পরাজয় করিব, দয়া করিয়া তাহা বলিয়া দিন।"

ভীষ্ম বলিলেন, "আমাকে পরাজয় করার সাধ্য কাহারো নাই, আর এখন আমার মরিবার সময়ও উপস্থিত হয় নাই। তুমি আবার আমার নিকট আসিও।"

তখন যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া দ্রোণের নিকট গেলেন। দ্রোণের সহিতও তাঁহার ঐরূপ কথাবার্তা হইল। তাঁহাকে পরাজয় করিবার উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে দ্রোণ বলিলেন, "আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না; আমাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা কর। সত্যবাদী লোকের মুখে নিতান্ত অপ্রিয় সংবাদ শুনিলেই, আমি অস্ত্র ছাড়িয়া দিব। এমনি সময় আমাকে মারিবার সুযোগ।"

সেখান হইতে যুধিষ্ঠির কৃপের নিকট গেলেন। সেখানেও ঐরূপই কথাবার্তা হইল। কৃপ বলিলেন, "আমি অমর, কাজেই আমাকে মারা সম্ভব হইবে না। কিন্তু তথাপি নিশ্চয় তোমার জয় হইবে; আমি সর্বদা তোমাকে আশীর্বাদ করিব।"

কৃপের নিকট হইতে যুধিষ্ঠির শল্যের নিকট গেলেন এবং যুদ্ধের সময় কর্ণের তেজ কমাইয়া দিবার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। শল্য বলিলেন, "আমি তাহা নিশ্চয় করিব। নির্ভয়ে যুদ্ধ কর, তোমার জয় অবশ্য হইবে।"

ইহার মধ্যে কৃষ্ণ কর্ণকে বলিলেন, "কর্ণ, ভীষ্ম থাকিতে তো তুমি আর এ পক্ষে যুদ্ধ করিতেছ না, ততদিন আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ কর না কেন?"

এ কথার উত্তরে কর্ণ বলিলেন, "আমি কিছুতেই দুর্যোধনের অনিষ্ট করিতে পারিব না।"

ফিরিয়া আসিবার সময় যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে কৌরবদিগকে বলিলেন, "এখানে যদি আমার বন্ধু কেহ থাকেন, তবে তিনি আসুন; আমরা পরম আদরে তাঁহাকে আমাদের দলে লইব।"

এ কথায় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র যুযুৎসু আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার হইয়া যুদ্ধ করিব।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এস ভাই। তুমি আমাদের হইলে।"

তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যে কি ভয়ানক যুদ্ধ, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য আমার নাই। সে যুদ্ধে বৃষ্টির ধারার ন্যায় ক্রমাগত বাণ পড়িয়াছিল; ঝড়ের সময় যেমন গাছের ফল পড়ে, সেইরূপ করিয়া লোকের মাথা কাটিয়া পড়িয়াছিল, কাটা মানুষের পাহাড় হইতে রক্তের নদী বহিয়া চলিয়াছিল। তখনকার ভয়ানক শব্দের কথা আর কি বলিব! তেমন শব্দ আর কখনো হয় নাই।

সে সময়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন, ভীম প্রভৃতি বড়-বড় যোদ্ধাদের বীরত্ব ও ক্ষমতা দেখিয়া, দেবতারা পর্যন্ত আশ্চর্য হইয়া যান। অনেকবারই তাঁহাদিগকে একথা মানিতে হইয়াছে যে, 'এমন অদ্ভুত কাজ আমরাও করিতে পারি কি না সন্দেহ।' ইঁহাদের এক একজনে যখন রাগিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন শত যোদ্ধা মিলিয়াও তাঁহাকে আটকাইতে পারে নাই। হাজার হাজার লোক মারিয়া তবে তাঁহারা থামিয়াছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ বা অর্জুনের এক এক বাণে, অথবা ভীমের এক এক গদাঘাতে, এক একটা হাতি তৎক্ষণাৎ মারা যাইতে ক্রমাগতই দেখা গিয়াছে।

পাণ্ডবদের পুত্রেরাই[১] কি কম যুদ্ধ করিয়াছিলেন? অভিমন্যুর যুদ্ধ দেখিয়া ভীষ্ম প্রভৃতিরা বারবার বলিয়াছেন, "ঠিক যেন অর্জুন!" ভীষ্মের সহিত তাঁহার খুবই যুদ্ধ হয়। তখন ভীষ্ম অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কিছু করিতে পারেন নাই। অভিমন্যু তাঁহার সমুদয় বাণ কাটিয়া রথের ধ্বজা উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

---

[১] দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানিক আর শ্রুতসেন। সুভদ্রার এক পুত্র, তাঁহার নাম অভিমন্যু।

আহা! উত্তরের কথা মনে করিয়া বাস্তবিকই দুঃখ হয়। বেচারা সেদিন ভালো করিয়া যুদ্ধ করিতে না করিতেই শল্যের হাতে মারা গেলেন। তিনি এক প্রকাণ্ড হাতিতে চড়িয়া শল্যকে আক্রমণ করেন। হাতি শল্যের রথের ঘোড়াগুলিকে মারিয়া ফেলিল। কিন্তু শল্য তাহার পরেই উত্তরকে এমন ভয়ংকর একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহা তাঁহার বর্ম ভেদ করিয়া, একেবারে তাঁহার দেহের ভিতর ঢুকিয়া গেল। সেই শক্তির ঘায়েই উত্তর হাতি হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

উত্তরের দাদা শ্বেত ইহাতে অসহ্য শোক পাইয়া রাগের সহিত কৌরবদিগকে আক্রমণ করেন। খানিক যুদ্ধের পর একটা ভয়ানক বাণের ঘায় তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলে, তাঁহার সারথি তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করে। কিন্তু অল্পক্ষণের ভিতরেই তিনি আবার আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এবার তিনি শল্যকে এমন তেজের সহিত আক্রমণ করিলেন যে, ভীষ্ম প্রভৃতি বীরেরা আসিয়া সাহায্য না করিলে, শল্যের প্রাণরক্ষা করাই কঠিন হইত। ভীষ্মের দল আসাতে শল্যও বাঁচিয়া গেলেন, আর যুদ্ধও আবার অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। সেই যুদ্ধে ভীষ্ম কত লোককে যে মারিলেন, তাহার সংখ্যা নাই।

শ্বেতও সেই সময়ে অসাধাবণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। সৈন্যরা তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পাবিয়া, ভীষ্মের নিকট গিয়া আশ্রয় লয়। ভীষ্ম ছাড়া আর কেহই শ্বেতের সম্মুখে স্থির থাকিতে পারেন নাই। এমনকি, ভীষ্মও এক একবার শ্বেতের হাতে রীতিমত জব্দ হইতে লাগিলেন। একবার তো সকলে মনে করিল, বুঝি বা শ্বেতের হাতে তাঁহার মৃত্যুই হয়।

তখন ভীষ্ম যারপরনাই রাগের সহিত শ্বেতকে অনেকগুলি বাণ মারিলেন; শ্বেতও তাহার সব আটকাইয়া, ভল্ল দ্বাবা তাঁহার ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন। ভীষ্ম অমনি আর এক ধনুক লইয়া, শ্বেতের রথের ঘোড়া ধবজ আর সারথিকে মাবিয়া ফেলাতে কাজেই তাঁহাকে রথ হইতে লাফাইয়া পড়িতে হইল। তখন তিনি ধনুক রাখিয়া ভীষ্মকে একটা ভয়ংকর শক্তি ছুঁড়িয়া মারেন, কিন্তু তাহা ভীষ্মের বাণে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। শক্তি বৃথা হওয়ায়, শ্বেদ গদা লইয়া যেই ভীষ্মের উপরে তাহা ছুঁড়িতে যাইবেন, অমনি ভীষ্ম তাহা এড়াইবার জন্য রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। সে গদা রথের উপরে পড়িলে আর রথ, ঘোড়া, সারথি, কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

এদিকে দ্রোণ, কৃপ, শল্য প্রভৃতি যোদ্ধারা সাহায্যের জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; ভীষ্মের নতুন রথ আসিয়াছে। শ্বেতের পক্ষেও সাত্যকি, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং কিছুকাল সকলে মিলিয়া আবার যুদ্ধ চলিল। এমন সময় ভীষ্ম কি যে এক সাংঘাতিক বাণ ছুঁড়িয়া বসিলেন, শ্বেতের তাহা বারণ করিবার কোনো ক্ষমতাই হইল না, সে বাণ তাঁহার বর্ম ও শরীর ভেদ করিয়া মাটির ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

শ্বেতের মৃত্যুর পর সেদিন আর পাণ্ডবদের যুদ্ধে উৎসাহ রহিল না। এদিকে ভীষ্ম শ্বেতকে মারিয়া, এতই তেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, মনে হইল, বুঝি এখনি তিনি সকলকে মারিয়া শেষ করেন। তখন সন্ধ্যাও হইয়াছিল, কাজেই যুধিষ্ঠির সেদিনের মতন যুদ্ধ শেষ করিয়া দিয়া দুঃখের সহিত শিবিরে ফিরিলেন।

সে রাত্রিতে যুধিষ্ঠিরের মনে বড়ই চিন্তা হইতে লাগিল। তিনি সকলকে বলিলেন,

"এমনভাবে বন্ধুবান্ধবকে মরিতে দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। কাল হইতে তোমরা আরো ভালো করিয়া যুদ্ধ কর।"

যুধিষ্ঠিরের চিন্তা দেখিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার মন অনেকটা শান্ত হওয়ায়, পরদিনের যুদ্ধের পরামর্শ আরম্ভ হইল। তখন যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন, "এবারে 'ক্রৌঞ্চারুণ' ব্যূহ করিয়া সৈন্য সাজাইবে।"

পরদিন 'ক্রৌঞ্চারুণ' ব্যূহ করিয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্য সাজান হইল। কৌরবেরাও তাহাদের সৈন্য দিয়া অন্যরূপ এক ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। সেদিনকার যুদ্ধও নিতান্তই ভয়ানক হইয়াছিল।

সেইদিন অর্জুনের যুদ্ধে কৌরবেরা বড়ই অস্থির হইয়া উঠে। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন ভীষ্মকে বলিলেন, "দাদামহাশয়! আপনারা থাকিতে কি অর্জুন সব সৈন্য মারিয়া শেষ করিবে? একটু ভালো করিয়া যুদ্ধ করুন।"

তখন অর্জুন আর ভীষ্মে এমনি ঘোরতর যুদ্ধ আবম্ভ হইল যে, তেমন যুদ্ধ আর হয় নাই। সে যুদ্ধ দেখিয়া অন্য সকলের উৎসাহ বাড়িয়া যাওয়াতে, তাহারা পাগলের মতো হইয়া কাটাকাটি আরম্ভ করিল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রোণেও সেদিন কম যুদ্ধ হয় নাই। যুদ্ধ করিতে কবিতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ঘোড়া আর ধনুক কাটা গেল। তখন তিনি ভাবিলেন যে, গদা লইয়া দ্রোণকে আক্রমণ করিবেন। কিন্তু রথ হইতে নামিবার পূর্বেই দ্রোণ সেই মহাগদা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন. তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন ঢাল তলোযার লইযা দ্রোণকে মারিতে চলিলেন কিন্তু তাঁহাব বাণের মুখে অগ্রসর হয়, কাহার সাধ্য? ধৃষ্টদ্যুম্ন ঢাল দিয়া বাণ কাটাইতে ব্যস্ত রহিলেন, তাঁহাব আর যুদ্ধ করা হইল না।

এই সময় ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্য করিতে আসিয়া কি অদ্ভুত কাণ্ডই দেখাইলেন! কলিঙ্গ আর তাঁহার পুত্র শক্রদেব কিছুকাল তাঁহাব সহিত খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এমনকি, তাঁহাদের ভয়ে তাঁহার সঙ্গের চেদি দেশীয় সৈন্যগুলি তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন কবিতেও ত্রুটি করে নাই। শক্রদেব ভীমের ঘোড়া অবধি মারিয়া ফেলেন। কিন্তু তাহার পরেই ভীম এমন এক গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহাতে শক্রদেব আর তাঁহার সারথির শরীর চূর্ণ হইয়া গেল।

তারপর ভানুমানের সহিত ভীমের যুদ্ধ হয়। ভানুমান ছিলেন হাতির উপরে আর ভীম মাটির উপরে। ভীম খড়্গ হাতে একলাফে সেই হাতির উপরে উঠিয়া, ভানুমান এবং হাতি উভয়কেই কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর ভীম হাতি, ঘোড়া যাহা সম্মুখে পান, তাহাই খড়্গ দিয়া খণ্ড খণ্ড করেন। লাথির চোটে কত মানুষ পুঁতিয়া গেল। হাঁটুর গুঁতায় কত যোদ্ধা ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। এ সকল কাণ্ড দেখিয়া কে কোথায় পলাইবে তাহার ঠিকানাই রহিল না।

তারপর ভীম কলিঙ্গ আর কেতুমানকে মারিয়া, দুইহাজার সাতশত কলিঙ্গ সেনা বধ করিলেন।

আর এক স্থানে দুর্যোধন অনেক যোদ্ধা লইয়া অভিমন্যুকে ঘিরিয়াছেন। অভিমন্যুর তাহাতে কিছুমাত্র ভয় হয় নাই। কিন্তু অর্জুন যখন দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রকে দুরাত্মারা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে তখন আর তিনি তাঁহার কাছে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। এদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বড়-বড় বীরেরা অর্জুনকে আটকাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। তখন

অর্জুন এমনি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহাকে আটকান দূরে থাকুক, উহাদের নিজের প্রাণ বাঁচানোই ভার হইল। চারিদিকে খালি যোদ্ধাদের মাথা কাটিয়া পড়িতেছে, ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, ভীষ্ম তাড়াতাড়ি দ্রোণাচার্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, অর্জুন কি আরম্ভ করিয়াছে! আজ আর উহার সঙ্গে পারা যাইবে না। বেলাও শেষ হইয়াছে; শীঘ্র যুদ্ধ থামাইয়া দাও।"

কাজেই তখন যুদ্ধ শেষের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল; কৌরব সৈন্যেরাও বলিল, "আঃ বাঁচিলাম!"

পরদিন কৌরবেরা 'গরুড়' ও পাণ্ডবেরা 'অর্ধচন্দ্র' ব্যূহ করিয়া সৈন্য সাজাইলেন। সেদিন ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ভীম, ঘটোৎকচ ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব প্রভৃতি সকলেই খুব যুদ্ধ করেন। যুধিষ্ঠির আর ধৃষ্টদ্যুম্ন এমনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, ভীষ্ম আর দ্রোণ দুজনে মিলিয়াও তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে পারেন নাই। কৌরব-সৈন্যেরা ভীষ্ম দ্রোণের কথা না শুনিয়া তাঁহাদের সম্মুখে পলাইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া দুর্যোধন ভীষ্মকে বলিলেন, "সৈন্য সব মারা যাইতেছে, আর আপনারা চুপ করিয়া আছেন! ইহাতে বোধহয়, পাণ্ডবদের উপকার করাই আপনাদেব উদ্দেশ্য। এমন জানিলে আমি কখনোই যুদ্ধ করিতে আসিতাম না।"

এ কথায় ভীষ্ম বলিলেন, "পাণ্ডবেরা যে কত বড় বীর, তাহা তোমাকে বারবার বলিয়াছি। আমি বুড়া মানুষ, তথাপি আমার যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতেছি, দেখ।"

এই বলিয়া ভীষ্ম ক্রোধভরে এমনি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে কাহার সাধ্য তাঁহার সামনে দাঁড়ায়! চারিদিকে কেবল 'হায় হায়!' 'রক্ষা কর!' 'বাবা গো!' এইরূপ শব্দ। পাণ্ডব পক্ষের এক এক যোদ্ধার নাম করিয়া তিনি বলেন, "এই তোমাকে কাটলাম!" আর অমনি তাহার মাথা কাটিয়া পড়ে! সেই বুড়ো মানুষ তখন এমনি বেগের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন যে, তাঁহার বাণই কেবল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "অর্জুন! এই সেই সময়। তুমি বলিয়াছিলে ভীষ্ম, দ্রোণ সকলকে মারিবে; এখন তোমার কথা রাখ।"

অর্জুন বলিলেন, "শীঘ্র ভীষ্মের নিকট রথ লইয়া চলুন।"

কিন্তু অর্জুন অনেক যুদ্ধ করিয়াও ভীষ্মকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। বুড়া বাণে বাণে কৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যুদ্ধ করিবেন না; কিন্তু ভীষ্মের কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, চুপ করিয়া থাকিলে বা তিনি এখনই পাণ্ডবদিগের সকলকে মারিয়া শেষ করেন। কাজেই তিনি রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, "আজই আমি কৌরবদিগের সকলকে মারিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিব।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার সেই সুদর্শন চক্র নামক আশ্চর্য অস্ত্র হাতে ভীষ্মকে মারিবার জন্য ছুটিয়া চলিলেন। ভীষ্মের তাহাতে কিছুমাত্র ভয় বা দুঃখের চিহ্ন দেখা গেল না। তিনি কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, তোমার হাতে মরিলে তো আমি অমনি স্বর্গে যাইব। এখনই আমাকে কাট।"

এমন সময় অর্জুন নিতান্ত লজ্জিত ও কাতরভাবে আসিয়া কৃষ্ণের পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "আপনি শান্ত হউন, আমি আর যুদ্ধে অবহেলা করিব না।"

এ কথায় কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া, আবার আসিয়া ঘোড়ার রাশ হাতে লইলেন। ইহার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত অর্জুন যে কি ভীষণ যুদ্ধ করিলেন, তাহা আর কি বলিব। তাঁহার গাণ্ডীব হইতে অদ্ভুত ইন্দ্র-অস্ত্র এবং আগুনের মতন উজ্জ্বল আরো অসংখ্য বাণ উল্কা ধারার ন্যায় অবিরাম ছুটিয়া গিয়া কৌরবদিগকে ধানের মতো কাটিতে লাগিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক প্রভৃতি সকলে হারিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া কৌরব-সৈন্যেরা সেই যে রণস্থল হইতে চ্যাঁচাইয়া ছুট দিল, আর শিবিরের ভিতরে না গিয়া থামিল না।

পরদিন আবার মহারণ আরম্ভ হইল। প্রথমে ভীষ্ম, অর্জুন আর অভিমন্যু প্রভৃতি ঘোর যুদ্ধ করেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন কিছুকাল সাংযমনির পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া, গদাঘাতে তাঁহার মাথা গুঁড়া করিয়া দেন।

কিন্তু সেদিনকার যুদ্ধে বাস্তবিক ভয়ানক কাণ্ড যদি কেহ করিয়া থাকেন, তবে সে ভীম! ভীম গদা হাতে হাতি, ঘোড়া, রথী, পদাতি সকলকে পিষিতে আরম্ভ করিলে দুর্যোধন তাঁহাকে মারিবার জন্য অনেকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দেন। সে সকল সৈন্য মারা গেলে, কিছুকাল ভীষ্ম আর অলম্বুষের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ চলে। তারপর দুর্যোধনের সহিত ভীমের দেখা হয়। দুর্যোধন একবার বাণাঘাতে ভীমকে অজ্ঞান করিয়া দেন। ভীম অবিলম্বে আবার উঠিয়া দুর্যোধনকে মারেন আট বাণ, আর শল্যকে পঁচিশ। শল্য বেগতিক দেখিয়া তখনই পলায়ন করিলেন।

তখন সেনানী, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, আলোপুর, দুর্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট এবং সম নামক দুর্যোধনের চৌদ্দ ভাই একসঙ্গে আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করেন। ভীমের তাহাতে সন্তোষ ভিন্ন অসন্তোষের কোনো কারণ ছিল না। তিনি তাঁহাদিগকে হাতের কাছে পাইয়া, মনের সুখে এক একটি করিয়া সংহার করিতে লাগিলেন। প্রথমে সেনানী, তারপর জলসন্ধ, তারপর সুষেণ, তারপর উগ্র, বীরবাহু, ভীমরথ, সুলোচন—দেখিতে দেখিতে সাতটির প্রাণ গেল। ইহার পর আর বাকি সাতটির উধর্বশ্বাসে পলায়ন ভিন্ন উপায় রহিল না।

এ সকল কাণ্ড দেখিয়া ভীষ্ম কৌরবদিগকে কহিলেন, "ঐ দেখ, ভীম বোকাগুলিকে পাইয়া একেবারে শেষ করিল! তোমরা শীঘ্র যাও।"

সে কথায় ভগদত্ত ভীমকে আক্রমণ করিয়া, খানিক যুদ্ধের পর, একেবারে তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলেন। ভীম অজ্ঞান হওয়ামাত্রই বিশাল বিশাল হাতির উপরে অগণ্য রাক্ষস লইয়া ঘোর বেগে ঘটোৎকচ আসিয়া উপস্থিত। তখন ভগদত্তকে বাঁচানোই কঠিন হইল। ততক্ষণ সন্ধ্যাও হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং ভীষ্ম তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করিয়া সেদিনকার মতন কৌরবদিগকে ঘটোৎকচের হাত হইতে রক্ষা করিলেন।

পরদিন প্রভাতে কৌরবেরা 'মকর' ব্যূহ ও পাণ্ডবেরা 'শ্যেন' ব্যূহ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে ভীমার্জুন আর ভীষ্মের যুদ্ধ হইল, তারপর দ্রোণ আর সাত্যকির। সাত্যকি দ্রোণের হাতে একটু জব্দ হইয়া আসিলে ভীম দ্রোণকে অনেক বাণ মারিয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া দেন। ইহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ আর শল্য রোষভরে ভীমকে আক্রমণ করায় অভিমন্যু দ্রৌপদীর পুত্রগণসহ ভীমের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এমন সময় শিখণ্ডী ধনুর্বাণ হাতে ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ভীষ্ম তো আর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। শিখণ্ডী যতই বাণ মারেন, ভীষ্মের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। ততক্ষণে দ্রোণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, শিখণ্ডীকে পলায়ন করিতে হইল।

তারপর সকলে যুদ্ধে মাতিয়া রণস্থলে ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত করিলেন। বেলা যায়, তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই। সেদিন সাত্যকি দুর্যোধনের অনেক সৈন্য মারেন। দুর্যোধন দশ হাজার সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাকে থামাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই দশ হাজার সৈন্যও তাঁহার হাতে মারা গেল।

এই সময়ে ভূরিশ্রবা আসিয়া সাত্যকিকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করাতে তাঁহার সঙ্গের লোকেরা তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। সাত্যকির দশ পুত্র তাঁহার সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু ভূরিশ্রবার বজ্রসম বাণের আঘাতে, দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের দেহ চূর্ণ হইয়া গেল। তারপর বেলা আর অতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই অর্জুন পঁচিশ হাজার মহারথী মারিয়া শেষ করিলেন। এইরূপে সেদিনকার যুদ্ধ শেষ হইল।

পরদিন পাণ্ডবদের 'মকর' ব্যূহ এবং কৌরবদের 'ক্রৌঞ্চ' ব্যূহ করিয়া সৈন্য সাজানো হইল। সেদিনকার যুদ্ধে ভীম এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের যে বীরত্ব দেখা গিয়াছিল, তাহার তুলনা দুর্লভ। ভীমকে দেখিতে পাইয়াই দুঃশাসন তাঁহার আর বারোটি ভাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "এস ভাইসকল। আজ ইহাকে মারিব।"

তখন হাজার হাজার রথী লইয়া তেরো বীর ভীমকে আক্রমণ করিলেন। ভীমের তাহা গ্রাহ্যই হইল না; তিনি ভাবিলেন, 'আগে রথীগুলিকে শেষ করিয়া লই!' তারপর তিনি গদা হাতে রথ হইতে নামিয়া, একদিক হইতে কৌরব সৈন্য মারিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ করিতে করিতে সেখানে আসিয়া ভীমের শূন্য রথখানি দেখিয়া ব্যস্তভাবে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হায়! হায়! শূন্য রথ কেন? ভীম কোথায়?"

সারথি বলিল, "তিনি কৌরব মারিবার জন্য গদা হাতে নামিয়া গিয়াছেন।"

ভীম যে পথে গিয়াছেন, গদার ঘায় ক্রমাগত হাতি মারিয়া গিয়াছেন। সেই হাতিগুলি দেখিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইল না। ভীম তখন ছোট সৈন্য শেষ করিয়া রাজা মারিতে ব্যস্ত। অতঃপর তাঁহারা দুজনে মিলিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে দুর্যোধনের কতকগুলি ভাই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন সম্মোহন অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে অজ্ঞান করিয়া ফেলাতে বেচারারা যুদ্ধ করিতে পাইল না!

ইহার পর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া পাণ্ডবদিগকে বড়ই অস্থির করিয়া তোলেন। পাণ্ডবগণ কিছুতেই তখন তাঁহাকে বারণ করিতে পারেন নাই। তারপর ভীষ্ম আর অর্জুন কিছুকাল ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এইরূপে সমস্ত দিনই নানা স্থানে তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কোনো ঘটনা সেদিন ঘটে নাই।

সেদিনকার যুদ্ধ শেষ হইলে, যুধিষ্ঠির ভীম আর ধৃষ্টদ্যুম্নকে আদর করিয়া মনের সুখে শিবিরে গেলেন।

পরদিন কৌরবদিগের হইল 'মণ্ডপ' ব্যূহ আর পাণ্ডবদের 'বজ্র' ব্যূহ। সেদিন প্রথম বেলায় বিরাটের পুত্র শঙ্খ দ্রোণের হাতে মারা যান।

সাত্যকি আর অলম্বুষে সেদিন খুব যুদ্ধ হইয়াছিল। অলম্বুষ রাক্ষস, ঘোর মায়াবী। তাই

সে আগে মায়া দ্বারা সাত্যকিকে ভুলাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু সাত্যকি অর্জুনের ছাত্র, তাঁহার নিকট ইন্দ্র-অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন; সেই ইন্দ্র-অস্ত্র দিয়া তিনি রাক্ষসের সকল মায়া উড়াইয়া দিলেন। তখন সে পলাইতে পারিলে বাঁচে।

অর্জুনের পুত্র ইরাবান, বিন্দ ও অনুবিন্দের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করেন। ঘটোৎকচ ভগদত্তকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগদত্ত অসাধারণ যোদ্ধা; তাঁহার যুদ্ধ কেহ সহিতে পারে না। ঘটোৎকচ কিছুকাল তাঁহাব সহিত খুব তেজের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

শল্য সেদিন নকুল ও সহদেবকে আক্রমণ করিতে গিয়া, শেষে একটু জব্দ হন। মেঘ যেমন সূর্যকে ঢাকে, সহদেব তেমনি করিয়া বাণের দ্বারা শল্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলেন। শল্য সহদেবের মামা; কাজেই তাঁহার বাণে আচ্ছন্ন হইয়াও তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। খানিক বেশ জোরের সহিতই যুদ্ধ চলিয়াছিল। তাবপর সহদেবের এক বাণ খাইয়া শল্য আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সারথি দেখিল, মদ্ররাজ অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং সে রথ লইয়া প্রস্থান করিল।

বেলা দুই প্রহরের সময় শ্রুতায়ু যুধিষ্ঠিরের বাণ খাইয়া পলায়ন করেন। ভীষ্ম, দ্রোণ আর অর্জুনও সেদিন বহু সৈন্য বধ করেন। তারপর ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সেদিনকার যুদ্ধও থামিল।

পরদিন প্রভাতে কৌরবেবা সাগরের মতো ভয়ানক এক ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। তাহা দেখিয়া যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন, "তুমি 'শৃঙ্গাটক' ব্যূহ রচনা কর।"

সেদিন সকালবেলায় ভীষ্ম অসীম তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে এক ভীম ছাড়া আর এমন কেহই উপস্থিত ছিল না যে তাঁহাকে আটকায়। ভীম ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন; আর দুর্যোধন ভ্রাতাগণসহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভীমের প্রথম কাজই হইল, ভীষ্মের সারথিটিকে সংহার করা। সারথি নাই, ঘোড়া কে থামাইবে? তাহারা রথ লইয়া রণস্থলময় ছুটাছুটি করিতেছে। সেই ফাঁকে ভীমও দুর্যোধনেব ভাই সুনাভের মাথাটি কাটিয়া বসিয়া আছেন। সুনাভের মৃত্যুতে আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিত ও বিশালাক্ষ নামক দুর্যোধনের আর সাত ভাই ক্ষেপিয়া ভীমকে মারিতে লাগিল। ভীমও তাহাদিগকে সম্মুখে পাইয়া আর সংহার করিতে বিলম্ব করিলেন না।

তাহা দেখিয়া দুর্যোধন কাঁদিতে কাঁদিতে ভীষ্মকে বলিলেন, "দাদামহাশয়, ভীম তো ভাইগুলিকে মারিয়া ফেলিল। আপনার যুদ্ধে উৎসাহ নাই!"

ভীষ্ম বলিলেন, "আগে তো শুন নাই! ভীম কি তোমাদিগকে পাইলে ছাড়িবে? আমি আর দ্রোণ যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতেছি, করিবও।"

অর্জুনের পুত্র ইরাবান সেদিন অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। শকুনি আর তাঁহার ছয় ভাই মিলিয়া ইরাবানকে আক্রমণ করেন। সাতজনে মিলিয়া চারিদিক হইতে মারে, কাজেই ইরাবান প্রথমে তাহাদিগের কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার শরীর অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। তখন ইরাবান অসিচর্ম (খড়্গ ও ঢাল) হাতে রথ হইতে নামিলেন। শত্রুরা এই সুযোগে তাঁহাকে মারিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তাহারা আর কোনো অনিষ্ট করিবার পূর্বে শকুনি ছাড়া তাহাদের আর সকলে ইরাবানের খড়্গে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

ভাইদিগের মৃত্যুতে শকুনি পলায়ন করিলে, দুর্যোধন ইরাবানকে মারিবার নিমিত্ত আর্যশৃঙ্গ নামক এক ভয়ংকর রাক্ষসকে পাঠাইয়া দিলেন। দুরাত্মা যুদ্ধ করিতে আসিয়াই মায়াবলে দুই হাজার অশ্বারোহী রাক্ষস আনিয়া ফেলিল। রাক্ষসের দল মারামারি করিতেছে, সেই অবসরে মায়াবী আর্যশৃঙ্গ আকাশে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইরাবানও মায়া জানিতেন, কাজেই আকাশে উঠিয়াও রাক্ষস তাঁহার কিছু করিতে পারিল না, তিনি খড়্গ দিয়া দুষ্টকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

ইরাবান নাগের দেশের লোক। নাগেরা যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া দলে দলে তাঁহার সাহায্য করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাক্ষসও তখন গরুড় হইয়া সেই সকল সাপ গিলিতে আরম্ভ করিল।

হায়! ইহাতে কি সবনাশ হইল! এই ব্যাপার দেখিয়া ইরাবান এমন আশ্চর্য হইয়া গেলেন যে, যুদ্ধের কথা আর তাঁহার একেবারে মনে নাই। সেই সুযোগে দুষ্ট রাক্ষস তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। অর্জুন অন্যদিকে ভয়ানক যুদ্ধে ব্যস্ত, ইরাবানের মৃত্যুর কথা তিনি তখন জানিতে পারিলেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীম, দ্রুপদ প্রভৃতিও তখন প্রত্যেকে হাজার হাজার করিয়া সৈন্য মারিতেছেন। সে সময়ের অবস্থা কি ভীষণ! যোদ্ধাদিগের কি বিষম রাগ, যেন সকলকে ভূতে পাইয়াছে। ঘটোৎকচ, ভীম, দ্রোণ, ভগদত্ত ইঁহারা সকলেই অতি অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইলেন। সেদিন বিকালবেলার অর্ধেক যুদ্ধ ঘটোৎকচ একেলাই করিয়াছিল। তখন তাহার ভয় বা ক্লান্তি কিছুই দেখা যায় নাই।

ভীমকে মারিবার জন্য দুর্যোধনের ভ্রাতারা দ্রোণকে সহায় করিয়া খুবই তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু ভীম যখন দ্রোণের সাক্ষাতেই তাঁহাদের এক একটি করিয়া ক্রমাগত বূঢ়োরস্ক, কুণ্ডলী, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বৈরাট, বিশালাক্ষ্য, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনকধ্বজ এই নয়টিকে বধ করিলেন, তখন অবশিষ্টেরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ যমের মতো ভাবিয়া আর পলাইবার পথ পান না।

ইঁহারা পলাইয়া গেলে, ভীম অন্যান্য যোদ্ধাগণকে মারিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত, কৃপ ইঁহাদের সাধ্য হইল না যে তাঁহাকে বারণ করেন।

রাত্রি হইল, তথাপি যুদ্ধের শেষ নাই। ঘোর অন্ধকার হইলে তবে সেদিন সকলে শিবিরে গেলেন।

রাত্রিতে দুর্যোধন কর্ণ আর শকুনিকে বলিলেন, "পাণ্ডবদিগকে কেহই মারিতে পারিতেছে না, ইহার কারণ কি? আমার মনে বড়ই ভয় হইয়াছে।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "ভীষ্ম কেবল বড়াই করেন, আসলে তাঁহার ক্ষমতা নাই। উঁহাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে বলুন, দেখিবেন, আমি দুদিনের মধ্যে পাণ্ডবদিগকে মারিয়া শেষ করিব।"

দুর্যোধন তখনই ভীষ্মের শিবিরে গিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক বলিলেন, "দাদামহাশয়! পাণ্ডবদিগকে মারিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন? আপনার যদি তাহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা না থাকে, তবে না হয় একবার কর্ণকে বলিয়া দেখুন না। তিনি তাহাদিগকে বধ করিবেন।"

এমন অপমানের কথায় ভীষ্মের মনে নিতান্তই ক্লেশ হইবে, তাহা আশ্চর্য কি? তিনি খানিক চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন; তারপর বলিলেন, "আমি প্রাণপণে তোমার উপকার

করিতেছি, তথাপি তুমি কেন আমাকে এমন কঠিন কথা বলিতেছ? যে পাণ্ডবেরা খাণ্ডবদাহ করিল, নিবাত কবচগণকে মারিল, তোমাকে গন্ধর্বের হাত হইতে বাঁচাইল, বিরাটনগরে তোমাদিগকে হারাইয়া গরু ছাড়াইয়া নিল, আর তোমাদের পোশাক লইয়া উত্তরাকে পুতুল খেলিতে দিল, তাহারা যে অসাধারণ বীর ইহা কি বুঝিতে পার না? যাহা হউক, কাল আমি এমন যুদ্ধ করিব যে লোকে চিরদিন সেই যুদ্ধের কথা বলিবে।"

পরদিন যুদ্ধ বড়ই ভয়ানক হইল। সকালবেলায় দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আর অভিমন্যুকে মারিতে আসিয়া রাক্ষস অলম্বুষ খুব জব্দ হয়। তারপর দ্রোণ, অর্জুন, সাত্যকি, অশ্বত্থামা প্রভৃতি অনেকক্ষণ যুদ্ধ করেন। মধ্যাহ্নকাল হইতে যুদ্ধক্রমেই ঘোরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। অর্জুন তখন এমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে কৌরব সৈন্যেরা পলাইবারও অবসর পায় নাই।

কিন্তু শেষবেলায় একেলা ভীষ্ম পাণ্ডবদিগকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিলেন। কাহার এমন ক্ষমতা হইল না যে তাঁহাকে আটকায়। ভীষ্মের ধনুষ্টঙ্কার অন্যসকল শব্দকে ডুবাইয়া দিল। তাঁহার বাণ যাহার গায়ে লাগিল, তাহাকে ভেদ না করিয়া ছাড়ল না। পাণ্ডব সৈন্যেরা অস্ত্র ফেলিয়া এলোচুলে চ্যাঁচাইয়া পলাইতে লাগিল; কাহার সাধ্য তাহাদিগকে ফিরায়। কৃষ্ণ ক্রমাগত অর্জুনকে বলিতেছেন, "অর্জুন, কি দেখিতেছ? ভীষ্মকে মার!"

অর্জুন বলিলেন, "রাজ্যের জন্য যদি এমন কাজই করিতে হয়, তবে আর বনে গিয়া ক্লেশ পাইলাম কেন? আচ্ছা চলুন আপনার কথাই রাখিতেছি।"

কিন্তু অর্জুন কিছুতেই ভীষ্মকে বারণ করিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ চাবুক হাতে নিজেই ভীষ্মকে মারিতে চলিলেন। ইহাতে অর্জুন লজ্জিত হইয়া আরো উৎসাহের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ভীষ্মের তেজ কমা দূরে থাকুক, বোধ হইল যেন আরো বাড়িয়া গিয়াছে। আগুন লাগিলে উলুবনের যেমন দশা হয়, ভীষ্মের হাতে পড়িয়া পাণ্ডব সৈন্যদেরও প্রায় তেমনি হইল।

যতক্ষণ আলো ছিল, ততক্ষণ ভীষ্ম এইরূপ করিয়া যুদ্ধ করেন। তারপর অন্ধকার আসিয়া সৈন্যদিগকে বাঁচাইয়া দিল।

সেরাত্রে পাণ্ডবেরা ভীষ্মের নিকট গিয়া, তাঁহাকে প্রণামপূর্বক কাতরভাবে বলিলেন, "দাদামহাশয়! আমরা তো কিছুতেই আপনার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। আমাদের রাজ্য পাওয়ার কি উপায় হইবে? আর এত লোক যে মরিতেছে, তাহাই বা কিরূপে বারণ হইবে? আপনাকে বধ করিবার উপায় বলিয়া দিন।"

ভীষ্ম বলিলেন, "আমার হাতে অস্ত্র থাকিলে দেবতারাও আমাকে পরাজয় করিতে পারে না। আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলে আমাকে মারা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং এক উপায় বলিয়া দিই। শিখণ্ডীকে দেখিলে আমি অস্ত্র ত্যাগ করি, অর্জুন এই শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া আমার গায় বাণ মারুক। এই আমার বধের উপায়; আমি অনুমতি দিতেছি, তোমরা মনের সুখে আমায় প্রহার কর। আমার এই কথামত কাজ করিলে, নিশ্চয় তোমাদের জয়লাভ হইবে।"

এইরূপ কথাবার্তার পর পাণ্ডবেরা সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। শিবিরে আসিয়া অর্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন, "ছেলেবেলায় খেলা করিতে করিতে, ধূলাসুদ্ধ দাদামহাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার গায়ে ধূলা মাখাইয়া দিতাম। কোলে উঠিয়া ডাকিতাম, 'বাবা।' তিনি

বলিতেন, 'আমি তোমার বাবা নই, তোমার বাবার বাবা!' সেই দাদামহাশয়কে কি করিয়া মারিব? আমি তাহা পারিব না। মরি সেও ভালো।"

যাহা হউক, কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের মনের এই দুঃখ শীঘ্রই দূর হইয়া গেল। ভীষ্মকে না মারিলে জয় নাই; সুতরাং যে উপায়েই হউক তাঁহাকে মারিতে হইবে।

রাত্রি প্রভাত হইলে পাণ্ডবেরা রণবাদ্য বাজাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আজ শিখণ্ডী সকলের আগে, অপর যোদ্ধারা তাঁহার পশ্চাতে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র, ভীষ্ম পূর্বদিনের ন্যায় একধার হইতে পাণ্ডব সৈন্য শেষ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী তাঁহাকে বারণ করিবার জন্য ক্রমাগত বাণ মারিতেছেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। শিখণ্ডীর বাণ খাইয়া তিনি হাসেন আর বলেন, "তোমার যাহা খুশি কর, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।"

শিখণ্ডী তাহার উত্তরে বলিলেন, "তুমি যুদ্ধ কর আর না কর আমার হাতে আজ তোমার রক্ষা নাই।"

এইরূপে শিখণ্ডী ভীষ্মকে বাণ মারিতেছেন, আর ভীষ্ম তাঁহার দিকে না তাকাইয়া ক্রমাগত পাণ্ডবদিগের সৈন্য মারিতেছেন; পাণ্ডবেরা তাঁহাকে কোনোমতেই বারণ করিতে পারিতেছেন না। তাহা দেখিয়া অর্জুন মহারোষে কৌরব সৈন্য মারিতে আরম্ভ করিলেন।

দুর্যোধনের নিজের এমন ক্ষমতা নাই যে তিনি অর্জুনকে আটকান, কাজেই তিনি ভীষ্মকে বলিলেন, "দাদামহাশয়! অর্জুন তো সব মারিয়া শেষ করিল, আপনি ভালো করিয়া যুদ্ধ করুন!"

তাহা শুনিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, রোজ দশ হাজার সৈন্য মারিব। তাহার মতে আমি রোজ দশহাজার সৈন্য মারিয়াছি। আজ যুদ্ধে প্রাণ দিয়া, তুমি যে এতদিন আমাকে অন্ন দিয়াছ, সেই ঋণশোধ করিব।"

এই বলিয়া তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এদিকে শিখণ্ডীর বাণের বিরাম নাই। অর্জুন ক্রমাগত তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলিতেছেন, "ভয় নাই! দাদামহাশয়কে আক্রমণ কর! আমি বাণ মারিয়া তাঁহাকে বধ করিব।"

অর্জুনকে বারণ করিবার জন্য দুঃশাসন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু খানিক যুদ্ধের পরেই অর্জুনের বাণ সহিতে না পারিয়া, ভীষ্মের রথে গিয়া তাঁহাকে আশ্রয় নিতে হইয়াছে।

এদিকে ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, কৃতবর্মা, বিন্দ, অনুবিন্দ, জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ, দুর্মর্ষণ, ইঁহারা সকলে মিলিয়া ভীমকে আক্রমণ করিয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের হাজার হাজার বাণ সহ্য করিয়া ভীম তাঁহাদের সকলকে বাণে বাণে অস্থির করিয়া দিয়াছেন।

এমন সময় অর্জুন আসিয়া ভীমের সহিত মিলিলেন। তখন কৌরবদেরও ভীষ্ম, দুর্যোধন, বৃহদ্বল প্রভৃতি সকলে সেখানে আসিলে, যুদ্ধ বড়ই ভীষণ হইয়া উঠিল। এই গোলমালের ভিতরে শিখণ্ডী তাঁহার নিজের কাজ ভুলেন নাই। সুযোগ পাইলেই তিনি ভীষ্মের গায়ে বাণ মারিতেছেন।

যুধিষ্ঠির এই সময়ে খুব কাছে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "যুধিষ্ঠির! অনেক প্রাণী বধ করিয়াছি, আমার আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। আমাকে যদি সুখী করিতে চাহ, তবে শীঘ্র অর্জুনকে লইয়া আমাকে বধ কর।"

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র আইস। আজ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে।"

ইহার পর হইতে শিখণ্ডীকে সম্মুখে করিয়া, পাণ্ডবগণ ভীষ্মের বধের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৌরবেরাও সকলে মিলিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিবার কোনোরূপ আয়োজনই করিতে বাকি রাখিলেন না। তখন যে কিরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার আর নাই।

আর ভীষ্মের কথা কি বলিব? 'আজ মরিতে হইবে', এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। যেমন করিয়া মরিলে ক্ষত্রিয় স্বর্গে যায়, সেইরূপ করিয়া মরিতে হইবে। রণস্থলে ধর্মযুদ্ধে শত্রু সংহার করিতে করিতে প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা, ক্ষত্রিয়ের আর গৌরবের কথা হইতে পারে না। ভীষ্মের ন্যায় মহাবীর আর মহাপুরুষ আজ সেই গৌরবের সুযোগ পাইয়া, আর তাহা ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। তাই তিনি আজ মরিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। ঐ দেখ, পাণ্ডবদের দলের সোমক নামক সৈন্যগণ দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাণে শেষ হইয়া গেল। ঐ শুন, মেঘ গর্জনের ন্যায় তাঁহার ধনুকের শব্দ অবিরাম শুনা যাইতেছে। কৃষ্ণ, অর্জুন আর শিখণ্ডী ব্যতীত কেহই সে ধনুকের সম্মুখে টিকিতে পারিতেছে না।

শিখণ্ডী ভীষ্মের বুকে দশ বাণ মারিলেন। ভীষ্ম তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। অর্জুন ক্রমাগত তাঁহাকে বলিতেছেন, "মার! মার!" শিখণ্ডী উৎসাহ পাইয়া বাণে বাণে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই মহাপুরুষ, সে সকল বাণের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, একদিকে অর্জুনকে নিবারণ, আর একদিকে পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিতে ব্যস্ত।

এই সময়ে দুঃশাসন একা পাণ্ডবদিগের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতেছিলেন। তখন তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া কেহই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। অর্জুন ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে এড়াইয়া যাইতে পারিলেন না।

শিখণ্ডী ভীষ্মকে বাণ মারিতে এক মুহূর্তও অবহেলা করিতেছেন না। ভীষ্ম হাসিতে হাসিতে তাঁহার সকল বাণ অগ্রাহ্য করিয়া, ক্রমাগত পাণ্ডব সৈন্য বধ করিতেছেন। দুর্যোধন প্রভৃতি সকলে প্রাণপণে ভীষ্মের সাহায্যের জন্য ব্যস্ত; কিন্তু অর্জুনের তেজে তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইতেছে। অর্জুনের গাণ্ডীব হইতে ভীষণ বাণ বৃষ্টির আর বিরাম নাই, কৌরব সৈন্যদের আর বুঝি কিছু অবশিষ্ট থাকিল না। কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ, বিংশতি সকলেই পলাইয়া গেলেন। মৃতদেহে রণস্থল ছাইয়া গেল।

কিন্তু ভীষ্ম একাই যে অদ্ভুত কাজ করিতেছিলেন, অন্যেরা পলাইয়া যাওয়াতে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না।

অর্জুনের কাছে পাণ্ডবপক্ষের যে সকল রাজা ছিলেন, ভীষ্ম তাঁহাদের সকলকেই মারিয়া শেষ করেন। দশ হাজার গজারোহী, সাতজন মহারথ, চৌদ্দ হাজার পদাতি, এক হাজার হাতি, দশ হাজার ঘোড়া, তাহা ছাড়া বিরাটের ভাই শতানীক প্রভৃতি হাজার হাজার যোদ্ধা সেদিন তাঁহার হাতে মারা যান।

এমন সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "অর্জুন, তুমি শীঘ্র ভীষ্মকে বারণ কর। উঁহাকে মারিতে পারলেই জয় হইবে।"

অমনি অর্জুন বাণে বাণে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভীষ্মও সে সকল বাণ খণ্ড খণ্ড

করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। তারপর ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, সাত্যকি, ঘটোৎকচ প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষের সকলে তাঁহার বাণে অস্থির হইয়া উঠিলে, অর্জুন তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন।

শিখণ্ডীর বিশ্রাম নাই, আবার অর্জুন তাঁহার সাহায্য করিতেছেন। সাত্যকি চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ প্রভৃতি সকলে মিলিয়াও তাঁহাকে বাণ মারিতে ত্রুটি করিতেছেন না। তথাপি ভীষ্ম কিছুমাত্র কাতর নহেন। তাঁহার যুদ্ধ তেমনি চলিয়াছে।

এমন সময় অর্জুন ভীষ্মের ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া দ্রোণ, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত মিলিয়া অর্জুনকে আক্রমণ করিতে যাওয়ায়, সাত্যকি, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, ঘটোৎকচ আর অভিমন্যু অর্জুনের সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিলেন।

এদিকে শিখণ্ডী বাণে বাণে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। ভীষ্ম ধনুক হাতে লইলেই অর্জুন তাহা কাটিয়া ফেলিতেছেন। তাহাতে ভীষ্ম এক শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে, তাহাও তিনি কাটিতে বাকি রাখেন নাই।

তখন ভীষ্ম মনে মনে বলিলেন, 'কৃষ্ণ না থাকিলে এখনো আমি এক বাণেই পাণ্ডবদিগকে মারিতে পারি। কিন্তু আমি পাণ্ডবদিগকে মারিব না, শিখণ্ডীর সহিতও যুদ্ধ করিব না। এই আমার মরিবার সুযোগ।'

ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, অপর বসুগণ আকাশ হইতে বলিলেন, "তাহাই ঠিক, ভীষ্ম! আর যুদ্ধে কাজ নাই।"

এ কথায় স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেবতারা ভীষ্মের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর এই সময় হইতে ভীষ্ম অর্জুনের সহিত যুদ্ধের চেষ্টা ছাড়িয়া দিলেন। এতক্ষণ শিখণ্ডী তাঁহাকে যেসকল বাণ মারিতেছিলেন তাহা তাঁহার গ্রাহ্যই হয় নাই। অতঃপর অর্জুন গাণ্ডীব লইয়া তাঁহার গায়ে ভয়ংকর বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম তখনো অন্যান্য যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু অর্জুনের বাণে জর্জরিত হইয়াও তিনি তাঁহাকে আর আঘাত করিলেন না। অর্জুন অবসর পাইয়া ক্রমাগত তাঁহার ধনুক কাটিয়া তাঁহার উপর বাণ মারিতে লাগিলেন।

এই সময় দুঃশাসন ভীষ্মের কাছে ছিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন, "দুঃশাসন! এ সকল তো শিখণ্ডীর বাণ নয়, এগুলি নিশ্চয় অর্জুনের। দেখ আমার বর্ম ভেদ করিয়া বাণগুলি শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে।"

এই বলিয়া তিনি অর্জুনের প্রতি একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে, অর্জুন তিন বাণে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তারপর ভীষ্ম ঢাল আর খড়্গ হাতে লইয়া মনে করিলেন, 'হয় মরিব, না হয় সকলকে মারিব।' কিন্তু তিনি খড়্গ চর্ম হাতে রথ হইতে নামিবার পূর্বেই তাহাও অর্জুন কাটিয়া শত খণ্ড করিলেন।

এদিকে কৌরবেরা ভীষ্মকে রক্ষার জন্য কত চেষ্টাই করিতেছেন, কিন্তু পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগকে কিছুই করিবার অবসর দিতেছেন না। অর্জুনের বাণে ভীষ্মের শরীর এরূপ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে যে, আর দু আঙ্গুল স্থানও অবশিষ্ট নাই। এইরূপে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে, ভীষ্ম রথ হইতে পড়িয়া গেলেন। পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। 'হায়

হায়!' শব্দে দেবতারা চিৎকার করিয়া উঠিলেন। 'হায় হায়!' শব্দে যোদ্ধাগণ কাঁদিতে লাগিল। শরীরে এত বাণ বিঁধিয়া ছিল যে, রথ হইতে পড়িয়াও ভীষ্ম শূন্যেই রহিয়া গেলেন; তাঁহার শরীর মাটি ছুঁইতে পাইল না। লোকে মৃত্যুর সময় কোমল বিছানায় শয়ন করে; কিন্তু ভীষ্মের হইল 'শর-শয্যা', অর্থাৎ বাণের বিছানা।

সেই মহাবীর শর-শয্যায় শুইয়া স্বর্গের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তখন আকাশ হইতে দেবতারা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে মহাবীর! হে মহাপুরুষ! সূর্য এখনো আকাশের দক্ষিণভাগে রহিয়াছেন। মহাপুরুষের মৃত্যুর ইহা সময় নহে। তুমি এমন সময়ে প্রাণত্যাগ করিবে?"

ভীষ্ম বলিলেন, "আমি তো প্রাণত্যাগ করি নাই!"

মানস সরোবরবাসী হংসগণ আকাশে উড়িয়া যাইতেছিল। তাহারা বলিল, "এখনো সূর্যদেব আকাশের দক্ষিণভাগেই রহিয়াছেন; মহাত্মা ভীষ্ম কি এমন সময়ে প্রাণত্যাগ করিবেন?"

ভীষ্মদেব সেই হংসগণকে দেখিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। উহারা তাঁহারই মাতা গঙ্গাদেবীর প্রেরিত হংসরূপী মহর্ষিগণ।

তাই তিনি বলিলেন, "হে হংসগণ! পিতার বরে আমি মৃত্যুকে বশ করিয়াছি। সত্য কহিতেছি, সূর্যদেব আকাশের উত্তরভাগে না গমন করিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব না।"

ভীষ্ম রথ হইতে পড়িবামাত্র যুদ্ধ থামিয়া গেল। পাণ্ডবদের দলে মহাশঙ্খ বাজিয়া উঠিল; ভীম আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দ্রোণ এ সংবাদ শুনিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া রথ হইতে পড়িয়া গেলেন। তারপর যোদ্ধাগণ কবচ পরিত্যাগ করিয়া হেঁটমুখে জোড়হাতে সেই মহাবীরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন ভীষ্ম বলিলেন, "হে মহারথগণ! তোমাদের মঙ্গল তো? তোমাদিগকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। দেখ, আমার মাথা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বালিশ দাও।"

রাজা মহাশয়েরা তৎক্ষণাৎ রাশি রাশি কোমল রেশমী বালিশ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তাহা দেখিয়া ভীষ্ম হাসিয়া বলিলেন, "এ বালিশ তো এ বিছানার উপযুক্ত নয়। বৎস অর্জুন, উপযুক্ত বালিশ দাও।"

অর্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দাদামহাশয়! কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তুমি ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান আর ক্ষত্রিয়ের ধর্মে শিক্ষিত। মাথা ঝুলিতেছে, উপযুক্ত বালিশ দাও।"

তখন অর্জুন, ভীষ্মের পদধূলি লইয়া, তিন বাণে তাঁহার মাথা উঁচু করিয়া দিলেন। তাহাতে ভীষ্ম পরম সন্তোষের সহিত অর্জুনকে আশীর্বাদ করিয়া সকলকে বলিলেন, "এই দেখ, অর্জুন আমার উপযুক্ত বালিশ দিয়াছেন।"

তারপর ভীষ্ম আবার বলিলেন, "যতদিন না সূর্যদেব আকাশের উত্তরভাগে যাইবেন, ততদিন আমি এইভাবেই থাকিব; সূর্যদেব আকাশের উত্তরভাগে আসিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। আমার চারিদিকে পরিখা করিয়া (অর্থাৎ খাল কাটিয়া) দাও। আর তোমরা শত্রুতা ছাড়িয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হও।"

তারপর দুর্যোধন ভালো ভালো চিকিৎসক ও ঔষধ লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ভীষ্ম বলিলেন, "উহা দিয়া আমার কি হইবে? এখন আমার চিকিৎসার সময় নহে, আমাকে পোড়াইবার সময়।"

সুতরাং চিকিৎসকেরা তাহাদের ঔষধ লইয়া ফিরিয়া গেল। তারপর রাত্রি হইলে সে স্থানে প্রহরী রাখিয়া সকলে শিবিরে গমন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, পুনরায় সকলে ভীষ্মের নিকট আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ক্রমে স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ সকলে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত সেখানে আসিতে লাগিল। কন্যাগণ তাঁহার উপরে ফুলের মালা চন্দনচূর্ণ ও খই ছড়াইতে লাগিল। গায়ক নর্তক ও বাদ্যকরগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজারা বিনীতভাবে তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিলেন। তখন সেখানকার শোভা হইল যেন স্বর্গের শোভা।

এমন সময় ভীষ্ম বলিলেন, "জল দাও।"

অমনি সকলে ব্যস্ত হইয়া নানারূপ মিষ্টান্ন এবং সুশীতল জল আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহা দেখিয়া ভীষ্ম কহিলেন, "এ পৃথিবী হইতে আমি বিদায় লইয়াছি; সুতরাং এখানকার মানুষেরা যে জল খায় আমি আর তাহা খাইব না। অর্জুন কোথায়?"

অর্জুন জোড়হাতে বলিলেন, "কি করিতে হইবে দাদামহাশয়?"

ভীষ্ম বলিলেন, "দাদা! বিছানা দিয়াছ, বালিশ দিয়াছ, এখন তাহার উপযুক্ত জল দাও।"

অর্জুন ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, অমনি গাণ্ডীবে পর্জন্যাস্ত্র যোজনা করিলেন। সে অস্ত্র ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বের ভূমিতে নিক্ষেপ করামাত্রই, তথা হইতে অতি পবিত্র নির্মল জলের উৎস উঠিতে লাগিল। আহা, কি সুগন্ধ! কি মধুর শীতল জল! সে জল পান করিয়া ভীষ্মের প্রাণ জুড়াইল। তিনি অর্জুনকে বার বার আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার সমান ধনুর্দ্ধর এ জগতে আর নাই। দুর্যোধন আমাদের কথা শুনিল না; সুতরাং সে নিশ্চয় মারা যাইবে।"

দুর্যোধন কাছেই ছিলেন, আর ভীষ্মের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিতও হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভীষ্ম বলিলেন, "দুর্যোধন! অর্জুন যাহা করিল, দেখিলে তো? এমন কাজ আর কেহই করিতে পারে না। এই পৃথিবীতে অর্জুন আর কৃষ্ণ ভিন্ন আগ্নেয়, বরুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, পারমেষ্ট, প্রাজাপাত্য, ধাত্র, ত্বাষ্ট্র, সাবিত্র ও বৈবস্বত অস্ত্র সকলের কথা কেহ জানেন না। তুমি এইবেলা পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর, আমার মৃত্যুতেই এই যুদ্ধের শেষ হউক। আমি সত্য কহিতেছি, আমার কথা না শুনিলে নষ্ট হইবে।"

এই কথা বলিয়া ভীষ্ম চুপ করিলেন; সকলে শিবিরে চলিয়া গেলেন। এমন সময় কর্ণ সেখানে আসিয়া ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে প্রতিদিন আপনার দৃষ্টিপথে পড়িয়া আপনাকে ক্লেশ দিত, আমি সেই রাধেয় (রাধার পুত্র)।"

ভীষ্ম কষ্টে চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে অপর লোক নাই, কেবল প্রহরীরা আছে।। তখন প্রহরীদিগকে সরাইয়া দিয়া এক হাতে কর্ণকে আলিঙ্গনপূর্বক তিনি বলিলেন, "কর্ণ! তুমি আসিয়া ভালো করিয়াছ। আমি নারদ আর ব্যাসের মুখে শুনিয়াছি, তুমি রাধার পুত্র নহ, তুমি কুন্তীর পুত্র। তুমি দুষ্টের দলে জুটিয়া পাণ্ডবদিগের নিন্দা করিতে, তাই আমি তোমাকে কঠিন কথা কহিতাম; কিন্তু আমি কখনো তোমার মন্দ ভাবি নাই। তোমার মতন ধার্মিক, দাতা, আর বীর এ পৃথিবীতে নাই এ কথা আমি জানি। এখন তুমি তোমার ভাইদিগের সহিত মিলিয়া থাক; আমার মৃত্যুতেই এই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাউক।"

কিন্তু এ কথায় কর্ণের মন ফিরিল না। তিনি বলিলেন, "পাণ্ডবদের সহিত আমার শত্রুতা

কিছুতেই দূর হইবার নহে। আপনি অনুমতি করুন, আমি যুদ্ধ করিব। আর, আপনার নিকট যদি কোনো অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করুন।"

ভীষ্ম বলিলেন, "যদি যুদ্ধ করিবেই, তবে রোষহীন মনে পুণ্য কামনায় যুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম পালনপূর্বক স্বর্গে চলিয়া যাও।"

দ্রোণপর্ব

ভীষ্মের পতন হইলে কর্ণ আসিয়া কৌরবদিগের পক্ষে যোগ দিলেন। কর্ণকে পাইয়া তাঁহাদের উৎসাহের সীমা রহিল না। অনেকে বলিল, "ভীষ্ম ইচ্ছা করিয়া পাণ্ডবদিগকে মারেন নাই, কিন্তু কর্ণ উঁহাদিগকে নিশ্চয় বধ করিবেন।"

দুর্যোধন বলিলেন, "কর্ণ! একজন সেনাপতি স্থির কর।" কর্ণ বলিলেন, "দ্রোণ থাকিতে আর কাহাকে সেনাপতি করিবেন? দ্রোণই সর্বাপেক্ষা একাজের উপযুক্ত।"

একথায় দুর্যোধন দ্রোণকে বলিলেন, "গুরুদেব! এখন আপনি সেনাপতি হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

দ্রোণ বলিলেন, "আচ্ছা, আমি সেনাপতি হইয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব। কিন্তু আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিতে পারিব না। সে আমাকে মারিবার জন্যই জন্মিয়াছে।"

দ্রোণকে সেনাপতি করিয়া কৌরবগণ বলিতে লাগিল, "এবারে পাণ্ডবদের পরাজয় নিশ্চয়!" দ্রোণ দুর্যোধনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, আমি তোমার জন্য কি কবিব?"

দুর্যোধন বলিলেন, "আপনি যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত ধরিয়া দিন।"

দ্রোণ ইহাতে আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরই ধন্য; তাঁহার শত্রু কোথাও নাই। তুমিও তাঁহাকে মারিতে না চাহিয়া, কেবল ধরিয়া আনিতে চাহিতেছ।"

ভালো লোকে ভালোভাবেই কথা নেয়, দ্রোণ মনে করিলেন যে, দুর্যোধন বুঝি যুধিষ্ঠিরকে ভালোবাসিয়াই তাঁহাকে মারিতে চাহেন নাই। কিন্তু দুর্যোধনের পেটে যে বাঁকা বুদ্ধি, তাহা তাঁহার কথাতেই ধরা পড়িল। তিনি বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরকে মারিলে কি অর্জুন আর আমাদিগকে রাখিবে? তাহার চেয়ে তাঁহাকে জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পারিলে, আবার পাশা খেলিয়া বনে পাঠাইতে পারিব।"

এ কথায় দ্রোণ বলিলেন, "অর্জুন থাকিতে যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনার শক্তি দেবতাদেরও নাই। অর্জুনকে যদি সরাইতে পার, তবে যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চয় আজ ধরিয়া আনিব।"

চরের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন, "তুমি আজ আমার নিকট

থাকিয়া যুদ্ধ কর। আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।"

অর্জুন বলিলেন, "আমি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার কোনো ভয় নাই। দেবতার সাহায্য পাইলেও কৌরবেরা আপনাকে ধরিয়া নিতে পারিবে না।"

তারপর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এবং প্রথম হইতেই দ্রোণের তেজে পাণ্ডবেরা নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। সৈন্য যে কত মরিল তাহার সীমা সংখ্যা নাই। ইহাতে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বীরগণ দ্রোণকে আক্রমণ করায়, যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরতর হইয়া উঠিল।

অভিমন্যুকে আক্রমণ করিতে গিয়া হার্দিক্য বড়ই জব্দ হইলেন। প্রথমে ধনুর্বাণ লইয়া তিনি মন্দ যুদ্ধ করেন নাই; এমনকি, তিনি অভিমন্যুর ধনুক অবাধ কাটিয়া ফেলেন। তখন অভিমন্যু খড়্গ চর্ম হাতে তাঁহার রথে উঠিয়া এক হাতে তাঁহার কেশাকর্ষণ, এক লাথিতে সারথিকে সংহার এবং খড়্গাঘাতে রথের ধবজাটি নাশ করিলেন। তারপর হার্দিক্যের চুল ধরিয়া তাঁহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

হার্দিক্যের পরে জয়দ্রথ আসিয়াও কম নাকাল হন নাই। তারপর শল্য আসিতেই অভিমন্যুর হাতে তাঁহার সারথিটি মারা গেল। তাহাতে শল্য ক্রোধভরে গদাহাতে অভিমন্যুকে মারিতে আসিলে, অভিমন্যুও বজ্র হেন মহাগদা উঠাইয়া বলিলেন, "আইস।" এমন সময় ভীম আসিয়া তাঁহাকে থামাইয়া শল্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

সে অতি আশ্চর্য যুদ্ধ হইয়াছিল। গদায় গদায় ঠোকাঠুকিতে এমনি আগুনের ফিন্‌কি ছুটিয়াছিল যে, কামারের দোকানেও তেমন হয় না। শেষে দুজনের গদার বাড়িতে দুজনেই ঠিকরাইয়া পড়িলেন। ভীম তখনই আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু শল্যের জ্ঞান না থাকায় তাঁহার আর উঠা হইল না।

তারপর ভীম, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতির ঘোর যুদ্ধ চলিল। এই সময়ে কৌরব সেনাগণ ক্ষত-বিক্ষত শরীরে পলায়ন করিতেছিল, দ্রোণ তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই!" বলিয়াই তিনি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। সে সময়ে শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, নকুল, সহদেব প্রভৃতির কেহই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিলেন না।

ইঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিবামাত্র বিরাট, দ্রুপদ, কৈকেয়গণ, সাত্যকি, শিবি, ব্যাঘ্রদত্ত, সিংহসেন প্রভৃতি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পথ আটকাইলেন। কিন্তু তাঁহাদের বাণে দ্রোণের কি হইবে? তিনি দেখিতে দেখিতে ব্যাঘ্রদত্ত আর সিংহসেনের মাথা কাটিয়া একেবারে যুধিষ্ঠিরের রথের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডব সৈন্যেরা তখন "মহারাজকে মারিল!" বলিয়া চ্যাঁচাইতে লাগিল, আর কৌরব সৈন্যেরা "এই ধরিয়া আনিল!" বলিয়া আকাশ ফাটাইল।

এমন সময় অর্জুন শত্রু সৈন্য কাটিতে কাটিতে আসিয়া সেখানে দেখা দিলেন। তারপর আর কি কেহ ধনুক ধরিতে পাইল? সকলে ভয়েই অস্থির, যুদ্ধ করিবে কে? অর্জুনের ভীষণ বাণবৃষ্টিতে চারিদিক আঁধার হইয়া গেল। তখন আর এতটুকুও বুঝিবার সাধ্য রহিল না যে, 'এই পৃথিবী, ঐ আকাশ।'

আর তখন সন্ধ্যাও হইতেছিল। কাজেই দ্রোণ তখনি যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন। সেদিন আর তাঁহার যুধিষ্ঠিরকে ধরা হইল না।

দ্রোণের পক্ষে ইহা লজ্জার কথা বটে; আর অর্জুন থাকিতে এ লজ্জা দূর হওয়াও দুর্ঘট।

সুতরাং যুক্তি হইল যে, পরদিন কৌশলে অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে সরাইয়া, আর একবার চেষ্টা করিতে হইবে। দ্রোণ বলিলেন, "অর্জুনকে কেহ যুদ্ধের ছলে দূরে লইয়া যাউক। তখন সে ব্যক্তিকে পরাজয় না করিয়া অর্জুন কখনোই ফিরিবে না। সেই অবসরে আমি যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনিব।"

এ কথায় সুশর্মা, সত্যরথ, সত্যধর্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু, সত্যকর্মা প্রভৃতি বীরগণ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সমেত, তখনই অগ্নির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "কাল আমরা অর্জুনকে না মারিয়া যুদ্ধ হইতে ফিরিব না। যদি ফিরি তাহা হইলে, যত মহাপাপ আছে, সকলের শাস্তি যেন আমরা পাই!"

এমন প্রতিজ্ঞা যে করে, তাহাকে বলে 'সংশপ্তক"। পরদিন যুদ্ধের সময় এই সংশপ্তকগণ অর্জুনকে ডাকিয়া বলিল, "আইস অর্জুন! যুদ্ধ করি!"

তাহা শুনিয়া অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "দাদা! আমাকে যখন ডাকিতেছে, তখন তো আমি না গিয়া পারি না।" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "দ্রোণ আমাকে ধরিয়া নিতে আসিবেন তাহার কি হইবে?" অর্জুন বলিলেন, "আপনার কাছে সত্যজিৎকে রাখিয়া যাইতেছি। ইনি জীবিত থাকিতে আপনার কোনো ভয় নাই। সত্যজিৎ মরিলে আপনারা কেহ রণস্থলে থাকিবেন না।"

সেদিন সংশপ্তকেরা মিলিয়া কি অর্জুনকে কম ব্যস্ত করিয়াছিল? দলে দলে তাহারা আসিয়া প্রাণের মায়া ছাড়িয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এক এক দলকে শেষ করিয়া অর্জুন যেই যুধিষ্ঠিরের নিকটে ফিরিতে যান, অমনি আর একদল আসিয়া বলে, "কোথায় যাও? এই যে আমরা আছি!"

আর তাহারা যুদ্ধও এমনি ভয়ানক করিয়াছিল যে কি বলিব! ইহাব মধ্যে আবার নারায়ণী সেনারা আসিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তখন অর্জুন রোষভরে "ত্বাষ্ট্র" অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। সে অতি অদ্ভুত অস্ত্র। উহা ছুঁড়িবামাত্র শত্রুদিগের মাথায় গোল লাগিয়া গেল! তখন তাহারা নিজ নিজ সঙ্গীকেই দেখিয়া বলে, "এই অর্জুন! কাট ইহাকে!" এইরূপে তিলেকের মধ্যে তাহারা নিজে নিজে কাটাকাটি করিয়া মরিল।

তথাপি সে যুদ্ধের শেষ নাই। দেখিতে দেখিতে ললিখ, মালব, মাবেল্লক প্রভৃতি যোদ্ধাগণ আসিয়া বাণে বাণে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জুন! তুমি বাঁচিয়া আছ? আমি তো তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। অমনি অর্জুন বায়ব্যাস্ত্র মারিয়া শত্রুগণের বাণ তো উড়াইয়া দিলেনই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঘূর্ণী বাতাস বহিয়া হাতি ঘোড়া সংশপ্তক অবধি সকলকেই শুকনা পাতার মতো উড়িয়া নিল!

এদিকে দ্রোণাচার্য তাঁহার কাজ ভুলেন নাই। তিনি যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে গিয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ তাঁহাকে কিছুতেই আটকাইতে পারিতেছে না। দ্রোণের হাতে পাণ্ডবপক্ষের বৃক্ক মরিয়াছেন, সত্যজিৎ মরিয়াছেন, দৃঢ়সেন, ক্ষেম, বসুদান ইঁহারাও মরিয়াছেন। যুধিষ্ঠির দেখিলেন বড়ই বিপদ। দ্রোণ সকলকে পরাজিত করিয়া এখন তাঁহারই দিকে ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তিনি অবিলম্বে ঘোড়া হাঁকাইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে দুর্যোধন অনেক হাতি লইয়া ভীমকে আক্রমণ করেন। ভীম ক্ষণকালের

মধ্যেই সে সকল হাতি মারিয়া ফেলাতে, অঙ্গদেশের ম্লেচ্ছ রাজা হাতি চড়িয়া দুর্যোধনকে সাহায্য করিতে আসেন। ইনি মরিলে আসেন ভগদত্ত।

ভগদত্ত ইন্দ্রের বন্ধু এবং ভয়ানক যোদ্ধা ছিলেন, আর তদপেক্ষাও অতি ভয়ানক একটা হাতিতে চড়িয়া আসিয়াছিলেন। ভীম এত হাতি মারিয়াছেন, কিন্তু এ হাতিকে মারা দূরে থাকুক, বরং হাতিই তাঁহাকে শুঁড়ে জড়াইয়া, পায়ের নীচে ফেলিবার জোগাড় করিয়াছিল। অনেক কষ্টে শুঁড় ছাড়াইয়া ভীম হাতির পায়ের তলায় গিয়া লুকাইয়াছিলেন, তাই রক্ষা। আর সকলে তো মনে করিয়াছিল, তাঁহাকে বুঝি মারিয়াই ফেলিয়াছে।

এদিকে ভীমকে বাঁচাইবার জন্য যুধিষ্ঠির, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অন্যান্য লোকের সহিত ভগদত্তের যুদ্ধ হইতে লাগিল। দশার্ণের রাজা ভগদত্তের হাতে মারা গেলেন। ভগদত্তের হাতি সাত্যকির রথখানিকে শুঁড় জড়াইয়া ছুঁড়িয়া মারিলে সাত্যকি ও তাঁহার সারথি তাহা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিলেন। তারপর হাতিটি রাজামহাশয়দিগকে লইয়া লুফালুফি করিতে লাগিল।

তখন না জানি কিরূপ কাণ্ড হইয়াছিল, আর সকলে কিরূপ চিৎকার করিয়াছিল। সে চীৎকার অর্জুনের কানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ঐ বুঝি ভগদত্ত তাঁহার হাতি লইয়া সকলকে শেষ করিলেন। শীঘ্র ওখানে চলুন।"

কিন্তু এদিকে আবার চৌদ্দহাজার সংশপ্তক আসিয়া উপস্থিত! অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্রে তাহাদিগকে মারিয়া ফিরিতে চলিয়াছেন, এমন সময় আবার সুশর্মা ছয় ভাই সমেত আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যাহা হউক, সুশর্মার ছয় ভাইকে মারিয়া এবং তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া, চলিয়া আসিতে অর্জুনের অধিক সময় লাগিল না।

এদিকে ভগদত্ত তাঁহার হাতি লইয়া পাণ্ডব সৈন্য শেষ করিতে ব্যস্ত, এমন সময় অর্জুন কৌরব সেনা মারিতে মারিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর দুজনে কি ভীষণ যুদ্ধই হইল! ভগদত্ত হাতির উপরে, অর্জুন রথের উপরে। অর্জুনের রথ তো আর যুদ্ধ করিতে জানে না, কিন্তু ভগদত্তের হাতিটি এক একবার ক্ষেপিয়া রথ গুঁড়া করিয়া দিতে আসে, কৃষ্ণ তখন অনেক কৌশলে পাশ কাটিয়া তাহাকে এড়ান।

এমন সময় অর্জুন ভগদত্তের ধনুক ও তূণ কাটিয়া, তাঁহার গায়ে সত্তরটি বাণ বিঁধাইয়া দিলেন। তখন ভগদত্তও রাগে অস্থির হইয়া, 'বৈষ্ণব অঙ্কুশ' নামক অস্ত্র অর্জুনের বুকের দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। ইহা অতি ভয়ানক অস্ত্র। বিষ্ণু ইহা নরকাসুরকে দেন, নরকাসুর ভগদত্তকে দেয়। এ অস্ত্রের ঘা খাইলে ইন্দ্রেরও প্রাণ বাহির হইয়া যায়। একমাত্র বিষ্ণু ইহা সহ্য করিতে পারেন।

তাই সে অস্ত্রকে অর্জুনের দিকে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণ (যিনি নিজেই বিষ্ণু) নিজের বুক পাতিয়া দিলেন। তাঁহার বুকে পড়িয়া তাহা একটি সুন্দর মালা হইয়া গেল।

ইহাতে অর্জুন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যুদ্ধে যোগ দিবেন না। এখন সে প্রতিজ্ঞা কিজন্য ভাঙিলেন? আমি অস্ত্র বারণ করিতে পারিতাম না?"

কৃষ্ণ তাঁহাকে সে অস্ত্রের কথা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভগদত্তের হাতে আর তাহা নাই। এখন তুমি উহাকে মার।"

ইহার অল্পক্ষণ পরেই অর্জুন রাগে ভগদত্তের হাতিকে মারিয়া, অর্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তকেও

বধ করিলেন।

তারপর অচল ও বৃষক নামক শকুনির দুই ভাই অর্জুনের হাতে মারা গেলে, শকুনির সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

শকুনি নানারূপ মায়া জানিতেন। প্রথমে তিনি এমন এক কৌশল করিলেন যে তাহাতে নানারূপ উৎকট অস্ত্র কোথা হইতে আসিয়া, কৃষ্ণ আর অর্জুনের গায়ে পড়িতে লাগিল। আর ভয়ংকর জন্তু এবং রাক্ষসগণ তাঁহাদিগকে মারিতে আসিল। কিন্তু অর্জুনের বাণের সম্মুখে এসকল অস্ত্র বা জন্তু এক মুহূর্তও টিকিতে পারিল না।

তখন শকুনি হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন।

অর্জুন জ্যোতিষ্ক অস্ত্রে সে অন্ধকার দূর করিলে, সেই ধূর্ত কোথা হইতে জলের বন্যা আনিয়া সকলকে ভাসাইয়া দিবার আয়োজন করিলেন। অর্জুনের আদিত্যাস্ত্রে জল সহজেই দূর হইল। তারপর আর শকুনির মায়ায় কুলাইল না; তিনি অর্জুনের বাণ খাইয়া পলায়ন করিলেন।

এইরূপে অর্জুন ক্রমে কৌরব সৈন্যদিগকে নিতান্ত অস্থির করিয়া তোলায় তাহারা আর রণস্থলে টিকিয়া থাকিতে পারিল না। পাণ্ডব সৈন্যগণ ইহাতে উৎসাহ পাইয়া দ্রোণকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিল। তখন যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বড়ই সাংঘাতিক। একদিকে দ্রোণ মহারোষে হাজার হাজার সৈন্য মারিতেছেন, অপরদিকে অশ্বত্থামা নীলকে সংহার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার একদল সংশপ্তক আসিয়া, অর্জুনকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাস্তবিক তখন পাণ্ডব সৈন্যদের একটু বিপদই হইয়াছিল। কিন্তু এমন সময় ভীম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, আবার তাহাদের উৎসাহ দেখা দিল। ততক্ষণে অর্জুনও, সংশপ্তকদিগকে মারিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন তাঁহার বাণে কৌরবদের কি দুর্গতিই হইল! তাহারা চ্যাঁচায় আর শুধু বলে 'কর্ণ! কর্ণ!'

সে ডাক শুনিয়া কর্ণ তখনই তিনটি ভাইসমেত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাই তিনটি তো আসিয়াই অর্জুনের হাতে মারা গেল; নিজে কর্ণও বুকে হাতে সাত্যকির বাণ খাইয়া কম শিক্ষা পাইলেন না। দ্রোণ, দুর্যোধন আর জয়দ্রথ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে না ছাড়াইলে বিপদ হইত।

তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত দুইপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ থামাইয়া সকলে শিবিরে আসিলেন।

সেদিনও যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে না পারায়, দুর্যোধনের নিকট লজ্জা পাইয়া, দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পরদিন 'চক্র' ব্যূহ নামক অতি ভয়ংকর ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া তিনি পাণ্ডবপক্ষের একজন মহারথীকে বধ করিবেন।

সেদিন প্রভাত হইবামাত্রই সংশপ্তকেরা আসিয়া অর্জুনকে ডাকিয়া লইয়া গেল। এই অবসরে দ্রোণ সেই সাংঘাতিক 'চক্র' ব্যূহ রচনা করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবেরা তখন এমনই বিপদে পড়িলেন যে কি বলিব। অর্জুন অনুপস্থিত, এখন শুধু অভিমন্যু ছাড়া আর কেহই সে ব্যূহে প্রবেশ করিতে জানে না। সুতরাং দ্রোণ সুবিধা পাইয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলিলেন।

যুধিষ্ঠির আর উপায় না দেখিয়া, অভিমন্যুকেই বলিলেন, "বাবা! আমরা তো এ বৃহে প্রবেশ করিবার কোনো উপায় জানি না। এখন অর্জুন আসিয়া যাহাতে আমাদের নিন্দা না করেন, তাহা কর।"

অভিমন্যু বলিলেন, "আমি এ বৃহে প্রবেশ করিতে ভয় পাই। কিন্তু আপনি যখন বলিতেছেন, তখন অবশ্যই যাইব।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির আর ভীম বলিলেন, "তুমি কেবল পথটুকু করিয়া দাও তারপর তোমার পিছু পিছু আমরা ঢুকিয়া বাকি যাহা করিবার সব করিব।"

এ কথায় অভিমন্যু তাঁহার সারথি সুমিত্রকে চক্রব্যূহের দিকে রথ চালাইতে বলিলে, সুমিত্র বিনয় করিয়া বলিল, "কুমার, বড়ই কঠিন এবং ভয়ংকর কাজে হাত দিতেছেন; একবার ভাবিয়া দেখুন।"

অভিমন্যু বলিলেন, "তুমি চল। নিজে ইন্দ্র দেবতাদিগকে লইয়া আসিলেও আজ আমি যুদ্ধ করিব।"

সুতরাং সারথি আর বিলম্ব না করিয়া রথ চালাইয়া দিল। আর অমনি, হরিণের ছানা পাইলে বাঘ যেমন করিয়া আসে, সেইরূপ করিয়া কৌরব যোদ্ধাগণ বালক অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বয়সে বালক হইলে কি হয়? সেই আঠারো বৎসরের ছেলে দ্রোণের সামনেই বৃহ ভেদ করিয়া বড়-বড় কৌরবদিগকে একধার হইতে বাণের ঘায়ে অচল করিতে লাগিলেন। কত লোক মরিল, কত পলাইয়া গেল, তাহার কি সংখ্যা আছে? অশ্মকেশ্বর মরিলেন, কর্ণ অজ্ঞান হইলেন, শল্য অজ্ঞান হইলেন, শল্যের ভাই মারা গেলেন, ছোটখাট যোদ্ধার তো কথাই নাই।

অভিমন্যুর বীরত্ব দেখিয়া দ্রোণ কৃপকে বলিলেন, "ইহার মতো যোদ্ধা বোধহয় আর কোথাও নাই। এ ইচ্ছা করিলে আমাদের সকলকে মারিয়া শেষ করিতে পারে।"

এ কথা কিন্তু দুর্যোধনের সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন, "অর্জুনের পুত্র বলিয়া দ্রোণ ইচ্ছা করিয়াই ইহাকে মারিতেছেন না। তাই এই মূর্খের এত স্পর্ধা হইয়াছে। চল, আমরা সকলে মিলিয়া ইহাকে বধ করি।"

দুঃশাসন বলিলেন, "ইহাকে মারিলে, অর্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে আপনিই মরিয়া যাইবে। অর্জুন মরিলে পাণ্ডবেরাও মরিবে। সুতরাং আমি এখনই ইহাকে মারিয়া আপনার সকল আপদ দূর করিয়া দিতেছি।"

দুঃশাসন এইরূপ গর্ব করিয়া অভিমন্যুকে মারিতে গেলেন, আর তাহার খানিকক্ষণ পরেই দেখা গেল যে তিনি চিৎ হইয়া রথে পড়িয়া খাবি খাইতেছেন, আর সারথি সেই রথ হাঁকাইয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিতেছে!

কর্ণ দুবার আসিয়া দুবারই নাকালের একশেষ হইলেন; তাঁহার এক ভাই তো মরিয়াই গেল।

কিন্তু হায়! যাঁহারা এত উৎসাহ দিয়া অভিমন্যুকে বৃহের ভিতরে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই তাঁহার সঙ্গে বৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। একা জয়দ্রথ যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের সকলকে ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। তিন বাণে সাত্যকি, আট বাণে ভীম, যাট বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন, দশ বাণে বিরাট, পাঁচ বাণে দ্রুপদ, দশ বাণে শিখণ্ডী, সত্তর বাণে যুধিষ্ঠির, এইরূপে সকলকেই

তাঁহার নিকট পরাজিত হইতে হইল। দ্বৈত বনে ভীমের হাতে মার খাইয়া জয়দ্রথ শিবের তপস্যা করেন। তখন শিব তাঁহাকে বর দেন যে 'তুমি অর্জুন ভিন্ন আর চারি পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজয় করিবে; সেই বরের জোরে আজ জয়দ্রথের এত পরাক্রম।

এদিকে অভিমন্যু বৃষসেনকে পরাজয়পূর্বক বসাতীকে মারিয়াছেন। তারপর কৌরবপক্ষের অনেকে মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তাঁহাদিগকেও কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন; শল্যের পুত্র রুক্মরথকে মারিয়া গান্ধর্ব-অস্ত্রে অনেক যোদ্ধাকে অজ্ঞান করত, তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন।

বাস্তবিক কেহই তাঁহার নিকট হইতে অক্ষত শরীরে ফিরিতে পায় নাই। দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও হার্দিক্য এই ছয়জনে এক সঙ্গে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গিয়া ছয়জনই পরাজিত হইলেন। তারপর ক্রাথের পুত্র আসিয়া মারা গেল। তারপর আবার সেই দ্রোণ প্রভৃতি ছয়জনের পরাজয়;তারপর বৃক্ষারক এবং বৃহদ্বলের মৃত্যু। আর কত বলিব? ক্রমাগত যোদ্ধারা আসে, আর অভিমন্যুর অস্ত্রে মারা যায়। কৌরবেরা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, আজ ইহার হাতে আর তাঁহাদের রক্ষা নাই।

তখন শকুনি বলিলেন, "চল সকলে মিলিয়া উহাকে মারি, নচেৎ ও আমাদের সকলকেই বধ করিবে।"

কর্ণ তখন দ্রোণকে বলিলেন, "শীঘ্র ইহাকে মারিবার উপায় করুন। নচেৎ আর রক্ষা নাই!"

এ কথায় দ্রোণ বলিলেন, "উহার কবচ ভেদ করা অসম্ভব। কিন্তু চেষ্টা করিলে, উহার ধনুক কাটিয়া, সারথি প্রভৃতি মারিয়া উহার যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিতে পার। উহার হাতে ধনুক থাকিতে দেবতাগণেরও উহাকে পরাজয় করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং আগে উহার ধনুক কাট; তারপর যুদ্ধ করিও।"

এই কথায় কর্ণ হঠাৎ বাণ মারিয়া, অভিমন্যুর ধনুকটি কাটিলেন, ভোজ তাঁহার ঘোড়াগুলিকে মারিলেন, কৃপ সারথিকে বধ করিলেন; এইরূপে তাঁহাকে সঙ্কটে ফেলিয়া, নিষ্ঠুর ছয় মহারথ এককালে সেই বীর বালককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধনুক নাই, রথ নাই। অভিমন্যু খড়্গ চর্ম লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাহাও দ্রোণ আর কর্ণের ছলনায় দেখিতে দেখিতে কাটা গেল। চক্র নিলেন, তাহাও চারিদিক হইতে বাণ বিঁধিয়া অভিমন্যুর দেহ সজারুর দেহের মতো হইয়া গিয়াছে।

এই সময়েও অভিমন্যু গদাঘাতে সত্তরটি সঙ্গীসমেত কালিকেয় এবং অপর সতেরজন রথী ও দশটি হাতিকে মারিয়া দুঃশাসনের পুত্রের রথ ও ঘোড়া চূর্ণ করেন। তখন দুঃশাসনের পুত্রও গদা লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। দুইজনেই দুজনের গদার বাড়িতে ঠিকরাইয়া পড়েন। কিন্তু দুঃশাসনের পুত্র আগে উঠিয়া অভিমন্যুর মাথায় সাংঘাতিক গদার আঘাত করে। এইরূপ অন্যায় যুদ্ধে সে বালক মহাবীরকে সকলে মিলিয়া নির্দয়ভাবে হত্যা করিল।

কৌরবগণ তাঁহাদের পাপকর্ম শেষ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আর পাণ্ডবদের কথা কি বলিব? তাঁহাদের দুঃখ লিখিয়া জানানো সম্ভব নহে। অভিমন্যুর মৃত্যুতে সৈন্যেরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিতেছিল; যুধিষ্ঠির অনেক কষ্টে তাহাদিগকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। তারপর সকলে যুধিষ্ঠিরকে ঘিরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কাহারো মুখে কথা বাহির

হইল না।

এদিকে অর্জুন সংশপ্তকদিগকে মারিয়া ফিরিবার সময় কৃষ্ণকে বলিলেন, "আজ কেন আমার মন এত অস্থির হইতেছে? আমার শরীরও যেন অবশ হইয়া পড়িতেছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কোনো অমঙ্গল হয় নাই তো?"

শিবিরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা দেখিলেন, চারিদিক অন্ধকার, লোকজনের সাড়াশব্দ নাই। অন্যদিন বাদ্য আর কোলাহলে শিবির পরিপূর্ণ থাকে, আজ তাহার কিছুই নাই। বিশেষত, অভিমন্যু প্রত্যহ, অর্জুন শিবিরে আসিবামাত্র, ভাইদিগকে লইয়া হাসিমুখে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন; আজ সেই অভিমন্যুই বা কোথায়?

এ সকল কথা আর বাড়াইয়া বলিয়া ফল কি? অভিমন্যুর মৃত্যুর সংবাদ অর্জুনের কিরূপ কষ্ট হইল, তাহা তোমরা কল্পনা করিয়া লও। অভিমন্যুর মতো পুত্র মরিলে যেমন দুঃখ হইতে পারে, তাহা তাঁহার অবশ্যই হইল। আর সেই দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "কল্য আমি জয়দ্রথকে বধ করিব। যদি কল্য সেই পাপাত্মা জীবিত থাকিতে সূর্য অস্ত হয়, তবে আমি এইখানেই জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করিব।"

এই সংবাদ তখনই চরেরা দুর্যোধনের শিবিরে লইয়া গেল। তাহা শুনিয়া জয়দ্রথ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলকে বলিলেন, "রাজামহাশয়গণ! আপনাদের মঙ্গল হউক! আপনাদের অনুমতি পাইলেই আমি এইবেলা পলায়ন করি!"

কিন্তু দুর্যোধন তাহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, "আমরা এতগুলি লোক থাকিতে তোমার ভয় কি? আমরা তোমাকে রক্ষা করিব।"

দুর্যোধনের কথায় ভরসা না পাইয়া, জয়দ্রথ দ্রোণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্রোণও তাঁহাকে খুব সাহস দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই! আমি এমন ব্যূহ প্রস্তুত করিব যে, অর্জুন তাহা পারই হইতে পারিবে না। আর যদিই বা অর্জুন তোমাকে মারে, তাহা হইলেও তো তোমার স্বর্গলাভ হইবে। সুতরাং ভয় কি?"

এসকল কথা আবার পাণ্ডবদিগের চরেরা তাঁহাদের কাছে গিয়া বলিলে কৃষ্ণ অর্জুনের জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন।

পরদিন দ্রোণ যে ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন, তাহা বড়ই অদ্ভুত। এই ব্যূহ চব্বিশ ক্রোশ লম্বা, আর পিছনের দিকে দশ ক্রোশ চওড়া। ইহার সম্মুখ ভাগে শকটের ন্যায়, পশ্চাদ্ভাগ চক্র বা পদ্মের ন্যায়। ইহার ভিতরে আবার লুকাইয়া 'সূচী' নামক একটি ব্যূহ হইল। কৃতবর্মা, কাম্বোজ, জলসন্ধ, দুর্যোধন প্রভৃতি বীরেরা, জয়দ্রথকে তাঁহাদের পশ্চাতে রাখিয়া, এই 'সূচী' ব্যূহে লুকাইয়া রহিলেন। নিজে দ্রোণ বড় ব্যূহের মুখে এবং ভোজ তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া সকলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেদিন অর্জুন কি ভীষণ রণই করিলেন। কৌরব সৈন্যের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাহারা পলাইবে কি, যেদিকে চাহে, সেইদিকেই দেখে অর্জুন! দুঃশাসন অনেক হাতি লইয়া অর্জুনকে আটকাইতে আসিলেন, মুহূর্তের মধ্যে সে সকল হাতি অর্জুনের বাণে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তাঁহার এক একটা বাণে দুই তিনটা করিয়া মানুষ কাটা যাইতে লাগিল।

এমন সময়, দুর্যোধনের তাড়ায় দ্রোণ অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। কিছুকাল দুইজনে এমনি যুদ্ধ চলিল যে, তাহার আর তুলনা নাই। কিন্তু অর্জুনের আজ অন্য কাজ রহিয়াছে,

দ্রোণের কাছে এত সময় নষ্ট করিলে তাঁহার চলিবে কেন? কাজেই তিনি হঠাৎ তাঁহার পাশ দিয়া রথ চালাইয়া দিলেন। তাহাতে দ্রোণ বলিলেন, "সে কি অর্জুন! তুমি না শত্রুকে জয় না করিয়া ছাড় না?" অর্জুন বলিলেন, "আপনি তো আমার শত্রু নহেন. আপনি আমার গুরু! আমি আপনার পুত্রের সমান শিষ্য। আর আপনাকে কে যুদ্ধে হারাইতে পারে?"

কিন্তু বুড়া কি সহজে ছাড়িবার লোক? তিনি অর্জুনের পশ্চাতে তাড়া করিলেন. তখন কাজেই অল্প স্বল্প করিয়া তাঁহাকে বারণ করা আবশ্যক হইল। এরপর ভোজকে পার হইতে হইবে। কিন্তু কৃতবর্মা ইহার মধ্যে পথ আটকাইয়া বসিয়াছেন। যাহা হউক. ইঁহাকে অজ্ঞান করিতে অর্জুনের অধিক সময় লাগিল না।

কৃতবর্মা অজ্ঞান হইলে আসিলেন শ্রুতায়ুধ। ইঁহার বরুণদত্ত একটা ভয়ংকর গদা আছে। সে গদা কেহই ফিরাইতে পারে না। কিন্তু উহার একটি দোষ এই যে, যুদ্ধে লিপ্ত নহে এমন লোককে মারিলে. উহা উল্টিয়া তাহার প্রভুরই মাথায় পড়ে। শ্রুতায়ুধ অর্জুনকে মারিতে গিয়া, সেই গদা কৃষ্ণের উপর ঝাড়িয়া বসিয়াছেন! কাজেই, বুঝিতেই পার, অর্জুনের আর শ্রুতায়ুধকে মারিবার জন্য পরিশ্রম করিতে হইল না।

শ্রুতায়ুধের পর সুদক্ষিণ; তারপর শ্রুতায়ু ও অচ্যুত; তারপর উঁহাদিগের পুত্র নিয়তায়ু, দীর্ঘায়ু; তারপর সহস্র সহস্র অঙ্গদেশীয় গজারোহী সৈন্য; তারপর বিকটাকার অসংখ্য যবন. পারদ ও শক; তারপর আর-একজন শ্রুতায়ু—এইরূপ করিয়া কত যোদ্ধা মরিল। দুর্যোধন তো দ্রোণের উপর চটিয়াই অস্থির! তিনি বলিলেন, "আপনি আমাদের খান, আবার আমাদেরই অনিষ্ট করেন। আপনি যে মধু মাখানো ক্ষুরের মতো, তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক, শীঘ্র জয়দ্রথকে বাঁচাইবার উপায় করুন।"

দ্রোণ বলিলেন, "আমি কি করিব? আমি বুড়া হইয়া এখন আর ছুটাছুটি করিতে পারি না। অর্জুন একটু ফাঁক পাইলেই রথ হাঁকাইয়া চলিয়া যায়। কৃষ্ণ এমনি তাড়াতাড়ি রথ চালান যে অর্জুনের বাণ তাহার এক ক্রোশ পিছনে পড়ে। বজ্রহাতে ইন্দ্র আসিলেও আমি তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু অর্জুনকে পরাজয় করিতে কিছুতেই পারিব না। তুমিই না হয় অনেক লোক লইয়া, একবার তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া দেখ না। আমি তোমার গায়ে এক আশ্চর্য কবচ বাঁধিয়া দিতেছি; ইহাকে কোনো অস্ত্রই ভেদ করিতে পারিবে না।"

এই বলিয়া দ্রোণাচার্য, জল ছুঁইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, দুর্যোধনের গায়ে সেই অদ্ভুত উজ্জ্বল কবচ বাঁধিয়া দিলে, দুর্যোধন মহোৎসাহে অর্জুনকে মারিতে চলিলেন।

এই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা, অনেক সৈন্য লইয়া, দ্রোণকে ভয়ংকর তেজের সহিত আক্রমণ করাতে তাঁহার সৈন্যসকল তিন দলে ভাগ হইয়া গেল। দ্রোণ অনেক চেষ্টা করিয়াও আর তাহাদিগকে একত্র করিতে পারিলেন না। তখন কি ঘোর যুদ্ধই হইয়াছিল! অশ্বত্থামা, কর্ণ, সৌমদত্ত প্রভৃতি কয়েকজন বড়-বড় বীরের হাতে, সকল সৈন্যের পশ্চাতে জয়দ্রথকে রাখিয়া, আর প্রায় সকলেই যুদ্ধে লাগিয়া গিয়াছিলেন। কত যে লোক মরিয়াছিল তাহার গণনা নাই। দ্রোণাচার্যের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সময়ে খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাত্যকি আসিয়া সাহায্য না করিলে, বুড়ার হাতে তাঁহার বড়ই দুর্দশা হইত। সাত্যকি দেখিলেন যে, দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়্গ, চর্ম, ধ্বজ, ছত্র, ঘোড়া সারথি সমুদায় শেষ করিয়া এক সাংঘাতিক বাণ চড়াইয়া বসিয়াছেন। সেই বাণ ছুঁড়িবামাত্র সাত্যকি চৌদ্দ বাণে তাহা

কাটিয়া ফেলাতেই ধৃষ্টদ্যুম্ন সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন।

ইহার পর হইতে সাত্যকির সহিত দ্রোণের ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। কিন্তু জয় পরাজয় কাহারো হইল না। শেষে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, বিরাট প্রভৃতি আসিয়া সাত্যকির সহিত যোগ দিলে, বহুতর কৌরব যোদ্ধাও আসিয়া দ্রোণের সহায় হইলেন।

এদিকে বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল; অর্জুন এতক্ষণ কি করিতেছেন? এখনো জয়দ্রথকে পাইতে তাঁহার অনেক বিলম্ব আছে; কিন্তু তাহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। তিনি ক্রমাগত বাণাঘাতে কৌরব সৈন্য কাটিয়া পথ করিয়া দিতেছেন, আর সেই পথে কৃষ্ণ রথ চালাইতেছেন। অর্জুনের বাণ তাঁহার ধনুক হইতে ছুটিয়া শত্রুর বুকে পড়িতে যে সময় লাগে, তাহার মধ্যে রথ যাইতেছে এক ক্রোশ! সুতরাং ঘোড়াগুলির যে খুবই পরিশ্রম হইবে, তাহা আশ্চর্য কি? কৃষ্ণ দেখিলেন যে, এগুলিকে একটু বিশ্রাম না করাইলে আর কিছুতেই চলিতেছে না।

অর্জুনের কি আশ্চর্য ক্ষমতাই ছিল। তিনি ঘোড়ার বিশ্রামের জন্য, রথ হইতে নামিয়া সেই মাঠের মধ্যেই বাণের দ্বারা একটা ঘর গাঁথিয়া ফেলিলেন। সেখানে জল ছিল না, তাই একটি সুন্দর সরোবরও করিলেন। সে সরোবরে সুমধুর, সুবিমল জল তো ছিলই, তাহার উপর আবার তাহাতে হাঁসও চরিতেছিল, পদ্মফুলও ফুটিয়াছিল।

শত্রুরা অবশ্য অর্জুনের রথ থামিল এবং অর্জুনকে নামিতে দেখিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু অর্জুনের বাণের কাছে তাহারা কি আর করিবে? কৃষ্ণ সেই বাণের ঘরেব ভিতবে ঘোড়াগুলির সাজ খুলিয়া, তাহাদিগকে দলিয়া মলিয়া, জল খাওয়াইয়া, আবার তাজা করিয়া লইলেন। ইহার পর হইতে রথ আবার বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল। জয়দ্রথ যাইবেন কোথায়? ঐ তাঁহাকে দেখা যাইতেছে।

এমন সময় দুর্যোধন জয়দ্রথকে বাঁচাইবার জন্য অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। এবারে তাঁহার আর সাহসের সীমা নাই; তাঁহার গায়ে দ্রোণের বাঁধা সেই কবচ রহিয়াছে। বাস্তবিকই সে কবচের এমনি আশ্চর্য গুণ যে, অর্জুনের বাছা বাছা বাণগুলি ইহা হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। ইহাতে কৃষ্ণ আর অর্জুন বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তখন তিনি বলিলেন, "ঐ কবচসুদ্ধই উহাকে হারাইব।"

কিন্তু কি মুস্কিল! অর্জুন মন্ত্র পড়িয়া সাংঘাতিক অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করেন, আর অশ্বত্থামা অন্যদিক হইতে বাণ মারিয়া, তাহা মধ্য পথেই কাটিয়া ফেলেন; দুর্যোধনও সেই অবসরে অর্জুন এবং কৃষ্ণকে ক্ষত-বিক্ষত করেন। যাহা হউক, ইহার ঔষধ শীঘ্রই পড়িল। দুর্যোধনের সমস্ত শরীর কবচে ঢাকা, কিন্তু হাত দুখানি খালি। সেই দুখানি হাতেই অর্জুন বাণ মারিতে লাগিলেন। আর দুর্যোধন যাইবেন কোথায়? হাতে বাণ লাগাতে তাঁহার যুদ্ধ করাই অসম্ভব হইয়া উঠিল। সকলে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা না করিলে, তখনি মহারাজের প্রাণটিও যাইত।

তারপর জয়দ্রথকে ধরিবার জন্য অর্জুন অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলে কৌরবদের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। অর্জুনের গাণ্ডীবের টঙ্কার ও কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ভীষণ শব্দে কত লোক যে অজ্ঞান হইয়া গেল, তাহার সংখ্যা নাই। তখন ভূরিশ্রবা, শাল্ব, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা এই আটজনে মিলিয়া অর্জুনকে শরজালে আচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহাদের সকল বাণ কাটিয়া সমুচিত প্রতিফল দিতে অর্জুনের কোনো ক্লেশ হইল না।

এদিকে দ্রোণের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বিষম যুদ্ধ চলিতেছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাহারো জয়-পরাজয় বুঝা গেল না। বাণ, শক্তি, গদা, দুজনে কতই ছুঁড়িলেন; দুজনেরই সমান তেজ। কিন্তু ইহার পরেই দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের ঘোড়া আর ধনুক কাটিয়া, তিনটি ভয়ংকর বাণ মারিলে তাঁহার এমনি বিপদ হইল যে, তখন রথ ছাড়িয়া অস্ত্র ফেলিয়া হাত তুলিয়া দাঁড়ানো ভিন্ন ভিন্ন আর উপায় নাই। দ্রোণ দেখিলেন এই তাঁহার সুযোগ। অমনি তিনি, সিংহের ন্যায় যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে ছুটিলেন। 'হায় হায়! মহারাজা ধরা পড়িলেন!' বলিয়া চারিদিকে চিৎকার উঠিল। ভাগ্যে সহদেবের রথ কাছে পাইয়া, যুধিষ্ঠির তাহাতে উঠিতে পারিলেন, আর সহদেবের ঘোড়াগুলি দ্রোণের ঘোড়ার চেয়ে অনেক ভালো ছিল, নহিলে সেদিন সর্বনাশই হইত।

এদিকে রাক্ষস অলম্বুষ, খানিক পাণ্ডবদিগকে খুবই জ্বালাতন করিয়া, ভীমের তাড়ায় পলায়ন করে। তারপর সে অন্যত্র গিয়া আবার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করাতে, ঘটোৎকচের হাতে আছাড় খাইয়া চূর্ণ হয়। তারপর অনেকক্ষণ দ্রোণের সহিত পাণ্ডবদিগের তুমুল সংগ্রাম চলে।

এমন সময় দূর হইতে কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। গাণ্ডীবের শব্দ এত দূর পৌঁছায় নাই, কাজেই তাহা কেহ শুনিতে পাইল না। এদিকে কৌরবেরাও সিংহনাদ করিতেছে। কাজেই যুধিষ্ঠির ভাবিলেন, বুঝি অর্জুনের কোনো বিপদ ঘটিল। তাই তিনি সাত্যকিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি শীঘ্র অর্জুনের কাছে যাও।

সাত্যকি বলিলেন, "অর্জুন আমাকে আজ আপনার পাশ ছাড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, আমি কি করিয়া যাই? আপনি অর্জুনের জন্য চিন্তা করিবেন না। আপনাকে রক্ষা করাই আমাদের প্রথম কাজ।"

কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে অর্জুনের জন্য বড়ই ব্যস্ত দেখিয়া শেষে সাত্যকিকে যাইতে হইল। যুধিষ্ঠির ভীমকেও তাঁহার সঙ্গে পাঠাইতেছিলেন; কিন্তু সাত্যকি তাঁহাকে বলিলেন, "আমার মতে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করাই তোমার কর্তব্য।" কাজেই ভীম রহিয়া গেলেন।

সাত্যকি কৌরবদিগের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় দ্রোণ আসিয়া তাঁহাকে আটকাইলেন। দ্রোণ বলিলেন, "অর্জুন আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কাপুরুষের মতো পাশ কাটিয়া পলায়ন করিল। তুমি যুদ্ধ না করিলে আজ তোমাকে বধ করিব।" বুদ্ধিমান সাত্যকি অমনি বলিলেন, "গুরু যাহা করেন, শিষ্যও তাহাই করে। আমি অর্জুনের কাছে চলিলাম।"

সেদিন সাত্যকির বিক্রম কৌরবেরা ভালো করিয়াই জানিতে পারিল। দ্রোণের নিকট হইতে ভোজের নিকট; ভোজের সারথিকে কাটিয়া, কৃতবর্মাকে ঠেঙ্গাইয়া, জলসন্ধ ও মহামাত্রকে মারিয়া আবার দক্ষিণের দিকে, এইভাবে সাত্যকি চলিয়াছেন। এমন সময় আবার দ্রোণ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে দুর্মর্ষণ, দুঃসহ, বিকর্ণ, দুর্মুখ, দুঃশাসন, চিত্রসেন, দুর্যোধন প্রভৃতিও আসিয়া একসঙ্গে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে পরাজয় করে কাহার সাধ্য? দুর্যোধন পলায়ন করিলেন, কৃতবর্মা অজ্ঞান হইলেন। তারপর যুদ্ধ চলিল, কেবল দ্রোণ আর সাত্যকিতে। ভয়ংকর যুদ্ধের পর দ্রোণকে হার মানিতে হইল। তারপর সুদর্শন মরিল, কাম্বোজ, শক ও যবন—সৈন্যগণ পরাস্ত হইল, দুর্যোধন

আবার আসিয়া যথেষ্ট সাজা পাইলেন। বিকটাকার পার্বতীয় সৈন্যগণ, বিশাল পাথর হাতে যুদ্ধ করিতে আসিয়া, তাহারাও সাত্যকির বাণে খণ্ড খণ্ড হইল। তখন কৌরবেরা কে কোথায় পলায়ন করিবেন তাহাই ভাবিয়া অস্থির।

এমন সময় দ্রোণ দুঃশাসনকে সম্মুখে পাইয়া বলিলেন, "কি দুঃশাসন! এখন তোমার বীরত্ব কোথায় গেল? সকলে সাত্যকির ভয়ে পলাইতেছ, অর্জুনের হাতে পড়িলে কি করিবে! এই মুখেই কি পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিতে গিয়াছিলে?"

এই বলিয়া দ্রোণ পাণ্ডবদিগের সহিত আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলে বীরকেতু, সুধন্বা, চিত্রকেতু, চিত্রবর্মা ও চিত্ররথ নামক পাঞ্চাল রাজের পুত্রগণ দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন মনের দুঃখে রাগের ভরে দ্রোণকে আক্রমণ করাতে, কিছুকাল দুজনে যুদ্ধ চলিল। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সম্মুখে টিকিতে পারিলেন না।

এদিকে সাত্যকি ক্রমে দুঃশাসন ত্রিগর্ত প্রভৃতিকে পরাজয় করিয়া অর্জুনের দিকে চলিয়াছেন, আর দ্রোণ পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধার পর যোদ্ধাকে মারিয়া প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছেন। বৃহৎক্ষেত্র, ধৃষ্টকেতু, চেদিরাজের পুত্র, জরাসন্ধের পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রবর্মা প্রভৃতি কত লোকের দ্রোণের হাতে প্রাণ গেল! সেই পঁচাশি বৎসরের বুড়া রণস্থলে এমনি ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, যেন তিনি ষোল বৎসরের বালক।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এই সময়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা হইল যে, 'আমি অর্জুনের সন্ধানে সাত্যকিকে পাঠাইলাম, কিন্তু সাত্যকির সাহায্যের জন্য তো কাহাকেও পাঠাই নাই।'

অমনি তিনি ভীমকে সেই কার্যে পাঠাইয়া দিলেন। ভীম খানিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতে দ্রোণ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "অর্জুনকে ছাড়িয়াছি, কিন্তু তোমাকে ছাড়িব না।" ভীম বলিলেন, ঠাকুর! অর্জুনকে আপনি দয়া করিয়া ছাড়িয়াছেন বলিয়া তো আমার মনে হয় না। সে হয়তো ভদ্রতা করিয়া আপনার মান রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি তো ভালোমানুষ অর্জুন নহি, আমি ভীম! যুদ্ধ করিতে আসিলে গুরু বলিয়া মানিব না।" বলিতে বলিতেই ভীম এক বিশাল গদা ঘুরাইয়া দ্রোণকে ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন। বুড়া তখন 'বাপ!' বলিয়া রথ হইতে এক লাফ! ততক্ষণে ভীম তাঁহার রথ ঘোড়া সারথি প্রভৃতি একেবারে পুঁতিয়া ফেলিয়াছেন।

ইহাতে দুর্যোধনের ভ্রাতাগণ ভীমকে আক্রমণ করিলে, তিনি তাহাদের সাতজনকে বধ করিলেন। যাহাদিগকে তিনি সম্মুখে পাইলেন, তাহাদের অল্প লোকই বাঁচিয়া রহিল। এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, দ্রোণাচার্য পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধাদিগকে নিতান্ত অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। অমনি আর কথাবার্তা নাই; ভীম চক্ষু বুজিয়া দ্রোণের সেই বাণবৃষ্টির ভিতরেই তাঁহার রথের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তারপর সেই রথখানিসুদ্ধ—হেঁইয়োঃ হোঃ! —মার্ বুড়াকে ছুঁড়িয়া! কিন্তু বুড়ার হাড় কি অসম্ভব মজবুত! রথ গুঁড়া হইল, কিন্তু বুড়া মরিলেন না।

তারপর আর খানিক দূরে গিয়াই ভীম সাত্যকিকে দেখিতে পাইলেন। আরো খানিক দূরে গিয়া দেখিলেন, ঐ অর্জুন যুদ্ধ করিতেছেন! ওঃ! তখন যে ভীমের সিংহনাদ। সিংহনাদ শুনিয়া কৃষ্ণ আর অর্জুনও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এই সকল সিংহনাদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের

কানে পৌঁছাইলে তাঁহার যে খুবই আনন্দ হইল, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এ সকল সিংহনাদ কর্ণের সহ্য না হওয়ায়, তিনি আসিয়া ভীমের সহিত মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু খানিক পরেই ভীমের বাণে তাঁহার ধনুক, ঘোড়া আর সারথি কাটা যাওয়াতে তাঁহাকে গিয়া বৃষসেনের রথে আশ্রয় লইতে হইল।

কিন্তু কর্ণ ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি আবার আসিয়া ভীমকে বলিলেন, "কি হে পাণ্ডুপুত্র। তুমিও আবার যুদ্ধ করিতে জান নাকি! বড় যে পলাইতেছ?"

সুতরাং আবার তাঁহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবারেও কর্ণ অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া শেষে দেখিলেন যে, আবার তাঁহার ধনুক ঘোড়া সারথি সব কাটা গিয়াছে! তারপর ভীমের অস্ত্র বুকে বিঁধিয়া তাঁহার প্রাণ যায় যায়! সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি অন্য রথে উঠিয়া পলায়ন করিলেন।

তথাপি কর্ণের লজ্জা নাই, তিনি আবার আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করিলেন। এবারে ধনুক সারথি আর ঘোড়া কাটা গিয়া তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হইতেছে দেখিয়া, দুর্যোধন তাড়াতাড়ি দুর্জয়কে সাহায্য করিতে পাঠাইলেন। কিন্তু সে বেচারা ভালো করিয়া সাহায্য করিবার পূর্বেই মরিয়া গেল।

যাহা হউক, এবারে কর্ণকে আর পলাইতে হইল না; তাঁহার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সমেত এক নূতন রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। দুঃখের বিষয় এই যে ভীম সে রথেরও ঘোড়া আর সারথি সংহার করাতে, তাহাতে চড়িয়া কর্ণের যুদ্ধ করা হইল খুব কমই। এমন সময় দুর্মুখ কর্ণের সাহায্য করিতে আসিলেন। সাহায্য যাহা করিলেন তাহা একটু নূতনরকমের বটে, আর তিনি ইচ্ছা করিয়া যে সেরূপ করিয়াছিলেন, তাহাও অবশ্য কখনোই নহে, কিন্তু তাহাতেই কর্ণের প্রাণ রক্ষা হইল। দুর্মুখ আসিয়াই তো অমনি ভীমের হাতে প্রাণত্যাগপূর্বক, নিজের রথখানি খালি করিয়া দিলেন সে-রথের ঘোড়াগুলি ছিল বড়ই চমৎকার! সুতরাং কিঞ্চিৎ পরেই যখন ভীমের হাতে কর্ণেরও দুর্দশার একশেষ হইল, তখন ঐ ঘোড়াগুলির সাহায্যে তিনি সহজেই রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন।

তারপর ভীম দুর্যোধনের আর পাঁচটি ভাইকে বধ করিলে, কর্ণ আবার যুদ্ধ করিতে আসেন আর দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাতে জব্দও হন। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন তাঁহার সাতটি ভাইকে পাঠাইবামাত্র, তাহারাও ভীমের হাতে মারা যায়। তারপর আবার কর্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এবারেও ভীমের হাতে কর্ণের দুর্দশা দেখিয়া দুর্যোধন তাঁহার আর সাতটি ভাইকে বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র গিয়া উহাকে বাঁচাও!" হায়! কে কাহাকে বাঁচায়? সাতভাই ভালো করিয়া যুদ্ধ করিতে না করিতেই মরিয়া গেল। তারপর কর্ণের মাথায় কি যে গোল লাগিল তিনি পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া কৌরবদিগকেই মারিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু ইহার পর হইতেই যেন কর্ণের তেজ আবার ফিরিয়া আসিল। তখন দেখা গেল যে, অনেকক্ষণ দুজনে সমানভাবে যুদ্ধ চলার পর, কর্ণ ক্রমেই ভীমকে কাবু করিয়া আনিতেছেন। ক্রমে ভীমের তূণ, ধনুর গুণ, ঘোড়ার রাশ, সবই কাটা গেল। সারথিটি বাণ খাইয়া অন্য রথে আশ্রয় লইল। ধবজ, পতাকা, কিছুই আস্ত রহিল না। একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলেন, তাহাও কাটা গেল। শেষে রহিল খড়্গ ও চর্ম। চর্মখানি কর্ণ কাটিয়া ফেলিলে।

খড়্গাটি ভীম ছুঁড়িয়া মারিলে, তাহাতে কর্ণের ধনুক কাটিয়া গেল। কর্ণ তখনি আর এক ধনুক লইয়া, ভীমের উপরে বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তখন ভীম কর্ণকে মারিবার জন্য লাফাইয়া তাঁহার উপর পড়িতে গেলেন। কিন্তু কর্ণ হঠাৎ গুঁড়ি মারিয়া রথের তলার সঙ্গে মিশিয়া পড়ায়, তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। তারপর ভীমের হাত খালি দেখিয়া, কর্ণ তাঁহাকে তাড়া করাতে, তিনি এমনি বিপদে পড়িলেন যে, বিপদ যাহাকে বলে! কতকগুলি মরা হাতি সেখানে পড়িয়াছিল; ভীম আর উপায় না দেখিয়া তাহারই পিছনে গিয়া লুকাইলেন। কিন্তু হাতি খণ্ড খণ্ড করিতে কর্ণের মতো বীরের আর কতক্ষণ লাগে? তাহাতে ভীম রথের চাকা হাতির মাথা প্রভৃতি কর্ণকে ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের বাণের কাছে তাহাতেই বা কি ফল হইবে?

তখন ভীম বজ্রমুষ্টি উঠাইয়া এক কীলে কর্ণকে বধ করিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু এই মনে করিয়া ক্ষান্ত হইলেন, 'আমি কর্ণকে মারিলে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইবে।' কর্ণও ইচ্ছা করিলে তখন ভীমকে মারিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারও মনে হইল যে, কুন্তীর নিকটে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ইহাদিগকে মারিবেন না। তাই তিনি ভীমকে ধনুক দিয়া একটা খোঁচা মাত্র মারিলেন। ভীমও তৎক্ষণাৎ ধনুক কাড়িয়া লইয়া, সাঁই শব্দে এক ঘা লাগাইতে ছাড়িলেন না।

তখন কর্ণ রাগে চোখ লাল করিয়া বলিলেন, "মূর্খ! পেটুক! কাপুরুষ! তুই কেন আবার যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস? তুই তো যুদ্ধের 'য'ও জানিস না! যা! পেট ভরিয়া খা গিয়া। আমার মতো লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা তোর কাজ নহে।"

তাহাতে ভীম বলিলেন, "ছোটলোক! এতবার আমার সঙ্গে হারিয়াছিস তবুও আবার বড়াই করিস! হারজিত তো ইন্দ্রেরও হয়। আয় না একবার মল্লযুদ্ধ করি; দেখি, তোকে কীচক বধ করিতে পারি কিনা।"

ভীমের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে কর্ণের সাহস হইল না। কিন্তু তিনি এই ঘটনা লইয়া অর্জুনের সামনেই খুব বড়াই করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অর্জুনের কয়েকটি বাণ আসিয়া গায়ে পড়িলে আর তাঁহার বড়াই রহিল না। তখন তাঁহার হঠাৎ মনে হইল যে, বড়াই করার চেয়ে পলায়ন করাতে বেশি কাজ দেয়।

এই সময়ে সাত্যকি অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া অর্জুনের মনে সুখ হইল না। তিনি সাত্যকিকে যুধিষ্ঠিরের কাছে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া আসাতে না জানি মহারাজের কি বিপদই হইয়াছে। বিশেষত এতক্ষণ যুদ্ধ করিয়া সাত্যকির অস্ত্র প্রায় শেষ হইয়া যাওয়ায়, এখন তাঁহারও খুবই বিপদ। এদিকে ভূরিশ্রবা রাশি রাশি অস্ত্রসমেত সুন্দর রথে চড়িয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার সম্বল সাত্যকির মোটেই নাই। কাজেই অর্জুনের রাগ হইবার কথা। এখন সাত্যকিকেই বা তিনি কি করিয়া ফেলিয়া যান, আর যে সামান্য বেলাটুকু অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে জয়দ্রথকে মারিতে হইবে, তাহারই বা কি করেন?

সাত্যকি একে অতিশয় ক্লান্ত, তাহাতে আবার অস্ত্রহীন, কাজেই ভূরিশ্রবা তাঁহাকে যেন নিতান্তই বাগে পাইলেন। তথাপি সাত্যকির যতক্ষণ কিছুমাত্র অস্ত্র অবশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ

তিনি কম যুদ্ধ করেন নাই। ভূরিশ্রবা যেমন তাঁহার ধনুক আর ঘোড়া কাটিলেন, তিনিও তেমন ভূরিশ্রবার ধনুক আর ঘোড়া কাটিতে ছাড়িলেন না। তারপর রথ ছাড়িয়া দুজনের খড়্গযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু ক্লান্ত শরীরে আর কত করা যায়? সাত্যকি খানিক খড়্গযুদ্ধ করিয়াই কাবু হইয়া পড়িলেন।

এমন সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "ঐ দেখ! সাত্যকিকে দুর্বল পাইয়া ভূরিশ্রবা তাহাকে বধ করিতেছে? ইহা অতি অন্যায়। সাত্যকি তোমার শিষ্য, আর তোমার জন্যই আসিয়া বিপদে পড়িল। উহাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য।"

এদিকে ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে খড়্গাঘাতে ফেলিয়া দিয়া, তাঁহার চুলে ধরিয়া, বুকে লাথি মারিয়া তাঁহার মাথা কাটিতে উদ্যত;সাত্যকি প্রাণপণে মাথা নাড়িয়া তাহার আঘাত এড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় অর্জুনের বাণ উল্কার মতো আসিয়া ভূরিশ্রবার ডানহাত কাটিয়া ফেলিল।

তখন ভূরিশ্রবা অর্জুনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "অর্জুন, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, তুমি কেন আমার হাত কাটিলে?"

অর্জুন বলিলেন, "আমার শিষ্য আত্মীয় ও বন্ধুকে আমার সম্মুখে বধ করিতে দেখিয়াও নীরব থাকিলে মহাপাপ হইত, তাই কাটিলাম।"

তখন ভূরিশ্রবা অনাহারে প্রাণত্যাগের জন্য নিজ হাতে শরশয্যা প্রস্তুত করিয়া ইষ্ট দেবতার ধ্যানে বসিলে কৌরবেরা চারিদিক হইতে অর্জুনের নিন্দা আরম্ভ করিল।

তাহাতে অর্জুন আবার ভূরিশ্রবাকে বলিলেন, "হে ভূরিশ্রবা! আমার পক্ষের লোককে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা আমার কর্তব্য কাজ, তাহাই আমি করিয়াছি! কিন্তু বল দেখি, তোমরা যে বালক অভিমন্যুকে মারিয়াছিলে, তাহা তোমাদের কিরূপ কাজ হইয়াছিল?"

ভূরিশ্রবা নতশিরে অর্জুনের কথা মানিয়া লইলেন, আর বাঁ হাতে নিজের কাটা ডান হাতখানি অর্জুনের সামনে ধরিয়া একথাও জানাইলেন যে, ও হাত কাটিয়া ফেলা উচিতই হইয়াছে।

এমন সময় সাত্যকি অসহ্য রাগের ভরে খড়্গ লইয়া ভূরিশ্রবার দিকে ছুটিয়া চলিলেন। সকলে চিৎকার করিয়া উঠিল, "আহা! আহা! কর কি?" কিন্তু সাত্যকি কাহারো নিষেধ না শুনিয়া ভূরিশ্রবার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

আর বিলম্ব করা চলে না; জয়দ্রথ বধের সময় যায়। তাই অর্জুন শীঘ্র সে কাজ শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। দুর্যোধন, কর্ণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা আর দুঃশাসন ইঁহারাও তখন জয়দ্রথকে পশ্চাতে রাখিয়া মহাতেজে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন।

অর্জুন তাঁহাদের প্রত্যেকের বাণ দুই তিন খণ্ড করিয়া কাটিতেছেন, তাঁহারাও বারবার অর্জুনকে বাণে আচ্ছন্ন করিতেছেন। জয়দ্রথও তখন চুপ করিয়া নাই। কিন্তু অর্জুনকে বারণ করে কাহার সাধ্য? তিনি ক্রমে সকলকে হারাইয়া চৌষট্টি বাণে জয়দ্রথকে অস্থির করিলেন।

কিন্তু তখনো ছয় মহাবীরের মাঝখানে জয়দ্রথ লুকাইয়া রহিলেন। ইঁহাদিগকে পরাজয় না করিয়া তাঁহাকে মারা অসম্ভব। এদিকে সূর্য অস্ত যাইতে আর অল্পই বাকি। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "আমি মায়াবলে সূর্যকে ঢাকিতেছি, তাহা হইলে জয়দ্রথ ভাবিবে, সূর্য অস্ত গেল, এখন তোমাকে মরিতে হইবে। সুতরাং তখন আর সে লুকাইবার চেষ্টা করিবে

না। সেই অবসরে কিন্তু তাহাকে বধ করা চাই।"

এই বলিয়া কৃষ্ণ মায়াবলে সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলিলে, অর্জুনের মৃত্যুকাল উপস্থিত মনে করিয়া কৌরবদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। তখন জয়দ্রথ গলা উঁচু করিয়া দেখিতে লাগিলেন, সূর্য যথার্থই অস্ত গিয়াছে কিনা।

অমনি কৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জুন, এই বেলা! ঐ দেখ জয়দ্রথ নিশ্চিন্তে গলা উঁচু করিয়া সূর্য দেখিতেছে। এই বেলা উহার মাথা কাটিয়া ফেল।"

কিন্তু জয়দ্রথের মাথা কাটা সহজ কাজ নহে। উহার জন্মকালে দেবতারা বলিয়াছিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো মহাবীর ইহার মাথা কাটিবেন।" তখন উঁহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্র বলেন, "যে ব্যক্তি আমার পুত্রের মাথা ভূমিতে ফেলিবে, তাহার মাথাও তখনই শতখণ্ড হইবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধক্ষত্র বনে গিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। এখনো তিনি সমন্তপঞ্চক নামক তীর্থে তপস্যা করিতেছেন।

এ সকল কথা মনে করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "সাবধান অর্জুন! ইহার মাথাটা তোমার হাতে মাটিতে পড়িলে কিন্তু সর্বনাশ। মাথাটাকে সেই সমন্তপঞ্চক তীর্থে বুড়া বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে নিয়া ফেলিতে হইবে।"

তখন অর্জুন এক বাণেই জয়দ্রথের মাথা কাটিয়া, তাহা মাটিতে পড়িবার পূর্বেই তিনি আর কয়েক বাণে সেটাকে উড়াইয়া সেই সমন্তপঞ্চক তীর্থে, জয়দ্রথের পিতার কোলে নিয়া ফেলিলেন। সেখান হইতে উহা মাটিতে পড়িবামাত্র বৃদ্ধক্ষত্রের মাথা কাটিয়া শতখণ্ড হইয়া গেল।

তারপর কৃষ্ণ অন্ধকার দূর করিয়া দিলে দেখা গেল যে, তখনো সূর্য একেবারে ডুবিয়া যায় নাই।

জয়দ্রথের মৃত্যুতে কৃপ আর অশ্বত্থামা রাগিয়া অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অর্জুনের বাণ তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না।

সেদিন সন্ধ্যার পরেও আর কেহ শিবিরে যায় নাই। সমস্ত রাত্রি মশাল জ্বালিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। সে রাত্রিতে দ্রোণ, সাত্যকি, অশ্বত্থামা, ভীম, ঘটোৎকচ প্রভৃতি অতি অদ্ভুত বীরত্ব দেখান, আর অর্জুনের হাতে অসংখ্য লোক মরে। সে সময়ে তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল যে, কর্ণের সহিত যুদ্ধ করেন; কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলে তাহা হয় নাই।

কর্ণ ঘোরতর যুদ্ধের পর সাত্যকির হাতে পরাজিত হইলেন। তারপর অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা প্রভৃতি অনেকেই সাত্যকিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পরাজয় করিতে কাহারো শক্তি হইল না।

এদিকে দুর্যোধন যুদ্ধে কিছু করিতে না পারিয়া শেষে দ্রোণকে গালি দিতে আরম্ভ করায় দ্রোণ নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, "দুর্যোধন! কেন বৃথা আমাকে কষ্ট দিতেছ? আমি তো সর্বদাই বলিতেছি যে, অর্জুনকে জয় করা অসম্ভব। পাপ তো কম কর নাই। এখন সে পাপের ফল ভোগ কর।" এই বলিয়া তিনি বাণে বাণে পাণ্ডবদিগকে অস্থির করিয়া তুলিলেন।

দুর্যোধনও তখন কম তেজ দেখান নাই! হাজার হাজার লোক তাঁহার হাতে প্রাণত্যাগ করে। তারপর যুধিষ্ঠির আসিয়া ধনুক কাটিয়া দশ বাণেই তাঁহাকে কাতর করিয়া দেন। যুধিষ্ঠির আবার বাণ মারিলে আর দুর্যোধন যুদ্ধ করিতে পারেন নাই।

দ্রোণ আর ভীমের কথা কি বলিব? দ্রোণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কেকয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ ও শিবিকে বিনাশ করিলেন। আর ভীম কীল মারিয়া কলিঙ্গরাজের পুত্র ধ্রুব, আর লাথির চোটে দুর্মদ এবং দুষ্কর্ণকে সংহার করিলেন।

ঘটোৎকচ আর অশ্বত্থামার সে সময়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বড়ই অদ্ভুত। রাত্রিতে রাক্ষসদের বল বাড়ে, আর রাক্ষসেরা নানারকম মায়াও জানে, তাহার উপর আবার ঘটোৎকচ অসাধারণ বীর। সুতরাং অশ্বত্থামা যে নিতান্ত সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এমন সঙ্কটেও তিনি কিছুমাত্র কাতর হন নাই। ঘটোৎকচের সকল মায়া তিনি তিনবার চূর্ণ করিয়া দিলেন।

ঐ সময়ে ঘটোৎকচের পুত্র অঞ্জনপর্বা অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা গেলে, ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার উপরে ঘোরতর বাণবৃষ্টি আরম্ভ করে। সে সকল বাণ অশ্বত্থামা কাটিয়া ফেলিলে সে এমনি অদ্ভুত এক পাহাড় আনিয়া উপস্থিত করিল যে, কি বলিব! সে পাহাড়ের ঝর্ণা সকল হইতে ক্রমাগত শেল, শূল, মুষল, মুদগর প্রভৃতি অস্ত্র অশ্বত্থামার উপর পড়িতে লাগিল।

পাহাড় অশ্বত্থামার বাণে চূর্ণ হইলে, ঘটোৎকচ মেঘের রূপ ধরিয়া ক্রমাগত অশ্বত্থামার উপরে প্রস্তরবৃষ্টি আরম্ভ করিল। কিন্তু অশ্বত্থামার 'বায়ব্য' অস্ত্রে সে সকল পাথরসুদ্ধ মেঘ কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার ঠিক নাই।

তখনি আবার কোথা হইতে বিকটাকার রাক্ষসগণ অশ্বত্থামাকে গিলিতে আসিল। কিন্তু অশ্বত্থামা তাহাতেও কাতর হইলেন না। রাক্ষসেরা দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাণে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

ইহা দেখিয়া ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে একটা বজ্র ছুঁড়িয়া মারে। অশ্বত্থামা সেই বজ্র লুফিয়া লইয়া উল্টিয়া ঘটোৎকচকেই আবার তাহা ছুঁড়িয়া মারিলে তাহাতে ঘটোৎকচের ঘোড়া, সারথি আর ধবজ কাটিয়া গেল। এই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচকে সাহায্য করিতেছিলেন, তথাপি অশ্বত্থামার বাণে সে এতই কাতর হইয়া পড়িল যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহার মৃত্যু হইল ভাবিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলাইয়া গেলেন।

এদিকে সোমদত্ত ও বাহ্লীকের সহিত ভীম আর সাত্যকির যুদ্ধ চলিয়াছে। সোমদত্তকে ভীম পরিঘের আঘাতে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলে তাঁহার পিতা বাহ্লীক ভীমকে আক্রমণ করেন। বাহ্লীকের শক্তির ঘায়ে ভীম অচেতন হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুহূর্ত পরেই আবার উঠিয়া তিনি এমন এক গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহাতে বাহ্লীকের মাথা চূর্ণ হইয়া গেল।

তারপর ভীম নাগদত্ত, দৃঢ়রথ, বীরবাহু প্রভৃতি দুর্যোধনের নয়টি ভাইকে মারিয়া কর্ণের ভ্রাতা বৃকরথ শকুনির ভাই শতচন্দ্র ও ধৃতরাষ্ট্রের আর সাতটি শ্যালককে সংহার করিলেন।

আর এক স্থানে যুধিষ্ঠিরকে অনেক লোক মারিতে দেখিয়া, দ্রোণ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠির তাঁহার বায়ব্য, বারুণ, যাম্য, আগ্নেয়, ত্বাষ্ট্র, সাবিত্রী প্রভৃতি সকল অস্ত্র কাটিয়া শেষ করিলেন। দ্রোণের ঐন্দ্র ও প্রাজাপত্য অস্ত্র যুধিষ্ঠিরের মাহেন্দ্র অস্ত্রে কাটা গেল। তখন দ্রোণ রোষভরে ব্রহ্মাস্ত্র হাতে করিলে, যোদ্ধাদের আতঙ্কের সীমাই রহিল না। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহাতে কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া, নিজের ব্রহ্মাস্ত্রে দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র বারণ করিলেন। কাজেই দ্রোণের আর

যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করা হইল না।

এই সময় কর্ণ পাণ্ডব সৈন্যদিগকে বড়ই অস্থির করিয়া তোলেন। তাহারা তাঁহার বাণের জ্বালায় হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন করিতে থাকে। তখন অর্জুন না থাকিলে কি হইত, কে জানে? অর্জুন আসিয়া কর্ণের ধনুক, ঘোড়া আর সারথি কাটিয়া তাঁহাকে বাণে বাণে সজারুর প্রায় করিয়া দেন। কৃপের রথ সেখানে ছিল তাই রক্ষা, নহিলে সে যাত্রা কর্ণের প্রাণ বাঁচানোই ভার হইত!

ইহার পর ভীষণ যুদ্ধে সাত্যকির হাতে সোমদত্তের মৃত্যু হয়। যুধিষ্ঠিরও তখন দ্রোণের সহিত খুব যুদ্ধ করিতেছিলেন; এমনকি, মুহূর্তেকের জন্য তাঁহাকে অজ্ঞান করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে বারণ করিয়া বলিলেন, "উনি সর্বদা আপনাকে ধরিয়া নিবার চেষ্টায় আছেন, উঁহার সহিত আপনার যুদ্ধ না করাই ভালো।"

ইহার কিছু পরে কৃতবর্মার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া যুধিষ্ঠির অজ্ঞান হইয়া যান; অন্যেরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচায়।

তারপর আবার অশ্বত্থামা এবং ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এবারেও জয় অশ্বত্থামারই হইল। দুর্যোধন এই সময়ে ভীমকে আক্রমণ করিয়া ক্রমাগত পাঁচবার তাঁহার ধনুক কাটিলেন। তাহাতে ভীম ধনুক ছাড়িয়া শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে তাহাও দুর্যোধন কাটিতে ছাড়িলেন না। তখন ভীম দুর্যোধনের রথের উপরে এমনি বিশাল এক গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে তাহাতে রথ, ঘোড়া, সারথি সব চুরমার হইয়া গেল। দুর্যোধন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নন্দকের রথে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু ভীমের মনে হইল বুঝি রথ আর ঘোড়ার সহিত তিনিও চূর্ণ হইয়াছেন।

এই সময়ে সহদেবের সহিত কর্ণের যুদ্ধ হয়; আর সহদেব দেখিতে দেখিতে তাহাতে হারিয়া যান। তখন কর্ণ ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে বধ করিতে পারিতেন, কিন্তু কুন্তীর কথা ভাবিয়া ক্ষান্ত রহিলেন।

শকুনি কিন্তু নকুলের হাতে খুবই সাজা পাইলেন। শিখণ্ডীরও কৃপের হাতে প্রায় সেইরূপ দশা হইল। তারপর দ্রোণ আর ধৃষ্টদ্যুম্নে, কর্ণ আর সাত্যকিতে; এইরূপ করিয়া কত যে যুদ্ধ হইল, তাহার শেষ নাই। এদিকে, এ সকল যুদ্ধের ভিতরেই, অর্জুনের গাণ্ডীবের ভয়ংকর শব্দ ক্রমাগত দূর হইতে শোনা যাইতেছিল। তিনি যে তখন কত লোক মারিতেছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহাকে আটকাইতে আসিয়া শকুনি আর তাঁহার পুত্র উলুক বড়ই লজ্জা পাইলেন।

ইহাতে দুর্যোধনের নিকট বকুনি খাইয়া, দ্রোণ আর কর্ণ মহারোষে পাণ্ডব সৈন্য মারিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বেচারারা দ্রোণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। যতক্ষণ না অর্জুন আসিয়া দ্রোণ আর কর্ণকে আক্রমণ করিলেন, ততক্ষণ আর তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে সাহসই পায় নাই। খানিক পরে আবার কর্ণ এমনি ভয়ংকর হইয়া উঠিলেন যে, সৈন্যদের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের ভাবনা হইল, 'এখন যুদ্ধ করি, না পলায়ন করি।'

অর্জুন আর সহ্য করিতে না পারিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, "শীঘ্র কর্ণের নিকট চলুন, আজ হয় আমি উঁহাকে বধ করিব, না হয় ঐ আমাকে বধ করিবে।"

কিন্তু কৃষ্ণ তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, "তোমাকে মারিবার জন্য কর্ণ ইন্দ্রের সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি রাখিয়া দিয়াছে, অতএব এখন তোমার তাহার কাছে যাওয়া উচিত নহে। ঘটোৎকচকে পাঠাও।"

তখন অর্জুনের কথায় ঘটোৎকচ গিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এদিকে সেই জটাসুরের পুত্র অলম্বল নামক রাক্ষস আসিয়া দুর্যোধনকে বলিল, "হেই মোহার্‌রাজ্জ! মোকে বোল্‌না, মুহি পাণ্ডোধের্‌র্‌কে মারকে খাই। ই লোক মোর বাপ্পুকে মারিলেক্!"

দুর্যোধনের ইহাতে কোনো আপত্তি হওয়ার কথা ছিল না। সুতরাং তখন অলম্বল আর ঘটোৎকচে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই রাক্ষস মিলিয়া কি অদ্ভুত যুদ্ধই করিয়াছিল! অস্ত্র দিয়া, নখ দিয়া, দাঁত দিয়া, কীল, লাথি, চড় মারিয়া সাদাসিধা যুদ্ধ তো প্রথমে তাহারা করিলই, শেষে আরম্ভ হইল মায়াযুদ্ধ একজন যেইমাত্র আগুন হইল, অমনি আর একজন হইল জল! তখন এ হইল তক্ষক, অমনি ও হইল গরুড়! এ হইল মেঘ, ও হইল ঝড়; মেঘ হইল পর্বত, ঝড় হইল বজ্র। পর্বত হইল হাতি, বজ্র হইল বাঘ! হাতি গেল সূর্য হইয়া বাঘকে পোড়াইতে, অমনি বাঘ আসিল রাহু হইয়া সূর্যকে গিলিতে!

এইরূপে অসম্ভব অদ্ভুত যুদ্ধের পর ঘটোৎকচ অলম্বলের মাথা কাটিয়া তারপর কর্ণকে আক্রমণ করিল। দুইজনেই বীর, কাহারো তেজ কম নহে। কত বাণ ঘটোৎকচ কর্ণকে মারিল, কত বাণ কর্ণ ঘটোৎকচকে মারিলেন। দুজনের কাঁসার কবচ ছিঁড়িয়া গেল। দুজনের শরীরই রক্তে লাল হইল। শেষে কর্ণ ঘটোৎকচের ঘোড়া মারিয়া আর রথ ভাঙ্গিয়া দিলে, সে মায়া দ্বারা এমনি বিকট চেহারা করিল যে কি বলিব! কর্ণ বাণ মারেন, আর সে হাঁ করিয়া তাহা গিলে। দেখিতে দেখিতে সে বুড়া আঙ্গুলটির মতন ছোট হইয়া যায়, আবার তখনি বিশাল পর্বতের বেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে তাহার একশতটা মাথা হইয়া গেল। তারপর হঠাৎ আর সে নাই, সে পাতালে ঢুকিয়া গিয়াছে। আবার মুহূর্তেকের ভিতরেই, সে পাহাড় সাজিয়া শূন্যমার্গে আকাশে আসিয়া উপস্থিত। সেই পাহাড় হইতে কত শেল, কত শূল, কত গদা যে কর্ণের মাথায় পড়িল, তাহার অন্তই নাই। তারপর আবার অসংখ্য বিকট রাক্ষস কোথা হইতে আনিয়া উপস্থিত করিল! এইরূপে কত মায়া যে সে দেখাইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, কিন্তু কর্ণ কিছুতেই কাতর হইলেন না।

ইহার মধ্যে অলায়ুধ নামক একটা ভয়ংকর রাক্ষস আসিয়া ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিল। তখন ভীম ঘটোৎকচের সাহায্য করিতে আসিলে, অলায়ুধের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হইল। অলায়ুধ সেই বকের ভাই, কাজেই ভীমের উপর তাহার বড়ই রাগ। আর সে রাগের উপযুক্ত বলও তাহার ছিল। সুতরাং সে ভীমকে সহজে ছাড়িল না। এই সময়ে ঘটোৎকচ কর্ণকে ছাড়িয়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ না করিলে, হয়তো সে ভীমকে পরাজয়ই করিত।

ঘটোৎকচ অনেক কষ্টে অলায়ুধকে বধ করিয়া, আবার কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল। খানিক যুদ্ধের পর সে কর্ণের ঘোড়া আর সারথিকে মারিয়া হঠাৎ আর সেখানে নাই। তারপর আবার আসিয়া সে কি ভয়ংকর মায়াযুদ্ধই যে আরম্ভ করিল, তাহা কি বলিব! তখন অগ্নিবর্ণ মেঘসকল আকাশ হইতে ক্রমাগত বজ্র, উল্কা, বাণ, শক্তি, প্রাস, মুষল, পরশু, খড়্গ, পট্টিশ, তোমর, পরিঘ, গদা, শূল, শতঘ্নী, পাথর প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিল। কর্ণের আর তখন এমন শক্তি হইল না যে, তাহা বারণ করেন। ইহার উপরে আবার শত শত রাক্ষস

আসিয়া, কৌরবদিগকে সংহার করিতে লাগিল। কর্ণ তথাপি যথাসাধ্য বাণবৃষ্টি করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছুই হইল না। এদিকে ঘটোৎকচ শতঘ্নী মারিয়া তাঁহার ঘোড়া কয়টিকে বধ করিয়াছে।

এমন সময় কৌরবেরা সকলে মিলিয়া কর্ণকে কহিলেন, "আর কি দেখিতেছ? শীঘ্র ইন্দ্রের সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি দিয়া এই রাক্ষসকে বধ কর।"

কর্ণ দেখিলেন যে, রাক্ষসের হাতে প্রাণ যায় যায়; কাজেই তখন তিনি নিরুপায় হইয়া, সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি হাতে লইলেন।

সে শক্তি দেখিবামাত্র ঘটোৎকচ নিজের দেহকে বিশাল পর্বতের ন্যায় বড় করিয়া, উধর্বশ্বাসে পলাইতে লাগিল। জীব-জন্তুরা চিৎকার করিয়া উঠিল, ঝড় বহিল, বজ্রপাত আরম্ভ হইল; আর সেই মহাশক্তি, কর্ণের হাত হইতে ছুটিয়া গিয়া ঘটোৎকচের বুক ভেদ করত, উধর্বমুখে প্রস্থান করিল।

ঘটোৎকচ পড়িবার সময়, এক অক্ষৌহিণী কৌরব সৈন্য তাহার সেই বিশাল শরীরের চাপে মারা গেল। তাহার মৃত্যুতে পাণ্ডবদের কিরূপ দুঃখ হইল, বুঝিতেই পার। কিন্তু কৃষ্ণ ইহার মধ্যে সিংহনাদপূর্বক অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া, সেই রথের উপরেই নাচিতে লাগিলেন।

ইহাতে অর্জুন ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন দুঃখের সময় কিজন্য আপনি এত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন?"

কৃষ্ণ বলিলেন, "আনন্দ করিতেছি এইজন্য যে, কর্ণ সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর মারাতে, তোমার বিপদ কাটিয়া গেল। ঘটোৎকচকে না মারিলে ঐ শক্তি দিয়া সে তোমাকে বধ করিত। এখন উহা তাহার হাত হইতে চলিয়া গেল, এরপর তুমি অনায়াসেই তাহাকে মারিতে পারিবে।"

কিন্তু ঘটোৎকচের গুণের কথা মনে করিয়া কেহই স্থির থাকিতে পারিল না। জন্মাবধি সে এক মুহূর্তও নিজের সুখের দিকে না চাহিয়া, পাণ্ডবদিগের কত সেবা করিয়াছে, যুধিষ্ঠির সে সকলের কথা বলিতে বলিতে, রাগে এবং দুঃখে অস্থির হইয়া কর্ণকে বধ করিতে চলিলেন। ভীম তো তখন হইতে কৌরবদিগকে এক ধার হইতে মারিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এ পর্যন্ত ক্ষান্ত হন নাই।

এমন সময় অর্জুন সকলকে বলিলেন, "রাত্রি অনেক হইয়াছে, আর তোমরাও অন্ধকারে যুদ্ধ করিয়া নিতান্তই ক্লান্ত হইয়াছ। সুতরাং এই বেলা একটু বিশ্রাম করিয়া লও, চন্দ্র উঠিলে আবার যুদ্ধ করা যাইবে।" অর্জুনের কথায় সকলে সন্তুষ্ট হইয়া, যিনি যেমনভাবে ছিলেন, সেইভাবেই, কেহ ঘোড়ায়, কেহ রথে, কেহ হাতিতে, কেহ সেই রণস্থলের কাদার উপরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। অস্ত্রশস্ত্র যোদ্ধাদিগের হাতেই রহিল।

শেষ রাত্রিতে চাঁদ উঠিলে, আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভোরবেলায় দ্রুপদ, এবং তিনটি পৌত্র সহ বিরাট, দ্রোণের হাতে মারা গেলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন শোকে অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আজ যদি আমি দ্রোণকে বধ না করি, তবে যেন আমার স্বর্গলাভ না হয়।"

এই বলিয়া তিনি ভীমের সহিত দ্রোণ-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। তখনকার যুদ্ধ কি ঘোরতরই হইয়াছিল! দুর্যোধন ও দুঃশাসন নকুল ও সহদেবের সহিত, কর্ণ ভীমের সহিত, দ্রোণ অর্জুনের সহিত, এমনই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, সকলে তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল!

দ্রোণ আর অর্জুনের যুদ্ধ কি আশ্চর্য; তাঁহাদের হাতেরই বা কি অদ্ভুত ক্ষমতা, রথেরই বা কি বিচিত্র গতি, আর অস্ত্রেরই বা কি চমৎকার গুণ। কত বড়-বড় অস্ত্র যে দ্রোণ অর্জুনকে মারিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। অর্জুন তাহা সকলই কাটিয়া ফেলিলেন। যতই তিনি সে সব অস্ত্র কাটেন, দ্রোণ ততই আহ্লাদিত হইয়া ভাবেন যে, 'আমি যত পরিশ্রম করিয়া উহাকে শিখাইয়াছিলাম, তাহা সার্থক হইয়াছে।'

সেদিন অনেকের সহিত অনেকের যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু দ্রোণ যেমন তেজের সহিত পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরা তেমন করিয়া কৌরব সৈন্য মারিতে পারেন নাই। দ্রোণের পরাক্রম দেখিয়া তাঁহাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

এমন সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "অর্জুন! দ্রোণের হাতে অস্ত্র থাকিতে দেবতারাও উহাকে মারিতে পারেন না। অতএব যাহাতে উনি অস্ত্র ছাড়েন, তাহার উপায় করিতে হইবে। কেহ গিয়া উহার কাছে বলুক যে, 'অশ্বত্থামা মরিয়া গিয়াছে'; তাহা হইলে উনি অস্ত্র ছাড়িয়া দিবেন।"

অর্জুন এমন কাজ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কিন্তু অন্য যোদ্ধারা ইহাতে মত দিলেন, এবং অনেক কষ্টে যুধিষ্ঠিরেরও মত করানো হইল।

তখন ভীম কি করিলেন শুন। পাণ্ডবপক্ষের ইন্দ্রবর্মার একটা হাতি ছিল, তাহার নাম 'অশ্বত্থামা'। ভীম গদাঘাতে সেই হাতিটাকে মারিয়া, লজ্জিতভাবে দ্রোণের নিকট আসিয়া চিৎকারপূর্বক বলিতে লাগিলেন, "অশ্বত্থামা মরিয়া গিয়াছে! অশ্বত্থামা মরিয়া গিয়াছে!"

এ কথায় দ্রোণ প্রথমে বড়ই কাতর হইলেন; কিন্তু তারপর মনে করিলেন যে 'অশ্বত্থামা অমর, সে কি মরিয়া যাইবে? তারপর খানিক যুদ্ধ করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুধিষ্ঠির! অশ্বত্থামা মরিয়াছে এ কথা কি সত্য?"

দ্রোণ জানেন যে, যুধিষ্ঠির কখনোই মিথ্যা কথা কহেন না, কাজেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু হায়! কৃষ্ণ যে ইহার মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে কি শিখাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনি জানেন না। কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছেন, "মহারাজ! আপনি এই মিথ্যা কথাটুকু না বলিলে, আমরা সকলে আজ দ্রোণের হাতে মারা যাইব। সুতরাং এইটুকু মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

ইহার উপর আবার ভীম সেই অশ্বত্থামা নামক হাতিটাকে মারিয়া অশ্বত্থামা মরিয়াছে একথা বলার সুবিধাও করিয়া দিয়াছেন। কাজেই যুধিষ্ঠিরের আর তাহা বলিতে তত আপত্তি নাই। তবে কথা এই যে, দ্রোণ তো আর হাতির কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, তিনি তাঁহার পুত্রের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সুতরাং কেবল 'অশ্বত্থামা মরিয়াছে', এ কথা তাঁহাকে বলিলে মিথ্যা কথাই বলা হয় বৈকি!

যাহা হউক, যুধিষ্ঠিরের চেষ্টা, যাহাতে দুই দিকই রক্ষা হয়। জয়ও লাভ করিতে হইবে, মিথ্যাও বলা হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি দ্রোণকে বলিলেন, "অশ্বত্থামা মরিয়াছে.....হাতি।"

'অশ্বত্থামা মরিয়াছে' এই কথাগুলি বলিলেন জোরে, দ্রোণ তাহাই শুনিতে পাইলেন। 'হাতি' কথাটি বলিলেন অতি মৃদু স্বরে; দ্রোণ তাহা শুনিতে পাইলেন না।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রথ কখনো মাটি ছুঁইত না, সর্বদাই চারি আঙ্গুল উচ্চে থাকিত। কিন্তু তিনি মিথ্যা কথা বলার পর হইতে, তাহা মাটিতে নামিয়া পড়িল।

যুধিষ্ঠিরের মুখে অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথা শুনিয়া, দ্রোণ নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, তিনি আর আগের মতো যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি অনেকক্ষণ যুঝিয়াছিলেন, এবং সহজে কেহ তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই।

এমন সময় ভীম আবার আসিয়া বলিলেন, "কিসের জন্য এত যুদ্ধ করিতেছেন? অশ্বত্থামা তো মরিয়া গিয়াছে!"

তখন দ্রোণ অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "হে মহাবীর কর্ণ! হে কৃপাচার্য! হে দুর্যোধন! আমি বারম্বার বলিতেছি, তোমরা ভালো করিয়া যুদ্ধ কর! তোমাদের মঙ্গল হউক; আমি অস্ত্রত্যাগ করিলাম।" এই বলিয়া তিনি ভগবানের চিন্তায় মন দিলেন।

এমন সময় দেখা গেল যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন অসি হস্তে দ্রোণকে কাটিতে চলিয়াছেন। রণভূমিসুদ্ধ লোক তাহাতে শিহরিয়া উঠিল। সকলে চিৎকার করিয়া বলিল, "হায় হায়! এমন কাজ করিও না।" অর্জুন রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে বারণ করিতে ছুটিলেন। কিন্তু হায়! কিছুতেই কিছু হইল না; অর্জুন তাঁহাকে ধরিবার পূর্বেই তিনি তাঁহার নিষ্ঠুর নীচ কাজ শেষ করিয়া ফেলিলেন।

দ্রোণের মৃত্যুতে কৌরবেরা ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্যোধন পলাইলেন, কর্ণ পলাইলেন, শল্য পলাইলেন, কৃপ কাঁদিতে কাঁদিতে রণস্থল ছাড়িয়া চলিলেন। সকলেই ভাবিলেন যে, আজ বুঝি কৌরব সৈন্য নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

অশ্বত্থামা অন্যদিকে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন; তিনি এ বিপদের কিছুই জানিতে পারেন নাই। সকলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কিজন্য এমন করিয়া পলাইতেছ?"

ইহার উত্তরে যখন তাঁহাকে দ্রোণের মৃত্যু সংবাদ শোনানো হইল, তখন তিনি অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "আজ নিশ্চয় আমি পাণ্ডবপক্ষের সকলকে বিনাশ করিব।"

অশ্বত্থামার নিকট নারায়ণ অস্ত্র নামক একখানি অতি ভয়ংকর অস্ত্র ছিল। সে অস্ত্র ছুঁড়িলে, কাহারো সাধ্য হয় না যে তাহাকে আটকায়। অমরই হউক আর দেবতাই হউক, সে অস্ত্র গায়ে পড়িলে, তাহাকে মরিতেই হইবে। স্বয়ং নারায়ণ এই অস্ত্র দ্রোণকে দেন, দ্রোণের নিকট হইতে তাহা অশ্বত্থামা পান। সেই অস্ত্র এখন তিনি ধনুকে জুড়িলেন।

নারায়ন অস্ত্র ছুঁড়িবামাত্র ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং ভূমিকম্প আরম্ভ হইল, সূর্য মলিন হইয়া গেল, চারিদিকে অন্ধকার ঘিরিয়া ফেলিল, সাগর উথলিয়া উঠিল, নদী সকলের স্রোত ফিরিয়া গেল। সেই সাংঘাতির অস্ত্রের ভিতর হইতে, আগুনের মতো অসংখ্য অস্ত্র বাহির হইয়া, জ্বলিতে জ্বলিতে, ঘোর গর্জনে পাণ্ডবদিগকে তাড়া করিল। তখন আর কেহই মনে করিল না যে, তাঁহাদের রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় আছে।

কিন্তু উপায় ছিল; তাহা কৃষ্ণ জানিতেন। তিনি সকলকে বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র অস্ত্র ফেলিয়া নামিয়া দাঁড়াও, তাহা হইলে এ অস্ত্রে কিছুই করিতে পারিবে না। অমনি সকলে অস্ত্রত্যাগ করিয়া, হাতি, ঘোড়া, রথ, যিনি যাহার উপর ছিলেন, তাহা হইতে নামিয়া পড়িলেন। কিন্তু ভীম রোখা লোক, তিনি বলিলেন, "অস্ত্র ছাড়িব কেন? এই গদা দিয়ে আমি নারায়ণ অস্ত্রকে পিষিয়া দিব।" বিষম বিপদ আর কি! ভীম কিছুতেই অস্ত্র ছাড়িবেন না। নারায়ণ অস্ত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিতে গেলেন; আর নারায়ণ অস্ত্রের

ভীষণ অগ্নিও তৎক্ষণাৎ আসিয়া, রথসুদ্ধ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন কৃষ্ণ আর অর্জুন উধর্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া, তাঁহাকে রথ হইতে টানিয়া নামান, আর তাঁহার অস্ত্র কাড়িয়া ফেলিয়া দেন, নচেৎ না জানি সেদিন কি হইত!

এইরূপে ভীম বাঁচিয়া গেলেন বটে, কিন্তু জোর করিয়া নামাইবার আর অস্ত্র কাড়িয়া লইবার দরুন, তাঁহার ভয়ানক রাগ হওয়াতে, তিনি সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

নারায়ণ অস্ত্র বৃথা হওয়ায়, অশ্বত্থামা ক্রোধভরে অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, ভীম ইঁহাদের কেহই তাঁহার সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে পারিলেন না। তারপর অর্জুন তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি মন্ত্র পড়িয়া আগ্নেয়াস্ত্র নামক এক মহা অস্ত্র তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করা মাত্র অতি ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত হইল, যেন সৃষ্টি থাকে কি যায়! এরূপ অস্ত্র আর কেহ কখনো দেখে নাই। অশ্বত্থামা মনে করিয়াছিলেন যে, এ অস্ত্রে পাণ্ডবেরা নিশ্চয় মরিবে। কিন্তু অর্জুন তাহার পরক্ষণেই ব্রহ্মাস্ত্র মারিয়া সে অস্ত্রকে দূর করিয়া দিলেন। তখন অশ্বত্থামা নিতান্ত নিরাশভাবে "দূর হোক। সব মিথ্যা!" এই বলিতে বলিতে রণস্থল ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন।

কর্ণপর্ব

চদিন ঘোরতর যুদ্ধের পর দ্রোণ প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পর কাহাকে সেনাপতি করা যায়, এ বিষয়ে পরামর্শ আরম্ভ হইলে, অশ্বত্থামা বলিলেন, "মহাবীর কর্ণও অসাধারণ যোদ্ধা, অতএব তাঁহাকেই আমরা সেনাপতি করিয়া, শত্রুদিগকে বিনাশ করিব।"

তখন দুর্যোধন বলিলেন, "হে কর্ণ! তোমার মতো যোদ্ধা তো আর কেহই নহে, সুতরাং তুমিই এখন আমাদের সেনাপতি হও।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "মহারাজ! আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব। এখন আমি তোমার সেনাপতি হইতেছি, সুতরাং মনে কর যেন পাণ্ডবেরা হারিয়া গিয়াছে।"

তখনই ধুমধামের সহিত কর্ণকে সেনাপতি করা হইল। তারপর রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র দেখা গেল যে, 'সাজ! সাজ!' বলিয়া সকলে যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত। কর্ণকে সেনাপতি করিয়া, আবার কৌরবদিগের সাহস ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাদের এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভীষ্ম আর দ্রোণ স্নেহ করিয়া পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এবার কর্ণের হাতে আর

তাঁহাদের রক্ষা নাই। সুতরাং সেদিন যুদ্ধ আরম্ভের সময় সকলেরই খুব উৎসাহ দেখা গেল।

আজ বিশাল হাতিতে চড়িয়া ভীম যুদ্ধে নামিয়াছেন। যাঁহার সহিত প্রথমে তাঁহার যুদ্ধ হইল, তাঁহার নাম ক্ষেমমূর্তি; তিনিও হাতির উপরে এবং অসাধারণ বীরও বটে, প্রথমে যুদ্ধ অনেকটা সমানে সমানেই চলিল; এমনকি, ক্ষেমমূর্তিই আগে নারাচের গায়ে ভীমের হাতিকে মারিয়া ফেলিলেন। ভীম সেই হাতি পড়িবার পূর্বেই তাহা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ক্ষেমমূর্তির হাতিকে এমনি লাথি মারিলেন যে, হাতি তাহাতে চেপ্টা হইয়া মাটির ভিতর ঢুকিয়া গেল। তখন ক্ষেমমূর্তি মাটিতে নামিয়া রোষভরে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ামাত্র ভীম গদাঘাতে তাঁহার প্রাণ বাহির করিয়া দিলেন।

তারপর অশ্বত্থামার সহিত ভীমের অনেকক্ষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ করিতে করিতে, শেষে দুজনেই অজ্ঞান হইয়া যাওয়ায়, সারথিরা তাঁহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করে।

এদিকে অর্জুনকে অবশিষ্ট সংশপ্তকদিগের সহিত ঘোর যুদ্ধে রত দেখিয়া অশ্বত্থামা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং বেশ একটু জব্দও হইলেন। তখন অর্জুন আবার সংশপ্তকদিগকে আক্রমণ করামাত্র আবার অশ্বত্থামা আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু এবারে হাতে বুকে ও মাথায় বাণের খোঁচা খাইয়া অশ্বত্থামা একটু বিশেষরূপে সাজা পাইলেন। তাঁহার ঘোড়াগুলিরও কম দুর্দশা হইল না। ইহার উপর আবার তাহাদের রাশ কাটিয়া যাওয়াতে, তাহারা অশ্বত্থামাকে লইয়া সেখান হইতে যে ছুট দিল আর রণক্ষেত্রের বাহিরে না গিয়া থামিল না। অশ্বত্থামাও ভাবিলেন, 'ভালোই হইয়াছে।'

তারপর আর একজন অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন, তাঁহার নাম দণ্ডধার। তিনি মরিলে আসিলেন তাঁহার ভাই দণ্ড। দণ্ড মরিলে আবার সংশপ্তকেরা আসিল।

অপরদিকে কর্ণও পাণ্ড্যকে বধ করিয়া বিস্তর পাণ্ডব সৈন্য মারিয়াছেন। তারপর নকুলকে আক্রমণ করাতে দুজনে যুদ্ধ চলিয়াছে। দুজনেই দুজনের বাণে আচ্ছন্ন, মেঘের ছায়ার ন্যায় বাণের ছায়ায় রণস্থল ঢাকিয়া গিয়াছে। এমন সময় কর্ণের বাণে নকুলের ধনুক কাটা গেল, তারপর দেখিতে দেখিতে তাঁহার সারথি, ঘোড়া, রথ, অস্ত্র সকলই গেল, আর তাঁহার যুঝিবার ক্ষমতা রহিল না। তখন তিনি পলায়নের আয়োজন করামাত্র কর্ণ আসিয়া তাঁহার গলায় ধনুকের ফাঁস লাগাইয়া দেওয়াতে বেচারার সে পথও বন্ধ হইয়া গেল। কর্ণ ইচ্ছা করিলেই তখন নকুলকে বধ করিতে পারিতেন, কিন্তু কুন্তীর কথা মনে করিয়া, কেবল এই বলিয়াই ছাড়িয়া দিলেন, "যাও, ঘরে যাও! আর বড়-বড় কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিও না!"

ইহার পর আর কর্ণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, সৈন্যদের দুর্গতির একশেষ হইয়া উঠিল।

এদিকে কৃপের হাতে পড়িয়া ধৃষ্টদ্যুম্নেরও প্রায় সেই দশা। অনেকে ভাবিল, তিনি বুঝি বা মারাই যান। সারথি তাঁহাকে বলিল, "বড়ই তো বিপদ দেখিতেছি, রথ ফিরাইব নাকি?" ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন, "আমি ঘামিয়া কাঁপিয়া আর মাথার ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। চল এই বামুনকে ছাড়িয়া শীঘ্র ভীম বা অর্জুনের কাছে যাই।" সারথি তাহাই করিল।

দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ অতি অদ্ভুত হইয়াছিল। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ধনুক কাটিলেন, যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ অন্য ধনুক লইয়া দুর্যোধনের ধনুক কাটিয়া তাহার উত্তর দিলেন। যুধিষ্ঠিরের

তিন বাণ দুর্যোধনের বুকে আসিয়া পড়িল, দুর্যোধন তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, উল্টিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাঁচ বাণ আর একটা শক্তি মারিলেন। সেই শক্তি কাটা গেলে, দুর্যোধন মারিলেন একটা ভল্ল; তাহার উত্তরে যুধিষ্ঠিরের এক বাণ আসিয়া তাঁহার গায়ে বিষম বিঁধিয়া গেল। তখন দুর্যোধন বিশাল গদা হাতে যুধিষ্ঠিরকে মারিতে গিয়া তাঁহার শক্তির ভীষণ ঘায়ে রথের উপরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় ভীম আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বারণ করিয়া বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি দুর্যোধনকে মারিব, সুতরাং আপনার এখন উহাকে মারা উচিত নহে।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে ছাড়িয়া দিলেন। তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত বড়ই ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। এই সময়ে সর্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব দেখান কর্ণ আব অর্জুন। দুজনেই অসংখ্য সৈন্য বিনাশ করেন। বিশেষত কর্ণের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইলে, অর্জুন এমনি অসাধারণ যুদ্ধ করেন যে কৌরবেরা তাহা দেখিয়া, ভয়ে চক্ষু বুজিয়া, আর্তনাদ করিতে থাকেন। তাঁহাদের ভাগ্যবলে এই সময়ে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা যুদ্ধ শেষ করিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কর্ণ সর্বদাই বড়-বড় কথা কহেন। সেদিন নাকালের একশেষ হইয়াও তিনি বলিলেন, "অর্জুন আজ হঠাৎ অস্ত্র বৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছে, কিন্তু কাল আমি তাহাকে জব্দ করিব।"

রাত্রি প্রভাত হইলে কর্ণ দুর্যোধনকে বলিলেন, "আজ হয় আমি অর্জুনকে মারিব, না হয় সে আমাকে মারিবে। কিন্তু আমার একজন ভালো সারথি চাই। আমার বিজয় নামক বিশ্বকর্মা-কৃত যে আশ্চর্য ধনুক আছে, তাহা অর্জুনের গাণ্ডীবেব চেয়ে কম নহে। এখন কৃষ্ণের মতো একটি সারথি পাইলেই, আমি পাণ্ডবদিগকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারি।"

তারপর তিনি বলিলেন, "শল্য যদি আমার সারথি হন, তবে নিশ্চয় অর্জুনকে বধ করিব। মহাবীর শল্য কৃষ্ণ অপেক্ষাও ভালো সারথি আর আমি তো অর্জুনের চেয়ে বড় যোদ্ধা আছিই। সুতরাং শল্য আমার সারথি হইলে, দেবাসুরগণও আমার হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারিবেন না।"

তখন দুর্যোধন শল্যকে বলিলেন, "মামা! আপনাকে কর্ণের সারথি হইতে হইতেছে।"

এ কথায় শল্য রাগে চোখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "কি এত বড কথা! আমাকে বল সূতপুত্রের (সারথির ছেলে) সারথি হইতে! আমি কি তাহার চেয়ে কম, যে আমি তাহার সারথি হইতে যাইব? চলিলাম আমি এখান হইতে!"

ইহাতে দুর্যোধন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "রাম রাম! আপনি কেন তাহার চেয়ে কম হইতে যাইবেন? কৃষ্ণ কি অর্জুনের চেয়ে কম? আমি তো মনে করি যে অর্জুনের চেয়ে বড়, আর আপনি কৃষ্ণের চেয়েও বড়!"

এ কথায় শল্য বলিলেন, "তুমি যে আমাকে কৃষ্ণের চেয়ে বড় বলিলে, ইহাতে আমি বড়ই তুষ্ট হলাম। আচ্ছা তবে আমি কর্ণের সারথি হইব, কিন্তু আমার একটা নিয়ম থাকিল। আমার যাহা খুশি তাহাই আমি কর্ণকে বলিব।"

কর্ণ তাহাতেই রাজি হইয়া রথে উঠিলেন। আর উঠিয়াই শল্যকে বলিলেন, "রথ চালাও! আমি এখনি অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব আর যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিব।"

ইহাতে শল্য বলিলেন, "সূতপুত্র! ইন্দ্রও যাঁহাদিগকে ভয় করেন, তুমি কোন সাহসে

তাঁহাদিগকে অবহেলা করিতেছ? যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আর তোমার মুখে এমন কথা শুনা যাইবে না।"

কর্ণ বলিলেন, "আজ যদি যম, বরুণ, কুবের আর ইন্দ্রও বন্ধু-বান্ধব লইয়া অর্জুনকে রক্ষা করিতে আসেন, তথাপি আমি তাঁহাদিগকে সুদ্ধ অর্জুনকে পরাজয় করিব।"

শল্য বলিলেন, "তোমার ক্ষমতা খুব আছে বটে, কিন্তু কথা কও তাহার চেয়ে অনেক বেশি! তুমি কখনোই অর্জুনের সমান নহ। পলায়ন না করিলে, আজ তাহার হাতে তোমার প্রাণ যাইবে।"

কর্ণ বলিলেন, "যখন অর্জুন আমাকে পরাজয় করিবে, তখন আসিয়া তাহার বড়াই করিও।"

তখন শল্য, "বেশ কথা! তাহাই হইবে।" বলিয়া রথ চালাইয়া দিলেন।

কর্ণ পাণ্ডব সৈন্য দেখিলেই বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে অর্জুনকে দেখাইয়া দিবে, তাহাকে গাড়ি ভরিয়া রত্ন দিব, ছয় হাতির রথ দিব, একশত গ্রাম দিব, আর কৃষ্ণ আর অর্জুনকে মারিয়া তাহাদের সকল ধন দিব।"

এ কথায় শল্য হাসিয়া বলিলেন, "তোমার অত হাতি টাতি কিছুই দিতে হইবে না, অর্জুনকে অমনিই দেখিতে পাইবে।"

এতক্ষণে কর্ণের রাগ হইল; তিনি বলিলেন, "তুমি নিতান্ত মূর্খ, যুদ্ধের কিছুই জান না। তুমি চুপ কর; তোমার মতো একশোজনে আসিয়া বকিলেও আমি ভয় পাইব না।"

শল্য বলিলেন, "তাই তো! তোমার দেখিতেছি মাথা খারাপ হইয়াছে! চিকিৎসার দরকার!"

এইরূপে ক্রমাগত উপহাস করিয়া, শল্য কর্ণেব মন ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কর্ণের তেজ কমাইয়া দিবার জন্য পাণ্ডবদিগের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই প্রতিজ্ঞা পালন করা। যুদ্ধের সময়ও একটু সুযোগ পাইলেই, "ঐ দেখ অর্জুন কেমন বীর, তুমি উহার সঙ্গে পারিবে না।" এইরূপ নানাকথা বলিয়া তিনি বেচারাকে ব্যস্ত করিয়া তোলেন।

তথাপি কর্ণ যেরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন তাহা অতি অদ্ভুত। অর্জুন যত কৌরব সৈন্য মারিলেন, কর্ণ তাহা অপেক্ষা কম পাণ্ডব সৈন্য মারিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সাত্যকি, ভীম, সহদেব, শিখণ্ডী যুধিষ্ঠির ইহারা সকলে তাঁহার নিকট হইতে হঠিয়া গেলেন।

যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের বাণে কর্ণ একবার অজ্ঞান হইয়া যান, কিন্তু শীঘ্রই আবার উঠিয়া আসিয়া যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বরক্ষক দুটিকে মারিয়া ফেলেন। তারপর ষাট বাণে তাঁহাকে কাতর করিয়া কর্ণ সিংহনাদ করিতেছেন, এমন সময় সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি অনেক যোদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিলেন।

তথাপি কর্ণ কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না। তাঁহার বাণে চারিদিক ছারখার হইয়া যাইতে লাগিল। যুধিষ্ঠিরের ধনুক আর বর্ম কাটিয়া, তিনি তাঁহাকে এমনি সংকটে ফেলিলেন যে কি বলিব। যুধিষ্ঠির এক শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলেন, কর্ণের বাণে তাহাও দুই খণ্ড হইয়া গেল। তারপর যুধিষ্ঠির চারিটা তোমর মারিয়া কর্ণকে কাতর করিলেন বটে, কিন্তু কর্ণ তথাপি তাঁহার ধ্বজ, তূণ, রথাদি নাশপূর্বক তাহাকে বাণাঘাতে ব্যাকুল করিতে ছাড়িলেন না।

তখন যুধিষ্ঠির অন্য রথে চড়িয়া পলায়নের আয়োজন করিলে, কর্ণ অমনি ছুটিয়া গিয়া, তাহার কাঁধে হাত দিলেন।

এমন সময় শল্য বলিলেন, "কর কি সূতপুত্র! উঁহাকে ধরিলেই উনি তোমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন।"

যাহা হউক, কুন্তীর কথা কর্ণের মনে ছিল; তাই তিনি যুধিষ্ঠিরের আর কোনো অনিষ্ট করিলেন না, কেবল কিছু গালি দিয়াই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। যুধিষ্ঠিরকে হারিতে দেখিয়া, কৌরবেরা তাঁহার সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে লাগিল, আর ভীম, সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণের হাতে তাহার শাস্তিও পাইল ভালো মতোই। দুর্যোধন চিৎকারপূর্বক তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা পলায়ন করিও না, পলায়ন করিও না।" কিন্তু তাঁহার কথা কে শুনে।

ইহা দেখিয়া কর্ণ শল্যকে বলিলেন, "শীঘ্র ভীমের নিকট রথ লইয়া চল।" ভীম তখন কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সিংহনাদপূর্বক সেই দিকেই আসিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া শল্য কর্ণকে বলিলেন, "ঐ দেখ ভীম আসিতেছে। আজ সে তাহার বহুদিনের রাগ তোমার উপর ঝাড়িবে!"

তারপর ভীমের আর কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে ভীম কর্ণকে এমনি ভয়ঙ্কর বাণ ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহা পর্বতে লাগিলে পর্বতও ফাটিয়া যাইত। সে বাণ খাইয়া আর কর্ণকে যুদ্ধ করিতে হইল না। তিনি তখনি চিৎ হইয়া রথের ভিতরে পড়িয়া অজ্ঞান হওয়ায় শল্য তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন।

কর্ণের পরাভব দেখিয়া দুর্যোধন তাঁহার ভাইদিগকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। তারপর সে বেচারাদের যে দুর্দশা। যুদ্ধ ভালো করিয়া আরম্ভ হইতে না হইতেই তাহাদের ছয়জন মরিয়া গেল। আর সকলে তখন ভাবিল, বুঝি যম আসিয়াছে। কাজেই তাহারা উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

তখন আবার কর্ণ আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করাতে, ভীম এক বিশিকের ঘায় তাঁহাকে অস্থির করিয়া দিলেন। কর্ণ তথাপি তাহাতে না চটিয়া ভীমের ধনুক আর রথ চূর্ণ করিলেন। তাহাতে ভীম মহারোষে গদা লইয়া এমনি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, কৌরবদিগেব সাতশত হাতি দেখিতে দেখিতে ঘন্ট হইয়া গেল। তখন আর কৌরবদের পলায়ন ভিন্ন কথা নাই।

এদিকে কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে সামনে পাইয়া, তাঁহাকে এমনি তাড়া করিয়াছেন যে, তিনি পলাইবার পথ পান না। তাহাতে ভীম ছুটিয়া আসিয়া আবার কর্ণকে আক্রমণ করিলেন। ততক্ষণে কৃপ অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা প্রভৃতি বীরগণও সেখানে উপস্থিত হইলে অনেকক্ষণ সাংঘাতিক যুদ্ধ চলিল!

অর্জুন এই সময়ে সংশপ্তক, নারায়ণী সৈন্য প্রভৃতির সহিত ঘোরতর যুদ্ধে ব্যস্ত। উহাদের মধ্যে সুশর্মা অর্জুনের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করেন, এমনকি, একবার তাঁহাকে অজ্ঞান করিতেও ছাড়েন নাই। অর্জুন ঐন্দ্রাস্ত্র মারিয়া তাঁহাদের সকলকেই জব্দ করিয়া দিলেন।

অশ্বত্থামা আর যুধিষ্ঠিরে অনেকক্ষণ খুব যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সাত্যকি মাঝে মাঝে যুধিষ্ঠিরের সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামার বাণে যুধিষ্ঠির ক্রমে এমনই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন যে, তখন আর তাঁহার সেখান হইতে প্রস্থান করা ভিন্ন উপায় রহিল না।

অশ্বত্থামা সেদিন অর্জুনের সঙ্গেও কম যুদ্ধ করেন নাই। এমনকি, তাঁহার তেজে অর্জুনকে

কাতর হইতে হয়। তখন কৃষ্ণ আশ্চর্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আজ কেন তোমার তেজ কমিয়া গেল? গাণ্ডীব কি তোমার হাতে নাই? না কি হাতে লাগিয়াছে?

যাহা হউক, এরূপভাবে অনেকক্ষণ যায় নাই। শেষে অশ্বত্থামাকে নিতান্তই নাকাল হইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতে হয়।

ইহার পরে অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক, রথ, ঘোড়া, সারথি প্রভৃতি মুহূর্তের মধ্যে চূর্ণ হইয়া গেল। তারপর তাঁহাকে খালি হাতে পাইয়া, অশ্বত্থামা বাণে বাণে তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহাকে বধ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ছুটিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিলে, কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "ঐ দেখ, ধৃষ্টদ্যুম্নের কি দুর্দশা!" তখন অর্জুন অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এই সময়ে কর্ণ প্রভৃতি বীরেরা, যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার চেষ্টায়, তাঁহাকে আক্রমণ করেন। কর্ণের বাণে নিতান্ত ক্লেশ পাইয়াও যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ এমনি তেজের সহিত যুদ্ধ করেন যে, তাহাতে কৌরবদলে হাহাকার উপস্থিত হয়। কিন্তু শেষকালে কর্ণের বাণ একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠাতে, তিনি সারথিকে বলিলেন, "শীঘ্র এখান হইতে রথ লইয়া চল।"

তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা "ধর! ধর!" বলিয়া তাঁহার পিছু পিছু তাড়া করিল। কিন্তু পাণ্ডব সৈন্যেরা ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে এমনি শিক্ষা দিল যে, আর তাহারা বেয়াদবি করিতে সাহস পাইল না।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির, বাণাঘাতে নিতান্ত কাতর হইয়া, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে ধীরে ধীরে শিবিরে চলিয়াছেন, ইতিমধ্যে আবার কর্ণ আসিয়া তাঁহার গায়ে বাণ মারিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা তিনজনে মিলিয়াও কর্ণকে কিছুতেই বারণ করিতে পারিলেন না। কর্ণের বাণে যুধিষ্ঠিরের ঘোড়া আর পাগড়ি, নকুলের ঘোড়া, রাশ আর ধনুক, দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। সর্বনাশের আর অধিক বাকি নাই, এমন সময় শল্য কর্ণকে বলিলেন, যুধিষ্ঠিরকে লইয়া ব্যস্ত হইয়াছ, অর্জুনের সহিত কখন যুদ্ধ করিবে? ইহাকে মারিয়া ফল কি? আগে অর্জুনকে মার। আর ঐ দেখ, দুর্যোধন ভীমের হাতে পড়িয়াছেন, ইহাদিগকে ছাড়িয়া আগে তাঁহাকে বাঁচাও!"

এ কথায় কর্ণ তাড়াতাড়ি দুর্যোধনকে সাহায্য করিতে গেলেন, যুধিষ্ঠিরও রক্ষা পাইলেন; আঘাতের যাতনায় তিনি এতই কাতর হইয়াছিলেন যে, শিবিরে আসিয়াই তাঁহাকে শয়ন করিতে হইল।

এদিকে আবার অশ্বত্থামা আর অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এবারেও অশ্বত্থামার তেজের কোনো অভাব নেই; কিন্তু তাঁহার সারথি হত আর ঘোড়া ক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি একটু বিপদে পড়িয়াছেন। ঘোড়াগুলি অর্জুনের বাণে অস্থির হইয়া, রথ রথী সকল সুদ্ধ রণস্থল হইতে ছুট দিল। তারপর পাণ্ডব যোদ্ধাগণের তাড়া খাইয়া, কৌরবদিগের সৈন্যগুলিও পলায়ন করিতে পারিলে বাঁচে।

তখন দুর্যোধন কর্ণকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, তুমি থাকিতেই সৈন্যগুলি পলায়ন করিতেছে! আর তাহারা তোমাকেই ডাকিতেছে।"

এ কথায় কর্ণ তাঁহার বিজয় নামক বিশ্বকর্মানির্মিত সেই আশ্চর্য পুরাতন ধনুকে ভার্গব অস্ত্র জুড়িয়া নিক্ষেপ করিলে আর পাণ্ডব সৈন্যদের দুর্দশার অবধি রহিল না। তখন তাঁহারা

দাবানলভীত জন্তুর ন্যায় চ্যাঁচাইতে লাগিল। সেই চিৎকার শুনিয়া অর্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন, "ঐ দেখুন, ভার্গবাস্ত্রে সৈন্যগণের কি দুর্দশা হইতেছে। শীঘ্র কর্ণের নিকট রথ লইয়া চলুন।"

কিন্তু কৃষ্ণ ভাবিলেন যে, কর্ণ আরো খানিক যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইলে, অর্জুন সহজেই তাঁহাকে বধ করিতে পারিবেন, কাজেই তিনি কর্ণের দিকে না গিয়া অর্জুনকে বলিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের বাণে বড়ই কাতর হইয়াছেন। আগে তাঁহাকে শান্ত করিয়া, তারপর কর্ণকে মারা যাইবে।"

তখন তাঁহারা তাড়াতাড়ি শিবিরের দিকে আসিতেছেন, এমন সময় অশ্বত্থামা আসিয়া মহারোষে অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। যাহা হউক, অশ্বত্থামাকে পরাজয় করিতে অনেক সময় লাগিল না। তারপর ভীমের হাতে কৌরবদিগের নিবারণের ভার দিয়া তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে গেলেন।

সেখানে অনেক কথাবার্তার পর তথা হইতে চলিয়া আসিবার সময় অর্জুন এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আজ হয় আমি কর্ণকে মারিব, না হয় কর্ণ আমাকে মারিবে।"

এদিকে ভীম সেই অবধি আর এক মুহূর্তের জন্যও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই। আজকার যুদ্ধে তাঁহার বড়ই আনন্দ বোধ হইতেছে। তিনি সারথি বিশোককে ডাকিয়া বলিলেন, "বিশোক, আমার বড়ই উৎসাহ হইতেছে, এখন আর কোন রথটা স্বপক্ষের কোনটা বিপক্ষের তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। একটু সতর্ক থাকিও, যেন শত্রু বোধে মিত্রকে মারিয়া না বসি। আজ প্রাণ ভরিয়া শত্রু মারিব। দেখ তো, অস্ত্রশস্ত্র কি পরিমাণ আছে।"

বিশোক বলিল, "এখনো দশ হাজার শর, দশ হাজার ক্ষুর, দশ হাজার ভল্ল, দু হাজার নারাচ, তিন হাজার প্রদর, আর অসংখ্য গদা, অসি, মুদগর, শক্তি আর তোমর রহিয়াছে। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধ করুন, অস্ত্র ফুরাইবার কোনো ভয় নাই।"

এই সময়ে অর্জুন কৌরব সৈন্য ছারখার করিয়া, অতি ভয়ংকর যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেই যুদ্ধের ঘোরতর শব্দ ভীমের নিকট আসিয়া পৌঁছিলে, তিনিও যারপরনাই উৎসাহ পাইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে কৌরবদিগকে একেবারে পিষিয়া দিতে লাগিলেন। তখন আর কেহই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না।

অন্যদিকে কর্ণও পাণ্ডব সৈন্যদিগকে মারিয়া আর কিছু রাখেন নাই। তাহারা তখন ভয়ে এমনি হইয়াছে যে, আর যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের হাত উঠে না।

বাস্তবিক তখন দুই পক্ষের কত লোক যে মরিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করে কাহার সাধ্য? দুই পক্ষের প্রায় প্রত্যেক বড়-বড় বীরই সে সময়ে হাজার হাজার সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন।

ইহার মধ্যে একবার দুঃশাসন ভীমকে আক্রমণ করেন। ইহাতে প্রথমেই ভীমের বাণে তাঁহার ধনুক আর ধবজ কাটা যায়, নিজের কপালেও একটি বাণ বিঁধে, তারপর এক বাণ আসিয়া তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলে। তখন দুঃশাসন তাড়াতাড়ি অন্য ধনুক লইয়া ভীমকে বারোটি বাণ মারেন, এবং নিজ হাতে ঘোড়ার রাশ ধরিয়া এক ভীষণ বাণে তাঁহাকে অজ্ঞান করিতেও ছাড়েন নাই। ইহার উপর আবার তিনি এক বাণে ভীমের ধনুক কাটিয়া তাঁহার সারথিকে নয়টি, এবং তাঁহাকে বহুতর বাণ মারাতে, ভীম রাগের ভরে তাঁহাকে একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারেন।

দুঃশাসন আকর্ণ (কান অবধি, অর্থাৎ যথাসাধ্য) ধনুক টানিয়া দশ বাণে সেই জ্বলন্ত

উল্কাবৎ শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি বাণে বাণে ভীমকে জর্জরিত করিতে থাকিলে ভীম তাহাতে বিষম ক্রোধভরে বলিলেন, "তুমি তো আমাকে খুবই মারিলে, এখন আমার এই গদাটিকে সামলাও দেখি!" বলিতে বলিতে তিনি এক বিশাল গদা দুঃশাসনকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। দুঃশাসনও ভীমকে একটা শক্তি মারিলেন বটে, কিন্তু তাহা অর্ধপথে গদায় ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তারপর সেই দারুণ গদা, দুঃশাসনের রথ আর সারথিকে চূর্ণ করিয়া, তাঁহার মাথায় পড়িলে, তিনি তাহার আঘাতে দশ ধনু দূরে বিক্ষিপ্ত হইলেন।

এই অবস্থায় দুঃশাসনকে যাতনায় ছটফট করিতে দেখিয়া ভীমের সেই পুরাতন প্রতিজ্ঞার কথা মনে হইল। এই দুরাত্মাই দ্রৌপদীকে সেই সভায় চুলে ধরিয়া আনিয়া অপমান করিয়াছিল; তখন ভীম বলিয়াছিলেন, 'আমি ইহার বুক চিরিয়া রক্ত খাইব।'

সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে হওয়া মাত্র ভীম কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ আমি এই পাপাত্মা দুঃশাসনকে বধ করিব, তোমাদের সাধ্য থাকে তো ইহাকে রক্ষা কর।" তারপর তিনি ঝড়ের ন্যায় আসিয়া দুঃশাসনকে পদতলে পেষণপূর্বক তাঁহার বুকে তলোয়ার বসাইয়া দিলেন। সেই তলোয়ারের ঘায়ে দুঃশাসনের গরম রক্ত সবেগে বাহির হওয়ামাত্র, ভীম মহানন্দে তাহা পান করিয়া বলিলেন, "আহা! কি মিষ্টি! দধি দুগ্ধ বা ঘৃত পানেও আমি এত সুখী হই না।"

ভীমকে দুঃশাসনের রক্ত খাইতে দেখিয়া, সৈন্যেরা "বাবা রে! রাক্ষস রে!" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল। এদিকে ভীম তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালনপূর্বক, দুঃশাসনের মাথা কাটিয়া বলিলেন, "অতঃপর দুর্যোধন পশুকে মারিয়া, পদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিতে হইবে।"

এই সময়ে দুর্যোধনের দশ ভাই, রোষভরে ভীমকে আক্রমণ করাতে ভীম দশ ভল্লে সেই দশজনকে সংহার করিলেন। এ সকল কাণ্ড দেখিয়া, আর ভীমের তখনকার সিংহনাদ শুনিয়া, অন্যেরা তো পলায়ন করিতেই পারে, নিজে কর্ণই ভয়ে আড়ষ্ট, তাঁহার মুখে কথা সরে না! তখন শল্য তাঁহাকে বলিলেন, "এখন ওরূপ হইলে চলিবে না, তোমার কাজ কর।"

কিন্তু কর্ণের পুত্র বৃষসেন এই সময়ে খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণে নকুলের ধনুক, রথ, খড়্গ প্রভৃতি কাটা গিয়া অল্পক্ষণের ভিতরেই নিতান্ত সংকট উপস্থিত হইল। ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ প্রভৃতিও তাঁহার বাণে অক্ষত রহিলেন না। এইরূপে অর্জুনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াতে, অর্জুন কর্ণকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে মিলিয়া অভিমন্যুকে মারিয়াছিলে। আমি তোমাদের সম্মুখেই বৃষসেনকে মারিতেছি, ক্ষমতা থাকে তো রক্ষা কর।"

তারপর অর্জুন হাসিতে হাসিতে দশ বাণে বৃষসেনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া আর চারিটি ক্ষুরে তাঁহার ধনুক, দুটি হাত আর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন ইহাতে কর্ণের প্রাণে কিরূপ লাগিয়াছিল, বুঝিতেই পার। ইহার পরেও কিন্তু আর তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? কাজেই তখন অর্জুনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এ সময়ে অশ্বত্থামা দুর্যোধনের দুটি হাত ধরিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আর কেন? এখনো ক্ষান্ত হও! আর পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। যুদ্ধের মুখে ছাই! আমাদের সকলেই মরিয়া গিয়াছেন, কয়েকটি মাত্র বাঁচিয়া আছি। এখন যুদ্ধ হইতে তুমি ক্ষান্ত হও,

নহিলে নিশ্চয় মারা যাইবে।" কিন্তু দুর্যোধন সেই উপকারী বন্ধুর কথায় কান দিলেন না। তিনি বলিলেন, "অর্জুন বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে; কর্ণ এখনি তাহাকে বধ করিবেন।"

এদিকে কর্ণ আর অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। যোদ্ধারা সিংহনাদ করিয়া আর চাদর উড়াইয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন। এমন যুদ্ধ কি সচরাচর হয়? তাই আজ দেবতারা অবধি, আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া, তামাশা দেখিতে আসিয়াছেন।

বাণ বাণ! কেবলই বাণের পর বাণ। অর্জুন মারেন, কর্ণ কাটেন; কর্ণ মারেন, অর্জুন কাটেন। অর্জুনের এক বাণে পৃথিবী, আকাশ সূর্য অবধি জ্বলিয়া উঠিল। যোদ্ধাদের কাপড়ে আগুন! বেচারারা বুঝি পলাইবার পূর্বেই মারা যায়। উহার নাম আগ্নেয়-অস্ত্র। উঃ! কি ঘোরতর হুড়-হুড় ধক্-ধক্ শব্দ! গেল বুঝি সব!

ঐ দেখ, কর্ণ বরুণাস্ত্র ছুঁড়িয়াছেন। ঐ কালো কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল! কি ঘোর অন্ধকার! কি ভয়ানক বৃষ্টি! সৃষ্টি বুঝি তল হয়!

অমনি দেখ, কি বিষম ঝড় বহিল! মেঘ বৃষ্টি উড়াইয়া নিল; সৃষ্টি বাঁচিল! অর্জুন বায়ব্য অস্ত্র মারিয়াছেন, তাহাতেই এত ঝড়!

আর একটা অস্ত্র আরো ভীষণ। ইহা অর্জুন ইন্দ্রের নিকট পাইয়াছিলেন। অস্ত্রের অদ্ভুত গুণে গাণ্ডীব হইতে কত ক্ষুরপ্র, কত নালীক, কত অঞ্জলীক, কত নারাচ, কত অর্ধচন্দ্রই বাহির হইতেছে। এবারে বুঝি আর কর্ণের রক্ষা নাই।

কিন্তু কর্ণ মরিলেন না! তিনি ভার্গবাস্ত্রে অর্জুনের সকল অস্ত্র দূর করিলেন। আর লোকও মারিলেন কতই। কর্ণের কি অসীম তেজ! কৃষ্ণ আর অর্জুনকে তিনি কি ব্যস্তই করিলেন! তখন ভীম ক্রোধভরে বলিলেন, "ও কি, অর্জুন! মন দিয়া যুদ্ধ কর!"

কৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জুন! তোমার উৎসাহ দেখিতেছি না কেন?"

তাহাতে অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র মারিলে কর্ণ তাহাও কাটিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু ইহার পর যে অর্জুন আর একটা ব্রহ্মাস্ত্র মারিলেন, সে বড়ই ভয়ানক! কত যোদ্ধাই তাহাতে মরিল। কিন্তু তথাপি বাণক্ষেপে ত্রুটি নাই; বৃষ্টিধারার মতো তাঁহার বাণ পড়িতেছে।

তখন অর্জুনের আঠারোটি বাণ ছুটিয়া চলিল। তাহার তিনটি বিঁধিল কর্ণের গায়ে, একটিতে কাটিল তাঁহার ধ্বজ, আর চারটি খাইলেন শল্য। বাকি দশটিতে রাজপুত্র সভাপতির মাথাটি কাটা গেল। বাণের আর অন্তই নাই; হাতি, রথী, পদাতি সবই বুঝি কাটিয়া শেষ হয়। এবারে কর্ণ কাবু হইবেন। কিন্তু হায়! অর্জুনের ধনুকের গুণ যে ছিঁড়িয়া গেল, এখন উপায়? কর্ণ সুযোগ পাইয়া কত বাণই মারিতেছেন। কৃষ্ণকে ষাট, অর্জুনকে আট, ভীমকেও অনেক, সৈন্যগুলিকে তো অসংখ্য। সর্বনাশ হইল বুঝি; দেখ কৌরবদের কত আনন্দ!

যাহা হউক, ঐ অর্জুনের ধনুকে আবার গুণ চড়িল। আর কর্ণের বাণের সে তেজ নাই, এখন অর্জুনের বাণেই আকাশ অন্ধকার। ঐ কর্ণের গায়ে উনিশ বাণ পড়িল, শল্যের গায়ে দশটি বিঁধিল। কর্ণ রক্তে লাল হইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি তিনি অর্জুনকে তিন বাণ, আর কৃষ্ণকে পাঁচ বাণ মারিতে ছাড়েন নাই। ঐ পাঁচটি বাণ পাঁচটা মহাসর্প। কৃষ্ণকে বিঁধিয়া উহারা আবার কর্ণের নিকট ফিরিয়া যাইতে যাইতে, মধ্যপথে অর্জুনের ভল্লে খণ্ড খণ্ড হইল। অর্জুনের আর দশ বাণে কর্ণের কি দশা হইয়াছে, দেখ। অর্জুনের কি অতুল বিক্রম, কি ভীষণ বাণ বৃষ্টি! আকাশ আঁধার হইল; কর্ণের

রথ কাটিয়া গেল। তাঁহার সঙ্গের একটি রক্ষকও বাঁচিয়া নাই; অপর কৌরবেরা, অর্জুনের ভয়ে, তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিতেছে। কৌরবদের মধ্যে কেবল কর্ণই ভয় পান নাই; তিনি অর্জুনের সামনেই বাণবৃষ্টি করিতেছেন।

এমন সময় কোথা হইতে ঐ সাপটা আসিয়া কর্ণের তূণের ভিতরে ঢুকিল; এ সেই অশ্বসেন, খাণ্ডব দাহের সময় সে অনেক কষ্টে পাতালে ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। সেই রাগে, সে আজ কর্ণের বাণের ভিতরে ঢুকিয়া অর্জুনকে বধ করিতে আসিয়াছে, কর্ণ ইহার কিছুই জানেন না। অশ্বসেন যে বাণের ভিতরে ঢুকিয়াছে, তাহারো চেহারা সাপের মতো। কর্ণ অর্জুনকে মারিবার জন্য এই বাণ বহুকাল যাবৎ পরম যত্নে চন্দন চূর্ণের ভিতরে রাখিয়াছেন।

এখন অর্জুনকে কিছুতেই আঁটিতে না পারিয়া, কর্ণ সেই দারুণ বাণ ধনুকে জুড়িয়া বসিয়াছেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উল্কাবৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, আকাশে আগুন ধরিয়া গিয়াছে। এ বাণ লাগিলে আর অর্জুনের রক্ষা নাই। ইহাকে আটকাইবার ক্ষমতাও কিছুরই নাই। তাই বাণ ছুঁড়িবার সময় কর্ণ বলিলেন, "অর্জুন! এইবারে তুমি গেলে!" উঃ! কি ভয়ংকর বাণ! সর্বনাশ হয় বুঝি।

এমন সময় কৃষ্ণ হঠাৎ পায়ে চাপিয়া অর্জুনের রথখানিকে মাটির ভিতরে বসাইয়া দিলেন; ঘোড়াগুলি হাঁটু গাড়িয়া রহিল। আর কর্ণের বাণ অর্জুনের গায়ে পড়িতে পাইল না, তাঁহার সেই ইন্দ্রদত্ত আশ্চর্য মুকুটখানি গুঁড়া করিয়া দিল, অর্জুন বাঁচিয়া গিয়া সাদা পাগড়ি বাঁধিয়া লইলেন।

সাপের বাছা ঠকিয়া গিয়া বড়ই চটিল। সে কর্ণকে গিয়া বলিল, "কর্ণ, তুমি আমাকে না দেখিয়াই বাণ মারিয়াছিলে, তাই অর্জুনের মাথা কাটিতে পারি নাই এবারে আমাকে দেখিয়া বাণ মার, নিশ্চয় উহাকে বধ করিব।"

কিন্তু কর্ণ বড় অহংকারী লোক, তিনি অন্যের সাহায্য নিতে প্রস্তুত নহেন। কাজেই দুষ্ট সাপ নিরাশ মনে ফিরিয়া চলিল। কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়া সে কোথায় যাইবে? তিনি অমনি অর্জুনকে তাহার কথা বলিয়া দিলেন, আর দেখিতে দেখিতে দুষ্ট সাপ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। ততক্ষণে কৃষ্ণও রথখানিকে তুলিয়া লইয়াছেন, আর কি ভয়ানক যুদ্ধই চলিয়াছে! কৃষ্ণকে বারোটি আর অর্জুনকে নববুইটি বাণ মারিয়া, কর্ণের আনন্দের সীমা নাই। অর্জুন তাহা সহিবেন কেন? তিনি কর্ণকে তেমনি শিক্ষা দিলেন। ঐ কর্ণের মুকুট আর কুণ্ডল উড়িয়া গেল! ঐ তাঁহার বর্ম ছিন্নভিন্ন হইল! আহা! এখন না জানি ঐ দারুণ বাণগুলি তাঁহার গায়ে কিরূপ বিঁধিতেছে। রক্তে শরীর ভাসিয়া গেল। ঐ তাঁহার বুকে ভীষণ বাণ ফুটিল, আর তাঁহার জ্ঞান নাই। তখন আর অর্জুনের উদার হৃদয় তাঁহাকে বাণ মারিতে চাহিল না; সেজন্য কৃষ্ণ তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন।

কর্ণের জ্ঞান হইল, আবার যুদ্ধ চলিল। কিন্তু এবারে বুঝি আর তাঁহার রক্ষা নাই। ঐ তাঁহার রথের চাকা বসিয়া গেল! আহা! এই বিপদের সময় আবার বেচারা তাঁহার সেই পরশুরামের দেওয়া বড়-বড় অস্ত্রের কথা সব ভুলিয়া গিয়াছেন।

নিজেরই পাপের ফল! পরশুরামকে ফাঁকি দিয়া তিনি তাঁহার নিকট অস্ত্র শিখিতে গেলেন; বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ।" পরশুরাম যথার্থই ব্রাহ্মণ বোধে তাঁহাকে অশেষরূপ অস্ত্রশস্ত্র

দিয়া বিধিমতে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলেন। তারপর একদিন দেখেন কি যে এ-ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়! কাজেই তখন তিনি শাপ দিলেন, "মৃত্যুকালে তুই এ সকল ভুলিয়া যাইবি।"

তারপর আর একবার দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণের বাছুর মারিয়া ফেলাতে সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে শাপ দেন, "যুদ্ধের কালে যখন তোর বড়ই আতঙ্ক হইবে, ঠিক সেই সময় তোর রথের চাকা বসিয়া যাইবে।"

সেই সকল পুরাতন পাপের শাস্তি আজ আসিয়া একসঙ্গে উপস্থিত হইল। আহা! ঐ দেখ, তিনি হাত ছুঁড়িয়া আক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু বীরের তেজ না কি বিপদেও লোপ পায় না, তাই এখনো তিনি অর্জুনের সহিত ঘোর যুদ্ধে মত্ত! ইহার মধ্যেও কৃষ্ণের হাতে তিন, আর অর্জুনকে সাত বাণ মারিতে ছাড়েন নাই। তাহাতে অর্জুনের বাণ খাইয়া মন্ত্রপূর্বক ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িয়াছেন। তাহাতে অর্জুন ঐন্দ্রাস্ত্র মারিলে, তাহাও আটকাইয়াছেন। তারপর আবার অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি অশেষ বাণে জর্জরিত হইয়াও না জানি কিরূপে কর্ণ তাঁহার ধনুকের গুণ কাটিলেন: অর্জুন তৎক্ষণাৎ নূতন গুণ পরাইয়াও তাঁহাকে আঁটিতে না পারায় কৃষ্ণ তাঁহাকে আরো বড়-বড় অস্ত্র মারিতে বলিতেছেন।

হঠাৎ কর্ণের রথের চাকা আরো অনেক বসিয়া গেল! বেচারা, তাহা উঠাইবার জন্য, প্রাণপণে কি টানাটানিই করিতেছেন! পৃথিবী তাহাতে চারি আঙ্গুল উঁচু হইয়া গেল, কিন্তু চাকা যে কিছুতেই উঠিতেছে না। এইবারে কর্ণের চোখে জল আসিল; তিনি অর্জুনকে বলিলেন, "অর্জুন! তুমি বড়ই ধার্মিক, আর মহাশয় লোক;একটু অপেক্ষা কর, আমার রথের চাকাটা তুলিয়া লই।"

তাহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, "সূতপুত্র! বড় ভাগ্য যে এখন তোমার ধর্মের কথা মনে হইয়াছে! কিন্তু যখন ভীমকে বিষ খাওয়াইবার পরামর্শ দিয়াছিলে, দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়া অপমান করিয়াছিলে, ছলপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে পাশায় হারাইয়াছিলে, জতুগৃহে পাণ্ডবদিগকে পোড়াইতে গিয়াছিলে, আর সকলে মিলিয়া বালক অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল?

এ কথার আর কি উত্তর দিবেন? তাই লজ্জায় কর্ণের মাথা হেঁট হইল। বিষমরোষে ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, ব্যায়ব্যাদি অস্ত্র বর্ষণপূর্বক তিনি আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং অচিরে ভীষণ একটা অস্ত্রে অর্জুনকে অজ্ঞান করিয়া ব্যস্তভাবে রথ হইতে নামিলেন, যদি এই অবসরে তাহার চাকা আবার উঠানো যায়। কিন্তু হায়! চাকা কিছুতেই উঠিল না।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "এই বেলা কর্ণকে মার। উহাকে রথে উঠিতে দিও না।" সে কথায় অর্জুন অঞ্জলীক নামক ভীষণ অস্ত্র গাণ্ডীবে জুড়িবামাত্র ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল;আর দেখিতে দেখিতে সেই মহাস্ত্র ঘোর গর্জনে প্রচণ্ড তেজে ছুটিয়া গিয়া কর্ণের মাথা কাটিয়া ফেলিল। তখন সকলে অবাক হইয়া দেখিলেন, কর্ণের দেহ হইতে অপরূপ দীপ্তি নির্গত হইয়া সূর্যের সহিত মিলাইয়া যাইতেছে।

আজ আর পাণ্ডবদের আনন্দের সীমা নাই। ভীম সিংহনাদপূর্বক নৃত্য করিতেছেন;আর সকলে শঙ্খ বাজাইয়া জয় ঘোষণায় মত্ত। বেচারা কৌরবগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া, পলায়নের পথও পাইতেছে না। এমন সময় সন্ধ্যা আসিয়া পড়িল;দুর্যোধন, 'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিরে চলিলেন।

আজ সঞ্জয়ের মুখে এই সংবাদ শুনিবামাত্রই, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ভীষ্ম, দ্রোণের মৃত্যু সংবাদেও তিনি এত ক্লেশ পান নাই।

শল্যপর্ব

র্ণের মৃত্যুতেও দুর্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন না। তাঁহার পক্ষের বীরগণেরও বিলক্ষণ রণোৎসাহ দেখা গেল। সুতরাং সকলে, শল্যকে সেনাপতি করিয়া, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

সে রাত্রে আর তাঁহারা শিবিরে থাকেন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রায় দুই যোজন দূরে, সরস্বতী নদীর তীরে, হিমালয়প্রস্থ নামক স্থানে, তাঁহারা রাত্রি কাটাইয়াছিলেন।

পরদিন নতুন সেনাপতি শল্য অসাধারণ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। আজ এই নিয়ম হইল যে 'তাঁহাদের কেহই একাকী পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিতে যাইবেন না; সকলে মিলিয়া সাবধানে পরস্পরকে সাহায্য করা হইবে।'

মোটামুটি এইভাবেই যুদ্ধ চলিল। কিছুকাল যুদ্ধের পরই, কর্ণের পুত্র চিত্রসেন, সত্যসেন এবং সুষেণ নকুলের হাতে এবং শল্যের পুত্র সহদেবের হাতে মারা গেলেন।

তারপর ভীমের সহিত শল্যের ঘোর গদাযুদ্ধ হয়। যুদ্ধ করিতে করিতে, শেষে দুইজনেই দুজনের গদাঘাতে অজ্ঞান হওয়ায়, কৃপাচার্য শল্যকে লইয়া প্রস্থান করিলেন, আর ভীম উঠিয়া গদা হাতে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠিরের সহিত শল্যের বারবার যুদ্ধ হয়! তখন পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা সকলে মিলিয়াও শল্যের কিছুই করিতে পারেন নাই! অর্জুন এ সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; তিনি অন্যস্থানে অশ্বত্থামা প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরে, অর্জুনের সম্মুখেই, সৈন্যেরা ভীমের নিষেধ অমান্য করিয়া, পলায়ন করিতে লাগিল।

এই সময়ে শল্যের বাণে নিজে নিতান্ত অস্থির হইয়া এবং সৈন্যদিগকে রক্তাক্ত শরীরে পলায়ন করিতে দেখিয়া, যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা করিলেন, "হয় শল্যকে বধ করিব না হয় নিজে প্রাণ দিব।" তারপর ভীমকে সম্মুখে অর্জুনকে পশ্চাতে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন আর সাত্যকিকে দুপাশে লইয়া, তিনি শল্যের সহিত এমন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে তাহাতে কৌরবদের আর আতঙ্কের সীমা রহিল না।

ইহার মধ্যে একবার শল্যের বাণে কঠিন বেদনা পাইয়াও যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া দিলেন। কিন্তু শল্যের জ্ঞান হইতে অধিক সময় লাগিল না। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহার কবচ ভেদ

করিলে, তিনি উল্টিয়া যুধিষ্ঠির এবং ভীম দুইজনেরই কবচ ছিঁড়িয়া দিলেন।

এমন সময় শল্যের বাণে যুধিষ্ঠিরের ধনুক এবং কৃপের বাণে তাঁহার সারথির মাথা কাটা গেল। ঘোড়া চারটি শল্যের বাণে মরিতেও আর বেশি বিলম্ব হইল না।

ইহাতে ভীম বিষম রোষে শল্যের ধনুক, সারথি, ঘোড়া সকল চূর্ণ করিয়া দিলেন। শল্যের বর্ম ও মুহূর্তেক পরেই কাটা যাওয়ায় তিনি অসি চর্ম হাতে, রথ হইতে নামিয়া, ক্রোধভরে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে গেলেন। এমন সময় ভীমের নয়টি বাণ, বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া শল্যের খড়্গের মুষ্টি কাটিয়া ফেলিল। তথাপি তিনি যুধিষ্ঠিরের দিকে সিংহের ন্যায় ছুটিয়া চলিলে যুধিষ্ঠির মণিমণ্ডিত অতি ভীষণ করালবদন স্বর্ণময় জ্বলন্ত শক্তি গ্রহণ করিলেন।

তারপর তিনি তাঁহার বিশাল দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া, রোষভরে সেই শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে, শল্য তাহা লুফিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সাংঘাতিক অস্ত্র, দেখিতে দেখিতে তাঁহার বক্ষ ভেদপূর্বক, প্রবল বেগে ভূতলে প্রবেশ করিল।

শল্যের মৃত্যুতে তাঁহার সহোদর সক্রোধে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিয়া মস্তক হারাইতে অধিক বিলম্ব হইল না। শল্যের সঙ্গের মদ্রদেশীয় লোকেরাও অনেক যুদ্ধের পর পাণ্ডবদের হাতে মারা গেল। ইহার পরে কৌরব সৈন্যেরা আর কিসের ভরসায় যুদ্ধ করিবে? তখন তাহারা সকলেই বুঝিল যে, আর পলায়ন ভিন্ন গতি নাই।

এ সময়ে দুর্যোধন, অনেক কষ্টে তাঁহার সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তখন ম্লেচ্ছরাজ শাল্ব, এক ভয়ংকর হাতিতে চড়িয়া, অতি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছিলেন। সৈন্যেরা তো সে হাতির ভয়ে চ্যাচাইয়া পলাইলই;ভীম, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্নের মতো বীরেরাও তাহার তাড়ায় কম ব্যস্ত হলেন না। সে হতভাগা হাতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে এমনি তাড়া করিল যে, তিনি রথ ছাড়িয়াই দে চম্পট! বেচারা সারথি আর পলাইতে পারিল না। হাতি তাহাকে সুদ্ধ রথখানিকে আছড়াইয়া গুঁড়া করিল।

যাহা হউক, শেষে ধৃষ্টদ্যুম্নের গদায়ই হাতি মারা পড়ে। তারপরেই তীক্ষ্ন ভল্লে সাত্যকি শাল্বের মাথা কাটেন।

তারপর দুই দলে ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। দুর্যোধন এ সময়ে খুবই বীরত্ব দেখাইলেন। শকুনিও কম যুদ্ধ করিলেন না। দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং সহদেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কিন্তু সেই দশ হাজারের মধ্যে চারি হাজার অশ্বারোহী দেখিতে দেখিতেই মারা যাওয়াতে, তাঁহার মনে হইল যে, এখন সবেগে প্রস্থান করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

যাহা হউক, শকুনি অবিলম্বেই আবার ফিরিয়া আসিলেন। তারপর পলকের মধ্যে তাঁহার অশ্বারোহীর সংখ্যা সাতশতে নামিয়া আসায় তিনি অমনি দুর্যোধনকে গিয়া বলিলেন, "আমি অশ্বারোহীগণকে পরাজয় করিয়াছি। এখন তুমি গিয়া রথীদিগকে পরাজয় কর।"

দুর্যোধনের নিরানব্বুই ভাইয়ের মধ্যে কেবল দুর্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্বিসহ, অরিহা, দুর্বিমোচন, দুষ্পরধর্ব আর শ্রুতর্বা এই বারোজন বাঁচিয়া ছিলেন। এই দিনের যুদ্ধে ভীমের হাতে তাহাদের মৃত্যু হইল। ইহার কিছুকাল পরেই সুশর্মা অর্জুনের বাণে, আর শকুনির পুত্র উলূক সহদেবের হাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পুত্রের মৃত্যু সহ্য করিতে না পারিয়া শকুনি তখনি সহদেবকে আক্রমণ করেন, কিন্তু

ভালো মতে যুদ্ধ আরম্ভ না করিতেই সহদেবের বাণে তাঁহার ধনুক কাটা যায়। তখন অসি গদা শক্তি প্রভৃতি যে অস্ত্রই তিনি হাতে করেন, সহদেব তাহাই কাটিয়া ফেলেন। কাজেই শকুনি আর এক মুহূর্তও সেখানে অপেক্ষা করিলেন না।

কিন্তু পলাইয়া তিনি যাইবেন কোথায়? সহদেব তাঁহার পিছু পিছু তাড়া করিয়া, বাণে বাণে তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। তখন শকুনি একটা প্রাস লইয়া সহদেবকে আক্রমণ করিতে গেলে, সহদেব তাঁহার দুখানি হাতসুদ্ধ সেই প্রাস কাটিয়া, সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহার মাথায় এক ভয়ানক ভল্ল ছুঁড়িয়া মারিলেন। সে ভল্ল তাঁহার মাথা কাটিয়া, প্রাণ বাহির করিয়া দিল।

ইহার পর আর যুদ্ধের বড় বেশি বাকি রহিল না। দেখিতে দেখিতে কৌরবদিগের মধ্যে কেবলমাত্র দুর্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা অবশিষ্ট রহিলেন। তাঁহাদের এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্যের সমস্তই মরিয়া শেষ হইল।

তখন রাজা দুর্যোধন, চারিদিক শূন্য দেখিয়া, প্রাণের ভয়ে পলায়নপূর্বক রণভূমির নিকটেই দ্বৈপায়ন নামক একটা হ্রদের জলে লুকাইতে চলিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল যে, বিদুর পূর্বেই বলিয়াছিলেন, এইরূপ হইবে।

ইতিমধ্যে বেচারা সঞ্জয়, সাত্যকি আর ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে পড়িয়া প্রায় মারাই গিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কাটিতে যাইবেন, ইত্যবসরে ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া বলিলেন, "ইহাকে ছাড়িয়া দাও।"

এইরূপে মুক্তি পাইয়া, সঞ্জয় তথা হইতে নগরের দিকে চলিয়াছেন, এমন সময়, রণস্থলের এক ক্রোশ দূরে, দুর্যোধনের সহিত তাঁহার দেখা হইল। দুই চক্ষু জলে পূর্ণ থাকায়, দুর্যোধন প্রথমে সঞ্জয়কে দেখিতে পান নাই। তারপর তাঁহার কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে চিনিয়া বলিলেন, "সঞ্জয়, বাবাকে বলিও, আমি হ্রদের নিকট লুকাইয়া, প্রাণ বাঁচাইয়াছি।" এই বলিয়া তিনি গদা হাতে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইয়া রহিলেন।

সঞ্জয় সেখান হইতে চলিয়া যাইবার কিঞ্চিৎ পরেই কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা তাঁহার নিকট দুর্যোধনের সংবাদ পাইয়া, সেই হ্রদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হলেন। হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ! জল হইতে উঠিয়া আইস, আমরা তিনজনে তোমাকে লইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। আজ উহারা নিশ্চয় পরাজিত হইবে।"

তাহা শুনিয়া দুর্যোধন বলিলেন, "বড় ভাগ্য যে, আপনাদিগকে জীবিত দেখিলাম! কিন্তু আমি অতিশয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি, আর পাণ্ডবদিগের অনেক সৈন্য এখনো বাঁচিয়া আছে। সুতরাং আজ আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না। আজিকার রাত্রিটি বিশ্রাম করি, কাল আপনাদিগকে লইয়া যুদ্ধ করিব।"

তখন অশ্বত্থামা বলিলেন, "মহারাজ! তুমি উঠিয়া আইস! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, রাত্রি প্রভাত না হইতে তোমার শত্রুদিগকে বিনাশ করিব।"

এই সময়ে কয়েকজন ব্যাধ সেই হ্রদের ধারে বিশ্রাম করিতেছিল। কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা তাহাদিগকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু তাহারা তাঁহাদের কথাবার্তা সকলই শুনিতে পাইল। সুতরাং দুর্যোধন যে সেই হ্রদের জলে লুকাইয়া রহিয়াছেন, এ কথা আর তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না। একটু আগেই তাহারা পাণ্ডবদিগকে তাঁহার অন্বেষণ করিতে দেখিয়াছিল,

আর তাঁহারা তাহাদিগকে দুর্যোধনের কথা জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল। এমন সংবাদ তাঁহাদিগকে দিতে পারিলে, নিশ্চয়ই বিশেষ পুরস্কার মিলিবে, এই মনে করিয়া তাহারা অবিলম্বে ভীমের কাছে গিয়া, সকল কথা বলিয়া দিল।

পাণ্ডবদিগের তখনো দুহাজার রথী, সাতশত গজারোহী, পাঁচহাজার অশ্বারোহী আর দশহাজার পদাতি অবশিষ্ট ছিল। দুর্যোধন পলায়ন করা অবধি তাঁহারা তাঁহাকে খুঁজিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পান নাই। এমন সময় সেই ব্যাধেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে সেই সংবাদ দিল।

ব্যাধদিগকে রাশি রাশি ধন দিয়া তখনি সকলে দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে আসিলেন। কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা দূর হইতেই তাঁহাদের কোলাহল শুনিতে পাইয়াই, হ্রদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তারপর পাণ্ডবেরা সেখানে আসিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখন কি উপায়ে দুর্যোধনকে জলের ভিতর হইতে বাহির করা যায়।

দুর্যোধন বড়ই অহংকারী লোক ছিলেন, কটু কথা তিনি কিছুতেই সহিতে পারিতেন না। গালি দিলে তিনি বাহির হইয়া আসিবেন, এই ভাবিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অতি কর্কশভাবে বলিলেন, "দুর্যোধন! তুমি যে সকলকে যমের হাতে দিয়া, নিজে প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে, এ কাজটা ভালো হয় নাই; আইস যুদ্ধ করি।"

এ কথার উত্তরে দুর্যোধন জলের ভিতর হইতে বলিলেন, "আমি পলায়ন কবি নাই, বিশ্রাম করিতেছি। তোমরাও এখন গিয়া বিশ্রাম কর, তারপর যুদ্ধ হইবে।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমাদের বিশ্রাম হইয়াছে, সুতরাং এখন আসিয়া হয় আমাদিগকে হারাইয়া রাজ্য ভোগ কর, না হয় আমাদের হাতে মরিয়া স্বর্গে যাও!"

দুর্যোধন বলিলেন, "আমি এখনো তোমাদিগকে পরাজয় করিতে পারি। কিন্তু আমার সব মরিয়া গেল, আর কাহার জন্য রাজ্য লইতে চাহিব? সুতরাং তোমরাই এখন বাজ্য ভোগ কর, আমি মৃগচর্ম পরিয়া বনে যাইতেছি।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তোমার ও কান্নায় আর আমার মন ভুলিবার নয়। এখন তুমি আমাকে রাজ্য দিবার কে? তোমাকে বধ করিয়া আমার রাজ্য কাড়িয়া লইব। আইস, যুদ্ধ করি।"

এরূপ কঠিন কথা দুর্যোধন আর তাঁহার জীবনে কখনো শোনেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "আমার বর্ম নাই, অস্ত্র নাই, রথ নাই; তোমাদের সকলই আছে। তোমরা সকলে আমায় ঘিরিয়া মারিলে, আমি কি করিয়া যুদ্ধ করিব? এক একজন করিয়া আইস, দেখা যাইবে।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তোমার যেমন খুশি, অস্ত্র দেখিয়া লও। বর্ম পর, চুল বাঁধ; আর যাহা খুশি কর। তারপর আমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যাহার সহিত ইচ্ছা যুদ্ধ কর। সেই একজনকে পরাজয় করিতে পারিলেই, সমুদয় রাজ্য তোমার হইবে।"

তখন দুর্যোধন বর্ম আর পাগড়ি পরিয়া, গদা হাতে লইয়া বলিলেন, "আমি এই গদা লইয়া যুদ্ধ করিব। তুমি বা ভীম বা অর্জুন বা নকুল বা সহদেব, যাহার খুশি, আসিয়া আমার সহিত গদাযুদ্ধ কর। ন্যায় মতে গদাযুদ্ধ করিয়া, তোমাদের কেহ আমার সঙ্গে পারিবে না। সত্য কি মিথ্যা, এমনি দেখিতে পাইবে।"

এই সময়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "আপনি কোন সাহসে দুর্যোধনকে আপনাদের যাহার সহিত ইচ্ছা যুদ্ধ করিতে বলিলেন? দুরাত্মা যদি আপনাকে, অর্জুনকে, নকুলকে বা সহদেবকে আক্রমণ করিয়া বসিত, তাহা হইলে আপনাদের কিরূপ দশা হইত? ভীমও গদাযুদ্ধে দুর্যোধনকে আঁটিতে পারে কি না সন্দেহ। ভীমের বল আর তেজ বেশি, কিন্তু দুর্যোধনের শিক্ষা অধিক, আর শিক্ষাতেই হারজিৎ। এখন বুঝিলাম যে, পাণ্ডবদের কপালে রাজ্য লাভ নাই, বিধাতা উঁহাদিগকে বনে থাকিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এমন সময় ভীম গদা হাতে লইয়া দুর্যোধনকে বলিলেন, "ওরে নরাধম! সকল দুরাত্মা মরিয়া এখন কেবল তুমিই অবশিষ্ট রহিয়াছ; আজ এই গদার প্রহারে তোমাকেও বধ করিয়া, আমাদের সকল দুঃখের শোধ লইব!"

দুর্যোধন বলিলেন, "আর বড়াই করিও না! এখনি তোমার যুদ্ধের সাধ মিটাইয়া দিব। ন্যায় মতে গদাযুদ্ধে ইন্দ্রও আমাকে পরাজয় করিতে পারেন না। আইস দেখি, তোমার কত বিদ্যা!"

দুজনে প্রাণ ভরিয়া গালাগালি চলিতেছে, এমন সময় বলরাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীম ও দুর্যোধন দুইজনেই বলরামের ছাত্র, তিনিই ইঁহাদের গদা শিক্ষার গুরু। সুতরাং যুদ্ধের সময় তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া দুজনেরই খুব উৎসাহ হইল।

কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র স্থান, সেখানে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয়। এইজন্য বলরাম বলিলেন যে, যুদ্ধ দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে না হইয়া কুরুক্ষেত্রে হওয়াই ভালো। তখন সকলে সেখান হইতে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া, যুদ্ধের জন্য একটি স্থান দেখিয়া লইলেন।

তারপর দুজনে, দুই মত্ত হস্তীর ন্যায় গর্জন করিতে করিতে, কি ঘোর যুদ্ধই আরম্ভ করিলেন। সকলে স্তব্ধভাবে চারিদিকে বসিয়া সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

সেকালের লোকেরা আগে খুব এক চোট বাক্য যুদ্ধ, অর্থাৎ গালাগালি, না করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিত না। সুতরাং প্রথমে তাহাই কিছুকাল চলিল। তারপর ভীষণ ঠকাঠক শব্দে রণস্থল কাঁপাইয়া উভয়ে উভয়কে আঘাত করিতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের গদা হইতে ক্রমাগত আগুন বাহির হইতেছিল।

সে যুদ্ধের কি অদ্ভুত কৌশল! মণ্ডল, গতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র, যন্ত্র, পরিমোক্ষ, প্রহার, বঞ্চন, পরিবারণ, অভিদ্রাবণ, আক্ষেপ, বিগ্রহ, পরাবর্তন, সংবর্দন, অবপ্লুত, উপপ্লুত, উপন্যস্ত প্রভৃতি অশেষ প্রকার কৌশল দেখাইয়া তাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এ সকল কৌশলে দুর্যোধনেরই অধিক ক্ষমতা দেখা গেল। তিনি একবার ভীমের বুকে এমনি গদা প্রহার করিলেন যে, কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহার নড়িবার শক্তি রহিল না। যাহা হউক, ইহার পরেই ভীমও, এক গদাঘাতে দুর্যোধনকে অজ্ঞান করিলেন।

খানিক পরে দুর্যোধন উঠিয়াই, ভীমের কপালে এমন গদার আঘাত করিলেন যে, সে স্থান হইতে দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। কিন্তু ভীমের দেহে এমনি অসাধারণ শক্তি ছিল যে, সেই সাংঘাতিক আঘাতেও তাঁহার কিছুই হইল না। তাহার পরেই দেখা গেল যে, দুর্যোধন ভীমের গদার চোটে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া যাইতেছেন। তখনি আবার দুর্যোধনের আঘাতে ভীমেরও সেই দশা হইল! তখন দুর্যোধন ঘোরনাদে পুনরায় গদাঘাত করত ভীমের কবচ ছিঁড়িয়া দিলেন। সে আঘাতের বেগ ভীম সহজে সামলাইতে পারিলেন না।

এতক্ষণে কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, ন্যায় যুদ্ধে ভীমের দুর্যোধনকে পরাজয় করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি অন্যায় যুদ্ধেই তাঁহাকে বধ করিতে পরামর্শ দিলেন। তখন অর্জুন ইঙ্গিত

করামাত্র ভীম বুঝিতে পারিলেন যে, দুর্যোধনের উরু ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে সংহার করিতে হইবে। গদাযুদ্ধে নাভির নীচে আঘাত নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু ইহা ভিন্ন দুর্যোধনকে বধ করা যাইতেছে না। সুতরাং ভীম এইটুকু অন্যায় করিয়াই নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

আবার যুদ্ধ চলিল। তারপর উভয়েই ক্লান্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। তারপর আবার যুদ্ধ চলিল। এই সময়ে ভীম ইচ্ছা করিয়াই দুর্যোধনকে একটু আঘাতের সুযোগ দিলেন। তাহাতে দুর্যোধন প্রবল বেগে ভীমকে আক্রমণ করিতে আসিবামাত্র ভীম তাঁহাকে গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন; দুর্যোধন বিদ্যুতের মতো সেই গদা এড়াইয়া ভীমকে সাংঘাতিকভাবে আঘাত করিলেন। যাহা হউক, ভীম সেই ভয়ানক আঘাতও আশ্চর্যরূপে সহিয়া রহিলেন। তাঁহার শান্তভাব দেখিয়া দুর্যোধনের মনে হইল বুঝি তাঁহার কি অভিসন্ধি আছে। সুতরাং তিনি তাঁহাকে আর আঘাত না করিয়াই ত্বরায় ফিরিয়া আসিলেন।

তারপর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, ভীম অসীম রোষে দুর্যোধনকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। দুর্যোধন তাঁহাকে এড়াইবার জন্য লাফ দিয়া শূন্যে উঠিবামাত্র ভীম দারুণ গদাঘাতে তাঁহাব দুই উরু ভাঙ্গিয়া দিলেন। তখন ভগ্নপদে নিতান্ত অসহায়ভাবে দুর্যোধনকে ধরাশায়ী হইতে হইল। অমনি ভীম তাঁহার মাথায় পদাঘাতপূর্বক বলিলেন, "রে দুরাত্মা! সভার মধ্যে 'গরু গরু' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলি, আব দ্রৌপদীকে অপমান করিয়াছিলি, তাহার এই সাজা।" এইরূপে গালি দিতে দিতে ভীম দুর্যোধনের মাথায় আবার পদাঘাত করিলেন।

ভীমেব এই ব্যবহারে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, "ভীম! সৎ উপায়েই হউক, আর অসৎ উপায়েই হউক, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি রাখিয়াছ,এখন ক্ষান্ত হও। ইহার মাথায় পদাঘাত করিযা আব পাপ কেন বাড়াও? ইহার অবস্থা দেখিলে এখন বড়ই দুঃখ হয়। এ আমাদের ভাই; তুমি ধার্মিক হইযা কেন উহাকে পদাঘাত করিতেছ?"

তারপর তিনি দুর্যোধনকে বলিলেন, "ভাই, তুমি দুঃখ করিও না। তোমাব দোষেই যুদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি দেহত্যাগপূর্বক এখনি স্বর্গে যাইবে, আব আমবা এখানে সুহৃদ্‌গণের শোকে চিরকাল দারুণ দুঃখ ভোগ কবিব।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন।

ভীমের কাজটি অতি অন্যায় হইয়াছিল; উপস্থিত যোদ্ধারাও ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। বলরাম তো লাঙ্গল উঠাইযা, তখনি ভীমকে বধ কবিতে চাহিয়াছিলেন। কৃষ্ণের অনেক চেষ্টায় তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাব রাগ দূর হইল না। তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন, "তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন, ভীম যে নিতান্ত অন্যায় কবিয়াছেন, এ বিশ্বাস আমাব মন হইতে দূব করিতে পাবিবে না।"

এই বলিয়া বলবাম সেখান হইতে চলিয়া গেলে, যোদ্ধারা সকলে মিলিয়া দুর্যোধনের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "হে ভীম! আজ তুমি দুষ্ট দুর্যোধনকে মারিয়া বড়ই ভালো কাজ করিলে। আমাদের ইহাতে যারপরনাই আনন্দ হইয়াছে।"

তখন কৃষ্ণ সেই যোদ্ধাদিগকে বলিলেন, "যে শত্রু মরিতে বসিয়াছে তাহাকে বকিলে কি হইবে? এ দুষ্ট এখন শত্রুতা বা বন্ধুতা কিছুরই উপযুক্ত নহে। আমাদের ভাগ্যের জোরে এতদিনে পাপী মারা গেল, এখন চল আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।"

এ কথায় দুর্যোধন, দুহাতে মাটিতে ভর দিয়া, মাথা তুলিয়া, কৃষ্ণকে বলিলেন, "হে কংসের দাসের পুত্র! তোমার দুষ্ট বুদ্ধিতেই আমাদের বীরেরা মারা গেলেন। তোমার মতো পাপী, নির্দয়

আর নির্লজ্জ কে আছে?"

তাহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি অনেক পাপ করিয়াছ এখন তাহারই ফল ভোগ কর।"

তাহাতে দুর্যোধন বলিলেন, "রাজার যে সুখ, তাহা আমি ভালো মতোই ভোগ করিয়াছি। এখন আমি সবান্ধবে স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকে দুঃখে আধমরা হইয়া এই পৃথিবীতে পড়িয়া থাক।"

এ কথা বলিবামাত্র স্বর্গ হইতে দুর্যোধনের উপর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইলে পাণ্ডবেরা লজ্জিতভাবে শিবিরে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু সে রাত্রিতে তাঁহাদের সকলের শিবিরের ভিতরে থাকা হইল না। কৃষ্ণের পরামর্শে, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর সাত্যকি তাঁহার সহিত শিবির ছাড়িয়া নদীর ধারে আসিয়া নিদ্রার আয়োজন করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা, দুর্যোধনের উরুভঙ্গের সংবাদ পাইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্যোধনের তখনকার অবস্থা দেখিয়া, সেই তিন বীরের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল! তাঁহারা তাঁহার কাছে বসিয়া অনেক কাঁদিলে, দুর্যোধন তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা আমার জন্য দুঃখ করিবেন না;আমি নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিব। আপনারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন;কিন্তু আমার ভাগ্যে জয়লাভ ছিল না, কি করিব?

এই কথা বলিয়া দুর্যোধন চুপ করিলে, অশ্বত্থামা দুঃখে ও রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, "আমাকে অনুমতি দাও, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ যেমন করিয়া হউক, শত্রুদিগকে মারিয়া শেষ করিব।"

এ কথায় দুর্যোধন তখনই অশ্বত্থামাকে সেনাপতি করিয়া দিলে তাঁহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়াই তিন বীর সিংহনাদ করিতে করিতে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সৌপ্তিকপর্ব

র্যোধনের এখন নিতান্তই দুরবস্থা। নিজে তো মরিতেই চলিয়াছেন;তাঁহার পক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যেও তিনজনমাত্র জীবিত।

এই তিনটি লোকে কি করিতে পারে? তাঁহারা দুর্যোধনের দুর্দশা আর পাণ্ডবদের পরাক্রমের কথা চিন্তা করিতে করিতে রথে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু শত্রুসংহারের কোনো উপায় দেখিতেছেন না। তাঁহারা চুপিচুপি শিবিরের কাছে গেলেন কিন্তু সেখানে পাণ্ডবদের সিংহনাদ শুনিয়া তাঁহাদের ভয় হইল। তারপর ঘুরিতে

ঘুরিতে তাঁহারা একটা বনের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর নিজেরাও অতিশয় ক্লান্ত, ঘোড়াগুলিও আর চলিতে পারে না। এখন একটু বিশ্রাম না করিলেই নয়। তাই সেই বনের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ দেখিতে পাইয়া, তাঁহারা রথ হইতে নামিলেন। নিকটেই জলাশয় ছিল। ঘোড়াগুলিকে খুলিয়া দিয়া, তাঁহারা সেই জলাশয়ে মুখ হাত ধুইয়া, সন্ধ্যাপূজা সারিয়া, বটগাছের নীচে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের ভিতরে কৃপ আর কৃতবর্মার ঘুম আসিল। কিন্তু দুঃখে আর চিন্তায় অশ্বত্থামার ঘুম হইল না। তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রাত্রি হইয়াছে;গাছের ডালে কাকেরা তাহাদের বাসায় সুখে নিদ্রা যাইতেছে। এমন সময় কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড পেচক আসিয়া, ঘুমের ভিতরে, অসহায় অবস্থায়, সেই কাকগুলিকে বধ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পেচক কাকগুলিকে মারিয়া শেষ করিল, একটিও অবশিষ্ট রহিল না।

এই ঘটনা দেখিয়া অশ্বত্থামার মনে হইল, 'তাই তো আমিও তো এই উপায়ে শত্রুদিগকে বধ করিতে পারি।' ইহার পর আর অশ্বত্থামা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখনই কৃপকে ডাকিয়া বলিলেন, "মামা! এইরূপ করিয়া আমরাও শত্রুদিগকে বধ করিব।"

কৃপাচার্য প্রথমে কিছুতেই এমন কাজে মত দেন নাই, কিন্তু ভাগিনেয়ের পীড়াপীড়িতে শেষটা তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। তখন তিনজনে মিলিয়া, সেই নিষ্ঠুর পাপকার্য সাধনের জন্য, পাণ্ডব শিবিরের দিকে যাত্রা করিলেন।

পাণ্ডব শিবিরের কাছে আসিয়া অশ্বত্থামা দেখিলেন যে, একজন অতিশয় উজ্জ্বল পুরুষ শিবিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। সেই উজ্জ্বল পুরুষ স্বয়ং মহাদেব;কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া, তাঁহাকে সেখান হইতে তাড়াইবার জন্য, বাণ মারিতে লাগিলেন।

অস্ত্রে মহাদেবের কি হইবে? অশ্বত্থামা বাণ, শক্তি, অসি, গদা, যাহা কিছু মারিলেন, সমস্তই সেই উজ্জ্বল পুরুষ গিলিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা সকল ক্ষমতা শেষ করিয়া, তারপর আর কি করবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না।

এমন সময় তাঁহার মনে হইল, 'শিবের পূজা করি, তাহা হইলে আমার কাজ হইবে।'

এই মনে করিয়া তিনি শিবের স্তব করিতে করিতে, নিজ শরীর উপহার দিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য, আগুন জ্বালিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিলেন। তখন শিব সন্তুষ্ট না হইয়া আর যান কোথায়? তিনি কেবল যে দরজা ছাড়িয়া দিলেন, তাহা নহে, তাঁহাকে একখানি ধারালো খড়্গও দিলেন, এবং নিজে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার বল বাড়াইতে ত্রুটি করিলেন না।

তারপর যাহা ঘটিল, বলিতে বড়ই ক্লেশ বোধ হয়। অশ্বত্থামা সেই খড়্গ হাতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন;কৃপ আর কৃতবর্মাকে দরজায় রাখিয়া গেলেন, যেন কেহ পলাইয়া যাইতে না পারে।

শিবিরে প্রবেশ করিয়াই অশ্বত্থামা সকলের আগে ধৃষ্টদ্যুম্নের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে তাঁহার পিতাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে বধ করিয়াছিল, তাহার উপর রাগ হইয়াই স্বাভাবিক। সেই রাগেই তিনি সকলের আগে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে মারিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

সুন্দর কোমল শয্যার উপরে ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় অশ্বত্থামার পদাঘাতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চমকিয়া উঠিয়া বসিবামাত্র, অশ্বত্থামা তাঁহাকে চুলে

ধরিয়া মাটিতে আছড়াইতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়া, বুকে লাথি মারিতে আরম্ভ করিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন অনেক কষ্টে বলিলেন, "আমাকে অস্ত্রাঘাতে শীঘ্র সংহার কর।" কিন্তু অশ্বত্থামা তাহা না শুনিয়া পদাঘাতে তাঁহার প্রাণ শেষ করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের চীৎকারে সকলে জাগিয়া উঠিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই ভীষণ রাত্রে ঘুমের ঘোরে, বিষম ত্রাসে কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, কি হইয়াছে।

এদিকে অশ্বত্থামা অস্ত্র হাতে সাক্ষাৎ শমনের ন্যায় সকলকে সংহার করিতেছেন। যোদ্ধারা যুদ্ধ করিবে কি? একে রাত্রিকাল, তাহাতে নিদ্রাকালে হঠাৎ আক্রমণ;হতভাগ্যেরা ভালোমতে প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই অশ্বত্থামা তাহাদিগকে আক্রমণপূর্বক বধ করিতে লাগিলেন।

সে নিষ্ঠুর নীচ ভীষণ কার্যের আর বর্ণনা করিয়া কি হইবে? শিবিরে যত লোক ছিল, স্ত্রীলোক ভিন্ন আর তাহাদের একজনও রক্ষা পাইল না। পাণ্ডবদিগের পুত্রকয়টিকে অবধি অশ্বত্থামা নির্দয়ভাবে বিনাশ করিলেন। তিনি চুপিচুপি চোরের ন্যায় প্রবেশ করিবার সময় শিবির যেমন নিস্তব্ধ ছিল, দেখিতে দেখিতে আবার তাহা সেইরূপ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, রাত্রিও শেষ হইয়াছে।

তারপর বাহিরে আসিয়া, অশ্বত্থামা কৃপ এবং কৃতবর্মাকে নিজ কীর্তি শুনাইলেন, আর জানিতে পারলেন যে, তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া একটি প্রাণীকেও পলায়ন করিতে দেন নাই। তখন তিনজনে মনের আনন্দে করতালি দিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন। এমন কাজের সংবাদটা দুর্যোধনকে তখন জানানো চাই;সুতরাং তাঁহারা তাঁহার নিকট আসিতে আর তিলমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

হায় মহারাজ দুর্যোধন! এখন তিনি কি করিতেছেন?-এখনো তিনি মৃত্যুর অপেক্ষায় রণস্থলে শয়ান। প্রাণ বাহির হইতে বিলম্ব নাই, জ্ঞান লোপ হইয়া আসিতেছে, মুখ দিয়া ক্রমাগত রক্ত বাহির হইতেছে! বৃক প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুগণ আসিয়া তাঁহার মাংসের লোভে তাঁহাকে ঘেরিয়াছে তিনি দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে, অতি কষ্টে তাহাদিগকে বারণ করিতেছেন।

তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সেই তিন বীর আর চোখের জল থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না। একাদশ অক্ষৌহিণীর যিনি অধিপতি ছিলেন, তাঁহার কিনা এই দশা! আর সেই বীরের মাংস খাইবার জন্য, বন্যজন্তুরা তাঁকে ঘেরিয়াছে! যাহা হউক, এসব কথা ভাবিয়া আর কি হইবে? এখন যে সংবাদ লইয়া তিনজন আসিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে শোনানো হউক। এই ভাবিয়া অশ্বত্থামা তাঁহাকে বলিলেন, 'হে কুরুরাজ! যদি জীবিত থাকেন, তবে এই আনন্দের সংবাদ শ্রবণ করুন। এখন পাণ্ডব পক্ষে পাঁচ পাণ্ডব, কৃষ্ণ আর সাত্যকি এই সাতজনমাত্র জীবিত। আজ রাত্রে আমি তাহাদের শিবিরে প্রবেশ করিয়া, আর সকলকে বধ করিয়াছি।"

এ কথায় দুর্যোধন চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "হে বীর! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ যাহা করিতে পারেন নাই, আজ তুমি তাহা করিলে। তোমাদের কথা শুনিয়া নিজেকে ইন্দ্রের ন্যায় সুখী মনে করিতেছি। এখন তোমাদের মঙ্গল হউক;আবার স্বর্গে দেখা হইবে।" এই বলিয়া দুর্যোধন সেই তিনজনকে আলিঙ্গন করিলে, তাঁহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

ইহার কিঞ্চিৎ পরে সঞ্জয় কাঁদিতে কাঁদিতে এই সংবাদ লইয়া হস্তিনার উপস্থিত হইলেন।

সেদিন আর তিনি অন্যদিনের মতো স্থিরভাবে তাঁহার কথা বলিতে পারিলেন না। ধৃতরাষ্ট্রের পুরীতে প্রবেশমাত্রই, তিনি দুহাত তুলিয়া, 'হা মহারাজ! হা মহারাজ!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার মুখে সেই দারুণ সংবাদ শুনিয়া, সকলের, বিশেষত ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীর, যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনাতীত। সে সংবাদে কেহ অজ্ঞান কেহ বা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। অনেকে পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তারপর এমন কান্না আরম্ভ হইল যে, তাহা শুনিলে বুঝি পাথরও গলিয়া যায়।

এদিকে রাত্রির সেই ভীষণ ব্যাপারের সংবাদ পাইয়া, পাণ্ডবগণের কিরূপ কষ্ট হইল, তাহা আর বলিয়া কি হইবে? নকুল তখনই দ্রৌপদীকে আনিতে পাঞ্চাল দেশে চলিয়া গেলেন। দ্রৌপদী আসিলে পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত এমনভাবে কাটিল যে, সে দুঃখের আর তুলনা নাই। দ্রৌপদী কাঁদিতে কাঁদিতে রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, "আজ যদি সেই পামরকে সংহার করা না হয়, তবে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।"

যুধিষ্ঠির তখন তাঁহাকে বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে শান্ত না হইয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি অশ্বত্থামার জন্মাবধি তাহার মাথায় একটা মণি আছে। ঐ দুরাত্মার প্রাণ বধপূর্বক সেই মণি আনিয়া দিতে পারিলে, আমি তাহা তোমাকে পরাইয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইতে পারি।"

তিনি ভীমকেও বলিলেন, "অশ্বত্থামাকে মারিয়া এই মণি আনিয়া দিতে হইবে।" একথা বলামাত্রই ভীম নকুলকে সারথি করিয়া অশ্বত্থামার খোঁজে বাহির হইলেন। অশ্বত্থামার রথের চাকার দাগ স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল, সুতরাং তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা তেমন কঠিন কাজ বলিয়াও বোধ হইল না।

কিন্তু ভীমকে অশ্বত্থামার খোঁজে যাইতে দেখিয়া কৃষ্ণের বড়ই চিন্তা হইল। তিনি জানতেন যে অশ্বত্থামাকে দ্রোণ ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র দিয়াছিলেন। উহা এমনই ভয়ংকর যে, তাহার বদলে অশ্বত্থামা কৃষ্ণের চক্র চাহিতেও লজ্জাবোধ করেন নাই। অশ্বত্থামা রাগের ভরে ভীমের উপরে এই অস্ত্র মারিয়া বসিলে, তাঁহার রক্ষা থাকিবে না। সুতরাং কৃষ্ণ তখনই যুধিষ্ঠির আর অর্জুনকে লইয়া রথারোহণে ভীমের অনুগামী হইলেন। ভীমকে পাইতেও তাঁহাদের বিলম্ব হইল না। কিন্তু তিনি কি নিষেধ শুনিবার লোক? তিনি তাঁহাদের কথা না শুনিয়াই ছুটিয়া চলিলেন। তারপর গঙ্গার ধারে আসিয়া অশ্বত্থামাকে ব্যাসদেবের নিকট দেখিবামাত্র তিনি, "দাঁড়া বামুন, দাঁড়া!" বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গেলেন।

অশ্বত্থামা দেখিলেন বড়ই বিপদ। একা ভীম হইতেই রক্ষা নাই, তাহাতে আবার ভীমের পশ্চাতে কৃষ্ণ, অর্জুন আর যুধিষ্ঠিরকেও দেখা যাইতেছে, কাজেই তিনি তখন প্রাণভয়ে তাড়াতাড়ি "পাণ্ডব বংশ নষ্ট হউক!" বলিয়া, সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র ছুঁড়িয়া বসিলেন। তখন সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "শীঘ্র তোমার দ্রোণদত্ত সেই মহাঅস্ত্র ছাড়।"

অর্জুন তৎক্ষণাৎ, "এই অস্ত্রে অশ্বত্থামার অস্ত্র বারণ হউক।" বলিয়া তাঁহার অস্ত্র ছাড়িলেন। অমনি সেই দুই অস্ত্রের তেজে এমন ভয়ংকর গর্জন উল্কাবৃষ্টি আর বজ্রপাত আরম্ভ হইল যে, সকলে ভাবিল, বুঝি সৃষ্টি নষ্ট হয়।

তখন নারদ আর ব্যাসদেব, সৃষ্টি রক্ষার জন্য, সেই দুই অস্ত্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া অর্জুন ও অশ্বত্থামাকে শীঘ্র তাঁহাদের অস্ত্র থামাইতে বলিলেন। অর্জুন বলিলেন, "অশ্বত্থামার অস্ত্র

বারণের জন্য আমি অস্ত্র ছুঁড়িয়াছিলাম। আমার অস্ত্র থামাইলেই উহার অস্ত্র আমাদিগকে ভস্ম করিবে। অতএব যাহাতে সকলে রক্ষা পাই আপনারা তাহা করুন।"

এ কথা বলিয়াই অর্জুন তাঁহার অস্ত্র থামাইয়া দিলেন। অতিশয় সত্যবাদী সাধুপুরুষ না হইলে সে অস্ত্র থামাইতে পারে না। মনের ভিতরে কিছুমাত্র মন্দভাব লইয়া উহা থামাইতে গেলে, উহাতে তৎক্ষণাৎ নিজেরই মাথা কাটা যায়। অর্জুন অসাধারণ সাধুপুরুষ ছিলেন, তাই তিনি ইচ্ছামাত্রই তাঁহার অস্ত্র থামাইয়া দিলেন।

কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁহার অস্ত্র থামাইতে না পারিয়া, মুনিদিগকে বলিলেন, "আমি ভীমের ভয়ে অস্ত্র ছাড়িয়াছিলাম, এখন তো আর থামাইতে পারিতেছি না; বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি; এ অস্ত্র নিশ্চয়ই পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবে।"

কিন্তু মুনিরা এরূপ অন্যায় কথায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "অর্জুন যখন তাঁহার অস্ত্র ফিরাইয়া লইয়াছেন, অশ্বত্থামারও পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করা নিতান্ত উচিত।"

বাস্তবিকই কেবল পাণ্ডবদেরই ক্ষতি হইবে, অশ্বত্থামার কিছুই হইবে না এমন হইলে অর্জুন তাঁহার অস্ত্র থামাইতে রাজি হইবেন কেন? অথচ এদিকে অশ্বত্থামার নিজের অস্ত্র থামাইবার শক্তি না থাকায় পাণ্ডবদিগের কিছু ক্ষতি না হইয়া যাইতেছে না। এ অবস্থায় অশ্বত্থামার অস্ত্রে অভিমন্যুর শিশুপুত্রটি মারা যাইবে; আর অশ্বত্থামা তাঁহার মাথার মণি পাণ্ডবদিগকে দিবেন।

এইরূপে পাণ্ডবেরা অশ্বত্থামার মাথার মণি আনিয়া দ্রৌপদীকে দিলে, সেই মণি যুধিষ্ঠিরের মাথায় পরাইয়া, এত দুঃখের ভিতরেও তিনি কিঞ্চিৎ সুখ পাইলেন।

আর অভিমন্যুর সেই পুত্রটির কি হইল? শিশুটি তখনো জন্মে নাই, সেই অবস্থায়ই সে মারা গেল। তাহার জন্মের পর মরা ছেলে দেখিয়া সকলে কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, কৃষ্ণ আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন। ছেলেটির নাম হইল পরীক্ষিৎ। যুধিষ্ঠিরের পরে এই পরীক্ষিৎ হস্তিনায় ষাটস হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল।

স্ত্রীপর্ব

ঠারো দিনের পর কুরুক্ষেত্রের সেই ভীষণ যুদ্ধের শেষ হইল। আঠারো অক্ষৌহিণী লোক এই যুদ্ধে প্রাণ দিযাছে। এখন সেই সকল যোদ্ধার ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেবল শোক করিয়া তো আর চলিবে না, মৃত লোকদের শ্রাদ্ধাদির আয়োজন করা চাই।

একশত পুত্রের শোক কি সহজ কথা? সামলাইয়া উঠিতে ধৃতরাষ্ট্রের বড়ই কষ্ট হইল। ব্যাস, বিদুর প্রভৃতি অনেকে বুঝাইয়াও তাঁহাকে সহজে শান্ত করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, অনেক কষ্টে শেষে তিনি কতক স্থির হইলেন, আর পাণ্ডবদের উপরও তাঁহার রাগ অনেকটা কমিল। ব্যাস তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তোমার পুত্রেরা নিতান্তই দুরাচার ছিল। তাহাদের দোষেই এই সর্বনাশ হইয়াছে; পাণ্ডবদের ইহাতে কিছুমাত্র অপরাধ নাই।"

তারপর শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে, সঞ্জয় আর বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইয়া বলিলেন, "মহারাজ এখন শ্রাদ্ধাদির সময় উপস্থিত। শোকের মোহে সে সকল কার্যে অবহেলা করিবেন না।"

তখন ধৃতরাষ্ট্র, পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করিলেন। কুলবধূগণ বিধবার বেশে পথে বাহির হইলে পৃথিবীসুদ্ধ লোক তাঁহাদের দুঃখে কাঁদিয়া আকুল হইল।

এদিকে পাণ্ডবেরাও কৃষ্ণ, সাত্যকি আর দ্রৌপদী প্রভৃতিকে লইয়া কুরুক্ষেত্রের দিকে আসিতেছিলেন। কিছুদূর আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের দেখা হইবামাত্র কৌরব নারীগণের দুঃখ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল, কেননা পাণ্ডবেরাই এই দুঃখের কারণ।

পাণ্ডবেরা একে একে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে যাইয়া নিজ নিজ নাম বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিরক্তভাবে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন ও তাঁহার সহিত দু একটি কথা কহিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভীম কোথায়?" তখন তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝা গিয়াছিল যে, ভীমকে পাইলে তিনি তাঁহাকে বধ না করিয়া ছাড়িবেন না। তাঁহার এরূপ অভিসন্ধির কথা কৃষ্ণ পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেও ভুলেন নাই। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র ভীমের কথা জিজ্ঞাসা করামাত্র, তিনি একটা লোহার ভীম আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সেই লোহার মূর্তিটাকে আলিঙ্গন করিবার ছলে, ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে এমনি চাপিয়া দিলেন. যে, তাহা একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল! ধৃতরাষ্ট্রের দেহে লক্ষ হাতির জোর ছিল, সুতরাং তিনি যে লোহার ভীম চূর্ণ করিবেন, তাহা আশ্চর্য নহে। আসল ভীমকে পাইলে না জানি তিনি তাঁহার কি দশা করিতেন।

যাহা হউক লোহার ভীম চূর্ণ করা লক্ষ হাতির জোরের পক্ষেও সহজ কথা নহে; সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র সে কাজ শেষ করিয়াই রক্ত বমি করিতে করিতে পড়িয়া গেলেন। এদিকে ভীমের যথেষ্ট সাজা হইয়াছে মনে করিয়া, তাঁহার রাগ চলিয়া গেল, তখন আবার তিনি "হা ভীম! হা ভীম!" করিয়া কাঁদিতে ত্রুটি করিলেন না। তাহাতে কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! দুঃখ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। ওটা লোহার ভীম, যথার্থ ভীম নহে। ভীমকে বধ করিতে যাওয়া আপনার উচিত হয় নাই। দেখুন, যুদ্ধ বারণ করিতে অশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, তথাপি আপনার পুত্রেরা তাহাতে ক্ষান্ত হন নাই; তাহারা ফলেই এখন তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সুতরাং ভীমকে তাহার জন্য দোষী করেন কেন?"

কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "কৃষ্ণ! তোমার কথাই সত্য! শোকে বুদ্ধিনাশ হওয়াতেই আমি ঐরূপ করিয়াছিলাম।" এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেবকে আলিঙ্গনপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা গান্ধারীর কথা ভাবিয়াই পাণ্ডবদের মনে অধিক ভয় হইয়াছিল। গান্ধারী সামান্য স্ত্রীলোক ছিলেন না। জীবনে তিনি কখনো একটি অধর্মের কাজ করেন নাই বা একটি

অধর্মের কথা মুখে আনেন নাই। অন্ধ স্বামীর দুঃখে তিনি এতই দুঃখিত ছিলেন যে, বিবাহের পরেই তিনি নিজের চক্ষু মোটা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলেন। সে বাঁধন তাঁহার চিরদিন একভাবে ছিল। যুদ্ধের সময় যখন দুর্যোধনেরা জয়লাভের জন্য তাঁহার আশীর্বাদ চাহিতে আসিলেন, তখন গান্ধারী তাঁহাদের মা হইয়াও এ কথা মুখে আনিতে পারিলেন না যে, 'তোমাদের জয় হউক', তিনি বলিলেন 'ধর্মের জয় হউক।

সেই দেবতার ন্যায় তেজস্বিনী ধার্মিকা রমণীর ক্রোধের কথা ভাবিয়াই পাণ্ডবেরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। আর ক্রোধও তাঁহার খুবই হইয়াছিল। সেই ক্রোধে পাছে তিনি পাণ্ডবদিগকে শাপ দেন এই ভয়ে ব্যাসদেব পূর্বেই তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন, "মা! তুমিই বলিয়াছিলে 'ধর্মের জয় হউক', সেই ধর্মের জয় হইয়াছে। তোমার যে অসাধারণ ক্ষমাগুণ, তাহাই ধর্ম, আর এখন যে ক্রোধ করিতেছ তাহা অধর্ম মা! ধর্মের উপর যেন অধর্মের জয় না হয়।"

ইহার উত্তরে গান্ধারী বলিলেন "ভগবন! পাণ্ডবদিগের উপর আমার ক্রোধ নাই তাহাদের বিনাশ আমি চাহি না। কিন্তু ভীম যে অন্যায়পূর্বক দুর্যোধনকে মারিয়াছে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না

তাই ভীম গান্ধারীর নিকট উপস্থিত হইয়া ভয়ে ভয়ে বিনয়ের সহিত বলিলেন, "মা! আমার অপরাধ হইয়াছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ভাবিয়া দেখুন, আপনার পুত্রেরা আমাদিগের বড়ই অনিষ্ট করিয়াছিল।

গান্ধারী বলিলেন, বাছা! আমার একশত পুত্রের মধ্যে যাহার কিছু কম অপরাধ, এমন একটিকেও যদি জীবিত রাখিতে, তাহা হইলেও সে এই দুই অন্ধের নড়িস্বরূপ হইতে পারিত। এখন আমাদের পুত্র নাই কাজেই তুমি আমাদের পুত্রের মতন হইলে।"

তারপর যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট আসিয়া জোড়হাতে বলিলেন, "দেবী! আমিই আপনাদের দুঃখের মূল। আমি অতি নরাধম আমাকে শাপ দিন "

গান্ধারী এ কথায় কোনো উত্তর না দিয়া, কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সেই সময়ে যুধিষ্ঠির গান্ধারীর পায়ে ধরিতে গেলে, গান্ধারী তাঁহার চোখের বাঁধনের ফাঁক দিয়া যুধিষ্ঠিরের আঙ্গুলের নখ দেখিতে পান। তদবধি যুধিষ্ঠিরের নখ মরিয়া গেল। তাহা দেখিয়া অর্জুন, সহদেব এবং নকুল ভয়ে আর তাঁহার নিকট আসিলেন না। তখন গান্ধারী তাহাদিগকে ডাকিয়া স্নেহের সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

তারপর পাণ্ডবেরা কুন্তীর নিকটে গেলেন। এত দুঃখ-কষ্টের পর তাঁহাদিগকে, পাইয়া আর তাঁহাদিগকে অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত এবং দ্রৌপদীকে পুত্রশোকে আকুল দেখিয়া, না জানি কুন্তীর কতই কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে কষ্টের দিকে মন না দিয়া, তিনি দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

তারপর সকলে মিলিয়া সেখান হইতে রণস্থলে গেলেন। তখন নিজ নিজ আত্মীয়গণের মৃত শরীর দেখিয়া তাঁহাদের যে দারুণ দুঃখ হইল, তাহা কথা অধিক বলিয়া আর কি হইবে? সেই মৃতদেহগুলির সৎকারই হইল তখনকার প্রথম কাজ। বহুমূল্য কাষ্ঠ, ঘৃত, চন্দনাদিতে অসংখ্য চিতা প্রস্তুত করিয়া যত্নপূর্বক সে কাজ শেষ করা হইলে, সকলে স্নান ও জলাঞ্জলি (অর্থাৎ যাহারা মরিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি ভরিয়া জল) দিবার জন্য গঙ্গা তীরে

উপস্থিত হইলেন।

এই সময় কুন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে পাণ্ডবদিগকে বলিলেন, "বৎসগণ! কর্ণের জন্য জলাঞ্জলি দাও, সে তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভাই ছিল।"

হায়! চিরকাল কর্ণের সহিত সাংঘাতিক শত্রুতা করিয়া তাঁহাকে আহ্লাদপূর্বক নিধনের পর ইহা কি নিদারুণ সংবাদ! সে সংবাদ শুনিয়া পাণ্ডবদিগের ন্যায় বীরপুরুষেরাও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

তখন যুধিষ্ঠির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কুন্তীকে বলিলেন, "মা! তুমি আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা গোপন করিয়া কি অন্যায় কাজই করিয়াছ! আমরা তাহাকে বধ করিয়াছি, এ কথা ভাবিয়া এখন বুক ফাটিয়া যাইতেছে। হায়! এ কথা আগে বলিলে কি আর এ নিষ্ঠুর যুদ্ধ হইত?"

শান্তিপর্ব

দবধি যুধিষ্ঠির এ কথা জানিতে পাবিলেন যে, কর্ণ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভাই, সেই অবধি তাঁহার শোকে এবং না জানিয়া তাঁহাকে বধ করার জন্য দুঃখ আর অনুতাপে, তিনি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। যে রাজ্যের জন্য এমন ঘটনা ঘটে, তাহার প্রতি তাঁহার এতই ঘৃণা জন্মিয়া গেল যে, আর কিছুতেই সে রাজ্য ভোগ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। ভাইদিগকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমার রাজ্য করিতে ইচ্ছা নাই, রাজ্য ছাড়িয়া বনে গিয়া আমি তপস্যা করিব।"

এ কথায় সকলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে রাজ্যের জন্য এত ক্লেশ, এত রক্তপাত, সে রাজ্য হাতে পাইয়া কোন রাজা তাহা পালন এবং রক্ষার অবহেলা করিতে পারে? বনে যাওয়াই যদি কর্তব্য হয়, তবে এত কাণ্ডের কি প্রয়োজন ছিল? না হয় এই রাজ্য দ্বারা দান যজ্ঞাদি, ধর্ম কাজই হউক-না। ইহা ছাড়িয়া দিলে কি প্রশংসার কাজ হইবে?

এইরূপে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী সকলে মিলিয়া যুধিষ্ঠিরকে কত বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই যুধিষ্ঠিরের মন শান্ত হইল না। তিনি সবিনয়ে ব্যাসকে বলিলেন, "ভগবন্! ধর্মের কথা আমাকে আরো ভালো করিয়া বলুন। কিরূপে একজন লোকে রাজ্যও করিতে পারে, আর ধর্মও করিতে পারে, এ কথা না বুঝিতে পারিয়া আমার মনে বড়ই চিন্তা হইতেছে।"

তখন ব্যাস তাঁহাকে বলিলেন, "যদি ভালো করিয়া ধর্মের কথা শুনিতে তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মের নিকটে যাও, তিনি তোমার সংশয় দূর করিবেন।

তিনি দেহত্যাগ না করিতে করিতে শীঘ্র তাঁহার নিকট যাও।"

কৃষ্ণও বলিলেন, "মহারাজ! অতিশয় শোক করা আপনার মতো লোকের উচিত নহে। মহর্ষি ব্যাস যাহা বলিলেন, আপনি তাহাই করুন!"

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতে সকলে নগরের বাহিরেই বাস করিতেছিলেন, এ পর্যন্ত তাঁহাদের হস্তিনায় প্রবেশ হয় নাই। ব্যাস এবং কৃষ্ণের উপদেশ এবং ভীষ্মের কথা শুনিবার আশায় মনে কতকটা শান্তি লাভ করাতে, এখন যুধিষ্ঠির হস্তিনায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

তখন শুভ্র, সুন্দর, সুসজ্জিত ষোড়শ বৃষযুক্ত শ্বেত রথে যুধিষ্ঠিরকে তুলিয়া, অর্জুন তাহার উপরে নির্মল শ্বেতছত্র ধারণ করিলেন, নকুল, সহদেব শুভ্র চামর লইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন, ভীম বল্গা হস্তে সেই রথের সারথি হইলেন। কৃষ্ণ শ্বেত রথে চড়িয়া সঙ্গে চলিলেন; ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলে, কেহ শিবিকায়, কেহ রথে, তাঁহাদের অনুগামী হইলেন।

নগরবাসীগণের তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা যত্নে রাজপথ, গৃহতোরণাদি সাজাইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। জনতার জয়গীতে, দুন্দুভী রব শঙ্খনাদ আর দ্বিজগণের আশীর্বাদ মিলিয়া, সে সময়ে এমনি একটি সুখের ব্যাপার হইয়াছিল যে, তাহার আর তুলনাই নাই।

ইহার মধ্যে চার্বাক নামক একটা দুষ্ট রাক্ষস, ভিক্ষুকের বেশে আসিয়া বড়ই রসভঙ্গ করিয়া দিল। হতভাগা দুর্যোধনের বন্ধু, পাণ্ডবদিগের অনিষ্টের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ব্রাহ্মণেরা যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ কবিতেছেন, তাহাতে দুষ্ট আসিয়া বলে কি, "মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ জ্ঞাতি বধের জন্য আপনাকে দুষ্ট রাজা বলিয়া গালি দিতেছেন। আপনার জীবনে কোনো প্রয়োজন নাই, আপনার মৃত্যুই শ্রেয়।"

এ কথা শুনিয়া ক্রোধে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণগণের কথা সরিল না। ইহার মধ্যে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে দ্বিজগণ! আপনারা দয়া করিয়া আমাকে গালি দিবেন না; আমি অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিব!"

তখন ব্রাহ্মণেরা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "মহাবাজ, আমরা আপনাকে গালি দেই নাই! আপনার মঙ্গল হউক! এই দুরাত্মা দুর্যোধনের বন্ধু, চার্বাক নামক রাক্ষস। দুর্যোধনের বন্ধু বলিয়াই দুষ্ট আপনাকে গালি দিয়াছে, আমরা কিছুই বলি নাই। আপনি কোনো ভয় করিবেন না।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বিষম রোষনয়নে চার্বাকের দিকে চাহিবামাত্র দুরাত্মার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

তারপর বিধিমতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক হইয়া গেলে, তিনি উপযুক্ত লোকদিগের হাতে রাজ্যের কাজ বাঁটিয়া দিলেন। ভীম হইলেন যুবরাজ, বিদুর হইলেন মন্ত্রী, সঞ্জয় আয় ব্যয়-পরীক্ষক, নকুল সৈন্য পরিদর্শক, অর্জুন শত্রু ও দুষ্ট শাসক, সহদেব দেব-রক্ষক, ধৌম্য দেবসেবা সম্পাদক। সকলের প্রতিই আদেশ রহিল যে, "ধৃতরাষ্ট্র যখন যেরূপ আজ্ঞা দেন, তাঁহারই মতে চলিতে হইবে।'

এইরূপে রাজকার্যের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া, যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সেই শরশয্যার দিন হইতে ভীষ্ম সেইভাবেই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া, সূর্যের উত্তরায়ণের (অর্থাৎ আকাশের উত্তর ভাগে যাওয়ার) অপেক্ষা করিতেছেন। উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলেই সেই

মহাপুরুষের দেহত্যাগের সময় হইবে। তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, কৃপ, সঞ্জয় প্রভৃতি রথে চড়িয়া যাত্রা করিলেন।

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, সেই মহাবীরের মৃত্যুশয্যার চারিদিকে মুনি-ঋষিগণ ঘিরিয়া বসায়, সে স্থানের এক অপূর্ব শোভা হইয়াছে। দূর হইতে তাহা দেখিয়াই, সকলে রথ হইতে নামিয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন।

তখন কৃষ্ণ ভীষ্মের নিকটে গিয়া, বিনয়ের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "হে কুরুপিতামহ! আপনার তুল্য মহৎ লোক এই পৃথিবীতে কেহই নাই; ধর্মের সকল তত্ত্বই আপনার জ্ঞাত। রাজা যুধিষ্ঠির শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছেন; এ সময়ে আপনি দয়া করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলে, তাঁহার শান্তিলাভ হইতে পারে।"

যুধিষ্ঠির লজ্জায় ভীষ্মের নিকটে গিয়া কথা বলিতে সাহস পান নাই। কিন্তু ভীষ্মের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "যুধিষ্ঠির তো যুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্মই পালন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার লজ্জিত হইবার কোনো কারণ নাই।"

তখন যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট আসিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে, ভীষ্ম তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্বক বলিলেন, "তোমার কোনো ভয় নাই; মন খুলিয়া আমাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা কর।"

এই সময় কৃষ্ণ ভীষ্মের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা এবং দুর্বলতা দূর করিয়া দিলেন।

তারপর বহুদিন পর্যন্ত, যুধিষ্ঠির প্রত্যহ সেই মহাপুরুষের নিকট আসিয়া, যেসকল অমূল্য উপদেশ পাইয়াছিলেন, তোমরা বড় হইয়া তাহার কথা পড়িবে। এমন উপদেশ যে সে দিতে পারে না। তাই যুধিষ্ঠির উপদেশ লইতে আসিলে নারদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এই মহাত্মা ধর্মের সকল সংবাদ জানেন, ইনি বাঁচিয়া থাকিতে তাহা শুনিয়া লও।"

অনুশাসনপর্ব

শেষ উপদেশ দ্বারা যুধিষ্ঠিরের মনের সকল সংশয় দূর করিয়া ভীষ্মদেব চুপ করিলে, চারিদিকের লোকেরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছবির ন্যায় স্থির এবং নিঃশব্দ হইয়া রহিল। তারপর যুধিষ্ঠির তাঁহার পায়ের ধূলা ও আশীর্বাদ লইয়া, হস্তিনায় ফিরিলেন। বিদায়কালে ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন, "সূর্যদেবের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে আমার নিকট আসিও।"

তারপর কিছুদিন গেলে, যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ আসিয়াছে। ইহাই সূর্যের উত্তরায়ণের সময়, এই সময়েই ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ করিবার কথা। সুতরাং তিনি অবিলম্বে পুরোহিত, পুরজন প্রভৃতি সকলকে সঙ্গে লইয়া রত্ন, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, পট্টবস্ত্র, চন্দনাদিসহ কুরুক্ষেত্রে

যাত্রা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ, বিদুর, সাত্যকি প্রভৃতিও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন।

ভীষ্মদেবের শরশয্যার চারিধারে ব্যাস, নারদ প্রভৃতি মুনিরা ও নানা দেশের রাজাগণ বসিয়া আছেন, এমন সময় যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "তোমরা আসাতে আমি বড় সুখী হইলাম। এই শরশয্যার আমার আটান্ন দিন কাটিয়াছে; এখন মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ উপস্থিত।"

তারপর তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "ধর্মের কথা তোমার অজানা নাই; সুতরাং আর শোক করিও না। এখন তুমি পাণ্ডবদিগকে প্রতিপালন কর।"

কৃষ্ণকে তিনি বলিলেন, "আমার দেহত্যাগের সময় উপস্থিত। অতঃপর আমার যেন স্বর্গলাভ হয়।"

সকলের প্রতি তাঁহার শেষ কথা এই হইল, "তোমরা অনুমতি কর, আমি দেহত্যাগ করি। তোমাদের বুদ্ধি যেন কদাপি সত্যকে পরিত্যাগ না করে; সত্যের তুল্য আর বল নাই।"

তাবপর সেই মহাপুরুষ মৌনাবলম্বনপূর্বক দেহত্যাগে উদ্যত হইলে শর সকল একে একে তাঁহাব শরীর হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার দেহে একটি শরের দাগ পর্যন্ত রহিল না। দেখিতে দেখিতে তাঁহাব উজ্জ্বল আত্মা, তাঁহার মস্তক হইতে উঠিয়া স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করিবামাত্র, দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি এবং দুন্দুভি বাদ্য আরম্ভ করিলেন।

এমন মহাত্মার জন্য কি আর শোক কবিতে হয়? বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতিবা তাঁহাকে মহামূল্য পট্টবস্ত্র ও উষ্ণীষ পবাইয়া তাঁহার উপরে উৎকৃষ্ট ছত্র ধাবণপূর্বক, চামব দোলাইতে লাগিলেন। নারীগণ তালবৃন্ত হস্তে চারিদিকে দাঁড়াইয়া ব্যজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে সুমধুর সামগান আরম্ভ হইয়াছে, চন্দন কাষ্ঠের চিতাও প্রস্তুত। সেই চিতার আগুনে ভীষ্মের দেহ শেষ করিয়া এবং তাঁহার উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিয়া সকলে তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

আশ্বমেধিকপর্ব

জয় লাভের পর যুধিষ্ঠিরের প্রথম কীর্তি হইল অশ্বমেধ যজ্ঞ। যুধিষ্ঠিরের শোক কিছুতেই একেবারে দুর না হওয়ায়, সকলে তাঁহাকে এই মহাযজ্ঞে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত বৃহৎ এবং কঠিন ব্যাপার; অল্প ধন লইয়া কিছুতেই ইহাতে হাত দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং যুধিষ্ঠির এ যজ্ঞ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াও, ইহা আরম্ভ করিতে ভয় পাইলেন।

ধনরত্ন যাহা কিছু ছিল, যুদ্ধে প্রায় তাহার সমস্তই ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখন অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযুক্ত ধন কোথায় পাওয়া যাইবে? যুধিষ্ঠিরের এইরূপ চিন্তা দেখিয়া ব্যাস তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস, তুমি চিন্তা করিও না; ধন সহজেই পাওয়া যাইবে। পূর্বে মহারাজ মরুত্ত হিমালয় পর্বতে যজ্ঞ করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে এত অধিক সুবর্ণ দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা বহিতে না পারিয়া সেইখানেই ফেলিয়া আসেন। সেই সুবর্ণ এখনো তথায় রহিয়াছে; তাহা আনিলে অনায়াসে তোমার যজ্ঞ হইতে পারে।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির হর্ষভরে অমাত্যগণের সহিত সেই ধন আনয়নের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতি সকলেই বলিলেন, "ব্যাসদেবের পরামর্শ অতি উত্তম।" সুতরাং অবিলম্বে মরুত্তের যজ্ঞের সোনা আনিবার জন্য হিমালয় যাত্রার আয়োজন হইল। সেখানে গিয়া উহা খুঁজিয়া বাহির করিতেও বিশেষ ক্লেশ হইল না।

সেকালের লোকে এত ধন কোথায় পাইত? আর না জানি তাহারা কিরূপ মহাশয় লোক ছিল যে, এত ধন দান করিত! মরুত্ত রাজার যজ্ঞের সেই সোনা আনিতে, ষাটলক্ষ উট, এক কোটি বিশ লক্ষ ঘোড়া, দুই লক্ষ হাতি, এক লক্ষ রথ, এক লক্ষ গাড়ি লাগিযাছিল। আর মানুষ আর গাধা যে কত লাগিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। এতগুলিতেও কি সে ধন সহজে আনিতে পারিয়াছিল? তাহারা সেই সোনার ভারে বাঁকা হইয়া, দিনে দুই ক্রোশের অধিক পথ চলিতে পারে নাই!

এত ধন যে যজ্ঞে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা যে কত বড় যজ্ঞ, বুঝিয়া লও। একটি প্রশস্ত ভূমি খাঁটি সোনায় মুড়িয়া, তাহার উপর যজ্ঞের গৃহাদি প্রস্তুত হইল। জমিটি যেমন, ঘর বাড়িও অবশ্য তাহার উপযুক্তই হইয়াছিল। এদিকে অর্জুন, ইহার অনেক পূর্বেই, গাণ্ডীব হাতে, একটি সুন্দর ঘোড়ার পশ্চাতে পৃথিবীর সকল স্থানে ঘুরিয়া আসিবে। ইহার মধ্যে কাহাকেও সে ঘোড়া আটকাইতে দেওয়া হইবে না। আর, অর্জুন যাহার রক্ষক, তাহাকে কেহ আটকাইয়া রাখিবার আশঙ্কাও নাই।

অর্জুনের যাত্রাকালে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলেন, "যাঁহারা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের পুত্র পৌত্রদিগকে বধ করিও না।" অর্জুন যথাসাধ্য এই আজ্ঞা পালনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সেজন্য তাঁহাকে বিস্তর ক্লেশও পাইতে হইল। কুরুক্ষেত্রে কত রাজাই পাণ্ডবদিগের হাতে মারা গিয়াছে; তাহাদের দেশে গেলেই, তাহাদের পুত্র পৌত্র আর দেশের লোকেরা ক্ষেপিয়া অর্জুনকে মারিতে আইসে। তিনি তাহাদিগকে অধিক বাণ মারেন না, পাছে বেচারারা মারা যায়। কিন্তু তাহাতে তাহারা মনে করে, বুঝি তিনি ভালোরূপ যুদ্ধই করিতে পারেন না; কাজেই তাহারা মহোৎসাহে তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করে। সুতরাং তখন তিনি তাহাদের দু-চারজনকে মারিতে বাধ্য হন। তারপর তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া তাঁহার নিকট হাতজোড় করিতে থাকে।

ত্রিগর্ত দেশে সুশর্মার পুত্র ধৃতবর্মার সহিত এইরূপ হইল। প্রাগ্‌জ্যোতিষে ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের সহিত এইরূপ হইল। সিন্ধুদেশে জয়দ্রথের আত্মীয়গণও এইরূপ আরম্ভ করিল। শেষে তাহাদের অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় তিনি তাহাদের মাথা কাটিতে আরম্ভ করিলে আর তাহাদের দুর্দশার সীমা নাই।

এমন সময় জয়দ্রথের স্ত্রী দুঃশলা, তাঁহার শিশু পৌত্রটিকে কোলে লইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে অর্জুনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুঃশলা ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা, সুতরাং অর্জুনের ভগিনী। তাঁহাকে দেখিবামাত্র অর্জুন গাণ্ডীব রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "ভগিনী! তোমার কি কাজ করিব, বল।"

ইহার উত্তরে দুঃশলা যাহা বলিলেন, তাহাতে অর্জুনের মনে বড়ই ক্লেশ হইল। জয়দ্রথের সঙ্গে দুঃশলার বিবাহ হইয়াছিল। জয়দ্রথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুরথ, পিতার শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। ইহার উপরে যখন তিনি শুনিলেন যে অর্জুন যজ্ঞের ঘোড়া সমেত আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন, তখনি তাঁহার মৃত্যু হইল। এখন দুঃখিনী বিধবা দুঃশলা, পতি পুত্রের শোকে অস্থির হইয়া, পৌত্রটিকে অর্জুনেব নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, যদি তাহাকে দেখিয়া অর্জুনের দয়া হয়।

ছেলেটি যখন মাথা হেঁট করিয়া কাতরভাবে অর্জুনকে প্রণাম করিল, তখন আর তিনি চক্ষের জল না রাখিতে পারিয়া বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের ধর্মকে ধিক্! এই ধর্ম পালন করিতে গিয়াই বন্ধু-বান্ধবদিগকে বধ করিয়াছি!"

এই বলিয়া তিনি দুঃশলাকে সাদর মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া তথা হইতে বিদায় হইলেন।

মণিপুরের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। এখন সেই চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহণ মণিপুরের রাজা। ঘোড়া মণিপুরে উপস্থিত হইলে বভ্রুবাহণ তাঁহার পিতার আগমন সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই পাত্রমিত্র সমেত, অতি বিনীতভাবে অর্জুনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু অর্জুন ইহাতে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বভ্রুবাহণকে বলিলেন, "আমি আসিলাম যুদ্ধ করিতে, আর তুমি করজোড়ে আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলে! ইহা কখনোই ক্ষত্রিয়ের কাজ নহে, ইহা কাপুরুষের কাজ। তোমাকে ধিক্। তোমার জীবনে প্রয়োজন কি?"

এ কথায় বভ্রুবাহণ নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। এমন সময় সেই যে উলূপী নাম্নী নাগকন্যার সহিত অর্জুনের বিবাহ হইয়াছিল, তিনি আসিয়া বভ্রুবাহণকে বলিলেন, "বাছা, আমি তোমার বিমাতা উলূপী। তোমার পিতা যখন যুদ্ধের বেশে আসিয়াছেন, তখন ইহার সহিত যুদ্ধ করাই তোমার উচিত। তাহাতে ইনি সন্তুষ্ট হইবেন।" তখন বভ্রুবাহণ, বিপুল যুদ্ধের আয়োজন করিয়া, সৈন্যগণকে আদেশ দিবামাত্রই তাহারা যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, ক্ষণেকের ভিতরেই বভ্রুবাহণের বাণে তাঁহাকে অজ্ঞান হইতে হইল।

জ্ঞান হইলে অর্জুন বভ্রুবাহণকে বলিলেন, "বাঃ! এই তো চাই! আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম! আচ্ছা, এখন আমি মারি, স্থির হইয়া সামলাও তো!"

তারপর অর্জুন অসংখ্য নারাচ ছুঁড়িয়া মারিলে, বভ্রুবাহণ তাহার সমস্তই কাটিলেন! কিন্তু তাহার পরে ভয়ানক বাণগুলি ফিরাইতে না পারায়, তাঁহার রথের ধবজ আর ঘোড়া কাটা

গেল। তখন তিনি রথ হইতে নামিয়া এমনি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, তাহা দেখিয়া অর্জুনের আর আনন্দের সীমা রহিল না। এমন সময় বভ্রুবাহণ কি যে একটা বাণ মারিলেন, তাহাতে নিমেষ মধ্যে অর্জুনকে একেবারে মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিল। বভ্রুবাহণও তাহা দেখিয়া দুঃখে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

এই বিষম বিপদের সময়, চিত্রাঙ্গদা কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে আসিয়া উলুপীকে দেখিয়াই বলিলেন, "উলুপি! তোমার দোষেই এই বিপদ উপস্থিত হইল।" বভ্রুবাহণও সেই সময়ে জ্ঞানলাভ করিয়া, উলুপীকে তিরস্কারপূর্বক বলিলেন, "পিতাকে মারিয়াছি, সুতরাং আমিও এখনি প্রাণত্যাগ করিব। তাহা হইলে হয়তো তুমি সন্তুষ্ট হইবে।"

উলুপী যথাসাধ্য ইহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়ে তখনি নাগলোক হইতে সঞ্জীবনী মণি আনাইলেন। সে মণির কি আশ্চর্য গুণ! উহা অর্জুনের বুকে স্থাপনমাত্রই তিনি চক্ষু মার্জনাপূর্বক উঠিয়া বসিলেন, যেন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল।

তারপর অবশ্য খুব সুখের অবস্থাই হইল। আর তখন এ কথাও জানা গেল যে উলুপী অতি মহৎ অভিপ্রায়েই এই ব্যাপার ঘটাইয়াছিলেন। শিখণ্ডীর সহায়তার ভীষ্মকে বধ করায়, অর্জুনের যথেষ্ট অপরাধ হইয়াছিল। সেই অপরাধে বসুগণ এবং গঙ্গাদেবী তাঁহাকে শাপ দিতে প্রস্তুত হন। উলুপী সে সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পিতা সেই দেবতাদিগকে অর্জুনের প্রতি প্রসন্ন হওয়ার জন্য বিস্তর মিনতি করায়, তাঁহারা বলেন, "বভ্রুবাহন অর্জুনকে বধ করিলে, তবে তাঁহার শাপ কাটিবে।" এইজন্যই উলুপী বভ্রুবাহণকে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ দেন। তিনি জানিতেন যে, অর্জুনকে বাঁচাইবার ঔষধ তাঁহার ঘরে আছে! এ সকল কথা জানিতে পারিয়া সকলেই যে উলুপীর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তখন বভ্রুবাহণ, চিত্রাঙ্গদা আর উলুপীকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণপূর্বক, অর্জুন পুনরায় তথা হইতে যাত্রা করিলেন।

মগধে জরাসন্ধের নাতি মেঘসন্ধিও অন্যান্য অনেক মূর্খের ন্যায়, মনে করিয়াছিলেন যে, অর্জুন অপেক্ষা তিনি নিজে অধিক যোদ্ধা। অর্জুন, যুধিষ্ঠিরের কথা মনে করিয়া যতই তাঁহাকে বাঁচাইয়া বাণ মারিতে যান, ততই তাঁহার আরো সাহস বাড়িয়া যায়। শেষে অবোধের যে দশা সচরাচর হয়, তাঁহারও তাহাই হইল, তাঁহার আর অস্ত্র নাই। তখন অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ হইয়া বেশ যুদ্ধ করিয়াছ, এখন ঘরে যাও! আমি তোমাকে বধ করিব না।" তাহাতে মেঘসন্ধি করজোড়ে কহিলেন, "মহাশয়! আমি পরাজিত হইয়াছি। এখন অনুমতি করুন, কি করিব।" অর্জুন বলিলেন, "চৈত্র মাসের পূর্ণিমার দিন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ দেখিতে যাইবে।" এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

গান্ধার দেশে শকুনির পুত্রও প্রথমে ভারি তেজ দেখাইয়াছিলেন। অর্জুন কৃপাপূর্বক, তাঁহার মাথা না কাটিয়া, পাগড়িটি উড়াইয়া দিলে, তাঁহার চৈতন্য হইল।

এইরূপে এক বৎসরকাল ঘোড়াটিকে দেশে দেশে ভ্রমণ করাইয়া তাহাকে হস্তিনায় ফিরাইয়া আনিলে, সেই ঘোড়ার মাংস দিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। সেরূপ যজ্ঞ আর তাহার পরে কখনো হয় নাই। এমন কোনো আত্মীয়-স্বজন, এমন কোনো রাজারাজড়া এমন কোনো মুনি-ঋষি বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না, যিনি সেই যজ্ঞে না আসিয়াছিলেন।

আর ভোজনের বিষয় কি বলিব? অন্নের পর্বত, ঘৃত-দধির নদী, আর মিঠাই-মোণ্ডা কি পরিমাণ, তাহা বলিতে পারি না। হাজার হাজার লোক মণি, কুণ্ডল, আর সুবর্ণ মাল্যে সুসজ্জিত হইয়া সেই-সকল সুমধুর খাদ্য পরিবেশন করিয়াছিল। এক-একলক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন শেষ হইলে, এক-একবার দুন্দুভি বাজিত। এইরূপে যজ্ঞের কয়েকদিনের মধ্যে কত শত বার যে দুন্দুভি বাজিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই।

এইরূপ সমারোহে সেই মহাযজ্ঞ শেষ হইল। এই যজ্ঞে একটি অদ্ভুত ঘটনা হয়। যজ্ঞ শেষে সকলেই যুধিষ্ঠিরের অতিশয় সুখ্যাতি করিতেছেন, এমন সময় একটি আশ্চর্য নকুল আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। উহার চক্ষু দুটি নীল; মাথা আর শরীরের এক পাশ সোনার। নেউল আসিয়া ঠিক মানুষের মতো বলিতে লাগিল, "হে রাজামহাশয়গণ! উঞ্ছবৃত্তি নামক ব্রাহ্মণ যে ছাতু দান করিয়াছিলেন, সে কাজ আপনাদের যজ্ঞের চেয়ে অনেক বড়!"

এ কথায় সকলে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এমন কি দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ যে, এই যজ্ঞকে তাহা অপেক্ষা কম মনে করিলে?"

তাহাতে নেউল বলিল, "আপনারা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন। উঞ্ছবৃত্তি নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী, এক পুত্র ও পুত্রবধূ ছিল। ক্ষেত্রের শস্য কাটিয়া নিলে যাহা পড়িয়া থাকে, উঞ্ছবৃত্তি এবং তাঁহার পরিবার সেই শস্যমাত্র আহার করিতেন; এইরূপে তাঁহাদের দিন যাইত।

"তারপর দেশে দুর্ভিক্ষ আসিল, ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট হইল, ব্রাহ্মণের কষ্টও বৃদ্ধি পাইল। তখন কোনোদিন অতি কষ্টে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ আহার জুটিত, কোনোদিন একেবারেই জুটিত না।

"এই সময়ে একবার সারাদিন ঘুরিয়া, শেষবেলায় ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ যব পাইলেন। তাহাতে তাঁহার পরিবারের লোকেরা আহ্লাদিত হইয়া, সেই যবের ছাতু প্রস্তুত করিল। তারপর সকলে স্নান, আহ্নিক অন্তে সেই ছাতু আহারের আয়োজন করিলেন।

"এমন সময় সেখানে এক অতিথি ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ সেই অতিথিকে আদরের সহিত তাঁহার নিজের ছাতুর ভাগ আহার করিতে দিলেন, কিন্তু অতিথির তাহাতে তৃপ্তি হইল না।

"তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহার নিজের ভাগ অতিথিকে দিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না।

"তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের পুত্র তাঁহার নিজের ভাগ অতিথিকে দিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার তৃপ্তি হইল না।

"তখন ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ তাঁহার নিজের ভাগ আনিয়া অতিথিকে দিলেন।

"ইহাতে সেই অতিথি পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'হে ধার্মিক! ঐ দেখ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে; দেবতারা তোমার স্তব করিতেছেন। এখন তুমি পরম সুখে সপরিবারে স্বর্গে চলিয়া যাও।"

সেই অতিথি ছিলেন, স্বয়ং ধর্ম। তাঁহার কথায় ব্রাহ্মণ স্ত্রী, পুত্র এবং পুত্রবধূ সহ তখনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তারপর আমি গর্ত হইতে উঠিয়া, সেই অতিথির পাতের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। তাহাতেই এই দেখুন! আমার অর্ধেক শরীর স্বর্ণময় হইয়া গিয়াছে।

সেই অবধি আমি, আমার অবশিষ্ট শরীরটুকু স্বর্ণময় করিবার আশায় যজ্ঞস্থান দেখিলেই তাহাতে গড়াগড়ি দিয়া থাকি। আজ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের কথা শুনিয়া, অনেক আশায় এখানে আসিয়া গড়াগড়ি দিলাম; কিন্তু আমার শরীর সোনার হইল না! তাই বলিতেছি যে, সেই গরিব ব্রাহ্মণ যে অতিথিকে ছাতু খাওয়াইয়াছিল, তাহা ইহার চেয়ে বড় কাজ।"

এই বলিয়া সেই নেউল তথা হইতে প্রস্থান করিল।

আশ্রমবাসিকপর্ব

জা হইয়া যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর সহিত এমন মিষ্ট ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে তাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। দুর্যোধনের কথা মনে করিয়া এখন যুধিষ্ঠিরের উপরে তাঁহাদের রাগ হওয়া দূরে থাকুক, বরং যুধিষ্ঠিরের গুণের কথা ভাবিয়া দুর্যোধনকেই অতিশয় দুষ্ট লোক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যুধিষ্ঠির ইঁহাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতিও সেইরূপই ব্যবহার করিতেন। বাস্তবিক ইঁহাদেব নিকট ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী যেমন ভক্তি ও ভালবাসা পাইতে লাগিলেন, নিজ পুত্রগণের নিকটও তাহা পান নাই।

পনেরো বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে পূর্বে যে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তাঁহার দুঃখের কথা ভাবিয়া ক্রমে আর সকলেই তাহা ভুলিয়া গেলেন; কিন্তু ভীম তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। এজন্য অন্য সকলের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রকে সম্মান এবং ভালোবাসা দানে তিনি অক্ষম হইলেন।

ভীমের এই ভাব ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে, তিনি গোপনে ধৃতরাষ্ট্রের অসম্মান করিতেও ত্রুটি করেন না। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্রের কিরূপ কষ্টের কারণ হইল, তাহা বুঝিতেই পার।

এই সময়ে ভীম একদিন, যুধিষ্ঠির, অর্জুন প্রভৃতির অসাক্ষাতে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে শুনাইয়া, নিজ বন্ধুগণের নিকট বলিতেছিলেন, "আমি আমার এই চন্দন মাখা দুখানি হাত দিয়াই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে বধ করিয়াছি।"

এ কথা শুনিয়া গান্ধারী চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া, তখনি নিজের বন্ধুদিগকে ডাকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হে বন্ধুগণ! আমিই যে এই কুরুবংশ নাশের মূল, তাহা তোমরা জান। সকলে যখন আমাকে হিতবাক্য বলিয়াছিল, তখন আমি তাহা শুনি নাই এতদিনে সেই পাপের দণ্ড গ্রহণ করিতেছি। এখন আমি আর গান্ধারী প্রতিদিন মৃগচর্ম পরিধান, মাদুরে শয়ন এবং দিনান্তে যৎকিঞ্চিৎ ভোজনপূর্বক ভগবানের নাম লইয়া দিন কাটাই। এ কথা জানিলে যুধিষ্ঠিরের অতিশয় ক্লেশ হইবে বলিয়া, কাহারো নিকট

ইহা প্রকাশ করি নাই।”

তারপর তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, “বাবা যুধিষ্ঠির, তোমার মঙ্গল হউক। তোমার যত্নে এতদিন পরম সুখে কাল কাটাইলাম, এখন আমাদিগের পরকালের পথ দেখিবার সময় উপস্থিত। সুতরাং অনুমতি দাও, আমি আর গান্ধারী বনে গিয়া তপস্যা করি।”

এ কথায় যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “জ্যাঠামহাশয়। আমার তুল্য নরাধম আর কেহ নাই। আপনি অনাহারে ভূমিশয্যায় এত কষ্টে কাল কাটাইয়াছেন, আর আমি আপনার সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। আপনি যদি কষ্ট পান, তবে আমার সুখের কি প্রয়োজন? দুর্যোধন আপনার যেরূপ পুত্র ছিল, আমাদিগকেও সেইরূপ মনে করিবেন। আপনি বনে গেলে, এই রাজ্য লইয়া আমি কিছুমাত্র সুখ পাইব না। আপনি আমাদিগের দিকে চাহিয়া মনকে শান্ত করুন, আমরা আপনার সেবা করিয়া কৃতার্থ হই।”

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, “বাবা! বৃদ্ধকালে বনে গিয়া তপস্যা করাই আমাদের কুলের ধর্ম। সুতরাং আমার তাহা করিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, তুমি ইহাতে আমাকে নিষেধ করিও না।”

অনাহারে ধৃতরাষ্ট্রের শরীর এতই দুর্বল হইয়াছিল যে, তিনি এইটুকু বলিতে বলিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহাতে যুধিষ্ঠিরের অতিশয় দুঃখ হইল বটে, কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা, বিস্তর মিনতি করিয়াও ধৃতরাষ্ট্রের মত ফিরাইতে পারিলেন না। ইহার উপরে আবার ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্রের কথায় সম্মত হইতে বলিলে, কাজেই শেষে তাঁহাকে তাহাই করিতে হইল! তখন ধৃতরাষ্ট্র বিনয়বচনে প্রজাদিগের নিকট বিদায় লইয়া, মৃত পুত্র এবং আত্মীয়গণের কল্যাণার্থ অনেক ধন দানপূর্বক বনগমনে উদ্যত হইলেন।

কার্তিক মাসের পূর্ণিমার দিন, বল্কল এবং মৃগচর্ম পরিদানপূর্বক, ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী, বিদুর এবং সঞ্জয়কে লইয়া গৃহের বাহির হইলে, স্ত্রী পুরুষ সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। কুন্তী এবং গান্ধারীর কাঁধে ভর দিয়া ধৃতরাষ্ট্র আগে আগে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা প্রভৃতি সকলেই চলিলেন। সকলেরই চোখে জল, কাহারো মন স্থির রাখিবাব শক্তি নাই।

নগরের বাহিরে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকলকে বলিলেন, “এখন তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও।” এ কথায় আর অন্য সকলেই নিরস্ত হইল, কিন্তু বিদুর, সঞ্জয়, এবং কুন্তী আর ঘরে ফিরিলেন না।

কুন্তীকে বনে যাইতে দেখিয়া পাণ্ডবদিগের যে কি দুঃখ হইল, আমার কি সাধ্য যে তাহা লিখিয়া জানাই। তাঁহারা অতি কাতরস্বরে সাশ্রুনয়নে কত মিনতি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। তখন অগত্যা তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সকলকে হস্তিনায় আসিতে হইল।

এদিকে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর আর সঞ্জয় অনেক পথ চলিয়া গঙ্গাতীরে এবং তথা হইতে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অনেক তপস্বীর আশ্রম ছিল। সেইসকল আশ্রমের নিকটে থাকিয়া তাঁহারা বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণপূর্বক কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। এইরূপে কিছুদিন গেল।

পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীকে বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা চলিয়া গেলে পর, আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিলেন না। এমনকি, ইঁহাদের শোকে যুধিষ্ঠিরের রাজকার্য

করাই অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুতরাং একদিন তিনি সকলকে লইয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি দেখিবার জন্য বনে যাত্রা করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমের কাছে আসিয়া, তাঁহারা তপস্বীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের জ্যাঠামহাশয় কোথায়?" তপস্বীরা বলিলেন, তিনি যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছেন। আপনারা এই পথে যান।"

সেই পথে খানিক দূরে গিয়াই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী আর সঞ্জয় স্নানান্তে কলসী হাতে আশ্রমে ফিরিতেছেন। সহদেব কুন্তীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, অন্য সকলেরও চক্ষে জল আসিল। তখন তাঁহারা দ্রুতপদে গিয়া, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীকে প্রণামপূর্বক, তাঁহাদের হাত হইতে কলসী গ্রহণ করিলেন।

তারপর তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলে সেই সময়ের জন্য তাঁহাদের মনের সকল দুঃখ দূর হইয়া গেল। তখন ধৃতরাষ্ট্রের বোধ হইতে লাগিল, তিনি হস্তিনাতেই রহিয়াছেন। আশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী আর সঞ্জয় মাত্রই আছেন, কিন্তু বিদুর কোথায়? বিদুরকে দেখিতে না পাইয়া, যুধিষ্ঠির ব্যাকুলচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "জ্যাঠামহাশয়! বিদুর কাকা কোথায়?"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আহার ত্যাগপূর্বক ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তপস্বীরা বনে মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে পান।"

এমন সময় সেই আশ্রমের নিকটেই বিদুরকে দেখিতে পাওয়া গেল। তাঁহার মস্তক জটাকুল, শরীর কর্দমাক্ত, অস্থিচর্ম সার এবং পরিচ্ছদ বিহীন। একটিবার মাত্র তিনি আশ্রমের দিকে তাকাইয়াই, আবার প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠিরও তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাতে বনের দিকে ছুটিতে ছুটিতে বলিতে লাগিলেন, "কাকা! আমি যে আপনার যুধিষ্ঠির, আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

তখন সেই বিজন বনে বিদুর একটি গাছ ধরিয়া দাঁড়াইলে, যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আবার বলিলেন, "আমি আপনার যুধিষ্ঠির, আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র, সেই মহাপুরুষের আত্মা তাঁহার দেহ ছাড়িয়া যুধিষ্ঠিরের দেহে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাঁহার দেহটি তেমনিভাবে গাছ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বোধ হইল যেন তাঁহার বল দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে! অমনি দৈববাণী হইল, "মহারাজ! তুমি ইঁহার দেহ দাহ করিও না। ইঁহার জন্য শোকও করিও না, কেননা ইনি স্বর্গে আসিয়া অতি উচ্চ সম্মান লাভ করিবেন।"

তখন যুধিষ্ঠির আশ্রমে ফিরিয়া এই আশ্চর্য ঘটনার কথা সকলকে বলিলেন। বিদুর যে কে, তাহা পরদিন ব্যাসদেব সেখানে আসিলে তাঁহার নিকট জানা গেল। মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্মকে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তিনি ছিলেন বিদুর।

সেইসময়ে ব্যাসদেব, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রভৃতির মনে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত, অতি আশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যত বীর মারা গিয়াছিলেন, সকলে ব্যাসের ডাকে, পরলোক হইতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে তখন সেই আশ্রমে কি আনন্দের ব্যাপার যে হইয়াছিল, তাহা কি বলিব; ব্যাসের বরে সে সময়ের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের চক্ষুও ভালো হইয়া গেল। সুতরাং তিনিও পুত্রগণকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলেন।

এক মাস কাল ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে থাকিয়া, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরা হস্তিনায় ফিরিয়া আসেন। তারপর দুই বৎসর চলিয়া গেলে, একদিন দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম দেখিয়া আসিয়াছেন, এ কথা জানিতে পারিয়া, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবন্! যদি জ্যাঠামহাশয়, জ্যেঠিমা, মা এবং সঞ্জয়ের কোনো সংবাদ পাইয়া থাকেন, তবে দয়া করিয়া তাহা বলুন।"

নারদ বলিলেন, "তোমরা তপোবন হইতে চলিয়া আসিলে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী আর সঞ্জয় অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। সে সময়ে ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী জল ভিন্ন আর কিছুই খাইতেন না, কুন্তী মাসে একবার আহার করিতেন, সঞ্জয় পাঁচদিনে একবার আহার করিতেন।

একদিন ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী কুন্তীর সঙ্গে বনের দিকে যাত্রা করেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিবার সময় ভীষণ দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। অনাহারে নিতান্ত দুর্বল থাকায় সে আগুন হইতে কোনোমতেই তাঁহাদের পলায়নের শক্তি হইল না। তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিলেন, 'সঞ্জয়! তুমি শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা কর। আমরা এই অগ্নিতেই দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইব।'

এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী, পূর্বমুখে ভগবানের ধ্যান আরম্ভ করিলে, দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের দেহ ভস্ম হইয়া গেল।

সঞ্জয় অনেক কষ্টে সেই অগ্নি হইতে রক্ষা পাইয়া, তাপসগণের নিকট এই সংবাদ প্রদানকালে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। তপস্বীদিগকে এই সংবাদ দিয়া, সঞ্জয় হিমাচলে চলিয়া গিয়াছেন। তারপর আমি, তোমাদিগকে এই সংবাদ দিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আসিবার সময় আমি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর কুন্তীর শরীর দেখিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা ইচ্ছাপূর্বকই অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করায় তাঁহাদের স্বর্গলাভ হইবে। অতএব তাঁহাদের জন্য তোমাদের শোক করা উচিত নহে।"

হায়, কি কষ্টের কথা! যুধিষ্ঠির এই দারুণ সংবাদে মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, হস্তিনায় হাহাকার উঠিল। পাণ্ডবদিগের মনে হইল যে, 'গুরুজনেরা যখন এইরূপে পুড়িয়া মরিলেন, তখন আমাদের রাজ্য, ধর্ম বীরত্ব সকলই বৃথা।'

নারদ উপদেশ দ্বারা তাঁহাদিগকে শান্ত করিলে, সকলে গঙ্গাতীরে গিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর কুন্তীর তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি শেষ করিলেন। বনবাসে ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী আর গান্ধারীর তিন বৎসর কাটিয়াছিল।

মৌসলপর্ব

রপর আঠারো বৎসর চলিয়া গেল। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের ছত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইলে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন যে শীঘ্রই কোনো বিপদ হইবে।

যে বিপদ হইল, তাহা পাণ্ডবদের নহে, যাদবদের (অর্থাৎ কৃষ্ণ যে বংশে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের)। এইরূপ একটা বিপদ যে হইবে তাহা কৃষ্ণ আগেই জানিতেন, কিন্তু এমনি হওয়া আবশ্যক বুঝিয়া তিনি তাহাতে ব্যস্ত হন নাই।

বিপদের কারণ অতি সামান্য। যদুকুলের কয়েকটি বালক একটা লৌহ মুসলের কথা লইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদকে উপহাস করে। ইহাতে তাঁহার বিষম ক্রোধভরে এই দারুণ শাপ দেন, "এই মুসলের দ্বারাই, কৃষ্ণ আর বলরাম ভিন্ন তোমাদের বংশের সকলে নষ্ট হইবে!"

কৃষ্ণ জানিতেন যে এইরূপ হইবে এবং হওয়া আবশ্যক সুতরাং তিনি আর এই বিপদ নিবারণের কোনো চেষ্টা করিলেন না। মুসলটিকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইল। যাদবদিগের মধ্যে অনেকে মদ খাইত। পাছে এইসকল লোক মাতাল হইয়া কোনো একটা কিছু বিপদ ঘটায়, এজন্য তখন হইতেই মদ্যপানও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আশা ছিল, ইহাতে লোকের চরিত্র ভালো হইবে কিন্তু ফল হইল ঠিক ইহার বিপরীত।

এই সময়ে একদিন যাদবেরা সকলে প্রভাস তীর্থে যায়। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, সেখানে গিয়া খুব আমোদ-প্রমোদ করিবে, সুতরাং তাহার আয়োজন সঙ্গে লইতে ভুলিল না। দুঃখের বিষয় এই যে, এত নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা সেই আয়োজনের সঙ্গে মদও লইল, সেই মদে যে কি সর্বনাশ হইল, তাহার কথা শুন।

প্রভাস তীর্থে গিয়া বলরাম, সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি সকলে কৃষ্ণের সম্মুখেই সুরাপান করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাঁহারা মাতাল হইয়া ঝগড়া আরম্ভ করিবেন, তাহা বিচিত্র কি? তখন সাত্যকি কৃতবর্মাকে বলিলেন, "তুই বড় নির্দয় লোক! ঘুমের ভিতরে লোককে মারিতে গিয়াছিলি!"

ইহাতে কৃতবর্মা চটিয়া বলিলেন, "তুই তো ভূরিশ্রবার মাথা কাটিয়াছিলি। তোর মতো নির্দয় কে আছে?"

এইরূপে কথায় কথায় বিবাদ আরম্ভ হইয়া, শেষে তাহা বড়ই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। সাত্যকি কৃতবর্মার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন, তাহাতে কৃতবর্মার পক্ষের লোকেরা, তাঁহাদের নিজ নিজ থালা হাতেই, সাত্যকিকে আক্রমণ করিলেন। তখন কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন আসিয়া সাত্যকির সাহায্য করিতে লাগিলেন।

তারপর ক্রমে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, কৃতবর্মার লোকেরা, কৃষ্ণের সম্মুখেই, সাত্যকি এবং প্রদ্যুম্নকে বধ করিল। তাহাতে কৃষ্ণ নিকটস্থ শরবণ হইতে এক মুষ্টি শর তুলিয়া লইবামাত্র তাহা একটা মুদগর হইয়া গেল! সেই মুদগর দিয়া তিনি কৃতবর্মার পক্ষের লোকদিগকে বিনাশ করিলেন!

মুনির শাপের কি বিষম তেজ! সে সময়ে কেহ একটিমাত্র শর তুলিয়া লইলেও তাহা বজ্রের মতন হইয়া যাইতে লাগিল। সেই শরের ঘায়ে কৃষ্ণের সাক্ষাতেই তাঁহার পুত্র, ভাই, নাতি প্রভৃতির মৃত্যু হইলে, তিনি ক্রোধভরে সেখানকার প্রায় সকলকে মারিয়া শেষ করিলেন।

তারপর কৃষ্ণ, বভ্রু এবং দারুক, বলরামকে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন যে, তিনি এক বৃক্ষের তলায় বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। তখন কৃষ্ণ, অর্জুনের নিকট সংবাদ দিবার জন্য দারুককে হস্তিনায় পাঠাইয়া বভ্রুকে বলিলেন, "বভ্রু, তুমি শীঘ্র গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা কর।"

কিন্তু বভ্রু অধিক দূর না যাইতেই এক ব্যাধের মুদগর আসিয়া তাঁহার উপরে পড়ায় তাঁহার মৃত্যু হইল। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ বলরামকে সেইখানে তাঁহার অপেক্ষা করিতে বলিয়া, নিজেই স্ত্রীলোকদিগকে বক্ষার ব্যবস্থা করিতে গেলেন।

নিজের পিতা বসুদেবের হাতে এই কার্যের ভার দিয়া কৃষ্ণ আবাব বলবামের নিকট আসিয়া দেখেন যে তাঁহার মুখ দিয়া সহস্র ফণাযুক্ত ভয়ংকর এক সাপ নির্গত হইতেছে! উহার শরীর শ্বেতবর্ণ এবং মুখসকল লাল! বাহির হইয়াই সেই সাপ সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিলে, সমুদ্র, বরুণ এবং প্রধান প্রধান নাগগণ তাহার পূজা করিতে করিতে, তাহাকে লইয়া গেলেন। বলরামের অসার নির্জীব দেহ সেইখানেই পড়িয়া বহিল।

কৃষ্ণ বুঝিতে পাবিলেন যে, বলরাম ঐ সর্পরূপেই নিজের দেহত্যাগ করিয়া গেলেন। ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, বন মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে, তিনি এক স্থানে শয়ন কবিয়াছেন, এমন সময় জরা নামক এক ব্যাধ, মৃগ মনে করিয়া, তাঁহার প্রতি এক বাণ মারিল। সেই বাণ তাঁহার পদতলে বিঁধিয়া গেল। ব্যাধ জানে, হরিণই পড়িয়াছে, কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া বুঝিতে পারিল, সে কি সর্বনাশ করিয়াছে! অমনি সে কৃষ্ণের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু কৃষ্ণ তাহার উপর কিছুমাত্র বাগ না করিয়া তাহাকে সান্ত্বনাপূর্বক স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এদিকে দারুকের নিকট সংবাদ পাইয়া, অর্জুন দ্বারকায় আসিয়া দেখিলেন যে, দ্বারকাপুরী শ্মশান হইয়া গিয়াছে! বসুদেব তখনো জীবিত ছিলেন, কিন্তু পরদিন তিনিও মারা গেলেন।

তখন আর দুঃখ করিবার সময় ছিল না। বসুদেবের এবং প্রভাস তীর্থে নিহত যাদবগণের সৎকারের অন্য লোক উপস্থিত না থাকায়, অর্জুনকেই সর্বাগ্রে সে সকল কাজের চেষ্টা দেখিতে হইল। তারপর কৃষ্ণের পৌত্র বজ্র এবং দ্বারকার স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া তিনি ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করিলেন। সেই সময়ে একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। অর্জুন সকলকে লইয়া দ্বারকানগরের যে স্থানই ছাড়িয়া যান, অমনি সমুদ্র আসিয়া তাহা গ্রাস করিতে লাগিল।

তারপর কি নিদারুণ ব্যাপার হইল শুন। অর্জুন দ্বারকার স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করিলে পথমধ্যে একদল দস্যু আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। অর্জুন দস্যুনাশার্থ গাণ্ডীব তুলিতে গিয়া দেখেন, দেহে বল কিছুমাত্রও নাই, গুণটুকু পরানোই প্রায় অসাধ্য হইয়াছে। বহু কষ্টে যদি গুণ পরানো হইল, উৎকৃষ্ট অস্ত্রগুলির কথা কিছুতেই মনে পড়িল

না। হা বিধাতঃ! এমন যে অক্ষয় তূণ, এই বিপদের সময় তাহাও শূন্য হইয়া গেল।

কাজেই দস্যুরা স্ত্রীলোকদিগের অনেককে ধরিয়া লইয়া গেল, অর্জুন তাহাদিগকে কিছুতেই বারণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ভগ্নহৃদয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া, তথায় বজ্রকে রাজা করিলেন।

এই সকল ঘটনার কথা ভাবিয়া অর্জুনের মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া, ব্যাসদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাস তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে অর্জুন? আজ কেন তোমাকে এরূপ চিন্তিত এবং বিষণ্ণ দেখিতেছি?"

এ কথার উত্তরে অর্জুন তাঁহাকে কৃষ্ণ, বলরাম এবং অন্যান্য যাদবগণের মৃত্যুর সংবাদ দিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণের শোকে আমার জীবনধারণ করাই ভার বোধ হইতেছে, আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। তারপর দ্বারকার নারীগণকে আনয়নকালে একদল দস্যু আমাদিগকে আক্রমণ করে। ঐ সময়ে আমার গাণ্ডীবে গুণ চড়ানো অতীব ক্লেশকর হইল; অক্ষয় তূণ শূন্য হইয়া গেল; দিব্য অস্ত্রসকল কিছুতেই স্মরণে আসিল না। এই সকল ঘটনার কথা ভাবিয়া আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি। ভগবন্! এখন আমরা কি কর্তব্য, তাহা বলুন।"

অর্জুনের কথা শুনিয়া ব্যাস বলিলেন, "এই পৃথিবীতে তোমাদের কার্য শেষ হইয়াছে। আমার মতে এখন তোমাদের এ স্থান পরিত্যাগ করাই উচিত। তোমার কাজ শেষ হওয়াতেই, দিব্য অস্ত্রসকল তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, তাই তুমি তাহাদিগকে স্মরণ করিতে পার নাই। এখন তোমাদের স্বর্গারোহণের কাল উপস্থিত; সুতরাং তাহারই চেষ্টা দেখ।"

মহাপ্রস্থানিকপর্ব

যদু বংশের বিনাশ ও কৃষ্ণের দেহত্যাগের কথা শুনিয়া আর যুধিষ্ঠির পৃথিবীতে থাকিতে চাহিলেন না। সুতরাং তিনি এখন মহাপ্রস্থানই (অর্থাৎ প্রাণত্যাগের উদ্দেশ্যে হিমালয়ে প্রস্থান) কর্তব্য বুঝিয়া অর্জুনকে বলিলেন, "ভাই! আমি ভাবিয়াছি, শীঘ্রই দেহত্যাগ করিব। এখন তোমরা কি করিবে, স্থির কর।"

অর্জুন বলিলেন, "আমিও তাহাই স্থির করিয়াছি।"

এ কথা শুনিয়া ভীম, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদী বলিলেন, "আমরাও তাহাই করিব।"

এইরূপে সকলের পরামর্শ স্থির হইলে, পরীক্ষিৎকে হস্তিনার রাজা করিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানে উদ্যত হইলেন। প্রজাগণ কাতরস্বরে তাঁহাদিগকে বারণ করিল; কিন্তু তাঁহারা আর মর্তবাসে সম্মত হইলেন না।

এইরূপ সময়ের করণীয় অনুষ্ঠানাদি শেষ হইলে, পাণ্ডবগণ এবং দ্রৌপদী মহামূল্য

বস্ত্রাভরণ পরিত্যাগপূর্বক, বল্কল পরিয়া হস্তিনা নগরকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চিরকালের জন্য তথা হইতে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে একটি কুকুরও তাঁহাদের অনুগামী হইল। এ সময়ে পশ্চাৎ হইতে ডাকিতে নাই। নগরবাসীরা নীরবে, নতশিরে বহুদূর অবধি তাঁহাদের সঙ্গে চলিল কিন্তু কেহ তাঁহাদিগকে ফিরিতে বলিল না।

ক্রমে সকলেই ঘরে ফিরিল, কিন্তু সেই কুকুরটি ফিরিল না।

পাণ্ডবেরা তথা হইতে ক্রমাগত পূর্বদিকে চলিতে চলিতে, অসংখ্য গিরিনদী পার হইয়া, শেষে লোহিত সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন। এ পর্যন্ত গাণ্ডীব এবং অক্ষয় তূণ অর্জুনের সঙ্গেই ছিল। সেই সময়ে এক পর্বতাকার পুরুষ পাণ্ডবদিগের পথরোধ করত বলিলেন, "হে পাণ্ডবগণ। আমি অগ্নি। কৃষ্ণ তাঁহার চক্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে অর্জুনও গাণ্ডীব পরিত্যাগ করুন। উহাতে আর তাঁহার কোনো প্রয়োজন নাই; উহা বরুণকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।"

এ কথায় অর্জুন গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ জলে নিক্ষেপ করায় অগ্নি চলিয়া গেলে, পাণ্ডবগণ দক্ষিণ মুখে চলিয়া শেষে লবণ সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে সমুদ্রের তীর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে ও তারপর ক্রমাগত পশ্চিমদিকে, বহুদূর চলিয়া, আবার সমুদ্রতীর প্রাপ্ত হইলে, জলের উপরে দ্বারকার মঠাদির চূড়াসকল দেখা গেল।

তারপর তাঁহারা ক্রমাগত উত্তরদিকে চলিয়া, অবশেষে হিমালয়ে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সহসা দ্রৌপদীর অঙ্গ অবশ হইয়া গেল। তিনি আর চলিতে না পারিয়া সেই স্থানেই পড়িয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! দ্রৌপদী তো কখনো কোনো অপরাধ করেন নাই, তবে কেন ইঁহার পতন হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "দ্রৌপদী আমাদের অপেক্ষা অর্জুনকে অধিক ভালোবাসিতেন সেই পাপেই তাঁহার পতন হইয়াছে।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রস্থানের যাত্রীকে ফিরিয়া তাকাইতে নাই, সুতরাং তিনি দ্রৌপদীর পানে চাহিয়া দেখিলেন না।

কিছুকাল পরে সহদেবও অবশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! সহদেব অতি সুশীল ছিল এবং সর্বদাই আমাদের সেবা করিত। সে কি অপরাধে পতিত হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "সর্বাপেক্ষা বিদ্বান বলিয়া সহদেবের অহংকার ছিল। তাহাতেই উহার পতন হইয়াছে।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির একমনে ভগবানকে ভাবিয়া চলিতে লাগিলেন। সহদেবের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না।

তারপর দ্রৌপদী ও সহদেবের শোকে অবশ হইয়া নকুল পড়িয়া গেলে ভীম পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! নকুল পরম ধার্মিক ছিল; সে কিজন্য পতিত হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "নকুল ভাবিত, তাঁহার মতো সুন্দর লোক পৃথিবীতে নাই। তাহাতে তাহার পতন হইয়াছে। চল! উহাদের দিকে আর ফিরিয়া তাকাইবার প্রয়োজন নাই।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির, আর ফিরিয়া না চাহিয়া, একমনে পথ চলিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে দ্রৌপদী, সহদেব এবং নকুলের জন্য শোক করিতে করিতে অর্জুনও পড়িয়া গেলেন। তাহাতে ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! মহাত্মা অর্জুন হাস্যচ্ছলেও কদাচ মিথ্যা কথা বলে নাই; তাহার কেন পতন হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "অর্জুন অহংকারপূর্বক বলিয়াছিল যে, সে একদিনেই সকল শত্রু সংহার করিবে, কিন্তু তাহা করিতে পারে নাই। সে অন্য বীরগণকে তুচ্ছ করিত। এইজন্যই আজ তাহাকে পড়িতে হইল।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির স্থিরচিত্তে ভীম আর সেই কুকুরকে লইয়া চলিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে ভীমেরও শরীর অবশ হইয়া গেল। তিনি ভূপতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার অতি প্রিয়পাত্র, আমার কি অপরাধ হইয়াছিল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তুমি অন্যকে না দিয়া নিজে অপরিমিত আহার করিতে আর তোমার তুল্য বলবান কেহ নাই, বলিয়া অহংকার করিতে। ইহাই তোমার অপরাধ!"

এই বলিয়া ভীমের দিকেও আর না চাহিয়া, যুধিষ্ঠির স্থিরচিত্তে পথ চলিতে লাগিলেন। সেই কুকুর তখনো তাঁহার সঙ্গে ছিল। অনন্তর যুধিষ্ঠির আর অল্প দূর গমন করিলেই ইন্দ্র উজ্জ্বল রথারোহণে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই রথে উঠ, তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছি।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার দ্রৌপদী এবং প্রিয় ভাইসকল পথে পড়িয়া আছে। তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমার স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা নাই।"

তাহা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "উঁহারা তো তোমার পূর্বেই স্বর্গে গিয়াছেন, উঁহাদের জন্য কেন দুঃখ করিতেছ? তুমি তোমার এই শরীর সমেতই স্বর্গে গিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে।"

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "দেবরাজ! এই কুকুর আমাকে ভালোবাসিয়া এতদূর আমার সঙ্গে আসিয়াছে, ইহাকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া স্বর্গে যাইব? সুতরাং দয়া করিয়া ইহাকেও আমার সঙ্গে আসিতে দিন!"

ইন্দ্র বলিলেন, "আজ তুমি স্বর্গে গিয়া দেবোচিত সুখ লাভ করিবে, আজ কেন একটা কুকুরের জন্য চিন্তিত হইতেছ? ওটা থাকুক; তুমি আইস!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "স্বর্গের সুখ লাভ করিতে হইলে যদি আমার পরম ভক্ত এই কুকুরটিকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে সে সুখে আমার প্রয়োজন নাই।"

ইন্দ্র বলিলেন, "যে কুকুরের সঙ্গে বাস করে, সে স্বর্গে যাইতে পারে না। সুতরাং শীঘ্র ওটাকে পরিত্যাগ কর!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ও আমাকে ভালোবাসে, সুতরাং আমি নিজের সুখের জন্য উহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তুমি দ্রৌপদীকে আর তোমার ভাইদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে, আর একটা কুকুরকে ছাড়িতে পারিবে না?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমি তো উহাদিগকে পরিত্যাগ করি নাই, উহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

জীবিত থাকিতে আমি কখনো উহাদিগকে ছাড়িয়া যাই নাই। মৃত্যুর পর আব উহাদিগকে ছাড়া না ছাড়া আমাব হাতে ছিল না, কাজেই কি কবিব?"

তখন সেই কুকুর, হঠাৎ তাহাব পশুবেশ পরিত্যাগপূর্বক, সাক্ষাৎ ধর্মরূপে পরম স্নেহভবে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে পবীক্ষা কবিবার জন্যই কুকুরের বেশে তোমার সঙ্গে আসিয়াছিলাম। তুমি যে, তোমাব ভক্ত কুকুরটির জন্য স্বর্গও ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়াছ, ইহাতে বেশ বুঝিলাম, তোমার মতো ধার্মিক আর স্বর্গেও নাই। তুমি এই দেহেই স্বর্গে যাইতে পাইবে।"

তখন সকল দেবতারা মিলিয়া, দিব্য রথে করিয়া মহানন্দে যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে লইয়া

গেলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, নারদ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যুধিষ্ঠির ভিন্ন আর কেহই সশরীরে স্বর্গে আসিতে পারেন নাই! ইনিই সকল ধার্মিকের শ্রেষ্ঠ।"

নারদের কথা শেষ হইলে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার ভাইয়েরা যেখানে গিয়াছে, সে স্থান ভালোই হউক আর মন্দই হউক, আমিও সেখানে যাইব। তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে চাহি না।"

তাহা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "মহারাজ! তুমি নিজ পুণ্যবলে এখানে আসিয়াছ, এইখানেই থাক। উঁহারা তোমার সমান পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। উঁহারা কেমন করিয়া আসিবেন?"

যুধিষ্ঠির তথাপি বলিলেন, "দ্রৌপদী আর আমার ভাইসকল যেখানে, আমি সেইখানেই যাইতে চাহি। উঁহাদিগকে ছাড়িয়া এখানে থাকিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।"

স্বর্গারোহণপর্ব

ধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়া দেখিলেন যে, দুর্যোধন সেখানে পরম সুখে বসিয়া আছেন, কিন্তু ভীমার্জুন প্রভৃতি কেহই তথায় নাই। ইহাতে তিনি নিতান্ত আশ্চর্য এবং দুঃখিত হইলে, নারদ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "দুর্যোধন ধর্মযুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন, আর তিনি ঘোর বিপদেও ভীত হন নাই। এই পুণ্যেই তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে!"

তখন যুধিষ্ঠির দেবতাদিগকে বলিলেন, "হে দেবতাগণ, আমি তো এখানে কর্ণকে দেখিতে পাইতেছি না। যে সকল রাজা আমার জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন, তাঁহারাই বা এখন কোথায়? তাঁহারা কি স্বর্গে আসিতে পান নাই? তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমি এ স্থানে কিরূপে থাকিব? কর্ণের জন্য আমার প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইতেছে, আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ইঁহাদিগকে দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। আমি সত্য কহিতেছি, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমি এখানে থাকিতে পারিব না। উঁহারা যেখানে নাই, সেখানে থাকিয়া আমার কি সুখ? উঁহারা যেখানে আছেন, সেই স্থানই আমার স্বর্গ!"

এ কথায় দেবগণ বলিলেন, "বৎস! তোমার যদি উঁহাদিগের নিকট যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে শীঘ্র সেখানে যাও। ইন্দ্র আমাদিগকে তোমার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে বলিয়াছেন, সুতরাং আমরা তাহা করিব!"

এই বলিয়া তাঁহারা একজন দেবদূতকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি শীঘ্র ইঁহাকে নিয়া ইঁহার আত্মীয়গণের সহিত দেখা করাও।"

দেবদূত তখনি যুধিষ্ঠিরকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সে বড়ই ভীষণ পথ; পাপীরা উহাতে চলাফেরা করে। মশা, মাছি, কীট, ভল্লুকাদিতে এবং অস্থি, রক্ত-মাংসের কর্দম ও

পুতিগন্ধে সেই ঘোর অন্ধকার পথ পরিপূর্ণ। চারিদিকে ভীষণ অগ্নি। লৌহচঞ্চু কাক ও গৃধিনীগণ দলে দলে তথায় উড়িয়া বেড়াইতেছে। পর্বতাকার সূচমুখ ভূতগণ তথায় ছুটাছুটি করিতেছে; তাহাদের কোনোটা রক্তমাখা, কোনোটার হাত-পা কাটা, কোনোটার নাড়ি-ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেখানকার নদীর জল আগুনের মতো গরম; গাছের পাতা ক্ষুরের মতো ধারাল। চারিদিকে লোহার কলসীতে ফুটন্ত তেলের মধ্যে ভাজা হইতে হইতে পাপীরা চীৎকার করিতেছে।

কি ভয়ংকর স্থান! যুধিষ্ঠির তাহা দেখিয়া দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এ পথে আর কতদূর যাইতে হইবে?"

দেবদূত বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কষ্ট হইলে, দেবতারা আপনাকে ফিরাইয়া নিতে বলিয়াছেন। সুতরাং যদি বলেন, এখান হইতে ফিরি।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির সেখান হইতে ফিরিলেন, আর অমনি চারিদিক হইতে, অতি কাতরস্বরে কাহারা বলিতে লাগিল, "হে মহারাজ! দয়া করিয়া আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন! আপনার আগমনে সুন্দর বাতাস বহিয়া আমাদিগকে অনেক শীতল করিয়াছে। অনেকদিন পরে আপনাকে দেখিয়া আমাদের বড় সুখ হইতেছে, আপনি দয়া করিয়া আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন।"

চারিদিক হইতে এইরূপ কাতর বাক্য শুনিয়া, যুধিষ্ঠিরের বড়ই দয়া হইল, কিন্তু উহা কাহার শব্দ, কোথা হইতে আসিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন তিনি বলিলেন, "হে দুঃখী লোকসকল! তোমরা কে? আর কিজন্য তোমরা কষ্ট পাইতেছ?"

যুধিষ্ঠির এই কথা কহিবামাত্র চারিদিক হইতে একসঙ্গে, "আমি কর্ণ!" "আমি ভীম!" "আমি অর্জুন!" "আমি নকুল!" "আমি সহদেব!" "আমি দ্রৌপদী!" "আমরা আপনার পুত্রগণ!" এইরূপে সকলে পরিচয় দিতে লাগিলেন। তখন যুধিষ্ঠির ভাবিলেন, 'হায়! কি কষ্ট! আমার পুণ্যবান প্রিয়তমেরা এমন কি পাপ করিয়াছে যে, তাহাদিগকে এ স্থানে আসিতে হইল? আর দুষ্ট দুর্যোধনই বা এমন কি পুণ্য করিয়াছে যে, সে সবান্ধবে স্বর্গে বসিয়া সুখ ভোগ করিতে পাইল? এ অতি অবিচার।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির দেবদূতকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি যাঁহাদের দূত, তাঁহাদিগকে বলুন যে, আমি এই স্থানেই থাকিলাম। আর আমি সেখানে যাইব না। আমার ভাইয়েরা আমাকে পাইয়া সুখী হইয়াছে।"

দেবদূত এ সকল কথা ইন্দ্রকে জানাইলে, দেবতারা সকলে সেই ভয়ংকর স্থানে যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেখিতে দেখিতে সেখানকার সকল অন্ধকার, দুর্গন্ধ এবং ভয় দূর হইয়া, সে স্থান স্বর্গের ন্যায় সুন্দর হইয়া গেল।

তারপর ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "মহারাজ! দেবতারা তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আর তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না; তোমার পুণ্যের বলে সর্বাপেক্ষা উচ্চ ফল লাভ হইয়াছে। নরক দেখিতে হইল বলিয়া তুমি বিরক্ত হইও না। সকল রাজাকেই একবার নরক দেখিতে হয়। পাপ-পুণ্য সকলেরই থাকে। যাহার পাপ অধিক, সে আগে অল্পকাল স্বর্গে থাকিয়া, পরে নরক ভোগ করে। যাহার পুণ্য অধিক, সে আগে নরকে থাকিয়া, শেষে স্বর্গ ভোগ করে। এইজন্যই তোমাকে আগে নরক দেখাইয়াছি। তুমি যে অশ্বত্থামার বধের

কথা বলিয়া দ্রোণকে ফাঁকি দিয়াছিলে, সেই পাপে তোমাকে নরক দেখিতে হইল। এইরূপ অল্প অল্প পাপ ভীমার্জুন, দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলেরই ছিল, তাই সকলকেই কিছু কিছু কষ্ট পাইতে হইয়াছে। কিন্তু এখন আর তাহাদের কোনো কষ্ট নাই, তাহারা সকলেই স্বর্গে গিয়াছে। তোমার পক্ষের রাজাদেরও সকলেরই স্বর্গলাভ হইয়াছে। এখন তুমি শোক পরিত্যাগপূর্বক আমার সঙ্গে আইস, সকলকেই দেখিয়া সুখী হইবে। ঐ দেখ, দেবনদী মন্দাকিনী বহিয়া যাইতেছে, উঁহার জলে স্নান করিলে, আর তোমার শোক, তাপ, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতি কিছুই থাকিবে না।"

সকলের শেষে ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "বৎস! আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। বারবার তোমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, তোমার তুল্য ধার্মিক আর নাই। তুমি যে তোমার ভাইদিগকে ছাড়িয়া স্বর্গ ভোগ করিতে চাও নাই, ইহাতেও তোমার মহত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এখন তুমি আমার সঙ্গে ঐ মন্দাকিনীর পবিত্র জলে স্নান কর।"

মন্দাকিনীর জলে স্নান করামাত্র যুধিষ্ঠিরের মানুষ দেহ দূর হইয়া দেবতুল্য অপরূপ উজ্জ্বল মূর্তি দেখা দিল। তখন তিনি ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, কুন্তী, মাদ্রী, পাণ্ডু, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি আত্মীয়গণ এবং কৃষ্ণের সহিত মিলিয়া স্বর্গের অতুল আনন্দে মগ্ন হইলেন।
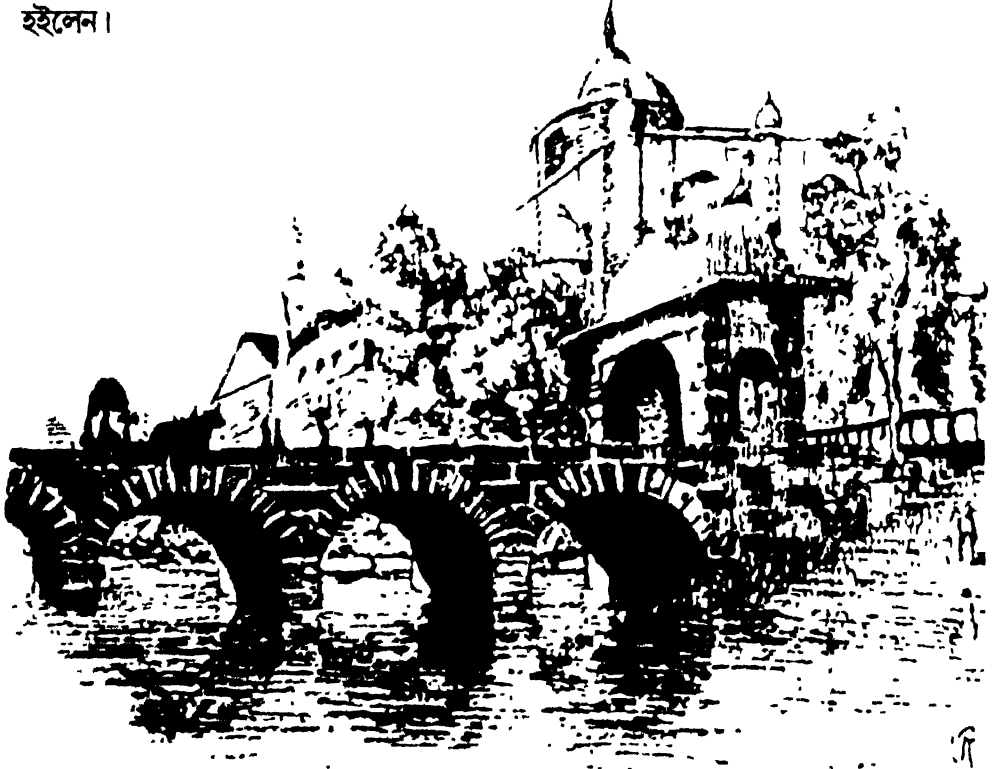
গল্পমালা

সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়?

ছেলেবেলায় একটু একটু এক গুঁয়েমো প্রায় সকলেরই থাকে। আমার কথা শুনিয়া কেহ চটিবেন না। চটিলেও বড় একটা অসুবিধা বোধ করিব না। অনেকের অভ্যাস আছে তাহারা খাঁটি কথা শুনিলে বিরক্ত হয়, কিন্তু কাহাকেও বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার নিজের দশা দেখিয়াই আমি উপরের কথাগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

ছেলেমানুষের একটা রোগ আছে। অনেক কাজ তাহারা আপনা আপনি করিয়া অন্য লোককে বিরক্ত করে, আবার যদি কেহ সেই কাজ তাহাদিগকে করিতে বলিল অমনি সেই কাজের মিষ্টত্বটুকু তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যায়। দাদা প্রথম বই পড়িতে শিখিয়াছে, তার বইয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি। পড়িবার সময় দাদা বই খুঁজিয়া পাইত না। আমার চোখে পড়িলেই আমি বইখানা হস্তে করিয়া, কেহ খুঁজিয়া না পায় এমন কোনো জায়গায় যাইয়া বসিতাম। শেষে, একদিন শুনিলাম ঐ বইখানা আমারও পড়িতে হইবে। আমার আনন্দের সীমানা রহিল না, তখনই দৌড়িয়া যাইয়া সঙ্গীদের সকলকে খবরটা দিয়া আসিলাম। পরদিন মাস্টার আসিলেই বই হাতে করিয়া হাজির। মনে করিলাম, প্রথম ছবিটার কথা আজ হইবে। মাস্টার প্রথম ছবির পাতে একটু আসিলেনও না— ছবিশূন্য একটা পাতা উল্টাইয়া, এ, বি, সি, ডি করিয়া কি বলিতে লাগিলেন। তখন হইতে আর সেই বই আমার ভাল লাগিল না।

দাদা ইস্কুলে যাইবার সময় মাঝে মাঝে আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইত। দাদাদের মাস্টার বড় ভালমানুষ। আমি মনে করিলাম ইস্কুলের সকল মাস্টারই বুঝি ঐরূপ। বাড়িতে তিন বছর থাকিয়া কয়েকখানা বই শেষ করিলাম। তাহার পর আমাকেও ইস্কুলে পাঠাইয়া দিল। কয়েক বছর বেশ চলিতে লাগিলাম, কিন্তু মাষ্টারকে আর তত ভাল লাগে না। কবে বড় মানুষ হইয়া ইস্কুল ছাড়িয়া দিব এই চিন্তাটা বড় বেশি মনে হইত। তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, ইংরাজি যে কয়েকখানা বই পড়িয়াছিলাম তাহার একখানিতে এক সাহেবের কথা লেখা ছিল। তিনি বাড়ি ছাড়িয়া বিদেশে গিয়াছিলেন, সেখানে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া শেষটা অনেক টাকা করিয়াছিলেন। সাহেব যে বয়সে বাড়ি ছাড়িয়াছিলেন, মিলাইয়া দেখিলাম আমারও এখন ঠিক সেই বয়স। তবে আর চাই কি। ক্লাসে সতীশের সঙ্গে আমার বড় ভাব, আমি সতীশের কাছে মনের কথাগুলি খুলিয়া বলিয়া ফেলিলাম। কথা শুনিয়া সতীশ যেন আর তার ছোট শরীরটির মধ্যে আঁটে না। তখনই সে লাফাইয়া উঠিল। বোধ হইল বাড়ি হইতে বিদেশে চলিয়া গেলেই বড়লোক হওয়া যাইবে, সতীশ বলিল, 'কালই চল।' কাল চলাটা তত সহজ বোধ হইল না। কিন্তু বেশি দেরি করা হইবে না, সেটা ঠিক করা হইল।

একদিন ইস্কুল হইতে ছুটি লইয়া বাড়ি আসিলাম, সতীশও আসিল। বাবা বাড়ি ছিলেন না। বাড়ির অন্যান্য লোকও চুপ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। চুপি চুপি কয়েকখানা কাপড় দিয়া একটি পুঁটলি বাঁধিলাম। তারপর বাবার বাক্স হইতে কতকগুলি টাকা লইয়া দুজনে চোরের মত বাড়ির বাহির হইলাম। পাছে কেহ আসিয়া ধরে সেই ভয়ে দুজনে মাঝে মাঝে দৌড়াইতে লাগিলাম। এইরূপে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটিয়া এক বাড়িতে যাইয়া উঠিলাম।

সেই বাড়ির কর্তা আমাদের অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন, আমাদের সম্বন্ধে যা যা কথা সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমরা কোনো কথারই ঠিক উত্তর দিই নাই। স্থানে স্থানে দু-একটি কথা গড়িয়া কহিতে হইল। তিনি আমাদের কথায় বুঝিয়া লইলেন যে আমরা দুজন পথ হারাইয়া ঘুরিতেছি, বলিলেন, 'কাল আমি একজন লোক দিয়া তোমাদের দুজনকে বাড়ি পাঠাইয়া দিব।'

খাইবার সময় ভদ্রলোকটি আমাদের সম্মুখে বসিয়া থাকিলেন, আমাদের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠিলেন না। একটি কুঠুরিতে আমাদের দুজনের ঘুমাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। সেখানে আর কেহ ঘুমাইতে আসিল না। আমি কিছু সুবিধা ভোগ করিলাম, ভাবিলাম কর্তা যাহা বলিলেন তাহা কাজে করিলে আর বড়লোক হওয়া হইবে না, সুতরাং কেহ জাগিবার পূর্বেই কর্তাকে ধন্যবাদ না দিয়া চলিয়া যাওয়া ঠিক হইল। সতীশকে ডাকিলাম, 'সতীশ! সতীশ!'— সতীশ কথা কয় না। সতীশের চক্ষে জল পড়িতেছে। কর্তার কথায় সতীশের মন ফিরিয়া গেল নাকি? বাস্তবিকও তাই, অনেক পীড়াপীড়ি করার পর বলিল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।' আপনারা কি মনে করিতেছেন? সতীশের কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব কিপ্রকার হইল? বড়লোক হওয়ার ইচ্ছাটা আমার এত বেশি হইয়াছিল যে, বাড়ি ছাড়িয়' অবধি আমার বোধ হইতেছিল—যেন বড়লোকের কাছাকাছি একটা কিছু হইয়াছি! সতীশকে আমি কাপুরুষ মনে করিতে লাগিলাম, সতীশের মা বাপ আছেন আমারও মা বাপ আছেন। প্রভেদ এই যে আমি স্বার্থপর, সতীশ তাহা নহে। সতীশের মনে যে-সকল চিন্তা উঠিতেছিল, আমার অন্তঃকরণে তাহার স্থান পাইল না। আমি সতীশের অবস্থা বুঝিতে পারিলাম না। মা বাপের মনে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিজের কথা লইয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে তাঁহাদের কথা ভাবিবার অবসরই পাই নাই। নানা চিন্তার মধ্যে ঘুম আসিল।

ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিলাম যে, আমি বাড়িতে কি একটা কথা লইয়া মার সঙ্গে রাগারাগি করিয়াছি। মা কত সাধিতেছেন আমার ভ্রূক্ষেপ নাই, রাগ যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। মার চক্ষে জল পড়িতেছে দেখিয়া যেন আমার প্রতিহিংসার ভাবটা চরিতার্থ হইতে লাগিল। আমি দাঁত খিঁচাইয়া মাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলাম। মা আমার হাত ধরিতে আসিলেন, আমি পাশের একটা গাছে উঠিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া চক্ষে দুফোঁটা জল আসিল, কিন্তু আবার সেই বড়লোক হওয়ার কথা! সতীশের মন ফিরিয়া গিয়াছে। সতীশ জাগিয়া আর যাইতে চাহিবে না, হয়ত আমারও যাওয়া হইবে না। রাত হয়ত আর বেশি নাই, এইবেলা সতীশকে না বলিয়া যাওয়াই ভাল। আমি আস্তে আস্তে উঠিলাম। আমার কাপড় আর টাকাগুলি লইয়া বাহির হইলাম। রাত্রি তখনো অনেক ছিল, কিন্তু আমার বোধ হইতে লাগিল যেন এই ভোর হইয়া আসিতেছে। একটা বড় রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। অনেকক্ষণ হাঁটিলাম, কিন্তু রাত ফুরায় না। রাস্তাটা একটা বড় নদীর ধারে যাইয়া শেষ হইয়াছে, আমিও সেইস্থানে যাইয়া থামিলাম — তারপর যাই কোথা? রাস্তাটা নিশ্চয় ওপারে যাইয়া আবার চলিয়াছে কিন্তু ওপারে যাই কেমন করিয়া? এতক্ষণ রাত ফুরাইল না। হয়ত আরো অনেক দেরি। ঘাটে একখানি নৌকা বাঁধা ছিল — নৌকার ছই নাই। একজন লোককে অনায়াসে ওরূপ

নৌকা অনেকবার চালাইতে দেখিয়াছি, আমার বোধ হইতে লাগিল আমিও পারি। নৌকায় উঠিতে বিলম্ব হইল না। যে লগিটিতে নৌকা বাঁধা ছিল তাহা তুলিয়া লইলাম। ডাঙ্গায় ভর করিয়া ঠেলিয়া নৌকা জলে ভাসাইয়া দিলাম। জলের গায় এত জোর আগে ভাবি নাই। শোঁ শোঁ করিয়া নৌকার গায় জল বাঁধিতে লাগিল, নৌকাখানা ঘুরিয়া গেল। হঠাৎ ঘুরিবার সময় তাড়াতাড়ি লগিটি ছাড়িয়া দিলাম। নৌকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাঙ্গা হইতে অনেক দূরে যাইয়া পড়িল — স্রোতে ভয়ানক বেগের সহিত ভাসিয়া যাইতে লাগিল, আমি কিছুকাল হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম।

বিপদের পরিণামটা প্রথম তত বুঝি নাই, শেষে কিছু কিছু করিয়া হুঁস হইতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া গেল। দুহাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঢেউগুলি তড়াক তড়াক করিয়া নৌকাখানিকে দোলাইতে লাগিল, তখন মায়ের সেই মুখখানি মনে হইল। কেন বাড়ি ছাড়িয়া আসিলাম? সেই অন্ধকার রাত্রি, ভয়ানক নদী, আর বাড়ির ছোট কুঠুরীটি— সেই কোমল সুন্দর বিছানাটি মনে হইল। দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। সেই আঁধারে পড়িয়া, মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কেন সতীশের সঙ্গে গেলাম না? তাহাকে কেন ছাড়িয়া আসিলাম?

এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ নৌকাখানি একদিকে যাইয়া ঠেকিল। চমকিয়া দেখিলাম কতকগুলি বড় বড় নৌকা তাহারি একটাতে আমার নৌকা ঠেকিয়াছে। আমি সেই মুহূর্তের জন্য আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু তার পরক্ষণেই নৌকা হইতে কতকগুলি কালো অর্ধ-উলঙ্গ লোক বাহির হইয়া কেঁউ মেঁউ করিয়া কি বলিতে লাগিল, আমি বুঝিতে পারিলাম আমাকে গালি দিতেছে, তাহারা আমার কথা বুঝিল বলিয়া বোধ হইল না। আরো বেশি গালাগালি দিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য নৌকার লোক আসিয়া গোলমালে যোগ দিল। আমার কথা শুনিয়া সকলেই ঐ লোকগুলিকে গালি দিতে লাগিল। একটি ভদ্রলোক সেখানে ছিলেন, তিনি দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার নৌকায় লইয়া গেলেন, নিজ হাতে আমার পুঁটলিটি যত্ন সহকারে এককোণে রাখিয়া দিলেন। তারপর আমাকে বলিলেন, 'আমি কা— যাইতেছি, তোমার আপত্তি না থাকিলে আমার সঙ্গে যাইতে পার, আমার বাড়িতে তোমার কোন ক্লেশ হইবে না।' আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম।

কা— ছোট একটি শহরের মত। অনেক লোক। বড়লোকও অনেকগুলি আছেন। আমি যাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাঁহাকে এখানে কালিদাসবাবু বলিব, তিনিও একজন বড়লোক। এই-সব দেখিয়া শুনিয়া আমার পুরাতন রোগ আবার দেখা দিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম এখানে থাকিয়া বড়লোক হওয়া যায় কি? যায় বইকি। না হইলে ইহারা এত গাড়ি চড়ে কি করিয়া? বোধ হইল যেন কালিদাসবাবুর বাড়িতে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ একদিন বড়লোক হইয়া যাইব। একদিন কালিদাসবাবু ডাকিলেন। কালিদাসবাবুর উপর প্রথম হইতেই আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছিল। যখনই তিনি আমাকে ডাকিতেন তখনই একখানা সুন্দর কিছু উপহার পাইতাম। আমার বয়সের অনেকেই এখন ভাল কাজ করিতেছেন, কিন্তু আমার যেন তখনো শিশু ভাবটা যায় নাই। কালিদাসবাবুও তাহা বেশ বুঝিতেন, যাহা হউক আমি কালিদাসবাবুর নিকট যাইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার নাম ধরিয়া বলিলেন, 'গিরিশ, এখানে তোমার কেমন লাগে?'

'দিব্যি।'

'বটে? তা এখান থেকে তোমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না?'

'কোথায় যাব? এখানেই থাকব।'

'তা বেশ' বলিয়া কালিদাসবাবু কপাল হইতে চশমা নামাইয়া ছাপার কাগজ পড়িতে লাগিলেন। কাগজের প্রথম পাতে একটা ছবি। আমার সেই সাহেব! আমি একটু আশ্চর্য হইলাম। অনেকদিন পরে কোনো পরিচিত বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইলে যেরূপ হয় আমারও সেইরূপ হইল। একটি ছোট কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল, আমি বলিয়া উঠিলাম, 'আরে!' কালিদাসবাবু কাগজ নামাইয়া আমার মুখের দিকে চাইলেন। তাহার অর্থ, ব্যাপারখানা কি?

আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে ঐ ছবিটে!'

'ইনি একজন বড়লোক ছিলেন, তোমারও বড়লোক হতে ইচ্ছে হয়, না?'

আমি ভাবিলাম এই বুঝি! হঠাৎ প্রশ্ন হওয়াতে থতমত খাইয়া বলিলাম, 'বড়লোক কি সবাই হয়?'

'হয় বইকি। ইচ্ছে করলে তুমিও হতে পার।'

'আমি পারি?'

'অবিশ্যি। কাল থেকে তোমাকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দেব ভেবেছি। লেখাপড়া না শিখলে বড়লোক হওয়া যায় না। তাই তোমাকে ডেকেছিলাম। কেমন?'

আমার বাতাসের ঘর ভাঙিয়া গেল। যার চোটে বাড়ি ছাড়া সেই আপদ! আমি কোন কথা কহিলাম না।

কালিদাসবাবু এতে সন্দেহ করেন নাই, সুতরাং কিছু বলিলেন না। এরূপ কথাবার্তা কালিদাসবাবুতে আর আমাতে অনেকদিন হইত। তিনি আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। 'সেই রাত্রিতে সেই নৌকায় কেমন করিয়া আসিলে!' 'বাড়ি কোথা?' 'মা বাপ নাই?' ইত্যাদি — আমি প্রায়ই চুপ করিয়া থাকিতাম। কালিদাসবাবুর ইচ্ছা ছিল, সুযোগ পাইলেই আমাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু এ-সব সম্বন্ধে কোনো খবরই আমি তাঁহাকে দিতে চাহিতাম না। তখন তিনি সে-সব বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া সেখানেই আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার মনস্থ করিলেন।

ইস্কুলে যাইয়া অবধি আমার আর মনে শান্তি ছিল না। কয়েকদিন কোনো মতে কাটাইলাম, কিন্তু শেষটা অসহ্য হইয়া উঠিল। কালিদাসবাবুর বাড়িতে থাকা হইবে না। কিন্তু হঠাৎ যাই কোথায়? গেলেও আর এবার হাঁটিয়া যাওয়া হইবে না। কা--- হইতে দুখানা স্টিমার ধু— তে যাতায়াত করিত। সপ্তাহের দুদিন স্টিমার চলে। ধু— যাইতে তিনদিন লাগে। হিন্দুরা এই তিনদিনের চিঁড়ে পুঁটলি-বাঁধিয়া লইয়া জাহাজে উঠে। ভোরবেলা জাহাজ ছাড়ে।

একদিন নদীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া দেখি একখানা স্টিমার এইমাত্র ঘাটে আসিয়া থামিল। পরের দিন ভোরে চলিয়া যাইবে। হঠাৎ স্টিমারে উঠিয়া ধু— চলিয়া যাইতে আমার বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল, বাড়ি আসিয়া কেহ না দেখে এমনভাবে আমার কাপড়-চোপড় সব একত্র জড় করিলাম। কালিদাসবাবুর বাড়ি আসিবার কালে সঙ্গে করিয়া যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহার একটিও ব্যয় হয় নাই। কালিদাসবাবুও মাঝে মাঝে আমার

ইচ্ছামত খরচ করিবার জন্য দু-একটি দিতেন। আমি সমস্তই সঞ্চয় করিতাম। শুনিয়াছিলাম, বড়লোকেরা সহজে টাকা খরচ করিতে চাহে না।

যাত্রার উপযোগী সকল জিনিস প্রস্তুত রাখিয়া ঘুমাইলাম। মনে একটা চিন্তা থাকিলে সহজে ঘুম হয় না, ঘুম হইলেও শীঘ্রই ভাঙিয়া যায়। আমারও তাই হইল, বড় কামরার ঘড়িতে চারটা বাজিল, আমি অমনি উঠিলাম। সঙ্গে পুঁটলিটি। পুঁটুলিতে কয়েকখানা কাপড়, একজোড়া চটী-জুতো, নগদ কিছু টাকা, কালিদাসবাবু মাঝে মাঝে যে উপহার দিতে সেগুলি— কয়েকখানা ছবি, একটা বড় ছুরি আর আমার স্কুলে পুস্তকগুলি। পুস্তকগুলি কেন সঙ্গে লইলাম ঠিক বলিতে পারি না, তবে কালিদাসবাবু বলিয়াছিলেন, 'লেখাপড়া না শিখলে বড়লোক হওয়া যায় না।' তাহাতেই মনে কেমন একটা ভয় রহিয়া গিয়াছিল। এইরূপ সাজ-সজ্জা করিয়া, ছাতাটি হাতে করিয়া, বিছানার চাদর-খানা পুঁটুলির উপর জড়াইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলাম, স্টিমার ঘাটে আসিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। সেখানেই মুদীর দোকান আছে, সেই দোকান হইতে চিঁড়ে কিনিয়া বিছানার চাদরের এক কোণে বাঁধিয়া লইয়া, জাহাজের একজন লোক আমাকে একটা জায়গা দেখাইয়া দিল, আমি সেইখানে যাইয়া বসিলাম। জাহাজে বিশেষ কিছু ঘটনা হইল না। তবে সঙ্গে যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। নিয়মিত সময় জাহাজ ধু— পৌঁছিল।

রামলোচনবাবু আমাদের ওদিককার লোক, তিনি ধু— তে থাকেন, সেখানকার একজন নামজাদা উকিল। আমি ভাবিলাম দেশের একজন লোক, তাঁর কাছে গেলে তিনি অবশ্যই কিছু খাতির করিবেন। জাহাজ হইতে তীরে উঠিয়াই তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। একটি ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ি দেখাইয়া দিলেন। আমি আস্তে আস্তে বাড়ির একজন চাকরের মত লোককে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রামলোচনবাবুর এই বাড়ি?' সে লোকটা আমার কথার উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। মুখ বিকৃত করিয়া একটা বড় ঘরে চলিয়া গেল, অগত্যা আমি অন্য লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সে যাহা বলিল তাহাতে জানিলাম, আমি যাহাকে রামলোচনবাবুর চাকর মনে করিয়াছিলাম, তিনিই রামলোচনবাবু। তাই অত রাগ! আমি ভয়ে ভয়ে রামলোচনবাবুর ঘরে দরজায় দাঁড়াইলাম। তিনি একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। অত কালো আমি আর দেখি নাই। মোটা বেশি নন, কিন্তু প্রায় বুকের উপর কাপড় পরেন। গোপগুলি সোজা সোজা, চুল অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে। কানে একটা কলম, হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় টানিয়া বসিয়াছেন। উরুদেশের উপর একটা লম্বা খাতা রাখিয়া তাহাই দেখিতেছেন, আর মাঝে মাঝে কাহার উদ্দেশে মুখ বাঁকাইতেছেন। তাকিয়ার একটা অংশ কলম মুছিবার স্থান বলিয়া বোধ হইল। কিছুকাল পরে দেখিলাম যে তাহা নহে। পাশে একটি মাটির দোয়াত, তাহা হইতে ঘাঁটিয়া এক কলম কালি লইয়া খাতায় যেন কি লিখিলেন। তারপর কলমটি মাথার চুলে ঘসিয়া কানে বসাইয়া হাতের কনুই তাকিয়ার উপর রাখিয়া, একখানা পা আমার দিকে বাড়াইয়া 'ভাউ' শব্দে উদগার করিলেন। শেষটা আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রথম প্রশ্নে হিন্দী ভাষায় হইল, তারপর পর বাঙলা।

'কি চাই?'

'আজ্ঞে আমি অনেক দূর থেকে এসেছি—'

'আমিও অনেক দূর থেকে এসেছি।'

'আমার নিবাস সু—।'

'আমারও নিবাস সু—। তারপর?'

'মহাশয় যদি—'

'ম-হা-শ-য় যদি। কি—ঞ্চি— ৎ—সা—হা—য্য? দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার আমার কাছে নাই। হিঁয়াসে চলে যাও।'

আমি আর এক মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব করিলাম না। কোথা যাইব ঠিক নাই, কিন্তু রামলোচনবাবুর বাড়িতে আর পদার্পণ করা হইবে না। রাস্তায় বাহির হইয়া একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, 'যে কোন মুদীকে পয়সা দিলেই থাকবার জায়গা আর খেতে দেবে।' মুদীর দোকান খুঁজিয়া লওয়া কঠিন বোধ হইল না। দুদিন মুদীর দোকানে খাইলাম। কিন্তু এরূপ ভাবে খাইলে বেশিদিন পয়সায় কুলাইবে না, এই চিন্তায় রাত্রিতে ঘুম হয় না। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া মুদীর পয়সা হিসাব করিয়া দিলাম। তারপর পুঁটুলিটি হাতে করিয়া বাহির হইলাম। রাস্তায় কতদূর হাঁটিয়া দেখি একটা বড় বাড়ি। এ বাড়ির কর্তা রামলোচনবাবুর মত নাও হইতে পারেন। আস্তে আস্তে বৈঠকখানার দিকে গিয়া দেখিলাম কর্তা বসিয়া আছেন, আর ইয়ার গোছের একটা অভ্যাগত লোক তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। আমি দাঁড়াইবামাত্রই কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে বাপু?'

আমি। — 'আমি পথিক, কষ্টে পড়েছি—।'

ইয়ার। — 'বড় খিদে পেয়েছে বুঝি?'

আমি কোন উত্তর করিলাম না, ইয়ার-বাবু উত্তর দিকে আঙুল নির্দেশ করিয়া চোখ বড় করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন —

'হোটেল আছে, হোটেল। বাবুরচি লোক দিব্যি রাঁধে — রোজ পাঁচ টাকাতেই চলে।'

আমি নিরাশ হইয়া বাবুর দিকে তাকাইলাম, বাবু ইয়ারেব উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিলেন, 'নিজের বাড়িতে একটি লোককে খেতে দিতে পার না, আবার অন্য লোকের বাড়ি এসে চাষামো কর। আর আমার বাড়ি এসো না।' বলা বাহুল্য, বাবুর উপর আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সম্মান ইত্যাদি যত হইতে পারে, সব কটা জন্মিয়া গেল। বাবু আমাকে বলিলেন, 'তোমার অন্য কোনরূপ কষ্ট না হলে আমার বাড়িতে তোমার থাকবার জায়গা আর খাবার বন্দোবস্ত হতে পারে।'

'আজ্ঞে আমি অমনি থাকতে চাই নে। আপনার কিছু কাজ করে দিব, তার পরিবর্তে যদি কিছু খাবার দেন তাহা হইলে ভাল হয়।'

'উত্তম! তুমি ইংরাজি লিখতে পার?'

'কিছু কিছু ইংরাজি পড়েছিলাম বটে, কিন্তু ভাল লেখা পড়া জানি না।'

'কতদূর পড়েছ?'

আমি বলিলাম।

'বেশ। তাতেই হবে।'

আমি বাবুর বাড়ি রহিলাম। কাজের মধ্যে এই, বাবুর চিঠিপত্র সব একটা নকল করিয়া রাখিতে হয়। এখানে থাকিয়া মাঝে মাঝে বাড়ির কথা ভাবিতাম। বড়লোক হইবার জন্য কত

কষ্ট পাইলাম, কিন্তু বড়লোক হইবার ত লক্ষণ দেখিতেছি না। কেবল বাড়ি হইতে চলিয়া আসিলেই কি বড়লোক হওয়া যায়? আরো কিছু চাই, আমার তাহা নাই। এইরূপ যতই ভাবিতে লাগিলাম ততই বাড়ি ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। শেষটা ঠিক করিলাম বাড়ি যাইতে হইবে। আমার হাতে যে কিছু টাকা আছে তাহাতে পথ খরচা চলিবে না। সুতরাং এবার স্টিমারে যাওয়া হইবে না। বৈ—তীর্থ এখান হইতে বড় বেশি দূরে নয়, সেখানে গেলে সঙ্গী পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তার পর মনে করিলাম, বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ—যাইব, সেখানে সঙ্গী পাইলে তাহাদের সহিত বাড়ি যাইব।

কর্তার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ— আসিতে বড় বেশি দেরি হইল না। জায়গাটা দেখিতে বড় সুন্দর, একটি ছোট পাহাড়, তার উপরে তীর্থ স্থান। পাথরের গায়ে সিঁড়ি কাটা আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। অনেকগুলি সিঁড়ি, উঠিতে অনেকক্ষণ লাগে। আমি উঠিতে উঠিতে তিনবার বিশ্রাম করিলাম। প্রথমেই যাহাকে দেখিলাম তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, 'যাত্রীরা কোথায় থাকে?' সে বলিল, 'যাত্রীদের থাকিবার ভাল জায়গা নাই। প্রায় সকলেই পাণ্ডাদের বাড়িতে থাকে। উপরে যে দেব মন্দির, সেই মন্দিরের পুরোহিতদের নাম পাণ্ডা। পাণ্ডা খুঁজিতে অধিকক্ষণ ঘুরিতে হইল না। প্রথম যে পাণ্ডা আমাকে দেখিল সেই হাত ধরিয়া আমাকে তাহার বাড়ি লইয়া গেল।'

পাণ্ডার বাড়ি দুদিন থাকিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে বিষয়টা তত সুবিধাজনক নহে। আমি যে সময় গিয়াছি সে সময় যাত্রীরা প্রায়ই আসে না। সঙ্গী পাইতে হইলে আরো তিনমাস অপেক্ষা করিতে হইবে। তিন মাসেব ত কথাই নাই; পাণ্ডা মহাশয় যেরূপ করিলেন তাহাতে তৃতীয় দিনেই আমাকে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিতে হইল। তৃতীয় দিন সকালে পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন, 'দেখিবি? চল্।' আমি চলিলাম। অনেক জিনিস দেখা হইল। শেষে এক জায়গায় গেলাম, সেটি একটি বড় মন্দির। মধ্যে গহ্বর, গহ্বরে নীচে ছোট এক ঝরনার মত। পাণ্ডা বলিল, 'এখানে পূজা করিতে হইবে।' কত লাগিবে তাহারও হিসাব দেওয়া হইল। আমি দেখিলাম, তা হলে আমার বাড়ি যাওয়া হয় না। আমি বলিলাম, 'আমি ছেলেমানুষ, পূজা কি করিব?' পাণ্ডা চটিয়া গেল, সেদিন হইতে আর আমাকে তাহার বাড়িতে জায়গা দিল না। অগত্যা আমায় সেখান হইতে প্রস্থান করিতে হইল। কিছুদূর গেলেই কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে আসিয়া 'পয়সা' 'পয়সা' করিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। আমি কোনো মতেই পয়সা দিতে চাহিলাম না। তাহারা ক্ষেপিল। কেহ গাল দেয়, কেহ কাপড় ধরিয়া টানে, কেহ দূর হইতে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়িয়া ফেলে। আমার মাথা গরম হইয়া গেল। কাছে একটা ছোট কাঠ পড়িয়াছিল, রাগের চোটে তাহাই হাতে করিয়া লইয়া ছেলেগুলাকে তাড়া করিলাম। মুহূর্তের মধ্যে সকলে অদৃশ্য হইল। আমার যেন ভূত ছাড়িল। সেখান হইতে উধর্বশ্বাসে দৌড়িয়া পাহাড়ের প্রায় অর্ধেক পথ আসিয়া পড়িলাম। তখন মনে হইল, জুতা জোড়াটি ফেলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহার পূর্বের পঁচিশ মিনিটের মধ্যে পাহাড় সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে মনে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। আমি জুতার আশা পরিত্যাগ করিলাম। চলিবার সময় সর্বদাই চটি জোড়াটি পুঁটলিতে বাঁধিয়া লইয়া যাইতাম, এক্ষণে তাহাই খুঁজিয়া লইলাম।

পাহাড়ের নীচে নামিতে নামিতে অনেক বেলা হইল। একটু একটু করিয়া ক্ষুধা বাড়িতে

লাগিল। কোনো দোকানে যাইতে হইলে অন্তত এক প্রহর চলিতে হইবে। সেই রোদে আর এক ঘন্টা চলাই অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। পথের ধারে দু-একটি গাছ দেখিলেই ইচ্ছা হতেছিল যে সেইখানেই শুইয়া পড়ি। কিন্তু একদিকে তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যাইতেছে এবং অন্যদিকে ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। কি করিব কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া পথের ধারে একটি বাড়ি খুঁজিয়া লইলাম। বাড়িতে উঠিয়া একটা বড় ঘরে গেলাম, সেখানে দুটি ছেলে বসিয়াছিল। আমি তাহাদের নিকটে আমার ক্ষুধার কথা জানাইলাম, তাহারা 'তুই' 'তুই' করিয়া আমার কথার উত্তর দিতে লাগিল। একজন বলিল—

'বাঙালী লোক চোর আর খ্রীষ্টান, বাঙ্গালী লোককে কিছু দিব না।'

'আমি ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ, চোর নই।'

'যা তুই এখান থেকে ঃ c-r-i-p crip: d-a-s-h dash.'

আমার তখন ঠাট্টার মেজাজ ছিল না। তথাপি এরপর আর হাসি থামাইতে পারিলাম না। তখন তাহাদের ধরনের কথা কহিতে লাগিলাম ঃ-

'ওর মানে কি হোল?'

'ও ইংরাজি। Ram is ill. I will not let him run in the sun.' বাঙ্গালী লোক চোর, যা তুই এখান থেকে।

'তোরা ইস্কুলে পড়িস?'

'এবার যেন তাহারা কিছু ভয় পাইল। বলিল, 'আমাদের মাস্টার বড় বই পড়ে।'

'তোমাদের মাস্টারের চাইতে আমি কি কম একটা কিছু?' এই দেখ ত!'

আমার পুঁটলিতে যে বইগুলি ছিল, তাহার মধ্যে Lamb's Tales ও ছিল। সেইখানা এখন বাহির করিলাম।

এইবেলা একটু পরিবর্তন দেখা গেল। তাহাদের মুখভঙ্গিতে বুঝা গেল যেন তাহার মনে করিয়া লইয়াছে যে আমি একটা কিছু হইব। একজন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উঠিয়া গেল। যে রহিয়া গেল আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাহার সহিত আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাহার কথায় বুঝা গেল যে তাহারা দুভাই। সে ছোট। বাবা নাই, মা আছেন, ইস্কুলে পড়ে, টাকা আছে, চাকর চাকরানী আছে। বলা বাহুল্য, সে বাড়িতে তখনকার জন্য আমার বিশ্রামের সংস্থান হইল।

আমার জন্য একটি ছোট ঘর নির্দিষ্ট করা হইল। আমি তাহাতে যাইয়া বসিলাম। তখন সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে সুতরাং নূতন আহারের আয়োজন করা হইল। একজন আসিয়া আমাকে স্নান করিতে বলিল। আমি কাছের একটা পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম যে জল-খাবারের জন্য কতকগুলি ভিজানো চাল আর কিছু সন্দেশ লইয়া বড় ছেলেটি আমার ঘরে বসিয়া আছে। চালগুলি ভিজিয়া ঠিক ভাতের মত হইয়াছে। সেখানে খাবার সময় ঐরূপ চাল অনেককে খাইতে দেখিয়াছি। আমি খাইতে বসিলাম। ছেলেটি আমার কাছে বসিয়া রহিল। তাহার ভাব ভঙ্গিতে বোধ হইতে লাগিল যেন কিছু বলিতে আসিয়াছে। কিছুকাল পরেই সে আমার গায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। আমি কিছু চমৎকৃত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম, সে বলিল, 'মা বলে দিয়েছেন আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি শাপ দিলে আমার অনিষ্ট হবে। আমি আপনাকে মন্দ কথা বলেছি।'

'তোমার উপর আমি রাগ করি নাই। তোমার কথায় আমার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিব, যেন তিনি তোমার ভাল করেন।' তাহাকে বুঝানো কিছু কষ্টকর বোধ হইল। কিন্তু শেষটা সে যেন সুখী হইল এবং বলিল, 'তবে যাই, মার কাছে বলিগে।'

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিলে সেই ছেলে দুটির নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইলাম। সেদিন রাত্রিতে এক বাজারে মুদির দোকানে ছিলাম। তারপর দুই দিন ঐ ভাবে গেল। সারাদিন পথ চলিতাম; কেবল দু-বেলা খাবার জন্য কোনো মুদীর দোকানে, উঠিতাম। রাত্রিতে কোনো মুদীকে পয়সা দিয়া তাহার ঘরে থাকিবার জায়গা পাইতাম। তৃতীয় দিন রাত্রিতে থাকিবার জন্য আর মুদীর ঘর পাইলাম না। কাজেই একজন গৃহস্থের বাড়ি যাইতে হইল। গৃহস্থ জায়গা দিতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিন্তু খাওয়া শেষ হইলে 'কড়া' 'বগুণো' সব দেখাইয়া বলিলেন, 'কাল' চলে যাবার আগে এইগুলো মেজে দিয়ে যেতে হবে। তুমি বাঙালী, তোমার এঁটো কে নেবে?' আমি মহা বিপদে পড়িলাম। বলিলাম, 'ওগুলো আমি ছুঁই নাই। তবে আমি যা যা ছুঁয়েছি সেগুলো দাও, এখনি মেজে দিচ্ছি।' সুতরাং একখানা থালা আর একটি বগুণো (বগুণোতে ডাল ছিল) আমার ঘাড়ে চাপিল। তিনি বাড়ির কাছে একটা পুকুর দেখাইয়া দিলেন; আমি তথায় যাইয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া আসিলাম। প্রায় আধঘণ্টা সময় লাগিল।

পরিশ্রমের পর সুনিদ্রা হইল। পরদিন গৃহস্থ ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইলেন, উঠিয়া দেখি সূর্য উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি পুঁটলি হাতে করিয়া বাহির হইলাম। গৃহস্থের নিকট বিদায় লইবার সময় ফা—যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'একটা বড় মাঠ, তারপর একটা পাহাড়, তারপর ফা—। একই পথ, ভুল হবার জো নাই।'

কিছুদূর হাঁটিয়াই একটা মাঠে আসিলাম। সেখানে পথিকদিগের জন্য একটি ঘর আছে। তথায় একজনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার সঙ্গে একটা ঘোড়া। সে আমাকে দেখিয়াই বলিল, 'বেশ, চল। একজন সঙ্গীর জন্য বসিয়াছিলাম।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সঙ্গীর প্রয়োজন কি? সে বলিল, 'তুমি আর কখনো এখানে চল নাই? একা গেলে খেয়ে ফেলবে।' আমার ভয় হইল।

মাঠের এপাশ থেকে ওপাশ দেখা যায় না। অতি কম চওড়া পথ; দশ বার হাত অন্তর ছোট ছোট খসখসের ঝোপ। জীব জন্তুর মধ্যে এক জাতীয় পাখি। পাখিটি একটি চড়াই অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়, গায়ের রং সবুজ; ঠোঁট সরু এবং লম্বা, স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল। ক্রমাগত একই রূপ শব্দ করিতেছে—"টিরিরিণ টিরিরিণ টিরিরিণ।" লেজে একটা নতুনত্ব আছে। লেজের মধ্যদেশ হইতে প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা একটি সূচীর মত বাহির হইয়াছে। আমার সঙ্গী বলিল, 'শ্বশুর বাড়ি গিয়ে ছুঁচ চুরি করেছিলেন। তাতেই ঐ শাস্তি।' অন্য কিছু না থাকাতে ঐ পাখিকেই বারবার ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ চারিটার সময় ছোট একটি ঘর দেখিতে পাইলাম। সঙ্গী বলিল, 'আজ এখানেই থাকিতে হইবে।' আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, 'চারটের সময় বসে থাকতে হবে কেন?'

সঙ্গী বলিল, 'মাঠে রাত হলে বাঘে খাবে।' বাঘে খায় এরূপ ইচ্ছা আমার ছিল না।

সুতরাং সে রাত্রির জন্য ঐ ঘরেই থাকিলাম। রাত্রিতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অনেকপ্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে-সব নাকি হাতির শব্দ। সৌভাগ্যক্রমে হাতিগণ আমাদের কোন খবর লইতে আসিলেন না। কিন্তু পরদিন উঠিয়া দেখি ঘোড়াটি নাই! ঘোড়ার স্বামী অনেক আক্ষেপ করিল।

মাঠ পার হইতে প্রায় চারটা বাজিল। মাঠ যে জায়গায় শেষ হইয়াছে, সেখানেও দেখিলাম একটি ছোট ঘর। সেখানে আসিলে সঙ্গী বিদায় লইয়া অন্য পথে গেল। আমি আমার নির্দিষ্ট পথে আস্তে আস্তে চলিলাম। কিছুদূর যাইয়া একটি মাহুতকে পাইলাম, সে হাতি লইয়া ফা—চলিয়াছে আমি চারি আনা পয়সা দিব বলাতে সে আমাকে তাহার হাতির পিঠে একটু স্থান দিল। মহাসুখে ফা—আসিলাম। কালিদাসবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস পাইলাম না। রাত্রিতে একটি মুদীর দোকানে থাকিয়া পরদিন ভোরে রওয়ানা হইলাম।

পথে যে-সকল ছোটখাট ঘটনা হইয়াছিল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে একদিনের কথা আবশ্যক। দুই প্রহরের পর আর মানুষের সাড়াশব্দ পাইলাম না। বেলা যতই কমিয়া আসিতে লাগিল, ততই ক্রমাগত নির্জন স্থানে যাইয়া পড়িতে লাগিলাম, তারপর কেবল একটা মাঠ দুই ধারে উলুবন এবং অন্যান্য দুই একটি ছোট ছোট গাছ। এরূপ জায়গায় সন্ধ্যা হইল। কি করি কোথায় যাই! প্রাণপণে দৌড়তে লাগিলাম। পথ এত সংকীর্ণ যে দুই পাশের গাছে গা লাগে। থাকিয়া থাকিয়া আমাব বুক গুড় গুড় করিয়া উঠিতে লাগিলাম। এমন সময় হঠাৎ যেন পিঠে একটা কি লাগিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম একজন পাহাড়ী লোক। সে আমাকে কি একরকম ভাষায় বলিল—'তুই কোথায় যাস? তোর প্রাণেব ভয় নাই? এই বলিয়া সে আমাকে তাহার পিছু পিছু যাইতে সংকেত করিল। আমি সহজেই তাহার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলাম। সে দুই হাতে উলুবন সরাইয়া শুয়োরের মত দৌড়াইতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে আমাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল 'আরে আয়, মরে যাবি।' আমি হতবুদ্ধি হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এইরূপে চলিলাম বলিতে পাবি না। অবশেষে একটা বড় নদীর ধারে আসিলাম, সেখানে দেখিলাম আরো কয়েকজন লোক বসিয়া আছে। পাহাড়ী বলিল, যতক্ষণ নৌকা আসিয়া ও পারে না যায়, ততক্ষণ এখানে বসিয়া থাসিতে হইবে। আমি তাহাদের সঙ্গে মাটিতে বসিলাম। অন্যান্য সকলে পঁটুলি হইতে খাবার খুলিয়া খাইতে লাগিল। পাহাড়ীর সঙ্গে কতকগুলি কমলালেবু ছিল। সে আমাকে তাহার খাবার খাইতে দিল। আমি তাহাই খাইয়া, নাক মুখ কাপড়ে ঢাকিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। অন্যান্য লোকেরা আমাকে বলিতে লাগিল 'ঘুমিও না, খেয়ে ফেলবে।' তেমন অবস্থায় ঐরূপ উপদেশ বাক্যের অত্যন্ত আবশ্যক ছিল, কারণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমার গা অবশ হইয়া আসিতেছিল। এবং একটুকু পরেই অতি নিকটে 'ঘ্যাঁওর' 'ঘ্যাঁওর' করিয়া বাঘ ডাকিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি চারিপাশে দূরে নিকটে হিংস্র জন্তুর শব্দ হইতে লাগিল। সে রাত্রির কথা আমার জীবনে আর কখনো ভুলি নাই। নৌকাওয়ালা পারে বসিয়া সুখভোগ করিতেছে, সেখানে নৌকা বোঝাই না হইলে ফিরিয়া আসিবে না। সমস্ত রাত্রি আমাদের প্রাণ হাতে করিয়া সেই ভয়ানক স্থানে বসিয়া থাকিতে হইল। পরদিন নৌকা আসিলে আমরা ওপারে গেলাম।

ইহার তিনদিন পরে বাড়ির কাছে বাজারে আসিলাম, সেখানে দই চিঁড়ে সন্দেশ ইত্যাদি

যাহা কিছু মনে হইল উদরস্থ করিয়া পথ কষ্টের প্রতিহিংসা বিধান করিলাম। দুইটার সময় বাড়ি আসিলাম। তখন বাহির বাটিতে কেহ ছিল না। গা ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল; শীতে অস্থির হইয়া গেলাম। আশে পাশে যে কয়খানা লেপ কাঁথা ছিল, উপর্যুপরি গায় দিয়া বিছানায় পড়িলাম। শক্ত জ্বর হইল। ফাঁকি দিয়া বড়লোক হওয়ার স্বপ্নটা ভালরকমেই ভাঙ্গিয়া গেল।

বড়লোক কিসে হয়?

সহজে কি বড়লোক হওয়া যায় এই নামের প্রস্তাবটি শেষ করিবার সময় আমরা গিরিশের পরে কি হইল তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। কিন্তু গিরিশের জীবনে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল যে আমরা সে-সব বলিতেও কষ্ট বোধ করি। তবে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে বেচারা কোন দিনই বড়লোক হইতে পারে নাই। দুঃখ কষ্টের একশেষ তাহার জীবনে হইয়াছিল। পরিশেষে সে নিজের হাতে নিজের জীবন শেষ করিয়া দিল।

গিরিশের সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হইয়াছে মোটামুটি সকলগুলিই সত্য। কথাগুলি যথার্থ বলিয়াই সেগুলি এত গুরুতর। তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, আমরা যদি তাহার মতন কাজ করি, কে জানে, কোন দিন আমাদের সম্বন্ধেও কেহ এইরূপ গল্পসকল বলিয়া লোককে সাবধান করিবে না। পরে কষ্ট পাওয়ার চাইতে আগে সতর্ক হওয়া ভাল।

বড়লোক হওয়ার ইচ্ছা থাকিলেই কিন্তু বড়লোক হয় না; তাহা হইলে অত কম লোক বড়লোক হইতে দেখিতাম না। ইচ্ছা ত সকলেরই আছে, তোমার আমার নাই? কিন্তু আমি যে আজিও ছোট লোকই রহিয়াছি! শুধু ইচ্ছা থাকিলেই বড়লোক হয় না; ইচ্ছার খুব দরকার, কিন্তু আরো কিছু চাই। গিরিশের ইচ্ছা যথেষ্ট ছিল। তাহার পক্ষে যতটুকু কুলাইয়াছিল সে ত চেষ্টারও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তবুও যে সে বড় লোক হইল না? হইবে কেমন করিয়া? কিরূপে কি করিতে হইবে তাহা যদি না জানিলাম, তবে ত সেই গাধা রামকান্তের মতই রহিলাম। রাম ক্লাশে একদিনও উপরে উঠিতে পারিল না, নীচে নামিবারও জায়গা ছিল না। গুরু মহাশয় তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, 'ওরে তোর আর কি কিছু হবে! ভাল ছেলে হ'তে হ'লে তেল পোড়াতে হয়, খাটতে হয়, কষ্ট সহ্য করতে হয়!' রামকান্ত একদিন বাড়ি আসিয়াই দু সের তেল কিনিয়া আনিল। ঐ তেলে কাপড় ভিজাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। তারপর ঘরের চালে দড়ি বাঁধিয়া তাহাতে প্রাণপণে দুলিতে লাগিল। সর্বশেষে দড়ি ছিঁড়িয়া আগুনের উপর অর্ধ দগ্ধ, অর্ধ ভগ্ন শরীরে নিষ্কৃতি পাইল। যে দুই সপ্তাহ শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল তাহার মধ্যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল মাস্টার মহাশয় ভুল করিয়াছেন। সে সরল লোক, যেদিন স্কুলে গেল সেদিনই মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিল। রামকান্তের যে ভুল, গিরিশ বেচারারও সেই ভুল। ভাই, আমরা যে বড়লোক হই না, আমাদেরও অনেকের সেই ভুল। যদি বড়লোক হইতে ইচ্ছা থাকে— নাই' যদি বল তবে আমি হাসিব— তবে প্রথমে কি কি কাজ করিলে বড়লোক হয়, বেশ করিয়া জান। তারপর নিঃশব্দে শান্তভাবে আপন কার্যে প্রবৃত্ত হও। অনেক কষ্ট পাইতে হইবে; তাহার জন্য যথেষ্ট সহিষ্ণুতা চাই। অনেক সুখ পায়ে ঠেলিতে হইবে; তাহার জন্য সমুচিত

ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। এত করিয়াও কত জন উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে বড় হইতে পারিতেছে না। তুমিও পারিবে কি না জানি না—আমি ইচ্ছা করিতেছি তোমরা সকলেই পারিবে।—কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে তোমার পক্ষে যতটুকু হওয়া সম্ভব তাহা হইতে গেলেই আমি যাহা বলিলাম সব কয়টি করিতে হইবে।

বড়লোক, বড়লোক, এতবার বলিলাম। কিন্তু যতজন বড়লোক হইতে চাহিতেছেন সকলেই কি বুঝিতে পারিতেছেন যে বড়লোক হওয়ার অর্থ কি? একটা লোক বলিতেছিল যে, 'আমার ছেলের বিবাহেতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছি।' তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'বল ত দেখি লাখ টাকা বলিলে কতগুলি টাকার কথা বলা হয়?' সে বলিল, 'কেন, লাখ টাকা আর লাখ টাকা, দুকুড়ি দশ টাকা।' বড়লোক হওয়া সম্বন্ধেও অনেকের ঐরূপ মত। অনেকের কেবল নিজের বেলাই ঐ মত। তাহারা বড় ছোট লোক। ভাই, বড়লোক না হও দুঃখ নাই; কিন্তু ছোট লোক হইও না।

কোন ভাল বিষয়ে খুব ভাল হইলে বড়লোক হয়। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়োলাক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়লোক, লর্ড রিপন বড়লোক, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বড়লোক, সুরেন্দ্র বাবু বড়লোক ইত্যাদি ইঁহাদের সকলেই এক বিষয়ের জন্য বড় হন নাই। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখিবে ইঁহাদের যাঁহার মধ্যে যেটুকু ভাল তাহার জন্যই তাঁহাকে বড়লোক বলা হয়। বড় চোরকেও বড়লোক বলা হয় না, বড় ডাকাতকেও বড়লোক বলা হয় না।

আর এক কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যার জন্য আমরা তাঁহাকে অত বড়লোক বলিতাম না, অন্তত তাঁহার প্রতি আমাদের অত শ্রদ্ধা হইত না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লর্ড রিপন, ইঁহারা কে কি শাস্ত্র অধিক জানেন, কি কিছুই বা জানেন না তাহার হিসাবও হয়ত আমরা কেহ দিতে পারিব না। সুরেন্দ্র বাবুর স্কুল আছে সেখানে তিনি পড়ান এজন্য তাঁহাকে কেহ বড়লোক বলে না। যিনি যে পরিমাণে লোকের উপকার করিতেছেন তিনি সেই পরিমাণে লোকের ভালবাসা পাইতেছেন। বড়লোক এবং ভাল লোক, এ উভয় হইলেই যথার্থ বড়লোক। বড়লোক হওয়া যেরূপই কঠিন হউক না কেন, ভাল লোক চেষ্টা করিলেই হওয়া যায়। এবং তাহাই আগে হওয়া উচিত। কাহারো যদি এক কোটি টাকা থাকে তাঁহাকে সুদ্ধ ঐ টাকাগুলির জন্য বড়লোক বলিব না। তিনি নিজের সদ্‌গুণের সাহায্যে উহা উপার্জন করিয়া থাকিলে অবশ্য তাঁহাকে বড়লোক বলিব। কিন্তু যখন দেখিব তিনি ঐ টাকা দিয়া দেশের উপকার করিতেছেন, তখনই তাঁহাকে যথার্থ বড়লোক বলিব। কারণ, তখন তিনি বড়লোক এবং ভাল লোক উভয়ই হইয়াছেন। বড়লোক বড়, ভাল লোক ভাল, বড়লোক ভাল হইলে বড় ভাল।

বানর রাজপুত্র

এক রাজার সাত রানী, কিন্তু ছেলেপিলে একটিও নেই। রাজার তাতে বড়ই দুঃখ, তিনি সভায় গিয়ে মাথা গুঁজে বসে থাকেন, কেউ এলে ভাল করে কথা কন না।

একদিন হয়েছে কি—এক মুনি রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মুনি রাজার মুখ

ভার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজা, তোমার মুখ যে ভার দেখছি, তোমার কিসের দুঃখ?'

রাজা বললেন, 'সে কথা আর কি বলব, মুনি-ঠাকুর। আমার রাজ্য, ধন, লোকজন সবই আছে, কিন্তু আমার যে ছেলেপিলে নেই, আমি মরলে এ-সব কে দেখবে?'

মুনি বললেন, 'এই কথা? আচ্ছা, তোমার কোন চিন্তা নেই। কাল ভোরে উঠেই তুমি সোজাসুজি উত্তর দিকে চলে যাবে। অনেক দূর গিয়ে একটা বনের ধারে দেখবে একটা আমগাছ রয়েছে। সেই আমগাছ থেকে সাতটি আম এনে তোমার সাত রানীকে বেটে খাইয়ে দিলেই, তোমার সাতটি ছেলে হবে। কিন্তু খবরদার, আম নিয়ে আসবার সময় পিছনের দিকে তাকিয়ো না যেন!'

এই কথা বলে মুনি চলে গেলেন। তারপর দিন গেল, রাত হল, ক্রমে রাত ভোর হল। তখন রাজামশাই তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে সোজাসুজি উত্তর দিকে চলতে লাগলেন। যেতে যেতে অনেক দূর গিয়ে তিনি দেখলেন, সত্যি সত্যি বনের ধারে একটা আমগাছ আছে, তাতে পাকা পাকা সাতটি আমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেই বনে তিনি কতবার শিকার করতে এসেছেন, কিন্তু আমগাছ কখনো দেখতে পান নি। যা হোক, তিনি তাড়াতাড়ি সেই গাছে উঠে আম সাতটি পেড়ে নিয়ে বাড়িতে ফিরে চললেন।

খানিক দূরে যেতে না যেতেই শুনলেন, কে যেন পিছন থেকে তাঁকে ডাকছে,

ওগো রাজা, ফিরে চাও,
আরো আম নিয়ে যাও।

মুনি যে সাবধান করে দিয়েছিলেন, সে কথা রাজার মনে ছিল না। তিনি পিছন থেকে ডাক শুনেই ফিরে তাকিয়েছেন, আর অমনি আমগুলো তাঁর হাত থেকে ছুটে গিয়ে আবার গাছে ঝুলতে লেগেছে। কাজেই রাজামশাই-এর আবার গিয়ে গাছে উঠে আমগুলি পেড়ে আনতে হল। এবার আর তিনি কিছুতেই মুনির কথা ভুললেন না। তিনি চলে আসবার সময় পিছন থেকে তাঁকে কতরকম করে ডাকতে লাগল, 'চোর' 'চোর' বলে কত গালও দিল। রাজামশাই তাতে কান না দিয়ে বোঁ বোঁ করে বাড়ি পানে ছুটলেন।

বাড়ি এসে রানীদের হাতে সাতটি আম দিয়ে রাজামশাই বললেন, 'তোমরা সাতজনে এই সাতটি আম বেটে খাও।'

ছোটরানী তখন সেখানে ছিলেন না। বড় রানীরা ছজনে মিলে তাঁকে কিছু না বলেই সব কটি আম খেয়ে ফেললেন। ছোটরানী এর কিছুই জানতে পারলেন না, কিন্তু তাঁর ঝি সব দেখল। বড় রানীদের খাওয়া হয়ে গেলে সে আমের ছালগুলি চুপিচুপি কুড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই ছালগুলো ধুয়ে বেটে ছোটরানীর হাতে দিয়ে বলল, 'মা, এই ওষুধটা খাও, তোমার ভাল হবে।' ওষুধ খেতে হয়, তাই ছোটরানী আর কোন কথা না বলেই সেটা খেয়ে ফেললেন।

তারপর বড় রানীদের সকলেরই এক-একটি সুন্দর খোকা হল, রাজা তাতে খুশি হয়ে ধুমধাম আর গানবাজনা করালেন। ছোটরানীরও একটি খোকা হল, কিন্তু সেটি হল বানর। বানর দেখে রাজা চটে গিয়ে ছোটরানীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। দেশের লোকের তাতে বড়ই দুঃখ হল। তারা একটি কুঁড়ে বেঁধে ছোটরানীকে বলল, 'মা, তুমি এইখানে থাকো।'

সেইখানে ছোটরানী থাকেন। বানরটি সেখানে থেকে দিন দিন বড় হচ্ছে। সে মানুষের মত কথা কয়। আর তার এমনি বুদ্ধি যে, কোন কথা তাকে শিখিয়ে দিতে হয় না। যখন যে কাজের দরকার, অমনি সে তা করে। সারাদিন সে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে যে ফল দেখে তা খায়; খুব ভাল লাগলে মার জন্যে নিয়ে আসে। তাকে কেউ কিছু বলে না, কারুর গাছের ফল খেতে গেলে সে ভারি খুশি হয়ে ভাল ভাল ফল দেখিয়ে দেয়। তার বুদ্ধি দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়!

এমনি করে দিন যাচ্ছে। বড় রাণীদের ছটি ছেলেও এখন বড় হয়েছে। তারা বানরটিকে যার পর নাই হিংসা করে, সে তাদের সঙ্গে খেলা করতে গেলে তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়।

তারপর একদিন বানরটি দেখল, যে বড় রানীদের ছেলেদের জন্য মাস্টার এসেছে, তারা পুঁথি নিয়ে তার কাছে বসে পড়ে। তা দেখে বানর গিয়ে তার মাকে বলল, 'মা, আমাকে পুঁথি এনে দাও, আমি পড়ব।'

মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'হায় বাছা, কি করে পড়বে? তুমি যে বানর।'

বানর বলল, 'সত্যি মা, আমি পড়ব; তুমি বই এনে দিয়েই দেখো। তুমি আমাকে পড়াবে।'

বানরের এমনি বুদ্ধি, যে বই পায় সে দুদিনে পড়ে শেষ করে ফেলে। সে দুবছরে মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠল। বড় রানীদের ছেলেরা তখনো দু-তিনখানি বই-পুঁথি শেষ করতে পারে নি; রোজ খালি মাস্টারের বকুনি খায়।

এ-সব কথা শুনে রাজা একদিন বললেন, 'বটে? বানরের এমনি বুদ্ধি? নিয়ে এসো ত তাকে, আমি দেখব।'

বানরের কিছুতেই ভয় নেই, রাজা ডেকেছেন শুনে সে অমনি তাঁর কাছে উপস্থিত হল। তাকে দেখে আর তার কথাবার্তা শুনে রাজার এমনি ভাল লাগল যে, তিনি আর কিছুতেই ছোটরানীকে কুঁড়েঘরে ফেলে রাখতে পারলেন না। বাড়িতে আনতেও ভরসা পেলেন না, পাছে বড় রানীরা কিছু বলেন। তাই তিনি ছোটরানীকে রাজবাড়ির পাশেই একটি খুব সুন্দর বাড়ি করে দিলেন। সেই বাড়িতে তখন থেকে ছোটরানী তাঁর বানর নিয়ে থাকেন। টাকা-কড়ি যত লাগে রাজার লোক এসে দিয়ে যায়। লোকে তাঁর বাড়িটাকে বলে বানরের বাড়ি। এ-সব দেখে বড় রানীদের ছেলেরা বানরকে আরো বেশি হিংসা করতে লাগল।

একটু একটু করে ছেলেরা বড় হয়ে উঠল। সকলে রাজাকে বলল, 'রাজপুত্রেরা বড় হয়েছেন, এখন এঁদের বিয়ে দিন।'

রাজা বললেন, 'তাদের দেশ বিদেশ ঘুরতে দাও। তারা নানান জায়গা দেখে, নানানরকম শিখে টুকটুকে ছয়টি রাজকন্যা বিয়ে করে আনুক।'

সকলে বলল, 'বেশ বেশ! তাই হোক।'

তারপর ছয় রাজপুত্র সেজেগুজে, টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নানান দেশ দেখতে বেরুল। তা দেখে বানর তার মাকে গিয়ে বলল, 'মা, আমিও যাব।'

তার মা বললেন, 'তুমি কি করতে যাব জাদু, তোমাকে কোন্ টুকটুকে রাজকন্যা বিয়ে করবে?'

মা বললেন, 'তুমি যে দেশ দেখতে যাবে, আমি তোমাকে ছেড়ে কি করে থাকব?

বানর বলল, 'আমি দেখতে দেখতে ফিরে আসব। তোমার পায়ে পড়ি মা, আমাকে যেতে দাও।'

কাজেই ছোটরানী আর কি করেন? বানরকে যেতে দিতেই হল।

ছয় রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে; রাজবাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। একটা বনের ভিতর দিয়ে তাদের পথ, সেই পথে চলতে চলতে তাদের নানারকম কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় বনের ভিতর থেকে বানর বেরিয়ে এসে বলল, 'দাদা, আমিও এসেছি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো।'

তাতে রাজপুত্রেরা যার পর নাই রেগে বলল, 'বটে রে, তোর এত বড় আস্পর্ধা! আমরা রাজকন্যা বিয়ে করে আনতে যাচ্ছি বলে তুইও তাই করতে যাবি! দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি!' এই বলে তারা বানরকে মারতে মারতে আধমরা করে একটা গাছে বেঁধে রেখে চলে গেল।

সেই বনে ছিল একদল ডাকাত। তারা দেখল যে ছয়জন রাজপুত্র ভারি সাজ করে টাকাকড়ি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। দেখেই ত তারা মার-মার করে চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলল। রাজপুত্রেরা ভয়েই জড়সড়, তলোয়ার খুলবার কথা আর তাদের মনেই নেই। তাদের টাকাকড়ি, ঘোড়া, পোষাক—সবসুদ্ধ তাদের হাত-পা বেঁধে নিয়ে যেতে তাদের দু মিনিটও লাগল না।

রাজপুত্রদের ধরে নিয়ে খানিক দূরে এসেই ডাকাতেরা দেখল পথের ধারে একটা বানর বাঁধা রয়েছে। তাকেও তারা সঙ্গে করে নিয়ে চলল। বানর যেন তাতে বেশ খুশি হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তাদের সঙ্গে যেতে লাগল। তা দেখে ডাকাতেরা ভাবল, বুঝি কারু পোষা বানর, কাজেই তাকে আর তারা তেমন করে বাঁধল না।

সেই বনের ভিতরেই ডাকাতদের ঘর। সেদিন তাদের বড্ড পরিশ্রম হয়েছিল, তাই রাজপুত্রদের নিয়ে সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে এসে বাঁধনসুদ্ধই ছটি ভাইকে একটা জায়গায় ফেলে রেখে তারা খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন খুব করে তাদের নাক ডাকতে লেগেছে, তখন বানর চুপিচুপি করে নিজের বাঁধন দাঁত দিয়ে কেটে তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজপুত্রদের বাঁধন খুলে দিয়েছে। তখন আর তারা বানরকে ফেলে যাবে কোন্ লাজে? কাজেই তাকেও সঙ্গে করে, জিনিসপত্র নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে অমনি তারা প্রাণপণে ছুট দিল, ডাকাতেরা কিছুই টের পেল না।

ডাকাতদের ওখান থেকে পালিয়ে রাজপুত্রেরা প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে লাগল, ভোরের আগে আর তারা কোথাও থামল না। সকালে তারা দেখল যে তারা ভারি চমৎকার একটা শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে খুব বড় এক রাজার দেশ; তাঁর বাড়ি দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, যেন একটা ঝকঝকে সাদা পাহাড়।

ছয় রাজপুত্র সেই বাড়ির কাছে গিয়েই টকটক করে ঘোড়া হাঁকিয়ে তার ভিতরে ঢুকে পড়ল। দারোয়ানেরা তাদের পোশাক আর ঘোড়ার সাজ দেখে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সেলাম করল, আর কিছু বলল না। বানর কিন্তু জানে যে, সে সেখানে গেলেই তাকে ধরে ফেলবে; তাই সে রাজবাড়ির পিছনের দিকে গিয়ে, খিড়কির পুকুরের ধারে শুয়ে রইল।

সেই দেশের রাজারও ছিল সাত রানী। তাদের বড় ছজন ছিল ভারি হিংসুক আর দেখতে বিশ্রী, আর ছোটটি ছিলেন পরীর মত সুন্দর আর বড় লক্ষ্মী। বড়রা রাজাকে মিছামিছি

নানান কথা বলে, ছোটরানীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল; তিনি খিড়কির পুকুরের ধারে একটি কুঁড়ের ভিতরে থাকতেন, রাজা তাঁর কোন খবরও নিতেন না। বড় ছয় রানীর ছটি মেয়ে ছিল, তারা দেখতে ছিল ঠিক তাদের মায়ের মতন, আর তাদের মনও ছিল তেমনি। আর ছোটরানীর যে মেয়েটি ছিল, সেও ছিল ঠিক তার মার মত— তেমনি সুন্দর, তেমনি লক্ষ্মী। তা হলে কি হয়, বড় রানীরা রাজাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, ছোটরানীর মেয়েটা পাগল, কালো, কুঁজো, কানা, খোঁড়া, কালা আর বোবা।

সেই খিড়কির পুকুরের ধারে, সেই ছোটরানীর কুঁড়েঘরের কাছে বানর গিয়ে শুয়ে রয়েছে। খানিক বাদে বড় রাণীদের ছয় মেয়ে ছটি ঘটি নিয়ে সেখানে স্নান করতে এল, ছোটরানীর মেয়েটিও তার ছোট্ট ঘটিটি নিয়ে এল। তারা স্নান করে চলে আসবার সময় সেই মেয়েটির ঘটি থেকে কেমন করে খানিকটা জল বানরের গায়ে পড়ে গেল। অমনি বড় রানীদের ছয় মেয়ে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ওমা! ওমা! তোমরা দেখো এসে—ছোটরানীর মেয়ে বাঁদরটাকে বিয়ে করেছে!"

বড় রানীরাও তা শুনে ছুটে এসে বলতে লাগল, 'তাই ত, তাই ত। ছোটরানীর মেয়ে বানরটাকে বিয়ে করেছে!'

সেই খবর তখনি তারা রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল। দেশের সকল লোক রাজ সভায় বসে শুনল যে, ছোটরানীর মেয়ের একটা বানরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।

ছোটরানীর মনে যে কি কষ্ট হল, তা আর কি বলব! তিনি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে, মেয়েটিকে বুকে নিয়ে মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তা দেখে বানর তাঁদের ঘরের দরজায় এসে বাইরে থেকে হাত জোড় করে বলল, মা, আপনি কাঁদবেন না। ভগবান যা করেন ভালই করেন; এ থেকেও আপনাদের ভাল হতে পারে।' বানরকে মানুষের মত কথা কইতে দেখে রানী উঠে বসলেন। তাঁর মনের দুঃখ যেন কোথায় চলে গেল। সেই থেকে বানর তাঁর ঘরের কাছে গাছের ওপরে থাকে আর প্রাণপণে তাঁর সেবা করে। রাণী যখন শুনলেন যে, সে রাজপুত্র, তখন সে যে বানর, সে কথা তিনি ভুলে গেলেন; তাঁর মনে হল যে এমন ভাল আর বুদ্ধিমান লোক আর মানুষের ভিতরে নাই।

এদিকে হয়েছে কি, সেই ছয় রাজপুত্রও রাজার বাড়িতে ঢুকে একেবারে তাঁর সভায় এসে হাজির হয়েছে; রাজা দেখেই বুঝতে পেরেছেন, এরা রাজপুত্র। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাপু তোমরা কে? কি করতে এসেছ?' তারপর যখন তাদের বাপের নাম শুনলেন, আর শুনলেন যে তারা বিয়ে করবার জন্য রাজকন্যা খুঁজতে বেরিয়েছে, তখন ত আর তাঁর খুশির সীমাই রইল না। তিনি বললেন, 'বাঃ! তোমরা যে আমার বন্ধুর ছেলে! বেশ হল; আমার ছয় মেয়েকে তোমরা ছজনে বিয়ে করবে।'

ঠিক এমনি সময় বাড়ির ভিতর থেকে খবর এল যে, ছোটরানীর মেয়ের একটা বাঁদরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। রাজপুত্ররাও তখনি বুঝে নিল যে এ আর কেউ নয়, তাদেরই বাঁদর। তাদের মনে হিংসাটা যে হল! বাঁদর এসে তাদের আগেই রাজার মেয়ে বিয়ে করে ফেলল, লোকে আবার কানাকানি করে বলে যে সে মেয়ে নাকি রাজার আর ছয় মেয়ের চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর আর ভাল। এ-সব কথা তারা যত ভাবে ততই খালি হিংসায় জ্বলে মরে।

যা হোক, রাজার ছয় মেয়ের সঙ্গে ত তাদের ছয় জনের বিয়ে হয়ে গেল, তারপর

ঝকঝকে ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে তারা বউ নিয়ে দেশে চলল। বানরও একটি ছোট নৌকায় করে তার স্ত্রীকে নিয়ে তাদের পিছু পিছু চলেছে। তাকে দেখেই ছয় রাজপুত্র রেগে ভূত হয়ে গেছে আর ভেবেছে যে একে বউ নিয়ে দেশে পৌঁছতে দেওয়া হবে না। মুখে কিন্তু 'ভাই, ভাই' বলে ভারি আদর দেখাতে লাগল, যেন তাকে কতই ভালবাসে। শেষে যখন বাড়ির কাছে এসেছে, তখন রাত্রে ঘুমের ভিতরে বেচারার হাত-পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দিল। ভাগ্যিস ছোট বউ টের পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা বালিশ ফেলে দিয়েছিল, আর তাই ধরে অনেক কষ্টে সে কোনমতে ডাঙ্গায় উঠল, নইলে সে যাত্রা আর উপায়ই ছিল না।

তারপর সকালবেলায় নৌকা এসে ঘাটে লাগল, রাজা খবর পেয়ে ছেলেবউদের আদর করে ঘরে নিতে এলেন। ছয় ছেলে এসে তাঁকে প্রণাম করল, রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার বানর কই?' তারা বলল, 'সে জলে ডুবে মারা গিয়েছে।'

বানর ত মরে নি, সে নদীর ধারে ধারে তাদের আগেই ঘাটে এসে গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। ওরা 'সে জলে ডুবে মারা গেছে' বলতেই বানর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে প্রণাম করে বলল, 'অমি মরি নি বাবা, ওরা আমার হাত-পা বেঁধে আমাকে জলে ফেলে দিয়েছিল, আমি অনেক কষ্টে বেঁচে এসেছি।'

তখন ত রাজপুত্রদের মুখ চুন। রাজা ভয়ানক রেগে তাদের বললেন, 'বটে! তোদের এই কাজ? দূর হ তোরা আমাব দেশ থেকে, আর তোদের মুখ দেখব না।'

এই বলে দুষ্ট ছেলেগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজা যার পর নাই আদরের সহিত বানর আর ছোট বউকে ঘরে নিয়ে এলেন। বানরের মা ছেলেকে ফিরে পেয়ে আর এমন সুন্দর লক্ষ্মী বউ ঘরে এনে যে কত সুখী হলেন তা বুঝতেই পার।

তারপর খুব সুখেই তাঁদের দিন কাটতে লাগল। এর মধ্যে হয়েছে কি, বউমা দেখলেন যে বানর শুধু দিনের বেলায়ই বানর সেজে বেড়ায়; রাত্রে সে বানরের ছাল খুলে ফেলে দেবতার মত সুন্দর মানুষ হয়। এ কথা তিনি ছোটরানীকে বললেন, ছোটরানী আবার রাজাকে জানালেন। রাজা ত শুনে ভারি আশ্চর্য হয়ে এসে বললেন, 'বউমা, তুমি এক কাজ করো। আজ রাত্রে যখন সে বানরের ছাল খুলে ঘুমোবে, তখন তুমি সেই ছালটাকে পুড়িয়ে ফেলবে।'

সেদিন বানরের শোবার ঘরের পাশের ঘরে মস্ত আগুন জ্বেলে রাখা হল, বানর তা জানতে পেল না। তারপর রাত্রে যেই ছাল খুলে রেখে সে ঘুমিয়েছে অমনি রাজকন্যা চুপিচুপি নিয়ে সেটাকে সেই আগুনে ফেলে দিয়েছেন। সকালে বানর উঠে দেখে তার ছাল নেই। তখন সে ত ধরা পড়ে গিয়ে খুবই ব্যস্ত হল, কিন্তু ব্যস্ত হয়ে কি হবে, আর বানর হবার জো নেই। দেখতে দেখতে সেই খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়ল, আর ছেলেবুড়ো সকলে ছুটে এসে, সব দেখেশুনে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল।

পাকা ফলার

পাড়াগাঁয়ে এক ফলারে বামুন ছিল। তাহাকে যাহারা নিমন্ত্রণ করিত, তাহারা সকলেই ঘুব গরিব; দৈ-চিঁড়ের বেশি কিছু খাইতে দিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না।

ব্রাহ্মণ শুনিয়াছিল দৈ-চিঁড়ের ফলারের চাইতে পাকা ফলারটা ঢের ভাল। সুতরাং এরপর যে ফলারের নিমন্ত্রণ করিতে আসিল, তাহাকে সে বলিল, 'পাকা ফলার খাওয়াতে হবে।' সে বেচারা গরিব লোক, পাকা ফলার সে কোথা হইতে দিবে? তাই সে বিনয় করিয়া বলিল, 'মশাই, পাকা ফলার দেওয়া কি যার তার কাজ? রাজা রাজড়া হলে তবে পাকা ফলার দিতে পারে।' এ কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, 'তবে, রাজা যেখানে থাকে, সেইখানে গিয়ে আমি পাকা ফলার খাব।'

ব্রাহ্মণ পাকা ফলার খাইবার জন্য রাজার বাড়ি চলিয়াছে। পথে যাহাকে দেখে, তাকেই জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁগা, রাজার বাড়িটা কোন্‌খানটায়?' একজন তাহাকে রাজার বাড়ি দেখাইয়া বলিল, 'ঐ যে পাকা বাড়ি দেখছ, ঐটে রাজার বাড়ি।'

ব্রাহ্মণ 'পাকা ফলার' যেমন খাইয়াছে, 'পাকা বাড়ি'ও তেমনি দেখিয়াছে। সুতরাং 'পাকা বাড়ি'র কথা শুনিয়া সে ভারি আশ্চর্য হইয়া রাজার বাড়ির দিকে তাকাইল। সে দেশের সব লোকেই কুঁড়েঘর; খালি রাজার একটি সুন্দর পাকা বাড়ি ছিল। রাজার বাড়ি দেখিয়া ব্রাহ্মণের মুখে লাল পড়িতে লাগিল। সে গদগদ স্বরে বলিল, 'পাকা বাড়ি! আহা! পাকা বাড়িই বটে! না হবে কেন? সে যে রাজা, তাই সে অমন বাড়িতে থাকে। ওটা তয়ের করতে না জানি কত ক্ষীর, ছানা আর চিনি লেগেছিল!'

এ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি গিয়া রাজার বাড়ির একটা কোণ কামড়াইয়া ধরিল; আবার তখনই 'উঃ-হুঃ-হুঃ করিয়া কামড় ছাড়িয়া দিল।

তারপর সে ভাবিতে লাগিল, 'তাই ত, এই পাকা ফলারের এত নাম!' আর খানিক ভাবিয়া সে বলিল, 'ওঃ হো! বুঝেছি। নারকেলের মতন আর কি! ওটা ওর খোলা; আসল জিনিসটা ভিতরে আছে! এই বলিয়া সে আগের চাইতে দ্বিগুণ উৎসাহে কামড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার দুইটা দাঁত ভাঙিয়া গিল, তাহাতে গ্রাহ্য নাই। কামড়াইতে কামড়াইতে সে সেই কোণের অনেকখানি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, আর মনে করিতেছে যে, 'আর বেশি দেরি নেই; এরপরই পাকা ফলার আসবে!' এমন সময় কোথা হইতে মস্ত পাগড়িওয়ালা এক দরোয়ান আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। 'আরে ঠাকুর, ক্যা করতে হো? মহারাজকে ইমারত খা ডল্‌তে হো? চলো তুম হমারে সাথ।' এই বলিয়া দরোয়ান তাহাকে রাজার নিকট লইয়া চলিল।

দরোয়ানের কাছে সকল কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'কি ঠাকুর, ওখানে কি করছিলে?' ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, 'মহারাজ! আমি পাকা ফলার খাচ্ছিলুম। খোলাটা না ভাঙতে ভাঙতেই এই বেটা দরোয়ান আমাকে ধ'রে এনেছে!'

এই কথা শুনিয়া রাজামহাশয় হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন, আর বেশ বুঝিতে

পারিলেন যে, ঠাকুরের পেটে অনেক বুদ্ধি। যাহা হউক, তাহার সাদাসিধে কথাগুলি রাজার বেশ ভাল লাগল। সুতরাং তিনি হুকুম দিলেন যে, এই ব্রাহ্মণকে পেট ভরিয়া পাকা ফলার খাইবার মত ময়দা, ঘি আর মিঠাই দাও।

ব্রাহ্মণ মনের সুখে রাজাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে ময়দা, ঘি আর মিঠাই লইয়া ঘরে ফিরিল। আসিবার সময় বলিয়া আসিল যে, পাকা ফলার খাইয়া আবার রাজামহাশয়কে আশীর্বাদ করিতে আসিবে।

পরদিন সকালে রাজামহাশয়, মুখ হাত ধুইয়া সভায় আসিয়াই সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ঠাকুর, কাল পাকা ফলার খেলে কেমন?' ব্রাহ্মণ বলিল, 'মহারাজ, অতি চমৎকার খেয়েছি! পাকা ফলার কি আর মন্দ হতে পারে? গুঁড়োগুলো আগে গলায় বড্ড আটকাচ্ছিল। জল দিয়ে গুলে নিতে শেষে তরল হল; কিন্তু অর্ধেক খেতে না খেতেই বমি হয়ে গেল!'

ময়দা আর ঘি দিয়া যে লুচি তৈয়ার করিতে হয়, ব্রাহ্মণ বেচারা তাহা জানিত না। কাজেই সে ঐ কাঁচা ময়দাগুলিকেই ঘি আর মিঠাই দিয়া মাখিয়া খাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। সহজে তরল হয় না দেখিয়া, আবার তাহার সঙ্গে জল মিশাইয়াছে। খাইতে তাহার খুব ভালই লাগিয়াছিল; তবে, পেটে রহিল না, এই যা দুঃখ!

রাজা দেখিলেন, লুচি নিজে তয়ের করিয়া খাইতে হইলে আর ব্রাহ্মণের ভাগ্যে পাকা ফলার ঘটিতেছে না। সুতরাং তিনি তাঁহার রসুয়ে বামুনদের একজনকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'এখান থেকে ময়দা ঘি নিয়ে, তোমার বাড়িতে লুচি তয়ের ক'রে, এই ঠাকুরকে পেট ভ'রে পাকা ফলার খাইয়ে দাও।'

রসুয়ে বামুন ফলারে বামুনকে তাহার বাড়ি দেখাইয়া বলিল, 'আমি খাবার তয়ের ক'রে রাখব, বিকালে আপনি এসে খাবেন। আমি বাড়ি থাকব না, আমার ছেলে আপনাকে খেতে দেবে এখন।' ব্রাহ্মণ রাজি হইয়া বাড়ি গিয়া বিকাল বেলার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রসুয়ে বামুনের সেই ছেলেটা ভাল লোক ছিল না; একটা চোরের সঙ্গে তাহার বন্ধুতা ছিল। রসুয়ে বামুন ফলারে বামুনের জন্য লুচি, সন্দেশ ইত্যাদি তয়ের করিয়া তাহার ছেলেকে বলিল, 'সেই লোকটি এলে তাকে বেশ ক'রে খাওয়াস!' তাহার ছেলে বলিল, 'তার জন্যে কিছু চিন্তা করো না, আমি তাকে খুব যত্ন ক'রে খাওয়াব এখন।' রসুয়ে বামুন রাজবাড়িতে রান্না করিতে চলিয়া গেল; আর তাহার ছেলে ফলারে বামুনের খাবারের আয়োজনে মন দিল। দু সেরের বেশি লুচি আর তাহার মত তরকারি মিঠাই ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। খানচারেক লুচি আর খানিকটা তরকারি ফলারে বামুনের জন্য রাখিয়া, আর সমস্ত সেই হতভাগা তাহার সেই বন্ধু আর নিজের জন্য রাখিয়া দিল। ফলারে বামুন আসিলে পর সে সেই চারখানা লুচি তাহাকে খাইতে দিল। সে বেচারা জন্মেও লুচি খায় নাই, তাহাতে আবার এমন চমৎকার লুচি— রাজার বামুন ঠাকুর যাহা তয়ের করিয়াছে! এমন জিনিস দু-চারখানি মাত্র খাইয়া তাহার পেট ত ভরিলই না, বরং তাহার ক্ষুধা বাড়িয়া গেল। সে খালি দুঃখ করিতে লাগিল, 'আহা! আর যদি খানকতক দিত!'

রসুয়ে বামুনের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ফলারে বামুন রাস্তা দিয়া চলিল। তাহার মনের দুঃখ রাখিবার আর জায়গা দেখিতেছে না। চলে, আর খালি বলে, 'আহা! আর যদি খানকতক

দিত!'

এমন সময় হইয়াছে কি, রাজার প্রধান ভান্ডারী সেই রাস্তা দিয়া চলিয়াছে সে নিজের হাতে সেদিন সকাল বেলায় ঐ ফলারে বামুনের জন্য পুরো দু সের ময়দা আর তাহার মতন অন্য সব জিনিস মাপিয়া দিয়াছে। ফলারে বামুনের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ঠাকুরমশাই! কি যদি আর খানকতক দিত?' ফলারে বামুন বলিল, 'বাবা আমি পাকা ফলারের কথা বলছি। রাজামশাই চিরজীবী হউন, আমাকে এমন জিনিস খাইয়েছেন! খালি যদি আর খানকতক হত!'

ভাণ্ডারী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাকে কখানা দিয়েছিল?'ফলারে বামুন বলিল, 'চারখানি পাকা ফলার আমাকে দিয়েছিল।' ভাণ্ডারী সবই বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'সে কি ঠাকুরমশাই! দু সের ময়দা দিয়েছি, তাতে কি মোটে চারখানা লুচি হয়!' ব্রাহ্মণ বলিল, 'হ্যাঁ বাপু, চারখানাই ছিল। আর তাতে খুব চমৎকার লেগেছিল।' ভাণ্ডারী বলিল, 'দু সের ময়দায় তার চেয়ে ঢের বেশি লুচি হয়। আমার বোধ হচ্ছে, ঐ রসুয়ে বামুনের ছেলেটা বাকি লুচিগুলো মাচায় তুলে রেখেছে। আপনি আবার যান। এবারে গিয়ে একেবারে মাচায় উঠবেন; দেখবেন আপনার লুচি সেখানে আছে।' ব্রাহ্মণ বলিল, 'তাই নাকি? বাপু তুমি বেঁচে থাকো। হতভাগা, বেল্লিক, বাঁদর, শয়তান পাজি'— বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ সেই রসুয়ে বামুনের বাড়ির পানে ছুটিল। গালিগুলি অবশ্য ভাণ্ডারীকে দেয় নাই।—রসুয়ে বামুনের ছেলেকে দিয়াছিল।

রসুয়ে বামুনের ছেলে ফলারে বামুনকে চারিখানি লুচি খাওয়াইয়া বিদায় করিয়াই, তাহার সেই চোর বন্ধুর কাছে গিয়াছিল। সেখানে গিয়া সে চোরকে বলিল, 'বন্ধু ঢের লুচি তয়ের ক'রে মাচার উপর রেখে এসেছি। তুমি শিগগির যাও; আমিও এই বাজার থেকে একটা জিনিস নিয়ে এখনি আসছি।'

চোর রসুয়ে বামুনের মাচার উপর উঠিয়া সবে লুচির ঢাকনা খুলিতে যাইবে, এমন সময় ফলারে বামুন আসিয়া উপস্থিত। এবারে কথাবার্তা নাই, একেবারে মাচায় গিয়া উঠিল। চোর মুশকিলে পড়িল। লুকাইবারও স্থান নাই, পালাইবারও পথ নাই। এখন সে যায় কোথায়? শেষটা আর কি করে, মাচার কোণে একটা কাঠের থাম জড়াইয়া কোনরকমে বেমালুম হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। একে সন্ধ্যাকাল, তাহাতে আবার ফলারে বামুন নিতান্তই সাদাসিধে লোক, লুচি খাইবার জন্য তাহার মনটা যারপর নাই ব্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং চোরকে সে দেখিতে পাইল না। ফলারে বামুন সামনে লুচি, সন্দেশ, তরকারি মিঠাই সাজানো দেখিয়াই খাইতে বসিয়া গেল। পেটে যত ধরিল, তত সে খাইল; আর একটি হজমি গুলির স্থানও নাই।

এমন সময়ে ভারি একটা মজা হইল। রসুয়ে বামুনের ছেলেও বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আর ঠিক সেই সময় রসুয়ে বামুনও আসিয়াছে। অন্যদিন সে প্রায় দুপুর রাত্রের পূর্বে ফিরে না, কিন্তু সেদিন সে ভুলিয়া একটা ঝাঁজরা ফেলিয়া গিয়াছিল, সেটার ভারি দরকার। ছেলে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, তুমি এখনি ফিরে এলে যে?' রসুয়ে বামুন বলিল, 'ঝাঁজরা ফেলে গিয়েছিলুম, তাই নিতে এসেছি।'

এতক্ষণে ফলারে বামুনের পেট এত বোঝাই হইয়াছে যে, আর-একটু হইলেই তাহার দম আটকায়। পিপাসায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেখানে জল নাই। সে 'জল জল' বলিয়া

চেঁচাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভাল করিয়া কথা ফুটিল না।

রসুয়ে বামুন তাহার ছেলেকে বলিল, 'ওটা কি রে?' ছেলে দেখিল ভারি মুশকিল। সে ফলারে বামুনের কথা ত আর জানিত না, কাজেই সে মনে করিয়াছে যে ওটা তাহার বন্ধু, গলায় সন্দেশ আটকাইয়া বিশ্রী স্বরে জল চাহিতেছে। বন্ধুর খবরটা বাপকে দিলে সে আর বন্ধুর হাড় আস্ত রাখিবে না, আর কিছু না বলিলেও হয়ত এখনই মাচায় উঠিয়া দেখিবে। এমন সময় হঠাৎ তাহার বুদ্ধি জোগাইল— সে বলিল, 'বাবা, ওটা, নিশ্চয় ভূত। না হইলে মাচার থেকে অমন বিশ্রী আওয়াজ দেবে কেন।'

ভূতের কথায় শুনিয়া রসুয়ে বামুন কাঁপিতে লাগিল। আরো মুশকিলের কথা এই যে, ভূতটা জল চাহিতেছে। তাহার কাছে জল লইয়া যাইতে কিছুতেই ভরসা হইতেছে না, অথচ জল না পাইলে সে নিশ্চয় ভয়ানক চটিয়া যাইবে। তারপর সে কি করে তাহার ঠিক কি? ছেলের ভারি ইচ্ছা, সে ভূতকে জল দিয়া আসে। কিন্তু রসুয়ে বামুন বলিল, 'তা হবে না, যদি তোর ঘাড় ভেঙে দেয়।' এই সময়ে তাহার মনে হইল যে, মাচার উপর কয়েকটা নারকেল ছাড়ানো আছে, সুতরাং; সে ভূতকে বলিল, 'মাচায় নারকেল আছে, থামে আছড়ে ভেঙে খাও।'

ফলারে বামুনের হাতের কাছেই নারকেলগুলি ছিল; সে তাহার একটা হাতে লইয়া থামে আছড়াইয়া ভাঙিতে গেল। সে থাম জড়াইয়া চোর দাঁড়াইয়া ছিল; ব্রাহ্মণ পিপাসার চোটে থাম মনে করিয়া সেই চোরের মাথাতেই নারকেল আছড়াইয়া বসিয়াছে—একেবারে মাথা ফাটাইয়া ফেলিবার জোগাড় আর কি!

এরপর একটা মস্ত গোলমাল হইল। নারকেলের বাড়ি খাইয়া চোর ভয়ানক চেঁচাইয়া উঠিল; আর তাহাতে ভয়ানক চমকাইয়া গিয়া ব্রাহ্মণও হাঁউমাউ করিতে লাগিল। গোলমাল শুনিয়া পাড়ার সমস্ত লোক সেখানে আসিয়া জড়ো হইল। আসল কথাটা জানিতে এরপর আর বেশি দেরি হইল না। চোর ধরা পড়িল; আর রসুয়ে বামুন তাহার ছেলেকে সেই ঝাঁজরা দিয়া এমনি ঠেঙান ঠেঙাইল যে কি বলিব!

দুঃখীরাম

দুঃখীরাম খুব গরীবের ছেলে। সকলে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত, কিন্তু তাহার এর চাইতে ঢের ভাল একটা নাম ছিল—সেটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

দুঃখীরামের যখন সবে দুই বছর বয়স, তখন তাহার মা-বাপ মরিয়া গেল। পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না, খালি ছিল মামা কেষ্ট। দু বছরের ছেলে দুঃখীরাম তাহার মামার খবর কিছুই জানিত না, তাহার মামাও তাহার কোন খবরই লইল না। কাজেই পাড়ার লোকেরা দয়া করিয়া তাহাকে মানুষ করিতে লাগিল। তখন হইতেই লোকে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত।

গরীবের ছেলের দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়াই অনেক সময় মুশকিল হয়, এর উপর আবার কে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবে? অন্য ছেলেদের ফেলিয়া-দেওয়া ছেঁড়া বই

পড়িয়া আর পাড়ার লোকের খুঁটিনাটি কাজ করিয়া তাহার দিন যাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে একদিন দুঃখীরাম শুনিল যে কেষ্ট বলিয়া তাহার একজন মামা আছে। শুনিয়াই সে মনে করিল যে, একবার মামার বাড়ি যাইতে হইবে।

অনেক সন্ধান করিয়া শেষে সে কেষ্টর বাড়ি বাহির করিল। কেষ্ট তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'তাই ত, দুঃখীরাম এসেছ! এখানে কত কষ্ট পাবে তা ত জান না। আমরা যে দু মাসে একদিন খাই! কাল খেয়েছি, আবার দুমাস পরে খাব।'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, তার জন্য ভাবনা কি? তোমরা যখন খাবে, আমিও তখনই খাব।' কেষ্ট আর কিছুই বলিল না; দুঃখীরামও আর কিছু বলিল না। মামার বাড়িতে খালি মামা আর মামাতো ভাই হরি ছাড়া আর কেহ নাই। মামাতো ভাইকে সে দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

সারাদিন কেষ্ট আর হরি কেহই কিছু খাইল না। কাজেই দুঃখীরামেরও খাওয়া জুটিল না। দুঃখীরাম এর চাইতে অনেক বেশি সময় না খাইয়া কাটাইয়াছে, সুতরাং তাহার বড় একটা ক্লেশও হইল না। সন্ধ্যার সময় সে কেষ্টকে বলিল, 'মামা, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমোই।' ইহাতে কেষ্ট যেন ভারি খুশি হইল, আর তখনই তাহাকে একটা মাদুর বিছাইয়া দিল। দুঃখীরাম সেই মাদুরে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খানিক পরে কেষ্ট আর হরি আসিয়া তাহার পাশেই ঘুমাইতে লাগিল। আসল কথা, কেহই ঘুমোয় নাই—মামা খালি ভাবিতেছে, কতক্ষণে দুঃখীরাম ঘুমাইবে, আর দুঃখীরাম ভাবিতেছে, এরপর মামা কি করে।

দেখিতে দেখিতে হরির নাক ডাকিল। দুঃখীরাম বুঝিল, দাদা ঘুমাইয়াছে। এর একটু পরে দুঃখীরাম পাশে একটা খচমচ শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে, এবারে মামা উঠিয়াছে। তারপর হেঁশেলে হাঁড়ি নাড়ার শব্দ হইল। তারপর হাঁড়ি ধোয়ার খলখল শব্দ, উনান ধরাইবার ফুঁ—সকলই শুনা গেল। দুঃখীরামের আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন সে চুপি চুপি উঠিয়া রান্নাঘরের বেড়ার ফুটা দিয়া দেখিল, কেষ্ট পায়স রাঁধিতেছে।

দুঃখীরাম এক-একবার উঠিয়া দেখে, আবার আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। যখন দেখিল যে, পায়স প্রস্তুত হইয়াছে, তখন হাউমাউ করিয়া উঠিয়া বসিল। গোলমাল শুনিয়া কেষ্ট তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে দুঃখীরাম কি হইয়াছে?'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, ও ঘরে তুমি কি করছিলে, আর একজন লোক বেড়ার ফুটো দিয়ে উঁকি মারছিল।' দুঃখীরাম নিজের কথাই বলিয়াছে, কিন্তু কেষ্ট মনে করিল বুঝি চোর আসিয়াছে। তাই সে লাঠি হাতে ঘরের পেছনে বনেব ভিতরে চোর তাড়াইতে ছুটিল।

তখন দুখীরাম তাহার দাদাকে ঠেলিয়া তুলিয়া বলিল, 'দাদা শিগ্‌গিব ওঠো, মামা একটা লাঠি হাতে তাড়াতাড়ি কোথায় যেন বেবিয়ে গেলেন।'

হরি বেচারার মনে ভারি ভয় হইল। সে মনে করিল যে লাঠি হাতে যখন গিয়াছে তখন নিশ্চয়ই একটু দূরে কোথায়ও গিয়াছে। তিন মাইল দূরে হরির ভগ্নীর বাড়ি, হয়ত হঠাৎ তাহার কোন ব্যারাম হইয়াছে, আর বাবা খবর পাইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া হরি ব্যস্ত হইয়া তাহার ভগ্নীর বাড়ি চলিল। খানিক পরে কেষ্ট ফিরিয়া আসিল। সে চোরকে ত ধরিতে পারেই নাই, লাভের মধ্যে বিছুটি লাগিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে।

সে আসিয়া হরিকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হরি কোথায় রে?'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা তুমিও গেলে আর যে লোকটা উঁকি মারছিল, সেই লোকটা দাদাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তার সঙ্গে কথা কইল; আর দাদাও তখ্‌খুনি বেরিয়ে গেল।'

ইহা শুনিয়া কেষ্ট মনে করিল যে হরি নিশ্চয় পাড়ার দুষ্ট ছেলের সঙ্গে জুটিয়া তাস খেলিতে গিয়াছে। সুতরাং হরি এবং সেই পাড়ার দুষ্ট ছেলেটার উপর তাহার ভয়ানক রাগ হইল, আর সেই লাঠি হাতে করিয়াই সে তাহার সঙ্গীকে শাস্তি দিবার জন্য পাড়া খুঁজিতে বাহির হইল।

দুঃখীরাম যখন দেখিল যে, মামা আর দাদার বাড়ি ফিরিতে একটু বিলম্ব হইবে, তখন সে আস্তে আস্তে রান্নাঘরে গিয়া পায়সের হাঁড়ি নামাইল। একে দুঃখীরামের বডই ক্ষুধা পাইয়াছিল, তার উপর আবার তার মামা রাঁধে বড় সরেস। সুতরাং দেখিতে দেখিতে সেই পায়সের হাঁড়ি খালি হইয়া গেল। তারপর দুঃখীরাম আবার সেই মাদুরে শুইয়া আরামে নিদ্রা গেল।

হরি ভগ্নীর বাড়িতে গিয়া তাহাকে ভালই দেখিতে পাইল। কিন্তু সে রাত্রে তাহার বোন আর তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া আসিতে দিল না। এদিকে কেষ্ট তাহাকে আকাশ-পাতাল করিয়া খুঁজিয়াছে, এবং তাহাকে কোথায়ও দেখিতে না পাইয়া রাগে আর বিছুটির জ্বালায় ছটফট করিতেছে। সুতরাং ভোরবেলা হরি যেই বাড়ি ফিরিয়া আসিল, অমনি কেষ্ট সেই লাঠি দিয়া তাহাকে খুব কয়েক ঘা লাগাইল।

এইরূপে সমস্ত রাত্রি নাকাল হইয়া, শেষে রান্নাঘরে গিয়া সে দেখে—পায়েসের হাঁড়ি খালি! তখন আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। দুঃখীরাম সকালে উঠিয়া অবধি কেমন আড়চোখে চায়, আর একটু হাসে। সুতরাং তাহা যে দুঃখীরামেরই কাজ, ইহা বেশ বুঝা গেল।

পরদিন বাপ-বেটায় মিলিয়া রাজার নিকট নালিশ করিতে গেল। রাজা দুঃখীরামকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁরে তুই এমন কাজ কেন করলি? ওদের পায়স চুরি করে কেন খেলি?—আর মিছে কথা বলে কেন ওদের নাকাল করলি।'

দুঃখীরাম হাত জোড় করিয়া বলিল, 'দোহাই ধর্মাবতার! ওঁরা দুমাসে একদিন খান। পরশু খেয়েছিলেন, আবার কাল পায়স রাঁধলেন কেন? ওঁরাই বলুন। তারপর নাকাল করার কথা বলছেন? তা আমি ত সত্যি কথাই বলেছি, তাতে যদি ওঁরা খামকা নাকাল হতে গেলেন, তা আমার কি দোষ।'

রাজা আগাগোড়া সমস্ত শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গেল।

দুঃখীরামকে বেশ চালাক-চতুর দেখিয়া রাজা তাহাকে একটি চাকুরি দিলেন। দুঃখীরাম এত ভাল করিয়া কাজ করিতে লাগিল যে, কয়েক বৎসরের ভিতরেই সেই সামান্য চাকরি হইতে ক্রমে সে ছোট মন্ত্রীর পদে উঠিল। বড় মন্ত্রীর পদ খালি হইলে যে তাহাও সে পাইবে, এ কথা সকলেই বলিতে লাগিলেন।

বড় মন্ত্রী লোকটা বড় সুবিধার ছিলেন না। দুঃখীরামকে তিনি ভারি হিংসা করিতেন, আর কি করিয়া তাহাকে জব্দ করিবেন ক্রমাগত তাহাই ভাবিতেন।

এক সওদাগরের সঙ্গে বড় মন্ত্রীর বন্ধুতা ছিল। সেই সওদাগরের একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া

ছিল। পক্ষিরাজ ঘোড়া মানুষের মত কথা কহিতে পারে, শূন্যে উঠিয়া এক মাসের পথ এক মিনিটে যাইতে পারে, আর ভূত ভবিষ্যৎ সব বলিয়া দিতে পারে। এই ঘোড়াটাকে পাইবার জন্য মন্ত্রীমহাশয় অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সওদাগর কিছুতেই সেটা তাঁহাকে দিতে চায় না।

এর মধ্যে সওদাগর একবার বিদেশে গিয়াছিল, সেখান হইতে একটা খুব আশ্চর্য আমের আঁটি লইয়া আসিয়াছে। সে আঁটির এই গুণ যে, তাহা পুঁতিবামাত্র গাছ হয়, তাতে তৎক্ষণাৎ আম হয়, তখনই সেটা পাকে, আর তখনই তাহা খাওয়া যায়। খাওয়ার পর আবার সেই আঁটি মাটির ভিতর হইতে তুলিয়া বাক্সে পুরিয়া রাখা যায়।

মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের চাকরকে টাকা দিয়া বশ করিলেন। সে তাঁহার কথায় সওদাগরের আমের আঁটি সিদ্ধ করিয়া রাখিল। তারপর একদিন মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বন্ধু, তুমি নাকি ভারি আশ্চর্য একটা আমের আঁটি আনিয়াছ?' সওদাগর বলিল, 'হ্যাঁ বন্ধু, সেটাকে পুঁতিলে তখনই গাছ হয়, তখনই তাতে ফল হয়, তখনই তাহা পাকে, আর তখনই তাহা খাইয়া আঁটিটি আবার বাক্সে রাখিয়া দেওয়া যায়।'

মন্ত্রীমহাশয় নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, 'ও কথা আমার বিশ্বাস হয় না।'

সওদাগর বলিল, 'আচ্ছা বাজি রাখুন। আমার কথা সত্য হয় ত কি হইবে?'' মন্ত্রী বলিলেন, 'তাহা হইলে পরদিন আমার বাড়িতে গিয়া প্রথমে যে জিনিসটাতে হাত দিবে সেইটা তোমার, আর যদি তোমার কথা সত্য না হয়?' সওদাগর বলিল, 'তবে আপনি পরদিন আমাব বাড়িতে আসিয়া প্রথমে যাহাতে হাত দিবেন তাহাই আপনার হইবে।'

ঠিক হইল, পরদিন সওদাগরের বাড়িতে মন্ত্রীমহাশয়ের নিমন্ত্রণ, আর তখন আমের আঁটির পরীক্ষা হইবে। আঁটি সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং পরীক্ষার ফল কি হইল তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। সওদাগর বেচারার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এবারে সে বুঝিতে পারিল যে, আর পক্ষিরাজ ঘোড়াকে রাখিতে পারিবে না।

অনেক ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া শেষে সওদাগর ছোট মন্ত্রীর কাছে গেল। সেখানে হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা নিবেদন করিল। বুদ্ধিমান ছোট মন্ত্রী একটু চিন্তা করিয়া তাহাকে একটা উপায় বলিয়া দিলেন। সওদাগর সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিয়া পক্ষিরাজ ঘোড়ার আস্তাবলের দরজা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া সুখে নিদ্রা গেল।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের বাড়ি গিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'বন্ধু! বন্ধু!' সওদাগর শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। মন্ত্রীমহাশয়ের একটু বসিবার দেরি সয় না। তিনি না বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কই বন্ধু, সে কথার কি হইল?' সওদাগর বলিল, 'আমি প্রস্তুত আছি, এখন আপনার যাহাতে খুশি হাত দিয়া লইয়া যাইতে পারেন।' মন্ত্রীমহাশয় অমনি আস্তাবলের দিকে চলিলেন; সওদাগরও সঙ্গে গেল।

আস্তাবলের দরজা বাঁধা ছিল। মন্ত্রীমহাশয় দড়ি ধরিয়া এক টান দিয়া বাঁধন খুলিয়া ফেলিলেন। অমনি সওদাগর বলিল, 'সেকি বন্ধু! আপনার মতন লোকের ঐ সামান্য দড়িগাছটায় লোভ! একটা কোন দামী জিনিস লইলে সুখী হইতাম।' মন্ত্রীর ত চক্ষু স্থির! অত সহজে ঠকিবেন, তাহা তিনি মনেও করিতে পারেন নাই। সওদাগরের কথার উত্তর

দিতে না পারিয়া আমতা আমতা করিয়া ঘরে ফিরিলেন।

পথে যাইতে যাইতে মন্ত্রীমহাশয় স্থির করিলেন যে, ছোট মন্ত্রী ছাড়া এ আর কাহারো কর্ম নয়, তারপর যখন শুনিলেন যে, সেদিন রাত্রে সওদাগর ছোট মন্ত্রীর বাড়ি গিয়াছিল তখন বুঝিলেন, নিশ্চয় ইহা ছোট মন্ত্রীর কাজ।

পরদিন দুপুরবেলা যখন রাজা ঘুমাইতেছিলেন, তখন মন্ত্রীমহাশয় জোড়হাতে তাঁহার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে রাজা চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞসা করিলেন, 'কি বড় মন্ত্রী?' মন্ত্রী বলিলেন, 'দোহাই মহারাজ! সুলক্ষণ সওদাগরের একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া আছে কিন্তু মহারাজের আস্তাবলে একটাও পক্ষিরাজ ঘোড়া নাই।' রাজা বলিলেন, 'বটে! ও ঘোড়া আমার চাই।' মন্ত্রী আরো বিনয় করিয়া কাঁদে-কাঁদো স্বরে বলিলেন, 'মহারাজের যাহাতে ভাল হয় আমার সেই চেষ্টা, আর ছোট মন্ত্রী দিনরাত তাহাতে বাধা দেন।' রাজা বলিলেন, 'সে কিরকম? মন্ত্রী বলিলেন, 'মহারাজের জন্য সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া আমি আনিতে গিয়াছিলাম কিন্তু ছোট মন্ত্রী সুলক্ষণকে মন্ত্রণা দিয়া সে ঘোড়া আনিতে দেয় নাই।

রাজাদের মেজাজ সেকালে বড়ই অস্থির ছিল। সহজেই সন্তুষ্ট হইতেন, আর সামান্য কথাতেই চটিয়া উঠিতেন। বকশিশ দিতেন ত অর্ধেক রাজ্যই দিয়া ফেলিতেন, আর সাজা দিতেন ত মাথাটাই কাটিয়া ফেলিতেন। রাজা ছোট মন্ত্রীর উপর এতদিন সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই তাহাকে ছোট মন্ত্রী করিয়াছিলেন। আজ বড় মন্ত্রীর কথা শুনিয়া এতই চটিয়া গেলেন যে, তখনই তাহাকে হাত-পা বাঁধিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। বেচারা কোন বিপদের কথা জানিত না, সুখে ঘুমাইতেছিল, এমন সময় রাজার লোক আসিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

দুঃখীরামের এই সাজার হুকুম হইল যে, তাহাকে থলের ভিতর পুরিয়া পাথর বাঁধিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। রাজামহাশয়ের সামনেই থলে আর পাথর আনিযা সব বাঁধিয়া ঠিক করা হইল, তারপর রাজা চারিটা জল্লাদকে হুকুম দিলেন যে, 'একে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়।'

দুঃখীরামকে সকলেই ভালবাসিত। সুতরাং তাহার এই সাজার কথা শুনিয়া সকলেরই ভারি ক্লেশ হইল। পথে যাইতে যাইতে জল্লাদেরা চুপিচুপি পরামর্শ করিল যে, এমন ভাল লোককে কখনই সমুদ্রে ফেলিয়া মারা হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা সমুদ্রের ধারে একটা বনের ভিতরে দুঃখীরামকে রাখিয়া থলের মুখ খুলিয়া দিয়া আসিল। আসবার সময় তাহাকে একখানি কুড়াল আর একটুকরা নেকড়া দিয়া বলিয়া আসিল, 'ছোট মন্ত্রীমশাই, আমরা আর তোমাকে কি দিতে পারি, এই নেকড়া ও কুড়াল নাও, কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে খেও। তোমার দোহাই ছোট মন্ত্রীমশাই, আমাদের রাজার দেশে যেও না। সেখানে তোমাকে দেখতে পেলে রাজা তোমাকেও রাখবে না, আমাদেরও রাখবে না।'

দুঃখীরাম এখন কাঠুরে হইয়াছে, লম্বা লম্বা চুল দাড়ি গোঁফ রাখিয়াছে আর নিজের পোশাকটা ফেলিয়া দিয়া সেই জল্লাদের দেওয়া নেকড়াখানা পরে। ভাল করিয়া স্নান না করাতে তাহার গায়ের রং ময়লা হইয়া গিয়াছে। পেট ভরিয়া খাইতে না পাওয়াতে ঢের রোগা হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাকে দেখিলে আর চট করিয়া চেনা যায় না। এইরূপ অবস্থায় কষ্টে দুঃখীরাম দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন কাঠ কাটিতে বাহির হইয়া দুঃখীরাম দেখিল যে, ঝরনার ধারে গাছতলায় এক বুড়ি ঘুমাইতেছে। সে এতই বুড়া হইয়াছে যে, তেমন বুড়ামানুষ আর দুঃখীরাম কখনো দেখে নাই। বুড়িকে দেখিয়া সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় দেখিল, যে একটা বিষাক্ত সাপ চুপি চুপি সেই বুড়ির দিকে যাইতেছে। দুঃখীরাম তখনই কুড়াল দিয়া সাপটাকে ঠুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল আর সেই টুকরাগুলি ঝরনার জলে ফেলিয়া দিল। কি আশ্চর্য! সেই টুকরাগুলি জলে পড়িবামাত্র একটা টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার শব্দ শুনিয়া বুড়ি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল।

বুড়ি খানিক অবাক হইয়া ঝরনার দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে বাবা?' দুঃখীরাম বলিল, 'আমি দুঃখীরাম।' বুড়ি বলিল, 'বাবা, তুমি কি চাও?' দুঃখীরাম বলিল 'আমি কিছু চাই না। তুমি বুড়োমানুষ, বনের ভিতর কেন আসিয়াছ? কত জন্তুটন্তু আছে, শীঘ্র চলিয়া যাও।' বুড়ি বলিল, 'বাপু, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছ, আমি তোমাকে কিছু না দিয়া অমনি যাইতে পারিতেছি না।' দুঃখীরাম কিন্তু কিছুই লইবে না, সুতরাং বুড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় চুপি চুপি বলিয়া গেল, তুমি কিছু লইলে না—আচ্ছা, আমি তোমাকে এক বর দিয়া যাইতেছি যে, 'তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহাই হইবে।' দুঃখীরাম ততক্ষণে কুড়াল হাতে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং এ-সকল কথা সে শুনিতে পাইল না।

আজ দুঃখীরামের ঢের বেলা হইয়া গিয়াছে। কখন কাঠ কাটা হইবে. সেই কাঠ বাজারে বিক্রী হইবে, তবে তাঁহার পেটে দুটি ভাত পড়িবে। এ-সকল কথা ভাবিয়া বেচারী মনটা একটু দুঃখিত ছিল, তাই তত সাবধান হইয়া পথ চলিতে পারিতেছে না। সামনে একটা ছোট গাছ পড়িয়া ছিল তাহাতে হোঁচট খাইয়া দুঃখীরাম পড়িয়া গেল। একে মন ভাল নাই, তাহার উপর এরূপ দুর্ঘটনা হইলে কাহার না রাগ হয়? দুঃখীরাম রাগিয়া বলিল, 'দূর হ ছাই। এ মুল্লুকে গাছপালা না থাকিলেই ভাল ছিল!'

যেই এ কথা বলা, আর অমনি সেখানকার যত গাছপালা সব কোথায় চলিয়া গেল, যেখানে ভয়ানক বন ছিল, সেখানে খালি মাঠ ধূ ধূ করিতে লাগিল। কি সর্বনাশ! এখন কাঠই বা কোথা হইতে মিলে, আর দুঃখীরামের খাওয়াই বা কি করিয়া হয়? বেচারা ব্যাপার দেখিয়া একেবারেই অবাক! ইহার কারণ কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া আপনমনে খালি হাঁটিয়া চলিল। বেলা ঢের হইয়াছে, ক্ষুধা আরো বেশি হইয়াছে, এমন অবস্থায় শুধু পথ চলিতেই কত কষ্ট, তাহাতে আবার হাতে প্রকাণ্ড কুড়াল; সে যে-সে কুড়াল নয়, জল্লাদের কুড়াল। সাধারণ কুড়ালের দুখানার সমান তাহার একখানা ভারি হয়। সেদিন দুঃখীরামের কাছে সেটা যেন দশটা কুড়ালের মত ভারি ঠেকিতে লাগিল, আর সেটাকে বহিয়া নিতে ইচ্ছা হয় না। সুতরাং দুঃখীরাম সেটাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, 'আমি আর পারি না, অত ভারি কুড়ালের হাত-পা থাকা উচিত, তাহা হইলে আমার সঙ্গে চলিতে পারে।'

কুড়াল তাহাই করিল। কোথা হইতে মাকড়সার পায়ের মত তাহার সব পা হইল; আর সে টুকটাক করিয়া দুঃখীরামের পিছু পিছু চলিল। দেখিয়া শুনিয়া বেচারার মাথায় আরো গোল লাগিয়া গেল। সে একভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল, হইল কি।

যাইতে যাইতে দুঃখীরাম একেবারে নিজের দেশের বাজারে গিয়া উপস্থিত। প্রভুভক্ত

কুড়াল সঙ্গেই আছে; সে এমনিভাবে চলিয়াছে, যেন চিরকাল তাহার ঐরকম করিয়াই চলা অভ্যাস।

একটা কুড়াল যদি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তোমার সামনে দিয়া চলিয়া যায়, তুমি তাহা হইলে কি কর? আর তেমন একটা কুড়াল যদি বাজারে গিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বাজারের লোকগুলিই বা কি করে? বাজারে প্রথম মোড়েই এক গোয়ালার দোকান। সেখানে এক বড়লোকের দরোয়ান ঘি কিনিতে আসিয়াছে। গোয়ালার হাতে ঘিয়ের বাটি দিয়া সবে সে পৈঠায় বসিয়া তামাকু খাইবার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখে, দুঃখীরামের সেই কুড়াল হাত-পাসুদ্ধ একেবারে তাহার সামনে উপস্থিত! 'হায় বাপ' বলিয়া চারি হাত-পা উর্ধ্বে উঠাইয়া দরোয়ানজী আপনি এক লাফে একেবারে গোয়ালার ঘাড়ে গিয়া উঠিল। গোয়ালাও তাড়াতাড়ি দরোয়ানজীকে ঠেলিয়া মাখনের হাঁড়িতে ফেলিয়া, ঘরে দরজা আঁটিল। তারপর যখন দেখিল যে, সেটা কাহাকেও কিছু বলে না, তখন দরজা খুলিয়া দুজনেই তাহার পিছু পিছু তামাশা দেখিতে চলিল।

সেদিন বাজারে কেনাবেচা বন্ধ। বাবুদের চাকর যাহারা বাজার করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই কুড়ালের পিছু-পিছু চলিয়াছে, তাহাদের বাজার করা আর হয় নাই। দোকানীরাও তাহাই করিতেছে—পুলিস-পাহারা সকলেই সেই কুড়ালের পিছু চলিয়াছে। চাকরদের সন্ধান লইতে বাবুরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই কুড়ালের তামাশা দেখিতেই রহিয়া গেলেন। এইরূপ করিয়া দেশের প্রায় সকল লোক সেইখানে আসিয়া জড়ো হইল। দুঃখীরামের সেই মামা আর মামাতো ভাই কেষ্ট আর হরিও তাহাদের ভিতর ছিল।

কেষ্ট আর হরি প্রথমে কুড়ালের তামাশা দেখিতেই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু তারপর একবার যেই দুঃখীরামের মুখের উপর চোখ পড়িল, অমনি তাহাদের বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। ভাল করিয়া দেখিয়া তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল যে, এ দুঃখীরাম। সুতরাং তাহারা তাড়াতাড়ি মন্ত্রীর নিকট গিয়া খবর দিল, 'মন্ত্রীমহাশয়, সেই দুখেটা আসিয়াছে।' মন্ত্রী অবিলম্বে এই সংবাদ রাজাকে দিলেন আর বলিলেন, 'মহারাজ, কুড়াল কি কখনো হাঁটে? এ নিশ্চয় কোন জাদু-টাদু শিখিয়া বদ মতলবে এখানে আসিয়াছে।' রাজা শুনিয়া বলিলেন, 'ঠিক বলিয়াছ মন্ত্রী, এখনি দশজন সিপাহী পাঠাইয়া দাও, উহাকে বাঁধিয়া নিয়া আসুক।' রাজার হুকুমে দানবের মত দশটা পালোয়ান দুঃখীরামকে আনিতে চলিল।

এদিকে বাজারের লোকেরা দুঃখীরামকে তত গ্রাহ্য করে নাই, কিন্তু তাহার কুড়ালটাকে রাজার কাছে লইয়া যাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে কুড়ালের গায়ে কি ভয়ানক জোর! তাহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া বাজারের সমস্ত লোক মিলিয়া কত টানিল, কিছুতেই তাহাকে এক পাও নাড়িতে পারিল না, বরং তাহারা যে দশ মিনিট ধরিয়া প্রাণপণে 'হিঁয়ো' করিয়াছে, ততক্ষণে দুঃখীরামের কুড়ালই তাহাদিগকে আধ মাইল খানেক টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

এমন সময় রাজার পালোয়ানেরা আসিয়া দুঃখীরামকে বাঁধিতে লাগিল। দুঃখীরামের কাছে আজ আর কিছুই আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয় না। সে কেবল দেখিতেছে, এরপর কি হয়! স্বয়ং বড় মন্ত্রী পালোয়ানদের সঙ্গে আসিয়াছেন, আর বলিতেছেন, 'শক্ত করিয়া বাঁধ।' এ কথা শুনিয়া দুঃখীরাম নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, 'অন্যের বেলা বলা খুব সহজ, তোমাকে

একবার ওরকম করিয়া বাঁধিত, তবে দেখিতে কেমন লাগে।'

অমনি চারটা পালোয়ান মন্ত্রীমহাশয়কে চিত করিয়া ফেলিয়া ঠিক দুঃখীরামের মতন করিয়া বাঁধিতে লাগিল। মন্ত্রীমহাশয় প্রথমে আশ্চর্য বোধ করিলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন, কিন্তু পালোয়ানেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। রাগে মন্ত্রীমহাশয়ের কথা বাহির হইতেছে না, চোখ দুটো ফুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, গলার শির ফুলিয়াছে, মুখে ফেনা উঠিতেছে। কিন্তু পালোয়ানেরা তথাপি তাঁহাকে বাঁধিতে কসুর করিতেছে না। বেশ করিয়া বাঁধিয়া তারপর পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ঠিক দুঃখীরামের মতন বাঁধা হইয়াছে কিনা। যখন দেখিল যে দুজনকেই ঠিক একরকম করিয়া বাঁধা হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগকে কাঁধে করিয়া রাজার নিকট লইয়া চলিল। বাজারের লোকেরা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এই-সকল লোক যখন রাজার কাছে উপস্থিত হইল, তখন রাজামহাশয়ের ভারি রাগ হইল এমনও নহে। মন্ত্রীর বাঁধন তিনি নিজ হাতে খুলিয়া দিলেন, তারপর তাঁহাকে লইয়া দুঃখীরামের বিচার করিতে বসিলেন। যে-সকল পালোয়ান মন্ত্রীমহাশয়কে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, প্রথমে তাহাদের ফাঁসির হুকুম হইল। দুঃখীরামের সম্বন্ধে একটা হুকুম দিবার পূর্বেই আহারের সময় হওয়াতে মাঝখানে রাজামহাশয় উঠিয়া গেলেন, খাওয়া-দাওয়ার পর দুঃখীরামের হুকুম হইবে।

দুঃখীরাম বেচারা সেই বাঁধা অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। তাহার চারধারে বিস্তর প্রহরী আছে, দর্শকদিগেরও অধিকাংশই রহিয়া গিয়াছে। দুঃখীরামের দুঃখের কথা আর কি বলিব! অন্য কষ্টের বিষয় আর এখন ততটা ভাবেন না, কিন্তু ক্ষুধা ত কিছুতেই থামিয়া থাকিবার নহে। রাজামহাশয়, মন্ত্রী-মহাশয়, সকলেই আহার করিতে গিয়াছেন। কত সুখাদ্য জিনিস খাইয়া তাঁহারা পেট ভরিয়া আসিবেন। দুঃখীরাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'আহা, ও-সব জিনিস যদি আমাকে কেহ এখন আনিয়া দিত!'

রাজামহাশয় আহারে বসিয়াছেন, সোনার পাত্রে শত ব্যঞ্জন সাজাইয়া তাঁহার সামনে রাখিয়াছে, তাহার সুগন্ধ নাকে গেলে লম্বা লম্বা নিশ্বাস টানিতে ইচ্ছা হয়, জিভে জল আসে। হাত ধুইয়া সবে রাজামহাশয় খাইবার উপক্রম করিয়াছেন, অমনি থালাসুদ্ধ খাবার জিনিস কোথায় মিলাইয়া গেল। মন্ত্রী-মহাশয়েরও ঐরূপ দশা হইল।

এদিকে দুঃখীরামের আক্ষেপ শেষ না হইতেই তাহার সামনে রাজা ও মন্ত্রীর আহারের সমস্ত আয়োজন আসিয়া হাজির হইল। দুঃখীরাম তাহাতে কিছুই আশ্চর্য বোধ করিল না, তাহার খালি দুঃখ হইতে লাগিল, 'হায় রে, হাত পা বাঁধা!' বলিতে বলিতে তখনি তাহার বাঁধন খুলিয়া গেল, সে এক লাফে উঠিয়া বসিয়া দু হাতে লুচি, মাংস, পোলাও, পায়স, মিঠাই, মোণ্ডা মুখে পুরিতে লাগিল।

প্রহরীরা ব্যাপার দেখিয়া এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া ছিল। হঠাৎ তাহাদের চৈতন্য হইল, একজন বলিল, 'আরে ধর পালাবে।' আর-একজন বলিল, 'কোথায় আর পালাবে, আমরা এতজন চারধারে দাঁড়িয়ে আছি। আহা বেচারার সামনে এত জিনিস এসেছে, একটু খেয়ে নিতে দে।' ও কথা শুনিয়া সকলেই বলিল, 'আহা, খাক্ খাক্!' দুঃখীরাম ইহাতে নিতান্ত কৃতার্থ হইয়া বলিল, 'বাপুসকল তোমরা রাজা হও।'

সেই রাজসভায় রাজার সিংহাসন ছিল, দেখিতে দেখিতে সেখানে তেমনি আরো হাজারটা সিংহাসন হইল। তারপর সকলেরই রাজার মত বেশভূষা হইল, আর তাহারা এক-একটা সিংহাসনে উঠিয়া বসিল।

রাজামহাশয় সভায় আসিয়া দেখেন, তাঁরা মতন ঢের রাজা সভায় বসিয়া আছে। তাহারা তাঁহাকে বলিল, 'মহারাজ, উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক।' রাজা আর কি করেন, এতগুলি রাজার অনুরোধ ঠেলিয়া ফেলা ত সহজ কথা নয়। কাজেই দুঃখীরাম তাড়াতাড়ি খালাস পাইল।

এমন সময় মন্ত্রীমহাশয় আসিয়া উপস্থিত। তিনি এতগুলি রাজাকে একঠাঁই দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। যেদিকে চান সেই দিকেই রাজা, আর মন্ত্রীমহাশয় খালি দু হাতে সেলাম করেন! সেদিন পেটে ভাত অল্পই পড়িয়াছিল, তাহাও হাজার রাজাকে সেলাম করিতে করিতে কখন হজম হইয়া গেল।

দুঃখীরামের কথা শুনিয়া মন্ত্রীমহাশয় যার পর নাই ব্যস্ত হইলেন। জোড়হাতে তিনি রাজাদিগকে অনুনয় করিতে লাগিলে, 'দোহাই ধর্মাবতারগণ, পুনরায় ইহার বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। এমন দুষ্ট লোককে সহজে ছাড়িয়া দিবেন না, কখন কার সর্বনাশ করে তার ঠিক নাই।' এই কথা শুনিয়া রাজাদেব ভিতর হইতে একজন বলিল 'সর্বনাশটা যে কি করলে তা ত বুঝতে পারছি না। আমি তোমার মেথর ছিলাম, আর আজ আমাকে রাজা করে দিয়েছে। এই এখনি তুমি দু হাতে আমাকে কত সেলাম করলে!'

মন্ত্রীমহাশয় আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, সত্যি সত্যি তাঁহার মেথর রাজা সাজিয়া বসিয়া আছে, আর তিনি তাহাকে সেলাম করিয়াছেন। ক্রমে দেখা গেল যে যত রাজা বসিয়া আছে সকলেই কেহ সহিস, কেহ পাইক, কেহ দরোয়ান কেহ দোকানী, কেহ ভিখারি।

রাজামহাশয় আর মন্ত্রীমহাশয় লজ্জা রাখিবার আর স্থান পান না। রাজা তাড়াতাড়ি হুকুম দিলেন, 'আবার বিচার হইবে, উহাকে ধর।' কিন্তু কে ধরিবে? সবাই রাজা সাজিয়া বসিয়াছে, হুকুম খাটিতে কাহারো ইচ্ছা নাই। অগত্যা মন্ত্রীমহাশয়ই ধরিতে গেলেন। দুঃখীরাম তাহা দেখিয়া বলিল, 'মন্ত্রী-মহাশয় অত কষ্ট করেন কেন? এই যে আমি হাজির আছি। কিন্তু আমার প্রাণদণ্ড হইলে আমাকে মারিবে কে? জল্লাদ যে রাজা হইয়া গিয়াছে। এখন আপনি আর রাজামহাশয় জল্লাদ হইলে তবে হয়।'

বলিতে বলিতে রাজা ও মন্ত্রীর সেই সুন্দর চেহারা আর জমকালো পোশাক কোথায় চলিয়া গেল, তাহার পরিবর্তে নেংটি-পরা, কুড়াল-হাতে, কালো ভূত দুই জল্লাদ সাজিয়া, জোড়হাতে হুকুমের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এখন হুকুম দেয় কে?

দুঃখীরাম এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, যে কারণেই হউক, সে যে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, ঘটনায় তাহাই হইতেছে। ইচ্ছা করিলে এখন সে কি না করিতে পারিত। কিন্তু সে বলিল, 'মহারাজ, আপনার নুন খেয়েছি, আপনার নিকট অকৃতজ্ঞ হইব না। আপনার রাজত্ব আপনারই রহিল। এখন আমাকে বিদায় দিতে আজ্ঞা হউক।'

লজ্জায় রাজামহাশয় মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছেন। দুঃখীরামের কথার তিনি আর কি উত্তর দিবেন। কেবল বলিলেন, 'আমার সমস্ত রাজ্যই তুমি লইতে পারিতে, ইচ্ছা করিলে আমায় প্রাণেও মারিতে পারিতে। এখন তুমি যাহা বলিলে তাহাতে বুঝিলাম, তুমি মহৎ

লোক। আমার অর্ধেক রাজ্য তোমার হউক, আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিয়া সুখে রাজত্ব করো।'

দুঃখীরাম রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পরমসুখে রাজত্ব করিতে লাগিল।

আর-সকলের কি হইল? মন্ত্রীমহাশয়ের সম্বন্ধে দুঃখীরাম কিছু বলে নাই, সুতরাং তিনি জল্লাদই রহিয়া গেলেন। যাহারা রাজা হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এক নতুন মুশকিল উপস্থিত হইল।

রাজা হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজ্য কোথায়পাইবে? অথচ সকলেই বলে, 'আমি রাজা হয়েছি যে, কাজ কেন করব?' ইহাতে ভারি অসুবিধা হইতে লাগিল। দুঃখীরাম বলিল, 'বাপুসকল, তোমাদের রাজা-টাজা হইয়া কাজ নাই, তোমরা যার যার যোগ্যতা অনুসারে কাজকর্ম কর গিয়া, আর সৎপথে থাকিয়া সুখে তোমাদের দিন কাটুক!'

ঠাকুরদা

এক গ্রামে এক বুড়ো ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ভবানীচরণ ভট্টাচার্য। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। তারা তাঁকে বলত ঠাকুরদা। তাদের কাছ থেকে শিখে দেশসুদ্ধ লোকেও তাঁকে ঐ নামেই ডাকত।

ছেলেরা ঠাকুরদার কাছে খুবই আদর পেত, আর তাঁকে জ্বালাতন করত তার চেয়েও বেশি। ঠাকুবদা ভারি পণ্ডিত আর বুদ্ধিমান ছিলেন। খালি এক বিষয়ে তাঁর একটু পাগলামি ছিল, পেয়াদার নাম শুনলেই তিনি ভয়ে কেঁপে অস্থির হতেন। ছেলেরা সে কথা খুবই জানত আর তা নিয়ে ভারি মজা করত।

ঠাকরদা রোজ তাঁর চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসে পুঁথি লিখতেন। সেই সময়ে মাঝে মাঝে পাড়ার এক-একটা দুষ্টু ছেলে দাড়ি পবে, লাল পাগড়ি এঁটে, মালকোচ্চা মেরে লাঠি হাতে এসে ঘরের আড়াল থেকে গলা ভার করে বলত, 'ভওয়ানী ভট্‌চাজ কোন হ্যায়?' ঠাকুরদা তাতে বিষম থতমত খেয়ে ঘাড় ফিরিয়েই যদি লাল পাগড়ির খানিকটা দেখতে পেতেন, তবে আর সে পাগড়ি কার মাথায়, সে কথার খবর নেবার অবসর তাঁর থাকত না। তিনি অমনি এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে একেবারে দিদিমার কাছে হাজির হতেন। ছেলেরা বলে যে, তখন নাকি প্রায়ই ঠাকুরদাকে স্নান করতে হত। কিন্তু সে বোধ হয় তাদের দুষ্টুমি।

যা হোক, এমন বিষম ভয়ের কাণ্ডটা যে ছেলেদের কাজ, এ কথা মুহূর্তের তরেও ঠাকুরদার মাথায় আসত না। তিনি ছেলেগুলিকে বাস্তবিকই খুব ভালবাসতেন। তাঁর কুলগাছটিতে কুল পাকলে তাদের সকলকে ডেকে ডেকে একটি-একটি করে কুল প্রত্যেকের হাতে দিতেন, কাউকে বঞ্চিত করতেন না — একটির বেশিও কখন কাউকে দিতেন না। সেই পরগনার ভিতরে এমন মিষ্টি কুল আর কোথাও ছিল না। কাজেই, একটি খেয়ে ছেলেদের যেমন ভাল লাগত, আর খেতে না পেয়ে তাদের অমনি কষ্ট হত।

তবুও এমন কথা শোনা যায় নি যে, ঠাকুরদার দেওয়া ছাড়া আর-একটি কুল কেউ কখনো তাঁর গাছ থেকে খেতে পেরেছে। তাঁর চণ্ডীমণ্ডপ থেকে সেই কুল গাছটি পরিষ্কার

দেখা যেত। সেদিকে কাউকে যেতে দেখলেই তিনি 'কে-রে এ-এ' বলে এমনি বিষম হাঁক দিতেন যে কি বলব! তখন আর হাত পা সামলে ছুটে দেবারও উপায় থাকত না। দু মাইল দূরে থেকে লোকে বলত, 'ঐ রে! ঠাকুরদা তাঁর কুল আগলাচ্ছেন।'

খালি একবার ছেলেরা ঠাকুরদার কাছ থেকে একপোয়া সন্দেশ আদায় করেছিল। ঠাকুরদা চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসে একমনে পুঁথি লিখছিলেন, তিনি দেখতে পান নি যে, এর মধ্যে ও পাড়ার বোসেদের বানরটা কেমন করে ছুটে এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছে, আর তার পঁয়ত্রিশ বছরে পুরনো বাঁধানো হুঁকোটি নিয়ে গাছে উঠছে। তারপর তামাক খেতে গিতে দেখেন, কি সর্বনাশ! বানরটাকে তিনি কত ঢিল ছুঁড়ে মারলেন, কত লম্বা লম্বা সংস্কৃত বকুনি বকলেন, কিছুতেই তার কাছ থেকে হুঁকোটি আদায় করতে পারলেন না। লাভের মধ্যে সে বেটা তাঁকে গোটা দশেক ভেংচি মেরে হুঁকো সুদ্ধ পাশের বাড়ির আমবাগানে চলে গেল।

সেদিন ছেলেরা না থাকলে ঠাকুরদার আবার তাঁর হুঁকোর মুখ দেখবার কোনো আশাই ছিল না। তিনি তাদের সন্দেশ কবুল করে অনেক কষ্টে তাদের দিয়ে বানরের হাত থেকে হুঁকোটি আদায় করালেন। তার পরদিনই নিজে গিয়ে বেচু ময়রার দোকান থেকে তাদের জন্যে এক পোয়া সন্দেশ কিনে আনলেন। সে সন্দেশ খেয়ে নাকি তারা মুখ সিঁটকিয়েছিল। ঠাকুরদা তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তারা বলল, 'সন্দেশটা বড্ড মিষ্টি।' ঠাকুরদা তখন খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'তাই ত আমি জানতুম না তোমরা তেতো সন্দেশ খাও। আমি মিষ্টি সন্দেশ কিনে এনেছি।'

পয়সা খরচ নিয়ে কিন্তু ঠাকুরদার একটু বদনাম ছিল। ঐ যে হুঁকোর খাতিরে ছেলেদের একপোয়া সন্দেশ কিনে খাইয়েছিলেন, তাছাড়া আর তাঁর জীবনে তিনি কখনো কাউকে কিছু কিনে খাওয়ান নি। লোকে বলত তাঁর ঘরের ভিতরে তিন-জালা টাকা পোঁতা আছে। কিন্তু নিজে তিনি এমনভাবে চলতেন যেন অনেক কষ্টে তাঁর দুটি খাবার জোটে, সেও বুঝি-বা একবেলা বই দুবেলা নয়। একদিন দিদিমা ডাল রাঁধতে গিয়ে তাতে একটু বেশি ঘি দিয়ে ফেলেছিলেন, সেই অপরাধে নাকি ঠাকুরদা দুমাস তাঁর সঙ্গে কথা কন নি।

ছেলেরা তাঁর সেই সন্দেশ খেয়ে অবধি তাঁর উপর একটু চটে ছিল। না চটবেই বা কেন? সেই হতভাগা বানরটার কাছ থেকে হুঁকো আদায় করতে গিয়ে কি তারা কম নাকাল হয়েছিল? কুড়ি জন মিলে তিনটি ঘন্টা ধরে তারা সেদিন কত গাছই বেয়েছে, কত ছুটোছুটিই করেছে, কত কাদাই লাগিয়েছে, কত বিছুটির ছ্যাঁকাই খেয়েছে। তার পুরস্কার হল কিনা অমনিতর একপোয়া সন্দেশ।

তখন ছিল পুজোর সময়। কুমোরদের বাড়িতে অনেক ঠাকুর গড়া হচ্ছিল, তার তামাশা দেখবার জন্য সকালে বিকালে ছেলেদের প্রায় সকলেই সেখানে যেত। সেইখানে তাদের একটা মস্ত মিটিং হল, ঠাকুরদাকে জব্দ করতে হবে। তিনি যেমন সন্দেশ খাইয়েছেন, তাঁকে দিয়ে কিছু বেশি টাকা খরচ করাতে পারলে তবে তার দুঃখটা মেটে। কিন্তু এমন লোকের পয়সা ত সহজে খরচ করানো যেতে পারে না, তার কি উপায় হতে পারে।

কতজনে কত কথা বলতে লাগল। কেউ বলল, 'চল ঠাকুরদার কুলগাছ কেটে ফেলি।' কেউ বলল, 'তাঁর হুঁকো লুকিয়ে রাখি।' কিন্তু এ-সব কথা কারুর পছন্দ হল না। এমন

কুলগাছটি কাটলে ভারি অন্যায় হবে। হুঁকো লুকিয়ে রাখলেও ত শেষটা তাঁকে ফিরিয়ে না দিলে চলবে না। তা ছাড়া, এ-সব করলে তাঁকে আর টাকা খরচ করানো হল কই? ঠাকুরদাকে ছেলেরা আসলে ভালবাসত, নাহক, তাঁর লোকসান করাতে কারো ইচ্ছা ছিল না। কাজেই এ-সব কথায় সকলের অমত হল। এমন ভাবে তাঁকে দিয়ে টাকা খরচ করাতে হবে যে সেটা তাঁর ক্ষতির মধ্যে ধরা না যেতে পারে।

ছেলেরা দেখল কাজটি তেমন সোজা নয়। বুড়ো কুমার এর মধ্যে এসে বুদ্ধি জুগিয়ে না দিলে তাদের পক্ষে এর একটা মতলব ঠিক করাই ভার হত। বুড়ো যে যুক্তি বলল, সে ভারি চমৎকার। ছেলেরা তার কথায় যার পর নাই খুশি হয়ে ঘরে চলে গেল। ঠিক হল, পরদিনই সেই কাজটি করতে হবে।

রাত থাকতেই ঠাকুরদার ঘুম ভাঙে। তখন তিনি শুয়ে শুয়ে সুর ধরে শ্লোক আওড়ান। তারপর ভোর হবার একটু আগে উঠে, স্নান তর্পন সেরে, শেষে গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসেন। সেদিনও দোয়েল ডাকবার আগেই তিনি জেগে সবে বলেছেন, 'ব্রহ্মামুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী' — অমনি বাইরে কে যেন ডাকল, 'ভওয়ানী ভট্‌চাজ ঘরমে হ্যায়?'

আর ঠাকুরদার শ্লোক আওড়ানো হল না। স্নান আহ্নিক আজ তিনি খিড়কির পুকুরেই সারলেন। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসে পুঁথি লেখার কাজটিও আজ বন্ধ রইল—তার চেয়ে দিদিমার রান্নাবান্নার খবর নেওয়াই বেশি দরকার মনে হয়েছে। এমনি ভাবে দুপুর অবধি কেটে গেল। এরপব যখন আর কেউ 'ভওয়ানী ভট্‌চাজ' বলে ডাকল না, তখন ঠাকুরদা সাহস পেয়ে ভাবলেন, একটু বাইরে গিয়ে দেখে আসি না কেন!

এই বলে আস্তে আস্তে বাইরে এসে ঠাকুরদা দেখলেন — কি সর্বনাশ! কি চমৎকার! তাঁর মণ্ডপের মাঝখানে দুর্গা প্রতিমা ঘর আলো করে বসে আছেন। ঠাকুরদার আর পা সরল না। তিনি সেইখানেই মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবলেন — হায়, হায়! কোন্ শয়তান এমন কাজ করল! এই প্রতিমা আমার ঘরে রেখে গেছে, এখন একে পুজো না করলে মহাপাপ হবে। আর পুজো করতে গেলেও যে তিনশোটি টাকার কম লাগবে না। বাবা গো, আমি কোথায় যাব!

যা হোক, ঠাকুরদা কৃপণ হলেও অতি ধার্মিক আর পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি তখনই ভাবলেন — আর দুঃখ করে কি হবে? ঘরে টাকা রেখেও আমি দেব সেবায় হেলা করেছিলাম, তাই দেবতা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। ভালোই হল, এখন থেকে আমি ফি-বছর দুর্গোৎসব করব।

ততক্ষণে ছেলেদের দুটি একটি করে প্রাণপণে হাসি চাপতে চাপতে এসে উপস্থিত হয়েছে। কাজটি ত তাদেরই, তারাই ঠাকুরদাকে পেয়াদার ভয় দেখিয়ে বাড়ির ভিতরে পাঠিয়ে সেই অবসরে প্রতিমাটিকে এনে মণ্ডপের ভিতরে রেখে গেছে। তাদের মুখের দিকে চেয়ে ঠাকুরদারও আর সে কথা বুঝতে বাকি রইল না। তখন তিনি বললেন, 'ভালই করেছ দাদা, বুড়ো পাপীর সুমতি জন্মিয়ে দিয়েছ। তোমরা বেঁচে থাকো। আমি খালি ভাবছি—এত বড় ব্যাপার, আমার লোকজন কিছু নেই, আমি কুলোব কি করে?'

ছেলেরা ভেবেছিল, ঠাকুরদা লাঠি নিয়ে তাদের তাড়া করবেন। তার বদলে তিনি এমন

কথা বলবেন, তা তারা মোটেই ভাবে নি। তারা তাতে ভারি খুশি হয়ে বলল, 'তার জন্যে চিন্তা কি ঠাকুরদা? আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি শুধু বসে বসে হুকুম দিন।' অমনি ঠাকুরদার মুখ ভরে হাসি ফুটে উঠল, তাঁর চোখ দুটি বুজে এল। ছেলেদেব মাথায় হাত বুলিয়ে, গাল টিপে আর নাকে কানে চিমটি কেটে তিনি তাদের বিদায় করলেন।

এবারে ঠাকুরদা যে সন্দেশ এনেছিলেন তা খেয়ে আর কারো নাক সিঁটকোতে হয় নি।

নরওয়ের দেশের পুরাণ

আমাদের দেশের পুরাণে যেমন দেবতা আর অসুরের গল্প আছে, পুরাতন নরওয়ে আর সুইডেন দেশের পুরাণেও তেমনি সব দেবতা আর অসুরের কথা লেখা আছে।

নরওয়ের পুরাণে আছে যে, সেকালের আগে যখন পৃথিবী বা সমুদ্র বা বায়ু কিছুই ছিল না—তখন কেবল বিশ্ব-পিতা (All father) ছিলেন। তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না; তিনি যাহা চাহেন, তাহাই হয়। সৃষ্টির আগে চারিদিকেই শূন্য আর অন্ধকার ছিল, সেই শূন্যের মাঝখানে ছিল গিন্নুঙ্গা নামে গহ্বর। সেই গহ্বরের উত্তরে কুয়াশার দেশ, তাহার মাঝখানে হ্বারগেল্‌মির নামে ঝরনার গরম জল টগবগ করিয়া ফুটিত।

সেই গহ্বরের দক্ষিণে মস্পেল্‌স্‌হাইম্‌, অর্থাৎ আগুনের দেশ, সুর্ৎর্ নামে বিশাল দৈত্য জ্বলন্ত তলোয়ার হাতে সেই দেশে পাহারা দিত।

সেই যে গিন্নুঙ্গা নামে গহ্বর, তাহার ভিতরটা ছিল বড়ই ঠাণ্ডা। হ্বারগেল্‌মির ঝরনার জল তাহাতে পড়িয়া বরফ হইয়া যাইত, সুর্ৎবের তলোয়ার হইতে আগুনের ফিনকি পড়িয়া সেই বরফকে গলাইয়া দিত। সেই আগুন আর বরফের লড়াই হইতে গিন্নঙ্গা গহ্বরের ভিতরে য়ীমির নামক অতি ভীষণ দৈত্য আর আধম্‌লা নামে গাই জন্মাই। য়ীমির আধম্‌লাকে পাইয়া তাহার দুধ খাইতে লাগিল, আব আধম্‌লা আশপাশের বরফে লবণের গন্ধ পাইয়া তাহাই চাটিতে আরম্ভ করিল। চাটিতে চাটিতে সেই বরফের ভিতর হইতে একটি দেবতা বাহির হইলেন, তাঁহার নাম বুরি।

এই য়ীমির হইতে অসুর আর বুরি হইতে দেবতাগণের জন্ম, আর জন্মাবধিই অসুর আর দেবতার বিবাদ। যুগ যুগ ধরিয়া সেই বিবাদ চলিতে থাকে, শেষে অনেক যুদ্ধের পর দেবতারা য়ীমিরকে মারিয়া ফেলেন। আর যত অসুর ছিল, য়ীমিরের রক্তের বন্যায় সকলেই ডুবিয়া মরে, বাকি থাকে কেবল বার্গেল্‌মির আর তাহার স্ত্রী। এই দুজনে একখানি নৌকায় করিয়া সকল জায়গায় শেষে একেবারে ব্রহ্মাণ্ডের কিনারায় গিয়া ঘর বাঁধিল। সেই স্থানের নাম হইল 'জোতন্‌হাইম' বা দৈত্যপুরী। সেই দৈত্যপুরীতে অসুরের বংশ বাড়িতে লাগিল, দেবতা-অসুরের বিবাদও আবার জাগিয়া উঠিল।

এদিকে অসুর সব মরিয়া যাওয়াতে দেবতারা কিছুদিনের জন্য যেন একটু আরাম পাইলেন। তখন তাঁহাদের মনে হইল যে, চারিদিকে কেবলই শূন্য আর কুয়াশা আর আগুন আর বরফের লড়াই দেখিতে একটুও ভাল লাগে না। তাই তাঁহারা সকলে মিলিয়া যুক্তি করিলেন যে, চলো আমরা য়ীমিরের দেহ হইতে গাছ-পালা নদ-নদী আর পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি করি।

এই বলিয়া তাঁহারা য়ীমিরের বিশাল দেহটাকে সকলে মিলিয়া গড়াইয়া গিন্নঙ্গা গহ্বরে নিয়া ফেলিলেন। তাহাতে গহ্বরও বুজিল, এই সৃষ্টি রাখিবার একটা জায়গাও জুটিল। য়ীমিরের রক্তে সমুদ্র ত আগেই হইয়াছিল, উহার মাংসে মাটি গড়িতেও বেশি বেগ পাইতে হইল না, হাড় আর দাঁত হইল পাহাড়-পর্বত, চুল-দাড়ি হইল গাছপালা, মাথার খোলটা হইল আকাশ, মগজগুলি হইল মেঘ, কাছেই আগুনের দেশ ছিল, যেখানে সেই সুর্তর্ নামক দৈত্য থাকিত— সেইখানকার আগুনের ফিনকি দিয়া চন্দ্র সূর্য আর তারা হইল।

এদিকে কিন্তু য়ীমিরের মাংস পচিয়া তাহাতে পোকা ধরিয়াছে। দেবতারা ভাবিলেন, 'তাই ত, এই পোকাগুলিকে কি করা যায়? এগুলি হইবে পরী, ভূত আর বামন।' পরীরা দেখিতে ভারি সুন্দর; তাহারা আকাশ আর পৃথিবীর মাঝখানে থাকে, চাঁদের আলোতে খেলা করে, প্রজাপতির পিঠে চড়িয়া ফুলগুলিকে ফুটাইতে আসে, আর নানামতে লোকের উপকার করে। ভূত আর বামনগুলি দেখিতে যেমন বিশ্রী তেমনি দুষ্টু। তাহারা মাটির নীচে থাকে, সোনা-রূপা মণি-মানিকের সন্ধান রাখে, আর লোকের মন্দ করিতে রাত্রে বাহিরে আসে। দিনে তাহাদের মাটির উপরে আসিবার হুকুম নাই, আসিলে পাথর হইয়া যায়।

সকলের মাঝখানে দেবতারা আগেই তাঁহাদের নিজের থাকিবার জায়গা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই জায়গার নাম আর্সগার্ড বা স্বর্গ। সেখানকার রাজা ছিলেন বিশ্ব-পিতা। তাঁহার অন্য নাম ওডিন (Odin) বা উওডেন (Woden) —যাহা হইতে বুধবারের নাম ওয়েডনেজ ডে হইয়াছে। ইঁহা হইতেই সকল দেবতা আর মানুষের জন্ম, ইঁহার নাম বিশ্ব-পিতা।

স্বর্গের সকলের চেয়ে উঁচু সিংহাসনে ওডিন তাঁহার রাণী ফ্রিগ্‌গার (Frigga) সহিত বসিয়া স্বর্গ মর্ত পাতাল কোথায় কি হইতেছে তাহার সংবাদ লইতেন; কিছুই তাঁহার চোখ এড়াইতে পারিত না। ওডিনের একটিমাত্র চোখ ছিল, আর একটি চোখ তিনি মিমির নামে এক বুড়াকে দিয়াছিলেন। সেই বুড়ার একটা ঝরনা ছিল, তাহার জল খাইলে ভূত ভবিষ্যৎ সকল বিষয় জানা যাইত। ওডিন সেই ঝরনার জল খাইতে গেলেন; বুড়া বলিল, 'তোমার একটি চোখ না দিলে জল খাইতে পাইবে না।' কাজেই একটি চোখ খুলিয়া দিয়া ওডিনকে সেই জলের দাম দিতে হইল। বুড়া সেই চোখটি নিয়া তাহার ঝরনার জলে ডুবাইয়া রাখিল। সেখানে সেটি দিনরাত ঝিকমিক করিত। ওডিন ঝরনার জল খাইয়া সকলের চেয়ে বেশি জ্ঞানী হইলেন। আর সেই ঘটনার চিহ্ন রাখিবার জন্য ঝরনার ধারের গাছের ডাল দিয়া একটা বল্লম তয়ের করাইয়া লইলেন। সে এমনি আশ্চর্য বল্লম যে, কিছুতেই তাহাকে ঠেকাইতে পারিত না।

ওডিনের এক পুত্রের নাম টিউ (Tiu)। ইঁহার নামে মঙ্গলবারের নাম টিউজ ডে (Tuesday) হইয়াছে। ইনি বীরত্ব এবং যুদ্ধের দেবতা। ওডিনের যেমন একটা আশ্চর্য বল্লম ছিল, ইঁহার তেমনি একটা তলোয়ার ছিল। লোকে এই তলোয়ারকে বড়ই ভক্তি করিত, আর যার পর নাই যত্নে একটা মন্দিরের ভিতর তাহা রাখিয়া দিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, এই তলোয়ার যাহার কাছে থাকিবে সে কখনো যুদ্ধে হারিবে না। কিন্তু হায়! একদিন কে সেই তলোয়ার চুরি করিয়া লইয়া গেল। শুনা যায়, তারপর সেই তলোয়ার লইয়া অনেকে পৃথিবী জয় করিয়াছে, আবার সেই তলোয়ারেই তাহারা মারা গিয়াছে। এমনি

করিয়া তাহার দ্বারা কতই কাণ্ড হইল। কিন্তু টিউর ঘরে আর তাহা ফিরিয়া আসিল না।

ওডিনের আর-এক পুত্র থরের (Thor) নামে ইংরাজি থার্সডে (Thursday) হইয়াছে। থরের মত জোর কোনো দেবতার ছিল না, দেখিতেও কেহ তাঁহার মত এমন বিশাল ছিলেন না। তাঁহার হাতুড়ি দিয়া যাহাকেই তিনি ঠাই করিয়া মারিতেন, সে পাহাড়ই হউক, আর পর্বতই হউক, তখনই গুঁড়া হইয়া যাইত। স্বর্গে বাইফ্রেস্ট্ নামে বিচিত্র সেতু আছে (যাহাকে তোমরা বল রামধনু)। সেই সেতুর উপর দিয়া দেবতারা যাওয়া আসা করিতেন। অর্থাৎ আর সকল দেবতারাই করিতেন— কিন্তু থর্ কখনো সেই সেতুর উপর যাইতেন না, গেলে তাহা ভাঙিয়া পড়িত।

ফ্রাইডে (Friday,শুক্রবার) যাঁহার নামে হইয়াছে, তাঁহার নাম ছিল ফ্রিয়া (Freya)। তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের দেবতা। কেহ বলে, ইনিই ওডিনের রাণী ফ্রিগ্গা। যুদ্ধে যত বীরের মৃত্যু হইত, তাহাদের অর্ধেক ফ্রিয়ার কাছে যাইত। ফ্রিয়া তাঁহার সঙ্গিনী ভ্যাল্কীরদিগকে লইয়া সেই বীরদিগকে নিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিতেন। তাঁহার সভায় গিয়া বীরদিগের সুখের আর সীমা পরিসীমা থাকিত না। সেখানে হাইদ্রুন্ নামে ছাগল ছিল, তাহার দুধ ছিল অমৃতের মত, সে দুধ দোহাইয়া শেষ করা যাইত না। আর সেহ্রি ম্নির নামে যে শুয়োরটি ছিল, তাহার মাংসও ছিল তেমনি মিষ্ট। এলধ্রিম্নির নামে পাচক তাহা ততোধিক মিষ্ট করিয়া রাঁধিত। বীরের ক্ষুধা—বুঝিতেই পার, তাহারা খাইত কেমন! কিন্তু সে মাংস কিছুতেই ফুরাইত না। খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গেলে আবার যেমন শুয়োর তেমনটি বাঁচিয়া উঠিয়া ঘোঁত্ ঘোঁত্ করিতে থাকিত।

ঠানদিদির বিক্রম

আমাদের এক ঠানদিদি ছিলেন। অবশ্য ঠাকুরদাও ছিলেন, নইলে ঠানদিদি এলেন কোত্থেকে? তবে ঠাকুরদাদাকে পাড়ার ছেলেরা ভালরকম জানত না। ঠাকুরদাদার নাম রামকানাই রায়; লোকে তাঁকে কানাই রায় বলে ডাকত, কেউ কেউ রায়মশায়ও বলত।

ঠাকুরদাদাকে যে ছেলেরা জানত না তার একটু নমুনা দিচ্ছি। ঠানদিদির বাড়িতে এক-ঝাড় তল্‌তা বাঁশ ছিল, ঐ বাঁশে ভাল মাছ ধরবার ছিপ হত। একবার কয়েকটি ছেলে ছিপ তৈরি করবে বলে চুপি চুপি একটি বাঁশ কেটে রাস্তায় টেনে এনেছে, অমনি দেখে—রায়মশায় সম্মুখে। তারা তখনি হাত জোড় করে বললে, 'আপনার পায়ে পড়ি, ঠানদিদিকে বলবেন না!' তিনি ত শুনে অবাক!— আরে বলিস কি? আমার বাঁশ নিয়ে পালাচ্ছিস, আর বলছিস "বলবেন না"!

ছেলেগুলি সকলে মিলে কেবলই বলতে লাগল, 'আপনার পায়ে পড়ি, ঠানদিদিকে বলবেন না।' তখন রায়মশায় বেগতিক দেখে বললেন, 'তোরা বাঁশ দিয়ে কি করবি?' 'আজ্ঞে, ছিপ করব।' 'আচ্ছা, নিয়ে যা।' তখন আবার 'দেখবেন, ঠানদিদিকে যেন বলবেন না' বলে ছেলেগুলো বাঁশ নিয়ে ছুট। এখনবোধ করি তোমরা বুঝতে পারছ, রায়মশাই যে ঠাকুরদাদা তা অনেক ছেলেই জানত না। ছেলেরা জানত—ঠানদিদির বাড়ি। ঠানদিদির

বাঁশঝাড়, ঠানদিদির কাঁঠালগাছ, বিশেষ ভাবে ঠানদিদির কুলগাছ আর পেয়ারাগাছ।

ঠানদিদির পুত্রসন্তান নেই, কেবল তিনটি মেয়ে। বড় মেয়ে দুটির বিবাহ হয়ে গিয়েছে।, ছোটটির বয়স ন-দশ বৎসর। ঠানদিদির বয়স চল্লিশের উপর। বাড়িতে অন্য লোকজন নেই, কিন্তু তা হলেও, ঠাকুরদাদা বিদেশে গেলে ঠানদিদির চৌকিদার বা ঘরে শোবার জন্য বুড়ো স্ত্রীলোকের দরকার হয় না। ঠানদিদি অনায়াসে একাই থাকেন।

একবার ঠাকুরদাদা বিদেশে গিয়েছেন। ঠানদিদি কেবল ছোট মেয়েটিকে নিয়ে বাড়িতে আছেন, সেই সময়ে একদিন দুপুর রাত্রে মেয়েটি বলল, 'মা! কে যেন আমার গায়ে হাত দিল!' ঠানদিদি বললেন, 'চুপ কর, কথা বলিস না।' ঠানদিদি পূর্বেই টের পেয়েছেন, ঘরে চোর ঢুকেছে। তারপর চোর যেই বাক্স-পেঁটরার সন্ধানে ঘরের অন্য দিকে গিয়েছে, অমনি ঠানদিদি আস্তে আস্তে উঠে, বাটনাবাটা শিলখানা এনে সিঁদের মুখে চাপা দিলেন।

তোমরা শহরের ছেলেরা বোধ করি বুঝতে পারলে না, সিঁদ কি। পাড়াগাঁয়ে অনেক মেটে ঘর। ঐ-সব মেটে ঘরে সিঁদকাঠি খুঁড়ে চোর ঘরের ভিতর ঢুকে চুরি করে। এইবার আরো মুশকিল হল, সিঁদকাঠি কি? সিঁদকাঠি যে কি তা আমিও কখনো চোখে দেখি নি। সম্ভবত ওটা খন্তা বা সাবলের মত লোহার কোন অস্ত্র হবে।

এই সিঁদকাঠি তৈরি সম্বন্ধে পাড়াগাঁয়ে একটা কথা আছে, 'চোরে কামারে কখনো দেখা হয় না।' সিঁদকাঠি যখন লোহার অস্ত্র, তখন অবশ্যই ওটা কামারে গড়ে। কিন্তু চোর কি কামারের বাড়ি গিয়ে বলে, 'কর্মকার ভায়া, আমাকে একটা সিঁদকাঠি তৈরি করে দাও!' নিশ্চয়ই না; তা হলে ত সেইখানেই সে চোর বলে ধরা দিল। কামার ভায়া চোরের নিতান্ত বন্ধু হলেও, সময় মত অন্য দু-দশজন বন্ধুর কাছে সে গল্পটা করবেই। দরকার হলে পুলিশের কাছেও বলতে পারে।

তবে চোর কি করে সিঁদকাঠি গড়ায়? আমরা ছেলেবেলায় শুনতাম চোরের সিঁদকাঠির দরকার হলে, চোর একখানি লোহা আর একটি আধুলি রাত্রে কামারশালের এমন জায়গায় রেখে যায় যে কামার সকালে কামারশাল খুলবার সময়েই সেটা তার নজরে পড়ে। তখন কামার অন্য কাজ বন্ধ রেখে, সকলের অসাক্ষাতে সিঁদকাঠিটি তৈরি করে। কামারশাল বন্ধ করবার সময়, ঠিক সেই জায়াগায় সেটি রেখে দেয়। রাত্রে চোর এসে সেটি নিয়ে যায়।

এখন আসল কথা শোনো। ঠানদিদি সিঁদের মুখে শিলটি চাপা দিয়ে তার পাশে চুপ করে বসে আছেন। তারপর চোর একটি বাক্স এনে সিঁদের কাছে যেমন নামিয়েছে, অমনি বেটাকে জাপটে ধরেছেন। তখন চোর নাকি সুরে বলল, 'মা ঠাকরুন, ছেড়ে দিন!' ঠানদিদি বললেন, 'বল্ বেটা তুই কে? নইলে এখনি পাড়ার লোক ডেকে তোকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করব।' চোর দেখল নাম না বললে আর নিষ্কৃতি নেই, কাজেই বলল, 'মা ঠাকরুণ, আমি শীতল!' তা শুনে ঠানদিদি বললেন, 'হতভাগা! মরতে আর জায়গা পাও নি? যাও! ঐ বাইরে কলসী আছে—পুকুরে গিয়ে জল আনো, তারপর কাদা করে সিঁদ বোজাও। ঐ গোয়ালে গোবর আছে, গোবর দিয়ে ভিতর-বার ভাল করে নিকিয়ে দিয়ে যাও। আমি সকালে উঠে এ সব হাঙ্গামা কত্তে পারব না।'

শীতল তখন কলসীটি নিয়ে আস্তে আস্তে পুকুর ঘাটে গেল। তখন ফাল্গুন মাস, পাড়া গাঁয়ে বেশ শীত। সেই শীতে পুকুর থেকে জল এনে, কাদা করে, সিঁদ বুজিয়ে, ভাল করে

নিকিয়ে তবে শীতল ছুটি পায়।

তোমরা চালাক ছেলেরা ভাবছ, চোরটা কি বোকা, কলসী নিয়ে অমনি পালাল না কেন? শীতল কলসী নিয়ে পালালে তার কি দশা হত, তা আর একদিন তোমাদের বলব।

ঘ্যাঁঘাসুর

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল একটি মেয়ে। মেয়েটি হইয়া অবধি খালি অসুখেই ভুগিতেছে। একটি দিনের জন্যেও ভাল থাকে না। কত বদ্যি, কত ডাক্তার, কত চিকিৎসা, কত ওষুধ—মেয়ে ভাল হইবে দূরে থাকুক, দিন দিনই রোগা হইতেছে। এত ধন জন থাকিয়াও রাজার মনে সুখ নাই। কিসে মেয়েটি ভাল হইবে, তাঁহার কেবল সেই চিন্তা।

এমনি করিয়া দিন যায়;এর মধ্যে একদিন এক সাধু রাজার মেয়ের অসুখের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তোমার মেয়ে একটি লেবু খাইয়া ভাল হইবে।'

একটি লেবু! সে কোন্ লেবুটি, কোথায় কাহার বাগানে তাহা পাওয়া যাইবে, সাধু তাহার কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। রাজা আর উপায় না দেখিয়া দেশের লোককে এই কথা জানাইয়া দিলেন, 'যাহার লেবু খাইয়া আমার মেয়ে ভাল হইবে, সে আমার মেয়েকে বিবাহ করিবে, আর আমার রাজ্য পাইবে।'

এখন মুশকিলের কথা এই যে, সে রাজ্যে লেবু মিলে না। কেবলমাত্র এক চাষিব বাড়িতে একটি লেবুর গাছ আছে; চাষি অনেক কষ্ট করিয়া শ্রীহট্ট হইতে সেই গাছটি আনিয়াছিল। সবে সেই বৎসর তাহাতে লেবু হইয়াছে। লেবু ত নয়, যেন রসগোল্লা! এক-একটা বড় কত! যেন একটা-বেল! তেমন লেবু তোমরা দেখও নাই, খাও-ও নাই। আমিও দেখিতে পাই নাই; দেখিতে পাইলে খাইতে চেষ্টা করা যাইত।

চাষির তিন ছেলে; যদু , গোষ্ঠ আর মানিক। রাজার হুকুম শুনিয়া চাষি যদুকে এক ঝুড়ি লেবু দিয়া বলিল, 'শিগ্‌গির এগুলি রাজার বাড়ি নিয়ে যা। এর একটা খেয়ে যদি মেয়ের ব্যামো সারে, তবে রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবি।'

যদু লেবুর ঝুড়ি মাথায় করিয়া রাজার বাড়ি চলিয়াছে, এমন সময় পথে একহাত লম্বা একটি মানুষের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। সেই লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ঝুড়িতে কি ও? যদু বলিল, 'ব্যাঙ।' সেই লোকটি বলিল, 'আচ্ছা তাই হোক।'

রাজার দরোয়ানেরা লেবুর কথা শুনিয়া যার পর নাই আদরের সহিত যদুকে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজামহাশয় ব্যস্ত হইয়া নিজেই ঝুড়ির ঢাকা খুলিলেন; আর অমনি চারিটি ব্যাঙ তাঁহার পাগড়ির উপর লাফাইয়া উঠিল। সেই ঝুড়িতে যতগুলি লেবু ছিল, সব কয়টাই ব্যাঙ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং লেবু খাওয়াইয়া রাজার মেয়েকে ভাল করা, আর রাজার জামাই হওয়া, যদুর ভাগ্যে ঘটিল না। সে বেচারা অনেকগুলি লাথি খাইয়া প্রাণে-প্রাণে বাড়ি ফিরিল, তাহাই ঢের বলিতে হইবে।

এরপর চাষি আর-এক ঝুড়ি লেবু দিয়া গোষ্ঠকে পাঠাইল। এবারেও সেই একহাত লম্বা মানুষটি কোথা হইতে আসিয়া গোষ্টর ঝুড়িতে কি আছে জিজ্ঞাসা করিল। গোষ্ঠ বলিল,

'ঝিঙের বীচি।' এক হাত লম্বা মানুষটি বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

রাজবাড়ির দরোয়ানেরা প্রথমে গোষ্ঠকে ঢুকিতে দেয় নাই। তাহারা বলিল, 'তোরই মতন একটা সেদিন এসে রাজামশাইয়ের পাগড়ি নোংরা করে দিয়ে গেছে। তুই আবার একটা কি করে বসবি কে জানে!' অনেক পীড়াপীড়ির পর গোষ্ঠ ঢুকিয়া রাজার মেয়েকে কিরূপ লেবু খাওয়াইল, বুঝিতে পার। সাজাটাও তার তেমনিই হইল।

মানিককে সকলেই একটু বোকা মনে করে। কাজেই তাহাকে আর লেবুর ঝুড়ি দিয়া রাজার বাড়ি পাঠাইতে কেহ বলিল না। কিন্তু সে যাইবার জন্য একেবারে সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। যতক্ষণ না চাষি তাহাকে যাইতে বলিল, ততক্ষণ তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না। শেষটা তাহাকেও এক ঝুড়িতে লেবু দিয়া পাঠাইতে হইল।

পথে সেই একহাত লম্বা মানুষের সহিত মানিকেরও দেখা হইল। একহাত লম্বা মানুষ জিজ্ঞাসা করিল, 'ঝুড়িতে কি ও?' মানিক বলিল, 'ঝুড়িতে লেবু আছে, তাই খেয়ে রাজার মেয়ের অসুখ সারবে।' এক হাত লম্বা মানুষ বলিল, 'আচ্ছা তাই হোক।'

রাজবাড়িতে ঢুকিতে মানিকের যার পর নাই মুশকিল হইয়াছিল। অনেক মিনতি আর হাত জোড়ের পর দারোয়ানেরা তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল আর বলিল, 'দেখিস, যেন ব্যাঙ কি ঝিঙের বীচি-টিচি হয় না। তাহলে কিন্তু তোর প্রাণটা থাকবে না।'

যাহা হউক মানিকের ঝুড়িতে লেবুই পাওয়া গেল। রাজামহাশয় ত খুবই খুশি! তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর লেবু পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, 'কেমন হয়, আমাকে খবর দিস্!' খবরের আশায় রাজামহাশয় বসিয়া আছেন, এমন সময় মেয়ে নিজেই খবর লইয়া উপস্থিত! সেই লেবু মুখে দিতে না দিতেই তাহার অসুখ একেবাবে সারিয়া গিয়াছে!

ইহাতে রাজামহাশয় যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাহার পরেই ভাবিতে লাগিলেন—'তাই ত, করিয়াছি কি। এখন যে চাষির ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে হয়!' এই ভাবিয়া রাজামহাশয় স্থির করিলেন যে চাষির ছেলেকে যেমন করিয়াই হউক ফাঁকি দিতে হইবে।

মানিকলাল ভাবিতেছে, 'এরপরই বুঝি মেয়ে বিয়ে দিবে।' এমন সময় রাজামহাশয় তাহাকে বলিলেন, 'বাপু, তুমি কাজটা বেশ ভালই করিয়াছ, কিন্তু রাজার মেয়ে বিবাহ করা সহজ কথা নয়। আগে, আর-একখানা কাজ করিয়া দাও, তারপর দেখা যাইবে কি হয়। জলে যেমন চলে, ডাঙায়ও তেমনি চলে, এইরূপ একখানা নৌকা আমাকে গড়িয়া না দিতে পারিলে, তোমার কোন আশাই নাই।'

মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায় হইল। তারপর বাড়ি আসিয়া সকল কথা বলিল।

বাড়ির সকলেই মানিককে নেহাত বোকা ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং তাহারা মনে করিল যে, মানকে যখন রাজার মেয়েকে ভাল করিয়া আসিয়াছে, তখন নৌকাখানা ইচ্ছা করিলেই যে-সে তয়ের করিতে পারে।

যদু একখানা কুড়াল লইয়া তখনই নৌকা গড়িতে চলিল। বনের ভিতর হইতে গাছ কাটিয়া সেখানেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ইচ্ছা, সেইদিনই নৌকা প্রস্তুত করিয়া ফেলে; পরিশ্রমেরও কসুর নাই। এমন সময় কোথা হইতে সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া উপস্থিত। 'কিহে যদুনাথ, কি হচ্ছে'? —'গামলা'। 'আচ্ছা, তাই হোক।'

'তাই হোক' বলিয়া একহাত লম্বা মানুষ চলিয়া গেল;যদুও নৌকা গড়িতে লাগিল। কিন্তু সে যত পরিশ্রম করে তাহার সমস্তই বৃথা হয়। সেই সর্বনেশে কাঠ খালি গামলার মত গোল হইয়া ওঠে, নৌকার মতন কিছুতেই হইতে চায় না। শেষটা যদুর রাগ হইয়া গেল। কিন্তু রাগের ভরে এক কাঠ ফেলিয়া দিয়া, ক্রমাগত আর দুই তিনটা কাঠ লইয়াও গামলা ছাড়া আর কিছু তয়ের করিতে পারিল না। যাহা হউক, গামলাগুলি হইল ভারি সরেস। সুতরাং সন্ধ্যার সময় যদুনাথ গোটা তিন চার গামলা ঘাড়ে করিয়া বাড়ি ফিরিল; এমন ভাল গামলাগুলি বনে ফেলিয়া আসিতে কিছুতেই তাহার ইচ্ছা হইল না।

তারপর গোষ্ঠ নৌকা গড়িতে চলিল, আর সেই একহাত লম্বা মানুষের অনুগ্রহে সন্ধ্যাবেলা পাঁচখানি অতিশয় উঁচুদরের লাঙল কাঁধে ঘরে ফিরিল।

অবশ্য, এরপর মানিক নৌকা গড়িতে গেল, আর তাহাকেও সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হচ্ছে?' মানিক সাদাসিধা উত্তর দিল—'জলে যেমন চলে ডাঙায়ও তেমনি চলে, এমন একখানা নৌকা গড়ে দিতে পারলে, রাজামশাই বলেছেন, মেয়ে বিয়ে দেবেন।' এই কথা শুনিয়া একহাত লম্বা মানুষ বলিল, 'আচ্ছা , তাই হোক।'

মানিক সবে নৌকার কাঠ কাটিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিয়াছিল। একহাত লম্বা মানুষের কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই কাঠ ছুটিয়া চলিয়াছে। সে আর এখন কাঠ নাই; অতি চমৎকার একখানা নৌকা। তাহাতে দাঁড়ি নাই, মাঝি নাই, দাঁড় নাই, পাল নাই। যেখানে যাইবার দরকার, তাহা নিজেই বুঝিয়া লয়, সেখানে সে নিজেই থামে। রাজা-রাজড়ার উপযুক্ত মখমলের গদি-তাকিয়ায় তাহার ভিতরটা সাজানো। বাহিরটা দেখিতে কি সুন্দর, তা কি বলিব। যে জিনিসে তাহা সাজাইয়াছে, তাহা সেই একহাত লম্বা মানুষের দেশে হয়; আমি তাহার নাম জানি না।

রাজামহাশয় সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় মানিকলালের নৌকা সেইখানে গিয়া উপস্থিত। সকলে নৌকার রূপগুণ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল, আর কত প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজামহাশয়ও খুব আশ্চর্য না হইয়াছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাহা চাপিয়া গিয়া মুখে মানিককে বলিলেন, 'এতেও হচ্ছে না; আর-একখানা কাজ করিয়া দিতে হবে। একগাছ ঘ্যাঁঘাসুরের লেজের পালক হইলে আমার মুকুটের বেশ শোভা হয়। এই জিনিসটি আনিয়া দিলে নিশ্চয় আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবে।' মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ঘ্যাঁঘাসুরের পালক আনিতে চলিল।

খানিকটা পাখি, খানিকটা জানোয়ার, বিদ্‌ঘুটে চেহারা, খিটখিটে মেজাজ, ভারি জ্ঞানী, বেজায় ধনী, অসুর ঘ্যাঁঘা মহাশয়, এক মাসের পথ দূরে, অজানা নদীর ধারে, অচেনা শহরে, সোনার পুরীতে বাস করেন। মানুষটিকে দেখিতে পাইলেই, রসগোল্লাটির মত টপ্ করিয়া তাহাকে গিলেন। সেই ঘ্যাঁঘা মহাশয়ের পালক আনিতে মানিক চলিয়াছে। যাহাকে দেখে, তাহাকেই ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকের পথ জিজ্ঞাসা করে; আর ডাইনে বাঁয়ে না চাহিয়া ক্রমাগত সেই পথে চলে। রাত্রি হইলে কাহারো বাড়িতে আশ্রয় লয়; আবার সকালে উঠিয়া চলিতে থাকে।

ঘ্যাঁঘাসুরের মুলুকে যাইতেছে শুনিয়া, সকলেই তাহাকে আদর করিয়া জায়গা দেয়। একদিন রাত্রিতে এইরূপে সে একজন খুব ধনী লোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে। সেই

ধনী অনেক কথাবার্তার পর তাহাকে বলিল, 'বাপু, তুমি ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে চলেছ শুনছি, সে অনেক বিষয়ের খবর রাখে। আমার লোহার সিন্দুকের চাবিটা হারিয়ে ফেলেছি; ঘ্যাঁঘা তার কোন সন্ধান বলতে পারে কিনা, জিজ্ঞাসা করো ত।' মানিক বলিল, 'আচ্ছা মশাই, আমি জেনে আসব।' আর-একদিন সে আর -এক বড়লোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে; সেই বড়লোকের মেয়ের ভারি অসুখ। তাহার বেয়ারামটা যে কি কোনো ডাক্তার কবিরাজ তাহা ঠিক করিতে পারে না। মেয়ে দিন দিন খালি রোগা হইয়া যাইতেছে। সেই বড়লোক মানিককে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া তারপর বলিলেন, 'আমার মেয়ের অসুখ কিসে সারবে এই কথাটা যদি ঘ্যাঁঘার কাছে থেকে জেনে আসতে পার, তবে বড় উপকার হয়।' মানিক বলিল, 'অবিশ্যি মশাই, আমি নিশ্চয় জেনে আসব।'

এইরূপে একমাস চলিয়া মানিক অজানা নদীর ধারে আসিয়া ওপারে ঘ্যাঁঘাসুরের সোনার বাড়ি দেখিতে পাইল। অজানা নদীর নৌকা নাই, খেয়া নাই; এক বুড়ো সকলকেই কাঁধে করিয়া পার করে। মানিকও তাহারি কাঁধে চড়িয়া নদী পার হইল। বুড়ো তাহাকে বলিল, 'বাপু, আমার এই দুঃখ কবে দূর হবে, ঘ্যাঁঘার কাছে জিজ্ঞেস করো ত! আমার খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, খালি কাঁধে করে দিনরাত্তির মানুষই পার করছি। ছেলেবেলা থেকে এই করছি, আর এখন বুড়ো হয়ে গেছি।' মানিক বলিল, 'তোমার কিছু ভয় নেই, আমি নিশ্চয়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করব।'

নদী পার হইয়া মানিক ঘ্যাঁঘার বাড়িতে গেল। ঘ্যাঁঘা তখন বাড়ি ছিল না; ঘেঁঘী ছিল। ঘেঁঘী তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'পালা বাছা, শিগ্‌গির পালা। ঘ্যাঁঘা তোকে দেখতে পেলেই গিল্‌বে।' মানিক বলিল, 'আমি যে ঘ্যাঁঘার লেজের একগাছি পালক চাই। সেটি না নিয়ে কেমন ক'রে যাব? আর সেই যাদের চাবি হারিয়ে গেছে সেই চাবিটি কোথায় আছে? আর যাদের মেয়ের অসুখ, তারা ওষুধ জেনে যেতে বলেছে। আর যে বুড়ো পার ক'রে দিলে, সে বাড়ি যাবে কেমন ক'রে?'

ঘেঁঘী বলিল, 'প্রাণটি নিয়ে কোথায় পালাবে, না আবার তার পালক চাই, আর তাকে একশো খবর বলে দাও। তুই কে রে বাপু?' মানিক বলিল, 'আমি মানিক। পালক না নিয়ে গেলে রাজা মেয়ে বিয়ে দেবে না; একগাছি পালক আমার চাই।'

হাজার হোক স্ত্রীলোক। মানিককে দেখিয়া ঘেঁঘীর দয়া হইল। সে বলিল, 'আচ্ছা বাপু, তাহলে তুই এই খাটের তলায় লুকিয়ে থাক্। তোর ভাগ্যে থাকলে হবে এখন।' মানিক ঘ্যাঁঘার খাটের তলায় লুকাইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ঘ্যাঁঘাসুর বাড়ি আসিল। ঘেঁঘী তাড়াতাড়ি পা ধুইবার জলটল দিয়া সোনার থালায় খাবার হাজির করিল। ঘ্যাঁঘার মেজাজটা বড়ই খিটখিটে সবটাতেই সে দোষ ধরে। বাড়ি আসিয়াই সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, 'মানুষের গন্ধ কোত্থেকে এল? হুঁ হুঁ —মানুষের গন্ধ। মানুষ দে, খাই।'

ঘ্যাঁঘার কথা শুনিয়া খাটের তলায় মানিকলালের মুখ শুকাইয়া গেল, ঘেঁঘীরও বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। সে অনেক কৌশল করিয়া ঘ্যাঁঘাকে বুঝাইল যে, একটা মানুষ আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা ঘ্যাঁঘার নাম শুনিয়াই পলাইয়াছে। ইহাতে ঘ্যাঁঘা কিছু শান্ত হইয়া খাবার খাইতে বসিল।

খাওয়া শেষ হইলে, ঘ্যাঁঘা খাটে শুইয়া নিদ্রা গেল। ঘুমের ভিতর তাহার লম্বা লেজটি লেপের বাহিরে আসিয়া খাটের পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই লেজের আগায় অতি চমৎকার পালকের গোছা। মানিক খাটের তলায় অপেক্ষা করিয়া আছে; লেজ দেখিয়াই সে খ্যাঁচ করিয়া একটি পালক ছিঁড়িয়া লইল। অমনি ঘ্যাঁঘা ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, 'ঘেঁঘী, আমার লেজ ধরে যেন কে টানলে। হুঁ হুঁ মানুষের গন্ধ।'

ঘেঁঘী বলিল, 'তোমার ভুল হয়েছে। অত বড় পালকের গোছা কোথায় আটকে লেজে টান পড়েছে। আর মানুষ ত একটা এসেছিল বলেছি, এ তারই গন্ধ। সেই মানুষটা কত কথা বললে। সেই কাদের বাড়ি লোহার সিন্দুকের চাবি হারিয়ে গেছে—' ঘেঁঘীর কথা শেষ হইতে না দিয়াই ঘ্যাঁঘা বলিল, 'হাঁ হাঁ! সেই লোহার সিন্দুকের চাবি! আমি জানি! সেটাকে তাদের খোকা গদির ফুটোর ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।' ঘেঁঘী বলিল, 'আবার কাদের মেয়ের কি অসুখ।' অমনি ঘ্যাঁঘা বলিল, 'কোনা ব্যাঙে ওর চুল নিয়ে গেছে; ঘরের কোণেই তার গর্ত। ঐখান থেকে খুঁড়ে সেই চুল আনলেই মেয়ের ব্যামো সারবে।' আবার ঘেঁঘী বলিল, 'যে লোকটা মানুষ ঘাড়ে করে নদী পার করে—?' ঘ্যাঁঘা বলিল, সেটা একটা মস্ত গাধা। একজনকে কেন নদীর মাঝখানে নামিয়ে দেয় না! তাহলেই ত সে বাড়ি যেতে পারে। যাকে নামিয়ে দেবে সে-ই মানুষ পার করতে থাকবে!'

মানিকের সকল কাজই আদায় হইল। এখন রাত পোহাইলে ঘ্যাঁঘা বাহিরে চলিয়া যায়, আর সেও বাহিরে আসিতে পারে। রাত ভোর হইলে ঘ্যাঁঘা জলখাবার খাইযা বেড়াইতে বাহির হইল; ঘেঁঘীও মানিককে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া বিদায় করিল।

এরপর প্রথমেই সেই বুড়োর সঙ্গে দেখা। বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা কিছু হল?' মানিক বলিল, 'সে হবে এখন, আগে পার কর; আমার বড্ড তাড়াতাড়ি।' বুড়ো মানিককে কাঁধে করিয়া পারে লইয়া গেলে পর ডাঙায় উঠিয়া মানিক বলিল, 'এবপর একজনকে মাঝখানে নামিয়ে দিয়ো; তা হলেই তোমার ছুটি।' এই কথা শুনিয়া বুড়ো মানিককে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বলিল, 'ভাই, তুমি আমার এমন উপকারটা করলে; আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাকে আর দুবাব কাঁধে করে পার করি।' মানিক বলিল, 'তুমি দয়া করে যা করেছ তাই ঢের; আর আমার বুড়ো মানুষের কাঁধে চড়ে কাজ নেই। আমি এখন দেশে চললাম।'

চারদিন চলিয়া মানিক, যাহাদের মেয়ের অসুখ ছিল, তাহাদের বাড়িতে আবার অতিথি হইল। বাড়ির কর্তা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘ্যাঁঘা কিছু বলেছে?' মানিক বলিল, 'হ্যাঁ।' এই বলিয়া সে ঘরের কোণ হইতে কোনা ব্যাঙের গর্ত খুঁড়িয়া যেই চুল বাহির করিল, আর অমনি যে মেয়ে দুই বৎসর যাবৎ মড়ার মতন পড়িয়া ছিল, সে উঠিয়া হাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাতে বাড়ির সকলে যে কত খুশি হইল, তাহা কি বলিব! মানিককে তাহারা এত টাকা দিল যে, দশটা উটে তাহা বহিতে পারে না।

যাহাদের চাবি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহারাও চাবি পাইয়া মানিককে ঢের টাকাকড়ি দিল। এই-সমস্ত টাকাকড়ি লইয়া সে দেশে ফিরিয়া রাজামহাশয়কে ঘ্যাঁঘাসুরের পালক বুঝাইয়া দিল। দেশের সকল লোক ইহাতে মানিকের যার পর নাই প্রশংসা করিল। তাহারা সকলেই বলিল যে, মানিককে এত ক্লেশ দেওয়া রাজার ভারি অন্যায় হইয়াছে, তাহার সঙ্গে মেয়ের

বিবাহ দিতে আর দেরি করা উচিত নয়। রাজামহাশয় আর কি করেন, শেষটা অনেক কষ্টে রাজি হইলেন।

তারপর খুব জাঁকজমকের সহিত রাজকন্যা ও মানিকের বিবাহ হইল। মানিক এত টাকাকড়ি লইয়া আসিয়াছে যে, তাহাতেই তাহার পরম সুখে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু রাজামহাশয়ের ইহাতে ভারি হিংসা হইল। তিনি মনে করিলেন, 'ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে গেলে যদি এত টাকা নিয়ে আসা যায়, তবে আমিও সেইখানে যাব।'

এই ভাবিয়া রাজামহাশয় ঘ্যাঁঘার মুল্লুকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছাইতে পারেন নাই। কারণ, অজানা নদী পার হইবার সময়, সেই বুড়ো তাহাকে মাঝখানে নামাইয়া দিল। রাজামহাশয় প্রথমে আশ্চর্য হইলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন, তারপর বুড়োকে গাল দিতে লাগিলেন, তারপর হাত জোড় করিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুড়ো তাঁহার কথায় কান দিবার অবসরই পায় নাই; ততক্ষণ সে ডাঙ্গায় উঠিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি পানে ছুটিয়াছে, তাড়াতাড়িতে রাজামহাশয়কে ছুটি পাইবার কৌশলটি বলিয়া দিবার কথা তাহার মনে হয় নাই। সুতরাং রাজামহাশয় আজও সেই স্থানেই মানুষ পার করিতেছেন।

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেহ যদি কখনো ঘ্যাঁঘাসুরের মুলুকে যান, তাহা হইলে দয়া করিয়া বেচারাকে সেই কথাটা বলিয়া দিবেন। কিন্তু পুনরায় নদীর এপারে ফিরিয়া না আসিয়া এ কথা বলিবেন না, কারণ তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতে পারে।

চালাক চাকর

এক বাবুর একটি বড় বুদ্ধিমান চাকর ছিল, তার নাম ভজহরি। একদিন ভজহরি পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখল তার বাবু ভারি ব্যস্ত হয়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছেন। ভজহরি জিজ্ঞাসা করল, 'বাবু, কোথায় যাচ্ছেন?' বাবু বললেন, 'শিগ্‌গির এস ভজহরি, সর্বনাশ হয়েছে—আমাদের ঘরে আগুন লেগেছে!' তাতে ভজহরি বলল, 'আপনার কোন ভয় নাই বাবু, ও মিছে কথা। আগুন কি করে লাগবে? আমার কাছে যে ঘরের চাবি রয়েছে।'

ভজহরি গেল কলুর দোকানে, এক সের তেল কিনতে। কলু তাকে এক সের তেল মেপে দিল, তাতেই তার বাটিটি ভরে গেল। তখন ভজহরি বলল, 'ফাউ দেবে না?' কলু বলল, 'হ্যাঁ দেব বইকি! কিসে করে নেবে?' ভজহরি ভাবল, 'তাই ত, কিসে করে নিই? কিন্তু ফাউ না নিয়ে গেলে যে বাবু আমাকে বোকা ভাববেন!' তখন তার মনে হল যে বাটির তলায় একটু গর্ত আছে। অমনি সে বাটিটি উল্টিয়ে নিয়ে সেই গর্তটা দেখিয়ে কলুকে বলল, 'এতে ফাউ দাও।' কলু হাসতে হাসতে সেই গর্তে ফাউ ঢেলে দিল, ভজহরি মহা খুশি হয়ে তাই নিয়ে বাড়ি এল।

ভজহরি তার বাবুর সঙ্গে নৌকায় চড়ে নদী পার হচ্ছে। নৌকায় ঢের লোক, ভজহরি ভাবল নৌকা বড্ড বোঝাই হয়েছে, যদি ডুবে যায়! এই ভেবে, সে তাদের পুঁটলিটা মাথায় করে বসে রইল। বাবু বললেন, 'ভজহরি, পুঁটলিটা নামিয়ে রাখ না, মাথায় করে কেন কষ্ট পাচ্ছ?' ভজহরি বলল, 'আজ্ঞে না, নৌকা বড্ড বোঝাই হয়েছে। পুঁটলিটা তাতে রাখলে

আরো বোঝাই হয়ে যাবে।'

বাড়িতে চোর এসেছে, ভজহরি তা টের পেয়েছে। সে ভাবল, বেটাকে ধরতে হবে। তখন সে মাথায় শিং বেঁধে লেজ পরে উঠানের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মতলবখানা এই যে, চোর নিশ্চয় তাকে দেখে ছাগল মনে করে তাকে চুরি করতে আসবে, তখন সে তাকে জড়িয়ে ধরবে। চোর এল, ঘরে গিয়ে ঢুকল, ভজহরি উঠানের কোণ থেকে বলল, 'ম্যা-আ-আ-আ!' চোর ঘরের সব জিনিসপত্র বাইরে এনে একটি পুঁটুলি বাঁধল, ভজহরি তাকে বলল, 'ম্যা-আ-আ-আ' তা চোর তাড়াতাড়ি সেই পুঁটুলি নিয়ে আঁস্তাকুড়ের উপর দিয়ে ছুট দিল। তখন ভজহরি হেসে গড়াগড়ি দিয়ে বলল, 'ব্যাটা কি বোকা, আঁস্তাকুড় মাড়িয়ে গেল, এখন বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হবে!'

রামধন লোকটি বেশ সাদাসিধে, কিন্তু একটু রাগী। সে গিয়েছে চোরেদের বাড়ি চাকরি করতে। রাত্রে চোরেরা এক জায়গায় চুরি করতে গেল, রামধনকেও সঙ্গে নিল। সেখানে রামধনকে একটা কচুবনে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই এইখানে চুপ করে বসে থাক্, আমরা চুরি করে জিনিস নিয়ে এলে সেগুলো বয়ে নিয়ে যাবি।' রামধন বলল, 'আচ্ছা।'

চোরেরা সিঁদ কাটছে, রামধন কচুবনে বসে আছে। সেখানে বেজায় রকমের মশা, রামধনকে কামড়িয়ে পাগল করে তুলল। বেচারা অনেকক্ষণ সয়ে চুপ করে ছিল, তারপর চটাস্ চটাস্ করে দু-একটা মারতে লাগল। শেষে রেগে গিয়ে লাঠি দিয়ে মেরে কচুবন তোলপাড় করে তুলল। সেই শব্দে বাড়ির লোক সব জেগে গিয়ে বলল, 'কে রে তুই এত গোলমাল করছিস?' রামধন বলল, 'আমি রামধন গো।' বাড়ির লোকেরা বলল, ওখানে কি করছিস?' রামধন বলল, 'আপনাদের ঘরে যে সিঁদ হচ্ছেন!'

তখন ত আর ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকির সীমাই রইল না। চোরেরা আর চুরি করবে কি, তাদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসাই ভার হল। ঘরে এসে তারা তারপর অবশ্যি রামধনের উপর খুবই চোটপাট লাগাল। সে বলল, 'কি করি ভাই, আমার রাগ হয়ে গেল; যে ভয়ানক মশা!' চোরেরা বলল, 'আচ্ছা, খবরদার! আর কখনো এমন করিস নে।'

পরদিন চোরেরা আবার রামধনকে নিয়ে চুরি করতে গিয়েছে। এবারে রামধন ঠিক করে এসেছে যে মশায় তাকে খেয়ে ফেললেও আর সে টুঁ শব্দটি করবে না। আর চোরেরাও বেশ বুঝে নিয়েছে যে, রামধনকে বাইরে রেখে ঘরে ঢুকলে বড়ই বিপদ হতে পারে। তাই তারা ভেবেছে ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

একটা বাড়ির কাছে এসে চোরেরা বাইরে থেকেই কেমন করে তার একটা দরজার ছিটকিনি খুলে ফেলল, তারপর রামধনকে বলল, 'এখন তুই চুপি-চুপি ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র বার করে আন্। দেখিস কোন শব্দ করিস না যেন।'

রামধন দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে গেল। দরজার কব্জায় ছিল মরচে ধরা, তাই দরজা ঠেলতেই সেটা বলল, 'ক্যাঁচ্!' রামধন থতমত খেয়ে অমনি থেমে গেল। তারপর আবার যেই ঠেলতে যাবে, অমনি দরজা আবার বলল, 'ক্যাঁচ্!' রামধন তাতে দাঁত খিচিয়ে 'আঃ!' বলে আবার থেমে গেল। তারপর রামধন কিছুতেই আর রাগ সামলাতে পারল না। তখন সে পাগলের মত হয়ে প্রাণপণে সেই দরজা নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ক্যাঁচ্!—ক্যাঁচ্!!—ক্যাঁচ্!!!—ক্যাঁচ্!!!!' তারপর কি হল বুঝতেই পার।

এ-সব ত শুধু গল্প, এবার একটি সত্যিকারের চাকরের কথা বলি। তার নাম, ধরে নাও যেন কেনারাম। কেনারাম সেজেগুজে একটা বোটের ছাতে উঠে বসে আছে—তার বাবুর সঙ্গে এক জায়াগায় তামাশা দেখতে যাবে। খানিক বাদেই বোটের ভিতর থেকে জুতোর শব্দ এল; কেনারাম বুঝল বাবু বেরুচ্ছেন, এইবেলা যেতে হবে। সে অমনি তাড়াতাড়ি বোটের ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ল—আর পড়ল ঠিক তার বাবুর ঘাড়ে।

প্রথমে যখন কেনারাম আসে তখন একজন পুরনো চাকর বলেছিল, 'বাবু কাছারি থেকে এলে রোজ তাঁকে পান খেতে দিও।' সেদিন বাবু কাছারি থেকে এসেই পায়খানায় গেলেন, কেনারামও তাড়াতাড়ি সেইখানেই গিয়ে তাঁকে বলল, 'বাবু পান এনেছি।'

বেচারাম কেনারাম
প্রথম দৃশ্য

(জামা রিপু করিতে কবিতে কেনারাম চাকবের প্রবেশ)

কেনা। ঐ যা! আবার খানিকটা ছিঁড়ে গেল! ছুঁতেই ছিঁড়ে যায়, তা বিপু করব কি? ভাল মনিব জুটেছে যাই হোক, এই জামাটা দিয়েই ক'বছর কাটালে। তিন বছর ত আমিই এইরকম দেখছি, আরো বা ক'বছর দেখতে হয়। তবু যদি চারটে পেট ভরে খেতে দিত! তাও কেমন? সকালে মনিব চাবটি ভাত খান, আমি ফ্যানটুকু খাই, রাত্তিরে তিনি হাঁড়ি চাটেন আমি শুঁকি তার উপর শ্রবণশক্তিটি কি প্রখর! বাড়িওয়ালা সেদিন টাকার জন্যে কি-ই না বললে! বাড়িওয়ালা বলে, 'টাকা দেও, ঢের টাকা বাকি।' মনিব বলেন 'তা ভাল ভাল, তোমার বাড়ি আজ নেমন্তন্ন?' বাড়িওয়ালা বলে, 'এমন করে ভাড়া ফেলে রাখলে চলে কই?' মনিব বলেন, 'তা আচ্ছা, চাকরটিও সঙ্গে যাবে।' বাড়িওয়ালা বেচারী, রেগেমেগে চলে গেল। বড়লোক হতে হলে বোধহয় আমার মনিবের মতই কত্তে হয়, কিন্তু এঁর কাছে থেকে বড়লোক হওয়ার কায়দাটাই শেখা হবে। বড়লোক হওয়ার ভরসা বড় নেই। রাখবার সময় কত আশাই দিয়েছিলেন, আর আজ এই তিন বছরে একটি পয়সা মাইনে দিলেন না! দেখি আজ যদি মাইনে না দেয়, তবে আর এর কাজ করা হচ্ছে না।

[প্রস্থান

(বেচারাম মনিবের প্রবেশ)

মনিব। চাকরটা জামাটা নিয়ে কত কথা বলছিল! সব শুনেছি। বেটা ভেবেছে, আমি সত্যিই কালা। আরে আমার মত যদি কান থাকত তা হলে আর চাকরি কত্তে হত না। আমি যা করে খাই, তাই করে খেতে পাও। ঘরের ভিতবে ক'জন জেগে আছে, ক'জন ঘুমুচ্ছে, দাওয়ায় কান পেতে সব বুঝে নি। কোথায় সিন্দুকের ভেতর আরশুলা কড়কড় কচ্চে, বাইরে থেকে বুঝে নি। বাপু হে! কানে শুনি, কানে শুনি। কানে শোনাটা ত বেশ ভালই, কিন্তু না শোনার যে সুবিধা আছে, তা ত বুঝবে না? এই সেদিন বাড়িওয়ালা বেটা ফাঁকি দিয়ে টাকা আদায় কত্ত! কানে না শোনার কত সুবিধা দেখো, পাওনাদারের টাকা দিতে হয় না, বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না, চাকরের মাহিনা দিতে হয় না—

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা (উচ্চৈঃস্বরে)। মশাই, হয় এই তিন বছরের মাইনে দিন, নাহয় আপনার এই-সব রইল, আমি চললেম।

মনিব। ডাকওয়ালা? চিঠি? দেখি?

কেনারাম (স্বগত)। এই মুশকিল কল্লে! তা এবারে বাপু এক ফন্দি এঁটেছি— সব লিখে এনেছি। (প্রকাশ্যে) চিঠিই বটে, এই নিন্।

মনিব (পাঠ)। 'মনিব মহাশয়, কানে শুনেন না, কিন্তু পড়িতে অবশ্যই পারেন। তিনটি বৎসরের বেতন চুকাইয়া বিদায় দিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীকেনারাম চাকর।'—তাই ত, তোমার বেতনটা দিতে হল। তা রাখবার সময় ত কোন বন্দোবস্ত হয় নি, কাজকর্মও তেমন ভাল করে কর নি। তিন বছরে তিন পয়সার বেশি তোমার প্রাপ্য হয় না। তা এই নেও। (তিন পয়সা প্রদান ও ধাক্কা দিয়া বহিষ্করণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা। এই বড়লোক হলাম আর কি! তিন-তিন বছরের মাইনে; ঢের টাকা—ঢের টাকা। এক দুই তিন, চার পাঁচ ছয়, সাত আট নয়, দশ এগার বার। (পয়সা তিনটি পকেটে স্থাপন)

(ছদ্মবেশী স্বর্গীয় দূতের প্রবেশ)

স্বর্গীয় দূত। আরে ভাই, তোর যে ভারি ফুর্তি?

কেনা। কে ও? ছোট্ট মানুষ? দাঁড়াও চশমাটা বার করে নি।

দূত। কেন! চোখে কম দেখ বুঝি?'

কেনা। তা কেন? বড়লোক হয়েছি যে, ছোটমানুষ আর তেমন চট করে চোখে মালুম পড়ে না।

দূত। বটে! এত বড়লোক কি করে হলি ভাই?

কেনা (পকেট চাপড়াইয়া)—তি—ন—টি ব—ছ—রের মা—ই—নে। (এক-একটি পয়সা বহিষ্করণ ও গম্ভীরভাবে গণন) এ—এ—এ—ক, দু—উ—উ—ইতি—ই—ই—ই—ন (পকেট উল্টাইয়া গম্ভীরভাবে অবস্থান)।

দূত। তাই ত ভাই, এত টাকা নিয়ে তুই কি করবি? আমি গরীব, আমাকে কিছু দে-না।

কেনা। নিবি? এই নে; ভগবান আমাকে খেটে খাবার শক্তি দিয়েছেন, খেটে খাব। (পয়সা তিনটি প্রদান)

দূত। তুই ভাই বেশ লোক, তোর মনটা খুব খোলা। আমি ঈশ্বরের দূত, ভাল লোক দেখলে পুরস্কার দি। তোর ব্যবহারে খুব খুশি হয়েছি, তুই কি চাস বল্, যা চাস তাই পাবি।

কেনা। অ্যাঁ, আপনি ঈশ্বরের দূত? তবে ত আপনার সম্মুখে আমি বড় বেয়াদবি করেছি?

দূত। তোর কিছু ভয় নেই, তুই আমাকে 'তুই' 'তুমি' যা খুশি বল্, কিছুতেই বেয়াদবি হবে

না; এখন তুই কি নিবি বল্।

কেনা। তা দাদা, যদি দেবে তবে এমন একখানা বেহালা দাও যে, যে তার আওয়াজ শুনবে তাকেই তিড়িং তিড়িং করে নাচতে হবে।

দূত। (ঝুলি হইতে বেহালা বাহির করিয়া)। এই নে।

কেনা। বাঃ। বেশ হল, আমাকে ত সঙ্গে সঙ্গে নাচতে হবে না?

দূত। না, সে ভয় তোর নেই, যা এখন ফুর্তি করগে। (দূতের প্রস্থানোদ্যম ও কেনারামের বাদ্যোদ্যম) আরে দূর হতভাগা, আমারই উপর পরীক্ষা করে বসলি।

কেনা। তুমিই যে ফুর্তি করতে বললে দাদা!

দূত। আমি আগে যাই, তারপর করিস।

কেনা। আ - চ্ছা।

তৃতীয় দৃশ্য

(বেচারামের প্রবেশ)

বেচা। ঐ ঝোপটাতে ফেলে গিছলুম। পুলিশ বেটা এমনি তাড়া কল্লে ধরেই ফেলেছিল আর কি চট করে টাকার থলেটি ঐ ঝোপটাতে ফেলে পালালুম, এখন পেলে বাঁচি। (থলি খুঁজতে ঝোপে প্রবেশ) বাপ রে, কি ভয়ানক কাঁটা—এই পেয়েছি!

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা (স্বগত)। ঐ যে বেচুবাবু কাঁটাবনে ঢুকেছেন, এইবারে এক গৎ বাজিয়ে নি, পুরোনো মনিবটে। (বেহালাবাদন)

বেচা (নৃত্য করিতে করিতে)। আরে! আরে! ও কী? উঃ আঃ! আরে তুমি কি—উঃ হু হু—আরে আর না—জামাটা—উঃ—হু জামাটা গেল যে, উঃ—গায়ের চামড়াও যে ছিঁড়ে গেল—উঃ!

কেনা। আজ্ঞে, আমি আপনার বকেয়া চাকর কেনারাম, মাইনে চুকিয়ে দিয়েছেন বলে কি এমন মনিবকে ভুলতে পারি? আপনাকে বাজনা শুনিয়ে আমার বেয়ালা সার্থক হল। (পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে বাদন)

বেচা (নৃত্য)। কি মুশকিল। বাবা কেনারাম, রক্ষে করো বাবা। এ কি বাজনা যে শুনলেই নাচতে হয়! বাবা আর কাজ নেই, আমি খুব খুশি হয়েছি, এই টাকার থলি তোমায় দিচ্ছি, তোমার মাইনে এ থেকে পুষিয়ে নাও, দোহাই বাবা, আমায় নাচিও না। (টাকার থলি কেনারামের হাতে প্রদান।)

কেনা (বিনীত অভিবাদন করিয়া)। আজ্ঞে, না হবে কেন? আপনার মত মনিব না হলে গুণ কে বোঝে! দেখছি বেয়ালার আওয়াজে আপনার 'কানে খাট'র ব্যারামটাও বেশ সেরে গেল। ভাল ভাল, আর এ ব্যারামের সূত্রপাত দেখলে আমায় খবর দেবেন, আমি বেয়ালা নিয়ে এসে চিকিৎসা করব। (দীর্ঘ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান)

বেচা। হতভাগা বেটা, লক্ষ্মীছাড়া বেটা, জোচ্চর, বাটপাড়, ডাকাত— বেটাকে দেখাচ্ছি। পুলিশ! পুলিশ! চোর—চোর!

চতুর্থ দৃশ্য

(বিচারালয়। ব্যস্তভাবে বেচারামের প্রবেশ)

বেচা। দোহাই হুজুর, আমাকে ধনে-প্রাণে মেরেছে। ও হো হো (ক্রন্দন)

বিচারক। আরে ব্যাপার কি? তোমার কি হয়েছে?

বেচা। (কাঁটার আঁচড় ও ক্ষতবিক্ষত শরীর দেখাইয়া)—আর কি হবে, আমি ধনে-প্রাণে গিয়েছি। বড় রাস্তার ধারে ঐ কেনা বেটা আমাকে মেরে ধরে টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েছে—এঁ হেঁ হেঁ (ক্রন্দন)। বেটাকে তিন বচ্ছর আমি খাইয়ে মানুষ কল্লুম, আর তার এই প্রতিশোধ দিলে। বেটা দিনরাত বেহালা নিয়ে ফেরে, এখনি ধরতে পাঠান, তাকে দেখলেই চিনতে পারবেন।

বিচারক। চারজন লোক এখনি গিয়ে কেনারামকে ধরে নিয়ে এসো।

(কেনারামকে লইয়া চারজন লোকের প্রবেশ)

বেচা। ঐ! ঐ! ঐ বেটা! হুজুর! কেনারাম বেটা আমার সর্বনাশ করেছে, বেটাকে আচ্ছা করে—

বিচারক। চুপ। (কেনার প্রতি) তুমি একে মেরে এর টাকা কেড়ে নিয়েছ?

কেনা। সে কি? হুজুর! উনি আমার বেয়ালা বাজানো শুনে আমায় এক থলি টাকা পুরস্কার দিয়েছেন— আমি যথার্থ বলছি।

বিচারক। ওর যে চেহারা দেখছি, তাতে ও যে বেহালা শুনে তোমায় এতগুলো টাকা দিয়েছে তা আমি কিছুতে বিশ্বাস কত্তে পারি নে। আর ওর গায়েও এই-সব দাগ দেখছি। সুতরাং প্রমাণ হচ্ছে তুমিই ওকে মেরে টাকার থলি কেড়ে নিয়েছ। এ ডাকাতি, ডাকাতির শাস্তি ফাঁসি—তোমার ফাঁসি হবে। এখন তোমার যদি কোন আকাঙ্খা থাকে ত বলো।

কেনা। হুজুর, আমার আর কোন সাধ নেই। খালি এ জন্মের মত বেয়ালাখানা একবার বাজাতে চাই।

বেচা। সর্বনাশ! হুজুর এমন হুকুম দেবেন না।

চাপরাসী। (বেচারামকে রুলের গুঁতা মারিয়া) চুপ্ রও।

বিচারক। আর কোন সাধ তোমার নেই? আচ্ছা বাজাও।

(কেনারামের উৎসাহের সঙ্গে বেহালাবাদন ও বিচারক হইতে চাপরাসী পর্যন্ত সকলের নৃত্য।)

বিচারক (হাঁফাইতে হাঁফাইতে)। আরে বাপু! থাম্ থাম্; শিগ্‌গির থাম্; তোকে বেকসুর খালাস দিচ্ছি, প্রাণ যায়—থাম্। বাপরে, এ কিরকম বেহালা বাজনা!

কেনা (সেলাম করিয়া)। হুজুর বেচুবাবুকে এখন সমস্ত সত্য ঘটনা বলতে হুকুম হয়। নইলে আমি পুনরায় বেয়ালায় ছড়ি দিলাম।

বিচারক (বেচারামের প্রতি সরোষে)। বল্ বেটা কি হয়েছিল, সত্যি করে এখনি বল্।

বেচা। ওগো, না গো, আর বেহালা ধরো না। ও টাকা আমিই দিয়েছি— দিয়েছি।

বিচারক। তুই এত টাকা কোথা পেলি, বল্।

বেচা। আমি—আমি—

কেনা। এই বেয়ালা ধরছি!

বেচা। না না— আমি, হুজুর আমি—কাল রাত্তিরে হুজুর, চুরি করেছিলাম। দোহাই হুজুর।

কেনা। ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। দেখলেন ত বেচুবাবু?

বিচারক। একে পঁচিশ বেত মারো।

ঝানু চোর চানু

ছেলেবেলা থেকেই চানু শয়তানের একশেষ, আশপাশের লোকজন তার জ্বালায় অস্থির। চানুর বাবা বড় গরিব ছিল, চানু ভাবল—বিদেশে গিয়ে টাকা পয়সা রোজগার করে আনবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ, একদিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। খানিক দূর গিয়েই বনের ভিতর দিয়ে একটা নির্জন রাস্তা—চানু সেই রাস্তা ধরে চলল। সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যার সময় পথের ধারেই একটি কুঁড়েঘর ছিল, সেখানে এসে উপস্থিত।

ঘরের ভিতরে আগুনের পাশে একটি বুড়ি বসেছিল, চানুকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই বাপু তোমার?'

চানু বলল, 'চাইব আর কি, কিছু খাবার দাবার চাই, আর একটি বিছানা চাই।'

বুড়ি বলল, 'সবে পড় বাপু, এখানে কিছু পাবে না। আমার ছয়টি ছেলে, সারা দিন খেটেখুটে তারা এখনই বাড়ি ফিরবে। তোমাকে এখানে দেখতে পেলে তারা তোমার গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে।'

চানু। সেটা আর বেশি কথা কি? এই ঠাণ্ডায় বাইরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মরার চাইতে গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে সেইটাই বরং ভাল।

বুড়ি দেখল সে সহজ লোকের পাল্লায় পড়ে নি; কি আর কবে, তখন চানুকে পেট ভরে খেতে দিল। শুতে যাবার সময় চানু বুড়িকে বলল, 'দেখো বুড়ি! তোমার ছেলেরা এসে যদি আমার ঘুম ভাঙায় তা হলে কিন্তু বড্ড মুশকিল হবে বলছি।'

পরের দিন ঘুম ভাঙলে চানু দেখল ছয় জন অতি বদ-চেহারার লোক তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে—সে তাদের দেখে গ্রাহ্যও করল না।

দলের সর্দারটি তখন চানুকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে হে বাপু? কি চাও এখানে?'

চানু। 'আমার নাম সর্দার চোর, আমার দলের জন্য লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমরা যদি চালাক চতুর হও তা হলে তোমাদের অনেক বিদ্যে শিখিয়ে দেব।'

সর্দার বলল, 'আচ্ছা বেশ, তুমি তা হলে এখন উঠে একটু খাও-দাও, তারপরে দেখা যাবে এখন কে সর্দার.

বিছানা থেকে উঠে সকলের সঙ্গে বসে চানু খেল। ঠিক তারপরই সকলে দেখল একটা সুন্দর ছাগল সঙ্গে নিয়ে একজন কৃষক বনের পাশে যাচ্ছে। তখন চানু বলল, 'আচ্ছা তোমাদের কেউ কোনরকম জবরদস্তি না করে শুধু ফাঁকি দিয়ে ঐ লোকটার ছাগলটা নিয়ে আসতে পার?' একজন একজন করে সকলেই বলল, 'না ভাই, আমরা কেউ তা পারব না।'

চানু। 'বাস, তা হলেই দেখো আমি তোমাদের সর্দার কিনা—আমি এখনি ছাগলটা নিয়ে আসছি।' এই বলে সে তখনই বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড়ে তার ডান পায়ের জুতোটা রেখে দিল, তারপর ছুটে গিয়ে কিছুদূরে রাস্তার আর একটা মোড়ে বাঁ পায়ের জুতোটাও রেখে রাস্তার ধারে বনের ভিতর চুপ করে লুকিয়ে রইল।

খানিক পরেই সেই কৃষক এসে প্রথম জুতোটা দেখে মনে করল, 'খাসা জুতোটা পড়ে রয়েছে, কিন্তু এক পাটী দিয়ে কি হবে, আর এক পাটীও থাকলে ভাল হত।'

খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে কৃষক আর-এক পাটী জুতো দেখে ভাবল, 'আমি কি বোকা, ও পাটীটা যদি নিয়ে আসতাম। যাই, তা হলে ওটা নিয়ে আসি গিয়ে। একটা গাছে ছাগলটা বেঁধে সে চলল জুতো আনতে। এদিকে চানু কিন্তু ছুটে গিয়ে আগেই সেটা নিয়ে এসেছে। তারপর কৃষক ছাগলটাকে বেঁধে রেখে যখন চলে গেল তখন চানুও বাঁ পায়ের জুতোটা নিয়ে ছাগলটার বাঁধন খুলে সেটাকেও নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে বুড়ির কুটিরে এসে উপস্থিত।

কৃষক গিয়ে প্রথম জুতোটাও পেল না, ফিরে এসে পরের জুতোটাও পেল না, তার উপর আবার যখন দেখল যে ছাগলটিও সেখানে নেই, তখন সে ভাবল, এখন করি কি? গিন্নীকে যে বলে এসেছি বাজারে ছাগলটা বেচে তার জন্যে একখানা গায়ের চাদর কিনে নিয়ে যাব! যাই তা হলে, চুপচাপ গিয়া আর-একটা জন্তু নিয়ে আসি, তা নইলে যে ধরা পড়ে যাব—গিন্নী ভাববে আমি বোকার একশেষ।

এদিকে চানু ছাগল নিয়ে বুড়ির বাড়িতে যখন গেল তখন সেই চোরেরা ত একেবারে অবাক! চানুকে কত করে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কিছুতেই সে বলল না কি করে সেই ছাগল আনল।

খানিক বাদেই সেই কৃষক একটা মোটাসোটা সুন্দর ভেড়া নিয়ে এসে উপস্থিত। চানু বলল, 'যাও দেখি, কে জবরদস্তি না করে ভেড়াটা আনতে পারে।' ছয় চোরের সকলেই অস্বীকার করল। তখন চানু বলল, 'আচ্ছা দেখি আমি পারি কি না, আমাকে একটা দড়ি দাও দেখি।' দড়ি নিয়ে চানু বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

এদিকে কৃষকটি তার ছাগল চুরির কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে চলেছে, মোড়ের কাছেই এসে দেখে গাছের ডালে একটা মড়া ঝুলছে। মড়া দেখেই তার গায়ে কাঁটা দিল, 'রক্ষা করো বাবা! খানিক আগে ত এখানে মড়া-টড়া কিছু দেখতে পাই নি!' সামনের মোড়ে গিয়ে কৃষক দেখল আর-একটা মড়া গাছের ডালে ঝুলছে। 'রাম রাম রাম— এ হল কি? আমার মাথাটা গুলিয়ে যায় নি ত?' কৃষক তাড়াতাড়ি চলল। কিন্তু কি সর্বনাশ! রাস্তার আর-একটা মোড়ে গিয়ে দেখে সেখানেও একটা মড়া ঝুলছে! পর পর তিনতিনটে মড়া এতটা কাছাকাছি ঝুলছে দেখে তার মনে সন্দেহ হল—'নাঃ, এ কখনই হতে পারে না। আমারই বোধ করি মাথা খারাপ হয়েছে। আচ্ছা দেখে আসি আগের মড়া দুটো এখনো গাছে ঝুলছে কি না।' কৃষক সবে মাত্র মোড়টা ফিরেছে তখন ডালের মড়া চট করে নেমে এসে বাঁধন খুলে ভেড়াটাকে নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে একেবারে বুড়ির বাড়ি হাজির।

এদিকে কৃষক দেখল মড়া-টড়া কিছুই গাছে ঝুলছে না। ফিরে এসে দেখল তার ভেড়াটাও নেই, কে জানি দড়ি খুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তখন তার মনটা কেমন হল তা বুঝতেই পার! বেচারি মাথা খুঁড়তে লাগল— 'হায়, হায়! কার মুখ দেখে আজ বেরিয়েছিলাম, এখন

গিন্নি কি বলবে? সমস্ত সকালটাই মাটি হয়ে গেল, ছাগল, ভেড়া দুটোই গেল; এখন করি কি? একটা কিছু এনে বাজারে বিক্রি করে গিন্নির শাল না কিনলেই চলবে না। আসবার সময় দেখেছিলাম ষাঁড়টা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, যাই, সেটাই নিয়ে আসি—গিন্নিও দেখতে পাবে না।'

চানু যখন চোরদের বাড়ি ভেড়া নিয়ে গিয়ে উপস্থিত, তখন চোরদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। সর্দার চোরটি বলল, 'আর-একটা যদি চালাকি এরকম খেলতে পার তাহলে তোমাকেই আমাদের সর্দার করব।'

ততক্ষণে কৃষকটিও ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত, চানু বলল, 'যাও ত, জবরদস্তি না করে কে ষাঁড়টা ফাঁকি দিয়ে আনতে পার?' কেউ যখন ভরসা পেল না তখন সে বলল, 'আচ্ছা দেখি, আমি পারি কি না।' চানু বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কৃষকটি খানিক দূর এগিয়ে গিয়েই বনের মধ্যে একটা ছাগলের ডাক শুনতে পেল। ঠিক তার পরেই একটি ভেড়াও ডেকে উঠল। আর তাকে রাখে কে একটা গাছে ষাঁড়টাকে বেঁধে রেখে ছুটল বনের ভিতর। কৃষক যত যায় ততই শোনে এই একটু আগেই ডাকছে, দেখতে দেখতে প্রায় আধ মাইল দূরে চলে গেল। তখন হঠাৎ সব চুপচাপ, ভেড়া ছাগলের ডাক আর শুনতে পাওয়া গেল না। এদিক-সেদিক খুঁজে খুঁজে কৃষক একেবারে হয়রান হয়ে গেল কোথা বা ছাগল আর কোথাই বা ভেড়া। বেচারি কাহিল হয়ে আবার ফিরে এল। কিন্তু কি সর্বনাশ! এসে দেখে ষাঁড়টিও সেখানে নেই। বন উলট পালট করে ফেলল, কিছুতেই আর ষাঁড়ের খোঁজ পেল না।

চানু যখন ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত তখন আর কথাটি নেই। চোরেরা চানুকে তাদের সর্দার করল। তাদের আনন্দ দেখে কে, সমস্তটা দিন আমোদ করেই কাটিয়ে দিল। লুটপাট করে চোরেরা যা-কিছু আনত একটা গহ্বরের মধ্যে সব লুকিয়ে রাখত, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তারা চানুকে নিয়ে সেই সমস্ত টাকাকড়ি সব দেখিয়ে দিল—চানুই যে এখন তাদের সর্দার, তাকে সব না দেখালে চলবে কেন।

দলের সর্দার হবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে চোরেরা একদিন চানুকে বাড়ির জিম্মায় রেখে চুরি করতে গেল। খালি বাড়ি, চানু সেই শয়তান বুড়িকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা তুমি যে এদের ঘর-সংসার দেখ, এরা তোমাকে তার দরুন কিছু বকশিশ-টকশিশ দেয় না?'

বুড়ি। 'বকশিশ দেয়, না ওদের মাথা দেয়!'

চানু। 'বটে, কিচ্ছু দেয় না। আচ্ছা এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে ঢের টাকা দেব।' বুড়িকে সঙ্গে করে চানু টাকার ঘরে গেল। জন্মেও বুড়ি এত ধন কোনোদিন দেখে নি—মুখ হাঁ করে সেই রাশি রাশি টাকা মোহরের দিকে বুড়ি খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বুড়ির আহ্লাদ আর ধরে না। হাঁটু গেড়ে মাটিতে পড়ে দুই হাতে টাকাগুলো ঘাঁটতে লাগল। সময় বুঝে চানুও তার পকেট বোঝাই ত করলেই, তারপর একটা থলে মোহর দিয়ে ভর্তি করে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দিকে থেকে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিল—বুড়ি সেই টাকার ঘরেই আটকা পড়ে রইল।

বেরিয়ে এসেই চানু সুন্দর একটা পোশাক পরলে, তারপর সেই ছাগল, ভেড়া আর ষাঁড়টাকে নিয়ে একেবারে সেই কৃষকের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। কৃষক তার স্ত্রীকে নিয়ে

বাড়ির দরজায়ই বসে ছিল, তারপর সেই হারানো জন্তুগুলিকে দেখে আহ্লাদে লাফিয়ে উঠল।

চানু বল, 'জন্তুগুলো কার বলতে পার কি?'

'এগুলো যে আমাদের ,আপনি কোথায় পেলেন মশায়?'

'এই বনের ভিতর চরে বেড়াচ্ছিল। আচ্ছা, ছাগলটার গলায় একটা থলে ঝুলছে, তাতে দশটা মোহর রয়েছে—ওগুলিও কি তোমাদের?'

'না মশায়। আমরা গরিব দুঃখী লোক, মোহর কোথা পাব?'

'আচ্ছা, মোহরগুলোও তোমরা নাও, আমার কিছু দরকার নেই। মোহরগুলি নিয়ে দুইহাত তুলে কৃষক চানুকে আশীর্বাদ করল।

সমস্ত দিন চলে চানু প্রায় সন্ধ্যার সময় তার বাড়িতে এসে উপস্থিত, বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখল তার মা-বাবা বসে আছেন। চানু বলল, 'ভগবান আপনাদের ভাল করুন, আজ রাতটা আপনাদের বাড়িতে থাকতে পারি কি?'

'আপনার মত ভদ্রলোক কি এখানে থাকতে পারবেন? আমরা যে বড্ড গরীব।'

চানু আর চুপ থাকতে পারল না, 'বাবা, তুমি কি তোমার ছেলেকেও চিনতে পারছ না?'

চানুর মা-বাবা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইল, তারপর চানুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এমন সুন্দর পোশাক তুমি কোথা পেলে বাবা?'

চানু। 'পোশাক দেখেই অবাক হয়ে গেলে, তা হলে এই টাকাগুলো দেখে কি করবে?' এই বলে চানু পকেট খালি করে সব মোহর টেবিলের উপর রাখল।

এতগুলো মোহর দেখে চানুর বাবাব বড্ড ভয় হল। চানু তখন সব কথা খুলে বলল-- তার আশ্চর্য বুদ্ধির কথা শুনে চানুর মা-বাপের আনন্দ আর ধরে না।

পরের দিন সকালে চানু বাবাকে বলল, 'বাবা, যাও জমিদারবাড়ি। বলো গিয়ে আমি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

চানুর কথা শুনে তার বাবার চোখ বড় হয়ে গেল, 'বলিস কিরে বেটা। তা হলে যে আমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেবে।'

'না! তুমি বোলো যে আমি সর্দার চোর, আমার মত ঝানু চোর দুনিয়ায় নেই, জবরদস্ত ও ওস্তাদ চোরদের ফাঁকি দিয়ে লাখ টাকা রোজগার করে এনেছি। দেখো বাবা, যখন দেখবে জমিদারের মেয়েও সেখানে আছে তখনই এ-সব কথা বোলো।'

'আচ্ছা, এত করে যখন বলছ যাচ্ছি, কিন্তু কিছু হবে বলে মনে হয় না।' প্রায় দুই ঘণ্টা পরে চানুর বাবা ফিরে এল। চানু বলল, কি করে এলে বাবা?'

'নেহাত মন্দ নয়। মেয়েটি যে বড় অনিচ্ছুক তা ত মনে হল না, বোধকরি বাবাজি তুমি এর আগেও তার কাছে এ প্রস্তাবটি করেছ—না? যা হোক, জমিদারমশায় বললেন আসছে রবিবারে তাঁরা নাকি একটি হাঁস ভেজে খাবেন, তুমি যদি কড়া থেকে হাঁসটা বে-মালুম চুরি করতে পার, তা হলে তিনি তোমার কথা ভেবে দেখবেন।'

'এ আর তেমন শক্ত কাজ কি? দেখা যাবে এখন।'

রবিবার দিন জমিদার এবং বাড়ির সকলে রান্নাঘরে রয়েছেন—হাঁস ভাজা হচ্ছে, এমন সময় রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল। একটা অতি কুৎসিত বুড়ো ভিখারি, পিঠে তার একটা

মস্তবড় থলে ঝুলছে, সে এসে রান্নাঘরের দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'জয় হোক বাবা! আপনাদের খেয়ে-দেয়ে কিছু থাকলে আমি বুড়ো ভিখারি কিছু খেতে পাব কি?'

জমিদারমশায় বললেন, 'অবশ্যি পাবে। রান্নাঘরের দাওয়ায় একটু বোসো।'

জানালার পাশে একজন লোক বসেছিল। খানিক পরে সে চেঁচিয়ে উঠল 'আরে মস্ত বড় একটা খরগোশ ছুটে বাগানের দিকে যাচ্ছে— এটাকে মারলে হয় না?'

জমিদার ধমক দিয়ে বললেন, 'খরগোশ মারবার ঢের সময় মিলবে, এখন চুপ করে বসে থাকো।'

খরগোশটা বাগানে গিয়ে ঢুকল। ভিখারি পোশাক-পরা চানু থলের ভিতর থেকে আর-একটা খরগোশ ছেড়ে দিল। একটু পরেই চাকর আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবু বাবু খরগোশটা এখনো রয়েছে—এখনো চেষ্টা করলে মারা যায়।'

আবার জমিদার ধমক দিলেন, 'চুপ করে থাকো বলছি।'

খানিক বাদে চানু আরো একটা খরগোশ থলে থেকে বের করে ছেড়ে দিল। চাকরও চেঁচিয়ে উঠল। —আর যায় কোথা! একজন একজন করে সবকটি চাকর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খরগোশের পেছনে তাড়া করল, জমিদারমশায়ও বাদ পড়লেন না।

খরগোশ তাড়িয়ে সকলে ফিরে এসে দেখে ভিখারিও নেই, কড়ার মধ্যে হাঁসও নেই।

জমিদারমশাই বললেন, 'আচ্ছা ফাঁকিটা দিয়েছে চানু, সত্যি সত্যি আমাকে জব্দ করেছে।'

একটু পরেই চানুদের বাড়ি থেকে একজন চাকর এসে জমিদারমশায়কে বলল, 'আজ্ঞে, আমার মনিব বলে পাঠিয়েছেন, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ি গিয়ে খাবেন।'

জমিদার বড় চমৎকার সাদাসিধে লোক ছিলেন, মনে একটুও অহংকার ছিল না। স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে চানুদের বাড়ি এলেন এবং সকলের সঙ্গে বসে নানারকম ভাল ভাল খাবার জিনিসের সঙ্গে তাঁর সেই হাঁস ভাজাটিও খেলেন। চানুর চালাকির কথা বলে জমিদারমশায় হাসতে হাসতে পাঁজরে ব্যাথা ধরিয়ে ফেললেন। মেয়েটি ত আগে থেকেই চানুকে পছন্দ করত, এখন তার পোশাক দেখে এবং তার আদব-কায়দা দেখে মনে মনে আরো খুশি হল।

খাওয়া দাওয়ার পর জমিদার বললেন, 'চানু, শুধু হাঁস চুরি করেই আমার মেয়ে পাবে না। কাল রাত্রে আমার আস্তাবল থেকে আমার ছয়টি ঘোড়া যদি চুরি করতে পার তা হলে দেখা যাবে এখন। ছজন সহিস কিন্তু ছয়টি ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাহারা দেবে মনে রেখো।'

চানু বলল, 'আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব এখন।'

সোমবার রাত্রে জমিদারের আস্তাবলে ছয়জন সহিস ছয়টি ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। বেজায় ঠাণ্ডা, রক্ত যেন জমে যেতে চায়; তাই প্রত্যেকের জামার পকেটে একটি করে মদের বোতল, খানিক পরে পরে একটু করে মদ খেয়ে গা গরম করে নিচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না, তাই সকলে মিলে মহা গল্প জুড়ে দিল —চানুর জন্য আস্তাবলের দরজা খোলাই রেখেছিল। রাত যত বেশি হতে লাগল ঠাণ্ডাটাও যেন বাড়তে লাগল। মদে আর শানায় না, গায়ে কাঁপুনি ধরে গেল এমন সময় ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে একটা কদাকার বুড়ো এসে দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'বাবাসকল, শীতে জমে গেলাম, এক মুঠো খড় দাও ত, আস্তাবলের এককোণে রাতটা পড়ে থাকি, তা না হলে বুড়ো মানুষ—শীতে মরেই যাব।' বুড়োর পিঠে ছয়টা থলে, মুখে প্রায় দু আঙুল লম্বা দাড়ি—চেহারাটি কুৎসিতের একশেষ।

বুড়ো আস্তাবলের দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'লক্ষী বাপ আমার, বুড়ো মানুষ শীতে মরে গেলাম, ঐ কোণটাতে একটু জায়গা দাও, একমুঠো খড় নিয়ে পড়ে থাকব এখন।'

সহিসরা ভাবল, এলই বা বুড়ো, বেচারি শীতে জমাট বেঁধে গেল—'ও ত আর কোনো অনিষ্ট করবে না।' আস্তাবলের কোণে খড় পেতে বুড়ো বেশ আরামে বসল। সহিসেরা দেখল বুড়ো খানিক পরেই একটা কালো বোতল বের করে একটু মদ খেল—তার মুখে আর হাসি ধরে না, যেন সে খুবই আরাম বোধ করেছে! সহিসদের বুড়ো বলল, 'বাবা, তোমাদের সব বোধ করি শেষ করে ফেলেছ, তা আমার কাছে ঢের আছে। তবে কিনা তোমরা পাছে কিছু মনে কর তাই তোমাদের দিতে ভরসা পাচ্ছি না।' একে বেজায় শীত, তার উপরে সত্যি সত্যি তাদের মদ শেষ হয়ে গেছে, বুড়োর কথা শুনে সহিসরা যেন হাতে চাঁদ পেল—'সে কি দাদু, তুমি যদি দাও তা হলে ত বেঁচে যাই—ঠাণ্ডায় মরে গেলাম।'

বুড়ির বোতলটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল, তবুও সহিসদের শীত গেল না। শয়তান বুড়ো তখন আর একটি বোতল বের করে তাদের দিল। এ বোতলটার মদের সঙ্গে কি মেশানো ছিল, খাওয়া মাত্র সব কটা সহিস ঘোড়ার পিঠে গদির উপরে বসেই নাক ডাকিয়ে ঘুম দিল।

তখন বুড়ো উঠে সবকটা সহিসকে খড়ের উপর শুইয়ে ঘোড়াগুলোর পায়ে মোজা পরিয়ে দিল। তারপর সবগুলিকে নিয়ে একেবারে চানুদের বাইরের একটা ঘরে গিয়ে হাজির।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জমিদারমশায় প্রথমেই কি দেখলেন? তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই চানু ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে আর তার ঘোড়ার পিছনে পিছনে অপর পাঁচটা ঘোড়াও চলেছে।

জমিদারমশায় অবাক হয়ে রইলেন, মনে মনে বললেন, 'গোল্লায় যা তুই চানু, আর যাদের চোখে ধুলো দিয়েছিলি সে বেচারারাও গোল্লায় যাক।' আস্তাবলে গিয়ে সহিস বেটাদের জাগাতে জমিদারমশায়কে বেগ পেতে হয়েছিল।

সকালবেলা জমিদারমশায় খেতে বসেছেন, চানুকেও ডেকে এনেছেন, খেতে খেতে চানুকে বললেন, 'কতকগুলো বোকা পাঁঠার চোখে ধুলো দিয়েছ। এতে তেমন বাহাদুরি নেই। আচ্ছা, আজ বেলা একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত আমি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে ঘুরে বেড়াব, নিও দেখি বাপু আমার ঘোড়াটা চুরি করে! তা হলে বুঝব তুমি বাহাদুর এবং আমার জামাই হবার উপযুক্ত।'

চানু মাথা নিচু করে উত্তর করল, 'যে আজ্ঞে, একবার চেষ্টা করে দেখব এখন।'

একটার পর থেকে জমিদার ঘোড়ায় চড়ে পাইচারি করে করে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন, তিনটে বেজে গেল, চানুর টিকিটিও দেখতে পেলেন না। মনে করলেন এবারে বাড়ি ফিরে যাবেন, এমন সময় তাঁর একটা চাকর পাগলের মত উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে হাজির—'কর্তা শিগ্‌গির বাড়ি যান, মা ঠাকরুনকে বুঝি বা আর দেখতে পেলেন না; সিঁড়ির উপর থেকে তিনি পড়ে গেছেন। বোধ করি হাত-পা সব ভেঙে গেছে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আমি চললাম ডাক্তারের বাড়ি।'

জমিদারের চোখ বড় হয়ে গেল, 'বলিস কিরে বেটা, কি সর্বনাশ। ডাক্তারের বাড়ি যে

ঢের দূর—তুই আমার ঘোড়াটা নিয়ে ছোট শিগ্‌গির।' ঘোড়ায় চড়ে চাকর তখন ডাক্তারের বাড়ি ছুটল।

জমিদারমশাই হোঁচট খেতে খেতে বাড়ি এসে উপস্থিত। বাড়ি এসে দেখলেন সাড়া শব্দ কিছু নেই, সব চুপচাপ। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বাড়ির ভেতর গেলেন, সেখানে বসবার ঘরে গিন্নি আর মেয়ে দিব্যি আরাম করে বসে আছেন। ততক্ষণে জমিদারমশায়ের চৈতন্য হল। তিনি বুঝতে পারলেন এ-সব চানু বেটারই চালাকি—বেটা তাকে আচ্ছা ঘোল খাইয়েছে।

খানিক পরেই দেখলেন, চানু তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। সেই চাকর বেটার কিন্তু আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। চাকর তার জন্য একটুও কেয়ার করে না, নাইবা করল তার চাকরি—চানু যে তাকে দশটা মোহর দিয়েছিল তা দিয়ে তার অনেক দিন চলবে।

পরের দিন চানু এসে জমিদার বাড়ি উপস্থিত. জমিদার বললেন, 'তুমি বাপু এবারে নেহাত ফাঁকি দিয়াছ, ওতে তোমার উপর আমার বড্ড রাগ হয়েছে। যা হোক আজ রাত্তিরে যদি আমাদের বিছানার থেকে চাদরখানা চুরি করতে পার তা হলে কালকেই বিয়ের আয়োজন করব।'

চানু বলল. 'আজ্ঞে আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখব, কিন্তু এবারেও যদি ফাঁকি দেন তাহলে কিন্তু আপনার মেয়েকেই চুরি করে নিয়ে যাব।'

রাত্রে জমিদার আর তাঁর গিন্নি শুয়েছেন, দিব্যি জ্যোৎস্না. কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরে পড়েছে। জমিদারমশায় দেখলেন হঠাৎ যেন একটা মাথা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে যাচ্ছিল; তাঁদের দেখতে পেয়েই আবার সরে পড়ল।

জমিদার গিন্নিকে বললেন— 'দেখলে ত? এ বেটা নিশ্চয় চানু।' তারপর বন্দুকটা হাতে করে নিয়ে বললেন, 'দেখো, আমি বেটাকে এখনি চমকে দিচ্ছি।' বন্দুক দেখেই জমিদার গিন্নি ব্যস্ত হয়ে বললেন. 'কর কি, চানুকে গুলি করবে না কি?'

জমিদার বললেন, 'আরে না, তুমি কি পাগল হলে নাকি? বন্দুকে কি আর গুলি পুরেছি—শুধু বারুদ।'

খানিক পরেই আবার জানালায় মাথা উঁকি মারল, দড়াম করে জমিদার বন্দুক ছুঁড়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন ধপ করে কি নীচে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লেগেছে।

জমিদার গিন্নি চেঁচিয়ে উঠলেন. 'হায় ভগবান, বেচারি বোধ করি মরে গেছে, আর নাহয় জন্মের মত খোঁড়া কানা হয়ে থাকবে।'

জমিদার মশায় বোধ করি তখনো বাইরের জানালার কাছে পৌঁছান নি, কিন্তু গিন্নিঠাকরুন শুনলেন কর্তা ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলেছেন. 'শিগগির বিছানার চাদরখানা দাও, বেটা মরে নি বোধ হয়. কিন্তু বেজায় রক্ত পড়ছে—একটু পরিষ্কার করে বেঁধে ঠেঁধে ওকে নিয়ে আসব।'

গিন্নিঠাকরুন একটানে চাদরখানা বিছানা থেকে তুলে দরজায় ছুঁড়ে দিলেন। চাদর নিয়ে জমিদার মশায় আবার ছুটলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য সেই মুহূর্তেই তিনি ফিরে এসে ঘরে উপস্থিত— সে সময়ের মধ্যে বাগানে জানালার কাছে গিয়ে ফিরে আসা একেবারে অসম্ভব।

ঘরে ঢুকেই জমিদার রেগে মেগে বলতে লাগলেন—'বেটা পাজি চানু তোকে ফাঁসি দেওয়া দরকার।'

কর্তার কথা শুনে গিন্নি অবাক হয়ে বললেন—'বেচারির বেজায় লেগেছে আর তুমি কিনা তাকে গালাগালি দিচ্ছ!'

'ওর বাস্তবিক লাগাটাই উচিত ছিল। বেটার বদমাইশি দেখেছ? খড় দিয়ে একটা মানুষ বানিয়ে সেটাকে কাপড়-চোপড় পরিয়ে এনে জানলায় ধরেছিল।'

'কী ছাই মাথা মুণ্ডু বলছ, আমি বুঝতেই পারছি না। খড়ের মানুষ হলে তার রক্ত মুছবার জন্য আবার বিছানার চাদর চেয়ে নিয়ে গেলে কেন?'

'বিছানার চাদর —বলছ কি, আমি ত বিছানার চাদর-টাদর চাইতে আসি নি।'

'চাদর চাইতে আস আর না আস আমি সে-সব কিছু জানি না। তুমি এসে দরজায় দাঁড়িয়ে চাদর চাইলে আর আমিও তোমাকে দিয়েছি।'

গিন্নির কথা শুনে জমিদার মশায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—'কি ভীষণ শয়তান রে বাবা চানু—ওর সঙ্গে আর পেরে উঠব না। কাল সকালেই বিয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে দেখছি।'

এরপর চানুর সঙ্গে জমিদার কন্যার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর চানু খুব ভাল হয়ে গেল—তার মত জামাই সচরাচর মেলে না। জমিদার মশায় এবং তাঁর গিন্নি শতমুখে চানুর সুখ্যাতি করেন আর লোকের কাছে বলেন—'আমার ঝানু চোর চানু।'

ছোট ভাই

সাতটি ভাই ছিল, তাহাদের সকলের ছোটটির নাম ছিল রুরু। দেশের মধ্যে তারা সাতটি ভাই দেখতে আর সকল ছেলের চেয়ে সুন্দর ছিল; তাদের মধ্যে আবার রুরু ছিল সকলের চেয়ে সুন্দর। রুরুকে সকলেই কেন এত সুন্দর বলে আর তাদের বলে না, এই জন্য রুরুর বড় ভাইয়েরা তাকে বড্ড হিংসা করত। ভাল ভাল কাপড়গুলো সব তারা ছ'জনায় পরে বেড়াত, রুরুকে পরতে দিত শুধু ছেঁড়া ন্যাকড়া। যত বিচ্ছিরি নোংরা কাজ, সব তারা রুরুকে দিয়ে করাত, আর নিজেরা বাবুগিরি করে বেড়াত। তবু সকল লোকে রুরুকেই বেশি ভালবাসত, বড় কটিকে কেউ দেখতে পারত না। তাতে তারা আরো চটে রুরুকে যখন তখন ধরে ঠ্যাঙাত। বেচারাকে এক দণ্ডও সুখে থাকতে দিত না।

রুরুদের গ্রাম থেকে ঢের দূরেররঙ্গা বলে একটি মেয়ে থাকত। এমন সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। তার কথা শুনেই রুরুর দাদারা বলল, 'চল্, আমরা সেই মেয়েকে দেখতে যাব। আমাদের মত সুন্দর ছেলে আর কোথায় আছে? আমাদের দেখলেই নিশ্চয় সেই মেয়ে আমাদের একজনকে বিয়ে করে ফেলবে।'

তখন ত তাদের খুবই আনন্দ আর উৎসাহ হল। ছ'জনের প্রত্যেকে ভাবল, 'ররঙ্গা নিশ্চয়ই আমাকেই বিয়ে করবে। কত গহনা এনে যে তারা তাদের ছ'টি পুঁটুলির ভিতরে পুরল, তার লেখাজোখা নেই। মস্ত বড় পানসি তাদের জন্য তয়ের হল। ছ'ভাই মিলে আজ

কতরকম করেই পোশাক পরেছে আর চুল আঁচড়েছে; একটু পরে পানসিতে চড়ে বউ আনতে যাবে।

তাদের মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, তোরা রুরুকে সঙ্গে নিবি না?' অমনি তারা ছ'জন একসঙ্গে বলল, 'নেব বইকি। নইলে আমাদের রান্না কে করবে? ররঙ্গাকে দেখতে যাবার সময় আমরা তাকে আমাদের বাসায় রেখে যাব। ও যে ছেঁড়া কাপড় পরে, ও আমাদের ভাই, এ কথা জানলে লোকে কি বলবে?'

রুরু সবই শুনল, কিন্তু কিচ্ছু বলল না। সেও তার দাদাদের সঙ্গে সেই পানসি চড়ে ররঙ্গাদের দেশে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানকার লোকেরা এর আগেই শুনতে পেয়েছিল যে, কয়েকটি খুব সুন্দর ছেলে তাদের দেশে বউ খুঁজতে যাচ্ছে। তারা সেই পানসি পৌঁছিবামাত্রই এসে রুরুর দাদাদের আদর করে তাদের গ্রামে নিয়ে গেল। সেখানে তারা বাড়ি ঘর সাজিয়ে মস্ত ভোজের আয়োজন আগেই করে রেখেছিল।

ছ'ভাই হাসতে হাসতে দুলতে দুলতে তাদের সঙ্গে চলে গেল। রুরুকে বলে গেল, 'আমাদের জন্য একটি বাসা ঠিক করে জিনিসপত্র তাতে নিয়ে রাখবি।'

তারপর তাদের খাওয়া দাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ খুবই হল। সেখানে অনেক মেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের কোনটি যে ররঙ্গা, ছ'ভাইয়ের কেউ তা বুঝতে পারল না। তাদের প্রত্যেকেই তার পাশের মেয়েটিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্‌টি ররঙ্গা?' সেই মেয়েদের প্রত্যেকে বলিল, আমিই ররঙ্গা কাউকে বোলো না।'

এ কথা শুনে ত আর ভাইদের আনন্দের সীমাই রইল না। অত সহজে ররঙ্গাকে পেয়ে যাবে, তা তারা মোটেই ভাবে নি। তারা তখনই সেই মেয়েগুলোর সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক করে ফেলল। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। সকলেই ভাবল, ররঙ্গাকে বিয়ে করেছে। ঠকেছে যে, সে কথা কারুরই মনে হল না।

রুরু বেচারা এত কথার কিচ্ছু জানে না, আর তার জানবার দরকারই বা কি? প্রথম দিন বাসা ঠিকঠাক করে সে কলসী হাতে জল আনতে বেরিয়েছিল। জল কোথায় আছে তা ত সে আর জানে না, তাই সে একটি ছোট্ট মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ গা, কোথায় জল পাব?' মেয়েটি বলল, 'ঐ যে ররঙ্গার বাড়ি, তারই পাশে ঝরনা আছে।'

রুরু সেই দিকে জল আনতে চলল। যেতে যেতে সে ভাবল, 'ররঙ্গা ত ভোজে গিয়েছে; এর মধ্যে আমি একটু উঁকি মেরে দেখে নিই না, তার বাড়িটি কেমন।' এই ভেবে সে আস্তে আস্তে সেই ঘরটির দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারল। উঁকি মেরে আর তার সেখান থেকে চলে আসবার কথা মনে রইল না। সে দেখল, ঘরের ভিতরে ররঙ্গা বসে আছে! নিশ্চয়ই সে ররঙ্গা নইলে এত সুন্দর আর কে হবে?

ররঙ্গা তাকে দেখেই ভারি খুশি হয়ে অমনি তাকে ডাকল, 'এসো, এসো, ঘরে এসো।' রুরু জড়সড় হয়ে ঘরে গেল। তখন ররঙ্গা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে? রুরু বলল, 'সেই যে ছ'জন লোক বউ খুঁজতে এসেছে, যাদের জন্য ভোজ হচ্ছে, আমি তাদের ছোট ভাই।' ররঙ্গা বলল, 'তুমি কেন তবে ভোজে যাও নি?' রুরু বলল, 'আমাকে তারা নিয়ে যায় নি, কাজ করবার জন্য বাসায় রেখে গেছে। আমার এর চেয়ে ভাল কাপড় নেই। এগুলো কাজ করতে করতে ময়লা হয়ে ছিঁড়ে গেছে।'

রুরুকে দেখেই ররঙ্গার যার পর নাই ভাল লেগেছিল, তার কথা শুনে তার বড়ই দুঃখ হল। সে বুঝতে পারল যে রুরুর দাদারা বড় দুষ্টু, তাকে কষ্ট দেয়। তখন রুরুকে তার আরো ভাল লাগল। দুদিন পরে তাদের বিয়েও হয়ে গেল।

তার পরদিন রুরুর দাদারা বউ নিয়ে ঘরে যাবে। রুরু যে তার আগেই ররঙ্গাকে নিয়ে নৌকার তলায় লুকিয়ে রেখেছে, সে কথা তাদের কেউ টের পায় নি। তারা ভারি ধুমধাম করে দেশে এল। তারপর বউ নিয়ে বাড়িতে পা দিয়েই সকলের বড় ভাই তাদের মাকে বলল, 'এই দেখ মা, ররঙ্গাকে বিয়ে করে এনেছি।' অমনি তার ছোটভাই তার চেয়ে বেশি করে চেঁচিয়ে বলল, 'না মা, ও মিছে কথা বলছে, আমি ররঙ্গাকে এনেছি।'

তখন ত ভারি মজা হল। সবাই বলছে, 'ওদের কথা মিথ্যে, আমি ররঙ্গাকে এনেছি।' ভয়ানক চটাচটি , মারামারি হয় হয়। বউ কটি থতমত খেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, তারা ভাবেনি যে অত সহজে ধরা পড়ে যাবে।

তখন মা বললেন, 'বাবা, ররঙ্গা ত ছটি নয়, আর এদের একটিও তেমন সুন্দরী নয়। তোমরা ঠকে এসেছ।' রুরু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, মার কথা শুনে সে বলল, 'ঠিক বলেছ মা, ঠকে এসেছে। আমার সঙ্গে এসো, আমি ররঙ্গাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

এ কথায় রুরুর দাদারা ত হেসেই গড়াগড়ি দিতে লাগল; কিন্তু মা বললেন, 'আচ্ছা গিয়েই দেখি না।' বলেই তিনি রুরুর সঙ্গে নৌকোয় এলেন, আর একটিবার ররঙ্গার মুখের দিকে চেয়েই তাকে কোলে নিয়ে আনন্দে নাচতে লাগলেন। সে খবর দেখতে দেখতে গ্রামময় ছেয়ে ফেলল। তখন পাড়ার ছেলে বুড়ো, গিন্নি বউ সকলে ছুটে এসে ররঙ্গাকে ঘিরে নাচতে লাগল।

এ-সব দেখে দাদারা চোখ লাল করে, দাঁত খিঁচিয়ে তাদের স্ত্রীদের বলল, 'বটে? ফাঁকি দিয়েছিস?' শুনে সকলে হো হো করে হাসল। তাদের মা বললেন, 'আর কেন বাছা? চুপ করো! তোমরা যেমন, তোমাদের তেমনি জুটেছে।'

কাজির বিচার

রামকানাই ভাল মানুষ—নেহাত গোবেচারা। কিন্তু ঝুটারাম লোকটি বেজায় ফন্দিবাজ। দুজনেই দেখা শোনা আলাপ-সালাপ হল। ঝুটারাম বললে, 'ভাই, দুজনেই বোঝা বয়ে খামকা কষ্ট পাই কেন? এই নাও, আমার পুঁটলিটাও তোমায় দিই—এখন তুমি সব বয়ে নাও—ফিরবার সময় আমি বইব।' রামকানাই ভালমানুষের মত দুজনের বোঝা ঘাড়ে বয়ে চলল।

গ্রামের কাছে এসে তাদের খুব খিদে পেয়েছে, রামকানাই বলল, 'এখন খাওয়া যাক—কী বল?' ঝুটারাম বলল, 'ভাই তোমার বাড়ি কে কে আছে?' রামকানাই তার বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, ছেলেপিলে সকলের কথা বলতে লাগল—তার মেয়ে কত বড় হয়েছে—তার ছেলে কি করে—সব কথা বলল। রামকানাই যত কথা বলে, ঝুটারাম ততই আরো প্রশ্ন করে, আর গপাগপ ভাত মুখে দেয়। রামকানাই গল্পেই মত্ত, তার যখন হুঁশ হল—

ততক্ষণে খাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—।

ঝুটারাম খাওয়া দাওয়া শেষ করে গম্ভীরভাবে হাতমুখ ধুয়ে বলল, 'ভাই একটি কথা। তুমি যে আমায় খাওয়ালে সে এমন বিশ্রী রান্না, যে কি বলব! তুমি এমন খারাপ লোক তা আমি জানতাম না, নেহাত তুমি বন্ধু লোক, তোমায় আর বেশি কি বলব; কিন্তু এরপর আর তোমার সঙ্গে আমার ভাব রাখা চলে না। আমি চললাম।' এই বলে সে ভরা হাঁড়ি কাঁধে নিয়ে হন হন করে চলে গেল। রামকানাই বেচারার পেটও ভরে নি—ঝুটারামের ভাগ থেকে যে খাবার আশা ছিল তাও গেল। সন্ধ্যার সময় পেটে খিদে নিয়ে এতখানি পথ হেঁটে কি করে সে বাড়ি ফিরবে—তাই ভেবে কাঁদতে লাগল।

এমন সময় কাজির পেয়াদা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে রামকানাইকে বললে, 'কাঁদ কেন?' রামকানাই তাকে সব কথা বলল। পেয়াদা বলল, 'এই কথা। চলো দেখি, কাজি সাহেবের কাছে। তিনি এর বিচার করবেন।' কাজির কাছে হাজির হতেই হুজুর বলেন, 'কী চাও?' রামকানাই তাঁকেও সব শোনাল। কাজি শুনে বললেন, 'হাঃ-হাঃ-হাঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ এমন মজা ত কখনো শুনি নি! আরে, তোকে দিয়ে জিনিস বইয়ে আবার তোরই ভাত খেয়ে গেল? তোর আক্কেল ছিল কোথায়?' 'হাঃ-হাঃ-হাঃ—বোলাও ঝুটারামকো!' পেয়াদা ছুটল, লোকলস্কর সবাই ছুটল- তিন মিনিটের মধ্যে ঝুটারামের ঝুঁটি ধরে কাজির সামনে দাঁড় করাল।

কাজি বললেন, 'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও! গাঁয়ের মোড়লকে ডাকো, শেঠজীকে ডাকো, কোটাল বদ্যি ওকমশাই—ঢাক পিটিয়ে সবাইকে ডাকো, এমন মজার কথাটা সবাই এসে শুনে যাক।' দেখতে দেখতে ঘর ভরিয়ে ভিড় জমিয়ে লোকের দল হাজির হল। তখন কাজি বললেন, 'বাবা ঝুটারাম, এবার তুমি বলো দেখি, তোমাতে আর এঁতে কি হয়েছিল?' ঝুটারাম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'দোহাই হুজুর, আমি কিছু জানি না। ঐ হতভাগা আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে খানিকটা খাবার খাইয়েছিল—সেই থেকে আমার মাথা ঘুরছে আর কেমন করছে।'

এই কথা শুনে রেগে চিৎকার করে কাজি বললেন, 'পাজি, আমার মজার গল্পটা মাটি করলি। খাবার খেলি আর মাথা ঘুরল, এ কি একটা কথা হল? পেয়াদা, দেখ ত ওর কাছে কি আছে। সব কেড়ে রাখ। ব্যাটার গল্পের মধ্যে যদি একটু রস থাকে ও-সব ঐ রামকানাইকে দিয়ে দে। ও যা বলছে, সত্যি হোক, মিথ্যা হোক, তার মধ্যে মজা আছে। আরে —'হাঃ-হাঃ-হাঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ।

সাতমার পালোয়ান

এক রাজার দেশে এক কুমার ছিল; তার নাম ছিল কানাই। কানাই কিছু একটা গড়িতে গেলেই তাহা বাঁকা হইয়া যাইত কাজেই তাহা কেহ কিনিত না। কিন্তু তাহার স্ত্রী খুব সুন্দর হাঁড়ি কলসী গড়িতে পারিত। ইহাতে কানাইয়ের বেশ সুবিধা হইবারই কথা ছিল। সে সকল মেহন্নত তাহার স্ত্রীর ঘাড়ে ফেলিয়া সুখে বেড়িয়া বেড়াইতে পারিত। কিন্তু তাহার স্ত্রী বড়ই

রাগী ছিল, কানাইকে আলস্য করিতে দেখিলেই সে ঝাঁটা লইয়া আসিত। সুতরাং মোটের উপর বেচারার কষ্টই ছিল বলিতে হইবে।

একদিন কানাইয়ের স্ত্রী কতকগুলি হাঁড়ি রোদে দিয়া বলিল, 'দেখ যেন কিছুতে মাড়ায় না।'

কানাই কিছু চিঁড়ে আর ঝোলাগুড় এবং একটা লাঠি লইয়া হাঁড়ি পাহারা দিতে বসিল। এক-একবার চিঁড়ে খায় আর এক-একবার হাঁড়ির পানে তাকাইয়া দেখে, কিছুতে মাড়াইল কিনা।

কানাইয়ের ঝোলাগুড়ের খানিকটা কেমন করিয়া হাঁড়ির উপর পড়িয়াছিল, অনেকগুলি মাছি আসিয়া তাহা খাইতে বসিয়া গেল। কানাই তাহা দেখিয়া বলিল, 'বটে! হাঁড়ি মাড়াচ্ছ? আচ্ছা, রোসো!' এই বলিয়া সে তাহার লাঠি দিয়া মাছিগুলোকে এমনি এক ঘা লাগাইল যে তাহাতে মাছিও মরিয়া গেল, হাঁড়িও গুঁড়া হইয়া গেল।

কানাই গনিয়া দেখিল যে, সাতটা মাছি মারিয়াছে। তাহাতে সে লাঠি বগলে করিয়া ভারি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। হাঁড়ি ভাঙাব শব্দ শুনিয়া তাহার স্ত্রী ঝাঁটা হাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কি হয়েছে?' কানাই কথা কয় না। তাহার স্ত্রী যতই জিজ্ঞাসা করে, সে খালি আরো গম্ভীর হইয়া যায়।

শেষটা যখন তাহার স্ত্রী বাড়াবাড়ি করিল, তখন সে চোখ লাল কবিয়া বলিল, 'দেখ, হিসেব করে কথা কোস। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস?'

শেষে একদিন কানাই এক থান মার্কিন দিয়া মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধিল। বনের ভিতর হইতে বাঁশ কাটিয়া একটা ভয়ানক মোটা লাঠি তয়ের করিল। তাবপব পিবান গায়ে দিয়া কোমর বাঁধিয়া, ঢাল হাতে করিয়া, জুতা পায় দিয়া, রাজাব বাড়িতে পালোয়ানগিরি করিতে চলিল। যাইবার সময় তাহার স্ত্রীকে বলিয়া গেল—'আমি তোদের এখানে থাকব না। আমি এক ঘায় সাতটা মারতে পারি।'

পথের লোক জিজ্ঞাসা করে, 'কানাই, কোথায় যাও?' কানাই সে কথার কোন উত্তর দেয় না। সে মনে করিয়াছে যে এখন হইতে আর কানাই বলিযা ডাকিলে উত্তর দিবে না। সে এক ঘায় সাতটা মারিয়া ফেলিয়াছে! এখন কি আর তাহাকে কানাই ডাকা সাজে? এখন তাহাকে বলিতে হইবে, 'সাতমার পালোয়ান।'

রাজার নিকট গিয়া কানাই জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহার সেই এক থান মার্কিনের পাগড়ি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি হে?' কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমার নাম সাতমার পালোয়ান। আমি এক ঘায় সাতটাকে মারতে পারি।'

কানাই রাজার বাড়িতে পালোয়ান নিযুক্ত হইল। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। এখন তার দিন সুখেই যায়।

ইহার মধ্যে একদিন সেই রাজার দেশে এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত। সে মানুষ মারিয়া, গরু বাছুর খাইয়া, দৌরাত্ম্য করিয়া দেশ ছারখার করিবার জোগাড় করিল। যত শিকারী তাহাকে মারিতে গেল, সব কটাকে সে জলযোগ করিয়া ফেলিল। রাজামহাশয় অবধি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'দেশ আর থাকে না।'

এমন সময় কোথাকার এক দুষ্ট লোক আসিয়া রাজার কানে কানে বলিল, 'রাজামহাশয়,

এত যে ভাবছেন, তবে পঞ্চাশটাকা দিয়ে পালোয়ান রেখেছেন কি করতে? তাকে ডেকে বাঘ মেরে দিতে হুকুম করুন না।'

রাজা বলিলেন, 'আরে তাই ত? ডাক্ পালোয়ানকে!'

রাজার তলব পাইয়া কানাই আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইলে রাজা বলিলেন, 'সাতমার পালোয়ান, তোমাকে ঐ বাঘ মেরে দিতে হবে। নইলে তোমার মাথা কাটব।'

কানাই লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, 'বহুত আচ্ছা মহারাজ, এখনি যাচ্ছি।'

ঘরে আসিয়া কানাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হায়, হায়! এমন সুখের চাকরিটা আর রহিল না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝি প্রাণটাও যায়! কানাই বলিল, 'এখন আর কি? বাঘ মারতে গেলে বাঘে খাবে, না গেলে রাজা মারবে। দূর হোক গে, আমি আর এদেশে থাকব না।'

সেদিন সন্ধ্যার পর কানাই তাহার পাগড়িটা মাথায় জড়াইল, কোমরটা আঁটিয়া বাঁধিল। এক হাতে ঢাল আর-এক হাতে ডাণ্ডা, পিঠে পুঁটুলি, পায়ে নাগরা জুতো। সকলে মনে করিল, সাতমার পালোয়ান বাঘ মারিতে চলিয়াছে। কানাই মনে করিল, এ রাজার দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই ভাল। একটা ঘোড়া হইলে আরো শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া যাইত।

ততক্ষণে বাঘ করিয়াছে কি—এক বুড়ির ঘরের পিছনে চুপ মারিয়া বসিয়া আছে। ইচ্ছাটা, বুড়ি কিংবা তাহার নাতনী একটিবার বাহিরে আসিলেই ধরিয়া খাইবে। বুড়ি ঘরের ভিতরে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছে। তাহার বাহিরে আসিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। এতক্ষণে যে কখন ঘুমাইয়া পড়িত, খালি নাতনীটার জ্বালায় পারিতেছে না। বুড়ি অনেক চেষ্টা করিযাছে, কিন্তু তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পারে নাই। শেষে রাগিয়া বলল, 'তোকে বাঘে ধরে নেবে।' নাতনী বলিল, 'আমি বাঘে ভয় করি না।' বুড়ি বলিল, 'তবে তোকে ট্যাঁপায় নেবে।'

বাস্তবিক ট্যাঁপা বলিতে একটা কিছু নাই, বুডি তাহার নাতনীকে ভয় দেখাইবার জন্যই ঐ নামটা তয়ের করিয়াছিল। কিন্তু বাঘ ঘরের পিছন হইতে ট্যাঁপার নাম শুনিয়া ভারি ভয় পাইয়া গেল! সে মনে বলিল, 'বাস রে! আমাকে ভয় করে না, কিন্তু ট্যাঁপাকে ভয় করবে! সেটা না জানি তবে কেমন ভয়ঙ্কর জানোয়ার। যদি একবার সেই জানোয়ারটা এই দিক দিয়ে আসে, তা হলেই ত মুশকিল দেখছি।"

অন্ধকারে বসিয়া বাঘ এইরূপ ভাবিতেছে, আর ঠিক এমনি সময় কানাই সেই পথে পলায়ন করিতেছে। বাঘকে দেখিয়া কানাই মনে মনে ভাবিল, 'বাঃ, এই ত একটা ঘোড়া বসে আছে!' এই বলিয়াই সে কোমরের কাপড়টা খুলিয়া বাঘের গলায় বাঁধিল।

অন্ধকারে বাঘকে কানাই ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। বাঘও কানাইকে তাহার পাগড়ি-টাগড়ি সুদ্ধ একটা নিতান্তই অদ্ভুত জন্তুর মতন দেখিল। একটা মানুষ হঠাৎ আসিয়া যে তার মতন জন্তুর সামনে এতটা বেয়াদবি করিয়া বসিবে, এ কথা তাহার মাথায় ঢুকে নাই। সে বেচারা নেহাত ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল—'এই রে, মাটি করেছে আমাকে ট্যাঁপায় ধরেছে!'

কানাই ভাবিল, 'ঘোড়া যখন পেয়েছি, তখন আর তাড়াতাড়ি কিসের? ঘরে একটু ঘুমুই, তারপর শেষরাত্রে ঘোড়ায় চড়ে ছুট দেব।' এই ভাবিয়া সে বাঘকে তাহার বাড়ির পানে

টানিয়া লইয়া চলিল। বাঘ বেচারা আর কি করে! সে মনে করিল, 'এখন ট্যাপার হাতে পড়েছি, এর কথামতনই চলতে হবে।'

বাড়ি আসিয়া কানাই বাঘকে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া দরজা আঁটিয়া দিল। তারপর বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, 'শেষ রাত্রেই উঠে পালাব।'

কানাইয়ের ঘুম ভাঙিতে ভাঙিতে ফরসা হইয়া গেল। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘোড়া আনিতে গিয়া দেখে—সর্বনাশ! বাঘ যে ঘরে বন্ধ আছে! বাহিরে আসিয়া তাহাকে খাইতে পারিবে না, সে কথা তখন তাহার মনেই হইল না। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া দরজায় হুড়কা আঁটিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এদিকে সকালবেলা সকলে সাতমার পালোয়ানের বাড়িতে খবর লইতে আসিয়াছে, বাঘ মারা হইল কিনা। তাহারা আসিয়া দেখিল যে, বাঘ ঘরে বাঁধা রহিয়াছে। তখন সকলে ছুটিয়া গিয়া রাজাকে বলিল, 'রাজামশাই, দেখুন এসে, সাতমার পালোয়ান বাঘকে ধরে এনে ঘরে বেঁধে রেখেছে!'

রাজামহাশয় আশ্চর্য হইয়া সাতমার পালোয়ানের বাড়ি চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে সত্যই বাঘ ঘরে বাঁধা। ততক্ষণে কানাই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আসিয়া রাজামহাশয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজা বলিলেন, 'সাতমার, ওটাকে মার নি কেন?'

কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমি এক ঘায় সাতটাকে মারি, ও যে শুধু একটা।'

এখন হইতে সাতমার পালোয়ানের নাম দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল। রাজামহাশয় যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মাইনে পাঁচশত টাকা করিয়া দিলেন। কানাইয়ের দিন খুব সুখেই কাটিতে লাগিল।

কিন্তু সুখের দিন কি চিরকাল থাকে? দেখিতে দেখিতে কানাইয়ের আর-এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

এবারে বাঘ নয়, আর-একটা রাজা। সে অনেক হাজার সৈন্য লইয়া এই রাজার দেশ লুটিতে আসিয়াছে। এ রাজাটা নাকি বড়ই ভয়ানক লোক, তাহার সঙ্গে কিছুতেই আঁটা যায় না।

রাজামহাশয় বলিলেন, 'সাতমার, এখন উপায়? তুমি না বাঁচালে আমার আর রক্ষে নেই। তোমাকে আমার অর্ধেক রাজ্য দেব, যদি এবার বাঁচিয়ে দিতে পার।'

কানাই বলিল, 'রাজামশাই, কোন চিন্তা করবেন না, এই আমি যাচ্ছি! আমাকে একটা ভাল ঘোড়া দিন।'

রাজার হুকুমে সরকারি আস্তাবলের সকলের চাইতে ভাল যুদ্ধের ঘোড়াটি আনিয়া কানাইকে দেওয়া হইল।

কানাই আজ দুই থান মার্কিন দিয়া পাগড়ি বাঁধিল। পোশাকটাও দস্তুর মতন করিল। মনে মনে কিন্তু তাহার মতলব এই যে, যুদ্ধে যাইবার ভান করিয়া একবার ঘোড়ার পিঠে চড়িতে পারিলেই পলায়নের সুবিধা হয়।

কিন্তু হায়, সেটা যে যুদ্ধের ঘোড়া কানাই তাহা জানিত না। সে বেচারা যতই ঘোড়াটাকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে চায়, ঘোড়া কিছুতে রাজি হয় না। যুদ্ধের বাজনা শুনিয়া ঘোড়া তখন নাচিতে লাগিল, কানাইয়ের তখন পিঠে টিকিয়া থাকা ভার হইল। শেষে ঘোড়া তাহার

কোন কথা না শুনিয়া একেবারে যুদ্ধের জায়গায় গিয়া উপস্থিত। পথে কানাই লতাপাতা গাছপালা খড়ের গাদা যাহা কিছু পাইয়াছে, তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই সেই ঘোড়া থামিল না। সেই গাছপালা আর খড়ের গাদা সবশুদ্ধই সে কানাইকে লইয়া ছুটিল।

এদিকে সেই বিদেশী রাজার সৈন্যেরা শুনিতে পাইয়াছে যে এদেশে একটা সাতমার পালোয়ান আছে, সে এক ঘায় সাতটাকে মারে— বাঘকে ধরিয়া আনিয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখে! এ কথা শুনিয়াই তাহারা বলাবলি করিতেছে, 'ভাই, ওটা আসিলে আর যুদ্ধ-টুদ্ধ করা হইবে না। বাপরে, এক ঘায় সাতটাকে মারিবে।'

এমন সময় সাতমারের ঘোড়া সেই দুই থান মার্কিনের পাগড়ি আর সেইসব গাছপালা আর খড়ের গাদা সুদ্ধ সাতমারকে লইয়া আসিয়া দেখা দিল! দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল, যেন একটা পাহাড় পর্বত ছুটিয়া আসিতেছে। বিদেশী রাজার সৈন্যেরা তাহা একবার দেখিয়া আর দুবার দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না। একজন যেই চেঁচাইয়া বলিল, 'ঐ রে আসছে। এবারে গাছ পাথর ছুঁড়ে মারবে।' অমনি মুহূর্তের মধ্যে সেই হাজার হাজার সৈন্য চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে কোথায় ছুটিয়া পলাইল তাহার ঠিকানা নাই।

কানাই দেখিল যে, বিদেশী সৈন্য সব পলাইয়াছে, খালি তাহাদের রাজাটা ছুটিতে পারে নাই বলিয়া ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কানাই মনে মনে ভাবিল, 'এ ত মন্দ নয়! পালাতে চেয়েছিলুম, মাঝখান থেকে কেমন করে যুদ্ধ জিতে গেলুম! এখন রাজাটাকে বেঁধে নিলেই হয়।'

আর কি! এখন ত সাতমার পালোয়ানের জয়জয়কার! অর্ধেক রাজ্য পাইয়া এখন সে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

কুঁজো আর ভূত

কানাই বলে একটি লোক ছিল, তার পিঠে ছিল ভয়ংকর একটা কুঁজ। বেচারা বড্ড ভালমানুষ ছিল, লোকের অসুখ-বিসুখে ওষুধপত্র দিয়ে তাদের কত উপকার করত। কিন্তু কুঁজো বলে তাকে কেউ ভালবাসত না।

কানাইয়ের ঝুড়ির দোকান ছিল; আর কোনো ঝুড়িওয়ালা তার মত ঝুড়ি বুনতে পারত না। তারা তাকে ভারি হিংসা করত, আর তার নামে যা-তা বলে বেড়াত। তা শুনে লোকে ভাবত কানাই বড় দুষ্টু লোক, তাকে দেখতে পেলে সকলে মুখ ফিরিয়ে থাকত। বেচারার দুঃখের সীমাই ছিল না।

এত বড় কুঁজ নিয়ে মাথা গুঁজে চলতে কানাইয়ের বড়ই কষ্ট হত। একদিন সে একটু দূরে এক জায়গায় ঝুড়ি বেচতে গেল, আর দিন থাকতে ঘরে ফিরতে পারল না। পথে একটা পুরনো বাড়ির কাছে এসে এমনি অন্ধকার হল, আর তার এতই কাহিল বোধ হল যে, আর চলা অসম্ভব। সে জায়গাটা ভারি বিশ্রী; লোকে প্রাণান্তেও সে পথে আসতে চায় না, বলে, ওটা ভূতের বাড়ি। কিন্তু কানাইয়ের বড্ডই পরিশ্রম হয়েছে, চলবার আর সাধ্য নেই! কাজেই

সে সেখানে পথের পাশে একটু না বসে আর কি করে?

কতক্ষণ সে এভাবে বসে ছিল তার কিছু ঠিক নেই। বসে থাকতে থাকতে তার মনে হল যেন সেই পুরনো বাড়িটার ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে। অনেকগুলো গলা মিলে, আহা, কি সুন্দর সুরেই গাইছে। শুনে কানাইয়ের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সে অবাক হয়ে খালি শুনতেই লাগল। গানের সুরটি অতি আশ্চর্য কিন্তু কথা খালি এইটুকু

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হিং হ্যায়!'

শুনতে শুনতে কানাই একেবারে মেতে গেল, সে ভাবল যে তারও গানটা না গাইলেই চলছে না। কাজেই সেও খুব করে গলা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ধরল

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হিং হ্যায়।

এইটুকু গেয়েই ঝাঁ করে তার বুদ্ধি খুলে গেল, সে আরো উঁচু সুরে গাইল ঃ লসুন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুঁটকি হ্যায়।'

কানাই এই কথাগুলো খুব গলা ছেড়েই গেয়েছিল—সে গলার আওয়াজ যে সেই বাড়ির ভিতরের গাইয়েদের কানে গিয়ে পৌঁছিয়েছিল, তাতে আর কোন ভুল নেই। সে গাইয়েগুলো ছিল অবশ্য ভূত। তারা সেই নূতন কথাগুলো শুনে এতই খুশি হইল যে, তখনই ছুটে কানাইয়ের কাছে না এসে আর থাকতে পারল না। তারা এসে কানাইকে কোলে করে নাচতে নাচতে সেই বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল, আর আদরটা যে করল! মিঠাই যে তাকে কত খাওয়াল, তার অন্ত নেই। তারপর সকলে মিলে নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল ঃ

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হিং হ্যায়।
লসুন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুঁটকি হ্যায়।'

কানাইকেও তাদের সঙ্গে নেচে নেচে গানটি গাইতে হল। তখন হঠাৎ তার মনে হল, কি আশ্চর্য, আমি কুঁজ নিয়ে চলতে পারি না, আমি আবার নাচলুম কি করে?' বলতে বলতেই তার হাতখানি পিঠের দিকে গেল—এ কি? তার সে কুঁজ যে আর নেই! একজন ভূত বলল, 'কি, দেখছিস বাপ? ওটা আর ওখানে নেই, ঐ দেখ, তোর পাশে পড়ে আছে!'

সত্যি সত্যি সে কুঁজ আর কানাইয়ের পিঠে ছিল না, সেটা তার পাশে পড়ে ছিল। আহা! কানাইয়ের তখন কি আনন্দই হল! হালকা আর আরাম বোধ হল এমনি, যে সে তখনই সেইখানে মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তারপর যখন পরদিন সকালে তার ঘুম ভাঙল, তখন সে দেখল যে সেই বাড়ির বাইরে রাস্তার ধারে শুয়ে আছে; ভূতেরা তাকে একটি চমৎকার নতুন পোশাক পরিয়ে সেখানে এনে রেখে গিয়েছে। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠে, মনের সুখে বাড়ি চলে এল। সেখানকার লোকেরা তার মুখের পানে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়, কেউ তাকে চিনতে পারে না। সে যে তাদের সেই কুঁজো কানাই, ভূতেরা তার কুঁজ ফেলে তার এমনি সুন্দর চেহারা করে দিয়েছে, এ কথা তাদের বোঝাতে তার অনেকক্ষণ লেগেছিল।

তারপর দেখতে দেখতে কানাইয়ের কুঁজের গল্প দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। যে শুনল, সেই ভাবল যে, এমন আশ্চর্য কথা আর কখনো শোনে নি। এখন আর লোকে তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে থাকে না; তাহা হাসতে হাসতে ছুটে এসে তার সঙ্গে কথা কয়, আর বাড়ির লোককে তার এই আশ্চর্য খবর শোনাবার জন্য তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। কত লোকে

শুধু সেই গল্প শোনবার জন্যই তার ঝুড়ি কিনতে আসে। ঝুড়ি বেচে সে বড়লোক হয়ে গেল।

এমনি করে দিন যাচ্ছে। তারপর একদিন কানাই তার ঘরের দাওয়ায় বসে ঝুড়ি বুনছে, এমন সময় একটি বুড়ি সেই পথে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁগা, কেবলহাটি যাব কোন্ পথে?' কানাই বললে, 'এই ত কেবলহাটি, তুমি কি চাও?' বুড়ি বলল, 'তোমাদের গ্রামে নাকি কানাই বলে কে আছে, ভূতেরা তার কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। তার মন্তরটা তার কাছে থেকে শিখে নিতে পারলে আমাদের মানিকের কুঁজটাও সারিয়ে নিতুম।'

কানাই বলল, আমিই ত সেই কানাই, ভূতেরা আমারই কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। এর ত মন্তর-টন্তর কিছু নেই, তারা রাত জেগে গাইছিল, আমি পথের ধারে শুয়ে শুয়ে তাদের গানে নতুন কথা জুড়ে দিয়েছিলাম, তাইতে তারা খুশি হয়ে আমার কুঁজ সারিয়ে, নতুন পোশাক পরিয়ে দিয়েছিল।' বুড়ি তখন খুঁটে খুঁটে সব কথা কানাইয়ের কাছে থেকে জেনে নিয়ে তাকে অনেক আশীর্বাদ করে সেখান থেকে চলে গেল।

সেই বুড়ির ছেলে যে মানিক, তার পিঠে ছিল কানাইয়ের কুঁজের চেয়েও ঢের বড় একটা কুঁজ। লোকটা এমনি দুষ্টু আর হিংসুটে ছিল যে পাড়ার লোকে তার জ্বালায় অস্থির থাকত। সেই মানিকের কুঁজ সারাবার জন্য তার বাড়ির লোকেরা একদিন রাত্রে তাকে গাড়ি করে এনে ভূতের বাড়ির কাছে রেখে গেল। সেখানে পড়ে পড়ে মানিক ভাবছে ভূতেরা কখন গান ধরবে, আর তাতে সে কথা জুড়ে দেবে, আর তার কুঁজ সেরে যাবে। তারপর যেই ভূতেরা বলেছে 'নুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইমলী হ্যায়,' অমনি মানিক আর তাদের শেষ করতে না দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'গুরুচরণ ময়রার দোকানের কাঁচাগোল্লা হ্যায়।'

তখন গানের তাল ভেঙে ত গেলই, কাঁচাগোল্লার নাম শুনে অনেক ভূতের বমি পর্যন্ত হতে লাগল। ভূতেরা এ-সব জিনিসকে বড্ড ঘৃণা করে, এর নাম অবধি শুনতে পারে না। কাজেই তারা তাতে বেজায় চটে দাঁত খিঁচুতে খিঁচুতে এসে বলল, 'কে রে তুই, অসভ্য বেতালা বেটা, আমাদের গান মাটি করে দিলি? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি!' এই বলে তারা কানাইয়ের সেই কুঁজটা এনে মানিকের কুঁজের উপরে বসিয়ে এমনি করে জুড়ে দিল যে আর কিছুতেই তাকে তুলবার জো নেই।

পরদিন মানিকের বাড়ির লোকেরা এসে তাকে দেখে অবশ্য খুবই আশ্চর্য আর দুঃখিত হল কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলল, 'বেটা যেমন দুষ্টু, তেমনি সাজা হয়েছে।'

জাপানী দেবতা

জাপান দেশে 'কোজিকী' বলে একখানা পুরনো পুঁথি আছে। তাতে লেখা আছে যে, পৃথিবীটা যখন হয়েছিল তখন সেটা তেলের মত পাতলা ছিল, আর ফেনার মত সমুদ্রে ভেসে বেড়াত।

তখন নাকি মোটে তিনটি দেবতা ছিলেন। এই তিনটি মরে গেলে আর দুটি হলেন; তাঁরা মরে গেলে আর দুটি—তাঁরা মারা গেলে আবার দশটি দেবতা হলেন।

এই দশটি দেবতার একজন ছিলেন 'ইজানাগী'; তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল 'ইজানামী'।

অন্য দেবতারা এঁদের দুজনের হাতে একটা শূল দিয়ে বললেন, 'তোমরা এই তেলের মতন জিনিসটা থেকে পৃথিবী তয়ের করো।'

ইজানাগী আর ইজানামী বললেন, 'আচ্ছা।' বলে তাঁরা সেই শূল দিয়ে সমুদ্রটাকে ঘাঁটিতে লাগলেন। তারপর যখন শূল তুললেন, তখন তার মুখ বেয়ে যে জল পড়েছিল, তাই থেকে একটা দ্বীপ হল, তার নাম 'ওনগরো'। এই ওনগরো দ্বীপে একটি সুন্দর বাড়ি তয়ের করে, তার ভিতরে ইজানাগী আর ইজানামী বাস করতে লাগলেন। সেইখান থেকেই তাঁরা জাপান দেশটাকে গড়েছিলেন। এই দেশকে আমরা বলি 'জাপান', কিন্তু সে দেশের লোকেরা বলে 'নিপ্পান্' বা 'দাই-নিপ্পন্'।

ইজানাগী আর ইজানামীর অনেক ছেলেমেয়ে। তার মধ্যে 'আগুন-দেবতা' একজন। এই দেবতার জন্মের সময় ইজানামী মরে গেলেন। তখন মনের দুঃখে ইজানাগী চোখের জল ফেলতে লাগলেন, আর সেই চোখের জল থেকে 'কান্না-পরীর' জন্ম হল। কাঁদতে কাঁদতে শেষে ইজানাগীর রাগ হল। তখন তিনি তলোয়ার দিয়ে আগুন-দেবতার মাথা কেটে ফেললেন, তাতে সেই কাটা দেবতার শরীর আর রক্ত হতে ষোলটা দেবতা উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু ইজানাগীর মনের দুঃখ তাতেও ঘুচল না। শেষে তিনি ইজানামীকে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পাতালে উপস্থিত হলেন—সেই যেখানে মৃত্যুর পরে সকলকেই যেতে হয়। পাতালের ভিতর মস্ত পুরী আছে, সেই পুরীর দরজায় গিয়ে ইজানামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ইজানামী তাঁকে বললেন, 'একটু দাঁড়াও আমি জিজ্ঞাসা করে আসি, তারপর তোমার সঙ্গে যাব।' এই বলে ইজানামী ভিতরে গেলেন। ইজানাগী খানিক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শেষে ইজানামীর দেরি দেখে তিনিও ভিতরে গেলেন। ভিতরে যেতেই এমনি ভয়ানক গন্ধ এসে তাঁর নাকে লাগল যে কি বলব। এমন ভয়ংকর নোংরা জায়গার কথা কেউ ভাবতেও পারে না; আর সেখানে থেকে থেকে ইজানামীও এমন নোংরা হয়ে গিয়েছেন যে, তাঁর কাছে যাবার সাধ্য নাই। এ-সব দেখে ইজানাগী নাকে হাত দিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালালেন। পেয়াদাগুলো তাঁকে পালাতে দেখে 'ধর ধর' বলে তাড়া করেছিল, কিন্তু ধরতে পারে নি।

কি বিষম গন্ধই সে জায়গার ছিল; দেশে ফিরেও ইজানাগীর গা থেকে সে গন্ধ গেল না। গন্ধে অস্থির হয়ে তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। সেই সময়ে তাঁর কাপড় আর গা থেকে অনেকগুলি দেবতা বেরিয়েছিলেন।

এঁদের মধ্যে একটি মেয়ে ইজানাগীর বাম চোখ দিয়ে বেরিয়েছিলেন, সেটি এমন সুন্দর যে, তেমন আর কেউ কখনো দেখে নি। সেই মেয়েটির নাম 'গগন-আলো', তিনি সূর্যের দেবতা।

ইজানাগীর ডান চোখ দিয়ে আর একটি সুন্দর দেবতা বেরিয়েছিলেন, সেটির নাম 'তেজবীর'।

তখন ইজানাগী তাঁর নিজের গলার হার গগন-আলোর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মা, তুমি হলে স্বর্গের রাণী।'

চন্দ্রপতিকে তিনি বললেন, তুমি হলে রাত্রির রাজা।' আর তেজবীরকে বললেন, 'তুমি হলে সমুদ্রের রাজা।' তখন গগন-আলো গিয়ে স্বর্গের রাণী হলেন, চন্দ্রপতি গিয়ে রাত্রির

রাজা হলেন। কিন্তু তেজবীর সেইখানে বসেই কাঁদতে লাগলেন। দিন নাই, রাত নাই, কেবলই গালে হাত দিয়ে কান্না। তাঁর দাড়ি লম্বা হয়ে ভুঁড়িতে গিয়ে ঠেকল, তবুও তাঁর কান্না থামল না।

ইজানাগী বললেন, 'আরে তোর হল কি? রাজ্য দিলাম, রাজ্যে গেলি না, খালি যে কাঁদছিস্?'

তেজবীর বললেন, 'আমি রাজ্য চাই না। আমি সেই পাতালে আমার মার কাছে যাব।'

ইজানাগী বললেন, 'তবে যা বেটা তুই এখান থেকে দূর হয়ে।' বলে তিনি তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন।

তখন তেজবীর স্বর্গে গিয়ে গগন-আলোর কাছে উপস্থিত হলেন। গগন-আলো জানতেন, তাঁর মন ভাল নয়, কাজেই তিনি তাঁকে দেখে ভাবলেন, 'না-জানি কে এসেছে।'

তেজবীর কিন্তু বললেন, 'বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই মার কাছে চলেছি। যাবার আগে তোমাকে দেখতে এলাম।'

গগন আলো বললে, 'তাই যদি হয়, তাবে তোমার তলোয়ারখানা দাও ত।'

তেজবীরের কাছ থেকে তলোয়ার নিয়ে গগন-আলো সেটাকে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন। সেই গুঁড়ো থেকে তিনটি দেবতা জন্মাল।

তখন তেজবীর বললেন, 'আচ্ছা, এখন তোমার গহনাগুলি দাও ত।' গহনা নিয়ে তিনি চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন, আর সেই গুড়ো থেকে পাঁচটি দেবতা হল।

এখন, এই যে সব দেবতা হল, এরা কার? গগন-আলো বললেন, 'তোমার তলোয়ার থেকে যারা হয়েছে, তারা তোমার, আর আমার গহনা থেকে যারা হয়েছে, তারা আমার।'

কথাটা ত বেশ ভালোই হয়েছিল, কিন্তু হলে কি হয়, গগন-আলো গহনা থেকেই যে বেশি দেবতা হয়েছিল কাজেই সে কথা তেজবীরের পছন্দ হল না। তাতে তিনি বিষম চটে গিয়ে গগন-আলোর ক্ষেত মাড়িয়ে, খাল বুঁজিয়ে, বাগান ভেঙে, বিষম দৌরাত্মি্য আরম্ভ করলেন।

পর্বতের গুহার ভিতরে নিজের ঘরে বসে সখীদের নিয়ে গগন-আলো কাপড় বুনছিলেন, সেই ঘরের ছাত ভেঙে তেজবীর ভিতরে ছাল-ছাড়ানো মরা ঘোড়া ফেলে দিলেন।

কাজেই তখন আর গগন-আলো কি করেন, তিনি তেজবীরের ভয়ে গুহার দরজা বন্ধ করে দিলেন। এখন, তিনিই হলেন সূর্যের দেবতা, আলোর মালিক, সেই আলোর মালিক যখন গুহায় লুকাতে গেলেন, তখন কাজেই জগৎ-সংসার অন্ধকার হয়ে গেল।

সকলে বলল, 'সর্বনাশ! এখন উপায়?' তখন তারা করল কি, তারা সবাই মিলে অনেক যুক্তি করে একখানা চমৎকার আরশি তয়ের করল আর যার পর নাই সুন্দর একছড়া মণির মালা গড়াল, আরো কত কি জিনিস খুঁজে নিয়ে এল। সেই-সব জিনিস আর সেই আরশি আর সেই মালা দিয়ে গগন-আলোর পূজা করে, তারপর তারা হেসে, গেয়ে, নেচে, লাফিয়ে চেঁচিয়ে, মোরগ ডাকিয়ে, কি যে একটা শোরগোল জুড়ে দিল, তা না শুনলে বোঝা যায় না।

গুহার ভিতর থিকে সেই গোলমাল শুনে গগন-আলো ভাবলেন, 'না জানি কি হয়েছে।' তিনি আস্তে আস্তে গুহার দরজা একটু ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে তোরা কিসের

এত গোলমাল করছিস?'

তারা বলল, 'গোলমাল করব না? দেখো এসে, তোমার চেয়ে কত সুন্দর একটি মেয়ে পেয়েছি!' বলেই সেই আরশিখানা এনে তাঁর সামনে ধরল।

সেই আরশির ভিতরে নিজের সুন্দর মুখখানি দেখে আর সূর্যের দেবতা লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি তখনি ছুটে বেরিয়ে এলেন — আর অমনি সকলে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল।

তখন আবার সূর্য উঠল, আবার আলো হল, আবার সংসারে সুখ এল। তারপর সবাই মিলে সেই দুষ্ট তেজবীরকে দূর করে তাড়িয়ে দিল।

সেখান থেকে তাড়া খেয়ে, তেজবীর ঘুরতে ঘুরতে হী নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন, সেখান দুটি বুড়োবুড়ি একটি ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে বসে কাঁদছিল, তাদেব দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?'

বুড়োটি বলল, 'বাবা, আমার দুঃখের কথা শুনে কি করবে? আমার আটটি মেয়ে ছিল, তার সাতটি অজগরে খেয়েছে, এই একটি আছে। সে বড় ভয়ংকর অজগর, তাব আটটি মাথা। বছরে একবার করে আসে, আর আমার একটি মেয়েকে খেয়ে যায়। আবার তার আসবার সময় হয়েছে, এবারে এটিকেও খাবে। তাই আমরা কাঁদছি।'

তেজবীর বললেন, 'এই কথা?' আচ্ছা, তোমাদের কোনো চিন্তা নাই। আমি যা বলছি তাই করো। আট জালা খুব কড়ারকমের সাকী (জাপানী মদ) তয়ের করত। করে, ঐ জায়গায় রেখে দাও, তারপর দেখো কি হয়।

বুড়ো সেইদিনই আট জালা সাকী তয়েব করে তেজবীরের কথামত সাজিয়ে রেখে দিল, সাকীর গন্ধে চারিদিক ভুর ভুর করতে লাগল। ঠিক সেই সময় অজগর গড়াতে গড়াতে আর ফোঁস ফোঁস করতে করতে এসে উপস্থিত হযেছে, আর, সকলের আগে সেই সাকীর গন্ধ গিয়েছে তার নাকে। আর কি সে বেটা তার লোভ সামলাতে পারে? সে অমনি আট জালায় আট মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে সাকী খেতে লাগল। খেতে খেতে তার চোখ বুঁজে এল, মাথা ঢুলে পড়ল, তবু হুঁশ নাই, সে চোঁ চোঁ করে খাচ্ছে। শেষে ঘুমে অচেতন হয়ে একেবারে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তা দেখে তেজবীব বললেন, 'আর—কি? এই বেলা!' বলেই তিনি তাঁর তলোয়ার নিয়ে এসে সেটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেন। তার লেজটা কিন্তু ভারি শক্ত ঠেকল। কিছুতেই কাটা গেল না, বরং তাঁর তলোয়ারই ভেঙে গেল। তখন তেজবীর খুঁজে দেখলেন যে সেই লেজের ভিতরে আশ্চর্যরকমের একখানা তলোয়ার রয়েছে। তিনি তখনি সেই তলোয়ারখানা বার করে নিলেন।

তখন ত সকলেরই খুব সুখ হল। তারপর বুড়োর মেয়েকে বিয়ে করে, সেই দেশে সুন্দর বাড়ি তয়ের করে, দুজনে সুখে বাস করতে লাগলেন। আর সেই বাড়িতে যার পর নাই আদর যত্নে থেকে বুড়োবুড়িরও শেষকাল খুব আরামেই কাটল।

গগন-আলোর যে নাতি, তাঁর ছিল তিন ছেলে, দীপ্তানল, ক্ষিপ্তানল আর তৃপ্তানল।

দীপ্তানল মাছ ধরেন আর তৃপ্তানল শিকার করেন। একদিন তৃপ্তানল দীপ্তানলকে বললেন, 'দাদা, চলোনা, তোমার কাজটি আমি করি, আর আমার কাজটা তুমি করো — দেখি কেমন হয়।' বলে, নিজের তীরধনুক দাদাকে দিয়ে, দাদার বঁড়শি আর ছিপ তিনি চেয়ে নিলেন।

নিয়ে মাছ ত ধরলেন খুবই, লাভের মধ্যে বঁড়শিটা মাছে ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

তারপর একদিন দীপ্তানল বললেন, 'ভাই, শখ কি মিটেছে? এখন কেন আমার বঁড়শি আর আমাকে ফিরিয়ে দাও না।' তাতে তৃপ্তানল ভারি লজ্জিত হয়ে বললেন, 'দাদা, বঁড়শি ত মাছে নিয়ে গেছে এখন কি করে দিই?' এ কথায় দীপ্তানল যার পর নাই রেগে বললেন, 'সে আমি জানি না, আমার বঁড়শি আমাকে এনে দাও।'

তখন তৃপ্তানল আর কি করেন, নিজের তলোয়ারখানা ভেঙে টুকরো টুকরো করে তাই দিয়ে বঁড়শি বানিয়ে দাদাকে দিলেন। কিন্তু দাদার তাতে মন উঠল না, তিনি বললেন, 'ও আমি চাই না, আমার বঁড়শি নিয়েছ তাই এনে আমাকে দাও।'

তৃপ্তানল হাজার বঁড়শি এনে দীপ্তানলকে দিতে গেলেন, তাতেও হল না। দীপ্তানল আরো রেগে গিয়ে বললেন, 'আমার সেই বঁড়শিটি আমাকে এনে দিতে হবে।' তা শুনে তৃপ্তানল মাথা হেঁট করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেখান থেকে চলে গেলেন। ভাবলেন, 'হায় হায়! এখন আমি কি করি? সমুদ্রের মাছে বঁড়শি নিয়ে গেছে, তাকে আমি কোথায় খুঁজে পাব?'

এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে কাঁদছেন, এমন সময় সমুদ্রের দেবতা লবণেশ্বর সেইখানে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি হয়েছে বাছা? তুমি কাঁদছ কেন?' তৃপ্তানল বললেন, 'দাদার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেটা মাছে নিয়ে গেছে। তাতে দাদা বড্ড রাগ করেছেন। আমি আরো কত কাঁটা তাঁকে দিতে গেলাম, তিনি নিলেন না, বললেন, আমার সেইটে এনে দাও। এখন আমি কি করি?' লবণেশ্বর বললেন, 'তুমি কেঁদো না, আমি যা বলছি তাই করো।' বলে, তিনি তখনি একখানা নৌকা তয়ের করে তৃপ্তানলকে তাতে বসিয়ে দিলেন, আর বললেন, 'এই নৌকায় চড়ে তুমি এই এই পথ দিয়ে যেতে থাকবে। খানিক দূর গিয়ে মাছের আঁশ দিয়ে গড়া একটা বাড়ি দেখতে পাবে, সেইখানে সমুদ্রের রাজা সিন্ধুপতি থাকেন। সেই বাড়ির পাশে, বাগানের ভিতরে, কুয়োর ধারে একটা গাছ আছে, তার আগায় উঠে তুমি বসে থাকবে। সেই বাগানে রাজার মেয়ে বেড়াতে আসে, সে তোমাকে তোমার বঁড়শির কথা বলে দেবে।'

এ কথায় তৃপ্তানল সেই নৌকা বেয়ে, সেই রাজার বাড়িতে গিয়ে সেই গাছে উঠে বসে রইলেন। খানিক বাদে রাজার মেয়ের দাসীরা কলসী হাতে করে সেই কুয়ো থেকে জল নিতে এল। এসে তারা দেখল যে গাছের উপরে কেমন সুন্দর একটি রাজপুত্র বসে আছে। তৃপ্তানল তাদের বললেন, 'হাঁ গা, তোমরা দয়া করে আমাকে একটু জল খেতে দেবে?' দাসীরা অমনি সোনার গেলাসে জল এনে তাঁকে খেতে দিল। তিনি তা থেকে একটুখানি জল খেলেন। তারপর গেলাস ফিরিয়ে দেবার সময়ে নিজের গলা থেকে মণি খুলে তার ভিতর ফেলে দিলেন। দাসীরা তা দেখতে পায়নি, তারা সেই মণিসুদ্ধ গেলাস নিয়ে রাজার মেয়ের ঘরে রেখে দিয়েছে।

তারপর রাজার মেয়ে জল খাবার জন্য গেলাস খুঁজতে এসে বললেন, — 'এ কি? গেলাসের ভিতর মণি কোত্থেকে এল রে?' দাসীরা বলল, 'তা ত আমরা জানি না, কুয়ো ধারে একটি রাজপুত্র বসে আছে। সে আমাদের কাছে জল খেতে চাইল, আমরা এই গেলাসে করে নিয়ে তাকে জল খেতে দিলাম। মণি হয়ত তারই হবে।'

রাজার মেয়ে তখনি ছুটে গিয়ে তাঁর বাবাকে সব কথা বললেন। রাজা সিন্ধুপতিও এ কথা শুনে তাড়াতাড়ি সেই কুয়োর ধারে চলে এলেন। এসে সেই গাছের উপরে তৃপ্তানলকে দেখেই তিনি যারপর নাই আশ্চর্য আর খুশি হয়ে বললেন, 'আরে তোমার নাম না তৃপ্তানল? আমাদের স্বর্গের রানী গগন-আলোর নাতির ছেলে। তুমি কেন কুয়োর ধারে বসে থাকবে বাবা? এসো এসো, ঘরে এসো!' বলে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে রাজা তাঁকে সভায় নিয়ে এলেন। সভার লোক তাঁর নাম শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠে তাঁকে সেলাম করে জোড়হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রাজা অনেক ধুমধাম করে তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

তারপর থেকে বেশ সুখেই দিন যায়। রাজা রোজই খবর নেন, তৃপ্তানল কেমন আছেন, রাজার মেয়ে বলেন, 'বেশ ভাল আছেন।' এমন করে তিন বৎসর চলে গেল। তারপর একদিন রাজা খবর নিতে এসে শুনলেন যে, তৃপ্তানল বিছানায় শুয়ে একটা খুব লম্বা নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

অমনি রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, তুমি কেন নিশ্বাস ফেলেছিলে?' তোমার কিসের দুঃখ?' তৃপ্তানল বললেন, 'দাদার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেই বঁড়শি মাছে নিয়ে গেছে। এতে দাদার বড্ড রাগ হয়েছে, আর বলেছেন যে, সেই বঁড়শি তাঁকে ফিরিয়ে না দিলে কিছুতেই হবে না।' শুনে রাজা বললনে, 'এই কথা? আচ্ছা -- ডাক্ ত রে সকল মাছকে!' রাজার হুকুমে পৃথিবীর যত মাছ সকলে এসে তাঁর কাছে হাজির হল, আর রাজা তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলো ত, তোমাদের কার গলায় সেই বঁড়শি আটকেছিল?' তারা সকলে বললে, 'তাই মাছের গলায় সেই বঁড়শি আটকেছিল। আজও তার খোঁচা লাগে।' তখন রাজামশায় তাকে বললেন, 'হাঁ কর্ ব্যাটা, দেখি তোর গলায় কিঁ আছে!' এ কথায় তাই যেই 'অ-অ-অ-আ-ক্!' করে দুহাত চওড়া হাঁটি করেছে, দেখা গেল যে ঠিক সেই বঁড়শিটি তার গলায় বিঁধে রয়েছে। অমনি চিমটা দিয়ে সেটাকে বার করে আনা হল। তখন ত আর তৃপ্তানলের আনন্দের সীমাই রইল না। রাজামশাই তাঁর হাতে সেই বঁড়শিটি দিয়ে আরো দুটি মাণিক তাঁকে দিলেন! তার একটির নাম জোয়ার মাণিক, তাকে ছুঁড়ে মারলে সমুদ্র ছুটে এসে শত্রুকে ডুবিয়ে দেয়। আর একটির নাম ভাটা-মাণিক, তাকে ছুঁড়ে মারলে সেই সমুদ্র ফিরে চলে যায়।

তারপর কুমিরের রাজাকে ডেকে সিন্ধুপতি বললেন, 'তুমি তৃপ্তানলকে তার দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো। দেখো যেন তার কোনো ক্ষতি না হয়।'

সেই পাহাড়ের মত কুমির তৃপ্তানলকে পিঠে করে তাঁর দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। তারপর দীপ্তানলকে তাঁর বঁড়শি ফিরিয়ে দিতে আর বেশিক্ষণ লাগল না। কিন্তু দীপ্তানল কোথায় তাঁর বঁড়শি পেয়ে খুশি হবেন, না তিনি আরো রেগে তলোয়ার নিয়ে তৃপ্তানলকে কাটতে গেলেন। তখন তৃপ্তানল আর কি করেন, তাড়াতাড়ি সেই জোয়ার-মাণিককে ছুঁড়ে মারলেন। মারতেই ত সমুদ্রের জল পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে এসে দীপ্তানলকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। তখন আর তিনি যাবেন কোথায়? ঢকঢক জল খেতে খেতে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'রক্ষে করো ভাই! আমার ঘাট হয়েছে, আমি — আর অমন করব না।' সে কথায় তৃপ্তানল ভাটা-মাণিক ছুঁড়ে জল সরিয়ে তাঁকে বাঁচালেন।

তাবপর থেকে দীপ্তানল ভালমানুষ হয়ে গেলেন, আব ছোট ভাইকেই রাজ্য ছেড়ে দিলেন।

তিনটি বর

এক দেশে এক কামার ছিল, তার মত অভাগা আর কোনো দেশে কখনো জন্মায় নি। তাকে এক জিনিস গড়তে দিলে তার জায়গায় আব-এক জিনিস গড়ে রাখত, একটা কিছু সারাতে দিলে তাকে ভেঙে আরো খোঁড়া করে দিত। আর লোককে ফাঁকি যে দিত, সে কি বলব! কাজেই কেউ তাকে কোনো কাজ করতে দিতে চাইত না, তার দুবেলা দুটি ভাতও জুটত না, লাভের মধ্যে সে তার গিন্নীর তাড়া খেয়ে সারা হত।

একদিন সে দোকানে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছে। ভযানক শীত, গাযে জড়াবার কিচ্ছু নেই। খিদেয পেট জ্বলে যাচ্ছে, ঘরে খাবাব নেই। এমন সময় কোত্থেকে এক এই লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো লাঠি ভব করে কাঁপতে কাঁপতে এসে তাব দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'জয় হোক বাবা, দুঃখী বুড়োকে কিছু খেতে দাও।'

কামার বলল, 'বাবা, খাবাব যদি থাকত, তবে নিজেই দুটি খেয়ে বাঁচতুম। দুদিন পেটে কিছু পড়ে নি, ছেলেপুলে নিয়ে উপোস করছি — তোমাকে কোত্থেকে দেব? তুমি নাহয় ঘবে এসে একটু গরম হয়ে যাও, আমি হাপর ঠেলে আগুনটা উসকিয়ে দিচ্ছি।'

বুড়ো তখন কাঁপতে কাঁপতে ঘবে এসে বলল, 'আহা, বাঁচালে বাবা, শীতে জমে গিয়েছিলুম।' তুমি দেখছি তবে আমাব চেয়েও দুঃখী। আমার নিজে খেতে পেলেই চলে, তোমার আবাব স্ত্রী আব ছেলেপুলেও আছে।'

এই বলে বুড়ো আগুনেব কাছে এসে বসল, কামার খুব করে হাপর ঠেলে আগুন উসকিযে তাকে গবম কবে দিল। যাবার সময বুড়ো তাকে বলল, 'তুমি আমাকে খেতে দিতে পার নি, তবু তোমাব যতদূর সাধ্য তুমি কবেছ। এখন তোমার যেমন ইচ্ছা, তিনটি বর চাও, আমি নিশ্চয় দেব।'

এ কথায় কামাব অনেকক্ষণ বুড়োব মুখেব দিকে চেয়ে মাথা চুলকোতে লাগল, কিন্তু কি বর চাইতে হবে, বুঝতে পারল না। বুড়ো বলল, 'শিগ্‌গির বলো, আমার বড্ড তাড়াতাড়ি— ঢের কাজ আছে।'

তখন কামার থতমত খেয়ে বলল, 'আচ্ছা, তবে এই বর দিন যে, আমার এই হাতুড়িটি যে একবার হাতে করবে, সে আর আমার হুকুম ছাড়া সেটি রেখে দিতে পাববে না। আর যদি তা দিয়ে ঠুকতে আরম্ভ করে, তবে আমি থামতে না বললে আর থামতে পারবে না।'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা তাই হবে। আর কি বর চাই?'

কামার বলল, 'আমার এই কেদারাখানিতে যে বসবে, সে আমার হুকুম ছাড়া তা থেকে উঠতে পারবে না।'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা তাও হবে। আর কি?'

কামার বলল, 'আমার এই থলিটির ভিতরে আমি কোনো টাকা রাখলে আমি ছাড়া আর

কেউ তাকে তা থেকে বার করতে পারবে না।'

সেই বুড়ো ছিলেন এক দেবতা। তিনি এই শেষ বরটিও সেই কামারকে দিয়ে ভয়ানক রেগে বললেন, 'অভাগা, তুই ইচ্ছা করলে এই তিন বরে পরিবার সুদ্ধ স্বর্গে চলে যেতে পারতিস, তার মধ্যে তোর এই দুর্মতি!'

এই বলে দেবতা চলে গেলেন, কামার আবার বসে বসে ভাবতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল যে, তাই ত, এই তিন বরের জোরে ত আমি বেশ দুপয়সা রোজগার করে নিতে পারি।

তখন সে দেশময় এই কথা রটিয়ে দিল যে, 'আমার দোকানে এলে আমি বিনি পয়সায় কাজ করে দেব।' দেশের যত কিপটে পয়সাওয়ালা লোক, সে কথা শুনে তার দোকানে এসে উপস্থিত হতে লাগল। এক-একজন আসে, আর কামার তাকে দুহাতে লম্বা লম্বা সেলাম করে তার সেই কেদারাখানায় নিয়ে বসতে দেয়। বিনি পয়সায় কাজ করিয়ে চলে যাবার সময় সে বেচারা তা থেকে উঠতে পারে না, কামারও বেশ ভালমতে তার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় না ক'রে তাকে উঠতে দেয় না। এমনি করে দিনকতক সে খুব টাকা পেতে লাগল। কাউকে এনে চেয়ারে বসায়, কারু হাতে তার হাতুড়িখানা তুলে দেয়, তারপর টাকা না দিলে আর তাকে ছাড়ে না।

যা হোক, ক্রমে সকলেই তার দুষ্টুমি টের পেয়ে ফেলল; তখন আর কেউ তার কাছে আসে না, কাজেই আবার তার দুর্দশার একশেষ হতে লাগল। এই সময় কামার একদিন একটা বনের ভিতর বেড়াতে গিয়ে একটি সাদাসিধি গোছের বুড়োকে দেখতে পেল। বুড়োকে দেখে সে আগে ভাবল, বুঝি কোনো উকিল হবে। কিন্তু তখনই আবার কোনো উকিলের সেই বনের ভিতর আসা তার ভারি অসম্ভব মনে হল। তারপর সে আবার ভাল করে চেয়ে দেখল যে সেই লোকটার পা দুখানিতে ঠিক ছাগলের পায়ের মত খুর আছে। তখন তার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, সেই বুড়ো আর কেউ নয়; স্বয়ং শয়তান। শয়তানের পা ঠিক ছাগলের মত থাকে, এ কথা সেই কামার ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছিল।

আর কেউ হলে তখনই সেখান থেকে ছুটে পালাত। কিন্তু সেই কামার তেমন কিছু না করে জোড়হাতে শয়তানকে নমস্কার করে বলল, 'প্রণাম হই।'

শয়তান বলল, 'বটে! তুমি এতই কষ্ট পাচ্ছ? তুমি কেন আমার চাকরি করো না, আমি তোমাকে ঢের টাকা দেব।'

ঢের টাকার নাম শুনে কামার তখনই শয়তানের কথায় রাজি হল, যদিও সে জানত যে তার কাজে একবার ঢুকলে আর কেউ ছেড়ে আসতে পারে না। শয়তান তখন তাকে তিন থলি মোহর দিয়ে বলল, 'এখন গিয়ে এই টাকা দিয়ে খুব আরামে খাও-দাও, সাত বছর পরে আমি তোমার কাছে আসব, তখন তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।' এই বলে শয়তান চলে গেল। কামারও হাসতে হাসতে টাকার থলি নিয়ে ঘরে ফিরল।

সেই তিন থলি মোহর নিয়ে কামার যার পর নাই খুশি হয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি এল। ভাবল, এখন সাত বছর এই মোহর দিয়ে খুব ধুমধাম করে নেবে। সাতবছর পরে শয়তানের তাকে নিতে আসবার কথা, তখন তার সঙ্গে যেতেই হবে।

তারপর লোকে দেখল যে কামার কেমন করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছে। এখন আর সে হাপরও ঠেলে না, লোহাও পেটে না; এখন তার গাড়ি ঘোড়া চাকরবাকরের অন্ত

নেই। দিন যাচ্ছে আর তার বাবুগিরি ক্রমেই বেড়ে উঠছে। সে বাবুগিরিতে সাত বছর শেষ হবার ঢের আগেই শয়তানের দেওয়া সব টাকা ফুরিয়ে গেল, আর ঘরে একটি পয়সাও নেই, একমুঠো চালও নেই। তখন কাজেই তাকে আবার যে কামার সেই কামারই হতে হল, নইলে খাবে কি?

তারপর একদিন সে তার দোকানে বসে একটা লোহা পিটছে আর ভাবছে, কখন খদ্দের আসবে, এমন সময় একজন বুড়ো-হেন লোক ধীরে ধীরে এসে তার কাছে দাঁড়াল। কামার আগে ভাবল, 'এই রে, খদ্দের!' তারপর চেয়ে দেখল, 'ওমা! এ যে শয়তান!'

শয়তান বলল, 'মনে আছে ত? সাত বছর শেষ হয়েছে, এখন আমার সঙ্গে চলো।'

কামাব বলল, 'তাই ত, আমি গেলে আমার ছেলেপুলেগুলো কি খাবে? তোমার ত কতই লোক আছে, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও।'

শয়তান বলল, 'সে হবে না! আমাকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত কাজ; চলো, এখনই চলো।'

কামার বলল, 'তুমি ছাড়বেই না যখন তখন ত চলতেই হবে, কিন্তু আমার হাতের এই কাজটি শেষ করে যেতে পারলে আমার ছেলেগুলোর পক্ষে বড় ভাল হত— এর দরুন কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। তুমি দাদা আমার উপকারটুকু করো না—আমি সকলের কাছে বিদায় হয়ে নিই, ততক্ষণ তুমি বসে এই হাতুড়িটা দিয়ে এই লোহাখানাকে পেটো।'

শয়তান কাজে এমন দুষ্টু হলেও কথাবার্তায় ভারি ভদ্রলোক, সে কামারের কথা শুনে তখনই তার হাত থেকে হাতুড়িটি নিয়ে লোহাটাকে পেটাতে লাগল। সে জানত না যে সেটা সেই দেবতার বর দেওয়া সর্বনেশে হাতুড়ি, তা দিয়ে একবার পিটতে আরম্ভ করলে আর কামারেব হুকুম ছাড়া থামবার উপায় নেই। কামার তার হাতে সেই হাতুড়ি দিয়েই অমনি যে ঘর থেকে বেরুল, আর একমাসের ভিতরে সেই মুখোই হল না।

একমাস পরে কামার দোকানে ফিরে এসে দেখল যে শয়তান তখনো ঠনাঠন ঠনাঠন করে বেদম হাতুড়ি পিটছে, আর তার দশা যে হয়েছে! খালি শয়তান বলে সে এতক্ষণ বেঁচে আছে, আর কেউ হলে মরেই যেত। কামারকে দেখে সে অনেক মিনতি করে বলল, 'ভাই ঢের ত হয়েছে; আমাকে মেরে ফেলে তোমার লাভ কি? তার চেয়ে তোমাকে আরো তিন থলি মোহর দিচ্ছি আরো সাত বছরেব ছুটি দিচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দাও।'

কামার ভাবল, মন্দ কি। আর তিন থলি মোহর দিয়ে সাত বছর সুখে কাটানো যাক। কাজেই সে শয়তানকে বলল, 'আচ্ছা, তবে তাই হোক।'

তখন শয়তান কামারকে আবার তিন থলি মোহর দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল, কামারও সেই টাকা দিয়ে আবার ধুমধাম জুড়ে দিল। তারপর সে টাকা শেষ হতেও আব বেশি দেরি হল না, তখন আর হাতুড়ি-পেটা ভিন্ন উপায় নেই। এমনি করে আবার সাত বছর কেটে গেল।

এবার শয়তান কামারকে নিতে এসে দেখে তার বাড়িতে ভারি গোলমাল। কি কথা নিয়ে কামার তার গিন্নির উপর বিষম চটেছে, আর তাকে ধরে ভয়ানক মারছে। কামারের গিন্নিও যেমন-তেমন মেয়ে নয়, পাড়ার সকলে তার জ্বালায় অস্থির থাকে। কামারকে সে ঝাঁটা দিয়ে কম নাকাল করছে না, কিন্তু কামারের হাতে কিনা হাতুড়ি তাই জিত হচ্ছে তারই। শয়তান এসে এ-সব দেখে কামারকে ভয়ানক দুই থাপ্পড় লাগিয়ে বলল, 'বেটা পাজি, স্ত্রীকে

ধরে মারিস? চল্, আমার সঙ্গে চল্।'

শয়তান ভেবেছিল, এতে কামারের স্ত্রী খুব খুশি হয়ে তার সাহায্য করবে। কিন্তু কামারের স্ত্রী তার কিছু না করে, 'বটে রে হতভাগা, তোর এত বড় আস্পর্ধা! আমার স্বামীর গায়ে হাত তুলছিস!' বলে, সেই ঝাঁটা দিয়ে শয়তানের নাকে মুখে এমনি সপাংসপ মারতে লাগল যে বেচারার দমই ফেলা দায়। সে তাতে বেজায় থতমত খেয়ে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল— সেই চেয়ার, যাতে একবার আর বিনা হুকুমে ওঠবার জো নেই।

কামার দেখল যে, শয়তান এবারে বেশ ভালমতেই ধরা পড়েছে, হাজার টানাটানিতেও উঠতে পারছে না। তখন সে তার চিমটেখানি আগুনে তাতিয়ে নিয়ে তা দিয়ে আচ্ছা করে তার নাকটা টিপে ধরল। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে 'হেঁইয়ো' বলে সেই চিমটে ধরে টানতেই নাকটা রবারের মত লম্বা হতে লাগল। এক হাত, দু হাত, চার হাত, আট হাত—নাক যতই লম্বা হচ্ছে, শয়তান বেটা ততই ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে। নাকটা যখন কুড়ি হাত লম্বা হল তখন শয়তান আর থাকতে না পেরে নাকিসুরে বলল, 'দোহাই দাদা! আর টেনো না, মরে যাব।'

কামার বলল, 'আরো তিন থলি টাকা, আর সাত বছরের ছুটি— দেবে কিনা বলো।' শয়তান ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এক্ষুনি, এক্ষুনি, এই নাও।' বলতে বলতেই তিন থলি ঝকঝকে মোহর এসে কামারের কাছে হাজির হল; কামার সেগুলো সিন্দুকে তুলে শয়তানকে বলল, 'আচ্ছা তবে যাও।' শয়তান ছাড়া পেয়েই সেখান থেকে এমনি ছুট দিল যে, ছুট যাকে বলে।

তখন কামার আর তার স্ত্রী মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়ে যে হাসিটা হাসল! আর সাত বছরের জন্য তাদের কোনো ভাবনা রইল না। সাত বছর যখন শেষ হল, তখন কামারের টাকাও ফুরিয়ে গেল, তাকে আবার তার ব্যবসা ধরতে হল, ততদিনে শয়তানও আবার তাকে নেবার জন্য এসে উপস্থিত হল।

সাত বছর পরে শয়তান আবার কামারকে নেবার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু গত বারে সে নাকে যে চিমটি খেয়ে গিয়েছিল, তার কথা ভেবে আর সে সোজাসুজি কামারের সামনে এসে দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছে না, তাই এবারে সে ভারি এক ফন্দি এঁটে এসেছে।

শয়তান জানে যে, কেউ যদি তাকে নিজে থেকে আদর করে নিয়ে যায় তা হলে আর সে কিছুতেই তার হাত ছাড়াতে পারে না। তখন শয়তান করল কি, একটি ঝকঝকে মোহর হয়ে ঠিক কামারের দোকানের সামনে রাস্তায় গিয়ে পড়ে রইল। সে ভাবল যে কামার খেতে পায় না, মোহরটি দেখলে সে পরম আদরে তাকে এসে তুলে নিয়ে যাবে, তারপর আর সে শয়তানকে ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়?

যে কথা সেই কাজ। কামার সেই মোহরটিকে দেখতে পাওয়া মাত্রই ছুটে গিয়ে সেটিকে তুলে এনে তার থলেয় পুরল। তখন থলের ভিতর থেকে শয়তান হেসে তাকে বলল, কি বাপু, এখন কোথায় যাবে? নিজে ধরে আমাকে ঘরে এনেছ, তার মজাটা এখনই দেখতে পাবে।'

কামার বলল, 'কী রে বেটা? তুই বুঝি আর মরবার জায়গা জোটে নি, তাই আমার থলের ভিতরে এসেছিস? দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি!'

এ কথায় শয়তান এমনি রেগে গেল যে, পারলে সে তখনই কামারকে মেরে শেষ করে। কিন্তু থলের বাইরে এলে তবে ত শেষ করবে! সে যে সেই বিষম থলে— তার ভিতরে

ঢুকলে আর বেরোবার হুকুম নেই। শয়তান বেচারার খালি ছটফটিই সার হল, সে আর থলের ভিতর থেকে বেরুতে পারল না। তৎক্ষণে কামার সেই থলেটি তার নেহাইয়ের উপর রেখে গিন্নীকে ডেকে দুজনে দুই প্রকাণ্ড হাতুড়ি নিয়ে, দমাদ্দম দমাদ্দম এমনি পিটুনি জুড়ল যে পিটুনি যাকে বলে। পিটুনি খেয়ে শয়তান খানিক খুব চেঁচাল। তারপর যখন আর চেঁচানি আসে না, তখন গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'ছেড়ে দাও দাদা, তোমার পায়ে পড়ি। এবার তোমাকে বিশাল বিশাল ছয় থলে ভরা মোহর দেব, আর —আর কখনো তোমার কাছে আসব না।'

এ কথায় কামারের গিন্নি বলল, 'ওগো, সে হলে নেহাত মন্দ হবে না, দাও হতভাগাকে ছেড়ে।' তখন কামার বলল, 'কই তোর মোহরের থলে?' বলতে বলতেই এমনি বড় বড় মোহরের থলে এসে হাজির হল যে তারা দুজনে মিলেও তার একটাকে তুলতে পারে না। তখন কামার একগাল হেসে, তার থলের মুখ খুলে দিয়ে বলল, 'যা বেটা! ফের তোর পোড়া মুখ এখানে দেখাতে আসবি ত টের পাবি।' তৎক্ষণে শয়তান থলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এমনি ব্যস্ত হয়ে ছুট দিল যে, কামারের সব-কথা শুনতেও পেল না।

সেই ছটা থলের ভিতর এতই মোহর ছিল যে, কামার হাজার ধুমধাম করেও তা শেষ করতে পারল না। চাল চেলে ভাল করে ফুরতে না ফুরতেই সে বুড়ো হয়ে শেষে একদিন মরে গেল। মরে গিয়ে ভূত হয়ে সে ভাবল যে এখন ত হয় স্বর্গে না হয় নরকে দুটোর একটায় যেতে হবে। আগে স্বর্গের দিকে গিয়েই দেখি-না, যদি কোনোমতে সেখানে ঢুকতে পারি।

স্বর্গের ফটকের সামনে গিয়ে তার সেই দেবতাটির সঙ্গে দেখা হল, যিনি তাকে সেই তিনটি বর দিয়েছিলেন তাকে দেখে কামার ভারি খুশি হয়ে ভাবল, 'এই ঠাকুরটি না আমাকে সেই চমৎকার বরগুলো দিয়েছিলেন? ইনি অবশ্যি আমাকে ঢুকতেও দেবেন।'

কিন্তু দেবতা তাকে দেখেই যার পর নাই রেগে বললেন, 'এখানে এসেছিস্ কি করতে? পালা হতভাগা, শিগগির পালা '

কাজেই তখন বেচারা আর কি করে? সে সেখান থেকে ফিরে নরকের দিকে চলল। সেখানকার ফটকের সামনে উপস্থিত হলে শয়তানের দরোয়ানেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম?'

কামার তার নাম বলতেই পাঁচ-ছয়টা দরোয়ান ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে শয়তানকে বলল, 'মহারাজ! সেই কামার এসেছে।' তা শুনে শয়তান বিষম চমকে গিয়ে একটা লাফ যে দিল! তারপর পাগলের মত ফটকের কাছে ছুটে এসে দরোয়ানদের বলল, 'শিগ্গির দরজা বন্ধ কর! আঁট হুড়কো! লাগা তালা! খবরদার! ও বেটাকে ঢুকতে দিবি না! ও এলে আর কি আমাদের রক্ষা থাকবে!'

শয়তানের গলা শুনে কামার গরাদের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে হাসতে হাসতে বলল, 'কি দাদা! কি খবর?' সে কথা শেষ না হতেই শয়তান এক লাফে এসে এমনি তার নাক মলে দিল যে কি বলব! কামার তখনই সেখান থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে পালাল, কিন্তু তার আগেই তার নাকে আগুন ধরে গিয়েছিল। সে আগুন আজও নেবে নি। কামার তার জ্বালায় অস্থির হয়ে জলায় জলায় নাক ডুবিয়ে বেড়ায়। লোকে সেই আগুন দেখতে পেলে বলে, 'ঐ আলেয়া।'

গুপি গাইন ও বাঘা বাইন

তোমরা গান গাইতে পার? আমি একজন লোকের কথা বলব, সে একটা গান গাইতে পারত। তার নাম ছিল গুপি কাইন, তার বাবার নাম ছিল কানু কাইন। তার একটা মুদীর দোকান ছিল। গুপি কিনা একটা গান গাইতে পারত, আর সে গ্রামের আর কেউ কিছু গাইতে পারত না, তাই তারা তাকে খাতির ক'রে বলত গুপি 'গাইন'।

গুপি যদিও একটা বই গান জানত না, কিন্তু সেই একটা গান সে খুব ক'রেই গাইত। সেটা না গেয়ে সে তিলেকও থাকতে পারত না, তার দম আটকে আসত। যখন সে ঘরে ব'সে গাইত, তখন তার বাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত। যখন সে মাঠে গিয়ে গান গাইত, তখন মাঠের যত গরু সব দড়ি ছিঁড়ে ভাগত। শেষে আর তার ভয়ে তার বাবার দোকানে খদ্দেরই আসে না, রাখালেরাও মাঠে গরু নিয়ে যেতে পারে না। তখন একদিন কানু কাইন তাকে এই বড় বাঁশ নিয়ে তাড়া করতে সে ছুটে মাঠে চ'লে গেল। সেখানে রাখালের দল লাঠি নিয়ে আসতে বনের ভিতর গিয়ে খুব ক'রে গলা ভাঁজতে লাগল।

গুপিদের গ্রামের কাছেই আরেকটা গ্রামে একজন লোক থাকত, তার নাম ছিল পাঁচু পাইন। পাঁচুর ছেলেটির বড্ড ঢোলক বাজাবার শখ ছিল। বাজাতে বাজাতে সে বিষম ঢুলতে থাকত, আর পা নাড়ত আর চোখ পাকাত, আর দাঁত খিঁচাত, আর ভ্রূকুটি করত। তার গ্রামের লোকেরা তা দেখে হাঁ ক'রে থাকত আর বলত 'আহা! আহা!! অ! অহ হ হ!!!' শেষে যখন 'হাঃ, হাঃ, হা হা' ব'লে বাঘের মত খেঁকিয়ে উঠত, তখন সকলে পালাবার ফাঁক না পেয়ে চিৎপাত হয়ে প'ড়ে যেত। তাই থেকে সকলে তাকে বলত 'বাঘা বাইন।' তার এই বাঘা নামই রটে গিয়েছিল, আসল নাম যে তার কি তা কেউ জানত না।

বাঘা ঢোলক বাজাত আর রোজ একটা ক'রে ঢোলক ভাঙত। শেষে আর পাঁচু তার ঢোলকের পয়সা দিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু বাঘার বাজনা বন্ধ হবে, তাও কি হয়? গ্রামের লোকেরা পাঁচুকে বলল, 'তুমি না পার, নাহয় আমরাই সকলে চাঁদা ক'রে ঢোলকের পয়সাটা দি। আমাদের গ্রামে এমন একটা ওস্তাদ হয়েছে, তার বাজনাটা বন্ধ হয়ে যাবে!' শেষে ঠিক হল যে গ্রামের সকলে চাঁদা ক'রে বাঘাকে একটা ঢোলক কিনে দেবে, আর সেই ঢোলকটি আর তার ছাউনি খুব মজবুত হবে, যাতে বাঘার হাতেও সেটা আর সহজে না ছেঁড়ে।

সে যা ঢোলক হল! তার মুখ হল সাড়ে-তিন হাত চওড়া, আর ছাউনি মোষের চামড়ার। বাঘা সেটা পেয়ে যার পর নাই খুশি হয়ে বললে, 'আমি দাঁড়িয়ে বাজাব।'

তখন থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঢোলক লাঠি দিয়ে বাজায়। দেড় মাস দিনরাত বাজিয়েও বাঘা সেটাকে ছিঁড়তে পারল না। ততদিনে তার বাজনা শুনে শুনে তার বাপ মা পাগল হয়ে গেল, গ্রামের লোকের মাথা ঘুরতে লাগল। আর দিনকতক এইভাবে চললে কি হত বলা যায় না। এর মধ্যে একদিন গ্রামের সকলে মিলে মোটা মোটা লাঠি নিয়ে এসে বাঘাকে বলল, 'লক্ষ্মী, দাদা! তোমাকে দশ হাঁড়ি মিঠাই দিচ্ছি, অন্য কোথাও চ'লে যাও, নইলে আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব!'

বাঘা আর কি করে? তখন কাজেই তাকে অন্য একটা গ্রামে যেতে হল। সেখানে দুদিন না থাকতে থাকতেই সেখানকার সকলে মিলে তাকে গ্রাম থেকে বার ক'রে দিল। তারপর থেকে সে যেখানেই যায়, সেখান থেকেই তাকে তাড়িয়ে দেয়। তখন সে করল কি, সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষুধার সময় তার নিজের গ্রামে গিয়ে ঢোলক বাজাতে থাকে, আর গ্রামের লোক তাড়াতাড়ি তাকে কিছু খাবার দিয়ে বিদায় ক'রে বলে, 'বাঁচলাম!' তারপর এমন হল যে আর কেউ তাকে খেতে দেয় না। আর তার ঢোলকের আওয়াজ শুনলেই আশপাশের সকল গ্রামের লোক লাঠি নিয়ে আসে। তখন বেচারা ভাবল, 'আর না! মূর্খদের কাছে থাকার চেয়ে বনে চ'লে যাওয়াই ভাল। না হয় বাঘে খাবে, তবুও আমার বাজনা চলবে!' এই ব'লে বাঘা তার ঢোলকটিকে ঘাড়ে ক'রে বনে চ'লে গেল।

এখন বাঘার বেশ মজাই হয়েছে। এখন আর কেউ তার বাজনা শুনে লাঠি নিয়ে আসে না। বাঘে খাবে দূরে থাক, সে বনে বাঘ-ভাল্লুক কিছু নেই। আছে খালি একটা ভয়ানক জানোয়ার; বাঘা আজও তাকে দেখতে পায় নি, শুধু দূর থেকে তার ডাক শুনে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপে, আর ভাবে, 'বাবা গো। ওটা এলেই ত ঢোলক সুদ্ধ আমাকে গিলে খাবে!'

সে ভয়ানক জানোয়ার কিন্তু কেউ নয়, সে গুপি গাইন। বাঘা যে ডাক শুনে কাঁপে, সে গুপির গলা ভাঁজা। গুপিও বাঘার বাজনা শুনতে পায়, আর বাঘারই মত ভয়ে কাঁপে। শেষে একটু ভাবল, 'এ বনে থাকলে কখন প্রাণটা যাবে, তার চেয়ে এই বেলা এখান থেকে পালাই।' এই ভেবে গুপি চুপিচুপি বন থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়েই দেখে আর-একটি লোকও এক বিশাল ঢোল মাথায় ক'রে সেই বনের ভিতর থেকে আসছে। তাকে দেখেই ভারি আশ্চর্য হয়ে গুপি জিজ্ঞাসা কর, 'তুমি কে হে?'

বাঘা বললে, 'আমি বাঘা বাইন; তুমি কে হে?'

গুপি বললে, 'আমি গুপি গাইন; তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

বাঘা বললে, যেখানে জায়গা জোটে, সেইখানেই যাচ্ছি। গ্রামের লোকগুলো গাধা, গানবাজনা বোঝে না, তাই ঢোলটি নিয়ে বনে চ'লে এসেছিলাম। তা ভাই, এখানে যে ভয়ংকর জানোয়ারের ডাক শুনেছি, তার সামনে পড়লে আর প্রাণটি থাকবে না। তাই পালিয়ে যাচ্ছি।'

গুপি বললে, 'ওই ত! আমিও যে একটা জানোয়ারের ডাক শুনেই পালিয়ে যাচ্ছিলাম। বলো ত, তুমি জানোয়ারটাকে কোথায় ব'সে ডাকতে শুনেছিলে?' বাঘা বললে, 'বনের পূর্বধারে, বটগাছের তলায়।'

গুপি বললে, 'আচ্ছা, সে যে আমারই গান শুনেছ! সে কেন জানোয়ারের ডাক হবে? সেই জানোয়ারটা ডাকে বনের পশ্চিম ধারে, হরতুকীতলায় ব'সে।'

বাঘা বললে, 'সে ত আমার ঢোলকের আওয়াজ, আমি যে ঐখানে থাকতাম।'

এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল যে, তারা তাদের নিজেদের গান আর বাজনা শুনেই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন যে দুজনার হাসি! অনেক হেসে তারপর গুপি বললে, 'ভাই, আমি যেমন গাইন, তুমি তেমনি বাইন! আমরা দুজনে জুটলে নিশ্চয় একটা কিছু করিতে পারি।'

এ কথায় বাঘারও খুবই মত হল। কাজেই তারা খানিক কথাবার্তার পর ঠিক করল যে, তারা দুজনায় মিলে রাজামশাইকে গান শোনাতে যাবে, রাজামশাই যে তাতে খুব খুশি

হবেন, তাতে ত আর ভুলই নেই, চাই কি অর্ধেক রাজ্য বা মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দিয়ে ফেলতে পারেন।

গুপির আর বাঘার মনে এখন খুবই আনন্দ, তারা রাজাকে গান শুনাতে যাবে। দুজনে হাসতে হাসতে আর নাচতে নাচতে এক প্রকাণ্ড নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল, সেই নদী পার হয়ে রাজবাড়ি যেতে হয়।

নদীতে খেয়া আছে, কিন্তু নেয়ে পয়সা চায়। বেচারারা বন থেকে এসেছে, পয়সা কোথায় পাবে! তারা বলল, 'ভাই, আমাদের কাছে ত পয়সা-টয়সা নেই, আমরা নাহয় তোমাদের গেয়ে বাজিয়ে শোনাব, আমাদেব পার ক'রে দাও।'তাতে খেয়াব চড়নদারেরা খুব খুশি হয়ে নেয়েকে বলল, 'আমরা চাঁদা ক'রে এদের পয়সা দেব, তুমি এদেব তুলে নাও।'

বাঘার ঢোলটি দেখেই নেয়েরও বাজনা শুনতে ভারি সাধ হয়েছিল, কাজেই সে এক কথায় আর কোনো আপত্তি করল না। গুপিকে আর বাঘাকে তুলে নিয়ে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল। নৌকো-ভবা লোক, ব'সে বাজাবার জায়গা কোথায় হবে? অনেক কষ্টে সকলের মাঝখানে খানিকটা জায়গা হতে হতে নৌকোও নদীর মাঝখানে এসে পড়ল তারপর খানিক একটু গুনগুনিয়ে গুপি গান ধরল, বাঘা তার ঢোলকটিতে লাঠি লাগল, আব অমনি নৌকোসুদ্ধ সকল লোক বিষম চমকে গিয়ে গড়াগড়ি আব জড়াজড়ি ক'রে দিল নৌকো খানাকে উলটে।

তখন ত আর বিপদের অন্তই নাই। ভাগ্যিস বাঘার ঢোলকটি এত বড় ছিল, তাই আঁকড়ে ধ'রে দুজনার প্রাণরক্ষা হল। কিন্তু তাদেব আর রাজবাড়ি যাওয়া ঘটল না। তাবা সারাদিন সেই নদীর স্রোতে ভেসে শেষে সন্ধ্যাবেলায় এক ভীষণ বনের ভিতরে গিয়ে কূলে ঠেকল। সে বনে দিনের বেলায় গেলেই ভয়ে প্রাণ উঠে যায়, বাত্রির ত আব কথাই নেই। তখন বাঘা বলল, 'গুপিদা, বড়ই ত বিষম দেখছি! এখন কি করি বল ত।' গুপি বলল, 'করব আর কি? আমি গাইব, তুমি বাজাবে। নিতান্তই যখন বাঘে খা'বে তখন আমাদেব বিদ্যেটা তাকে না দেখিয়ে ছাড়ি কেন?'

বাঘা বলল, 'ঠিক বলেছ দাদা। মরতে হয় ত ওস্তাদলোকের মতন মরি, পাড়াগেঁয়ে ভূতের মত মরতে রাজি নই!,

এই ব'লে দুজনায় সেই ভিজা কাপড়েই প্রাণ খুলে গান বাজনা শুরু করল। বাঘার ঢোলটি সেদিন কিনা ভিজে ছিল, তাইতে তার আওয়াজটি হয়েছিল যার পর নাই গম্ভীর। আর গুপিও ভাবছিল, এই তার শেষ গান, কাজেই তার গলার আওয়াজটিও খুবই গম্ভীর হয়েছিল। সে গান যে কি জমাট হয়েছিল, সে আর কি বলব?এক ঘণ্টা দুঘণ্টা ক'রে দুপুর রাত হয়ে গেল, তবু তাদের সে গান থামছেই না।

এমন সময় তাদের দুজনারই মনে হল, যেন চারদিকে একটা কি কাণ্ড হচ্ছে। ঝাপসা ঝাপসা কালো কালো, এই বড় বড় কি যেন সব গাছের উপর থেকে উঁকি মারতে লেগেছে, তাদের চোখগুলো জ্বলছে, যেন আগুনের ভাঁটা, দাঁতগুলো বেরুচ্ছে যেন মুলোর সার। তা দেখে তখনই আপনা হতে বাঘার বাজনা থেমে গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে দুজনার হাত-পা গুটিয়ে, পিঠ বেঁকে, ঘাড় ব'সে, চোখ বেরিয়ে মুখ হাঁ ক'রে এল। তাদের গায়ে এমনি

কাঁপুনি আর দাঁতে এমনি ঠকাঠকি ধ'রে গেল যে আর তাদের ছুটে পালাবারও জো রইল না।

ভূতগুলি কিন্তু তাদের কিছু করল না তারা তাদের গানবাজনা শুনে ভারি খুশি হয়ে এসেছে, তাদের রাজার ছেলের বিয়েতে গুপির আর বাঘার বায়না করতে। গান থামতে দেখে তারা নাকিসুরে বলল, 'থামলি কেন বাপ? বাজা, বাজা, বাজা!'

এ কথায় গুপির আর বাঘার একটু সাহস হল; তারা ভাবল, 'এ ত মন্দ মজা নয়, তবে একটু গেয়েই দেখি-না।' এই বলে যেই তারা আবার গান ধরেছে, অমনি ভূতেরা একজন দুজন ক'রে গাছ থেকে নেমে এসে তাদের ঘিরে নাচতে লাগল।

সে যে কি কাণ্ড কারখানা হয়েছিল, সে কি না দেখলে বোঝবার জো আছে! গুপি আর বাঘা তাদের জীবনে আর কখনো এমন সমজদারের দেখা পায় নি। সে রাত এমনিভাবেই কেটে গেল। ভোর হলে ত আর ভূতেদের বাইরে থাকবার জো নেই, কাজেই তার একটু আগেই তারা বলল, 'চল্ বাবা মোদের গোদার বেটার বে'তে! তোদের খুশি ক'রে দিব।'

গুপি বলল, 'আমরা যে রাজবাড়ি যাব!' ভূতেরা বলল, 'সে যাবি এখন, আগে মোদের বাড়ি একটু গানবাজনা শুনিয়ে যা! তোদের খুশি করে দিব!' কাজেই তখন তারা দুজনে ঢোল নিয়ে ভূতেদের বাড়ি চলল। সেখানে গানবাজনা যা হল, সে আর ব'লে কাজ নেই। তারপর তাদের বিদায় করবার সময় ভূতেরা বলল, 'তোরা কি চাস?'

গুপি বলল, 'আমরা এই চাই যে আমরা যেন গেয়ে বাজিয়ে সকলকে খুশি করতে পারি।' ভূতেরা বলল, 'তাই হবে, তোদের গানবাজনা শুনলে আর সে গান শেষ হওয়াব আগে কেউ সেখান থেকে উঠে যেতে পারবে না। আর কি চাস?'

গুপি বলল, 'আর এই চাই যে আমাদের যেন খাওয়া-পরার কষ্ট না হয়।' এ কথায় ভূতেরা তাদের একটি থলে দিয়ে বলল, 'তোরা যখন যা খেতে বা পরতে চাস, এই থলের ভিতরে হাত দিলেই তা পাবি। আর কি চাস?'

গুপি বলল, 'আর কি তা ত বুঝতে পারছি না!' তখন ভূতেরা হাসতে হাসতে তাদের দুজনকে দুজোড়া জুতো এনে দিয়ে বলল, 'এই জুতো পায়ে দিয়ে তোরা যেখানে যেতে চাইবি, অমনি সেখানে গিয়ে হাজির হবি।

তখন ত আর কোনো ভাবনাই রইল না। গুপি আর বাঘা ভূতদের কাছে বিদায় হয়ে, সেই জুতো পায়ে দিয়েই বলল, 'তবে আমরা এখন রাজবাড়ি যাব!' অমনি সেই ভীষণ বন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল; গুপি আর বাঘা দেখল তারা দুজনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় আর এমন সুন্দর বাড়ি তারা তাদের জীবনে কখনো দেখে নি। তারা তখনই বুঝতে পারল যে, এ রাজবাড়ি।

কিন্তু এর মধ্যে ভারি একটা মুশকিল হল। রাজবাড়ির ফটকে যমদূতের মত কতকগুলো দরোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল, তারা গুপি আর বাঘাকে সেই ঢোল নিয়ে আসতে দেখেই দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'এইয়ো! কাঁহা যাতা হ্যায়?' গুপি থতমত খেয়ে বলল, 'বাবা, আমরা রাজামশাইকে গান শোনাতে এসেছি।' তাতে দরোয়ানগুলো আরো বিষম চটে গিয়ে লাঠি দেখিয়ে বলল, 'ভাগো, হিঁয়াসে।' গুপি তখন নাক সিঁটকিয়ে বলল, 'ঈস্! আমরা ত রাজার কাছে যাবই।' বলতেই অমনি সেই জুতোর গুণে, তারা তৎক্ষণাৎ রাজামশায়ের সামনে

উপস্থিত হল।

রাজবাড়ির অন্দরমহলে রাজামহাশয় ঘুমিয়ে আছেন, রানী তাঁর মাথার কাছে বসে তাঁকে হাওয়া করছেন, এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, গুপি আর বাঘা সেই সর্বনেশে ঢোল নিয়ে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হল। জুতোর এমনি গুণ, দরজা জানালা সব বন্ধ রয়েছে, তাতে তাদের একটুও আটকায় নি। কিন্তু আসবার বেলা আটকাক, আর নাই আটকাক, আসবাব পরে খুবই আটকাল। রানী তাদের দেখে বিষম ভয় পেয়ে, এক চিৎকার দিয়ে তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলেন, রাজামশাই লাফিয়ে উঠে পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগলেন, রাজবাড়িময় হুলস্থূল পড়ে গেল। সিপাই সান্ত্রী সব খাঁড়া ঢাল নিয়ে ছুটে এল।

বেগতিক দেখে গুপি আর বাঘার মাথায় গোল লেগে গেল। তারা যদি তখন শুধু বলে, 'আমরা এখান থেকে অমুক জায়গায় চলে যাব,' তবেই তাদের জুতোর গুণে সকল ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু সে কথা তাদের মনেই হল না। তারা গেল ছুটে পালাতে, আর দু-পা যেতে না যেতেই বেচারাবা যে মারটা খেল! জুতো, লাঠি, চাবুক, কিল, চড়, কানমলা — কিছুই তাদের বাকি রইল না। শেষে রাজামশাই হুকুম দিলেন, 'বেটাদের নিয়ে তিন দিন হাজতে ফেলে রাখো। তারপর বিচার করে, হয় এদের মাথা কাটব, না হয় কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।'

হায় গুপি! হায় বাঘা! বেচারারা এসেছিল রাজাকে গান শুনিয়ে কতই বকশিশ পাবে ভেবে তার মধ্যে এ কি বিপদ? পেয়াদারা তাদের হাত বেঁধে মারতে মারতে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে ফেলে রাখল। সেখানে প'ড়ে বেচারারা একদিন আর গায়ের ব্যথায় নড়তে চড়তে পারল না। তাতে তেমন দুঃখ ছিল না, কিন্তু বাঘার ঢোলটি যে গেল, সেই হল সর্বনাশের কথা! বাঘা বুক মাথা চাপড়িয়ে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদছে, আর বলছে, 'ও গুপিদা।—ওঃ-ওঃ-হ-হ-হ-হ-অ-অ! আরে ও গুপিদা! মার খেলাম, প্রাণ যাবে, তাতে দুঃখ নেই—কিন্তু দাদা, আমার ঢোলকটি যে গেল!'

গুপির কিন্তু ততক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। সে বাঘার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'ভয় কি দাদা? ঢোল গিয়েছে, জুতো আর থলে ত আছে। আমরা নিতান্ত বেকুব, তাই এতগুলো মার খেলাম। যা হোক, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন এর ভিতর থেকে একটু মজা করে নিতে হবে।' বাঘা এ কথায় একটু শান্ত হয়ে বলল, 'কি মজা করবে দাদা?' গুপি বলল, 'আগে ত খাবার মজাটা করে নিই, তারপর অন্য মজার কথা ভেবে দেখব এখন।'

এই বলে সে সেই ভূতের দেওয়া থলির ভিতরে হাত দিয়ে বলল, 'দাও ত দেখি, এক হাঁড়ি পোলাও।' অমনি একটা সুগন্ধ যে বেরুল! তেমন পোলাও রাজারাও সচরাচর খেতে পান না। আর সে কি বিশাল হাঁড়ি! গুপি কি সেটা থলির ভিতর থেকে তুলে আনতে পারে? যা হোক, কোনমতে সেটাকে বার করে এনে তারপর থলিকে বলল, 'ভাজা, ব্যঞ্জন, চাটনি, মিঠাই, দই, রাবড়ি, শরবত।—শিগ্‌গির শিগ্‌গির দাও।' দেখতে দেখতে খাবার জিনিসে আর সোনা-রূপোর বাসনে ঘর ভরে গেল। দুজন লোকে আর কত খাবে? সে অপূর্ব খাবার খেয়ে তাদের গায়ের ব্যথা কোথায় চলে গেল তার আর ঠিক নেই।

তখন বাঘা বলল, 'দাদা, চলো এই বেলা এখান থেকে পালাই, নইলে শেষে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে।' গুপি বলল, 'পাগল হয়েছ নাকি? আমাদের এমন জুতো থাকতেই কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে? দেখাই যাক-না, কি হয়।' এ কথায় বাঘা খুব খুশি হল, সে বুঝতে পারল যে,

।পিদা একটা-কিছু মজা করবে।

দুদিন চলে গেল, আর একদিন পরেই রাজা তাদের বিচার করবেন। বিচারের দিন রাত ।াকতে উঠে গুপি থলের ভিতর হাত দিয়ে বলল, 'আমাদের দুজনের রাজপোশাক চাই।' লতেই তার ভিতর থেকে এমন সুন্দর পোশাক বেরুল যে তেমন পোশাক কেউ তয়েরই ংরতে পারে না। সেই পোশাক তারা দুজনে পরে, তাদের পুরনো কাপড় আর বাসন কখানি টুলি বেঁধে নিয়ে, জুতো পায় দিয়ে তারা বলল, 'এখন আমরা মাঠে হাওয়া খেতে যাব।' মমনি দেখে, রাজবাড়ির বাইরের প্রকাণ্ড মাঠে চলে এসেছে। সে মাঠের এক জায়গায় গাদের পুঁটুলিটি লুকিয়ে রেখে, তারা বেড়াতে বেড়াতে এসে রাজবাড়ির সামনে উপস্থিত শল।

দূর থেকে তাদের আসতে দেখেই রাজার লোক ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিয়েছিল যে, মহারাজ, দুজন রাজা আসছেন।' রাজাও তা শুনে তাঁর ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছলেন। বাঘা আর গুপি আসতেই তিনি তাঁদের যার পর নাই আদর দেখিয়ে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। চমৎকার একটি ঘরে তাদের বাসা দেওয়া হল। কত চাকর, বামুন, পেয়াদা,, পাইক তাদের সেবাতে লেগে গেল, তার অন্ত নেই।

তাবপর গুপি আর বাঘা হাত-পা ধুয়ে জলযোগ করে একটু ঠাণ্ডা হলেই রাজামশাই আবার তাদের খবর নিতে এলেন। তাদের পোশাক দেখে অবধিই তিনি ভেবে নিয়েছেন যে, না জানি এঁরা কত বড় রাজাই হবেন।' তাবপব শেষে যখন তিনি গুপিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কোন্ দেশের রাজা?' তখন গুপি হাত জোড় করে তাঁকে বলল, 'মহাবাজ! আমরা কি রাজা হতে পারি? আমরা আপনার চাকর!'

গুপি সত্য কথাই বলেছিল, কিন্তু রাজার তাতে বিশ্বাস হল না। তিনি ভাবলেন, 'কি ভাল মানুষ, কেমন নরম হয়ে কথা বলে। যেমন বড় বাজা তেমনি ভদ্রলোকও দেখছি।' তিনি তখন আর বিশেষ কিছু না বলে তাদের দুজনকে তাঁর সভায় নিয়ে এলেন। সেখানে সেদিন সে দুটো লোকের বিচাব হবে—তিনদিন আগে যারা গিয়ে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকেছিল। বিচারের সময় উপস্থিত. আসামী দুটোকে আনতে পেযাদা গিয়েছে, কিন্তু তাদের আর কোথায় পাবে? এ তিন দিন তাদের ঘরে তালা বন্ধ ছিল, সেই তালা খুলে দেখা হল, সেখানে কেউ নেই, খালি ঘর পড়ে আছে।

তখন ত ভারি একটা ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি পড়ে গেল। দারোগামশাই বিষম ক্ষেপে গিয়ে পেয়াদাগুলোকে বকতে লাগলেন। পেযাদারা হাত জোড় করে বলল, 'হুজুর! আমাদেব কোনো কসুর নেই, আমরা তালা দিয়ে রেখেছিলাম, তার উপর আবার আগাগোড়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ও দুটো ত মানুষ ছিল না, ও দুটো ছিল ভূত, নইলে এর ভিতর থেকে কি করে পালায়।'

এ কথায় সকলেরই বিশ্বাস হল। রাজামশাইও প্রথমে দারোগার উপর রেগে তাঁকে কেটেই ফেলতে গিয়েছিলেন, শেষে ঐ কথা শুনে বললেন, 'ঠিক, ও দুটো নিশ্চয় ভূত। আমার ঘরও ত বন্ধ ছিল, তার ভিতর এতবড় ঢোল নিয়ে কি করে ঢুকেছিল?'

তা শুনে সকলেই বলল, 'হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, ও দুটো ভূত!' বলতে বলতেই অদের শরীর শিউরে উঠল, গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। তখন তারা বাঘার সেই ঢোলকটির কথা মনে

করে বলল, মহারাজ! ভূতের ঢোল বড় সর্বনেশে জিনিস! ওটাকে কখনো আপনার ঘরে রাখবেন না। ওটাকে এখনি পুড়িয়ে ফেলুন।'

রাজামশাইও বললেন 'বাপ রে! ভূতের ঢোল ঘরে রাখব এক্ষুনি ওটাকে এনে পোড়াও।'

যেই এ কথা বলা, অমনি বাঘা দুহাতে চোখ ঢেকে 'হাউ-হাউ-হাউ-হাউ' করে কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগল!

সেদিন বাঘাকে নিয়ে গুপির কি মুশকিলই হয়েছিল। ঢোল পোড়াবার নাম শুনেই বাঘা কাঁদতে আরম্ভ করেছে, ঢোল এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে না-জানি সে কি করবে। তখন, সেটা যে তারই ঢোল, সে কথা কি আর বাঘা সামলে রাখতে পারবে? কি সর্বনাশ! এখন বুঝি ধরা পড়ে প্রাণটাই হারাতে হয়।

গুপির বড়ই ইচ্ছা হচ্ছিল যে বাঘাকে নিয়ে ছুটে পালায়। কিন্তু তার ত আর জো নেই, সভায় বসবার সময় যে সেই জুতোগুলো পা থেকে খুলে রাখা হয়েছে।

এদিকে কিন্তু বাঘার কাণ্ড দেখে সভাময় এক বিষম হুলুস্থুল পড়ে গেছে। সবাই ভাবছে, বাঘার নিশ্চয় একটা ভারি অসুখ হয়েছে, আর সে বাঁচবে না। রাজবাড়ির বদ্যিঠাকুর এসে বাঘার নাড়ি দেখে যার পর নাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। বাঘাকে খুব করে জোলাপের ওষুধ খাইয়ে তার পেটে বেলেস্তারা লাগিয়ে দেওয়া হল। তারপর বদ্যিঠাকুর বললেন, 'এতে যদি বেদনা না সারে, তবে পিঠে আর-একটা, তাতেও না সারলে দুপাশে আর দুটো বেলেস্তারা লাগাতে হবে।'

এ কথা শুনেই বাঘার কান্না তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। তখন সকলে ভাবল যে, বদ্যিঠাকুর কি চমৎকার ওষুধই দিয়েছেন, দিতে দিতেই বেদনা সেরে গেছে।

যা হোক, বাঘা যখন দেখল যে তার কান্নাতে ঢোল পোড়াবার কথাটা চাপা পড়ে গেছে, তখন সেই বেলেস্তারার বেদনার ভিতরেই তার মনটা কতক ঠাণ্ডা হল। রাজামশাই তখন তাকে খুব যত্নের সহিত তার ঘরে শুইয়ে রেখে এলেন, গুপি তার কাছে বসে তার বেলেস্তারায় হাওয়া করতে লাগল।

তারপর সকলে ঘর থেকে চলে গেলে গুপি বাঘাকে বলল, 'ছি, ভাই, যেখানে-সেখানে কি এমন করে কাঁদতে আছে? দেখ দেখি, এখন কি মুশকিল হল।' বাঘা বলল, 'আমি যদি না কাঁদতুম, তা হলে ত এতক্ষণে আমার ঢোলকটি পুড়িয়ে শেষ করে দিত। এখন না হয় একটু জ্বলুনি সইতে হচ্ছে, কিন্তু আমার ঢোলকটা ত বেঁচে গেছে!'

বাঘা আর গুপি এমনি কথাবার্তা বলছে। এদিকে রাজামশাই সভায় ফিরে এলে দারোগামশাই তাঁর কানে কানে বললেন, 'মহারাজ, একটা কথা আছে, অনুমতি হয় ত বলি।' রাজা বললেন, 'কি কথা?' দারোগা বললেন, 'মহারাজ, ঐ যে লোকটা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল, সে আর তার সঙ্গের ঐ লোকটা, সেই দুই ভূত, আমি তাদের চিনতে পেরেছি।' রাজা বললেন, 'তাই ত হে, আমারও একটু যেন সেইরকমই ঠেকছিল। তা হলে ত বড় মুশকিল দেখছি। বলো ত এখন কি করা যায়?'

তখন এ কথা নিয়ে সভার মধ্যে ভারি একটা কানাকানি শুরু হল। কেউ বলল, 'রোজা ডাকো, ও দুটোকে তাড়িয়ে দিক।' আর-একজন বলল, 'রোজা যদি তাড়াতে না পারে, তখন ত সে দুটো ক্ষেপে গিয়ে একটা বিষম কিছু করতে পারে। তার চেয়ে কেন রাত্রে ঘুমের

ভিতরে ও দুটোকে পুড়িয়ে মারুন না।'

এ কথাটা সকলেরই খুব পছন্দ হল, কিন্তু এর মধ্যে একটু মুশকিল এই দেখা গেল যে, ভূতদের পোড়াতে গেলে রাজবাড়িতেও তখন আগুন ধ'রে যেতে পারে। শেষে অনেক যুক্তির পর এই স্থির হল যে, একটা বাগানবাড়িতে তাদের বাসা দেওয়া হবে; বাগানবাড়ি পুড়ে গেলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। রাজামশাই বললেন, 'সেই ঢোলকটাকেও তা হলে সেই বাগানবাড়িতে নিয়ে রাখা যাক, বাগানবাড়ি পোড়াবার সময় একসঙ্গে সকল আপদ চুকে যাবে।'

বাগানবাড়ি যাবার কথা শুনে গুপি আর বাঘা খুব খুশি হল। তারা ত জানে না যে এর ভিতর কি ভয়ানক ফন্দি রয়েছে; তারা খালি ভাবল যে বেশ আরামে নিরিবিলি থাকা যাবে, সংগীতচর্চারও সুবিধা হতে পারে। জায়গাটি খুবই নিরিবিলি আর সুন্দর। বাড়িটি কাঠের, কিন্তু দেখতে চমৎকার। সেখানে গিয়ে দেখতে দেখতে বাঘা ভাল হয়ে গেল। তখন গুপি তাকে বলল, 'ভাই, আর এখানে থেকে কাজ কি? চলো আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।' বাঘা বলল, 'দাদা, এমন সুন্দর জায়গায় ত আর থাকতে পাব না, দুদিন এখানে রইলাম বা। আহা, আমার ঢোলকটি যদি থাকত!'

সেদিন বাঘা বাড়ির এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুপি বাগানের এক জায়গায় ব'সে গুনগুন করছে, এমন সময় হঠাৎ বাঘা ভয়ানক চেঁচামেচি ক'রে উঠল। তার সকল কথা বোঝা গেল না, খালি 'ও গুপিদা! ও গুপিদা!' ডাকটা খুবই শোনা যেতে লাগল। গুপি তখন ছুটে এসে দেখল যে, বাঘা তার সেই ঢোলকটা মাথায় ক'রে পাগলের মত নাচছে, আর যা-তা আবোল-তাবোল বলতে বলতে 'গুপিদা গুপিদা' ব'লে চেঁচাচ্ছে। ঢোলক পেয়ে তার এত আনন্দ হয়েছে যে, সে আর কিছুতেই স্থির হতে পারছে না, গুছিয়ে কথাও বলতে পারছে না। এমনি ক'রে প্রায় আধঘণ্টা চ'লে গেলে পর বাঘা একটু শান্ত হয়ে বলল, 'গুপিদা, দেখছ কি, এই ঘরে আমার ঢোলকটি—আর কি মজা—হাঃ হাঃ হাঃ' ব'লে আবার সে মিনিট দশেক খুব নেচে নিল। তারপর সে বলল, 'দাদা, এত দুঃখের পর ঢোলকটি পেয়েছি, একটা গান গাও, একটু বাজিয়ে নি।' গুপি বলল, 'এখন নয় ভাই, এখন বড্ড খিদে পেয়েছে। খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে বারান্দায় ব'সে দুজনায় খুব ক'রে গানবাজনা করা যাবে।

রাজামশাই কিন্তু ঠিক করেছেন, সেই রাত্রেরই তাদের পুড়িয়ে মারবেন। দারোগার উপর হুকুম হয়েছে যে, সেদিন সন্ধ্যার সময় সেই বাগানবাড়িতে মস্ত ভোজের আয়োজন করতে হবে। দারোগামশায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক নিয়ে সেই ভোজে উপস্থিত থাকবেন. খাওয়াদাওয়ার পর গুপি আর বাঘা ঘুমিয়ে পডলে, তাঁরা সকলে মিলে একসঙ্গে সেই কাঠের বাড়ির চারিদিকে আগুন দিয়ে তাদের পালাবার পথ বন্ধ করবেন।

সেদিনকার খাওয়া বেশ ভালমতই হল। গুপি আর বাঘা ভাবল যে লোকজন চ'লে গেলেই তারা গান-বাজনা আরম্ভ করবে, দারোগামশাই ভাবলেন যে গুপি আর বাঘা ঘুমোলেই ঘরে আগুন দেবেন। তিনি তাদের ঘুম পাড়াবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাব দেখে যখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে, তারা না ঘুমোলে তিনি সেখান থেকে যাবেন না, তখন গুপি বাঘাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় প'ড়ে নাক ডাকাতে লাগল।

একটু পরেই গুপি আর বাঘা দেখল যে লোকজন সব চ'লে গেছে, আর কারু সাড়াশব্দ নেই। তারপর আর-একটু দেখে, যখন মনে হল যে বাগান একেবারে খালি হয়ে গেছে, তখন তারা দুজনে বারান্দায় এসে ঢোল বাজিয়ে গান জুড়ে দিল।

এদিকে দারোগামশাই তাঁর লোকদের ব'লে দিয়েছেন, 'তোরা প্রত্যেক দরজায় বেশ ভাল ক'রে আগুন ধরাবি; খবরদার, আগুন ভাল ক'রে না ধরলে চ'লে যাস নি যেন!' তিনি নিজে গিয়েছেন সিঁড়িতে আগুন ধরাতে। আগুন বেশ ভাল মতই ধরেছে দারোগামশাই ভাবছেন, 'এই বেলা ছুটে পালাই' এমন সময় বাঘার ঢোল বেজে উঠল, গুপিও গান ধ'রে দিল। তখন আর দারোগামশাই বা তাঁর লোকদের কারু সেখান থেকে নড়বার জো রইল না, সকলকেই পুড়ে মরতে হল। ততক্ষণে গুপি আর বাঘাও আগুন দেখতে পেয়ে, তাদের জুতোর জোরে, তাদের ঢোল আর থলেটি নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল।

সেদিনকার আগুনে দারোগামশাই ত পুড়ে মারা গিয়েছিলেনই, তাঁর দলের অতি অল্প লোকই বেঁচেছিল। সেই লোকগুলো গিয়ে রাজামশাইকে এই ঘটনার খবর দিতে তাঁর মনে বড়ই ভয় হল। পরদিন আর দু-চারজন লোক রাজসভায় এসে বলল যে, তারা সেই আগুনের তামাশা দেখতে সেখানে গিয়েছিল; তারা তখন ভারি আশ্চর্যরকমের গান-বাজনা শুনেছে, আর ভূত দুটোকে শূন্যে উড়ে পালাতে স্বচক্ষে দেখেছে। তখন যা রাজামশায়ের কাঁপুনি! সেদিন তাঁর সভা করা হল না। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে এসে ভূতের ভয়ে দরজা এঁটে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন, এক মাসের ভিতরে আর বাইরে এলেন না।

এদিকে গুপি আর বাঘা সেই আগুনের ভিতর থেকে পালিয়ে একেবারে তাদের বাড়ির কাছের সেই বনে এসে উপস্থিত হয়েছে, যেখানে প্রথমে তাদের দেখা হয়েছিল। তাদের বড় ইচ্ছা যে এত ঘটনার পর একবার তাদের মা-বাপকে দেখে যায়। বনে এসেই বাঘা বলল, 'গুপিদা, এইখানে না তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল?' গুপি বলল, 'হ্যাঁ!' বাঘা বলল, 'তবে এমন জায়গায় এসে কি একটু গান বাজনা না ক'রে চলে যেতে আছে?' গুপি বলল, 'ঠিক বলেছ ভাই, তবে আর দেরি কেন? এই বেলা আরম্ভ ক'রে দাও।' এই ব'লে তারা প্রাণ খুলে গান-বাজনা করতে লাগল।

এর মধ্যে এক আশ্চর্য ঘটনা হয়েছে। এক দল ডাকাত হাল্লার রাজার ভাণ্ডার লুটে, তার ছোট ছেলে দুটিকে সুদ্ধ চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, রাজা অনেক সৈন্য নিয়ে তাদের পিছু পিছু প্রাণপণে ছুটেও ধরতে পারছিলেন না। গুপি আর বাঘা যখন গান ধরেছে ঠিক সেই সময়ে সেই ডাকাতগুলোও সেই বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে গান একবার শুনলে ত আর তার শেষ অবধি না শুনে চ'লে যাবার জো নেই; কাজেই ডাকাতদের তখনি সেখানে দাঁড়াতে হল। সারা রাত্রের ভিতরে আর সে গান-বাজনাও থামল না, ডাকাতদেরও সেখান থেকে যাওয়া ঘটল না। সকালে হাল্লার রাজা এসে অতি সহজেই তাদের ধরে ফেললেন। তারপর যখন তিনি জানলেন যে, গুপি আর বাঘার গানের গুণেই তিনি ডাকাত ধরতে পেরেছেন, তখন আর তাদের আদর দেখে কে? রাজকুমারেরাও বললেন, 'বাবা, এমন আশ্চর্য গান আর কখ্খনো শোন নি; এদের সঙ্গে নিয়ে চলো।' কাজেই রাজা গুপি আর বাঘাকে বললেন, 'তোমরা আমার সঙ্গে চলো! তোমাদের পাঁচশো টাকা করে মাইনে হল।'

এ কথায় গুপি জোড়হাতে রাজামশাইকে নমস্কার ক'রে বলল, 'মহারাজ, দয়া ক'রে আমাদের দুদিনের ছুটি দিতে আজ্ঞা হোক। আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে দেখে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আপনার রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হব।' রাজা বললেন, 'আচ্ছা এ দুদিন আমরা এই বনেই বিশ্রাম করছি; তোমরা তোমাদের মা-বাপকে দেখে দুদিন পরে এসে এইখানেই আমাদের পাবে।'

গুপিকে তাড়িয়ে অবধি তার বাবা তার জন্য বড়ই দুঃখিত ছিল, কাজেই তাকে ফিরে আসতে দেখে তার বড় আনন্দ হল। কিন্তু বাঘা বেচারার ভাগ্যে সে সুখ মেলে নি। তার মা বাপ এব কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা তাকে ঢোল মাথায় ক'রে আসতে দেখেই বলল, 'ঐ রে! সেই বাঘা বেটা আবাব আমাদের হাড় জ্বালিয়ে মারবে: মাব বেটাকে!' বাঘা বিনয় ক'বে বলল, 'আমি খালি আমার মা-বাবাকে দেখতে এসেছি; দুদিন থেকেই চ'লে যাব, বাজাব টাজাব না।' সে কথা কি তাবা শোনে? তাবা দাঁত খিঁচিয়ে তাব মা বাপেব মৃত্যুব কথা ব'লে এই বড় লাঠি নিযে তাকে মারতে এল, সে প্রাণপণে ছুটে পালাতে পালাতে ইট মেরে তাব পা ভেঙে মাথা ফাটিযে রক্তাবক্তি ক'রে দিল।

গুপি তাদের ঘরের দাওয়ায় ব'সে তার বাপের সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সে দেখল যে বাঘা পাগলের মত হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে, তার কাপড ছিঁড়ে ফালি ফালি আব বক্তে লাল হয়ে গেছে। অমনি সে তাড়া-তাড়ি বাঘার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? তোমাব এ দশা কেন?' গুপিকে দেখেই বাঘা একগাল হেসে ফেলেছে। তারপব সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দাদা, বড্ড বেঁচে এসেছি! মূর্খগুলো আর একটু হলেই আমাব ঢোলটি ভেঙে দিয়েছিল।' গুপিদেব বাড়ি এসে গুপির যত্নে আর তাব মা বাপেব আদরে বাঘাব দুদিন যতটা সম্ভব সুখেই কাটল। দুদিন পবে গুপি তার মা-বাপের কাছ থেকে বিদায় নেবাব সময় ব'লে গেল, 'তোমরা তয়ের হয়ে থাকবে; আমরা ছুটি পেলেই এসে তোমাদেব নিয়ে যাব।'

তারপর কয়েক মাস চ'লে গিয়েছে। গুপি আব বাঘা এখন হাল্লার রাজার বাড়িতে পরম সুখে বাস করে। দেশ বিদেশে তাদের নাম রটে গিয়েছে—'এমন ওস্তাদ আর কখনো হয় নি, হবেও না।' রাজামশাই তাদেব ভারি ভালবাসেন; তাদের গান না শুনে একদিনও থাকতে পারেন না। নিজের দুঃখ সুখেব কথা সব গুপিব কাছে বলেন। একদিন গুপি দেখল রাজামশায়ের মুখখানি বডই মলিন। তিনি ক্রমাগতই যেন কি ভাবছেন, যেন তাঁব কোনো বিপদ হয়েছে। শেষে একবাব তিনি গুপিকে বললেন, 'গুপি, বড মুশকিলে পডেছি, কি হবে জানি না। শুণ্ডীর রাজা আমার রাজ্য কেড়ে নিতে আসছে।'

শুণ্ডীব বাজা হচ্ছেন সেই তিনি যিনি গুপি আর বাঘাকে পুড়িযে মারতে চেয়েছিলেন। তাঁর নাম শুনেই গুপির মনে একটা চমৎকার মতলব এল। সে তখন রাজামশাইকে বলল, 'মহারাজ! এর জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আপনাব এই চাকরকে হুকুম দিন, আমি এ থেকে হাসির কাণ্ড ক'রে দেব।' রাজা হেসে বললেন, 'গুপি, তুমি গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ, যুদ্ধের ধারও ধারে না, তার কিছু বোঝও না। শুণ্ডীর রাজাব বড় ভারি ফৌজ, আমি কি তার কিছু করতে পারি?' গুপি বলল, 'মহারাজ, হুকুম পেলে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। ক্ষতি ত কিছু হবে না।' রাজা বললেন, 'তোমরা যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পার।'

এ কথায় গুপি যার পর নাই খুশি হয়ে বাঘাকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগল।

গুপি আর বাঘা সেদিন অনেকক্ষণ ধ'রে পরামর্শ করেছিল। বাঘার তখন কতই উৎসাহ! সে বলল, 'দাদা, এবারে আমরা দুজনে মিলে একটা কিছু করবই করব। আমার শুধু একটা কথায় একটু ভয় হচ্ছে; হঠাৎ যদি প্রাণ নিয়ে পালাবার দরকার হয়, তবে হয়ত আমি জুতোর কথা ভুলে গিয়ে সাধারণ লোকের মত কষে ছুট দিতে যাব, আর মার খেয়ে সারা হব। এমনি ক'রে দেখ-না সেবারে আমাদের গাঁয়ের মূর্খগুলোর হাতে আমার কি দশা হ'ল!'

যা হোক, গুপির কথায় বাঘার সে ভয় কেটে গেল, আর পরদিন থেকেই তারা কাজে লাগল। দিনকতক ধ'রে রোজ রাত্রে তারা শুণ্ডী চ'লে যায়, আর রাজবাড়ির আশেপাশে ঘুরে সেখানকার খবর নেয়। যুদ্ধের আয়োজন যা দেখতে পেল সে বড়ই ভয়ংকর; এ আয়োজন নিয়ে এরা হাল্লায় গিয়ে উপস্থিত হলে আর রক্ষা নেই। রাজার ঠাকুরবাড়িতে রোজ মহাধুমধামে পুজো হচ্ছে। দশ দিন এমনিতর পুজো দিয়ে, ঠাকুরকে খুশি ক'রে তারা হাল্লায় রওনা দেবে।

গুপি আর বাঘা এর সবই দেখল, তারপর একদিন তাদের ঘরে ব'সে দরজা এঁটে, সেই ভুতের দেওয়া থলিটিকে বলল, 'নতুন ধরনের মিঠাই চাই খুব সরেস।' সে কথায় থলির ভিতর থেকে মিঠাই যা বেরুল, সে আর বলবার নয়। তেমনি মিঠাই কেউ খায় নি, চোখেও দেখে নি। সেই মিঠাই নিয়ে বাঘা আর গুপি শুণ্ডীর রাজার ঠাকুরবাড়ির বিশাল মন্দিরের চুড়োয় গিয়ে বসল। নীচে খুব পুজোর ধুম—ধুপধুনো শঙ্খঘণ্টা কোলাহলের সীমা নেই, আঙিনায় লোকে লোকারণ্য। সেই সব লোকের মাথার উপরে ঝড়াৎ ক'রে মিঠাইগুলো ঢেলে দিয়ে বাঘা আর গুপি মন্দিরের চুড়ো আঁকড়ে ব'সে তামাশা দেখতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে সেই ধুপধুনো আর আলোর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কেউ তাদের দেখতে পেল না।

মিঠাই গুলি আঙিনায় পড়তেই অমনি কোলাহল থেমে গেল। অনেকেই লাফিয়ে উঠল, কেউ কেউ চেঁচিয়ে ছুটও দিল। তারপর দু-চারজন সাহসী লোক কয়েকটা মিঠাই তুলে, আলোর কাছে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। শেষে তাদের একজন চোখ বুঁজে তার একটু মুখে পুরে দিল; দিয়ে আর কথাবার্তা নেই— সে দুহাতে আঙিনা থেকে মিঠাই তুলে খালি মুখে দিচ্ছে আর নাচছে আর আহ্লাদে চেঁচাচ্ছে। তখন সেই আঙিনা -সুদ্ধু লোক মিঠাই খাবার জন্য পাগলের মত কাড়াকাড়ি আর কিচিরমিচির করতে লাগল।

এদিকে কয়েকজন ছুটে গিয়ে রাজামশাইকে বলেছে, 'মহারাজ! ঠাকুর আজ পুজোয় তুষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে যে কি অপূর্ব প্রসাদ, সে কথা আমরা বলতে পারছি না।' সে কথা শুনবামাত্রই রাজামশাই প্রাণপণে কাছা গুঁজতে গুঁজতে উর্ধ্বশ্বাসে এসে ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু হায়! ততক্ষণে সব প্রসাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত উঠোন ঝাঁট দিয়েও রাজামশাইয়ের জন্য একটু প্রসাদের গুঁড়ো পাওয়া গেল না। তখন তিনি ভারি চটে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের কি অন্যায়। পুজো করি আমি, আর প্রসাদ খেয়ে শেষ কর তোমরা! আমার জন্যে একটু গুঁড়োও রাখ না! তোমাদের সকলকে ধ'রে শুলে চড়াব!' এ কথায় সকলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জোড়হাতে বলল, 'দোহাই মহারাজ! আপনার প্রসাদ কি আমরা খেয়ে শেষ করতে পারি? বাপ রে! আমরা খেতে না খেতেই ধাঁ ক'রে কোন্‌খান

দিয়ে ফুরিয়ে গেল! আজ আমাদের প্রসাদগুলো আপনি মাপ করুন; কালকের যত প্রসাদ, সব মহারাজ একাই খাবেন!' রাজা তাতে বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে। খবরদার মনে থাকে যেন।'

পরদিন রাজামশাই প্রসাদ খাবেন, তাই একপ্রহর বেলা থাকতেই তিনি ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় এসে আকাশের পানে তাকিয়ে বসে আছেন। আর সকলে ভয়ে ভয়ে একটু দূরে ব'সে তাঁকে ঘিরে তামাশা দেখছে। আর পূজোর ঘটা অন্যদিনের চেয়ে শতগুণ; সবাই ভাবছে, দেবতা তাতে খুশি হয়ে রাজামশাইকে আরো ভাল প্রসাদ দেবেন।

রাত-দুপুরের সময় গুপি আর বাঘা আরো আশ্চর্যরকমের মিঠাই নিয়ে এসে মন্দিরের চুড়োয় বসল। আজ তাদের পরনে খুব জমকালো পোশাক, মাথায় মুকুট, গলার হার, হাতে বালা, কানে কুণ্ডল তারা দেবতা সেজে এসেছে। ধোঁয়ার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু রাজামশাই আকাশের পানে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় গুপি আর বাঘা হাসতে হাসতে তাঁর উপরে সেই মিঠাইগুলো ফেলে দিল। তাতে রাজামশাই প্রথমে একটা চিৎকার দিয়ে তিন হাত লাফিয়ে উঠলেন, তারপর তাড়াতাড়ি সামলিয়ে নিয়ে, দুহাতে মিঠাই তুলে মুখে দিতে লাগলেন, আর ধেই ধেই ক'রে নাচটা যে নাচলেন!

এমন সময় গুপি আর বাঘা হঠাৎ মন্দিরের চুড়ো থেকে নেমে এসে রাজার সামনে দাঁড়াল। তাদের দেখে সকলে 'ঠাকুর এসেছেন' ঠাকুর এসেছেন ব'লে কে আগে গড় করবে ভেবে ঠিক পায় না; রাজা মশায়ই ত লম্বা হয়ে মাটিতে পড়েই রয়েছেন, আর খালি মাথা ঠুকছেন। গুপি তাঁকে বলল, 'মহারাজ! তোমার নাচ দেখে আমরা বড়ই তুষ্ট হয়েছি, এসো তোমার সঙ্গে কোলাকুলি, করি।' রাজা তা শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন; দেবতার সঙ্গে কোলাকুলি, সে কি কম সৌভাগ্যের কথা?

কোলাকুলি আরম্ভ হল। সকলে 'জয় জয়' বলে চেঁচাতে লাগল। সেই অবসরে গুপি আর বাঘা রাজামশাইকে খুব ক'রে জড়িয়ে ধ'রে বলল, 'এখন তবে আমাদের ঘরে যাব!' বলতে বলতেই তারা তাঁকে সুদ্ধ একেবারে এসে তাদের নিজের ঘরে উপস্থিত। ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় সেই লোকগুলো অনেকক্ষণ ধ'রে হাঁ ক'রে আকাশের পানে চেয়ে রইল। তারপর যখন রাজা মশাই আর ফিরলেন না, তখন তারা যে যার ঘরে এসে বলল, 'কি আশ্চর্য্যই দেখলাম! রাজামশাই সশরীরে স্বর্গে গেলেন! দেবতারা নিজে তাঁকে নিতে এসেছিলেন!''

এদিকে রাজামশাই গুপি আর বাঘার কোলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ঘরে এসেও অনেকক্ষণ তাঁর জ্ঞান হয় নি। ভোরের বেলায় তিনি চোখ মেলে দেখলেন যে, সেই দু'টো ভূত তাঁর মাথার কাছে ব'সে আছে। অমনি তিনি তাদের পায়ে প'ড়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'দোহাই বাবা! আমাকে খেয়ো না! আমি দুশো মোষ মেরে তোমাদের পুজো করব।'

গুপি বলল, 'মহারাজ, আপনার কোন ভয় নেই। আমরা ভূতও নই, আপনাকে খেতেও যাচ্ছি না।' রাজামশাইয়ের কিন্তু তাতে একটুও ভরসা হল না। তিনি আর কোনো কথা না ব'লে মাথা গুঁজে ব'সে কাঁপতে লাগলেন।

এদিকে বাঘা এসে হাল্লার রাজাকে বলল, 'কাল রাত্রে আমরা শুন্ডীর রাজাকে ধ'রে এনেছি; এখন কি আজ্ঞা হয়? হাল্লার রাজা বললেন, 'তাঁকে নিয়ে এসো।'

দুই রাজায় যখন দেখা হল, তখন শুন্ডীর রাজা বুঝতে পারলেন যে তাঁকে ধ'রে এনেছে। হাল্লা জয় করা ত তাঁর ভাগ্যে ঘটলই না, এখন প্রাণটিও যাবে। কিন্তু হাল্লার রাজা তাঁকে প্রাণে না মেরে শুধু তাঁর রাজ্যই কেড়ে নিলেন। তারপর তিনি গুপি আর বাঘাকে বললেন, 'তোমরাই আমাকে বাঁচিয়েছ, নইলে হয়ত আমার রাজ্যও যেত, প্রাণও যেত। আমি আর তোমাদের কি উপকার করতে পারি? শুন্ডীর রাজ্যের অর্ধেক আর আমার দুটি কন্যা তোমাদের দুজনকে দান করলাম।'

তখন খুবই একটা ধুমধাম হল। গুপি আর বাঘা হাল্লার রাজার জামাই হয়ে আর শুন্ডীর অর্ধেক রাজ্য পেয়ে পরম আনন্দে সঙ্গীত চর্চা করতে লাগল। গুপির মা-বাপের মান্য আর সুখ তখন দেখে কে?

লাল সুতো আর নীল সুতো

এক জোলা একদিন তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'আমি পায়েস খাব, পায়েস রেঁধে দাও।' জোলার স্ত্রী বলিল, 'ঘরে কাঠ নেই, কাঠ এনে দাও, পায়েস রেঁধে দিচ্ছি।' জোলা কাঠ আনিতে গেল।

পথের ধারে একটা বড় আম গাছ ছিল, তাহার একটু শুক্‌নো ডালের আগায় বসিয়া জোলা তাহারই গোড়ার দিকটা কাটিতেছে। তাহা দেখিয়া পথের লোক একজন ডাকিয়া বলল, 'ওহে ও ডাল কেটো না, কাটলে পড়ে যাবে।' জোলা বিরক্ত হইয়া বলিল, 'তুমি গুনতে জানো নাকি? ও ডাল কাটলে পড়ে যাব, তা তুমি কি ক'রে জানলে? আমি পায়েস খাব না বুঝি!' পথের লোক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। আর, খানিক পরে জোলাও ডালসুদ্ধ পড়িয়া গেল।

গাছ হইতে পড়িয়াই জোলা ভাবিল, 'তাই ত! আমি প'ড়ে যাব, তা ও জানলে কি ক'রে? ও নিশ্চয় একটা কেউ হবে।' এই ভাবিয়া জোলা ছুটিয়া গিয়া সেই পথিকের পা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রভু আপনি কে? আমি কবে মরব, সেটি আমাকে ব'লে দিন পথিক ভারি মুশকিলেই পড়িল। জোলার খুব বিশ্বাস হইয়াছে যে, এ পথিক সামান্য পথিক নয়; সুতরাং তাহার প্রশ্নের উত্তর না পাইলে তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতেছে না। শেষটা পথিক যখন দেখিল যে, একটা কিছু না বললে তাহার আর ঘরে যাওয়া হইতেছে না, তখন সে রাগিয়া বলিল, 'তোর পেটের ভিতর থেকে লাল সুতো আর নীল সুতো যখন বেরুবে, তখন তুই মরবি।' এই কথায় জোলা সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ি ফিরিল।

এখন হইতে জোলা ঠিক হইয়া বসিয়া আছে যে, লাল সূতা আর নীল সূতা বাহির হইলেই তাহার মৃত্যু। সুতরাং সে রোজ পরীক্ষা করিয়া দেখে, তাহা বাহির হইল কি না। এইরূপ পরীক্ষা করিতে গিয়া একদিন সত্য সত্যই তাহার কাপড়ে একখণ্ড লাল সূতা আর একখণ্ড নীল সূতা পাইল। আর, অমনি সে চিৎকার করিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'ওগো শিগ্‌গির এস, আমি মরে গিয়েছি—আমার লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছে।' তাহার স্ত্রী আসিয়া দেখিল, সত্য সত্যই লাল সূতা আর নীল সূতা। তখন সে বেচারা কি করে,

জোলাকে বিছানায় শোয়াইয়া কাপড় চাপা দিয়া সে কাঁদিতে বসিল। এর মধ্যে আর দু-চারজন জোলা বেড়াইতে আসিয়া দেখে যে, জোলার স্ত্রী কাঁদিতেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিল যে, লাল সূতা নীল সূতা পাওয়া গিয়াছে, তখন সকলে স্থির করিল যে, জোলা নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার সৎকারের চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

কিন্তু ইহার মধ্যে ভারি মুশকিল দেখা দিল। পোড়ানোতে জোলা কিছুতেই রাজি নয়। পোড়ানোর কথা তুলিতেই সে বলে, 'ওমা! পুড়ে যাব যে!' মরিয়া গেলে তাহাকে পোড়ানো ছাড়া আর কি করা যায়? -গোর দেওয়া! কিন্তু জোলা তাহাতেও অসম্মত। বলে, 'ওমা! দম আট্‌কে যাবে যে! শেষে অনেক যুক্তির পর স্থির হইল যে, জোলাকে গোর দেওয়াই হইবে, কিন্তু মুখখানা জাগাইয়া রাখা যাইবে। জোলা তাহাতে রাজি হইল; কিন্তু সে বলিল যে খিদে পেলে চারটি ভাত দিয়ো।' এইরূপ পরামর্শের পর জোলাকে গোর দেওয়া হইল; অর্থাৎ তাহার মুখ জাগিয়া রহিল, আর-সব মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিল।

এইরূপে সমস্ত দিন চলিয়া গেল। রাত্রিতে চারটি ভাত খাইয়া জোলা একটু নিদ্রার চেষ্টা দেখিল।

সেই রাত্রিতে সাত চোর রাজার বাড়িতে চুরি করিতে চলিয়াছে। চোরেরা ত আর বাবুদের মতন সদর রাস্তা দিয়ে চলে না—তাহা প্রায়ই ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়া চলে, আর সে-সব জায়গা অনেক সময়ই নোংরা থাকে। চলিতে চলিতে একজন চোর কাদার মতন একটা কি জিনিস মাড়াইল, সে জিনিসটার বিশ্রী গন্ধ। সে পা মুছিবার জন্য একটা জায়গা খুঁজিতে লাগিল। উহার নিকটেই জোলাকে গোর দিয়াছে, সে চোর পা মুছিবি ত মোছ, সেই জোলার মুখে গিয়া মুছিতে লাগিল! ঘষার আর গন্ধের চোটে জোলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সে রাগিয়া বলিল, 'উঃ—হুঃ—হুঃ— তোমার কি চোখ নাই না কি?'

চোর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই কে রে?'

জোলা বলিল, আমি জোলা।'

'এখানে কি কবছিস?'

'আমি যে ম'রে গিয়েছি; আমার লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছে—তাই আমাকে গোর দিয়েছে!'

এই কথা শুনিয়া চোরেরা খুব হাসিতে লাগিল। তারপর তাহাদের একজন বলিল, 'একে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল।'

চোররা জোলাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার মৃত্যু হয় নাই, আর তাহাদের সঙ্গে গেলে পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে। জোলা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি খাওয়াবে? পায়েস? 'চোরেরা বলিল, 'হ্যাঁ, পায়েস—চল্' পায়েসের কথা শুনিয়া জোলা কোন আপত্তি করিল না। চোরেরা তাহাকে উঠাইয়া লইয়া চলিল।

রাজার বাড়িতে গিয়া চোরেরা রাজার ঘরে প্রকাণ্ড সিঁদ কাটিল। তারপর জোলাকে ঐ সিঁদের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া বলিল, 'রাজার মাথার মুকুটটা নিয়ে আয়।' রাজার খাটে মশারি খাটানো ছিল, তাহা দেখিয়া জোলা ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল। সে মশারির চারিদিক ঘুরিয়া কোথাও তাহার দরজা দেখিতে পাইল না; সুতরাং চোরেদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'হল না; ওর ভিতরে আর একটা ঘর আছে, তার দরজা নেই।'

চোরেরা বলিল, 'দূর বোকা! ওটা ঘর নয়, মশারি। ওটাকে তুলে দেখলি না কেন?' জোলা আবার ঘরের ভিতরে গেল।

এবার জোলা মশারি তুলিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু সেটাকে নাড়িতেও পারিল না—কারণ সে খাটসুদ্ধ ধরিয়া টানাটানি করিয়াছিল। সে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'না ভাই, ওটা বড্ড ভারি।'

'আরে এমন গাধাও আর দেখি নি! তুই বুঝি খাটসুদ্ধ তুলতে গিয়েছিলি? শুধু ওর কাপড়টা টানতে হয়।'

এবারে জোলা আর কোন ভুল করিল না। মশারির কাপড় ধরিয়া টানিতেই সেটা উঠিয়া আসিল। ভিতরে খুব উঁচু গদ্দির উপরে রাজা শুইয়া আছেন, তাঁহার গায়ে ঝালর-দেওয়া অতিশয় পুরু লেপ। দেখিয়া জোলার মনে ভারি দুঃখ হইল। সে ভাবিল, বুঝি রাজাকে গোর দিয়েছে। তারপর দেখিল, মুখখানি জাগিতেছে! তখন সে ভাবিল যে, 'ঠিক ত আমারই মতন করেছে দেখছি! এরও লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছিল নাকি?' জোলা যত ভাবে, ততই আশ্চর্য হয়, আর ততই তাহার জানিতে ইচ্ছা করে, রাজা মহাশয়েরও লাল সূতা নীল সূতা বাহির হইয়াছিল কি না। শেষটা এমন হইল যে, এই খবরটা তাহার না জানিলেই নয়। সুতরাং সে রাজাকে ঠেলিয়া জাগাইল। আর, তিনি চোখ মেলিবামাত্রই, জিজ্ঞাসা করিল 'লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছিল?'

ইহার পর একটা মস্ত গোলমাল হইল। রাজবাড়ির সকলে জাগিয়া গেল, সাত চোর ধরা পড়িল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জোলাও ধরা পড়িল।

পরদিন বিচারে সাত চোরের উচিত সাজা হইল। আর জোলাকে পেট ভরিয়া উত্তম উত্তম পায়েস খাওয়াইয়া বিদায় দেওয়া হইল।

দুষ্ট দানব

এক দানব আর এক চাষা, দুজনে পাশা খেলছিল। খেলায় চাষার হার হল।

পাশায় হেরে চাষা হায় হায় করতে লাগল। খেলবার আগে সে বাজি রেখেছিল যে, সে হারলে দানব তার ছেলেটিকে নিয়ে যাবে। এখন উপায় কি হবে? দানব কিছুতেই ছাড়বে না; সে বলছে, 'কালই এসে আমি ছেলে নিয়ে যাব। যদি তাকে রাখতে চাও, তবে এমন করে তাকে লুকিয়ে রেখে দাও যাতে আমি খুঁজে বার না করতে পারি। খুঁজে পেলে কিন্তু আর তাকে ফেলে যাব না।'

হায়, কি বিপদ! ছেলেটিকে কোথায় লুকোবে? যেখানেই রাখুক, দানব নিশ্চয় তাকে খুঁজে বার করবে। চাষা ভেবে কিছু বুঝতে না পেরে শেষে দেবতার রাজাকে ডাকতে লাগল। দেবতার রাজা তাঁর দুঃখ দেখে দয়া করে বললেন, 'তোমার কোনো চিন্তা নেই; আমি তোমার ছেলেটিকে এমন করে লুকিয়ে দেব যে দানবের বাবাও তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না।'

এই বলে তিনি ছেলেটিকে গমের ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে তাকে একটা ছোট্ট গমের ভিতরে

লুকিয়ে রাখলেন। তার পরদিন দানব এসে চাষার ঘরে, বাগানে, পুকুরে, বাক্স, উনুনে, হাঁড়িতে, হুঁকোর ভিতরে—কতই খুঁজল, কোথায়ও ছেলেটিকে দেখতে পেল না। কিন্তু সে এমনি দুষ্ট দানব ছিল—সে তখনি বুঝে নিল যে, তবে নিশ্চয় গমের ক্ষেতে গমের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছে! অমনি সে কাস্তে নিয়ে গিয়ে ঘ্যাঁশ ঘ্যাঁশ করে গম কাটতে লাগল! সব গম কেটে, তারপর তার এক-একটি করে দানা হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখে, সে দুদণ্ডের মধ্যেই ধরে ফেলল যে, এই গমটার ভিতর চাষার ছেলে বসে আছে।

আর-একটু হলেই সে সেই গমটার ভিতর থেকে চাষার ছেলেটিকে বার করে নিয়ে যেত। এর মধ্যে দেবতার রাজা এসে তার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি চাষার হাতে দিয়ে বললে, আমার যা সাধ্য আমি তা করেছি; এর বেশি আর পারব না।' দানব ছেলেটিকে নিতে না পেরে ভারি চটে বলল 'বটে, আমাকে ফাঁকি দিলে সে হবে না, আমি কাল আবার আসব।'

দেবতার রাজা যখন পারলেন না, তখন চাষা আলোর দেবতার কাছে গেল। আলোর দেবতা এসে তার ছেলেটিকে একটি রাজহাঁসের গলায় পালক বানিয়ে রেখে দিলেন। কিন্তু তাতে কি সে দানবকে ঠকাবার জো আছে? সে এসেই হাঁসের গলা ছিঁড়ে সেই পালকটি সুদ্ধ তাকে মুখে দিতে গিয়েছে। ভাগ্যিস পালকটি তখন তার ঠোঁটে লেগে রইল, নইলে আব উপায়ই ছিল না। পালকটিকে দানবের ঠোঁটে লাগাতে দেখেই আলোর দেবতা সেটিকে উড়িয়ে নিয়ে চাষাব কাছে পৌঁছে দিলেন, আর বললেন, আমি আর কিছু করতে পারব না।' দানব সেদিনও ঠকে গেল, কিন্তু যাবাব সময় বলে গেল, 'কাল আবার আসব।'

দেবতার রাজা হেরে গেলেন, আলোব দেবতা হেরে গেলেন। চাষা তখন আগুনের দেবতাকে ডেকে বলল, 'ঠাকুব! আপনি আমাব ছেলেটিকে বাঁচান!' আগুনেব দেবতা তখন ছেলেটিকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে একটা মাছের পেটের মধ্যে তার একটি ডিমের ভিতর লুকিয়ে রাখলেন।

দানব কিন্তু এর সবই টের পেয়েছে, আব তাই এবারে সে ছিপ নিয়ে তয়ের হয়ে এসেছে। সমুদ্রে কত কোটি কোটি মাছ, তার ভিতর থেকে সে সেই মাছটাকে দেখতে দেখতে ধরে ফেলল। সেই মাছটার পেটে কত কোটি কোটি ডিম, তার ভিতর থেকে সে সেই ডিমটাকে দেখতে দেখতে খুঁজে বাব করল।

তখন আগুনের দেবতা সেই ডিমটি তার তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চুপি চুপি ছেলেটিকে বললন, শিগগির ঘরে পালিয়ে যা; ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিস।' এ কথা তখন দানব শুনতে পায় নি। তারপর ছেলেটি পালিয়ে অনেক দূরে গেলে সে তাকে দেখতে পেল। অমনি ঘোঁত করে লাফিয়ে উঠে সে তার পিছু পিছু ছুটল। কিন্তু ছেলেটি ততক্ষণে ঘরে ঢুকে গিয়েছে দানবটাও তাকে ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি গেল সেই ঘরে ঢুকতে, সে জানত না যে আগুনের দেবতা এর আগেই কখন সেই ঘরের দরজায় তিন হাত লম্বা এক লোহার খোঁচ বসিয়ে রেখেছেন। দানব বাগে ভূত হয়ে ঘরে ঢুকবার সময় সেই খোঁচ আগাগোড়া গেল তার মাথায় ঢুকে। তখন সে ভয়ানক চেঁচিয়ে চিতপাত হয়ে পড়ে যেতেই আগুনের দেবতা ছুটে এসে তার একটা পা কেটে ফেললেন।

কিন্তু পা কাটলে কি হবে? দুষ্ট দানব তাকে কি জাদুই করে রেখেছে— সে কাটা পা

তখনি এসে আবার জোড়া লেগে গেল! যা হোক আগুনের দেবতা সেই দানবের থেকে বড় জাদুকর ছিলেন; তিনি জানতেন যে কাটা জায়গায় লোহা আর পাথর ফেলে দিলে আর তা জোড়া লাগতে পারে না। কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি দানবের আর একটা পা কেটেই লোহা আর পাথর দিয়ে কাটা জায়গা চাপা দিয়ে ফেললেন। তখন আর দানবের জাদু খাটল না, দেখতে দেখতে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

তখন ত চাষার খুব আনন্দ হল। সে আগুনের দেবতাকে কত প্রণাম যে করল তা গুণে শেষ করা যায় না। তারপর থেকে সে সকলকে বলত যে, এই দেবতাটির মত দেবতা নেই।

গল্প নয় সত্য ঘটনা

জন্তুওয়ালা অনেক জন্তু লইয়া শহরের একটি ঘর ভাড়া করিয়াছে মনে করিয়াছে, আজ হাটের দিন বিস্তর লোক হাটে আসিবে, আর তামাশা দেখিয়া পয়সা দিবে। হাটে লোক কম নাই, কিন্তু জন্তুওয়ালার ঘরের আধখানাও ভরিল না। জন্তুগুলারও যেন ফুর্তি নাই। লোক কম দেখিয়া তাহারাও কেমন হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। ভাল তামাশা হইতেছে না দেখিয়া যে দু-চার জন দর্শক উপস্থিত, তাহারাও হাসি-ঠাট্টা করিতেছে।

এমন সময়ে বাঘটার যেন কি হইল। সে এতক্ষণ খাঁচার এক কোণে শুইয়া ঝিমাইতেছিল। কথা নাই, বার্তা নাই। হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া, খাঁচার শিক ধরিয়া দাঁড়াইয়া ভয়ানক গর্জন। সেই গর্জন শুনিয়া দর্শকেরা হাসি ঠাট্টা ফেলিয়া, দুই লাফে দূরে সরিয়া গেল।

ব্যাপারখানা কি? এত রাগের ত কোনো কারণই দেখা যায় না—তবে ঐ যে গাঁট্টাগোঁটাটা, লাল-গোঁফওয়ালা জাহাজের মাল্লাটা, নীল কোট পরিয়া থেঁতলো টুপি মাথায় দিয়া, এইমাত্র তামাশা দেখিবার জন্য ঘরের ভিতরে আসিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া যদি বাঘ মহাশয়ের ক্রোধ হইয়া থাকে।

মাল্লা বাঘের খাঁচার দিকে চাহিল, বাঘটাকেও খানিকক্ষণ ধরিয়া মনোযোগ করিয়া দেখিল, তারপর অমনি একেবারে বাঘের কাছে গিয়া উপস্থিত! বাঘ তাহাকে কাছে পাইয়া আরো গর্জন করিয়া উঠিল। দর্শকেরা ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল, আর তাহাদের বড় ভয়ও হইল। মাল্লা কিন্তু ততক্ষণে খাঁচার ভিতর হাত ঢুকাইয়া দিয়া, দিব্যি বাঘের মাথা চাপড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—সেটাকে যেন সে বিড়াল ছানা পাইয়াছে। মাল্লা বলিল 'কি রে বিল্লি, কেমন আছিস ভাই?' লোকগুলি ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। যে-ভয়ঙ্কর দাঁত, এক কামড়েই ত মাল্লার হাতখানাকে একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। বাঘ কিন্তু তেমন কিছুই করিল না। সে তাহার প্রকাণ্ড মাথাটা আনিয়া, আদর করিয়া জ্যাকের (মাল্লার নাম) হাতে ঘষিতে লাগিল, আর আদর পাইলে বিড়ালের গলায় যেমন গুড়গুড় শব্দ হয়, তেমনি শব্দ করিতে লাগিল।

মুহূর্তের মধ্যে বাহিরের লোকে ইহার খবর পাইয়া দৌড়িয়া ঘরে আসিতে লাগিল, ঘরে আর লোক ধরে না। কত লোক দরজায় এক পয়সার জায়গায় সিকি দুআনি ফেলিয়া দিয়া আর বাকি পয়সার জন্য দাঁড়ায় নাই, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিতে পারিলেই ঢের মনে করিয়াছে। জন্তুওয়ালার এখন আর দুঃখ করিবার কোনো কারণ নাই। তাহার বাক্স বোঝাই হইয়া

গিয়াছে।

মাল্লা তৎক্ষণে জন্তুদের একজন প্রহরীর হাত ধরিয়া বলিল, 'বিল্লির খাঁচাটা একবার খোলো না ভাই। ও আমার পুরনো বন্ধু; একবার ভেতরে গিয়ে ওর সঙ্গে পুরনো কালের দুটো গল্প করে নিই।'

প্রহরী বেচারা একটু মুশকিলে পড়িল, আর তা হওয়ারই কথা। বাঘকে বিশ্বাস কি? চোখের সামনে একটা লোককে চিবাইয়া খাইবে, এরূপ দেখিতে তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। আর খাঁচা খুলিলে জ্যাক ঘরে যাইবেন, অথচ বাঘ বাহিরে আসিবেন না, এরূপ করাও ত সহজ ব্যাপার নয়। যদি একবার বাহিরে আসিয়া হাই তোলেন তবে তামাশাটা কি রকমের হইবে! প্রহরী আমতা আমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি সত্যি বলছ নাকি?' জ্যাক একটু চটিয়া বলিল, 'সত্যি বলছি না ত কি? এ কোথাকার বোকা! দেখতে পাচ্ছ না, ও আমাকে চিনতে পেরেছে?'

বাঘ সেই সময় আর-এক হাঁক দিয়াছে, যেন বলিতেছে—'হ্যাঁ হে হ্যাঁ।'

প্রহরী অনেক ইতস্তত করিয়া একহাতে দরজা খুলিল, আর-এক হাতে একখানা লোহার রুল বাগাইয়া ধরিল। জন্তুগুলি কথা না শুনিলে রুল দিয়া সে তাহাদের শাসন করে।

যেই দরজা খুলিল, অমনি দর্শকেরা তাড়াতাড়ি সরিয়া দাঁড়াইল— পাছে বাঘমহাশয়ের হঠাৎ জলযোগের খেয়াল হয়, আর বাহিরে আসিয়া দু-একটিকে ধরিয়া মুখে দেন! কিন্তু বিল্লি তাহার বন্ধুকে লইয়া ব্যস্ত ছিল. অন্য লোকের কোনো খবর নেয় নাই।

বাঘ অনেকবার মাল্লার চারিদিকে ঘুরিয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাহার গায়ে মাথা ঘষিতে লাগিল, তারপর দুই পায়ে দাঁড়াইয়া, হাত দুখানি জ্যাকের কাঁধে তুলিয়া দিল। জ্যাকও তাহার টুপিটা লইয়া বাঘের মাথায় পরাইয়া দিল।

টুপি পরিয়া বাঘকে নেহাত মন্দ দেখিতে হইল না—দর্শকেরা খুবই হাসিয়াছিল। কিন্তু তারপর আরো মজা হইয়াছিল।

টুপিটি ফিরাইয়া লইয়া মাল্লা বলিল, 'বিল্লি যা শিখিয়েছিলাম, মনে আছে ত? দেখি— লাফা।' মাল্লা হাত খুব বাড়াইয়া ধরিল, আর বাঘ তাহার ঐ প্রকাণ্ড শরীরটা লইয়া পরিষ্কার তাহার উপর দিয়া লাফাইয়া গেল।

'আচ্ছা ফিরে এসো।' বাঘ অমনি আবার লাফাইয়া ফিরিয়া আসিল। ভারি বাধ্য ছাত্র!

প্রহরী ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল। সে কত চেষ্টা করিয়াও সেই বাঘকে দিয়া এত কাজ করাইতে পারে নাই। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই, এত কথা ওকে কি করে শেখালে?'

জ্যাক হাসিয়া বলিল, 'জাহাজে থাকতে ওকে খাওয়ানোর ভারটা আমার হাতেই ছিল। সেটা দেখছি আজও সে ভোলে নি, —কেমন রে বিল্লি?' বাঘ একটু ঘোঁত করিল, যেন বলিল 'আরে, না।'

মাল্লা বলিল, 'আচ্ছা বিল্লি, বোসো ত'— অমনি বাঘ মাটিতে বিড়ালের মতন করিয়া বসিয়া পড়িল। মাল্লা তাহার গায়ে ঠেসান দিয়া বসিয়া এক হাতে তাহার থাবা চুলকাইয়া দিতে লাগিল। তারপর গান ধরিল। বাঘ গানের সঙ্গে ধুপধাপ করিয়া খাঁচার মেজে চাপড়াইতে লাগিল। খাঁচাখানা কাঁপিতে লাগিল। মাল্লা যখন খুব জোরে গাহিতে লাগিল, তখন বাঘ 'এঁয়াও' করিয়া তাহার সঙ্গে তান ধরিল। সেই তানের চোটে ঘরের জানলাগুলি খট খট

করিয়া উঠিল।

আরো তামাশা হইত, কিন্তু জ্যাক এই সময়ে জানালার ভিতর দিয়া গির্জার ঘড়ি দেখিতে পাইল। তাহাকে রেলে অনেক দূর যাইতে হইবে, আর দেরি করিলে চলিতেছে না। সুতরাং সে বিল্লির কাছে বিদায় লইল। বিল্লি কিন্তু তাহাকে অত তাড়াতাড়ি ছাড়িতে রাজি নহে। জ্যাকের সঙ্গে সঙ্গে সেও খাঁচার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল—প্রহরী দরজা খুলিলে সেও জ্যাকের সঙ্গে যাইবে! প্রহরী দরজা খুলিতেছিল, বাঘের কাণ্ড দেখিয়া আর খুলিল না। জ্যাক তিনবার চুপচাপ সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল, বাঘ তাহার কোটের কোণ কামড়াইয়া ধরিয়া তিনবার ফিরাইল। জ্যাক মুশকিলে পড়িয়া বলিল, 'এ ত বড় মুশকিল রে বাবু। আমি ত থাকতে আসি নি, আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম।'

কিন্তু প্রহরীর মুখ ততক্ষণে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। মাল্লা যতই যাইতে চাহিতেছে বাঘ ততই বিরক্ত হইতেছে; শেষে চটিয়া গিয়া এক থাপ্পড় বসাইয়া দিলেই ত মাল্লার দফা নিকাশ হইয়া যায়! এই সময়ে এক বুদ্ধি জুটিল। খাঁচাটাতে দুই কামরা। বাহিরটাতে বাঘ সকল লোকের সামনে তামাশা দেখায় ভিতরেরটাতে বসিয়া সে আহার করে। মাঝখানে দরজা আছে, বাহির হইতেই তাহা খোলা ও বন্ধ করা যায়। এই ভিতরের কামরায় বড় এক টুকরা মাংস ঢুকাইয়া দেওয়া হইল, আর বাঘ অমনি বন্ধুকে ভুলিয়া খাইবার ঘরে ঢুকিল। চতুর প্রহরী তৎক্ষণাৎ মাঝখানের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। জ্যাকও সুযোগ বুঝিয়া তাহার পথ ধরিল।

জোলা আর সাত ভূত

এক জোলা ছিল, সে পিঠে খেতে বড় ভালবাসত।

একদিন সে তার মাকে বলল, মা, আমার বড্ড পিঠে খেতে ইচ্ছে করছে, আমাকে পিঠে করে দাও।'

সেইদিন তার মা তাকে লাল-লাল, গোল-গোল চ্যাপটা-চ্যাপটা সাতখানি চমৎকার পিঠে করে দিল। জোলা সেই পিঠে পেয়ে ভারি খুশি হয়ে নাচতে লাগল আর বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

জোলার মা বলল, 'খালি নাচবিই যদি, তবে খাবি কখন?'

জোলা বলল, 'খাব কি এখানে? সবাই যেখানে দেখতে পাবে, সেখানে খাব।' ব'লে জোলা পিঠেগুলি নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আর বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

নাচতে নাচতে জোলা একেবারে সেই বটগাছতলায় চলে এল, যেখানে হাট হয়। সেই গাছের তলায় এসে সে খালি নাচছে আর বলছে,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

এখন হয়েছে কি— সেই গাছে সাতটা ভূত থাকত। জোলা 'সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব' বলছে, আর তা শুনে তাদের ত বড্ডই ভয় লেগেছে। তারা সাতজনে গুটিশুটি হয়ে কাঁপছে, আর বলছে, 'ওরে সর্বনাশ হয়েছে! ঐ দেখ, কোত্থেকে এক বিট্‌কেল ব্যাটা এসেছে, আর বলছে আমাদের সাতজনকেই চিবিয়ে খাবে! এখন কি করি বল্ ত।'

অনেক ভেবে তারা একটা হাঁড়ি নিয়ে জোলার কাছে এল। এসে জোড়হাত করে তাকে বলল, 'দোহাই কর্তা! আমাদের চিবিয়ে খাবেন না। আপনাকে এই হাঁড়িটি দিচ্ছি এইটি নিয়ে আমাদের ছেড়ে দিন!'

সাতটা মিশমিশে কালো তালগাছপানা ভূত, তাদের কুলোর মত কান, মুলোর মত দাঁত, চুলোর মত চোখ—তারা জোলার সামনে এসেই কাঁইমাই করে কথা বলছে দেখেই ত সে এমনি চমকে গেল যে, সেখান থেকে ছুটে পালাবার কথা তার মনেই এল না। সে বলল, 'হাঁড়ি নিয়ে আমি কি করব!'

ভূতেরা বলল, 'আজ্ঞে আপনার যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে, তাই এই হাঁড়ির ভিতর পাবেন।'

জোলা বলল 'বটে! আচ্ছা আম পায়েস খাব।'

বলতে বলতেই সেই হাঁড়ির ভিতর থেকে চমৎকার পায়েসের গন্ধ বেরুতে লাগল। তেমন পায়েস জোলা কখনো খায় নি, তার মাও খায় নি, তার বাপও খায় নি। কাজেই জোলা যার পর নাই খুশি হয়ে হাঁড়ি নিয়ে সেখান থেকে চলে এল, আর ভূতেরা ভাবল, 'বাবা! বড্ড বেঁচে গিয়েছি!'

তখন বেলা অনেক হয়েছে, আর জোলার বাড়ি সেখান থেকে ঢের দূরে। তাই জোলা ভাবল, 'এখন এই রোদে কি করে বাড়ি যাব? বন্ধুর বাড়ি কাছে আছে, এবেলা সেইখানেই যাই; তারপর বিকেলে বাড়ি যাব এখন।'

বলে সে ত তার বন্ধুর বাড়ি এসেছে। সে হতভাগা কিন্তু ছিল দুষ্টু। সে জোলার হাঁড়িটি দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'হাঁড়ি কোত্থেকে আনলি রে?'

জোলা বলল, 'বন্ধু, এ যে-সে হাঁড়ি নয়, এর ভারি গুণ।'

বন্ধু বলল, 'বটে? আচ্ছা দেখি ত কেমন গুণ।'

জোলা বলল, 'তুমি যা খেতে চাও, তাই আমি এর ভিতর থেকে বার করে দিতে পারি।'

বন্ধু বলল, 'আমি রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, সরভাজা, মালপুয়া, পান্তুয়া, কাঁচাগোল্লা, ক্ষীরমোহন, গজা, মতিচুর, জিলিপি, অমৃতি, বরফি, চমচম এই সব খাব।'

জোলার বন্ধু যা বলছে, জোলা হাঁড়ির ভিতর হাত দিয়ে তাই বার করে আনছে। এ-সব দেখে তার বন্ধু ভাবল যে, এ জিনিসটি চুরি না করলে হচ্ছে না।

তখন সে জোলাকে কতই আদর করতে লাগল। পাখা এনে তাকে হাওয়া করল, গামছা দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল, আর বলল, 'আহা ভাই, তোমার কি কষ্টই হয়েছে! গা দিয়ে ঘাম বয়ে পড়েছে! একটু ঘুমোবে ভাই বিছানা করে দেব?'

সত্যি সত্যিই জোলার তখন ঘুম পেয়েছিল; কাজেই সে বলল, 'আচ্ছা, বিছানা করে

দাও।'

তখন তার বন্ধু বিছানা করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে, তার হাঁড়িটি বদ্‌লে তার জায়গায় ঠিক তেমনি ধরনের আর-একটা হাঁড়ি রেখে দিল। জোলা তার কিছুই জানে না, সে বিকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ি চলে এসেছে আর তার মাকে বলছে, 'দেখো মা, কি চমৎকার একটা হাঁড়ি এনেছি। তুমি কি খাবে মা? সন্দেশ খাবে? পিঠে খাবে? দেখো আমি এর ভিতর থেকে সে-সব বার করে দিচ্ছি।'

কিন্তু এ ত আর সে হাঁড়ি নয়, এর ভিতর থেকে সে-সব জিনিস বেরুবে কেন? মাঝখান থেকে জোলা বোকা ব'নে গেল, তার মা তাকে বকতে লাগল।

তখন ত জোলার বড্ড রাগ হয়েছে, আর সে ভাবছে 'সেই ভূতব্যাটাদেরই এ কাজ।' তার বন্ধু যে তাকে ঠকিয়েছে, এ কথা তার মনেই হল না।

কাজেই পরদিন সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

তা শুনে আবার ভূতগুলো কাঁপতে কাঁপতে একটা ছাগল নিয়ে এসে তাকে হাত জোড় করে বলল, 'মশাই গো! আপনার পায়ে পড়ি, এই ছাগলটা নিয়ে যান। আমাদের ধরে খাবেন না।'

জোলা বলল, 'ছাগলের কি গুণ?

ভূতরা বলল, 'ওকে সুড়সুড়ি দিলে ও হাসে, আর ওর মুখ দিয়ে খালি মোহর পড়ে।'

অমনি জোলা ছাগলের গায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। আর ছাগলটা হিহি হিহি' করে হাসতে লাগল, আর মুখ দিয়ে ঝর ঝর করে খালি মোহর পড়তে লাগল। তা দেখে জোলার মুখে ত আর হাসি ধরে না। সে ছাগল নিয়ে ভাবল যে, এ জিনিসটি বন্ধুকে না দেখালেই নয়।

সেদিন তার বন্ধু তাকে আরো ভাল বিছানা করে দিয়ে দুহাতে দুই পাখা নিয়ে হাওয়া করল। জোলার ঘুমও হল তেমনি। সেদিন আর সন্ধ্যার আগে তার ঘুম ভাঙল না। তার বন্ধু ত এর মধ্যে কখন তার ছাগল চুরি করে তার জায়গায় আর-একটা ছাগল রেখে দিয়েছে।

সন্ধ্যার পর জোলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তার বন্ধুর সেই ছাগলটা নিয়ে বাড়ি এল; এসে দেখল যে তার মা তার দেরি দেখে ভারি চটে আছে তা দেখে সে বলল, 'রাগ আর করতে হবে না, মা; আমার ছাগলের গুণ দেখলে খুশি হয়ে নাচবে!' এই বলেই সে ছাগলের বগলে আঙুল দিয়ে বলল, কাতু কুতু কুতু কুতু!!!'

ছাগল কিন্তু তাতে হাসলো না, তার মুখ দিয়ে মোহরও বেরুল না। জোলা আবার তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে বলল, 'কাতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু!!'

তখন সেই ছাগল রেগে গিয়ে শিং বাগিয়ে তার নাকে এমনি বিষম গুঁতো মারল যে সে চিত হয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগল আর তার নাক দিয়ে রক্তও পড়ল প্রায় আধ সের তিন পোয়া। তার উপর আবার তার মা তাকে এমন বকুনি দিল যে, তেমন বকুনি সে আর খায় নি।

তাতে জোলার রাগ যে হল, সে আর কি বলব! সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

'বেটারা আমাকে দুবার দুবার ফাঁকি দিয়েছিল, ছাগল দিয়ে আমার নাক থেঁতলা করে দিয়েছিস—আজ আর তোদের ছাড়ছি নে!'

ভূতেরা তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কি মশাই, আমরা কি করে আপনাকে ফাঁকি দিলুম, আর ছাগল দিয়েই বা কি করে আপনার নাক থেঁতলা করলুম?'

জোলা তার নাক দেখিয়ে বলল, 'এই দেখ না, গুঁতো মেরে সে আমার কি দশা করেছে। তোদের সব কটাকে চিবিয়ে খাব!'

ভূতেরা বলল, 'সে কখনো আমাদের ছাগল নয়। আপনি কি এখান থেকে সোজাসুজি বাড়ি গিয়েছিলেন?'

জোলা বলল, 'না, আগে বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলুম। সেখানে খানিক ঘুমিয়ে তারপর বাড়ি গিয়েছিলুম।'

ভূতেরা বলল, 'তবেই ত হয়েছে! আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, সেই সময় আপনার বন্ধু আপনার ছাগল চুরি করেছে।' এ কথা শুনেই জোলা সব বুঝতে পারল। সে বলল, ঠিক ঠিক। সে বেটাই আমার হাঁড়িও চুরি করেছে, ছাগলও চুরি করেছে। এখন কি হবে?'

ভূতেরা তাকে একগাছি লাঠি দিয়ে বলল, 'এই লাঠি আপনার হাঁড়িও এনে দেবে, ছাগলও এনে দেবে! ওকে শুধু একটিবার আপনার বন্ধুর কাছে নিয়ে বলবেন, 'লাঠি লাগ ত!' তা হলে দেখবেন, কি মজা হবে! লাখ লোক ছুটে এলেও এ লাঠির সঙ্গে পারবে না, লাঠি তাদের সকলকে পিটিয়ে ঠিক করে দেবে।'

জোলা তখন সেই লাঠিটি বগলে করে তার বন্ধুকে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, একটা মজা দেখবে?'

বন্ধু ত ভেবেছে না জানি কি মজা হবে। তারপর যখন জোলা বলল, 'লাঠি, লাগ ত!' তখন সে এমনি মজা দেখল, যেমন তার জন্মে আর কখনো দেখে নি। লাঠি তাকে পিটে পিটে তার মাথা থেকে পা অবধি চামড়া তুলে ফেলল। সে ছুটে পালাল, লাঠি তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে পিটতে পিটতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বলল, 'তোর পায়ে পড়ি ভাই, তোর হাঁড়ি নে, তোর ছাগল নে, আমাকে ছেড়ে দে!'

জোলা বলল, 'আগে ছাগল আর হাঁড়ি আন্, তবে তোকে ছাড়ব।'

কাজেই বন্ধুমশাই আর কি করেন? সেই পিটুনি খেতে খেতেই হাঁড়ি আর ছাগল এনে হাজির করলেন। জোলা হাঁড়ি হাতে নিয়ে বলল, 'সন্দেশ আসুক ত!' অমনি হাঁড়ি সন্দেশে ভরে গেল। ছাগলকে সুড়সুড়ি দিতে না দিতেই সে হো হো করে হেসে ফেলল, আর তার মুখ দিয়ে চারশোটা মোহর বেরিয়ে পড়ল। তখন সে তার লাঠি, হাঁড়ি আর ছাগল নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

এখন আর জোলা গরিব নেই, সে বড়মানুষ হয়ে গেছে। তার বাড়ি, তার গাড়ি, হাতি-ঘোড়া—খাওয়া-পরা, চাল-চলন, লোকজন, সব রাজার মতন। দেশের রাজা তাকে যার

পর নাই খাতির করেন, তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন ভারি কাজে হাত দেন না।

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, আর কোন দেশের এক রাজা হাজার হাজার লোকজন নিয়ে এসে সেই দেশ লুটতে লাগল। রাজার সিপাইদের মেরে খোঁড়া করে দিয়েছে, এখন রাজার বাড়ি লুটে কখন তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে, তার ঠিক নেই।

রাজামশাই তাড়াতাড়ি জোলাকে ডাকিয়ে বললেন, 'ভাই, এখন কি করি বল ত? বেঁধেই ও নেবে দেখছি।'

জোলা বলল, 'আপনার কোন ভয় নেই। আপনি চুপ করে ঘরে বসে থাকুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

বলেই সে তার লাঠিটা বগলে করে রাজার সিংহদরজার বাইরে গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল। বিদেশী রাজা লুটতে লুটতে সেই দিকেই আসছে, তার সিপাই আর হাতি ঘোড়ার গোলমালে কানে তালা লাগছে, ধুলোয় আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। জোলা খালি চেয়ে দেখছে, কিছু বলে না।

বিদেশী রাজা পাহাড়ের মতন এক হাতি চড়ে সকলের আগে আগে আসছে, আর ভাবছে, সব লুটে নেবে। আর, জোলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর ভাবছে, আর একটু কাছে এলেই হয়।

তারপর তারা যেই কাছে এসেছে, অমনি জোলা তার লাঠিকে বলল, 'লাঠি, লাগ ত।' আর যাবে কোথায়? তখনি এক লাঠি লাখ লাখ হয়ে রাজা আর তার হাতি-ঘোড়া সকলের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। আর পিটুনি যে কেমন দিল সে যারা সে পিটুনি খেয়েছিল তারাই বলতে পারে।

পিটুনি খেয়ে রাজা চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, 'আর না বাবা, আমাদের ঘাট হয়েছে, এখন ছেড়ে দাও, আমরা দেশে চলে যাই।'

জোলা কিছু বলে না, খালি চুপ করে চেয়ে দেখছে আর একটু একটু হাসছে।

শেষে রাজা বলল, 'তোমাদের যা লুটেছি, সব ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমার রাজ্য দিচ্ছি, দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও।'

তখন জোলা গিয়ে তার রাজাকে বলল, 'রাজামশাই, সব ফিরিয়ে দেবে বলছে আর তাদের রাজ্যও আপনাকে দেবে বলছে, আর বলছে দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও। এখন কি হুকুম হয়?'

রাজামশায়ের কথায় জোলা তার লাঠি থামিয়ে দিলে। তারপর বিদেশী রাজা কাঁদতে কাঁদতে এসে রাজামশাইয়ের পায়ে পড়ে মাপ চাইল।

রাজামশাই জোলাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার এই লোকটিকে যদি তোমার অর্ধেক রাজ্য দাও, আর তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, তা হলে তোমাকে মাপ করব।'

সে ত তার সব রাজ্যই দিতে চেয়েছিল। কাজেই জোলাকে তার অর্ধেক রাজ্য আর মেয়ে দিতে তখনি রাজি হল।

তারপর জোলা সেই অর্ধেক রাজ্যের রাজা হল, আর রাজার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল। আর ভোজের কি যেমন তেমন ঘটা হল! সে ভোজ খেয়ে যদি তারা শেষ করতে না পেরে থাকে, তবে হয়ত এখনো খাচ্ছে। সেখানে একবার যেতে পারলে হত।

বুদ্ধিমান চাকর

এক কাজি সাহেবের এক চাকর ছিল তার নাম বুদ্ধু। চাকরটা একে বিদেশী, তাতে বুদ্ধি-সুদ্ধির ধার ধারে না—কাজেই কাজি সাহেবের মহা মুস্কিল। চাকরটা কায়দা কানুন কিছুই জানে না—বাড়িতে লোক আসলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। একদিন কাজি সাহেব তাকে দুই ধমক দিয়ে বল্‌লেন, ফের যদি এরকম বেয়াদবী করিস—কাউকে সেলাম না করিস তবে তোকে আমি দেখাব। সকলকে খাতির করবি আর 'সেলাম' বল্‌বি।'

সেই থেকে রাস্তায় বেরিয়ে যাকে দেখে সকলকেই বুদ্ধু 'সেলাম' করে। ছেলে বুড়ো মানুষ গরু কাউকে বাদ দেয় না। এক গাধাওয়ালা তার গাধা নিয়ে চলেছে—চাকরটা তাকে সেলাম করল আর গাধাগুলোকেও খুব খাতির ক'রে বলল "সেলাম"। তা শুনে গাধাওয়ালা খুব হাসতে লাগল, আর বলল, 'দূর আহাম্মক ওদের বুঝি সেলাম বলতে হয়; ওদের "হেই হেই' ক'রে চালাতে হয়।' বুদ্ধু বেচারা কিছু দূর গিয়ে দেখল একজন শিকারী ফাঁদ পেতে বসে আছে, আর অনেকগুলো পাখি সেই ফাঁদের কাছে ঘুরছে। তাই দেখে সে 'হেই হেই' করে এম্‌নি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল যে পাখি টাখি সব উড়ে পালাল। শিকারী ত চটে লাল!

আর-একদিন এক বড় লোকের বাড়িতে কাজি সাহেবের নেমন্তন্ন। বুদ্ধুও সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। তারা নবাব বংশের লোক— আশ্চর্য তাদের আদব-কায়দা। খেতে খেতে নিমন্ত্রণকর্তার দাড়িতে একটা ভাত পড়ল—ওমনি একজন চাকর যেন গান করছে এমনি ভাবে গুণ গুণ ক'রে বলতে লাগল—

ফুলের তলে বুল্‌বুল ছানা
তারে উড়িয়ে দেনা—উড়িয়ে দেনা—

অমনি তার মনিব ইশারা বুঝতে পেরে দাড়ি ঝেড়ে ভাত ফে'লে দিল।

কাজি সাহেব বাড়ি এসে বুদ্ধুকে বললেন, 'দেখ্‌লি ত কেমন কায়দা! আমার দাড়িতে যদি খাবার সময় ভাত লাগে তুইও ঠিক তেমনি ক'রে বলবি।' তারপর একদিন কাজি সাহেবের বাড়িতে খুব ভোজ হচ্ছে, কাজি সাহেব চাকরের কেরামতি দেখাবার জন্য ইচ্ছা ক'রে তাঁর দাড়িতে একটা ভাত ফেলে দিলে আর বুদ্ধুকে চোখ টিপে ইশারা করলেন। বুদ্ধু অমনি চেঁচিয়ে বল্ল, 'সেই যে সেদিন অমুক্‌দের বাড়িতে না কিসের কথা হ'য়েছিল? আপনার দাড়িতে তাই হয়েছে তানানা তানা।' শুনে সব লোক হো হো করে হেসে উঠল।

একদিন মনিব বল্লেন, 'দেখ্ তুই বড় বিশ্রী ভাত রাঁধিস। তুই এখনো ফেন গালাতেই শিখিস নি। আজ যখন ভাত বানাবি, ভাত সিদ্ধ হ'লেই আমাকে ডাকিস আমি দেখিয়ে দেব। আমাকে না দেখিয়ে কিছু করিস্ নি।'

সেদিন ভাত সিদ্ধ হতেই ত চাকর মনিবকে ডাকতে গিয়েছে। দরজার বাইরে থেকে উঁকি মেরে একটা আঙুল দিয়ে ইশারা করে সে মনিবকে ডাকতে লাগল। কাজি সাহেব তখন দরজার দিকে পিছন ফিরে কি যেন লিখছিলেন তিনি এ-সব কিছুই জানেন না। চাকরটা ঘণ্টাখানেক এইরকম ডেকে শেষটায় হয়রান হয়ে পড়ল। তখন সে রেগে চিৎকার করে বলল, 'আর

কতক্ষণ ডাকব? এদিকে ভাতটাত সব ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল।' তখন কাজি সাহেব ফিরে দেখেন চাকর তাঁকে একটা আঙুল দিয়ে ইশারা করেছে—ওদিকে সত্যি সত্যিই ভাত পুড়ে ছাই।

একদিন রাত্রে কাজি সাহেবের বাড়ি চোর ঢুকেছে। বুদ্ধু খচ্‌মচ্‌ শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করল, কে রে? চোরটা গম্ভীরভাবে বলল, 'কেউ নই বাবা, কেউ নই।' তা শুনে বুদ্ধু আবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমাতে লাগল। সকালে উঠে কাজি সাহেব দেখেন তাঁর সব চুরি হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধুকে জিজ্ঞাসা ক'রে যখন রাত্রের সব শুনলেন তিনি খুব রেগে গালাগালি করতে লাগলেন। কিন্তু বুদ্ধু তাতে মুখ ভারি বেজার করে বলল, 'তা কি করব—সে আমায় বারবার করে বললে, 'কেউ নই, কেউ নই' লোকটা ত দেখছি শুধু চোর নয়—ব্যাটা বেজায় মিথ্যাবাদী।'

একদিন কাজি সাহেব সহরের বাইরে কোথায় যাবেন। যাবার সময় বুদ্ধুকে বলে গেলেন, 'দেখিস্‌, দরজাটার উপর ভাল ক'রে চোখ রাখিস—দরজা ছেড়ে কোথায়ও যাস নে, তাহলে চোরে আমার সব নিয়ে যাবে।' কাজি সাহেব চলে গেলেন—চাকর বেচারা একটা লাঠি নিয়ে দরজায় পাহারা দিতে লাগল। একদিন গেল, দুদিন গেল। তার পরদিন বুদ্ধু শুনল এক জায়গায় ভারি তামাশা দেখান হচ্ছে। তাই ত, বেচারা কি করে? অনেক ভেবে সে করল কি বাড়ির দরজাখানা খুলে সেটাকে ঘাড়ে নিয়ে তামাশা দেখতে গেল। এদিকে বাড়িতে চোর ঢুকে যা কাণ্ড করে গেল সে আর কি বলব! কাজি সাহেব বাড়িতে এসে দেখেন— সর্বনাশ, বাড়ির সিন্দুক আল্‌মারি সব খালি। ওদিকে বুদ্ধু ব'সে তামাশা দেখছে আর খুব সাবধানে দরজা পাহারা দিচ্ছে।

ফিঙে আর কুঁকড়ো

একটা দানব ছিল, তার নাম ছিল ফিঙে; সে দেড়শো হাত লম্বা শালগাছের ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়াত। আর-একটা দানব ছিল, তার নাম কুঁকড়ো। সে ঘুঁষো মেরে লোহার মুগুর থেঁতলা করে দিত।

আর যত দানব ছিল, তাদের সকলকেই কুঁকড়ো ঠেঙিয়ে ঠিক করে দিয়েছে, এখন সে ফিঙের সন্ধানে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। এ কথা শুনে অবধি ফিঙের আর ঘুম হয় না, কাজেই সেও কুঁকড়োকে এড়াবার জন্য খালি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। ফিঙে সমুদ্রের ধারে গেলে,তা শুনে কুঁকড়ো সেই দিক পানে রওনা হল। সে খবর পেয়েই ফিঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে তার নিজের ঘরে চলে এল।

ঘরখানি ছিল একটা উঁচু পর্বতের উপর; সেখান থেকে দশ দিনের পথ অবধি দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই ফিঙে ভাবল যে, ওখানে গেলে কুঁকড়ো নিতান্ত আচমকা এসে তাকে মারতে পারবে না। ফিঙেকে অমন ব্যস্ত হয়ে ফিরে আসতে দেখে তার স্ত্রী উনা বলল, 'কি হয়েছে?' ফিঙে আঙুল দিয়ে সমুদ্রের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ঐ কুঁকড়ো আসছে। বেটা ঘুঁষো মেরে লোহার মুগুর থেঁতলা করে দেয়। এবারে দেখছি ভারি বেগতিক।'

উনা সেদিকে দেখল, সত্যি সত্যিই কুঁকড়ো আসছে, কিন্তু এখনো সে ঢের দূরে, তিন-চার দিনের কমে এসে পৌঁছবে না। তখন সে ফিঙেকে বলল, 'তোমার কোন ভয় নেই। তুমি পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকো, আমি কুঁকড়োকে ঠিক করে দিচ্ছি।' কিন্তু ফিঙের মনের ভয় তাতে গেল না। সে মাথা হেঁট করে বসে কত কথাই ভাবতে লাগল।

উনা কিন্তু ততক্ষণে চুপ করে ছিল না। সে গ্রামের লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যার ঘরে যত ভাঙা দা, কুড়ুল, কাস্তে, খন্তা, কোদাল, হুড়কো ছিটকিনি আর হাতুটি আর পেরেক ছিল, সব চেয়ে ঝুড়ি ভরে নিয়ে এল। তারপর সেইগুলো ভিতরে পুরে পুরে সে দুদিন ধরে খালি পাটিসাপটাই তয়ের করল। ফিঙে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, আর বলে, 'ও কি করছ?' উনা বলে, 'যাই করি না কেন—তুমি চুপ করে থাকো।'

পিঠে হয়ে গেলে উনা তিন গামলা ছানা ও তয়ের করল। তারপর ফিঙেকে অনেক পরামর্শ দিয়ে, অনেক সন্ধান শিখিয়ে রেখে, সে সব ঠিকঠাক করে রাখল। এখন কুঁকড়ো এলেই হয়।

পরদিন দুপুরবেলায় কুঁকড়ো এসে উপস্থিত হয়েছে। এসেই ভয়ংকর গর্জনে আকাশপাতাল কাঁপিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ফিঙে কোথায়? উনা বলল, 'সে ত বাড়ি নেই। কুঁকড়ো বলে নাকি একটা ছোকরা তাকে খুঁজতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে ভারি বড়াই করছিল, তাই শুনে ফিঙে বিষম রেগে লাঠি হাতে তাকে মারতে বেরিয়েছে। যদি তাকে দেখতে পায় তবে আর বেচারাকে আস্ত রাখবে না।'

তা শুনে কুঁকড়ো ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আমি ত কুঁকড়ো, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি।' এ কথায় উনা হো হো করে হেসেই কুটিপাটি। তারপর অনেকক্ষণ নাক সিঁটকিয়ে কুঁকড়োর পানে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'এই টিকটিকির মত জোয়ানটি হয়ে তুমি ফিঙের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? অমনি কাজও করতে নাই বাছা। কেন ফিঙের হাতে প্রাণ দেবে? আমার কথা শুনে চলো, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। ততক্ষণ একটা কাজ কর দেখি; বড্ড হাওয়া আসছে, ফিঙে বাড়ি নেই, কে ঘরখানিকে ঘুরিয়ে দেবে? দেখো ত তুমি পার কিনা।'

কুঁকড়ো ভাবল, 'বাবা! হাওয়া থামাতে হলে ফিঙে এই ঘরটাকে ঘুরিয়ে দেয় নাকি? এখন আমি যদি "না" বলি তবে ত দেখছি আমার বড্ড নিন্দে হবে।' তখন সে আগে খুব করে তার ডান হাতের মাঝের আঙুলটা মটকে নিল। আঙুলটাতেই তার যত জোর ছিল, ওটি না হলে সে কিছুই করতে পারত না। আঙুল মটকানো হয়ে গেলে সে দুহাতে ঘরখানিকে জড়িয়ে ধরে তাতে এমন পাক দিল যে দেখতে দেখতে পাহাড়ের চূড়া সুদ্ধ ঘরখানি ঘুরে গেল।

এতক্ষণ ফিঙে কি করছে? সে উনার পরামর্শে তার নিজের খোকা সেজে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, আর কুঁকড়োর কাণ্ড দেখে সেই কাঁথার ভিতরে ভয়ে ঘেমে আর কেঁপে অস্থির হচ্ছে।

এদিকে উনা আবার কুঁকড়োকে বলল, 'বেশ বাপু! লক্ষ্মী ছেলে তুমি। আহা! ঘরে এক ফোঁটা জল নেই, তোমাকে কি দিয়ে একটু মেঠাই খেতে দিই। পাহাড়টার নীচে জল থাকে, ফিঙে পাহাড় সরিয়ে তাই তুলে আনে। আজ ত সে বাড়ি নেই, এখন উপায় কি হবে? দেখো ত বাপু তুমি পাহাড়টা ঠেলে, একটু জল আনতে পার কি না!'

কুঁকড়ো আবার খুব করে তার আঙুল মটকে নিয়ে, সেই পাহাড়ের নীচে গিয়ে এমনি গুঁতো মারল যে তাতে দশহাত গভীর এক প্রকাণ্ড দীঘি হয়ে গেল, আর তাতে জলও হল তেমনি। তা দেখে উনা আর একটু হলেই 'মাগো!' বলে চেঁচিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু সে ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে, তাই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, 'চলো, এখন তোমাকে কিছু পিঠে খেতে দিই গে।'

এই বলে উনা কুঁকড়োকে ঘরে এনে দিয়েছে সেই পিঠে খেতে। সে বেটাও এমনি লোভী—একেবারে তার দশটা তুলে নিয়ে মুখে দিয়েছে। দিয়েই সে 'উঃ—হুঃ—হুঃ' বলে এমনি ভয়ংকর চেঁচিয়ে উঠল যে, আর একটু হলেই তাতে ঘরের ছাত উড়ে যেত। বেজায় ব্যস্ত হয়ে সেই পিঠে চিবোতে গিয়ে তার চারটে দাঁত ভেঙে রক্তারক্তি হয়ে গিয়েছে। কাজেই না চেঁচাবে কেন?

উনা তখন বলল, 'আরে অত চেঁচিও না, খোকার ঘুম ভেঙে যাবে। আমি ভাবছিলাম তুমি জোয়ান লোক, ঐ পিঠে খেতে তোমার ভাল লাগবে। ফিঙে আর খোকা ও পিঠে খুব খায়।'

বলতে বলতে সেই খোকাটা কাঁথার ভিতর থেকে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে বলল, 'অঁ-য়্যা-য়্যা বদ্দ খিদে পেয়েথে! পিতে থাব।' খোকার গলার সে আওয়াজ শুনেই ত কুঁকড়োর পিলে চমকে উঠেছে। উনা অবশ্য খোকার জন্য ভালো পিঠে করে রেখেছিল। তাই থেকে কয়েকটা খেতে দিল। কুঁকড়ো ত আর তা জানে না, সে দেখল, যাতে তার নিজের দাঁত ভেঙে গেছে, 'খোকা' তাই কপাকপ খাচ্ছে। কাজেই সে ভাবল, 'বাবা গো, খোকাই যদি অমনি পিঠে খেতে পারে তবে তার বাবা না জানি কি করতে পারে! ভাগ্যিস সে বেটা বাড়ি নেই।'

এমন সময় 'খোকা' আবার বলল, 'পাথল দে। দল বা'ল কবব!' উনা তাকে একতাল ছানা, আর কুঁকড়োকে একটা সাদা পাথর দিয়ে বলল, 'খোকার ঐ এক খেলা—পাথর চিপে জল বার করে। তুমিও একখানা পাথর টিপে দেখো ত।' কুঁকড়ো সেই পাথর প্রাণপণে টিপেও তা থেকে জল বার করতে পারল না। খোকার ছানা থেকে অবশ্য জল বার হতে লাগল। তা দেখে কুঁকড়ো ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'বাবা গো! আমি এই বেলা পালাই। এই খোকার বাবা এলে আমাকে আস্ত রাখবে না। আমার খালি দেখতে ইচ্ছা করছে যে এই খোকার দাঁতগুলো কেমন যা দিয়ে সে ঐপিঠেগুলো খায়।'

এই বলে সে তাড়াতাড়ি গিয়ে যেই 'যেই খোকার মুখে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, অমনি খোকাও কটাস করে তার সব-কটি আঙুল একেবারে গোড়াসুদ্ধ কামড়িয়ে নিয়েছে। সেই আঙুলেই নাকি ছিল কুঁকড়োর জোর, কাজেই সে আঙুল কাটা যেতে হায় হায় করে মাটিতে পড়ে গেল। 'খোকা'ও তখন লাফিয়ে উঠে তার সেই দেড়শো হাত লম্বা শালের ছড়িগাছি দিয়ে তার হাড় ভাঙতে আর কিছুমাত্র দেরি করল না।

পণ্ডিতের কথা

সেই যে হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী ছিল, সেই হবুচন্দ্র রাজার একটা ভারি জবর পণ্ডিতও ছিল। তার এতই বুদ্ধি ছিল যে, তার পেটে অত বুদ্ধি ধরত না;তাই তাকে দিনরাত নাকে কানে তুলোর টিপ্‌লী গুঁজে বসে থাকতে হত, নইলে বুদ্ধি বেরিয়ে যেত। তুলোর টিপ্‌লী গুঁজতে বলে নাম হয়েছিল 'ছিল 'টিপাই' পণ্ডিত।

একদিন হয়েছে কি, হবুচন্দ্রের দেশের জেলেরা একটা এঁধো পুকুরে জাল ফেলতে গিয়েছে। সেই পুকুরে কোত্থেকে একটা শূয়র এসে ঝাঁঝি পাটার ভিতরে গা ঢাকা দিয়েছিল; জেলেরা জাল ফেলতেই সে গিয়েছে তার মধ্যে আটকে, তারপর জাল টেনে তুলে সেই শূয়র দেখতে পেয়েই ত জেলেরা ভারি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। তাদের দেশে আর কেউ কখনো এমন জানোয়ার দেখে নি। তারা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারল না, এটা কি জানোয়ার। তারা জাল দিয়ে কত বড় বড় শোল, বোয়াল, কচ্ছপ ধরেছে, কিন্তু এমন জানোয়ারের কথা ত কখনো শোনে নি। যা হোক তারা ঠিক করল যে রাজা হবুচন্দ্রের সভায় নিয়ে এটাকে দেখাতে হবে। এই বলে সেই শূয়রটাকে খুব করে জাল দিয়ে জড়িয়ে তারা রাজার সভায় নিয়ে এল। বাজা তার ছটফটি দেখে দেখে আর চ্যাঁচানি শুনে বললেন, 'বাপ রে। এটা-আবার কি জন্তু?' সভাব লোকেরা কেউ সে কথার উত্তর দিতে পারল না। যে-সব পণ্ডিত সেখানে ছিল তারা দু দল হয়ে গেল। কয়েকজন বললে, 'গজক্ষয়', অর্থাৎ, হাতি ছোট হয়ে গিয়ে এমনি হয়েছে। কেউ বলে, মূষা বৃদ্ধি, অর্থাৎ ইঁদুর বড় হয়ে এমনি হয়েছে। এখন এ কথার বিচার টিপাই ছাড়া আর কে করবে? কাজেই রাজা তাকে ডেকে পাঠালেন। টিপাই এসে অনেকক্ষণ ধবে সেই শূয়রটাকে দেখে বলল, 'আরে তোমরা কেউ কিছু বোঝ না। এটাকে নিয়ে জলে ছেড়ে দাও। যদি ডুবে যায়, ত'বে এটা মাছ, যদি উড়ে পালায় তবে পানকৌড়ি আর যদি সাঁতরে ডাঙ্গায় ওঠে তা হলে কচ্ছপ, না হয় কুমির।' তখন সভার লোকেরা ভারি খুশি হয়ে বলল, 'ভাগ্যিস টিপাই মশাই ছিলেন, নইলে এমন কথা আর কে বলতে পারত।'

আমরা ছেলেবেলায় এই টিপাইয়ের গল্প শুনতাম। এইরূপ এক-একটা পণ্ডিত বা পাড়াগেঁয়ে বুদ্ধিমানের গল্প অনেক দেশেই আছে, তার দু-একটি নমুনা শোন।

টিপাইয়ের যে ছেলে, সেও বড় হয়ে তার বাপেরই মতন বড় পণ্ডিত হয়েছিল; তার গ্রামের লোকেরা একটা কিছু জানতে হলেই তার কাছে আসত। এর মধ্যে একদিন রাত্রে তাদের গ্রামের ভিতর দিয়ে একটা হাতি গিয়েছে। তখন সকলে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ হাতিটাকে দেখতে পায় নি; সকালে উঠে তার পায়ের দাগ দেখে তাদের ভারি ভাবনা হল। না জানি এ-সব কিসের দাগ, আর না জানি তাতে কি হবে। তারা এর কিছুই বুঝতে না পেরে শেষে টিপাইয়ের ছেলেকে নিয়ে এল। সে এসে অনেক ভেবে বলল, 'ওহ্! বুঝেছি রাত্রে চোর এসে উঘ্‌লি নিয়ে গেছে। সে বেটা বারবার বসেছিল, তাইতে উঘ্‌লির তলায় দাগ পড়েছে!'

কাশীর ওদিকে এমনি একটা পণ্ডিতের গল্প আছে, সেই পণ্ডিতের নাম ছিল 'লাল

বুঝগ্‌গর।' সে এমনি হাতির পায়ের দাগ দেখে বলেছিল—

লাল বুঝগ্‌গব সব সম্‌ঝো আউব না সমঝে কোই,
চার পয়ের মে চক্‌কব্‌ বাঁধকে হরণা কূদে হোই।'

অর্থাৎ লাল বুঝগ্‌গর সব বুঝতে পাবে, আর কেউ বুঝতে পারে না; চার পায়ে জাঁতা বেধে হরিণ ছুটে গিয়েছে।

তুরস্ক দেশেও এমনি একটি বেজায় বুদ্ধিমান লোক ছিল, একবার একটা উট দেখে একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মশায়, এটা কি জন্তু?' বুদ্ধিমান বললে, 'তাও— জান না? খরগোশ হাজার বছরের বুড়ো হয়েছে, তাইতে তার এমনি চেহারা হয়ে গিয়েছে।' কথাটা কিন্তু নিতান্ত মন্দ বলে নি, খরগোশ যদি হাজাব বছর বেঁচে থাকতে পারত, আব সেই হিসাবে তার নাক তুবড়ে গাল বসে মুখ লম্বা হয়ে আসত, তবে তাব অনেকটা উটেব মত চেহারা হত বইকি।

পাঞ্জাবের এক বুদ্ধিমান বুড়োর কথা আছে, সে বেশ মজাব। গ্রামেব মধ্যে সেই লোকটি সকলের চেয়ে বুড়ো আর বুদ্ধিমান, আব সব বড্ড বোকা। একদিন রাত্রে সেই গ্রামেব ভিতব দিয়ে একটা উট গিয়েছিল; সকালে উঠে তাব পায়েব দাগ দেখে কেউ বুঝতে পারছে না যে, কিসেব দাগ। শেষে তাবা সেই বুড়োব কাছে গিয়ে বলল, 'দেখ ত এসে বুড়ো দাদা, এ-সব কিসের দাগ?'

বুড়ো দাদা সঙ্গে সঙ্গে সেই উটেব পায়ের দাগগুলো দেখে খানিক হাউ হাউ করে কাঁদল, তারপর হিহি হিহি করে হেসে ফেলল। তাতে সকলে ভাবি আশ্চর্য হয়ে বললে, 'তুমি কাঁদলে কেন দাদা?' বুড়ো বললে, 'কাঁদব না? হায় হায়। আমি মরে গেলে তোবা কাব ঠেঞে এ-সব কথা জিজ্ঞেস কববি?' তাতে সকলে ভাবি দুঃখিত হয়ে বললে, 'আহা ঠিক বলেছ দাদা। তুমি না থাকলে আর কাকে জিজ্ঞাসা কবব? তুমি আবাব হাসলে কেন?' বুড়ো বলল হাসব না? হাঃ হাঃ হা-হা-আ-আ, আরে আমিও যে বুঝতে পারলুম না, এ ছাই কিসেব দাগ। হাঃ হাঃ হা-হা-আ-আ-হা-আ।'

আব দু ভাইয়ের কথা বলে শেষ করি। এক গ্রামে অনেক চাষা ভূষো থাকে, তাদেব সকলের কিছু কিছু টাকা কড়ি আছে, কিন্তু তাদেব কেউ কখনো লেখাপড়া শেখেনি, সেজন্য তারা বড়ই দুঃখিত। একদিন তারা সবাই মিলে যুক্তি করল, 'চল আমরা দুটি ছেলেকে শহরে পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে আনি। আমাদেব গ্রামে একটাও পণ্ডিত নেই, কেমন কথা?' এই বলে তারা তাদের গ্রামের মোড়লের দুটি ছেলেকে শহরে পাঠিয়ে দিল; তাদের বলে দিল 'তোরা বিদ্যে শিখে পণ্ডিত হয়ে আসবি।'

তারা দু ভাই শহরে চলেছে, পথের পাশে যা কিছু দেখছে, কোনটারই খবর নিতে ছাড়ছে না। এক জায়গায় গাছতলায় একটা হাতি বাঁধা ছিল। তাকে দেখে তারা ভারি আশ্চর্য হয়ে পথের লোককে জিজ্ঞাসা কবল 'এটা কি ভাই?' তারা বলল, 'এটা হাতি।' তা শুনে দু ভাই ভাবি খুশি হয়ে বলল, 'বাঃ, এরি মধ্যে ত এক বিদ্যা শিখে ফেললুম—হাতি, হাতি, হাতি হাতি।'

তারপর শহরের কাছে এসে মন্দির দেখতে পেয়ে তারা একজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি ভাই।' সে বলল, 'এটা মন্দির।' তাতে দু ভাই বলল, 'মন্দির, মন্দির, মন্দির, মন্দির, বাঃ,

আরেক বিদ্যে শেখা হল।'

বলতে বলতে তারা বাজারের ভিতর দিয়ে চলেছে। বাজারের মাছ, তরকারি, ডাল চাল সবই আছে, আর সবই তারা চেনে, খালি আলু আর কখনো দেখে নি। সেই জিনিসটার দিকে তারা অনেকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল, তারপর আলুওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো কি ভাই?' সে তাতে রেগে বলল, 'কোথাকার বোকা? এ যে আলু তাও জান না?' তারা দু ভাই সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে খালি বলতে লাগল, 'আলু, আলু, আলু আলু।' তখন তাদের মনে হল, 'ইস, আমরা কত বড় পণ্ডিত হয়ে গেছি, একটা বিদ্যে শিখলেই তাকে পণ্ডিত বলে। আর আমরা দেখতে দেখতে তিনটে বিদ্যে শিখে ফেললুম। আর কি, এখন দেশে ফিরে যাই।'

কাজেই তারা গ্রামে ফিরে এল। তারপর থেকে তারা পালকি ছাড়া চলে না, গ্রামের লোক তাদের দেখলেই দণ্ডবৎ করে আর বড় বড় চোখ করে বলে, 'বাপ রে, তিন মুখো পণ্ডিত হয়ে এসেছে।' এমনি করে কয়েক বছর চলে গেল। তারপর একদিন হয়েছে কি, সেই গ্রামে কোত্থেকে এসেছে এক হাতি। গ্রামের লোক তাকে দেখেই ত ছুটে পালাল। তারপর অনেক দূর থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে তাকে দেখতে লাগল, কিন্তু কেউ বলতে পারল না এটা কি, শেষে একজন বলল, 'শিগ্গির পণ্ডিতমশাইদের ডাক।' তখনি পালকি ছুটল পণ্ডিতদের আনতে। তারা এসে চশমা এঁটে অনেকক্ষণ ধরে হাতিটাকে দেখল, তারপর বড় ভাই বলল, 'এটা মন্দির।' তা শুনে ছোট ভাই বলল, 'দাদার যে কথা! এত টাকা দিয়ে বিদ্যে শিখে এসে শেষে কিনা বলছে এটা মন্দির। আরে না না, এ মন্দির নয়, এটা আলু। আলু।'

গল্প-সল্প

১

যদু যেমন ষণ্ডা ছিল; সে খেতেও পারত তেমনি। যখন সে খুব ছোট ছিল, তখন একদিন সে গেল এক বড়লোকের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে। ভারি ভারি খাইয়ে সব সেখানে খেতে বসেছে, লুচি কোরমার ধুম লেগে গেছে। খাইয়েরা খুব খেতে পারাটাকে বড়ই বাহাদুরি মনে করে। তাই খাওয়া শেষ হবার সময় তারা বললে, আচ্ছা, আজ কে সকলের চেয়ে বেশি খেয়েছে?' এ কথায় কেউ বলছে, 'আমি!' আর কেউ বলছে, 'না আমি!' তা শুনে যারা পরিবেশন করছিল তাদের একজন বলল, 'আজ্ঞে না; সকলের চেয়ে বেশি খেয়েছে এ ছেলেটি (মানে যদু)। সে 'এতগুলো' লুচি আর 'এতটুকরো' কোরমা খেয়েছে।

সকলে তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে যদুকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে, সত্যি নাকি তুই এত খেয়েছিস?' যদু বলল, 'খেয়েছি বৈকি। আরো খেতে পারি।' তা শুনে সবাই বলল, 'বটে? আচ্ছা, আন্ দেখি লুচি— কোরমা, দেখি ও আর কত খেতে পারে।' শুনেছি তখন নাকি যদু আরো এক দিস্তা (চব্বিশখানা) লুচি আর আঠার টুকরো কোরমা খেয়েছিল। সত্যি মিথ্যা ভগবান জানেন, আমার তখন জন্ম হয় নি। এত খেয়েও যে যদুর পেট ভার হয়েছিল তা মনে করো না। সে তখনি সুপারির ডালের ঘোড়া হাঁকিয়ে বাড়ি এল;এসে কালোজাম গাছে

উঠে আরো অনেকগুলো কালোজাম খেল।

২

এ হল বহুকালের কথা। তখন 'খাইয়ে' বললে ভারি একটা গৌরবের কথা হত। সে সময় এক ব্রাহ্মণ এই বাহাদুরির লোভে মারাই গিয়াছিলেন। কোন বড়লোকের বাড়িতে তাঁকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে, তাঁর যা ইচ্ছা, যত খুশি খেতে দেওয়া হত। একদিন সেখানে খেতে বসে বললেন, 'আজ আমি শুধু ছানা আর চিনি খাব।' তাই তাকে এনে দেওয়া হল। তিনি তখন সাতসের ছানা চেঁছেপুছে শেষ করে, বিস্তর বাহাদুরি পেয়ে, বাড়ি এসে সেই রাত্রেই পেট ফেঁপে মারা গেলেন।

আর-একটি ভটচাজ্জি মশায়েরও এ বিষয়ে খুব নাম ছিল। সকলে যখন তাঁর খাওয়া দেখে আশ্চর্য হত, তখন তিনি নিজের কপালে টোকা দিয়ে বলতেন 'দেখছ কি? এইটুকু শুধু নিরেট আর সব পেট।'

৩

একটি ছেলের মনটি বড় ভাল, কিন্তু স্বভাবটি একটু পাগলাটে গোছের। সে একদিন রাত্রে এক জায়গায় গিয়েছিল—পূজা দেখতে! ঢুকবার সময় তার বুট জোড়াটি খুলে বাইরে রেখে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে, কে তা নিয়ে গেছে। ছেলেটি ত তাতে হেসেই অস্থির, সে বলল, "বেটা ভারি ঠকেছে! পুরনো জুতো চুরি করেছে, দুমাসও পায়ে দিতে পারবে না।" যা হোক এখন বাড়ি ফিরে ত যেতে হবে; কাজেই শুধু পায়ে হেঁটে, ট্রাম ধরবার জন্য হেদোর ধারে এসে উপস্থিত হল; সেখান থেকে তার বাড়ি পঁচিশ মিনিটের পথ—পটলডাঙ্গায়। সে হেদোয় এসেই একখানা ট্রাম পেয়েছিলো, কিন্তু তখন সে ভাবল, এখান থেকে উঠে কেন নাহক ঠকি! সেই ছপয়সাই ত দিতে হবে,—আমি শ্যামবাজারে গিয়ে ট্রাম ধরে পয়সা আদায় করে নেব। বলে সে ত সেই শুধু পায়ে হেঁটে হেঁটে গিয়ে শ্যামবাজারে আড্ডায় উপস্থিত হয়েছে। সেখানে গিয়ে শুনল সেদিন আর ট্রাম পাওয়া যাবে না; হেদোর ধারে যেখানা পেয়েছিল সেখানা শেষ গাড়ি! সেদিন সে বাড়ি ফিরে এলে পর তার হাসির চোটে বাড়িসুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

৪

বাংলা অক্ষরে যেমন অন্য-সব ভাষায় সকল কথা লেখা যা—যেমন 'আই গো আপ', কিংবা কোন নাম যেমন 'লর্ড কারমাইকেল', 'জেমস ওয়াট', সেরকম কিন্তু সব ভাষায় চলে না। চীনা ভাষায় এক একটি অক্ষরের এক একটি কথা। একজন বাঙালি বাবু একজন চীনা ভদ্রলোককে বললেন, 'আপনি আপনাদের ভাষার অক্ষরে আমার নাম লিখুন ত। আমার নাম 'ধ্রুব'।' চীনা ভদ্রলোকটি অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে কতকগুলি হিজিবিজি কি যেন লিখলেন। সেই লেখা অন্য একজন চীনা ভদ্রলোককে পড়তে দেওয়া হল। সে বলল, 'এতে লেখা রয়েছে দু-লুফা।' একজন জাপানী ভদ্রলোক ট্রাফালগারের সম্বন্ধে জাপানীভাষায় কি যেন লিখছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে যেখানে ট্রাফালগার কথাটা আছে, সেটা তিনি ইংরাজীতে

লিখেছেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ও কথাটা ইংরাজীতে লিখলেন যে?' জাপানী ভদ্রলোক বললেন, 'আমাদের ভাষার অক্ষর দিয়ে ট্রাফালগার লেখা যায় না,' সবচেয়ে কাছাকাছি যা লেখা যায়, তার উচ্চারণ হচ্ছে—'ত্রা-ফারু-গারু'।

৫

এক সাহেবের বড় বাংলা শেখবার শখ হল। তিনি পণ্ডিত রেখে খুব উৎসাহের সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করলেন। গোড়ায় কয়েকদিন বেশ উৎসাহের সঙ্গে পড়া চলল; কিন্তু যখন যুক্ত অক্ষর পড়া আরম্ভ হল তখনই ত সাহেবের যত গোল বাধল। তিনি যুক্ত অক্ষর দেখে ত চটেই অস্থির, 'কি! একটা অক্ষরের ঘাড়ে আর একটা অক্ষর। এমন আজগুবি ভাষাও ত দেখি নি। এমন ভাষাও আবার ভদ্রলোকে পড়ে! মানুষের ঘাড়ে মানুষ, আর অক্ষরের ঘাড়ে অক্ষর, এ কেবল তোমাদের দেশেই সম্ভব।'

৬

এক চাষার একটু বুদ্ধি কম ছিল। চাষা মাঠে যাবে কাজ করতে, সারাদিন ত সেখানে থাকতে হবে তাই তার স্ত্রী বিকালে জলখাবার জন্য তার কাপড়ে দশখানা চাপাটি বেঁধে দিল। চাষা ভারি পেটুক ছিল। সে মাঠে যেতে না যেতেই ভাবল, 'উঃ! আমার দেখছি এক্ষুনি বড্ড খিদে পেয়েছে, চাপাটি খাব নাকি! না খাব না, তা হবে বিকালে খাব কি?'

খানিক বাদে সে ভাবল, 'উঃ! বড্ড যে খিদে পেয়েছে, একখানা চাপাটি খাই, বাকি বিকালে খাব।'

এই বলেই সে একখানা চাপাটি খেয়েছে, অমনি তার খিদে আরো বেড়ে গিয়েছে; তখন সে ভাবল 'আর একখানা খাই।' যত খায় ততই তার খিদে যেন বেড়ে যায়। একখানা দুখানা করে সে আটখানা খেয়ে ফেলল, তবুও তার পেট ভরল না শেষে বাকি দুখানাও বার করে খেতে হল, আর তাতে তার পেটও ভরে গেল।

তখন চাষা ভাবল, 'আটটা খেলাম, তাতে কিছু হল না, আর এ দুটো খেতে না খেতেই পেট ভরে গেল। আহা! এ দুখানা কেন আগে খেলুম না, তা হলে ত গোড়াতেই পেট ভরত, আর আমার কোঁচড়ে আটখানা চাপাটি থেকে যেত। তাইত, আমি কি বোকা!'

৭

এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ভোজ হচ্ছে, একদল গুলিখোর তাই শুনে সেখানে নিমন্ত্রণ খেতে চলল। যেতে যেতে তাদের একজন বলল, 'আরে, তোরা যে যাবি, ওদের ফটক শুনেছি বড্ড নিচু—ঢুকবি কি করে?'

তা শুনে আরেকজন বলল, 'কেন? এমনি করে ঢুকব।' বলেই সে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। তা দেখে আর সবকটাও তেমনি করে হামাগুড়ি দিতে লাগল।

এই ভাবে ত তারা গিয়ে ভোজের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে, আর অমনি যমদূতের মত চারটে দরোয়ান এসে তাদের ঘাড়ে চেপে ধরেছে। তখন সেই প্রথম গুলিখোরটা ভারি

গম্ভীর হয়ে মোটা গলায় বলল, 'এখন দেখ্ দেখিনি? আমি বলেই ছিলাম যে ফটক নিচু, আটকাবে!'

৮

একটি মাসে দশটি টাকার কমে একটি স্কুলের ছেলের খাওয়া চলে না। আমাদের ছেলেবেলায় 'আমরা চাকরকে দু'পয়সা করে দিয়েছি। তাতেই সে আমাদের দুবেলা খেতে দিয়েছে। আমি কিন্তু হিসাব-কিতাবের কথা বলতে যাচ্ছি না, আমি সেই চাকরটির কথা বলছি! তার নাম—আমরা তার সাক্ষাতে বলতাম 'কালা', অসাক্ষাতে বলতাম 'কেলে'। দু পয়সায় দুবেলা মাছ, তরকারি, ডাল, ভাত পেট ভরে খেতে দিতে হবে। কেলে তা ও দিতই, আবার তার উপরে ঢের লাভ করে নিতেও ছাড়ত না। তার লাভের চোটে আমাদের পেট চোঁ চোঁ করত।

বাজারে যতরকমেরই মাছ উঠুক, কেলে আনে শুধু বাটা। ছ আঙুল লম্বা একটি মাছ তাকেই দু'ভাগ করে একজনকে দেয় ল্যাজা, আর-একজনকে দেয় মুড়ো। যে ল্যাজা পায়, তার তবু দুগ্রাস খাওয়া চলে, কিন্তু যে মুড়ো পায় সে বেচারার খালি চোষাই সব।

মাছ পাতে পড়তেই ছেলেরা একজন আর-একজনকে ডেকে খবর নেয়, কার ভাগে কি জুটেছে। কিন্তু সে কথা কেউ বাংলাতে বলতে ভরসা পায় না। কেলের মেজাজটা বেজায় বেয়াড়া আর মুখটা অতি অসভ্য। ছেলেরা তাই ইংরেজিতে বলে ' কি হে 'হেড' না 'টেইল'?' একদিন একজনের পাতে পড়েছে 'ল্যাজা', সে ভুলে বলে ফেলেছে 'হেড'। অমনি কেলে বিষম দাঁত খিচিয়ে বলল, 'কি? তোমাকে দিলাম 'টেইল, আর তুমি যে বললে 'হেড'?'

সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর ছেলেরা ঘরে এসে বলতে লাগল, 'নাঃ, বেটাকে জব্দ করতে না পারলে আর চলছে না। ইংরাজিতে কথা বলব, তাও দুদিন শুনেই বুঝে নেবে, এ কি সহ্য হয়?' তখন এই যুক্তি হল যে, তরকারি যতই কম হোক, সবাই মিলে কষে ভাত খেয়ে কেলেকে নাকাল করবে।

বারজনের রান্না হয়, সেদিন রাত্রে পাঁচজনই তার সব চেঁছেপুছে খেয়ে বসে আছে, আবার বলছে 'আরো দাও'! হাঁড়ি পানে চেয়ে কেলের মুখ শুকিয়ে গেছে, কিন্তু আর উপায় কি? পেট ভরে খেতে দিতেই হবে। সে বেলার কাজ শেষে দই চিঁড়ে এনে চালাতে হয়েছিল; কাজেই লাভ যা হয়েছিল, তা উলটা বাগে।

তার পরদিনই কেলে আগে ভাগেই সাবধান হয়ে ঢের বেশি ভাত রেঁধেছিল; কিন্তু সবাই বললে, 'আজ আমাদের খিদে নেই।' কাজেই কেলের অনেক ভাত লোকসান হল। এমনি ভাবে দিন তিনেক যেতেই কেলে বেশ বুঝতে পারল যে ছেলেদের খুশি না রাখতে পারলে লাভের অংশ খুবই কম; তারপর থেকেই দেখা গেল যে কেলের মেজাজটিও একটু নরম, কথাবার্তাও কতকটা ভাল।

তারপর?

এক যে রাজা;তার ভারি গল্প শোনার শখ। কিন্তু তা থাকলে কি হয়, রাজামশাইকে কেউ গল্প শুনিয়ে খুশি করতে পারে না।

রাজামশাই বলেন, 'যে আমাকে গল্প শুনিয়ে খুশি করতে পারবে, তাকে আমার অর্ধেক রাজ্য দিব, না পারলে কান কেটে নিব।' তা শুনে দেশ বিদেশের কত ভারি ভারি নামজাদা গল্পওয়ালা কোমর বেঁধে গোঁফে তা দিয়ে গল্পের ঝুড়ি নিয়ে আসে, কিন্তু কেউ রাজামশাইকে খুশি করতে পারে না। যাবার সময় সকলেই কাটা কান নিয়ে দেশে যায়।

গল্প বলতে গেলেই রাজামশাই খালি বলেন, 'তারপব?' 'তারপর' তারপর' করে গল্পওয়ালার দফা শেষ করে তবে তিনি ছাড়েন। 'রাক্ষস মরে গেল'— 'তারপর?' রাজপুত্র বেঁচে গেলেন— 'তারপর?' বৌ নিয়ে দেশে এলেন'— 'তারপর?' ভারি আনন্দ হল'— 'তারপব? 'আমার কথা ফুরল' তারপর?' 'নটে গাছটি মুড়ল'—'তারপর?' এমনি করে আর কত বলবে? কাজেই শেষে একবার তাকে বলতে হয়, 'আর আমি জানি না' বা 'আর বলতে পারছি না।'

তা হলেই রাজা বলেন 'তবে গল্প বলতে এসেছিলে কেন? কাট তবে বেটার কান।'

এই ত ব্যাপার। রাজামশাইয়ের তারপরের শেষও কেউ করে উঠতে পারে না, অর্ধেক রাজ্যও পায় না, লাভের মধ্যে কানটি যায়।

সেই দেশে থাকে এক নাপিত সে বড্ড কুঁড়ে, কিন্তু ভারি সেয়ানা। সে ভাবল অর্ধেক রাজ্য যদি পাই;তবে নেহাৎ মন্দ হবে না;একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি? নাহয় কানটা যাবে।

এই বলেই সে জামা জোড়া পরে, মস্ত পাগড়ি বেঁধে, লম্বা ফোঁটা কেটে, রাজার সভায় গিয়ে লম্বা সেলাম ঠুকে জোড়হাতে বলল, 'মহারাজের জয় হোক হুকুম হয়ত কিছু গল্প শোনাই।'

রাজা বললেন 'ভাল, ভাল, কিন্তু আমার সর্ত জান ত, খুশি করতে পারলে অর্ধেক রাজ্য দিব, না পারলে কানটি কেটে নিব।'

নাপিত বলল, আমার গল্পের আগাগোড়া শুনতে হবে, মাঝখানে থামতে বলতে পারবেন না।

রাজা বললেন, তাই সই, আমিও ত তাই চাই।

তখন নাপিত চাকর মহলে গিয়ে আচ্ছা করে ছিলিম আট দশ তামাক টেনে এসে খুব গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল। —মহারাজ, এখান থেকে অনেক দূরে এক আজব দেশ আছে। অমনি মহারাজ বললেন, 'তারপর?'

সেইখানে অনেকদিন আগে ভারি নামজাদা এক রাজা ছিলেন।—তারপর?

তার রাজ্যের একধার থেকে আরেক ধার যেতে ছ'মাস লাগত।—তারপর?

আর সে রাজ্যের মাটি যে কি সরেস ছিল, কি বলব?—তারপর? তাতে একসের ধান বুনলে, দশমন ধান পাওয়া যেত।—তারপর?

তাই দেখে রাজামশাই তাঁর রাজ্যের সকল জমিতে ধানের চাষ করালেন।—তারপর?

আর তাতে ধান যা হল! সে ধান রাখবার জন্য যে গোলা তয়ের হয়েছিল, তার একধারে দাঁড়ালে আর -এক ধার দেখা যেত না।—তারপর?

লাখে লাখে মোষের গাড়ি লেগেছিল, সে ধান গোলায় আনতে। এত বড় গোলা তাতে একেবারে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল, আর-একটু হলেই ফেটে যেত।—তারপর!

তারপর সেই ধানের খবর পেয়ে পঙ্গপাল যা এল! পঙ্গপালে দশদিক ছেয়ে গেল, আকাশ অন্ধকার, হাওয়া চলবার জো নাই, শ্বাস টানলে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল নাকে ঢোকে।—তারপর? তারপর?

বেটারা এসেছে ধান খেতে। কিন্তু রাজামশায়ের গোলা কি যেমন তেমন করে গড়া? পঙ্গপালের সাধ্যি কি, তাতে ঢুকবে? দশদিন বেটারা বন্ বন্ করে গোলার চারধারে ঘুরে বেড়াল, বেড়ার কোনখানে একটা বিঁধ বার করতে পারল না।—তারপর? তারপর?

তারপর এগার দিনের দিনে কয়েকটা ডানপিটে ছোকরা পঙ্গপাল খুঁজে খুঁজে কোত্থেকে গিয়ে একটা বিঁধ বার করেছে, অনেক ঠেলাঠেলি করলে তা দিয়ে ভিতরে ঢোকা যায়।—তারপর? তারপর?

তখন তাদের পালের গোদাটা এসে সেই বিঁধের মুখে বসে বলল, ঠ্যাল্ ত রে বাপু—সকলে তোরা সবাই মিলে, দেখি, ভিতরে ঢুকতে পারি কি না— তারপর?

তারপর, ওঃ, সে কি বিষম ঠেলাঠেলি, গোদা বেটা চ্যাপ্টা হয়ে গেল, তবু বলল, 'ঠ্যাল ঠ্যাল।' —তারপর?

শেষে অনেক কষ্টে, অর্ধেক ছাল বাইরে রেখে তবে গিয়ে ভিতরে ঢুকল—তারপর?

ঢুকে একটি ধান মুখে করে নিয়ে, বিঁধের কাছে এসে বলল, এবারে আমাকে টেনে বার কর।—তারপর? ওহ! সে কি টানাটানি! আর একটু হলেই বেটা ছিঁড়ে যেত। যা হোক অনেক কষ্টে সে ধানটি নিয়ে বাইরে এল।—তারপর?

তারপর আর-এক বেটা গিয়ে বসেছে সে বিঁধের মুখে, আর তেমনি ঠেলাঠেলির পর ভিতরে ঢুকেছে আর একটি ধান নিয়ে তেমনি টানাটানির পর বাইরে এসেছে।—তারপর?

তারপর আরেক বেটা—আরেক বেটা।—তারপর আরেক বেটা। তারপর? আরেক বেটা।—

রাজামশাই যতই বলেন, তারপর? নাপিত ততই খালি বলে, আরেক বেটা।—

দণ্ডের পর দণ্ড এইভাবে গেল, রাজামশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু না শুনে উপায় নেই।— বলছেন আগা-গোড়া শুনবেন, থামিয়ে দিতে পারবেন না। সন্ধ্যার সময় রাজামশাই আর থাকতে না পেরে বললনে, 'আরে, আর কত বলবে? এখনো কি শেষ হল না?'

নাপিত জোড়হাতে বলল, 'সে কি মহারাজ? সবে ত আরম্ভ। গুটি কয়েক পঙ্গপাল সবে গুটি কয়েক ধান নিয়েছে। এখনো গোলা ধানে বোঝাই, আকাশ পঙ্গপালে অন্ধকার।'

কাজেই আর কি করা যায়? আরো দুদিন বসে পঙ্গপালের কথা শুনলেন। তারপর আর কিছুতেই থাকতে না পেরে, কেঁদে বললেন, 'আমার ঢের হয়েছে বাবা, অর্ধেক রাজ্য নেও, নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।'

তখন নাপিতের খুব মজা হল।

ভুতো আর ঘোঁতো

ভুতো ছিল বেঁটে আর ঘোঁতো ছিল ঢ্যাঙা; ভুতো ছিল সেয়ানা, আর ঘোঁতো ছিল বোকা। দুজনে মিলে গেল কুলগাছ থেকে কুল পাড়তে। ঘোঁতো কিনা ঢ্যাঙা, সে দুহাতে খালি কুলই পাড়ছে। ভুতো কিনা বেঁটে, তাই সে কুল নাগাল পায় না, সে শুধু ঘোঁতোর পাড়া কুল খাচ্ছে।

কুল পাড়া হয়ে গেলে ঘোঁতো বলল, 'কুল কই রে?' ভুতো বলল, 'নেই। খেয়ে ফেলেছি।' ঘোঁতো বলল, 'বটে রে? তবে দাঁড়া, লাঠি আনছি।'

বলেই অমনি ঘোঁতো গেল গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে, লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে, সে কেন কুল খেয়ে ফেলল—একটাও রাখল না?

গাছ বলল, 'এই যে ঘোঁতো। কেমন আছ? কোথা যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'গাছ কাটতে; গাছ নিয়ে লাঠি বানাতে, লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে, সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না;' গাছ বলল, 'আমাকে কাটবে? কি দিয়ে কাটবে? কুড়ুল কই?'

ঘোঁতো গেল কুড়ুল আনতে। কুড়ুল বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, কুড়ুল আনতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?কুড়ুল বলল, 'আমাকে নেবে? শানাবে কিসে? পাথর কই?'

ঘোঁতো গেল পাথর আনতে। পাথর বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, পাথর আনতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে, সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' পাথর বলল, ' আমাকে নেবে? ভেজাবে কি দিয়ে? জল কই?'

ঘোঁতো গেল জলের কাছে। জল বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, জল আনতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে, গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে, সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' জল বলল. 'আমাকে নেবে? হরিণ আসবে, আমাতে নামবে, গা ভিজবে, তবে ত হবে।'

ঘোঁতো গেল হরিণের কাছে। হরিণ বলল, 'এই যে ঘোঁতো, কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'হরিণ আনতে, হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে, লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে, সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না? হরিণ বলল, 'আমাকে নেবে? কুকুর কই? আমাকে ধরবে কে?"

ঘোঁতো গেল তাদের কুকুর ভোলাকে ডাকতে। ভোলা বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, ভোলাকে ডাকতে; ভোলাকে দিয়ে হরিণ ধরাতে, হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল

দিয়ে গাছ কাটতে গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' ভোলা বলল, 'আমাকে নেবে? তবে মাখন আনো, নখে মাখি।'

ঘোঁতো গেল মাখন আনতে। মাখন বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, মাখন আনতে; ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে হরিণ দিয়ে জল তোলাতে জল দিয়ে পাথর ভেজাতে পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে, কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' মাখন বলল, 'আমাকে নেবে? তবে বেড়াল আনো, চে[illegible] [illegible]লুক।'

ঘোঁতো গেল তাদের মেনির কাছে। মেনি বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, মেনিকে খুঁজতে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে, সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' মেনি বলল, 'আমাকে নেবে? দুধ দাও তবে, খাই আগে।'

ঘোঁতো গেল গাইয়ের কাছে। গাই বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'গাইয়ের কাছে দুধ আনতে মেনি তা খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে; নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে জল দিয়ে পাথর ভেজাতে পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' গাই বলল, 'দুধ নেবে? খড় আনো তবে, খাই আগে!'

ঘোঁতো গেল চাষার কাছে চাষা বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'চাষার কাছে খড় আনতে; গাইকে দিয়ে দুধ পেতে, মেনি তা খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে; নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে জল দিয়ে পাথর ভেজাতে পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' চাষা বলল, 'খড় নেবে? আটা আনো পিঠে খাব।'

ঘোঁতো গেল মুদীর কাছে। মুদী বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'মুদীর কাছে আটা আনতে, চাষাকে দিয়ে খড় নিতে খড় নিয়ে গাইকে দিয়ে দুধ পেতে মেনি তা খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে; নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে জল দিয়ে পাথর ভেজাতে পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' মুদী বলল, 'নদী থেকে এই চালনি ভরে জল আনো নইলে আটা পাবে না।'

চালনি নিয়ে খুশি হয়ে ঘোঁতো গেল নদী থেকে জল আনতে। জল ত তাতে থাকে না, তুলতে গেলেই পড়ে যায়। যত তোলে ততই পড়ে। বেলা হল, বেলা গেল, সন্ধ্যা এল; ঘোঁতো খুব খালি চালনি ডোবাচ্ছে আর তুলছে আর খালি ঝরঝর করে পড়ে যাচ্ছে।

ঘোঁতো বলল, 'কি মুশকিল! এখন কি হবে?'

সেখানে কতকগুলো হাঁস ছিল, তারা প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকছিল। তা শুনে ঘোঁতো বলল, 'আরে তাই ত, ঠিকই ত বলেছে। চালনিতে পাঁক মাখিয়ে নিতে হবে, তাহলেই ফুটো বন্ধ হয়ে যাবে আর জল ধরবে।' নদীর ধারে পাঁক ছিল, ঘোঁতো তাই নিয়ে চালনিতে মাখাল; ফুটো বন্ধ হয়ে গেল, আর জল পড়তে পেল না। ঘোঁতো তখন হাসতে হাসতে জল নিয়ে মুদীর কাছে ফিরে এল। মুদী তাতে খুশি হয়ে ঘোঁতোকে ঢের আটা দিল। আটা নিয়ে ঘোঁতো গেল চাষার কাছে; চাষা তাতে খুশি হয়ে ঘোঁতোকে খড় দিল। খড় নিয়ে ঘোঁতো দিল মেনিকে; মেনি তা খেয়ে খুশি হয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিল। ভোলা সে মাখন নখে মেখে হরিণ ধরে আনল। হরিণ গিয়ে জলে নেমে গা ভিজিয়ে এল। ঘোঁতো তার গা থেকে জল নিয়ে পাথরে দিল, সেই পাথরে কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটল, সেই গাছ দিয়ে লাঠি বানাল, সেই লাঠি নিয়ে দাঁত কড়মড়িয়ে ছুটে গেল কুলগাছতলায় ভুতোকে মারতে। ভুতো কি ততক্ষণ গাছতলায় বসে? সে তার কত আগেই ছুটে পালিয়েছে।

গিল্‌ফয় সাহেবের অদ্ভুত সমুদ্র-যাত্রা

তোমরা 'ইউনাইটেড স্টেট্‌স' কোথায় জান? পৃথিবীর মানচিত্রের বাঁ ধারের গোলাকারটির নাম নূতন মহাদ্বীপ। নূতন মহাদ্বীপের বড় দেশটা আমেরিকা। আমেরিকার মাঝখানটা খুব সরু, দেখিতে দুইটি দেশের মত দেখায়। এই দুইটির উপরেরটির নাম উত্তর আমেরিকা আর নীচেরটির নাম দক্ষিণ আমেরিকা। উত্তর আমেরিকার যত দেশ, ইউনাইটেড্ স্টেট্‌স্ তাহার মধ্যে সকলের বড়।

ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সে গিল্‌ফয় সাহেবের বাড়ি। গিল্‌ফয় সাহেব বড় মজার লোক। বয়স তেত্রিশ বৎসর হইবে। সাহেব এই বয়সটা প্রায় জাহাজে থাকিয়াই কাটাইয়াছেন। জাহাজে চড়িয়া কত দেশে গিয়াছেন, কত তামাশা দেখিয়াছেন, কিন্তু একা ছোট নৌকায় প্রশান্ত মহাসাগরে পার হন নাই, এই দুঃখে সাহেবের আর মন ঠাণ্ডা হয় না। ছুতোরকে বলিলেন, 'আমাকে একখানা নৌকা গড়িয়া দাও।' ছুতোর তাহাই করিল। নৌকা দৈর্ঘ্যে বার হাত, চওড়ায় চার হাত, আর উঁচুতে দুই হাত হইল। পঞ্চাশ মন জিনিস ধরে। নাম রাখিলেন 'প্যাসিফিক্'। সাহেব বলিলেন, 'জল-বিহার করিয়া কারস্থা অষ্ট্রেলিয়া যাইব।' অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা হইতে প্রায় ছ'হাজার মাইল দূরে।

পাঁচমাসের আন্দাজ খাদ্য সামগ্রী নৌকায় উঠান হইল। ১৮৮২ সালের ১৯ আগস্ট গিল্‌ফয় সাহেব যাত্রা করিলেন। প্রথম সপ্তাহ বেশ সুখে সুখে গেলেন—তবে নৌকা বড় নিচু বলিয়া জল ছিটিয়া খাবার জিনিসগুলি ভিজাইয়া দিতে লাগিল— এই একটু অসুবিধা। এরপর প্রায় একমাস পর্যন্ত কোনদিন বাতাস পান, কোনদিন বা বাতাস থাকেই না; আর দলে দলে মাছ এবং সামুদ্রিক কচ্ছপ আসিয়া নৌকা ঘিরিয়া তামাশা দেখে। বাতাস নাই, পথ এগোয় না; খাবার জিনিসও বেশি নাই; সাহেব দেখিলেন অত বেশি খাইলে চলিবে না। এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে এই সময়ে সাহেবের ক্ষুধা হ্রাস হইয়া উঠিল। বেশি খাইতে পারে না—সুবিধার বিষয়ই হইল। ভোর হইবার পূর্বে তিন-চার ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া

অভ্যাস ছিল, কিন্তু নৌকার নীচে কিসে ঠক্‌ঠক্ করিয়া তাহার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। সাহেব দেখিলেন, হাঙরের তাড়ায় ছোট ছোট মাছ আসিয়া নৌকায় ঠেকে—তাহাতেই এই শব্দ হয়। তিনি হাঙ্গর তাড়াইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তোমরা অনেকে বোটের মাঝিদের হাতে একরকমের লগি দেখিয়াছ তাহার মাথায় লোহার একটা বঁড়শির মত লাগান থাকে। সাহেবের এর একটা ছিল। তিনি তাহার অগ্রভাগটা সোজা করিয়া লইলেন। এই অস্ত্র হাতে করিয়া তিনি হাল ধরিতে বসিতেন আর হাঙ্গর কাছে আসিলেই সুট করিয়া ঘা মারিতেন। হাঙ্গরগুলি ভয় পাইল, তিনি যতক্ষণ বাহিরে বসিয়া থাকিতেন ততক্ষণ আর কাছে আসিতে সাহস পাইত না। ঘুমাইবার সময় একটা পিরাণ তাঁহার বসিবার জায়গায় লট্‌কাইয়া রাখিতেন; তাহাতে হাঙ্গরগুলি মনে করিত মানুষটাই বুঝি বসিয়া রহিয়াছে; সুতরাং ঠক্ ঠকি থামিল।

১০ নভেম্বর একখানা জাহাজ দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার কাছে গিয়া কিছু খাবার চাহিয়া লইলেন। তাহার পর কয়েকদিন এত বাতাস পাইয়াছিলেন যে একদিন প্রায় একশত ছয় মাইল গিয়াছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর, ঝড় তুফানের দিন; একটা বড় ঢেউ আসিয়া তাঁহার নৌকাখানি উল্টাইয়া ফেলল। সাহেব সাঁতরিয়া নৌকার পাশ দিয়া গেলেন, এবং নোঙরের দড়ি ধরিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে করিতে এক ঘণ্টায় নৌকাটিকে সোজা করিলেন। জল সেঁচিতে গিয়া তিনি কিছু বেশি হুড়োহুড়ি করিতে লাগিলেন—নৌকাখানি আবার উল্টিয়া গেল। দ্বিতীয় বার নৌকা সোজা করিতে তত কষ্ট বোধ হইল না; এবার খুব সাবধান হইয়া জল সেঁচিলেন এই গোলমালে সাহেবের ঘড়ি এবং কম্পাস হারাইয়া গেল। কিছু কাল পরে একটা কিরিচ মাছ আসিয়া নৌকার গায় ছিদ্র করিয়া দিয়া গেল। সাহেব তখন টের পাইলেন না। কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন নৌকায় জল উঠিয়া জিনিসপত্র ভাসিতেছে, তখন চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি ছিদ্র বন্ধ করিলেন।

নূতন বৎসর আসল। ৭ জানুয়ারি একটি পাখি উড়িয়া নৌকায় আসিল, সাহেব তাহা ধরিয়া খাইলেন। ১১ জানুয়ারি আর একটি পাখি ধরিলেন। কখন কখন দুই একটি 'উড়ুক্ক' মাছ নৌকায় আসিয়া পড়িত, তাহাও বিনা আপত্তিতে ভক্ষণ করিতেন। ১৬ তারিখ তাঁহার হালটি ভাঙিয়া গেল; তিনি আর একটি করিয়া লইলেন। ইহার পর আর একদিন একটি পাখি ধরিয়াছিলেন। কিন্তু ২১তারিখে হইতে ক্ষুধায় তাঁহাকে রোগা করিতে লাগিল। নৌকার গায়ে যে-সমস্ত শামুক ছিল তাহার বড়গুলি চুষিয়া খাইলেন। আর-একদিন গুলি করিয়া একটি পাখি মারিয়াছিলেন; কিন্তু জল হইতে উঠাইতে পারিলেন না। ৩০ তারিখে একটি পাখি ধরিয়া দেশলাই-এর আগুনে পোড়াইয়া খাইলেন। তারপর এত দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে নৌকা কোন্ দিকে যাইতেছে তাহার প্রতি মনোযোগ রহিল না। একদিন হেঁট মস্তকে বসিয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ মাথা তুলিয়া দেখিলেন—একটা জাহাজ; তিনি আনন্দে জাহাজের দিকে যাইতে লাগিলেন; জাহাজের লোকেরাও তাঁকে দেখিতে পাইয়া জাহাজ ফিরাইল। জাহাজে উঠিয়াই কিছু খাবার চাহিলেন। খাবার শীঘ্রই আনা হইল; খাইয়া ঠাণ্ডা হইলে পর সমস্ত লোক তাঁহার ইতিহাস শুনিতে আসিল। তিনি নোট বহিতে সব লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; সেই বহি হইতে ইংরেজি পত্রিকায় এই গল্পটি ছাপা হইয়াছে।

খুঁত ধরা ছেলে

বিলাতে চারটি ভাই একদিন এক জায়গায় বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিল। তাহাদের আলাপের বিষয়, কে কি করিবে। সকলেরই মনে ইচ্ছা, একটা কিছু হওয়া চাই। সকলের 'একটা কিছু' ত আর একরকম হয় না। তাই চার ভাই চাররকম কথা বলিল।

একজন বলিল—'আমি ইঁটের কারবার করিব। তাহাতে টাকা হইবে, আর ইঁট দিয়া আমার একখানা বাড়ি করিব।'

আর-একজন বলিল—'দূর হ, তোর নেহাত ছোট নজর। আমি তোর চাইতে বেশি একটা কিছু হ'ব —আমি ইঞ্জিনিয়ার হ'ব।। কত লোক আমার কাছে ঘরবাড়ির নক্সা করিয়া নিতে আসিবে,কত লোকের বাড়ি ঘর বাঁধিয়া দিব। আমি একটা "দশজনের একজন" হইব। বলিস্ কি, আমার নামে একটা স্ট্রীট যদি না হয়, তখন দেখিস্।'

তৃতীয় ভ্রাতা—'বিল্‌ডার, কন্ট্রাক্টর, ইঞ্জিনিয়ার সব বাজে লোক, তোরা হ'বি চিনির বলদ। আমি কি করিব জানিস্। আমি অন্যের কাজ নিয়ে ছুটোছুটি করিতে যাইব কেন। সব কাজে আমার নিজের বুদ্ধি খাটিবে। সব নূতন ফ্যাসানে বাড়ি-ঘর করিব। আমার সব এমন হইবে যাহা কেহ কখন দেখে নাই।'

শেষ ব্যক্তি উঠিয়া বলিল— 'তোরা যাহাই করিস্ ভাই, এমন কিছু করিতে পারিবি না যাহার উপর আমার বক্তৃতা না চলিবে। উত্তম হইল, দেখ্ দেখি। তোরা যাহা করিবি, আমি তাহার দোষ ধরিব। আমার কাজের আর অভাব কি?'

চারি ভায়ের পরামর্শ ঠিক হইল। একজন ইঁটের কাজ করিয়া কিছু টাকা করিল। ইঁট দিয়া তাহার একটি বাড়ি হইল। তা ছাড়া এক দুঃখিনী বুড়িকে ঐ ইঁট দিয়া আর একটি ঘর করিয়া দিল। কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি মহাশয়ও কথামত কাজ করিলেন। মিউনিসিপালিটিকে খোঁচাইয়া নিজের নামে একটি স্ট্রীট পর্যন্ত কেমন করিয়া লইয়াছেন। তিনিও একটা কিছু হইয়াছেন। তৃতীয় বেচারা নূতন ধরনে বাড়ি করিতে গিয়া চাপা পড়িয়া মরিল। খুঁতধরা মহাশয়ের ত কথাই নাই। তাহার কাজ ফুরায়ই না। মরিবার সময় পর্যন্ত সে সন্তোষজনকরূপে, প্রশংসার সহিত কর্তব্য- কাজ করিয়া গেল।

একদিন স্বর্গের দরজায় দারোয়ান-দেবতা বসিয়া রহিয়াছেন। সে প্রকাণ্ড দরজা। বিশ্বকর্মার হাতের তৈরি। বুঝিতেই ত পার; স্বয়ং বিশ্বকর্মা ঠাকুর যাহা করিয়াছেন সে কেমন সুন্দর। এত সুন্দর যে আর কি বলিব! দরজায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুখানা কাচ লাগান। তাহার ভিতর দিয়া দারোয়ান-ঠাকুর কে আসিল দেখিতে পান। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাহা করিতেছিলেন না। অনেক কাল হইল স্বর্গে লোক আসে না; তাই আজ-কালের ব্যস্ততা কিছু কম। দেবতা দরজা খুলিবার হীরার হ্যাণ্ডেলে হাত ঝুলাইয়া সোনার টুলে বসিয়া ঝিমাইতেছেন। এমন সময়ে কড়াৎ কড়াৎ করিয়া দরজায় ঘা মারিবার শব্দ হইল। বাহির হইতে একজন লোক বলিতেছেন—

'অনুগ্রহ করুন মহাশয়, আমি ভিতরে আসিতে প্রার্থনা করিতে পারি?

--দবজাগুলি ত মন্দ নয়, কিন্তু স্বর্গেব দ্বাব বন্ধ থাকিবে কেন? দবজাগুলি আবো বড হওযা উচিত।

'তুই কেবে, পৃথিবীর লোক, ক্যাচ্ ক্যাচ্ কবিযা কথা কহিতেছিস?'

'অত মোটা সুরে বলিতেছেন কেন? - আমি স্বর্গে যাইতে চাই।'

'বটে? তুই কবিয়াছিস কি?'

'আমি খুঁত-ধরা কাজ কবিযাছি। আমাব তিন ভাই যে কাজ কবিযাছে তাহাব সমস্ত দোষ আমার নোট বহিতে লিখিযা আনিযাছি। যে ইঁট পোডাইযাছিল সে আব দুই মন কযলা কম খবচ কবিলে সুবকিওযালা সহজেই খোওযা কবিতে পারিত। যাব নামে স্ট্রীট হইযাছে সে এত বোগা যে অত বড় স্ট্রীটে তাহাব কিছু দবকাব নাই। যে নূতন ধবণেব বাড়ী বানিযেছিল সে বাডী চাপা পডিযা মবিযাছে—

'আবে থাম্ থাম্, ও-সব কি কাজ? তুই নিজেব হাতে কি কবিযাছিস?'

'এই-সব নোটে লিখিযাছি।'

'দুব হ ব্যাটা, তুই কি আব কোন কাজই কবিস্ নাই? কেবল দোষ ধবা কাজই কবিযাছিস্?'

'আব স্মৃতি পুস্তিকায তাহা লিখিযাছি।'

'যা, যা। তোব এখানে আসিবাব হুকুম নাই।'

'আউ পচাবিব কাক্কু, জগনাথঙ্কু —' বলিযা দারোযান দেবতা গান ধবিলেন। আমাদেব সমালোচক দেখিলেন যে এত পথ খবচ, রেলভাডা গাড়িভাডা কবিযা আসিযাও কোন ফল পাইলেন না। বিবক্ত হইযা মনে কবিলেন যে, কাগজে লেখা উচিত স্বর্গে ভাল অভ্যর্থনাব বন্দোবস্ত নাই। গাডি পাইতে অনেক দেবি সুতবাং ইত্যবসবে দবজাব দোষগুলি টুকিযা বাখিতে লাগিলেন। দবজাব কথা শেষ হইলে সাহেব দ্বাবী ঠাকুবেব গানের এক মজাব বর্ণনা লিখিতেছিলেন, এমন সময দেখিলেন যে যে বুডিকে তাহাব ভাই ঘব কবিযা দিযাছিল, সে আসিতেছে। তিনি আশ্চর্য হইযা জিজ্ঞাসা কবিলেন 'ও বুডি তুই কেমন করিয়া আসিলি?'

'তাই ত বাপু, আমি ত কিছু জানি না। আমি গবীব দুঃখিনী বুডি, এমন ত কিছুই কবি নাই যাহাতে এখানে আসিতে পাবি।'

'তুই কি কোন কাজই করিস্ নাই? আমি ত সমালোচনা কবিযাছি।'

'আমার আর ত কিছুই মনে হয় না। তবে একদিন আমাব বাডিব কাছে পুকুরে জমা বরফের উপরে পাড়ার সকলে খেলা করিতে গিয়াছিল। যাইবাব সময আমাকে সকলেই দেখিয়া মিষ্টি কথা কহিয়া গেল। আমি ভয়ানক কাতর ছিলাম। কিছুকাল পরে দেখি, আকাশে একরকম মেঘ দেখা দিয়াছে। এরূপ মেঘ আমাব জন্মে আমি আব একবাব দেখিয়াছিলাম। তখন দুই মিনিটের মধ্যে সমুদয় বরফ ফাটিয়া গিয়াছিল। আমাব মনে বড ভয় হইল। এখনই এতগুলি লোক ডুবিয়া মরিবে ভাবিয়া আমার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। আমি কি করি। রোগে মরি, উঠিবার শক্তি নাই, ডাকিলেও কেউ আমার কথা শুনিবে না। তখন আমি আস্তে আস্তে অনেক কষ্টে বাহিরে আসিয়া আপনার ঘবে আগুন লাগাইয়া দিলাম। সকল লোক বুড়ি পুড়িয়া মরিল মনে করিয়া দৌড়িয়া আসিল। আমি তারপব কি হইল হইল বিশেষ জানি না। কেবলমাত্র একবাব জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাব কিছু হয় নি ত?'

একজন লোক বলিল, 'না, আমরাও আসিয়াছি আর ববফও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' তারপর [illegible] কিছু জানি না। কে যেন আমাকে এখানে আনিয়াছে।'

বুড়ির কথা শুনিয়া দারোয়ান-দেবতা স্বর্গে খবর দিলেন। আর দলে দলে দেবতারা আসিয়া 'এসো এসো, বুড়ি, এসো' বলিয়া আদব করিয়া বুড়িকে স্বর্গের ভিতর লইয়া চলিলেন। কিন্তু বুড়ি সমালোচকের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল; বলিল —'ওর ভাই আমাকে বাড়ি করিয়া দিয়াছিল, আমার থাকিবার জায়গা ছিল না। ও মুখ কালো করিয়া [illegible] যাইবে [illegible] আমি কোন প্রাণে তোমাদের সঙ্গে যাইব? আমার মনে বড় লাগে। [illegible] এ বেচারা তাহা হইলে বড় কষ্ট পাইবে।'

[illegible] দেবতারা সমালোচককে বলিলেন —'অলস অপদার্থ! যা! বুড়ির জন্য তোকে [illegible] হইল। তুই জীবনটা কেবল সমালোচনা করিয়াই কাটাইলি, ভাল কাজ কিছুই করিলি না। তোর মতন লোক আর এর পূর্বে স্বর্গে যায় নাই।'

দেবতারা তারপর বুড়ির সঙ্গে সমালোচককেও টানিয়া স্বর্গে নিয়া চলিলেন। সমালোচক হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। একবার মাত্র বলিল, 'টানিয়া লওয়া বুঝি তোমাদের অভ্যাস নাই। ভাল করিয়া টানা হইতেছে না। এমনি করিয়া বুঝি টানে।'

[illegible] থাক্ তার ধান ভানা কাজ ঘোচে না; আমাদের সমালোচক ভায়া স্বর্গে গিয়াও খুঁত ধরিতে ব্যস্ত, আর কিইবা করবে, একটা কাজ ত চাই? কতকগুলি ছেলে আছে, তারা কেবলই খুঁত ধরে, পরের দোষ দেখিয়া তাহার নিন্দা করার চেয়ে নিজের দোষ শোধরাইয়া পরের গুণ দেখা ভাল।

নূতন গল্প

এক রাজা, তার তিন ছেলে। বড় ছেলে গাঁজা খায়, মেজ ছেলে লাঠি হাতে ঘুরিয়া বেড়ায়, ছোট ছেলে বাপের কাছে বসিয়া রাজ্যের কাজকর্ম দেখে। বড় দুটো ছোটটিকে দেখিতে পারে না।

'সোনার গাছ, রূপোর পাতা, শ্বেত কাকের বাসা তাতে।' রাজার বড় ইচ্ছা এই গাছ ছেলেরা আনিয়া দেয়। তিন ছেলে কত জায়গায় ঘুরিল। বড় দুটির কি হইল জানা গেল না; ছোটটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক রাজার বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত। সেখানে জন-প্রাণী কিছুই নাই; সব খালি। এক ঘরে একটি মেয়ে ঘুমাইয়া আছে, তার মাথার কাছে রুপোর কাঠি, পায়ের কাছে সোনার কাঠি। সে পায়ের কাঠিটি মাথায় আনিল আর মাথার কাঠিটি পায়ের দিকে লইল; অমনি মেয়েটি জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, 'হায়! মানুষের ছেলে তুই এখানে কেন এলি? তোকে এখনি খেয়ে ফেল্‌বে। এ বাড়িতে রাক্ষস থাকে। আমার বাবাকে খেয়েছে, মাকে খেয়েছে, বাড়ির সকলকে খেয়েছে, সেদিন দুটি রাজার ছেলে 'সোনার গাছ রূপোর পাতা, শ্বেত কাকের বাসা তাতে' এই গাছ নিতে এসেছিল, তাদেরও খেয়েছে। আমাকে যে কেন খায় নি জানি নে।' সে বুঝতে পারিল যে মেয়ে তাহার দুই দাদার কথাই কহিতেছে। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া কত কথাই জানিয়া লইল; রাক্ষসগুলি সহজে মরিবে না, তবে যদি কেহ ঐ পুকুরের তলায় যে স্ফটিকের স্তম্ভ আছে, সেটাকে

এক নিশ্বাসে ডুব দিয়া তুলিতে পারে তারপর তাহাকে ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরে যে ভ্রমরটি আছে, তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে তবে ঐ গুলি মরিবে। রাক্ষসেরা যত লোককে খাইয়াছে, তাহাদের হাড়গুলি সবই রাখিয়া দিয়াছে। যদি কেহ রাক্ষসগুলিকে মারিয়া তারপর ঐ হাড়গুলিতে এই সোনার কাঠি এবং রূপার কাঠি ধোওয়া জল ছড়াইয়া দিতে পারে, তবে ঐ-সকল লোক বাঁচিয়া উঠিবে। রাজার ছেলে এই কথা শুনিয়া একদিন রাক্ষসদের অনুপস্থিতিতে এই-সকল কার্য সাধন করিল। রাক্ষসও মারিল, ভাইদেরও বাঁচাইল।

আরো এক গল্প শুনিয়াছি। রাজার মেয়ে মরিয়া গেল, মুনি-ঠাকুর আসিয়া রাজার নিকট বলিলেন, 'রাজা, তোমার মেয়েকে আমি বাঁচাইয়া দিতেছি। আমাকে একটা বড় কড়া দাও, একটা টেবিল দাও, একটা ছুরি দাও, আর জল ও আগুন দাও। রাজা সকলই দিলেন। মুনি-ঠাকুর সেই মড়াটাকে কড়াতে সিদ্ধ করিয়া তার মাংসগুলি ফেলিয়া দিলেন। পরে হাড়গুলি পরিষ্কার করিয়া টেবিল রাখিয়া তাহাতে মন্ত্রপূর্বক জল ছড়াইয়া দিলেন, আর অমনি যে মেয়ে ছিল সেই মেয়ে হইয়া উঠিল।

এ-সব ত গেল গল্প। সত্যি সত্যি মড়া বাঁচাইতে দেখিয়াছ? আমি দেখি নাই কিন্তু শুনিয়াছি। চোরাসান্নিপাত রোগে যাহারা মরে, তাহাদের অনেককে দেশীয় শাস্ত্রীয় কবিরাজেরা বাঁচাইয়াছেন; এরূপ গল্প অনেকের মুখে আমি শুনিয়াছি।

একখানি ইংরাজি কাগজে নিম্নলিখিত গল্পটি পড়িয়াছি—

'বিলাতের একজন ডাক্তার একটি ছোট কুকুরের গলার শিরা কাটিয়া দিলেন; কুকুরটি দেখিতে দেখিতে রক্ত পড়িয়া মরিয়া গেল। মরিয়া গেলে পর তিন ঘণ্টা কাল একটি ঘরে কুকুরটিকে রাখিয়া দেওয়া হইল। কুকুরটি শক্ত হইয়া গেল। তারপর তাহাকে গরম জলে ফেলিয়া ক্রমাগত মাজিয়া দেওয়া হইল। হাত-পাগুলি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দিলে পর শরীরটা যেন বেশ নরম হইল। তারপর সাহেব একটা রাবারের নল দিয়া তাহার পেটে তিন ছটাক রক্ত পুরিয়া দিলেন। একটা কল দিয়া কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস করান হইতে লাগিল; এবং একটা বড় কুকুরের রক্ত ঐ ছোট কুকুরটির গায়ে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। এই-সকল কার্য একবারে হইতে লাগিল। অর্থাৎ একজন সাহেব নিশ্বাস প্রশ্বাস করাইতে লাগিলেন, একজন রক্ত দিতে লাগিলেন আর-একজন ক্রমাগত তাহার শরীরটা মাজিতে লাগিলেন। ক্রমে কুকুরটির চক্ষু সতেজ হইল, আর কয়েক মুহূর্ত পরে শরীরটা একটু একটু কাঁপিতে লাগিল। তারপর কুকুরটি হাঁপাইতে লাগিল, চক্ষু উজ্জ্বল হইল; শেষে ফিট হইলে যেমন হয়, সেইরূপ করিতে লাগিল। তারপর ক্রমেই শান্ত হইয়া আসিতে লাগিল, একটু একটু কোঁকাইতেও লাগিল। প্রথম রক্ত দেওয়ার কুড়ি মিনিটের মধ্যে কুকুরটি উঠিয়া বসিল। শীঘ্রই দাঁড়াইয়া, তারপর হাঁটিতে লাগিল। দুই দিনের মধ্যে সে রাস্তায় দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

'সাহেবদের গরু বাছুর মারিতে আপত্তি নাই, সুতরাং ডাক্তারমহাশয় একটি বাছুরকেও ঐরূপ করিয়া দেখিলেন। সেও বাঁচিল। আর একটি ছোট কুকুরকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া আবার ঐ প্রণালীতে বাঁচাইয়া দিলেন।'

'আমরা ছোট-খাট রকমে একপ্রকার মরা জানোয়ার বাঁচাইয়াছি। সে হয়ত পাঠকগণের মধ্যে সকলেই এক-একবার করিয়া থাকিবেন। মাছিগুলিকে দু-একটা চড় চাপড় মারিলেই

তাহারা মরিয়া যাইতে রাজি হয়। একটি মাছিকে ঐরূপ করিয়া তাহাকে সহজেই পুনরায় বাঁচান যাইতে পারে। মাছিটিকে এক হাতে রাখিয়া আর-এক হাত দিয়া তাহার উপর একটি ঘর নির্মাণ করিয়া দেও। ঘরের একটি ছোট দরজা রাখিয়া তাহার মধ্যে দিয়া খুব ফুঁ দিতে থাক। দেখিবে, শীঘ্রই মাছিটি বাঁচিয়া উঠিবে।

আমাদের দেশের কথা শুনিয়াছি, সর্পাঘাতে মরা লোকগুলিকে তিন দিন চারি দিন পরে ওঝা আসিয়া মন্ত্র পড়িয়া বাঁচাইয়া দিতে পারে। সত্য মিথ্যা শপথ করিতে পারি না।

ভূতের গল্প

আমি ভূতের গল্প বড় ভালবাসি। তোমরা পাঁচ জনে মিলিয়া ভূতের গল্প কর, সেখানে পাঁচ ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে পারি। ইহাতে যে কি মজা; একটা শুনিলে আর-একটা শুনিতে ইচ্ছা করে, দুটা শুনিলে একটা কথা কহিতে ইচ্ছা করে। গল্প শেষ হইয়া গেলে একাকী ঘরের বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হয় না। তোমাদের মধ্যে আমার মতন কেহ আছ কি না জানি না, বোধহয় আছে। তাই আজ তোমাদের কাছে একটা গল্প বলিব। গল্পটা একখানি ইংরাজি কাগজে পড়িয়াছি। তোমাদের সুবিধার জন্য ইংরাজি নামগুলি বদল করিয়া দিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গল্পটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবে যে শুধু নাম বদলাইলে কাজ চলিবে না। সুতরাং ঠিক যেরূপ পড়িয়াছি প্রায় সেইরূপ অনুবাদ করিয়া দেওয়াই ভাল বোধ হইতেছে।

'স্কট্‌লণ্ডের ম্যাপ্‌টার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে বাঁ ধারে ছোট-ছোট দ্বীপ দেখিতে পাইবে। তাহার উপরেরটির নাম নর্থ উইস্ট্‌, নীচেরটির নাম সাউথ্‌ উইস্ট্‌। এর মাঝামাঝি ছোট-ছোট আর কতকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এ সেকালের কথা, তখন স্টীম্‌ এঞ্জিনও ছিল না টেলিগ্রাফও ছিল না; আমার ঠাকুরদাদা তখন এর একটি দ্বীপে স্কুলে মাস্টারি করিতেন।

'সেখানে লোক বড় বেশি ছিল না। তাদের কাজের মধ্যে কেবল মাত্র মেষ চরান, আর কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে দিন চলার মত কিছু শস্য উৎপাদন করা। সেখানকার মাটি বড় খারাপ; তারি একটু একটু সকলে ভাগ করিয়া নেয় আর জমিদারকে খাজনা দেয়।... এরা বেশ সাহসী লোক ছিল। আর ঐরকম কষ্টে থাকিয়া এবং সামান্য খাইয়াও বেশ একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইত।

'এই দ্বীপে এল্যান, ক্যামেরণ্‌ নামে একজন লোক ছিলেন, তাঁহার বাড়ি গাঁ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। এল্যানের সঙ্গে মাস্টারমহাশয়ের বড় ভাব, তাঁর কাছে তিনি কতরকমের মজার গল্প বলিতেন। হঠাৎ একদিন ক্যামেরণ্‌ বড় পীড়িত হইলেন, আর কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার কেউ আপনার লোক ছিল না, সুতরাং তাঁহার বিষয় সমস্ত বিক্রি হইয়া গেল। তাঁর বাড়িটা কেহই কিনিতে চাহিল না বলিয়া তাহা অমনি খালি পড়িয়া রহিল।

'এর কয়েক মাস পরে একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ডনাল্ড্‌ ম্যাকলীন বলিয়া একটি রাখাল ঐ বাড়ির পাশ দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জানালার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল, আর সে ঘরের ভিতরে এল্যান্‌ ক্যামেরণের ছায়া দেখিতে পাইল। দেখিয়া ত তার চক্ষু স্থির! সেখানেই সে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার চুলগুলি খ্যাংরা কাঠির মত সোজা হইয়া উঠিল, ভয়ে

প্রাণ উড়িয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল।

শীঘ্রই তাহার চৈতন্য হইল। ঐরকম ভয়ানক পদার্থের সঙ্গে কাহারই বা জানা শুনা করিবার ইচ্ছা থাকে? সে এক দৌড়ে একেবারে মাস্টারমহাশয়ের বাড়িতে। তাঁহার কাছে সব কথা সে বলিল মাস্টারমহাশয় এ সব মানেন না, তিনি তাহাকে প্রথম ঠাট্টা করিলেন, তারপরে বলিলেন তাহার মাথায় কিঞ্চিৎ গোল ঘটিয়াছে; আরো অনেক কথা বলিলেন— বলিয়া যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন যে ঐরূপ কিছুতে বিশ্বাস থাকা নিতান্ত বোকার কার্য।

ডনাল্ড্ কিন্তু ইহাতে বুঝিল না, সে অপেক্ষাকৃত সহজ বুদ্ধি বিশি[illegible]। অন্যান্য লো[illegible] ছে তাহার গল্প বলিল শীঘ্রই ঐ দ্বীপের সকলেই এই গল্প জানিতে [illegible] সব বিষয় মীমাংসা করিতে বৃদ্ধেরাই মজবুত, তাঁহারা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ইহাতে কত কুলক্ষণই দেখিতে পাইলেন।

‘ঐ দ্বীপের মধ্যে কেবলমাত্র মাস্টারমহাশয়ের কাছেই খবরের কাগজ আসিত। মাসের মধ্যে একবার করিয়া কাগজ আসিত আর সেদিন সকলে মাস্টারমহাশয়ের বাড়িতে গিয়া নূতন খবর শুনিয়া আসিত। সেদিন তাহাদের পক্ষে একটা খুব আনন্দের দিন। রান্নাঘরে বড় আগুন করিয়া দশ-বার জন তাহার চারিদিকে সন্ধ্যার সময় বসিত কাগজের বিজ্ঞাপন হইতে আরম্ভ করিয়া অমুক কর্তৃক অমুক যন্ত্রে মুদ্রিত হইল ইত্যাদি পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের তদারক ও তর্কবিতর্ক করিত। শেষের কথাগুলি সকলেরই একপ্রকার মুখস্থ হইয়াছিল এবং পড়া শেষ হইলে ঐ কথাটা প্রায়ই সকলে একসঙ্গে একবার বলিত।

‘এই-সকল সভায় রাখাল কৃষক, গির্জার ছোট পাদরি প্রভৃতি অনেকেই আসিতেন। গ্রামের মুচি রবীও আসিত। রবী ভয়ানক নাছোড় বান্দা লোক, একটা কথা উঠিলে তাহাকে একবার অচ্ছা করিয়া না ঘাঁটিয়া সহজে ছাড়িবে না।

ডনাল্ড্ ম্যাকলীনের ঐ ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন সকলে এইরূপ সভা করিয়া বসিয়াছে, মাস্টারমহাশয় চেঁচাইয়া তর্জমা করিতেছেন, এমন সময় একজন আসিয়া বলিল যে, এল্যান্ ক্যামেরণের ছায়া আবার দেখা গিয়াছে। এবারে একজন স্ত্রীলোকে দেখিয়াছে ঐ রাখাল যে স্থানে যেভাবে উহাকে দেখিয়াছিল এও ঠিক সেইরকম দেখিয়াছে।

‘এরপর আর পড়া চলে কি করিয়া। মাস্টারমহাশয় চটিয়া গেলেন এবং ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। রবী তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিল। রবী কোন কথাই ঠিক মানে না, এবারেও মাস্টারমহাশয়ের কথাগুলি মানিতে পারিল না। প্রচণ্ড তর্ক উপস্থিত। ভূতের কথা লইয়া সাধারণভাবে এবং ক্যামেরণের ভূতের বিষয় বিশেষভাবে বিচার চলিতে লাগিল; আর সকলে বেশ মজা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু রবীর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল, সে বলিল—

‘দেখ মাস্টারের পো, যতই কেন বল না, আমি এক জোড়া নতুন বুট হারব, তোমার সাধ্যি নেই আজ দুপুর-রেতে ওখান থেকে গিয়ে দেখে এস।’

‘সকলে করতালি দিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয় হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু রবী ছাড়িবে কেন? সে সকলের উপর বিচারের ভার দিল। তাহারা এই মত দিল যে, মাস্টারমহাশয় যখন গল্পগুলি মানিতেছেন না, সে স্থলে তাঁহার উচিত যে নিদেনপক্ষে তিনি যে এ মানেন না তা প্রমাণ করিয়া দেন।

'মাস্টাবমহাশয দেখিলেন, অস্বীকাব কবিলে যশেব হানি হয়। তিনি বলিলেন, 'যাব বইকি? কিন্তু আমি গিযে ফিবে এলেও এব চাইতে 'আব তোমাদেব জ্ঞান বাড়বে না।'

'ববী 'আচ্ছা দেখা যাউক।'

'মাস্টাবমহাশয- -'ভাল, ওখানে গিযে আমি কি কবব?'

'ববী--'ওখানে গিযে দবজাব কাছে দাঁডিযে তিনবাব বলবে--এলান ক্যামেবণ আছ গো।' কোন জবাব না পাও ফিবে এস আমি আব ভূত মানবো না।

'মাস্টাবমহাশয হাসিযা বলিলেন, 'এটা ঠিক জেনো যে, এলান সেখানে থাকলে আমাব কথাব উত্তব দিবেই। আমাদেব বড ভাব ছিল।

'একজন বলিল, 'তাকে যদি দেখতে পাও তা হলে মুচিব কাছে যে ও টাকা পেত সে' কথাটা ভুল না।' এ কথায সকলে হাসিযা ফেলিল, ববী একটু অপ্রস্তুত হইল।

'এইরূপে হাসি তামাশা চলিতে লাগিল, ক্রমে মাস্টাবমহাশযেব যাওযাব সময হইযা আসিল।

শেষে মুচি ঘডিব দিকে চাহিযা বলিল [illegible] বাবো বাজতে কুডি মিনিট বাকি

তুমি এখন [illegible] তা হলেই ঠিক [illegible] সমযে পৌঁছিতে পাববে।'

'বেশ [illegible] মাস্টাবমহাশয যষ্ঠি হস্তে সেই বাডিব দিকে চলিলেন [illegible] সকলে [illegible] কেটা [illegible] দিযা দিল, এবং স্থিব কবিল, [illegible] কি হয [illegible]।

'বাহিবে [illegible] একটু এক্ষা। কাল কাল মেঘ আসিযা চাঁদকে ঢাকিযা [illegible] মাস্টাব [illegible] গেলে সকলে আলস্ত কবিল যে, সমস্ত বাস্তাটা সাহস কবিযা যাওযা তাব পক্ষে সম্ভব কিনা। ছোট পাদবি বলিল যে তিনি হযত অর্ধেক পথ গিযাই ফিবিযা আসিবে। যাহা ইচ্ছা বলিবেন তখন আব কাহাবো কিছু বলিবাব থাকিবে না [illegible] শুনিযা মুচিব মনে ভয হইল [illegible] ফাঁকি দিযা দেয, এটা তাহাব [illegible] লাগিল না [illegible] প্রস্তাব কবিল [illegible] ববী যাইযা দেখিযা আসুক।

'প্রথমে ববী [illegible] আপত্তি কবিল কিন্তু [illegible] পবে বাজি হইল। সকলে তাহাকে সাবধান কবিযা দিল যেন মাস্টাব তাহাকে দেখিতে না পায, তাবপব সে বাহিব হইল। খুব চলিতে পাবিত এই জন্যে শীঘ্রই সে মাস্টাবকে দেখিতে পাইল। ববী একটু দূবে দূবে থাকিতে লাগিল- বাস্তাটা একটা জলা জাযগাব মধ্য দিযা একটি গাছপালা নাই যে মাস্টাব ফিবিযা চাহিলে তাহাব আডালে থাকিযা বাঁচিবে।

'পবে মাস্টাবমহাশয যখন ঐ বাডিতে পৌঁছিলেন তখন ববী একটু বুদ্ধি খাটাইযা খানিকটা ঘুবিযা বাডিব সমুখে আসিল। সেখানে একটা নিচু বেডা ছিল, তাহাব আডালে শুইযা পডিল।

'সে অবস্থায় দূতের কার্য কবিতে যাইয়া তাহার অন্তরটা গুর গুব করিতে লাগিল। মাস্টাবমহাশয ছিলেন বলিযা, নহিলে সে এতক্ষণ চেঁচাইয়া ফেলিত। কষ্টেসৃষ্টে কোন মতে প্রাণটা হাতে কবিযা দেখিতেছে কি হয। মনে করিয়াছে মাস্টাবমহাশয যেরূপ ব্যবহাব করেন তাহা দেখা হইযা গেলেই সে বাহিব হইবে।

'গ্রামেব গির্জাব ঘডিতে বাবটা বাজিল। সে বেডাব ছিদ্র দিযা চাহিযা দেখিল যে

মাস্টারমহাশয় নির্ভয়ে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

'মাস্টারমহাশয় গলা পরিষ্কার করিলেন এবং একটু শুষ্ক স্বরে বলিলেন—

'এল্যান্ ক্যামেরণ আছে গো!' —কোন উত্তর নাই।

'দু-এক পা পশ্চাৎ সরিয়া একটু আস্তে আবার বলিলেন, 'এল্যান্ ক্যামের্ণ আছ গো!'—কোন উত্তর নাই।

'তারপর বাড়িতে আসিবার রাস্তাটির মাথা পর্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া থতমত স্বরে অর্ধ চিৎকার অর্ধ আহ্বানের মত করিয়া তৃতীয়বার বলিলেন, 'এল-ক্যামেরণ—আছ—।' তারপর আর উত্তরের অপেক্ষা নাই। —সটান চম্পট।

'কি সর্বনাশ! কোথায় মাস্টারের সঙ্গে বাড়ি যাইবে, মাস্টার যে এ কি করিয়া ফেলিলেন। মুচি বেচারীর আর আতঙ্কের সীম' নাই। তবে বুঝি ভূত এল। আর থাকিতে পারিল না। এই সময়ে তার মনে যে ভয় হইয়াছিল, তারই উপযুক্ত ভয়ানক গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে সে মাস্টারমহাশয়ের পেছনে ছুটিতে লাগিল।

'সেই ভয়ানক চিৎকার শব্দ মাস্টারমহাশয়ের কানে গেল। মুচি দৌড়িতেছে আর ডাকিতেছে 'দাঁড়াও গো মাস্টারমশাই! দাঁড়াও!' মাস্টারমহাশয় শুনিতে পাইলেন। পশ্চাতে একপ্রকার শব্দও শুনিতে পাইলেন। আর কি? ঐ এল্যান্ ক্যামেরণ! ভয়ে আরো দশ গুণ দৌড়িতে লাগিলেন। রবী বেচারা দেখিল বড় বিপদ! ফেলিয়াই বুঝি গেল। কি করে তারও প্রাণপণ চেষ্টা। মাস্টারমহাশয় দেখিলেন পাছেরটা আসিয়া ধরিয়াই ফেলিল। তাঁহার গায়ের বল চলিয়া যাইতে লাগিল।

'অবশেষে মাস্টারমহাশয় যখন দেখিলেন যে আর রক্ষা নাই, তখন তিনি সাহসে ভর করিলেন, এবং খুব শক্ত ক'রে লাঠি ধরিয়া সেই কল্পিত ভূতের দিকে ফিরিলেন এবং আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া যত জোর ছিল একবার সেই কল্পিত ভূতের মস্তকে সপাট—সাংঘাতিক এক ঘা। তারপর সেটাও যেন কোথায় অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

'ভূতটা যাওয়াতে এখন একটু সাহস আসিল, কিন্তু তথাপি যতক্ষণ গ্রামের আলোক না দেখা গেল ততক্ষণ থামিলেন না। গ্রামের প্রবেশ করিবার পূর্বে সাবধানে ঘাম মুছিয়া ঠাণ্ডা হইয়া লইলেন। মনটা যখন নির্ভয় হইল তখন ঘরে গেলেন—যেন বিশেষ একটা কিছু হয় নাই। অনেক কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি সকলগুলিরই উত্তরে বলিলেন—

'ঐ আমি যা বলেছিলাম; ভূতটুত কিছুই ত দেখতে পেলাম না!'

'এরপর মুচির জন্য সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাস্টারকে তাহারা বলিল যে, সে স্থানান্তরে গিয়াছে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।

'আধঘণ্টা হইয়া গেল তবু মুচি আসে না। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। চিন্তা বাড়িতে লাগিল, ক্রমে একটা বাজিল! তারপর আর থাকিতে পারিল না, মুচির অনুপস্থিতির কারণ তাহারা মাস্টারমহাশয়কে বলিয়া ফেলিল, মাস্টারমহাশয় শুনিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিলেন। লাফাইয়া উঠিয়া লণ্ঠন হাতে করিয়া দৌড়িয়া বাহির হইলেন এবং সকলকে পশ্চাৎ আসিতে বলিয়া দৌড়িয়া চলিলেন।

'সকলেরই বিশ্বাস হইল মাস্টারমহাশয়ের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। হৈ চৈ কাণ্ড। সকলেই জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারটা কি? তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া তাহারা মাস্টারকে

দাঁড়াইতে বলিতে লাগিল। তাঁহাদের শব্দ শুনিয়া কুকুরগুলি খেউ খেউ করিয়া উঠিল। কুকুরের গোলমালে গাঁয়ের লোক জাগিল! সকলেই জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারখানা কি?

'এই সময়ে মাস্টারমহাশয় জলার মধ্য দিয়া দৌড়িতেছেন। মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে—কেবল পুলিস—মাজিস্ট্রেট—জুরী—ইত্যাদি ভয়ানক বিষয় মনে হইতেছে। তাঁহার লণ্ঠনের আলো দেখিয়া অন্যেরা তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছে।

সকলে তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহাকে ধরিল এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মাস্টারমহাশয়ের উত্তর দিবার পূর্বেই সেই মাঠের মধ্যে হইতে গালি এবং কোঁকানি মিশ্রিত একপ্রকার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। কতদূর গিয়া দেখা গেল একটা লোক জলার ধারে বসিয়া আছে। লণ্ঠনের সাহায্যে নির্ধারিত হইল যে এ আর কেহ নহে, আমাদের সেই মুচি। সেইখানে বেচারা দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া আছে আর তাহাদের মাস্টারের উদ্দেশ্যে গালাগালি দিতেছে। তাহার নিকট হইতে সকলে সমস্ত ঘটনা শুনিল।

'শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল যে ঐ বাড়ির জানালার ঠিক সম্মুখে একটা ছোট গাছ ছিল। তাহারই ছায়া চন্দ্রের আলোকে দেয়ালে পড়িত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই ছায়ার আকৃতি দেখিতে ঠিক ক্যামেরণের মুখের মত। সেদিন চন্দ্র ছিল না বলিয়াই মাস্টারমহাশয় সেই ছায়া দেখিতে পান নাই।'

সাগর কেন লোনা?

এক যে ছিল রাজা, তার নাম ফ্রদি। তার ছিল একটা যাঁতা, তাকে বলত গ্রত্তি। সে যাঁতা যেমন তেমন যাঁতা ছিল না, তাকে ঘুরিয়ে যে জিনিস ইচ্ছা তাই তার ভিতর থেকে বার করা যেত।

কিন্তু ঘোরাবে কে? সে যাঁতা ছিল পাহাড়ের মত বড়। রাজার চাকরেরা সেটা নাড়তেই পারল না। রাজার দেশে যত জোয়ান ছিল, সকলে হার মেনে গেল, সে যাঁতা কিছুতেই ঘুরবার নয়।

রাজার মনে দুঃখ। ভেবেছিলেন যাঁতা ঘুরিয়ে কত হীরা-মাণিক বার করে নেবেন। কিন্তু, হায়! যাঁতা আর ঘুরল না!

এমনি করে দিন যায়। তারপর একবার বিদেশে গিয়ে তিনি দুটি দানবের মেয়েকে দেখতে পেলেন। তারা দুটি বোন। একজনের নাম মেনিয়া আর একজনের নাম ফেনিয়া। তারা চলতে গেলে মাটি কাঁপে, বসতে গেলে গর্ত হয়ে যায়। তাদের দেখে রাজা ভাবলেন—'এইবার আমার যাঁতা ঠেলবার লোক জুটেছে।'

তখন রাজা খুশি হয়ে মেনিয়া-ফেনিয়াকে কিনে নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। এসেই তাদের দুজনকে যাঁতার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন 'ঠেল, ঠেল, ঠেল! সোনা বেরোক, রূপা বেরোক, ঠেল, ঠেল!'

মেনিয়া আর ফেনিয়া যাঁতা ঠেলতে লাগল আর গাইতে লাগল ঃ—

'আয় সোনা—হুঁই রে হাঁ!
আয় রূপা—হুঁই রে হাঁ!
ফুদিব ঘরে—হুঁই রে হাঁ!
সিন্দুক ভরে—হুঁই রে হাঁ!'

দেখতে দেখতে সোনা-রূপায় রাজার বাড়ি ভরে গেল, তবু রাজা খালি বলেন; ঠেল, ঠেল, ঠেল!'

দিনের পর দিন যাঁতা ঠেলতে ঠেলতে মেনিয়া-ফেনিয়া কাহিল হয়ে পড়ল, তাদের পিঠ ধরে গেল, হাত অবশ হয়ে এল, তবু রাজা খালি বলছেন—ঠেল, ঠেল, ঠেল! [illegible]নিয়া ফেনিয়া ঠেলতে লাগল। কি করে, কিনে যখন এনেছে, তখন কাজেই [illegible]। কিন্তু মনে মনে তাদের বড্ড রাগ হল।

একদিন রাজা খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে আছেন, মেনিয়া-ফেনিয়া যাঁতা ঠেলছে। ঠেলতে ঠেলতে তারা বলল—'দাঁড়াও, এই বেলা একটু মজা [illegible]'

বলে তারা গাইতে লাগল—

'আয় ডাকাত—হুঁই রে হাঁ!
হাজার হাজার—হুঁই রে হাঁ!
মার-মার—হুঁই রে হাঁ!
লাগাও আগুন—হুঁই রে হাঁ!'

অমনি হাজারে হাজারে ডাকাত এসে দেশ ছেয়ে [illegible] পার হয়ে দেশ বিদেশে ডাকাতি করে বেড়ায়, তাদের বলে বোম্বেটে,—তাদের সঙ্গে কেউ পারে না।

রাজা ঘুমুতেই লাগলেন। ডাকাতেরা তাঁদের সকলকে মেরে, যত টাকা কড়ি লুটে নিয়ে গেল; মেনিয়া-ফেনিয়াকে শুদ্ধ সেই যাঁতাটাও নিয়ে জাহাজে তুলল।

তারপর ডাকাতদের সর্দার বলল—'বাঃ বেশ হয়েছে—যাঁতাটার ভিতর থেকে যা চাই তাই বেরোবে! টাকা কড়ি ত আমাদের ঢের আছে—নাই খালি নুন। এবার আমাদের নুনের দুঃখ দূর হবে। ঠেল, ঠেল, ঠেল—নুন বেরোক, নুন, নুন।

মেনিয়া ফেনিয়া যাঁতা ঠেলতে লাগল, আর কেবল নুন বেরোতে লাগল। নুন, নুন আর নুন! শেষে জাহাজ একেবারে ডুবেই গেল। সব ডাকাত তার সঙ্গে ডুবে মরল।

সেই ভয়ঙ্কর যাঁতা ডুববার সময়ে কি যে কাণ্ড হয়েছিল, কি বলব! সাগরের জলে গর্ত হয়ে, হড় হড় শব্দে জল তার চারিদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল,—সে ঘুরুনি আজো থামে নি!

আর সেই লবণের কি হল? কি আর হবে? সেই নুন সমুদ্রের জলে ভেসে গেল। দুই দানবীতে মিলে কম নুন তো বার করে নি, সাগরের সব জল তাতে লোনা হয়ে গেছে।

আমার কথা বিশ্বাস না হয় মুখে দিয়ে দেখে আসতে পার।

ভীতু কামা

জুলু দেশের গল্প

এক যে ছিল ছোট ছেলে, তার নাম ছিল কামা। সে এতটুকু মানুষ ছিল, তার পেটটি ছিল বড়, হাত-পা ছিল কাঠি কাঠি। সে অন্য ছেলেদের সঙ্গে জোরে পারত না, খেলতে গেলে খালি তাদের হাতে মার খেত। বেচারা চুপ করে সে সব সয়ে থাকত, তার গায়ে জোর ছিল না, কাজেই কি নিয়ে ঝগড়া করবে? তার ইচ্ছা হত যে সে খুব ভারি ভারি কাজ করে, খালি গায় জোর ছিল না বলে সেসব কিছু করতে পারত না।

গ্রামের লোকেরা তাকে বলত ভীতু কামা। তারা চাইত যে গ্রামের ছেলে পিলে খুব ষণ্ডা আর সাহসী হয়। তাদের সর্দার যখন দেখল যে কামা তার কিছুই হচ্ছে না, তখন সে তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল!

কামা ভাবল—ওমা! কি হবে? আমি কোথায় যাব? গ্রাম থেকে ত আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এখন পরীর পাহাড়ে গিয়ে দেখি পরীরা আমাকে কি করে!

সে দেশে একটা গোলপানা পাহাড় ছিল, তাতে পরীরা থাকত। সেখানকার লোকেরা তাদের ভয়ে কেউ সেখানে যেত না। কামা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেই পরীর পাহাড়ে গিয়ে উপস্থিত হল,—তারা জুলু দেশের পরী কিনা, তাই কালো, তাদের ফড়িংএর মতন ডানা আর হাতে ঢাল আর বর্শা। কামাকে তাদের পাহাড়ে আসতে দেখে তারা এমনি চটেছে যে কি আর বলব। তাদের রাজা এসে তাকে বলল,—'তুই যে আমাদের পাহাড়ে এলি? দাঁড়া এখনি তোকে মেরে ফেলছি!'

কামা কাঁপতে কাঁপতে হাতজোড় করে বলল—'দোহাই মহাশয়, আমাকে মারবেন না! আমি ভীতু কামা, আপনাদের কোন ক্ষতি করবার ক্ষমতা আমার নাই, আমাকে মেরে কি হবে?'

পরীর রাজা বলল—'বটে? তুই ভীতু কামা? হা হাঁ তোর কথা শুনেছি বটে। তোর গায় জোর নাই, কিন্তু তোর মনটাতে সাহস আছে। আচ্ছা বাছা, তোর আর অমনি করে ভয়ে কাঁপতে হবে না, আমি তোকে পালোয়ান করে দিচ্ছি।'

বলে পরীর রাজা মাটিতে একটা সিংহের চামড়া বিছিয়ে কামাকে বলল— 'এর উপর শুয়ে একটু ঘুমো দেখি।' কামা সেই সিংহের চামড়ার উপরে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর যখন তার ঘুম ভেঙ্গেছে, তখন সে দেখে তার আর সেই কাঠি কাঠি হাত পা নাই, সে ভারি এক পালোয়ান হয়ে গেছে, আর তার মনে হচ্ছে যেন সে এক থাপ্পড়ে হাতি মেরে ফেলতে পারে!

তখন কামা চারিদিকে চেয়ে দেখল যে সেই পাহাড়ের উপর সে একলাটি দাঁড়িয়ে আছে। পরীদের একজনও সেখানে নাই, তার জন্য মস্ত বড় ঢাল আর বর্শা রেখে কোথায় চলে গেছে।

সেই ঢাল আর সেই বর্শা হাতে করে কামা পাহাড় থেকে নেমে ঘরের দিকে চলল। খানিক দূর এসে সে দেখল যে ভয়ঙ্কর একটা সিংহ হাঁ করে তাকে খেতে এসেছে। সে কি

আর এখন সিংহকে ডরায়? তার বর্শার এক খোঁচা খেয়েই সিংহ জিব বার করে, চোখ উলটিয়ে মবে গেল।

সেই সিংহটাকে কাঁধে ফেলে, ঢাল আর বর্শা হাতে যখন কামা গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছে তখন ত তাকে দেখে আর কারুর মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না।গ্রামের জোয়ানেরা এসে তার ঢাল আর বর্শা আর সিংহটাকে নিয়ে কত টানাটানি করল, কিন্তু কেউ তাকে একটু নাড়াতে পারল না।

গ্রামের সর্দার আগে কামাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এখন সে তাকে কি কবে আদর দেখাবে, তাই ভেবে ঠিক কবতে পারছে না। তখনি সে তাকে একখানি ঘব আব অনেকগুলি ষাঁড় দিয়ে দিল।

এখন আর কামার কোন দুঃখ নাই। সে সেই ঘরখানিতে তাব মাকে নিযে থাকে। আগে যারা তাকে বলত 'ভীতু কামা'—এখন তারা বলে 'কামা পালোযান।'

চিল মা

এক যে ছিল বড় ঘরেব ছোট বৌ, তাব ছিল টুকটুকে একটি খুকী। বৌটি বসে কুটনো কুটছে, খুকীটি হামা দিযে ছাতে চলে গেছে। সেইখানে ছিল এক চিল বসে, সে যে খুকীটিকে দেখতে পেয়েই ছোঁ মেরে নিযে গেছে, বৌ তাব কিচ্ছু জানে না।

খুকীটিকে নিয়ে চিল একেবাবে ঘন বনেব ভিতবে তার বাসায চলে গেল। সেইখানে খুকী থাকে, চিলেব সঙ্গে খেলা কবে, তাব পাখায় মুখ লুকিযে হাসে। চিল দেশ বিদেশে ঘুরে তার জন্য খাবার নিয়ে আসে, ঝড়বাদলে তাকে ডানা দিযে ঢেকে নিযে বসে থাকে।

দিন যাচ্ছে, খুকীও বড় হচ্ছে, আব দেখতে হযেছে যেন দেবতাব মেযে। চিল তাকে কোত্থেকে একটা চরকা এনে দিয়েছে, তাই নিযে সে দিনবাত খেলা কবে।

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, সেই দেশের যে বাজা, তিনি বনে এসেছেন শিকার করতে। সঙ্গে কত লোকজন এসেছে, তারা ঝোপে ঝোপে উঁকি মেরে হবিণ খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুঁজতে খুঁজতে তারা সেই চিলের বাসার কাছে এসে বলল—ভালরে ভাল, চিলের বাসায় চরকার শব্দ হচ্ছে কি করে হচ্ছে? বলে তারা যেই গাছে উঠে দেখতে যাবে, অমনি চিল কোত্থেকে উড়ে এসে নখ আর ঠোঁট দিয়ে তাদের নাক মুখ ছিঁড়ে দিতে লাগল। তখন তারা টিপঢাপ গাছ থেকে পড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাজার কাছে এসে বলল—রাজামশাই, এমন ত কখনো শুনিনি! চিলের বাসায় কে বসে চরকা কাটছে! আমরা দেখতে গিয়েছিলুম, তাতেই দেখুন আমাদের কি দশা হয়েছে!

এ-কথা শুনে রাজা নিজেই সেই গাছের তলায় এলেন। তাঁকে দেখেই চিল সেই গাছ থেকে উড়ে চলে গেল। তিনি গাছে উঠে দেখলেন পরীর মত সুন্দর একটি মেয়ে চিলের বাসায় বসে আছে!

রাজামহাশয়ের শিকার করা হল না। তিনি যারপর নাই আদর করে সেই মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। তারপর পুরুত ডেকে, বাজনা বাজিয়ে, হাসি গান আর আলোর মধ্যে

দিয়ে তাঁর সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। সবাই বলল—কি সুন্দর রাণী! কি সুন্দর রাণী!

রাজার আরো ছয়টি রাণী ছিল। নূতন রাণীকে দেখে তাদের ত ভারি হিংসে হয়েছে। তারা তার বাপের নাম জিজ্ঞাসা করে, বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করে, বেচারা তার কিছুই বলতে পারে না।তখন তারা রাজাকে বলল—কোথাকার কোন ছোট লোকের মেয়ে বিয়ে করে এনেছ, বাপের নাম বলতে পারে না!

রাজা বললেন—কি করে বলবে? জন্মে অবধি চিলের কাছে ছিল, বাপ-মায়ের মুখ দেখতে পায় নি। ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখ দেখি, কাকে ছোটলোকের মেয়ের মতন দেখায়!

তখন রাণীরা ত হিংসায় যেন মরেই যেতে লাগল। তারা দিনরাত ভাবে, কি করে ছোটরাণীকে জব্দ করবে!

এর মধ্যে একদিন রাজা রাণীদের বললেন, তোমরা নিজের নিজের ঘর বেশ করে সাজাও ত, দেখি কার কেমন পছন্দ।

একথা শুনে বড় রাণীরা ভাবল—বেশ হয়েছে! ও ছোটলোকের মেয়ে, ভাল করে ঘর সাজাতে পারবে না।, আর রাজার কাছে বোকা বনে যাবে!

তারা সবাই মিলে যুক্তি করে রাজার কাছ থেকে দামী দামী ঝাড় লণ্ঠন, পর্দা, ঝালর, গালিচা এনে নিজের নিজেব ঘর সাজাল।

ছোটরাণী বেচারা কি করবে? সে মনের দুঃখে বাগানে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল—

এক গাছে টান দিতে বেত গাছ নড়ে,
চিল মা, চিলমা, আয় মা উড়ে!

বলতে বলতেই সেই চিল উঠে এসে বলল—কি হয়েছে মা? কেন ডেকেছ?

ছোটরাণী বলল—রাজা বলেছেন ঘর সাজাতে, বড়রাণীরা তাদের ঘর কি চমৎকার করে সাজিয়েছে। আমি ত মা কিছু জানি না, কি করে আমাব ঘর সাজাব?

চিল বলল—এই কথা? আচ্ছা মা, তোমার কোন ভাবনা নেই। একটু বস, আমি এক্ষুণি আসছি। বলে চিল কোত্থেকে একটা গাছের ডাল নিয়ে এসে বলল—এই ডালের পাতাগুলি ঘরের দেওয়ালে, ছাতে, দরজায়, মেঝেতে আর সব জিনিসপত্রে নিয়ে ঘসে দাও, আর কিছু করতে হবে না।

এই কথা বলে চিল চলে গেল, আর ছোটরাণী তার ঘরে এসে সকল জায়গায় আর জিনিসপত্রে সেই ডালের পাতা ঘসে দিল। দিতেই দেখে যে সেই ঘরের যা কিছু, দরজা-জানলা, কড়ি, বরগা অবধি সব সোনার হয়ে গেছে। খাট সোনার, লেপ তোষক বালিস মশারি অবধি সব সোনার!

রাজা ত অন্য রাণীদের ঘর দেখে ভারি খুশি হয়ে এসেছেন, আর ভাবছেন—ছোটরাণী হয়ত কিছুই করতে পারেনি।

ছোটরাণীর ঘরে ঢুকে কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না—এমন সুন্দর ঘর কি আর কখনো দেখেছে? বড় রাণীদের তখনি ডেকে এনে রাজা বললেন—দেখ ত কে ছোটলোকের মেয়ে! ছোটলোকের মেয়ের কাজ বুঝি এমনি হয়?

রাণীরা আর কি বলবেন? বলার কিছু থাকলে ত!

তারপর আরেকদিন রাজা বললেন—তোমরা এক একজন এক একদিন আমাদের রেঁধে খাওয়াও ত, দেখি কে কেমন রাঁধতে পারে!

বড় রাণীরা ভাবল—এই বেলা দেখা যাবে। ও আর আর যাই করুক, আমাদের মত রাঁধতে আর ওকে হবে না।

সত্যি-সত্যিই রাণীরা খুব ভাল রাঁধতে পারত। তাঁদের এক-একজনের ঘরে রাজা সকলকে নিয়ে খেতে আসেন, খেয়ে সবাই বলে—আঃ, কি চমৎকার!

ছোটরাণী ভাবল—হায় হায়! এবারে কি হবে? সে কাঁদতে কাঁদতে বাগানে গিয়ে আবার ডাকতে লাগল—

এক গাছে টান দিতে বেত গাছ নড়ে,
চিল মা, চিল মা, আয় মা উড়ে।

বলতে বলতেই চিল এসে বলল—কি হয়েছে মা! কেন ডাকছ?

ছোটরাণী বলল—রাজা বলেছেন কাল তাঁদের সকলকে রেঁধে খাওয়াতে হবে। বড় রাণীরা সকলেই চমৎকার করে রেঁধে খাইয়েছে। আমি ত কিছু জানি না মা, কি করে রাঁধব?

চিল বলল—কোন চিন্তা নাই মা, একটু বস! বলেই সে কোত্থেকে গিয়ে একটা ছোট হাঁড়ি নিয়ে এসে বলল—এটাকে উনুনে বসিয়ে তুমি যে খাবার চাইবে, তাই এর ভিতর থেকে বার করতে পারবে। আর লাখ লাখ লোককে খাওয়ালেও তাতে কম পড়বে না। বলে চিল উড়ে গেল।

পরদিন ছোটরাণী সেই হাঁড়িটি উনুনে চড়িয়ে তার রান্নাঘরের দুয়ার বন্ধ করে বসে রইল। খাবার সময় হলে, চাকরদের দিয়ে জায়গা করিয়ে, রাজাকে ডেকে পাঠাল। রাজা পাত্রমিত্রদের নিয়ে এসে খেতে বসলেন। ছোটরাণী পোলাও, মাংস, লুচি, সন্দেশ, পায়েস —যখন যা খুশি, সেই হাঁড়ির ভিতর থেকে তাদের পাতে দিতে লাগল। তার যে সুন্দর গন্ধ, আর যে তা খেতে মিষ্টি— সে আর কি বলব? সেদিন তাঁদের যে খাওয়া হল, তেমন খাওয়া তাঁদের কেউ আর জন্মেও খান নি।

খেয়ে উঠেই রাজামশাই ছোটরাণীকে পাটরাণী করে দিলেন।

এরপর আর বড় রাণীরা কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারল না। তারা একদিন ছোট রাণীকে নিয়ে নদীতে স্নান করতে গিয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দিল। বাড়িতে এসে বলল— সে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মারা গেছে।

ছোটরাণী কিন্তু মরেনি। তার চিল মা এসে তাকে ভাসিয়ে একটা বনের ধারে নিয়ে গিয়ে, সেই বনের ভিতরে তাকে রেখে দিল। সেইখানে সে তাকে খাবার এনে দিত, একটুও কষ্ট হতে দেয়নি।

এমনি করে সেই বনের ভিতরে ছোটরাণী থাকে। তারপর একদিন রাজা সেই বনে শিকার করতে গেলেন। তখন ছোটরাণীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল, আর কোন কথাই তাঁর জানতে বাকি রহিল না। আহ্লাদে তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তখনি তিনি ছোটরাণীকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। আর মন্ত্রীকে হুকুম দিলেন যে দুষ্টু বড়রাণী ছটার মাথা মুড়িয়ে; ঘোল ঢেলে, গলায় ঢোল বেঁধে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও!

মহাভারতের কথা

গ্রন্থকারের নিবেদন

মহাভারতের অবান্তর গল্পগুলি লইয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। এ-সকল গল্পের প্রত্যেকটির আগাগোড়া অবিকল রাখিয়া বালক-বালিকাদিগের নিকট বলা একেবারেই অসম্ভব। আর, তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়াও বোধ হয় না, কারণ মহাভারতের ভিতরেই এক গল্পের নানারূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই পুস্তকের স্থানে স্থানে মূলের সহিত যে অনৈক্য আছে, তজ্জন্য সহৃদয় পাঠক আমাকে ক্ষমা করিবেন, এই আমার আশা। ইতি—

২২নং সুকিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা — শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

১৬ আশ্বিন, ১৩১৬

মহাভারতের কথা

রাত্রিকালে আকাশের উত্তর ভাগে সাতটি উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদিগকে 'সপ্তর্ষি' অর্থাৎ সাতমুনি বলে।

সাতটি মহামুনি সাতটি ভাই —ব্রহ্মার সাতটি পুত্র। সকল মুনির আগে এই সাত মুনি জন্মিয়াছিলেন। তখন জীবজন্তুর জন্ম হয় নাই। এই সাত মুনির নাম—

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু আর বশিষ্ঠ।

বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর, পরাশরের পুত্র মহামুনি ব্যাস। ব্যাসদেবের মৃত্যু নাই, বিশ্বসংসারে কোন বিষয়ই তাঁহার অজানা নাই। যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইতেছে, আর যাহা কিছু হইবে সকলই তিনি জানেন।

সাধারণ মানুষের চক্ষু আছে, তথাপি তাহারা অন্ধের ন্যায় কাজ করে। ধর্ম-অধর্মের কথা, পাপ-পুণ্যের কথা, তাহাদিগকে না বলিয়া দিলে, তাহাবা কেমন করিয়া বুঝিবে? ইহাদের কথা ভাবিয়া ব্যাসদেবের বড়ই দয়া হইল।

তাই তিনি সুন্দর ভাষায়, সুললিত ছন্দে অতি আশ্চর্য কবিতা বচনা করিয়া, জ্ঞান, ধর্ম, শাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতির সার কথা সকলের পক্ষে সহজ করিযা দিলেন। এই-সকল কবিতা রচনা করিয়া ব্যাসদেবের মনে এই চিন্তা হইল যে, এখন কি করিয়া তাঁহার শিষ্যদিগের পক্ষে ইহা শিক্ষা করার সুবিধা হয়।

ব্যাসের চিন্তার কথা জানিতে পারিয়া, ব্রহ্মা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, এবং লোকের উপকারের নিমিত্ত, তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মাকে দেখিবামাত্র, ব্যাস নিতান্ত আশ্চর্য এবং ব্যস্ত হইয়া, তাঁহার বসিবার জন্য আসন দিয়া, জোড় হাতে তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ব্রহ্মা আসনে বসিয়া ব্যাসকেও বসিতে অনুমতি করিলে, তিনি আনন্দের সহিত তাঁহার নিকটে বসিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন—

"ভগবান্, আমি একখানি সুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছি, ইহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতির সার আছে। ধর্ম, অধর্ম আর সংসারের সকল কাজেব উপদেশ আছে। পৃথিবী, চন্দ্র সূর্য, গ্রহ, তারা, নদ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, গ্রাম, নগর, বন উপবনেব বর্ণনা আছে। এমন কবিতা আমি রচনা করিয়াছি, কিন্তু ভগবন্, আমার এই-সকল কবিতা লিখিয়া দিবার উপযুক্ত একজন ভাল লেখক খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "বৎস, তুমি অতি মধুর কাব্য রচনা করিয়াছ। আর কোন কবিই এমন কাব্য লিখিতে পারিবে না। তুমি গণেশকে স্মরণ কর, তিনিই তোমার এই আশ্চর্য কাব্যের উপযুক্ত লেখক।"

এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন। তারপর গণেশকে স্মরণ করিবামাত্র, তিনি আসিয়া ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইলে, ব্যাস তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান এবং আদর দেখাইয়া, বিনয় পূর্বক বলিলেন—

"হে গণপতি, আমি আমার মন হইতে বলিয়া যাইতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমার কাব্যখানি অবিকল লিখিয়া দিন।"

এ কথায় গণেশ বলিলেন, "মুনিবর, আমি আপনার লেখক হইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু দেখিবেন, লিখিতে লিখিতে যেন আমাকে কলম হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে না হয়; আমি খুবই তাড়াতাড়ি লিখিতে পারি।"

তাহা শুনিয়া ব্যাস বলিলেন, "অতি উত্তম কথা। আমি যথাসাধ্য তাড়াতাড়িই বলিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু দেখিবেন, যেন তাড়াতাড়ি লিখিতে গিয়া আপনি যাহা-তাহা লিখিয়া না বসেন। আমি যাহা বলিব, তাহার অর্থ বুঝিয়া তবে লিখিবেন, না বুঝিয়া লিখিতে পারিবেন না।"

গণেশ বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।"

এইরূপ নিয়ম করিয়া ত লেখা আরম্ভ হইল। ব্যাস বড়ই বুদ্ধিমান্ লোক, তাই তিনি বলিয়াছেন, "অর্থ বুঝিয়া তবে লিখিতে হইবে।" সোজাসুজি লিখিয়া যাওয়ার কথা হইলে, আর তিনি গণেশের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেন না! গণেশের মত লেখক ত্রিভুবনে নাই; তাঁহার কলমের কাছে ঝড় হার মানিয়া যায়, কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবার শক্তি ব্যাসেরও ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু ব্যাস অতি চমৎকার উপায়ে গণেশকে জব্দ করিলেন। এক একটি শ্লোক তিনি এমনি কঠিন করিয়া দিতে লাগিলেন যে, তাহার অর্থ বুঝিতে গণেশ যে সর্বজ্ঞ, তাঁহাকেও ভ্রূকুটি করিয়া ভাবনায় পড়িতে হয়। গণেশ যতক্ষণ ভাবেন, ততক্ষণে ব্যাস বিস্তর শ্লোক রচনা করিয়া ফেলেন। কাজেই গণেশের আর কলম থামাইবার আবশ্যকই হইল না।

এই কাব্য প্রস্তুত করিয়া ব্যাসদেব সকলের আগে তাহা নিজের পুত্র শুকদেবকে শিখাইলেন। তারপর তাঁহার শিষ্যেরা তাহা শিক্ষা করেন। দেবলোকে নারদ, পিতৃলোকে অসিত দেবল, গন্ধর্ব যক্ষ ও রাক্ষসদিগের নিকট শুকদেব ও মনুষ্যলোকে বৈশম্পায়ন ইহার প্রচার করেন। দেবতারা এই পুস্তক আর চারিবেদ ওজন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, চারিখানি বেদ অপেক্ষা ব্যাসের এই কাব্যই অধিক ভারি। এইজন্য এই কাব্যের নাম 'মহাভারত' রাখা হইয়াছে।

সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা

মহাভারতে লেখা আছে যে, সৃষ্টির পূর্বে কেবলই অন্ধকার ছিল। তারপর প্রথমে একটি ডিম হইল। ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর বীজ এই ডিমের ভিতরে ছিল।

ডিমটি যখন ফুটিল, তখন তাহার ভিতর হইতে সকলের আগে ব্রহ্মা বাহির হইলেন, তারপর ক্রমে দেব, দানব, যক্ষ, পিশাচ, পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতির সৃষ্টি হইল।

ব্রহ্মার অনেক পুত্র, তাহার মধ্যে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ, এই সাতজনকে সপ্তর্ষি বলে। ব্রহ্মার বুক হইতে ধর্ম ও ভৃগু, এবং তাঁহার পায়ের বুড়া আঙ্গুল হইতে দক্ষের জন্ম হয়। দক্ষের পঞ্চাশটি কন্যা ছিল, মরীচির পুত্র কশ্যপ এই পঞ্চাশটির মধ্যে তেরটিকে বিবাহ করেন। সেই তেরটি কন্যার নাম—অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু। ইঁহারাই দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব, অপ্সরা, প্রভৃতির মাতা।

কিন্তু জীবজন্তু সকলেই যে ইঁহাদের সন্তান, তাহা নহে। রাক্ষস, বানর, যক্ষ, কিন্নর ইহারা পুলস্ত্য হইতে এবং সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পুলহ হইতে জন্মিয়াছিল। তাহা ছাড়া, অন্যান্য কয়েকজনের সন্তানও প্রাণীদিগের ভিতরে আছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

সৃষ্টির সময়টি ছিল এই সংসারের শিশুকাল। এখন তাহার অনেক বয়স হইয়াছে। তাহার পর যখন তাহার শেষকাল উপস্থিত হইবে, তখন প্রলয় আসিয়া সৃষ্টি নষ্ট করিয়া দিবে। তাহার পর ভগবান আবার নূতন সৃষ্টি করিবেন। যেমন দিনের পর রাত্রি, তারপর আবার দিন, তারপর আবার রাত্রি—সেইরূপ সৃষ্টির পর প্রলয়, তারপর আবার সৃষ্টি তারপর আবার প্রলয়। সংসারটা যেন একটা মস্ত জাল, ভগবান সেই জালকে ক্রমাগতই কেবল মেলিতেছেন। আর গুটাইতেছেন।

মানুষের জীবনে যেমন শিশুকাল, যৌবনকাল, প্রবীণ বয়স আর বৃদ্ধকাল থাকে, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসকলের মতে এই সংসারের জীবনেও সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ, আর কলিযুগ, এই চারিটি যুগ আছে। সত্যযুগে সকলই ছিল খুব ভাল ভাল আর বড় বড়। তখনকার এক একটা মানুষ নাকি হইত একুশ হাত লম্বা। তারপর ত্রেতাযুগে সংসারে একটু মন্দা দেখা দিল, মানুষও একটু দুষ্ট আর একটু খাটো হইল। কিন্তু তখনো সে চৌদ্দ হাত লম্বা হইত। দ্বাপরযুগের মানুষ সাত হাত মাত্র লম্বা ছিল, আর তখন ভাল মন্দের ভাগও সমান সমান ছিল, তারপর শেষে এখন কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে। এখনকার হতভাগা মানুষ সাড়ে তিন হাত বই লম্বা হয় না, আর একটা ভাল কাজ করিতে করিতে তিনটা মন্দ কাজ করিয়া বসে! এইরূপে এই সংসার যখন পুরাতন ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের ন্যায় অতিশয় নোংরা আর অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে, তখন ভগবান তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলিবেন— অর্থাৎ তখন প্রলয় হইবে। এইরূপে কতবার যে সৃষ্টি আর প্রলয় হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

যাঁহারা অমর, প্রলয়ের সময় তাঁহাদেরও মৃত্যু হয়, কিন্তু মার্কণ্ডেয় নামক মুনির মৃত্যু হয় না। পাণ্ডবদিগের বনবাসের সময় এই আশ্চর্য মুনির সহিত তাঁহাদের দেখা হইয়াছিল। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে তিনি প্রলয় দেখিয়াছেন এবং আবার যখন প্রলয় হইবে, তখনো তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন। মার্কণ্ডেয় মুনির বয়স যে কত হাজার হাজার বৎসর, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে কাহারো মনে হইবে না যে, তাঁহার এমন ভয়ানক বেশি বয়স হইয়াছে। দেখিলে মনে হয় যে, তাঁহারা পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইতে পারে!

প্রলয়ের সময় মার্কেণ্ডেয় মুনিকে বড়ই কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, আর তিনি অনেক আশ্চর্য ঘটনাও দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রলয়ের অনেক বৎসর পূর্ব হইতেই বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। গাছ-পালা সব মরিয়া গেল। ছোট ছোট জন্তুরা সকলেই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল।

তারপর এক কালে সাতটি সূর্য আকাশে উঠিয়া, ভীষণ তেজের দ্বারা নদ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র, সকলই শুকাইয়া ফেলিল; ঘাস, পাতা, কাঠ, যাহা কিছু পৃথিবীতে ছিল, পোড়াইয়া ছাই করিল।

তারপর সম্বর্তক নামক ভয়ঙ্কর আগুন জ্বলিয়া উঠিল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বহিয়া তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিল। সে আগুন পাতাল পর্যন্ত ধরিয়া বসিলে, আর দেব,

দানব, যক্ষ, রাক্ষস, জীবজন্তুর সহিত সকল সৃষ্টি সেই আগুনে পুড়িয়া নষ্ট হইল।

তারপর আসিল মেঘ। লাল মেঘ, নীল মেঘ, কালো মেঘ, হাতির মত মেঘ, পর্বতের মত মেঘ। তখন বিদ্যুতের ঝিকিমিকি আর বজ্রপাতের ঘোরতর শব্দে আকাশ পাতাল তোলপাড় করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সেই বৃষ্টি দেখিতে দেখিতে সেই ভীষণ আগুন নিভাইয়া, পাহাড় পর্বত তল করিয়া দিল। বার বৎসরের মধ্যে আর সেই সাংঘাতিক বৃষ্টির বিরাম হইল না। তারপর যখন ঝড়-বৃষ্টি থামিল, তখন দেখা গেল যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলে ডুবিয়া গিয়াছে, জল ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই।

এত কাণ্ডের ভিতরে মার্কণ্ডেয় মুনি কি করিয়া বাঁচিয়া রহিলেন, তাহা জানি না, কিন্তু তিনি মরেন নাই। যাহা হউক, ক্ষুধায় ভুগিয়া, আগুনে পুড়িয়া, আর জলে ভাসিয়া, তাঁহার নিতান্তই ক্লেশ আর অসুবিধা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই বিপদের সময় তিনি একটা অতি বিশাল বটগাছ দেখিতে পাইলেন। সেই বটগাছের নিকট গিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাহার ডালের উপর একখানি খাট, তাহাতে চমৎকার বিছানা, আর সেই বিছানার উপরে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল পরম সুন্দর একটি নীলবর্ণ বালক বসিয়া আছেন।

এত আশ্চর্য দৃশ্যের ভিতর দিয়া আসিবার পরেও এই ঘটনাটি মার্কণ্ডেয়ের নিকট বড়ই আশ্চর্য বোধ হইল, এত কাণ্ড হইয়া গেল, চরাচর লণ্ডভণ্ড হইল, তথাপি এই বালক কি করিয়া রক্ষা পাইল? মার্কণ্ডেয় ত্রিকালজ্ঞ (অর্থাৎ গত কাল, উপস্থিত কাল আর যে কাল আসছে, এই তিন সময়ের কথাই যে জানে) হইয়াও এই প্রশ্নের উত্তর ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

সেই বালক কিন্তু মার্কণ্ডেয়কে দেখিয়া কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না। তিনি তাঁহাকে দেখিবামাত্রই বলিলেন—

"মার্কণ্ডেয়, তোমার বড়ই পরিশ্রম হইয়াছে? আইস, আমার পেটের ভিতরে আসিয়া বিশ্রাম কর!"

এই বলিয়া বালক হাঁ করিলেন, আর মার্কণ্ডেয় তাঁহার পেটের ভিতর ঢুকিয়া গেলেন!

কিন্তু কি আশ্চর্য! বালকের পেটের মধ্যে গিয়া, মার্কণ্ডেয় কোথায় হজম হইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইবেন, না, তাহার বদলে তিনি দেখেন যে, তিনি পরম সুখে এই পৃথিবীতেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! সেই হিমালয়, সেই গঙ্গা, সেই-সকল গ্রাম, নগর আর তীর্থস্থান, সেই লোকজন, সেই হাট-বাজার, সেই সংসার যাত্রার সকল আয়োজন ও আনন্দ।

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মার্কণ্ডেয় সেই নিতান্ত অদ্ভুত বালকের পেটের ভিতরে বাস করিলেন, কিন্তু তাহার শেষ কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। এত ঘটনার পরে, তাঁহার মনে হইল, 'হয়ত বা এই বালক একটা কেহ হইবে।' তখন তিনি তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিবামাত্র দেখেন যে, তিনি হঠাৎ বালকের পেটের ভিতর হইতে বাহিরে চলিয়া আসিয়াছেন, আর বালকটি যেমন ছিলেন, তেমনিই সেই বটগাছের ডালে খাটের উপরে বসিয়া আছেন। মার্কণ্ডেয়কে বাহিরে আসিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মার্কণ্ডেয়, বিশ্রাম ভালরূপ হইল ত?"

তারপর মার্কণ্ডেয় জানিতে পারিলেন যে, এই বালক আর কেহ নহেন, স্বয়ং নারায়ণ।

নারায়ণ মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন, "ব্রহ্মা এখন ঘুমাইতেছেন। তাঁহার ঘুম ভাঙিলে আবার নূতন সৃষ্টি করা যাইবে, ততক্ষণ তুমি এইখানে বিশ্রাম কর।"

এই বলিয়া নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন (আকাশে মিলাইয়া গেলেন)। তারপর আবার নূতন সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা মহাভারতে এইরূপ লেখা আছে।

বৈবস্বত মনু ও আশ্চর্য মাছের কথা

সত্যযুগে এক মুনি ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল মনু। তাঁহার পিতার নাম ছিল বিবস্বান্, তাই লোকে তাঁহাকে বলিত, বৈবস্বত (বিবস্বানের পুত্র) মনু।

তখন পৃথিবীতে কত সুন্দর মানুষ ছিল, কিন্তু বৈবস্বত মনুর মত সুন্দর কেহই ছিল না। কত বড় বড় মুনি ছিলেন, কিন্তু বৈবস্বত মনুর চেয়ে বড় মুনি কেহই ছিলেন না।

চারিণী নদীতে বৈবস্বত মনু স্নান কবিলেন। তাঁহার মাথার জটা, পরনের কাপড় ভিজাই রহিল। তাহা লইয়াই মুনি তপস্যা করিতে বসিলেন। তাঁহার মতন তপস্যা কেহই করিতে পারিত না।

নদীতে একটি ছোট্ট মাছের ছানা ছিল। সে বেচারা কতই ছোট, তাহাকে ভাল কবিযা দেখিতেই পাওয়া যায় না।

মহামুনি তপস্যায় বসিয়াছেন, ছোট্ট মাছের ছানাটি তাহাব নিকট আসিয়া, তাহার ছোট্ট ডানা দুখানি জোড় করিয়া বলিল—

"মুনি ঠাকুব! আমাকে দয়া করুন। দেখুন, আমি কতই ছোট— বড় মাছেবা আমাকে খাইয়া ফেলিবে।"

মুনি চাহিয়া দেখিলেন, একটি ছোট মাছের ছানা তাঁহার নিকট হাত জোড় করিতেছে। মুনির দয়া হইল, তিনি বলিলেন—"বাছা, তোর কি চাই? বল আমি কি করিলে তোর দুঃখ দূর হইবে।"

ছোট মাছের ছানাটি তাহার ছোট্ট ডানা দুখানি জোড় কবিয়া বলিল— "আমাকে এখান হইতে লইয়া যাউন। আমাকে দিয়া আপনার উপকার হইবে।"

দুহাতে অঞ্জলি করিয়া, মহামুনি ছোট্ট মাছের ছানাটিকে তুলিয়া লইলেন। তারপর তাহাকে বাড়িতে আনিয়া, ধব্‌ধবে সাদা কলসীর ভিতরে রাখিয়া, পরম যত্নে পুষিতে লাগিলেন।

যতদিন যাইতে লাগিল, মাছের ছানাটি ততই বাড়িতে লাগিল। শেষে আর সেই কলসীতে তাহার জায়গা হয় না। তখন সে মুনিকে বলিল—"মুনি ঠাকুর, এখানে ত আমি নড়িতে চড়িতে পাই না। দয়া করিয়া আমাকে অন্য জায়গায় লইয়া যাউন!"

সেইখানে একটা খুব বড় দীঘি ছিল, তাহার এপার হইতে ওপার ধোঁয়ার মত দেখা যাইত। মুনি মাছের ছানাটিকে কলসী হইতে তুলিয়া, সেই দীঘিতে নিয়া রাখিলেন।

তারপর অনেক বৎসর গেল। অনেক বৎসর ধরিয়া সেই দীঘিতে থাকিয়া, মাছটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল। শেষে আর সেই বিশাল দীঘিতেও তাহার জায়গা হয় না! তখন সে অনেক মিনতি করিয়া মুনিকে আবার বলিল— "মুনি ঠাকুর, আপনার দয়ায়, দেখুন, আমি কত বড় হইয়াছি! এখন আর এই দীঘিতেও আমার জায়গা হয় না। আপনার দুটি পায়ে

পড়ি, দয়া করিয়া আমাকে আর কোথাও লইয়া যাউন।"

তখন মুনি মাছটিকে সেই দীঘি হইতে তুলিয়া, গঙ্গায় নিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে, গঙ্গায়ও তাহার জায়গা কুলাইল না। তখন সে মুনিকে বলিল— মুনি ঠাকুর এখানেও আমার জায়গা হইতেছে না। আমাকে সমুদ্রে লইয়া চলুন।"

তখনই, এত বড় মাছ, তাহাকে মুনি মাথায় করিয়া লইলেন। তাহার গায় এমন গন্ধ ছিল, সে গন্ধ মুনি সহিয়া রহিলেন, শ্যাওলা আর পোকার কথা তিনি মনেই করিলেন না। এইরূপে তাহাকে বহিয়া নিয়া মুনি সাগরের জলে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

তখন সেই মাছ হাসিতে হাসিতে বলিল—"মুনি ঠাকুব, আপনি আমাকে এত কবিয়া বাঁচাইলেন, আমিও আপনার উপকার করিতে ভুলিব না। এখন, এক যে ভয়ানক বিপদের সময় আসিতেছে, তাহার কথা শুনুন। সৃষ্টি নষ্ট হইতে আর দেরি নাই। এই বেলা আমি যাহা বলিতেছি তাহা করুন একটা খুব বড় নৌকা প্রস্তুত করাইয়া, তাহাতে খুব মোটা, খুব শক্ত দড়ি বাঁধিয়া বাখিবেন। সেই নৌকায়, সকল রকমেব বীজ সঙ্গে লইয়া, সপ্তর্ষিদিগের সহিত, আপনি উঠিয়া বসিয়া থাকিবেন। তাবপব যখন সময় হইবে, তখন আমি আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইব। তখন আমাব মাথায় একটা শিং থাকিবে।"

এই বলিয়া মাছ চলিয়া গেল। মুনি নৌকা প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিক পবে, সেই মাছও শাল গাছের মতন উচু শিং মাথায় কবিয়া, সেইখানে আসিয়া দেখা দিল। সেই শিঙে সেই মোটা দড়ি দিয়া নৌকাখানিকে বাঁধিয়া দিলে, আব কোন ভয় বহিল না।

তারপব মেঘ ডাকিতে লাগিল; ঢেউ সকল পর্বতের মতো উঁচু হইয়া ছুটিতে লাগিল, অকূল সমুদ্রের ভিতবে ভয়ঙ্কব ঝড়ে পড়িয়া নৌকাখানি ঘুরপাক খাইতে লাগিল। সেই বিষম ঝড়ে সংসাবেব সকল প্রাণী ডুবিয়া মরিল, কেবল মনু আর সেই সাতজন ঋষি, সেই মাছের দয়াতে প্রাণে বাঁচিয়া বহিলেন।

শেষে জল কমিতে লাগিল। ক্রমে হিমালয়ের চূড়া দেখা দিল। তখন সেই মাছ বলিল— "মুনি ঠাকুর, এই পর্বতের চূড়ায় নৌকা বাঁধুন।"

মাছের কথায় মুনিরা সেইখানে নৌকা বাঁধিলেন। সেই মাছ ছিলেন ব্রহ্মা। তিনি এইরূপ করিয়া প্রলয়ের সময়ে সেই আটটি মুনিকে বাঁচাইয়া ছিলেন।

দেবতা আর অসুরের কথা

অদিতি আর দিতি কশ্যপের স্ত্রী ছিলেন। অদিতির পুত্র ধাতা, মিত্র অর্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু এই বারজন। অদিতির পুত্র বলিয়া ইঁহাদিগকে আদিত্য বলে। দেবতারা ইঁহাদেব দলের লোক।

দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপু। দিতিব সন্তান বলিয়া ইঁহাব বংশের লোকদিগকে দৈত্য বলে। অসুরেরা ইঁহাদের দলের লোক।

সকল দেবতাই অদিতির সন্তান নহেন, সকল অসুরও দিতির সন্তান নহে। ইঁহাদের সকলের পিতামাতার সংবাদ লইবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তবে, আমাদের এই

কথাটা বিশেষ করিয়া জানা দরকার যে, দেবতা আর অসুরদিগের মধ্যে ভয়ানক শত্রুতা ছিল। অসুরেরা চাহিত যে, দেবতাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, তাহারাই স্বর্গের রাজা হইবে। দেবতাদেরও সর্বদাই এই চেষ্টা ছিল যে, কি করিয়া তাঁহারা অসুরদিগকে মারিয়া স্বর্গটাকে নিজের হাতে রাখিবেন।

যখন ভাল করিয়া সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয় নাই, তখন হইতেই দানবেরা দেবতাদিগকে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি আরম্ভ করেন, তখন তিনি একটা পদ্মের ভিতরে বাস করিতেন। তখন জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না, সেই জলের উপরে নারায়ণ অনন্ত শয্যায়* নিদ্রা যাইতেছিলেন। সে সময়ে নারায়ণের নাভি হইতে একটি পদ্ম বাহির হয়, তাহারই ভিতরে ব্রহ্মার বাসা ছিল। ইহার মধ্যে কখন নারায়ণের হাত হইতে দুই বিন্দু জল আসিযা, সেই পদ্মের উপরে পড়ে। তাহা দেখিয়া নারায়ণ বলেন—

"এই দুই বিন্দু জল হইতে দুইটা দৈত্য বাহির হউক।"

মধুকৈটভের কথা

এ কথা বলিবামাত্র, মধু আর কৈটভ নামক দুইটা ভযঙ্কর দৈত্য, গদা হাতে সেই দুই বিন্দু জলের ভিতর হইতে বাহির হইযা আসিল। ব্রহ্মা তখন অন্য জিনিস সৃষ্টি করিবার আগে, সবেমাত্র বেদ কখানি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিযাছেন। দুষ্ট দানবগণ তাহা দেখিবামাত্র, ব্রহ্মার হাত হইতে বেদের পুঁথি কাড়িযা লইয়া, ঝুপ করিয়া জলে লাফাইযা পড়িল। তারপর সেই জলের ভিতরে ডুব সাঁতার দিযা, তাহারা একেবারে পাতালে গিয়া বসিয়া রহিল।

এদিকে বেদ হারাইয়া ব্রহ্মার দুঃখ আর-আক্ষেপের সীমা পরিসীমা রহিল না। তিনি আর উপায় না দেখিয়া, নিতান্ত কাতর ভাবে নারাযণকে বলিলেন—"ভগবন্, মধু আর কৈটভ যে বেদ কাড়িয়া নিল, এখন উপায কি হইবে? বেদ না হইলে ত সৃষ্টি করাই অসম্ভব দেখিতেছি!"

সুতরাং নারাযণের আর নিদ্রা হইল না। তিনি সেই মুহূর্তেই উঠিযা, অতি ভীষণ হযগ্রীব মূর্তি (অর্থাৎ সেই মূর্তির মাথা ঘোড়ার মতন ছিল) ধারণ পূর্বক, বেদ আনিবার জন্য পাতালে যাত্রা করিলেন।

পাতালে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া সাম বেদ গান করিতে লাগিলেন। সেই গানের শব্দ শুনিবামাত্রই মধুকৈটভ তাড়াতাড়ি বেদ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেখিতে চলিল, উহা কিসের শব্দ। সেই অবসরে নারায়ণ বেদ আনিয়া ব্রহ্মাকে দিয়া, হযগ্রীব মূর্তি পরিত্যাগ করতঃ আবার ঘুমাইয়া রহিলেন। মধুকৈটভ ইহার কিছু জানিতে পারিল না।

এদিকে মধু আর কৈটভ 'কিসের শব্দ' কিসের শব্দ' করিয়া পাতালময় খুঁজিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। তারপর ফিরিয়া আসিয়া দেখে, বেদও নাই! তখন তাহারা পাতাল হইতে উঠিয়া আসিয়া দেখিল, নারায়ণ নিদ্রা যাইতেছেন।

---

* অনন্ত একটি সাপ, তাহার এক হাজারটা মাথা। এই সাপের উপরে নারায়ণ ঘুমাইতেছিলেন।

নারায়ণকে দেখিয়াই দানবেরা বলিল, "ঐ সেই সাদা বেটা (নারায়ণের দেহ শ্বেতবর্ণ ছিল) ঘুমাইতেছে। বেদ চুরি করা উহারই কাজ।"

এই বলিয়া তাহারা নারায়ণের কাছে আসিয়া আবার ঘোরতর শব্দে বলিতে লাগিল, "এ বেটা কে রে? বেটা ঘুমাইতেছে কেন?"

ইহাতে নারায়ণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি চাহিয়া দেখিলেন যে, দুই দানব মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে। সুতরাং তখন তিনিও তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, আর দেখিতে দেখিতে দুই দানবের প্রাণও বাহির হইয়া গেল।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টির গোড়া হইতেই দেবতা আর অসুরের শত্রুতা। এই অসুরদের হাতে দেবতারা যে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অসুরগুলি স্বভাবতই বেজায় ষণ্ডা ছিল। তাহাদের চেহারা অতি ভয়ঙ্কর আর দেহগুলি পাহাড় পর্বতের মত বড় হইত। ইহার উপর আবার বড় বড় দেবতাদিগকে নিতান্ত ভালো মানুষ পাইয়া, উহারা সহজেই তাঁহাদিগকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া ফেলিত। তুষ্ট হইলেই তাঁহারা তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত বর দিতেন। এমনি করিয়া এক একটা অসুর বড়ই ভয়ানক হইয়া উঠিত। সুন্দ আর উপসুন্দ নামক দুইটি দানব, এইরূপে ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া, কি কম [illegible] করিয়াছিল?

সুন্দ ও উপসুন্দের কথা

সুন্দ আর উপসুন্দ, দুই ভাই, হিরণ্যকশিপুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। দুই ভাই মিলিয়া যুক্তি করিল যে, ব্রহ্মার নিকট বর লইয়া, ত্রিভুবন জয় করিতে হইবে।

এইরূপ পরামর্শ করিয়া, তাহারা বিন্ধ্য পর্বতে গিয়া এমনি ভয়ঙ্কর তপস্যা আরম্ভ করিল যে, তাহাতে দেবতারা পর্যন্ত ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন। ইহাদের তপস্যা ভাঙ্গিবার জন্য তাঁহারা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তাহারা খালি বাতাস খাইয়া, কেবল পায়ের বুড়ো আঙুলের ভরে খাড়া থাকিয়া, চোখের পলক না ফেলিয়া, একমনে তপস্যাই করিতে লাগিল। তপস্যার তেজে বিন্ধ্য পর্বতে আগুন ধরিয়া গেল!

কাজেই তখন ব্রহ্মা আর তাহাদের নিকট না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমরা কি বর চাহ?"

সুন্দ ও উপসুন্দ বলিল, "আমরা এই বর চাহি যে, আমরা সকলরকম মায়া জানিব, যেমন ইচ্ছা তেমনি চেহারা করিতে পারিব, যুদ্ধে সকলকেই হারাইয়া দিব, আর অমর হইব।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে আর সব কয়টি বর দিতেছি, কিন্তু অমর করিতে পারিব না। তোমরা যখন ত্রিভুবন জয়ের জন্য তপস্যা করিতেছ, তখন তোমাদিগকে অমর করিলে চলিবে কেন? অমর হইলে ত তোমরা দেবতাদিগের সমানই হইয়া যাইবে!"

এ কথা শুনিয়া সুন্দ উপসুন্দ বলিল, "যদি অমর না করেন, তবে এই বর দিন যে, ত্রিভুবনের ভিতরে কেহই আমাদিগকে বধ করিতে পারিবে না। আমাদিগকে মারিবার ক্ষমতা

কেবল আমাদের নিজেরই থাকিবে।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক। তোমাদের নিজেদের হাতেই তোমাদের মৃত্যু হইবে, অপর কেহ তোমাদিগকে মারিতে পারিবে না।"

এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলে, সুন্দ উপসুন্দ ঘরে ফিরিয়া দিনকতক খুবই ধুমধাম করিল। তারপর তাহারা লাখে লাখে বিকটাকার অসুর সঙ্গে লইয়া ত্রিভুবন জয় করিতে বাহির হইল।

ব্রহ্মা যে সুন্দ উপসুন্দকে বর দিয়াছেন, এ কথা দেবতারা বেশ জানিতেন। সুতরাং তাঁহারা তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই যার পর নাই ব্যস্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্বক একেবারে ব্রহ্মালোকে উপস্থিত হইলেন। এদিকে অসুরেরা স্বর্গ খালি পাইয়া তাহা অধিকার করিতে এবং সেখানে যাহাদিগকে পাইল তাহাদিগকে বধ করিতে, কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না।

তারপর সুন্দ উপসুন্দ তাহাদের সৈন্যদিগকে ডাকিয়া বলিল, "রাজারা আর মুনিরা যাগ যজ্ঞ করিয়া দেবতাদিগের তেজ বাড়াইয়া দেয়। সুতরাং আইস, আমরা তাহাদিগকে গিয়া বধ করি।"

সমুদ্রের ধারে মুনিরা যজ্ঞ করিতেছিলেন। সুন্দ উপসুন্দের কথায় অসুরের দল ক্ষেপিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে বধ করিতে লাগিল, যজ্ঞের আয়োজন সকল জলে ফেলিয়া দিল। মুনিরা শাপ দিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার বরের গুণে সে শাপে কোন ফল হইল না। তাহাতে নিতান্ত আশ্চর্য হইয়া, এবং ভয় পাইয়া, তাঁহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

তারপর সুন্দ উপসুন্দ, নানারূপ উপায়ে মুনি এবং রাজাদিগকে বধ করিতে লাগিল। সংসারময় হাহাকার পড়িয়া গেল। ধর্মকর্ম ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি কোন কার্যই করিবার লোক রহিল না। দেখিতে দেখিতে এই সুন্দর সৃষ্টির এমন অবস্থা হইল যে, তাহা শ্মশানের চেয়েও ভয়ানক। এইরূপে সুন্দ উপসুন্দ ত্রিভুবন ছারখার করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে, কুরুক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

তখন দেবর্ষি এবং সিদ্ধগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জোড় হাতে, অতি কাতরভাবে বলিলেন "হে পিতামহ! সুন্দ উপসুন্দের দৌরাত্ম্যে সৃষ্টি নষ্ট হইল। দয়া করিয়া ইহার উপায় করুন।"

এ কথায় ব্রহ্মা একটু চিন্তা করিয়া বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি একটি এমন সুন্দর কন্যা প্রস্তুত কর যে, তেমন সুন্দর আর কেহ কখনো দেখে নাই।"

তাহা শুনিয়া বিশ্বকর্মা বলিলেন, "যে আজ্ঞা।"

তিলোত্তমা

তারপর, এই জগতে যেখানে যাহা কিছু সুন্দর আছে, তিল তিল করিয়া তাহাদের সকলের সারটুকু বিশ্বকর্মা কুড়াইয়া আনিলেন। চাঁদের আলোর সার, রামধনুকের রঙের সার, ফুলের শোভার সার, মণিমুক্তার জ্যোতির সার, গানের সার, নৃত্যের সার, হাসির সার, সকল মিলাইয়া তিনি তিলোত্তমা (অর্থাৎ তিল তিল করিয়া যাহার রূপের আয়োজন হইয়াছে) নামে এমনই এক অপরূপ রূপবতী কন্যার সৃষ্টি করিলেন যে, তাহাকে যে দেখে সেই আর

চক্ষু ফিরাইতে পারে না। ইন্দ্র তাহাকে দুই চোখে দেখিয়া তৃপ্তি পাইলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীরে এক হাজার চোখ হইল; সেই এক হাজার চোখ দিয়া তিনি ইহাকে আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিলেন!

তিলোত্তমা ভক্তিভরে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবন্, আমাকে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন।"

ব্রহ্মা কহিলেন, "বাছা, তুমি একটিবার সুন্দ উপসুন্দের নিকট গিয়া দেখা দেও।"

এ কথায় তিলোত্তমা দেবতাগণকে প্রণাম করিয়া, ও তাঁহাদের সকলের আশীর্বাদ লইয়া সুন্দ উপসুন্দের নিকট যাত্রা করিল। সে সময়ে সুন্দ উপসুন্দ বিন্ধ্য পর্বতের নিকটে বেড়াইতে গিয়াছিল। তিলোত্তমা সুন্দর লাল কাপড় পরিয়া, সেইখানে গিয়া ফুল তুলিতে লাগিল।

তিলোত্তমাকে দেখিবামাত্র, সুন্দ আর উপসুন্দ দুইজনেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, আমি ইহাকে বিবাহ করিব!"

সুন্দ বলিল, "তাহা হইবে না! আমি ইহাকে বিবাহ করিব।"

উপসুন্দ বলিল, "তুমি বলিলে কি হইবে? আমিই ইহাকে বিবাহ করিব।"

সুন্দ বলিল, "চুপ! বেয়াদব!"

উপসুন্দ বলিল, "খবরদার! মুখ সামলাইয়া কথা কও!"

তখন সুন্দ গদা লইয়া উপসুন্দকে মারিতে গেল। উপসুন্দও গদা লইয়া সুন্দকে মারিতে গেল।

তারপর সেই গদা দিয়া দুইজনেই দুইজনের মাথা ফাটাইয়া দিল। সুতরাং ব্রহ্মার বরে দুইজনেরই প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া অন্যান্য দানবেরা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পাতালে পলায়ন করিল।

ইহাতে দেবতারা অবশ্য অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তিলোত্তমার অনেক প্রশংসা করিলেন। তারপর, সূর্য যে পথে চলেন, সেই ঝক্‌ঝকে সুন্দর পথে দেবতারা তিলোত্তমাকে রাখিয়া দিলেন। সেই পথে সে মনের আনন্দে খেলা করিয়া বেড়ায়। সূর্যের তেজে আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না।

ব্রহ্মা সুন্দ উপসুন্দকে অমর হইতে না দিয়া ভালই করিয়াছিলেন, নহিলে এত সহজে তাহাদের দৌরাত্ম্যের শেষ হইত না। দেবতারা যে অমর ছিলেন, আর অসুরেরা অমর ছিল না, ইহাও সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে; নহিলে দুর্দান্ত অসুরের দল কবে দেবতদাদিগকে মারিয়া শেষ করিত।

এমন এক সময় ছিল, যখন দেবতারা অমর ছিলেন না। তখন অসুরদিগের ভয়ে, তাঁহাদের বড়ই দুঃখে দিন যাইত। সকলের চেয়ে বেশি দুঃখের কথা এই ছিল, যুদ্ধে সাংঘাতিক আঘাত পাইলে, দেবতারা মরিয়া যাইতেন, কিন্তু অসুরদিগের গুরু শুক্র তাহাদিগকে মরিতে দিতেন না। শুক্র 'সঞ্জীবনী', অর্থাৎ মরাকে বাঁচাইবার মন্ত্র জানিতেন, দেবতাদিগের গুরু বৃহস্পতি তাহা জানিতেন না। কাজেই, অসুর মরিলেই শুক্র তাহাকে বাঁচাইয়া দিতেন; কিন্তু দেবতা মরিলে বৃহস্পতি আর তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিতেন না।

একে ত অসুরদের বল বেশি, তাহাতে যদি আবার এমন হয়, তবে কি দুঃখের কথাই হয়! কাজেই দেবতারা দেখিলেন যে, সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র তাঁহাদের না শিখিলে আর চলিতেছে না।

কচের কথা

এই ভাবিয়া তাঁহারা বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের নিকটে গিয়া বলিলেন, "কচ, আমরা দুঃখে পড়িয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, তোমাকে আমাদের একটু উপকার করিতে হইবে।"

কচ দেবতাদিগকে নমস্কার পূর্বক, বিনয়ের সহিত বলিলেন, "আমার সাধ্য হইলে, আমি তাহা অবশ্য করিব। বলুন, আমাকে কি করিতে হইবে?"

দেবতারা বলিলেন, "ভৃগুর পুত্র শুক্র সঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন, তাঁহার নিকট হইতে সেই বিদ্যা তোমাকে শিখিয়া আসিতে হইবে।"

কচ বলিলেন, "আমি এখনই তাঁহার নিকট যাইতেছি।"

দানবদিগের রাজা বৃষপর্বার বাড়িতে শুক্রাচার্য বাস করিতেন, কচ দেবতাদিগের নিকট বিদায় হইয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শুক্র তখন বৃষপর্বার নিকটেই বসিয়াছিলেন, কচ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি অঙ্গিরার পৌত্র, বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ, আপনার শিষ্য হইতে আসিয়াছি। আপনি কৃপাপূর্বক অনুমতি করিলে, এক হাজার বৎসর আপনার সেবায় থাকিয়া, ব্রহ্মচর্য (অর্থাৎ ছাত্রাদিগের ধর্ম পালন) করিব।"

অঙ্গিরাও ব্রহ্মার পুত্র, ভৃগুও ব্রহ্মার পুত্র কাজেই সম্পর্ক হিসাবে কচ শুক্রের ভাইপো। সুতরাং শুক্র তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার পিতা আমার মান্য লোক। আমি আহ্লাদের সহিত তোমাকে শিষ্য করিলাম।"

এইরূপে কচ শুক্রের শিষ্য হইয়া, পরম সুখে তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। শুক্র তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, আর তাঁহার কন্যা দেবযানীর ত কচ না হইলে কাজই চলিত না। দেবযানীকে ফুল আনিয়া দেওয়া, তাঁহার কাজের সাহায্য করা, তাঁহার সঙ্গে গান গাওয়া, নানারকম নৃত্য করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা— অবসর কালে, এই-সকলই কচের প্রধান কাজ ছিল। এইরূপে পাঁচশত বৎসর পরম সুখে কাটিয়া গেল।

এদিকে কচ শুক্রের শিষ্য হওয়াতে অসুরদের আর অসন্তোষের সীমা রহিল না। তাহাদের মনে বড়ই সন্দেহ হইল যে, এই ছোকরা সঞ্জীবনী বিদ্যা চুরি করিয়া নিতে আসিয়াছে। সুতরাং তাহারা স্থির করিল যে, যেমন করিয়াই হউক, ইহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে।

একদিন কচ শুক্রের গরু লইয়া বনে গিয়াছেন, এমন সময় অসুরেরা তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শিয়াল কুকুর দিয়া খাওয়াইয়া ফেলিল। সন্ধ্যার সময় গরুগুলি ঘরে ফিরিল, কিন্তু কচ তাহাদের সঙ্গে আসিলেন না। তাহা দেখিয়া দেবযানী তাঁহার পিতাকে বলিলেন, "বাবা, সন্ধ্যা হইল আপনার অগ্নিহোত্রে আহুতি দেওয়া হইল, গরুগুলি আপনা আপনি ঘরে ফিরিল, কিন্তু কচ ত আসিল না! সে বুঝি তবে আর বাঁচিয়া নাই! আমি সত্য বলিতেছি, কচ বিনা আমিও বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না।"

দেবযানীর দুঃখ দেখিয়া শুক্র বলিলেন, "ভয় কি মা! কচ এখনই আসিবে, আমি তাহাকে বাঁচাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কচকে ডাকিতে লাগিলেন আর অমনি

কচ শিয়াল কুকুরের পেট ছিঁড়িয়া, তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবযানী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কচ, তোমার আসিতে বিলম্ব হইল কেন?"

কচ বলিলেন, 'কাঠ কুড়াইতে কুড়াইতে বড় পরিশ্রম হইয়াছিল, তাই আমি গরুগুলি লইয়া একটা বটগাছের তলায় বিশ্রাম করিতেছিলাম। এমন সময় অসুরেরা আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই কে?' আমি বলিলাম, 'আমি বৃহস্পতির পুত্র কচ।' এ কথায় তাহারা আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, শিয়াল কুকুরকে খাইতে দিয়া, হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। তারপর তোমার পিতার মন্ত্রের গুণে বাঁচিযা উঠিয়া, এই আসিতেছি।"

আর-একদিন কচ দেবযানীর জন্য ফুল আনিতে বনে গিয়াছেন, এমন সময় অসুরেরা আবার আসিয়া, তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল। তারপর, আর যাহাতে শুক্র তাঁহাকে না বাঁচাইতে পারেন, সেজন্য ভারি আশ্চর্যরকমের এক কৌশল করিল।

শুক্র মদ্য পান করিতেন। যে মদ খায়, তাহার সকল সময় কাণ্ড জ্ঞান থাকে না। এই মনে করিয়া তাহারা কচের দেহটাকে পোড়াইয়া, সেই দেহের ছাইগুলি শুক্রাচার্যের সুরার সহিত মিশাইয়া দিল। শুক্রাচার্যও নেশার ঝোঁকে তাহা খাইয়া ফেলিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না!

সেদিনও দেবযানী কচের জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু অসুরেরা ক্রমাগতই কচকে মারিয়া ফেলিতেছে দেখিয়া, শুক্রের মনে উৎসাহ ছিল না। তাই তিনি দেবযানীকে বলিলেন—

"উহাকে আর বাঁচাইয়া কি হইবে? অসুরেরা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না। তুমি কাঁদিও না, মা! একটা সামান্য লোকের জন্য কেন এত দুঃখ করিতেছ?

দেবযানী বলিলেন, "মহামুনি অঙ্গিরা যাঁহার পিতামহ, বৃহস্পতি যাঁহার পিতা, আর নিজেও যিনি এমন ধার্মিক আর বুদ্ধিমান, তিনি ত সামান্য লোক নহেন, বাবা! তাঁহার জন্য দুঃখ না করিয়া যে পারিতেছি না। কচকে আমি বড়ই ভালবাসি; তিনি মরিলে আমিও প্রাণত্যাগ করিব।"

ইহাতে দানবদিগের উপরে শুক্রের বড়ই রাগ হইল। তখন তিনি, "অসুরেরা বারবার আমার শিষ্যকে বধ করিতেছে, আমি ইহার উচিত সাজা দিব।" এই বলিয়া ক্রোধভরে সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কচকে ডাকিতে লাগিলেন।

কচকে ডাকিতে ডাকিতে শুক্রাচার্যের মনে হইল, যেন, সেই ডাকের উত্তর তাঁহার নিজের পেটের ভিতর হইতেই আসিতেছে! তখন তিনি নিতান্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি, কচ, আমার পেটের ভিতরে কি করিয়া ঢুকিলে!"

কচ বলিলেন, "অসুরেরা আমাকে আপনার সুরার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিল, আপনি আমাকে খাইয়া ফেলিয়াছেন।"

তাহা শুনিয়া শুক্র বলিলেন, "কি সর্বনাশ! ও মা দেবযানি, এখন তোমার কচকে আমি কি করিয়া বাঁচাইব? তাহা করিতে গেলে যে আমাকেই প্রাণত্যাগ করিতে হয়! আমার পেট না ছিঁড়িয়া ত তাহার বাহির হইবার উপায় নাই!"

তাহাতে দেবযানী বলিলেন, "আপনি মরিলেও আমি বাঁচিব না, কচ মরিলেও আমি বাঁচিব না। কাজেই আপনি যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই করুন।"

তখন শুক্র খানিক চিন্তা করিয়া কচকে বলিলেন, "বাবা, কচ, আমি তোমাকে সঞ্জীবনী

বিদ্যা শিখাইয়া দিতেছি। তুমি বাহিরে আসিবার সময় আমি মরিয়া যাইব, তখন এই বিদ্যার দ্বারা তুমি আমাকে বাঁচাইয়া দিবে।"

এই বলিয়া শুক্র কচকে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখাইয়া দিলেন। তারপর কচ বাহিরে আসিয়া, সেই বিদ্যার দ্বারা শুক্রকে বাঁচাইলেন। বাঁচিয়া উঠিয়া শুক্রের এইরূপ চিন্তা হইল—

"তাই ত! আমি মদ খাই বলিয়াই ত আজ এমন কুকর্ম করিয়া বসিলাম। এখন হইতে এমন জঘন্য জিনিস যে ব্রাহ্মণে খাইবে, তাহার ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হইবে।"

তারপর তিনি দানবদিগকে, ডাকিয়া এমনই তিরস্কার করিলেন যে, আর তাহারা কচের কোন অনিষ্ট করিতে সাহস পাইল না। দেখিতে দেখিতে এক হাজার বৎসর নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

এক হাজার বৎসরের পরে কচ শুক্রের নিকটে বিদায় লইয়া ঘরে ফিরিবার সময়, দেবযানী তাঁহাকে বলিলেন—

"কচ, আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া তোমার সঙ্গে লইয়া যাও।"

দেবযানীর কথা শুনিয়া কচ বলিলেন, "দিদি তোমার পিতাকে আমি যেমন মান্য ও ভক্তি করি, তোমাকেও তেমনি মান্য ও ভক্তি করি। তোমার পিতা আমার গুরু, সুতরাং তিনিও আমার পিতা, আর তুমি আমার দিদি। আমাকে এমন কথা বলা তোমার উচিত হয় না।"

ইহাতে দেবযানী নিতান্তই দুঃখিত হইতেছেন দেখিয়া কচ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। শেষে তিনি বলিলেন—

"দিদি, তোমাদের এখানে এতদিন বড়ই সুখে ছিলাম। এখন অনুমতি কর গৃহে যাই, আর আশীর্বাদ কর, যেন পথে আমার কোন বিপদ না হয়। মাঝে মাঝে আমাকে স্মরণ করিও, আর সাবধানে গুরুদেবের সেবা করিও।"

কিন্তু কচের কোন কথাতেই দেবযানী শান্ত হইলেন না। শেষে মনের দুঃখে তিনি কচকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে—

'কচ, তুমি যখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তখন তোমার সঞ্জীবনী বিদ্যায় কোন ফল হইবে না।'

এ কথায় কচ বলিলেন, "আমার বিদ্যায় কোন ফল না হউক, তাহাতে দুঃখ নাই। আমি অন্যকে এই বিদ্যা শিখাইলে, তাহার বিদ্যার ফল হইবে। আর তুমি যেমন আমাকে শাপ দিলে, তেমনি আমিও বলিতেছি যে, কোন ঋষিপুত্র তোমাকে বিবাহ করিতে আসিবে না।"

এই বলিয়া কচ সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। তাঁহাকে পাইয়া দেবতারা যে খুব আনন্দিত হইলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য।

সেই সঞ্জীবনী বিদ্যার জোরে কতজন মরা দেবতা বাঁচিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু দেখা যায় যে এই ব্যবস্থায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। একজন মরিয়া গেলে পরে, আর একজন আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দিবে, ইহা খুবই ভাল কথা, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু একেবারেই যদি না মরিতে হয়, তবে যে ইহার চেয়ে অনেক সুবিধা হয়, এ কথা সকলেই বুঝিতে পারে।

সুতরাং দেবতারা যে সঞ্জীবনী বিদ্যায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া অমর হইবার উপায় খুঁজিবেন, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে। অমর হইবার ঔষধ অমৃত। এই অমৃত খাইয়া অমর হইবার জন্য, দেবতাদিগের মনে বড়ই ইচ্ছা হইল।

তাই তাঁহারা, সুমেরু পর্বতের উপর বসিয়া, পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, কি উপায়ে এই অমৃত পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহাদিগকে এইরূপ পরামর্শ করিতে দেখিয়া নারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন, "দেবতা আর অসুরগণ একত্র হইয়া যদি সমুদ্র মন্থন করেন, তবে তাহা হইতে অমৃত উঠিবে।"

এ কথায় ব্রহ্মা দেবগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে দেবতাগণ! তোমরা সমুদ্র মন্থন কর, অমৃত পাইবে। অল্প মন্থন করিয়াই ক্ষান্ত হইও না; অতিশয় পরিশ্রম হইলেও ছাড়িয়া দিও না, ধনরত্ন বিস্তর পাইলেও মন্থন বন্ধ করিও না। ক্রমাগত কেবলই মন্থন করিতে থাক, নিশ্চয় অমৃত পাইবে!"

ব্রহ্মার কথা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। তখনই সকলে 'আইস!' 'কোমর বাঁধ!' 'মন্থন বাড়ি আন!' 'মন্থন দড়ি খুঁজিয়া বাহির কর!' এই বলিয়া সমুদ্র মন্থনের আয়োজনের তাড়া পড়িল।

সমুদ্র মন্থন হইবে, তাহার মতন মন্থন বাড়ি চাহি! যে সে মন্থন-বাড়িতে একাজ চলিবে না। বাঁশে হইবে না, তালগাছে কুলাইবে না। আরো অনেক লম্বা, অনেক হাজার যোজন লম্বা মন্থন-বাড়ি চাহি।

এত বড় মন্থন-বাড়ি আর কিসে হইতে পারে? এক মন্দর পর্বতখানি আছে, তাহা বাইশ হাজার যোজন লম্বা। সেই মন্দর পর্বতকে দিয়াই মন্থনবাড়ি করিতে হইবে।

সে পর্বত বাইশ হাজার যোজন লম্বা। এগার হাজার যোজন মাটির নীচে, এগার হাজার যোজন উপরে। বন জঙ্গল, বাঘ ভাল্লুক, গন্ধর্ব কিন্নর সুদ্ধ, সেই বিশাল পুরানো পর্বত তুলিতে দেবতাদিগের কিছুতেই শক্তি হইল না। অনেক পরিশ্রম, অনেক টানাটানি করিয়া, শেষে তাহারা হেঁট মুখে ব্রহ্মা ও নারায়ণের নিকট গিয়া, জোড়হাতে বলিলেন, "প্রভো, আমরা ত পর্বত উঠাইতে পারিলাম না! দয়া করিয়া ইহার উপায় করুন!"

ইহা শুনিয়া নারায়ণ সর্পরাজ অনন্তকে বলিলেন, "অনন্ত, তুমি এই পর্বত উঠাইয়া দাও।"

অনন্ত এই পৃথিবীটাকে মাথায় করিয়া রাখেন, তাঁহার পক্ষে একটা পর্বত উঠান কি কঠিন কাজ? নারায়ণের অনুমতি মাত্রই তিনি সেই বিশাল পর্বত তুলিয়া আনিলেন। তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না।

তারপর সেই পর্বত লইয়া আর অনন্তকে সঙ্গে করিয়া দেবতা ও অসুরগণ সমুদ্রের তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্থন-দড়ির জন্য কোন চিন্তা করিতে হইল না। অনন্ত সর্প অতিশয় লম্বা আর তাঁহার শরীর বড়ই মজবুত, তিনি বলিলেন, "আমিই দড়ি হইব!"

কিন্তু সমুদ্রের তলায় কাদা, তাহাতে পর্বত বসাইয়া পাক দিলে তলায় ছিদ্র হইয়া যাইবে! হয়ত সেই ছিদ্রে পর্বত আঁটিয়া যাইবে---তারপর আর তাহাতে পাক দেওয়া যাইবে না! সুতরাং কিসের উপরে পর্বত রাখা যায়?

অনন্ত পৃথিবীকে মাথায় রাখেন। সেই পৃথিবীসুদ্ধ সেই অনন্তকে কচ্ছপের রাজা পিঠে করিয়া রাখেন, তাঁহার পিঠের খোলা বড়ই কঠিন।

তাই দেবতারা পবিলেন, "হে কূর্মরাজ (কচ্ছপের রাজা)! তোমার পিঠে পর্বত রাখিয়া দাও!"

কূর্মরাজ বলিলেন, "এ আর কত বড় একটা কথা!"

কচ্ছপের রাজা তখনই গিয়া সমুদ্রের তলায় বসিলেন। তাঁহার পিঠের উপরে মন্দর পর্বত রাখা হইল। সেই পর্বতের চারিদিকে অনন্তকে জড়াইয়া দেওয়া হইল। তারপর দেবতারা ধরিলেন সাপের লেজ, অসুরেরা ধরিল তাঁহার মাথা, এইরূপ করিয়া তাঁহারা সেই পর্বতে এমনি বিষম পাক দিতে লাগিলেন যে, পাক যাহাকে বলে!

দেবতারা টানেন—হুড়্-হুড়্-হুড়্-হুড়্-হুড়্-হুড়্-হুড়্-হুড়্!!

অসুরেরা টানে— ঘড়্-ঘড়্-ঘড়্-ঘড়্-ঘড়্-ঘড়্-ঘড়্-ঘড়্-!!!

তাহাতে ত্রিভুবন কাঁপাইয়া ঘোরতর শব্দ উঠিল। পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। জল ছুটিয়া আকাশে উঠিল! মাছ মরিয়া গেল, পর্বতে আগুন ধরিয়া গেল।

তারপর, সেই পর্বতে যত ঔষধ, মণি,আর ধাতু ছিল; আগুনের তেজে তাহা গলিয়া সমুদ্রে পড়াতে, সমুদ্রের জল দুধ হইয়া গেল। সেই দুধ হইতে ঘি বাহির হইল।

এইরূপ করিয়া অনেকদিন চলিয়া গেল। দেবতারা ক্রমাগত পর্বতে পাক দিয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন যদি নারায়ণ তাঁহাদিগকে উৎসাহ না দিতেন, তবে তাঁহাবা কখনই এ কাজ শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। নারায়ণের উৎসাহে নূতন বল পাইয়া, তাঁহাবা আরো বেশি করিয়া পর্বতে পাক দিতে লাগিলেন।

এমন সময় হঠাৎ অতি কোমল এবং শীতল সাদা আলোতে চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া গেল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রদেব তাঁহাব সুন্দর গোল মুখখানি লইয়া হাসিতে হাসিতে সমুদ্রের ভিতর হইতে উঠিয়া আসিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহারা পাক দিতে ভুলিলেন না। চন্দ্র উঠিয়া সবে দেবতাদিগের নিকট গিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় সেই ঘৃতের ভিতর হইতে একটি আশ্চর্য পদ্মফুল উঠিল। সেই পদ্মের ভিতরে লক্ষ্মীদেবী বসিয়াছিলেন, তাঁহার রূপের ছটায় ত্রিভুবন আলো হইয়া গেল!

লক্ষ্মীকে পাইয়া সকলে আনন্দের সহিত আরো বেশি করিয়া পাক দিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই ঘৃতের ভিতর হইতে ক্রমে আরো তিনটি জিনিস বাহির হইল—একটি দেবতা, উচ্চৈঃশ্রবাঃ নামক একটি ঘোড়া, আর কৌস্তুভ নামক একটি মণি।

কৌস্তুভ মণিটি উঠিয়াই নারায়ণের বুকে গিয়া ঝুলিতে লাগিল। অন্য জিনিসগুলিও দেবতারাই পাইলেন।

এদিকে কিন্তু পাক থামে নাই। হুড়্-হুড়্-ঘড়্-ঘড়্ গভীর গর্জনে তাহা ক্রমাগতই চলিতেছিল। কিঞ্চিত পরে, শ্বেতবর্ণ কমণ্ডলু হাতে চিকিৎসার দেবতা ধন্বন্তরি সমুদ্রের ভিতর হইতে উঠিয়া আসিলেন। সেই কমণ্ডলুর ভিতরে অমৃত ছিল।

অমৃত দেখিবামাত্রই দৈত্যগণ, 'উহা আমাদের" "উহা আমাদের" বলিয়া ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ করিল।

মন্থন কিন্তু তখনো থামে নাই। তারপর ঐরাবত নামে একটা চা'র-দাঁতওয়ালা সাদা হাতি উঠিল। তাহাকে দেখিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "ইহা আমার!" সুতরাং উহা তাঁহাকেই দেওয়া হইল।

তথাপি মন্থন থামিল না। এত জিনিস পাইয়া, বোধহয় সকলে ভাবিয়াছিল যে, আরো পাক দিলে, আরো ভাল ভাল জিনিস উঠিবে। কিন্তু এত লোভের কি সাজা, এবারে আর ভাল জিনিস না উঠিয়া, উঠিল, কালকূট নামক বিষম বিষ! সেই সাংঘাতিক বিষের গন্ধ শুঁকিয়াই ত্রিভুবন অজ্ঞান হইয়া গেল!

এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া ব্রহ্মা শিবকে বলিলেন, "এখন উপায় কি হইবে? সকল যে যায়!"

ব্রহ্মার কথায় মহাদেব, সৃষ্টি রক্ষার জন্য সেই বিষ নিজের কণ্ঠের ভিতরে রাখিয়া দিলেন। ইহাতেই তাঁহার কণ্ঠ নীল হইয়া যায়। সেইজন্য মহাদেবের এক নাম 'নীলকণ্ঠ'।

এদিকে দৈত্যগণ অমৃতের জন্য ক্ষেপিয়া গিয়া দেবতাদিগের নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়াছে! দেবতাদের এমন শক্তি নাই যে, যুদ্ধ করিয়া উহাদের হাত হইতে তাহা উদ্ধার করেন। হায় হায়! এত ক্লেশ, এত পরিশ্রমের ফল কি এই?

এই বিপদের সময় নারায়ণ অসুরদের হাত হইতে অমৃত উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি একটি অপরূপ সুন্দরী কন্যার বেশে অসুরদিগের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অসুরেরা যখন তাঁহার সেই সুন্দর মুখখানি দেখিতে পাইল, তখন আর তাহাদের মুখে কথা সরিল না, চোখে পলক পড়িল না। তাহারা হাঁ করিয়া, হতবুদ্ধির ন্যায়, গোল চোখে, জোড়হাতে তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর যখন তিনি হাত মেলিয়া, হাসিতে হাসিতে, তাহাদের নিকট অমৃতের পাত্রটি চাহিলেন, তখন নিতান্ত ব্যস্তভাবে তাহা তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়া, যেন তাহারা কতই কৃতার্থ হইল!

রাহুর কথা

তারপর দেবগণ অপার আনন্দের সহিত সেই অমৃত আহার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাহু নামক একটা ধূর্ত দানব দেবতার সাজ ধরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে অমৃত খাইতে বসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু চন্দ্র আর সূর্য তাহাকে চিনিয়া ফেলাতে, তাহার সেই চাতুরীতে কোন ফল হইল না। সে সবে মাত্র অমৃত মুখে দিয়াছে, এমন সময় চন্দ্র সূর্য নারায়ণকে তাহার কথা বলিয়া দিলেন। আর সেই মুহূর্তেই নারায়ণের সুদর্শন নামক অস্ত্র আসিয়া তাহার গলা কাটিয়া ফেলিল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে রাহুর গলা কাটা গেলেও, তাহার মাথাটা আকাশে উঠিয়া ভীষণ ভ্রূকুটির সহিত দাঁত খিঁচাইয়া গর্জন করিতে লাগিল। অমৃত তাহার গলা পর্যন্ত গিয়াছিল, এইজন্যই তাহার মাথাটার মৃত্যু হইল না। সেই মাথাটা এখনো আকাশের কোণে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া থাকে, আর চন্দ্র বা সূর্য সেই পথে গেলেই, তাঁহাকে ধরিয়া গিলিবার চেষ্টা করে! ইহাতেই না কি গ্রহণ হয়! যাহা হউক, কেবল মাথাটি মাত্র থাকাতে, সে চন্দ্র সূর্যকে গিলিয়াও তাঁহাদিগকে রাখিতে পারে না, তাঁহারা তাহার গলার ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া আসেন। যদি তাহার পেট থাকিত তবে বড় বিপদের কথাই হইত!

তারপর লবণ সমুদ্রের তীরে, দেবতা আর অসুরগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অস্ত্রে

আকাশ ছাইয়া গেল। দানবদিগের কাঁচা সোনার রঙের মাথাগুলি ক্রমাগত কাটিয়া পড়িতে লাগিল। এবারে দেবতারা অমৃত খাইয়া অমর হইয়াছেন, সুতরাং দানবেরা আর তাঁহাদিগকে মারিতে পারিল না। উহারা পাহাড় পর্বত এবং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ভয়ানক যুদ্ধ করিযাছিল। কিন্তু নারায়ণের সুদর্শন চক্র এবং দেবতাদের বাণের সম্মুখে তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারিল না। কাজেই শেষে তাহাদের কেহ মাটির নীচে, কেহ বা সমুদ্রের ভিতরে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল।

যুদ্ধে জয়লাভ করিযা দেবতাগণের আনন্দের সীমা রহিল না। তখন তাঁহারা মন্দর পর্বতকে যত্নের সহিত তাহার স্থানে রাখিয়া, এবং অবশিষ্ট অমৃত নারায়ণের হাতে দিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন।

বৃত্রের কথা

অমর হইয়াও দেবতারা দৈত্যদিগকে সহজে আঁটিতে পারেন নাই। ইহার পরেও তাঁহারা দৈত্যদিগকে দেখিলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেন, আর, যুদ্ধে ক্রমাগতই তাহাদের নিকট হারিয়া যাইতেন। কালেয় (অর্থাৎ কালের পুত্র) নামক একদল দৈত্য তাঁহাদিগকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল যে, কি বলিব। ইহাদের দলপতি বৃত্রের নাম শুনিলেই তাঁহারা ভয়ে কাঁপিতেন।

শেষে আর উপায় না দেখিযা, তাঁহারা সকলে মিলিযা ব্রহ্মার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন—

দধীচের কথা

"আমি তোমাদিগকে বৃত্রাসুর বধ করিবার উপায় বলিয়া দিতেছি। দধীচ নামে এক অতি প্রসিদ্ধ এবং মহাশয় মুনি আছেন; তোমরা সকলে গিয়া তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা কর। তোমরা চাহিবামাত্র তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে প্রস্তুত হইবেন। তখন তোমরা বলিবে, "আপনি জগতের উপকারের জন্য আপনার হাড় ক'খানি দিন।" জগতের উপকারের জন্য সেই মহামুনি তখনই আনন্দের সহিত দেহত্যাগ করিবেন। তারপর তাহার হাড় ক'খানি আনিয়া তাহা দ্বারা বজ্র নামক এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রস্তুত করাইতে হইবে। সে অস্ত্রের ছয়টি কোণ, আর তাহার গর্জন অতি ভীষণ। সেই বজ্র দিয়া বৃত্রকে বধ করিতে, ইন্দ্রের কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না।"

এই কথা শুনিবামাত্র, দেবতাগণ সরস্বতী নদীর তীরে, দধীচ মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া বর প্রার্থনা করিলে, তিনি আহ্লাদের সহিত বলিলেন—

"আমি আপনাদিগকে শুধু হাতে ফিরিতে দিব না। এই আমি দেহত্যাগ করিতেছি।" বলিতে বলিতেই তাঁহার আত্মা দেহ ছাড়িযা চলিয়া গেল। তারপর দেবতারা তাঁহার হাড়

লইয়া বিশ্বকর্মার নিকট চলিয়া আসিলেন।

দেবতারা বলিলেন, "বিশ্বকর্মা, আমরা বজ্র প্রস্তুত করিবার জন্য দধীচ মুনির হাড় আনিয়াছি। তুমি শীঘ্র সেই অস্ত্র গড়িয়া দাও, ইন্দ্র তাহা দ্বারা বৃত্রকে সংহার করিবেন।"

ইহাতে বিশ্বকর্মা অতিশয় আনন্দিত হইয়া, সেই হাড় দিয়া ভয়ঙ্কর বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বজ্র হাতে করিয়া ইন্দ্রের আনন্দ আর উৎসাহের সীমা রহিল না।

তারপর দানবদিগের সহিত দেবতাদের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন কালেয়গণ সোনার কবচ পরিয়া, প্রচণ্ড তেজের সহিত দেবতাদিগকে আক্রমণ করিবামাত্র, তাঁহাদের রাগ আর সাহস কোথায় চলিয়া গেল—তাঁহারা তাহাদের সামনে টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না! এক দিকে দেবতারা এইরূপে পলায়ন করিতেছেন, অপরদিকে বৃত্রাসুরটা রাগে ফুলিয়া পর্বতের মতন বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া ইন্দ্র বেচারা ভয়ে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

এই সময়ে নারায়ণ না থাকিলে আর উপায়ই ছিল না। ইন্দ্রের দুর্দশা দেখিয়া, নারায়ণ নিজের তেজের খানিকটা তাঁহাকে দিলেন। তাহাতে নূতন বল আর সাহস পাইয়া ইন্দ্র মনে করিলেন যে, 'এবারে আর ভয় পাইব না।'

তখন তিনি বজ্র হাতে খুব তেজের সহিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র বৃত্র একটা অতিশয় উৎকট রকমের ডাক ছাড়িল। তাহা শুনিয়া ইন্দ্র ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, দুই চক্ষু বুজিয়া, বজ্রটাকে ছুঁড়িয়া মারিয়া, অমনি দে ছুট! বজ্র কোথায় পড়িল সেটুকু পর্যন্ত দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, তিনি সেখান হইতে পলায়ন পূর্বক একটা পুকুরের ভিতরে ঢুকিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

এদিকে কিন্তু সেই বজ্রের ঘায় তখনই বৃত্র মরিয়া গিয়াছে, আর দেবতাগণ উচ্চৈঃস্বরে ইন্দ্রের বীরত্বের প্রশংসা করিতে করিতে বিশেষ উৎসাহের সহিত দৈত্য মারিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দলপতি মরিয়া যাওয়াতে অসুরেরা নিতান্ত দুর্বল এবং নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই তাহারা আর দেবতাদের সামনে টিকিতে না পারিয়া পলায়ন পূর্বক সমুদ্রের ভিতর গিয়া আশ্রয় লইল। সেইখানে বসিয়া তাহারা পরামর্শ করিল যে, তাহারা সৃষ্টি নষ্ট করিয়া দিবে। কেমন করিয়া নষ্ট করিবে, তাহাও তাহারা স্থির করিতে ভুলিল না।

লোকে যে তপস্যা করে সেই তপস্যার জোরেই সংসার টিকিয়া আছে। সুতরাং দানবেরা স্থির করিল যে, যত তপস্বী আর ধার্মিক লোক আছে, সকলকে সংহার করিতে হইবে, এরূপ করিলেই অল্পদিনের ভিতরে জগৎ নষ্ট হইয়া যাইবে!

ইহার পর হইতেই, দানবের দৌরাত্ম্যে পৃথিবী একেবারে ছারখার হইয়া যাইতে লাগিল। দুষ্ট দানবগণ দিনের বেলায় সমুদ্রের ভিতরে লুকাইয়া থাকিত, রাত্রিতে বাহির হইয়া মুনিঋষিদিগকে ধরিয়া খাইত। এইরূপে বশিষ্ঠের আশ্রমে একশত সাতানব্বই জনকে, চ্যবনের আশ্রমে একশত জনকে আর ভরদ্বাজের আশ্রমে বিশজনকে দানবেরা খাইয়া শেষ করিল। অন্যান্য আশ্রমে কত লোক মারিল, তাহার সংখ্যা নাই। সকাল হইলেই দেখা যাইত, যে, মুনিদিগের হাড় মাংস আর রক্তে চারিদিক ছাইয়া রহিয়াছে।

দানবের ভয়ে লোকেরা সংসার যাত্রা বন্ধ হইয়া গেল। যাহারা পারিল নানাস্থানে পলায়ন করিল। ভীতু লোকেরা অনেকে ভয়েই প্রাণত্যাগ করিল। বীর পুরুষেরা দলে দলে দানবদিগকে

খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাদের সন্ধান পাইলেন না। তখন দেবতাগণ নারায়ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "প্রভো, আপনিই আমাদের আশ্রয়-স্থান। এই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন।"

অগস্ত্যের সাগরপানের কথা

দেবগণের কথা শুনিয়া নারায়ণ বলিলেন, 'ইন্দ্রের হাতে বৃত্রাসুরের মৃত্যু হইলে পর কালেয়গণ তোমাদের ভয়ে পলায়ণ করিয়া সমুদ্রের ভিতরে আশ্রয় লইয়াছে। সেইখান হইতে রাত্রিতে বাহির হইয়া, সৃষ্টি সংহার করিবার নিমিত্ত সেই দুষ্টগণ প্রত্যহ এইরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার করে। দিনের বেলায় উহারা সমুদ্রের ভিতরে লুকাইয়া থাকে। যতদিন উহারা এইরূপে সমুদ্রের ভিতরে লুকাইবার স্থান পাইবে, ততদিন উহাদিগকে বধ করিতেও পারিবে না, অত্যাচারও বারণ হইবে না।

"সুতরাং তোমরা সমুদ্র শুষিবার উপায় দেখ। তাহা ভিন্ন এ বিপদ আর কিছুতেই কাটিবে না। আমি একটিমাত্র লোকের কথা জানি। যাঁহার সাগর শুষিবার ক্ষমতা আছে। তিনি হইতেছেন, মহামুনি অগস্ত্য। এ সংসারে আর কাহারো দ্বারা এ কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

এ কথা শুনিবামাত্র দেবতারা নারায়ণকে ধন্যবাদ দিয়া, অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের নিকট সকল কথা শুনিয়া অগস্ত্য যখন সাগরের জল পান করিবার জন্য যাত্রা করিলেন, তখন আর সংসারের লোক কেহই বসিয়া থাকিতে পারিল না। অগস্ত্যের পিছু পিছু দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সকলে ছুটিয়া সেই আশ্চর্য ব্যাপারের তামাশা দেখিতে আসিল। সমুদ্রের ধারে আসিয়া অগস্ত্য দেবতাগণকে বলিলেন—

"আচ্ছা, আমি সমুদ্রের জল পান করিতেছি। আপনারা আপনাদের কাজ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিবেন।"

এই বলিয়া অগস্ত্য মুনি ক্রোধভরে সাগরের জলপান করিতে লাগিলেন।

না জানি তখন কি ঘোরতর চোঁ চোঁ শব্দ হইয়াছিল এমন অদ্ভুত কাজ দেবতারাও কখনো চক্ষে দেখেন নাই। তাঁহারা আশ্চর্য ত হইয়াছিলেনই, তাহা ছাড়া, যতক্ষণ সেই চোঁ চোঁ শব্দ চলিয়াছিল, ততক্ষণ সকলে মিলিয়া চিৎকার পূর্বক, ক্রমাগতই অগস্ত্যের স্তব করিয়াছিলেন! এইরূপে সমুদয় জল খাওয়া শেষ হলে, দেখা গেল যে, যত রাজ্যের অসুর সমুদ্রের তলায় কিলবিল করিতেছে।

তখন আর বাছাগণ যাইবেন কোথায়? দেবতাদিগের অস্ত্রের ঘায়, দেখিতে দেখিতে পাপিষ্ঠদিগের প্রাণ বাহির হইয়া গেল। কয়েকটা মাত্র পাতালে ঢুকিয়া রক্ষা পাইল।

তারপর দেবতারা, অগস্ত্যকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি ছিলেন, তাই আমরা রক্ষা পাইলাম। আপনার এই অদ্ভুত কাজের জন্য, চিরকালই আমরা আপনার সুখ্যাতি করিব। এখন, সাগর শুকনো পড়িয়া থাকিলে, অনেক অসুবিধা হইতে পারে। সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া তাহার জলটুকু ফিরাইয়া দিন।"

মুনি বলিলেন, "যাহা খাইয়াছি, তাহা ত হজম হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার কি করিয়া

ফিরাইয়া দিব? সাগরে জল আনবার আপনারা অন্য উপায় দেখুন।”

এ কথায় সকলে একটু দুঃখিত হইয়া ঘরে গেলেন। আজকাল সাগরে যখন এত জল দেখা যায়, তখন নিশ্চয় সেই জল আনিবার একটা উপায় হইয়াছিল। কিন্তু তাহার কথা এখন নহে।

দেবতারা অমর হইলেন, বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর অস্ত্র পাইলেন, কিন্তু ইহাতেই যে তাঁহারা অসুরের ভয় হইতে একেবারেই বাঁচিয়া গেলেন, এমন কথা বলা যায় না। কারণ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদের ভালো সেনাপতি ছিল না।

দেবতাগণ যখন ক্রমাগতই অসুরদিগের নিকট হারিয়া যাইতেন, তখন ইন্দ্রের ঠিক এইরূপ কথা মনে হইত। তিনি অনেক সময় এই কথা ভাবিতেন যে, ‘একজন ভাল সেনাপতির দরকার হইয়াছে।’

দেবসেনার কথা

একদিন তিনি মানস পর্বতে বসিয়া, এই বিষয়ের চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একটি স্ত্রীলোকের চিৎকার তাঁহার কানে গেল। তিনি তখনই, ‘ভয় নাই’ বলিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, কেশী নামক একটা দানব একটি বালিকাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহাতে ইন্দ্র কেশীকে তিরস্কার পূর্বক, মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিতে বলিলে, দুষ্ট তাঁহাকে একটি গদা ছুঁড়িয়া মারিল। সেই গদাকে ইন্দ্র অর্ধপথেই বজ্র দিয়া কাটিয়া ফেলাতে কেশী তাঁহাকে একটা পর্বত ছুঁড়িয়া মারিল। পর্বত বজ্রের ঘায়ে খণ্ড খণ্ড হইয়া উলটিয়া কেশীর গায়েই পড়াতে, পাপিষ্ঠ সাংঘাতিক ব্যথা পাইয়া, কন্যাটিকে পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিল!

তারপর সেই কন্যার পরিচয় লইয়া, ইন্দ্র দেখিলেন যে, তিনি তাঁহারই মাসতুত বোন, তাঁহার নাম দেবসেনা। সুতরাং তখন হইতেই তিনি একটি উপযুক্ত পাত্রের সহিত কন্যাটির বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু দেবসেনার সম্বন্ধে আগেই এ কথা জানা ছিল যে, ‘যে ব্যক্তি ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়া দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, সর্প, রাক্ষস প্রভৃতির সকলকে পরাজয় করিতে পারিবেন, তিনিই সেই কন্যাকে বিবাহ করিবেন।’

ইন্দ্র দেখিলেন যে, এমন লোক একটিও সংসারে নাই। সুতরাং তিনি দেবসেনাকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন, “আপনি এই কন্যার জন্য এইরূপ একটি পাত্রের ঠিকানা বলিয়া দিন।”

ব্রহ্মা বলিলেন, “ইন্দ্র, তুমি যেরূপ চাহিতেছ, ঠিক সেইরূপই একটি হইবে। সে এই কন্যাকেও বিবাহ করিবে আর তোমার সেনাপতির কাজও চালাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।”

স্কন্দের কথা

ঠিক এই সময়েই অগ্নি এবং স্বাহাদেবীর স্কন্দ নামক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ইহার আর-এক নাম কার্তিকেয়। খোকাটি নিতান্তই অদ্ভুতরকমের, তেমন আর কেহ দেখেও নাই, শোনেও নাই। খোকার ছয়টি মাতা, বারটি চোখ, বারটি কান, বারটি হাত!

স্বর্গের সুন্দর শরবনে খোকাটিকে রাখিয়া, কৃত্তিকারা ছয়জনে মিলিয়া পরম স্নেহে তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যত্নে চারিদিনের ভিতরে সেই খোকা মস্ত হইয়া উঠিল। মহাদেব যে ধনুক দিয়া দানব মারিতেন, সেই বিশাল ধনুক হাতে লইয়া খোকা গর্জন করিল; ত্রিভুবনের ভিতরে কেহই সে গর্জন শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিল না।

চিত্র ও ঐরাবত নামক ইন্দ্রের দুইটি হাতি সেই গর্জন শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া খোকা, দুই হাতে শক্তি এবং আর দুই হাতে তাম্রচূড় এবং কুক্কুট নামক দুইটি অস্ত্র লইয়া ঘোরতর গর্জন পূর্বক লাফাইতে লাগিল। আর দুই হাতে এই বড় একটা শাঁখ লইয়া ফুঁ দিল। আর দুই হাতে আকাশের খেলায় ধুপ্ ধাপ্ করিয়া বিষম চাপড় আরম্ভ করিল! তখন হাতির পুত্রেরা, লেজ খাড়া করিয়া, কোন্‌দিকে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না।

তারপর স্কন্দ ধনুক হাতে লইয়া একটা তীর ছুঁড়িবামাত্র, তাহার ঘায় ক্রৌঞ্চ -পর্বতের মাথা উড়িয়া গেল।

সেকালের পর্বতগুলির প্রাণ ছিল। তাহারা পাখির মত উড়িতেও পারিত। স্কন্দের তাড়া খাইয়া যখন তাহারা সকলে মিলিয়া কাকের মতন চ্যাঁচাইতে আর উড়িতে আরম্ভ করিল, তখন না জানি ব্যাপারখানা কিরকম হইয়াছিল।

এদিকে দেবতাগণ ইন্দ্রকে বলিলেন, "হে দেবরাজ, এই খোকা বড় হইলে আপনার ইন্দ্রপদ কাড়িয়া লইবে। সুতরাং এই বেলা শীঘ্র ইহাকে বধ করুন।"

ইন্দ্র বলিলেন, "দেবগণ আমার ত মনে হয় যে, এ খোকা ইচ্ছা করিলে বুঝি ব্রহ্মাকেও মারিয়া ফেলিতে পারে। এমত অবস্থায় আমি কি করিয়া ইহাকে বধ করিব?"

দেবতারা বলিলেন, "কেন? লোকমাতা সকলকে পাঠাইয়া দিলেই ত তাঁহারা ছেলেটিকে খাইয়া ফেলিতে পারেন।"

'লোকমাতা' যাঁহাদের নাম, তাঁহাদের কাজ এমন নিষ্ঠুর হইবার কারণ কি? তাহা আমি বলিতে পারি না। যাহা হউক স্কন্দকে বধ বা ভক্ষণ করা দূরে থাকুক, তাঁহারা তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমাকে দেখিয়া আমাদের বড়ই স্নেহ হইয়াছে; তুমি আমাদিগকে মা বলিয়া ডাক।"

তাহা দেখিয়া ইন্দ্র নিজেই অসংখ্য সৈন্য সমেত, ঐরাবতে চড়িয়া স্কন্দকে সংহার করিতে আসিলেন। কিন্তু স্কন্দ সৈন্য দেখিয়া, বা তাহাদের গর্জন শুনিয়া, ভয় পাইবার মতন খোকা নহেন। বরং তাঁহারই সিংহনাদ শুনিয়া সৈন্যদের মাথায় গোল লাগিয়া গেল! তারপর স্কন্দের মুখ হইতে আগুন বাহির হইয়া, সেই-সকল সৈন্যের ঢাল তলোয়ার আর দাড়ি গোঁফ পোড়াইতে আরম্ভ করিলে, তাহারা আর ইন্দ্রের দিকে না চাহিয়া, দুহাতে স্কন্দকেই সেলাম

কবিতে লাগিল। তখন দেবতাবাও বেগতিক দেখিয়া ইন্দ্রকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

তখন ইন্দ্র বলিলেন, 'তাই ত এই নিতান্ত অশিষ্ট খোকাটাকে ত বধ না কবিলে চলিতেছে না। কোথায় বে আমাব বজ্র।' বলিতে বলিতে তিনি স্কন্দকে বজ্র ছুঁড়িয়া মাবিলেন। তিনি জানিতেন না যে, ইহাতে হিতে বিপবীত হইবে। বজ্র স্কন্দেব গায় লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাব মৃত্যু হওয়াব বদলে তাঁহাব শবীব হইতে বিশাখ নামক একজন অতি ভয়ঙ্কব পুরুষ, শক্তি হাতে বাহিব হইয়া, ইন্দ্রেব সহিত যুদ্ধ কবিতে প্রস্তুত হইলেন। কাজেই তখন ইন্দ্র জোডহাতে বলিলেন "আব কাজ নাই, আমাব ঢেব হইয়াছে। খোকা, আমাকে ক্ষমা কব।"

তাহা শুনিয়া স্কন্দ বলিলেন, আচ্ছা তবে আব আপনাদেব কোন ভয় নাই।

স্কন্দেব তখন ছয় দিন মাত্র বয়স হইয়াছে, ইহাবই মধ্যে তাঁহাব এত বিক্রম। তাহা দেখিয়া বড বড মুনিবা আসিয়া স্কন্দকে বলিলেন তোমাব যখন এত তেজ, তখন তুমিই ইন্দ্র হইয়া স্বর্গ শাসন কব।'

তাহা শুনিয়া স্কন্দ বলিলেন 'আপনাবা যাহা বলিলেন তাহা হইলে, আমাব কি কবিতে হইবে?'

মুনিগণ বলিলেন "ইন্দ্র হইলে দুষ্ট লোককে সাজা দিতে হইবে, আব যাহাতে সংসাব ভালবকম চলে তাহা দেখিতে হইবে"

স্কন্দ বলিলেন অত কঞ্ঝাটে আমাব কাজ নাই, আমি ইন্দ্র হইতে পাবিব না

তখন ইন্দ্র বলিলেন, বাবা তোমাব শক্তি অতিশয় অদ্ভুত অতএব তুমিই এখন হইতে ইন্দ্রপদ লইয়া দেবতাদেব শত্রুদিগকে বধ কব

তাহাতে স্কন্দ বলিলেন সে কি কথা? আপনিই ত্রিভুবনেব বাজা, আমি আপনাব আশ্রয়ে থাকিয়া আপনাব আজ্ঞা পালন কবিব। এখন কি কবিব, অনুমতি করুন।'

ইন্দ্র বলিলেন, "তবে তুমি আমাব সেনাপতি হও।"

এ কথায় স্কন্দ আহ্লাদেব সহিত সম্মত হইলে, তখনই তাঁহাকে দেবতাগণেব সেনাপতি কবিয়া দেওয়া হইল। সে সময়ে সকলে মিলিয়া যে খুব আনন্দ কবিয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পাবা যায়, তাহাব কথা বেশি কবিয়া বলাব প্রয়োজন দেখি না।

তাবপব স্কন্দ কাঞ্চন পর্বতে পবম সুখে বাস কবিতে লাগিলেন। স্বর্গে যতবকম আশ্চর্য এবং সুন্দব খেলনা পাওয়া যাইত, দেবতাবা তাহাব সমস্তই তাঁহাকে আনিয়া দিতেন। চুষি, ঝুমঝুমি, হাতি, ঘোডা, ঢোল, পটকা, ভেঁপু প্রভৃতি বিশ্বকর্মা নিশ্চয়ই খুব চমৎকাব কবিয়া গডিতে পাবিতেন। তাহা ছাডা, ঐবাবতেব গলাব একটা ঘণ্টাও ইন্দ্র তাঁহাকে দিয়াছিলেন, তাহা লইয়া নাডাচাডা কবিতে তাঁহাব যে বডই ভাল লাগিত, এ কথা আমি নিশ্চয় কবিয়া বলিতে পাবি।

এইখানে আবাব সেই দেবসেনা নাম্নী কন্যাব কথা বলি। ব্রহ্মা যে বলিয়াছিলেন, 'উহাব উপযুক্ত পাত্র একটি হইবে', এ কথা তিনি স্কন্দেব কথা ভাবিয়াই বলিযাছিলেন। সুতবাং শেষে স্কন্দেব সহিতই সেই কন্যাব বিবাহ হইয়াছিল।

ইহাব মধ্যে একদিন পর্বতাকাব অসংখ্য দানব আসিয়া দেবগণকে আক্রমণ কবিল, সে সময়ে স্কন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, সুতবাং দানবেবা যে প্রথমে দেবগণকে নিতান্তই

ব্যতিব্যস্ত কবিয়া তুলিবে, ইহা আশ্চর্য নহে। দানবেব তাড়ায তাঁহাবা পথহাবা শিশুব ন্যায অস্থিব হইয়া উঠিলেন।

মাঝে ইন্দ্রেব উৎসাহে, তাঁহাবা একটু স্থিব হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাব পবই যখন মহিষাসুব নামক একটা অতি ভীষণ দৈত্য বিশাল পর্বত হাতে তাঁহাদেব উপব আসিয়া পড়িল, তখন আব তাঁহাবা পলাইবাব পথ খুঁজিযা পান না। এবাবে ইন্দ্রেব আব দেবতাগণকে উৎসাহ দেওযাব কথা মনে ছিল না। সুতবাং তাঁহাদেব সঙ্গে জুটিযা তিনিও পলাযন কবিলেন।

সেখানে মহাদেব ছিলেন, তিনি অবশ্য পলাযন কবেন নাই। সামান্য একটা অসুব দেখিযা ব্যস্ত হওযাব অভ্যাস তাঁহাব ছিল না তিনি পলাযনও কবিলেন না, যুদ্ধও কবিলেন না, খালি চাহিযা দেখিতে লাগিলেন অসুবেবা কি কবে।

মহিষাসুব ছুটিযা আসিয়া মহাদেবেব বথেব ধুব (অর্থাৎ যাহাকে গাড়োযানেবা 'বম' বলে) কাড়িযা লইল। মহাদেবেব তথাপি গ্রাহ্য নাই। তিনি মনে ভাবিতেছেন যে 'আমি আব এটাকে কিছু বলিব না এখনই স্কন্দ আসিযা ইহাব ব্যবস্থা কবিবে।

এমন সময লাল কাপড় এবং লাল মালা পবিযা সোনাব বর্ম গাযে সোনাব বথে চড়িযা স্কন্দ সূর্যেব ন্যায তেজেব সহিত বণস্থলে আসিযা উপস্থিত হইলেন। তাবপব একটা জ্বলন্ত শক্তি হাতে লইযা তিনি তাহা মহিষাসুবকে ছুঁড়িযা মাবিতেই দুষ্ট দানবেব মাথা কাটিযা পড়িল। সে মাথা পড়িযা গিযা উত্তব কুব নামক দেশে উত্তব কবব সিংহ দবজা, যাহা যোজন চওড়া ছিল মহিষাসুবেব প্রকাণ্ড মাথা পড়িযা সেই ষোল যোজন চওড়া বিশাল দবজা বন্ধ হইযা গেল। তাহাব ভিতব দিযা যে লোক যাওযা আসা কবিত, তাহাব উপায বহিল না

তাবপব অবশিষ্ট দানবদিগকে বধ কবিতে স্কন্দেব অতি অল্প সময়ই লাগিয়াছিল।

এইরূপে সৃষ্টিব প্রথম হইতেই দেবতা আব অসুবেব বিবাদ চলিযা আসিতেছিল। সে বিবাদ কত দিনে থামিযাছিল সে বিষয়ে কোন কথা শুনিতে পাওযা যায না। দ্বাপব যুগেও যে সে বিবাদ খুব ভাল কবিযাই চলিযাছিল, মহাভাবতে এ কথা স্পষ্ট লেখা আছে নিবাতকবচ নামক একদল দৈত্য সমুদ্রেব ভিতবে দুর্গ প্রস্তুত কবিযা ইন্দ্রকে বড়ই জ্বালাতন কবিতে আবম্ভ কবে। অর্জুন যখন অস্ত্র আনিবাব জন্য স্বর্গে গিযাছিলেন, তখন এই সকল দৈত্যেব সহিত তাঁহাব যুদ্ধ কবিতে হয। যুদ্ধে অর্জুনেবই জয হইযাছিল কিন্তু তিনিও দৈত্যদিগকে মাবিযা শেষ কবিতে পাবিযাছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কাবণ, দেখা যায যে, ইহাব অতি অল্প দিন পবেই দুর্যোধনেব সঙ্গে দৈত্যদিগেব খুব বন্ধুতা হইযাছিল। পাণ্ডবদিগেব দযায চিত্রসেন নামক গন্ধর্বেব হাত হইতে বক্ষা পাইযা দুর্যোধন যখন প্রাণত্যাগ কবিতে চাহিযাছিলেন, তখন দৈত্যেবা তাঁহাকে শান্ত কবিবাব জন্য অনেক চেষ্টা কবে।

কদ্রু ও বিনতার কথা

কদ্রু আব বিনতা দক্ষেব কন্যা। মবীচিব পুত্র কশ্যপেব সহিত ইঁহাদিগেব বিবাহ হইযাছিল। একদিন কশ্যপ ইঁহাদের উপব সন্তুষ্ট হইযা বলিলেন-

"আমি তোমাদিগকে বব দিব, তোমবা কি বব চাহ?"

এ কথায কদ্রু বলিলেন "আমাব যেন এক হাজাবটি পুত্র হয।"

বিনতা বলিলেন, "আমি দুটিব বেশি পুত্র চাহি না। কিন্তু সেই দুটি পুত্র যেন কদ্রুব একহাজাব পুত্রেব চেযে বীব হয।"

কদ্রু আব বিনতাব কথা শুনিযা কশ্যপ বলিলেন, "আচ্ছা! তোমবা যেমন চাহিতেছ তেমনি হইবে।"

অনেক দিন পবে, কদ্রুব এক হাজাবটি, আব বিনতাব দুটি ডিম হইল। তাবপব আব পাঁচশত বৎসব চলিযা গেল, কদ্রুব ডিমগুলি ফুটিযা এক হাজাবটি পুত্র বাহিব হইল। কিন্তু বিনতাব ডিম দুটি হইতে তখনো কিছু বাহিব হইল না।

কদ্রুব ডিমগুলি সবই ফুটিল আব বিনতাব একটি ডিমও ফুটিল না, ইহাতে বিনতাব বডই দুঃখ আব লজ্জা হইল। তখন তিনি আব বিলম্ব সহিতে না পাবিযা নিজহাতেই তাঁহাব দুটি ডিমেব একটি ভাঙ্গিযা ফেলিলেন। সেই ডিমেব ভিতবে তাহাব যে পুত্রটি ছিল, তাহাব শবীবেব সকল স্থান তখনো ভাল কবিযা মজবুত হয নাই। তাহাব উপবকাব অর্ধেক বেশ মজবুত হইযাছিল, কিন্তু নীচেব অর্ধেক তখনো নিতান্তই কাচা ছিল। ছেলেটি বাহিব হইযা যাব পব নাই দুঃখ ও বাগেব সহিত তাহাব মাতাকে বলিল

"মা, তুমি [illegible] কিতে বাহিব কবিযা কেন আমাব সর্বনাশ কবিলে? যাহা হউক, তুমি যখন [illegible] কবিতে গিযা আমাব এমন ক্ষতি কবিযাছ, তখন আমিও তোমাকে শাপ দিতেছি [illegible] তোমাকে পাঁচ শত বৎসব এই কদ্রুব দাসী হইযা থাকিতে হইবে।"

তাবপব সেই ছেলেটি আবাব বলিল "আব একটি ডিম যে আছে, তাহাকে যেন এমন [illegible] উহাব ভিতব তোমাব যে পুত্র আছে, তাহাব দ্বাবাই তোমাব দাসী হওযা [illegible] তাহাকে যদি বলশালী কবিতে চাহ, তবে, ডিমটি আপনা [illegible] অপেক্ষা কবিযা থাক। উহা ফুটিতে আবো পাঁচশত বৎসব আছে।"

[illegible] নিকট চলিযা গেল। ছেলেটিব নাম অরুণ, সূর্যেব নিকট গিযা সে তাহাব সাবথি হইল। সেই কাজ সে এখনো কবিতেছে। সূর্যদেব যেমন সমান ওজনে চলা ফেবা কবেন, তাহাতে নিশ্চয বুঝা যায যে, অরুণ তাঁহাব কাজ বেশ ভাল কবিযাই কবিতেছে।

অরুণ যে আকাশে উডিযা গেল ইহাব মধ্যে আশ্চর্য হইবাব কিছুই নাই। অরুণ মানুষ ছিল না, সে পাখি ছিল। আব কদ্রুব সেই এক হাজাব ছেলেও যে মানুষ ছিল, তাহা নহে, তাহাবা ছিল সাপ।

অরুণ বিনতাকে শাপ দিযা চলিযা গেল। তাবপব কি হইল শুন।

ইন্দ্রেব উচ্চৈঃশ্রবাঃ নামক একটা সাদা ঘোডা ছিল। একদিন কথায কথায কদ্রু বিনতাকে বলিলেন, "বল দেখি, উচ্চৈঃশ্রবাঃব কিরূপ বর্ণ।"

বিনতা বলিলেন, "কেন? সাদা।"

কদ্রু বলিলেন, "হইল না। উহাব শবীব সাদা কিন্তু লেজ কালো।"

বিনতা বলিলেন, "বাজি বাখ।"

কদ্রু বলিলেন, "আচ্ছা বাখ বাজি। যাহাব কথা মিথ্যা হইবে, সে পাঁচ শত বৎসব অন্য

জনের দাসী হইয়া থাকিবে।"

এমনি করিয়া বাজি রাখা হইল, আর স্থির হইল যে, পরদিন দুইজনে মিলিয়া ঘোড়াটাকে দেখিতে যাইবেন। অবশ্য উচ্চৈঃশ্রবাঃ যে সাদা, এ কথা সকলেই জানে। কদ্রুও যে এ কথা না জানিতেন, এমন নহে। তাঁহার মনে দুষ্ট অভিসন্ধি ছিল, এজন্য তিনি জানিয়া শুনিয়াই বলিয়াছিলেন, "উচ্চৈঃশ্রবাঃর লেজ কালো।"

বিনতার সঙ্গে বাজি রাখিয়া কদ্রু চুপি চুপি তাঁহার ছেলেদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছাসকল, আমি ত বিনতার সঙ্গে এইরকম বাজি রাখিয়া আসিয়াছি। কাল গিয়া যদি উচ্চৈঃশ্রবাঃর লেজ কালো দেখিতে না পাই, তবেই কিন্তু আমাকে পাঁচ শত বৎসর দাসী হইয়া থাকিতে হইবে। তোমরা এই বেলা গিয়া, কালো কালো সুতার মতন হইয়া উহার লেজ ধরিয়া ঝুলিতে থাক। এমনি করিয়া তাহার লেজটাকে কালো করিয়া দেওয়া চাই, নইলে আমার বড়ই বিপদ।"

কদ্রুর কথায় দলে দলে সরু সরু কালো সাপ গিয়া উচ্চৈঃশ্রবাঃর লেজ ধরিয়া ঝুলিয়া থাকিলে, সেই লেজের রং দূর হইতে কালোই দেখা যাইতে লাগিল। কতগুলি সাপ কদ্রুর কথা মত কাজ করিতে রাজি হয় নাই। তাহাদিগকে তিনি এই বলিয়া শাপ দিলেন, "তোরা জন্মেজয় রাজার যজ্ঞের আগুনে পুড়িয়া মারা যাইবি।"

পরদিন প্রাতঃকালে কদ্রু আর বিনতা দুজনে মিলিয়া উচ্চৈঃশ্রবাঃকে দেখিতে চলিলেন। বিনতা মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই উচ্চৈঃশ্রবাঃকে সাদা রঙের দেখিতে পাইবেন। কিন্তু ঘোড়ার নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, উহার লেজটি মিস্‌মিসে কালো।

তখন কদ্রু বলিলেন, "কেমন? বড় যে বলিয়াছিলে, ঘোড়াটি সাদা। দেখত উহার লেজটি কি রঙের। এখন আইস। আমার ঘর ঝাঁট দাও আসিয়া!"

ইহাতে বিনতা নিতান্তই আশ্চর্য এবং দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু বাজি যখন হারিয়াছেন, তখন ত আর কদ্রুর দাসী না হইয়া উপায় নাই! কাজেই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দাসীর কাজই করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পাঁচশত বৎসর পরে বিনতার অপর ডিমটি ফুটিলে তাহার ভিতর হইতেও একটি পক্ষী বাহির হইল। এই পক্ষীটির নাম ছিল গরুড়।

কশ্যপ হইতেই অধিকাংশ জীবের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সন্তানেরা যে, কেহ দেবতা, কেহ অসুর, কেহ মানুষ, কেহ জানোয়ার, কেহ সাপ, আর কেহ পাখি হইবে, ইহা ত ধরা কথা! কিন্তু এই গরুড় যে পাখি হইয়াছিল, মহাভারতে তাহার একটা বিশেষ কারণের কথা আছে।

গরুড়ের কথা

একবার মহামুনি কশ্যপ, পুত্র লাভের জন্য, খুব ঘটা করিয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন। দেবতা এবং মুনিগণ সকলে মিলিয়া সেই যজ্ঞে কাজ করিতে আসেন।

যজ্ঞের সকল কাজ ইঁহাদিগের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইল। যাঁহারা কাঠ আনিবার ভার

লইলেন, ইন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইঁহাদের মধ্যে বালখিল্য নামক একদল মুনিও ছিলেন।

এই বালখিল্যদিগের মতন আশ্চর্য মুনি আর কখনো হইয়াছে কিনা সন্দেহ। দেখিতে ইঁহারা নিতান্তই ছোট ছোট ছিলেন। কত ছোট, তাহা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। কেহ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা 'অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ' (অর্থাৎ বুড়ো আঙুলের মত ছোট) ছিলেন। কিন্তু এ কথা যে একেবারে ঠিক নয়, তাহার প্রমাণ এই একটা ঘটনাতেই পাওয়া যাইতেছে—

ইঁহাদের দলে কয়জন ছিলেন, জানি না। কিন্তু দেখা যায় যে কশ্যপ মুনির যজ্ঞের জন্য কাঠ কুড়াইতে গিয়া, তাহারা সকলে মিলিয়া অতি কষ্টে একটি পাতার বোঁটা মাত্র বহিয়া আনিতেছিলেন। তাহাও আবার, পথে এক দুর্ঘটনা হওয়াতে, তাহারা যজ্ঞ স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন নাই।

দুর্ঘটনাটা একটু ভারিরকমের। গরুর পায়ের দাগ পড়িয়া, পথে ছোট ছোট গর্ত হইয়াছিল, সেই গর্তগুলিতে বৃষ্টির জল দাঁড়াইয়াছিল। পাতার বোঁটা লইয়া ঠেলাঠেলি করিতে করিতে, বালখিল্য ঠাকুরেরা সেই বোঁটা সুদ্ধ সকলে, সেই গর্তের একটার ভিতর গড়াইয়া পড়িয়াছেন, তারপর আর তাহার ভিতর হইতে উঠিতে পারেন না।

এই সময়ে ইন্দ্র পর্বত প্রমাণ কাঠের বোঝা লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনিদিগের দুর্দশা দেখিয়া তাঁহার বড়ই আশ্চর্য বোধ হইল, আর হাসি পাইল। পিপীলিকার মতন মুনিগণকে দেখিয়া তাহার একেবারেই গ্রাহ্য না হওয়াতে, সেই হাসি আর তিনি থামাইতে চেষ্টা করেন নাই। ইহার উপর আবার একটু আধটু ঠাট্টাও যে না করিয়াছিলেন, এমন নহে শেষে আবার উঁহাদিগকে ডিঙাইয়া চলিয়া আসেন।

মুনির সম্মান ত আর শরীরের লম্বা চওড়া দিয়া হয় না তাহাদিগের সম্মান আর ক্ষমতা তাঁহাদের তপস্যার ভিতরে। বালখিল্যদিগের মতন তপস্বী খুব কমই ছিল। আর তাঁহাদের ক্ষমতা যে কিরূপ ছিল তাহার পরিচয়ও তাঁহারা তখনই দিলেন।

ইন্দ্রের ব্যবহারে অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া, তাঁহারা, উঁহার চেয়ে অনেক বড় আর এক ইন্দ্র জন্মাইবার জন্য, যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এ কথা জানিবামাত্রই ইন্দ্রের ভয়ের আর সীমা নাই। তিনি তাড়াতাড়ি কশ্যপের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'বাবা, এখন আপনি না বাঁচাইলে, আর উপায় দেখিতেছি না।'

ইন্দ্র কশ্যপের পুত্র (বারজন আদিত্যের মধ্যে যাঁহার নাম শক্র তিনিই ইন্দ্র)সুতরাং পুত্রের জন্য তাঁহার দয়া না হইবে কেন? কশ্যপ ইন্দ্রের সকল কথা শুনিয়া বালখিল্যদিগের নিকট গিয়া বলিলেন -

"মুনিগণ, আপনাদের তপস্যা বৃদ্ধি হউক। আমি একটি কাজ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আশীর্বাদ করুন, যেন আমার কাজটি হয়।

সত্যবাদী বালখিল্যগণ তখনই বলিলেন, 'আপনার কার্যসিদ্ধ হইবে।'

তাহা শুনিয়া কশ্যপ তাঁহাদিগকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বলিলেন যে "দেখুন, ব্রহ্মা আমার এই পুত্রটিকে ইন্দ্র করিয়া দিয়াছেন। এখন, আপনারা যদি ইহাকে যজ্ঞ করিয়া তাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে ত ব্রহ্মার কথা মিথ্যা হইয়া যায়। আপনাদের যজ্ঞ বৃথা হয়, ইহা কখনই আমার ইচ্ছা নহে। আপনারা যে একটি ইন্দ্র করিতে চাহিয়াছেন, তাহা হইবেই। তবে আমি এই চাহি যে সে ইন্দ্র আমাদিগের ইন্দ্র না হইয়া পাখির ইন্দ্র হউক। দেখুন, ইন্দ্র মিনতি করিতেছেন

আপনারা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হউন।"

ধার্মিকের রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। সুতরাং কশ্যপের কথায় বালখিল্যগণ তখনই আহ্লাদের সহিত ইন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন। তারপর তাঁহারা কশ্যপকে বিনয় করিয়া বলিলেন যে, "আমরা দুইটি জিনিসের জন্য এই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলাম, নতুন একটি ইন্দ্র, আর আপনার একটি পুত্র। এ অবস্থায় আপনার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহা করুন।"

সুতরাং স্থির হইল যে, এই নূতন ইন্দ্রটি যেমন পাখির ইন্দ্র হইবে, তেমনি কশ্যপের পুত্রও হইবে। সেই পুত্রই গরুড়, সে পক্ষিগণের ইন্দ্র।

গরুড়ের শরীর অতিশয় প্রকাণ্ড ছিল, আর তাহা সে ইচ্ছামত ছোট বড় করিতে পারিত। আগুনের মত লাল আর উজ্জ্বল তাহার গায়ের রঙ ছিল। সে বিদ্যুতের মতন বেগে ছুটিতে পারিত, আর যখন যেমন ইচ্ছা রূপ ধরিতে পারিত। জন্মমাত্রেই সে আকাশে উঠিয়া, আনন্দে চিৎকার করিতে লাগিল।

এদিকে দেবতারা গরুড়কে দেখিয়া মনে করিলেন যে, উহা বুঝি আগুন। তাই তাহারা ব্যস্ত ভাবে অগ্নির নিকট গিয়া বলিলেন, "আজ কেন তোমার এত তেজ দেখিতেছি? তুমি কি আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার ইচ্ছা করিয়াছ?"

এ কথা শুনিয়া অগ্নি বলিলেন, "আপনার ব্যস্ত হইবেন না। উহা আগুন নহে কশ্যপের পুত্র গরুড়। ইনি দেবতাদিগের উপকারী বন্ধু, সুতরাং আপনাদের কোন ভয় নাই।"

তখন তাঁহারা সকলে গরুড়ের নিকট গিয়া তাহার নানারূপ প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন, "বাপু তোমাকে দেখিয়া আমরা বড়ই ভয় পাইয়াছি, আর তোমার তেজে অস্থির হইয়াছি। সুতরাং তুমি দয়া করিয়া তোমার শরীরটাকে একটু ছোট কর, আর তেজ একটু কমাও।"

তাহাতে গরুড় বলিল, "এই যে, মহাশয়, আমি এখন ছোট হইয়া গিয়াছি। আপনাদের আর ভয় পাইতে হইবে না।" এই বলিয়া সে তাহার মাতা বিনতার নিকট চলিয়া গেল।

বিনতার দিন যে তখন কি দুঃখে যাইতেছিল, তাহা না বলিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না। বাসন মাজা, জল টানা প্রভৃতি দাসীর যে কাজ, তাহা ত তাঁহাকে করিতেই হইত। ইহার উপর আবার কদ্রু যখন তখন বলিয়া বসিতেন, "আমি অমুক জায়গায় যাইব, আমাকে পিঠে করিয়া লইয়া চল।"

একদিন বিনতা গরুড়ের নিকট বসিয়া আছেন এমন সময় কদ্রু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বিনতা, সমুদ্রের মধ্যে একটা অতি সুন্দর দ্বীপ আছে, সেখানে অনেক নাগ বাস করে। আমাকে সেইখানে লইয়া যাইতে হইবে।"

তখনই কদ্রু বিনতার পিঠে উঠিয়া বসিলেন, আর কতকগুলি সাপ (কদ্রুর পুত্র) গরুড়ের পিঠে গিয়া চড়িল। তাহাদিগকে লইয়া দুইজনকে সেই দ্বীপে যাইতে হইল।

দ্বীপে গিয়া সাপেরা কিছুকাল আমোদ আহ্লাদ করিয়া গরুড়কে বলিল, "তুমি আকাশে উড়িতে পার, তোমার ত না জানি ইহার চেয়ে কতই ভাল ভাল জায়গার কথা জানা আছে। সেই-সকল জায়গায় আমাদিগকে লইয়া চল।"

ইহাতে গরুড় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সাপেরা কেন এমন করিয়া আমাকে আজ্ঞা দিবে, আর আমাকেই বা কেন তাহা মানিতে হইবে, তাহা

বল?"

বিনতা বলিলেন, "বাছা, পণে হারিয়া আমি উহাদের দাসী হইয়াছি, তাই উহারা আমাদিগকে এমন করিয়া খাটাইয়া লয়।"

ইহাতে যে গরুড়ের মনে খুব কষ্ট হইল, তাহা বুঝিতেই পার। সে তখনই সাপদের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হে সর্পগণ, কি হইলে তোমরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পার?"

সর্পেরা বলিল, 'যদি তুমি অমৃত আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব।'

এ কথায় গরুড় তাহার মাকে বলিল "মা আমি অমৃত আনিতে চলিলাম, পথে কি খাইব, বলিয়া দাও।

বিনতা বলিলেন "বাছা সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার নিষাদ (শিকারী ব্যাধ) বাস করে, তুমি তাহাদিগকে খাইও। কিন্তু সাবধান। কখনো যেন ব্রাহ্মণকে খাইও না।"

গরুড় বলিল 'মা ব্রাহ্মণ কিরকম থাকে? আর সে কি করে? সে কি বড় ভয়ানক?"

বিনতা বলিলেন, "যাহাকে খাইলে তোমার পেটের ভিতরে ছুঁচের মত ফুটিবে, গলায় আগুনের মত জ্বালা হইবে তিনিই জানিবে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের বড় অদ্ভুত ক্ষমতা, নিতান্ত বিপদে পড়িলেও তাহাকে মুখে দিও না। যাও বাছা তোমার মঙ্গল হউক।"

এইরূপে মায়ের নিকট বিদায় লইয়া গরুড় অমৃত আনিতে যাত্রা করিল খানিক দূরে গিয়াই সে দেখিল যে, তাহার ভারি ক্ষুধা হইয়াছে। কিছু আহার না করিলে আর চলে না। তখন সে চারিদিক চাহিয়া দেখিল নিকটেই একটা নিষাদের গ্রাম দেখা যাইতেছে। তাহা দেখিবামাত্র, সে, সেই গ্রামের পথে তাহার সেই বিশাল মুখখানি মেলিয়া রাখিয়া, দুই পাখায় বাতাস করিতে লাগিল। কি ভীষণ বাতাসই সে করিয়াছিল। সে বাতাসে ঝড় বহিয়া, ঘূর্ণী বায়ু ছুটিয়া, ধূলা উড়িয়া গ্রামখানি সুদ্ধ একেবারে তাহার মুখের ভিতরে আনিয়া উপস্থিত, এখন মুখ বন্ধ করিয়া তাহা গিলিলেই হয়।

নিষাদের গ্রাম খাইয়া গরুড়ের পেট একটুও ভরিল না, লাভের মধ্যে গলা জ্বলিয়া বেচারার কষ্টের এক শেষ হইল। সে এমনি ভয়ানক জ্বালা যে, আর একটু হইলেই, হয়ত গলা পুড়িয়া যাইত। গরুড় ভাবিল, "কি আশ্চর্য। একগাল জল-খাবার খাইলাম, তাহাতে কেন এত জ্বালা? তবে বা কোন খান দিয়া একটা ব্রাহ্মণ আমার পেটের ভিতর ঢুকিয়া গেল। মা ত ব্রাহ্মণ খাইলেই এমনি জ্বালা হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন।" এই ভাবিয়া সে বলিল, ঠাকুর মহাশয়। আপনি শীঘ্র বাহিরে আসুন আমি হা করিতেছি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমার স্ত্রীও যে আছে। আমি একেলা কেমন করিয়া বাহির হইব?"

গরুড় বলিল, "শীঘ্র আপনার স্ত্রীকে লইয়া বাহিরে আসুন। বিলম্ব হইলে হজম হইয়া যাইবেন।"

ব্রাহ্মণকে তাড়া দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তিনি খুবই শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলেন। গরুড়ের গলাও তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা হইল। তখন ঠিক একসঙ্গে ব্রাহ্মণও বলিলেন, "কি, বিপদ।" গরুড়ও বলিল, "কি, বিপদ।"

তারপর ব্রাহ্মণ গরুড়কে ধন্যবাদ দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, গরুড়ও আবার অমৃত আনিতে যাত্রা করিল। সে সময় তাহার পিতা কশ্যপ সেই পথে যাইতে ছিলেন,

সুতরাং খানিক দূর গিয়াই দুইজনে দেখা হইল। কশ্যপ গরুড়কে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "কেমন আছ বৎস? তোমার যথেষ্ট আহার জোটে ত?"

গরুড় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "ভগবন্; আমি ভালই আছি, কিন্তু আহার ত আমার ভাল করিয়া জোটে না! মাকে সাপদিগের হাত হইতে ছাড়াইবার জন্য আমি অমৃত আনিতে চলিয়াছি। মা বলিয়াছিলেন, পথে নিষাদ খাইতে। নিষাদ অনেকগুলি খাইলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কিছুই হইল না! ভগবন্, দয়া করিয়া আমাকে আর কিছু খাবার জিনিসের কথা বলিয়া দিন্। ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে, পিপাসায় তালু শুকাইয়া গিয়াছে।

এ কথা শুনিয়া কশ্যপ বলিলেন, "বৎস, ঐ যে একটি প্রকাণ্ড সরোবর দেখা যাইতেছে, ওখানে গেলে পর্বত-প্রমাণ একটি কচ্ছপ আর তাহার চেয়েও বড় একটি হস্তি দেখিতে পাইবে। পূর্বজন্মে ইহারা বিভাবসু আর সুপ্রতীক নামে দুই ভাই ছিল। ইহাদেব পিতা কিছু টাকাকড়ি রাখিয়া যান, ছোটভাই সুপ্রতীক সেই টাকা তাহাকে ভাগ করিয়া দিবার জন্য, বড় ভাই বিভাবসুকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিত। বিভাবসু রাগী লোক ছিল, তাই সে সুপ্রতীকের পীড়াপীড়িতে অত্যন্ত চড়িয়া গিয়া, তাহাকে শাপ দিল যে, তুই মরিয়া হাতি হইবি!" ইহাতে সুপ্রতীক বলিল, "তুমি মরিয়া কচ্ছপ হইবে।"

"এখন সেই দুইভাই বিশাল হাতি আর প্রকাণ্ড কচ্ছপ হইয়াছে। ঐ শুন, হাতিটা সরোবরের কাছে আসিয়া কি ভয়ঙ্কর গর্জন আরম্ভ করিয়াছে, আর তাহা শুনিয়া কচ্ছপটা সরোবরের জল তোলপাড় করিয়া, কেমন রাগের সহিত উঠিয়া আসিতেছে, দেখ। ঐ দেখ, উহাদের কি বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল! হাতিটা ছয় যোজন উঁচু আর বার যোজন লম্বা। কচ্ছপটা তিন যোজন উঁচু, আর তাহার বেড় দশ যোজন: এ দুটাকে খাইতে পারিলে তোমার পেটও ভরিবে, গায়ও খুব জোর হইবে।"

এই বলিয়া গরুড়কে আশীর্বাদ পূর্বক, কশ্যপ চলিয়া গেলেন। তারপর গরুড়ও এক নখে হাতি, আর এক নখে কচ্ছপটাকে লইয়া, আবার আকাশে উড়িল। তখন তাহাব চিন্তা হইল যে, 'কোথায় বসিয়া এদুটাকে ভক্ষণ করা যায়।' গাছের নিকটে গেলে, তাহা তাহার পাখার বাতাসেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এমন একটা গাছ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, যাহার উপর গিয়া বসিতে ভরসা হয়। তারপর অনেক দূরে অতিশয় প্রকাণ্ড কতগুলি গাছ দেখা গেল। তাহাদের মধ্যে একটা বড় গাছ ছিল, তাহা এতই প্রকাণ্ড যে তাহার একটা ডাল এক শত যোজন লম্বা! গাছটি যেমন বড়, তেমনই ভদ্র। সে গরুড়কে ডাকিয়া বলিল, "গরুড়, আমার এই ডালে বসিয়া, তুমি গজ-কচ্ছপ আহার কর।"

গাছের কথায় গরুড় তাহার ডালে বসিবামাত্র, ঘোরতর মট্‌মট্ শব্দে ডাল ভাঙিয়া পড়িল।

যাহা হউক, গরুড় ডালটিকে মাটিতে পড়িতে দিল না। সে দেখিল যে, পিঁপড়ার ন্যায় ছোট ছোট অনেকগুলি মুনি মাথা নিচু করিয়া, বাদুড়ের মত সেই ডালে ঝুলিতেছেন। ইঁহারা বালখিল্য মুনি; ইঁহারা ঐ ভাবে তপস্যা করিতেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়া গরুড়ের বড়ই ভয় আর চিন্তা হইল, কেননা ডাল মাটিতে পড়িলে আর ইঁহাদের কেহই বাঁচিয়া থাকিতেন না। সুতরাং সে দুইপায়ে হাতি আর কচ্ছপ, আর ডালটিকে ঠোঁটে লইয়া আবার আকাশে উড়িল।

এইরূপে বিশাল তিনটি বোঝা লইয়া বেচারা ক্রমাগত উড়িতেছে, কোথাও বসিবার জায়গা পায় না। এমন সময় সে দেখিল যে, গন্ধমাদন পর্বতে বসিয়া কশ্যপ তপস্যা করিতেছেন। কশ্যপ তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "বৎস, করিয়াছ কি? ঐ ডালে বালখিল্যগণ রহিয়াছেন, উঁহারা যে তোমাকে এখনি শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন!

তারপর তিনি বালখিল্যদিগকে বলিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া গরুড়কে অনুমতি দিন, সে এই হাতিটাকে আর কচ্ছপটাকে খাইলে লোকের উপকার হইবে!"

এ কথায় বালখিল্যগণ, গরুড়ের উপর সন্তুষ্ট হইয়া, সেই ডাল ছাড়িয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলেন।

তারপর গরুড় কশ্যপকে বলিল, "ভগবন্, এখন এই ডাল কোথায় ফেলি?"

ইহাতে কশ্যপ একটা পর্বতের কথা বলিয়া দিলেন। সে পর্বতে ডাল ফেলিয়া, গরুড় গজ-কচ্ছপ ভক্ষণ করিল।

তারপর যখন গরুড় আবার নূতন বলের সহিত অমৃত আনিতে যাত্রা করিল তখন তাহাকে দেখিয়া দেবতাগণ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বলিলেন, "ওটা কি আসিতেছে?"

বৃহস্পতি বলিলেন, "কশ্যপের পুত্র গরুড় অমৃত লইতে আসিতেছে, আর তাহা লইয়াও যাইবে।"

বৃহস্পতির কথায় তখনই এই বলিয়া অমৃতের প্রহরীদিগের উপর তাড়া পড়িল যে, "ভয়ঙ্কর একটা পক্ষী অমৃত লইতে আসিতেছে। সাবধান! সে যেন তাহা চুরি করিতে না পারে।"

কেবল প্রহরীদিগকে সতর্ক করিয়াই দেবতাগণ সন্তুষ্ট রহিলেন না, তাঁহারা নিজেও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অমৃত রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইন্দ্র বজ্র হাতে এবং অন্যান্য দেবতারা অসি, চক্র, ত্রিশূল শক্তি, পরিঘ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র লইয়া, অমৃতের চারিদিকে দাঁড়াইলে, বাস্তবিকই তাঁহাদিগকে অতি ঘোরতর দেখা যাইতে লাগিল।

কিন্তু গরুড় যে কতখানি ভয়ানক, দূর হইতে দেবতারা তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং সে কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা মাথা ঠিক রাখিতে না পারিয়া নিজেরাই কাটাকাটি করিতে লাগিলেন। এদিকে গরুড় বিশ্বকর্মা বেচারাকে সামনে পাইয়া, চক্ষের পলকে তাঁহার দুর্দশার একশেষ করিয়া দিল! বেচারা কারিকর লোক যুদ্ধ করার অভ্যাস নাই, তথাপি তিনি কিছুকাল ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

অপরদিকে গরুড়ের পাখার বাতাসে ধূলা উড়িয়া, অন্যান্য দেবতাদিগেরও অজ্ঞান হইতে আর বেশি বাকি নাই। অমৃতের প্রহরীদিগের চক্ষুও ধূলায় অন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

এমন সময় পবন আসিয়া ধূলা উড়াইয়া দিলে, দেবতারা সাহস পাইয়া, গরুড়কে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অস্ত্রের ঘায় গরুড় কিছুমাত্র কাতর না হইয়া, পাখার ঝাপটে তাঁহাদিগকে উড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। ইহাতে তাঁহাদের নানারকম দুর্গতি হওয়ার তাঁহারা অমৃতের মায়া ছাড়িয়া দিয়া, উৎসাহের সহিত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। গন্ধর্ব ও

সাধ্যগণ পলাইলেন পূর্বদিকে, রুদ্র ও বসুগণ দক্ষিণদিকে, আদিত্যগণ পশ্চিমদিকে, আর অশ্বিনীকুমার দুইভাই উত্তরদিকে।

তারপর নয়জন যক্ষ আসিয়া গরুড়কে আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা মারা গেলে, আর কেহ যুদ্ধ করিতে আসিল না।

তখন গরুড় অমৃতের কাছে আসিয়া দেখিল যে, উহা ভয়ঙ্কর আগুন দিয়া ঘেরা; সেই আগুনের শিখায় আকাশ ছুঁইয়া গিয়াছে।

গরুড় যেমন ইচ্ছা তেমনই চেহারা করিতে পারিত। সুতরাং সেই আগুন নিভাইবার জন্য সে, তাহার একটা মাথার জায়গায়, আট হাজার একশতটা মাথা করিয়া ফেলিল। সেই আট হাজার একশত মুখে জল আনিয়া আগুনের উপরে ঢালিলে, আর তাহা নিভিতে অধিক বিলম্ব হইল না।

আগুন নিভিলে দেখা গেল যে, একখানি ক্ষুরের মত ধারালো লোহার চাকা বনবন্ করিয়া অমৃতের উপর ঘুরিতেছে। অমৃতের নিকট চোর আসিলেই সেই চাকায় তাহার গলা কাটিয়া যায়।

সৌভাগ্যের বিষয়, সেই চাকার মাঝখানে একটা ছিদ্র ছিল. গরুড় সেই ছিদ্র দেখিবামাত্র, মৌমাছির মত ছোট হইয়া, তাহার ভিতর দিয়া ঢুকিয়া পড়িল! ঢুকিয়া তাহার বিপদ বাড়িল কি কমিল, তাহা বলা ভারি শক্ত। সেই চাকার নীচেই এমন ভয়ঙ্কর দুইটা সাপ ছিল যে, তাহাদের মুখ দিয়া আগুন আর চোখ দিয়া ক্রমাগত বিস বাহির হইতেছিল। তাহারা একটিবার কাহারও পানে তাকাইলেই সে ভস্ম হইয়া যাইত। কিন্তু গরুড় তাহাদিগকে তাকাইবার অবসর দিলে ত! সে তাহার পূর্বেই ধূলা দিয়া তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ধূলার কাছে সাপেরা নাকি বড়ই জব্দ থাকেন! বাছাদের চক্ষে পলক পড়ে না, কাজেই চক্ষে ধূলা ছুঁড়িয়া মারিলেই তাহাদের সর্বনাশ উপস্থিত হয়।

গরুড় যেই দেখিল যে, সাপগুলি তাহাদের চোখ লইয়া বিপদে পড়িয়াছে, অমনি সে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন আর তাহার অমৃত লইয়া যাইতে কোন বাধা রহিল না।

গরুড় অমৃত লইয়া আকাশে ছুটিয়া চলিয়াছে, এমন সময়ে নারায়ণের সহিত তাহার দেখা হইল। নারায়ণ তাহার বীরত্ব দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাহাকে বলিলেন, "তুমি আমার নিকট বর লও, আমি তোমাকে বর দিব।"

এ কথায় গরুড় বলিল, "আমি অমর হইতে, আর তোমার চেয়ে উঁচুতে থাকিতে চাহি; আমাকে সেই বর দাও।"

নারায়ণ বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হইবে।"

তারপর গরুড় নারায়ণকে বলিল, "তোমাকেও আমার বড় ভাল লাগিয়াছে, তাই আমিও তোমাকে বর দিব। তুমি কি বর চাহ?"

নারায়ণ বলিলেন, "তুমি আমার বাহন (যে জন্তুর উপরে চড়িয়া চলাফেরা করা যায়) হইলে বেশ সুবিধা হইত। কিন্তু তোমাকে যে বর দিয়াছি, তাহাতে আর তোমার উপরে চড়িবার উপায় থাকে না; কাজেই তুমি আমার রথের চূড়ায় বসিয়া থাকিবে, আর জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে, তুমি আমার বাহন।"

গরুড় বলিল, "তথাস্তু। (তাই হোক)"

এই বলিয়া সে সবেমাত্র অমৃত লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় ইন্দ্র তাহাকে বধ করিবার জন্য বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুই হইল না। তখন সে মনে ভাবিল যে 'এত বড় একটা অস্ত্র, এতবড় মুনির হাড় দিয়া তাহা প্রস্তুত হইয়াছে, আর জগতে তাহার এত বড় নাম। এমন একটা অস্ত্র বৃথা হইলে ত বড় লজ্জার কথা হয়। সুতরাং ইহার জন্য আমার কিছু ক্ষতি হওয়া উচিত হইতেছে।"

এই ভাবিয়া সে তাহার শরীর হইতে একখানি পালক ফেলিয়া দিয়া, ইন্দ্রকে বলিল, "এই নিন। আপনার অস্ত্রের মান রাখিয়া গেলাম।"

ইন্দ্র ত তাহা দেখিয়া একেবারে অবাক। তিনি তখন গরুড়ের সহিত বন্ধুতা করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহা দেখিয়া গরুড়ও তাঁহার উপর খুব সন্তুষ্ট হইল

তখন ইন্দ্র বলিলেন ' ভাই অমৃত যাহারা খাইবে তাহারাই অমর হইয়া আমাদের উপর অত্যাচার করিবে। তোমার যদি উহাতে প্রয়োজন না থাকে তবে উহা আমাকে দিয়া যাও।"

গরুড় বলিল 'আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, সুতরাং ইহা আমি কিছুতেই দিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি যেখানে ইহা রাখিব সেখান হইতে তখনই আপনি ইহা লইয়া আসিতে পারিবেন।'

ইহাতে ইন্দ্র যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া গরুড়কে বর দিতে চাহিলে সে বলিল "সর্পগণ আমার মাতাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছে সুতরাং আমাকে এই বর দিন যে সাপেরা আমার খাদ্য হইবে, তাহাদের বিষে আমার কিছুই হইবে না '

ইন্দ্র বলিলেন আচ্ছা তাহাই হইবে। এখন তুমি অমৃত লইয়া যাও। তুমি উহা রাখিয়া দিবা মাত্র আমি তাহা লইয়া আসিব।'

এই বলিয়া ইন্দ্র গরুড়কে বিদায় দিলে সে অমৃতসহ তৎক্ষণাৎ সর্পগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল

এই দেখ আমি অমৃত আনিয়াছি আমি উহা কুশের (সেই যাহাতে কুশাসন হয়) উপর রাখিয়া দিলাম তোমরা স্নান করিয়া আহ্নিক সারিয়া আসিয়া উহা আহার কর।"

তারপর সে বলিল তোমরা যাহা বলিয়াছিলে, আমি তাহা করিয়াছি সুতরাং এখন হইতে আর আমার মা তোমাদের দাসী থাকিলেন না '

নাগগণ ইহাতে সম্মত হইয়া স্নান করিতে গেল, আর সেই অবসরে ইন্দ্রও আসিয়া কুশের উপর হইতে অমৃত লইয়া পলায়ন করিলেন।

সর্পগণ সেদিন খুবই আনন্দের সহিত, আর হয়ত খুব তাড়াতাড়ি স্নান আর পূজা শেষ করিয়াছিল। কিন্তু হায়। ফিরিয়া আসিয়া তাহারা দেখিল অমৃত নাই, খালি কুশ পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা ভাবিল, "আর দুঃখ করিয়া কি হইবে? আমরা যেমন ছল করিয়া বিনতাকে দাসী করিয়াছিলাম, তেমনি ছল করিয়া আমাদের নিকট হইতে অমৃত লইয়া গিয়াছে।"

তারপর, "আহা। এই কুশের উপর অমৃত রাখিয়াছিল গো।" বলিয়া তাহারা সেই কুশ চাটিতে লাগিল। চাটিতে চাটিতে কুশের ধারে তাহাদের জিব চিরিয়া দুইভাগ হইয়া গেল। তাই আজও সাপের জিব চেরা দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপে মাতাকে সর্পগণের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া গরুড় মনের আনন্দে সাপ ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তখন আর তাহার পেট ভরিবার জন্য কোন চিন্তা রহিল না, পৃথিবীর লোকেরও বোধহয় তাহাতে সাপের ভয় অনেকটা কমিয়া থাকিবে।

সর্পযজ্ঞের কথা

কদ্রু সর্পগণকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন, "তোরা জনমেজয় রাজার যজ্ঞে পুড়িয়া মরিবি।"

এই শাপের কথা মনে করিয়া সাপেদের মনে বড়ই চিন্তা হইল। তাই তাহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল যে, কি উপায়ে এই শাপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সংসারে মায়ের মতন গুরু কেহই নাই, তাঁহার শাপ বড়ই দারুণ শাপ। সুতরাং সর্পগণের মনে হইল যে, এখন হইতে বিশেষ চেষ্টা না করিলে, আর তাহাদের রক্ষা নাই।

অনেকে অনেক উপায়ের কথা বলিল।

কেহ বলিল, "আমরা ব্রাহ্মণের বেশে জনমেজয়ের নিকট গিয়া বলিব যে, 'আপনি সর্পযজ্ঞ (অর্থাৎ সর্পগণকে বধ করিবার জন্য যজ্ঞ) করিবেন না।' তাহা হইলে তিনি হয়ত আমাদের কথা শুনিবেন।"

কেহ বলিল, "আমরা গিয়া তাঁহার মন্ত্রী হইব। তিনি যজ্ঞের কথা পাড়িলেই, আমরা বলিব, 'মহারাজ! এমন কাজও করিবেন না। যজ্ঞেতে খালি পয়সা খরচ হয়, আর তাহাতে কোন লাভ নাই, বরং ইহকাল পরকাল নানারূপ কষ্ট হইয়া থাকে। আপনি আর যাহাই করুন, যজ্ঞ কখনো করিবেন না।'"

অনেকে বলিল, "যে সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিতে যাইবে, আমরা তাহাদিগকে কামড়াইয়া মারিব। তাহা হইলে আর যজ্ঞ করিবার লোক পাওয়া যাইবে না।"

আর কয়েকজন বলিল, "আমরা মেঘ হইয়া, মুষলধারে যজ্ঞের আগুনের উপর বৃষ্টি করিতে থাকিব। তাহা হইলে আগুন নিভিয়া যাইবে, আর যজ্ঞ হইবে না।"

আবার কেহ কেহ বলিল, "আমরা রাত্রিতে গিয়া যজ্ঞের সকল দ্রব্য চুরি করিয়া আনিব। তখন দেখিব, কেমন করিয়া যজ্ঞ হয়।"

ইহাতে আর কয়েকজন বলিয়া উঠিল, "এত পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? জনমেজয়কে কামড়াইয়া দিলেই ত গোলমাল চুকিয়া যাইতে পারে।"

এইরূপে সর্পগণ বুদ্ধি খাটাইয়া অনেকরকম উপায়ের কথা বলিল। কিন্তু আসল উপায়টির কথা তাহাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেহই জানিত না।

সেই সাপটির নাম ছিল, এলাপত্র।

কদ্রু সর্পদিগকে শাপ দিবার সময়, এই বিষয় লইয়া ব্রহ্মার সহিত দেবতাগণের কথাবার্তা হয়। তখন ব্রহ্মা বলেন, "যাযাবর বংশে জরৎকারু নামে মুনি জন্মগ্রহণ করিবেন, বাসুকি নাগেরও জরৎকারু নামে একটি ভগিনী আছে তাহার সহিত সেই মুনির বিবাহ হইলে, ইঁহাদের আস্তিক নামে একটি পুত্র হইবে। সেই আস্তিকই জনমেজয়ের যজ্ঞ বারণ করিয়া,

ধার্মিক সর্পদিগকে রক্ষা করিবেন।। এই সকল কথা এলাপত্র শুনিতে পাইয়াছিল। সুতরাং সে বলিল, "এই জরৎকারু মুনিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বাসুকির ভগিনীর সহিত তাহার বিবাহ দাও; তাহা হইলেই আমাদের রক্ষার উপায় হইবে।"

সমুদ্র মন্থনের সময় অনন্ত নাগ মন্থনের-দড়ি হইয়াছিলেন, তাহাতে দেবতাগণ তাঁহার উপরে অতিশয় তুষ্ট হন। এজন্য ব্রহ্মা নিজেও তাঁহাকে ধার্মিক সর্পগণের রক্ষার ঐ উপায়টি বলিয়া দেন।

সুতরাং জরৎকারু মুনিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাঁহার সহিত বাসুকির ভগিনীর বিবাহ দিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা হইতে লাগিল।

এইরূপে জনমেজয়েব জন্মের অনেক পূর্ব হইতেই সাপেরা তাঁহার যজ্ঞের কথা ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়াছিল।

কিন্তু জনমেজয় কে? আর তিনি কেনই বা সাপ মারিবার জন্য এমন উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিয়াছিলেন? এই-সকল কথা হয়ত এখনই কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে। সুতরাং আগে ভাগে তাহার উত্তব দিয়া বাখা ভাল।

পরীক্ষিতের কথা

জনমেজয় হস্তিনার বাজা পবীক্ষিতেব পুত্র। মহারাজ পবীক্ষিৎ অভিমন্যুর পুত্র, এবং অর্জুনের নাতি ছিলেন। তাঁহাব তুল্য গুণবান্ ধার্মিক রাজা অতি অল্পই ছিল। প্রজাদিগকে তিনি নিজেব পুত্রের মত পালন করিতেন।

যুদ্ধ-বিদ্যায় আর মৃগয়ায় (শিকাবে) তাঁহার মতন কেহই ছিল না। বিশেষত মৃগয়া করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। পবীক্ষিতেব বাণ খাইয়া মৃগ আবাব উঠিয়া পলাইয়াছে এমন কথা কখনো শোনা যায় নাই।

কিন্তু যাহা আর কখনো ঘটে নাই, এমন ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে। একথার প্রমাণ এই যে, একদিন একটি হরিণ পরীক্ষিতের বাণ খাইয়া পলায়ন করিল। হরিণটি পলায়ন করাতে তিনি কিরূপ আশ্চর্য আর ব্যস্ত হইলেন, বুঝিতে পার। তিনি ঐ মৃগের পিছু পিছু ত্রিভুবন ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। শেষে পিপাসায় আর পরিশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া, তিনি এক গোচারণের মাঠে (অর্থাৎ যে মাঠে গরু চরান হয়) আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেখানে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, বাছুরেরা গরুর দুধ খাইবার সময়, তাহাদের মুখ দিয়া যে ফেনা বাহির হয় একজন তপস্বী ক্রমাগত সেই ফেনা পান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমি অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ। আমার বাণ খাইয়া একটি হরিণ পলায়ণ করিয়াছে; উহা কোন দিকে গিয়াছে, আপনি দেখিয়াছেন কি?"

সেই মুনি তখন মৌনব্রত (অর্থাৎ 'কোন কথা কহিব না' এইরূপ নিয়ম)লইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি রাজার কথাব উত্তর দিলেন না।

একে ত হরিণটা পলাইয়া যাওয়াতে রাজার মন নিতান্তই খাবাপ হইয়াছিল, তাহাতে ক্ষুধা

পিপাসা আর পরিশ্রমে তিনি অতিশয় অস্থির ছিলেন, তাহার উপর আবার মুনিকে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি কোন উত্তর পাইলেন না। সুতরাং তখন তাঁহার রাগ হইবে, ইহা আশ্চর্য কি? তাই তিনি ধনুব আগায় করিয়া একটি মরা সাপ আনিয়া মুনির গলায় জড়াইয়া দিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুনি ইহাতে কিছুমাত্র রাগ করিলেন না। আর মৌনব্রতে থাকার দরুণ, তিনি রাজাকে কিছু বলিতেও পারিলেন না।

মুনি রাগ করিলেন না দেখিয়া, রাজারও রাগ চলিয়া গেল। তখন তিনি দুঃখের সহিত রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

আসিবার সময় রাজা যদি সাপটি ফেলিয়া দিয়া মুনির নিকট ক্ষমা চাহিতেন, কি অন্তত দুটি মিষ্ট কথাও তাঁহাকে বলিতেন, তবে বড়ই ভাল হইত। কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিলেন না। মুনি সেই অবস্থাতেই রহিয়া গেলেন।

সেই মুনির নাম ছিল শমীক। তিনি অতি মহাশয় পুরুষ ছিলেন, তাহা ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, এমন অপমান পাইয়াও তিনি পরীক্ষিৎকে শাপ দেন নাই। পরীক্ষিৎকে তিনি খুব ধার্মিক রাজা বলিয়া জানিতেন। তাই তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

কিন্তু শমীকের পুত্র শৃঙ্গী এত সহজ লোক ছিলেন না। এই ঘটনার সময়ে শৃঙ্গী তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় কৃশ নামক এক ঋষিপুত্রের সহিত তাঁহার দেখা হইল। কৃশ শৃঙ্গীকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শৃঙ্গী, তোমার পিতার গলায় মরা সাপ জড়ান রহিয়াছে, আর তুমি ত দেখিতেছি তপস্বী বলিয়া বড়ই বাহাদুরি করিয়া বেড়াইতেছ।"

পিতার এইরূপ অপমানের কথা শুনিয়া শৃঙ্গীর মনে বড়ই ক্লেশ হইল। তিনি কৃশকে বিনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃশ, পিতার এমন অপমান কি করিয়া হইল?"

কৃশ বলিলেন, "রাজা পরীক্ষিৎ তোমার পিতার গলায় মরা সাপ দিয়া গিয়াছেন।"

এ কথায় শৃঙ্গী রাগে দুইচোখ লাল করিয়া বলিলেন, "আমার পিতা সেই দুষ্ট রাজার কি করিয়াছিলেন, সত্য করিয়া বল। আজ তোমাকে আমার তপস্যার বল দেখাইতেছি।"

কৃশ তখন সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া শৃঙ্গী রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে পরীক্ষিৎকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, "যে দুষ্ট আমার পিতার গলায় মরা সাপ দিয়াছে, আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে, তক্ষকের (একটা ভয়ানক সাপ) কামড়ে তাহার মৃত্যু হইবে।"

এই বলিয়া শৃঙ্গী তাঁহার পিতার নিকট গিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই তাঁহার গলায় একটা মরা সাপ জড়ান রহিয়াছে। তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা দুরাত্মা পরীক্ষিৎ বিনা অপরাধে আপনার এমন অপমান করিল। তাই আমি তাহাকে শাপ দিয়াছি যে, সাত দিনের ভিতরে তাহাকে তক্ষকে খাইবে।"

শৃঙ্গীর কথায় শমীক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি রাজাকে শাপ দিয়া বড় অন্যায় কাজ করিয়াছ। এমন ধার্মিক রাজা একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিলেও তাঁহার অনিষ্ট করা উচিত নহে। আর আমরা হইতেছি তপস্বী, ক্ষমা করাই আমাদের ধর্ম। ক্রোধ করিলে ধর্মের হানি হয়। আমার মৌনব্রতের কথা জানিলে, রাজা কখনই এমন কাজ করিতেন না। আমরা তাঁহার আশ্রয়ে সুখে বাস করিয়া কত পুণ্য উপার্জন করিতেছি, এমন লোককে কি শাপ দিতে হয়?"

কিন্তু আর দুঃখ করিয়া কি ফল হইবে? শৃঙ্গী শাপ দিয়া বসিয়াছেন, এখন আর পরীক্ষিতের রক্ষা নাই। তথাপি শমীক মনে করিলেন যে, অন্তত এই সংবাদ রাজাকে জানাইয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলে কিছু উপকার হইতে পারে। সুতরাং তিনি, গৌরমুখ নামক একজন শিষ্যকে দিয়া এই সংবাদ পরীক্ষিতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

গৌরমুখের নিকট সকল কথা শুনিয়া, পরীক্ষিতের বড়ই অনুতাপ হইল। কিন্তু তিনি নিজের মৃত্যুর কথা মনে করিয়া তত দুঃখিত হইলেন না, যত সেই মুনির কথা ভাবিয়া হইলেন। তিনি কেবল ইহাই বলিতে লাগিলেন, "আমি তাঁহার এত অপমান করিলাম, তথাপি তিনি আমাকে ক্ষমা করিলেন! হায়! এমন মহাপুরুষের অপমান করিয়া আমি কি কুকর্মই করিয়াছি!"

যাহা হউক, এই বিষম বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় আছে কি না, পরীক্ষিৎ তাহার কথা ভাবিতে ভুলিয়া গেলেন না। মন্ত্রীদিগকে লইয়া তিনি এ বিষয়ে অনেক পরামর্শ করিলেন। তারপর রাজ্যের বড়বড় রাজমিস্ত্রী-দিগকে ডাকিয়া আনা হইল। তাহারা খুব মজবুত একটা থাম খাড়া করিয়া, তাহার আগায়, রাজার থাকিবার জন্য পায়রার ঘরের মত (অবশ্য, তার চেয়ে ঢের বড) একটি ঘর প্রস্তুত করিয়া দিল। সেই ঘরে রাজা বড় বড় রোজা আর বদ্যি আর রাশি রাশি ঔষধ লইয়া অতি সাবধানে বাস করিতে লাগিলেন। বিনা অনুমতিতে কাহারই তাঁহার নিকট যাইবার উপায় রহিল না। থামের চারিধারে দিনরাত হাতিয়ার বাঁধা সিপাইরা পাহারা দিতে লাগিল পিপীলিকারও সাধ্য ছিল না যে, তাহাদিগকে ফাঁকি দিয়া উপরে যায়।

সেকালে কাশ্যপ নামক এক মুনি, সাপের বিষের অতি আশ্চর্যরকম চিকিৎসা জানিতেন। পরীক্ষিৎকে সাপে খাইবে এই সংবাদ শুনিয়া, তিনি মনে করিলেন, 'ইহাকে বাঁচাইতে পারিলে আমি নিশ্চয়ই অনেক টাকা পুরস্কার পাইব।' এই মনে করিয়া তিনি তাঁহার চিকিৎসা করিবার জন্য হস্তিনায় যাত্রা করিয়াছেন, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার দেখা হইল। এই ব্রাহ্মণ আর কেহ নহে, তক্ষকই ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া রাজাকে সংহার করিতে যাইতেছে।

কাশ্যপকে দেখিয়া তক্ষক জিজ্ঞাসা করিল, "কি মুনিঠাকুর, এত তাড়াতাড়ি কোথায় চলিয়াছেন?"

কাশ্যপ কহিলেন, "রাজা পরীক্ষিৎকে আজ তক্ষকে কামড়াইবে, আমি তাঁহাকে বাঁচাইতে যাইতেছি।"

তক্ষক বলিল, "মহাশয়, আমি সেই তক্ষক। আপনি মিছামিছি এত পরিশ্রম কেন করিতেছেন? ঘরে ফিরিয়া যাউন। আমি কামড়াইলে আপনার সাধ্য নাই যে, তাঁহাকে রক্ষা করেন."

কাশ্যপ কহিলেন, "আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

তক্ষক বলিল, "যদি আপনার এমন ক্ষমতাই থাকে তবে আমি এই বটগাছটাকে কামড়াইতেছি, ইহাকে বাঁচাইয়া দিন ত দেখি!"

কাশ্যপ কহিলেন, "আচ্ছা, তুমি কামড়াও ত!"

এ কথায় তক্ষক সেই বটগাছটাকে কামড়াইবামাত্র উহার শিকড় অবধি আগা পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কিন্তু কাশ্যপের মন্ত্রের কি আশ্চর্য গুণ, তাহাতে মুহূর্তের মধ্যে সেই ছাই হইতে প্রথমে একটু অঙ্কুর, তারপর দুটি পাতা এইরূপ কবিয়া ক্রমে সেই প্রকাণ্ড বটগাছ যেমনটি ছিল তেমনটি অবিকল হইয়া দাঁড়াইল। সে সময়ে একটি ব্রাহ্মণ কাঠের জন্য সেই গাছে উঠিয়াছিলেন, গাছের সঙ্গে তিনিও ভস্ম হইয়া যান, আবার কাশ্যপের মন্ত্রে বাঁচিয়া উঠেন!

বটগাছ বাঁচিতে দেখিয়া, তক্ষক অতিশয় আশ্চর্য হইয়া কাশ্যপকে বলিল, "আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা! আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু আপনি কিসের জন্য পরীক্ষিৎকে বাঁচাইতে চাহিতেছেন?"

মুনি বলিলেন, "রাজাকে বাঁচাইলে অনেক টাকা পাইব, তাই আমি তাঁহাকে বাঁচাইতে চাহিতেছি।"

এ কথায় তক্ষক বলিল, "রাজাকে বাঁচাইলে যে অনেক টাকা পাইবেন, তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু যদি বাঁচাইতে না পারেন, তখন কেমনটি হইবে? আপনি মুনিব শাপেব সঙ্গে যুঝিতে যাইতেছেন, সে জায়গায় আপনার মন্ত্র নাও খাটিতে পারে। তাহাব চেয়ে এক কাজ করুন না! আপনার টাকা পাওয়া নিয়াই ত কথা—রাজাব কাছে যাহা পাইতেন, আমিই আপনাকে সেই টাকাটা দিতেছি। তাহা লইয়া আপনি ঘরে চলিয়া যাউন, আপনার অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইবে।"

মুনির টাকাটাবই দরকাব ছিল, তাহাব চেয়ে ভাল উদ্দেশ্য তাঁহাব ছিল না। সুতরাং তিনি তক্ষকের কথায় বিশেষ সুবিধাই বোধ করিয়া, তাহার নিকট হইতে অনেক টাকা লইয়া আহ্লাদের সহিত ঘরে ফিরিলেন।

এদিকে তক্ষক হস্তিনায় আসিয়া যখন দেখিল যে, পরীক্ষিৎকে সোজাসুজি গিয়া কামড়াইবার কোন উপায় নাই, তখন সে ইহার এক কৌশল স্থির কবিল। তক্ষকেব কথায় কতকগুলি সাপ ব্রাহ্মণ সাজিয়া ফল, ফুল, কুশ আর জল হাতে হস্তিনায় আসিয়া বলিল যে, "আমরা রাজাকে আশীর্বাদ করিতে আসিযাছি।"

এ সময়ে রাজার যে আশীর্বাদের নিতান্তই প্রয়োজন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই-সকল ব্রাহ্মণের তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতে কোন কষ্ট হইল না। কপট ব্রাহ্মণেরা রাজাকে কপট আশীর্বাদপূর্বক ফল দিয়া প্রস্থান করিল।

উহারা চলিয়া গেল, রাজা অমাত্যগণকে লইয়া সেই-সকল ফল আহার করিবার আয়োজন করিলেন। রাজা একটি ফল হাতে লইয়া দেখিলেন যে, উহার ভিতর হইতে একটি অতিশয় ক্ষুদ্র কীট বাহির হইয়াছে। উহার শরীর তাম্রবর্ণ, চোখদুটি কাল কাল।

মুনি বলিয়াছিলেন, সাতদিনের ভিতরে রাজার মৃত্যু হইবে। সেদিনকার সূর্য অস্ত গেলেই সেই সাত দিন পূর্ণ হয়, রাজারও বিপদ কাটিয়া যায়। সূর্যও তখন গাছের আড়ালে লুকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, অস্ত হইতে আর বিলম্ব নাই। ইহা দেখিয়া রাজার ভয় অনেকটা কমিয়া যাওয়াতে, তিনি তামাসা করিয়া বলিলেন, "এখন আর আমার বিষের ভয় নাই, এখন এই পোকাই তক্ষক হইয়া আমাকে কামড়াইতে আসুক! তাহা হইলে আমার শাপও কাটে, ব্রাহ্মণের কথাও থাকে।"

এই বলিয়া তিনি সেই পোকাটিকে নিজের গলায় রাখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহার সেই হাসি অতি অল্পক্ষণের জন্যই দেখা দিয়াছিল। সেই পোকাই ছিল তক্ষক। রাজার হাসির সঙ্গে সঙ্গে সে নিজ মূর্তি ধারণ করিয়া ভীষণ গর্জনের সহিত তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল! তারপর কি হইল, আর বলিয়া কি হইবে?

এই রূপে পরীক্ষিতের মৃত্যু হইলে, সকলে মিলিয়া তাঁহার শিশুপুত্র জনমেজয়কে হস্তিনার রাজা করিল।

সে সময় হয়ত জনমেজয় এ-সকল ঘটনার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু বড় হইয়া তিনি অনেক সময় এ বিষয়ের চিন্তা করিতেন। একদিন তিনি পাত্রমিত্র সমেত সভায় বসিয়া রাজ্যের কাজ দেখিতেছেন, এমন সময় উতঙ্ক নামক একটি মুনি আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! আসল কাজের কথা ভুলিয়া ছেলেমানুষের মতন, কেন সামান্য কাজে ব্যস্ত রহিয়াছেন?"

মুনির কথা শুনিয়া জনমেজয় বলিলেন, "কেন, আমি ত রাজ্যের কাজ আমার সাধ্যমত করিতেছি। আপনি আর কোন্ কাজের কথা বলিতেছেন? "

মুনি বলিলেন, "আমি যে কাজের কথা বলিতেছি, আর সকল কাজের আগে, তাহাই আপনার কাজ। দরাত্মা তক্ষক যে আপনার পিতাকে বধ করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ না লইয়া, আপনি আর কোন্ কাজের কথা ভাবিতেছেন? সেই দুষ্ট বিনা দোষে আপনার পিতার প্রাণনাশ করিয়াছিল।

কাশ্যপ মহারাজকে বাঁচাইতে আসিতেছিলেন. পাপিষ্ঠ তাঁহাকে পথের মাঝখান হইতে ফিরাইয়া দিল। এই দুরাত্মাকে শাস্তি দিতে আর বিলম্ব করিবেন না। শীঘ্র সর্পযজ্ঞের আয়োজন করিয়া, উহাকে তাহার আগুনে পোড়াইয়া মারুন। ইহাতে আমারও কাজ হইবে। আমি গুরুর জন্য দক্ষিণা আনিতে গিয়াছিলাম, পথে ঐ দুষ্ট আমাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছে।"

উতঙ্ক কে তক্ষক কি কষ্ট দিয়াছিল, তাহা এখানে বলিয়া কাজ নাই। উঁহার নিকট পরীক্ষিতের কথা শুনিয়া জনমেজয় অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন. "আমার পিতার মৃত্যু কিরূপে হইয়াছিল?"

এ কথায় অমাত্যগণ পরীক্ষিতের মৃত্যুর সকল বৃত্তান্ত শুনাইলে, তিনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চোখের জল ফেলিলেন। তারপর তিনি ক্রোধভরে বলিলেন, "হে অমাত্যগণ, আমি যাহা বলিতেছি তাহা তোমরা শোন দুষ্ট তক্ষক যে আমার পিতার প্রাণ বধ করিয়াছিল, ইহার উচিত শাস্তি তাহাকে দিতেই হইবে।"

তারপর তিনি ঋত্বিক্গণকে (যে-সকল মুনি যজ্ঞ করেন) ডাকাইয়া বলিলেন, "দুরাত্মা তক্ষক আমার পিতাকে বধ করিয়াছিল, আমি তাহার প্রতিফল দিতে চাহি। আপনারা এমন কোন যজ্ঞের কথা জানেন কি না, যাহা দ্বারা আমি সেই দুষ্টকে ভাই বন্ধু সকল সুদ্ধ আগুনে পোড়াইয়া মারিতে পারি?"

ঋত্বিক্গণ বলিলেন, "মহারাজ! পুরাণে লেখা আছে যে, ঠিক আপনার এই কার্যের জন্যই, বহুকাল পূর্বে, দেবতাগণ সর্পযজ্ঞ নামক একটা যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ যজ্ঞ করিলে নিশ্চয়ই তক্ষকের মৃত্যু হইবে।"

একথা শুনিয়া জনমেজয় আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করিলেন না। তখনই যজ্ঞের আয়োজন

আরম্ভ হইল, ঋত্বিকেরা যজ্ঞভূমি মাপিয়া প্রস্তুত করাইলেন। যজ্ঞের সকল সামগ্রী আনিয়া, সেই যজ্ঞভূমি পরিপূর্ণ করা হইল।

সাপেরা এতদিন কি করিতেছিল? আমরা জানি যে, উহারা জরৎকারু মুনির সহিত বাসুকির ভগিনীর বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। তারপর কি হইল?

তখন হইতেই তাহারা এ বিষয়ে বিস্তর চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু নানা কারণে কাজটি তাহাদের নিকট বড়ই কঠিন বোধ হইল।

জরৎকারু কথা

জরৎকারু মুনি সর্বদাই কঠিন তপস্যায় ব্যস্ত থাকিতেন। বিবাহ বা সংসারের অন্য কোন কাজ করার ইচ্ছা তাঁহার একেবারেই ছিল না। তপস্যা করিয়া, আর তীর্থে স্নান করিয়া তিনি, পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ঘর বাড়ি তাঁহার কিছুই ছিল না, যেখানে রাত্রি হইত, সেইখানে নিদ্রা যাইতেন। এমন লোককে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করাইয়া দেওয়া কি সহজ কাজ? এ কাজ হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না, যদি ইহার মধ্যে একটি আশ্চর্য ঘটনা না হইত। ঘটনাটি এই —জরৎকারু নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন দেখিলেন যে, একটা ভয়ঙ্কর অন্ধকার গর্তের মুখে, কয়েকটি নিতান্ত দীনহীন, রোগা, হাড্ডিসার মানুষ একগাছি খস্‌খসের শিকড় ধরিয়া ঝুলিতেছে! উহাদের পা উপর দিকে, মাথা নীচের দিকে। একটা ইঁদুর ক্রমাগত সেই খস্‌খসের শিকড় খানিকে কাটিয়া উহার একটি আঁশ মাত্র বাকি রাখিয়াছে। সেটুকু কাটা গেলেই বেচারারা গর্তের ভিতর পড়িয়া যাইবে। ইহাদিগকে দেখিয়া জরৎকারুর বড়ই দয়া হওয়াতে, তিনি বলিলেন, "আহা! আপনাদের অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে! আপনারা কে? আর কি করিয়াই বা আপনাদের এমন কষ্টের অবস্থা হইল? আমি কি আপনাদের কোন উপকার করিতে পারি?"

সেই লোকগুলি বলিলেন, "আমাদিগকে দেখিয়া তোমার দুঃখ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের দুঃখ দূর হওয়া বড় কঠিন দেখিতেছি। আমরা যাযাবর নামক ঋষি। আমরা কেহ কোন পাপ করি নাই, কেবল আমাদের বংশ-লোপ হওয়ার গতিক হওয়াতেই আমাদের এই দুর্দশা। আমাদের বংশে এখনো একটি লোক আছে, উহার নাম জরৎকারু। জরৎকারু বাঁচিয়া আছে বলিয়াই আমরা এখনো কোন মতে এই খস্‌খসের শিকড়টুকু ধরিয়া টিকিয়া আছি, উহার মৃত্যু হইলে এই শিকড়টি ছিঁড়িয়া যাইবে, আর আমরাও এই গর্তের ভিতর পড়িয়া যাইব। সেই মূর্খ কেবল তপস্যা করিয়াই বেড়ায়; কিন্তু উহার তপস্যায় আমাদের কি ফল হইবে? তাহার চেয়ে সে যদি বিবাহ করিত, আর তাহার পুত্র পৌত্র হইত, তবে আমরা এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতাম। বৎস, আমাদের দশা দেখিয়া তোমার দয়া হইয়াছে, তাই বলি, যদি সেই হতভাগার সঙ্গে তোমার দেখা হয়, তবে দয়া করিয়া আমাদের কথা তাহাকে বলিও।"

হায়, কি কষ্টের কথা! পূর্বপুরুষেরা এমন ভয়ানক কষ্টে পড়িয়াছেন, আর সেই কষ্টের কারণ জরৎকারু নিজে! এ কথা ভাবিয়া তিনি যার পর নাই দুঃখের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে

বলিলেন, "হে মহর্ষিগণ, আপনারা আমারই পূর্বপুরুষ। আমিই সেই দুরাত্মা হতভাগ্য জরৎকারু। আমার অপরাধের সীমা নাই। সেজন্য আমাকে উচিত শাস্তি দিন। আর বলুন, আমি কি করিব।"

ইহাতে পূর্বপুরুষেরা বলিলেন, "তুমি বিবাহ কর।"

জরৎকারু বলিলেন, "আচ্ছা, আমি বিবাহ করিব; কিন্তু ইহার মধ্যে দুইটি কথা আছে। মেয়েটির আমার নামে নাম হওয়া চাহি। আর বিবাহের পর স্ত্রীকে খাইতে দিতে পারিব না। ইহাতে যদি আমার বিবাহ জোটে, তবেই বিবাহ করিব, নচেৎ নহে।"

এই বলিয়া জরৎকারু বিবাহের জন্য মেয়ে খুঁজিতে লাগিলেন। একে বুড়ো তাতে গরিব। স্ত্রীকে খাইতে পরিতে দিতে পারিবে না, কুঁড়ে ঘরখানি পর্যন্ত নাই, যে, তাহাতে নিয়া তাহাকে রাখিবে। এমন বরকে মেয়ে দিতে বোধহয় বাঘ ভালুকেও রাজি হয় না, মানুষ ত দূরের কথা। মুনি দেশ বিদেশে খুঁজিয়া হয়রান হইলেন, কোথাও মেয়ে পাইলেন না। তখন পূর্বপুরুষদের কথা মনে করিয়া, তাহার নিতান্ত কষ্ট হওয়াতে তিনি এক বনের ভিতর গিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিলেন, "এখানে যদি কেহ থাক, তবে শোন । আমি যাযাবর বংশের তপস্বী, নাম জরৎকারু। পূর্বপুরুষদিগের আজ্ঞায় আমি বিবাহ করিতে চাহিতেছি। কিন্তু কিছুতেই কন্যা জুটিতেছে না। যদি তোমাদের কাহারও নিকট কন্যা থাকে, আর যদি তাহার আমার নামে নাম হয়, আর যদি আমায় টাকা না দিতে হয়, আর মেয়েকেও খাইতে পরিতে দিতে না হয়, তবে নিয়া আইস, আমি তাহাকে বিবাহ করিব।"

এদিকে হইয়াছে কি—বাসুকির লোকেরা সেই তখন হইতেই জরৎকারুকে খুঁজিতেছে, কিন্তু এত দিন কোথাও তাঁহার দেখা পায় নাই। জরৎকারু যখন সেই বনের ভিতরে ঢুকিয়া কাঁদিতেছিলেন, তখন বাসুকির ঐ-সব লোকের কয়েকজন সেখানে ছিল। তাহারা তাঁহার কথা শুনিয়াই বলিল, ঐ রে সেই মুনি! ঐ শোন, সে বিবাহ করিতে চায়! শীঘ্র কর্তাকে খবর দিই গিয়া চল।"

এই বলিয়া তাহারা বায়ুবেগে ছুটিয়া গিয়া বাসুকিকে এই সংবাদ দিল। বাসুকিও সে সংবাদ পাওয়া-মাত্রই তাঁহার ভগিনীকে অতি সুন্দর পোশাকে এবং বহুমূল্য অলঙ্কার পরাইয়া জরৎকারুর নিকট উপস্থিত করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জরৎকারু বলিলেন—

"মহাশয়, ইঁহার নামটি কি?"

বাসুকি বলিলেন, "ইঁহার নাম জরৎকারু।"

জরৎকারু বলিলেন, "বেশ! কিন্তু আমি ত টাকাকড়ি দিতে পারিব না।"

বাসুকি বলিলেন, "আপনাকে কিছুই দিতে হবে না।, আমি অমনিই মেয়ে দিতেছি।"

জরৎকারু বলিলেন, "বেশ! বেশ! কিন্তু মেয়েকে খাইতে পরিতে দিবে কে? আমার ত কিছুই নাই।"

বাসুকি বলিলেন, "তাহার জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। আমি ইহাকে চিরকাল ভরণ পোষণ করিব (খাওয়াইব পরাইব)।"

জরৎকারু বলিলেন, "তবে ভাল, আমি ইঁহাকে বিবাহ করিব। কিন্তু যদি ইনি কখনো আমাকে অসন্তুষ্ট করেন, তবে আমি তখনই চলিয়া যাইব।"

এইরূপ কথাবার্তার পর জরৎকারুর সহিত বাসুকির ভগিনীর বিবাহ হইল। ইহাদের পুত্রই আস্তিক, যিনি সর্পগণকে জনমেজয়ের যজ্ঞ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আস্তিকের জন্মের কয়েকদিন আগে জরৎকারু তাঁহার স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বেচারীর কোন দোষ ছিল না। তিনি পরম যত্নে স্বামীর সেবা করিতেন।

একদিন বিকাল বেলায় জরৎকারু মুনি নিদ্রা গেলেন ক্রমে সূর্যাস্ত আসিয়া উপস্থিত হইল, সন্ধ্যাকালে উপাসনার (ভগবানের পূজার) সময় হইল, তথাপি মুনির ঘুম ভাঙ্গিল না। ইহাতে তাঁহার স্ত্রী ভাবিলেন, 'এখন কি করি? ঘুম ভাঙ্গাইলে হয়ত ইঁহার রাগ হইবে, আর সন্ধ্যাপূজা না করা হইলে ইঁহার পাপ হইবে।" অনেক ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন, "যাহাতে ইঁহার পাপ হয়, এ-সব ঘটনা হইতে দেওয়া উচিত নহে, সুতরাং ইঁহাকে জাগানই কর্তব্য।" এই মনে করিয়া যেই তিনি মুনিকে আস্তে আস্তে জাগাইয়াছেন; অমনি মুনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "কি? আমাকে অপমান করিলে? এই আমি চলিলাম—আর এখানে কিছুতেই থাকিব না।"

ইহাতে বাসুকির ভগিনী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন, "ভগবন্, সূর্যাস্ত হইতেছিল, তাই সন্ধ্যাপূজার জন্য আপনাকে জাগাইয়াছিলাম। আপনাকে অপমান করিতে চাহি নাই।"

জরৎকারু বলিলেন, "আমি ঘুমাইয়া থাকিতে কি সূর্যাস্ত হইবার শক্তি আছে? কাজেই আমাকে জাগাইয়া আমার অপমান করিয়াছ। আমি আর এখানে থাকিব না।"

এই বলিয়া মুনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; তাঁহার স্ত্রীর চোখের জলের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না। ইহার কিছুদিন পরেই আস্তিকের জন্ম হইল! ছেলেটি দেখিতে দেবতার ন্যায় সুন্দর। আর তাহার এমন অসাধারণ বুদ্ধি যে, শিশুকালেই বেদ, পুরাণ সমস্ত পড়িয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিল। তাহাকে পাইয়া নাগগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। উহারা কত যত্নের সহিত যে তাহাকে পালন করিতে লাগিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এই সময়েই জনমেজয়ের যজ্ঞ আরম্ভ হয়। যজ্ঞের সকল আয়োজন প্রস্তুত, সকলে তাহা আরম্ভ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় সেখানে একটি লোক আসিল; তাঁহার চোখ দুইটা ভারি লাল। লোকটি স্থপতি বিদ্যায় (অর্থাৎ ঘর বাড়ি প্রস্তুত বিষয়ে) বড়ই পণ্ডিত। সে খানিক এদিক, ওদিক দেখিয়া, তারপর বলিল, "যে সময়ে আর যে স্থানে তোমরা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছ তাহাতে আমার বোধ হয়; তোমরা ইহা শেষ করিয়া উঠিতে পারিবে না; এক ব্রাহ্মণ আসিয়া ইহাতে বাধা দিবে।" ইহা শুনিয়া জনমেজয় তখনই দারোয়ানদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, "আমাকে না জানাইয়া কাহাকেও ঢুকিতে দিবে না।"

তারপর যজ্ঞ আরম্ভ হইল। পুরোহিতেরা কালোরঙের ধুতি চাদর পরিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, আগুনে ঘি ঢালিতে লাগিলেন, ধোঁয়ায় তাঁহাদের চোখ লাল হইয়া উঠিল। সর্পগণের নাম লইয়া অগ্নিতে আহুতি পড়িবামাত্র (ঘৃত ঢালা হইবামাত্র) তাহারা বুঝিল যে, আর প্রাণের আসা নাই। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল যে, নানারকম সাপ আসিয়া আগুনে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বেচারারা ভয়ে অস্থির হইয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, বাঁচিবার জন্য কত চেষ্টাই করিতেছে, লেজ দিয়া আর মাথা দিয়া একজন আর একজনকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিতেছে। আর ক্রমাগত আপনার লোকদিগের নাম লইয়া চিৎকার পূর্বক কত যে

কাঁদিতেছে, তাহার ত কথাই নাই; কিন্তু কিছুতেই তাহারা রক্ষা পাইতেছে না। সাদা, হল্‌দে, নীল, কালো, ছোট, বড়, মাঝারি, সকলরকমের সাপ হাজারে হাজারে আগুনে পুড়িয়া মরিল।

সে সময়ে সাপের চিৎকারে আর কোন শব্দই শুনিবার উপায় রহিল না, পোড়া সাপের গন্ধে সে স্থানে টিকিয়া থাকা ভার হইয়া উঠিল। হায়! মায়ের শাপ কি দারুণ শাপ!

কিন্তু যাহার জন্য এত আয়োজন, সেই তক্ষক এতক্ষণ কি করিতেছিল? যজ্ঞের কথা শুনিবামাত্র আর সকলের আগে, উহারই প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, সে তখনই নিতান্ত ব্যস্তভাবে ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে জোড় হাতে বলিল, "দোহাই দেবরাজ! আমাকে রক্ষা করুন! জনমেজয় আমাকে পোড়াইয়া মারিবার আয়োজন করিতেছে।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার এইখানে থাক।"

ইহাতে তক্ষক কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ইন্দ্রের পুরীতেই বাস করিতে লাগিল।

এদিকে ক্রমাগতই সাপ আসিয়া যজ্ঞের আগুনে পড়িতেছে। এইরূপে কয়েকঘণ্টার ভিতরেই অধিকাংশ সাপ মরিয়া গেল, অল্পই বাকি রহিল। সাপের রাজা বাসুকি এ-সকল ঘটনা দেখিয়া বার বার অজ্ঞান হইয়া যাইতে লাগিলেন। সাপেদের মধ্যে কেহ যে রক্ষা পাইবে এমন আ.। তাঁহার রহিল না।। তাঁহাব কেবল ইহাই মনে হইতে লাগিল, "এইবার বুঝি আমার ডাক পড়ে।" এমন সময় তাঁহার আস্তিকের কথা মনে পড়িল।

বাস্তবিক, আস্তিক যদি সর্পগণকে রক্ষা করিবার জন্যই জন্মিয়া থাকেন, তবে আর তাঁহার বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। এই বেলা গিয়া একটা কিছু না করিলে, আর তাঁহার সে কার্য করিবার অবসরই থাকিত না। সুতরাং বাসুকি তাড়াতাড়ি তাঁহার ভগিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আর দেখিতেছ কি বোন্? শীঘ্র আস্তিককে ইহার উপায় করিতে বল!"

এ কথায় বাসুকির ভগিনী তখনই আস্তিকের নিকট গিয়া বলিলেন, "বাছা, সর্বনাশ উপস্থিত! তুমি যে কার্যের জন্য জন্মিয়াছিলে, শীঘ্র তাহা না করিলে ত আর উপায় দেখিতেছি না!"

ইহাতে আস্তিক একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "আমি কি কার্যের জন্য জন্মিয়াছি মা? বল, আমি এখনই তাহা করিতেছি।"

তখন আস্তিকের মাতা তাঁহাকে কদ্রুর শাপের কথা, আর জনমেজয়ের যজ্ঞের কথা আর তাঁহার দ্বারা যে সেই যজ্ঞ বারণ হইবে সেই কথা, আগাগোড়া শুনাইলেন। তাহা শুনিয়া আস্তিক বাসুকির নিকট গিয়া বলিলেন, "মামা আপনি আর দুঃখ করিবেন না। এই আমি চলিলাম—যেমন করিয়াই হউক, সে যজ্ঞ আমি বারণ করিয়া আসিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

এই বলিয়া আস্তিক জনমেজযের যজ্ঞের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় বড় মুনি ঋষিতে সে যজ্ঞস্থান পরিপূর্ণ ছিল। আর তাহার দরজায় যমদূতের মতন সিপাহী সকল ঢাল তলোয়ার হাতে পাহারা দিতেছিল। বালক আস্তিককে দেখিয়াই তাহারা ধমক দিয়া বলিল, "এইয়ো! কোথায় যাইতেছ?"

আস্তিক তাহাতে কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া বলিলেন, "তোমাদের জয় হউক দারোয়ানজী। যজ্ঞটি যেমন জমকালো, তোমরা তাহার উপযুক্ত দারোয়ান। এমন সুন্দর যজ্ঞও কেহ দেখে

নাই। তোমাদের দয়া হইলে আমি একটু তামাশা দেখিয়া আসি।"

প্রশংসা শুনিয়া দারোয়ানেরা বড়ই খুশি হইল। তারপর আর তাহারা আস্তিককে ঢুকিতে দিতে আপত্তি করিল না।

ভিতরে গিয়া আস্তিক জনমেজয়কে বলিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! আপনি এমন সুন্দর যজ্ঞ করিতেছেন যে, কি বলিব। মহারাজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধু গণের মঙ্গল হউক। প্রাচীনকালের অতি প্রসিদ্ধ রাজা আর মুনি ঋষিগণ যে-সকল মহা মহা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞও তেমনি হইয়াছে। মহারাজ! আমি প্রার্থনা করি আমার বন্ধু গণের মঙ্গল হউক। কত বড় বড় মুনিগণ আপনার যজ্ঞে কাজ করিতেছেন, ইঁহারা যে কত বড় পণ্ডিত, তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আর আপনি যে কিরূপ ধার্মিক রাজা; তাহা মনে করিলেই বড় সুখ হয়।"

নিজের প্রশংসা শুনিলে, দেবতার মনও খুশি হয়। আর সেই প্রশংসা যদি আস্তিকের ন্যায় অপরূপ সুন্দর একটি বালকের সুমিষ্ট কথায় হয়, তবে তার উপর সন্তুষ্ট না হইয়া কেহই থাকিতে পারে না। সুতরাং জনমেজয় বলিলেন, "হে মুনিগণ, আপনাদের কি অনুমতি হয়? আমার ত ইচ্ছা হইতেছে যে, এই সুন্দর বালকটি যাহা চায়, তাহা তাহাকে দিয়া দেই।"

মুনিরা বলিলেন, "তক্ষক বিনা ইনি আর যাহা চাহেন, তাহাই পাইতে পারেন।"

তখন রাজা আস্তিকের বর দিতে গেলে, প্রধান মুনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ তক্ষক কিন্তু এখনো আসিল না।"

তাহাতে জনমেজয় বলিলেন, "আপনারা তক্ষককে শীঘ্র উপস্থিত করিবার চেষ্টা করুন।"

তখন, সেই লাল চোখওয়ালা লোকটি— যে বলিয়াছিল যে, এক ব্রাহ্মণ যজ্ঞে বাধা দিবে—বলিল, "মহারাজ তক্ষক ইন্দ্রের নিকট আশ্রয় লইয়াছে, তাই তাহাকে সহজে আনা যাইতেছে না।"

মুনিরাও বলিলেন, "হাঁ এ কথা ঠিক।"

ইহাতে প্রধান মুনি ইন্দ্রের পূজা আরম্ভ করিলেন। তখন আর ইন্দ্র চুপ করিয়া স্বর্গে থাকিবেন কিরূপে? তাঁহাকে পূজার স্থানে যাত্রা করিতেই হইল। তক্ষক দেখিল মহা বিপদ! ইন্দ্রকে ছাড়িয়া যাইতেও ভরসা হয় না, তাঁহার সঙ্গে যাইতেও সাহস হয় না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, সে ইন্দ্রের চাদরের ভিতরে লুকাইয়া রহিল।

এদিকে রাজা জনমেজয় দেখিলেন যে, ইন্দ্রের আশ্রয় পাইয়া তক্ষক তাঁহাকে ফাঁকি দিতেছে। সুতরাং তিনি ক্রোধভরে মুনিদিগকে বলিলেন, "যদি ইন্দ্র তক্ষককে লুকাইয়া রাখেন, তবে তাঁহাকে সুদ্ধই দুষ্টকে পোড়াইয়া মারুন।"

রাজার কথায় মুনিগন তক্ষকের নাম লইয়া অগ্নিতে আহুতি দিবামাত্র ইন্দ্রকে সুদ্ধই সে কাঁপিতে কাঁপিতে আকাশের ভিতর দিয়া আসিয়া দেখা দিল। তখন ইন্দ্র প্রাণের ভয়ে তক্ষককে ছাড়িয়া ব্যস্তভাবে প্রস্থান করিলে, তক্ষক ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে যজ্ঞের আগুনের কাছে আসিতে লাগিল। তাহাতে ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, আর চিন্তা নাই। ঐ দেখুন তক্ষক চ্যাচাইতে চ্যাচাইতে এদিকে আসিতেছে। এখন বালকটিকে বর দিতে পারেন।"

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণকুমার, এখন তুমি যাহা চাহ তাহাই দিব। বল তোমার কি বর চাই?"

আস্তিক বলিলেন, "আমি এই বর চাহি যে, আপনার যজ্ঞ থামিয়া যাউক। আর যেন ইহার আগুনে পুড়িয়া সাপেদের মৃত্যু না হয়।"

এ কথা শুনিয়াই ত রাজা চমকিয়া উঠিলেন! তাহাকে যদি হঠাৎ তক্ষকে কামড়াইত, তবুও বোধহয় তিনি এত চমকিয়া উঠিতেন না। তিনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সেও কি হয়? ঠাকুর, আপনি আর কিছু প্রার্থনা করুন। টাকা কড়ি যত আপনার ইচ্ছা হয়, আমি আপনাকে দিতেছি, কিন্তু যজ্ঞ থামাইতে পারিব না।"

আস্তিক বলিলেন, "আমি যাহা চাহি, তাহা যদি না পাইলাম, তবে টাকা কড়ি দিয়া কি করিব? আমি আমার মাতুলদিগকে বাঁচাইতে আসিয়াছি। টাকার জন্য আসি নাই।"

তখন মুনিগণ বলিলেন, "মহারাজ, যখন দিবেন বলিয়াছেন, তখন এই বালক যাহা চাহিতেছেন তাহা ইঁহাকে দিতেই হইতেছে।"

এদিকে তক্ষক আগুনের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আর এক মুহূর্ত পরে পুড়িয়া মারা যাউবে। ইহা দেখিয়া আস্তিক চিৎকার পূর্বক তিনবার তাহাকে বলিলেন, "তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! তিষ্ঠ!" (থামো! থামো! থামো!) তাহাতেই তক্ষক আর আগুনে না পড়িয়া কিছুকাল শূন্যে থামিয়া রহিল।

ঠিক এই সময়ে ব্রাহ্মণদিগের কথায়, জনমেজয় আস্তিককে বর দিতে সম্মত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা তবে যজ্ঞ থামুক! সর্পগণের ভয় দূর হউক।"

এ কথায় তখনই যজ্ঞ থামিয়া গেল, তক্ষকেরও আর পুড়িয়া মরিতে হইল না। যাহারা যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া 'জয় জয়' শব্দে কোলাহল করিতে লাগিল। এইরূপে আস্তিক তাহার মাতুলদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আস্তিকের এই কার্যে সাপেরা প্রাণে বাঁচিয়া গেল। সুতরাং তাহারা যে সন্তুষ্ট হইল, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাহারা বার বার বলিতে লাগিল, "বাছা, তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছ, বল আমরা কি করিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিব।"

আস্তিক বলিলেন, "আপনারা যদি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে, আমার নাম যে লইবে, আপনারা আর তাহাকে হিংসা করিবেন না।"

সাপেরা বলিল, "এখন হইতে যে তোমাব নাম লইবে আমরা তাহার কোন অনিষ্ট করিব না। এ কথা যে অমান্য করিবে তাহার মাথা শিমূলের কলার মত ফাটিয়া যাইবে।"

সাগরে জল আনিবার কথা

অগস্ত্য মুনি সাগরের জল খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সে জল তাঁহার পেটে গিয়া হজম হইয়া গেল, সুতরাং কাজের সময় তিনি আর তাহা ফিরাইয়া দিতে পারিলেন না। বহুকাল পর্যন্ত, মরা নদীর খাতের ন্যায়, সাগর শুকনো পড়িয়া ছিল। তারপর কেমন করিয়া আবার জল আসিল, সে অতি আশ্চর্য ব্যাপার।

ইক্ষ্বাকু বংশে সগর নামে একজন অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বীরত্বে, তাঁহার সমান আর সেকালে কোন রাজাই ছিলেন না। সকল বিষয়েই তিনি সুখী ছিলেন, কেবল এক বিষয়ে তাঁহার বড়ই দুঃখ ছিল, তাঁহার পুত্র ছিল না। পুত্র লাভের জন্য

তিনি তাঁহার বৈদর্ভী এবং শৈব্যা নাম্নী দুই রানীকে লইয়া কৈলাস পর্বতে গিয়া কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে, শিব রাজার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তুমি কি চাহ?"

রাজা ভক্তিভরে শিবকে প্রণাম করিয়া, জোড় হাতে বলিলেন, "ভগবন, আমার পুত্র নাই। আমার মৃত্যুর পর আমার বিশাল সাম্রাজ্য ভোগ করিবার লোক থাকিবে না; আমার বংশলোপ হইয়া যাইবে, সুতরাং, যদি আমার প্রতি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া, যাহাতে আমার পুত্র হয়, এমন বর দিন।"

শিব কহিলেন, "মহারাজ, তোমার এক রানীর ষাট হাজার পুত্র হইবে, কিন্তু তাহারা সকলেই এক সঙ্গে মরিয়া যাইবে। আর -এক রাণীর একটি মাত্র পুত্র হইবে, সে-ই তোমার বংশ রক্ষা করিবে।"

কিছুদিন পরে বৈদর্ভীর ষাট হাজার আর শৈব্যার একটি পুত্র হইল। বৈদর্ভীর ষাট হাজার পুত্র জন্মিবার সময় বড়ই আশ্চর্য ঘটনা হয়। ছেলেগুলি একটি লাউয়ের ভিতরে ছিল। লাউ দেখিয়া রাজা তাহা ফেলিয়া দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, এমন সময় আকাশ হইতে কে যেন অতি গম্ভীর স্বরে বলিল, 'মহারাজ, ওটাকে ফেলিয়া দিও না। উহার ভিতরেই তোমার ষাট হাজার পুত্র আছে। উহার ষাট হাজারটি বীচিকে ঘৃতের কলসির ভিতর রাখিয়া দাও, দেখিবে তোমার ষাট হাজার পুত্র হইবে।"

সুতরাং রাজা আর লাউটি ফেলিয়া না দিয়া, উহার বীচিগুলি ঘিয়ের ভিতরে রাখিয়া দিলেন ইহাতে অনেক দিন পরে, সেই বীচির ভিতর হইতে ষাট হাজারটি সুন্দর খোকা বাহির হইল; সেই খোকাগুলি বড় হইয়া ষাট হাজারটি অসুরের মতন গোঁয়ার গুণ্ডা হইল। তাহাদের জ্বালায় মানুষের কথা আর কি বলিব, দেবতা গন্ধর্ব পর্যন্ত সুস্থির হইয়া বসিতে পাইত না।

শেষে সকলে ইহাদের দৌরাত্ম্যে জ্বালাতন হইয়া, ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিল, "ভগবন্, আর ত পারি না! ইহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণের একটা উপায় করুন!"

ব্রহ্মা বলিলেন, "তোমাদের কোন চিন্তা নাই। আর অতি অল্পদিনের ভিতরেই ইহারা নিজের স্বভাব দোষে নষ্ট হইবে।"

এ কথায় সকলে কতকটা নিশ্চিত হইয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম পূর্বক যে যাহার ঘরে ফিরিল।

তারপর সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের ঘোড়ার রক্ষক হইল ঐ ষাট হাজার রাজপুত্র। তাহারা দিনকতক তাহাকে দেশে দেশে তাড়াইয়া ফিরিল। সে শুকনো সাগরের বালির উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে কোথায় যে চলিয়া গেল, রাজপুত্ররা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। তখন তাহারা দেশে ফিরিয়া তাহাদের পিতাকে বলিল, "বাবা, সর্বনাশ ত হইয়াছে, ঘোড়া হারাইয়া গিয়াছে!"

এ কথা শুনিয়া সগর বলিলেন, "তোমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে খুব ভাল করিয়া খোঁজ!"

তখন রাজপুত্রেরা আবার ঘোড়া খুঁজিতে বাহির হইল, কিন্তু সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান করিতে পারিল না। সুতরাং তাহারা আবার তাহাদের পিতার নিকট আসিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, "বাবা আমরা শহর, বাজার, পাহাড়, পর্বত, বন, বাদাড়, কিছুই বাকি রাখি নাই। কিন্তু ঘোড়া ত কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না!"

এ কথায় সগর রাজা অস্থির হইয়া বলিলেন, "দূর হ তোরা এখান হইতে! ঘোড়া না লইয়া তোরা আর দেশে মুখ দেখাইতে পাইবি না।"

সুতরাং আবার ষাট হাজার ভাই ঘোড়ার সন্ধানে বাহির হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা আবার সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, তাহার এক জায়গায় একটি গভীর গর্ত রহিয়াছে। তখন ষাট হাজার ভাই, ষাট হাজার কোদাল লইয়া সেই গর্তের চারিধারে খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অনেক খুঁড়িয়াও তাঁহারা সেই সর্বনেশে গর্তের তলা পাইল না। দিন গেল মাস গেল, বৎসর চলিয়া গেল, তথাপি সেই গর্তের ভিতরে উঁকি মারিলে, যেমন অন্ধকার ছিল, তেমনি অন্ধকার দেখা যায়।

ইহাতে তাহারা রাগের ভরে আরো বেশি করিয়া খুঁড়িতে লাগিল, গর্ত যতই অন্ধকার দেখা যায়, তাহারা ততই খালি বলে, "খোঁড়, খোঁড়, খোঁড়!" এমনি করিয়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহারা একেবারে পাতালে গিয়া উপস্থিত হইল। পাতালে গিযাই তাহারা দেখিল যে, সেখানে কপিল মুনি বসিয়া আছেন, আর ঘোড়াটি তাঁহার কাছেই ঘাস খাইতেছে। ঘোড়া দেখিয়া আর কি তাহারা স্থির থাকিতে পারে? তখনই কপিল যে সেখানে বসিয়া আছেন তাহা যেন তাহারা দেখিয়াও দেখিতে পাইল না। কপিলকে অগ্রাহ্য করিয়াই তাহারা ঘোড়া ধরিতে ছুটিয়া চলিল।

ইহাতে কপিল রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে দুই চক্ষু লাল করিয়া ভীষণ ভ্রূকুটির সহিত উহাদিগের পানে তাকাইবামাত্র সেই ষাট হাজার রাজপুত্র পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

যখন এই ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়, তখন নারদ মুনি সেইদিক দিয়া যাইতেছিলেন। তিনিই রাজপুত্রগণের মৃত্যুর সংবাদ সগরকে শুনান। পুত্রদিগের মৃত্যুর কথা শুনিয়া সগর দুঃখে অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। তারপর নিজের নাতি অংশুমানকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "এখন ঘোড়া না আনিতে পারিলে তা আর উপায় দেখি না।"

শৈব্যার যে একটি পুত্র হয়, তাহার নাম ছিল অসমঞ্জ, অসমঞ্জ এমনই দুষ্ট ছিল যে, সে ছোট ছোট ছেলেপিলের গলা ধরিয়া তাহাদিগকে জলে ফেলিয়া দিত। তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া সকলে সগরের নিকট নালিশ করাতে তিনি তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। অংশুমান সেই অসমঞ্জর পুত্র।

সগরের কথায় অংশুমান সেই গর্তের ভিতর দিয়া পাতালে চলিয়া গেলেন। কপিল তখনো সেখানে বসিয়া ছিলেন, আর ঘোড়াটাও তাঁহার কাছে ছিল। অংশুমান মুনিকে দেখিবামাত্র ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করাতে, মুনি তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বাঃ, বেশ ত ছেলেটি! তুমি কি চাও বৎস?"

অংশুমান জোড়হাতে বলিলেন, "ভগবন্, আপনি দয়া করিয়া ঘোড়াটিকে আমাকে দিলে আমাদের যজ্ঞ শেষ হইতে পারে।"

মুনি বলিলেন, "বটে? তোমাদের যজ্ঞের ঘোড়া? এখনি তুমি ওটাকে নিয়া যাও। তোমার আর কিছু চাই?"

অংশুমান জোড়হাতে বলিলেন, "ভগবন্ দয়া করিয়া যদি আমার খুড়া মহাশয়দিগকে উদ্ধার করিয়া দেন তবে বড় ভাল হয়।"

মুনি বলিলেন, "তুমি যখন চাহিতেছ তখন তাহাও হইবে কিন্তু সে এখন নহে, আর তাহা

এত সহজে হইবে না। তোমার যে নাতি হইবে, সে মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া, তাঁহার সাহায্যে, গঙ্গাদেবীকে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে লইয়া আসিবে। সেই স্বর্গের নদী গঙ্গার জল লাগিলে, তোমার খুড়াগণ উদ্ধার পাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এখন শীঘ্র ঘোড়া লইয়া দেশে গিয়া যজ্ঞ শেষ কর, তোমার মঙ্গল হউক।"

এইরূপে অংশুমান ঘোড়া লইয়া দেশে ফিরিলে, সগরের অশ্বমেধ শেষ হইল।

অংশুমানের পুত্র দিলীপ, গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই। তারপর তাঁহার পুত্র পরম ধার্মিক এবং সত্যবাদী মহারাজ ভগীরথ জন্মগ্রহণ করিলেন।

ভগীরথ

বড় হইয়া যখন সগরের পুত্রগণেব ভয়ঙ্কর মৃত্যুব কথা শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহাব মনে অতিশয় ক্লেশ হইল। তিনি তখনই এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ইহাদিগের উদ্ধারের উপায় করিতে হইবে।

এই ভাবিয়া তিনি মন্ত্রীগণেব হাতে রাজ্যের ভার দিয়া, গঙ্গার তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। এক হাজার বৎসর তপস্যার পর গঙ্গা তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তুমি কিসের জন্য এত ক্লেশ করিয়া আমার আরাধনা করিতেছ?" ভগীরথ বলিলেন, "হে দেবি, সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র কপিলের কোপে ভস্ম হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আমার পূর্বপুরুষ। এইরূপে তাঁহাদের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহারা স্বর্গে যাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের দেহের ছাই আপনার জলে ভিজিলে তবে তাঁহাদের উদ্ধার হয়। অতএব আপনি কৃপা করিয়া তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে আগমন করুন আমার এই প্রার্থনা।"

গঙ্গা ভগীরথকে বলেলেন, "এখন বল বাবা কোন পথে যাইব?"

গঙ্গা বলিলেন, "তোমার জন্য আমি অবশ্য পৃথিবীতে আসিব। কিন্তু আমি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পড়িবার সময় পৃথিবী ত আমার বেগ সহ্য করিতে পারিবে না। সে সময়ে যদি মহাদেব আসিয়া মাথা পাতিয়া আমাকে নেন; তবেই এ কাজ সম্ভব হয় নহিলে এ জগতে এমন আর কিছুই নাই যাহা আমার বেগ সহিতে পারে। তুমি মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া, এ কাজটি তাঁহাকে দিয়া করাইয়া লইতে পার কি না দেখ।"

গঙ্গার কথায় ভগীরথ কৈলাসপর্বতে গিয়া, শিবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একে শিব সহজেই সন্তুষ্ট হন, তাহাতে এমন তপস্যা! কাজেই তাঁহাকে গঙ্গার প্রস্তাবে সম্মত করিতে ভগীরথের অধিক বিলম্ব হইল না।

সাধারণ পাহাড় পর্বত হইতে যে নদীর জল গড়াইয়া পড়ে, তাহার তামাশা দেখিবার জন্যই লোকে কত পরিশ্রম করিয়া দেশ বিদেশে যায়। সুতরাং গঙ্গার স্বর্গ হইতে পড়িবার সময় যে দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি সকলে ছুটিয়া তামাশা দেখিতে আসিবে, তাহা বিচিত্র কি? সে সময়ে সেই ঘোরতর ঝর্ঝর গর্জনে নিশ্চয়ই ত্রিভুবন কাঁপিয়া গিয়াছিল; ফেনায় মহাদেবের জটা সাদা হইয়া গিয়াছিল; আর আকাশ ছুঁইয়া সেই জলের কণা উড়িয়াছিল। সেই জলকণায় রোদ পড়িয়া যে কি সুন্দর রামধনুক হইয়াছিল, তাহা যে দেখে নাই, সে কি করিয়া বুঝিবে?

এইরূপে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে নামিয়া গঙ্গা ভগীরথকে বলিলেন, "এখন বল বাবা, কোন পথে যাইব?" তখন ভগীরথ আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিলেন, আর তাহার পিছু পিছু গঙ্গা কলকল শব্দে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া শেষে তাঁহারা সমুদ্রের উপস্থিত হইলে, গঙ্গার জলে ভিজিয়া সাগরের পুত্রগণের উদ্ধার হইল, আর সাগর যে এতদিন শুকনো পড়িয়াছিল, তাহাও পরিপূর্ণ হইল। সে সময়ে সাগরের জল অতিশয় মিষ্ট ছিল। তারপর একবার সমুদ্রের দুর্বুদ্ধি হওয়াতে, সে বিষ্ণুকে অবহেলা করে। তখন বিষ্ণু তাহার শরীরের ঘাম দিয়া তাহাকে লোনা করিয়া দেন।

শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর কথা

বৃষপর্বা দানবদিগের রাজা, শুক্রাচার্য তাহাদের গুরু। শুক্রাচার্যের কন্যার নাম দেবযানী, বৃষপর্বার কন্যার নাম শর্মিষ্ঠা। একদিন দানবের মেয়েরা বনে বেড়াইতে গেল, দেবযানী আর শর্মিষ্ঠাও তাহাদের সঙ্গে গেলেন।

স্নানের পর পরিবার জন্য মেয়েরা যে কাপড় আনিয়াছিল, তাহা এক জায়গায় সাজাইয়া রাখিয়া, তাহারা আমোদ আহ্লাদ করিতেছিল। ইহার মধ্যে কখন বাতাস আসিয়া সেই-সকল কাপড় উল্টোপাল্টা করিয়া দিয়াছে, কেহ তাহা টের পায় নাই। সুতরাং তাহারা নিজের নিজের কাপড় খুঁজিতে গিয়া ভুল করিতে লাগিল। শর্মিষ্ঠা যে কাপড়খানি হাতে লইলেন, সেখানি ছিল দেবযানীর; আর দেবযানী তাহাতে রাগিয়া গিয়া শর্মিষ্ঠাকে বলিলেন, "হ্যাঁ লো, অসুরের মেয়ে, তুই কোন্ সাহসে আমার কাপড় নিতে গেলি?"

এ কথায় শর্মিষ্ঠা বলিলেন, "দেখ্ দেবযানী, আমি মহারাজ বৃষপর্বার কন্যা। তোর পিতা

আমার পিতার চেয়ে নিচু আসনে বসিয়া সর্বদা তাঁহার স্তব করিয়া থাকে। তুই কি ভাবিয়াছিস যে খালি তোর মুখের জোরে তুই আমার সমান হইয়া যাইবি?”

তখন দেবযানী আর কোন কথা না কহিয়া, কাপড় ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলে, শর্মিষ্ঠা তাঁহাকে একটা কুয়ার ভিতর ঠেলিয়া ফেলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মনে হইল যে, দেবযানী নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ঠিক সেই সময়ে নহুষের পুত্র মহারাজ যযাতি ঘোড়ায় চড়িয়া সেই পথে যাইতেছিলেন। আব সারাদিন হরিণ তাড়াইয়া তাঁহার অত্যন্ত পিপাসা হওয়াতে, তিনি জল খুঁজিতে খুঁজিতে সেই কুয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন।

কুয়ার নিকটে আসিয়া তিনি যখন তাঁহার ভিতরে কান্না শুনিতে পাইলেন, তখন তাহার আর আশ্চর্যের সীমা রহিল না। তিনি ব্যস্তভাবে কুয়ার ভিতরে তাকাইয়া দেখিলেন যে, একটি পরমাসুন্দবী কন্যা তাহাতে পড়িয়া কাঁদিতেছে।

রাজা অবিলম্বে সেই কন্যাটিকে কুয়ার ভিতর হইতে উঠাইলেন, আব তাঁহার পরিচয় লইয়া জানিলেন যে তিনি শুক্রাচার্যেব কন্যা দেবযানী।

দেবযানীকে মিষ্ট কথায় শান্ত করিয়া যযাতি সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এমন সময় ঘূর্নিকা নামে দেবযানীদের এক দাসী, তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবযানী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে বলিলেন, “ঘূর্নিকা তুমি বাবাকে গিয়া বল যে, শর্মিষ্ঠা আমাকে কুয়ায় ফেলিয়া দিয়াছিল, আমি আর বৃষপর্বার দেশে যাইব না।”

শুক্রাচার্য ঘূর্নিকার মুখে এ কথা শুনিতে পাইযাই, তাড়াতাড়ি দেবযানীব নিকট চলিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবযানী বলিলেন, “বাবা, শর্মিষ্ঠা আমাকে কুযার ভিতরে ফেলিয়া দিয়াছিল; আর সে বলিয়াছে যে, আপনি নাকি বৃষপর্বার নীচে বসিয়া তাঁহার স্তব করেন। বাবা, এ কথা যদি সত্য হয় তবে তাহার নিকট আমি ঘাট মানিব। আর যদি তাহা না হয়, তবে এমন কথা বলার সাজা তাহাকে দিতে হইবে।”

শুক্রাচার্য দেবযানীকে শান্ত কবিবাব জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার রাগ থামিল না।

তখন শুক্র বৃষপর্বার নিকট গিয়া বলিলেন, “হে দানবরাজ, পাপ করিলে সকলকেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। আমার শিষ্য কচকে তুমি তোমার লোক দিয়া কতরকম যন্ত্রণাই দিয়াছিলে। তারপর তোমার কন্যা শর্মিষ্ঠা আমার কন্যা দেবযানীকে কুয়ায় ফেলিয়া দিয়াছে। সুতরাং আমরা আর তোমার দেশে বাস কবিব না, আজই তোমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলাম।”

শুক্রের কথায় বৃষপর্বার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “যদি আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যান, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় সমুদ্রে ডুবিয়া মরিব।”

শুক্র বলিলেন, “তুমি তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার; কিন্তু তোমার কন্যা আমার দেবযানীকে যে অপমান করিয়াছে, তাহা আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না।”

বৃষপর্বা বলিলেন, “ভগবন্! আমাদের যাহা কিছু আছে সকলই আপনার। আপনি আমাদের সকলের প্রভু। আপনি আমাদিগকে দয়া করুন।”

এ কথা শুক্র দেবযানীকে বলিলে, তিনি বলিলেন, "বৃষপর্বা যদি নিজের আমার নিকট আসিয়া এ কথা বলেন, তবে আমি ইহা বিশ্বাস করিতে পারি।"

তাহা শুনিয়া বৃষপর্বা বলিলেন, "তোমার কি ইচ্ছা হয় বল, উহা যত বড় জিনিসই হউক, আমি নিশ্চয় তাহা তোমাকে দিব।"

তখন দেবযানী বলিলেন, "আমি এই চাই যে, শর্মিষ্ঠা একহাজার অসুর-কন্যা লইয়া আমার দাসী হইবে। আমাব বিবাহের পব যখন আমি স্বামীর গৃহে যাইব, তখনো সে এক হাজার অসুর-কন্যা সমেত আমার দাসী হইয়া আমার সঙ্গে যাইবে।'

এ কথা শুনিয়া বৃষপর্বা তখনই একটি দাসীকে বলিলেন, 'তুমি শীঘ্র শর্মিষ্ঠাকে ডাকিয়া আন।'

দাসী রাজার আজ্ঞায় শর্মিষ্ঠার নিকট গিয়া বলিল, 'রাজকন্যা, মহারাজ ডাকিতেছেন, তুমি শীঘ্র চল। দেবযানীকে সন্তুষ্ট কবিবাব জন্য তোমাকে তাঁহার দাসী হইতে হইবে, নহিলে অসুরদিগের বড়ই বিপদ, দেবযানীব কথায় শুক্র আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছিলেন।'

এ কথায় শর্মিষ্ঠা বলিলেন, 'আমার জন্য শুক্র আর দেবযানী চলিয়া যাইবেন, ইহা কখনই হইতে পাবে না। তাহার চেয়ে আমাব দাসী হইয়া থাকাই ভাল।'

এই বলিয়া শর্মিষ্ঠা এক হাজার সখী সমেত দেবযানীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'গুরুকন্যা, আমি আমাব এই একহাজার সখী লইয়া তোমার দাসী হইতেছি। তুমি স্বামীর ঘবে যাইবার সময় আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইও।'

শর্মিষ্ঠাব কথায় দেবযানী বলিলেন, 'সে কি? তুমি বাজাব মেয়ে হইয়া কি করিয়া দাসী হইতে যাইবে?'

শর্মিষ্ঠা বলিলেন, 'আমি দাসী হইলে যদি আমার আত্মীয়গণের বিপদ নিবারণ হয়, তবে আমার তাহাই করা উচিত।'

এইরূপে দানবদিগের উপকারের জন্য শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসী হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।দেবযানী কোথাও বেড়াইতে গেলে, শর্মিষ্ঠা একহাজাব সখী লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতেন, দেবযানী শুইয়া বা বসিয়া থাকিলে শর্মিষ্ঠা তাঁহার পা টিপিয়া দিতেন।

একদিন দেবযানী সেই বনে আবার বেড়াইতে গেলেন। শর্মিষ্ঠা ও তাঁহার সখীগণ দেবযানীর সঙ্গে গিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

সেদিনও মহারাজ যযাতি সেই বনে শিকার করিতে আসিয়াছেন, আর জল খুঁজিতে খুঁজিতে সেই কন্যাগণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রথমে যখন যযাতির সহিত দেবযানীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন দেবযানীব যার পর নাই দুঃখের অবস্থা। আর এখন তিনি পরম সুখে বসিয়া একহাজার সখী সমেত রাজকন্যার সেবা গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং, হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া যযাতির চিনিতে না পা'বই কথা।

কিন্তু যযাতিকে দেবযানীর না চিনিতে পারার কোন কারণ ছিল না। যযাতির দয়ায় মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া অবধি দেবযানী তাঁহাকে বড় ভালোবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যযাতিকে আবার দেখিয়া তাঁহার সেই ভালোবাসা আরো বাড়িয়া গেল।

এই সময়ে শুক্রাচার্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার কন্যা যযাতিকে ভালোবাসেন, আর যযাতিও তাঁহার কন্যাকে ভালোবাসেন, তখন

তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যযাতিকে বলিলেন, "মহারাজ, আমি আনন্দের সহিত অনুমতি দিতেছি, তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ কর।"

এইরূপে যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ হইল। যযাতি তাঁহাকে লইয়া পরম আনন্দে নিজের দেশে চলিয়া আসিলেন।

অবশ্য শর্মিষ্ঠা আর তাঁহার একহাজার সখীও যযাতির সহিত তাঁহার রাজধানীতে আসিলেন। শুক্র যযাতিকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, "সাবধান! শর্মিষ্ঠাকে তুমি বিবাহ করিতে পারিবে না।"

রাজধানীতে পৌঁছিয়া দেবযানী রাজার বাড়ীতে রহিলেন, কিন্তু শর্মিষ্ঠাকে তিনি সেখানে থাকিতে দিলেন না। তাঁহার কথায় রাজা একটি অশোক বনের ভিতরে শর্মিষ্ঠার জন্য একটি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

এইরূপে দিন যায়। ইহার মধ্যে একদিন কি হইয়াছে, শুন। শর্মিষ্ঠাকে যযাতি বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু দেবযানীকে তাহা জানিতে দেন নাই। দেবযানীর দুই পুত্র তাহাদের নাম যদু আর তুর্বসু। শর্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র, তাঁহাদের নাম দ্রুহ্যু, অনু আর পুরু। দেবযানীর পুত্রেরা রাজপুত্রের মতন পরম সুখে রাজ্যের ভিতরে চলাফেরা করে, তাহাদের সম্মান আর আদরের সীমা নাই। শর্মিষ্ঠার ছেলে তিনটিকে, দেবযানীর ভয়ে, রাজা সেই অশোক বনের ভিতরেই লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাদিগকে বাহিরে আসিতে দেন না। ছেলে কয়টি আশপাশের বনে খেলা করিয়া বেড়ায়। বাহিরের লোক তাহাদিগকে দেখিতেও পায় না, কাজেই তাহাদের কথা জানেও না।

একদিন দেবযানী রাজার সঙ্গে বনের ভিতরে বেড়াইতে গিয়া সেই ছেলে তিনটিকে দেখিতে পাইলেন। এমন সুন্দর ছেলে তিনটি বনের ভিতরে কোথা হইতে আসিল? দেখিতে রাজপুত্রের মতন অথচ তাহাদের সঙ্গে লোক জন নাই। এ-সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে সকলেরই আশ্চর্য বোধ হয়, আর তাহাদের পরিচয় লইতে ইচ্ছা করে। দেবযানী তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা তোমরা কে? তোমাদের পিতার নাম কি?"

এ কথায় ছেলে তিনটি পরম আহ্লাদের সহিত যযাতিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, "এই আমাদের বাবা! আমাদের মার নাম শর্মিষ্ঠা।"

এই বলিয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে যযাতির নিকট ছুটিয়া আসিল, কিন্তু যযাতি দেবযানীর ভয়ে যেন তাহাদিগকে চিনিতেই পারিলেন না। ইহাতে ছেলে তিনটি অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের মায়ের নিকট চলিয়া গেল।

ইহার পর আর দেবযানীর জানিতে বাকি রহিল না যে, রাজা লুকাইয়া শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মনে কি যে কষ্ট হইল, তাহা কি বলিব। তাঁহার বিশাল সুন্দর চক্ষু দুইটি জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তিনি আর এক মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব না করিয়া, "মহারাজ, এই আমি চলিলাম" বলিয়া তখনই তাঁহার পিতার নিকট যাত্রা করিলেন।

রাজা নিতান্ত দুঃখের সহিত তাঁহাকে নানারূপ মিনতি করিতে করিতে তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন, কিন্তু দেবযানী কিছুতেই ফিরিলেন না। তিনি রাজাকে ভালো মন্দ কিছু না বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে শুক্রাচার্যের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়া জোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তারপর দেবযানীর নিকট সকল কথা শুনিয়া, শুক্র যযাতিকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, "মহারাজ! তুমি ধার্মিক হইয়া অধর্ম করিয়াছ। এই দোষে এখনই দারুণ জরা (ভয়ানক বুড়া মানুষের অবস্থা) আসিয়া তোমাকে ধরিবে।"

শুক্র এ কথা বলিবামাত্র রাজার চুল পাকিয়া গেল, দাঁত পড়িয়া গেল, চোখ ঝাপ্‌সা হইয়া গেল, চামড়া ঝুলিয়া পড়িল, তাঁহার হাত পা আর মাথা কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার মুখের ভিতরে কথা জড়াইয়া যাইতে লাগিল। তিনি আর কানে শুনিতে পান না; সোজা হইয়া দাঁড়াইতেও পারেন না।

তখন যযাতি বিনয় করিয়া শুক্রকে বলিলেন, "ভগবন্, এই অবস্থায় আমার আর বাঁচিয়া লাভ কি? আমি যে এখনো এই পৃথিবীর সুখ ভালো করিয়া ভোগ করিতে পারি নাই। দয়া করিয়া আমার শরীর হইতে এই জরা দূর করিয়া দিন।"

শুক্র বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা হইবেই। তবে তুমি ইচ্ছা করিলে, আমাকে স্মরণ করিয়া, এই জরা অন্য কাহাকেও দিতে পার। ইহাতে তোমার পাপ হইবে না।"

রাজা বলিলেন, "তবে আমাকে এই অনুমতি দিন যে, আমার পাঁচ পুত্রের মধ্যে যে আমার জরা নিযা আমাকে তাহার যৌবন দিতে সম্মত হইবে, সেই আমার রাজ্য পাইবে।"

শুক্র বলিলেন, "আচ্ছা আমি তোমাকে এ বিষয়ে অনুমতি দিতেছি।"

তারপর জরায় কাতর যযাতি দেশে ফিরিয়া, নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বলিলেন, "বৎস, দেখ শুক্রের শাপে আমার কি দশা হইয়াছে। পৃথিবীর সুখে এখনো আমার তৃপ্তি হয় নাই। তুমি যদি, একহাজার বৎসবের জন্য, আমার এই জরা নিয়া তোমার যৌবন আমাকে দাও, তবে আমি কিছু কাজকর্ম এবং সুখ ভোগ করিয়া লইতে পারি। একহাজার বৎসর পরে আবার তোমার যৌবন তোমাকে ফিরাইয়া দিব।"

যদু বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার জরা লইয়া কষ্ট পাইতে ইচ্ছা করি না। আপনার আরো অনেক পুত্র আছে, তাহাদিগকে আপনার জরা দিন।"

এ কথায় যযাতি বলিলেন, "তুমি যখন আমার কথা অমান্য করিলে, তখন, তুমি বা তোমার বংশের কেহ, রাজ্য পাইবে না!"

তারপর যযাতি তুর্বসুকে বলিলেন, "বৎস, তুমি আমার জরা গ্রহণ কর।"

তুর্বসু বলিলেন, "মহারাজ, আমি তাহা করিতে পারিব না।"

এ কথায় রাজা তুর্বসুকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, "তোমার ছেলেপিলে হইবে না। আর তুমি পাপীদিগের রাজা হইবে।"

তারপর দ্রুহ্য আর অনুকে ডাকিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাঁহারাও তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন না। ইহাতে তিনি দ্রুহ্যকে বলিলেন, "তোমার কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে না। তোমার বংশে কেহই রাজা হইবে না। আর, যেখানে হাতি, ঘোড়া, গাড়ি, পাল্কি কিছুই নাই, কেবল ভেলায় চড়িয়া আর সাঁতরাইয়া চলাফেরা করিতে হয়, সে দেশে গিয়া তোমাকে বাস করিতে হইবে।"

আর অনুকে তিনি এই বলিয়া শাপ দিলেন, "তুমি যে জরা লইতে এত আপত্তি করিতেছ, সেই জরা এখনই তোমাকে ধরিবে। আর তোমার ছেলেপিলে একটিও বাঁচিবে না!"

এইরূপে পাঁচ ছেলের মধ্যে চারিজন যযাতির জরা লইতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু

সকলের ছোট পুরু যযাতি বলিবামাত্রই তাঁহার কথায় রাজি হইলেন। ইহাতে যযাতি পুরুর উপর নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "তোমার রাজ্যে প্রজারা চিরকাল পরম সুখে বাস করিবে।"

তারপর পুরুর যৌবন লইয়া যযাতি একহাজার বৎসর নানারূপ সৎকার্যে সুখে সময় কাটাইলেন। একহাজার বৎসর শেষ হইলে পুরুর যৌবন তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া এবং তাঁহাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া, তিনি তপস্যার জন্যে বনে চলিয়া গেলেন।

অনেক যাগ যজ্ঞ এবং বহুকালের কঠোর তপস্যার ফলে যযাতির বিস্তর পুণ্য সঞ্চয় হওয়ায় মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া কয়েক হাজার বৎসর তাঁহার বড়ই সুখে কাটিল। তারপর একদিন ইন্দ্রের সহিত তাঁহার দেখা হওয়ায় ইন্দ্র কথায় কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাস করিলেন, "মহারাজ, বল দেখি, তুমি কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলে?"

যযাতি বলিল, 'সে আর কি বলিব? আমার সমান তপস্যা এই ত্রিভুবনে কেহ কখনো করিতে পারে নাই।'

যযাতির এই অহঙ্কারে ইন্দ্র নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, অন্যে কিরূপ তপস্যা করিয়াছে, বা না করিয়াছে, তাহা না জানিয়াই তুমি সকলের অপমান করিলে। এই দোষে তুমি আজই স্বর্গ হইতে পড়িয়া যাইবে।'

তাহাতে যযাতি বলিলেন, 'যদি পড়িতে হয়, তবে যেন ভালো লোকের নিকট পড়ি।'

ইন্দ্র বলিলেন, 'তুমি ভালো লোকদের মধ্যেই পড়িবে।'

এইরূপে কথাবার্তার পর যযাতি স্বর্গ হইতে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তিনি স্বর্গ আর পৃথিবীর মাঝামাঝি আসিয়াছেন, এমন সময়, সেই শূন্যের উপরে, বসুমান, অষ্টক, প্রতর্দন ও শিবি রাজার সহিত তাঁহার দেখা হইল।

এই চারিজন রাজা পৃথিবীতে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া স্বর্গে যাইতেছিলেন। ইঁহারা যযাতিকে আগুনের মতন তেজের সহিত পৃথিবীর দিকে পড়িতে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে যুবক, তুমি কে? আর কি জন্যই বা স্বর্গ ছাড়িয়া পৃথিবীতে চলিয়াছ?'

ইহার উত্তরে যযাতির নিকট সকল কথা শুনিয়া, ইঁহারা সকলেই বলিলেন, 'মহারাজ, আমাদের পুণ্যের যে ফল, তাহা আপনাকে দিতেছি, আপনি আমাদের সঙ্গে স্বর্গে চলুন।'

এ কথায় যযাতি প্রথমে সম্মত হন নাই। তিনি কহিলেন, 'দান ব্রাহ্মণেরাই লইয়া থাকে। আমি রাজা, আমি দান করিতেই পারি — দান লইতে যাইব কেন?'

কিন্তু সেই চারিজন রাজা যযাতিকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। সুতরাং তাঁহাদের পুণ্যের জোরে, তাঁহাকে আবার স্বর্গে যাইতে হইল।

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার কথা

এমন মায়ের কথা কি কেহ শুনিয়াছ যে, সে তাহার কচি খুকিটিকে নদীর ধারে ফেলিয়া নিষ্ঠুর ভাবে চলিয়া যায়? মেনকা নামে এক অপ্সরা ঠিক এমনি নিষ্ঠুর ছিল। তাহার একটি খুকি হইল, আর সে তাহাকে মালিনী নদীর ধারে ফেলিয়া, পাষাণীর মতন চলিয়া গেল।

আহা! মা হইয়া কি এমন নিষ্ঠুর কাজ করে? খুকিটির মুখখানি এতই সুন্দর ছিল যে, তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বনের পাখিরাও তাহাকে ভালো না বাসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা বনের পাখি, মানুষের ছানাকে কি খাওয়াইতে হয়, তাহা তাহারা জানে না। তাহারা খালি খুকিটির চারি ধারে বসিয়া তাহাকে পাহারা দিতে লাগিল, আর ডানা দিয়া তাহাকে সূর্যের তাপ হইতে বাঁচাইয়া রাখিল।

এমন সময় মহামুনি কন্ব সেই নদীতে স্নান করিতে আসিলেন। ধার্মিক তপস্বীরা পশুপক্ষীকে পর্যন্ত কত দয়া করেন, এমন খুকিটিকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ স্নেহে গলিয়া যাইবে, ইহা আশ্চর্য কি? তিনি তাহাকে বুকে করিয়া পরম যত্নে নিজের আশ্রমে লইয়া আসিলেন। নিজের-সন্তান ছিল না, সেই খুকিটিকে তিনি তাঁহার প্রাণের সমস্ত স্নেহ দিয়া, মনে ভাবিলেন, যেন সেই তাঁহার সন্তান।

পাখিরা তাহকে পালন করিয়াছিল, এই জন্য কন্ব সেই কন্যাটির নাম রাখিলেন, শকুন্তলা (শকুন্ত = পক্ষী)। শকুন্তলা যখন কথা কহিতে শিখিল তখন কন্বকে সে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। সে জানিত যে, মুনিই তাহার পিতা।

সেই মেয়েটিকে পাইয়া না জানি মুনির প্রাণে কতই আরাম বোধ হইয়া ছিল। তাহার সুন্দর মুখখানির দিকে তাকাইলেই তাঁহার আনন্দ উথলিয়া উঠিত। মেয়েটির এমন বুদ্ধি যে, তাহাকে কিছুই বলিয়া দিতে হইত না। সে তাহার দুটি খুরখুরে পায় ছুটাছুটি করিয়া, আর তাহার ছোট ছোট হাত দুখানি নাড়িয়া মুনির ঘর ঝাঁট দেওয়া হইতে ফুল তুলিয়া আনা অবধি, এত কাজ করিয়া রাখিত যে, তাহা যে দেখিত, সেই আশ্চর্য হইয়া যাইত।

বনের যত হরিণ, আর পাখি, তাহারা ছিল শকুন্তলার খেলার সঙ্গী। তাহারা তাহাকে দেখিলেই ছুটিয়া আসিত। শকুন্তলা তাহাদিগকে খাবার দিয়া তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া দিত, তাহারাও শকুন্তলার আঁচলে মাথা গুঁজিয়া খেলা করিত।

এইরূপে বনের পশুপক্ষীর সঙ্গে খেলা করিয়া, আর কন্বের নিকট ভগবানের কথা শুনিয়া, শকুন্তলা ক্রমে বড় হইয়া উঠিল। মুনি ঋষি ছাড়া বাহিরে মানুষ তপোবনে প্রায় আসিত না। কাজেই শকুন্তলা তাহাদের কথা বেশি করিয়া জানিতেও পারিল না। তাহার জন্ম এবং শিশুকালের কথা কন্ব অন্যান্য মুনিদিগকে অনেক সময় বলিতেন, সুতরাং সে-সকল কথা সে মোটামুটি জানিয়াছিল।

ইহার মধ্যে একদিন সেই বনের ধারে হস্তিনার রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার লোকজনের অন্ত ছিল না। তাহাদের কোলাহল শুনিয়াই বনের জন্তুদের প্রাণ উড়িয়া গেল। শুয়োর হরিণ যত ছিল, রাজা তাহার অনেকগুলিই মারিয়া ফেলিলেন। সবগুলিকে যে মারেন নাই, তাহা কেবল তাঁহার ভয়ানক পিপাসা হইয়াছিল বলিয়া।

পিপাসায় অস্থির হইয়া, রাজা জল খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমে কন্বমুনির আশ্রমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতি সুন্দর আশ্রমটি। গাছের ছায়ায়, ফুলের গন্ধে আর পাখির গানে সেখানে গেলেই প্রাণ শীতল হইয়া যায়। মালিনী নদী তাহার নীচ দিয়াই কুল কুল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। এমন সুন্দর নদী, এমন নির্মল জল, আর কোথাও নাই। জলের পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে নদীতে সাঁতার দিতেছে, তাহাদের কলরব যেন সেতারের বাদ্য, এমনি মিষ্ট।

আশ্রমের নিকট আসিয়া আর তাহার শোভা দেখিয়া সকলের মনেই ভক্তির উদয় হইল, সৈন্যেরা তাহাদের ধূলামাখা বিকট চেহারা লইয়া উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস পাইল না। রাজা তাঁহার রাজ বেশ ছাড়িয়া বিনয়ের সহিত সাধারণ লোকের মত, কেবল অমাত্য আর পুরোহিত সঙ্গে লইয়া মুনির সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন।

আশ্রমের ভিতরে মুনিগণ কেহ বা বেদগান করিতেছেন, কেহ বা ধর্মের কথা বলিতেছেন, কেহ বা ভগবানের চিন্তা করিতেছেন। রাজা যত দেখেন, ততই বলেন, 'আহা! কি সুন্দর, কি সুন্দর!'

আশ্রমের যেখানে কণ্ব থাকেন, তাহার নিকট আসিয়া রাজা পুরোহিত আর অমাত্যকে বলিলেন, 'আপনারা এইখানেই থাকুন, আর ভিতরে গিয়া কাজ নাই।' তারপর রাজা একাকী ভিতরে প্রবেশ করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কণ্বকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি বলিলেন, 'কুটীরের ভিতরে কেহ আছ কি? যদি থাক বাহিরে আইস!'

কুটীরের ভিতর আর কে থাকিবে? শকুন্তলাই সেখানে ছিলেন। রাজা হয়ত ভাবিয়াছিলেন মুনির কোন শিষ্য কুটীর হইতে বাহির হইবে, কিন্তু উহার ভিতর হইতে যে এমন সুন্দর দেবতা বাহির হইয়া আসিবেন, এ কথা তিনি মনে করিতে পারেন নাই।

শকুন্তলা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বাড়িতে অতিথি উপস্থিত। তিনি অতিশয় বুদ্ধি মতী মেয়ে ছিলেন, সুতরাং ইহাও তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, অতিথি সাধারণ লোক নহেন, নিশ্চয় কোন রাজা। মুনি বাড়িতে নাই, সুতরাং অতিথির আদর শকুন্তলাকেই করিতে হইল।

তাই তিনি রাজাকে বসিবার আসন আর পা ধুইবার জল দিয়া অতিশয় মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, এখানে কিজন্য আসিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ কাজ করিতে হইবে।'

রাজা বলিলেন, 'ভদ্রে, আমি মহর্ষি কণ্বের পায়ের ধূলা লইতে আসিয়াছি। তিনি কোথায়?'

শকুন্তলা বলিলেন, 'তিনি ফল আনিতে গিয়াছেন একটু পরে আসিবেন, আপনি বসুন!'

রাজা শকুন্তলার অপরূপ সৌন্দর্য দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার মিষ্ট কথা শুনিয়া, আর বুদ্ধি আর ভদ্রতা দেখিয়া, তিনি একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। সুতরাং তিনি আর তাঁহার পরিচয় না লইয়া থাকিতে পারিলেন না।

রাজা শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে? এই বনের ভিতর কি জন্য বাস করিতেছ? আর কি করিয়াই বা এমন সুন্দর হইলে?'

শকুন্তলা বলিলেন, 'আমি মহর্ষি কণ্বকেই আমার পিতা বলিয়া থাকি। কিন্তু শুনিয়াছি আমার পিতার নাম বিশ্বামিত্র, আর মার নাম মেনকা। মহর্ষি কণ্ব আমাকে মালিনী নদীর ধারে কুড়াইয়া পাইয়া, কৃপা পূর্বক নিজের কন্যার মতন আমাকে পালন করিয়াছেন। আমার নাম শকুন্তলা।'

শকুন্তলার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'শকুন্তলা, আমি তোমাকে বড়ই ভালবাসি। আমি তোমাকে সোনালি শাড়ি, গজমতির মালা, আর নানান্ দেশের মহামূল্য মণি-মাণিক্য আনিয়া দিব, আমার রাজ্যে যত ধন আছে, সকলই তোমার হইবে, তুমি আমার রানী হও।'

শকুন্তলা বলিলেন, 'মহারাজ, আমিও তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি। আমি তোমার রানী হইব।'

এ কথায় রাজা পরম আনন্দের সহিত সুন্দর সুগন্ধি সাদা ফুলের মালা আনিয়া, একগাছি নিজে পরিলেন, আর একগাছি শকুন্তলাকে পরিতে দিলেন। তারপর রাজা নিজের গলার মালা লইয়া শকুন্তলার গলায় পরাইয়া দিলেন, শকুন্তলাও তাঁহার নিজের গলার মালাখানি লইয়া রাজার গলায় পরাইয়া দিলেন। এইরূপে গন্ধর্বদিগের মতন করিয়া তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের খানিক পরে রাজা বলিলেন, 'শকুন্তলা, দুদিন অপেক্ষা কর, আমি দেশে গিয়াই তোমাকে লইবার জন্য চতুরঙ্গ (অর্থাৎ, রথী, পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী, এই চারিরকমের) সেনা পাঠাইব।'

এই বলিয়া রাজা চলিয়া গেলেন, আর শকুন্তলা, কবে তাঁহাকে নিতে রাজার লোক আসিবে, এই ভাবিয়া পথ চাহিয়া রহিলেন।

দুষ্মন্ত চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই কন্ব ফল লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন। মুনি ত্রিকালজ্ঞ (অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সকল সময়ের কথাই জানেন), সুতরাং দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার বিবাহের কথা বনে থাকিয়াই তাঁহার জানিতে বাকি ছিল না। দুষ্মন্তের মত ধার্মিক এবং গুণবান রাজা এই পৃথিবীর মধ্যে আর নাই, মুনির নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, ঠিক এমনি একটি লোকের সহিত শকুন্তলার বিবাহ হয়। সুতরাং এই বিবাহে তাঁহার এত আনন্দ হইল যে, ঘরে ফিরিয়া ফলের বোঝাটি মাথা হইতে মাটিতে নামাইবার বিলম্বটুকুও তাঁহার সহ্য হইল না। বোঝা মাথায় করিয়াই, তিনি শকুন্তলাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওমা, শকুন্তলা! মা, কি আনন্দের কথাই হইয়াছে? আমি সব জানিয়াছি মা। দুষ্মন্তের মতন এমন মহাশয় লোক তোমার স্বামী হওয়াতে, আমি বড়ই সুখী হইয়াছি। আমি আশীর্বাদ করি যে, তোমার পুত্র যেন সকল বীরের প্রধান, আর এই সসাগরা (অর্থাৎ সাগর সমেত) পৃথিবীর রাজা হয়।'

মুনি যেমন বর দিলেন, শকুন্তলার তেমনি মহাবীর পুত্র হইল। ছয় বৎসর বয়সের সময় সে সিংহ, বাঘ, শুয়োর, মহিষ, আর হাতিকে আশ্রমের নিকটের গাছে বাঁধিয়া চাবুক মারিত! তাহা দেখিয়া আশ্রমের মুনিরা তাহার নাম রাখিলেন, 'সর্বদমন' অর্থাৎ সকলকে যে দমন (শাসন) করিতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা আর কি বলিব? 'দুদিন পরে তোমাকে লইয়া যাইব' বলিয়া দুষ্মন্ত গেলেন, তারপর এই ছয় বৎসর চলিয়া গেল, খোকা এত বড় হইল, ইহার মধ্যে তিনি শকুন্তলার কোন সংবাদই লইলেন না।

দুষ্মন্ত যাইবার সময়, যত দূর অবধি তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল, শকুন্তলা কুটীরের কোণে দাঁড়াইয়া ততদূর পর্যন্ত তাঁহার পানে চাহিয়া ছিলেন। তাহার পর হইতে প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায়, আর সকল অবসর সময়ে, সেইখানে দাঁড়াইয়া তিনি সেই পথের দিকে চাহিয়া থাকেন। প্রতিদিন তাঁহার মনে হয়, 'আজ আমাকে নিতে আসিবে', কিন্তু হায় প্রতিদিনই তিনি, সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত সেই পথে কাহাকেও আসিতে না দেখিয়া, ছল ছল চোখে ঘরে ফিরেন। তাঁহার মনে এই চিন্তা ক্রমাগতই হয় যে, 'হায়! কেন এমন হইল?' কিন্তু পাছে কেহ দুষ্মন্তের নিন্দা করে এ জন্য নিজের মনের কথা তিনি কাহাকেও বলিলেন না।

আশ্রমের সকলেই হয়ত এ কথা ভাবিয়া আশ্চর্য হইতেন, আর হয়ত দুষ্মন্তের নিন্দাও করিতেন, কিন্তু কেন যে এমন হইয়াছিল — দুষ্মন্তের মত ধার্মিক রাজা কেন যে তাঁহার রানীকে এমন আশ্চর্যভাবে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকেই জানিতেন, দুষ্মন্ত চলিয়া যাওয়ার পরেই একদিন দুর্বাসা মুনি কণ্বের আশ্রমে আসেন, কণ্ব তখন ঘরে ছিলেন না, শকুন্তলা এক মনে দুষ্মন্তের কথা ভাবিতেছিলেন, তাই তিনিও দুর্বাসাকে দেখিতে পান নাই। ইহাতেই মুনি অপমান বোধ করিয়া শকুন্তলাকে শাপ দেন, 'যাহার কথা ভাবিয়া তুই আমাকে অমান্য করিলি সেই দুষ্মন্ত তোকে ভুলিয়া যাইবে।' এইজন্যই হস্তিনায় গিয়া দুষ্মন্তের আর শকুন্তলার কথা মনে ছিল না।

শকুন্তলার ছেলেটি ছয় বৎসর হইয়াছে, আর ইহারই মধ্যে সে এমন অসাধারণ বীর হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহা দেখিয়া কণ্ব শকুন্তলাকে বলিলেন, "মা, সর্বদমনের এখন যুবরাজ হওয়ার সময় হইয়াছে অতএব তোমার—আর এখানে থাকা উচিত নহে। তুমি শীঘ্র ইহাকে লইয়া হস্তিনায় চলিয়া যাও।"

এ কথায় শকুন্তলার মনে বড়ই আনন্দ হইল। আবার কেমন একটা ভয়ও হইল। তিনি তাড়াতাড়ি যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তপস্বীর মেয়ের জিনিসপত্র অতি সামান্যই থাকে, সুতরাং তাহাদের যাত্রার আয়োজনও খুব অল্পই করিতে হয়। কেবল একটি জিনিস ছিল, যাহাকে শকুন্তলা অন্য সকল দ্রব্যের চেয়ে ভালবাসিতেন আর যত্নে রাখিতেন। সে জিনিসটি একটি আংটি! বিবাহের সময়ে এই আংটিটি দুষ্মন্ত শকুন্তলার হাতে পরাইয়া দেন। সেই আংটিটি হাতে আছে কি না তাহাই শকুন্তলা সকলের আগে দেখিলেন; তারপর আর অন্য কিছুর জন্য তাঁহার বেশী চিন্তা হইল না।

এইটুকু আয়োজনে আর অধিক সময় লাগিল না, তারপর কণ্বের দুইজন শিষ্যকে লইয়া, আর ছেলেটিকে কোলে করিয়া শকুন্তলা হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। কণ্বের নিকট বিদায় লইবার সময়, অবশ্য তাঁহার খুব কষ্ট হইল, কিন্তু দুষ্মন্তের আর ছেলেটির কথা ভাবিয়া তিনি তাহা সহিয়া রহিলেন। পথের কষ্টকে তিনি কষ্টই মনে করিলেন না। চলিতে চলিতে তিনি এত কথা ভাবিতেছিলেন যে, পথে কি হইতেছিল, তাহার দিকে তিনি মনই দিতে পারেন নাই। কেবল খোকা খুব উৎসাহের সহিত কোন কথা বলিলে তাহাই তিনি একটু শুনিতে পাইয়া আনমনে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন।

এইরূপে তাঁহারা দুষ্মন্তের সভায় উপস্থিত হইলে, কণ্বের শিষ্যগণ শকুন্তলাকে সেখানে রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। কিন্তু হায়, রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া আনন্দিত হওয়া বা আদর করা দূরে থাকুক, তিনি তাঁহাকে চিনিতেই পারিলেন না।

রাজার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল যেন শকুন্তলাকে তিনি নিতান্ত অপরিচিত স্ত্রী লোক মনে করিয়াছেন, আর আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছেন, "এ কিসের জন্য এমন ভাবে আসিয়া আমার সামনে দাঁড়াইল?" হায়! কি লজ্জা, কি কষ্ট! রাজা চিনিতে না পারায়, শকুন্তলা নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা আরো আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "সে কি কথা? আমার ত তোমাকে কখনো দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না।"

তখন শকুন্তলার মনে হইল, যেন সেই ঘরখানি ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর কোথা হইতে অন্ধকার আসিয়া সকল জিনিস ঢাকিয়া ফেলিতেছে। তারপর কি হইল, তিনি কিছুই

বুঝিতে পারিলেন না। এইভাবে খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল।

জ্ঞান হইলে শকুন্তলার সেই আংটির কথা মনে হইল; তিনি ভাবিলেন যে, আংটি দেখিলে হয়ত সকল কথা রাজার মনে হইবে কিন্তু হায়! হাতের দিকে চাহিয়া শকুন্তলা দেখিলেন, আংটি নাই। আসিবার সময় একটি নদীতে নামিয়া হাত মুখ ধুইয়াছিলেন, তখন আংটিটি জলে পড়িয়া গিয়াছিল।

তখন শকুন্তলা নিতান্ত দুঃখের সহিত রাজাকে বলিলেন, "হায়! না জানি অন্য জন্মে আমি কি ভয়ানক পাপ করিয়াছিলাম, শিশুকালে মা আমাকে ফেলিয়া দিল; আবার এখন তুমি পতি হইয়াও আমাকে চিনিতে পারিলে না। আমার জন্য আমি ভাবি না, কারণ পিতার নিকট গেলেই আমি আশ্রয় পাইব। কিন্তু আমাদের পুত্রটিকে তুমি আদর না করিয়া বড়ই অন্যায় করিতেছ।"

ইহার উত্তরে দুষ্মন্ত বলিলেন, 'স্ত্রীলোকেরা বড় মিথ্যাবাদী, বোধহয় তুমিও মিথ্যা কথা কহিতেছ, তোমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?"

এ কথা শুনিয়া শকুন্তলা বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি নিজেই এখান হইতে চলিয়া যাইব; আর কখনো তোমার সহিত কথা কহিব না। কিন্তু হে দুষ্মন্ত! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, তোমার পরে আমাদিগের এই পুত্রই এই পৃথিবীর রাজা হইবে।"

এমন সময় স্বর্গ হইতে দেবতাগণ অতি গভীর স্বরে দুষ্মন্তকে ডাকিয়া বলিলেন, "দুষ্মন্ত! শকুন্তলা তোমার রাণী, এই বালক তোমার পুত্র। তুমি শকুন্তলাকে অপমান করিও না। তাঁহাকে আর তোমার পুত্রকে আদর করিয়া ঘরে লও, আমাদের কথায় এই বালকের 'ভরত' নাম রাখ। তোমার পরে ইনি অতিশয় বিখ্যাত রাজা হইবেন।"

দেবতাদের কথা শুনিবামাত্র দুষ্মন্তের সকল কথা মনে পড়িল। সভার লোক যে কি আশ্চর্য হইল; তাহা কি বলিব। কিন্তু অল্পক্ষণের ভিতরেই তাহাদিগকে ইহার চেয়েও অধিক আশ্চর্য হইতে হইল।

দেবতাদের কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে কোলাহল করিতেছে, এমন সময় রাজার প্রহরীগণ এক জেলেকে বাঁধিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিল, প্রহরীরা বলিল, "এই জেলে রাজার আংটি চুরি করিয়া বাজারে বেচিতে গিয়াছিল।"

জেলে বেচারা হাত জোড় করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "দোহাই মহারাজ, আমি আংটি চুরি করি নাই, একটা মাছের পেটের ভিতরে পাইয়াছি। ও আংটি কাহার, আমি তাহা জানি না।"

জেলের কথা শুনিয়া সকলে বলিল, "তবে বল্ ব্যাটা, তুই সেই মাছ কোথায় পাইয়াছিলি।"

জেলে বলিল, "আমি শচী তীর্থের নিকটে জাল ফেলিয়া সেই মাছ ধরিয়া ছিলাম।"

আংটি যে রাজার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেন না রাজার নাম তাহাতে লেখা রহিয়াছে। যে উহা হাতে নেয়, সেই বলে, "তাই ত, এ যে মহারাজের আংটি, এ আংটি মাছের পেটের ভিতরে কি করিয়া গেল?"

তাহাতে রাজা আংটিটি দেখিবার জন্য হাতে লইলেন। সে আংটির দিকে তাকাইবামাত্র তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "এই আংটি আমি শকুন্তলার হাতে পরাইয়া দিয়াছিলাম।"

ইহার পর কাহারো আর কোন কথাই বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন যে কিরূপ সুখ আর

আনন্দের ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা কাগজে লেখার চেয়ে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে অনেক মিষ্ট লাগে।

শকুন্তলা যত কষ্ট পাইয়াছিলেন, দুষ্মন্তের আদরে তাহার সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। সর্বদমন যুবরাজ হইলেন, আর তাঁহার 'সর্বদমনের' বদলে ভরত' নাম হইল। ইহার পরেও তিনি সিংহ আর বাঘ লইয়া খেলা করিতেন কি না তাহা আমি শুনিতে পাই নাই! কিন্তু তিনি যে রাজাদিগের সকলকেই পরাজয় করিয়াছিলেন, এ কথা মহাভারতে স্পষ্ট লেখা আছে। আমাদের এই দেশের নাম যে ভারতবর্ষ তাহা এই ভরত হইতেই হইয়াছে।

এই গল্পে যে দুর্বাসার শাপ এবং আংটির ঘটনার কথা আছে, তাহা মহাভারতে নাই। কালিদাসের শকুন্তলায় এই-সকল ঘটনা আছে।

চ্যবন ও সুকন্যার কথা

ভৃগুর পুত্র মহর্ষি চ্যবনের তপস্যার কথা অতি আশ্চর্য। তিনি বনের ভিতরে একটি সরোবরের ধারে এক আসনে বসিয়া কত কাল যে তপস্যা করিতেছিলেন, তাহা কেহই বলিতে পারিত না। তাঁহার শরীর ধূলায় ঢাকিয়া গেল, সেই ধূলার উপর গাছপালা হইল, সেই গাছে পিঁপড়ের বাসা হইল; তথাপি তাঁহার তপস্যার শেষ হইল না। শেষে এমন হইল যে তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত ঠিক যেন একটি উইয়ের ঢিপি। লোকে সেই উইঢিপিকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। তাহাদের পিতামহের পিতামহেরা উঁহাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, সেই উইঢিপির ভিতরে মহামুনি চ্যবন তপস্যা করিতেছেন।

এইরূপে অনেক কাল গেল। তারপর একদিন মহারাজ শর্যাতি, অনেক লোকজন সঙ্গে লইয়া সপরিবারে সেই সরোবরের ধারে বনভোজন করিতে আসিলেন। ছোট ছোট মেয়েদের অনেকেই আর কখনো বনের শোভা দেখে নাই। তাই এরকম জায়গায় এত গাছ আর ফুল দেখিয়া তাহাদের অতিশয় আনন্দ হইল। "এটা কিসের গাছ?" "ওটা কি ফুল?" "এ ফল কি খায়?" "ও গাছে কি হয়?" ক্রমাগত এই-সব কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা সঙ্গের লোকদিগকে এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিল যে, ব্যস্ত যাহাকে বলে।

রাজার একটি কন্যা ছিলেন, তাঁহার নাম সুকন্যা। মেয়েটি বড়ই বুদ্ধিমতী, আর তাহার মনটি অতিশয় সরল। আর দেখিতে তিনি এমনই সুন্দর যে, তেমন আর দেখা যায় না। বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান, কাজেই বড় আদরের মেয়ে, আর সেইজন্যই তাঁর স্বভাবটি একটু একগুঁয়ে —একটু ঝোঁকের মাথায় কাজ করেন। কিন্তু তাঁর মনটি বড় ভালো।

রাজকন্যা সখীদিগকে লইয়া বনের শোভা দেখিতে দেখিতে সেই উইয়ের ঢিপির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনির ধ্যান তখন সবে শেষ হইয়াছে, আর তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াছেন আর চাহিয়াই তিনি দেখিলেন, সম্মুখে এক রাজকন্যা। দেবতার মতন রূপ, আর দেবতার মতন পবিত্র মনের জ্যোতি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাজকন্যাকে দেখিবামাত্রই মুনির মন স্নেহে গলিয়া গেল। তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল, কন্যার পরিচয় গ্রহণ করেন; আর দুটি মিষ্ট কথা তাঁহাকে বলেন। কিন্তু বহুকালের অনাহারে

তাহার কণ্ঠ একেবারেই শুকাইয়া গিয়াছিল— তাহাতে কথা সরিল না।

উইয়ের ঢিপি দেখিয়া রাজকন্যার আশ্চর্যের সীমা রহিল না। এমন অদ্ভুত পদার্থ তিনি আর কখনো দেখেন নাই, সুতরাং তাঁহার মনে হইল, ' এ জিনিসটাকে একটু ভালো করিয়া ঘাঁটিয়া দেখিতে হইবে।' এই ভাবিয়া সেই উইঢিপির খুব কাছে গিয়া, সুকন্যা দেখিলেন যে, তাহাতে দুটি ছোট ছোট কি জিনিস ঝক ঝক করিতেছে।

ইহার একটু আগে, বনের ভিতরে একটি গাছে খুব লম্বা লম্বা কাঁটা দেখিতে পাইয়া রাজকন্যা, তামাশা দেখিবার জন্য, তাহার একটা সঙ্গে লইয়াছিলেন। উইঢিপিতে দুটো চকচকে জিনিস দেখিয়া তিনি, "বাঃ! এগুলো আবার কিরে?" বলিয়া সেই কাঁটা দিয়া তাহাতে খোঁচা মারিলেন।

সেই চকচকে জিনিস দুটি আর কিছুই নয়। উহা চ্যবনের চোখ। সমস্ত শরীর মাটি চাপা পড়িয়া কেবল উঁহার ঐ চোখ দুইটি জাগিয়া ছিল। দেখিতে উহা দুটি চকচকে পাথরের মতনই দেখা যাইতেছিল, সুকন্যা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, উহা আবার কোনো মানুষের চোখ হইতে পারে।

যাহা হউক, মুনির বড়ই লাগিল, তাহাতে আর ভুল নাই। তিনি যে লাফাইয়া উঠেন নাই, তাহা কেবল মাটির চাপনে। চ্যাচান নাই যে, সে কেবল গলা শুকাইয়া যাওয়াতে। আর, সুকন্যাকে যে শাপ দেন নাই কেন, তাহা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না।

কিন্তু তাঁহার বড়ই রাগ হইয়াছিল। তাই তিনি রাজার সৈন্যদিগের এমনি অদ্ভুত রকমের এক অসুখ উপস্থিত করিয়া দিলেন যে, বলিতে গেলে তাহা তেমন সাংঘাতিক অসুখ কিছু নয়, অথচ তাহারা ভয়ে আর অসুবিধায় পাগলের মত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ এমন আশ্চর্য ব্যাপার উপস্থিত দেখিয়া রাজা ত নিতান্তই চিন্তিত হইলেন। কিন্তু তিনি ইহার কারণ কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে তিনি সৈন্যদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ত সেই উইঢিপির ভিতরের মুনিঠাকুরকে কোনরকমে অমান্য কর নাই।" সৈন্যগণ জোড়হাতে বলিল, "মহারাজ, আমরা তাঁহার অমান্য করিব দূরে থাকুক, আমরা কেহ ঐদিক্ দিয়া যাই-ই নাই। আপনি নাহয় তাঁহার নিকট গিয়া বিনয়ের সহিত ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করুন।"

রাজা আর সৈন্যদিগের কথাবার্তা শুনিয়া সুকন্যা বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ ঢিপির ভিতরে একজন তপস্বী আছেন, তখন তাঁহার মনে হইল যে, সেই চকচকে জিনিস দুটাতে খোঁচা মারাতেই বা কোনরূপ দোষ ঘটিল। সুতরাং তিনি তখনই রাজার নিকট গিয়া একটু দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "বাবা আজ বেড়াইবার সময় আমি ঐ ঢিপিটাতে দুটা চকচকে জিনিস দেখিতে পাইয়া তাহাতে কাঁটা দিয়া খোঁচা মারিয়াছিলাম।"

ইহার পর আর রাজার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কিসে সর্বনাশ হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ যার পর নাই ব্যস্ত হইয়া সেই ঢিপির নিকট ছুটিয়া চলিলেন, আর জোড়হাতে চ্যবনকে বলিলেন, "ভগবন্, আমার কন্যা না জানিয়া আপনাকে কষ্ট দিয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করুন।"

চ্যবন বলিলেন, "মহারাজ, তোমার মেয়ে আমার চোখে যে খোঁচা মারিয়াছে, তাহার পর আর কিছুতেই উহাকে ক্ষমা করা যাইতেছে না। তোমার সেই সুন্দরী পাগলী মেয়েটিকে আমি বিবাহ করিব, তবে ছাড়িব।"

কি সর্বনাশ! হাজার বৎসরের বুড়া মুনি, তাহাকে আবার উইয়ে খাইয়া হাড় ক'খানি মাত্র বাকি রাখিযাছে। সে কিনা বলে, "তোমার মেয়েকে বিবাহ করিব।" রাজা ত বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন—এখন উপায় কি?

উপায় আর কি হইবে? মেয়ে বিবাহ না দিলে মুনি কিছুতেই রাজার সৈন্যদিগকে ছাড়িতেছেন না। এতক্ষণে তাহারা অসুখের জ্বালায় আধপাগলা গোছের হইয়া উঠিয়াছে আর খানিক বাদে কি করিবে তাহার ঠিক নাই। কাজেই, রাজার বুক ফাটুক আর যাহাই হউক, মুনির কথায় তাঁহাকে রাজি হইতেই হইল।

হায়! এমন আদরের ধন, তাহার কপালে কিনা এই ছিল! মা বাপের দুঃখ হইবে সে আর কতবড় কথা—রাজ্য সুদ্ধ লোক ইহাতে কাঁদিয়া অস্থির হইল।

কিন্তু যাঁহার জন্য এত দুঃখ, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহাকে ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত মনে হইল না। সুকন্যার মনের ভাব ছিল অন্যরূপ। তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, 'এত কষ্ট পাওয়ার পরেও যে মহাপুরুষ আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া আমাকে এমন স্নেহ দেখাইতে পারেন, তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করাই হইতেছে আমার কাজ।' সুতরাং তিনি এই ঘটনার দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দিতই হইলেন।

এদিকে পণ্ডিতেরা পঞ্জিকা দেখিয়া বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়াছেন;বিবাহের আয়োজনের ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। তারপর শুভকার্য শেষ হইতেও আর অধিক বিলম্ব হইল না। বিবাহে ধুমধাম যে নিতান্ত কম হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু আনন্দ আর কোথা হইতে হইবে? বিবাহের পর সুকন্যার কথা ভাবিয়াই সকলে দুঃখ করিতে লাগিল, কিন্তু সুকন্যা আনন্দের সহিত তপস্বিনীর বেশে, তাঁহার স্বামীর সহিত বনে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া স্বামীর সেবায় এবং ভগবানের চিন্তায় পরম সুখে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে একদিন সুকন্যা স্নান করিয়া তাঁহাদের কুটীরের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় অশ্বিনীকুমার দুইভাই সেইখান দিয়া যাইতে ছিলেন। বনের ভিতরে এমন অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখিয়া অশ্বিনীকুমারদিগের আশ্চর্যের সীমা রহিল না। তাঁহারা সুকন্যার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, তুমি কে? এই বনের ভিতর কিজন্য আসিয়াছ?" সুকন্যা মাথা হেঁট করিয়া লজ্জিতভাবে বলিলেন, "ভগবন্, আমি রাজা শর্যাতির কন্যা; মহর্ষি চ্যবনের স্ত্রী।"

এ কথায় অশ্বিনীকুমারেরা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না জানি তোমার পিতা কিরকম লোক, যে এই বুড়ার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিলেন। তোমার মতন সুন্দরী মেয়ে স্বর্গেও দেখিতে পাওয়া যায় না। তোমাকে হীরা মুক্তায় জড়াইয়া রাখিলে তবে তোমার উপযুক্ত শোভা হয়! এই সামান্য ময়লা কাপড়খানি পরিয়া থাকা কি তোমার সাজে? আহা! তুমি এমন গরীবের হাতে পড়িয়াছ যে, তোমাকে ভাল করিয়া খাইতে পরিতে দিতে পারে না। এমন হতভাগ্য লোকের নিকট থাকিয়া কেন কষ্ট পাইতেছ? আমাদের একজনকে বিবাহ কর, স্বর্গে গিয়া পরম সুখে থাকিবে।"

ইহাতে সুকন্যা আশ্চর্য এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি আমার স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসি, এবং ভক্তি করি, আমার সাক্ষাতে এমন কথা মুখে আনিবেন না।"

কিন্তু ইহাতেও অশ্বিনীকুমারদিগের ভদ্রতা শিক্ষা হইল না। তাঁহারা ফাঁকি দিয়া সুকন্যাকে

ঠকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারেরা স্বর্গের চিকিৎসক ছিলেন, কাজেই চিকিৎসায় তাঁহাদের ক্ষমতা অতি আশ্চর্য ছিল। তাঁহারা খানিক চিন্তা করিয়া সুকন্যাকে বলিলেন, "আচ্ছা আমরা যদি তোমার স্বামীকে যুবা এবং সুশ্রী করিয়া দেই, তবে কেমন হয়? একবার তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ ত, তিনি কি বলেন।"

এ কথা সুকন্যা চ্যবনের নিকট বলিলে, তিনি বলিলেন, "বেশ কথা! আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি।। জিজ্ঞাসা কর, আমাকে কি করিতে হইবে?"

অশ্বিনীকুমারেরা বলিলেন, "আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল একটিবার এই পুকুরের জলে ডুব দিতে হইবে।"

অশ্বিনীকুমারের কথায় চ্যবন পুকুরের জলে ডুব দিবামাত্র, সেই দুই দুষ্ট দেবতাও ঝুপ করিয়া সেই জলের ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন। তারপর যখন তাঁহারা মুনির সঙ্গে জল হইতে উঠিয়া আসিলেন, তখন দেখা গেল যে, তিনজনেরই অবিকল একরকম চেহারা!

দুষ্ট দেবতাগণ ভাবিয়াছিলেন যে, চ্যবনের চেহারা ঠিক তাঁহাদের নিজেদের মত করিয়া দিলে, আর সুকন্যা তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না। কিন্তু যথার্থ বুদ্ধিমতী ধার্মিক স্ত্রীলোককে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ নহে। সুকন্যা দেখিলেন যে, চেহারা একরকম হইলেও চোখের ভাবের অনেক প্রভেদ আছে। চ্যবন তাহার দিকে যেমন স্নেহের সহিত তাকাইতেন, সেই স্নেহের দৃষ্টি চিনিয়া লইতে সুকন্যার মত মেয়ের ভুল হইতে পারে? তিনি একবার চ্যবনের চোখের দিকে তাকাইয়া অপার আনন্দের সহিত তাঁহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় চ্যবন দুর্বাসা ছিলেন না। তাহা হইলে দেবতা মহাশয়েরা তাঁহাদের উচিত সাজা তখনই হাতে হাতে পাইতেন। চ্যবন অতিশয় ভালমানুষ ছিলেন, তাই তিনি ইহার কিছুই না করিয়া, তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ভগবন, আমি বুড়া ছিলাম, আপনারা আমাকে যুবা আর সুশ্রী করিলেন। দেবতাগণ সোমরস পান করেন, আপনাদিগকে তাহার ভাগ দেন না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আপনাদিগের জন্য সোমরসের ভাগ লইয়া দিব।"

ইহাতে অশ্বিনীকুমারেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে চ্যবন আবার যুবা এবং দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছেন এই আশ্চর্য সংবাদ দেখিতে দেখিতে মহারাজ শর্যাতির নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। সে সংবাদে তিনি এতই আনন্দিত হইলেন যে, সকলকে লইয়া চ্যবনের আশ্রমে আসিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। তখন সকলের মনে কি যে আনন্দ হইল, তাহা লিখিয়া আর কত জানাইব? সেখানে কিছু কাল নানারূপ কথাবার্তায় অতিশয় সুখে কাটিলে, চ্যবন শর্যাতিকে বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার জন্য একটা যজ্ঞ করিব, আপনি তাহার আয়োজন করুন।"

রাজা আনন্দের সহিত অতি অল্প দিনের ভিতরেই যজ্ঞের আয়োজন শেষ করিয়া দিলে চ্যবন যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। সে যজ্ঞ বড়ই চমৎকার হইয়াছিল। আর তাহাতে যে একটি ঘটনা হইয়াছিল তা নিতান্তই অদ্ভুত।

যজ্ঞে দেবতারা সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য অনেক কলসী সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে। চ্যবন তাঁহাদের সম্মান বুঝিয়া সকলকেই সোমরস বাঁটিয়া দিতেছেন; তাঁহারাও আনন্দের সহিত তাহা পান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে দুইটি বাটিতে সোমরস ঢালিতে আরম্ভ করিয়া, চ্যবন বলিলেন, ইহা অশ্বিনীকুমারদিগকে দিতে হইবে।"

এ কথায় ইন্দ্র হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তাহা হইতে পাবে না। অশ্বিনীকুমাবেরা নিতান্তই সামান্য দেবতা, চিকিৎসা করিয়া খায়। উহাদিগকে কখনই সোমরস দেওয়া যাইতে পাবে না।"

চ্যবন বলিলেন, "অশ্বিনীকুমাবেরা আমাকে দেবতার ন্যায সুখী এবং সুস্থ করিযাছেন, তাঁহারা সোমরস পাইবেন না, আব কেবল আপনারাই যত সোমবস খাইবেন, ইহা ত ভালো কথা নহে। আপনি যেমন দেবতা, তাঁহাদিগকেও তেমনি দেবতা বলিয়া জানিবেন।"

তথাপি ইন্দ্র ক্রমাগতই বলিতে লাগিলেন, "সে কি কথা। উহাবা চিকিৎসক, হীন জাতি, *উহাবা কি করিযা সোমবস খাইবে?"

ইন্দ্রের কথায় কান না দিযা চ্যবন নিজ হাতে অশ্বিনীকুমারদিগেব জন্য সোমবস ঢালিতে লাগিলেন। তাহা দেখিযা ইন্দ্র বিষম বাগেব সহিত বলিলেন, "যদি তুমি উহাদিগকে সোমবস ঢালিয়া দাও, তাহা হইলে এখনই বজ্র দিযা তোমাকে বধ কবিব।"

এ কথায চ্যবন একটু হাসিলেন, কিন্তু তিনি সোমবস ঢালিতে ছাড়িলেন না।

ইহাতে ইন্দ্র বাগে অস্থিব হইযা চ্যবনকে মাবিবাব জন্য বজ্র উঠাইলে, সকলেব প্রাণ ভয়ে কাঁপিযা উঠিল। কিন্তু চ্যবন ভযও পাইলেন না, পলাযনও কবিলেন না। তিনি কেবল একটি কি মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, যজ্ঞেব আগুনে খানিকটা ঘি ফেলিয়া দিলেন।, আব অমনি, সংসাবে যত ভযঙ্কব জিনিস আছে তাহাদেব সকলেব চেয়ে ভযানক, মদ নামক অতি বিকটাকার একটা অসুব সেই আগুন হইতে উঠিযা আসিল। সে হাঁ কবিবামাত্র তাঁহাব এক ঠোঁট মাটিতে আব এক ঠোঁট স্বর্গে গিযা ঠেকিল। তখন দেখা গেল যে, তাহাব ছোট ছোট দাঁতগুলিবই এক একটি দশযোজন লম্বা। আব বড় দাঁত চাবিটিব ত কোনটিই একশত যোজনের কম হইবে না। উহাব চোখ দুইটা সূর্যেব মত জ্বলিতেছে, আব হাত পা যে কোথায গিযা ঠেকিযাছে, তাহাব ঠিকানাই নাই। সে অসুব যখন তাহাব হাজাব যোজন লম্বা লক্‌লকে জিবখানি বাহির কবিল, তখন সকলেব মনে হইল, বুঝি সে সৃষ্টি সুদ্ধ চাটিযা খায। তাবপব যখন সে ইন্দ্রের দিকে আড় চোখে চাহিয়া ঠোঁট চাটিতে চাটিতে ঘোবতব ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে তাঁহাকে খাইতে আসিল, তখন তিনি প্রাণপণে চ্যাচাইযা বলিতে লাগিলেন, "ও ঠাকুব মহাশয়, বক্ষা করুন। আবে হাঁ হাঁ। অশ্বিনীকুমাবেবা সোমবস খাইবে, খাইবে। বক্ষা করুন।"

সুতরাং তখন চ্যবন দয়া কবিযা দেববাজকে অসুবেব হাত হইতে বক্ষা কবিলেন, আব অশ্বিনীকুমাবেরাও, সেই অবধি, সকল যজ্ঞেই সোমবসেব ভাগ পাইতে লাগিলেন।

এইরূপে চ্যবন তাঁহাব প্রতিজ্ঞা বাখিযা সুকন্যাব সহিত নিজের আশ্রমে চলিযা আসিলে, তাঁহাদের সময় অতি সুখেই কাটিতে লাগিল।

রুরু ও প্রমদ্বরার কথা

পূর্বকালে স্থূলকেশ নামে একজন পরম ধার্মিক তপস্বী ছিলেন। একদিন তিনি ফল আনিতে বনে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, একটি নিতান্ত ছোট খুকিকে কে

* সোমলতা নামক একপ্রকাব লতার বস খাইতে দেবতাবা বড়ই ভালবাসিতেন।

তাঁহার আশ্রমে ফেলিয়া গিয়াছে। এমন নিষ্ঠুর নীচ কাজ যাহারা করিতে পারে, সে-সকল হতভাগ্য লোকেদের সংবাদ লইয়া আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। এমন সুন্দর শিশুর প্রতিও যাহার দয়া হয় নাই, না জানি তাহার প্রাণ কতই কঠিন!

মুনি সেই কন্যাটিকে কোলে করিয়া ঘরে আনিলেন, এবং মায়ের মতন যত্নের সহিত তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন। খুকিটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল, আর দেখিতে দেখিতে তাহার আধ আধ মিষ্ট কথায় আর কোমল ব্যবহারে সকলের মন কাড়িয়া লইল। তাহার সেই সুন্দর মুখখানি দেখিলে, কেহই তাহার সহিত দুটি কথা না কহিয়া থাকিতে পারিত না, আর একটিবার তাহার সেই সুন্দর মুখের মধুমাখা কথা শুনিলে, তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। বাস্তবিক এমন সুন্দর মেয়ে কেহই কখনো দেখে নাই; এমন মিষ্ট কথাও শুনে নাই, এমন সুন্দর ব্যবহারও কেহ আর কোন বালক বা বালিকার নিকট কখনো পায় নাই। তাই মহর্ষি স্থূলকেশ মেয়েটির নাম রাখিলেন প্রমদ্বরা, অর্থাৎ সকল মেয়ের সেরা।

মেয়েটি যখন বড় হইল, তখন একদিন মহর্ষি চ্যবনের নাতি মহাত্মা প্রমতির পুত্র রুরু সেই আশ্রমে বেড়াইতে আসিলেন। সেখানে প্রমদ্বরাকে দেখিয়াই তাঁহার মন কেমন হইয়া গেল, সেই অবধি আর তাঁহার কিছুই ভালো লাগে না। তিনি কেবলই প্রমদ্বরার কথা ভাবেন, আর যে কাজ করিতে হইবে তাহারই কথা ভুলিয়া যান।

রুরুর বন্ধুরা প্রমতির নিকট গিয়া বিনয় করিয়া কহিল, "ভগবন্, আপনার পুত্র, স্থূলকেশের আশ্রমে প্রমদ্বরা নাম্নী একটি কন্যাকে দেখিয়া, তাহাকে বড়ই ভালোবাসিয়াছে। এখন সে খাওয়া দাওয়া ছাড়িয়া দিয়া সকল সময়ই সেই কন্যার কথা ভাবে। অতএব আপনি যাহা ভালো মনে করেন, করুন।"

এ কথা শুনিবামাত্রই প্রমতি স্থূলকেশের নিকট গিয়া বলিলেন, "হে মহর্ষি, আমি আমার পুত্র রুরুর জন্য, আপনার প্রমদ্বরাকে চাহিতে আসিয়াছি। আপনার মত হইলে, এই দুইজনের বিবাহ হইতে পারে।"

ইহার উত্তরে স্থূলকেশ অতিশয় আনন্দের সহিত বলিলেন, "আহা! মহর্ষি, আপনি কি সুন্দর প্রস্তাবই করিয়াছেন। আপনার পুত্রটি দেখিতে যেমন সুশ্রী তেমনি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বিনয়ে, তপস্যায়, সকলেরই বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়াছে। আমিও মনে করিতেছিলাম যে, ইহার সহিত আমার প্রমদ্বরার বিবাহ হইলে যৎপরোনাস্তি (যার পর নাই) সুখের বিষয় হয়।"

তারপর দুই মুনিতে মিলিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, আর কয়েক সপ্তাহ পরেই, ফাল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহের অতি উত্তম দিন রহিয়াছে। সুতরাং সেই দিনেই বিবাহ স্থির করিয়া, সকলে তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়! মানুষেরা কত সময় কত আশা করিয়া আনন্দের আয়োজন করে, আর কোথা হইতে বিপদ আসিয়া তাহাদিগকে দুঃখের সা[illegible]রে ভাসাইয়া দেয়। একদিন প্রমদ্বরা তাঁহার সঙ্গিনীগণের সহিত মিলিয়া আশ্রমের নিকটে আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন; তিনি জানিতেন না যে, সেইখানেই ঘাসের ভিতরে দারুণ কেউটে সাপ ঘুমাইয়া রহিয়াছে। খেলিতে খেলিতে, সেই কেউটে সাপের উপর প্রমদ্বরার পা পড়িল, আর অমনি দুষ্ট সাপ রাগে অস্থির হইয়া

* দেবতাদিগের ভিতরেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতি আছে। অশ্বিনীকুমারেরা শূদ্র জাতীয় দেবতা।

তাঁহাকে কামড়াইয়া দিল।

এমন দুঃখের কথা আমাদের বলিতে এবং শুনিতেই কত কষ্ট হইতেছে, যাহারা সে ঘটনায় উপস্থিত ছিল, তাহাদের হয়ত কষ্টের অ'ধ সীমাই ছিল না। এইমাত্র প্রমদ্বরা কত হাসিতেছিলেন, মুহূর্তের মধ্যে সে হাসির আলো নিভিয়া গেল। সোনার শরীর ছাইয়ের মত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সঙ্গিনীবা তখন ভয়ে অস্থির হইয়া চিৎকার করিতে লাগিল। সেই চিৎকারে আশ্রমের সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এত আনন্দের ভিতরে হঠাৎ এমন বিপদ উপস্থিত হওয়াতে, ক্ষণকালের জন্য মুনিরাও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তাঁহারা সকলে প্রমদ্বরার মৃত দেহের চারিধারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কাহারো মুখে কথা সরিল না। তখনো দেখিলে মনে হইতেছিল, যেন প্রমদ্বরার মৃত্যু হয় নাই, তিনি ঘুমাইতেছেন। মুখখানি কালো হইয়াও যেন পূর্বের চাইতে মিষ্ট দেখা যাইতেছিল।

রুরু সেখানে ছিলেন, আর মেয়েদের চিৎকার শুনিয়া সকলেব সঙ্গে ছুটিয়াও আসিযাছিলেন, সেখানে আসিয়া সকলে কাঁদিতে বসিল, আর তিনি পাগলের মত হইয়া ঊধর্বশ্বাসে বনেব দিকে ছুটিয়া পলাইলেন। তাঁহার মোটামুটি মনে হইল যে, প্রমদ্বরা মবিয়া গিযাছেন। কিন্তু তাঁহাকে আর ফিবিয়া পাইবেন না, এ কথা কিছুতেই তাঁহার মন মানিতে চাহিল না।

রুরু ক্রমে গভীর বনেব ভিতরে ঢুকিয়া, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ তাহার প্রাণ যেন তেজে পবিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, স্বর্গেব দিকে দৃষ্টি পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

"আমি যদি দান করিয়া থাকি, যদি তপস্যা কবিয়া থাকি, যদি ভক্তিপূর্বক গুরুজনেব সেবা করিয়া থাকি, তবে আমার প্রমদ্বরা বাঁচিয়া উঠুক। আমি জন্মাবধি যত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, তাহার বলে আমাব প্রমদ্বরা উঠিয়া দাঁড়াক!"

রুরুর এই কথা স্বর্গে গিয়া পৌঁছিল। তাহার পবেই তিনি দেখিলেন যে, সেই অন্ধকাব বন আলো করিয়া দেবদূত আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন।

দেবদূত বলিলেন, 'রুরু, মানুষ একবার মরিলে ত আব সে ফিরিয়া আসিতে পারে না। সুতরাং তুমি যাহা চাহিতেছ, তাহা কি করিয়া হইবে? প্রমদ্বরার আয়ু শেষ হইয়াছিল, তাই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং তুমি আর দুঃখ করিও না।'

দেবদূতের কথা শুনিয়া রুরু বলিলেন, 'তবে কি আমার প্রমদ্বরাকে পাইবার কোন উপায় নাই?'

দেবদূত বলিলেন, 'আছে! তুমি যদি একটি কাজ করিতে পাব, তবে প্রমদ্বরাকে আবার বাঁচান সম্ভব হয়।'

রুরু বলিলেন, 'বল, সে কি কাজ। আমি এখনই তাহা করিতেছি।'

দেবদূত বলিলেন, 'দেবতাগণ বলিয়াছেন যে, তুমি যদি অর্ধেক আয়ু প্রমদ্বরাকে দিতে পার, তবে সে সেই পরিমাণ সময়ের জন্য আবার তোমার নিকট আসিতে পারে।'

রুরু বলিলেন, 'আমি আমার অর্ধেক আয়ু প্রমদ্বরাকে দিলাম। সুতরাং সে আবার বাঁচিয়া উঠুক।'

এ কথায় দেবদূত যমের নিকট গিয়া বলিলেন, 'হে যম, রুরু প্রমদ্বরাকে তাঁহার অর্ধেক

আয়ু দান করিয়াছেন। অতএব, আপনি অনুমতি করুন, প্রমদ্বরা আবার জীবন লাভ করুন।'

যম বলিলেন, 'আচ্ছা, তবে তাহাই হউক।'

যমের মুখ দিয়া এ কথা বাহির হইবামাত্র, প্রমদ্বরা চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিলেন। তখনো সকলে তাঁহার চারিধারে বসিয়া কাঁদিতেছিল। তাহারা তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া নিতান্তই আশ্চর্য এবং আনন্দিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আনন্দ সামলাইয়া উঠিতে তাহাদের অনেক সময় লাগিয়াছিল। কেননা, বিবাহের দিনও ইহার পরে দেখিতে দেখিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা-রাজড়ার বিবাহে অবশ্য খুব জমকালো রকমের ধুমধাম হয়। মুনিঋষিদের বিবাহে অত ঘটা না হইবার কথা। কিন্তু রুরু আর প্রমদ্বরার বিবাহে সকলের মনে যেমন আনন্দ হইয়াছিল আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, কোন কালে আর কোন বিবাহে তাহার চেয়ে বেশি হয় নাই।

এইরূপ আনন্দের ভিতরে এই ব্যাপারের শেষ হইল। রুরুর মনে ইহাতে খুবই সুখ হইয়াছিল এ কথা আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি। কিন্তু দুষ্ট সাপ তাঁহার প্রমদ্বরাকে কামড়াইয়া ক্ষণকালের জন্য তাঁহাকে যে কষ্ট দিয়াছিল তাহার কথা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। এই ঘটনাতে সর্পজাতির উপর তাঁহার এমনই বিষম রাগ হইয়া গেল যে, তিনি আর ঘরে থাকিতে না পারিয়া বিশাল ডাণ্ডা হাতে সাপের বংশ ধ্বংস করিতে বাহির হইলেন। সে সময়ে কোন হতভাগ্য সাপ তাঁহার সম্মুখে পড়িল, আর কি তাহার রক্ষা ছিল? সে ফোঁস করিবার আগেই সেই ভীষণ ডাণ্ডা ধাঁই শব্দে তাহার মাথায় পড়িয়া তাহার সর্পলীলা সাঙ্গ করিয়া দিত।

এইরূপে রুরু বন, জঙ্গল পাহাড় পর্বত খুঁজিয়া কত সাপ যে সংহার করিলেন, তাহার লেখাজোখা নাই। একদিন তিনি সাপ খুঁজিতে খুঁজিতে গভীর বনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া 'ডুণ্ডুভ' নামক একটা সাপ দেখিতে পাইলেন। সাপটি নিতান্তই বুড়ো এবং অস্থিচর্মসার হইয়াছে, ভালো করিয়া নড়িতে চড়িতে পারে না। সেই বুড়া ডুণ্ডুভ সাপকে দেখিবামাত্র, রুরু ক্রোধভরে তাঁহার সেই বিশাল ডাণ্ডা উঠাইয়া তাঁহাকে মারিতে গেলেন।

তাহা দেখিয়া সেই সাপ কহিল, 'মুনি ঠাকুর, আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই, তবে কেন বিনা অপরাধে আমার প্রাণ বধ করিতে আসিতেছ?'

রুরু বলিলেন, 'তাহা বলিলে কি হইবে? আমার প্রমদ্বরাকে সাপে কামড়াইয়াছিল। সুতরাং দেখিতেছ, ডাণ্ডা! — আজ আর আমার হাতে তোমার রক্ষা নাই।'

সাপ কহিল, ঠাকুর, আমরা ডুণ্ডুভ সাপ, কোনদিন কাহারো হিংসা করি না। যাহারা কামড়ায় তাহারা অন্য সাপ। আমরা তাহাদের মত নহি, অথচ তাহাদের দোষের জন্য অকারণ সাজা পাই। তুমি ধার্মিক লোক, আমাদের দুর্দশা দেখিয়া কি তোমার দয়া হয় না?'

বাস্তবিকই সেই সাপটির কথা শুনিয়া রুরুর দয়া হইল। সুতরাং তিনি আর তাহাকে বধ না করিয়া মিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে? কি করিয়া তোমার এমন দুর্দশা হইল?'

সাপ কহিল, 'পূর্বজন্মে আমি সহস্রপাদ নামে মুনি ছিলাম, ব্রাহ্মণের শাপে সর্প হইয়াছি।'

রুরু বলিলেন, 'তোমার কথা আমার বড়ই আশ্চর্য বোধ হইতেছে। ব্রাহ্মণ কেন তোমাকে শাপ দিলেন, আর সে শাপ দূর হইবার কোন উপায় আছে কি না— এ-সকল কথা শুনিতে পাইলে আমি অতিশয় সুখী হইব।'

সর্প কহিল, 'ছেলেবেলায় 'খগম' নামে আমার একটি বন্ধু ছিলেন। তিনি সর্বদাই তপস্যা করিতেন, আর কখনো মিথ্যা কথা কহিতেন না। একদিন আমি, তামাশা দেখিবার জন্য একটা খড়ের সাপ লইয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইতে গেলাম, আমি জানিতাম না যে, সেই খড়ের সাপের ভয়ে তিনি অজ্ঞান হইয়া যাইবেন। জ্ঞান হইলে পর তিনি রাগে অস্থির হইয়া আমাকে এই শাপ দিলেন যে, তুমি যে খড়ের সাপ দিয়া আমাকে ভয় দেখাইলে সেই খড়ের সাপের মত অকর্মণ্য সাপ তুমি হইবে। খগমের তপস্যার তেজ আমি জানিতাম, তাই তাঁহার কথা শুনিয়া আমি জোড়হাতে বলিলাম, 'ভাই, আমি তামাশা করিতে গিয়া একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর আর কঠিন শাপ হইতে আমাকে বাঁচাইয়া দাও।'

ইহাতে খগমের চোখে জল আসিল, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'ভাই, নিষ্ঠুর কথা মুখে আনিয়া ফেলিয়াছি, এখন ত আর উপায় দেখি না। এখন আমি যাহা বলিতেছি, মন দিয়া শুন, আর কখনো ভুলিও না। প্রমতির পুত্র রুরুর সহিত দেখা হইলে তোমার শাপ দূর হইবে।'

কি আশ্চর্য! সাপ তাহার কথা ভালো করিয়া শেষ করিতে না করিতেই তাহার চেহারা একটু একটু করিয়া মানুষের মত হইতে লাগিল। তখন সে বলিল, 'বুঝিয়াছি, আপনি সেই প্রমতির পুত্র রুরু। তাই আপনার দর্শন পাইয়া আজ আমার শাপ দূর হইল।' বলিতে বলিতে সহস্রপাদ তাঁহার নিজের সুন্দর মূর্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর তিনি স্নেহের সহিত রুরুকে অনেক সুন্দর উপদেশ দিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নল ও দময়ন্তীর কথা

বিদর্ভ দেশে ভীম নামে এক রাজা ছিলেন। দেশ বিদেশের লোকে তাঁহার গুণের কথা বলিত। ধনে, জনে, যশে, মানে, তাঁহার সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু এক দুঃখে তাঁহার সকল সুখ মাটি হইয়া গিয়াছিল। সোনার সংসার দিয়া কি হইবে, যদি তাহা খালি পড়িয়া থাকিল? রাজা নিশ্বাস ফেলিতেন, আর বলিতেন, 'হায়, আমার এ ধন কে খাইবে? আমার যে সন্তান নাই।'

একদিন মহামুনি দমন রাজার সঙ্গে দেখা কবিতে আসিলেন। রাজা রানী তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া, বসিতে সোনার আসন দিলেন। সুবাসিত জল দিয়া নিজ হাতে তাঁহার পা ধুইয়া দিলেন। তারপর মুক্তার ঝালর দেওয়া চন্দনের পাখা লইয়া দুজনে তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। মুনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'মহারাজা, তোমরা আমাকে যেমন খুশি করিলে, আমিও তোমাদের তেমনি সুখী করিব। আমার বরে তোমাদিগের একটি লক্ষ্মীর মতন কন্যা ও তিনটি পুত্র হইবে।'

বর দিয়া মুনি চলিয়া গেলেন, রাজাও মনে করিলেন, 'এতদিনে যদি আমাদের দুঃখের শেষ হয়।'

তারপর ক্রমে রাজার তিনটি ছেলে আর একটি মেয়ে হইল। মুনির নাম ছিল দমন, সেই

মনে করিয়া রাজা ছেলে তিনটির নাম দম, দান্ত, আর দমন, আর মেয়েটির নাম দময়ন্তী রাখিলেন।

এতদিনে রাজার আঁধার ঘরে আলো জ্বলিল। ছেলে তিনটির যেমন রূপ, তেমনি গুণ। আর দময়ন্তীর কথা কি বলিব? দেহের মধ্যে যেমন প্রাণ, সেই রাজপুরীর মধ্যে তেমনি হইলেন দময়ন্তী। আকাশ হইতে দেবতারা তাঁহাকে দেখিয়া বলিতেন, 'আহা, কি সুন্দর!' রাজ্যের লোক তাঁহাকে দেখিলে মনে করিত, বুঝি নিজে লক্ষ্মী রাজার ঘরে জন্ম লইয়াছেন।

দময়ন্তী যখন বড় হইলেন, তখন শত শত সখী আর দাসী তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। রাজবাড়ির ভিতরে মেয়েদের বেড়াইবার বাগান ছিল। সেই বাগানে দময়ন্তী তাঁহার সখীদিগকে লইয়া রোজ বেড়াইতে যাইতেন। একদিন সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন, এক ঝাঁক সোনার হাঁস সেখানে খেলা করিতেছে।

হাঁস দেখিয়া দময়ন্তী বলিলেন, 'কি সুন্দর, কি সুন্দর! ওলো, তোরা দেখিস্ যেন পলায় না।'

সখীরা সকলে হাঁস ধরিতে গেল, হাঁসগুলি তাহাদিগকে লইয়া বাগানের আর-এক পানে ছুটিয়া পলাইল। একটি হাঁস পিছনে পড়িয়াছিল, দময়ন্তী নিজেই তাহাকে ধরিতে গেলেন।

তখন হাঁস বলিল, 'তুমি যাঁহার যোগ্য রানী, আমি তাঁহার খবর জানি। রাজকন্যা! নলের কথা শুনিয়াছ?'

দময়ন্তী বলিলেন, 'তুই পাখি হইয়া কথা কহিতেছিস্, না জানি, তোর খবর কেমন আশ্চর্য। তুই যাঁহার নাম করিলি, সেই নল কে? তিনি কোথায় থাকেন?'

পাখি বলিল, একটা দেশ আছে, তাহার নাম নিধধ। বীরসেনের পুত্র নল সেই দেশের রাজা। রাজকন্যা! এমন রাজার কথা আর কখনো শোন নাই। এমন সুন্দর মানুষ আর কখনো দেখ নাই। দেবতা, গন্ধর্ব, মানুষ, যক্ষ, সকলকেই দেখিয়াছি—রূপে গুণে নলের সমান কেহই নহে। যেমন তুমি, তেমনি নল। তুমি যদি তাঁহার রানী হও, তবেই যথার্থ সুখের কথা হয়।'

দময়ন্তী বলিলেন, 'হাঁস, তোর কথা বড়ই মিষ্ট। এ কথা তুই নলকে বলিতে পারিস্?'

হাঁস বলিল, 'অবশ্যই পারি। আমি এই চলিলাম।' এই বলিয়া হাঁসের ঝাঁক হাসিতে হাসিতে নলরাজার দেশে উড়িয়া গেল। নল তখন রাজবাড়ির এক কোণে বাগানের ভিতরে নিরিবিলি বসিয়া দময়ন্তীর কথাই ভাবিতে ছিলেন, এ কথা হাঁসেরা জানিত। ইহার কারণ এই যে, নলের সঙ্গেই তাহাদের আগে দেখা হইয়াছিল।

নলের বাগানে তাহারা বেড়াইতে যায়, আর, নল তাহাদের একটাকে ধরিয়া ফেলেন। হাঁসটি ধরা পড়িয়া মিনতি করিয়া বলিল, 'মহারাজ! আমাকে মারিবেন না, আমি আপনাকে দময়ন্তীর খবর আনিয়া দিব।'

নল ইহার আগেই দময়ন্তীর কথা শুনিয়াছিলেন, আর বাগানে বসিয়া তাঁহারই কথা ভাবিতেছিলেন। হাঁসের কথা শুনিয়া তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তারপর তাহারা দময়ন্তীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া নলের কথা শুনাইয়া গেল।

সে কথা শুনিয়া অবধি আবার দময়ন্তীর চোখে ঘুম নাই, মুখে হাসি নাই। অন্ন ব্যঞ্জন থালা সুদ্ধ তাঁহার সামনে অমনি পড়িয়া থাকে। দিনরাত তিনি কেবলই নলের কথা ভাবেন, আর কাঁদেন।

রানী রাজার নিকট কাঁদিয়া বলিলেন, 'মায়ের আমার হইল কি?' রাজা অনেকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, 'চল, স্বয়ম্বরের আয়োজন করিয়া উহার বিবাহ দিয়া দিই!'

তারপর দেশ বিদেশে রাজার নিকট সংবাদ গেল, 'দময়ন্তীর স্বয়ম্বর হইবে, সকলে আসুন।' সে সংবাদ শুনিয়া আর কেহই ঘরে বসিয়া থাকিলেন না। দেখিতে দেখিতে রাজা-রাজড়ায় বিদর্ভ নগর ছাইয়া গেল। সৈন্যের কলরবে, হাতি ঘোড়ার ডাক, আর রথের শব্দে, লোকের কথাবার্তা কহা ভার হইয়া উঠিল।

রাজারা সকলে স্বয়ম্বরে আসিয়াছেন, তাই কয়েকদিনের জন্য তাঁহাদেব ঝগড়া বিবাদ থামিয়া গিয়াছে, আর যুদ্ধও হয় না, তেমন ভাবে লোকও মরিয়া স্বর্গে যায় না। ইন্দ্র ভাবিলেন, 'সে কি! যুদ্ধে মরিয়া মাসে মাসে এতগুলি লোক স্বর্গে আসে, এ মাসে ত সেরকম আসিল না। ইহার কারণ কি? সেখানে নারদ মুনি ছিলেন, তিনি বলিলেন, 'দেববাজ, রাজারা সকলে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে গিয়াছেন, তাই এখন আব যুদ্ধ হয় না, লোকও অধিক মরে না।'

নারদের কথা শুনিয়া স্বর্গের সকলে বলিল, 'আমরাও দময়ন্তীর স্বয়ম্বব দেখিতে যাইব।' তখনই দেবতারা সকলে নিজ নিজ বাহনে চড়িয়া পরম আনন্দে বিদর্ভ দেশে যাত্রা কবিলেন। বিদর্ভ দেশের কাছে আসিয়া তাহারা দেখিলেন যে, নিষধের রাজা নলও সেই পথে স্বয়ম্বরে যাইতেছেন। নলকে দেখিয়া দেবতাদিগেব বডই ভয় হইল। তাঁহাদের মনে হইল যে, এই রাজার মত সুন্দর লোক তাঁহাদের মধ্যে কেহই নাই। তখন, কেহ বলিলেন, 'তাই ত, কি করি?' কেহ বলিলেন, 'চল! ফিবিয়া যাই!' আবার কেহ কেহ মনে করিলেন, 'উহাকে ফাঁকি দিয়া আমাদের কাজ করাইয়া লই।" এই ভাবিয়া তাঁহাদের চাবিজনে নলেব নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তুমি অতিশয় ধার্মিক লোক, তোমাকে আমাদের একটি কাজ, কবিয়া দিতে হইবে।'

দেবতাদিগকে দেখিয়া নল, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া জোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে? আমাকে আপনাদের কি কাজ করিতে হইবে?

দেবতাদের একজন বলিলেন, "আমি ইন্দ্র, ইনি অগ্নি, ইনি যম, আর ইনি বরুণ। আমবা দময়ন্তীকে পাইবার জন্য স্বয়ম্বরে চলিয়াছি। তুমি আমাদের দূত হইয়া দময়ন্তীর নিকটে গিয়া বলিবে, যেন তিনি আমাদের কোন একজনকে বিবাহ করেন।"

নল বলিলেন, "ইহা কি সুবিচার হইল? আপনারাও দময়ন্তীর জন্য যাইতেছেন, আমিও দময়ন্তীর জন্য যাইতেছি। আপনাদের কি উচিত, আমাকে দূত করিয়া পাঠান?"

দেবতারা বলিলেন, "মহারাজ, তুমি ত বলিয়াছ, যে 'আজ্ঞা', এখন আবার কি করিয়া, 'না' বলিবে? শীঘ্র যাও।"

নল বলিলেন, "আচ্ছা, আমি নাহয় আপনাদের দূত হইলাম। কিন্তু আমি দময়ন্তীর কাছে কি করিয়া যাইব? তাহার আগেই ত প্রহরীরা আমাকে কাটিয়া ফেলিবে!"

ইন্দ্র বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই। প্রহরীরা তোমাকে দেখিতেই পাইবে না। তুমি অতি সহজে দময়ন্তীর নিকট যাইতে পারিবে।"

এ কথায় নল দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া দময়ন্তীর নিকট যাত্রা করিলেন। তাঁহার দরজায় ঢাল তলোয়ার হাতে সিপাহীরা দাঁড়াইয়া ছিল; তিনি তাহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন,

কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। চাকর-চাকরানীরা তাঁহার চারিদিক দিয়া যাওয়া আসা করিতে লাগিল, কেহই বুঝিতে পারিল না যে, একজন লোক আসিয়াছে। শেষে যখন একেবারে দময়ন্তীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দময়ন্তী আর তাঁহার সখীরা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, বুঝি কোন দেবতা আসিয়াছেন। তাই তাঁহারা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, হেঁট মুখে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

তখন দময়ন্তীর মন বলিল, "ইনিই মহারাজা নল।' এ কথা মনে হইবামাত্র তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "মহারাজ কি করিয়া এখানে আসিলে? দরজায় যে পাহারা।"

নল বলিলেন, "দেবতাদের বরে তোমার লোকেরা আমাকে দেখিতে পায় নাই। ইন্দ্র, যম, অগ্নি আর বরুণ আমাকে তাঁহাদের দূত করিয়া তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন; তুমি তাঁহাদের মধ্যে একজনকে বরণ কর।"

দময়ন্তী বলিলেন, "মহারাজ, হাঁসের মুখে তোমার কথা শুনিয়াছিলাম, সেই হইতে তোমাকে ভালোবাসিয়াছি। তোমা ছাড়া আমি আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিব না। তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, তবে আমি বিষ খাইয়া মরিব।"

নল বলিলেন "রাজকুমারি, দেবতাদিগের পায়ের ধূলার সমানও আমি নহি। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমাকে কেন বিবাহ করিতে চাহিতেছ? মনে করিয়া দেখ, ইঁহারা অসন্তুষ্ট হইলে কি না করিতে পারেন।"

দময়ন্তী বলিলেন, "দেবতাদিগের মহিমার অন্ত নাই; তাঁহাদিগকে নমস্কার করি! কিন্তু মহারাজ, আমি সত্য বলিতেছি, তোমাকে ছাড়িয়া আমি আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিব না।"

নল বলিলেন, "দময়ন্তি, আমিও তোমাকে বড়ই ভালোবাসি। কিন্তু যাঁহাদের দূত হইয়া আসিয়াছি, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া নিজের কথা বলিলে আমার মহাপাপ হইবে।"

দময়ন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মহারাজ, তোমার কাজ ত তুমি ভালো মতই করিয়াছ। ইহার পরেও যদি আমি ত্রিভুবনের সম্মুখে তোমার গলায় মালা দিই, তাহাতে তোমার কেন পাপ হইবে? মহারাজ, তুমি সভায় আসিবে; আমি তোমাকেই বরণ করিব।"

রাজা দেবতাদের নিকট চলিয়া আসিলেন। দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, দময়ন্তী কি বলিল?"

নল বলিলেন, "আমি আপনাদের কথা আমার সাধ্যমত বলিয়াছি। তথাপি দময়ন্তী বলিলেন, আমার গলাতেই মালা দিবেন। এখন আপনাদের যাহা ভালো মনে হয় করুন।"

স্বয়ম্বরের শুভদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সুন্দর সভাঘর আলো করিয়া দেবতা আর রাজাগণ, মাণিকের কাজ করা সোনার সিংহাসনে বসিলে, সে স্থানের শোভার আর সীমা রহিল না। তারপর সন্ধ্যার আকাশে যেমন চন্দ্র দেখা দেয়, দময়ন্তী স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মনোহর বেশে সেইরূপ আসিয়া সভায় দাঁড়াইলেন। তখন ঘটকেরা মালা চন্দন পরিয়া, মধুর স্বরে অতি চমৎকার ভঙ্গিতে রাজাগণের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। দময়ন্তী সকলের কথাই শুনিলেন। কিন্তু কিছুই বলিলেন না, তিনি কেবল চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিলেন, নল কোথায়!

নলকে খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি দেখিলেন যে, পাঁচটি লোক সভায় বসিয়া আছেন। তাঁহাদিগকে দেখিতে ঠিক নলেরই মত। তিনি বুঝিতে পারিলেন, উঁহাদের মধ্যে একজন নল। আর চারিজন দেবতা। কিন্তু ইহার বেশি তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন তিনি দুখানি হাত জোড় করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "আমি নলকে ভালোবাসি আর মনে মনে তাঁহাকেই বরণ করিয়াছি। হে দেবতাগণ, আপনারা দয়া করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিন।"

দময়ন্তীর কথায় দেবতাগণের মন গলিল। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই পাঁচজনের মধ্যে চারিজন শূন্যে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের চোখে পলক নাই; শরীরে ঘাম নাই, ছায়া নাই। তিনি বুঝিলেন; এই চারিজন দেবতা, অপরটি নল। তখন তিনি লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া অপার আনন্দের সহিত বরমাল্যখানি নলের গলায় পরাইয়া দিলেন। নল বলিলেন, "দময়ন্তি, যতদিন এই প্রাণ থাকিবে, ততদিন আমি তোমাকে ভালোবাসিব।"

দময়ন্তী বলিলেন, "আমার এই প্রাণ দিয়া তোমার সেবা করিব।"

এদিকে দেবতারা আনন্দের সহিত বলিতেছেন, "বড়ই সুখের বিষয় হইল; যেমন কন্যা তেমনি বর মিলিল। রাজা মহাশয়েরা বলিতেছেন, "হায়! এত ক্লেশ করিয়া আসিলাম, আর অন্যে কন্যা লইয়া গেল!"

যাহা হউক কন্যা যখন মোটেই একটি, তখন রাজা মহাশয়দিগের প্রত্যেকেরই কন্যা পাওয়ার ত কোন কথা ছিল না; দুঃখ করিলে কি হইবে? দেবতারা কেহই দুঃখ করেন নাই। এমন-কি, যাঁহারা ফাঁকি দিয়া দময়ন্তীকে পাইবার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই শেষে সন্তুষ্ট হইয়া নলকে বর দিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র বলিলেন, "তুমি স্বর্গে গিয়া পরম সুখে থাকিবে।"

অগ্নি কহিলেন, "তুমি যাহাই রাঁধিবে তাহাই খাইতে অমৃতের মত হইবে।"

বরুণ কহিলেন, "তুমি ডাকিলেই আমি আসিব। আর এই মালা লও; ইহার ফুল কখনো শুকাইবে না।"

তারপর মহাসমারোহে নল-দময়ন্তীর বিবাহ হইল। বিবাহের পরে সকলে নিজ নিজ দেশে চলিয়া গেলেন। নলও কিছুদিন বিদর্ভ দেশে থাকিয়া দময়ন্তীকে লইয়া মনের আনন্দে ঘরে ফিরিলেন।

দেশে ফিরিয়া তাঁহাদের সময় কিছুদিন বড়ই সুখে কাটিল। প্রজারা দু'হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "না জানি কতই পুণ্য করিয়াছিলাম, তাই এমন রাজা রানী পাইলাম।" শত্রুরা অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া বলিল, "মারিলেও নল, রাখিলেও নল, এমন কাজ আর করিব না।"

ইহার উপর যখন তাঁহাদের ইন্দ্রসেন আর ইন্দ্রসেনা নামে একটি পুত্র আর একটি কন্যা হইল, তখন তাহাদের চাঁদমুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহারা এই পৃথিবীতেই স্বর্গের সুখ পাইলেন।

কিন্তু সংসারের সুখকে বিশ্বাস করিতে নাই। সুখ যখন আসে তখন সে দুঃখকে আড়ালে করিয়া আনিতে প্রায়ই ভোলে না। নলের সুখের শুরু হইতেই কলি নামে কুটিল দেবতা তাঁহার সর্বনাশের সুযোগ খুঁজিতে ছিল।

সেই স্বয়ম্বরের দিন ইন্দ্র, যম, অগ্নি আর বরুণ স্বর্গে ফিরিয়া যাইবার সময় পথে কলি আর দ্বাপরের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হয়। কলিকে দেখিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "কি হে কলি,

কোথায় চলিয়াছ?”

কলি বলিল, “দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে।”

ইন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “হাঃ, হাঃ, হা-া-া! স্বয়ম্বর শেষ হইয়া গিয়াছে। দময়ন্তী নলকে মালা দিয়াছেন।”

এ কথা শুনিবামাত্র কলি ভ্রূকুটি করিয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, “বটে! আপনারা থাকিতে একটা মানুষকে মালা দিল? ইহার উচিত সাজা দিতে হইবে।”

দেবতারা বলিলেন, “দময়ন্তীর দোষ নাই, আমরা তাহাকে অনুমতি দিয়াছি। নলের মতন বরকে মালা দিবে না ত কাহাকে দিবে? এমন লোককে শাপ দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুর কাজ।”

এই বলিয়া দেবতারা চলিয়া গেলে, কলি দ্বাপরকে বলিল, “দ্বাপর, তুমি কি বল? আমার ত রাগে গা জ্বলিয়া যাইতেছে। যেমন করিয়াই হউক, এই নলের ভিতরে ঢুকিয়া, তাহার সর্বনাশ করিতে হইবে। সে সময় তুমি আমায় সাহায্য করিবে কি না, বল?”

দ্বাপব বলিল, “তাহা আর বলিতে! অবশ্য সাহায্য করিব।”

এমনি যুক্তি হইল, এখন একটি ছিদ্র পাইলেই হয়। এ-সকল দুষ্ট দেবতা; পুণ্যবাণ লোকের শবীরে চট্ করিয়া প্রবেশ করিবার শক্তি ইহাদের নাই। কাজেই কলি নলের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দেখিতে লাগিল, তিনি কখনো কোন দোষ করেন কি না। এগার বৎসর ধরিয়া দুষ্ট কলি নলেব পিছু পিছু ঘুরিল। এগার বৎসরের ভিতরে সে না পাইল, তাঁহার একটি কাজের খুঁত, বা একটি কথার ভুল। এগার বৎসর পরে একদিন তিনি সন্ধ্যা উপাসনার আগে পা ধুইতে ভুলিয়া যান, তাই তাঁহার শরীব অশুচি ছিল। এইটুকু ছিদ্র পাইবামাত্র বেয়ারামের বীজের মত, দুষ্ট কলি তাহার ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

এমনি ভাবে নলকে কাবু করিয়া, কলি নলের ভাই পুষ্করকে গিয়া বলিল, “চল তোমাকে বাজা করিয়া দিই গে।”

পুষ্কব ভারি দুষ্ট আব নিতান্ত বোকা ছিল, তাই রাজা হওয়ার কথায় তাহার জিবে জল আসিল। সে তখনই লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, “চল! কিন্তু কেমন করিয়া রাজা করিবে?”

কলি বলিল, “কেন তুমি পাশা খেলিয়া নলকে হারাইয়া দিবে।”

এ কথা শুনিয়াই পুষ্কব আবার ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল—সে পাশার ‘প’ও জানিত না। কিন্তু কলি বলিল, “ভয় কি? তোমায় কিছুই করিতে হইবে না। আমি তোমাকে জিতাইয়া দিব।”

তখন পুষ্করেব আনন্দ আর সাহস দেখে কে? সে অমনি নলের নিকট গিয়া উপস্থিত। তারপর যতক্ষণ না নল পাশা খেলিতে রাজি হইলেন, ততক্ষণ সে তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে দিল না। খালি বলিল,

“দাদা! এস, পাশা খেলিতে হইবে!”

কাজেই আর কি করা যায়, পাশা খেলা আরম্ভ হইল।

নলের মাথার ভিতরে কলি; পাশার ভিতরে কলি। নল এককথা বলিতে আর-এক কথা বলিয়া বসেন। দারুণ পাশা একরকম বলিতে আর-একরকম হইয়া যায়!

দময়ন্তী দেখিলেন, সর্বনাশ, হইতে চলিয়াছে। সকলেই বুঝিল, রাজার আজ মাথার ঠিক নাই।

পুরীময় হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজা সোনা হারিয়াছেন, রূপা হারিয়াছেন, তথাপি তিনি থামেন না, বারণ করিতে গেলে কথা শোনেন না।

সকলে পরামর্শ করিয়া সারথি বার্ষ্ণেয়কে পাঠাইল। সে দময়ন্তীর নিকট আসিয়া জোড়হাতে বলিল, "দেবি! পাত্রমিত্র সকলে মহারাজকে দেখিতে চাহে। দয়া করিয়া একটিবার তাঁহাকে বাহিরে পাঠান।"

তখন দময়ন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ তোমার পায়ে পড়ি, একবার উঠিয়া বাহিরে চল, সকলে তোমাকে দেখিতে চাহে।"

কিন্তু রাজা তখন কলির হাতে, রানীর কথার উত্তর কে দিবে?দময়ন্তী যত কাঁদিলেন, তাহার কিছুই রাজার কানে গেল না। পাত্রমিত্রগণকে তাঁহার দর্শন না পাইয়া ফিরিতে হইল।

এইরূপে নানারকমে বারবার চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই রাজার মতি ফিরান গেল না।

দময়ন্তী বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই, এখন ছেলেটি আর মেয়েটিকে রক্ষা করিতে পারিলে হয়।

তাই তিনি সারথি বার্ষ্ণেযকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাছা বার্ষ্ণেয়, রাজার যখন সময় ছিল, তখন তিনি তোমাদের অনেক করিয়াছেন, এখন এই অসময়ে তাঁহার কিছু উপকার কর। আমাদের যাহা হইবার হইবে, কিন্তু ইন্দ্রসেন আর ইন্দ্রসেনার দুঃখ দেখিতে পারিব না। বাছা, তুমিই এই বিপদে আমার একমাত্র ভরসা। তুমি ইহাদের দুজনকে বিদর্ভ দেশে আমার পিতার নিকট লইয়া যাও। সেখানে তাহাদিগকে রাখিযা ইচ্ছা হয় সেখানে থাকিও, নাহয় অন্য কোথাও যাইও।"

রাণীর কথায় বার্ষ্ণেয় ছেলেটি আর মেয়েটিকে লইয়া, তখনই বিদর্ভ দেশে চলিয়া গেল। সেখানে তাহাদের দুজনকে, আর রথখানি আর ঘোড়াগুলিকে রাখিয়া, সে অযোধ্যায় গিয়া সেখানকার রাজা ঋতুপর্ণের নিকট কাজ লইল। ঋতুপর্ণের সারথি হইযা তাহার ভাত-কাপড়ের চিন্তা গেল বটে। কিন্তু মনের দুঃখ দূর আর হইল না।

এদিকে নলের দুঃখের কথা আর কি বলিব। হারিতে হারিতে তিনি সর্বস্ব খোয়াইয়া ফকির হইয়া দময়ন্তীকে লইয়া পথে বাহির হইয়াছেন! গায়ের চাদরখানি পর্যন্ত নাই। সঙ্গে একটি লোকও নাই। পুষ্কর পাশায় জিতিয়া, যত মুখে আসিয়াছে, ততই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছে। শেষে সেই দুরাত্মা রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে, "যে নলের হইয়া কথা বলিবে, তাহাকে কাটিয়া ফেলিব।"

কাজেই প্রজারা গোপনে কেবল চোখের জল ফেলে, কিন্তু রাজাকে দেখিলে কথা কয় না।

নগরের কাছেই একটি বনের ভিতরে, কেবল জল খাইয়া, নল দময়ন্তী তিনদিন কাটাইলেন। তারপর দুজনে অতিকষ্টে, বনের ফল মূল খাইয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।

এমন করিয়া কিছুদিন গেল। তারপর একদিন নল দেখিলেন, বনের ভিতর এক ঝাঁক পাখি চরিতেছে, তাহাদের পালক গুলি সোনার। আহা! নলের মনে সেই পাখিগুলি দেখিয়া কি আনন্দই হইল। তিনি ভাবিলেন, "পাখিগুলি মারিয়া খাইব, আর পালকগুলি বেচিয়া পয়সা পাইব।"

এই ভাবিয়া তিনি লতা পাতায় শরীর উত্তমরূপে ঢাকিয়া, নিজের কাপড় খানি দিয়া সেই

পাখি ধরিতে গেলেন, অমনি দুষ্ট পাখির দল খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে কাপড়খানি লইয়া উড়িয়া পলাইল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "হাঃ-হাঃ! মহারাজ, চিনিতে পারিলে না? আমরা সেই পাশা! সব হারিয়া মনে করিয়াছিলে, বুঝি কাপড়খানি লইয়া পলাইবে? তা আমরা কাপড়খানি ছাড়িব কেন?"

রাজা ভাবিলেন, 'সময়ে সবই হয়, ইহার পর না জানি কি হইবে।' ভাবিতে ভাবিতে তিনি দময়ন্তীর নিকট আসিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, 'দময়ন্তি, দুষ্টেরা আমার রাজ্য নিয়াছে, সর্বস্ব নিয়াছে। একখানিমাত্র কাপড় যে পরিয়াছিলাম, তাহাও তাহাদের সহ্য না হওয়াতে, আজ তাহাও লইয়া গেল! এখন আমি যাহা বলি শুন। দময়ন্তি, এই দেখ, কত পথ অবন্তী নগর ও ঋক্ষবান্ পর্বত হইয়া দক্ষিণ দেশে গিয়াছে। ঐ দেখ, বিন্ধ্য পর্বত, এই পায়োষ্ণী নদী। ঐ মুনিদিগের আশ্রম সকল দেখা যাইতেছে। এই পথে গেলে বিদর্ভ দেশে যাওয়া যায়; ঐ পথটি কোশলায় গিয়াছে।"

রাজার কথায় দময়ন্তীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, না জানি তুমি কি মনে ভাবিয়া এ-সকল কথা বলিতেছ! তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব? শাস্ত্রে বলিয়াছে, স্ত্রীই সকল দুঃখের ঔষধ; মহারাজ, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না।" রাজা বলিলেন, "দময়ন্তি, আমি প্রাণত্যাগ করিতে পারি, তথাপি তোমাকে ছাড়িতে পারি না। তুমি ভয় পাইতেছ কেন।"

দময়ন্তী বলিলেন, "তবে কি জন্য বিদর্ভ দেশের পথ দেখাইয়া দিতেছ? মহারাজ, আমার বড়ই ভয় হইতেছে। যদি যাইতে হয়, চল না, দুজনেই বিদর্ভ দেশে যাই। বাবা তোমাকে বুকে করিয়া রাখিবেন।"

নল বলিলেন, "না দময়ন্তী, এই বেশে আত্মীয়গণের নিকট যাইতে আমি কিছুতেই পারিব না।"

এই বলিয়া তিনি বারবার মিষ্ট কথায় দময়ন্তীকে শান্ত করিতে লাগিলেন। তারপর ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া বনের এক গভীর স্থানে দুজনেই বিশ্রাম করিতে বসিলেন, অল্পক্ষণের ভিতরেই দময়ন্তীর নিদ্রা আসিল। কিন্তু নলের প্রাণে যে দুঃখের আগুন জ্বলিতেছিল, তাহাতে নিদ্রা কি করিয়া আসিবে! এই দুঃখের ভিতরে দুষ্ট কলি ক্রামাগতই তাঁহার ভিতর হইতে বলিতেছিল, "দময়ন্তীকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া কেন কষ্ট দিতেছ? চলিয়া যাও! চলিয়া যাও! দময়ন্তী তাহার বাপের বাড়ি গিয়া সুখে থাকুক!"

নল বলিলেন, 'যাইব? না, মরিব? যদি যাই, এই বেশে কি করিয়া যাইব? দময়ন্তীর কাপড়ের আধখানা কাটিয়া পরিয়া যাই। কিন্তু কি দিয়া কাটিব?"

এই কথা মনে হইতে না হইতেই তিনি দেখিলেন, সামনে একখানি তলোয়ার, পড়িয়া আছে। সেকলই দুষ্ট কলির কাজ, কিন্তু নল তাহা বুঝিতে পারিলেন না! তিনি সেই তলোয়ার দিয়া দময়ন্তীর কাপড়ের অর্ধেক কাটিয়া পরিলেন। তখন কলি ক্রমাগত বলিতে লাগিল, "চল! চল!" তিনি তাহার কথায় কয়েক পা চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণের ভিতরে হায়, হায়! শব্দ উঠাতে আবার ফিরিয়া আসিলেন!

এইরূপে কলি কতবার তাঁহাকে টানিল, কতবার তিনি আবার ফিরিলেন। একবার তাঁহার মনে হইল, 'হায়! আমার দময়ন্তীর এই দশা!' একবার ভাবিলেন, 'হায়! এই ভয়ংকর বনে

আমার দময়ন্তী কি করিয়া থাকিবে?' এমনি এক-এক কথা ভাবিয়া রাজা এক-একবার ফিরেন, আবার কলি তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যায়। শেষে কলিরই জয় হইল, নল চোখের জলে ভাসিয়া বারবার দময়ন্তীর দিকে ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে পাগলের মত ছুটিয়া পলাইলেন।

আহা, দময়ন্তীকে যে কি দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া গেলেন, তাহা নলের তখন ভাবিয়া দেখিবার ক্ষমতা ছিল না। যখন দময়ন্তী জাগিয়া দেখিলেন, নল, নাই তখন যে তাঁহার কি কষ্ট হইল, আমার কি সাধ্য, তাহা বলিয়া বুঝাই! সে সময়ে তাঁহার দুঃখে বুঝি পাষাণও গলিয়া ছিল। তিনি পাগলিনীর ন্যায় মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিলেন; বারবার অজ্ঞান হইয়া আবার জ্ঞান হইলে ছট্‌ফট্ করিয়া কাঁদিলেন; সন্ধ্যাকালে ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, নল যে তাঁহাকে খুঁজিবেন সে কথা ভাবিয়া আকুল হইয়া কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে নলের শত্রুদিগের উপর তাঁহার রাগ হইল। তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, "যে আমার পতিকে এমন কষ্টে ফেলিয়াছে, ইহার চেয়েও অধিক কষ্ট তাহার হইবে।"

বিপদ প্রায়ই একেলা আসে না। দময়ন্তী ব্যাকুল হইয়া বনের ভিতরে নলকে খুঁজিতেছেন, এমন সময়, এক ভীষণ অজগর তাহার লক্‌লকে জিব বাহির করিতে করিতে তাঁহাকে খাইতে আসিল। এমন দুঃখের সময়ে মৃত্যু হইলে ত আরামের কথাই হয়। দময়ন্তী অজগর দেখিয়া ভয় পাইলেন না। কিন্তু তাহার মনে হইল, "হায়! এই ঘোর অরণ্যের ভিতরে আমাকে সাপে খাইয়াছে। এ কথা শুনিলে না জানি, নলের মনে কতই কষ্ট হইবে।"

যখন আর কেহই থাকে না; তখনো ভগবান থাকেন। তিনি কৃপা করিলে নিতান্ত ঘোরতর বিপদ হইতেও মানুষকে রক্ষা করিতে পারেন। দময়ন্তী অজগর দেখিয়া জীবনের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমন সময় এক ব্যাধ আসিয়া সাপটাকে মারিয়া ফেলিল।

তারপর বনের ভিতরে চলিতে চলিতে দময়ন্তী দেখিলেন যে, একটা ভয়ঙ্কর সিংহ তাঁহার দিকে আসিতেছে। সিংহকে দেখিবামাত্র তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "হে পশুরাজ! আমি মহারাজ ভীমের কন্যা, নলের পত্নী। আমার নাম দময়ন্তী। যদি তুমি নলকে দেখিয়া থাক, তবে তাঁহার সংবাদ দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর; নচেৎ আমাকে ভক্ষণ করিয়া আমার দুঃখ দূর কর।"

সিংহ তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়াই চলিয়া গেল, তখন দময়ন্তী পর্বতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গিরিরাজ! তুমি কি আমার নলকে দেখিয়াছ?" হায় হায়! পর্বতও তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

এইরূপে দময়ন্তী পাগলিনীর বেশে মুনিদিগের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনিরা তাঁহাকে দেখিয়া স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি কি এই বনের দেবতা? কেন মা তুমি এমন করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছ?"

দময়ন্তী বলিলেন, "ওগো, আমি দেবতা নই! আমি মানুষ, অতি দীন দুঃখিনী; আপনাদের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। মুনিঠাকুর, আমি মহারাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তী। আমার স্বামীর কথা কি আপনারা শোনেন নাই? তিনি নিষধের রাজা। তাঁহার নাম নল। তাঁহার রূপ দেবতার মতন; তেজ সূর্যের মতন। ধর্ম আর সত্যের তিনি আশ্রয়। মুনিঠাকুর, আমি সেই নলের স্ত্রী; তাঁহাকে খুঁজিতে আপনাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি কি আপনাদের তপোবনে আসিয়াছেন?"

মুনিগণ বলিলেন, "মা তুমি স্থির হও! চক্ষের জল মুছ। আমরা নিশ্চয় বলিতেছি, শীঘ্রই তোমার আর নলের দুঃখ দূর হইবে।"

বলিতে বলিতে, আর সেখানে মুনিও নাই, আশ্রমও নাই। সকলই ভেল্কির মত আকাশে মিলাইয়া গেল। দময়ন্তী ভাবিলেন, "কি আশ্চর্য! আমি স্বপ্ন দেখিলাম?" চিন্তা করিতে করিতে তিনি এক নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, অনেকগুলি বণিক হাতি, ঘোড়া, উট, আর গাড়িতে করিয়া বিস্তর জিনিসপত্র লইয়া সেই নদী পার হইতেছে। দময়ন্তী সেই সওদাগরদিগের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। তাহাদের কেহ চিৎকার করিয়া উঠিল, কেহ ছুটিয়া পলাইল। কেহ তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কেহ তাঁহাকে বনের দেবতা মনে করিয়া তাঁহার নিকট আশীর্বাদ চাহিতে আসল; আবার কেহ কেহ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দয়া করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

দময়ন্তী তাহাদিগকে বলিলেন, "বাছাসকল, আমি মানুষ; রাজার মেয়ে, রাজার রাণী, নিষধের রাজা নল আমার স্বামী, আমি বনের ভিতরে তাঁহাকে হারাইয়া পাগলিনীর মত তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ?"

সেই বণিকদিগের দলপতির নাম ছিল শুচি। সে দময়ন্তীর কথায় বিনয় করিয়া বলিল, "মা, আমরা ত নল নামে কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। এই বনের ভিতরে বাঘ ভালুক অনেক আছে। কিন্তু মানুষ ত খালি তোমাকেই দেখিলাম।"

এই বলিয়া বণিকের দল যাইতে প্রস্তুত হইলে, দময়ন্তী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোন দেশে যাইবে?"

বণিকেরা বলিল, "আমরা চেদীর রাজা সুবাহুর নিকট যাইব।"

এ কথা শুনিয়া দময়ন্তীও সেই সওদাগরদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার মনে হইল যে, হয়ত বা পথে নলের সঙ্গে দেখা হইতে পারে। সওদাগরের দল সমস্ত দিন পথ চলিয়া একটা সুন্দর সরোবরের ধারে উপস্থিত হইল। সরোবর দেখিয়া বণিকেরা বলিল, "কি সুন্দর স্থানটি। চল ভাই, ইহার ধারে বিশ্রাম করি।" এই বলিয়া তাহারা সরোবরের পশ্চিম ধারে একটি জায়গা দেখিয়া, সেইখানে রাত কাটাইবার আয়োজন করিল। হাতি ঘোড়া-গুলিকে গাছে বাঁধিয়া রাখিল। বহুদিন পথ চলিয়া সকলেরই অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছিল, কাজেই তাহারা সকলে ঘুমাইয়া পড়িতে বেশি বিলম্ব হইল না।

রাত দুপুর হইয়াছে, সকলে অচেতন হইয়া ঘুমাইতেছে, এমন সময় একদল বুনো হাতি সেই সরোবরে জল খাইতে আসিল। তাহারা তখন সদাগরদিগের পোষা হাতিগুলিকে দেখিতে পাইল, তখন আর তাহাদের রাগের সীমা রহিল না। তাহারা তৎক্ষণাৎ গভীর গর্জনে সেই পোষা হাতিগুলিকে তাড়া করিলে সেগুলি ভয়ে চিৎকার করিতে করিতে, হতভাগ্য সওদাগরদের উপর দিয়াই ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। বেচারারা ভালো করিয়া বুঝিতেও পারিল না, কি হইয়াছে। তাহার পূর্বেই তাহাদের অধিকাংশ লোক হাতির পায়ের তলায় পড়িয়া পিষিয়া গেল।

একদিকে এমন ভয়ানক বিপদ, অন্যদিকে বনে আগুন লাগিয়া প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত। ধনরত্ন, জিনিসপত্র, যাহা কিছু ছিল, সে সর্বনেশে আগুন হইতে কিছুই রক্ষা পাইল না। হাতির

পায়ে যাহা চূর্ণ হয় নাই; তাহা আগুনে পুড়িয়া শেষ হইল।

এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের ভিতরে দময়ন্তী হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন যে সওদাগরদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজনই বাঁচিয়া আছে, আর তাহাদের কেহ কেহ ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাকেই এই বিপদের কারণ মনে করিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, "এই পাগলিনীকে জায়গা দিয়াই আমাদের সর্বনাশ হইল। এ নিশ্চয় কোন রাক্ষসী বা পিশাচী হইবে। চল উহাকে বধ করি।"

সেখানে আর দু-চারজন ভালো বুদ্ধিমান লোক না থাকিলে, হয়ত সেদিন দময়ন্তীর প্রাণই যাইত! ভগবানের কৃপায় সেই-সকল লোক তাঁহার পক্ষ হওয়াতে তিনি বাঁচিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, সেই কয়জন সওদাগর, যাহা কিছু জিনিস অবশিষ্ট ছিল তাহাই লইয়া, অতি কষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে সুবাহুর দেশে যাত্রা করিল। দময়ন্তীও তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। তাহারা যখন সুবাহুর নগরে পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা কাল। শহরের ছেলেরা তখন পথে বেড়াইতে আর খেলা করিতে বাহির হইয়াছে। দুঃখিনী দময়ন্তীর মলিন ছেঁড়া কাপড়, ধূলায় ধূসর শরীর আর এলো চুল দেখিয়া তাহারা মনে করিল বুঝি পাগল, তাই তাহারা হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দময়ন্তী যেদিকে যান, তাহারাও সেদিকে যায়। এমনি করিয়া তিনি রাজবাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই সময়ে রাজার মা বায়ু সেবন করিবার জন্য ছাদে উঠিয়াছিলেন। সেইখান হইতে দময়ন্তীকে দেখিতে পাইয়াই, দয়ায় তাঁহার মন গলিয়া গেল। তিনি দাইকে বলিলেন, "আহা না জানি কাহার বাছা গো! দুঃখিনীর মুখখানি দেখিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! ও দাই, শীঘ্র উহাকে আমার নিকট লইয়া আয়। ছেলেগুলি উহাকে বিরক্ত করিতেছে।"

দাই তখনই ছেলের দলকে তাড়াইয়া দিয়া দময়ন্তীকে রাজমাতার নিকট লইয়া আসিল। রাজমাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাছা তুমি কে? তোমার স্বামীর নাম কি? আহা গায় একখানিও গহনা নাই, তবু দেখিতে কি সুন্দর! দুষ্ট ছেলের দল এত বিরক্ত করিতেছিল, তবু একটু রাগও করে নাই।"

দময়ন্তী বলিলেন, "আমি ভদ্রঘরের মেয়ে, দুঃখে পড়াতে সৈরিন্ধ্রীর কাজ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমার স্বামী পরম গুণবাণ, আর আমাকে বড়ই ভালোবাসিতেন, বিবাহের পর কয়েক বৎসর আমরা বড়ই সুখে ছিলাম, তারপর আমাদের কপাল ভাঙ্গিল। পাশায় রাজ্যধন সব হারাইয়া আমাকে লইয়া পতি বনবাসী হইলেন। এ হতভাগীর দুঃখের শেষ তাহাতেও হইল না, একদিন তিনি ঘুমের ভিতরে আমাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, সেই অবধি পাগলিনীর মত তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।"

এই বলিয়া দময়ন্তী কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, রাজমাতার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "বাছা, তুমি আমার নিকট থাক, তোমার স্বামীর খোঁজ করাইয়া দিব। হয়ত বা ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি নিজেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন।"

তারপর তিনি নিজের কন্যা সুনন্দাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই দেখ মা, তোমার জন্য কেমন সুন্দর একটি সখী পাইয়াছি। তোমরা দুজনেই এক বয়সী। এক সঙ্গে থাকিয়া তোমাদের

সময় বেশ সুখে কাটিবে।"

সুনন্দা একটিবার দময়ন্তীর মুখের দিকে তাকাইয়াই, ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর হইতে আর সকল সময়েই দেখা যাইত যে, সুনন্দার একখানি হাত দময়ন্তীকে জড়াইয়া রহিয়াছে।

এতদিন নল কি ভাবে ছিলেন?

দময়ন্তীর নিকট হইতে পলায়ন করিয়া তিনি একটি অতি গভীর বনের ভিতরে প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন, বনে ভয়ানক আগুন লাগিয়াছে, আর সেই আগুনের ভিতর কে যেন অতি কাতর স্বরে ডাকিয়া বলিতেছে, "হে মহারাজ নল, দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা কর।"

তিনি তৎক্ষণাৎ 'ভয় নাই' বলিয়া ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, একটি প্রকাণ্ড সাপ কুণ্ডলী করিয়া সেখানে পড়িয়া আছে। সাপটি তাঁহাকে দেখিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, "মহারাজ, আমি কর্কোটক নামক নাগ; নারদের শাপে আমার চলিবার শক্তি গিয়াছে। আমি বহুকাল যাবৎ এইভাবে এইখানে পড়িয়া আছি; তুমি আসিয়া আমাকে এখান হইতে সরাইলে তবে আমার শাপ দূর হইবার কথা। দোহাই মহারাজ, আমাকে বাঁচাও। আমি তোমার উপকার করিব।" এই বলিয়া সাপটি আঙ্গুলের মতন ছোট হইয়া গেল, আর নল অতি সহজেই তাহাকে আগুনের ভিতর হইতে লইয়া আসিলেন। সেই স্বয়ম্বরের সময় হইতেই অগ্নি নলের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই আগুনের শিখা তাঁহাকে দেখিয়াই দূরে চলিয়া গেল।

তখন কর্কোটক নলকে বলিল, "মহারাজ এখন গণিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে খানিক দূর চলিয়া যাও; তাহা হইলে আমি তোমার বিশেষ উপকার করিব।"

সাপের কথায় নল গণিতে গণিতে দশ পা যাইবামাত্র সে কুট করিয়া তাঁহাকে কামড়াইয়া দিল। আর তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই দেবতার মতন সুন্দর চেহারা এমনি কালো আর কদাকার হইয়া গেল যে, কি বলিব!

ইহাতে নল যার পর নাই আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "এই বুঝি তোমার উপকার? তা সাপের উপকার এমনি হইবে না ত কেমন হইবে?"

কর্কোটক বলিল, "মহারাজ বিচার করিয়া তবে আমাকে তিরস্কার কর। ভাবিয়া দেখ আমার কামড়ে তোমার দুটি মহৎ উপকার হইয়াছে। এক উপকার এই যে, পুষ্করের লোক এখন আর তোমাকে চিনিতে পারিবে না। আর-এক উপকার এই যে, যে দুষ্ট তোমার শরীরে ঢুকিয়া তোমাকে এমন কষ্ট দিতেছে, এখন হইতে সেই দুষ্ট আমার বিষে জ্বলিয়া পুড়িয়া নাকালের একশেষ হইবে। তাহার প্রমাণ দেখ, আমার বিষে তোমার কোন কষ্ট হইতেছে না। ইহাতেই বুঝিতে পারিবে, বিষের মজাটা সেই দুষ্টই ষোল আনা পাইতেছে। আমার এই কামড়ের পর আর অন্য কোন জন্তু তোমাকে কামড়াইতে পারিবে না, আর তোমার শত্রুরাও ক্রমে জব্দ হইয়া যাইবে।"

তখন নল বলিলেন, "কর্কোটক, বাস্তবিকই তুমি আমাকে কামড়াইয়া যথার্থ বন্ধুর কাজ করিয়াছ।"

কর্কোটক বলিল, "মহারাজ, তুমি এখন অযোধ্যা নগরে রাজা ঋতুপর্ণের নিকট চলিয়া যাও; সেখানে "বাহুক" নামে পরিচয় দিয়া ঋতুপর্ণের সারথি হইবে। ঘোড়া চালাইবার কার্যে

এই পৃথিবীতে তোমার সমান আর কেহ নাই; তেমনি, পাশাখেলায় ঋতুপর্ণের মত এই পৃথিবীতে আর কেহই নাই। তুমি যদি ঘোড়া চালাইবার বিদ্যা তাঁহাকে শিখাইয়া দাও, তবে, তিনি নিশ্চয়ই তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তোমার সহিত বন্ধুতা করিবেন, আর খুব ভালো করিয়াই তোমাকে পাশা খেলা শিখাইবেন। সেই পাশার দ্বারা আবার তোমার রাজ্য ধন সকলই তুমি ফিরাইয়া আনিতে পারিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই তোমার মঙ্গল হউক! তুমি আর দুঃখ করিও না। যখন তোমার নিজের সেই সুন্দর রূপ আবার ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা হইবে, তখন এই কাপড় দুখানি পরিয়া আমাকে স্মরণ করিও।"

এই বলিয়া কর্কোটক নলকে দুইখান কাপড় দিয়া, তাঁহার সম্মুখেই আকাশে মিলাইয়া গেল, আর, নল তাহাকে মনে মনে অনেক ধন্যবাদ দিয়া ঋতুপর্ণের দেশে যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌঁছাইতে তাঁহার দশদিন লাগিল।

মহারাজ ঋতুপর্ণ পাত্রমিত্র-সমেত সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় নল তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

মহারাজ আমার নাম বাহুক। অশ্ব চালনায় আমার সমান লোক এই পৃথিবীতে কেহ কখনো দেখে নাই। ইহা ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই আমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। আপনার টাকার কষ্ট হইলে তাহার উপায় করিতে পারি, রন্ধনের কাজ অতি আশ্চর্যরকম করিতে পারি। ইহা ছাড়া বিশেষ কঠিন কোন কাজ উপস্থিত হইলে, অনেক সময় তাহাও করিতে পারি। আমাকে রাখিতে আজ্ঞা হউক।"

ঋতুপর্ণ বলিলেন, "তোমাকে অসাধারণ গুণী লোক বলিয়া বোধ হইতেছে; বিশেষত তাড়াতাড়ি ঘোড়া চালাইবার আমার বড়ই শখ। তুমি মাসে দশ হাজার মোহর বেতন পাইবে; আমার নিকট থাক। এই বার্ষ্ণেয় আর জীবল তোমার কাজকর্ম করিবে।"

ইহার পর হইতে ঋতুপর্ণের রাজ্যে নল বিশেষ সম্মানের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। দিনের বেলায় কাজ করিতে করিতে দময়ন্তীর সেই মুখখানি তাঁহার ক্রমাগতই মনে পড়িত। সন্ধ্যাকালে অবসর হইবামাত্র তিনি প্রত্যহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন, 'হায়! না জানি সে এখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, এই হতভাগ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে কোথায় পড়িয়া আছে! না জানি কত কষ্টে তাহার অন্ন জুটিতেছে!"

নল প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই কথা বলেন, জীবল প্রত্যহ আশ্চর্য হইয়া তাহা শোনে, একদিন সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাহুক, তুমি রোজ সন্ধ্যাকালে কাহার জন্য এমন করিয়া দুঃখ কর?"

নল বলিলেন, "ভাই, এক মূর্খের সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত স্ত্রী ছিল। বুদ্ধির দোষে সেই লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া আসিয়া, এখন দারুণ দুঃখে হতভাগ্যের বুক ফাটিয়া যাইতেছে। সেই মূর্খই প্রত্যহ সেই লক্ষ্মীকে স্মরণ করিয়া এই কথা বলে।"

এইরূপে ঋতুপর্ণের দেশে নলের দিন যাইতে লাগিল।

নলের সারথি যখন তাঁহাদের ছেলেটি আর মেয়েটিকে লইয়া বিদর্ভদেশে উপস্থিত হয়, তাহার কিছুদিন পরেই মহারাজ ভীম শুনিতে পান যে, নল-দময়ন্তী রাজ্য ছাড়িয়া বনবাসী হইয়াছেন। তখন হইতেই তিনি বিশ্বাসী বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণদিগকে অনেক টাকাকড়ি দিয়া দেশ বিদেশে পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সকলকে বলিয়া দিলেন,

"উহাদিগকে এখানে আনিতে পারিলে ত বিশেষ পুরস্কার দিবই, উহাদের সংবাদ আনিতে পারিলেও এক হাজার গরু আর খুব বড় একখানি গ্রাম দিব।"

সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের যতদূর সাধ্য ছিল, তাঁহারা খুঁজিতে কোনরূপ ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু একে একে তাঁহাদের প্রায় সকলেই নল-দময়ন্তীর কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া, দুঃখের সহিত ফিরিয়া আসিলেন।

ইঁহাদের মধ্যে সুদেব নামক একজন অতি বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। তিনি নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে, চেদী নগরে আসিয়া, রাজবাড়ীতে সুনন্দার সঙ্গে একটি মেয়েকে দেখিতে পাইলেন। মেয়েটির বেশ অতি দীন হীন, মুখখানি মলিন, আর শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অস্থি চর্মসার হইয়াছে। তথাপি তাঁহার মনে হইল, যেন সেই মুখখানি তিনি ইহার পূর্বে কোথায় দেখিয়াছেন। তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে মেয়েটিকে দেখিতে লাগিলেন। যত দেখিলেন, ততই তাঁহার নিশ্চয় মনে হইল যে, এই মেয়েটিই দময়ন্তী। শেষে তিনি আর থাকিতে না পারিয়া দময়ন্তীর নিকটে গিয়া বলিলেন, "বৈদর্ভি (অর্থাৎ বিদর্ভদেশের রাজার মেয়ে) আমি আপনার ভ্রাতার প্রিয় বন্ধু; আমার নাম সুদেব। মহারাজ ভীমের আজ্ঞায় আপনাকে খুঁজিতে আসিয়াছি, আপনার পিতা, মাতা, ভাই, সন্তান, সকলেই ভালো আছেন; কিন্তু আপনার জন্য দিনরাত কেবলই তাঁহাদের চক্ষের জল পড়ে!"

সুদেবকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া দময়ন্তী কাঁদিয়া উঠিলেন। তারপর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, এক এক করিয়া পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু সকলের সংবাদ লইতে লাগিলেন।

এদিকে সুনন্দা যখন দেখিলেন যে, দময়ন্তী কাঁদিতেছেন, তখন তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার মার নিকট গিয়া বলিলেন, "মা, এক ব্রাহ্মণ কোথা হইতে আসিয়া দময়ন্তীকে কি সংবাদ দিয়াছেন, তাহা শুনিয়া দময়ন্তী কাঁদিতেছেন।"

এ কথায় রাজার মা তখনই সুদেবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আপনি এই মেয়েটির পরিচয় জানেন বলিয়া বোধহয়। ইনি কে? কাহার কন্যা?"

সুদেব কহিলেন, "মা, ইনি বিদর্ভরাজ মহাত্মা ভীমের কন্যা, ইঁহার নাম দময়ন্তী, বীরসেনের পুত্র মহারাজ নলের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তারপর নল পাশায় রাজ্য হারাইয়া ইঁহাকে লইয়া দেশ ত্যাগ করেন সেই অবধি আমরা ইঁহাদিগকে খুঁজিয়া অস্থির হইয়াছি, কিন্তু এতদিন কোথাও ইঁহাদের সন্ধান পাই নাই। সমুদায় পৃথিবী ঘুরিবার পর আজ আপনার বাড়িতে এই মেয়েটিকে দেখিয়াই মনে হইল যে, ইনি দময়ন্তী; নহিলে এমন সুন্দর আর কে হইবে। ইঁহার দুটি ভুরু মাঝখানে একটি পদ্মের মতন জরুল আছে। মুখখানি মলিন হইয়া যাওয়াতে বোধ হয়, তাহা আপনাদের চক্ষে পড়ে নাই, কিন্তু আমি তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি।"

সুনন্দা অমনি ভিজা গামছা আনিয়া, পরম যত্নে দময়ন্তীর কপালখানি ঘষিয়া পরিষ্কার করিলেন। তখন দেখা গেল যে, সত্য সত্যই ভুরু মাঝখানে ঠিক পদ্মের আকৃতি একটি অতি সুন্দর জরুল রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া রাজমাতা আর সুনন্দা দুজনেই দময়ন্তীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে রাজমাতা বলিলেন, "মাগো তুই এতদিন আমার বুকের এত কাছে ছিলি, তবু আমি তোকে চিনিতে পারি নাই। আমি যে মা তোর আপনার মাসী, আমার পিতার ঘরে তোকে হইতে দেখিয়াছি। তোর মা আর আমি দশার্ণ দেশের রাজা সুদামের মেয়ে। তোর মার বিবাহ হইল ভীমের সঙ্গে, আর আমাকে বাবা

দিলেন এই অযোধ্যার রাজা বীরবাহুর হাতে। মা, তুই তোর আপনার ঘরে আসিয়াছিলি; এখানকার সকলই তোর।"

তখন দময়ন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে রাজমাতার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন, "মা, আমিও আপনাকে চিনিতে পারি নাই, আপনিও আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তবুও ত মা আপনার নিজের মেয়ের মতই যত্নে এতদিন আপনার আশ্রয়ে বাস করিয়াছি। সুনন্দা আমাকে যে স্নেহ দিয়াছে, কোন্ ভাই বোন তাহার চেয়ে বেশি দিতে পারে! মাগো, এরপর এখানে থাকিলে আমার প্রাণে নিশ্চয় আরো সুখ হইত। কিন্তু এখন একটিবার বাবাকে আর খোকাখুকিকে দেখিবার জন্য আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে। দয়া করিয়া আমাকে শীঘ্র বিদর্ভ নগরে পাঠাইয়া দিন।"

রাজমাতা বলিলেন, "মা তুমি যথার্থই বলিয়াছ। আমার প্রাণ যদি তোমাকে দেখিয়া এমন করে, তবে না জানি তোমার বাপ মায়ের প্রাণ তোমার জন্য কি করিতেছে। মা, তুমি প্রস্তুত হও। আমি তোমাকে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছি।"

রাজমাতার কথায় তখনই জরির সাজ দেওয়া হাতির দাঁতের পাল্কি প্রস্তুত হইয়া আসিল। পাগড়ি আঁটিয়া দশ হাজার সিপাহী তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য ঢাল তলোয়ার বল্লম হাতে হাজির হইল।

এদিকে সুনন্দা নিজ হাতে দময়ন্তীকে স্নান করাইয়া সাজাইয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। পাল্কি আর লোকজন পথ খরচের সকল আয়োজন লইয়া উপস্থিত হইলে, তিনজনে মিলিয়া কিছুকাল কাঁদিলেন। তারপর দময়ন্তী তাঁহার মাসীমার পায়ের ধূলা লইলে, আর সুনন্দার গলা জড়াইয়া তাঁহাকে চুমো খাইলে, রাজমাতা ভক্তিভরে দেবতার নাম করিতে করিতে তাঁহাকে পাল্কিতে তুলিয়া দিলেন।

দময়ন্তী বিদর্ভ দেশে পৌঁছিলে তাঁহার পিতা-মাতা আর আত্মীয়েরা কিরূপ আনন্দিত হইলেন, আর রাজা সুদেবকে তাঁহার আশার অধিক কত ধনরত্ন দিলেন, এ-সকল আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি। দময়ন্তীও অবশ্য পিতামাতা আর সন্তান দুটিকে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য আনন্দিত হইলেন; কিন্তু তাহার পরেই আবার নলের চিন্তা আসিয়া, তাঁহার মুখের হাসি নিভাইয়া দিল! রাজা আর রাণী স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, নলের সন্ধান না করিতে পারিলে দময়ন্তীকে বাঁচান কঠিন হইবে।

সুতরাং আবার ব্রাহ্মণগণ দেশ বিদেশে নলের সন্ধানে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা দময়ন্তীর নিকট বিদায় লইতে আসিলে, দময়ন্তী তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "আপনারা সকল দেশের পথে, ঘাটে, বাজারে, আর রাজসভায় এই কথা বারবার বলিবেন, "হে শঠ! বনের ভিতর ঘুমের মধ্যে দুঃখিনীকে ফেলিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছ? দুঃখিনী সেই আধখানি কাপড় পরিয়া কেবল তোমার জন্য চক্ষের জল ফেলিতেছে!" এ কথায় যদি কেহ কোন উত্তর দেন, তবে তিনি কে, কোথায় থাকেন, কি কেন, এ-সকল সংবাদ বিশেষ করিয়া জানিয়া আসিবেন।"

ব্রাহ্মণেরা কত দেশে, কত বাজারে, কত সভায়, কত বনে, এই কথা চিৎকার করিয়া বলিলেন। লোকে তাহা শুনিয়া কত আশ্চর্য হইল, কত বিদ্রূপ করিল, কিন্তু কথার উত্তর কেহ দিতে আসিল না। ক্রমে, একজন ছাড়া ব্রাহ্মণদিগের সকলেই ফিরিয়া আসিলেন।

যে ব্রাহ্মণ তখনো ফিরেন নাই, তাঁহার নাম ছিল পর্ণাদ। অন্যেরা ফিরিবার পরেও, তিনি অনেকদিন ধরিয়া দেশে দেশে ঘুরিতে লাগিলেন। শেষে একদিন অযোধ্যায় ঋতুপর্ণের সভায় গিয়া, দময়ন্তীর ঐ কথাগুলি বলিলেন। সভায় কেহই তাঁহার কথার উত্তর দিল না, কিন্তু তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়, রাজার বাহুক নামক সারথি চুপি চুপি তাঁহাকে ডাকিয়া একটা নির্জন স্থানে লইয়া গেল। লোকটি দেখিতে কুৎসিত, আর বেঁটে। তাহার হাত দুখানি সেই বেঁটে মানুষের পক্ষে নিতান্ত ছোট।

বাহুক সেই ব্রাহ্মণকে নির্জনে লইয়া গিয়া বলিল, "নল নিতান্ত কষ্টের দশায় পাগলের মত হইয়া দময়ন্তীকে ছাড়িয়া যায়। তখন হইতেই তিনি দারুণ মনোদুঃখে কাল কাটাইতেছেন। এমত অবস্থায় দময়ন্তী যেন তাঁহার উপর রাগ না করেন।"

বাহুকের মুখে এ কথা শুনিয়া পর্ণাদ আর এক মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব করিলেন না। তিনি দিনরাত পথ চলিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, বিদর্ভ দেশে উপস্থিত হইয়াই, দময়ন্তীকে সকল কথা অবিকল বলিলেন। তাহা শুনিয়া দময়ন্তী পর্ণাদকে তাঁহার আশার অধিক ধনরত্ন দানে তুষ্ট করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি আমার যে উপকার করিলেন, তাহার পুরস্কার আপনাকে আমি কি দিব? নল আসিলে, আপনি আরো ধন পাইবেন।"

ব্রাহ্মণ যাহা পাইয়াছিলেন তাহাতেই যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া দময়ন্তীকে আশীর্বাদ করিতে করিতে ঘরে চলিয়া গেলেন। তারপর দময়ন্তী তাহার মার নিকট গিয়া বলিলেন, "মা, সুদেবকে দিয়া আমি একটা কাজ করাইব; তুমি কিন্তু তাহা বাবাকে জানাইতে পারিবে না।"

রানী এ কথায় সম্মত হইলে, তিনি তাঁহার সম্মুখে সুদেবকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "ভাই সুদেব, তুমি ভিন্ন আর কেহ এ কাজ করিতে পারিবে না। তোমাকে ঋতুপর্ণ রাজার সভাতে যাইতে হইবে। সেখানে গিয়া তুমি বলিবে, "মহারাজ, কাল সকালে দময়ন্তীর আবার স্বয়ম্বর হইবে। আপনাদের যদি সেখানে যাইতে ইচ্ছা হয়, তবে আজ রাত্রির মধ্যেই যাহাতে বিদর্ভ দেশে গিয়া পৌঁছাইতে পারেন, তাহার উপায় করুন। কাল সূর্য উঠিলেই স্বয়ম্বরের কাজ শেষ হইয়া যাইবে।"

এক রাত্রির মধ্যে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভ দেশে যাওয়ার ক্ষমতা একমাত্র নলেরই ছিল, পৃথিবীতে আর-একটি লোকেরও এ কাজ করিবার সাধ্য ছিল না। ঋতুপর্ণের ঐ বাহুক নামক সারথি যদি বাস্তবিকই নল হন, তবে তিনি একরাত্রির ভিতরেই ঋতুপর্ণকে বিদর্ভ নগরে আনিতে পারিবেন। ঋতুপর্ণ একরাত্রির ভিতরে বিদর্ভ দেশে পৌঁছাইতে পারিলে, নিশ্চয় বুঝা যাইবে যে, তাঁহার সারথির চেহারা যেমনই হউক, সে নল ভিন্ন আর কেহ নহে।

দময়ন্তীর কথা শুনিয়া রাণী আর সুদেব দুজনেই তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সুদেবের তখন এতই আনন্দ আর উৎসাহ হইল যে, তিনি সেই দণ্ডেই বায়ুবেগে অযোধ্যার পানে ছুটিয়া চলিলেন।

সুদেবের নিকট দময়ন্তীর সংবাদ শুনিয়া, ঋতুপর্ণ তখনই বাহুককে ডাকিয়া বলিলেন "বাহুক শুনিলাম, আবার নাকি দময়ন্তীর স্বয়ম্বর হইবে! আজ রাত্রির মধ্যে বিদর্ভ দেশে পৌঁছাইতে পারিলে, আমি সেই স্বয়ম্বরে উপস্থিত থাকিতে পারিব। এ কথায় তুমি কি বল?

এক রাত্রির মধ্যে সেখানে পৌঁছাইতে পারিবে কি?"

হায়, বেচারা বাহুক! রাজার কথায় সে উত্তর দিবে কি, তাঁহার সামনে স্থির হইয়া দাঁড়ানই তাহার পক্ষে নিতান্ত কঠিন হইল। তাহার মনে হইল, যেন তাহার বুকের ভিতর দশ জন লোকে হাম্বর (কামারদের প্রকাণ্ড হাতুড়ি) পিটিতে আরম্ভ করিয়াছে! মাথাটা যেন ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিতান্ত রাজার সামনে বলিয়া সে অনেক কষ্টে চোখের জল আর কান্না থামাইয়া রাখিল।

যাহা হউক, এভাবে অতি অল্প সময়ই গিয়াছিল। তাহার পরেই সে বুঝিতে পারিল যে, 'দময়ন্তীর আবার স্বয়ম্বর হইবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। আমার সন্ধান করিবার জন্যই সে এই কৌশল করিয়াছে!' তখন সে রাজাকে বলিল, "হাঁ মহারাজ! আপনার অনুমতি হইলে, আমি একরাত্রির ভিতরেই মহারাজকে বিদর্ভ দেশে পৌঁছাইয়া দিতে পারি।"

রাজা বলিলেন, "তবে শীঘ্র অশ্বশালায় গিয়া আটটি খুব ভালো ঘোড়া বাছিয়া আন। যে-সে ঘোড়া এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই যাইতে পারিবে না।"

বাহুক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলিয়া গেল, আর খানিক বাদে আটটি রোগা-রোগা ঘোড়া লইয়া উপস্থিত হইল। রাজা বলিলেন, "ও কি ও! এ বেচারারা যে দেখিতেছি নিজের শরীর লইয়াই ভালো করিয়া চলিতে পারে না। এই ঘোড়া লইয়া তুমি একদিনে বিদর্ভ দেশে যাইবে, মনে করিয়াছ?

বাহুক বলিল, "মহারাজ, যদি কোন ঘোড়া পারে, তবে এই-সকল ঘোড়াই আপনাকে বিদর্ভ দেশে লইয়া যাইতে পারিবে। আপনার কোন চিন্তা নাই। ইহারা পক্ষীবাজ ঘোড়া।"

রাজা বলিলেন, "এ বিষয়ে তুমি আমাদের চেয়ে ঢের বেশি জান, তোমার যাহা ভালো মনে হয়, তাহাই কর।"

রাজার কথায় নল ঘোড়াগুলিকে রথে জুতিলেন। তারপর রাজা বারবার তাহাদের দিকে চাহিতে চাহিতে, নিতান্ত সন্দেহের সহিত রথে গিয়া চড়িলেন। অমনি ঘোড়াগুলি তাঁহার ভার সহিতে না পারিয়া মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু বাহুক তথাপি অন্য ঘোড়া লইল না। সেই ঘোড়াগুলিকে সে চাপড়াইয়া আর হাত বুলাইয়া শান্ত করিল, তারপর বার্ষ্ণেয়কে রথের পিছনে তুলিয়া সে রথ ছাড়িয়া দিল।

যে ঘোড়া এইমাত্র লোকের ভার সহিতে না পারিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, বাহুকের হাতে পড়িয়া সেই ঘোড়া এমনি তেজের সহিত রথ লইয়া ছুট দিল যে, রাজা ত দেখিয়া একেবারে অবাক্। ক্রমে দেখা গেল যে, ঘোড়ার পা আর মাটি ছোঁয় না। দেখিতে দেখিতে তাহারা রথখানিকে সুদ্ধ শূন্যে উঠাইয়া লইয়া চলিল। ইহা দেখিয়া বার্ষ্ণেয় ভাবিল, "সামান্য একজন সারথির এমন অসাধারণ ক্ষমতা এ কথা ত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। এ ব্যক্তি যদি এমন কদাকার আর বেঁটে না হইত, তবে নিশ্চয় মনে করিতাম, এ আমার প্রভু নল। তিনি ভিন্ন এই পৃথিবীতে আর কাহারো এমন ক্ষমতা নাই। অথচ এ ব্যক্তি যে নল নহে, এ কথা ত তাহার চেহারাতেই প্রমাণ হইতেছে, তবে কি ইনি কোন দেবতা?"

রাজা বাহুকের ক্ষমতা দেখিয়া এতই আশ্চর্য হইয়াছেন যে তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইতেছে না, কত নগর, কত বন, কত নদী, কত পর্বত যে তাঁহারা ইহারই মধ্যে পার হইয়াছেন তাহার লেখাজোখা নাই। হাওয়ার জোর এত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার চাদরখানিকে দুহাতে প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়াও গায়ে রাখিতে পারিতেছেন না। শেষে সে চাদর মহারাজের

হাত হইতে একেবারেই ছুটিয়া চলিয়া গেল।

রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আরে, আরে! গেল, গেল! বাহুক! বার্ষ্ণেয়, থামো, থামো! আমার চাদর উড়িয়া গিয়াছে। শীঘ্র রথ থামাইয়া তাহা লইয়া আইস।"

বাহুক বলিল, "মহারাজ, চাদর ত আর এখন আনা সম্ভব হইবে না; এতক্ষণে তাহা চারিক্রোশ পিছনে পড়িয়া গিয়াছে।"

ইহাতে রাজা বাহুকের ক্ষমতার কথা ভাবিয়া যেমন আশ্চর্য হইলেন তেমনি তাঁহারও নিতান্ত ইচ্ছা হইল যে, নিজের ক্ষমতার কিছু পরিচয় দিয়া বাহুক কে আশ্চর্য করেন। তাই তিনি পথের ধারে একটা বহেড়া গাছ দেখিতে পাইয়া বাহুককে বলিলেন, "বাহুক, দেখ ত আমি কেমন গণিতে পারি, এই বহেড়া গাছে পাঁচ কোটি পাতা আর দুই হাজার পঁচানব্বুইটি ফল আছে। আর উহার তলায় একশত একটি ফল পড়িয়া আছে।"

বাহুক তখনই রথ থামাইয়া বলিল, "মহারাজের কথা যদি সত্য হয়, তবে মহারাজের এই ক্ষমতা নিতান্ত আশ্চর্য বলিতে হইবে। সুতরাং, এ কথার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। আমি এখনই এই গাছটাকে কাটিয়া দেখিব।"

ইহাতে রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "বাহুক, এখন নহে। তাহা হইলে বড় বিলম্ব হইবে।"

বাহুক বলিল, "মহারাজ একটু অপেক্ষা করুন; নাহয় বার্ষ্ণেয় মহারাজকে লইয়া বিদর্ভ দেশে যাউক।"

রাজা আরো ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আরে না, না! তাহা কেমন করিয়া হইবে? তুমি ছাড়া আর কেহই এ কাজ করিতে পারিবেন না। সূর্যোদয়ের পূর্বে আমাকে বিদর্ভ দেশে পৌঁছাইয়া দাও, তোমাকে খুশি করিব।"

বাহুক বলিল, "মহারাজের কোন চিন্তা নাই; আমি গাছের পাতা আর ফল গণিয়া, মহারাজকে ঠিক পৌঁছাইয়া দিব।"

রাজা আর কি করেন? বাহুকের আব্দার না রাখিলে তাঁহার কাজ হয় না। কাজেই তিনি তখন রাজি হইলেন। তখন বাহুক তাড়াতাড়ি রথ হইতে নামিয়া গাছটি কাটিয়া গণিয়া দেখিল রাজার কথাই ঠিক তাহাতে সে নিতান্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল, "বলিল মহারাজ, আমি আপনাকে অশ্ব বিদ্যা (ঘোড়া চালাইবার বিদ্যা) শিখাইব, তাহার বদলে এই আশ্চর্য বিদ্যা আমাকে শিখাইতে হইবে।"

অশ্ববিদ্যার কথা শুনিয়া রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তখনই বাহুককে দুই বিদ্যা শিখাইয়া দিলেন! একটি এই গণনাবিদ্যা আর একটি অক্ষবিদ্যা, অর্থাৎ পাশা বশ করিবার বিদ্যা।

ঋতুপর্ণের নিকট হইতে নল অক্ষবিদ্যা শিখিবামাত্র, একটি আশ্চর্য ঘটনা হইল। কলি এতদিন পর্যন্ত, কর্কোটকের বিষে আর দময়ন্তীর শাপে জ্বালাতন হইয়া অতিকষ্টে নলের শরীরে বাস করিতেছিল। এখন এই পবিত্র বিদ্যা তাহার দেহে প্রবেশ করাতে, দুষ্ট আর কিছুতেই সেখানে টিকিয়া থাকিতে পারিল না। সুতরাং সে তখনই কর্কোটকের বিষ বমি করিতে করিতে নলের শরীর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নল তাহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "তবে রে দুষ্ট, তুমি এতদিন আমাকে এই কষ্ট দিয়াছ, তাহার প্রতিফল এই লও।" এই বলিয়া তিনি কলিকে শাপ দিতে প্রস্তুত হইলে, সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হাত জোড় করিয়া

কহিল, "মহারাজ, দময়ন্তীর শাপে, আর কর্কোটকের বিষে ইহার পূর্বেই আমার যথেষ্ট সাজা হইয়াছে। সুতরাং আপনি দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আপনার নাম লইবে, কখনো তাহার নিকট যাইব না।"

এ কথায় নল দয়া করিয়া কলিকে ছাড়িয়া দিলে, দুষ্ট তাড়াতাড়ি সেই বহেড়া গাছের ভিতরে গিয়া লুকাইল। এ-সকল কথাবার্তা নলেতে আর কলিতে এমন ভাবে হইতেছিল যে বার্ষ্ণেয় আর ঋতুপর্ণ ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। কলিকেও তাঁহারা দেখিতে পান নাই। তাঁহারা খালি বহেড়া গাছটাকে শুকাইয়া যাইতে দেখিলেন, কিন্তু এ কথা বুঝিতে পারিলেন না যে, কলি তাহার ভিতরে প্রবেশ করাতেই এরূপ হইয়াছে।

নলকে কলি ছাড়িয়া গেলেও তাঁহার চেহারা অবশ্য বাহুকের মতই ছিল। আর ঠিক বাহুকের মত করিয়াই তিনি আবার ঘোড়ার রাশ ধরিয়া রথ চালাইতে লাগিলেন। পথে এত বিলম্ব হওয়ার পরেও তিনি সন্ধ্যার পূর্বেই রথ লইয়া বিদর্ভ দেশে পৌঁছিলেন।

দূতগণ কুণ্ডিণপুরে (বিদর্ভদিগের রাজধানী) আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাজা ঋতুপর্ণ আসিয়াছেন। তাহাতে ভীম একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "শীঘ্র তাঁহাকে আদরের সহিত এখানে লইয়া আইস।"

ঋতুপর্ণও যে আশ্চর্য না হইলেন, এমন নহে। তিনি স্বয়ম্বরের সংবাদ পাইয়া আসিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, খুবই একটা ধুম-ধামের ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কুণ্ডিনপুরে পৌঁছিয়া তিনি একটা নিশানও দেখিতে বা একটা ঢোলের শব্দও শুনিতে পাইলেন না। তিনি নিতান্ত আশ্চর্য হইয়া ভাবিলেন, "তাই ত, বিষয় টা কি? স্বয়ম্বরের ত কোন আয়োজনই দেখিতে পাইতেছি না।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি রাজা ভীমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে ভীম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কি নিমিত্ত আপনার শুভাগমন হইয়াছে?"

এ কথায় তিনি ত বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। স্বয়ম্বরের কোন আয়োজন নাই, একজন রাজাও আসেন নাই, একটি ব্রাহ্মণকেও দেখা যাইতেছে না; এমত অবস্থায় স্বয়ম্বরের কথা আর কি করিয়া বলেন? তাই তিনি থতমত খাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "মহারাজ, আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।"

নিকটের এত রাজাকে ফেলিয়া, এত পরিশ্রম করিয়া শতাধিক যোজন পার হইয়া ঋতুপর্ণ আসিয়াছেন কিনা —ভীমের সহিত দেখা করিতে। ভীমের মতন বুদ্ধিমান বুড়া রাজার এ কথা বিশ্বাস হইবে কেন? তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন, ইঁহার অন্য কোন-একটা মতলব আছে। কিন্তু এ কথা তিনি তাঁহাকে জানিতে দিলেন না। তিনি অল্প কাল তাঁহার সহিত মিষ্ট আলাপে কাটাইয়াই যত্ন পূর্বক তাঁহার আহার এবং বিশ্রামের আয়োজন করাইয়া দিলেন। ঋতুপর্ণও ভাবিলেন যে, বাঁচিলাম।'

বাহুক ততক্ষণে রথখানিকে রথশালায় রাখিয়া, ঘোড়াগুলিকে দলিয়া মলিয়া সুস্থ করিয়া, রথের ভিতরেই বিশ্রামের জোগাড় করিল।

এতক্ষণ দময়ন্তী কি করিতেছিলেন? ঋতুপর্ণ আসিয়াছেন কিনা, তাহার সংবাদ যে তিনি বারবার বিশেষ করিয়া লইয়াছিলেন তাহাতে ত কোন সন্দেহই নাই। কেহ আসিয়া তাঁহার নিকট কোনরূপ সংবাদ দিবার পূর্বেই রথের শব্দ শুনিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল যে, নল

যখন রথ চালাইতেন, তখন ঠিক এমনি শব্দ হইত। তখন হইতেই তিনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া ঋতুপর্ণের সারথিকে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু হায় বাহুককে দেখিয়া তাঁহার প্রাণের সকল আশা চলিয়া গেল। এই কদাকার পুরুষ নল, এ কথা কি বিশ্বাস হয়! দময়ন্তী একবার ভাবিলেন, হয়ত এ ব্যক্তি নল অথবা ঋতুপর্ণ কাহারো নিকট হইতে ঠিক নলের মত অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। তাহার পরেই তাঁহার মন যেন বলিল, 'এই বাহুকই নল, ইহার চালচলন ঠিক নলের মত।'

ভাবিয়া চিন্তিয়া দময়ন্তী স্থির করিলেন যে, এই বাহুকের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া সংবাদ লইতে হইবে। তারপর তিনি কেশিনী নাম্নী একটি বুদ্ধিমতী দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "কেশিনী, ঐ যে কালো বেঁটে লোকটি রথের ভিতরে বসিয়া আছেন, আমার মন বলিতেছে, উনিই নল। তুমি উঁহার নিকট গিয়া উঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর। নলকে খুঁজিবার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে পাঠাইবার সময় আমি তাঁহাদিগকে যে কথাগুলি পথেঘাটে বলিতে বলিয়াছিলাম—কথায় কথাই সেই কথাগুলি উঁহাকে শুনাইবে, আর তাহাতে উনি কি বলেন, বেশ করিয়া মনে রাখিবে।"

এ কথায় কেশিনী তখনই বাহুকের নিকট চলিয়া গেল, আর দময়ন্তী ছাতে উঠিয়া দেখিতে লাগিলেন।

বাহুকের নিকট গিয়া কেশিনী বলিল, "মহাশয়, আপনারা কি জন্য এখানে আসিয়াছেন, আর কখন অযোধ্যা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, আমাদের দময়ন্তী এ-সকল কথা জানিতে চাহেন।"

বাহুক বলিল, "আমাদের রাজা আজ সকালে এক ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়া ছিলেন যে, কাল দময়ন্তীর স্বয়ম্বর হইবে। তিনি তখনই রথে পক্ষিরাজ ঘোড়া জুতিয়া এখানে আসিয়াছেন। আমি তাঁহার সারথি।"

কেশিনী বলিল, "আপনার সঙ্গের এই লোকটি কে?"

বাহুক বলিল, "ইঁহার নাম বার্ষ্ণেয়। ইনি আগে মহারাজ নলের সারথি ছিলেন, এখন ঋতুপর্ণের সারথির কাজ করেন।"

কেশিনী বলিল, "এমন লোক থাকিতে রাজা আপনাকে কি জন্য সারথি করিয়াছেন?

বাহুক বলিল, "আমি অশ্ববিদ্যা খুব ভালোরকম শিখিয়াছি। আর রাঁধিতেও বেশ পারি। তাই রাজা আমাকেও রাখিয়াছেন।"

কেশিনী বলিল, "মহাশয়, আপনাদের এই বার্ষ্ণেয় কি নলের কোন সংবাদ জানেন?"

বাহুক বলিল, "নলের সংবাদ কেবল নলই জানেন, আর কেহই জানে না। বার্ষ্ণেয় তাঁহার সন্তান দুটিকে এখানে রাখিয়া গিয়াছিল, সে কেবল এইমাত্র বলিতে পারে।"

কেশিনী বলিল, "আচ্ছা, মহাশয়, আমাদের দেশের একটি ব্রাহ্মণ আপনাদের রাজসভায় গিয়া না কি একবার বলিয়াছিলেন, 'হে শঠ, বনের ভিতরে দুঃখিনীকে ফেলিয়া কোথায় গেলে! দুঃখিনী তোমার জন্য কাঁদিতেছে।' অন্য কেহ না কি এ কথায় কিছু বলে নাই, কিন্তু আপনি এ কথার উত্তর দিয়াছিলেন। আপনি সেই ব্রাহ্মণকে কি বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিতে দময়ন্তীর বড় ইচ্ছা হইয়াছে!"

এ কথায় বেচারা বাহুকের চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। সে অতি কষ্টে মনের দুঃখ

গোপন করিয়া কেশিনীকে বলিল, "আমি বলিয়াছিলাম যে, নল নিতান্ত কষ্টের দশায় পাগলের মত হইয়া দময়ন্তীকে ছাড়িয়া যান। তখন হইতেই তিনি দারুণ মনোদুঃখে কাল কাটাইতেছেন। এমন অবস্থায় দময়ন্তী যেন তাঁহার উপর রাগ না করেন।"

বলিতে বলিতে বেচারার মুখে আর কথা সরিল না, সে দুহাতে মুখ ঢাকিয়া একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিল।

এ-সকল কথা কেশিনীব মুখে শুনিয়া দময়ন্তীরও বড়ই কষ্ট হইল। কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে স্থির রাখিয়া বলিলেন, 'কেশিনি, তুমি আবার যাও। তিনি কখন কি করেন বেশ ভালো করিয়া দেখিবে। তিনি আগুন চাহিলে আগুন আনিতে দিবে না। জল চাহিলে যাহাতে জল না পান, তাহা করিবে।"

কেশিনী চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে সে নিতান্ত ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এমন আশ্চর্য মানুষ ত আমি আর কখনো দেখি নাই! এতটুকু ছোট দরজা দিয়া ঢুকিবার সময়ও মাথা হেঁট করেন না। তিনি কাছে গেলেই দরজা আপনি বড হইয়া যায়। খালি কলসীর দিকে তিনি একটিবার শুধু তাকাইলেই তাহা জলে ভরিয়া যায়। খড়ের গোছা হাতে করিয়া কি একটা কথা ভাবেন আর অমনি তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিযা উঠে। আগুনের ভিতব তিনি হাত ঢুকাইয়া দিলেও তাহা পুড়ে না। জল অমনি তাঁহার ঘটিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, গড়াইতে হয় না। ফুল হাতে লইয়া চট্কাইতে লাগিলেন, সে ফুল নষ্ট না হইয়া আরো ভালো করিয়া ফুটিয়া উঠিল, আর তাহার ভিতর হইতে আবো চমৎকার গন্ধ বাহির হইতে লাগিল।"

তখন দময়ন্তীর মন আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পাবিলেন যে এই ব্যক্তির আকৃতি যেমনই হউক ইনি নল ভিন্ন আর কেহ নহেন। তথাপি তাঁহার মনে হইল যে, সকল সন্দেহ ভালো মত দূর কবা উচিত। তাই তিনি কেশিনীকে বলিলেন, "কেশিনি, ইঁহার রাঁধা ব্যঞ্জন একটু খাইয়া দেখিতে পারিলে আমার মনের সকল সন্দেহ দূর হয়। তুমি আবার গিয়া উঁহার রাঁধা একটু ব্যঞ্জন চাহিয়া আন।"

কেশিনী বাহুকের নিকট হইতে তাঁহার প্রস্তুত ব্যঞ্জন চাহিযা আনিল। সে ব্যঞ্জন রাঁধিবার শক্তি আর কাহারই ছিল না।

অনেক কষ্টে দময়ন্তী কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া মুখ ধুইলেন। তারপর ইন্দ্রসেন আর ইন্দ্রসেনাকে কেশিনীর হাতে দিয়া বলিলেন, "একটিবার তুমি ইহাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাও দেখি, তিনি ইহাদিগকে দেখিয়া কি করেন।"

কেশিনী শিশু দুটিকে বাহুকের নিকট লইয়া যাইবামাত্র সে তাহাদিগকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া নিতান্ত আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু পাছে তাহার কান্না দেখিয়া লোকে তাহাকে চিনিয়া ফেলে, তাই সে তাড়াতাড়ি সামলাইয়া গিয়া, কেশিনীকে বলিল, "আমার ঠিক এমনি দুটি খোকা খুকি ছিল, তাই ইহাদিগকে দেখিয়া আমার কান্না পাইতেছে। তুমি ইহাতে কিছু মনে করিও না। এখন তবে তুমি ইহাদিগকে লইয়া ঘরে যাও, আমার একটু কাজ কর্ম আছে।"

বাহুকই যে নল এতক্ষণে আর দময়ন্তীর মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই রহিল না। তবে চেহারার এতটা তফাৎ কি করিয়া হইল এ কথায় মীমাংসা অবশ্য একবার দুজনের দেখা

না হইলে কি করিয়া হইবে? রাজা রানী এ-সকল কথা শুনিবামাত্র বাহুককে দময়ন্তীর নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন। বেচারা আসিয়াই ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, কোন কথা কহিতে পারিল না।

দময়ন্তীও প্রথমে অনেক কাঁদিলেন; তারপর তিনি একটু শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, " বাহুক, তুমি কি এমন কোন ধার্মিক পুরুষের কথা জান, যিনি নিজের স্ত্রীকে ঘুমের মধ্যে বনের ভিতরে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন? দেবতাগণকে ফেলিয়া আমি তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলাম; আমার কোন্ অপরাধে তিনি আমাকে ফেলিয়া গেলেন?" বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া গেল; তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না।

তখন নল বলিলেন, "দময়ন্তি, আমি কলির ছলনায় পাগলের মত হইয়া যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য আমার উপর রাগ করিও না। এখন সেই দুষ্ট আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে কাজেই এরপর আর বোধহয় আমাদিগের দুঃখ দূর হইতে অধিক বিলম্ব নাই। আমি কেবল তোমাকে পাইবার জন্যই এখানে আসিয়াছি।"

তারপর দুজনে অনেক কথাবার্তা হইল। তখন নলের সন্ধান করিবার জন্য দময়ন্তী যত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কিছুই নলের জানিতে বাকি রহিল না। দময়ন্তী দেশে বিদেশে লোক পাঠাইয়া নলকে খুঁজিয়াছেন; শেষে পর্ণাদের মুখে বাহুকের কথা শুনিয়া তিনি তাহার পরিচয় জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। বাহুক ঋতুপর্ণের সারথি; সে যদি নল হয় তবে ঋতুপর্ণকে একদিনের ভিতরেই বিদর্ভ নগরে পৌঁছাইতে পারিবে। এই ভাবিয়া দময়ন্তী সুদেবকে দিয়া ঋতুপর্ণের ঋতুপর্ণের নিকট এমন সংবাদ পাঠাইলেন, যাহাতে একদিনের ভিতরেই তাঁহার বিদর্ভ নগরে পৌঁছাইবার দরকার হয়। ইহাতেই বাহুকের বিদর্ভ নগরে আসা হইল; নতুবা নল-দময়ন্তীর আবার দেখা হইবার কোন উপায়ই ছিল না। এ-সকল কথার সমস্তই নল জানিতে পারিলেন; আর তাহাতে তাঁহার মনে বড়ই আনন্দ হইল।

এইরূপে তাঁহাদের দুঃখের দিন শেষ হইয়া গেল। তারপর নল সেই দুখানি কাপড় পরিয়া কর্কোটককে স্মরণ করিবামাত্র, তিনি তাঁহার নিজের সেই অপরূপ সুন্দর উজ্জ্বল মূর্তি ফিরিয়া পাইলেন। তারপর সকলের মনে এমন সুখ হইল যে, তাহারা আর হাসিতে কুলাইতে না পারিয়া, ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে রানী রাজার নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিতেছেন, "ওগো, শীঘ্র একটি বার এস। দেখ আসিয়া, নল ফিরিয়া আসিয়াছেন; আমাদের ঘরে আর আনন্দ ধরে না।"

রাজা জোড়হাত মাথায় তুলিয়া স্বর্গের দিকে তাকাইলেন, তারপর বলিলেন, "আহা! বাঁচিয়া থাকুক, বাঁচিয়া থাকুক! আমি বুড়া মানুষ, এ সময়ে গিয়া তাহাদের সুখে বাধা দিব না। আজ তাহারা আনন্দ করুক, আর বিশ্রাম করুক, কাল গিয়া আমি তাহাদিগকে দেখিব।"

পরদিন নল-দময়ন্তী যখন ভীমকে প্রণাম করিতে গেলেন, আর রাজ্যের সকলে এই সুখের সংবাদ জানিতে পারিল, তখন খুবই একটি আনন্দের ব্যাপার হইল—সে আর আমি কত বর্ণনা করিব! সারা দেশটার মধ্যে সকলেই হাসিমুখে ছুটাছুটি আর কোলাহল করিতেছিল; কেবল একটি লোক হাসিতে হাসিতে কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া মাথা চুলকাইতে ছিলেন।

এ ব্যক্তি আর কেহ নহে—মহারাজ ঋতুপর্ণ। নিদ্রা হইতে উঠিয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন

যে, তাঁহার বাহুক নামক সারথিটিই মহারাজ নল, তিনি আবার তাঁরা নিজ বেশ ধারণ করিয়া দময়ন্তীকে ফিরিয়া পাইয়াছেন, এ কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মনে হইল, "কি সর্বনাশ এত বড়লোক আমার সারথি হইয়াছিলেন, আর আমি তাঁহাকে চিনিতে পাবি নাই! এমন মহাপুরুষকে দিন রাত কত আজ্ঞা করিয়াছি, আর হয়ত কতবার তাঁহার নিকট অপরাধীও হইয়াছি।"

এ-সকল কথা ভাবিয়া ঋতুপর্ণের বড়ই লজ্জা হইল; আর নলকে দময়ন্তীকে ফিরিয়া পাওয়াতে, তাঁহার খুব আনন্দও হইল। শেষে তিনি নলকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনার সুখের সংবাদ শুনিয়া কত যে আনন্দিত হইলাম, তাহা মুখে প্রকাশ করিতে পারি না। আপনার নিকট না জানিয়া, হয়ত কত অপরাধ করিয়াছি। সে দোষ আমায় ক্ষমা করিতে হইবে।"

নল বলিলেন, "সে কি মহারাজ! বিপদেব সময় আমি আপনার আশ্রয়ে সুখে বাস করিতেছিলাম। আপনার আমার নিকট অপরাধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং আমিই আপনার দয়ার ঋণ শোধ করিতে পারিব না। আপনার নিকট আমি আর এক বিষয়েও ঋণী আছি। আমি আপনাকে অশ্ববিদ্যা শিখাইব বলিয়াছিলাম, তাহা এ পর্যন্ত শিখান হয় নাই।"

এ বলিয়া নল ঋতুপর্ণকে অশ্ববিদ্যা শিখাইয়া দিলে, ঋতুপর্ণ যার পব নাই আনন্দিত হইয়া অযোধ্যায় চলিয়া গেলেন। তারপর একটি মাস দেখিতে দেখিতে পরম সুখে কাটিয়া গেল। এক মাস পরে নল তাঁহার শ্বশুরকে বলিলেন, আপনার অনুমতি হইলে, এখন আমি দেশে গিয়া নিজের রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা দেখিতে চাহি।" এ কথায় ভীম অনেক আশীর্বাদ করিয়া তাকে বিদায় দিলেন।

এতদিন নিষধে রাজত্ব করিয়া পুষ্করের মনে হইয়াছিল যে, চিরকালই এইরূপ রাজত্ব করিবে। সুতরাং নল যখন তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, পুষ্কর, আইস, আর একবার পাশা খেলি, নাহয় দুজনে যুদ্ধ করি," তখন সে ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল। যাহা হউক প্রথম বারে নলকে অতি সহজেই সে হারাইয়াছিল বলিয়া সে মনে করিল যে, এবারেও তেমনি সহজে তাঁহাকে হারাইয়া দিবে, কাজেই সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি বুঝি বিদেশ হইতে অনেক ধন উপার্জন করিয়া আনিয়াছ! আচ্ছা তবে আর দেরি কেন, আন পাশা! এ টাকাও শীঘ্র আমারই হউক।"

পাশা খেলা আরম্ভ হইল। এবারে আর কলি পুষ্করের সাহায্য করিতে আসিল না। কাজেই খেলার ফল কি হইল, সহজেই বুঝা যায়। নল তাঁহার সমস্ত রাজ্য ধন ত ফিরিয়া পাইলেনই, শেষে পুষ্কর নিজের প্রাণ পর্যন্ত পণ রাখিয়াছিলেন, তাহাও তিনি জিতিয়া লইলেন। তখন পুষ্কর জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, একবাব নলের দিকে, একবার দরজার দিকে তাকাইতে আরম্ভ করিলেন, নল বলিলেন, "ভয় নাই, পুষ্কর! প্রজার হউক, তুমি আমার ভাই। আর, তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাও নিজের বুদ্ধিতে কর নাই—কলিই তোমাকে দিয়া সে কাজ করাইয়াছে। সুতরাং আমি তোমাকে ক্ষমা করিতেছি, তুমি নিশ্চিন্তে ঘরে যাও। আর তোমার নিজের যে ধন আমি জিতিয়াছি, তাহাও সঙ্গে লইয়া যাও। আশীর্বাদ করি, তুমি শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন কর।"

এ কথায় পুষ্কর কাঁদিতে কাঁদিতে নলের পা জড়াইয়া ধরিল। ইহার পর আর সে কখনো নলের সহিত শত্রুতা করে নাই।

তারপর বিদর্ভ দেশে লোক গিয়া দময়ন্তী, ইন্দ্রসেন, আর ইন্দ্রসেনাকে লইয়া আসিল।

তারপর কি হইল?—

তারপর বড়ই আনন্দ হইল!

সত্যবান্ ও সাবিত্রীর কথা

মদ্র দেশে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। ধার্মিক, দাতা, সত্যবাদী— মহারাজ অশ্বপতি সকল গুণে পৃথিবীর সকল রাজার বড়, ইহার উপরে যদি তাঁহার একটি সন্তান থাকিত, তবে বড়ই সুখের কথাই হইত।

ভালো একটি সন্তান পাওয়া দেবতার বিশেষ কৃপার কথা। মহারাজ একটি সন্তানের জন্য আঠার বৎসর ধরিয়া সাবিত্রী দেবীর আরাধনা করিলেন। আঠার বৎসর দিনের শেষে সামান্য জলযোগ মাত্র করিয়া কাটাইলেন।

শেষে দেবীর কৃপায় হইল। তিনি যজ্ঞের অগ্নি হইতে অতি মনোহর বেশে উঠিয়া আসিয়া, রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আমি তুষ্ট হইয়াছি; বর প্রার্থনা কর।"

অশ্বপতি ভূমিতে লুটাইয়া দেবীকে প্রণামপূর্বক করজোড়ে কহিলেন, "দেবি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে দয়া করিয়া এই বর দিন যে, আমার যেন অনেকগুলি সন্তান হয়।"

দেবী কহিলেন, "মহারাজ, তোমার জন্য আমি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন, তোমার একটি পরমাসুন্দরী আর অতি গুণবতী কন্যা হইবে।"

দেবী চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে রাজার ঘর আলো করিয়া, রানীর কোলে চাঁদের মত সুন্দর একটি কন্যা আসিল। সাবিত্রী দেবীর দয়ায় কন্যাটিকে পাইয়াছেন, তাই রাজা তাঁহার নাম রাখিলেন, সাবিত্রী।

যেমন দেবতার নামে নাম, তেমনি মেয়েটি দেখতে দেবতার মত সুন্দর। বিধাতা যেন সোনার সহিত সকালবেলার সূর্যের আলোক মিশাইয়া তাঁহার শরীরখানি গড়িয়াছিলেন। লোকে মোহিত হইয়া একদৃষ্টে তাঁহাকে চাহিয়া দেখিত, আর ভাবিত, না জানি কোন্ দেবতার মেয়ে আমাদের রাজার ঘর আলো করিতে আসিয়াছেন।

সাবিত্রী ক্রমে বড় হইয়া উঠিলেন, আর ক্রমেই তাঁহার মনে ভগবানের প্রতি ভক্তি জাগিয়া উঠিল। ভগবানের কৃপায়, সকল সময়েই তাঁহার মুখে এমন আশ্চর্য একটি তেজ দেখা যাইত যে, রাজপুত্রেরা তাঁহাকে দেখিলেই নিজেদের চঞ্চলতার কথা ভাবিয়াই লজ্জিত হইতেন। সেই লজ্জায় তাঁহাদের কেহই সাবিত্রীকে বিবাহ করিতে আসিতে সাহস পাইলেন না।

একদিন সাবিত্রী স্নানের পর দেবতার পূজা করিয়া, রাজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলে, তাঁহার সেই অপরূপ মূর্তি দেখিয়া রাজা নিতান্ত দুঃখের সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'হায়! মায়ের এমন সুন্দর মূর্তি এমন সকল গুণ—মাকে কেহই বিবাহ করিতে আসিল না।'

তারপর তিনি সাবিত্রীকে বলিলেন, "মা লক্ষ্মি, ধনরত্ন লোকজন সঙ্গে দিব, সোনার রথ সাজাইয়া দিব; একবার দেশ ভ্রমণ করিয়া আইস, যদি কোন রাজপুত্রকে দেখিয়া তোমার

ভালো লাগে, সেই রাজপুত্রের সহিত তোমার বিবাহ দিব।" তাহা শুনিয়া সাবিত্রী লজ্জায় মাটির দিকে তাকাইলেন।

বুড়া মন্ত্রী বিশ্বাসী লোকজন ঠিক করিলেন। পথে খরচের জন্য মণি-মুক্তোর পুঁটলি কোমরে বাঁধিয়া লইলেন। তারপর সোনার রথ সাজাইয়া সাবিত্রীর ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তারপর সাবিত্রী পিতামাতার চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন।

তখন বুড়া মন্ত্রী স্নেহের সহিত তাঁহাকে রথে তুলিয়া দিলে, সারথি রথ চালাইয়া দিল। তারপর রাজকুমারী কত তীর্থ, কত তপোবন দেখিয়া বেড়াইলেন, কত দান করিলেন, কত আনন্দ পাইলেন, তাহা বলিতে গেলে আমি শেষ করিয়া উঠিতে পারিব না।

অনেকদিন পরে যখন সাবিত্রী দেশে ফিরিলেন, তখন অশ্বপতি আর নারদ মুনি বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিলেন। সাবিত্রী তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে গেলে, নারদ বলিলেন, 'মহারাজ তোমার এই কন্যাটি কোথায় গিয়েছিল? মেয়েটি বড় হইয়াছে, তবুও কেন উহার বিবাহ দিতেছ না?'

রাজা বলিলেন, 'আমি ইহাকে দেশ ভ্রমণে পাঠাইয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, কোন রাজপুত্রকে ইহার ভালো লাগিলে, তাহারই সহিত ইহার বিবাহ দিব।'

এই বলিয়া রাজা সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, এমন কোন রাজপুত্রকে দেখিয়াছ কি?'

পিতার কথার উত্তর না দিলেই নয়, অথচ মুনিঠাকুর সামনে বসিয়া আছেন। তাই সাবিত্রী নিতান্ত জড়সড় হইয়া বলিলেন, 'আমি দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্‌কে মনে মনে বরণ করিয়াছি।'

দ্যুমৎসেন শাল্ব দেশের রাজা ছিলেন, তিনি অন্ধ হইয়া যাওয়াতে, শত্রুরা সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেয়। তখন রাজা আর রানী তাঁহাদের সত্যবান্ নামক শিশু পুত্রটিকে লইয়া বনবাসী হইলেন। সেই অবধি বনের ভিতরে থাকিয়া সত্যবান্ এখন বড় হইয়াছেন।

সত্যবানের কথা শুনিয়া নারদ চমকিয়া উঠিলেন। তারপর তিনি মুখ ভার করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'তাই ত! কাজটি ভালো হয় নাই! মহারাজ, সত্যবান্‌কে বরণ করিয়া তোমার কন্যা বড়ই ভুল করিয়াছে।'

ইহাতে রাজা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন মুনিঠাকুর? ছেলেটি কি ভালো নয়?'

নারদ বলিলেন, 'অতি চমৎকার ছেলে। দেখিতে অশ্বিনীকুমারের ন্যায়, তেজে সূর্যের ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায়! এমন শান্ত সরল সত্যবাদী ধার্মিক যুবক পৃথিবীতে আর নাই।'

রাজা বলিলেন, 'সত্যবানের দোষ কি?'

নারদ বলিলেন, 'সত্যবানের দোষ এই যে, আজ হইতে এক বৎসরের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে। এই এক দোষে তাহার সকল গুণ বৃথা হইয়াছে।'

তখন রাজা নিতান্ত দুঃখের সহিত সাবিত্রীকে বলিলেন, 'মা মুনি বলিতেছেন আর এক বৎসর পরেই সত্যবানের মৃত্যু হইবে। তুমি উহাকে বিবাহ [illegible] না।

সাবিত্রী বলিলেন, 'আমি যখন তাঁহাকে বরণ করিয়াছি। তখন তিনিই আমার পতি। তাঁহার আয়ু অল্প হয় হউক, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও বরণ করিব না।'

তাহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, 'মহারাজ, তোমার কন্যার বুদ্ধি বড়ই স্থির, ধর্মে ইহার মতি নিতান্তই অটল। আমি বলি, সত্যবানের সহিতই ইহার বিবাহ দাও। সত্যবানের ন্যায় গুণবান্ লোক আর নাই।'

রাজা বলিলেন, 'আপনি আমার গুরু, আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই হউক।'

নারদ বলিলেন, 'আচ্ছা, তবে আমি এখন আসি। তোমাদের মঙ্গল হউক।'

এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন, আর অশ্বপতি সাবিত্রীর বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তারপর শুভ দিন স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণ পুরোহিত সকলের সহিত রাজা সাবিত্রীকে লইয়া সেই বনের ভিতরে দ্যুমৎসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন।

অন্ধ রাজা দ্যুমৎসেন এক শাল গাছের তলায় কুশাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময়, অশ্বপতি সেখানে গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি ভালো আছেন ত? আমি মদ্রদেশ হইতে আসিয়াছি, আমার নাম অশ্বপতি।'

দ্যুমৎসেন পরম সমাদরে তাঁহাকে অর্ঘ্য আর আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, কি জন্য আসিয়াছেন?'

অশ্বপতি বলিলেন, 'মহারাজ, আমার সাবিত্রী নাম্নী কন্যাটি পরম সুন্দরী ও গুণবতী। আমি তাহাকে আপনার নিকট উপস্থিত করিয়াছি, স্নেহপূর্বক ইহাকে আপনার পুত্রবধূ করুন।'

দ্যুমৎসেন যার পর নাই আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আমরা বনবাসী দরিদ্র লোক। আপনার কন্যা কি করিয়া বনবাসের দুঃখ সহ্য করিবেন?'

অশ্বপতি বলিলেন, 'আমার কন্যা তাহা পারিবে, আর তাহার ভিতরেই সুখে থাকিবে। ইহার জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।'

দ্যুমৎসেন বলিলেন, "আমার রাজ্য নাই, তাই আমি ওরূপ কহিতেছিলাম। নহিলে, আপনার কন্যা আমার বধূ হইবেন, ইহার চেয়ে সুখের আর কি হইতে পারে?"

বনের ভিতর যত তপস্বী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাবিত্রী আর সত্যবান্‌কে জানিতেন। বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহারা আনন্দের সহিত আসিয়া দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সকলের আশীর্বাদে এই সুখের ব্যাপার অতি সুন্দররূপেই শেষ হইল। সাবিত্রীকে যথার্থ সুপাত্রে দান করিয়া অশ্বপতির মনেও আনন্দের সীমা রহিল না।

তারপর রাজা রানী, ব্রাহ্মণ পুরোহিত সকলে মিলিয়া বিদায় হইয়া গেলে, সাবিত্রী মনের সুখে স্বামী আর শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করিতে লাগিলেন। রাজবেশ পরিত্যাগপূর্বক তপস্বিনীর কষায় বসন (গেরুয়া কাপড়) পরিয়া যেন তাঁহার কতই আরাম বোধ হইতে লাগিল।

সাবিত্রী নারদের সেই নিদারুণ কথা এক মুহূর্তের তরেও ভুলেন নাই। বৎসরের শেষ যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই সেই ভীষণ বিপদের চিন্তা অন্য সকল চিন্তাকে ডুবাইয়া দিয়া, তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। প্রতিদিন দিন গণিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে, আর চারিটি দিন মাত্র বাকি আছে, তখন তিনি আহার নিদ্রা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া, একমনে কেবল ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনদিন চলিয়া গেল। তারপর সেই দিন আসিয়া উপস্থিত হইল, যেদিন সত্যবান্ তাঁহাকে চিরকালের মত ছাড়িয়া যাইবেন।

সেদিন সকালে উঠিয়া সাবিত্রী সকলের আগে ভক্তিভরে দেবতার পূজা করিলেন। তারপর গুরুজনদিগের চরণে প্রণাম করিয়া জোড়হাতে তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলে, তাঁহারা বহুকষ্টে চোখের জল থামাইয়া আশীর্বাদ করিলেন, "তোমার পতি বাঁচিয়া থাকুন।"

চিন্তায় এবং অনাহারে সাবিত্রীর দেহ ক্ষীণ হইয়া যেন তাহার ছায়াখানি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ীর মনে বড়ই কষ্ট হইল।

তাঁহারা বলিলেন, "মা, তিনদিন জলটুকুও মুখে দাও নাই, এখন আহার কর" সাবিত্রী তাঁহাদিগকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "আজিকার দিনটি আমাকে ক্ষমা করুন, সূর্য অস্ত গেলে আমি আহার করিব।"

কথায় বার্তায় বেলা হইল। সত্যবান্ কুড়াল কাঁধে লইয়া কাঠ আনিবার জন্য বনে যাইতে প্রস্তুত হইলেন, তাহা দেখিয়া সাবিত্রী বলিলেন, "আজি আমি কিছুতেই তোমার কাছ ছাড়া হইব না; আমাকে সঙ্গে লও।"

সত্যবান্ বলিলেন, "সাবিত্রি, তুমি ত কখনো বনে যাও নাই, তাহাতে তোমার শরীর এত দুর্বল। তুমি কি করিয়া পথ চলিবে? কি করিযা বনের কষ্ট সহ্য করিবে?"

সাবিত্রী বলিলেন, "আমার কোনো কষ্ট হইবে না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে বারণ করিও না।"

সত্যবান্ বলিলেন, "তুমি যাহাতে সুখী হও, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত। কিন্তু মা, বাবা কি তোমাকে যাইতে দিবেন?"

সাবিত্রী শ্বশুর শাশুড়ীর পায়ে ধরিয়া বলিলেন, " বাবা, মা আজিকার দিনে দযা করিয়া আমাকে ইঁহার সহিত যাইতে দিন।"

দ্যুমৎসেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এক বৎসর সত্যবানের বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে মা আমার কোনদিন কিছু প্রার্থনা করেন নাই। আজ তাঁহার এই প্রথম আবদার আমি কোন প্রাণে অগ্রাহ্য করিব? যাও মা, আজ তুমি সত্যবানের সঙ্গে সঙ্গেই থাক।"

দুজনে মিলিয়া বনের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে শোভার অন্ত নাই; ফল ফুলে বন পরিপূর্ণ হইয়া আছে। নদীতে হাঁস খেলিতেছে, গাছে বসিয়া পাখি গান গাহিতেছে, সত্যবানের আজ আনন্দ ধরে না। তিনি ক্রমাগত বলিতেছেন, "সাবিত্রি, দেখ, দেখ!" হায়! সাবিত্রী কি দেখিবেন? বাহিরের ঘটনা স্বপ্নের মত তাঁহার চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু তাঁহার মন তাহার কোন সংবাদই লইতেছে না। সেই নিদারুণ মুহূর্ত কখন আসিয়া উপস্থিত হয়, এই চিন্তায় অন্য সকল কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া, তিনি বারবার কেবল সত্যবানকেই চাহিয়া দেখিতেছেন।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল, সাজি ফলে ভরিয়া গেল। তারপর সত্যবান্ কাঠ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। কাটিতে কাটিতে তিনি বলিলেন, "সাবিত্রি, আমার বড় মাথা ধরিয়াছে; শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না; একটু নিদ্রা যাইব।"

অমনি নারদ মুনির সেই কথা সাবিত্রীর মনে হইল। কিন্তু তাহার জন্য আর ব্যস্ত না হইয়া, তিনি সত্যবানের মাথাটি নিজের কোলে লইয়া; স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন, কিঞ্চিৎ পরেই তিনি দেখিলেন যে, এক ভয়ঙ্কর পুরুষ হঠাৎ কোথা হইতে সত্যবানের নিকট আসিয়া, একদৃষ্টে

তাঁহাকে চাহিয়া দেখিতেছেন। সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ দেখিতে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। তাঁহার চক্ষু অত্যন্ত লাল, শরীর ঘোর কালো, পরিধানে লাল কাপড়, এবং হাতে পাশ (ফাঁদ)।

সেই ভয়ঙ্কর পুরুষকে দেখিবামাত্র সাবিত্রীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তখন তিনি স্নেহভরে সত্যবানের মাথাটি নামাইয়া, বিনীতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং জোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছেন?"

ভয়ঙ্কর পুরুষ বলিলেন, "আমি যম। আজ তোমার পতি সত্যবানের আয়ু শেষ হইয়াছে। তাই তাঁহাকে বাঁধিয়া নিতে আসিয়াছি।"

সাবিত্রী বলিলেন, "মানুষকে ত আপনার দূতেরাই লইয়া যায়, শুনিয়াছি। আজ আপনি নিজে কি জন্য আসিয়াছেন?"

যম বলিলেন, "এই সত্যবান্ অসাধারণ পুণ্যবান পুরুষ, তাই আমি নিজে ইহাকে লইতে আসিয়াছি।"

এই বলিয়া তিনি সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ (বুড়ো আঙ্গুলের মতন বড়) একটি পুরুষকে পাশে বাঁধিয়া টানিয়া বাহির করিলেন। উহাই ছিল সত্যবানের আত্মা। উহা বাহির হইবামাত্র তাঁহার শরীর অসাড় হইয়া মড়ার মত পড়িয়া রহিল।

যম সেই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষকে বাঁধিয়া লইয়া দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন; সাবিত্রীও শোকে কাতর হইয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহার পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন।

যম বলিলেন, "সাবিত্রী, তুমি কি জন্য আসিতেছ? তুমি ফিরিয়া যাও। সত্যবানের শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে হইবে।"

সাবিত্রী বলিলেন, "স্বামী যেখানে যান, স্ত্রীরও সেইখানেই যাওয়া উচিত। আমাদের দুজনে মিলিয়া ধর্ম-সাধন করিতে হইবে; সুতরাং আমার স্বামীকে ছাড়িয়া আমি কোথায় থাকিব? আমি তপস্যা করিয়া, এবং আপনার কৃপায় যেখানে ইচ্ছা যাইবার ক্ষমতা পাইয়াছি আমি আমার স্বামীর সঙ্গে যাইব।"

যম বলিলেন, "সাবিত্রী, ফিরিয়া যাও। আমি তোমার কথায় বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। সত্যবানের জীবন ছাড়া, তোমার যাহা ইচ্ছা বর লও।"

সাবিত্রী বলিলেন, "আমার শ্বশুর অন্ধ হইয়াছেন, এবং রাজ্য হারাইয়া বনে বাস করিতেছেন। আপনার কৃপায় তাঁহার চক্ষু ভাল হউক, আর তিনি অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় বল লাভ করুন।"

যম কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। এখন তুমি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছ দেখিতেছি। আর কষ্ট পাইও না, এখন ঘরে যাও।"

সাবিত্রী বলিলেন, "আমি আমার স্বামীর সঙ্গে রহিয়াছি, আমার কিসের কষ্ট, আর আপনার নিকটে থাকিলে আমার পুণ্য লাভ হইবে। আমার ঘরে ফিরিবার প্রয়োজন নাই।"

যম কহিলেন, "সাবিত্রী, তোমার কথা বড়ই মিষ্ট। সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি আর একটি বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী বলিলেন "তবে আমার শ্বশুর আবার তাঁহার রাজ্য ফিরিয়া পাউন!" যম কহিলেন, "তোমার শ্বশুর শীঘ্রই তাঁহার রাজ্য পাইবেন। এখন ফিরিয়া যাও।"

সাবিত্রী বলিলেন, "আপনি ধর্মরাজ; পাপের শাস্তি আপনিই বিধান করেন, পুণ্যবানের মনোবাঞ্ছা আপনিই পূর্ণ করেন। আপনার ন্যায় মহতেরা শত্রুকেও দয়া করিয়া থাকেন।"

যম কহিলেন, "পিপাসার সময়ে জলে যেমন তৃপ্তি হয়, তোমার এই কথাগুলি শুনিয়া আমার তেমনি তৃপ্তি বোধ হইতেছে। সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি আর- একটি বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী বলিলেন, "আমার পিতার পুত্র সন্তান নাই; তাঁহার একশতটি পুত্র হউক।"

যম কহিলেন, "তাহাই হউক! তোমার একশতটি অতি সুন্দর ভাই হইবে। এখন ত সকলই পাইলে; এখন ফিরিয়া যাও, দেখ, তুমি কত দূরে চলিয়া আসিয়াছ।"

সাবিত্রী বলিলেন, "আমি ত আমার স্বামীর কাছে রহিয়াছি, তবে আর দূরে কি করিয়া হইল! আমার ইহার চেয়ে আরো দূরে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনি চলিতে চলিতেই আমার কথা শুনুন। ন্যায় এবং সাধুতাকে আপনি রক্ষা করেন, এইজন্য আপনার নাম ধর্মরাজ। আপনার প্রতি আমাব যেমন বিশ্বাস হয়, আমার নিজের প্রতিও তেমন হয় না। তাই আমি আপনার সঙ্গে চলিয়াছি।'

যম কহিলেন, 'সাবিত্রি, এমন সুন্দর কথা ত আমি আর কাহারো নিকট শুনি নাই। আমি বড়ই সুখী হইলাম। সত্যবানের জীবন বিনা তুমি আরো একটি বর প্রার্থনা কর।'

সাবিত্রী বলিলেন, 'তবে সত্যবানের একশতটি পুত্র হউক।'

যম কহিলেন, 'আচ্ছা তবে তাহাই হইবে। এখন ঘরে যাও।'

সাবিত্রী বলিলেন, 'সাধু লোকের নিকট সাধু লোক আসিলে সর্বদাই মঙ্গল হইয়া থাকে। সাধুদিগের অনুগ্রহ কখনো বিফল হয় না। সাধুরাই সকলকে রক্ষা করেন।'

যম কহিলেন, 'সাবিত্রি, তোমার কথা যত শুনিতেছি ততই তোমার উপর আমার ভক্তি হইতেছে। তুমি পুনরায় বর প্রার্থনা কর।'

সাবিত্রী বলিলেন, 'আপনি সত্যবানের শতপুত্র হইবার বর দিলেন, তথাপি তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন। তাহা হইলে আপনার কথা কেমন করিয়া সত্য হইবে! সুতরাং সত্যবান্‌কে ছাড়িয়া দিন।'

তখন যম আহ্লাদের সহিত সত্যবানের বাঁধন খুলিয়া দিয়া বলিলেন, 'এই নাও, তোমার স্বামীকে ছাড়িয়া দিলাম। ইহার পর চারিশত বৎসর তোমরা সুখে বাঁচিয়া থাকিয়া একশতটি পুত্র লাভ কর।'

এই বলিয়া যম সেখান হইতে প্রস্থান করিলে, সাবিত্রী বনের ভিতরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সত্যবানের দেহ সেইভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তিনি পরম আদরে তাঁহার মাথাখানি কোলে লইবামাত্র সত্যবান্ চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, 'কি আশ্চর্য! রাত্রির হইয়া গিয়াছে তবুও আমি ঘুমাইতেছিলাম। সাবিত্রি, তুমি আমাকে জাগাও নাই কেন? আর আমাকে যে ধরিয়া টানিতেছিল, সেই কালো লোকটি কোথায় গেল?'

সাবিত্রী বলিলেন, 'সেই লোকটি চলিয়া গিয়াছেন। এখন বোধহয় তোমার শরীর একটু সুস্থ হইয়াছে, এখন উঠ, দেখ, রাত্রি হইয়াছে।'

তখন সত্যবান্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক চাহিয়া বলিলেন, 'আমার মনে হইতেছে যে, আমি শুধু ফল খাইয়া তোমাকে লইয়া বনে আসিয়াছিলাম। তারপর কাঠ চিরিতে চিরিতে আমার ভয়ানক মাথা ধরিল, আমি তোমার কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। তারপর যেন একটা ভয়ঙ্কর কালো লোককে দেখিলাম। সে সত্য কি স্বপ্ন তাহা বলিতে পারি না।

তুমি কিছু দেখিয়াছ?'

সাবিত্রী বলিলেন, 'কাল সব বলিব। এখন রাত্রি হইযাছে, চল শীঘ্র বাড়ি যাই, নহিলে বাবা আর মা ব্যস্ত হইবেন। অন্ধকার হইয়াছে জানোয়ারেরা ডাকিতেছে, আমার বড়ই ভয় হইতেছে।'

সত্যবান্ বলিলেন, 'এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারের মধ্যে তুমি পথ দেখিতে পাইবে না।'

সাবিত্রী বলিলেন, 'তোমাকে বড় দুর্বল বোধ হইতেছে। তোমার যদি চলিতে কষ্ট বোধ হয়, তবে নাহয় চল এইখানেই আজ রাত্রে থাকি। ঐ দেখ, একটা গাছ জ্বলিতেছে, ঐখান হইতে আগুন আনিয়া এই কাঠগুলো জ্বালাইয়া দিই, তাহা হইলে তোমার একটু আরাম বোধ হইতে পারে।'

সত্যবান্ বলিলেন, 'আমার এখন বেশ ভালো বোধ হইতেছে, চল ঘরেই যাই। আর কখনো আমার ঘরে ফিরিতে এত দেরি হয় নাই। সন্ধ্যা হইলেই মা আমাকে ঘরের ভিতরে বন্ধ করিতেন। দিনের বেলায় আমি বাহিরে গেলেও মা-বাবা ব্যস্ত হইতেন। তখন বাবা আমাকে কত খুঁজিতেন। একদিন আমার বিলম্ব হওয়াতে, বাবা বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন, আর আমাকে অনেক বকিয়াছিলেন। আজ না জানি আমার জন্য তাঁহার কতই ব্যাকুল হইয়াছেন। আহা। আমি ভিন্ন যে আর তাঁহাদের কেহই নাই! হায় হায়! কেন ঘুমাইয়া পড়িলাম?'

এই বলিয়া সত্যবান্ কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সাবিত্রী স্নেহের সহিত তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া, তাঁহাকে শান্ত করিলে তিনি বলিলেন, 'সাবিত্রি, আর বিলম্ব করা হইবে না, চল শীঘ্র ঘরে যাই। বাবা-মা'র যদি কিছু হয়, তবে আর আমার বাঁচিয়া থাকিয়া ফল কি?'

তখন সাবিত্রী সত্যবানের কুড়াল আর ফলের ঝুড়ি হাতে করিয়া লইলে, সত্যবান্ একহাতে তাঁহার বাম কাঁধের উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। বনের সকল পথই সত্যবানের বেশ ভালোরূপে জানা ছিল, কাজেই অন্ধকারের ভিতরেও তাঁহাদের চলিতে বিশেষ কষ্ট হইল না।

এদিকে এক আশ্চর্য ঘটনা হইয়াছে। অন্ধ দ্যুমৎসেন আশ্রমে বসিয়া সত্যবানের কথা ভাবিতেছিলেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ তাঁহার চক্ষু ভালো হইয়া গেল। তিনি আশ্চর্য হইয়া চারিদিক চাহিয়া বলিলেন, 'সত্যবান্ কোথায়?' যখন শুনিলেন তিনি তখনো ফিরেন নাই, তখন আর তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। তখন সেই অন্ধকারের ভিতরেই স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া তিনি বনে বনে সত্যবানকে খুঁজিবার জন্য পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইলেন। কাঁটার ঘায় তাঁহাদের পা ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। শরীর বাহিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সে কষ্ট তাঁহাদের কষ্ট বলিয়াই মনে হইল না। কোন শব্দ হইলেই দ্যুমৎসেনের মনে হইতে লাগিল যে, ঐ বুঝি উহারা আসিতেছে। এই মনে করিয়া তিনি কতবার যে 'সত্যবান্! সত্যবান্! সাবিত্রি! সাবিত্রি।' বলিয়া ডাকিলেন তাহার সংখ্যা নাই।

ভাগ্যিস আশ্রমের লোকেরা এই শব্দ শুনিয়া অনেক কষ্টে তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন, নচেৎ না জানি কি হইত? মুনিরা সকলে তাঁহাকে আশ্রমে আনিয়া, অতি মিষ্টভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিতে লাগিলেন।

সুবচা বলিলেন, 'আপনারা স্থির হউন! সাবিত্রীর পুণ্যের বলে সত্যবান্ অবশ্যই জীবিত আছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।'

গৌতম বলিলেন, 'আমি অনেক তপস্যা করিয়াছি, লোকের মনের কথাও বলিয়া দিতে পারি, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সত্যবানের মৃত্যু হয় নাই।'

এ কথায় গৌতমের একজন শিষ্য বলিলেন, 'আমার গুরুদেবের কথা কখনো মিথ্যা হয় না। সত্যবান্ অবশ্যই বাঁচিয়া আছেন।'

দালভ্য কহিলেন, 'তোমার চক্ষু যখন ভালো হইয়াছে, তখন সত্যবান্ও ভালো আছেন।'

মুনিদিগের কথায় দ্যুমৎসেন অনেক সুস্থির হইযাছেন, এমন সময় সাবিত্রী আর সত্যবান্ হাসিতে হাসিতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। তাহাতে মুনিগণ আনন্দে কোলাহল করিতে করিতে দ্যুমৎসেনকে কত যে আশীর্বাদ করিলেন তাহার সীমা নাই। তারপর সকলে সত্যবান্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সত্যবান্ আজ তোমার ঘরে ফিরিতে এত বিলম্ব কেন হইল? তোমাদের জন্য তোমার পিতামাতা কত যে কষ্ট পাইয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।'

ইহাতে সত্যবান্ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'আমার কখনো ত এমন হয় না, কিন্তু আজ বড় মাথা ধরায়, বনের ভিতরে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম।'

তখন গৌতম কহিলেন, 'সত্যবান্, তোমার পিতার চক্ষু কি করিয়া ভালো হইল, তুমি তাহার কিছুই জান না, কিন্তু সাবিত্রী তাহার সমস্তই জানেন, তিনি যদি তাহা আমাদিগকে বলেন, তবে বড় সুখী হইব।'

গৌতমের কথায় সাবিত্রী সে রাত্রির আশ্চর্য ঘটনাসকলের কথা বলিলে মুনিরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে নিজ নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

পরদিন সকালে দ্যুমৎসেন মুনিদিগের সহিত বসিয়া রাত্রির ঘটনার বিষয়ে কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে শাল্বদেশ হইতে তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'মহারাজ! মন্ত্রী আপনার শত্রুকে বধ করিয়াছেন, তাহার সৈন্যরা পলাইয়া গিয়াছে। আমরা সকলে মিলিয়া স্থির করিযাছি যে, আপনার চক্ষু থাকুক বা না থাকুক, আপনিই আমাদের রাজা হইবেন। তাই আমরা রথ লইয়া আপনাকে লইতে আসিয়াছি, আপনি আপনার রাজ্যে চলুন।'

বলিতে বলিতেই তাহারা দেখিল যে, রাজা আর অন্ধ নহেন, তাঁহার দুই চক্ষু ভালো হইয়া গিয়াছে। ইহাতে তাহারা নিতান্ত আশ্চর্য এবং আনন্দিত হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে আরম্ভ করিল।

তারপর দেশে গিয়া দ্যুমৎসেন রাজা আর সত্যবান্ যুবরাজ হইলেন। কালে সত্যবান্ ও সাবিত্রীর একশতটি পুত্র আর রাজা অশ্বপতিরও একশতটি পুত্র হইল।

এমনি করিয়া সাবিত্রী পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী এবং স্বামীর দুঃখ দূর করিয়াছিলেন। আর সেইজন্য এখনো আমাদের দেশের লোকে সাবিত্রীকে ভক্তি করে।

পরীক্ষিৎ ও সুশোভনার কথা

অযোধ্যায় পরীক্ষিৎ নামে এক রাজা ছিলেন।

একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ ঘোড়ায় চড়িয়া শিকারে বাহির হইলেন। শিকার করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে, একটা আশ্চর্যরকমের হরিণ বনের ভিতর চড়িয়া বেড়াইতেছে। হরিণটা তাঁহাকে দেখিয়াই ছুটিয়া পালাইতে লাগিল। মহারাজও তাহার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ধরিতে পারিলেন না। সে পাগলা হরিণ বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, খানা খন্দ পার করাইয়া, তাঁহাকে কত দেশ যে ঘুরাইল, আর কি নাকাল যে করিল, তাহা আর বলিবার নয়। শেষকালে হতভাগা মহারাজকে একটা ঘোর অন্ধকার অরণ্যের ভিতরে আনিয়া গা ঢাকা দিল, তখন তিনি আর কি করেন? তিনি ভাবিলেন, 'আর আমার হরিণ তাড়াইয়া কাজ নাই, এখন একটু জল খাইতে পাইলে বাঁচি।'

ভাবিতে ভাবিতে খানিক দূর গিয়াই তিনি দেখিলেন যে একটি অতি সুন্দর সবোবর সেখানে রহিয়াছে। মহারাজ সেই সরোবরে স্নান আর তাহার জল পান করিয়া সুস্থ হইলেন, ঘোড়াটাকে পদ্মের মৃণাল খাইতে দিলেন। তারপর সেই পুকুরের ধারে কোমল সবুজ ঘাসের উপর শুইয়া তিনি বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় কোথা হইতে অতি মধুর গানের শব্দ তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। এই ঘোর অরণ্য, ইহাতে মানুষের গতিবিধি নাই, এমন স্থানে কে এমন করিয়া গান গাহিতেছে? মহারাজ যত ভাবেন, ততই তাঁহার আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার অধিক ভাবিতে হইল না। খানিক পরেই তিনি দেখিলেন যে, একটি অতি অপরূপ সুন্দরী কন্যা ফুল তুলিতে তুলিতে, আর গান গাহিতে গাহিতে তাঁর দিকেই আসিতেছে। রাজা তখন শশব্যস্তে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে, তুমি কে? কাহার স্ত্রী?'

কন্যা বলিল, 'আমি কাহারো স্ত্রী নহি, আমার এখনো বিবাহ হয় নাই।'

রাজা বলিলেন, 'তবে আমাকে বিবাহ কর।'

কন্যা বলিলেন, 'আপনি যদি একটি প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন, তবে আমি আপনাকে বিবাহ করিতে পারি।'

রাজা বলিলেন, 'কি প্রতিজ্ঞা?'

কন্যা বলিল, 'প্রতিজ্ঞাটি এই যে, আপনি কখনো আমাকে জল দেখিতে দিবেন না।'

রাজা বলিলেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে কখনো জল দেখিতে দিব না।'

তারপর সেই কন্যার সহিত রাজা বিবাহ হইয়া গেল, রাজা যার পর নাই আনন্দের সহিত তাহাকে পাল্কিতে করিয়া অযোধ্যায় লইয়া আসিলেন অযোধ্যায় আসিয়া তাঁহার এই এক বিষম চিন্তা হইল, 'না জানি কখন রানী জল দেখিয়া বসেন, আর তাহাতে কি সর্বনাশ উপস্থিত হয়।'

আশপাশের সকল পুকুর মাটি দিয়া বুজাইয়া ফেলা হইল, সরযূ নদীর দিকের সকল জানালা বন্ধ হইয়া গেল, ছাতের উপর প্রকাণ্ড দেওয়াল উঠিল। রাজা দাসদাসীদিগকে বলিলেন, 'খবরদার, তোরা জল খাইতে পারিবি না।'

তথাপি রাজার চিন্তা দূর হইল না। চাকর চাকরানীরা যদি কথা না শোনে আর যদি বৃষ্টি হয়? এই ভাবিয়া রাজা নিতান্ত ব্যস্ত ভাবে রানীর নিকট বসিয়া ক্রমাগত চাকরানীদিগের উপর পাহারা দিতে লাগিলেন, আর, মেঘ আসিলেই জানালা বন্ধ করিতে হইবে, তাই তিনি প্রত্যেক মিনিটে দুবার করিয়া ছাতে উঠিয়া আকাশ দেখিতে লাগিলেন।

কাজেই রাজার আর রাজ্যের কাজ দেখিবার অবসর রহিল না। মন্ত্রীরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, প্রজারা চটিয়া গেল। রাজাকে খবর দিতে গেলেই তিনি বলেন, 'আমার অবসর কোথায়?'

মাসের পর মাস এইভাবে গেল, ইহার মধ্যে কেহই রাজার দর্শন পাইল না। বুড়া মন্ত্রী দাড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, 'তাই ত? ইহার একটা উপায় না করিলে নয়।'

অন্দরমহলে চাকরানীদিগকে মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের কি কি কাজ করিতে হয়?'

চাকরানীরা বলিল, 'যাহাতে বাড়ির ভিতর জল না আসে, সকল কাজের আগে আমাদিগকে তাহাই দেখিতে হয়।'

রানী যে জল দেখিতে নারাজ, মন্ত্রীমহাশয় তাহার কথা একটু একটু শুনিয়াছিলেন, তিনি চাকরানীদিগের কথা শুনিয়া ভাবিলেন, 'হুঁ—উঁ' তবে দেখিতেছি, রানীকে জল দেখাইবার ফন্দি করিতে হইল।

এই ভাবিয়া মন্ত্রী মহাশয় একটি বাগান প্রস্তুত করাইলেন। বাগানের ভিতরে এমন একট বাড়ি হইল যে, বাহিরে বৃষ্টি হইলেও সে বাড়ীর ভিতর হইতে তাহা দেখিতে পাওযা যায় না। সেই বাগানে একটি অতি সুন্দর ছোট পুকুরও ছিল, কিন্তু তাহা দেওয়াল এবং গাছপালাব ঘোরফেরের মধ্যে এমনি কৌশলপূর্বক লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল যে, দিনকতক, বাগানেব ভিতরে না ঘুরিলে আর তাহার সন্ধান পাইবার জো ছিল না।

ক্রমে রাজা সংবাদ পাইলেন যে, মন্ত্রী একটি আশ্চর্য বাগান করিয়াছেন, তাহার ভিতরে জল নাই, আর তাহার মধ্যে একটি সুন্দর বাড়ি আছে, সে বাড়ির ভিতরে থাকিলে বাহিরে বৃষ্টি হইলে তাহা দেখা যায় না। ক্রমাগত ছাতে উঠিয়া উঠিয়া রাজা মহাশয়ের বড়ই পা ধরিয়া গিয়াছিল। মন্ত্রীর বাগানবাড়ির কথা শুনিয়া তিনি লম্বা নিশ্বাস ফেলিলেন, আর বলিলেন, 'আমি উহা দেখিতে যাইব!'

বাগানবাড়ি দেখিয়া রাজার এতই ভালো লাগিল যে, তিনি রানীকে সেখানে লইয়া আসিতে আর একদিনও বিলম্ব করিলেন না, বুড়া মন্ত্রীর মনের ভিতরে আর হাসি ধরে না। তিনি পরম আদরে রাজা ও রানীকে বাগানে পৌঁছাইয়া দিয়া, বাহির হইতে তালা লাগাইয়া দিলেন।

এতদিন ঘরের ভিতরে বন্ধ থাকার পর বাগানের খোলা হাওয়ায় রাজা রানীর প্রাণ জুড়াইয়া গেল। তাঁহারা দুইজনে ভোরে উঠিয়া বাগান দেখিতে আরম্ভ করিলেন, দুপুরবেলাও ঘরে ফিরিলেন না। রাজামহাশয় একে ত সেই রানীকে আনিয়া অবধি জল খান নাই, ইহার উপর আবার দুপুরবেলায় প্রখর রোদ লাগিয়া, তাঁহার এমনি ভয়ানক পিপাসা আর জ্বালা হইল যে কি বলিব! পিপাসার তাড়নায় তিনি রোদ ছাড়িয়া ক্রমাগত ঘন ছায়ার দিকে যাইতে লাগিলেন, সেই ঘন ছায়ার ভিতরে, ঘনগাছের আড়ালে, রাজামহাশয় আসিয়া দেখিলেন—

একটি পুকুর!

তখন রাজামহাশয় কেবল পিপাসার জ্বালার কথাই ভাবিতেছিলেন, জলের ভয়ের কথা তাঁরা মনেই ছিল না। তাই পুকুর দেখিবামাত্র তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া রানীকে ডাকিলেন, তারপর দুইজনে জলে নামিয়া স্নান করিতে গেলেন।

স্নানের পর শীতল হইয়া রাজা তীরে আসিলেন, কিন্তু হায়রে হায়! রানী সেই জলে ডুবিলেন, আর ভাসিলেন না। রাজার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, রাজ্যময় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। জেলেরা আসিয়া জাল দিয়া পুকুর ছাঁকিল, কিন্তু কিছুই পাইল না। পুকুরের জল সেঁচিয়া ফেলা হইল, কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হইল না, খালি দেখা গেল, এক গর্তের মুখে একটি ব্যাঙ বসিযা আছে।

ব্যাঙ দেখিয়া রাজা ক্রোধভরে বলিলেন, 'এই দুষ্টই আমার রানীকে খাইয়াছে! সুতরাং তোমরা সকলে মিলিয়া ব্যাঙ বধ কর। যে যত ব্যাঙ মারিবে, আমি তাহার উপর তত খুশি হইব, এবং তাহাকে তত বেশি পুরস্কার দিব!'

এ কথায় ছেলে বুড়ো সকলে তখনই লাঠি আর ঝুড়ি হাতে ব্যাঙ মারিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হইল। জলের ধারে, বনেব ভিতরে, ঘরের কোণে, সারাদিন খালি ধুপ্ ধাপ্ ভিন্ন আর কোন শব্দ শুনিবাব জো রহিল না। রাজবাড়ীর দিকে অবিরাম লাঠি বগলে, ঝুড়ি মাথায় লোকের স্রোত বহিতে লাগিল। বাজামহাশয় সভায় আসিয়া আর অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাইতেন না, খালি, 'জয় হোক মহাবাজ! এক ঝুড়ি ব্যাঙ আনিয়াছি!' দিনরাত্রি এই কথাই তাঁহাকে শুনিতে হইত।

আব বেচারা ব্যাঙদিগের কথা কি বলিব? খোলা জায়গা পাইলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া মারে, জলে ঝাঁপ দিলে ছাঁকিয়া আনে, বনে লুকাইলে খুঁজিয়া বাহির করে, গর্তে ঢুকিলে খুঁড়িয়া তোলে। তাহারা প্রাণের ভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া তাহাদের রাজার নিকট গিয়া বলিল, 'দোহাই মহারাজ! আমাদিগকে রক্ষা করুন, রাজার লোক আমাদিগকে মারিয়া শেষ করিল।'

তখন ব্যাঙের রাজা তপস্বীব বেশে পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয়পূর্বক বলিলেন, 'মহারাজ, ভেকদিগের কোন অপরাধ নাই, তুমি তাহাদের উপর ক্রোধ করিও না।'

রাজা বলিলেন, 'তাহা হইতে পাবে না। ঐ দুরাত্মারা আমার রানীকে খাইয়াছে, উহাদিগকে অবশ্য বধ করিব।'

ব্যাঙের রাজা বলিলনে, 'তোমার রানী আমারই কন্যা! উহার নাম সুশোভনা। আমার নাম আয়ু, আমি ব্যাঙদিগের রাজা। আমি বেশ জানি. তোমার রানীকে কেহই খায় নাই।'

এ কথায় রাজা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, 'তবে আপনার কন্যাকে আনিয়া দিন।'

ইহাতে আয়ু সুশোভনাকে রাজার নিকট উপস্থিত করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, 'সুশোভনা, তুমি মহারাজকে এমন করিয়া কষ্ট দিয়াছ, ইহাতে আমি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছি, এই অপরাধে তোমার সন্তানেরা ব্রাহ্মণদিগের সহিত বন্ধুতা করিতে পারিবে না।'

রানীকে পাইয়া রাজার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি ভক্তিভরে শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া নানারূপ মিষ্ট কথায় তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন, তারপর আয়ু, রাজা ও রানীকে আশীর্বাদ করিয়া দেশে চলিয়া গেলেন।

তখন হইতে পরীক্ষিতের সময় খুব সুখেই কাটিতে লাগিল। ইহার পর আর সুশোভনা জল দেখিতে আপত্তি করেন নাই।

বামদেব ও বামীর কথা

পরীক্ষিতের তিনপুত্র; শল, দল আর বল।

শল বড় হইলে তাঁহার হাতে রাজ্য দিয়া পরীক্ষিত তপস্যা করিবার জন্য বনে চলিয়া গেলেন।

একদিন শল মৃগয়া করিতে গিয়া একটা হরিণকে তাড়া করিলেন। কিন্তু তাঁহার সারথি অনেক চেষ্টা করিয়াও তেমন বেগে রথ চালাইতে পারিল না। রাজা, 'জোরে চালাও! বলিয়া বেচারাকে কতই ধমকাইলেন; কিন্তু ধমকের জোরে যদি ঘোড়ার পায়ে জোর হইত, তবে আর কথা কি ছিল। শেষে সারথি ভয়ে ভয়ে হাত জোড় করিয়া বলিল, "মহারাজ, আমার উপরে ক্রোধ করিবেন না; এ-সকল ঘোড়া দিয়া ও হরিণকে ধরা একেবারে অসম্ভব। মহারাজের রথে যদি বামী জোতা থাকিত, তবে নাহয় একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম।"

বামীর কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "সে আবার কিরকম ঘোড়া? শীঘ্র বল, আমি তাহাই নাহয় আনিয়া লইব।"

এ কথায় সারথি বড়ই সঙ্কটে পড়িল। মহর্ষি বামদেবের দুটি আশ্চর্য ঘোড়া ছিল, তাহাদেরই নাম বামী। রাজার কথার উত্তর দিলে হয়ত তিনি ঐ দুই ঘোড়া লইয়া আসিবেন। আর যদি তিনি তাহা ফিরাইয়া না দেন, তবে মুনিঠাকুর হয়ত সারথির উপর চটিয়া গিয়া তাহাকে শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন; কাজেই সে কোন কথা বলিতে সাহস না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। ইহাতে রাজা বিষম ভ্রুকুটিপূর্বক ক্রোধভরে তলোয়ার উঠাইয়া বলিলেন, "বটে রে দুষ্ট, তুই আমার কথার উত্তর দিবি না? এখনই তোর মাথা কাটিব।"

তখন আর সারথি কি করে? সে প্রাণের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "বামদেবের খুব ভালো দুটি ঘোড়া আছে, তাহাদেরই নাম বামী।"

রাজা বলিলেন, "তবে এখনই বামদেবের আশ্রমে লইয়া চল্!"

দেখিতে দেখিতে রথ বামদেবের আশ্রমে উপস্থিত হইল। মুনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার ঘোড়া দুটি রথে জুতিয়া হরিণ ধরিবার জন্য রাজা বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন, তখন আর তিনি ঘোড়া দিতে আপত্তি করিলেন না; কিন্তু রাজাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, "আপনার কাজ হইয়া গেলেই ঘোড়া দুটি ফিরাইয়া দিবেন।"

রাজা বলিলেন, "তাহা আর বলিতে? আমি অবশ্যই ঘোড়া ফিরাইয়া দিব!"

এই বলিয়া ত রথে মুনির ঘোড়া জুতিয়া রথ হাঁকান আরম্ভ হইল। আশ্রমের বাহিরে গিয়াই রাজা সারথিকে বলিলেন, "কি বল হে সারথি। এত ভালো ঘোড়া দিয়া মুনির কি কাজ? এ ঘোড়া আমার ঘোড়াশালে থাকিলেই মানাইবে ভালো, মুনিকে আর উহা ফিরাইয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

সারথি আর কি বলিবে? সে চুপ করিয়া রহিল।

একমাস চলিয়া গেল, তথাপি রাজা ঘোড়া ফিরাইয়া দিলেন না দেখিয়া, বামদেব তাঁহার

আত্রেয় নামক শিষ্যকে দিয়া ঘোড়া দুটি চাহিয়া পাঠাইলেন। কিছুকাল পরে আত্রেয় শুধু হাতে ফিরিয়া আসিয়া দুঃখের সহিত বলিলেন, "ভগবন্, আমি রাজার নিকট ঘোড়া চাহিলে তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন, 'এমন ঘোড়া রাজারই উপযুক্ত। ব্রাহ্মণের আবার ঘোড়ার প্রয়োজন কি? আপনি আশ্রমে চলিয়া যান!"

ইহাতে বামদেব নিজে রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ আমার ঘোড়া ফিরাইয়া দাও।"

রাজা বলিলেন, "আপনি ঘোড়া ফিরাইয়া লইয়া কি করিবেন? উহা আমারই কাছে থাকুক।"

মুনি বলিলেন, "আমি তোমার ভালোব জন্য বলিতেছি। ঘোড়া দুটি ফিরাইয়া দাও। নচেৎ তোমার বড়ই দুর্গতি হইবে।"

রাজা বলিলেন, "শাস্ত্রে বলে, ব্রাহ্মণের বাহন ষাঁড়। আপনার মত লোকেরা কি শাস্ত্র অমান্য করিতে পাবেন? দুটি ষাঁড় কিনিয়া লউন।"

বামদেব কহিলেন, ব্রাহ্মণের ষাঁড় বাহন ত স্বর্গে; পৃথিবীতে তোমারও ঘোড়া বাহন আমাবও ঘোড়া বাহন। সুতরাং আমার ঘোড়া দুটি ফিরাইয়া দাও।"

রাজা বলিলেন, "ষাঁড় যদি পছন্দ না হয়, তবে বরং গাধা বা খচ্চর বা আর চারিটি ঘোড়া চড়িয়া চলা ফেরা করুন, আব মনে করুন যে, বামী ঘোড়া আপনার নহে, আমারই।"

মুনি বলিলেন, "যদি তোমার বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয, তবে শীঘ্র আমাব বামী ঘোড়া ফিরাইয়া দাও।"

বাজা বলিলেন, "মুনিঠাকুব, ঐ একটি কথা বাদে আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিতে রাজি আছি; কিন্তু ঘোড়া ফিরাইয়া দিতে পারিব না। আপনি ত শিকার করেন না, আপনার এত ভালো ঘোড়াব প্রয়োজন কি?

এ কথা বলিতে বলিতেই বিষম বিকটাকার চারিটা রাক্ষস, চোখ ঘুরাইতে ঘুরাইতে আর দাঁত খিঁচাইতে খিঁচাইতে, ভয়ঙ্কর শূল উঠাইয়া বাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, "আমাব লোকজন আমার পক্ষে থাকিলে, কখনই আমি ঘোড়া ছাড়িয়া দিব না। এই মুনি দেখিতেছি নিতান্ত পাপিষ্ঠ!" কিন্তু তাহার কান্না শেষ হইতে না হইতেই রাক্ষসেরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল।

শলের মৃত্যুব পব বাজা হইলেন দল। বামদেব তাঁহারও নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ আমার বামী ঘোড়া ফিরাইয়া দাও।"

ইহার উত্তরে দল বলিল, "সারথি, তীর ধনুক আন ত! আমি এই মুনিকে মারিয়া কুকুরকে খাইতে দিব।"

তখনই ধনুর্বান আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা ভয়ঙ্কর এক বাণ হাতে লইয়া মুনিকে মারিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহা দেখিয়া মুনি বলিলেন, "এ বাণে আমি মরিব না; মরিবে তোমার খোকা!"

এ কথার সঙ্গে সঙ্গেই দল মুনিকে বাণ মারিলেন, কিন্তু সে বাণ মুনির দিকে না গিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক রাজাব দশ বৎসরের পুত্র শ্যেনজিৎকে বধ করিল!

এই ঘটনার সংবাদ পাইবামাত্র, দল আর একটি বাণ হাতে লইয়া বলিলেন, "এই বাণে

দুষ্ট ব্রাহ্মণকে সংহার করিব!"

এ কথায় বামদেব হাসিয়া বলিলেন, "বান ছুঁড়িতে পারিলে তবে ত আমাকে মারিবে!"

বাস্তবিকই, রাজা বাণ ছুঁড়িতে গিয়া দেখেন, তাঁহার হাত অসাড় হইয়া গিয়াছে। তিনি আর তাহা নাড়িতে পারেন না! তখন তিনি ভয়ে অস্থির হইয়া বলিলেন, "আমি যে অবশ হইয়া গিয়াছি। মুনিঠাকুরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া আমার কাজ নাই!"

এমনি করিয়া রাজার ভালো বুদ্ধি আসিল। তারপর রানী বামদেবকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিলে, তিনি দলের অপরাধ মার্জনাপূর্বক তাঁহাকে বর দিয়া, ঘোড়া দুইটি লইয়া আহ্লাদের সহিত আশ্রমে ফিরিলেন।

মুনির বরে রাজার পাপ দূর হইল। ইহার পর তিনি আর কোন অন্যায় কাজ করেন নাই।

আয়োদধৌম্য ও তাঁহার শিষ্যগণের কথা
আরুণি

মহর্ষি আয়োদধৌম্যের আরুণি নামে একটি শিষ্য ছিলেন। একদিন আয়োদধৌম্য আরুণিকে বলিলেন, "বৎস আরুণি, ক্ষেত্রে জল বাহির হইয়া যাইতেছে; তুমি শীঘ্র গিয়া আল বাঁধিয়া তাহা বন্ধ কর।"

গুরুর কথায় আরুণি তখনই ছুটিয়া গিয়া আল বাঁধিতে আরম্ভ কারলেন, কিন্তু একে বরষার জল, তাহাতে বেলে মাটি, সে বালির বাঁধ বাঁধিতে না বাঁধিতেই জলে ধুইয়া নিতে লাগিল, আরুণি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াও তাহা রাখিতে পারিলেন না।

কিন্তু আরুণি একটি কাজ আরম্ভ করিয়া তাহা সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন না, জল যতই বাঁধ ভাসাইয়া নিতে লাগিল, তিনিও-ততই মাটি চাপাইতে লাগিলেন। যখন তাহাতেও কোন ফল হইল না। তখন তিনি নিজেই সেখানে শুইয়া পড়িলেন। ইহাতে জলও থামিল, আরুণির মনও খুশি হইল।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে, তথাপি আরুণি ঘরে ফিরিতেছেন না। দেখিয়া মহর্ষি তাঁহার শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরুণি কোথায় গেল?" শিষ্যেরা বলিলেন, "ভগবন্, আজ সকালে আপনি তাঁহাকে ক্ষেতের আল বাঁধিতে পাঠাইয়াছিলেন; তাহার পর আর সে ঘরে ফিরে নাই।"

এ কথায় মহর্ষি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "বল কি? এখনো সে ফিরে নাই? তবে হয়ত তাহার কোন বিপদ হইয়াছে। শীঘ্র চল; তাহার খোঁজ লইতে হইবে।"

এই বলিয়া আয়োদধৌম্য ক্ষেতের ধারে গিয়া আরুণিকে ডাকিতে লাগিলেন —"বৎস আরুণি! কোথায় তুমি? শীঘ্র আইস!"

গুরুর ডাক শুনিয়া আরুণি আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

আরুণি কহিলেন, "ভগবন্, আমি আর কিছুতেই জল আট্‌কাইতে না পারিয়া সেখানে এতক্ষণ শুইয়াছিলাম। এখন কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন।"

আরুণির কথা শুনিয়া মহর্ষির বড় দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "তোমার মঙ্গল হউক, বৎস। আমার বরে তুমি সকল শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে। আর তুমি আল ফুঁড়িয়া আমার নিকট উঠিয়া আসিয়াছ, এজন্য আজ হইতে তোমার নাম উদ্দালক হইবে।"

এইরূপে আরুণি সকল বিদ্যা লাভ করিয়া, গুরুকে প্রণামপূর্বক আহ্লাদের সহিত দেশে চলিয়া গেলেন।

উপমন্যু

আয়োদধৌম্যের আর একটি শিষ্যের নাম ছিল উপমন্যু। একদিন মহর্ষি উপমন্যুকে বলিলেন, "বৎস, তোমার উপর আমার গরু চরাইবার ভার রহিল। যত্নের সহিত আমার গরুগুলিকে রাখিবে।"

উপমন্যু পরম যত্নে মহর্ষির গরু চরাইতে আরম্ভ করিলেন। সারাদিন গরু চরাইয়া সন্ধ্যাকালে আশ্রমে ফিরিয়া, তিনি গুরুকে প্রণামপূর্বক জোড়হাতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেন। মহর্ষি দেখিলেন, উপমন্যু দিন দিন মোটা হইতেছেন। ইহাতে তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমাকে ত ক্রমেই বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেখিতেছি; তুমি কি আহার কর?

উপমন্যু বলিললেন, "ভগবন, আমি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাই, তাহাই আহার করি।"

মুনি বলিলেন, "সে কি? ভিক্ষা করিয়া তুমি যাহা পাও, আমাকে না জানাইয়া তুমি তাহা আহার কর? ইহাত' ঠিক হইতেছে না!"

তখন হইতে উপমন্যু ভিক্ষার জিনিস আনিয়া গুরুর হাতে দেন। গুরু তাহা সমস্তই নিজে রাখেন, উপমন্যুকে কিছুই দেন না।

উপমন্যু তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া সারাদিন গরু চরান, আর সন্ধ্যাকালে আসিয়া গুরুকে প্রণামপূর্বক জোড়হাতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ান। মুনি দেখিলেন, তথাপি উপমন্যু দিন দিন মোটাই হইতে চলিয়াছেন; তাহাতে তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস উপমন্যু তুমি ভিক্ষা করিয়া যাহা আন, তাহার সমস্তই ত আমি রাখিয়া দিই; তথাপি তোমাকে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেখিতেছি। এখন তুমি কি আহার কর?"

উপমন্যু বলিলেন, "ভগবন্, আমি একবারের ভিক্ষার জিনিস আপনাকে দিয়া, তারপর আবার নিজের জন্য ভিক্ষা করি।" মহর্ষি বলিলেন, "ইহা ত অন্যায়! ইহাতে অন্যের ভিক্ষার ক্ষতি হইতেছে, আর তোমারও লোভ বাড়িয়া যাইতেছে। ভদ্রলোকের এমন কাজ করিতে নাই।"

উপমন্যু তাহাতেই রাজি হইয়া সারাদিন গরু চরান, আর সন্ধ্যা হইলে, গুরুর নিকট আসিয়া, তাঁহাকে প্রণামপূর্বক জোড়হাতে দাঁড়াইয়া থাকেন। মুনি দেখিলেন, তথাপি উপমন্যু মোটা হইতেছেন। তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি একবার ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সমস্তই আমাকে দাও, তারপর আর নিজের জন্য ভিক্ষা কর না; তবে তুমি কি করিয়া মোটা হইতেছ? এখন কি খাও?"

উপমন্যু বলিলেন, "ভগবন্, এখন আমি গরুর দুধ খাই।"

মহর্ষি বলিলেন, "আমি ত তোমাকে গরুর দুধ খাইতে অনুমতি দিই নাই, তবে তুমি তাহা

কি করিয়া খাও? ইহা অত্যন্ত অন্যায়।"

উপমন্যু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা।"

তারপর তিনি সারাদিন গরু চরান, সন্ধ্যাকালে মুনির নিকট আসিয়া দাঁড়ান। তাঁহার শরীর তখনো মোটাই হইতেছে। তাহা দেখিয়া মুনি বলিলেন, "বৎস, তুমি নিজের জন্য আর ভিক্ষা কর না, গরুর দুধ খাওয়াও ছাড়িয়া দিয়াছ। তথাপি তোমাকে হৃষ্ট-পুষ্টই দেখিতেছি। এখন তুমি কি খাও?"

উপমন্যু বলিলেন, "বাছুরেরা গরুর দুধ খাইবার সময় তাহাদের মুখ দিয়া যে ফেনা বাহির হয়। আমি এখন তাহাই খাই।"

মহর্ষি বলিলেন, "আহা ওরূপ করিতে নাই। বাছুরদের যে দয়া, তুমি ফেনা খাইতে গেলে, উহারা তোমার জন্য বেশি করিয়া ফেনা বাহির করিবে। কাজেই তাহাদের নিজেদের পেট ভরিবে না।"

উপমন্যু মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা!"

এখন বেচারার আহারের পথ একেবারেই বন্ধ হইল। নিজের জন্য ভিক্ষা করিবার জো নাই। দুধ খাইবার অনুমতি নাই। তথাপি তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় ভুগিয়া যথাশক্তি যত্নের সহিত মহর্ষির গরু চরাইতে লাগিলেন। ক্ষুধা যখন অসহ্য হইল, তখন সামনের একটা আকন্দ গাছ দেখিতে পাইয়া, তাহারই কতকগুলি পাতা চিবাইয়া খাইলেন। সে সর্বনেশে গাছের যে কি সর্বনেশে পাতা, উহা খাইবামাত্র উপমন্যুর চোখ ভয়ঙ্কর টাটাইয়া, ক্রমে তাহা একেবারে অন্ধ হইয়া গেল। তথাপি তিনি যথাশক্তি মহর্ষির গরু চরাইতে ত্রুটি করিলেন না। এইরূপে গরু লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন তিনি এক কূয়ার ভিতরে পড়িযা গেলেন।

এদিকে আয়োদধৌম্য সন্ধ্যাকালে উপমন্যুকে ফিরিতে না দেখিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "দেখ, উপমন্যু আজ এখনো ঘরে ফিরিল না; বোধ হয় আমি তাহার আহার বন্ধ করিয়া দেওয়াতে সে রাগ করিয়াছে। চল ত দেখি,' সে কোথায় গেল।"

বনের ভিতরে আসিয়া মহর্ষি ব্যস্তভাবে উপমন্যুকে ডাকিতে লাগিলেন। গুরুর ডাক শুনিয়া উপমন্যু কূয়ার ভিতর হইতে চিৎকারপূর্বক বলিলেন,"ভগবন্, আমি কূয়ার ভিতরে পড়িয়া গিয়াছি।"

ইহাতে মহর্ষি আশ্চর্য হইয়া বলিেন, "তুমি কেমন করিয়া কূয়ায় পড়িলে?

উপমন্যু বলিলেন, "আকন্দের পাতা খাইয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, তাহাতেই কূয়ায় পড়িয়াছি।"

মহর্ষি বলিলেন, "অশ্বিনীকুমারদিগের স্তব কর; তোমার চক্ষু ভালো হইবে।

এ কথায় উপমন্যু অশ্বিনীকুমারদিগের অনেক স্তব-স্তুতি করিলে, তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমরা তোমার স্তবে অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। তাই তোমার জন্য একটি পিঠা আনিয়াছি, তুমি ইহা আহার কর।"

উপমন্যু দেবতাদিগকে প্রণামপূর্বক বিনয়ের সহিত বলিলেন, "আপাদের কথা ত অবহেলার যোগ্য নয়। কিন্তু আগে গুরুকে না দিয়া আমি কেমন করিয়া ইহা খাইব?"

অশ্বিনীকুমারের বালিলেন, "তোমার গুরুকেও একবার আমরা একটি পিষ্টক দিয়াছিলাম আর তাহা তিনি তাঁহার গুরুকে না বলিয়াই খাইয়াছিলেন, তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা

তোমার করিতে বাধা কি?”

উপমন্যু জোড়হাতে বলিলেন, ‘‘আপনাদের বিনয় করিয়া বলিতেছি, আমি গুরুকে না দিয়া পিষ্টক ভক্ষণ করিতে পারিব না।”

ইহাতে অশ্বিনীকুমারেরা আহ্লাদের সহিত বলিলেন, ‘‘আমরা তোমার গুরু ভক্তি দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। তোমার গুরুর দাঁত লোহার; তোমার দাঁত সোনার হইবে। আর, তোমার চক্ষু ত ভালো হইবেই; তাহা ছাড়াও তোমার অনেক মঙ্গল লাভ হইবে।”

এ কথা শেষ হইতে না হইতেই উপমন্যু সেই অন্ধকার কূয়ার ভিতরে সকল জিনিস অতি পরিষ্কার দেখিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে কিরূপ আনন্দ হইল, আর তিনি দেবতাদিগকে ভক্তিভরে প্রণামপূর্বক কত ধন্যবাদ দিলেন, তাহা বুঝিতে পার। ইহার পর আর সেই কূয়ার ভিতর হইতে উঠিয়া আসিতে তাঁহার কোন কষ্ট হইল না। তারপর উপমন্যু গুরুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্বক সকল কথা বলিলে, মহর্ষির আনন্দের সীমা রহিল না। তখন তিনি উপমন্যুকে অনেক আদর দেখাইয়া, এই বলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন, ‘‘অশ্বিনীকুমারেরা যেরূপ বলিয়াছেন, তোমার সেইরূপ মঙ্গল লাভ হইবে। আর, এখন হইতে বেদ আর ধর্মশাস্ত্রের কোন কথাই তোমার জানিতে বাকি থাকিবে না।”

এমনি করিয়া আয়োদধৌম্য তাঁহার শিষ্যদিগকে পরীক্ষা করিতেন। সে-কালের মুনিরা যাহাকে তাহাকে বিদ্যা দান করিতে চাহিতেন না। তাঁহারা বেশ জানিতেন যে, যথার্থ ধার্মিক লোক হইলে, সে বিদ্যা আর ধর্মের জন্য অনেক ক্লেশ সহিতে পারে। তাই তাঁহারা অনেক সময় শিষ্যদিগকে কষ্টে ফেলিয়া দেখিতেন, সে কেমন লোক, আর তাহার বাস্তবিকই শিখিবার খুব ইচ্ছা আছে কি না। তাঁহারা যদি এত অধিক কষ্ট না দিয়া, শিষ্যদিগকে পরীক্ষা করিবার কোন উপায় বাহির করিতে পারিতেন, তবে বড়ই ভালো হইত। এত কষ্ট সহিয়া গুরুকে সন্তুষ্ট করা সাধারণ ভালো লোকের কর্ম নহে। এ কষ্ট যাঁহারা একবার পাইতেন, তাঁহারা জীবনে আর তাহা ভুলিতে পারিতেন না।

বেদ

আয়োদধৌম্যের আর একটি শিষ্য ছিলেন। তাঁহার নাম বেদ। তাঁহাকেও মহর্ষি বিধিমতে ক্লেশ দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। শীতে, গ্রীষ্মে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় যতরকম কষ্ট হইতে পারে বেদের ভাগ্যে তাহার কোনটারই ক্রটি হয় নাই। তিনি হাসিমুখে সে-সকল কষ্ট সহিয়া গুরুর সেবা করিতেন, আর মনে মনে বলিতেন, ‘‘হে ভগবন্, তোমার দয়ায় যদি আমি বিদ্যালাভ করিতে পারি, আর আমার শিষ্য জোটে, তবে আমি কখনো তাহাদিগকে এমনি করিয়া কষ্ট দিব না।”

বাস্তবিকই বেদের যাহারা শিষ্য হইয়াছিল, তাহাদের মত সুখে খুব কম লোকেই গুরুর ঘরে বাস করিয়াছে। তিনি কখনো তাঁহার শিষ্যদিগকে নিজের সেবা বা অন্য কোন কাজ করিতে বলিতেন না। জনমেজয় ও পৌষ্যের মতন বড় বড় রাজারা তাঁহার শিষ্য হইয়া ছিলেন।

উতঙ্ক

বেদের আর একটি শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম উতঙ্ক। একবার বেদ উতঙ্কের উপর সংসার দেখিবার ভার দিয়া বিদেশে গেলেন। উতঙ্ক অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং ধার্মিক লোক ছিলেন। গুরু বিদেশে থাকার সময় তিনি এমন সুন্দর করিয়া তাঁহার সংসারের কাজ চালাইলেন যে, অল্প লোকেই তেমন করিতে পারে। বেদ বিদেশ হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, উতঙ্ক কোন বিষয়েই কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। বরং কোন কোন কঠিন বিষয়ে আশ্চর্যরূপ বিবেচনার সহিত কাজ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "বৎস উতঙ্ক, তোমার ব্যবহারে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক; তুমি সকল বিদ্যা লাভ করিয়া সুখে গৃহে গমন কর।"

গুরুর কথা শুনিয়া উতঙ্ক বিনয়ের সহিত বলিলেন, "ভগবন্, আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে প্রার্থনা করি। আমি শুনিয়াছি যে, বিদ্যা লাভ করিয়া দক্ষিণা না দিলে গুরুরও অনিষ্ট হয়, শিষ্যেরও অনিষ্ট হয়। অতএব, কিরূপ দক্ষিণা আনিব, অনুমতি করুন।"

বেদ বলিলেন, "আচ্ছা, আর-এক সময় বলিব।"

তারপর বেদ দক্ষিণার কথা ভুলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া উতঙ্ক আর-একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "গুরুদেব, কিরূপ দক্ষিণা আনিব অনুমতি করুন।"

বেদ সাধাসিধা মানুষ। তিনি হয়ত উতঙ্কের ব্যবহারেই যথেষ্ট দক্ষিণা পাইয়াছেন মনে করিয়াছিলেন, তাই তাহার কথা তিনি ভাবেন নাই। উতঙ্ক দক্ষিণা দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ দক্ষিণা লওয়া তাঁহার উচিৎ মনে হইল, কিন্তু কি চাহিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে বলিলেন, "তোমার উপাধ্যায়ানীকে (গুরুপত্নীকে) বল। তিনি যাহা চাহেন সেই দক্ষিণা আনিয়া দাও।"

তখন উতঙ্ক উপাধ্যায়ানীর নিকট গিয়া বলিলেন, "মা, গুরুদেব আমাকে গৃহে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন। আমি কিছু দক্ষিণা দিয়া যাইতে চাহি. অনুমতি করুন কি আনিব।"

উপধ্যায়ানী বলিলেন, "বাছা, মহারাজ পৌষ্যের রানী যে দুটি আশ্চর্য কুণ্ডল পরেন সেই কুণ্ডল দুটি আমাকে আনিয়া দাও। আর তিনদিন পরে একটা ব্রত হওয়ার কথা আছে। সেদিন খুব ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন হইবে; সেইদিন ঐ কুণ্ডল পরিয়া আমি পরিবেশন করিতে চাহি। তাহার পূর্বে কুণ্ডল আনিয়া দিতে পারিলেই তোমার মঙ্গল নচেৎ কষ্ট পাইবে।"

উতঙ্ক তখন কুণ্ডল আনিতে যাত্রা করিলেন। খানিক দূর গিয়া তিনি দেখিলেন যে, একজন অতি প্রকাণ্ড পুরুষ এক বিশাল ষাঁড়ের উপর চড়িয়া, পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রকাণ্ড পুরুষ উতঙ্ককে সেই ষাঁড়ের গোবর দেখাইয়া বলিলেন, "উতঙ্ক, তুমি উহা আহার কর।"

এ কথায় উতঙ্ক নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, "ওয়াক্! থু! আমি তাহা পারিব না।"

তাহাতে প্রকাণ্ড পুরুষ বলিলেন, "ভয় পাইও না! তুমি নিশ্চিন্তে আহার কর। তোমার গুরুও একবার উহা খাইয়াছিলেন।"

গুরু যখন পূর্বে এ কাজ করিয়াছেন, তখন ত আর উতঙ্কের তাহাতে কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না। আর সেই লোকটির বিশাল দেহ দেখিয়া তাঁহারা একটু ভ্যাবাচেকাও লাগিয়া থাকিবে! কাজেই তিনি আর বিলম্ব না করিয়া জলযোগে বসিয়া গেলেন; সে কাজ শেষ হইলে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

পৌষ্যের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, উতঙ্ক তাঁহাকে আশীর্বাদ পূর্বক কুণ্ডল চাহিলে পৌষ্য বলিলেন, "আপনি রাণীর নিকটে গিয়া উহা চাহিয়া লউন।"

এ কথায় উতঙ্ক বাড়ির ভিতরে গেলেন, কিন্তু সেখানে রাণীকে দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে তিনি আশ্চর্য হইয়া রাজার নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ আপনি বুঝি আমাকে ফাঁকি দিয়াছেন? আমি ত সেখানে রাণীকে দেখিতে পাইলাম না।"

রাজা বলিলেন, "আমি আপনাকে ফাঁকি দিই নাই। আমার রাণী এমন ধার্মিক, আর তাঁহার মন এতই পবিত্র যে, অশুচি লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। আমার বোধহয় কোন কারণে আপনি অশুচি হইয়াছেন।"

তখন উতঙ্কের মনে হইল যে, তাড়াতাড়ির ভিতে.., পথে জলযোগের পর আঁচানটা তেমন ভালো করিয়া হয় নাই। এই ভাবিয়া তিনি খুব ভালো মত আচমন করিয়া, অন্তঃপুরে যাওয়ামাত্র রাণী' ,দেখা পাইলেন।

রাণী জানিতেন, উতঙ্ক খুব সাধু লোক আর দানের উপযুক্ত পাত্র। সুতরাং উতঙ্ক চাহিবামাত্র তিনি আহ্লাদের সহিত কুণ্ডল দুটি খুলিয়া তাঁহার হাতে দিলেন, আর বলিয়া দিলেন, "খুব সাবধান হইয়া কুণ্ডল লইয়া যাইবেন। তক্ষক নাগ এ কুণ্ডল পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। যাইবার সময় সে আপনার অনিষ্ট করিতে পারে।"

উতঙ্ক বলিলেন, "কোন ভয় নাই। তক্ষক আমার কি করিবে?"

এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। অনেক দূরে পথচলার পর তিনি একটি সরোবরের ধারে উপস্থিত হইয়া, মনে মনে চিন্তা কবিলেন যে, এখন বেলাও হইয়াছে। আর সরোবরের জলও অতি পরিষ্কার; সুতরাং এইখানে স্নান আহ্নিক করিয়া লই। তারপর তিনি কুণ্ডল দুটি সরোবরের ধারে রাখিয়া সবে জলে নামিয়াছেন এমন সময় কোথা হইতে এক ক্ষপণক (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) আসিয়া সেই কুণ্ডল লইয়া ছুট দিল!

উতঙ্কও স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া প্রাণপণে চোরের পিছু পিছু ছুটিলেন, তিনি ছুটিতেও পারিতেন যেমন তেমন নয়। সোজা পথে হইলে চোরকে ধরিয়া কুণ্ডল কাড়িয়া লইতে তাঁহার কোন কষ্টই হইত না। কিন্তু সে দুষ্ট চোর যখন দেখিল যে, আর ছুটিয়া কুলাইতে পারিতেছে না, তখন সে হঠাৎ একটা সাপ হইয়া গেল। তাহার সঙ্গে যখন সেখানে একটা গর্ত দেখা দিল, আর সাপটা তাহার ভিতরে ঢুকিয়া গেল, তখন আর উতঙ্কের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ঐ সাপই তক্ষক।

এখন উপায় কি হইবে? তক্ষক পাতালে থাকে, সে সেই গর্তের ভিতর দিয়া সেখানে চলিয়া গিয়াছে। গর্ত যদি বড় হইত, তবে উতঙ্ক নিজেও তাহার ভিতর দিয়া পাতালে যাইতে পারিতেন। কিন্তু উহা এতই সরু যে, তাঁহার লাঠিটাও ভালো করিয়া তাহার ভিতরে ঢোকে না। যাহা হউক, উতঙ্কের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। গর্তটাকে বড় করিবার জন্য তিনি তাঁহার লাঠিগাছ দিয়াই প্রাণপণে খোঁচাইতে লাগিলেন।

উতঙ্কের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ইন্দ্রের বড়ই দয়া হইল। তিনি তাঁহার বজ্রকে আদেশ করিলেন, "তুমি ঐ ব্রাহ্মণের লাঠির ভিতরে ঢুকিয়া তাহার সাহায্য কর।"

বজ্র যে কখন গিয়া লাঠির ভিতরে ঢুকিয়াছে, উতঙ্ক তাহার কিছুই জানেন না। তিনি হঠাৎ একবার দেখিলেন যে, তাঁহার লাঠির এক খোঁচাতেই প্রকাণ্ড একটা গর্ত হইয়া গেল। সেই গর্তের ভিতরে ঢুকিয়া আর-এক খোঁচা মারিতেই, আরো অনেকখানি গর্ত হইয়া গেল। তারপর কি আর তিনি ছুটিয়া কুলাইতে পারেন? লাঠি সামনে ধরিয়া তিনি যতই উধর্বশ্বাসে ছোটেন, গর্ত ততই যেন আপনা আপনিই বাড়িয়া যায়, এমনি করিয়া উতঙ্ক দেখিতে দেখিতে একেবারে পাতালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার শোভার কথা কি বলিব। এমন সুন্দর বাড়ি ঘর, মঠ মন্দির, আর ঘাট আমরা কেহ কখনো দেখি নাই।

উতঙ্কের তখন শোভা দেখিবার অবসর ছিল না। তিনি কুণ্ডলের সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং সেই কুণ্ডলটি ফিরাইয়া দিবার জন্য চিৎকার পূর্বক সর্পগণের স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাপেরা কেহ তাঁহার কথায় কানই দিল না।

ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া উতঙ্ক চারিদিকে তাকাইতেছেন, এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, দুটি স্ত্রীলোক একটা তাঁতে কাপড় বুনিতেছে; সেই কাপড়ে সাদা সুতার টানা আর কালো সুতার প'ড়েন। একটা চাকায় বারটি খুঁটি, ছয়টি শিশু সেই চাকা ঘুরাইতেছে। তাহাদেব নিকট সুন্দর একটি ঘোড়াব উপবে, একজন উজ্জ্বল পুরুষ বসিয়া আছেন।

ইঁহাদিগকে দেখিয়া উতঙ্কের বড়ই আশ্চর্য বোধ হওয়াতে, তিনি ইঁহাদেব সকলেরই স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব শুনিয়া সেই উজ্জ্বল পুরুষ বলিলেন, তোমাব স্তবে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি কি চাহ?"

উতঙ্ক অমনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, যদি দয়া করিয়া সাপ গুলিকে আমার বশ করিয়া দিতে পারেন, তবে আমার বড় উপকার হয়।"

উজ্জ্বল পুরুষ বলিলেন, "আচ্ছা তুমি এই ঘোড়ার পিছনে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত ইহার গায়ে ফুঁ দিতে থাক।"

এ কথায় উতঙ্ক সেই ঘোড়ার পিছন হইতে প্রাণপণে ফুঁ দিতে আরম্ভ করিলে, তাহার শরীর হইতে রাশি রাশি ধোঁয়া, আর নাক, কান, চোখ এবং মুখ দিয়া হুস্ হুস্ শব্দে ভয়ঙ্কর আগুন বাহির হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই ঝাঁঝাল ধোঁয়া সাপদের নাক চোখ মুখের ভিতর ঢুকিয়া, তাহাদিগকে হাঁচাইয়া, কাঁদাইয়া, আর কাশাইয়া, তাহাদের দুর্দশার এক শেষ করিল। তখন আর তাহারা ঘরের ভিতরে টিকিতে না পারিয়া, যেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহিরে আসিয়াছে অমনি সেই ভয়ঙ্কর আগুন তাহাদিগকে পোড়াইতে লাগিল!

তখন তক্ষক প্রাণের ভয়ে জড়সড় হইয়া তাড়াতাড়ি কুণ্ডল হাতে উতঙ্কের নিকট আসিয়া কাশিতে কাশিতে বলিল, "ঠাকুব, এই নিন আপনার কুণ্ডল।"

উতঙ্ক কুণ্ডল পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সে আনন্দ অধিকক্ষণ রহিল না; কারণ তিনি তখনই হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, সেইদিনই তাঁহার উপধ্যায়ানীর ব্রত আরম্ভ হইবে, সুতরাং সময় থাকিতে সেখানে পৌঁছান একেবারেই অসম্ভব।

উতঙ্কের ভাবনা কথা জানিতে পারিয়া সেই উজ্জ্বল পুরুষ বলিলেন, "উতঙ্ক, তোমার কোন চিন্তা নাই, আমার এই ঘোড়ায় চড়িয়া তুমি এই মুহূর্তেই তোমাব গুরুর বাড়িতে

উপস্থিত হইতে পারিবে।”

এই কথা বলিয়া সেই দয়াবান্ উজ্জ্বল পুরুষ উতঙ্ককে তাঁহার ঘোড়ায় চড়াইয়া দিলে, তিনি চক্ষুর নিমেষে গুরুগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপাধ্যায়ানী ততক্ষণে স্নান আহ্নিক সারিয়া চুল বাঁধিতে বসিয়াছিলেন। আর উতঙ্কের বিলম্ব দেখিয়া মনে করিতে ছিলেন, ‘উহাকে শাপ দিই;এমন সময় উতঙ্ক আসিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক কুণ্ডল দিবামাত্র, তাঁহার রাগের বদলে মুখ দিয়া হাসি বাহির হইয়া গেল। তিনি অতিশয় আনন্দের সহিত উতঙ্কের হাত হইতে কুণ্ডল লইয়া বলিলেন, “ভালো আছ ত বাপ? বড় সময়ে আসিয়া দেখা দিয়াছ। আমি এখনই তামাকে শাপ দিতেছিলাম—ভাগ্যিস্ দিই নাই! এখন আশীর্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি চিরজীবী হইয়া সুখে থাক।”

এইরূপে উতঙ্ক উপাধ্যায়ানীকে সন্তুষ্ট করিয়া বেদের নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভালো আছ ত বৎস? এত বিলম্ব করিলে কেন?”

এ কথাব উত্তরে, উতঙ্ক তক্ষকের হাতে নিজের লাঞ্ছনার কথা সমস্তই গুরুকে জানাইয়া, বলিলেন, “গুরুদেব, পাতালে গিয়া আমি দেখিলাম, দুটি স্ত্রীলোক সাদা সূতায় আর কালো সূতায় কাপড় বুনিতেছে। আর ছয়টি ছেলে বারটি খুঁটি দেওয়া একখানি চাকা ঘুরাইতেছে; আর-একজন অতি উজ্জ্বল পুরুষ ঘোড়ায চডিযা আছেন। যাইবার সময় পথে এক ষাঁড়ের উপরে একজন পুরুষকে দেখিযাছিলাম। তিনি আমাকে বড়ই নোংরা জিনিস খাওয়াইলেন, আর বলিলেন, আপনাকেও নাকি তাহা খাওযাইয়াছেন। আমি ত ইঁহাদের কাহাকেও চিনিতে পারিলাম না; ইঁহাবা কে?”

বেদ বলিলেন, “বৎস, ঐ স্ত্রী লোক দুটি জীবাত্মা আর পরমাত্মা। চাকাখানি বৎসর, বারটি খুঁটি বার মাস, ছেলে ছয়টি ছয় ঋতু উজ্জ্বল পুরুষ পর্জন্য; ঘোড়াটি অগ্নি। পথে যে ষাঁড দেখিযাছ, তাহা ঐবাবত; তাহার উপরে যিনি ছিলেন, তিনি ইন্দ্র; আর তুমি যাহা খাইয়াছিলে, তাহা অমৃত। ইন্দ্র আমার বন্ধু, তাই তিনি দয়া করিয়া তোমাকে অমৃত খাওযাইয়াছিলেন; নহিলে, সাপের দেশ হইতে তোমার বাঁচিয়া আসা ভার হইত। এখন আশীর্বাদ করি, তোমাব মঙ্গল হউক, তুমি মনের সুখে ঘরে চলিয়া যাও।”

গুরুকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া উতঙ্ক তাঁহার নিকট বিদায় হইলেন, কিন্তু তিনি দেশে না গিয়া, গেলেন সটান হস্তিনায়, জনমেজয়ের কাছে। তক্ষকের উপর তাঁহার যে খুবই রাগ হইয়াছিল, এ কথা কেহ না বলিয়া দিলেও আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারিতাম। সেই দুষ্ট তক্ষককে সাজা দিবার জন্যই, তাঁহার জনমেজয়ের নিকট যাওয়া। তাহার ফল কি হইয়াছিল তাহা আমরা জানি।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কথা

মহামুনি বশিষ্ট ব্রহ্মার পুত্র। ধর্ম আর ক্ষমাগুণে তাঁহার সমান কেহই ছিল না। তাঁহার ক্ষমার কথা শুনিলে পুণ্যলাভ হয়। কান্যকুব্জ দেশে কুশিক নামে এক রাজা ছিলেন। কুশিকের পুত্র গাধি; গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র।

একদিন বিশ্বামিত্র পাত্রমিত্র সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিবার নিমিত্ত এক গভীর বনের ভিতরে

প্রবেশ করিলেন। অনেক শূকর আর হরিণ বধ হইলে, তাহাতে রাজারও নিতান্ত পরিশ্রম আর পিপাসা হইল। নিকটে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল; জল খাইবার জন্য রাজা সেই আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজাকে পরম সমাদরপূর্বক বসিতে আসন দিয়া, মহামুনি মিষ্ট বাক্যে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করতঃ কহিলেন, "মহারাজ, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আমাকে তুষ্ট করুন।"

জলযোগের আয়োজন ভালো করিয়াই হইল। বশিষ্ঠের ধন জন ছিল না; তাঁহার ছিল কেবল নন্দিনী নামে একটি আশ্চর্য গরু। গাইটি অতি সুন্দরী। পাঁচ হাত চওড়া; ছয় হাত উঁচু; চক্ষু দুটি ব্যাঙের ন্যায়; শরীরটি নধর; পা চারিখানি অতি নিটোল; লেজটি আর শিং দুটি বড়ই চমৎকার; আর বাঁটগুলি যেন অমৃতের ভাণ্ড। মুনি যাহা চাহিতেন, নন্দিনীর নিকট তাহাই পাইতেন।

রাজার জলযোগের কথা শুনিয়া নন্দিনী দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর, মিঠাই, মণ্ডায় হাজার হাজার হাঁড়ি পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন; মহামূল্য বস্ত্র আর অলঙ্কার সিন্দুকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। রাজা পাত্রমিত্র সহিত পরিতোষপূর্বক ভোজন করিয়া, মনে ভাবিলেন, 'একি আশ্চর্য ব্যাপার।

গরুটিকে বারবার দেখিয়াও রাজার সাধ মিটিল না; তিনি মুনিকে বলিলেন, "ঠাকুর, আমি দশকোটি গরু, আর আমার সমুদয় রাজ্য দিতেছি; আপনার গাইটি আমাকে দিন।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজ, নন্দিনী আমার সকল ধর্মকর্মের একমাত্র উপায়; আমি নন্দিনীকে দিতে পারিব না।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন. "আপনি সহজে না দিলে, আমি জোর করিয়া গাই লইয়া যাইব।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "আপনার বল বিক্রম অনেক আছে; আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন।"

রাজার লোকজন অনেক ছিল; তাহারা আজ্ঞামাত্র নন্দিনীকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। নন্দিনী মুহূর্তের মধ্যে সেই বাঁধন ছিঁড়িয়া, তাহাদের শত প্রহার সত্ত্বেও হাম্বা হাম্বা শব্দে বশিষ্ঠের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজার লোকেরা তাড়া খাইয়াও তিনি আশ্রম ছাড়িলেন না। তাহা দেখিয়া বশিষ্ঠ নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, "মা, তোমার কাতর হাম্বারব শুনিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে। কিন্তু বিশ্বামিত্র তোমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছে আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, কি করিব?"

নন্দিনী বলিলেন, "ভগবন্, রাজার লোকেদের নিষ্ঠুর প্রহারে অনাথার ন্যায় কাতর ভাবে কাঁদিতেছি, এমন সময় কেন আপনি আমার দিকে চাহিতেছেন না?"

বশিষ্ঠ অনেক কষ্টে স্থির থাকিয়া বলিলেন, "মা ক্ষত্রিয়ের বল তেজ, আর ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা। সুতরাং আমি কি করিতে পারি? তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তুমি যাও।"

নন্দিনী বলিলেন, "হে ভগবন্, আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ না করেন, তবে কেহই জোর করিয়া আমাকে নিতে পারিবে না।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "মা, আমি কি ইচ্ছা করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি? তোমার যদি ক্ষমতা থাকে, তবে আমার কাছেই থাক। ঐ দেখ, তোমার বাছুরটিকে বাঁধিয়া নিতেছে!"

তখন রাগে নন্দিনীর দুই চোখ লাল হইয়া উঠিল; আর তিনি অতি ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ

পূর্বক, ঘাড় উঁচু করিয়া শিং নাড়িতে নাড়িতে , ঘোরতর হাম্বা হাম্বা শব্দে রাজার সৈন্যদিগকে তাড়া করিলেন। তাহারা তাঁহাকে আটকাইবার জন্য কত চেষ্টা করিল, লাঠি দিয়া তাঁহাকে কতই মারিল; কিন্তু তাহাতে কাতর হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাঁহার রাগ শতগুণে বাড়িয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার শরীর সূর্যের ন্যায় জ্বলিতেছিল। আর তাহার ভিতর হইতে পহ্লব, দ্রাবিড়, শক, যবন, কিরাত, কাঞ্চী, শরভ, পৌণ্ড্র, সিংহল, বর্বর, বশ, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, কেরল প্রভৃতি অসংখ্য জাতীয় বিকটাকার সৈন্য কত যে বাহির হইতেছিল, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। তাহাদের কাহারো ঝাঁটার মতন গোঁফ দাড়ি; কাহারো নেড়া মাথায় লম্বা টিকি, কাহারো গায়ে মুখে বিচিত্র উল্কি; কাহারো ঝাঁকড়া চুলে পালক গোঁজা; কেহ ঝোল্লা পরা পাগড়ি আঁটা।

এই-সকল সৈন্য বিশ্বমিত্রের লোকদের কোন অনিষ্ট করিল না। কিন্তু ইহাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্র, ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি, বিষম দাঁতখিঁচুনি আর উৎকট গর্জনের ভয়েই সে বেচারারা প্রাণভয়ে পিতামাতার নাম লইয়া পলায়ন করিল। নন্দিনীর সৈন্যেরা তাহাদিগকে অনেক দূর অবধি তাড়া করিয়াছিল, কিন্তু দয়া করিয়া তাহাদের একটিরও প্রাণ বধ করে নাই।

এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া বিশ্বামিত্রের মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল।

তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, ক্ষত্রিয়ের বল কিছুই নহে, ব্রাহ্মণের বলই যথার্থ বল; তপস্বীরা তপস্যা দ্বারা যাহা করিতে পারেন, রাজা তাঁহার রাজ্য, সম্মান, ধন জন লইয়া তাহার কিছুই করিতে পারেন না।

এইরূপ চিন্তায় রাজ্য আর ধনের উপরে বিশ্বামিত্রের এতই ঘৃণা জন্মিয়া গেল যে, তিনি চিরদিনের মত তাহা পরিত্যাগপূর্বক বনে গিয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সে যে কি কঠোর তপস্যা, তাহা আমি কি বলিব? তেমন তপস্যা আর কেহ করিয়াছে কি না সন্দেহ। এই তপস্যার জোরে শেষে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন।

ইহার পর হইতে বিশ্বামিত্র খুব বড় একজন মুনি হইলেন, আর তখন হইতেই নানা উপায়ে বশিষ্ঠকে ক্লেশ দিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্রের তপস্যার বল অসাধারণ ছিল, আর বশিষ্ঠকে তিনি যে দুঃখ দিয়াছিলেন, তাহাও অসাধারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সরস্বতী নদীর তীরে স্থানু নামক তীর্থ। সেই তীর্থের নিকটে সরস্বতীর পূর্বাধারে বশিষ্ঠের ও পশ্চিম কূলে বিশ্বামিত্রের আশ্রম। বশিষ্ঠ সরস্বতীর তীরে বসিয়া তপস্যা করেন, সেই আশ্চর্য তপস্যা দেখিয়া বিশ্বামিত্রের বড়ই হিংসা হয়। একদিন বিশ্বামিত্র মনে ভাবিলেন, "বশিষ্ঠ যখন নদীর ধারে বসিয়া জপ করে, তখন এই নদীকে দিয়া উহাকে আমার নিকট আনাইয়া, উহার প্রাণ বধ করিব।"

এই মনে করিয়া তিনি অতিশয় ক্রোধ ভরে নদীকে স্মরণ করিবামাত্র, নদী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া করজোড়ে বলিলেন, "ভগবন্, আমাকে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন।"

বিশ্বামিত্র ভ্রূকুটি করিয়া রাগের সহিত বলিলেন, "শীঘ্র বশিষ্ঠকে এইখানে লইয়া আইস; আমি তাহাকে বধ করিব।"

এ কথা শুনিয়া সরস্বতী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই; শীঘ্র বশিষ্ঠকে এখানে লইয়া আইস।"

সরস্বতী তখন কাঁপিতে কাঁপিতে বশিষ্ঠের নিকট গিয়া নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, "ভগবন্, বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রোধভরে আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে হইবে। এখন উপায় কি হয়?"

সরস্বতীর মুখ মলিন দেখিয়া বশিষ্টের বড়ই দয়া হইল; তিনি বলিলেন, "মা তুমি কোন চিন্তা করিও না; এখনই আমাকে বিশ্বামিত্রের নিকট লইয়া যাও। নহিলে তিনি তোমাকে শাপ দিবেন।"

সরস্বতী ভাবিলেন, "এমনি লোকের অনিষ্ট আমি করিতে পারিব না আমি বিশ্বামিত্রের কথাও রাখিব, বশিষ্টকেও বাঁচাইব।"

তারপর বশিষ্ঠ নদীর কুলে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। সরস্বতী মনে করিলেন, এই আমার সুযোগ; এই বেলা কূল ভাঙ্গিয়া দেই।"

নদীর বেগে বশিষ্ঠকে সুদ্ধ কুল ভাঙ্গিয়া পড়িল; নদীর খরতর স্রোত তাহাকে বহিয়া, দেখিতে দেখিতে বিশ্বামিত্রের ঘাটে উপস্থিত করিল। তাহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, 'এখন ইহাকে বধ করি।'

এই মনে করিয়া বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে মারিবার জন্য অস্ত্র খুঁজিতে গেলেন। এদিকে সরস্বতী দেখিলেন যে, বিশ্বামিত্রের কথা রাখা হইয়াছে; এখন বশিষ্ঠকে রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত। সুতরাং তিনি বিশ্বামিত্র ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই, তাড়াতাড়ি বশিষ্ঠকে অপর পারে দিয়া আসিলেন।

বিশ্বামিত্র অস্ত্র হাতে আসিয়া যখন দেখিলেন, বশিষ্ঠ নাই, তখন তিনি রাগে চোখ লাল করিয়া সরস্বতীকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, "তোর জল রক্ত হইয়া যাউক!"

অমনি সরস্বতীর জল রক্ত হইয়া গেল, আর রাক্ষসেরা আসিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাহা পান করিতে লাগিল।

এইরূপে দিন যায়। এক বৎসর পরে কয়েকজন তপস্বী সেই তীর্থে স্নান করিতে আসিয়া দেখিলেন, নদীতে রক্তধারা বহিতেছে। ইহাতে তাঁহারা নিতান্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সরস্বতি! তোমার এমন দশা কি করিয়া হইল?"

সরস্বতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বিশ্বামিত্রের শাপে আমার এই দশা হইয়াছে।"

এই বলিয়া তিনি তপস্বীদিগকে সকল কথা জানাইলে, তাঁহারা বলিলেন, "এমন কথা? আচ্ছা মা, আমরা তোমার দুঃখ দূর করিয়া দিব।"

তারপর সেই দয়ালু তপস্বীগণ সকলে মিলিয়া শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন, এবং মহাদেব তুষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইলে, তাঁহারা বলিলেন, "ভগবন্, দয়া করিয়া এই নদীর দুঃখ দূর করুন।"

এ কথায় মহাদেব তথাস্তু বলিবামাত্র, সরস্বতীর আবার পূর্বের ন্যায় সুমিষ্ট নির্মল জল হইল।

বশিষ্ঠের একশত পুত্র ছিলেন, তাঁহাদের সকলের বড়টির নাম ছিল শক্তি। একবার কল্মাষপাদ নামক অযোধ্যার এক রাজার সহিত শক্তির বিবাদ হইল। রাজা রথে চড়িয়া যাইতেছিলেন, শক্তি পথের মাঝখানে ছিলেন। রাজা শক্তিকে বলিলেন, "এইয়ো! পথ ছাড়িয়া দাও!"

শক্তি মিষ্টভাবে বলিলেন, "মহারাজ! এ ত আমারই পথ; কেন না, শাস্ত্রে আছে, রাজা সকলের আগে ব্রাহ্মণদিগকে পথ ছাড়িয়া দিবেন।"

এইরূপে দুজনে পথ লইয়া এমনি তর্ক আরম্ভ হইল যে, শেষে রাজা রাগে অস্থির হইয়া শক্তিকে চাবুক মারিতে লাগিলেন। ইহাতে শক্তিও ক্রোধভরে রাজাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, "তুমি যেমন রাক্ষসের মত ব্যবহার করিতেছ, তেমনি তুমি রাক্ষসই হও।"

সেইখান দিয়া তখন বিশ্বামিত্রও যাইতেছিলেন, এবং আড়ালে থাকিয়া শক্তি আর কল্মাষপাদের কলহ দেখিতেছিলেন। শক্তি কল্মাষপাদকে 'রাক্ষস হও' বলিয়া শাপ দিবামাত্র বিশ্বামিত্র কিঙ্কর নামক একটি রাক্ষসকে সেখানে দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে কল্মাষপাদের শরীরে ঢুকাইয়া দিলেন।

কল্মাষপাদ শক্তির শাপে ভয় পাইয়া বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময় রাক্ষস তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করাতে হঠাৎ তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গেল। তখন তিনি আর ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া, সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট মাংস চাহিলেন, রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "একটু বসুন, মাংস আনিতেছি।"

বাড়ি আসিয়া রাজার সমস্ত দিনের ভিতরে এ কথা মনেই হইল না। দুই প্রহর রাত্রিতে হঠাৎ তাঁহার চৈতন্য হইলে, তিনি তাড়াতাড়ি পাচককে ডাকিয়া ব্রাহ্মণের নিকট মাংস ভাত পাঠাইতে বলিলেন। কিন্তু চাকর অনেক খুঁজিয়াও মাংস পাইল না। রাজার ভিতরে রাক্ষস; তাঁহার বুদ্ধিসুদ্ধিও এতক্ষণে রাক্ষসের মতই হইয়া গিয়াছে। তাই তিনি পাচককে ধমক দিয়া বলিলেন, "কেন? শ্মশানে কত মানুষ পড়িয়া আছে, তাহার মাংস আনিয়া রাঁধ না।" পাচক রাজার আজ্ঞায় তাহাই করিল; আর সেই মানুষের মাংসের ব্যঞ্জন আর ভাত ব্রাহ্মণের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণ অতিশয় তেজীয়ান তপস্বী ছিলেন, তিনি সেই মাংস দেখিবামাত্র সকল কথা জানিতে পারিয়া "রাক্ষস হও" বলিয়া রাজাকে শাপ দিলেন।

শক্তির শাপেই রাজার স্বভাব ক্রমে রাক্ষসের মত হইয়া আসিতেছিল। তাহার উপর ব্রাহ্মণ এইরূপ শাপ দেওয়াতে রাজা একেবারেই ক্ষেপিয়া গিয়া দাঁত-কড়মড় করিতে করিতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। খানিক দূরে গিয়াই তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে, শক্তি! অমনি আর কথাবার্তা নাই—"তবে রে বামুন, তুই-ই না আমাকে রাক্ষস হইতে বলিয়াছিলি? আয় তোকেই আগে খাই!" এই বলিয়া তিনি মুহূর্তের মধ্যে শক্তির ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে খাইয়া ফেলিলেন।

বিশ্বামিত্র যে রাজার দেহে রাক্ষস প্রবেশ করাইয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন এমন নহে। তিনি ক্রমাগতই সংবাদ লইতে ছিলেন, ইহার পর কি হয়। যেই তিনি দেখিলেন, রাজা শক্তিকে খাইয়াছেন, অমনি তিনি বশিষ্ঠের আর নিরানব্বইটি পুত্রকেও খাইবার জন্য সেই রাক্ষসকে লেলাইয়া দিলেন। সিংহ যেমন শিকার ধরিয়া খায়, মুনির ইঙ্গিত পাইবামাত্র রাক্ষস সেইরূপ করিয়া শক্তির নিরপরাধ ভাই গুলিকে একে একে চিবাইয়া খাইল।

এই দারুণ সংবাদ যখন বশিষ্ঠদেব শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি সামান্য মানুষের ন্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন না। শোক ত তাঁহার হইয়াছিলই, সে শোকের আমরা কি বুঝিব? কিন্তু এমন শোক পাইয়াও তিনি এমন কথা বলিলেন না, 'আমার শত্রুর কোনরূপ অনিষ্ট হউক।' অথচ তিনি ইচ্ছা করিলেই বিশ্বামিত্রকে সবংশে সংহার করিতে পারিতেন। এমন ক্ষমতা

তাঁহার ছিল।

সেই ভীষণ শোকের আগুনে পুড়িয়া বশিষ্ঠদেবের হৃদয় যেন একেবারে ছাই হইয়া গেল, ইহার পর আর এই অন্ধকার, শূন্য সংসারে একদিনও বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। দেহ ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া তিনি মেরু পর্বতের চূড়া হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। কিন্তু এমন মহাপুরুষের এভাবে মৃত্যু হয়, ইহা ভগবানের ইচ্ছা ছিল না। তিনি বশিষ্ঠের দেহ তুলার মত হাল্‌কা করিয়া দিলেন, আর বশিষ্ঠ তুলার মত হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে অতিশয় আরামের সহিত আস্তে আস্তে নামিয়া আসিলেন।

দেহে একটি আঘাত বা আঁচড় পর্যন্ত লাগিল না। মৃত্যু কেমন করিয়া হইবে? তখন বশিষ্ঠদেব ভাবিলেন, 'ঐ বনের ভিতরে প্রচণ্ড দাবানল জ্বলিতেছে, উহাতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব!'

বশিষ্ঠদেব ছুটিয়া আগুনের ভিতরে গেলেন। কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাহার পূর্বেই আগুন হিমের ন্যায় শীতল হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে বশিষ্ঠের দেহ পুড়িল না। এইরূপে বশিষ্ঠদেব কোন মতেই মরিতে না পারিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু সেই শ্মশানের মত শূন্য আশ্রম দেখিবামাত্র, তাঁহার প্রাণত্যাগের ইচ্ছা দ্বিগুন বাড়িয়া উঠিল, তিনি আবার সেখান হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন।

বর্ষাকাল, নদীতে বান ডাকিয়াছে, জলের স্রোতে গাছ পাথর সকল ভাঙ্গিয়া কল্ কল্ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। বশিষ্ঠ ভাবিলেন, 'এই নদীতে ঝাঁপ দিয়া মরিব।' এই মনে করিয়া তিনি নিজের হাত পা বাঁধিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কিন্তু নদী তাঁহাকে তল না করিয়া, পরম যত্নে তীরের দিকে লইয়া চলিল, খরতর স্রোত তাঁহার পাশ (অর্থাৎ বাঁধন) কাটিয়া দিল। তাই মহর্ষি তীরে উঠিয়া নদীর নাম রাখিলেন 'বিপাশা'।

তারপর 'হায়! আমার কি কিছুতেই মৃত্যু হইবে না?' বলিয়া বশিষ্ঠদেব সংসারময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে তিনি অতি ভয়ঙ্কর কুম্ভীর পরিপূর্ণ হৈমবতী নদীর তীরে আসিয়া মনে করিলেন, 'ইহার জলে নামিলে নিশ্চয়ই কুমিরেরা আমাকে সংহার করিবে।'

কিন্তু সেই মহাপুরুষ নিকটে আসিবামাত্রই নদী শতভাগ হইয়া পলায়ন করিল। তাঁহার প্রাণত্যাগ করা হইল না। এইজন্য এখনো লোকে সেই নদীকে 'শতদ্রু' বলিয়া থাকে।

তখন বশিষ্ঠ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু হওয়া ভগবানের ইচ্ছা নহে, সুতরাং তিনি আশ্রমের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। এমন সময় তাঁহার পুত্রবধূ (শক্তির স্ত্রী) অদৃশ্যন্তী দেবীও তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া পিছন হইতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠদেব সে কথা জানিতে পারেন নাই। তাহার মনে হইল যেন, কেহ তাঁহার পিছন হইতে অতি চমৎকারভাবে বেদ পাঠ করিতেছে। ইহাতে মহর্ষি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে, আমার পশ্চাতে আসিতেছ?'

অদৃশ্যন্তী বলিলেন, 'ভগবন্, আমি তপস্বিনী অদৃশ্যন্তী, আপনার পুত্রবধূ।'

মহর্ষি বলিলেন, 'মা, এমন সুন্দর করিয়া কে বেদ পাঠ করিতেছে? আহা, আমার শক্তির মুখে যেমন শুনিতাম, মনে হইতেছে যেন ঠিক সেইরূপ।'

অদৃশ্যন্তী বলিলেন, 'বাবা, এটি আপনার নাতি, জন্মিবার পূর্বেই সে বেদ পড়িতে শিখিয়াছে।'

এমন নাতির কথা শুনিয়া স্নেহে এবং আনন্দে বশিষ্ঠের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সংসারে এখনো তাঁহার অনেক কর্তব্য রহিয়াছে, তাহার জন্য তাঁহার বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন। সুতরাং তিনি পরম স্নেহে অদৃশ্যন্তীকে সঙ্গে লইয়া, তাড়াতাড়ি আশ্রমের দিকে চলিলেন।

পথে একটা গভীর বন। সেই বনের ভিতরে রাক্ষস রাজা কল্মাষপাদ শুইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ আর অদৃশ্যন্তীকে দেখিয়াই রাক্ষস তাঁহাদিগকে খাইবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ইহাতে অদৃশ্যন্তী বড়ই ভয় পাইতেছেন দেখিয়া, বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন, 'মা, কোন ভয় নাই।'

এই বলিয়া তিনি রাক্ষসকে এক ধমক দিবামাত্র, সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর তিনি মন্ত্র পড়িতে পড়িতে তাহার গায় খানিকটা জল ছড়াইয়া দিতেই, তাহার শাপ দূর হইয়া গেল।

এইরূপে শাপ হইতে রক্ষা পাইয়া, কল্মাষপাদ যার পর নাই ভক্তি এবং বিনয়ের সহিত বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলে, বশিষ্ঠ বলিলেন, 'মহারাজ, এখন রাজধানীতে গিয়া রাজ্য শাসন কর, আর কখনো ব্রাহ্মণের অপমান করিও না।'

রাজা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 'ভগবন্, আমি আর কখনো এমন কাজ করিব না।'

তারপর কল্মাষপাদ অনেক মিনতি করিয়া বশিষ্ঠকে অযোধ্যায় লইয়া গেলেন। সেখানকার লোকেরা মহর্ষির যে কত সম্মান, কত স্তব স্তুতি করিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

পরাশর

বশিষ্ঠদেব তাঁহার পৌত্রটির নাম পরাশর রাখিলেন। পরাশর পিতাকে চক্ষে দেখেন নাই, তিনি মনে করিতেন, বুঝি বশিষ্ঠই তাঁহার পিতা। জন্মাবধি তিনি বশিষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন, আর তাঁহাকেই পিতা বলিয়া ডাকিতেন।

পরাশর যখনই বশিষ্ঠকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন, তখনই শক্তির কথা মনে হইয়া অদৃশ্যন্তীর চক্ষে জল পড়িত। একদিন তিনি পরাশরকে কোলে লইয়া, তাঁহার মুখে চুমো খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'বাছা, আমার শ্বশুর ত তোমার পিতা নহেন, তিনি তোমার পিতামহ।'

পরাশর তাঁহার উজ্জ্বল চোখ দুটি বড় করিয়া মার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'তবে আমার পিতা কোথায় গিয়াছেন?'

অদৃশ্যন্তী অনেক কষ্টে স্থির থাকিয়া বলিলেন, 'তিনি স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।' এ কথায় পরাশর বলিলেন, 'মানুষ ত মরিয়া গেলেই স্বর্গে যায়, আমার পিতা কি করিয়া মরিয়া গেলেন?'

অদৃশ্যন্তী বলিলেন, 'এক রাক্ষস তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল।'

পিতার এমনভাবে মৃত্যু হইয়াছিল, এ কথা শুনিয়া পরাশর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, 'আমি সৃষ্টি নষ্ট করিব।'

পরাশর বালক হইলেও, তিনি সাধারণ বালক ছিলেন না। জন্মিবার পূর্বেই তিনি সকল শাস্ত্র মুখস্থ করিয়া ফেলেন, আর জন্মিবামাত্রই অদ্বিতীয় তপস্বী হইয়া উঠেন। সুতরাং তাঁহার মুখে এ কথা শুনিয়া বশিষ্ঠদেবের বড়ই চিন্তা হইল। তাই তিনি পরাশরকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, 'বৎস, তুমি এমন কাজ করিও না।'

বশিষ্ঠদেবের কথায় পরাশর সৃষ্টিনাশ করিবার প্রতিজ্ঞা ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু রাক্ষসদিগের উপর তাঁহার বড়ই রাগ রহিয়া গেল। সেই রাগে তিনি রাক্ষস মারিবার জন্য এমন ভয়ঙ্কর এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন যে, তেমন যজ্ঞ আর কেহ কখনো দেখেন নাই। ইহাতে বশিষ্ঠদেব দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু বারবার পরাশরের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা অনুচিত মনে করিয়া, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

এদিকে যজ্ঞ ভূমিতে প্রকাণ্ড তিন কুণ্ডে ঘোর শব্দে আগুন জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার আলোকে স্বর্গ মর্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রাক্ষসেরা যে যেখানে আছে, সেই আগুনে আহুতি পড়িবামাত্র আর কোথাও তাহারা স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। পাহাড় পর্বত আঁকড়াইয়াও তাহাদের রক্ষা নাই, সে ভীষণ আগুন তাহা সুদ্ধই তাহাদিগকে টানিয়া আনিতেছে।

বনের ভিতর হইতে, পর্বতের গুহা হইতে, এমন-কি, পাতাল হইতেও দলে দলে বিকটাকার রাক্ষস, ঘন ঘন চিৎকার পূর্বক প্রাণপণে মাটি আঁকড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে করিতে, পিছন বাগে আসিয়া আগুনে পুড়িতে লাগিল। এরূপভাবে অধিকক্ষণ চলিলে আর পৃথিবীতে একটি রাক্ষসও থাকিবে না, ইহা দেখিয়া রাক্ষসদিগের পূর্বপুরুষ মহর্ষি পুলস্ত্যের মনে বড়ই কষ্ট হইল। এজন্য তিনি পুলহ, ক্রতু আর মহাক্রতু এই তিনজন মুনিকে সঙ্গে করিয়া, পরাশরের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'বৎস, এ-সকল রাক্ষসের ত কোন দোষ নাই, ইহাদিগকে বধ করা তোমার উচিত হইতেছে না। তোমার পিতা তাঁর ভাইদিগের সহিত স্বর্গে গিয়া পরম সুখে আছেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর জন্য তোমার ক্রোধ করারও কোন কারণ নাই। তাই বলিতেছি, বৎস, আর যজ্ঞ করিয়া কাজ কি? উহা শেষ করিয়া দাও।'

তখন বশিষ্ঠদেবও পুলস্ত্যের পক্ষ হইয়া পরাশরকে যজ্ঞ শেষ করিতে বলায়, পরাশর আর তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। এইরূপে রাক্ষসদিগের বিপদ কাটিয়া গেল।

পরাশর তাঁহার যজ্ঞ শেষ করিয়া, তাহার আগুন হিমালয় পর্বতে গিয়া ফেলিয়াছিলেন। আজও সে আগুনকে মাঝে মাঝে পর্বতের গায় জ্বলিতে দেখা যায়।

ঔর্ব

এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল কৃতবীর্য, আর এক মুনি ছিলেন, তাঁরা নাম ভৃগু। ভৃগুর বংশের লোকেরা কৃতবীর্যের বংশের রাজাদিগের পুরোহিতের কার্য করিতেন।

সে কালের রাজারা তাঁহাদের পুরোহিতদিগকে অনেক ধন দান করিতেন। ভৃগু বংশের লোকেরা পুরোহিতের কাজ করিয়া এমনই ধনী হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ঘরে যে কত কোটি টাকা ছিল, তাহা কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারিত না।

একবার রাজাদিগের একটা কাজের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন হইল। এত টাকা

তাঁহাদের ঘরে না থাকায়, তাঁহারা ভার্গব (ভৃগু বংশের লোক) দিগের নিকট টাকা চাহিতে গেলেন। রাজাদিগকে টাকা দিতে ভার্গবদের ইচ্ছা ছিল না। নিতান্ত রাজাদের খাতিরে কেহ কেহ টাকা দিলেন বটে, কিন্তু অনেকেই তাঁহাদের টাকা পুঁতিয়া ফেলিলেন।

ইহার মধ্যে একজন ক্ষত্রিয় গিয়া কেমন করিয়া সেই টাকা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। সে টাকা তুলিতে তুলিতে প্রকাণ্ড পাহাড় হইয়া গেল, আর ক্ষত্রিয়েরা আশ্চর্য হইয়া তাহা দেখিতে আসিল।

এ-সকল ঘটনায় ভার্গবেরা যে নিতান্ত বিরক্ত হইলেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই। এজন্য তাঁহারা ক্ষত্রিয়দিকের বিস্তর কটু কথা কহিলেন, আর তাহাদের অনেককে বিধিমতে অপমান করিতেও ছাড়িলেন না।

ইহাতে ক্ষত্রিয়েরা সকলে রাগে অস্থির হইয়া, ধনুর্বাণ হাতে ভার্গবদিগকে আক্রমণ করিল। দেখিতে দেখিতে তাহাদের হাতে ভার্গবদিকের সকলেই প্রাণত্যাগ করিলেন, মার কোলের শিশুরা পর্যন্ত রক্ষা পাইল না। ইহাতেও কি নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয়গণের রাগ থামিল? ইহার পর তাহারা দেশ বিদেশে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল, ভার্গবদিগের কে কোথায় পলায়ন করিয়াছে।

ভার্গবদিগের মৃত্যুর পর, তাঁহাদের স্ত্রীসকল ক্ষত্রিয়ের ভয়ে হিমালয়ে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। ইঁহাদের একজন নিজের নিতান্ত শিশু পুত্রটিকে, অতি আশ্চর্য উপায়ে গোপন করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা তাহা জানিতে পারিয়া, সেই শিশুর প্রাণবধ করিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশুটি অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন। ক্ষত্রিয়দিগের আস্পর্দ্ধা দেখিয়া তিনি ক্রোধভরে মায়ের নিকট হইতে বাহিরে আসিবামাত্র, দুরাচারগণ অন্ধ হইয়া গেল! তখন আর তাহাদের দুর্গতির অবধি রহিল না। বিশাল পর্বতের ভয়ঙ্কর খানা-খন্দের ভিতরে তাহারা না পাইল পথ, না করিতে পারিল আহারের আয়োজন। এইরূপে তাহারা নাকালের একশেষ হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে জোড়হাতে সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিল, 'মা! আমরা যেমন দুরাচার, তেমনি আমাদের উচিত সাজা হইয়াছে। আর কখনো আমরা এমন কর্ম করিব না। এখন দয়া করিয়া আমাদের চক্ষু দিয়া দিন, আমরা দেশে ফিরিয়া যাই।'

ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'বাছাসকল, আমি ত জানিয়া শুনিয়া তোমাদের কিছু করি নাই। বোধহয় আমার এই ছেলেটির ক্রোধেই তোমাদের ওরূপ দশা হইয়া থাকিবে। এই শিশু অতি মহাপুরুষ, জন্মিবার পূর্বেই সকল বেদ শিক্ষা করিয়াছে। তোমরা ইহাকেই তুষ্ট কর, তোমাদের চক্ষু ভাল হইবে।'

এ কথায় তাহারা সে ছেলেটির নিকট হাত জোড় করিয়া বলিল, 'ভগবন্, আমাদিগকে দয়া করুন, আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।'

তখন সেই শিশু ক্ষত্রিয়গণের চক্ষু ভাল করিয়া দিলে, তাহারা লজ্জিতভাবে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

সেই ছেলেটির নাম ছিল ঔর্ব। সে যাত্রা ক্ষত্রিয়দিগকে তিনি ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু উহারা যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার আত্মীয়দিগকে বধ করিয়াছিল, সে কষ্ট তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। মনের দুঃখ কোনরূপে দূর করিতে না পারিয়া, তিনি সৃষ্টি বিনাশ করিবার জন্য ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেই আশ্চর্য তপস্যার তেজ দেবতাদিগের সহ্য করা কঠিন হইল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া ঔর্বের পূর্বপুরুষগণ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'বৎস, আমরা তোমার তপস্যার বল দেখিয়া আশ্চর্য এবং আনন্দিত হইয়াছি। এখন তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর। আমরা ক্রোধের বশ নহি, সুতরাং তুমি যাহা করিতে যাইতেছ, তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। ইহাতে তোমার তপস্যার হানি হইবে, তুমি শীঘ্র এ কাজ ছাড়িয়া দাও।'

ঔর্ব কহিলেন, 'হে পিতৃগণ! আপনাদের আজ্ঞা পাইয়াও ত আমি রাগ দূর করিতে পারিতেছি না। ক্ষত্রিয়েরা যখন আপনাদিগকে বধ করে, তখন আমি মাতৃগণের ক্রন্দন শুনিয়াছিলাম। সে সময়ে আপনারা প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া, এই পৃথিবীতে কোথাও আশ্রয় পান নাই। এখন সেই-সকল কথা স্মরণ করিয়া, রাগে আমার প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে। আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, আমার সে রাগ এখন যথার্থই আগুন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ আগুন আমি কোথায় ফেলি, আপনারা তাহা বলিয়া দিন।'

পিতৃগণ বলিলেন, 'বৎস, তোমার এই ভীষণ রাগের আগুন তুমি সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দাও।'

এ কথায় ঔর্ব সেই অদ্ভুত আগুন সমুদ্রের জলে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। জলে পড়িয়া তাহা অতি বিশাল এবং ভীষণ ঘোড়ার মুখের আকার ধারণ করিল। সেই ঘোড়ার মুখ দিয়া না কি এখনো আগুন বাহির হয়। যাহাকে বাড়বানল বলে, তাহা ঔর্বের সেই রাগের আগুন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অষ্টাবক্র

মহর্ষি উদ্দালকের শ্বেতকেতু নামে একটি পুত্র, সুজাতা নামে একটি কন্যা, আর কহোড় নামে একটি শিষ্য ছিলেন। গুরুর প্রতি কহোড়ের বড়ই ভক্তি, এবং তাঁহার সেবায় যার পর নাই যত্ন ছিল। তাহাতে উদ্দালক অতিশয় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সকল বিদ্যা প্রদানপূর্বক সুজাতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

কহোড়ের যে পুত্র হইল, সে বড়ই আশ্চর্য লোক। জন্মিবার পূর্বেই সে তাহার পিতার ভুল ধরিয়াছিল। একদিন সে কহোড়কে বলিল, 'বাবা, তুমি সকল রাত জাগিয়া পড়, কিন্তু তোমার পড়া ঠিক হয় না।' সে সময়ে কহোড়ের শিষ্যগণ সেইখানে উপস্থিত থাকায়, সেই শিশুর কথায় তাঁহার নিতান্তই লজ্জাবোধ হইল। সুতরাং তিনি শিশুটিকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, 'যেহেতু তুমি আমার এইরূপ অপমান করিলে, অতএব তোমার শরীরের আটটি স্থান বাঁকা হইবে!'

পিতার শাপে ছেলেটি এইরূপ বাঁকা হইয়া জন্মগ্রহণ করাতে, তাঁহার 'অষ্টাবক্র' নাম রাখা হয়। জন্মের পর অষ্টাবক্র তাঁরা পিতাকে দেখিতে পান নাই, কারণ তাহার পূর্বেই কহোড়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

কহোড় অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন বলিয়া, সুজাতার নানারূপ ক্লেশ হইত। ইহাতে কহোড় দুঃখিত হইয়া মিথিলার রাজা জনকের নিকট কিছু টাকা ভিক্ষা করিতে গেলেন। জনকের সভায় বন্দী নামক বড়ই ভয়ানক রকমের একজন পণ্ডিত ছিলেন। জনকের নিকট কেহ কিছু

চাহিতে গেলে, আগে এই বন্দীর সহিত তর্ক না করিয়া, সে রাজার সহিত দেখা করিতে পাইত না। তর্কের নিয়ম এই ছিল যে, 'যে হারিবে তাহাকেই জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে।' লোকটি এমনি অসম্ভব রকমের ঠ্যাটা যে কি বলিব! কাহারো সাধ্য ছিল না যে, তাঁহাকে তর্কে হারায়। কাজেই এ পর্যন্ত যতলোক আসিয়াছে, তাঁহার হাতে পড়িয়া সকলেই মারা গিয়াছে। বেচারা কহোড়ের টাকা ভিক্ষা করিতে আসিয়া সেই দশাই হইল।

এ ঘটনার কথা অষ্টাবক্রকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। তিনি মনে করিতেন, উদ্দালক তাঁহার পিতা আর শ্বেতকেতু তাঁহার ভাই। শ্বেতকেতু আর অষ্টাবক্র প্রায় এক বয়সী ছিলেন। তাই তাঁহাদের খেলান বেড়ান সকলই এক সঙ্গে হইত। মাঝে মাঝে ঝগড়াও যে না হইত, এমন নহে।

এমনি করিয়া বার বৎসর কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে একদিন অষ্টাবক্র উদ্দালকের কোলে বসিয়াছিলেন, তাহাতে শ্বেতকেতুর হিংসা হওয়াতে, তিনি আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। ইহাতে অষ্টাবক্র কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, শ্বেতকেতু বলিলেন, 'উহা ত তোমার পিতার কোল নহে, তুমি কেন ওখানে বসিবে?'

এ কথায় অষ্টাবক্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া নিজের মাতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, 'মা, আমাব বাবা কোথায়?'

তখন সুজাতা আব কি করেন? কাঁদিতে কাঁদিতে অষ্টাবক্রকে তাঁহার পিতার মৃত্যুর কথা শুনাইলেন। সে সংবাদ শুনিয়া অষ্টাবক্র তখন কিছু বলিলেন না, কিন্তু রাত্রিতে শ্বেতকেতুর সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁহার অনেক পরামর্শ হইল।

অষ্টাবক্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "চল, আমবা কাল মিথিলায় যাই।"

শ্বেতকেতু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিথিলায় যাইব কেন? সেখানে কি আছে?'

অষ্টাবক্র বলিলেন, 'সেখানে জনক রাজা যজ্ঞ করিতেছেন, তাহাতে পৃথিবীর যত মুনি ঋষি আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলেই আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইলে, দেখিতে বড়ই চমৎকার হইবে। সেখানে গেলে আমরা সেই তর্কের তামাশাও দেখিতে পাইব, বেদগানও শুনিতে পাইব, আর তাহার উপরে বিস্তর টাকা-কড়ি লইয়া ঘরে ফিরতে পারিব।'

তখন শ্বেতকেতু উৎসাহের সহিত বলিলেন, 'তবে চল যাই।'

পরদিন ভোরে উঠিয়া দুইজনে মিথিলায় যাত্রা করিলেন। পথের শোভা দেখিয়া আর যজ্ঞের কথা কহিয়া মনের আনন্দে তাঁহাদের সময় কাটিয়া গেল, সুতরাং মিথিলায় উপস্থিত হইতে তাঁহাদের কোন কষ্টই হইল না। সে সময়ে স্বয়ং মহারাজা জনক রাজপথ দিয়া যজ্ঞস্থানে যাইতেছিলেন, রাজার সিপাহীরা দূর হইতে চিৎকার পূর্বক লোক সরাইয়া পথ পরিষ্কার রাখিতেছিল। অষ্টাবক্র আর শ্বেতকেতুকেও তাহারা সরিয়া যাইতে বলিল। কিন্তু অষ্টাবক্র তাহাদের কথায় কান না দিয়া বলিলেন, "মহারাজ! পথের মধ্যে যতক্ষণ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত না হন, ততক্ষণ সকলের আগে অন্ধ, তারপর বধির, তারপর স্ত্রীলোক, তারপর মোট মাথায় মুটে, তারপর রাজা পথ পাইবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ আসিলে সকলের আগে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। সুতরাং আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনার যাওয়া কেমন হয়?'

ইহাতে জনক আশ্চর্য এবং সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ইনি যথার্থই কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণ শিশু

হইলেও সম্মানের পাত্র। শীঘ্র ইঁহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দাও।'

অষ্টাবক্র আবার বলিলেন, 'মহারাজ, আমরা বড় সাধ করিয়া আপনার যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছি, আর আপনার ঐ দরোয়ান বেটা আমাদিগকে ঢুকিতে দিতেছে না, ইহাতে আমাদের অত্যন্ত রাগ হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া উহাকে দ্বার ছাড়িয়া দিতে বলুন।'

তখন দরোয়ান বলিল, 'ঠাকুর, আমাদের দোষ নাই, আমরা বন্দীর হুকুমে কাজ করি। তিনি বৃদ্ধ পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকেই ঢুকিতে দিতে বলিয়াছেন, ছেলেপিলেকে ঢুকিতে দিতে নিষেধ করিয়াছেন।'

অষ্টাবক্র বলিলেন, 'পণ্ডিতকে যে ঢুকিতে দাও, সে ত খুব ভাল কথা। কিন্তু খালি কি বুড়া হইলেই পণ্ডিত হয়, আর চুল দাড়ি সাদা না হইলে আর দাঁত সবগুলি পড়িয়া না গেলে পণ্ডিত হয় না? আমরা যে পণ্ডিত নহি, তাহা তুমি কি করিয়া বুঝিলে?'

দরোয়ান বলিল, 'ঠাকুর, তোমার যতখানি বয়স হইয়াছে, লেখাপড়া শিখিতে তাঁহার চেয়ে ঢের বেশি সময় লাগে। ছেলেমানুষ আসিয়া বুড়ার মত কথা কহিলেই কি সে পণ্ডিত হইয়া যায়?'

অষ্টাবক্র বলিলেন, "আচ্ছা বাপু। তুমি নাহয় মহারাজকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ না। আজ আমরা সভায় গিয়া যখন তর্কের চোটে তোমাদের বন্দী মহাশয়ের ধন্ধ লাগাইয়া দিব, তখন বুঝিবে কে বেশি পণ্ডিত।"

দরোয়ান বলিল, "তোমরা ছেলেমানুষ তোমাদিগকে অমনি কি করিয়া ঢুকিতে দিই? একটু অপেক্ষা কর, দেখি কৌশলে ঢুকাইতে পারি কি না। নাহয়, তোমরাও একটু চেষ্টা কর।"

তখন অষ্টাবক্র আবার রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, শুনিয়াছি আপনার বন্দী নাকি বড়ই পণ্ডিত, সে সকলকে তর্কে হারাইয়া জলে ডুবাইয়া মারে। আপনার লোকটি কোথায়? আমি তাহাকে একটিবার দেখিতে চাহি। আপনারা দেখুন, আজ আমি তাহাকে জলে ডুবাইতে পারি কি না।"

রাজা বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি বন্দীর কথা ভাল করিয়া জান না। তাই ওরূপ কহিতেছ। বড় বড় পণ্ডিতেরা তাঁহার নিকট হারিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে কেহই হারাইতে পারেন নাই।"

অষ্টাবক্র বলিলেন, "মহারাজের কথায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বন্দী আমার মত লোকের হাতে পড়ে নাই, তাই তাহার বড়াই। আমার সঙ্গে একটিবার তর্ক করিলে, উহার ঠিক পথের মাঝখানে ভাঙ্গা গাড়ির মত দুর্দশা হইবে।"

ইহাতে রাজা খুব শক্ত শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া অষ্টাবক্রকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অষ্টাবক্র সে-সকল কথার যে উত্তর দিলেন, তাহা শুনিয়া রাজাকে বলিতে হইল, "ব্রাহ্মণ কুমার, তোমাকে সামান্য মানুষ বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমি তোমাকে দ্বার ছাড়িয়া দিলাম; ঐ দেখ বন্দী বসিয়া আছেন।"

তখন অষ্টাবক্র বন্দীকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে বন্দী, আইস, আমরা তর্ক করি! আমি যে কথা কহিব, তুমি তাহার উত্তর দিবে; আর তুমি যে কথা কহিবে, আমি তাহার উত্তর দিব। যে ঠকিয়া যাইবে, তাহাকে জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে!"

এ কথায় বন্দী সম্মত হইলে, অমনি অষ্টাবক্রের সহিত তাঁহার কথার লড়াই আরম্ভ

হইল।

বন্দী বলিলেন, "সকল আগুন একই জিনিস; সূর্য একটি মাত্র; ইন্দ্র একজন; যম একজন।"

অষ্টাবক্র বলিলেন, "ইন্দ্র আর অগ্নি দুই বসু, নারদ আর পর্বত দুই দেবর্ষি; অশ্বিনীকুমারেরা দুজন; রথের চাকা দুখানি; স্বামী আর স্ত্রী দুজন।"

এমনি করিয়া দুইজনে বিষম বাক্যযুদ্ধ আরম্ভ হইল! বন্দী যাহাই বলেন, অষ্টাবক্র তাহার চেয়ে বেশি করিয়া বলেন, আবার বন্দী তাহার চেয়েও বেশি করিয়া বলিলে, অষ্টাবক্র আরো বেশি করিয়া বলেন।

যে-সকল জিনিস এক-একটা করিয়া হয়, বন্দী তাহাদের নাম করিলে, অষ্টাবক্র এমন কতকগুলো জিনিসের নাম করিলেন যাহা দুই-দুইটা করিয়া হয়। ইহাতে বন্দী আর কতকগুলি জিনিসের নাম করিয়া বলিলেন, "এই-সকল জিনিস তিন-তিনটা করিয়া হয়।" অষ্টাবক্র তাহার উত্তরে এমন কতকগুলি জিনিসের কথা বলিলেন, সেগুলি চারি-চারটা করিয়া হয়।

এইরূপে চারির উত্তরে পাঁচ, পাঁচের উত্তরে ছয়, ছয়ের উত্তরে সাত, এমনি করিয়া ক্রমে এগারটায় উঠিল। তারপর অষ্টাবক্র বলিলেন, "বৎসরে বারটি মাস, জগতী ছন্দের এক এক চরণে বারটি অক্ষর; প্রাকৃত যজ্ঞ বার দিনে শেষ হয়; আদিত্যেরা বার জন।"

এ কথার উত্তরে বন্দী, তেরটা করিয়া যাহা হয়, এমন দুটা জিনিসের নাম করিয়াই, "য়্যাঁ—য়্যাঁ- - ।—" করিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন, আর অমনি অষ্টাবক্র ঐরূপ আরো অনেকগুলি জিনিসের নাম করিয়া তাঁহাকে বেকুব বানাইয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া সেই সভাসুদ্ধ লোক হো হো শব্দের সঙ্গে হাততালি দিয়া কি আনন্দ যে করিল, তাহা কি বলিব! বন্দীকে সকলেই অত্যন্ত ভয় করিত, ঘৃণাও করিত। বার বছরের ছেলে অষ্টাবক্র এমন ভয়ঙ্কর লোককে মুহূর্তের মধ্যে হারাইয়া দেওয়াতে তাহারা যেমন আশ্চর্য হইল, তেমনি অষ্টাবক্রের উপরে সন্তুষ্টও হইল।

তখন অষ্টাবক্র বলিলেন, "এই ব্যক্তি অনেক ব্রাহ্মণকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে। সুতরাং ইহাকে কিছুতেই ছাড়া হইবে না; এখনই হাত পা বাঁধিয়া ইহাকে জলে নিয়া ফেল!"

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বন্দী অষ্টাবক্রের এই কথা শুনিয়া কিছু মাত্র ভয় পাইলেন না, বরং তাঁহার যেন ইহাতে খুব আনন্দই হইল। তিনি বলিলেন, "জলে ডুবিতে আমি কিছুমাত্র ভয় পাই না! আমি বরুণের পুত্র। এই জনক রাজার ন্যায় আমার পিতাও আজ বার বৎসর ধরিয়া এক যজ্ঞ করিতেছেন; সেই যজ্ঞের জন্য ভাল ভাল ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হওয়াতে, আমি ঐ কৌশল করিয়া তাঁহাদিগকে আমার পিতার নিকট পাঠাইয়াছি। ইঁহাদের একজনেরও মৃত্যু হয় নাই। তাঁহারা আমার পিতার নিকট পরম সুখেই আছেন এবং শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। অষ্টাবক্র আমার বড়ই উপকার করিলেন; তাঁহার কৃপায়, আমি পিতার নিকট চলিয়া যাইব।"

এ কথা কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না। কিন্তু সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "এখন বন্দীকে কি করা হইবে?"

জনক বলিলেন, "উনি যখন হারিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি?"

অষ্টাবক্র বলিলেন, "বরুণ ত জলের রাজা। এই ব্যক্তি যদি যথার্থই তাঁহার পুত্র হয়, তবে

জলে ডুবিতে ইহার কোন ভয়ের কারণ দেখি না।"

বন্দী বলিলেন, "ঠিক কথা! ইহাতে আমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। আর আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অষ্টাবক্র এখনই তাঁহার পিতা কহোড়ের দেখা পাইবেন!"

এ কথা শেষ হইতে না হইতেই, বন্দী যে-সকল ব্রাহ্মণকে জলে ডুবাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে আবার জল হইতে উঠিয়া আসিলেন। তখন কাহোড় জনককে বলিলেন, "মহারাজ! লোকে এই জন্যই পুত্র লাভ করিতে চাহে। আমি যাহা করিতে পারি নাই আমার পুত্র অনায়াসে তাহা করিল। মহারাজ. আপনার মঙ্গল হউক!"

কাহোড়ের কথা শেষ হইলে বন্দী জনককে বলিলেন, "মহারাজ আপনার আশ্রয়ে কয়েক বৎসর পরম সুখে বাস করিয়াছিলাম; এখন আপনার অনুমতি হইলে, আমি আমার পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে চাহি।"

এই বলিয়া বারবার জনককে আশীর্বাদ পূর্বক, বন্দী হাসিতে হাসিতে সমুদ্রের জলে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

এদিকে অষ্টাবক্র নিজের পিতাকে সম্মুখে পাইয়া মনের আনন্দে তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন; তারপর উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগের নিকট অনেক আশীর্বাদ এবং জনকের নিকট রাশি রাশি ধন পাইয়া, কাহোড় এবং শ্বেতকেতুর সহিত গৃহে ফিরিলেন। সেখানে আসিয়া অষ্টাবক্র জননীকে প্রণাম পূর্বক তাঁহার সহিত কিছুকাল কথাবার্তা কহিবার পর, কাহোড় তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস! তুমি শীঘ্র আশ্রমের নিকটের ঐ নদীটিতে স্নান করিয়া আইস।"

কি আশ্চর্য! অষ্টাবক্র নদীতে স্নান করিবামাত্র তাঁহার খোঁড়া পা, নুলো হাত, কুঁজো পিঠ, বাঁকা মুখ, একপেশে নাক আর কোঁকড়ান কান দূর হইয়া, দেবকুমারের মত পরম সুন্দর চেহারা হইল। নদীতে স্নান করিয়া অষ্টাবক্রের অঙ্গ সমান হইয়াছিল বলিয়া তদবধি সেই নদীর নাম 'সমঙ্গা' হইয়াছে। অষ্টাবক্রের দেবতার সমান রূপ সত্ত্বেও, এখনো আমরা তাঁহাকে অষ্টাবক্রই বলিয়া থাকি। শিশুকালে বাঁকা শরীর লইয়া তিনি যে মহৎ কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার এই নামটি যেন তাঁহার কথা মনে করিয়া দিবার জন্যই রহিয়া গিয়াছে। তোমরা কিন্তু তাঁহার বাঁকা মূর্তি কল্পনা করিয়া লইও না। তিনি অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন।

পরশুরাম

কান্যকুব্জের রাজা গাধির সত্যবতী নামে একটি রূপবতী কন্যা ছিলেন। ঔর্বের পুত্র মহর্ষি ঋচীক সেই কন্যাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, এবং তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য রাজার নিকট প্রার্থনা করেন।

ঋচীক রূপে, গুণে, জ্ঞানে, ধর্মে পরম সুপাত্র বটেন, কিন্তু তিনি নিতান্ত দরিদ্র, নিজে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারেন, এমন সঙ্গতি তাঁহার নাই। এমন দরিদ্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে রাজার কিছুতেই ইচ্ছা হইল না। সুতরাং ঋচীক দুঃখের সহিত গৃহে ফিরিতে প্রস্তুত হইলেন।

তখন রাজা ভাবিলেন, 'তাই ত, এমন মহাপুরুষকে অমনি ফিরাইয়া দেওয়াটা দেখিতে কেমন হয়? ইহাতে লোকে নিন্দা করিতে পারে, আর ইনিও বিরক্ত হইতে পারেন, সুতরাং

ইঁহাকে সোজাসুজি "না", না বলিয়া, কৌশল পূর্বক ফিরাইয়া দিই।'

এই মনে করিয়া তিনি ঋচীককে বলিলেন, "আমাদের কুলের একটি নিয়ম আছে যে, আমরা কন্যার বিবাহ দিবার সময়ে বরের নিকট হইতে পণ গ্রহণ করিয়া থাকি। সত্যবতীকে বিবাহ করিতে হইলে, আপনাকে পণ দিতে হইবে; আপনি কি তাহা আনিতে পারিবেন?"

ঋচীক বলিলেন, "কিরূপ পণ, তাহা জানিতে পারিলে, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।"

রাজা বলিলেন, "সমস্ত শরীর ধবধবে কেবল একটি কানের ভিতর লাল, বাহির কালো, এই রূপ একহাজারটি অতিশয় তেজস্বী ঘোড়া সত্যবতীর বিবাহের পণ। ইহা আনিয়া দিতে পারিলেই আপনি তাহাকে বিবাহ করিতে পাইবেন।"

এইরূপ একহাজারটি ঘোড়া বাজারে খুঁজিয়া পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না; আর থাকিলেও ঋচীক তাহার দাম দিতেন কোথা হইতে? কাজেই রাজা পণের কথা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, খুবই কৌশল করা হইয়াছে। কিন্তু ঋচীক অতি সহজ উপায়ে পণের জোগাড় করিয়া ফেলিলেন, তাঁহার টাকার চিন্তাও করিতে হইল না, বাজারে বাজারে ঘুরিতেও হইল না। তিনি বরুণের নিকট গিয়া ঐরূপ একহাজারটি ঘোড়া চাহিবা মাত্র, বরুণ শুধু যে তাঁহাকে ঘোড়া দিলেন, তাহা নহে, সেই ঘোড়ার পাল তাড়াইয়া দেশে আনার পরিশ্রম হইতেও তাঁহাকে বাচাইয়া দিলেন।

বরুণ বলিলেন, "মুনিঠাকুর, আপনি নিশ্চিন্তে দেশে চলিয়া যাউন। সেখানে গিয়া আপনি ঘোড়ার কথা মনে করিবামাত্র তাহারা আপনার নিকট উপস্থিত হইবে।"

এ কথায় ঋচীকের ত আর আনন্দের সীমাই রহিল না, তিনি দিব্য আরামে ভজন গাহিতে গাহিতে কান্যকুব্জের নিকট গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া যেই তিনি ভাবিয়াছেন যে, 'এখন ঘোড়া গুলি আসিলে হয়,' অমনি দেখিলেন, তাহারা চী-হিঁ হিঁ-হিঁ শব্দে নাচিতে নাচিতে গঙ্গার ভিতর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। গঙ্গার সেই স্থানটির নাম তদবধি অশ্বতীর্থ হইয়া গেল।

সেই একহাজার আশ্চর্য ঘোড়া লইয়া ঋচীক যখন হাসিতে হাসিতে গাধির নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা ত তাহা দেখিয়া একেবারে অবাক! যাহা হউক, এখন আর তাঁহার ঋচীককে ফিরাইয়া দিবার উপায় রহিল না। সুতরাং তিনি অবিলম্বে শুভ দিন দেখিয়া তাঁহার সহিত সত্যবতীর বিবাহ দিলেন!

ঋচীক সত্যবতীকে যেমন ভালবাসিতেন, সত্যবতীও তাঁহাকে তেমনি ভক্তি করিতেন। সুতরাং বিবাহের পর তাঁহাদের দিন অতিশয় সুখেই যাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে কি হইল, শুন।

সত্যবতীর পুত্র হয় নাই। তাঁহার মাতারও পুত্র হয় নাই। সকলেরই ইচ্ছা যে, তাঁহাদের দুজনের দুটি পুত্র হয়। এজন্য ঋচীক নিজ হাতে দুঃ বাটি চরু, অর্থাৎ পায়েস প্রস্তুত করিয়া এক বাটি সত্যবতীকে এবং এক বাটি তাঁহার মাতাকে খাইতে দিলেন।

সত্যবতী সেই চরু হাতে মাতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন, রানী বলিলেন, "মা, আমি তোমার স্বামীর চেয়েও তোমার মান্য লোক, কাজেই আমি যাহা বলি, তোমার তাহাই করা উচিত!"

সত্যবতী বলিলেন, "কি করিব মা?"

রানী বলিলেন, "আমার মনে হয়, তোমার স্বামী তোমাকে যে চরু খাইতে দিয়াছেন, তাহা আমার চরুর চেয়ে অনেক ভাল; তুমি সেই চরু আমাকে খাইতে দাও, আর আমার চরুটা তুমি খাও।"

মা যখন বলিতেছেন, তখন সত্যবতী আর কি করেন? কাজেই তিনি তাঁহার নিজের চরু রাণীকে খাইতে দিয়া, রাণীর চরু নিজে খাইলেন।

ত্রিকালজ্ঞ মহামুনি ঋচীকের এ-সকল কথা জানিতে বাকি রহিল না। তিনি ইহাতে দুঃখিত হইয়া সত্যবতীকে বলিলেন, "সত্যবতি, কাজটা ভাল কর নাই। তোমার মাতা রাজরানী, আর তুমি তপস্বিনী। আমি চাহিয়াছিলাম যে, তোমার পুত্রটি ধার্মিক তপস্বী, আর মহারাণীর পুত্রটি তেজস্বী বীর হয়; সেরূপ চরুই আমি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। এখন তোমরা চরু বদল করিয়া খাওয়াতে, তোমার ভাই হইবে নিরীহ ব্রাহ্মণ, আর তোমার পুত্র হইবে ঘোরতর ক্ষত্রিয়।"

এ কথায় সত্যবতী নিতান্ত আশ্চর্য এবং ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "হায়, হায়, কি করিযাছি! এমন পুত্র লইয়া আমি কি করিব?"

ঋচীক বলিলেন, "আমি কি করিব? ঐ চরুর ঐ গুণ। তুমি তাহা খাইয়া বসিযাছ; এখন আর উপায় কি আছে?"

সত্যবতী বলিলেন, "তোমার পায়ে পড়ি, ইহার একটা উপায় হয় কি না দেখ। নাহয় আমাব নাতি ক্ষত্রিয় হউক কিন্তু আমার পুত্রটি যেন তপস্বী ব্রাহ্মণ হয়।"

ঋচীক বলিলেন, "আচ্ছা তাহা বোধহয় হইতে পারে। তোমাব পুত্র ব্রাহ্মণই হইবে, কিন্তু তোমার নাতিটি বড়ই উৎকট যোদ্ধা হইবে।"

ইহার কিছুদিন পরে সত্যবতীর একটি পুত্র হইলে, তাঁহাব নাম জমদগ্নি রাখা হইল। ইনি বড় হইয়া একজন বিখ্যাত মুনি হইয়াছিলেন। সত্যবতীর ভাই হইলেন বিশ্বামিত্র। তিনি যে রাজা হইয়াও কি করিয়া শেষে মুনি হইয়াছিলেন, তাহা আমরা সকলেই জানি।

জমদগ্নি বড় হইয়া রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। ইঁহার পাঁচটি পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম 'রুমন্বান', 'সুষেণ', 'বসু', 'বিশ্বাবসু' এবং 'রাম'। ইঁহাদের মধ্যে রাম যদিও সকলের ছোট, তথাপি গুণে তিনি সকলের বড় হইয়াছিলেন, ঋচীক সত্যবতীকে যে উৎকট যোদ্ধা নাতির কথা বলিয়াছিলেন, রাম সেই নাতি। ইঁহার কিঞ্চিৎ বয়স হইলেই, ইনি মহাদেবকে তুষ্ট করিবার জন্য গন্ধমাদন পর্বতে গিয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করেন এবং শেষে তাঁহার নিকট হইতে নানারূপ আশ্চর্য অস্ত্র পাইয়া ত্রিভুবনজয়ী অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠেন। মহাদেব তাঁহাকে এমনই অদ্ভুত একখানি পরশু, অর্থাৎ কুঠার দিয়াছিলেন যে, তাহার ধার কিছুতেই কমিত না, আর তাহার ঘায় পর্বতও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইত। এই পরশুখানি সর্বদাই রামের হাতে থাকিত; এজন্য সেই অবধি তাঁহার নাম 'পরশুরাম' হইল।

পরশুরাম ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন ছিল ক্ষত্রিয়ের মত কঠিন। সে যে কিরূপ কঠিন, তাহার পরিচয় একটা ঘটনাতেই পাওয়া গিয়াছিল। কোন কারণে একদিন রেণুকার উপর জমদগ্নি মুনির বড়ই ভয়ানক রাগ হয়। রাগে তিনি একেবারে পাগলের মত হইয়া পুত্রগণকে বলিলেন, "তোমরা এখনই রেণুকাকে বধ কর।"

রুমন্বান, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ইঁহাদের কেহই এমন অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর কাজ কাজ করিতে সম্মত হইলেন না, কিন্তু পরশুরাম পিতার আজ্ঞা মাত্র কুড়াল দিয়া তাঁহার মায়ের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। জমদগ্নি তখন ক্রোধ ভরে সাপ দিয়া রুমন্বান, সুষেণ, বসু, এবং বিশ্বাবসুকে পশু করিয়া দিলেন। পরশুরামকে তিনি বলিলেন, "বৎস; আমার কথায় তুমি বড়ই কঠিন কাজ করিয়াছ, এখন তোমার যেমন ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর।"

এ কথায় পরশুরাম বলিলেন, "বাবা, যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে মাকে বাঁচাইয়া দিন। আর দাদাদিগকে আবার ভাল করিয়া দিন।"

জমদগ্নি বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হউক, তুমি আর কি চাহ?"

পরশুরাম বলিলেন, "আমি যে মাকে বধ করিয়াছিলাম, এ কথা যেন তাঁহার মনে না থাকে, আর ইহার জন্য যেন আমার পাপ না হয়।"

জমদগ্নি বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক, তুমি আর কি চাহ?

পরশুরাম বলিলেন, "আমি যেন অমর হই, আর পৃথিবীতে যত বীর আছে, সকলের চেয়ে বড় হই।"

জমদগ্নি বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হইবে।"

ইহার পর একদিন জমদগ্নির পুত্রগণ আশ্রম হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন; এমন সময় হৈহয়ের রাজা কার্তবীর্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই কার্তবীর্য বড়ই ভয়ঙ্কর লোক ছিলেন। ইঁহার আসল নাম অর্জুন, পিতার নাম কৃতবীর্য। এই জন্যই লোকে ইঁহাকে কার্তবীর্যার্জুন অথবা শুধু কার্তবীর্য বলিয়া ডাকিত। সাধারণ মানুষের দুটি বই হাতে থাকে না। শুধু ইহার ছিল একহাজারটি। এই একহাজার হাতে একহাজার অস্ত্র লইয়া ইনি যখন যুদ্ধ করিতেন, তখন ইহার সামনে টিকিয়া থাকা কিরূপ কঠিন হইত, বুঝিতেই পার। তাহাতে আবার "দত্তাত্রেয়ের" বরে তিনি এমন একখানি রথ পাইয়াছিলেন যে, তাহাকে জল, স্থল, আকাশ, পাতাল, যেখান দিয়া বলা যাইত, সেখান দিয়াই সে গড় গড় করিয়া চলিত! এমন লোক যদি দুষ্ট হয়, তবে তাহাকে সকলেই ভয় করে। তাই দেবতারা অবধি কার্তবীর্যকে দেখিলে দূর হইতে পলায়ন করিতেন।

এহেন অদ্ভুত লোক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অথচ কেবল জমদগ্নি আর রেণুকা ভিন্ন তাঁহার সমাদর করিবার কেহই নাই। রেণুকা নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহার যথাশক্তি রাজাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা প্রভৃতি করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে আদর রাজা গ্রাহ্যই করিলেন না। তাহার বদলে তিনি আশ্রমের গাছপালা ভাঙ্গিয়া বলপূর্বক মহর্ষির হোমধেনুর (হোমের গরুর) বাছুরটিকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া মহর্ষির মুখে এ কথা শুনিবামাত্র রাগে তাঁহার দুই চক্ষু লাল হইয়া উঠিল! তিনি আর-এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া ধনুর্বাণ, এবং তাঁহার সেই সাংঘাতিক কুঠার হস্তে কার্তবীর্যের সন্ধানে ছুটিয়া চলিলেন। দুইজনে দেখা হইলে তাঁহাদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সে বড়ই ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কিন্তু কার্তবীর্য তাঁহার একহাজার হাত এবং একহাজার অস্ত্র লইয়াও পরশুরামকে কিছুতেই আঁটিতে পারলেন না। পরশুরামের পরশু, দেখিতে দেখিতে তাঁহার সেই একহাজার হাত সুদ্ধ তাঁহাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিল!

কার্তবীর্যের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তাঁহার পুত্রগণের যে ভয়ানক রাগ হইবে, ইহা আশ্চর্য

নহে। সুতরাং তাহারা তখন হইতেই ইহার প্রতিশোধ লইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। শেষে একদিন, পরশুরাম আর তাঁহার চারি ভাই আশ্রম হইতে বাহির হইয়া গেলে, দুষ্টেরা খালি আশ্রম পাইয়া, বাঘের মত আসিয়া জমদগ্নিকে আক্রমণ করিল। জমদগ্নি প্রহারের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, কাতরভাবে 'হা রাম'! বলিয়া কতই চিৎকার করিলেন, দুরাত্মাগণের তথাপি দয়া হইল না।

এইরূপে সেই দুষ্টেরা জমদগ্নিকে হত্যা পূর্বক সেখান হইতে প্রস্থান করিবার কিঞ্চিৎ পরেই পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। আশ্রমের আঙ্গিনায় প্রবেশমাত্রই তিনি দেখিলেন, সেখানে রক্তের স্রোত বহিতেছে, আর তাহার মধ্যে তাঁহার পিতার দেহ শত অস্ত্রের ঘায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখন যে তাঁহার প্রাণে কি দারুণ কষ্ট হইল, আর কিরূপ কাতরভাবে তাঁহার পিতার গুণের কথা বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিলেন, তাহার বর্ণনা আমি কি করিব! কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমে তিনি রাগের আগুন হইয়া উঠিলেন। এমন রাগ বুঝি বা এ পৃথিবীতে আর কাহারো হয় নাই।

জমদগ্নির দেহ পোড়ানই অবশ্য এ সময়ে পরশুরামের প্রথম কর্তব্য হইল। সে কাজ শেষ হইলে, তিনি ধনুর্বাণ এবং ভীষণ কুঠার হস্তে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায়, কার্তবীর্যের পুত্রগণের প্রাণবধ করিতে বাহির হইলেন। অল্পকালের ভিতরেই ঘোরতর যুদ্ধে তাহাদের সকলে পরশুরামের কুঠারের ঘায় খণ্ড খণ্ড হইল, কিন্তু তথাপি পরশুরামের রাগ থামিল না। ইহার পর তিনি কার্তবীর্যের বংশের সকল লোক এবং তাহাদের আশ্রিত সকলকে বধ করিলেন, তথাপি তাহার রাগ থামিল না। শেষে ক্ষত্রিয়মাত্রেই তাঁহার রাগের পাত্র হইয়া দাঁড়াইল।

যতদিন পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, ততদিন আর পরশুরাম বিশ্রাম করেন নাই। ক্রমে ক্ষত্রিয়ের রক্তে পৃথিবীরময় কাদা হইয়া গেল, ক্ষত্রিয়দের শিশুরা পর্যন্ত পরশুরামের হাতে প্রাণ ত্যাগ করিল;তাহার পর আর ক্ষত্রিয় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না! তখন পরশুরামের মনে দয়া হওয়াতে, তিনি দুঃখের সহিত বনে চলিয়া গেলেন।

বনে গিয়াও পরশুরাম অনেক সময় সেখানকার মুনিদিগের নিকট অহঙ্কার করিয়া বলিতেন, 'আমি পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় (ক্ষত্রিয় শূন্য) করিয়াছি।" কিন্তু মুনিরা কেহই তাহার এ নিষ্ঠুর কার্যে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

এই ভাবে একহাজার বৎসর চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে ক্ষত্রিয়দের যে দু-একটি শিশু ভগবানের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিল, ক্রমে তাহাদের ছেলেপিলে হইয়া আবার এ পৃথিবী ক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এমন সময় একদিন বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবসু পরশুরামকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, "তুমি যে ক্ষত্রিয় শেষ করিয়াছ বলিয়া এত বড়াই করিয়া থাক, কই! আবার ত দেখিতেছি পৃথিবী ক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এ কথায় পরশুরামের সেই নিভানো রাগের আগুন আবার ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! সুতরাং আর তিনি বনের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তখন আবার ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত হইল! আবার ক্ষত্রিয়ের রক্তে পৃথিবী ভাসিয়া গেল। যতক্ষণ একটি মাত্র ক্ষত্রিয়ও খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল, ততক্ষণ আর পরশুরাম বিশ্রাম করেন নাই। যখন আর ক্ষত্রিয় পাওয়া গেল না। তখন আর কি করেন? তখন কাজেই তাঁহাকে থামিতে হইল। কিন্তু তাহা আর কতদিনের জন্য? যখন আবার ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, তখন পরশুরামের

রাগও হঠাৎ আবার বাড়িয়া গেল। এমনি করিয়া ক্রমাগত একুশবার তিনি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। শেষে ক্ষত্রিয়ের রক্তে সমন্তপঞ্চক নামক তীর্থের পাঁচটি হ্রদ হইয়া গেল, সেই রক্তে পূর্বপুরুষদিগের তর্পণ করিয়া তাঁহার মনে হইল, যেন এতক্ষণে বাগটা একটু কমিয়াছে।

ক্ষত্রিয়েরাই ছিলেন পৃথিবীর রাজা, সেই ক্ষত্রিয়দিগকে জয় করাতে সমস্ত পৃথিবী এখন পরশুরামেরই হইল। কিন্তু তিনি ত আর রাজ্যের লোভে ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করেন নাই, রাজ্যের প্রয়োজন তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। সুতরাং ইহার পর তিনি একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সেই যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ সমস্ত পৃথিবী মহর্ষি কশ্যপকে দান করিয়া ফেলিলেন।

পরশুরামের নিষ্ঠুর কার্যে অন্যান্য মুনিগণের ন্যায় কশ্যপও নিতান্ত দুঃখিত ছিলেন। সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণা পাইয়া তাঁহার মনে হইল যে, ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করিবার এই উত্তম সুযোগ। এই ভাবিয়া তিনি পরশুরামকে আঙ্গুল দিয়া দক্ষিণে যাইবার পথ দেখাইয়া বলিলেন, "হে মহাপুরুষ! তুমি তবে এখন এই পথে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে চলিয়া যাও। এ-সকল দেশ ত এখন আমার হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে আর তোমার বাস করা উচিত নহে!"

এ কথায় পরশুরাম আর কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া তখনই দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে চলিয়া গেলেন। সমুদ্র তাঁহাকে দেখিবামাত্র খানিক দূর সরিয়া গিয়া তাঁহার বাসের জন্য 'শূর্পাকার' নামক একটি নূতন দেশ প্রস্তুত করিয়া দিল।

এদিকে পৃথিবীর নানারূপ দুর্দশা উপস্থিত হইল। ক্ষত্রিয়েরা মরিয়া যাওয়াতে কোথাও আর রাজা রহিল না। কশ্যপ মুনি পৃথিবীকে পাইয়া যদি তাহাতে রাজ্য করিতেন, তাহা হইলেও কতক কাজ হইতে পারিত। কিন্তু তিনি তপস্বী মানুষ, রাজ্য দিয়া তিনি কি করিবেন? যে মুহূর্তে তিনি পৃথিবী দক্ষিণা পাইলেন, তাহাব পর মুহূর্তেই তিনি তাহা ব্রাহ্মণদিগের হাতে দিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণেবা পৃথিবীতে বাস করিয়া মনের সুখে তাঁহাদের জপতপ করিতে লাগিলেন; উহা যে আবার শাসন করিতে হইবে, এ কথা তাঁহাদের মাথায় আসিল না। এভাবে কিছুদিন চলিলেই দেখা গেল যে, যত চোর ডাকাত, তাহারাই রাজ্যের কর্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চোরেরা নিশ্চিন্তে চুরি করিয়া বেড়ায়, কেহ তাহাদিগকে সাজা দিবার কথা বলে না। ভাল লোকেরা দুষ্ট লোকদিগের ভয়ে সর্বদা শশব্যস্ত থাকে, ধন পাইয়া লোকে এতটুকুও আসা করিতে পারে না যে, আর দু-দণ্ড সে ধন তাহার হাতে থাকিবে। শেষে পৃথিবী আর পাপীদের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া রসাতলে (পাতালে) যাইতে আরম্ভ করিলেন। ভাগ্যিস ভগবান কশ্যপ সেই সময়ে তাড়াতাড়ি আসিয়া নিজের উরু দিয়া পৃথিবীকে আটকাইয়া ছিলেন; নহিলে এখন আমরা কোথায় বাস করিতাম?

কশ্যপ উরু দিয়া আটকাইয়াছিলেন বলিয়াই পৃথিবীর এক নাম হইয়াছে উর্বী। সে যাত্রা পৃথিবী কোন মতে বাঁচিয়া গেলেন, কিন্তু নিজের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া তিনি কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিলেন না। তাই তিনি অতিশয় বিনয়ের সহিত কশ্যপকে বলিলেন. "ভগবন, আমি কিসের ভরসায় সুস্থির থাকিব? আমাকে কে দেখিবে? রাজারা সকলেই মরিয়া গিয়াছেন, এখন তাঁহাদের জায়গায় কেহ না আসিলে ত আমি আর উপায় দেখি না। ইঁহাদের কয়েকজনের সন্তানকে আমি অনেক কষ্টে নানাস্থানে লুকাইয়া রক্ষা করিয়াছি, কৃপা পূর্বক তাহাদিগকে আনিয়া রাজা করিলে আমিও রক্ষা পাইতে পারি।"

তখন ভগবান কশ্যপ আর বিলম্ব না করিয়া এই-সকল রাজপুত্রকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। ঋক্ষবান পর্বতে ভল্লুকেরা অতিশয় স্নেহের সহিত বিদুরথের পুত্রকে পালন করিতেছিল। মহর্ষি পরাশর সৌদাসের পুত্র সর্বকর্মাকে মাতার ন্যায় স্নেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতর্দনের পুত্র বৎসকে বাছুরেরা তাহাদের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। শিবির পুত্র গোপতিকেও গরুরা পালন করিয়াছিলেন। দিবিরথের পুত্রকে মহর্ষি গৌতম রক্ষা করিয়াছিলেন। বৃহদ্রথ নামক একটি রাজপুত্রকে গৃধ্রকূট পর্বতে গোলাঙ্গুলগণ (একপ্রকার বানর) পালন করিয়াছিল। ইহা ছাড়া সমুদ্র মরুত্ত রাজার বংশের কয়েকটি বালককে রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহর্ষি কশ্যপ এই-সকল বালককে আনাইয়া পৃথিবীতে রাজা করিলে, তাঁহারা বিধিমতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন পূর্বক ধর্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

শুকদেব

পূর্বকালে মহাদেব এবং পাবতী কর্ণিকার ফুলের অপরূপ শোভা এবং সুগন্ধে পরিপূর্ণ পর্বতের শৃঙ্গে বাস করিয়াছিলেন; সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব, মুনি, ঋষি সকলে মিলিয়া তাঁহাদের স্তব করিতেছিলেন।

সেই সময় ভগবান ব্যাস, সকল গুণে গুণবান দেবতুল্য পুত্র লাভের জন্য মহাদেবের নিকট গিয়া বায়ুভক্ষণ পূর্বক অতি আশ্চর্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। এক বৎসর কঠোর তপস্যায় কাটিয়া গেল। তথাপি ব্যাসদেব কিছুমাত্র কাতর বা চঞ্চল হইলেন না। সেই তপস্যার তেজে তাঁহার জটা আগুনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং তদবধি চিরকালই তাহা ঐরূপ উজ্জ্বল দেখা যাইত। ত্রিভুবনের লোক সে তপস্যা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

সে তপস্যায় মহাদেব নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, স্নেহের সহিত ব্যাসকে বলিলেন, "দ্বৈপায়ন (ব্যাসদেবের অন্য নাম) তুমি শীঘ্রই অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, জল ও আকাশের ন্যায় পবিত্র পরম গুণবাণ পুত্র লাভ করিবে। সেই পুত্র তাহার সমুদয় মন প্রাণ ভগবানের চরণে সমর্পণ পূর্বক ত্রিভুবনে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যাইবে।"

ইহাতে ব্যাসদেব যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া মহাদেবকে প্রণাম পূর্বক হোমের আয়োজন করিতে লাগিলেন। হোমের প্রথম প্রয়োজন অগ্নি। তাহার জন্য ব্যাসদেব অরণী কাষ্ঠ দুখানি (সেকালে দিয়াশলাই এর বদলে কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন বাহির করিতে হইত, ঐ কাঠে নাম অরণী) লইয়া ঘর্ষণ করিতেছেন। এমন সময় সেই কাষ্ঠ হইতে অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল পরম সুন্দর এক কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই কুমারই ব্যাসদেবের পুত্র, তাঁহার নাম শুক।

শুকদেব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র, স্বয়ং গঙ্গাদেবী সেখানে আসিয়া তাঁহার পবিত্র জলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিলেন। তাহার সঙ্গে স্বর্গ হইতে তাঁহার জন্য দণ্ড এবং কৃষ্ণাজিন (পরিবার জন্য কৃষ্ণসার নামক হরিণের ছাল) নামিয়া আসিল। দেবতারা দুন্দুভি বাজাইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

স্বয়ং মহাদেব পার্বতীর সহিত আসিয়া মহানন্দে শুকদেবের উপনয়ন করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার জন্য অপূর্ব কমণ্ডলু আর দিব্য বস্ত্র আনিয়া দিলেন। হংস, সারসী, শুক প্রভৃতি পক্ষিগণ আনন্দে কোলাহল পূর্বক তাঁহার চারিধারে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

শুকদেব পরম ভক্ত সন্ন্যাসী হইয়াই জন্মিয়াছিলেন, তাই কেহই তাঁহাকে পৃথিবীর ধনরত্ন কিছু উপহার দেয় নাই। ধর্মজ্ঞান এবং ভগবানের চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তাই তাঁহার মনে আসিত না। সুতরাং সাংসারিক সুখের আয়োজনে তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল?

দেবগণের গুরু বৃহস্পতির নিকট শুকদেব বিদ্যাশিক্ষা করিতে গেলেন; কিন্তু বৃহস্পতির তাঁহার জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হইল না। বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস প্রভৃতি সকল শাস্ত্র যেন আপনা হইতেই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইতে লাগিল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, তাঁহার আর কিছুই শিখিতে বাকি নাই।

তারপর শুকদেব তপস্যা আরম্ভ করিলেন। দেবতারা এবং ঋষিগণ তাহা দেখিয়া বলিলেন, "অহো! কি আশ্চর্য তপস্যা!" শুকদেব তখনো বালক ছিলেন। কিন্তু সেই বালককে দেখিলে দেবতারাও নমস্কার করিতেন।

কিন্তু বিদ্যা, সম্মান, তপস্যা এ-সকলের কিছুতেই শুকদেবের মন সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। তিনি বলিলেন, "এ সকল পাইয়া আমার কি হইবে? আমি ভগবানকে চাই; আমি মুক্তি চাই।"

তাই শুকদেব পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পিতঃ: আমি মুক্তি লাভ করিতে চাই, দয়া করিয়া আমাকে তাহার পথ বলিয়া দিন।"

এ কথা শুনিয়া আনন্দে ব্যাসদেবের চক্ষে জল আসিল। তিনি তখন হইতেই মুক্তি লাভের উপায়সকল শুকদেবকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি বলিলেন, "বৎস এখন তুমি মিথিলার রাজা জনকের নিকট যাও, তিনি তোমাকে মুক্তির কথা বলিবেন। বিনয়ের সহিত সেই মহাপুরুষের নিকট গমন করিবে; মনের ভিতরে কোনরূপ অহঙ্কার লইয়া যাইও না। তিনি আমাদিগের যজমান, তথাপি তুমি তাঁহাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিবে।"

শুকদেব তখনই মিথিলায় যাত্রা করিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই চক্ষের পলকে শূন্যপথে তথায় গিয়া উপস্থিত হইতে পারিতেন। কিন্তু পাছে তাহাতে কিছুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ হয়; তাই তিনি সেরূপ না করিযা, অতিশয় শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের সহিত, পথের কষ্ট সহ্য করিয়া, তথায় হাঁটিয়া চলিলেন।

সুমেরু হইতে মিথিলা অনেক দূরের পথ। কত নদী, কত পর্বত, কত তীর্থ, কত সরোবর, কত বন, কত প্রান্তর পার হইয়া, ইলাবৃতবর্ষ হরিবর্ষ ও কিম্পুরুষবর্ষ অতিক্রম পূর্বক তবে ভারতবর্ষে উপস্থিত হওয়া যায়। সেই ভারতবর্ষে আর্যাবর্ত, তাহার ভিতরে বিদেহ রাজ্য, সেইখানে মিথিলা নগর। মুক্তি ও ভগবানের চিন্তা করিতে, শুকদেব অনেক কষ্টে দুই প্রহর বেলায় প্রখর রৌদ্রের সময় সেই মিথিলায় উপস্থিত হইলেন।

শুকদেব রাজপুরীর প্রথম মহলে প্রবেশ করিবামাত্র, অশিষ্ট দরোয়ান সকল আসিয়া, ভ্রুকুটি পূর্বক অতি কর্কশভাবে তাঁহার পথ আটকাইল। কিন্তু তিনি ক্ষুধা, পিপাসা এবং পথশ্রমে কাতর হইয়াও, তাহাদের কথায় কিছুমাত্র ক্রোধ না করিয়া, শান্তভাবে সেই প্রখর রৌদ্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন সেই দারোয়ানদিগের একজন, 'না জানি ইনি কোন্ মহাপুরুষ হইবেন', এই ভাবিয়া জোড়হাতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক, তাঁহাকে দ্বিতীয় মহলে প্রবেশ করিতে দিল। সেখানে রাজমন্ত্রী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই, পরম সম্মান ও আদরের

সহিত তাঁহাকে তৃতীয় মহলে লইয়া গেলেন।

রাজর্ষি জনক যখন জানিলেন যে, শুকদেব পথশ্রমে কাতর হইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার লোকদিগকে বলিলেন, 'আজ ইঁহাকে যত্ন পূর্বক বিশ্রাম করাও, কাল আমি ইঁহার সহিত দেখা করিব।'

এ কথায় জনকের লোকেরা শুকদেবের বিশ্রামের নানারূপ আয়োজন করিতে লাগিল। কি আশ্চর্য আয়োজনই তাহারা করিয়াছিল। সুশীতল সরবত, মনোহর মিষ্টান্ন, সুকোমল শয্যা, সুমধুর গীতবাদ্য, সুন্দর ফুলের সৌরভ ও বিচিত্র পাখার বাতাস, কোন বিষয়েই তাহারা ত্রুটি করে নাই। এমন সেবা দেবতারাও কমই পাইয়া থাকেন। কিন্তু শুকদেব এমন সেবা পাইয়াও কিছুমাত্র চঞ্চল হইলেন না, তিনি সমস্ত রাত্রি ভগবানের চিন্তাতেই কাটাইলেন।

পরদিন রাজা জনক পাত্রমিত্র সমেত তাঁহার নিকট আসিয়া অশেষরূপে সমাদর পূর্বক, ভক্তিভরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্, আপনি এত কষ্ট করিয়া কিজন্য আমার নিকট আসিয়াছেন?'

শুকদেব কহিলেন, 'মহারাজ, পিতৃদেব আমাকে বলিয়াছেন যে, আপনার নিকট আসিলে আমি মুক্তির কথা শুনিতে পাইব। আপনি দয়া করিয়া আমাকে সে বিষয়ের উপদেশ দিন।'

এ কথায় জনক শুকদেবকে যে আশ্চর্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তেমন উপদেশ আর কেহই দিতে পারেন না। সেই অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়া, শুকদেব অপার আনন্দের সহিত হিমালয় পর্বতে চলিয়া গেলেন। ভগবান ব্যাস সে সময়ে পর্বতের পূর্বদিকে একটি অতি নির্জন স্থানে থাকিয়া সুমন্তু, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও পৈল নামক চারিটি শিষ্যকে বেদশিক্ষা দিতেছিলেন। শুকদেব তথায় উপস্থিত হইয়া জনক রাজার উপদেশের কথা বলিলে, ব্যাসের মনে অতিশয় আহ্লাদ হইল।

ক্রমে ব্যাসদেবের শিষ্যেরা বেদশিক্ষা সমাপন করিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। তারপর ভগবান ব্যাস এবং নারদের নিকট নানারূপ উপদেশ পাইয়া মুক্তির পথ শুকদেবের নিকট অতি পরিষ্কার এবং সহজ হইয়া গেল। তখন তাঁহাব মনে এই চিন্তা হইল যে, 'সংসারে থাকিলে অনেক কষ্ট পাইতে হয়, আমি যোগ বলে এই দেহ ত্যাগ করিয়া ইহার চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থানে চলিয়া যাইব।'

এই ভাবিয়া শুকদেব তাঁহার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক বিনীতভাবে বলিলেন, 'পিতঃ! আমার আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই। অনুমতি করুন, আমি যোগবলে ইহার চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থানে চলিয়া যাই।'

ব্যাস বলিলেন, 'বৎস, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া লই।'

কিন্তু পিতার এইরূপ স্নেহের কথায়ও কিছুমাত্র ব্যাকুল না হইয়া, শুকদেব সেখান হইতে কৈলাস পর্বতে চলিয়া আসিলেন। সেই পর্বতের চূড়ায় বসিয়া যোগ সাধন করিতে করিতে ক্রমে ভগবানের দেখা পাইয়া, তাঁহার আত্মা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তিনি বায়ুর ন্যায় আকাশে উড়িয়া প্রবল বেগে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখা যাইতেছিল, আর তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন যে, সমুদয় সৃষ্টি ভগবানের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সে সময়ে দেবতাগণ তাঁহার উপরে পুষ্পবৃষ্টি

করিতেছিলেন, আর মহর্ষি, সিদ্ধ, অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ আশ্চর্য হইয়া বলিতেছিলেন, 'এই মহাত্মা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ইনি কে?'

শুকদেব সূর্যের দিকে চাহিয়া গভীর শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ করতঃ ক্রমাগত পূর্বদিকে যাইতে লাগিলেন। অপ্সরাগণ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ইনি কোন্ দেবতা?' কেহ বলিল, 'আহা, ইঁহার পিতা ইঁহাকে কতই স্নেহ করেন, তিনি কিরূপে এমন পুত্রকে বিদায় দিলেন?'

এ কথায় তখনই শুকদেবের পিতার কথা মনে পড়াতে, তিনি বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্বত, সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হে বন্ধুগণ! যদি আমার পিতা আমার জন্য ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আমাকে ডাকেন, তবে দয়া করিয়া তোমরা তাহার উত্তর দিও।'

তাহা শুনিয়া বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্বত সকলে বলিল, 'হাঁ শুকদেব, আপনার পিতা আপনাকে ডাকিলেই আমরা উত্তর দিব।'

ক্রমে শুকদেব মেরু ও হিমালয় পর্বতের শত যোজন প্রশস্ত সোনা আর রূপার শৃঙ্গ দুইটির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর্বতের চূড়া শুকদেবকে দেখিবামাত্র দুই ভাগে ভাগ হইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। অমনি চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল, 'কি আশ্চর্য!' 'কি আশ্চর্য!'

এইরূপে শুকদেব ত্রিভুবনের লোককে আশ্চর্য করিযা শেষে ভগবানের সহিত মিলিত হইলেন।

শুকদেব চলিয়া আসিলে ব্যাসের প্রাণ তাঁহার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া শুকদেবকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই পর্বতের নিকট আসিয়া দেখিলেন, তাহারা দুইভাগ হইযা গিয়াছে। ব্যাসদেবকে দেখিয়া মহর্ষিগণ তাঁহার নিকট আগমন পূর্বক আহ্লাদ এবং বিস্ময়েব সহিত শুকদেবের আশ্চর্য কার্য সকলের কথা কহিতে আরম্ভ কবিলে, ব্যাসদেব, 'হা, বৎস!' 'হা, বৎস!' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। তখন বৃক্ষ, লতা, পর্বত সকলে শুকদেবেব সেই কথা স্মরণ করিয়া 'ভো!' শব্দে ব্যাসদেবের কথার উত্তর দিল। সেই অবধি এখনো পর্বত বা নদীর নিকট কথা কহিলে, তাহারা তাহার উত্তর দিয়া পবম ভক্ত শুকদেবের পবিত্র নাম স্মরণ করাইয়া দেয়।

নচিকেতা

অতি প্রাচীনকালে ডদ্দানকি নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহাব একটি পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম নচিকেতা।

একদিন মহর্ষি উদ্দানকি নদীতে স্নান ও তাহার তীরে সাধন ভজন শেষ করিয়া, আনমনে কুটিরে চলিয়া আসিলেন, সঙ্গে কাঠ, কলসী, ফুল আর ফল ছিল, তাহা লইয়া আসিবার কথা তাঁহার মনে হইল না।

বাড়ি আসিয়া সেই-সকল দ্রব্যের কথা মনে পড়াতে মহর্ষি নচিকেতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি বেদপাঠ করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া পূজা আর রন্ধনের আয়োজন নদীর তীরে ফেলিয়া আসিয়াছি, তুমি গিয়া শীঘ্র তাহা লইয়া আইস।"

নচিকেতা তখনই ছুটিয়া নদীর ধারে গেলেন, কিন্তু সেখানে কাঠ বা কলসী, ফুল বা ফল, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি আসিবার পূর্বেই নদীর স্রোতে তাহা ভাসিয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া তিনি দুঃখিত মনে পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন, "বাবা, নদীর ধারে ত আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বোধ করি, তাহা স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।"

তখন বেলা অনেক হইয়াছিল, আর কাঠ ও ফল ফুল কুড়াইয়া মহর্ষি নিতান্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছিলেন। এমন অবস্থায় মানুষের সহজেই রাগ হয়। নচিকেতার কথা শুনিবামাত্র মহর্ষি ক্রোধে অস্থির হইয়া বলিলেন, "তোমার এখনই যমের সহিত দেখা হউক।"

রাগের মাথায় কি বলিয়াছেন, মহর্ষির তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর ছিল না। কিন্তু এই দারুণ কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইবামাত্র, নচিকেতা সকালবেলার শেফালিকা ফুলটির ন্যায় মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। পিতার রাগ দেখিয়া সবে তিনি দুটি হাত জোড় করিয়া, "বাবা আমাকে দয়া করুন! এইমাত্র বলিয়াছিলেন; ইহার অধিক আর তিনি বলিতে পাইলেন না।

নচিকেতার সেই অবস্থা দেখিয়া মহর্ষির চৈতন্য হইল। কিন্তু হায়! এখন চৈতন্য হইলেই বা কি, আর না হইলেই বা কি? যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে; এখন আর ক্রন্দন ভিন্ন উপায় নাই। "হায়, আমি কি করিলাম!" বলিযা মহর্ষি মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন; "হা পুত্র! হা বাপ নচিকেতা!" বলিয়া ব্যাকুল ভাবে চিৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণের বেদনা তাহাতে বড়িল বই কমিল না।

এদিকে নচিকেতা যম রাজার পুরীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, ধর্মরাজ যম সহস্র যোজন বিস্তৃত উজ্জ্বল সোনার সভায় বসিয়া, ন্যায়ের দণ্ড হাতে পাপপুণ্যের বিচার করিতেছেন।

নচিকেতাকে দেখিবামাত্র যম বলিলেন, "শীঘ্র ইহার বসিবার জন্য আসন লইয়া আইস! ইনি অতিশয় পিতৃভক্ত এবং পুণ্যবান; ইহাকে মহামূল্য মণিমুক্তার থালা আনিয়া উপহার দাও!"

নচিকেতা যমের সৌজন্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিনয়ের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "ধর্মরাজ! আমি আপনার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। এখন আমি যে স্থানে থাকিবার উপযুক্ত , সেইখানে আমাকে পাঠাইয়া দিন!"

এ কথায় যম একটু হাসিয়া যার পর নাই স্নেহের সহিত বলিলেন, "বৎস তোমার ত মৃত্যু হয় নাই। তোমার পিতা অতিশয় তেজস্বী, তাঁহাব কথা আমি অমান্য কবিতে পাবি না। তিনি তোমাকে আমার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছেন। তাই তোমাকে এখন আনিয়াছি। এখন দেখা হইয়া গেল; তুমি মনের সুখে গৃহে চলিয়া যাও। আর, তোমাকে আমি অতিশয় স্নেহ করি; তুমি তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।"

নচিকেতা বলিলেন, "পুণ্যবানেরা আপনার অধিকারে আসিয়া কিরূপ স্থানে বাস করেন, তাহা জানিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। আপনি যদি আমার উপর তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে কৃপা করিয়া আমাকে সেই-সকল দেখিতে দিন।"

এ কথায় যম নচিকেতাকে উজ্জ্বল রথে চড়াইয়া পুণ্যবান দিগের বাসস্থান সকলে লইয়া গেলেন, সেখানে যে যেমন পুণ্যবান, তাঁহার সেইরূপ সুখে থাকিবার ব্যবস্থা আছে। সে-

সকল স্থান যে কি সুন্দর আর তাহাতে বাস করিতে যে কি আরাম, তাহা যাহারা সেখানে গিয়াছে, আর তথায় বাস করিয়া দেখিয়াছে, তাহারাই বলিতে পারে। নচিকেতা দেখিলেন, সেখানে মিষ্টান্নের পর্বত, দুগ্ধের নদী ও ঘৃতের হ্রদ আছে। সেখানকার যে বাড়ি ঘর, সে-সকল চন্দ্র, সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল; আর তাহাতে ঘরের কাজও চলে, গাড়ির কাজও চলে, বেলুনের কাজও চলে, জাহাজের কাজও চলে।

নচিকেতা এই-সকল আশ্চর্য স্থান দেখিয়া যেমন আনন্দ লাভ করিলেন, যমের সুন্দর উপদেশ শুনিয়া তেমনি উপকারও পাইলেন। তারপর বিনীতভাবে যমকে নমস্কার পূর্বক তিনি তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, যমের লোকেরা তাঁহাকে আদরের সহিত মহর্ষি উদ্দানকির আশ্রমে রাখিয়া গেল।

এদিকে মহর্ষি উদ্দানকি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াই কাটাইলেন। তাঁহার চক্ষের জলে নচিকেতার দেহ ভিজিয়া গেল, তথাপি তিনি শান্ত হইতে পারিলেন না। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল; তখনো নচিকেতার দেহ তাঁহার কোলে, তাঁহার চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতেছে। এমন সময় কি এক অপরূপ সৌরভে কুটির পরিপূর্ণ হইয়া গেল, আর, মহর্ষির মনে হইল, যেন নচিকেতার হাত পা অল্প অল্প নড়িতেছে। তাহার পর মুহূর্তেই নচিকেতা উঠিয়া বসিলেন। তখন মহর্ষির মনে এত আনন্দ হইল যে, তিনি আর আশ্চর্য হইবার অবসর পাইলেন না।

ইহার পরে বোধহয় আর তিনি নচিকেতাকে সহজে কটু কথা কহিতেন না। আর এই ঘটনার দরুণ যে নচিকেতার মনে তাঁহার পিতার প্রতি কিছুমাত্র রাগ হয় নাই, তাহাও আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। তিনি বলিতেন যে, 'বাবা আমাকে শাপ দিয়াছিলেন বলিয়াই আমি এমন সকল আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছি।'

শঙ্খ ও লিখিত

বহুকাল পূর্বে শঙ্খ ও লিখিত নামে দুটি ভাই, বাহুদা নদীর তীরে নিজ নিজ আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতেন।

একদিন শঙ্খ কোন কারণে আশ্রমের বাহিরে গিয়াছেন, এমন সময়ে লিখিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শঙ্খকে আশ্রমে না পাইয়া, লিখিত এদিক-ওদিক বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন আশ্রমের একটি গাছে অতি চমৎকার ফল পাকিয়া রহিয়াছে। বোধহয় তখন লিখিতের খুব ক্ষুধা হইয়াছিল, তাই ফল দেখিবামাত্রই তিনি ভাবিলেন, 'ইহার কয়েকটি পাড়িয়া খাই। এই মনে করিয়া তিনি কয়েকটি ফল পাড়িয়া আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, ঠিক সেই সময়ে শঙ্খও আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।'

লিখিতকে ফল খাইতে দেখিয়া শঙ্খ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই, তুমি এ-সকল ফল কোথায় পাইলে?'

এ কথায় লিখিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'দাদা, এ-সকল ফল আপনারই আশ্রমের গাছ হইতে পাড়িয়া লইয়াছি।'

তখন শঙ্খ অতিশয় দুঃখের সহিত বলিলেন, "তুমি বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছ! আমাকে না বলিয়া ফল খাওয়াতে চুরি করা হইয়াছে।" এখন শীঘ্র রাজার নিকট গিয়া এই পাপের শাস্তি চাহিয়া লও।"

শঙ্খের কথায় তিনি তখনই রাজা সুদ্যুম্নের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে অতিশয় সমাদর পূর্বক বিনয়ের সহিত বলিলেন, "ভগবান্, কিজন্যে আসিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করতে হইবে?"

লিখিত বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার কথা রাখিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইহার পর কিন্তু আর না বলিতে পারিবেন না। আমি দাদার অনুমতি বিনা তাঁহার আশ্রমের ফল খাইয়া চোরের কাজ করিয়াছি। আপনি শীঘ্র আমাকে ইহার শাস্তি দিন।"

ইহাতে সুদ্যুম্ন যার পর নাই আশ্চর্য হইয়া পলিলেন, "ভগবান্, রাজা যেমন অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারেন, তেমনি তাহাকে ক্ষমাও করিতে পারেন। আপনি ধার্মিক লোক, আমি আপনার অপরাধ মার্জনা করিলাম। ইহা ছাড়া আপনার কি চাই বলুন?"

লিখিত বলিলেন, "আমি আর কিছুই চাহি না, আপনি আমার অপরাধের উচিত শাস্তি দিন।"

লিখিতের সরল সাধুতা দেখিয়া রাজার মনে তাঁহার প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা হইল। কিন্তু তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মন ফিরাইতে পারিলেন না। লিখিত বলিলেন, "পাপের উচিত শাস্তি না পাইলে আমার শরীর হইতে সে পাপ দূর হইবে না, সুতরাং আমাকে শাস্তি দিতেই হইতেছে।"

তখন রাজা আর কি করেন? চোরের সাজা হাত কাটিয়া দেওয়া, সুতরাং তিনি লিখিতের হাত দুখানি কাটিয়া দিয়া তাঁহার মনের দুঃখ দূর করিলেন।

সেই কাটা হাত লইয়া লিখিত শঙ্খের নিকট আসিয়া বলিলেন, "দাদা দেখুন রাজা আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। এখন আপনি দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।"

লিখিতের হাত দুখানির দিকে চাহিবামাত্র শঙ্খের চোখে জল আসিল, তিনি নিতান্ত স্নেহের সহিত বলিলেন, "ভাই আমি ত তোমার উপর কিছুমাত্র রাগ করি নাই। তোমার পাপ হইয়াছিল, তাই আমি তাহা দূর করাইয়া দিলাম। এখন তুমি বাহুদা নদীতে গিয়া বিধি মতে দেবতা, ঋষি এবং পিতৃগণের তর্পণ কর।"

শঙ্খের কথায় লিখিত নদীতে স্নান করিয়া যেই তর্পণের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি তাঁহার হাত দুখানি পূর্বের ন্যায় সুস্থ হইয়া গেল। ইহাতে তিনি নিতান্ত আশ্চর্য হইয়া অবিলম্বে শঙ্খকে সেই হাত দেখাইলে, শঙ্খ বলিলেন, "লিখিত তুমি আশ্চর্য হইও না। আমার তপস্যার বলেই এরূপ হইয়াছে।"

তখন তিনি বলিলেন, "দাদা, আপনার এমন ক্ষমতা থাকিতে আপনি আমাকে রাজার নিকট পাঠাইলেন কেন? আপনি নিজেইত আমাকে পবিত্র করিয়া দিতে পারিতেন।"

শঙ্খ বলিলেন, "ভাই, পাপের শাস্তিই হইতেছে তাহা দূর করিবার উপায়। রাজা ভিন্ন আর কাহারো সেই শাস্তি দিবার অধিকার নাই। এইজন্যই আমি তোমাকে রাজার নিকট পাঠাইয়াছিলাম, রাজা তোমাকে শাস্তি দেওয়াতে, তোমারও পাপ দূর হইল, তাঁহার কর্তব্য পালন হইল। সুতরাং ইহাতে দুজনেরই মঙ্গল হইয়াছে।"

মুদ্‌গল ও দূর্বাসা

মহর্ষি মুদ্‌গলের বৃত্তান্ত অতি চমৎকার।

মহর্ষি মুদ্‌গল কুরুক্ষেত্রে বাস করিতেন। তাঁহার মত দরিদ্র এবং ধার্মিক লোক সংসারে আতি অল্পই ছিল। চাষিরা ক্ষেত্রের ধান কাটিয়া নিলে যে দু-একটি ধান ক্ষেত্রে পাড়িয়া থাকিত, মহর্ষি মুদ্‌গল পনের দিন ধরিয়া তাহাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া কুড়াইতেন। এমনি করিয়া পনের দিনে তাঁহার এক দ্রোণ (প্রায় বত্রিশ সের) ধান হইত। পনের দিন পরে সেই ধান দেবতা আর অতিথিগণের পূজা হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, মুদ্‌গল এবং তাঁহার পরিবার তাহাই আহাব করিয়া আনন্দে দিন কাটাইতেন, পনের দিন অন্তর এইরূপে মুদ্‌গলের আশ্রমে পূজা হইত! আর সেই পূজা তিনি এমন ভক্তিভরে এবং পবিত্রভাবে করিতেন যে, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ তাহাতে না আসিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহাদের কৃপায় মহর্ষির এক দ্রোণ ধানেই সমুদয় দেবতাগণ এবং শত শত ব্রাহ্মণের পবিতোষ পূর্বক ভোজন হইত।

মুদ্‌গলের আশ্চর্য পূজার কথা শুনিতে পাইয়া, একদিন দুর্বাসা মুনি তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্বাসার স্বভাব যেমন কর্কশ, চেহারা তেমনি কদাকার, তাহার উপর আবার মাথার চুল নাই, পবনে কাপড় নাই, মুখে গালি ভিন্ন আর কোন কথা নাই। চাহনি আব চাল-চলন দেখিলে সাধ্য কি কেহ বলে যে 'এ ব্যাক্তি পাগল নহে, ভাল মানুষ।' দুর্বাসা আসিয়াই বলিলেন, "বড ক্ষুধা হইয়াছে, শীঘ্র খাবার আন!"

মুদ্‌গল মধুর বাক্যে সেই পাগলের কুশল জিজ্ঞাসা পূর্বক পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন, এবং সন্তোষেব সহিত তাঁহার সকল গালি আর অত্যাচার সহ্য করিয়া, পরম যত্নে তাঁহাকে আহার করাইলেন।

না জানি সর্বনেশে মুনিব কেমন সর্বনেশে ক্ষুধা হইয়াছিল! মুদ্‌গলের অতি কষ্টে কুড়ান সেই আধ মণ ধানের ভাত দেখিতে দেখিতে তিনি প্রায় শেষ করিয়া ফেলিলেন। তারপর সামান্য যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা গায়ে মাখিয়া, বিড় বিড় করিতে করিতে পাগলের মত চলিয়া গেলেন, মুদ্‌গল এবং তাঁহার পরিবারের খাইবার জন্য কিছুই রহিল না।

সেই পরম ধার্মিক তপস্বী ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত বা দুঃখিত না হইয়া , অনাহারে থাকিয়াই পুনবায় ধান কুড়াইতে লাগিলেন। দুর্বাসাও পনের দিন পরে আবার আসিয়া, তাহার সমস্ত খাইয়া আর গায়ে মাখিয়া শেষ করিতে ভুলিলেন না।

এইরূপ ঘটনা ক্রমাগত ছয়বার হইল। পনের দিনের কঠিন পরিশ্রমে যাহা কিছু সঞ্চয় হয়, দুর্বাসা আসিয়া তাহা খাইয়া যান, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা গায়ে মাখেন। সুতরাং এই দীর্ঘকালের মধ্যে মুদ্‌গল আর তাঁহার পরিবার এক গ্রাস অন্নও মুখে দিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহাতেও এমন বোধ হইল না যে, তাঁহার মনে কিছুমাত্র ক্লেশ বা অসন্তোষ হইয়াছে। প্রথম দিনে তিনি যেমন হাসিমুখে এবং মিষ্টভাবে দুর্বাসার সেবা করিয়াছিলেন, শেষদিনে ঠিক সেইরূপই দেখা গেল। তখন দুর্বাসা আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া, মুদ্‌গলকে বলিলেন, "মুদ্‌গল, তোমার মত মহাশয় লোক আমি আর কোথাও দেখি নাই। তোমার এমন ক্ষুধার সময়েও আমি বার বার আসিয়া তোমার অতি কষ্টে সঞ্চিত অন্ন খাইয়া

যাইতেছি, তথাপি তোমার কিছুমাত্র রাগ হইতেছে না. কি আশ্চর্য। আমার পরম ভাগ্য যে এমন মহাপুরুষের সহিত আমার পরিচয় হইল। দেবতারাও তোমার সাধুতায় পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তুমি শীঘ্রই সশরীরে স্বর্গে যাইবে!"

দুর্বাসার কথা শেষ হইতে না হইতেই দেবদূত হংস-সারসে টানা বিচিত্র রথ সমেত মুদ্‌গলের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহর্ষি, আপনার সিদ্ধি লাভ হইয়াছে, এখন এই রথে চড়িয়া স্বর্গে চলুন।"

দেবদূতের কথা শুনিয়া মুদ্‌গল বলিলেন, "দেবদূত, স্বর্গবাসের কিরূপ গুণ এবং তাহার দোষই বা কিরূপ, তুমি তাহার বর্ণনা কর! তোমার কথা শুনিয়া আমি যাহা করিতে হয় করিব।"

দেবদূত বলিলেন, "স্বর্গ এখান হইতে অনেক উচ্চ। দেবতাগণ নানারূপ রথে চড়িয়া সেখানে বিচরণ করেন। যাহারা তপস্যা করে না, যাহারা ধর্মকে অবহেলা করে, যাহারা মিথ্যা কথা কহে আর যাহার নাস্তিক, সে-সকল লোক কখনো স্বর্গে যাইতে পারে না। কেবল ধার্মিকেরাই স্বর্গে গিয়া থাকেন। মেরু নামক তেত্রিশ যোজন বিস্তৃত সোনাব পর্বতেব উপরে দেবতাদিগের অতি আশ্চর্য এবং সুন্দর উদ্যান সকল আছে, পুণ্যবাণ লোকেরা স্বর্গে গিয়া সেই-সকল উদ্যানে বিহার করেন। তথায় ক্ষুধা পিপাসা, ক্লেশ, ভয়, শোক, তাপ, ক্লান্তি প্রভৃতি কোন অসুখই নাই। পরম পবিত্র নির্মল সুশীতল বায়ু সর্বদাই সেখানে ধীবে ধীরে প্রবাহিত থাকে, আর নানারূপ সুমধুর শব্দে প্রাণ মন মোহিত হয়। সেই ধূলা ও দুর্গন্ধ শূন্য পরম সুন্দর পবিত্র স্থানে পুণ্যবানেরা, উজ্জ্বল মূর্তি ধাবণ পূর্বক বথে চড়িয়া বিচরণ কবেন। তাঁহাদের মনে কদাচ হিংসা, মোহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট ভাব আসে না। তাঁহাদের সুগন্ধি পুষ্পমালা সকল কখনো মলিন হয় না।"

"স্বর্গ বাসের এইরূপ গুণ। উহার দোষ এই যে, সেখানে গিয়া কেবল সুখই ভোগ করিতে হয়, ধর্ম কর্মের দ্বারা অধিক পুণ্য সঞ্চয় করিবার অবসব থাকে না। সুতরাং পূর্বের পুণ্য শেষ হইলে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়।"

মুদ্‌গল বলিলেন, "আমি কেবল ভগবানকেই চাহি, স্বর্গে বা সুখে আমাব প্রয়োজন নাই। তোমার রথ লইয়া তুমি ফিরিয়া যাও।" এই বলিয়া দেবদূতকে বিদায় পূর্বক মহর্ষি মুদ্‌গল ভগবানের চিন্তায় মন দিলেন, এবং শেষে তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

ইন্দ্র ও নহুষ

পূর্বকালে ত্বষ্টা নামক প্রজাপতির সহিত ইন্দ্রের শত্রুতা হইয়াছিল। সে সময়ে ত্বষ্টা তাঁহার ত্রিশিরা নামক পুত্রকে ইন্দ্রের অনিষ্ট করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। ত্বষ্টার পুত্রটি নিতান্তই অদ্ভুত রকমের ছিলেন। ত্রিশিরা কি না যাঁহার তিনটা মাথা। তিন মুখের এক মুখ দিয়া তিনি বেদপাঠ করিতেন, আর-এক মুখে মদ্যপান করিতেন, আর-একখানি মুখ তাঁহার এমনি ভয়ানক ছিল যে, তাহা দেখিলেই মনে হইত, যেন তিনি ঐ মুখখানি দিয়া ত্রিভুবন গিলিয়া খাইবেন।

পিতার কথায় এই ত্রিশিরা, ইন্দ্রকে তাড়াইয়া নিজে ইন্দ্র হইবার জন্য, ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। যাহার চেহারা দেখিলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সে যদি আবার এমন বিষম তপস্যা করিতে থাকে, তবে তাহাতে ইন্দ্রেরও ভয় সহজেই হইতে পারে। সুতরাং ইন্দ্র ত্রিশিরার তপস্যা ভাঙ্গিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সেই উৎকট তপস্যার কোনরূপ হানি করিতে পারিলেন না।

তখন ইন্দ্রের মনে হইল যে, ইহাকে বধ করা ভিন্ন আর ইহার তপস্যা নিবারণের অন্য উপায় নাই। এই মনে করিয়া তিনি ত্রিশিরার উপরে অতি ভয়ঙ্কর একটা অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। অস্ত্রের ঘায় ত্রিশিরা পড়িয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এমন বোধ হইল না। তাহা দেখিয়া ইন্দ্র নিতান্ত ভয় পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এখন কি করি?'

এমন সময় একজন ছুতার কুড়াল কাঁধে সেইখান দিয়া যাইতেছিল। ইন্দ্র তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "বাপু, তুই এক কাজ করিতে পারিস? তোর ঐ কুড়ালখানি দিয়া এই লোকটার মাথা তিনটা কাটিয়া ফেলত, দেখি।"

ছুতার বলিল, "আমি তাহা পারি না, কর্তা! কাজটা আমার বড়ই অন্যায় মনে হইতেছে, আর তাহা না হইলেও ইহার ঘাড় যে মোটা, আমার কুড়ালে ধরিবে না।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তোর কোন ভয় নাই! আমি তোর কুড়ালকে বজ্রের মত কঠিন করিয়া দিব।"

ছুতার বলিল, "আপনি কে মহাশয়? আর এমন অন্যায় কাজ করিয়া আপনার কি লাভ হইবে?"

ইন্দ্র বলিলেন, "আমি ইন্দ্র! তুই কোন চিন্তা করিস না, আমার কাজটা করিয়া দে।"

ছুতার বলিল, "এমন নিষ্ঠুর কাজ করিতে কি আপনার লজ্জা হইতেছে না? ব্রহ্মহত্যার পাপের কথাও ত একবার ভাবিতে হয়!"

ইন্দ্র বলিলেন, "তাহার জন্য কোন ভাবনা নাই, আমি অনেক ধর্ম কর্ম করিয়া ব্রহ্মহত্যার দোষ সারাইয়া লইব।"

তখন ছুতার যেই তাহার কুড়াল দিয়া ত্রিশিরার মাথাগুলি কাটিল, অমনি তাঁহার তিনটি মুখ হইতে তিত্তির, চড়ুই প্রভৃতি পক্ষী উড়িয়া বাহির হইতে লাগিল।

এইরূপে ত্রিশিরাকে বধ করিয়া ইন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে ঘরে চলিয়া আসিলেন।

ত্রিশিরার মৃত্যুর কথা শুনিয়া ত্বষ্টার যে খুব রাগ হইয়াছিল, এ কথা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। তিনি রাগে অস্থির হইয়া আচমন পূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিবামাত্র অতি ভীষণ এক দৈত্য উৎপন্ন হইল। দৈত্যকে দেখিয়া ত্বষ্টা বলিলেন, "বড় হও।" অমনি সে দেখিতে দেখিতে আকাশের মত উঁচু হইয়া গেল। তারপর সে আকাশকেও ছাড়াইয়া গেল তারপর আর কত বড় হইল তাহা আমি বলিতে পারি না।

সেই দৈত্যের নাম বৃত্র। বৃত্র হাত জোড় করিয়া ত্বষ্টাকে বলিল, "মহাশয়! আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?"

ত্বষ্টা বলিলেন, "তুমি স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রকে সংহার কর!"

এ কথায় বৃত্র তখনই স্বর্গে গিয়া কি কান্ড যে উপস্থিত করিলে, তাহা কি বলিব?

দেবতারা কিছুকাল তাহার সহিত খুবই যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে যুদ্ধে তাহার কি হইবে? সে তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্রকে মশার কামড়ের মত অগ্রাহ্য করিয়া, খালি দেখিতে লাগিল, কোন্‌টা ইন্দ্র। তারপর তাঁহাকে চিনিবামাত্র, সে তাঁহাকে খপ্‌ করিয়া ধরিয়া, মুখের ভিতরে পুরিয়া, মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া দিল।

ভাগ্যিস দেবতাদিগের নিকট "জৃম্ভিকা" অর্থাৎ "হাইতোলানি" নামক অতি আশ্চর্য অস্ত্র ছিল, নহিলে সর্বনাশই হইয়াছিল আর কি! দেবতাগণ তাড়াতাড়ি সেই অস্ত্র আনিয়া প্রাণপণে তাহা ছুঁড়িয়া মারিবামাত্র, দুষ্ট দৈত্য বিশাল এক হাই তুলিল, আর সেই অবসরে ইন্দ্র যে কিরূপ উধর্বশ্বাসে ছুটিয়া তাহা মুখের ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন, তাহা বুঝিতেই পার।

তারপর আবার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু সেই দুষ্ট দৈত্যের মুখের ভিতর হইতে বাহির হইয়া অবধি, ইন্দ্রের কেমন যেন মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং ইহার পর আর-একবার বৃত্র খুব রুখিয়া উঠিবামাত্র তিনি নিতান্ত ব্যস্তভাবে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া, মন্দর পর্বতের চূড়ায় গিয়া বসিয়া রহিলেন।

সেইখানে গিয়া দেবতারা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন, কিন্তু সে যাত্রা আর তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনিতে পারিলেন না। এই যুদ্ধের শেষ কি করিয়া হইয়াছিল—কি করিয়া দধীচ মুনির হাড় দিয়া বজ্র প্রস্তুত হয়, আর সেই বজ্র দিয়া ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেন, এ-সকল কথা আমরা কিছু কিছু জানি। তবে, ইন্দ্র যে বজ্র হাতে পাইয়াই অমনি তাহা লইয়া বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, এ কথা বোধ হয় ঠিক নহে। বাস্তবিক ইন্দ্র সরল ভাবে যুদ্ধ করিয়া বৃত্রকে বধ করেন নাই।

সম্মুখ যুদ্ধে বৃত্রকে আঁটিতে না পারিয়া, দেবতারা স্থির করিলেন যে, উহাকে কৌশল পূর্বক বধ করিতে হইবে, এই মনে করিয়া তাঁহার মুনিদিগকে সঙ্গে করিয়া বৃত্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া মুনিরা তাহাকে বলিলেন, "হে বৃত্র! তোমার তেজে জীবগণের বড়ই ক্লেশ হইতেছে, সুতরাং তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের সহিত বন্ধুতা কর।"

বৃত্র প্রথমে এ কথায় সম্মত হয় নাই। কিন্তু তপস্বীগণ সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহারা তাহাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া, বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, সে ইন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিলে বড়ই চমৎকার ব্যাপার হইবে। তখন বৃত্র তাঁহাদিগকে বলিল, "ঠাকুর মহাশয়েরা আপনারা আমার মান্যলোক, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। আমি আপনাদের আজ্ঞা পালন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাহার আগে দেবতাগণকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। উহারা শুকনো জিনিস দিয়া বা ভিজা জিনিস দিয়া, পাথর দিয়া বা কাঠ দিয়া, অস্ত্র দিয়া বা শস্ত্র দিয়া, দিনের বেলায় বা রাত্রিতে, আমাকে বধ করিতে পারিবেন না। এ কথায় যদি দেবতারা রাজি হন তবে আমি তাঁহাদের সহিত বন্ধুতা করিতে প্রস্তুত আছি।"

মুনিরা বলিলেন, "তথাস্তু"। সুতরাং তখন বৃত্র ভারি খুশি হইয়া ইন্দ্রের সহিত বন্ধুতা করিল। তাহতে ইন্দ্র মনে মনে বলিলেন, "বেশ হইয়াছে, এখন ইহাকে একবার বাগে পাইলেই বধ করিব।"

ইহার পর একদিন সন্ধ্যাকালে ইন্দ্র সমুদ্রের ফেনা দেখিয়া চিন্তা করিলেন যে, 'এই

সন্ধ্যাকাল দিবাও নহে রাত্রিও নহে, আর এই ফেনা শুকনোও নহে ভিজাও নহে, পাথরও নহে কাঠও নহে, অস্ত্রও নহে শস্ত্রও নহে। সুতরাং এই সন্ধ্যাকালে এই ফেনা দিয়া বৃত্রকে বধ করিতে হইবে।'

তারপর ইন্দ্র সন্ধ্যাকালে ফেনার আঘাতে বৃত্রকে বধ করিলেন। এতবড় অসুরটা ফেনার আঘাতে মরিয়া গেল, এ কথা নিতান্তই আশ্চর্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেই ফেনার ভিতরে যে ইন্দ্রের বজ্রখানি লুকান ছিল, এ সংবাদটি শুনিলে আর কাহারো আশ্চর্য হইবার কারণ থকিবে না।

বৃত্র মরিয়া গেল, দেবতাগণের আপদ দূর হইল। কিন্তু ইন্দ্রের মন ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। ইহার কারণ এই যে, পাপ করিলে ইন্দ্রকেও ত তাহার ফলভোগ করিতে হয়। পূর্বে ত্রিশিরাকে মারিয়া এক মহাপাপ করিয়াছিলেন, এখন বৃত্রের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করাতে আব এক মহাপাপ হইল। না জানি এ-সকল পাপের কি ভয়ঙ্কর শাস্তি হইবে! এই চিন্তায় অস্থির হইয়া ইন্দ্র স্বর্গের রাজত্ব পরিত্যাগপূর্বক জগতের শেষে যে জল আছে, সেই জলের ভিতরে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

এদিকে ইন্দ্র চলিয়া যাওয়াতে সংসারময় হাহাকার উপস্থিত হইল। বৃষ্টি নাই, পৃথিবীতে জল নাই, গাছ-পালা মরিয়া গিয়াছে, জীব-জন্তুর আহার মিলে না। দেবতারা দেখিলেন, সৃষ্টি আর থাকে না, অবিলম্বে একজন ইন্দ্র ঠিক না করিলে সকলই মাটি হয়। অনেক চিন্তা করিয়া তাঁহারা সংসারেব মধ্যে একটিমাত্র লোককে ইন্দ্র হইবার উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন। সেই লোকটি রাজা নহুষ। যশে. মানে তেজে, ধর্মে নিতান্তই সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্র হইবার উপযুক্ত লোক।

সুতরাং দেবতা, ঋষি, এবং পিতৃগণ সকলে মিলিয়া নহুষের নিকট গমন পূর্বক বলিলেন, "হে মহারাজ! আপনি দেবরাজ্যের ভাব গ্রহণ করুন।"

নহুষ বলিলেন, "আমি নিতান্ত দুর্বল, আমি কি করিয়া স্বর্গে রাজত্ব করিব?"

দেবতারা বলিলেন, "আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি যাহার পানে তাকাইবেন, তাহারই বল হরণ করিতে পারিবেন।"

তখন নহুষ দেবতাদিগের কথায় সম্মত হইয়া স্বর্গে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিছুকাল তিনি খুব ভালো করিয়াই রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! মানুষ হইয়া হঠাৎ এমন উচ্চপদ লাভ করাতে, শেষে বেচারার মাথা ঘুরিয়া গেল।

একদিন তিনি সভায় বসিয়া বলিলেন, "হে সভাসদ্‌গণ! আমি ত ইন্দ্র হইয়াছি, তবে শচী কেন আসিয়া আমার পদসেবা করে না?"

নহুষ আসিবার পূর্বে শচী ছিলেন স্বর্গের রাণী। নহুষের মুখে এই অপমানের কথা শুনিয়া তিনি ভয়ে এবং দুঃখে নিতান্তই কাতর হইলেন' এসময়ে বৃহস্পতি তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, "মা! তোমার কোন ভয় নাই, শীঘ্রই আমাদের ইন্দ্র স্বর্গে ফিরিয়া আসিবেন।"

এদিকে নহুষ নিতান্তই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছেন, শচীকে আসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেই হইবে। অনেক কষ্টে তাঁহাকে দুই-চারি দিনের জন্য থামাইয়া রাখিয়া সকলে ইন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিষ্ণুর নিকট পরামর্শ লইতে গেলেন। বিষ্ণু তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, "হে দেবতাগণ! তোমরা চিন্তিত হইও না। ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেই তাঁহার

পাপ দূর হইবে তোমাদেরও দুঃখ যাইবে। তোমরা কিছুকাল সাবধানে অপেক্ষা কর।"

বিষ্ণুর উপদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রের পাপ দূর হইল বটে, কিন্তু একবার স্বর্গে ফিরিয়া আসিয়াও নহুষের ভয়ে তাঁহাকে পুনরায় পলায়ন করিতে হইল। ইহাতে শচীদেবীর মনে যে কি দারুণ ক্লেশ হইল, তাহা কি বলিব? তিনি উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, "হে ধর্ম! যদি আমি কখনো দান করিয়া থাকি, যদি কখনো অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, যদি কখনো গুরুজনকে তুষ্ট করিয়া থাকি, আর সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিযা থাকি, তবে যেন আমি আমার স্বামীকে প্রাপ্ত হই। "

ইন্দ্র যে কোথায় পলায়ন করিয়াছিলেন, উপশ্রুতি নাম্নী এক দেবী তাহার সন্ধান জানিতেন। শচীর দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই উপশ্রুতি দেবী তাঁহার নিকটে অসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরম সুন্দর স্নেহময় মূর্তি দেখিয়া শচী যার পর নাই সম্মান এবং আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে মা?"

উপশ্রুতি বলিলেন, "দেবি আমি উপশ্রুতি, তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি একান্ত পুণ্যবতী এবং পতিপরায়ণা, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি আমার সহিত আইস, আমি তোমাকে ইন্দ্রের নিকটে লইয়া যাইব।"

উপশ্রুতির কথায় শচী পরম আহ্লাদের সহিত তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। তাহারা দেবতাদিগের বাসস্থান পার হইয়া, হিমালয় পার হইয়া উত্তরদিকে কতদূর যে গেলেন, তাহার অবধি নাই। যাইতে যাইতে শেষে তাহারা এক মহাসমুদ্রের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে সমুদ্রে নানারূপ বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ একটি দ্বীপ, সেই দ্বীপেব মাঝখানে শতযোজন বিস্তৃত একটি সুন্দর সরোবর। সেই সরোবরে, নানাবর্ণের অসংখ্য পদ্মের মধ্যে একটি শ্বেতবর্ণের পদ্ম খুব উঁচু বোঁটায় ফুটিয়া বড়ই শোভা পাইতেছিল। উপশ্রুতি এবং শচী সেই পদ্মের বোঁটাব ভিতরে ইন্দ্রকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন।

শচীকে দেখিয়া ইন্দ্র নিতান্ত আশ্চর্য এবং আহ্লাদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে? আর আমি যে এখানে আছি, তাহাই বা কি করিয়া জানিলে?"

এ কথায় শচী সকল সংবাদ ইন্দ্রকে শুনাইলে ইন্দ্র তাঁহাকে অনেক সাহস দিয়া নহুষকে জব্দ করিবার উপায় শিখাইয়া দিলেন। সেই উপায় শিখিয়া শচীর মনে বড়ই আনন্দ হইল, এবং সেইমত কাজ করিবার জন্য স্বর্গে ফিরিয়া আসিতে তিনি আর একমুহূর্তও বিলম্ব করিলেন না।

শচীকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াই, নহুষ বলিলেন, " তুমি কবে আমার সেবা করিতে আসিবে?"

শচী বলিলেন, "আপনি যখন আমাকে লইয়া যাইবার উপযুক্ত একখানি পাল্কিতে চড়িয়া আমাকে নিতে আসিবেন, তখনই আমি যাইব!"

নহুষ ইহাতে একটু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কেমন পাল্কি?"

শচী বলিলেন, "এমন পাল্কি হওয়া চাই যে, তেমন আর কাহারো নাই সকলের পাল্কি বেহারায় বয়, কিন্তু আপনি যে পাল্কিতে চড়িয়া আসিবেন, তাহা বড়বড় মুনিরা বহিবে। "

নহুষ বলিলেন, "এ আর কত বড় একটা কথা?"

তখনই মুনি-ঋষিদিগের বড় বড় কয়েকজনকে পাল্কি কাঁধে করিয়া আসিতে হইল, সেই

পাল্কিতে উঠিয়া নহুষ ভাবিলেন যে, এমন আমোদ আর তিনি কখনো ভোগ করেন নাই। সেই-সকল মুনির মধ্যে একজন ছিলেন অগস্ত্য। তিনি যে কিরূপ অদ্ভুত লোক, তাহা ত জানই। নহুষ আহ্লাদে অধীর হইয়া সেই অগস্ত্যের মাথায় পা তুলিয়া দিলেন! অমনি আর তিনি যাইবেন কোথায়? তখনই অগস্ত্যের শাপে তাঁহাকে অজগর হইয়া পৃথিবীতে পড়িতে হইল, দেবতাদিগেরও আপদ কাটিয়া গেল।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ যে, এই অজগরের সঙ্গেই একবার পাণ্ডবদিগের দেখা হইয়াছিল। তখন সে ভীমকে ধরিয়া গিলিবার আয়োজন করে, আর যুধিষ্ঠির আসিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়া দেন। সে ঘটনা উপস্থিত ঘটনার দশ হাজার বৎসর পরে হইয়াছিল।

এইরূপে নহুষের অত্যাচার দূর হইল। তারপর যে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরিয়া আসিলেন, আর দেবতাগণের তাহাতে খুব আনন্দ হইল, এ কথা আর বিশেষ করিয়া বলার কোন প্রয়োজন দেখি না।

সোমক ও তাঁহার ঋত্বিক

বহুকাল পূর্বে সোমক নামে এক রাজা ছিলেন।

সোমকের একশত রানী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটিও পুত্র ছিল না। এজন্য তিনি সর্বদাই অতিশয় দুঃখিত থাকিতেন। এইরূপে অনেক বৎসর গত হইলে, ভগবানের কৃপায় বৃদ্ধ বয়সে রাজার জন্তু নামে একটি পুত্র হইল। এত কষ্টের পরে পুত্রটিকে পাইয়া রাজা এবং রানীগণের কিরূপ আনন্দ হইল, আর তাহারা কিরূপ স্নেহের সহিত তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন, তাহা লিখিয়া কত জানাইব? ছেলেটিকে বারবার অনিমেষ চক্ষে দেখিয়াও রানীদিগের তৃপ্তি হয় না, তাঁহার আহার নিদ্রা ভুলিয়া দিন রাত কেবল তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া থকিতেন।

এমন করিয়া দিন যায়, ইহার মধ্যে কি হইল শুন। হীরা-মতির ঝালর দেওয়া সোনার খাটে, মাখনের মত কোমল শয্যায়, জন্তু সুখে নিদ্রা যাইতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে এক পাপিষ্ঠ পিপীলিকা আসিয়া তাহার কোমরে কামড়াইয়া দিল। খোকা তখনই পিঠ বাঁকাইয়া, মুখ সিঁটকাইয়া, বিষম ভ্রূকুটি পূর্বক চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহাতে খোকার সেই একশত মাতা সকলে মিলিয়া বুক চাপড়াইয়া, হাত পা ছুঁড়িয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

সেকালের মেয়েরা কিরকম সুরে বিলাপ করিত জানি না। কিন্তু সেই একশত রানীর চিৎকার মিলিয়া যে খুবই ভয়ানক একটা গোলমাল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহারাজ সোমক তখন ঋত্বিক (যজ্ঞের পুরোহিত) ও পাত্রমিত্র লইয়া সভায় বসিয়াছিলেন, রানীদের কান্নার শব্দ প্রলয়ের ঝড়ের ভয়ঙ্কর গর্জনের ন্যায়, সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাতে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া দরোয়ানকে বলিলেন, "শীঘ্র দেখ, কি হইয়াছে।" দরোয়ান উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া অন্তঃপুর হইতে সংবাদ আনিল, "খোকা মহারাজের না জানি কি ভয়ানক কি হইয়াছে!"

তখন রাজা ছুটিলেন, মন্ত্রী ছুটিলেন, ঋত্বিক ছুটিলেন, পাত্রমিত্র সকলেই পাগড়ি ফেলিয়া

শিখা এলাইয়া, অন্তঃপুরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। ততক্ষণে পিঁপড়েও চলিয়া গিয়াছে, খোকাও চুষি মুখে দিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছে। রাজা আসিয়া সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাই বল, আমি ভাবিয়াছিলাম, না জানি কি।"

খোকাকে খানিক আদর করিয়া আবার সভায় আসিয়া রাজা বলিলেন, "হায়! একপুত্র হওয়ার কি কষ্ট! ইহার চেয়ে পুত্র না থাকাও বরং ভাল। বৃদ্ধ বয়সে অনেক কষ্টে একটি মাত্র পুত্র পাইয়া এখন তাহার চিন্তা আমার রোগের চিন্তার চেয়েও যেন বেশি হইয়াছে। ঋত্বিক মহাশয়, এমন কি কোন কর্ম নাই, যাহা করিলে আমার একশতটি পুত্র হইতে পারে? যদি থাকে, বলুন সে কার্য নিতান্ত কঠিন হইলেও আমি তাহা করিব।"

ঋত্বিক বলিলেন, "মহারাজ, এমন কার্য আছে আপনি যদি তাহা করিতে পারেন, তবে বলি!"

রাজা বলিলেন, "শীঘ্র বলুন! সে কাজ ভালই হউক আর মন্দই হউক, আমি অবশ্যই তাহা করিব!"

তখন ঋত্বিক বলিলেন, "মহারাজ! আমি আমার বাড়িতে এক যজ্ঞ করিব। সেই যজ্ঞে আপনাকে আপনার পুত্রের বসা (চর্বি) দ্বারা আহুতি দিতে হইবে! সেই সময় রানীগণ আহুতির ধোঁয়ার গন্ধ লইলে, তাঁহাদের সকলেরই এক-একটি পুত্র জন্মিবে। সেই-সকল পুত্রের সহিত আপনার এই পুত্রটিও পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ কথা যে সত্য, সেই খোকার বামপার্শ্বে একটি সোনালি চিহ্নই হইবে তাহার প্রমাণ।"

রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন, সুতরাং যথাসময়ে সেই নিষ্ঠুর যজ্ঞ আরম্ভ হইল, যখন আহুতি দিবার জন্য ঋত্বিক জন্তুকে লইতে আসিলেন, রানীরা তখন তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। তাঁহাদের করুন কান্নায় পাষাণ গলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সেই নিষ্ঠুর ঋত্বিকের হৃদয় গলিল না। রানীরা খোকার ডান হাতখানি ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, ঋত্বিক তাহার বাম হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া তাহাকে ছিনাইয়া আনিলেন। সেই শিশুকে হত্যা করিয়া, তাহার বসা দ্বারা আহুতি আরম্ভ হইল। সে আহুতির গন্ধ পাইয়া আর মাতাগণ তাঁহাদের শোক কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহারা সকলেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

যাহা হউক, কিছুদিন পরে তাঁহাদের সকলেরই এক-একটি পুত্র হইল আর তাহাদের সঙ্গে জন্তুও যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কেন না, ঋত্বিক যে সোনালি চিহ্নের কথা বলিয়াছিলেন, সেই চিহ্নটি তাহার বামপার্শ্বে স্পষ্টই দেখা গিয়াছিল। একশত পুত্রের মধ্যে জন্তুই হইল সকলের বড়, আর সকলের চেয়ে মাতাগণের অধিক স্নেহের পাত্র।

ইহার কিছুদিন পরে ঋত্বিকের মৃত্যু হইল, এবং যথাসময়ে মহারাজ সোমকও দেহত্যাগ করিলেন। পরলোকে গিয়া সোমক দেখিলেন যে, তাঁহার ঋত্বিককে ঘোরতর নরকে ফেলা হইয়াছে। ইহাতে তিনি নিতান্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি, ঋত্বিক মহাশয়! আপনার এমন দশা কেন হইল?"

ঋত্বিক বলিলেন, "মহারাজ! আপনার জন্য সেই যজ্ঞ করিয়াছিলাম, এখন তাহারই ফলভোগ করিতেছি!"

তখন সোমক যমকে বলিলেন, "হে ধর্মরাজ, ইনি আমার গুরু, আর আমারই নিমিত্ত এই

নরকে পতিত হইয়াছেন। সুতরাং আপনি দয়া করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিন, ইহার পরিবর্তে আমি নিজে এই নরকে প্রবেশ করিতেছি।”

যম কহিলেন, “মহারাজ! একজনের কর্মের ফল অন্যে ভোগ করিতে পারে না। তুমি সৎকার্য করিয়াছ, তাহার ফল-স্বরূপ তুমি পবিত্র লোক স্থান সকল ভোগ করিবে।”

রাজা কহিলেন, “ইহাকে ছাড়িয়া আমি পবিত্র লোক ভোগ করিতে চাহি না। স্বর্গেই হউক আর নরকেই হউক, আমি ইঁহার সঙ্গে থাকিব। আমাদের দুজনেরই সমান কাজ, তাহার ফলও সমান হউক।”

যম বলিলেন, “তথাস্তু! তবে তোমরা উভয়ে কিছুকাল নরক ভোগ কর, তারপর উভয়ে স্বর্গে গিয়া সুখে বাস করিবে।”

ইহাতে সোমক অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সেই নরকে প্রবেশ পূর্বক তাঁহার প্রিয় পুরোহিতের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের সকল পাপ ক্ষয় হইয়া গেল। তারপর উভয়ে স্বর্গে গিয়া সেখানকার সকল সুখের অধিকারী হইলেন।

উশীনরের পরীক্ষা

শিবিবংশীয় মহারাজ উশীনরের কথা অতি পবিত্র। যতদিন এই পৃথিবীতে পুণ্যবানের সম্মান থাকিবে, ততদিন লোকে মহারাজ উশীনরকে ভক্তি করিবে।

মহারাজ উশীনর যেমন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্রও তেমন করিতে পারেন নাই।

একদিন ইন্দ্র অগ্নিকে বলিলেন, “উশীনর যে কেমন ধার্মিক, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।”

এইরূপ পরামর্শ করিয়া ইন্দ্র শ্যেন (শাঁচান) আর অগ্নি কপোতের (পায়রার)বেশে উশীনরের যজ্ঞ ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ উশীনর যজ্ঞ করিতেছেন, এমন সময় শ্যেন পাখির তাড়ায় অত্যন্ত ভয় পাইয়া, কপোতটি তাঁহার কোলে আসিয়া আশ্রয় লইল।

তখন শ্যেন রাজাকে বলিল, “মহারাজ, আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে। আপনি কপোতটিকে ছাড়িয়া দিন, আমি ভক্ষণ করিব।”

রাজা বলিলেন, “তাহা কি করিয়া হয়? এই কপোত প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিয়া আমার নিকট আশ্রয় লইয়াছে, এখন ইহাকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত অন্যায়! ব্রহ্মহত্যা আর গোহত্যার যেমন পাপ, আশ্রিতকে পরিত্যাগ করিতে তেমনি পাপ।”

শ্যেন বলিলেন, “মহারাজ, আহার করিয়াই প্রাণিগণ জীবিত থাকে! না খাইতে পাইলে আমি মরিয়া যাইব, আমার মৃত্যু হইলে আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলেই বিনাশ পাইবে। আপনি একটি প্রাণীকে বাঁচাইতে গিয়া এতগুলি প্রাণীর মৃত্যু ঘটাইতেছেন, ইহা কি উচিত?”

রাজা কহিলেন, “তোমার ত ভোজনই প্রয়োজন, এই কপোতকে বধ না করিয়াও তাহা তোমার স্বচ্ছন্দে জুটিতে পারে। গরু, মহিষ, শুয়োর, যাহা খাইতে তোমার ইচ্ছা হয়, এখনই

তোমাকে আনিয়া দিতেছি।"

শ্যেন বলিলেন, "মহারাজ, শ্যেন পক্ষী কপোত ভক্ষণ করে। ইহাই বিধাতার বিধি। অন্য কোন জন্তু আমরা খাই না, আমাকে ঐ কপোতটিই দিতে আজ্ঞা হয়।"

রাজা বলিলেন, "তোমাকে শিবিদিগের বিশাল রাজ্য দিতেছি, অথবা আর যাহা চাহ তাহাই দিতেছি, কিন্তু এই শরাণাগত (আশ্রিত) কপোতটিকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব না। আমি যাহা করিলে তুমি এই কপোতটিকে ছাড়িতে সম্মত হও, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

শ্যেন কহিল, "মহারাজ! যদি এই কপোতটির প্রতি আপনার এতই স্নেহ জন্মিয়া থাকে, তবে ইহার সমান ওজনে আপনার নিজের মাংস কাটিয়া আমাকে দিন। তাহা হইলে আমি আহ্লাদের সহিত কপোতকে ছাড়িয়া দিব।"

এ কথায় রাজা অতিশয় আনন্দিত হইয়া, তখনই নিজের মাংস কাটিয়া কপোতের সহিত ওজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কপোতের ভার কি অসম্ভব ছিল, রাজা নিজের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া কতই মাংস কাটিলেন, তথাপি তাহা কপোতের সমান হইল না!

রাজা পুনরায় তাঁহার শরীর হইতে অনেক মাংস কাটিয়া তুলায় দিলেন, তথাপি সেই ক্ষুদ্র কপোতের ভারই বেশি রহিয়া গেল, শেষে নিরুপায় ভাবিয়া তিনি নিজেই সেই তুলায় উঠিয়া বসিলেন।

তখন শ্যেন পক্ষী বলিল, "মহারাজ, আমি ইন্দ্র, আর এই কপোত অগ্নি। আমরা তোমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। আজ তুমি যে আশ্চর্য কাজ করিলে, তাহা চিরদিন ত্রিভুবনের লোকে স্মরণ করিবে।"

এই বলিয়া ইন্দ্র আর অগ্নি চলিয়া গেলেন, মহারাজ উশীনরও তখন পরম সুন্দর মূর্তি ধারণ পূর্বক অতি আশ্চর্য মণিময় রথে আরোহণ করিয়া, স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

মহাভারতের অন্য স্থানে এই ঘটনার বর্ণনায় উশীনরের পরিবর্তে শিবির উল্লেখ আছে। কেহ কেহ উশীনরের তখনই স্বর্গে যাওয়ার কথা বলেন না। তাঁহাদের মতে, অগ্নি রাজার নিকট হইতে বিদায় হওয়ার সময়, তাঁহাকে এই বলিয়া বর দেন যে, 'মহারাজ, আমার জন্য তুমি নিজের মাংস কাটিয়া দিয়াছিলে, আমি তাহা সোনার করিয়া তোমাকে ফিরাইয়া দিতেছি। উহা তোমার শরীরে অতি সুন্দর এবং পবিত্র রাজ-চিহ্ন হইয়া থাকিবে আর তোমার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে কপোতরোমা নামক একটি ধার্মিক পুত্র জন্মিবে। উহার সমান বীর আর এই পৃথিবীতে কেহই থাকিবে না।'

যবক্রীতের তপস্যা

মহর্ষি ভরদ্বাজ এবং রৈভ্য দুই বন্ধু ছিলেন, ভরদ্বাজের একটি পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম যবক্রীত, রৈভ্যের দুই পুত্র ছিলেন, তাঁহাদের নাম অর্ববসু ও পরাবসু।

রৈভ্য এবং তাঁহার পুত্রগণ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, এজন্য মুনিরা সকলেই তাঁহাদিগকে যার পর নাই সম্মান করিতেন। ভরদ্বাজ এবং যবক্রীত তপস্বী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের

বিদ্যা অধিক না থাকায় তাঁহারা তেমন সম্মান পাইতেন না। ইহাতে যবক্রীতের মনে বড়ই ক্লেশ হইত।

যবক্রীত যখন দেখিলেন যে, পণ্ডিত হইতে না পারিলে সমাজে মান লাভ করা যায় না, তখন তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, 'আমি তপস্যা দ্বারা অতি অল্পকালের ভিতরেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইব।'

এই মনে করিয়া যবক্রীত গঙ্গাতীরে গমন পূর্বক, চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেই উৎকট তপস্যার তেজ ইন্দ্রের এতই অসহ্য হইয়া উঠিল যে, তিনি আর যবক্রীতের নিকট না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ইন্দ্র যবক্রীতের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুনিপুত্র, তুমি কিজন্য এরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছ?"

যবক্রীত বলিলেন, "ভগবন, আমি বিদ্যালাভের জন্য তপস্যা করিতেছি। গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া বিদ্বান হইতে অনেক সময় লাগে, আমি তপস্যা করিয়া অল্প কালের মধ্যে এরূপ জ্ঞান লাভ করিতে চাহি যে, অন্য কোন ব্রাহ্মণের তাহা নাই।"

ইন্দ্র বলিলেন, "ব্রাহ্মণ কুমার, বিদ্যালাভের উপায় ত এরূপ নহে, গুরুর নিকট গিয়া যত্ন পূর্বক বিদ্যা লাভ কর। তপস্যায় দেহ ক্ষয় করিলে তোমার বিদ্যালাভ হইবে না। "

এই বলিয়া ইন্দ্র চলিয়া গেলেন, আর যবক্রীত আরো অধিক আগুন জ্বালিয়া, পূর্বাপেক্ষাও ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

ইন্দ্র দেখিলেন, ঋষি-কুমার সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। তখন তিনি অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ যক্ষ্মায় কাতর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া কাশিতে কাশিতে পুনরায় যবক্রীতের তপস্যার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যবক্রীত দেখিলেন যে, কোথা হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া, ক্রমাগত কেবল মুষ্টি মুষ্টি বালি আনিয়া গঙ্গায় ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে তিনি আশ্চর্য হইয়া ভবিলেন, 'বুড়া করে কি!' তারপর হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন. "মহাশয়, ও কি করিতেছেন?"

বুড়া বামুন বলিলেন, "গঙ্গা পার হইতে লোকের ভারি কষ্ট হয়, তাই আমি সেতু বাঁধিতেছি। এই সুন্দর সেতুর উপর দিয়া সকলে অনায়াসে গঙ্গা পার হইবে!"

যবক্রীত হাসিয়া বলিলেন, "হাঃ! হাঃ! হাঃ! তাহাও নাকি কখনো হয়! মুঠো মুঠো বালি ফেলিয়া আপনি ভবিতেছেন, গঙ্গায় সেতু বাঁধিবেন! এ বিড়ম্বনা কেন? তাহার চেয়ে, যাহা হইতে পারে, এমন কোন একটা কাজ করুন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কেন বাপু! তুমি যদি তপস্যা করিয়া মস্ত পণ্ডিত হইতে পার, তবে আমিই বা কেন বালি দিয়া গঙ্গায় সেতু বাঁধিতে না পারিব?"

যবক্রীত বুঝিলেন, এই কেশো বামুন আর কেহই নহে, স্বয়ং ইন্দ্র। সুতরাং, তিনি বলিলেন, "দেবরাজ, আমার এই তপস্যা আপনার ঐ বালির বাঁধের মত, ইহাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে আপনার যাহা সাধ্য হয় করুন। আমি ইহার পর আমার হাত পা গুলির এক-একখানি আগুনে ফেলিয়া আর-একটি ভাল মতে তপস্যা করিব।"

ইন্দ্র ভবিলেন, 'কি বিপদ! এ ত দেখিতেছি বড়ই ভয়ানক লোক, নিজের মতলব আদায়

না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না।' তখন তিনি আর উপায় না দেখিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ কুমার, ক্ষান্ত হও! আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছি। তুমি আর তোমার পিতা আমার বরে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলে, এখন ঘরে চলিয়া যাও।"

তখন আর যবক্রীতের আনন্দ দেখে কে! তিনি হাসিতে হাসিতে পিতার নিকট আসিয়া সকল কথা জানাইলেন। কিন্তু ভরদ্বাজ এ সংবাদে বিশেষ সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন, "বৎস! আমার বড়ই ভয় হইতেছে, পাছে এই ঘটনায় তোমার অহংকার হয়, আর তুমি কষ্ট পাও! দেখ, বালধি মুনির পুত্র মেধাবীও বর পাইয়া বড়ই অহঙ্কারী হইয়াছিল। তাই সে ধনুষাক্ষ মুনির কোপে মারা যায়। পূর্বে বালধির এক পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে তিনি অমর পুত্র লাভের জন্য তপস্যা করেন। দেবতা বর দিলেন, 'তোমার পুত্র ঐ পর্বতের ন্যায় অমর হইবে। যতদিন পর্বত আছে, ততদিন তাহার মৃত্যু নাই, পর্বত নষ্ট হইলে তোমার পুত্রও মরিবে।' সেই অমর পুত্র হইল মেধাবী। সে নিজেকে অমর ভাবিয়া অহঙ্কাব পূর্বক ঋষিদিগের অপমান করিত, একদিন সে ধনুষাক্ষের আশ্রমে গিয়া তাহার অনিষ্ট করিল। ধনুষাক্ষ তাহাকে 'ভস্ম হও।' বলিয়া শাপ দিলেন, কিন্তু সে শাপে পর্বত নষ্ট হইল না, কাজেই মেধাবীরও মৃত্যু হইল না। তাহাতে মুনি ক্রোধভরে এমন ভয়ঙ্কর বিশাল মহিব সকলের সৃষ্টি করিলেন যে, তাহারা দেখিতে দেখিতে শিং দিয়া পর্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিল, আর সেই পর্বত নষ্ট হইবামাত্র মেধাবীও মরিয়া গেল। তাই বলি বৎস, তুমি যেন বরলাভে অহঙ্কারী হইয়া বিপদে পড়িও না।"

যবক্রীত বলিলেন, "বাবা আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না, আমি বিশেষ সাবধান হইয়া চলিব।"

কিন্তু হায়! মুখে বলিলেই যদি কাজে তাহা হইত, তবে আর দুঃখ কি ছিল! অল্পদিনেব ভিতরেই যবক্রীতের অহংকারে মুনিগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। শেষে একদিন যবক্রীত রৈভ্যের আশ্রমের গিয়া পশুর ন্যায় এমন জঘন্য অত্যাচার করিলেন যে, তেমন অত্যাচার কেহই সহিয়া থাকিতে পারে না।

তখন মহর্ষি রৈভ্য ক্রোধে অস্থিব হইযা নিজের মাথার একটি জটা অগ্নিতে আহুতি দিবামাত্র, তাহা হইতে অতি ভীষণ এক রাক্ষস জন্মিয়া, শূল হাতে যবক্রীতকে বধ করিতে চলিল।

যবক্রীত প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে এক সরোবরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন, কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহাতে জল নাই। সেখান হইতে নদীতে গেলেন, দেখিলেন, তাহাও শুকাইয়া গিয়াছে। সেখান হইতে তিনি তাঁহার পিতার অগ্নিশালার দিকে ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। সেই অবসরে রাক্ষস আসিয়া শূল দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিল।

ভরদ্বাজ সে সময়ে গৃহে ছিলেন না। তিনি তথায় ফিরিয়া এই দারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্র করুণ বিলাপ করিতে করিতে রৈভ্যকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, "আমি যেমন পুত্র শোকে কাতর হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছি, সেই রূপ রৈভ্যও বিনা অপরাধে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতে প্রাণ ত্যাগ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

আবার তখনই নিতান্ত দুঃখের সহিত তিনি এ কথাও বলিলেন, "হায়! পুত্র শোকে

ব্যাকুল হইয়া আমি প্রিয় বন্ধুকে এমন শাপ দিলাম, আমার মত দুঃখী এবং পাপী আর কে আছে?"

ইহার কিছুদিন পরে, অর্বাবসু ও পরাবসু একটি যজ্ঞ উপলক্ষে কিছুদিনের জন্য বৃহদ্দ্যুম্ন রাজার বাড়িতে যান। সেই সময়ে একদিন রাত্রিকালে কোন কারণে, পরাবসুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার প্রয়োজন হয়, রৈভ্য যে তখন কৃষ্ণাজিন (কাল হরিণের ছাল) গায় দিয়া বাহিরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, পরাবসু তাহা জানিতেন না। অন্ধকার রাত্রিতে সেই কৃষ্ণাজিন গায়ে রৈভ্যকে দেখিবামাত্র পরাবসু যার পর নাই চমকিয়া গেলেন এবং হিংস্র জন্তু মনে করিয়া, নিজের প্রাণের ভয়ে তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন।

এই পিতৃ হত্যার পাপ হইতে পরাবসুকে মুক্ত করিবার জন্য, ব্রহ্মহিংসন নামক ব্রত করা আবশ্যক হইল। রাজার যজ্ঞ ছাড়িয়া পরাবসুর এই ব্রত করিতে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না, তাই অর্বাবসু তাঁহার হইয়া ব্রত করিতে গেলেন। ব্রত শেষ করিয়া তিনি যখন আবার রাজার যজ্ঞস্থানে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সকলে বলিল, " এই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে! ইহাকে প্রবেশ করিতে দিও না।" ইহাতে অর্বাবসু নিতান্ত আশ্চর্য হইয়া বারবার উচ্চৈঃস্বরে সকলকে বলিলেন, "আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই। আমার ভ্রাতা এ কাজ করিয়াছেন, আমি কেবল তাহাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছি।" কিন্তু তাঁহার কথা কে শুনে? রাজার হুকুমে বিকটাকার ভৃত্যগণ আসিয়া, তাঁহাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দিল।

এই অপমান এবং অবিচারের পর অর্বাবসু আর গৃহে ফিরিলেন না। তিনি মনের দুঃখে বনে গিয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেই তপস্যায় তুষ্ট হইয়া দেবতাগণ তাঁহাকে বর দিতে আসিলেন, তিনি করজোড়ে, তাঁহাদিগকে বলিলেন, "হে দেবতাগণ, আপনাদের যদি দয়া হইয়া থাকে, তবে আমাকে এই বর দিন যে, আমার পিতা আবার জীবিত হউন, আমার ভ্রাতার পাপ দূর হউক, পিতৃদেব তাঁহার অকারণ হত্যার কথা ভুলিয়া যাউন, আর ভরদ্বাজ ও যবক্রীত দুজনেই আবার বাঁচিয়া উঠুন।"

এ কথায় দেবগণ আনন্দের সহিত "তথাস্তু" বলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তারপর যে খুব আনন্দের ব্যাপার হইল, তাহা আর আমি পরিশ্রম করিয়া না বলিলেও হয়ত চলিবে।

মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠিলে খুব আনন্দ প্রকাশ করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যবক্রীত তাহা করিবার পূর্বে দেবতাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দেবতাগণ। আমি ত অনেক ব্রত করিয়াছিলাম, অনেক বিদ্যা শিখিয়াছিলাম তবে কেন রৈভ্যের হাতে আমার এমন দুর্দশা হইল?"

দেবতারা বলিলেন, "বাপু! তুমি বিদ্যালাভ করিয়াছিলে ফাঁকি দিয়া, আর রৈভ্য তাহা পাইয়াছিলেন অনেক যত্নে, অনেক কষ্টে, গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া। এরূপ দুজনের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা হয়ত তুমিও বুঝিতে পার। সুতরাং রৈভ্যের নিকট তোমার পরাভব হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নহে।"

বোধহয়, এ কথায় যবক্রীতের বিলক্ষণ শিক্ষা হইয়াছিল। কেননা, তিনি যে শেষে একজন অতিশয় ধার্মিক ঋষি হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। লোকে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যবক্রীতের আশ্রমে আসিয়া বাস করিত।

চ্যবনের মূল্য

মহর্ষি চ্যবন প্রয়াগ তীর্থে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। এই পবিত্র তীর্থে গঙ্গা এবং যমুনার মিলনের স্থান। সেই স্থানে, গঙ্গা এবং যমুনার জলের মধ্যে কাষ্ঠের ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া, মহর্ষি চ্যবন ক্রমাগত বার বৎসর একমনে একাসনে কেবল ভগবানের চিন্তা করেন। এতদিন জলের মধ্যে স্থির ভাবে থাকায়, তাঁহার দেহ শ্যাওলায় আর শামুকে ঢাকিয়া গিয়াছিল। মাছেরা আশ্চর্য হইয়া দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আর শুঁকিতে আসিত, এবং কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া তাঁহার চারিদিকে খেলা করিত। মহর্ষি এ-সকল ব্যাপারের কোন সংবাদ না লইয়া মনের সুখে ঈশ্বর-চিন্তায় সময় কাটাইতেছেন।

এমনি করিয়া বার বৎসর কাটিয়া গেল। তারপর একদিন কোথা হইতে অসুরের মত জেলেসকল আসিয়া, বিশাল জগৎ-বেড় জালে সে স্থান ঘিরিয়া ফেলিল।

মাছ, কচ্ছপ, কুমির প্রভৃতি যত জন্তু নদীতে ছিল, সকলেই সেই জালে ধরা পড়িল, কেহই তাহা এড়াইতে পারিল না।

তারপর সেই প্রকান্ড জালকে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিবামাত্র জেলেরা দেখিল যে সেই-সকল মাছের সঙ্গে একটি অদ্ভুতরকমের মুনিও সেই জালে ধরা পড়িয়াছেন। তাঁহার সমস্ত শরীর, এমন-কি, দাড়ি আর জটা পর্যন্ত শ্যাওলায় সবুজ হইয়া গিয়াছে, অসংখ্য শামুক, ডুমুরের ফলের ন্যায় তাঁহার দেহে লাগিয়া রহিয়াছে।

মুনিকে দেখিয়া জেলেরা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে বারবার নমস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু চ্যবন তাহাদিগকে কিছুই বলিলেন না। মাছ-গুলিকে জল হইতে তুলিয়া আনাতে তাহারা খাবি খাইতেছিল। তাহাদের কষ্ট দেখিয়া তিনি মনের দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া জেলেরা জোড়হাতে বিনয় করিয়া বলল, "ভগবান, আমরা না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আর এখন আমরা আপনার কি প্রিয় কার্য করিতে পারি, তাহারও অনুমতি করুন।"

চ্যবন বলিলেন, "বাপুসকল! আমি এই মৎস্যগণের সহিত বহুকাল বাস করিয়াছি, এখন কিছুতেই ইহাদিগকে ছাড়িতে পারিব না। আমি হয় ইহাদের সঙ্গে প্রাণত্যাগ করি, না হয় তোমরা আমাকে ইহাদের সহিত বিক্রয় কর।"

মহর্ষির কথায় নিষাদগণ যার পর নাই ভয় পাইয়া, নিতান্ত দুঃখের সহিত মহারাজ নহুষের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাদের নিকট মুনির সংবাদ পাইবামাত্র, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম এবং অশেষ রূপ সমাদর পূর্বক জোড়হাতে বলিলেন, "ভগবন্ কি অনুমতি হয়?"

চ্যবন বলিলেন, "মহারাজ! এই জেলে বেচারারা বড়ই পরিশ্রম করিয়াছে। তুমি উহাদিগকে উহাদের মৎস্যের এবং আমার মূল্য প্রদান কর।"

রাজা বলিলেন, "আপনার অনুমতি হইল আপনার মূল্যস্বরূপ সহস্র মুদ্রা ইহাদিগকে দেওয়া যাউক।"

মুনি বলিলেন, "একহাজার টাকা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। তুমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া, আমার উচিত মূল্য ইহাদিগকে দাও।"

রাজা বলিলেন, "তবে একলক্ষ টাকা দিই?"

মুনি বলিলেন, "একলক্ষ টাকাও আমার উচিত মূল্য নহে। তুমি অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, আমার উচিত মূল্য ইহাদিগকে দাও।"

নহুষ বলিলেন, "তবে ইহাদিগকে এককোটি টাকা বা তাহার চেয়েও বেশি দেওয়া হউক।"

মুনি বলিলেন, "তাহাতেও আমার উচিত মূল্য হইবে না। তুমি ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া এ বিষয়ে পরামর্শ কর।"

রাজা বলিলেন, " তবে আমার অর্ধেক বা সমস্ত রাজ্য দিই। তাহা হইলে বোধহয় আপনার উপযুক্ত মূল্য হইতে পারে।"

মুনি বলিলেন, "তাহাতেও আমার উপযুক্ত মূল্য হইবে না। তুমি ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া, আমার উপযুক্ত মূল্য স্থির কর।"

এ কথায় নহুষ বড়ই চিন্তায় পড়িলেন। রাজ্য দিলেও যদি মুনির উপযুক্ত মূল্য না হয়, তবে আর এমন কি দিবার আছে, যাতে তাহা হইতে পারে? রাজা কত ভাবিলেন, অমাত্যেরা সকলে মিলিয়া কত পরামর্শ করিলেন, কিন্তু এ কথার উত্তর কেহই দিতে পারিলেন না!

এমন সময় অতিশয় জ্ঞানী একজন ফলমূলাহারী তপস্বী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি রাজাকে চিন্তিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! আপনাকে এত চিন্তিত দেখিতেছে কেন?"

রাজা বলিলেন, "ভগবান, এই মহর্ষির উচিত মূল্য কি, তাহা ত আমি কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত রাজ্য দিতে চাহিলাম, তাহাও তিনি যথেষ্ট মনে করিলেন না। ইহার উপর আর কি দেওয়া যাইতে পারে, তাহা ভাবিয়া আমি একেবারে অস্থির হইয়াছি। শীঘ্র ইঁহার উচিত মূল্য স্থির করিতে না পারিলে হয়ত ইঁহার রাগ হইবে, আর আমাকে শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন।"

এ কথা শুনিয়া তপস্বী বলিলেন, "টাকা কড়ি অপেক্ষা গোধনই শ্রেষ্ঠ। গরুর তুল্য ধন নাই। আপনি গরু দিলে মহর্ষির উচিত মূল্য হইতে পারে।"

তখন রাজা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া চ্যবনকে বলিলেন, "ভগবন্, আমি গরু দিয়া আপনাকে ক্রয় করিলাম। বোধহয়, এইবার আপনার উচিত মূল্য হইয়াছে।"

চ্যবন তখনো সেই মাছের গাদায় পড়িয়াছিলেন, রাজার কথায় তিনি আহ্লাদের সহিত তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ। এইবার যথার্থই আমার উচিত মূল্য হইয়াছে। এ সংসারে গরুর তুল্য আর ধন নাই।"

তখনই একটি গাই আনিয়া জেলেদিগকে দেওয়া হইল। গাভীটি পাইয়া জেলেরা অতিশয় বিনীত ভাবে চ্যবনকে বলিল "মুনি-ঠাকুর! সাত পা চলিতে যে সময় লাগে, ততটুকু সময় সাধুদের সঙ্গে থাকিতে পারিলেই তাঁহাদের সহিত বন্ধুতা হয়। আপনার সহিত অনেক্ষণ যাবৎ আমাদের সাক্ষাৎ এবং আলাপ হইয়াছে, সুতরাং আপনি আমাদের উপরে তুষ্ট হউন। আপনি অতি মহাপুরুষ, আপনার পায়ে পড়িয়া বলিতেছি দয়া করিয়া এই গরুটি আপনি

নিন।”

চ্যবন বলিলেন, “বাছাসকল! দরিদ্রের মনে দুঃখ দেওয়া মহাপাপ, সুতরাং আমি কখনো তোমাদের কথা অমান্য করিব না। আমি তোমাদের গাভী গ্রহণ করিলাম। এখন তোমরা এই সকল মৎস্যের সহিত স্বর্গে চলিয়া যাও।”

এই বলিয়া চ্যবন জেলেদের নিকট হইতে গাভীটি গ্রহণ পূর্বক রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া, সেই তপস্বীর সঙ্গে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

একলব্যের গুরুদক্ষিণা

মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র মহাবীর দ্রোণাচার্য কৌরব এবং পাণ্ডব রাজপুত্রদিগকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তাঁহার যশে ত্রিভুবন ছাইয়া গিয়াছিল। দেশ-বিদেশের সকল রাজপুত্রেরা আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। একদিন নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য আসিয়া, ভূমিতে লুটাইয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক করজোড়ে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

দ্রোণ সেই বালকের বলিষ্ঠ দেহ এবং সকল উজ্জ্বল মুখশ্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে বৎস? কাহার পুত্র?কি জন্য আসিয়াছ?”

একলব্য মাথা হেঁট করিয়া জোড়হাতে বলিল, “ভগবন! আমার নাম একলব্য, পিতার নাম হিরণ্যধনু, জাতিতে নিষাদ। দয়া করিয়া আমাকে শিষ্য করিলে, আপনার চরণ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব।”

একলব্যের মুখের দিকে চাহিয়া দ্রোণের মনে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার পরিচয় শুনিবামাত্র তাহা শুকাইয়া গেল, নিষাদের পুত্র ম্লেচ্ছ জাতি, তাহকে স্পর্শ করিলেও পাপ হয়। তাহাকে কি কখনো শিষ্য করা যাইতে পারে, না সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশিতে দেওয়া যাইতে পারে? দ্রোণ তাহাকে অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, “তুমি ম্লেচ্ছের পুত্র, তুমি কি সাহসে আমার শিষ্য হইতে আসিয়াছ?”

একলব্য অনেক আশা করিয়া আসিয়াছিল, দ্রোণের এক কথায় তাহার সকল আশা চূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রতি তাহার ভক্তি কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। তাঁহার ঐ কথার পর সে আর তাঁহাকে কিছু বলিলও না। সে নীরবে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া, ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

একলব্য এখন কোথায় যাইবে? দেশে ফিরিবে? না, দেশে যাইবার যে পথ, সে পথে ত সে গেল না, সে যে অন্য পথে বনের দিকে চলিয়াছে। বাস্তবিক সে বনে যাওয়াই স্থির করিয়াছে। ম্লেচ্ছের পুত্র হইলেও সে সাধারণ লোক নহে, যাহা শিখিতে আসিয়াছিল, তাহা না শিখিয়া কখনই সে দেশে ফিরিবে না। দেশ হইতে যাত্রা করিবার সময়ই সে মনে মনে দ্রোণকে গুরু করিয়া আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাতে কি? তথাপি তিনিই তাহার গুরু। যে বিদ্যা তিনি ইচ্ছা পূর্বক দান করিলেন না, ভগবানের কৃপা হইলে, তপস্যা করিয়া সে সেই বিদ্যা তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিবে।

এই মনে করিয়া সে বনের ভিতরে আসিয়া মৃত্তিকা দ্বারা দ্রোণের এক মূর্তি প্রস্তুত

করিল। তারপর, সম্মুখে সেই মূর্তি , হাতে ধনুর্বান, আর হৃদয়ে অটল প্রতিজ্ঞা, এইরূপে সে ভগবানকে স্মরণ পূর্বক আশ্চর্য অধ্যবসায়ের সহিত অস্ত্র অভ্যাস আরম্ভ করিল।

এইরূপে অনেকদিন চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে একদিন পাণ্ডব এবং কৌরব মৃগয়া করিবার জন্য রথারোহণ পূর্বক সেই বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের একজন সঙ্গে করিয়া একটি কুক্কুরও আনিয়াছিলেন। রাজপুত্রেরা মৃগের সন্ধানে বনে প্রবেশ করিলে, সেই কুক্কর স্বভাব-দোষে চঞ্চলভাবে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে স্থান হইতে একলব্যের আশ্রম বেশি দূরে ছিল না। কুক্কুরটি ঝোপে ঝোপে উঁকি মারিয়া আর গাছে গাছে শুঁকিয়া ক্রমে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, আর একলব্যকে দেখিবামাত্র সে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। ইহাতে একলব্যের অতিশয় অসুবিধা বোধ হওয়াতে, সে একবারে সাতটি শর মারিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

রাজপুত্রেরা শিকারে ব্যস্ত, এমন সময় কুকুরটি নিতান্ত জড়সড় ভাবে তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বেচারার লেজ প্রাণপণে গুটান, মুখে শরের ছিপি আঁটা, ঘেউ ঘেউ করিবার শক্তি নাই! অন্তরে আতঙ্কের অবধি নাই, তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া রাজপুত্রগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিশেষত, এমন করিয়া তাহার মুখে সেই আশ্চর্য ছিপি কে আঁটিল, এই কথা ভাবিয়া তাঁহারা একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। সে ব্যক্তি যে ধনুর্বিদ্যায় তাঁহাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল, কেননা, তাঁহাদের কাহারো এমন অদ্ভুত কাজ করিবার শক্তি ছিল না।

সুতরাং রাজপুত্রদের আর শিকার করা হইল না। তাহার পরিবর্তে, এখন সেই অসাধারণ বীরকে খুঁজিয়া বাহির করাই হইল তাঁহাদের প্রধান কাজ। অনেকক্ষণ বনে বনে অনুসন্ধান করিয়া, শেষে তাঁহারা দেখিলেন যে, এক বিশাল দেহ জটাধারী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ এক মনে কেবলই শর নিক্ষেপ করিতেছে। তাঁহারা ইহাতে অতিশয় আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র, এবং দ্রোণাচার্যের শিষ্য। আমার নাম একলব্য।"

ইহার পূর্বে রাজপুত্রদিগের যেমন আশ্চর্য বোধ হইয়াছিল, একলব্য দ্রোণাচার্যের শিষ্য এ কথা শুনিয়া তাঁহাদের তেমনই অভিমান হইল। সুতরাং তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া সেখান হইতে একেবারে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "গুরুদেব, আমাদের কি অপরাধ হইয়াছে, যে, আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া, নিষাদ পুত্র একলব্যকে এমন চমৎকার শিক্ষা দান করিলেন?"

এ কথায় দ্রোণ ত নিতান্তই আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তিনি অনেক ভাবিয়াও এই ব্যাপারের কোন অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি বলিলেন, "বৎসগণ, আমি ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই ব্যক্তি কেমন করিয়া আমার শিষ্য হইল, আমিই বা কখন ইহাকে শিক্ষা দিলাম, তাহা ভাবিয়া আমি অবাক হইতেছি, চল, ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইবে।"

তখনই সকলে মিলিয়া পুনরায় একলব্যের নিকট আসিলেন। একলব্য দূর হইতে দ্রোণকে দেখিতে পাইয়াই "গুরুদেব" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল। তাহার পর তাঁহাকে

বসিবার জন্য আসন দিয়া, জোড়হাতে তাঁহার সম্মুখে দাড়াইয়া রহিল।

তখন দ্রোণ বলিলেন, "হে বীর, যদি তুমি সত্য-সত্যই আমার শিষ্য হও, তবে আমার দক্ষিণা দাও।"

এ কথায় একলব্য যার পর নাই আনন্দিত হইয়া বলিল, "গুরুদেব, কিরূপ দক্ষিণা দিতে হইবে, অনুমতি করুন, আমি তাহা আনিয়া দিতেছি।"

দ্রোণ বলিলেন, "তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি কাটিয়া আমাকে দাও, উহাই আমার দক্ষিণা!"

একলব্য তখনই হাসিতে হাসিতে তাহার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি কাটিয়া দ্রোণকে দিল। এমন নিষ্ঠুর ব্যবহারের পরও এমন বোধ হইল না যে, দ্রোণের প্রতি তাহার ভক্তি কিছুমাত্র কমিয়াছে।

অঙ্গুষ্ঠ গেল, সুতরাং একলব্যের আর তেমন আশ্চর্য রূপ তীর ছুঁড়িবার ক্ষমতা রহিল না, ইহাতে দ্রোণাচার্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন একলব্যও এই-সকল কথা ভাবিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

কুশিকের সহিষ্ণুতা

কান্যকুব্জের রাজা গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র, ক্ষত্রিয় হইয়াও নিজের অসাধারণ তপস্যার বলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র যে ব্রাহ্মণ হইবেন, এ কথা তাঁহার জন্মের অনেক পূর্ব হইতেই জানা ছিল। ক্ষত্রিয়েরা এইরূপে ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণদিগের এরূপ ইচ্ছা হয়ত একেবারেই ছিল না। এমন কি, মহর্ষি চ্যবন প্রথমে এ কথা ব্রহ্মার নিকট শুনিতে পাইয়া, যে বংশে বিশ্বামিত্রের জন্মগ্রহণ করিবার কথা ছিল, সেই বংশটাকেই নাশ করিবার জন্য বিধি মতে চেষ্টা করেন।

তখন বিশ্বামিত্রের পিতামহ মহারাজ কুশিক কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। চ্যবন মনে করিলেন, 'এই কুশিককে কোন সুযোগে শাপ দিয়া বংশকে ভস্ম করিতে হইবে। আমি উহার সঙ্গে বাস করিয়া নানারূপে উহাকে কষ্ট দিব। তাহা হইলে অবশ্য উহার রাগ হইবে। তখন সে আমাকে কিছুমাত্র অসম্মান করিলেই, আমি উহাকে শাপ দিব।' তাই তিনি একদিন কুশিকের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ। আমি তোমার সহিত কিছুকাল বাস করিব!"

রাজা তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া, নিজ হাতে তাঁহার পদ প্রক্ষালন পূর্বক অতিশয় বিনয় ও সমাদরের সহিত বলিলেন, "ভগবন, অনুমতি করুন, এখন কি করিতে হইবে।"

মুনি বলিলেন, "আর কিছুই করিতে হইবে না, আমি একটি ব্রত করিব, সেই ব্রত শেষ না হওয়া পর্যন্ত, তুমি এবং তোমার রানী সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমার সেবা কর।"

রাজা ও রানী আহ্লাদের সহিত তখনই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সন্ধ্যা হইবামাত্র মুনিঠাকুর রাজার গৃহের সমস্ত অন্ন, ব্যঞ্জন, পায়স এবং মিষ্টান্ন নিঃশেষ পূর্বক, অতি পরিপাটি রূপে আহার করিয়া বলিলেন, "আমি নিদ্রা যাইব, যতক্ষণ আমি নিদ্রিত থাকি, ক্রমাগত আমার সেবা কর, দেখিও, আমার ঘুম ভাঙে না যেন!"

মহর্ষি নিদ্রা গেলেন, রাজা আর রানী তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। একুশদিন এইভাবে চলিয়া গেল, একুশদিনের মধ্যে একবারও মহর্ষির নিদ্রাভঙ্গ হইল না। একুশদিনের ভিতরে, রাজা আর রানী একটিবারও মহর্ষির পদসেবা ছাড়িয়া উঠিবার অবসর পাইলেন না। অনাহারের অনিদ্রায় তাঁহাদের এই দীর্ঘকাল কাটিল।

একুশদিনের পর মহর্ষি শয্যা ত্যাগ পূর্বক, কোন কথা না বলিয়া, বেড়াইতে বাহির হইলেন। রাজা আর রানী ক্ষুধায় অতিশয় কাতর এবং অনিদ্রা আর পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াও মুনির সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, কিন্তু মুনি একটিবার তাঁহাদের পানে চাহিয়াও দেখিলেন না।

কিঞ্চিৎ পরেই রাজা দেখিলেন মুনি আর সেখানে নাই, তিনি আকাশে মিলাইয়া গিয়াছেন রাজা আর রানী তখন যার পর নাই ভয় এবং দুঃখের সহিত সেই ক্লান্ত শরীরেই প্রাণপণে মুনিকে খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার দেখা পাইলেন না। শেষে নিতান্ত লজ্জিত ও কাতরভবে ঘরে ফিরিয়া আসিবামাত্র দেখিলেন, মহর্ষি পরম সুখে শয্যায় নিদ্রা যাইতেছেন! সুতরাং তখনই আবার তাঁহার পদসেবা আরম্ভ করিতে হইল।

এইরূপে গেল আর একুশদিন। আমরা হইলে এতদিন অনাহারে অনিদ্রায় বাঁচিয়াই থাকিতে পারিতাম না, পদসেবা করা ত দূরের কথা! কিন্তু রাজা আর রানী এত কষ্ট সহিয়াও কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই, বা সেবার ত্রুটি করেন নাই।

তারপর মহর্ষি হঠাৎ উঠিয়া বলিলেন, "তৈল আন! স্নান করিব।"

তখনই মহামূল্য তৈল আনিয়া মুনির গায়ে মাখান হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া মাখান হইলে, মুনি নিজেই উঠিয়া স্নানের ঘরে গেলেন। সেখানে স্নানের আয়োজন সকলই প্রস্তুত ছিল। রাজ মুনিকে স্নান করাইতে গিয়া দেখেন, মুনি নাই! আবার তখনই ঘরে আসিয়া দেখিলেন, মুনি সেখানে বসিয়া আছেন, তাঁহার স্নান হইয়া গিয়াছে! তখন রাজা ভক্তি পূর্বক জোড় হাতে বলিলেন, "ভগবন! অনুমতি করুন, অন্ন আনি।"

মুনি বলিলেন, "ঘরে যত খাবার আছে, সব লইয়া আইস!"

তখনই রাজবাটীর সকল ভাত, সকল ব্যঞ্জন, সমস্ত সন্দেশ আনিয়া মুনির সম্মুখ উপস্থিত করা হইল। মুনিবর তাহার উপরে সেই ঘরের সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র, আসন, শয্যা প্রভৃতি স্থাপন করতঃ, তাহাতে অগ্নি প্রদান পূর্বক সেখান হইতে অন্তর্ধান হইলেন।

তাহাতেও রাজার কিছুমাত্র রাগ হইল না। এইরূপে উনপঞ্চাশ দিন গেল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে একদিনও এমন দেখা গেল না যে, রাজার অতি সামান্য পরিমাণেও মুখ ভার হইয়াছে।

পঞ্চাশদিনের দিন মুনি বলিলেন, "আমাকে রথে বসাইয়া তুমি আর রানী তাহা টানিয়া লইয়া চল, আমি হাওয়া খাইব!"

তখনই রাজা আর রানীকে জুতিয়া রথ আনা হইল, মুনি অতিশয় তীক্ষ্ণ প্রতোদ (খোঁচা মারিবার জন্য লাঠি) হস্তে তাহাতে উঠিয়া বসিলেন।

রাজা বলিলেন, "ভগবান! কোন দিকে যাইব?"

মুনি বলিলেন, "বড় রাস্তার ভিতর দিয়া চল। আর ধনরত্ন যত পার সঙ্গে লও, আমি দান করিব!"

রাজা আর রানী রাজপথের জনতার ভিতর দিয়া রথ টানিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ দানের

জন্য রাশি রাশি ধন, রত্ন, হাতি, ঘোড়া, ছাগ, মেষ, প্রভৃতি লইয়া সঙ্গে চলিল। তখন মুনি অতি নির্দয় ভাবে সেই তীক্ষ্ম প্রতোদ দিয়া, রাজা রানীর শরীরে খোঁচা মারিতে আরম্ভ করিলেন। নগরের লোক সে দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া হাহাকার করিতে লাগিল, কিন্তু রাজার তাহাতেও রাগ হইল না। তারপর মুনি তাঁহার ধনরত্ন সমুদায়ই দান করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এত অত্যাচারেও যাঁহার রাগ হয় নাই, সামান্য ধনের ক্ষতিতে তাঁহার কি হইবে মুনি পরাস্ত হইয়া গেলেন! ইহার পর রাজার অনিষ্টের চেষ্টা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

তখন তিনি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, রাজার নিকট সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ পূর্বক বলিলেন, "মহারাজ! বর লও!"

রাজা বিনয়ের সহিত বলিলেন, "মুনি ঠাকুর! আমি যে সবংশে নষ্ট হই নাই, ইহাই আমার যথেষ্ট বর, আর বর লইয়া কি করিব? আপনি আমার ত্রুটি পাইলেই আমাকে ভস্ম করিতেন। এত ঘটনার ভিতরেও যে আমার কোন ত্রুটি হয় নাই, ইহা আমার বিশেষ সৌভাগ্য।"

নৃগের পাপ

দ্বারকা নগরের নিকটে যদুকুলের বালকগণ খেলা করিতেছিল। অনেকক্ষণ খেলা করিয়া তাহাদের অত্যন্ত পিপাসা হওয়ায়, তাহারা জল খুঁজিতে খুঁজিতে একটা প্রকান্ড পুরাতন কূয়ার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যে কত কালের পুরানো কূয়া, তাহা কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। তাহার মুখ লতা-পাতায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, দেখিলে হঠাৎ তাহাকে কূয়ার মুখ বলিয়া চিনিতেই পারা যায় না। যাহা হউক, বালকেরা সেই কূয়া দেখিতে পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইল, এবং উৎসাহের সহিত তাহা হইতে জল তুলিতে গেল। কিন্তু তাহারা অনেকে চেষ্টা করিয়াও জল তুলিতে পারিল না! তাহাদের মনে হইল, যেন কোন-একটা প্রকান্ড জিনিস সেই কূয়ার মুখ আটকাইয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা বলিল যে, জল খাইতে পাই আর না পাই, কূয়ার মুখ কিসে বন্ধ হইল, তাহা দেখিতে হইব।

এই বলিয়া তাহারা অনেক কষ্টে গাছপালা কাটিয়া কূয়ার মুখ পরিষ্কার করিবামাত্র দেখিতে পাইল যে, এক পর্বত প্রমাণ কৃকলাশ (গিরগিটি) কূয়ার ভিতর হইতে তাহাদের পানে মিট্‌মিট্ করিয়া তাকাইতেছে। যদুকুলের বালকেরা বিলক্ষণ সাহসী ছিল বলিতে হইবে। সেই বিশাল এবং ভীষণ গিরগিটিকে দিখিয়া চিৎকার বা উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন, ইহার কিছুই তাহারা করিল না বরং তখনই তাহারা 'আন দড়ি!' 'আন্ আঁকষি!' 'আন্ দোয়ালি!' বলিয়া মহা উৎসাহের সহিত তাহাকে কূয়া হইতে উঠাইবার আয়োজন করিল।

কিন্তু সে কি সহজ গিরগিটি? বালকদের টানাটানিই সার হইল, গিরগিটি কিছুতেই সেখান হইতে নড়িল না।

ইহাতে বালকগণ অতিশয় অপ্রস্তুত হইয়া কৃষ্ণের নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ! একটা ভয়ঙ্কর কৃকলাশ এক বিশাল কূপের মুখ জুড়িয়া বসিয়া আছে। আমরা প্রাণপণে টানাটানি করিয়াও তাহাকে উঠাইতে পারিলাম না!"

কৃষ্ণ বলিলেন, "বটে! তোমরা সকলে মিলিয়া একটা কৃকলাশকে টানিয়া তুলিতে পারিলে

না! চল ত দেখি, সে কেমন ভয়ানক কৃকলাশ!"

কৃষ্ণ সেই কূপের নিকট গিয়া গিরগিটিটাকে টানিয়া তুলিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই সেটা এক অতি বিশাল পর্বত প্রমাণ জন্তু, সে আবার মানুষের মত কথা কহে!

কৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি কে হে?" গিরগিটি বলিল, "আমি রাজা নৃগ!"

ইহাতে কৃষ্ণ যার পর নাই আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "সে কি অদ্ভুত কথা! মহারাজ নৃগ পরম ধার্মিক ছিলেন। যাগ, যজ্ঞ, দান, ধর্ম এই পৃথিবীতে তাঁহার মতন আর কেহই করে নাই। সেই মহারাজ নৃগের এমন দুরবস্থা কি করিয়া হইল?"

গিরগিটি বলিল, "হে বাসুদেব, আমি পূর্বজন্মে অনেক দান, অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু একটি পাপ কার্যও না জানিয়া করিয়াছিলাম।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "কিরূপ পাপ?"

গিরগিটি বলিল, "এক ব্রাহ্মণের একটি গরু আমার গরুর পালের ভিতরে ঢুকিয়া যায়। আমার রাখালেরা তাহাকে না চিনিতে পারিয়া আমারই গরুর সামিল করিয়া লয়। তারপর আমি এই ঘটনার কথা কিছুই না জানিয়া, সেই গরু অপর এক ব্রাহ্মণকে দান করি। কিছুদিন পরে গরু লইয়া দুই ব্রাহ্মণে বিবাদ হইল। একজন বলেন,'এ আমার গরু!' আর একজন বলেন, 'তাহা কখনই হইতে পারে না,' স্বয়ং রাজা আমাকে এই গরু দান করিয়াছেন।" এইরূপে বিবাদ করিতে করিতে দুই ব্রাহ্মণ আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমি দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকে বলিলাম, 'ঠাকুর আমি আপনাকে এক অযুত গরু দিতেছি, আপনি এই ব্রাহ্মণের ঐ গরুটি তাঁহাকে দিন।' ইহাতে সেই ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'এই গরুর মিষ্ট দুধটুকু খাইয়া আমার মা-হারা রোগা ছেলেটি বাঁচিয়া রহিয়াছে। এমন গরুটিকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না।' এই বলিয়া তিনি তখনই তাড়াতাড়ি ঘরে চলিয়া গেলেন। তখন আমি প্রথম ব্রাহ্মণকে বলিলাম, 'ভগবন! আমি আপনার সেই গরুর বদলে একলক্ষ গরু আপনাকে দিতেছি, দয়া করিয়া তাহা গ্রহণ করুন।' ব্রাহ্মণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমার ঘরে খাবার আছে, রাজাদের দান লওয়ার আমার কোন প্রয়োজন নাই! আপনি আমার গরুটি আমাকে ফিরাইয়া দিন। তখন আমি তাঁহাকে ধন, রত্ন, গাড়ি,ঘোড়া, কতই দিতে চাহিলাম, তিনি কিছুতেই রাজি না হইয়া দুঃখের সহিত গৃহে চলিয়া গেলেন। তারপর যথা সময়ে আমার আয়ু শেষ হইলে, আমি দেহ ত্যাগ করিয়া যমের নিকট উপস্থিত হইলাম, যম আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! তোমার পুণ্যের শেষ নাই। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের গরুটির দরুণ একটি পাপও তোমার হইয়াছে। এখন বল, তুমি পাপের ফল আগে চাহ, না পুণ্যের ফল আগে চাহ?' আমি জোড়হাতে বলিলাম, 'ধর্মরাজ আমার পাপের সাজাই আমাকে আগে দিন।'এই কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইবামাত্র, আমি কৃকলাশ হইয়া হেঁট মুখে এই কূয়ার ভিতরে পড়িয়া গেলাম। পড়িবার সময় শুনিতে পাইলাম, যম বলিতেছেন, 'মহারাজ! একহাজার বৎসর পরে ভগবান বাসুদেব তোমাকে উদ্ধার করিবেন। তারপর তুমি স্বর্গে যাইবে।' "

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই স্বর্গ হইতে সুন্দর রথ নামিয়া আসিল এবং মহারাজ নৃগ কৃকলাশ রূপ পরিত্যাগ পূর্বকউজ্জ্বল দেহ ধারণ করতঃ, সেই রথে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তারপর দ্বারকার বালকগণও, সেই অদ্ভুত কৃকলাশের বৃত্তান্ত উৎসাহের সহিত সকলকে বলিতে বলিতে, মনের সুখে কৃষ্ণের সঙ্গে ঘরে ফিরিল।

গৌতমীর ক্ষমা

পূর্বকালে গৌতমী নামে এক অতি দয়াশীলা ধর্মপরায়ণা এবং বুদ্ধিমতী ব্রাহ্মণী ছিলেন। অন্ধের যষ্টির ন্যায় একটিমাত্র অতি গুণবান পুত্র ভিন্ন এ সংসারে তাঁহার আর কেহই ছিল না। দুঃখিনী মাতার সেই পুত্রটিকে একদিন এক দুষ্ট সর্প দংশন পূর্বক সংহার করিল।

দৈবাৎ সেই সময়ে সেইখান দিয়া এক ব্যাধ যাইতেছিল, তাহার নাম অর্জুন, অর্জুন সেই দুষ্ট সর্পকে তাহার নিষ্ঠুর কার্য শেষ করিয়া আর পলায়ন করিবার অবসর দিল না। সে ক্রোধে অস্থির হইয়া তখনই তাহাকে বন্ধন করতঃ গৌতমীর নিকটে উপস্থিত করিল।

গৌতমীর নিকটে আসিয়া ব্যাধ বলিল, "মা! এই দুষ্ট সাপ আপনার পুত্রকে বধ করিয়াছে এখন বলুন, ইহাকে কেমন করিয়া মারিব, পোড়াইয়া ফেলিব, না কাটিয়া খন্ড খন্ড করিব?"

ব্যাধের কথায় গৌতমী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাছা! ইহাকে মারিয়া এখন আমার কি লাভ হইবে? আমার পুত্রের আয়ু শেষ হওয়াতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সর্প কেবল উপলক্ষ মাত্র। সুতরাং তুমি ইহাকে ছাড়িয়া দাও।"

ব্যাধ বলিল, "মা! এই দুষ্টকে ছাড়িলে সে হয়ত আরো কত লোককে কামড়াইবে। সুতরাং ইহাকে বধ করাই উচিত হইতেছে।"

গৌতমী বলিলেন, "বাছা! ইহাকে মারিলে ত আমার পুত্র ফিরিয়া পাইব না। আর এ কাজে আমার কোন পুণ্যও হইবে না। সুতরাং আমি ইহাকে ক্ষমা করিতেছি।"

এই-সকল শুনিয়া সেই সর্প ব্যাধকে কহিল, "ভাই, মৃত্যু আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাই আমি এই বালককে কামড়াইয়াছি। ইহাতে আমার কি দোষ? দোষ যদি থাকে, তবে সেই মৃত্যুর।"

ব্যাধ বলিল, "হইতে পারে, মৃত্যুই তোমাকে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু মারিয়াছ ত তুমি। মৃত্যুর যদি দোষ থাকে তাহা পাঠাইবার দোষ মাত্র, মারিবার দোষ তাঁহার নহে, সে দোষ তোমারই।"

সর্প কহিল, "আমি ত কেবল আজ্ঞা পালন করিয়াছি মাত্র, দোষ কেন আমার হইবে? মৃত্যু আমাকে না পাঠাইলে কখনই আমি এই বালককে বধ করিতাম না। তোমরা যে পুরোহিতকে দিয়া পূজা করাও, তাহার ফল ত তোমরাই পাও। পুরোহিত ত পান না। তেমনি মৃত্যু যদি আমাকে দিয়া কোন কাজ করান, তাহার ফল তাঁহারই পাইতে হয়, আমার তাহাতে কোন ভাগ নাই।"

এইরূপ তর্ক হইতেছে, এমন সময় মৃত্যু সেখানে আসিয়া বলিলেন, "বালকের মৃত্যুর কাল হইয়াছিল, তাই আমি তাহাকে পাঠাইয়াছিলাম। আমরা সকলেই কালের অধীন, সুতরাং আমারই বা দোষ কি? দোষ ত কালের।"

তাহা শুনিয়া ব্যাধ বলিল, "বুঝিয়াছি! তোমরা দুজনেই যত অনিষ্টের মূল। তোমাদের মত এমন নিষ্ঠুর দুষ্ট লোক আর কোথাও নাই।"

এ সময়ে কাল যদি তথায় আসিয়া মীমাংসা করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে এ তর্ক কোথায় গিয়া শেষ হইত, কে জানে? কাল আসিয়া বলিলেন, "তোমরা কেন এত বিবাদ

করিতেছ? বালক পূর্বজন্মে যেমন কাজ করিয়াছে, এ জন্মে তেমন ফল পাইয়াছে, সুতরাং দোষ আর কাহারো নহে। দোষ সেই বালকের নিজেরই!"

তখন গৌতমী বলিলেন, "অর্জুন, আমার পুত্র তাহার কর্মদোষেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আর আমিও আমার কর্ম দোষেই এই শোক পাইয়াছি। তাই বলি বাছা, এই সর্পকে ছাড়িয়া দিয়া নিজের ঘরে যাও।"

এ কথায় ব্যাধ সর্পকে ছাড়িয়া দিল। মৃত্যু এবং কাল নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। গৌতমীও ভগবানের চিন্তায় মন দিয়া পুত্রশোক নিবারণ করিলেন।

ধূর্ত শিয়াল

এক যে ছিল শিয়াল, তার ছিল চারিজন বন্ধু। এক বন্ধু বাঘ, এক বন্ধু ইঁদুর, এক বন্ধু বৃক (হুড়ার), আর এক বন্ধু নেউল, পাঁচ বন্ধুতে খুব ভাব, তাহারা বনের ভিতরে থাকে আর শিকার ধরিয়া খায়।

সব দিন সমান শিকার মিলে না, কোনদিন ছোট, কোনদিন বড়। ইহার মধ্যে একদিন খুব বড় একটা হরিণ কোথা হইতে সেখানে আসিল। হরিণ দেখিয়া পাঁচ বন্ধুর বড়ই আনন্দ হইল, তাহারা বলিল, "আজ এই হরিণ মারিয়া পেট ভরিয়া খাইব!"

অমনি বাঘ ছুটিল, বৃক ছুটিল, শিয়াল ছুটিল, নেউল ছুটিল। হরিণও তাহাদিগকে দেখিয়া প্রাণের ভয়ে ছুটিতে লাগিল। সে হরিণ ছিল তাহার দলের সর্দার! তাহার গায় আর পায় ভয়ানক জোর। মাথায় তেমনি মস্ত শিং। তাহার সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া পাঁচ বন্ধুর এই লম্বা লম্বা জিব বাহির হইয়া পড়িল, তাহার শিং নাড়া দেখিয়া ভয়ে তাহাদের প্রাণ উড়িয়া গেল!

তখন শিয়াল বলিল, "বাঘ মামা, ওর গায়ে বড় জোর, ওকে অমনি কাবু করিতে পারিবে না। চল, আমরা চুপি চুপি ঝোপের ভিতরে লুকাইয়া থাকি। তারপর যখন হরিণটা ঘুমাইয়া পড়িবে, তখন ইঁদুর গিয়া খ্যাঁচ্ করিয়া তাহার পায়ের শির কাটিয়া দিবে। তখন আর সে ছুটিতেও পারিবে না, গুঁতাইতেও পারিবে না। তাহা হইলেই আমরা তাহাকে মারিয়া, মনের সুখে পেট ভরিয়া খাইব।"

বাঘ বলিল, "বেশ বলিয়াছ ভাগ্নে, তবে তাহাই হউক।"

বৃক, নেউল, আর ইঁদুরও একসঙ্গে বলিল, "হাঁ, হাঁ! তবে তাহাই হউক!"

তারপর ইঁদুর ঘুমের ভিতর যেই হরিণের পায়ের শির কাটিয়া দিল, অমনি বাঘ তাহার ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিল।

তখন শিয়াল নাচিতে নাচিতে বলিল, "বাঃ! বাঃ! ইঁদুর বন্ধুর দাঁতে কেমন ধার, আর বাঘ মামার গায়ে কি জোর! এখন সকলে মিলিয়া হরিণটাকে খাইতে হইবে। তোমরা শীঘ্র শীঘ্র স্নান করিয়া আইস, ততক্ষণে আমি এটাকে পাহারা দিই!"

শিয়ালের কথায় আর-সকলে স্নান করিতে গেল, আর সে ঘাড় উঁচু করিয়া, কান খাড়া করিয়া, খুব গম্ভীরভাবে বসিয়া যেন কতই পাহারা দিতে লাগিল। খানিক বাদে বাঘ স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, শিয়ালের মুখ বড়ই ভার, যেন সে যার পর নাই ভাবনায় পড়িয়াছে।

তাই সে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাগ্নে, এত গম্ভীর দেখিতেছি যে, কি ভাবিতেছ?"

শিয়াল বলিল, "আর মামা, সে কথা বলিয়া কাজ কি? আমার মন বড্ড খারাপ হইয়া গিয়াছে। তুমি ত গেলে স্নান করিতে। তখন ইঁদুর হতভাগা বলে কিনা যে, সে নিজেই হরিণ মারিয়াছে, তুমি নাকি কিছুই করিতে পার নাই। আর মামা, তোমার নিন্দাটা যে সে করিল, সে আর কি বলিব? এরপর আমার আর এই হরিণ খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

এ কথায় বাঘ গর্জন করিয়া বলিল, "বটে? তবে কাজ নাই ভাগ্নে ও হরিণ খাইয়া। আমি এখনই আরো অনেক জন্তু মারিয়া আনিতেছি, তাহাই আমরা খাইব।"

এই বলিয়া বাঘ সেখান হইতে চলিয়া গেল, তারপর আসিল ইঁদুর। ইদুরকে দেখিয়া শিয়াল খুব গম্ভীরভাবে বলিল, "তাই ত, ভাই একটা কথা যখন হইয়াছে, তখন তোমাকে তাহা না বলা কি ভাল হয়? এইমাত্র বৃক তোমাকে খুঁজিতে গেল। সে বলিয়াছে তাহার নাকি হরিণ খাইতে একটুও ভাল লাগে না, আজ সে ইঁদুর খাইবে!"

যেই এই কথা শুনা, অমনি, "মাগো! আমার কাজ নাই হরিণ খাইয়া! বলিয়া ইঁদুর দুই লাফে গর্তের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল!"

ইঁদুর গর্তে ঢুকিবার একটু পরেই শিয়াল দেখিল, ঐ বৃক আসিতেছে। অমনি সে যার পর নাই ব্যস্ত হইয়া তাহার নিকট গিয়া তাহার কানে কানে বলিল, "ভাই! বড়ই ত মুস্কিল দেখিতেছি। তুমি বাঘকে কি বলিয়াছ? সে দেখিতেছি তোমার উপর চটিয়া একেবারে আগুন। আমি কি তাহাকে থামাইয়া রাখিতে পারি? সে পারিলে যেন আমাকেই ধরিয়া খায়। সে এই মাত্র তোমার খুঁজিতে গেল। এখনই আবার আসিবে।"

তাহা শুনিয়া বৃক বলিল, "সর্বনাশ! তবে আমি এই বেলা পলাই! বাঁচিয়া থাকিলে অনেক হরিণ খাইতে পারিব।" তারপর আর সে সেখানে একটুও দেরি করিল না।

বৃক যাইবামাত্র, শিয়াল তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেখানকার মাটিতে বড় বড় আঁচড় কাটিতে লাগিল। তারপর খানিক ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া, আর মুখের দুই পাশে অনেক থুথু আর হরিণের রক্ত মাখাইয়া, বিকট ভেংচি মারিয়া বসিয়া রহিল।

নেউল স্নান করিয়া আইয়া দেখে, একি বিষম কান্ড! শিয়াল তাহার দিকে খালি আড় চোখে চায়, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই দাঁত খিঁচাইতে থাকে। শেষে সে অনেক মিনতি করিয়া বলিল, "কি হইয়াছে ভাই, বল না?"

এ কথায় শিয়াল দুই চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "বাঘ পলাইল, বৃক পলাইল, এখন নেউল বলে কিনা, 'কি হইয়াছে?' হইবে আর কি? ওরা সকলেই আমার কাছে যুদ্ধে হারিয়া পলাইয়াছে। এখন খালি তুমিই বাকি, আইস একবার যুদ্ধ করি।"

এই বলিয়া শিয়াল আরো বেশি করিয়া দাঁত খিঁচাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া নেউল বলিল, "ভাই, তোমার অত পরিশ্রম করিতে হইবে না, আমি বিনা যুদ্ধেই হার মানিতেছি।"

তারপর তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল। আর শিয়াল খানিক খুব হাসিয়া লইয়া হরিণ খাইতে বসিল।

দুষ্ট হাঁস

সমুদ্রের ধারে এক ভারি দুষ্ট বুড়া হাঁস থাকিত। সে মুখে কেবলই মিষ্ট হাসি হাসিত, আর মনের ভিতরে দিন রাত খালি দুষ্ট ফন্দি আঁটিত।

বুড়া হাঁস, তাহার গায়ে জোর নাই, ঠোঁটে ধার নাই। মাছ ধরিতে পারে না, পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। সে দিন রাত বসিয়া ভাবে, "তাই ত, এখন করি কি?"

তারপর একদিন সে কোথায় একখানি নামাবলীর টুকরা কুড়াইয়া পাইল। সেই নামাবলীর টুকরাখানি গায় দিয়া আর নাকের উপর সুন্দর ফোঁটা কাটিয়া বুড়া বলিল, "বাঃ! আমি কেমন ভট্‌চার্যি হইয়াছি!"

সমুদ্রের জলে শত শত পাখি খেলা করিতেছিল। ভট্‌চার্যি সাজিয়া দুষ্ট হাঁস তাহাদের নিকট গিয়া বারবার বলিতে লাগিল, "দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা! বাছাসকল! ধর্ম কর, অধর্ম করিও না! দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা!"

তখন হইতে সে রোজ এমনি করে। তাহাতে পাখিদের তাহার উপর কি যে ভক্তি হইল, কি বলিব। তাহারা তাহাকে হাঁস-ঠাকুর বলে, দেখিতে পাইলেই ছুটিয়া আসিয়া গড় করে, আর ভাল ভাল মাছ আনিয়া খাইতে দেয়।

একদিন হাঁস-ঠাকুর তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল, "বাছাসকল! তোমরা তোমাদেব ডিমগুলি ফেলিয়া জলে খেলা করিতে যাও, আর তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এমন করিতে নাই। ডিমগুলি আমার কাছে রাখিয়া যাইও, আমি পাহারা দিব।"

তখন হইতে তাহারা হাঁস-ঠাকুরের কাছে ডিম রাখিয়া জলে খেলা করিতে যায়। বেচারারা গণিতে জানে না, কাজেই ফিরিয়া আসিয়া যে কয়টি ডিম পায়, তাহাতেই খুসি থাকে। দুষ্ট হাঁস কিন্তু তাহারা জলে ডুব দিলেই এক-একটা করিয়া ডিম খায়।

তারপর একদিন একটি পাখি কাঁদিতে কাঁদিতে অন্য পাখিদিগকে বলিল, "ভাই, আমার একটি ডিম ছিল, হাঁস-ঠাকুরের কাছে সেটি রাখিয়া আমি খেলা করিতে গিয়াছিলাম। হায়! আমার ডিমটি কি হইল? খেলা করিয়া আসিয়া ত আমি আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।"

এ কথা শুনিয়া আর পাখিরা বলিল, "তুমি বড় অসাবধানী এমন করিয়া কি ডিম হারাইতে আছে?"

তারপর আর একদিন আর-একটি পাখি হাঁস-ঠাকুরের কাছে ডিম রাখিয়া খেলা করিতে গেল, ফিরিয়া আসিয়া আর তাহা পাইল না। কিন্তু এ কথা সে আর কাহাকেও বলিল না, পরদিন অন্য পাখিরা হাঁস-ঠাকুরের নিকট তাহাদের ডিম রাখিয়া খেলা করিতে গেল, কিন্তু এই পাখিটি সেদিন আর খেলা করিতে না গিয়া, একটি গর্তের ভিতর হইতে হাঁস-ঠাকুরকে পাহারা দিতে লাগিল।

হাঁস-ঠাকুর নামাবলী গায় দিয়া আর নাকে ফোঁটা কাটিয়া বসিয়া আছে। আর কেবল বলিতেছে, "দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা!" তাহার চারিদিকে পাখিদের ডিম ছড়ান রহিয়াছে, দুর্গা,

দুর্গা বলিতে বলিতে সে তাহার দিকেও এক-একবার তাকাইতেছে।

ইহার মধ্যে জলের পাখিরা সকলে মিলিয়া একবার টুপ করিয়া ডুব মারিল। আর অমনি হাঁস-ঠাকুর খপ করিয়া একটি ডিম লইয়া মুখে পুরিল। তারপর সেটিকে গিলিয়া আবার খুব জোরের সহিত বলিতে লাগিল, "দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা!"

সেই পাখিটির এ-সকলের কিছুই দেখিতে বাকি রহিল না। সেদিন রাত্রিতে তাহার নিকট এ কথা শুনিতে পাইয়া আটটা খুব যন্ডা আর ধারাল ঠোঁটওয়ালা পাখি বলিল, "কাল আমরা পাহারা দিব।"

পরদিনও হাঁস-ঠাকুর সকলকে খেলা করিতে পাঠাইয়া তাহাদের ডিমের উপর পাহারা দিতে লাগিল। সে জানিত না যে তাহার উপর আবার আটটা পাখি পাহারা দিতেছে। তাই সেদিনও, জলের পাখিরা ডুব দেওয়া মাত্র যেই সে একটি ডিম খপ্ করিয়া মুখে পুরিয়াছে, অমনি আটটা পাখি আটদিক হইতে আসিয়া ঠকাঠক শব্দে তাহার মাথায় ঠোকর মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে ডিম আর হাঁস-ঠাকুরের গেলা হইল না। তাহার আগেই সেই আট পাখির ঠোকরের চোটে তিনি হাঁ করিয়া মরিয়া গেলেন।

তখন একটা খুব গোলমাল হইল। তাহা শুনিয়া সকল পাখি তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া আসিয়া দেখিল যে, হাঁস-ঠাকুর হাঁ করিয়া মরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মুখের ভিতরে একটি গাং-শালিকের ডিম!

যখন সকলেই বুঝিল, কি হইয়াছে।

নিতান্ত প্রাচীন কচ্ছপ

যখন প্রলয় হয়, মার্কন্ডেয় মুনি তখন উপস্থিত ছিলেন, তিনি অনেক দিনের মানুষ। আবার তাঁহারও আগের মানুষ ছিলেন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যে কত দান, কত ধর্ম, কত যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আর তাহাতে তাঁহার যে কত পুণ্য হইয়াছিল, তাহা বলিবার আমার সাধ্য নাই।

সেই পুণ্যের ফলে মহারাজ স্বর্গে গিয়া হাজার হাজার বৎসর বাস করিয়াছিলেন। হাজার হাজার বৎসর পরে তাঁহার পুণ্য ফুরাইয়া গেল, কাজেই তখন আবার তাঁহাকে এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইল।

ততদিনে পৃথিবীর লোকে তাঁহার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল এত দান, এত ধর্ম, এত যজ্ঞ যে তিনি করিয়াছিলেন, সে-সকলের কথা জানা দূরে থাকুক, তাঁহার নামটি পর্যন্ত কাহারো মনে ছিল না।

রাজা ভাবিলেন, 'মার্কন্ডেয় মুনি খুব পুরানো মানুষ, তাঁহার নিকট যাই, তাঁহার হয়ত আমার কথা মনে থকিতে পারে।'

তাই তিনি মার্কন্ডেয় মুনির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনি-ঠাকুর আমার কথা ত সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে। আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন?"

মার্কন্ডেয় মুনি বলিলেন, "আমরা তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে ব্যস্ত থাকি, তাহাতে নিজের কথাই কতবার ভুলিয়া যাই। আপনাকে আবার কি করিয়া চিনিতে পারিব?"

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আচ্ছা মুনি-ঠাকুর, আপনার চেয়েও পুরানো লোক কি কেহ আছে?"

মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন, "হিমালয় পর্বতে প্রবীরকর্ণ বলিয়া এক প্যাঁচা আছে, সে আমার চেয়েও ঢের বুড়া হইয়াছে। হয়ত সে আপনাকে চিনিতে পারিবে। আপনার সেখানে যাইতে ইচ্ছা হইলে, আমি আপনার সঙ্গে যাইতে পারি। কিন্তু সে ঢের দূরের পথ!"

রাজা বলিলেন, "তাহাতে কি? আমি আপনাকে বহিয়া লইয়া যাইব।"

এই বলিয়া তিনি মার্কণ্ডেয় মুনিকে বহিয়া, সেই প্যাঁচার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বাপু, তুমি ত শুনিয়াছি যার পর নাই পুরানো লোক, তুমি কি আমাকে চিনিতে পার?"

এ কথায় প্যাঁচা তাহার গোল গোল চোখ দুটি বড় করিয়া, খুব ব্যস্তভাবে, আগে বসিয়া, তারপর দাঁড়াইয়া, তারপর উঁকি দিয়া, তারপর গুঁড়ি মারিয়া, রাজাকে মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তারপর অতিশয় গম্ভীর ভাবে বলিল, "না মহাশয়! আমার ত বোধ হয়, যেন বা আপনাকে চিনি বলিয়া মনে হইতেছে না!"

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার চেয়েও বুড়া কি কেহ আছে?"

প্যাঁচা খানিক চিন্তা করিয়া বলিল, "ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক সরোবর আছে। তাহার ধারে নাড়ীজঙ্ঘ বলিয়া এক বক থাকে। সে আমার চেয়েও বুড়া, তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করুন।"

প্যাঁচা তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া সেই সরোবরের ধারে সেই বকের নিকট লইয়া আসিলে, মার্কণ্ডেয় মুনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে নাড়ীজঙ্ঘ, তুমি কি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জান?"

বক এক পায়ে দাঁড়াইয়া খানিক চিন্তা করিয়া বলিল, "মহাশয়! আমি ত তাহার কথা কিছুই জানি না।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার চেয়েও প্রাচীন কেহ আছে কি?"

বক বলিল, "এই সরোবরেই এক কচ্ছপ থাকে, তাহার নাম অকূপার, সে আমার চেয়েও অনেক প্রাচীন।"

এ কথায় তাঁহারা সেই বককে লইয়া অকূপারকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। বকের ডাক শুনিয়া, সে তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া আসিলে, মার্কণ্ডেয় মুনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অকূপার, তুমি এই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জান?"

এ কথা শুনিয়াই অকূপার কাঁদিতে লাগিল। তারপর একটু শান্ত হইয়া সে বলিল, "আহা! ইঁহাকে জানিব না ত জানিব কাহাকে? এত যাগ-যজ্ঞ আর কে করিয়াছে? ইনি যজ্ঞের সময় যে-সকল গরু দান করিয়াছিলেন, তাহাদের খুরের ঘায় এই সরোবর হইয়াছে, তাহাতে সেই অবধি আমি পরম সুখে বাস করিতেছি।"

তখন স্বর্গ হইতে দেবতারা ইন্দ্রদ্যুম্নকে ডাকিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এখনো তোমার পুণ্যের কথা লোকে ভুলিয়া যায় নাই, সুতরাং তুমি আবার স্বর্গে চলিয়া আইস!"

সেই কচ্ছপটি না জানি কতই বুড়া ছিল। আমরা তাহার কথা সহজে ভুলিব না। সে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে মনে রখিয়াছিল। তাই তিনি আবার স্বর্গে যাইতে পাইলেন।

অলস উট

সত্যযুগে এক বনের ভিতরে যার পর নাই বোকা আর অলস একটা বিশাল উট ছিল। মুনিরা তপস্যা করেন, তাহা দেখিয়া সেই উট বলিল, "আমিও তপস্যা করিব।"

এই বলিয়া সে সত্য সত্যই অতি ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিল। তপস্যার সময় মুনিরা যতরকম কঠিন কাজ করিয়া থাকেন, তাহার কিছুই সে করিতে বাকি রাখিল না, শেষে একদিন "ব্রহ্মা তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে আসিলেন।"

ব্রহ্মা তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "বাপু! তোমার অতি উত্তম তপস্যা হইয়াছে। এখন বল দেখি, তুমি কি চাও?"

উট বলিল, "ঠাকুর, আপনি যদি দয়া করিয়া আমার এই গলাটিকে একশো যোজন লম্বা করিয়া দেন, তবে বড় ভাল হয়।"

এ কথায় ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

তারপর দেখিতে দেখিতে সেই উটের গলা একশত যোজন লম্বা হইয়া গেল।

এখন আর উটের সুখের সীমা নাই! আহারের জন্য আর আগের মত তাহার বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। একশত যোজনের ভিতরে যত কচি ঘাস, কোমল পাতা আর মিষ্ট ফল আছে, সে এক জায়গায় শুইয়াই সব খাইতে পায়।

এমনি করিয়া সারাটা গ্রীষ্মকাল তাহার পরম সুখে কাটিয়া গেল, তারপর আসিল বর্ষাকাল। তখন সে বেচারা তাহার সেই একশত যোজন লম্বা গলা লইয়া এমনই বিপদে পড়িল যে, কি বলিব!

দিন রাত বনে বনে ঘুরিয়া সে সারা হইয়া গেল, কোথাও এমন একটু জায়গা পাইল না, যেখানে তাহার গলাটি রাখে। শেষে অনেক খুঁজিয়া সে একটা পর্বতের গুহা দেখিতে পাইল, তাহাও একশত যোজন লম্বা। সেই গুহায় গলা ঢুকাইয়া সে কিছুকালের জন্য বৃষ্টির হাত হইতে বাঁচিল।

তারপর বড়ই ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আর সেই বৃষ্টিতে সকল দেশ জলে ডুবিয়া গেল। সেই সময়ে এক শিয়াল আর তাহার শিয়ালনী বৃষ্টির তাড়ায় যার পর নাই কাতর হইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু কোথাও একটু থাকিবার জায়গা বা খাইবার জিনিস পায় নাই। শেষে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া অনেক কষ্টে তাহারা সেই পর্বতের গুহায় আসিয়া ঢোকে। গুহায় ঢুকিয়া সেই উটের গলা দেখিতে পাইবামাত্রই, তাহারা আনন্দে সহিত তাহা খাইতে আরম্ভ করিল। সরু গুহার মধ্যে গলা গুটাইবারও সাধ্য নাই, একশত যোজন লম্বা সেই জিনিসটাকে তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া আনিবারও উপায় নাই, কাজেই তখন সেই বোকা উটের কি দশা হইল, বুঝিতেই পার।

বাঘ আর শিয়ালের কথা

পূর্বকালে পৌরাণিক নামে একরাজা তাঁহার প্রজাদিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করাতে, মৃত্যুর পর তাঁহাকে শিয়াল হইয়া জন্মিতে হয়।

সেই শিয়ালের পূর্ব জন্মের কথা সবই মনে ছিল। তাই সে দিন রাত কেবল এই বলিয়া দুঃখ করিত, "হায়! আমি রাজা ছিলাম, আর নিজের কর্মদোষে শিয়াল হইলাম।"

এই ভাবিয়া সে মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া, কেবল ফল মূল খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল, আর, সর্বদা সত্য কথা বলাতে আর সকল জীবকে দয়া করাতে, অল্পদিনের ভিতরেই সে খুব ধার্মিক হইয়া উঠিল।

সেই শিয়াল একটি শ্মশানে থাকিত। সেখানকার অন্য শিয়ালেরা তাহাকে আশ্চর্য হইয়া বলিল, "ভাই! তুমি শিয়াল হইয়া নিরামিষ খাও, ইহা বড়ই অন্যায় কথা। এত মাংস এখানে থাকিতে, তুমি এমন কষ্ট করিতেছ, তুমি কি বোকা?"

এ কথায় সেই ধার্মিক শিয়াল বলিল, "ভাই! শিয়াল হইয়াছি বলিয়াই কি অধর্ম করিব? ফল খাইয়া যদি বাঁচিয়া থাকা যায়, তবে কেন মাংস খাইয়া পাপের ভাগী হই?"

এই সময়ে এক বাঘ সেইখান দিয়া যাইতেছিল। শিয়ালের কথা শুনিয়া সে ভাবিল, 'আহা, এই শিয়ালটি কি ধামির্ক! আমি ইহাকে আমার মন্ত্রী করিব।'

এই ভাবিয়া সে শিয়ালকে বলিল, "আমি বুঝতে পারিতেছি তুমি অতি সৎলোক। তুমি আমার মন্ত্রী হও।"

এ কথায় শিয়াল বলিল, "মহারাজ, আপনি যদি আমার কয়েকটি কথায় রাজি হন, তবে আমি আপনার মন্ত্রী হইতে প্রস্তুত আছি। আপনি কথায় অমত করিতে পারিবেন না। আপনি যখন আমার সহিত পরামর্শ করিবেন, তখন আর কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিতে পারিবে না। আর, আপনার রাগ হইলেও আমাকে শাস্তি দিতে পারিবেন না।"

বাঘ বলিল, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। তুমি আমার সঙ্গে আইস।"

এইরূপে সেই শিয়াল ত বাঘের মন্ত্রী হইল। তাহাকে মন্ত্রী করিবার কিছুদিন পরেই বাঘ বুঝিতে পারিল যে, এমন ভাল মন্ত্রী আর সে কখনো পায় নাই। সুতরাং সে তাহাকে খুবই আদর দেখাইতে লাগিল। শিয়ালও নিজের সুখ দুঃখের দিকে না চাহিয়া, প্রাণপণে তাহার কাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু বাঘের যে পুরানো কর্মচারীরা ছিল, তাহারা এই নূতন মন্ত্রী আসাতে একটুও সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা বড়ই দুষ্টলোক ছিল, দিনরাত কেবল বাঘকে ফাঁকি দিত। তাহারা দেখিল যে, নূতন মন্ত্রী আসাতে তাহাদের লাভের পথও একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।। তাই তাহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিল যে, যেমন করিয়াই হউক, এই দুষ্ট মন্ত্রীটাকে তাড়াইতে হইবে।

বাঘের খাওয়ার জন্য প্রতিদিন ভালো ভালো মাংস আসে, অন্য কাহারো সে মাংস খাইবার হুকুম নাই। বাঘের দুষ্ট চাকরেরা একদিন চুপি চুপি সেই মাংস চুরি করিয়া, শিয়ালের

গর্তের নিকট লুকাইয়া রাখিল, শিয়াল ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। বাঘ তখন ঘুমাইয়া আছে, ঘুম হইতে উঠিয়াই খাইবে। কিন্তু সেদিন সে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল, তাহার খাইবার কিছুই নাই।

তখন বাঘের কেমন রাগ হল, তাহা বুঝিতেই পার। সে রাগে গর্জন করিতে করিতে সকলকে বলিল, 'কোন্ দুষ্ট আমার মাংস খাইল? শীঘ্র তাহাকে ধরিয়া আন।'

তখন সেই দুষ্ট চাকরেরা তাহকে বলিল, 'মহারাজ, আপনার সেই মন্ত্রী মহাশয়ই এই কাজ করিয়াছেন। মহারাজ ভাবলেন, বুঝি তিনি বড়ই ধার্মিক, কিন্তু এই দেখুন, তাঁহার কেমন কাজ।'

এই বলিয়া শিয়ালের গর্তের কাছে লুকান সেই মাংস আনিয়া তাহারা বাঘকে দেখাইল। তখন বাঘ রাগে দুই চোখ ঘুরাইয়া বলিল, 'বাপুসকল! তোমরা শীঘ্র সেই দুষ্টকে বধ কর।'

দুষ্ট চাকরেরা তখনই গিয়া শিয়ালকে মারিয়া ফেলিত, কিন্তু বাঘের মা তাহা হইতে দিল না। সে বড়ই বুদ্ধিমতী বাঘিনী ছিল। তাই চাকরদের ছল বুঝিতে পারিয়া সে বাঘকে বলিল, 'বাছা! ইহারা কেমন লোক, তাহা ত জানই! ইহাদের কথায় কি বিশ্বাস করিতে আছে? শিয়ালকে তুমি কত ভাল জিনিস দিতে চাও, সে তাহা নেয় না। সে কেন মাংস চুরি করিতে যাইবে? তুমি ভাল করিয়া ইহার বিচার কর।'

মায়ের কথায় বাঘ শান্ত হইল। তারপর একটু খবর লইয়াই সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, শিয়ালের কোন দোষ নাই, সমস্তই সেই দুষ্ট চাকরদের চক্রান্ত।

তখন আর শিয়ালের আদরের সীমা রহিল না। কিন্তু বুদ্ধিমান শিয়াল বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এমন মুনিবের চাকরি করা ধার্মিক লোকের কাজ নহে। সুতরাং সে বাঘকে বিনয় করিয়া বলিল, 'মহারাজ! এমন অপমানের পর আর আপনার নিকট কি করিয়া থাকিব? আপনার মঙ্গল হউক। আমি চলিলাম।'

এই বলিয়া সে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

মহর্ষি ও কুকুরের কথা

সত্যযুগে এক অতি দয়ালু মুনি ছিলেন, তাঁহার তপস্যার তেজ বড়ই আশ্চর্য ছিল। একটা কুকুর সেই মুনি-ঠাকুরের অতিশয় ভক্তি করিত। সে সর্বদা তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিত। আর তিনি তাহার দিকে চাহিলেই আহ্লাদে লেজ নাড়িত, মহর্ষিকে সে অতি-যত্নের সহিত পাহারা দিত। কখনো তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইত না। এজন্য মহর্ষিও তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন।

একদিন একটা দ্বীপী সেই কুকুরটাকে খাইবার জন্য মহর্ষির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেচারা কুকুর তখন লেজ গুটাইয়া, প্রাণের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, এক-একবার মুনি-ঠাকুরের পিছনে গিয়া কেঁউ কেঁউ করে, কিন্তু কিছুতেই স্থির হইতে পারে না। তাহার এইরূপ দুর্দশা দেখিয়া মুনির দয়া হওয়াতে তিনি বলিলেন, 'ভয় কি বাছা তোর? এই আমি তোকেও দ্বীপী করিয়া দিতেছি। এরপর আর দ্বীপী দেখিলেই তোকে পলাইতে হইবে না।'

এই বলিয়া মহর্ষি তাহাকে দ্বীপী করিয়া দিলেন, তখন আর সেই কুকুরের আহ্লাদের সীমা

রহিল না। সে বুক ফুলাইয়া আশ্রমের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া বনের দ্বীপী অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেল।

সেই কুকুর এখন হইয়াছে দ্বীপী। এখন আর সে দ্বীপী দেখিলে ভয় পায় না, আর কুকুর দেখিলেই সে তাড়িয়া খাইতে যায়। এমনি করিয়া কয়েকদিন গেল। তারপর একদিন এক প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া সেই আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে ভয়ঙ্কর বাঘের হাঁড়িপানা মুখ, ধারাল দাঁত আর এই বড় হাঁ দেখিয়া, মহর্ষির দ্বীপী ভাবিল, 'এইবার বুঝি প্রাণটা যায়!' তখন মুনি তাহাকে বলিলেন, 'ভয় নাই, তোকে এখনি বড় বাঘ করিয়া দিতেছি।'

সেই মুহূর্তেই সেই দ্বীপী ভয়ঙ্কর বাঘ হইয়া গেল, বুনো বাঘ আর তখন তাহার কি করিবে? ইহার পর হইতে সে অন্য বাঘের মতন বনে শিকার ধরিয়া খায়, আর খুব উৎসাহের সহিত মহর্ষির আশ্রমে পাহারা দেয়।

একদিন সে খাওয়া দাওয়ার পর আশ্রমে শুইয়া আছে, এমন সময় দেখিল যে, কালোমেঘের মত অতি বিশাল এক পাগলা হাতি থামের মত দুই দাঁত বাগাইয়া তাহাকে মারিতে আসিতেছে। সে হাতির গর্জন মেঘের ডাকের চেয়েও ভয়ানক। তাহা দেখিয়া মহর্ষির বাঘ নিতান্ত জড়সড় ভাবে মহর্ষির পিছনে লুকাইতে গেলে, তিনি বলিলেন, 'হাতি দেখিয়া ভয় পাইয়াছিস? আচ্ছা, আমি তোকে হাতি করিয়া দিতেছি।'

এ কথা শেষ হইতে না হইতেই মহর্ষির বাঘ, সেই ভয়ঙ্কর হাতির চেয়েও ভয়ানক পর্বতাকার এক হাতি হইয়া গেল। তাহার চেহারা দেখিয়া, বুনো হাতি আর এক মুহূর্তও সেখানে রহিল না।

ইহার পর অনেকদিন কাটিয়া গেল। মহর্ষির হাতি বনের গাছপালা খায়, আর আশ্রমে পাহারা দেয়। একদিন একটা সিংহ সেই আশ্রমে আসিয়া দেখা দিল।

হাতি যতই বড় হউক, সিংহ দেখিলেই ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া যায়। মহর্ষি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার হাতিটি সিংহের ভয়ে নিতান্তই অস্থির হইয়াছে, তখন কাজেই তাহাকেও তিনি সিংহ না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। এমনি করিয়া সেদিনকার বিপদ কাটিয়া গেল।

ছিল কুকুর, মুনির দয়ায় হইল দ্বীপী। তারপর সেই দ্বীপী হইল বাঘ, বাঘ হইল হাতি, হাতি হইল সিংহ, সিংহ হইলে ত সে তাবৎ পশুর রাজা হইল, তখন আর তাহার কিসের ভয়? তখন সে মনের আনন্দে সেই বনে সর্দারি করিয়া বেড়াইত, অন্য পশুরা তাহাকে দেখিলে ভয়ে পলাইয়া যাইত।

যাহা হউক, সিংহের চেয়েও ভয়ানক একটা অতি অদ্ভুত আর নিতান্ত উৎকট আট পেয়ে জন্তু আছে, তাহার নাম শরভ। সে সিংহ দেখিলেই তাহাকে ধরিয়া খায়। এমন ভয়ঙ্কর জন্তু আর এই ত্রিভুবনে নাই। মহর্ষির সিংহ যখন বনের ভিতরে খুবই রাজত্ব করিতেছিল, তখন একদিন সেই শরভ একটা আসিয়া তাহাকে খাইবার জন্য তাড়া করিল। আর একটু হইলেই সে তাহাকে খাইয়া শেষ করিত। কিন্তু মহর্ষি তাঁহার সিংহটাকে তাড়াতাড়ি শরভ করিয়া দেওয়াতে, আর তাহা করিতে পারিল না। তারপর মহর্ষির শরভ কিছুদিন সেই বনের ভিতরে খুবই ধুমধাম করিয়া বেড়াইত, আর অতি অল্পদিনের ভিতরেই বনের সকল জন্তু খাইয়া শেষ করিল। যে দু-একটা জন্তু তাহার হাতে মারা পড়ে নাই, তাহারা পলাইয়া প্রাণ

বাঁচাইল। তাহার পর হইতে আর মহর্ষির শরভের আহার জোটে না। বেচারা দিন কতক উপবাস করিয়া কাটাইল, তারপর ক্ষুধার জ্বালায় তাহার প্রাণ যায় যায়। তখন সে তাহার শুকনো ঠোঁট চাটিতে চাটিতে ভাবিল, 'আর ত জন্তু নাই। তবে মুনি-ঠাকুরকেই খাইব নাকি?'

মুনি যে ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, বোকা শরভ তাহা জানিত না। সে মুনিকে খাইবার কথা মনে করিবামাত্র, তিনি তাহা টের পাইয়া বলিলেন, 'বটে রে, হতভাগা? তবে তুই যে কুকুর ছিলি, আবার সেই কুকুর হ!'

বলিতে বলিতেই সেই শরভ আবার কুকুর হইয়া হেঁট মুখে মুনির সামনে আসিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। কিন্তু মুনি তাহাকে আর পূর্বের ন্যায় আদর না করিয়া বলিলেন, 'দূর হ হতভাগা। আমার এখানে আর তোর স্থান নাই!'

তিন মাছের কথা

কোন এক পুকুরে তিনটি শোল মাছ ছিল। তাহাদের একটির নাম ছিল 'অনাগত বিধাতা', সে কোন বিপদ হইবার আগেই তাহার উপায় করিয়া রাখিত। আর একটির নাম ছিল 'প্রত্যুৎপন্নমতি'। তাহার খুব বুদ্ধি ছিল, কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সে ঢের বুদ্ধি খাটাইয়া তাহা দূর করিত। আর একটির নাম 'দীর্ঘসূত্র'। সে কোন বিপদের কথা জানিতে পারিলেও আজ নয় কাল, করিয়া সময় কাটাইত, কাজেই বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইলে আর তাহার বিপত্তির সীমা থাকিত না।

একদিন একদল জেলে আসিয়া মাছ ধরিবার জন্য সেই পুকুরের জল সিঁচিতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া 'অনাগত বিধাতা', 'প্রত্যুৎপন্নমতি' আর 'দীর্ঘসূত্র'কে ডাকিয়া বলিল, 'ভাই, বড়ই ত বিপদ উপস্থিত দেখিতেছি। ঐ দেখ, বিকটাকার জেলেরা আসিয়া পুকুরের জল সিঁচিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুদিনের ভিতরেই এই পুকুর শুকাইয়া যাইবে, তারপর জেলেরা আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। চল, আমরা এই বেলা এখান হইতে পলাই। এখনো পলাইবার একটি পথ আছে, জল শুকাইয়া গেলে আর সেটি থাকিবে না।'

এ কথা শুনিয়া 'দীর্ঘসূত্র' বলিল, 'আমি ভাই অত তাড়াহুড়ো করিতে পারিব না। এখনই হইয়াছে কি? একটু দেখা যাউক না।'

প্রত্যুৎপন্নমতিও বলিল, 'এত আগেই ভয় পাইবার দরকার কি? যখন বিপদ আসিবে, তখন যা হয় করা যাইবে।'

কাজেই 'অনাগত বিধাতা', বুঝিল যে, ইহাদের এখন যাইবার মত নাই। তখন সে আর তাহাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া, সেই পথটি দিয়া অন্য একটা জলাশয়ে চলিয়া গেল।

এদিকে জেলেরা এমনি উৎসাহের সহিত জল সিঁচিতে আরম্ভ করিল যে, পুকুর শুকাইতে আর বেশি বিলম্ব হইল না। তখন তাহারা দড়ি আনিয়া এক-একটি করিয়া মাছ ধরিয়া তাহাতে গাঁথিতে লাগিল। শুকনো পুকুরের মাছ আর কোথায় পলাইবে? কাজেই বেচারারা বুঝিতে পারিল যে, এ যাত্রা আর কাহারো রক্ষা নাই।

কিন্তু 'প্রত্যুৎপন্নমতি' তখনো জীবনের আশা একেবারে ছাড়িল না। সে ভাবিল, 'যাহা হয় হইবে, একবার ত প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া দেখি।' এই মনে করিয়া সে চুপিচুপি জেলেদের সেই দড়িতে গাঁথা মাছগুলির মধ্যে ঢুকিয়া এমনভাবে দড়িটা কামড়াইয়া রহিল যে, দেখিলে মনে হয়, ঠিক যেন সে তাহাতে গাঁথা রহিয়াছে। কাজেই জেলেরা আর তাহাকে গাঁথিবার চেষ্টা করিল না। অন্য যত মাছ সেই পুকুরে ছিল, তাহাদের সবগুলিকেই — এবং তাহাদের সঙ্গে বেচারা দীর্ঘসূত্রকেও—তাহারা দড়িতে গাঁথিয়া লইল।

যখন জেলেরা মনে করিল যে, সকল মাছ গাঁথা হইয়াছে, তখন সেই কাদা মাখা মাছগুলিকে ধুইয়া পরিষ্কার করিবার জন্য তাহারা আর একটা পুকুরে লইয়া গেল। সেই পুকুরটা ছিল খুব বড়, আর তাহাতে জলও ছিল ঢের। সেই বড় পুকুরের গভীর জলে, জেলেরা মাছ সুদ্ধ তাহাদের দড়ি ডুবাইবামাত্র, প্রত্যুৎপন্নমতি সেই দড়ি ছাড়িয়া ছুট দিল।

এক বাঁচে সাবধান, আর বাঁচে বুদ্ধিমান। এ সংসারে অসতর্ক বোকার বড়ই বিপদ।

ইঁদুর আর বিড়ালের কথা

কোন এক বনে বহুকালের পুরাতন এক প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল। সেই বটগাছের গোড়ায় পলিত নামে একটি অতিশয় বুদ্ধিমান ইঁদুর শতমুখ বিশিষ্ট সুন্দর গর্তে বাস করিত। ঐ গাছের ডালে কত পাখির বাসা ছিল, তাহার সংখ্যা নাই। লোমশ নামে এক দুষ্ট বিড়াল, সেই-সকল পাখির ছানা খাইবার জন্য, সেই গাছে থাকিত।

ইহার মধ্যে পরিঘ নামক এক বিকটাকার ব্যাধ সেই বনে আসিয়া কুঁড়ে বাঁধিল। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, ঐ গাছের নিকটে ফাঁদ পাতিয়া মাংসের টুকরা ছড়াইয়া রাখিত, আর সকালে আসিয়া দেখিত, তাহাতে অনেক জন্তু ধরা পড়িয়াছে। একদিন সেই ফাঁদে পাখির-ছানা-খেকো দুষ্ট বিড়ালটা আটকা পড়িল।

ইঁদুরটিরও বড়ই ইচ্ছা হইত যে, সেই টুক্‌টুকে মাংসের একটু খানি চাখিয়া দেখে। কিন্তু দুরন্ত বিড়াল গাছের আড়াল হইতে ক্রমাগতই তাহাকে ধরিবার চেষ্টায় থাকাতে আর তাহার সে সাধ মিটাইবার সুযোগ হইত না। আজ সেই শত্রু ফাঁদে পড়িয়াছে, সুতরাং ইঁদুরের বড়ই আনন্দ। সে ফাঁদের নিকটে আসিয়া মনের সুখে মাংস খাইতে লাগিল; বিড়ালকে গ্রাহ্যই করিল না।

এমন সময় সেই ইঁদুরের গন্ধ পাইয়া, হরিত নামক একটা অতি ভীষণ এবং নিতান্ত নিষ্ঠুর নেউল তাহাকে খাইবার জন্য, ঠোঁট চাটিতে চাটিতে আসিয়া গর্তের ভিতর হইতে উঁকি মারিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রক নামে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় ভয়ঙ্কর একটা প্যাঁচা, গাছের উপর হইতে তাহার উপর ছোঁ মারিবার আয়োজন করিল। সেই নেউলের রাঙা রাঙা চোখ, আর প্যাঁচার সাংঘাতিক ঠোঁট আর নখ দেখিয়া, ইঁদুর বেচারার ত আর ভয়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। সে তখন এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, 'এখন কি করিয়া এই বিষম বিপদ হইতে রক্ষা পাই? একমাত্র এই বিড়াল এখন আমাকে বাঁচাইতে পারে, সুতরাং ইহার সহিত বন্ধুতা করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।'

এই মনে করিয়া সে বিড়ালের নিকট গিয়া বলিল, "কেমন আছ ভাই? একটা কথা শুনিবে? দেখ, এখন তোমারও নিতান্ত বিপদ; আমারও নিতান্ত বিপদ; কিন্তু তোমাতে আমাতে বন্ধুতা হইলে দুজনেরই বিপদ সহজে কাটিতে পারে।"

বিড়াল আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন করিয়া?"

ইঁদুর বলিল, "দেখ, ঐ দুষ্ট নেউল আর প্যাঁচা আমাকে ধরিয়া খাইবার জন্য কেমন ব্যস্ত হইয়াছে। উহাদিগের পানে তাকাইলে আর আমার এক মুহূর্তের তরেও প্রাণের আশা থাকে না। এখন তুমি যদি আমাকে হিংসা না কর, তবেই তোমার কোলের কাছে বসিয়া আমি উহাদের হাত হইতে বাঁচিতে পারি। তারপর আমি তোমার বাঁধন কাটিয়া দিলে, তুমিও নিশ্চিন্তে ঘরে চলিয়া যাইতে পার।"

বিড়াল দেখিল, বাস্তবিকই ইঁদুরের কথা মত কাজ করা ভিন্ন তাহাদের রক্ষা পাওয়ার আর উপায় নাই। সুতরাং সে আনন্দের সহিত তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন সেই ইঁদুরের মনে কি আনন্দ যে হইল, তাহা কি বলিব? বিড়ালের নিজের ছানাও বোধহয় তাহার কোলে এমন আরামের সহিত গিয়া লুকাইতে পারিত না, যেমন সেই ইঁদুর গিয়া লুকাইল।

এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া নেউল আর প্যাঁচা কি করিবে, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহারা খানিক বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া, চোরের মত সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

তারপর ইঁদুর বিড়ালকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া, ধীরে সুস্থে তাহার বাঁধন কাটিতে আরম্ভ করিল। বিড়াল বলিল, "ভাই! একটু চট্ পট কর, আমার বড্ড লাগিতেছে।"

ইঁদুর বলিল, "ভাই, তুমি ব্যস্ত হইও না। আমি ঠিক সময়ে নিশ্চয় বাঁধন কাটিয়া শেষ করিব।"

বিড়াল বলিল, "আর কখন শেষ করিবে? আর-একটু পরে ত ব্যাধই আসিয়া উপস্থিত হইবে।'

ইঁদুর বলিল, "ব্যাধ যাহাতে তোমার কোন অনিষ্ট না করিতে পারে, তাহার জন্য আমি দায়ী। কিন্তু ভাই, এখন তোমার সকল বাঁধন খুলিয়া দিলে, যদি তুমি এখনই আমাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিতে চাহ, তবে আমার কি দশা হইবে? তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি সকল দড়ি কাটিয়াছি, এক গাছি মাত্র বাকি আছে; তাহাও আমি ঠিক সময়ে কাটিয়া দিব। ব্যাধ তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

এমনি করিয়া ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল; তাহার খানিক পরেই ব্যাধও আসিয়া দেখা দিল। তাহা দেখিয়া বিড়াল বলিল, "সর্বনাশ! ভাই, এখন উপায়?"

ইঁদুর বলিল, "কোন চিন্তা নাই!"

এই বলিয়া সে কুট করিয়া বিড়ালের শেষ বাঁধনটি কাটিয়া দিবামাত্র বিড়াল যার পর নাই ব্যস্ত হইয়া দুই লাফে গাছের উপরে গিয়া উঠিল। ইঁদুরও সেই অবসরে তাহার গর্তে গিয়া ঢুকিল। ব্যাধ আসিয়া দেখিল, তাহার জালের বড়ই দুর্দশা হইয়াছে; সুতরাং সে দুঃখের সহিত তাহা লইয়া ঘরে ফিরিল।

বিড়াল যখন দেখিল, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, তখন সে অতিশয় মিষ্টভাবে ইঁদুরকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল "ভাই! তখন তুমি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলে, আর আমি তোমাকে

ধন্যবাদ দিতে পারিলাম না। তুমি আমার এত উপকার করিয়াছ, আমারও ত তোমার জন্য কিছু করিতে হয়। তুমি একটি বার আমার নিকট আইস, দেখিবে আমি তোমাকে কেমন আদর করিব।"

তাহা শুনিয়া ইঁদুর হাসিয়া বলিল, "ভাই, তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য। তবে কিনা, নিজের প্রাণটাকে বাঁচাইয়া চলা সকলেরই কর্তব্য। আমাকে আদর করিতে করিতে তোমার হঠাৎ ক্ষুধা হইলে, আমার বিপদ ঘটিতে পারে। তাহা ছাড়া ভগবানের কৃপায় তোমার ছেলেপিলে ঢের আছে। তাহাদের বয়স অল্প বটে, কিন্তু ক্ষুধা বেশি। তাহারা বাঁচিয়া থাকুক, কিন্তু আমার পক্ষে তাহাদের সামনে না যাওয়াই ভাল।"

সুতরাং সে যাত্রা বিড়ালের আর ইঁদুর খাওয়া হইল না।

ব্যাধ ও কপোতের কথা

পূর্বকালে এক পাপিষ্ঠ ব্যাধ যমদূতের ন্যায় বনে বনে পাখি ধরিয়া বেড়াইত। তাহার চেহারা যেমন কদাকার এবং ভয়ঙ্কর ছিল, মনও তেমনি নিষ্ঠুর ছিল। নিরপরাধ পাখিগুলিকে বধ করিয়া বাজারে বিক্রয় করা ভিন্ন, তাহার আর কোন কাজ ছিল না।

একদিন সেই ব্যাধ, জাল এবং তীর ধনুক হাতে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় আকাশ অন্ধকার করিয়া ঘোরতর শব্দে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তারপর দেখিতে দেখিতে চারিদিক জলে ভাসিয়া গেল। আর বড় বড় গাছ ক্রমাগত ভাঙিয়া পড়াতে, বনের বড়ই ভয়ানক অবস্থা হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, ব্যাধের কষ্ট আর দুর্দশার অবধি রহিল না। সে জলে ভিজিয়া, শীতে কাঁপিয়া, ঝড়ে নাকাল হইয়া ভাবিতে লাগিল, "হায়! হায়! কোথায় পথ, কোথায় ঘাট? এখন কি করিয়া প্রাণ বাঁচাই, কি করিয়াই বা ঘরে ফিরি?"

কিন্তু এই দুঃখের সময়েও তাহার দুষ্ট বুদ্ধি তাহাকে ছাড়ে নাই। সেই অন্ধকারের ভিতরে হাতড়াইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সে দেখিল, একটি পায়রা জলে ভিজিয়া আর শীতে আড়ষ্ট হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। অমনি সেই দুষ্ট তাহার নিজের দুর্গতি ভুলিয়া গিয়া, পায়রাটিকে ধরিয়া খাঁচায় পুরিল।

ক্রমে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া আকাশ পরিষ্কার হইল, কিন্তু সেই ঘোর রাত্রিতে ব্যাধের আর ফিরিবার শক্তি রহিল না। তখন সে নিকটে একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখিতে পাইয়া, তাহার তলাতেই রাত কাটাইবার আয়োজন করিল।

সেই গাছে একটি পায়রা আর একটি পায়রী তাহাদের সুহৃদ স্বজন লইয়া সুখে বাস করিত, সেদিন সকালে পায়রীটি খাবার খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল, তাহার পর আর ঘরে ফিরে নাই। তাই পায়রাটি তাহার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে, এই বলিয়া দুঃখ করিতেছিল যে, 'হায়! আমার প্রিয় পায়রী ত এখনো ঘরে ফিরিল না। না জানি এই ভয়ঙ্কর ঝড়ে তাহার কি বিপদ হইয়াছে! আহা! তাহার কি সুন্দর রাঙা চোখ, আর খুরখুরে পা দুখানি ছিল! আর তাহার কথা আমার কি মিষ্ট লাগিত! আমি রাগ করিলে সে কি স্নেহের সহিত আমাকে শান্ত

করিত! তাহাকে হারাইয়া আমি কেমন করিয়া বাঁচিব?' সে জানিত না যে, তাহার পায়রী সেই গাছের তলাতেই, ব্যাধের হাতে পড়িয়া ঠিক এমনি করিয়া তাহার কথা ভাবিতেছে।

পায়রার কথা শুনিয়া পায়রী এই বিপদের ভিতরেও একটু আনন্দিত হইল, এবং সে সেই পিঞ্জরের ভিতর হইতেই তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ওগো! তুমি আমার জন্য দুঃখ করিও না। এই লোকটি শীতে আর ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়াছে, ইহার দুঃখ দূর করাই হইতেছে এখন আমাদের প্রধান কাজ।'

তখন পায়রা ভাবিল, 'তাই ত! এই ব্যাধ এখন আমার অতিথি। ইহার সেবা করা আমার কর্তব্য!' এই মনে করিয়া সে ব্যাধকে বলিল, 'মহাশয়! আপনি যাহাই করিয়া থাকুন, আপনি আমাদের অতিথি—আপনার সেবা করাই আমাদের ধর্ম। এখন বলুন, আপনার জন্য আমি কি করিতে পারি।'

এ কথায় ব্যাধ নিতান্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল, "বাপু! আমি শীতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। আমার এই কষ্ট যদি দূর করিতে পার, তবে আমার বড় উপকার হয়।"

পায়রা তখনই শুকনো পাতা কুড়াইতে গেল, এবং দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি পাতা আনিয়া উপস্থিত করিল।

তারপর দেখা গেল যে, কোথা হইতে এক টুকরা জ্বলন্ত কয়লা ঠোঁটে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। কয়লাখানি পাতার ভিতরে গুঁজিয়া পায়রা তাহার পাখা দিয়া একটু বাতাস করিতেই, দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুনের তাপে যর পর নাই আরাম পাইয়া, ব্যাধ বলিল, "আঃ বাঁচিলাম! কিন্তু আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে।"

এ কথায় পায়রা অতিশয় চিন্তিত হইল।

পায়রা যেদিন যাহা দরকার, সেইটুকু মাত্র খাবার খুঁজিয়া আনে; তাহাদের সঞ্চয় করিবার রীতি নাই। কাজেই তখন পায়রার ঘরে কণামাত্রও খাবার জিনিস ছিল না। এখন অতিথিকে সে কি খাইতে দিবে?

খানিক চিন্তা করিয়া সে ব্যাধকে বলিল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনার ক্ষুধা দূর করিতেছি।"

এই বলিয়া সে আরো অনেক পাতা আনিয়া খুব বেশি করিয়া আগুন জ্বালিল। তারপর ব্যাধকে বলিল, "মহাশয়, দয়া করিয়া আজ আমাকে আহার করিয়াই আপনার ক্ষুধা দূর করুন।"

বলিতে বলিতে সে তিনবার সেই আগুন প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল!

ব্যাধ এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিল, পায়রা আগুনে ঝাঁপ দিবামাত্র, সে হায় হায় করিতে করিতে বলিল, "আমি কি করিলাম! আমার মতন মহাপাপী বোধহয় আর ইহ সংসারে নাই। আজ এই পুণ্যবান পক্ষীটি আমাকে বড়ই শিক্ষা দিল। আমি ইচ্ছা করিলে কত সৎকাজ করিতে পারিতাম, তাহার বদলে আমি পাখি মারিয়া বেড়াইতেছি! আমাকে ধিক্! আমার আর বাঁচিয়া কি ফল?"

এই বলিয়া সে সেই পাখিটিকে ছাড়িয়া দিয়া, নিতান্ত বিরক্তভাবে তীর, ধনুক, জাল প্রভৃতি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল।

এদিকে পায়রী পায়রার শোক সহ্য না করিতে পারিয়া, পিঞ্জর হইতে মুক্তি পাওয়া মাত্র

সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। তখন সে সেই আগুনের ভিতর যে আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে পাইল, তাহার কথা বলি, শুন। সে দেখিল, তাহার পায়রা পরম সুন্দর দেহ ধারণ পূর্বক, দিব্য অলঙ্কার, মালা, চন্দন, আর উজ্জ্বল বসনের শোভায় সোনার রথ আলো করিয়া বসিয়া আছে, আর স্বর্গ হইতে পুণ্যবানেরা আসিয়া তাহার স্তব করিতেছেন। তারপর পায়রীও তাহার সঙ্গে সেই রথে চড়িয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া গেল।

সেই সময়ে সেই ব্যাধ উপরের দিকে চাহিয়া পায়রা ও পায়রীর সেই সুন্দর রথ দেখিতে পাইয়াছিল। তখন তাহার মনে হইল যে, যে পুণ্য কাজ করিয়া এমন সুখ লাভ করা যায়, এরপর সেই পুণ্য কাজ ভিন্ন আর সে কিছুই করিবে না।

তখন হইতে সেই ব্যাধ পরম ধার্মিক তপস্বী হইল। সে এক মনে এক প্রাণে কেবলই ভগবানের চিন্তা করিয়া বনে বনে ফিরিত। সেই বনের ভিতরে একদিন ভীষণ দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। তপস্বী তাহা দেখিয়া ভয়ও পাইল না। পলায়নও করিল না; সে ভগবানের নাম লইয়া হাসিতে হাসিতে সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। তাহার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া দেবতারা তাহাকে পরম আদরের সহিত স্বর্গে 'গেলেন; সে এককালে ব্যাধ ছিল বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিলেন না।

ডাকাত ব্রাহ্মণ ও ধার্মিক বক

প্রাচীনকালে গৌতম নামে এক অতি মূর্খ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ছিল। সে দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। ভিক্ষা করিতে করিতে, সে উত্তর দেশে এক ডাকাতের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, সেই ডাকাত তাহার লোক জনকে বড়ই সুখে রাখিয়াছে। খাওয়ায় পরায়, আমোদ আহ্লাদে তাহাদের সৌভাগ্যের আর সীমা নাই।

ব্রাহ্মণ সেই ডাকাতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমাকে বাড়িঘর দাও, আর এক বৎসরের খোরাক দাও; আমি তোমার গ্রামে বাস করিব।"

ডাকাত বলিল, "ঠাকুর, আপনার বড়ই দয়া!" সে তখনই বাড়ি, ঘর, খোরাক, পোশাক দিয়া ব্রাহ্মণকে পরম আদরে তাহার গ্রামে রাখিয়া দিল।

তারপর দিন যায়, মাস যায়, গৌতম ঠাকুরের আর ডাকাতের বাড়ি ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। তাহার মনে হইল যে, 'সন্ধ্যা তর্পণে বড়ই কষ্ট, ভিক্ষা করাও নিতান্ত নির্বোধের কাজ!' সুতরাং 'ভিক্ষা করিয়া কেন মরিব? তাহা হইতে হয়ত ডাকাত হওয়াই ভাল!'

অল্পদিনের ভিতরেই সেই ব্রাহ্মণ ডাকাতের মেয়ে বিবাহ করিয়া, তীর ধনুক শিখিয়া, বিকট চেহারা করিয়া, মস্ত ডাকাত হইয়া গেল, তাহার মত শিকার করিতে কেহই পারিত না। যখন ডাকাতি করিতে না যাইত, তখন কেবল পাখি মারিয়াই সময় কাটাইত।

গৌতমের এক পরম ধার্মিক এবং পণ্ডিত ব্রহ্মচারী বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধু অনেকদিন গৌতমের কোন সংবাদ না পাইয়া, দেশে দেশে তাহার সন্ধান করিতে করিতে, দস্যুদিগের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেখানে আসিয়া সেই ধার্মিক তপস্বী দেখিলেন যে, তাহার ছেলেবেলার প্রিয় বন্ধু মরা

হাঁসের ভার কাঁধে করিয়া, ডাকাতের বেশে পথ দিয়া চলিয়াছে। তাহাতে তিনি নিতান্ত আশ্চর্য এবং দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি ব্রাহ্মণ ছিলে, আর তোমার এই দুর্দশা! তুমি কোন কুলে জন্মিয়াছ, তাহা কি তোমার মনে নাই! শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ কর।"

এ কথায় গৌতমের যার পর নাই অনুতাপ হওয়াতে, সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভাই, আমি অতিশয় মূর্খ আর দরিদ্র ছিলাম, তাই লোভে পড়িয়া আমার এমন দশা হইয়াছে। আমার ভাগ্যের জোরে যদি তুমি আসিয়াছ, তবে দয়া করিয়া একটি রাত আমার বাড়িতে থাক। কাল সকালে আমরা দুজনেই এখান হইতে চলিয়া যাইব।"

গৌতমের কথায় তপস্বী, সেই রাত্রির জন্য তাহার বাড়িতে থাকিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তিনি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াও সেই অপবিত্র স্থানে এক বিন্দু জল পর্যন্ত খাইলেন না। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তিনি সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার কিঞ্চিৎ পরে, গৌতমও বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিল, এবং সেই পথে একদল বণিককে যাইতে দেখিয়া, তাহাদের সঙ্গে জুটিয়া পড়িল।

তারপর তাহারা খানিক দূর চলিয়া, যেই একটা পর্বতের গুহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, অমনি একটি প্রকান্ড হাতি ঘোরতর গর্জনে আসিয়া সেই বণিকদিগকে আক্রমণ করিল। গৌতম তখন প্রাণের ভয়ে, বনের ভিতর দিয়া উত্তর দিক পানে উর্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। সে এইরূপে কতদূর পর্যন্ত যে ছুটিয়া গেল, তাহা তখন তাহার ভাবিয়া দেখিবার অবসর ছিল না। কিন্তু অনেকক্ষণ ছুটিবার পর তাঁহার মনে হইল যে, সে একটি সুন্দর স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। এমন স্থান গৌতম তাহার জীবনে আর কখনো চক্ষে দেখে নাই। সেখানকার গাছপালা যেমন আশ্চর্য, পাখির গান তেমনি মিষ্ট। এ-সকল দেখিয়া শুনিয়া, গৌতমেব বড়ই আশ্চর্য বোধ হইল, কিন্তু সে তথাপি ছুটিতেই লাগিল। ডালে বসিয়া আশ্চর্য পাখিগণ গান করিতেছে, তাহাদের মানুষের মত মুখ; সেই অদ্ভুত পাখির দিকে চাহিয়া দেখিবার জন্যও গৌতম একটিবার দাঁড়াইল না। বন ছাড়িয়া শেষে সে মাঠে আসিয়া পড়িল। সে মাঠেব বালি সোনার। সেই আশ্চর্য বালির দিকেও সে একবার চাহিয়া দেখিল না।

এমনি করিয়া উর্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে, শেষে সে এক প্রকান্ড বটগাছের নীচে আসিবামাত্র, এমন সুন্দর একটি গন্ধ তাহার নাকে আসিয়া প্রবেশ করিল যে, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সেই গাছের গোড়ায় চন্দনের জল ছড়ান ছিল, আর অতি সুশীতল সুগন্ধি বায়ু সেই স্থান দিয়া ধীরে ধীরে বহিতেছিল। তখন গৌতমের মনে হইল যে, তাহার অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে। সুতরাং সে সেই পরিষ্কার সুগন্ধি বটতলায় শুইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

গৌতম অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিল। তখন বেলা অল্পই ছিল; ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তখন গৌতম দেখিল যে, একটি অতি সুন্দর বক পক্ষী সেই গাছে আসিয়া বসিয়াছে। সেই বকের নাম নাড়ীজঙ্ঘ; সে কশ্যপের পুত্র, ব্রহ্মার বন্ধু। তাহার আর একটি নাম রাজধর্ম।

গৌতম সেই পক্ষীর দেবতার ন্যায় অপরূপ উজ্জ্বল দেহ আর আশ্চর্য অলঙ্কারসকল দেখিয়া কিছুকাল অবাক হইয়া রহিল। কিন্তু সে সময়ে তাহার যার পর নাই ক্ষুধা হওয়াতে, সে তখনই আবার তাহাকে ধরিয়া খাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময় পক্ষীটি তাহাকে বলিল "মহাশয়! আমার বড়ই সৌভাগ্য যে, আপনি আমার বাড়িতে অতিথি হইয়াছেন। এখন সন্ধ্যা হইয়াছে, সুতরাং আজ আমার এখানেই আহার এবং বিশ্রাম করুন।

কাল প্রাতে যেখানে ইচ্ছা হয়, যাইবেন।"

এই বলিয়া, গৌতমের জন্য লাল ফুলের অতি সুন্দর শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিয়া, সে গঙ্গায় মাছ ধরিতে গেল। এবং অল্প কালের ভিতরেই নানারূপ সুমিষ্ট মাছ আনিয়া তাহাকে পরিতোষ পূর্বক আহার করাইল। আহারের পর সে গৌতমকে, নিজের ডানার বাতাসে শীতল করিয়া, অতি মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে? আপনার কি নাম?"

গৌতম বলিল, "আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম গৌতম।"

বক বলিল, "আপনি কিজন্য এখানে আসিয়াছেন?"

গৌতম বলিল, "পাখি, আমি নিতান্ত দীনহীন, ধন পাইবার আশায় সমুদ্রে চলিয়াছি।"

বক বলিল, "সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নাই, এখন আমার সহিত আপনার বন্ধুত্ব হইল; আপনি যাহাতে অনেক ধন পান, আমি তাহাব উপায় করিয়া দিব।"

এ কথায় গৌতম অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সুখে নিদ্রা গেল। পরদিন প্রভাতে রাজধর্ম তাহাকে একটি পথ দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই পথে তিন যোজন গেলে আপনি আমার পরম বন্ধু রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের দেখা পাইবেন। তাহার নিকট গেলে আর আপনার ধনের ভাবনা থাকিবে না।"

গৌতম সেই পথে চলিতে চলিতে, মেরুব্রজ নামক নগরে উপস্থিত হইল, উহাই রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের রাজধানী। গৌতম সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র, দরোয়ান বিরূপাক্ষের নিকট সংবাদ দিতে গেল, এবং খানিক পরেই ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "আপনি শীঘ্র চলুন, রাজা আপনাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।"

গৌতম মেরুব্রজ নগরে পৌঁছিবার পূর্বেই বাজধর্ম বিরূপাক্ষকে তাহার সংবাদ দিয়াছিল। সুতবাং সেখানে গিয়া তাহাব সমাদরের কোন ত্রুটি হইল না। বিরূপাক্ষ অতিশয় ধীর এবং বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন, ধার্মিক বিদ্বান ব্রাহ্মণকে যেমন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়, গৌতমকেও তিনি সেইরূপে, তপস্যার কথা, বেদাধ্যায়নের কথা, ব্রহ্মচর্যের কথা, এই-সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গৌতম মূর্খ মানুষ, সে তাহার কি উত্তর দিবে? সে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কেবল বলিল, "আমি ব্রাহ্মণ!"

তাহা শুনিয়া বিরূপাক্ষ আবার বলিলেন, "আপনার কোন ভয় নাই। আপনি যথার্থ বলুন, আপনার বাড়ি কোথায়, কোন বংশে জন্মিয়াছেন, আর কোথায় বিবাহ করিয়াছেন?"

গৌতম বলিল, "মহারাজ, আমার জন্মস্থান মধ্যদেশে, এখন আমি কিরাতগণের দেশে বাস করি, আর শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছি।"

বিরূপাক্ষ দেখিলেন, এ ব্রাহ্মণ নিতান্ত অধম, দানের উপযুক্ত পাত্র নহে। তথাপি তিনি মনে করিলেন যে, 'যা হোক, এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ত বটে; আর আমার বন্ধু রাজধর্ম ইঁহাকে পাঠাইয়াছেন। সুতরাং তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তাহাই করিতে হইবে। আজ কার্তিকমাসের পূর্ণিমা, আজ আমি সহস্র ব্রাহ্মণকে সুবর্ণদান করিব। সেই উপলক্ষে ইঁহাকেও সন্তুষ্ট করিয়া দেওয়া যাইবে।'

ইহার একটু পরেই নানাদিকে হইতে মহামান্য দেবতুল্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজসভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা সভায় বসিলে সে স্থানের অতি অপরূপ শোভা হইল। রাজার কথায় গৌতমও নিতান্ত জড়সড় হইয়া তাঁহাদের এক পাশে গিয়া বসিল। রাজা তাঁহাদের প্রত্যেককে রাশি রাশি ধনরত্ন দান করিয়া, বিনয়ের সহিত বলিলেন, "ঠাকুর

মহাশয়েরা কেবল আজিকার দিনটির জন্য আমার রাক্ষসেরা মানুষ খাওয়া বন্ধ করিয়াছে। সুতরাং আপনারা আপনাদের ধনরত্ন লইয়া যত শীঘ্র পারেন, প্রস্থান করুন; বিলম্ব হইলে বিপদ হইতে পারে!"

এ কথা শুনিয়া ঠাকুর মহাশয়েরা আর তিলার্ধও তথায় অপেক্ষা করিলেন না। নিজ নিজ সম্পত্তি পুঁটুলি বাঁধিয়া, তাহারা সকলেই যার পর নাই ব্যস্তভাবে প্রস্থান করিলেন। গৌতম তাহার অতিশয় প্রকান্ড পুঁটুলিটি মাথায় করিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে যখন সেই বটগাছের তলায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন প্রায় সন্ধ্যাকাল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর পরিশ্রমে, তখন আর তাহার এক পাও চলিবার শক্তি ছিল না।

সেই গাছের তালায় পুঁটুলিটি রাখিয়া গৌতম বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় রাজধর্মও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে ক্লান্ত দেখিয়া ব্যস্তভাবে নিজের ডানা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। তাহাতে সে একটু শান্ত হইলেই, রাজধর্ম তাড়াতাড়ি ভাল ভাল মাছ আনিয়া তাহাকে পেট ভরিয়া আহার করাইল।

বকের সেবায় খুব আরাম পাইয়া দুষ্ট ব্রাহ্মণ ভাবিল যে, 'এরপর আমাকে অনেক দূর যাইতে হইবে, অর তত দূর এই প্রকান্ড পুঁটুলি বহিয়া নিতে খুব পরিশ্রম আর ক্ষুধাও হইবে। তখন কি খাইব?' এই ভাবিয়া দুরাত্মা বারবার বকের দিকে তাকাইতে লাগিল, আর মনে করিল যে, 'এই পাখিটার গায় ঢের মাংস, আর, বোধহয় যেন তাহা খাইতে বড়ই ভাল লাগিবে। ইহাকে মারিয়া সঙ্গে লইলে আর আমার খাবারের ভাবনা থাকিবে না।'

রাজধর্ম তখন নিদ্রা যাইতেছিল। পাপিষ্ঠ ডাকাত সেই সুযোগে তাহাকে বধ করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার পালক ছাড়াইয়া আগুনে পোড়াইতে লাগিল। তারপর তাহাকে পুঁটুলিতে বাঁধিয়া, নিতান্ত আহ্লাদের সহিত সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

রাজধর্ম প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করিতে যাইত, এবং প্রতিদিন ব্রহ্মার নিকট হইতে ফিরিবার সময় বিরূপাক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিত। ইহার পর আর সে বিরূপাক্ষের নিকট গেল না। বিরূপাক্ষ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ কেন বন্ধু রাজধর্ম আসিল না? তাহার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, সেই অপদার্থ মূর্খ ব্রাহ্মণ তাহাকে বধ করে নাই ত? ঐ দুষ্টকে দেখিয়াই তাহাকে ডাকাত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তুমি শীঘ্র রাজধর্মের নিকট গিয়া তাহার সংবাদ জানিয়া আইস।"

রাজপুত্র অনেক রাক্ষসের সহিত তখনই রাজধর্মের বাড়িতে গিয়া দেখিলেন যে, সে সেখানেই নাই, আর গাছের তলায় তাহার পালকসকল পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া রাক্ষসেরা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে, তখনই ক্রোধ ভরে সেই দুষ্ট দস্যুকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া চলিল। দুষ্ট ততক্ষণে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া রাক্ষসেরা তাহাকে ধরিয়া, পুঁটুলি খুলিয়া যেই তাহার ভিতরে রাজধর্মের দেহ দেখিতে পাইল, অমনি চুলের মুঠি ধরিয়া, তাহাকে একেবারে বিরূপাক্ষের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল।

বন্ধুর মৃতদেহ দেখিয়া বিরূপাক্ষের দুঃখের সীমা রহিল না। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মেরুব্রজ নগরের সকল লোক, সেই সরল হৃদয় সুন্দর পক্ষীটির জন্য কাঁদিয়া অস্থির হইল। তখন বিরূপাক্ষ অনেক কষ্টে চোখের জল মুছিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "এই দুরাত্মা ব্রাহ্মাকে এখনই বধ কর। রাক্ষসেরা ইহার মাংস ভক্ষণ করুক!"

রাজ-আজ্ঞায় রাক্ষসগণ অতি ভীষণ পট্টিশের আঘাতে সেই দুরাত্মার দেহ খন্ড খন্ড করিয়া ফেলিল; কিন্তু এমন মহাপাপীর মাংস খাইতে তাহারা কিছুতেই সম্মত হইল না। রাজা তখন নিতান্ত নীচাশয় মানুষখেকো দস্যুদিগকে ডাকিয়া, সেই মাংস খাইতে বলিলেন। কিন্তু তাহারাও সেই দুরাচারের জঘন্য মাংস খাইতে মুখ সিঁটকাইয়া অস্বীকার করিল।

তারপর সুগন্ধি কাঠের সুসজ্জিত চিতা প্রস্তুত করিয়া, সকলে অতিশয় যত্ন ও স্নেহের সহিত রাজধর্মের দেহ দাহ করিতে আরম্ভ করিলে, সেই বকের মাতা সুরভি স্বর্গ হইতে ঠিক সেই চিতায় উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখ হইতে ক্রমাগত অমৃত তুল্য দুগ্ধ এবং ফেনা বাহির হইতেছিল। সেই ফেনা বকের শরীরে পড়িবামাত্র, সে চিতা হইতে উঠিয়া বিরূপাক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল!

তখন সকলের আর আনন্দের সীমা কি? দেবতারা পর্যন্ত আনন্দ করিতে আসিয়া বিরূপাক্ষকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ইন্দ্র বলিলেন, "ব্রহ্মার সভায় যাইতে অবহেলা করায় তিনি রাজধর্মকে এই বলিয়া সাপ দেন যে, 'তুমি অতি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবে।' এইজন্য আর সুরভির দুগ্ধের ফেনের গুণে, আজ সে মরিয়াও রক্ষা পাইল।"

রাজধর্ম তখন ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, "দেবরাজ, আমার প্রতি যদি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তবে আমার বন্ধু গৌতমকে আবার বাঁচাইয়া দিন।"

এ কথায় ইন্দ্র তখনই গৌতমকে বাঁচাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু সেই মহাপাপীর আর কিছুতেই ধর্মে মতি হইল না, সুতরাং মৃত্যুর পরে সে নরকে গিয়া তাহার সকল পাপের উচিত পুরস্কার লাভ করিল।

কৃতজ্ঞ শুকপক্ষী

পূর্বকালে এক ব্যাধ ছিল, সে ভয়ানক বিষ মাখান বাণ মারিয়া, বনের জন্তুদিগকে বধ করিত। একদিন তাহার একটি বাণ জন্তুর গায়ে না লাগিয়া, এক প্রকান্ড গাছে গিয়া বিঁধে। সেই সাংঘাতিক বিষের এমনই তেজ ছিল যে, তাহাতেই সেই বহুকালের পুরাতন বিশাল গাছটি মরিয়া গেল! যুগ যুগান্তর ধরিয়া কত শত পাখি সেই গাছে বাস করিত; গাছটি মরিয়া গেলে তাহারা সকলেই তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সেই গাছের একটি কোটরে একটি শুকপক্ষী থকিত। সে সেই গাছটিকে শুকাইতে দেখিয়া, তাহার জন্য বড়ই দুঃখিত হইল। অন্য সকল পাখিকে সেই গাছ ছাড়িয়া যাইতে দেখিয়াও সে কিছুতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিল না। এমন-কি, যখন গাছটি একেবারেই মরিয়া গেল, তখন সেই শুকপক্ষীটিও খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া দিয়া, দিন রাত কেবল তাহার জন্য দুঃখ করিতে লাগিল।

স্বর্গ হইতে দেবরাজ ইন্দ্র এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া, সেই পক্ষীটির উপর এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি তাহার নিকট না আসিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। শুকপক্ষী গাছের কোটরে বসিয়া চিন্তা করিতেছে, এমন সময় ইন্দ্র এক ব্রাহ্মণের বেশে সেখানে আসিয়া বলিলেন, "পক্ষিরাজ! তোমার মাতার বড়ই সৌভাগ্য যে, তিনি তোমার মত পুত্র লাভ

করিয়াছিলেন। কিন্তু তুমি এই শুকনো গাছে কিজন্য বাস করিতেছ? অন্য একটা ভাল গাছে চলিয়া যাও।"

শুক বড়ই বুদ্ধিমান ছিল; সে দেবরাজকে দেখিবামাত্রই চিনিয়া ফেলিল। সুতরাং, সে তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, "দেবরাজ, আপনার আদেশ আমান্য করার সাধ্য আমার নাই। কিন্তু এই গাছটিতে জন্মবধি বাস করিয়া আমি এত বড় হইয়াছি! বৃক্ষরাজ পিতার ন্যায় আমাকে আশ্রয় দিয়া, কত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। তাই এখন ইহার দুঃখের অবস্থায়, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না। এমন কাজ করা কি আপনি উচিত মনে করেন?"

এ কথায় ইন্দ্র অতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "শুক, আমি তোমার কথায় বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।"

শুক বলিলেন, "দেবরাজ, যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন যে, আমার আশ্রয়দাতা এই গাছটি এখনই বাঁচিয়া উঠিয়া, পুনারায় ফুলে ফলে শোভা পাউক।"

তখন ইন্দ্র আহ্লাদের সহিত 'তথাস্তু' বলিয়া সেই গাছে অমৃত ছড়াইয়া দিলে, তাহা তৎক্ষণাৎ বাঁচিয়া উঠিয়া পূর্বের ন্যায় বনের শোভা করিতে লাগিল।

জুতা আর ছাতার জন্ম

বহুকাল পূর্বে, একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসেব সকাল বেলায, এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল।

জমদগ্নি মুনি তীর ছুঁড়িতেছেন, রেণুকা তাহা কুড়াইযা আনিতেছেন, মুনি ভাবিতেছেন, এ খেলার বড়ই আমোদ; তাই আজ আর তাঁহার অন্য কাজেব কথা মনে নাই, তিনি ক্রমাগত খালি তীরেব উপব তীরই ছুঁড়িতেছেন। এদিকে বেলা যে ঢের হইযাছে, বোদে যে তালু ফাটিয়া গেল, মাটি যে তাতিয়া আগুন, সে কথা কে ভাবে? মুনির আজ তীর ছুঁড়িয়া বড়ই ভাল লাগিয়াছে।

বেচারী রেণুকা একেবারে সারা হইয়া গেলেন, তাঁহাব মাথা ঝিম্ ঝিম্ কবিতেছে, পায় ফোস্কা হইয়াছে, প্রাণ ওষ্ঠাগত! কিন্তু মুনির সেদিকে দৃষ্টি নাই। তাঁহার আজ বড়ই আমোদ হইয়াছে, তাই তিনি খালি তীরই ছুঁড়িতেছেন, আর বলিতেছেন, "রেণুকা শীঘ্র আন! দেরি করিতেছ কেন?"

কিন্তু রেণুকা আর পারেন না। একটু ছায়ায় দাঁড়াইয়া বিশ্রাম না করিলে এখনই হয়ত তাঁহার প্রাণ যাইবে। তাই তিনি মুহূর্ত কালের জন্য একটি গাছের তলায় দাঁড়াইলেন, তাহার পরের মুহূর্তেই ছুটিয়া মুনির কাছে উপস্থিত হইলেন।

ইহাতেই মুনির রাগের সীমা নাই। তিনি ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "এত বিলম্ব হইল কেন?"

রেণুকা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, নিতান্ত কষ্টের সহিত বলিলেন, "বড় রোদ। মাথা জ্বলিয়া গেল। একটু গাছতলায় দাঁড়াইযাছিলাম!"

তখন মুনির চৈতন্য হইল। তিনি দেখিলেন, সত্য সত্যই রেণুকা রৌদ্রে নিতান্ত কাতর

হইয়াছেন। তাঁহার শরীর কাঁপিতেছে, তিনি আর দাঁড়াইতে পারেন না। মুনি একবার রেণুকার সেই অবস্থার দিকে, আর একবার সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর দুই চক্ষু লাল করিয়া বিষম ভ্রূকুটির সহিত তীর ধনুক উঠাইয়া সূর্যকে বলিলেন, "বটে, তোমার এতই আস্পর্ধা! তুমি রেণুকাকে কষ্ট দিয়াছ! দাঁড়াও! তোমাকে দেখাইতেছি!"

সূর্য ত তখন, "বাপ রে! মারিল রে!" বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির! তিনি তাড়াতাড়ি এক ব্রাহ্মণের বেশে জমদগ্নির নিকট আসিয়া জোড়হাতে বলিলেন, "ভগবন! সূর্য আপনার নিকট কি দোষ করিল? তাহার তেজ ভিন্ন ফল শস্য কিছুই থাকিতে পারে না, তাই এ সময়ে তাহার একটু গরম না হইলে চলিবে কেন?

তাহার জন্য কি তাহাকে মারিতে হয়? আর তাহাকে মারিবেনই বা কিরূপে? সে যে আকাশে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়!"

জমদগ্নি ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "যাও বাপু! তোমার চালাকি করিতে হইবে না। আমি টের পাইয়াছি, তুমি কে। আমি বেশ জানি, দুপুর বেলায় মাথার উপর আসিয়া তোমাকে দাঁড়াইতে হয়, সেই সময় আমি তীর মারিয়া তোমাকে কানা করিব।"

তখন সূর্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "দোহাই মুনিঠাকুর! আমার ঘাট হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন।"

সেকালের মুনিরা চট করিয়াই ক্ষেপিয়া যাইতেন, আবার হাত জোড় করিলেই ঠান্ডা হইতেন! সূর্যের কথায় জমদগ্নি মুনি তুষ্ট হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুর, সে হইবে এখন। কিন্তু আমার পত্নী যাহাতে তোমার তেজে কষ্ট না পায়, আগে তাহার একটা উপায় কর।"

এ কথায় সূর্য তাঁহার চাদরের ভিতর হইতে একটি ছাতা আর এক জোড়া জুতা বাহির করিয়া জমদগ্নিকে দিলেন। ইহার পূর্বে আর এমন আশ্চর্য জিনিস কেহ কখনো দেখে নাই। মুনিঠাকুর তাহা হাতে লইয়া অপার বিস্ময় এবং কৌতূহলের সহিত, অনেকবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সকল অস্ত্র দিয়া কি করিতে হয়?"

সূর্য বলিলেন, "এই জিনিসটার নাম ছাতা;ইহাকে এমনি করিয়া মাথায় ধরিতে হইবে। আর, এই দুখানির নাম জুতা,ইহাকে এমনি করিয়া পায় পরিতে হইবে।" এই বলিয়া সূর্য চলিয়া গেলেন; রেণুকাও তখন হইতে রৌদ্রের কষ্ট হইতে রক্ষা পাইলেন। সেই অবধি লোকে জুতা পরিতে আর ছাতা মাথায় দিতে শিখিল।

পুরাণের গল্প

নিজেব হাতে ছবি এঁকে, নিজেব নব প্রতিষ্ঠিত ইউ বায এণ্ড সন্সেব কার্যালয থেকে, নিজেব প্রেসে মুদ্রিত কবে, এই বই লেখক প্রকাশ কবেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোব বিশ্বাস করতেন আমাদেব শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূলে আছে রামাযণ, মহাভারত ও পৌবাণিক ঐতিহ্য। এগুলি না জানলে নিজেদের বা নিজের দেশকে জানা যায না।

পুরাণ হল প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও কিংবদন্তী দিয়ে তৈরি শাস্ত্রবিশেষ। আঠাবোটি পুরাণ আছে, যথা ব্রহ্ম, পদ্ম, ব্রহ্ম বৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড। তা ছাড়া নৃসিংহ, কালিকা ইত্যাদি উপপুরাণও আছে। পণ্ডিতবা সবগুলিকে সমান গুরুত্ব দেন না। সাধারণ লোকের পক্ষে সবগুলি বিশদভাবে পড়াও সম্ভব নয়। অথচ আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির মূলে এগুলিও আছে।

বর্তমান গ্রন্থে উপেন্দ্রকিশোর বাছাই করে কয়েকটি পৌরাণিক কাহিনী ছোটদের উপযুক্ত করে লিখেছেন। যেমনই সব গল্প, তেমনই তার ভাষা। লেখাগুলি মোটামুটি সন্দেশ-এ প্রকাশিত কালানুক্রমেই বিন্যস্ত হল।

পৃথিবীর পিতা

সকলের আগে যাহাকে লোকে রাজা বলিয়াছিল, তাঁহার নাম ছিল পৃথু। তিনি সূর্যবংশের লোক ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম ছিল বেণ। 'রাজা' কিনা, যে 'রঞ্জন' করে অর্থাৎ খুশি রাখে। পৃথু নানারকমে প্রজাদিগকে খুশি করিয়াছিলেন, তাই সকলে মিলিয়া তাঁহাকে 'রাজা' নাম দিয়াছিল। পৃথুর পূর্বে লোকের দিন বড়ই কষ্টে যাইত। সেকালে গ্রাম নগর পথঘাট কিছুই ছিল না, ঝোপে জঙ্গলে, পর্বতের গুহায় সকলে বাস করিত। পৃথু তাহাদিগকে বাড়ি-ঘর বাঁধিয়া এক জায়গায় থাকিতে শিখান। আর পথ বানাইয়া চলাফেরার সুবিধা করিয়া দেন। সেই হইতে শহর বস্তির সৃষ্টি হইল। সে কালের লোকে চাষবাস করিতে জানিত না। ফলমূল খাইয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইত।

জমিতে কাঁকর, আকাশে মেঘ নাই; খট্‌খটে শুকনো মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া আছে, তাহাতে শস্য জন্মাইতে গেলেও তাহা হয় না। প্রজারা পৃথুকে বলিল, "হে রাজা, পৃথিবী সকল শস্য খাইয়া বসিয়াছে, আমরা কেমন করিয়া বাঁচিব? ক্ষুধায় বড়ই কষ্ট পাইতেছি আমাদিগকে শস্য আনিয়া দাও।"

পৃথু বলিলেন, "বটে, পৃথিবীর এমন কাজ? শস্য সব খাইয়া বসিয়াছে? আচ্ছা এখনি ইহার সাজা দিতেছি। আন তো রে ধনুক, নিয়ে আয় তো তীর।"

পৃথিবী ভাবিল, 'মাগো, মারিয়াই ফেলে বুঝি।"

সে প্রাণের ভয়ে গাই সাজিয়া লেজ উঁচু করিয়া ছুটিয়া পালাইতে লাগিল। কিন্তু পৃথুর বড়ই রাগ হইয়াছিল, তিনি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। আকাশ পাতাল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, ব্রহ্মালোক অবধি ছুটিয়া গেল; কিছুতেই সে তাঁহাকে এড়াইতে পারিল না। তখন পৃথিবী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "দোহাই মহারাজ! আমি স্ত্রীলোক, আমাকে মারিলে আপনার পাপ হইবে।"

পৃথু বলিলেন, "তুমি ভারি দুষ্ট। তোমাকে মারিলে অনেক উপকার হইবে। কাজেই ইহাতে পাপ নাই বরং পুণ্য আছে।"

পৃথিবী বলিল, "প্রজাদের যে উপকার হইবে বলিতেছেন, আমি মরিলে তাহারা থাকিবে কোথায়?"

পৃথু বলিলেন, "কেন? আমি তপস্যা করিয়া তাহাদের থাকিবার জায়গা করিব।

পৃথিবী বলিল, "আমাকে মারিলে শস্য পাওয়া যাইবে না; শস্য পাইবার উপায় আমি বলিতেছি। সে আর এখন শস্য নাই, আমার পেটে হজম হইয়া দুধ হইয়া গিয়াছে। আমাকে দোহাইলে সেই দুধ পাইতে পারেন। কিন্তু একটি বাছুর চাই, নহিলে দুধ বাহির হইবে না। আর জমির উঁচু নিচু দূর করিয়া দিন, যেন দুধ দাঁড়াইতে পারে, গড়াইয়া না চলিয়া যায়।"

রাজা তখনই ধনুকের আগা দিয়া জমির উপরকার ঢিপি সরাইয়া দিলেন। তাহাতে জমি সমান হইল, আর ঢিপি সকল এক এক জায়গায় জড় হইয়া পর্বতের সৃষ্টি হইল। সমান জমির উপরে দুধ ছড়ান যাইতে পারে। সেই বাছুর হইলেন স্বয়ম্ভুব মনু। এমন বাছুর তো আর সহজে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে দেখিয়াই গাইয়ের বাঁট দিয়া দুধ ঝরিতে লাগিল।

তখন পৃথু নিজ হাতে গাই দোহাইতে লাগিলেন। সে আশ্চর্য গাই না জানি কতই দুধ দিয়াছিল। সংসারে যত শস্য, সকলই তাহাকে দোহাইয়া পাওয়া গেল, সেই শস্য খাইয়া এখনো আমরা বাঁচিয়া আছি। শুধু তাহাই নহে, পৃথুর পরে দেব, দানো, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি সকলে আসিয়া সেই গাই দোহাইতে লাগিল। সকলেই নিজের নিজের বাসন আনিল। নিজেদের এক একটি বাছুর ঠিক করিয়া আনিল, দোহাইবার লোক অবধি আনিতে ভুলিল না। কেহ সোনার বাসনে, কেহ রূপার বাসনে, কেহ লোহার হাঁড়িতে, কেহ পাথরের বাটিতে, কেহ লাউয়ের খোলায়, কেহ পদ্মপাতায় এমনি করিয়া তাহারা কতরকমের জিনিসে যে দোহাইয়া নিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তথাপি দুধে কম পড়ে নাই।

পৃথিবীও বাঁচিয়া গেল। এত জিনিস যাহার কাছে পাওয়া যায়, তাহাকে কি বুদ্ধিমান লোকে মারে? কাজেই পৃথু তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

পৃথু তাহাকে প্রাণদান করিয়াছিলেন, তাই আজও পৃথিবী বাঁচিয়া আছে—আর, প্রাণ দিয়াছিলেন বলিয়াই পৃথু পৃথিবীর পিতার তুল্য হইলেন। সেইজন্যই পৃথিবীকে পৃথুর কন্যা বলা হয়, আর তাহার নাম হইয়াছে 'পৃথিবী' বা 'পৃথ্বী'।

যাহা হউক, পৃথিবীর নামের অন্যরূপ অর্থও দেখা যায়। পৃথ্বী বলিতে খুব বড়ও বুঝায়। পৃথিবী যে খুবই বড় তাহাও তো আমরা দেখিতেই পাইতেছি। সুতরাং পৃথিবী নাম যথার্থই হইয়াছে।

প্রথম কবি ও প্রথম কাব্য

তমসা নদীর ধারে বাল্মীকি মুনির তপোবন ছিল। দুধারে গভীর বন;তাহার মাঝখান দিয়া সুন্দর ছোট নদীটি কুলকুল করিয়া বহিতেছে। তাহার জল এতই পরিষ্কার যে তলার বালি অবধি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। একটুও কাদা নাই, একগাছিও শ্যাওলা নাই। কাচের মতো টলমল করিতেছে। বাল্মীকি নদীর ধারে বেড়াইতে আসিলেন, আর সেই নির্মল জল দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই সুখ হইল। সঙ্গে তাঁহার শিষ, ভরদ্বাজ ছিলেন, তাঁহাকে তিনি বলিলেন, "দেখ ভরদ্বাজ, নদীর জল কি নির্মল, যেমন সাধু লোকের মন। আমার বল্কল দাও, আমি এইখানে স্নান করিব।"

সেইখানে দুটি বক নদীর ধারে খেলা করিতেছিল। এমন সুন্দর দুটি পাখি, এবং তাহাদের এমন মিষ্ট ডাক, আর তাহারা মনের আনন্দে এমনি চমৎকার খেলা করিতেছিল যে দেখিয়া মুনি আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। পাখি দুটির উপরে মুনির কেমন স্নেহ জন্মিয়া গেল, তিনি স্নানের কথা ভুলিয়া কেবলই তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময় কোথা হইতে এক দুষ্ট ব্যাধ আসিয়া পাখি দুটির পানে তীর ছুঁড়িয়া মারিল। এমন সুখে পাখি দুটি খেলা করিতেছিল, তাহাদের কোনো দোষ ছিল না, কোনো বিপদের কথা তাহারা জানিত না। এমন নিরীহ জীবকে বধ করে এমন নিষ্ঠুরও লোক হয়? তীর খাইয়া পুরুষ পাখিটি যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, মেয়েটি শোকে আর ভয়ে কাঁদিয়া আকুল হইল। মুনি আর এ দুঃখ সহিতে না পারিয়া ব্যাধকে বলিলেন, "ওরে ব্যাধ, এমন

সুখে পাখিটি খেলা করিতেছিল, তাহাকে তুই বধ করিলি? তোর কখনই ভালো হইবে না!"

দয়ালু মুনির মনের দুঃখ তাঁহার চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলির ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইল।

সেই কথায় আপনা হইতেই ছন্দ আসিয়া আপনা হইতেই তাহা কবিতা হইয়া গেল। সেই কবিতাই সকলের প্রথম কবিতা, তাহার পূর্বে কেহ কবিতা রচনা করে নাই।

মুনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "এ কি চমৎকার কথা আমি বলিলাম! আমি কিছুই জানি না, তবু ইহাতে বীণার ছন্দের মতন কেমন সুন্দর ছন্দ হইল! ইহার চারিভাগে সমান সমান অক্ষর হইল! আমি বলি ইহার নাম 'শ্লোক' হউক, কেননা আমার শোকের সময় ইহা আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে।"

ভরদ্বাজও বলিলেন, "গুরুদেব! কি সুন্দর কথা, এমন কথা তো আর কেহ কখনো বলে নাই। ইহার নাম শ্লোকই হউক।"

তারপর মুনি স্নান শেষ করিয়া ঘরে আসিয়া সেই পাখির আর সেই সুন্দর ছন্দের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। পাখি দুইটির দুঃখে কাতর হইয়া মুনি আর ব্রহ্মাকে অন্য কথা বলিবার অবসর পাইলেন না, তাঁহাকে সেই দুষ্ট ব্যাধের কথা বলিয়া সেই কবিতাটি গাহিয়া শুনাইলেন।

তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "বাল্মীকি, তোমার এ কবিতার নাম শ্লোকই হউক। এইরূপ শ্লোক লিখিয়া তুমি রামের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। সে বড় সুন্দর কাহিনী, তাহা যে পড়িবে তাহারই মঙ্গল হইবে। তুমি যাহা লিখিবে তাহার একটি কথাও মিথ্যা হইবে না। যতদিন পৃথিবীতে পর্বত আর নদী সকল থাকিবে, ততদিন লোকে তোমার 'রামায়ণে'র আদর করিবে; আর যতদিন রামায়ণের আদর থাকিবে, তুমি স্বর্গে গিয়া ততদিন আমার লোকে থাকিতে পাইবে।"

এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন, আর তাঁহার কথাগুলি মনে করিয়া বাল্মীকি বলিলেন, "এইরূপ মিষ্ট শ্লোক দিয়া আমি রামায়ণ রচনা করিব।"

তারপর সেই ধার্মিক মুনি কুশাসনে বসিয়া জোড়হাতে ভগবানকে স্মরণপূর্বক রামায়ণ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রামায়ণ শেষ হইল। তখন মুনি ভাবিলেন, 'কাব্য তো শেষ হইল, এখন ইহা গাহিবে কে? ঠিক সেই সময়ে 'কুশ' 'লব' দুই ভাই আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দুটি ভাই রামেরই পুত্র, মুনির বেশে সেই আশ্রমে থাকিয়া লেখাপড়া শিখেন। দেবতার মতন সুন্দর;গন্ধর্বের মতন মিষ্ট গান গাহেন। মুনি বলিলেন, "এই আমার রামায়ণের উপযুক্ত গায়ক।"

সেই দুটি ভাইকে পরম যত্নের সহিত মুনি রামায়ণ শিক্ষা দিলেন। তারপর একদিন সকল মুনিদিগকে সভায় ডাকিয়া সেই রামায়ণের গান তাঁহাদিগকে শোনান হইল। মুনিরা সকলে মোহিত হইয়া সে গান শুনিলেন, তাঁহাদের চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল, আর মুখ দিয়া ক্রমাগত কেবল "আহা!" "আহা!" এই শব্দ বাহির হইতে লাগিল। শেষে তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একজন মুনি তাঁহার নিকটে যাহা কিছু ছিল সকলই কুশলবকে দিয়া দিলেন। অন্যেরা কেহ বল্কল, কেহ হরিণের ছাল, কেহ কমণ্ডলু, কেহ কুড়াল কেহ কৌপীন দিলেন। একজন মুনি কাঠ আনিতে চাহিয়াছিলেন, সেই কাঠ বাঁধিবার দড়িগাছি

ভিন্ন তাঁহার নিকটে আর কিছুই ছিল না; তিনি সেই দড়িগাছিই কুশলবকে দিয়া বারবার আশীর্বাদ করিলেন।

ত্রিপুর

দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের ভয়ানক শত্রুতা ছিল। দিনরাতই কেবল ইহাদের মারামারি চলিত, তাহাতে অনেক সময় অসুরেরাও হারিত, অনেক সময় দেবতারাও হারিতেন। দেবতারা অসুরদের জ্বালায় অস্থির থাকিতেন, আবার অসুরেরা তপস্যা করিলে তাহাদিগকে বর না দিয়াও পারিতেন না। বর দিয়া তারপর তাহার ধাক্কা সামলাইতে তাঁহাদের প্রাণান্ত হইত।

একটা অসুর ছিল তাহার নাম ময়। জাদু, মায়া, ভেলকিবাজি যত আছে, ময় তাহার সকলই জানিত, আর তাহার জোরে সময় সময় দেবতাদিগকে ভারি নাকাল করিত।

একবার যুদ্ধে হারিয়া ময় তপস্যা করিতে লাগিল; বিদ্যুন্মালী আর তারক নামে আর দুইটা অসুরও তাহার দেখাদেখি তপস্যা আরম্ভ করিল। তাহারা উপবাস করিয়া শীতে ভুগিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া এমনি আশ্চর্য তপস্যা করিল যে, ব্রহ্মা আর তাহাদের কাছে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ব্রহ্মা বলিলেন, "বাপুসকল, আমি তোমাদের তপস্যায় বড়ই তুষ্ট হইয়াছি, এখন, কি বব লইবে বল।"

তখন ময় জোড়হাতে মিষ্ট কথায় তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিল, "প্রভু, দেবতাবা আমাদিগকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এখন আমরা কোথাও একটু থাকিবার জায়গা পাইতেছি না। দয়া করিয়া আমাকে এমন বর দিন, যাহাতে আমি একটি খুব ভালো দুর্গ প্রস্তুত করিতে পারি। সে দুর্গের ভিতরে বসিয়া থাকিলে আর কেহই যেন আমাকে কিছু করিতে না পারে।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "একেবারে কেহই কিছু করিতে পারিবে না, এমন কি হয়?"

ময় বলিল, "তাহা যদি না হয়, তবে এই বর দিন, যে একমাত্র শিব ছাড়া আর কেহ সে দুর্গ নষ্ট করিতে পারিবে না; আর শিবকেও একটিমাত্র বাণ মারিয়া সে কাজ করিতে হইবে।"

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হইবে।" এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন, ময়ও যারপরনাই খুশি হইয়া দুর্গ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

ময় বলিল, "আমি এমন দুর্গ বানাইব যে, তাহা তিন ভাগ হইয়া তিন জায়গায় থাকিবে। তাহা হইলে আর এক বাণে তাহাকে নষ্ট করা যাইবে না। খালি, একদিন সেই তিনটি ভাগ একত্র হইবে—যেদিন চন্দ্র আর সূর্য একসঙ্গে পুষ্য নক্ষত্রে থাকিবেন। সেইদিন যদি শিব আসিয়া বাণ মারেন, তবেই আমার এই দুর্গ তিনি নষ্ট করিতে পারিবেন, নহিলে নয়।"

এমনি করিয়াই সে তাহার দুর্গ প্রস্তুত করিল। পৃথিবীর উপরে করিল একটি লোহার দুর্গ; সেটা তারকের জন্য। স্বর্গে করিল একটা রূপার দুর্গ; সেটা বিদ্যুন্মালীর জন্য। আর স্বর্গেরও উপরে একটা সোনার দুর্গ, সেটা করিল তাহার নিজের থাকিবার জন্য। এইরূপে তিনটি পুরী মিলিয়া দুর্গটি প্রস্তুত হইল, তাই তাহার নাম হইল ত্রিপুর।

তেমন দুর্গ আর কেহ কখনো দেখে নাই। যেমন বড়, তেমনি মজবুত, তেমনি সুন্দর।

মাঠ, বাগান, পথ ঘাট, হাট বাজার, নদী পুকুর সকলই তাহার ভিতর আছে, কোনো জিনিসের জন্যই দুর্গের বাহিরে যাইতে হয় না। অসুরেরা যে যেখানে ছিল, খবর পাইয়া সকলে আসিয়া সেই দুর্গে বাস করিতে লাগিল। তাহাদের আর আনন্দের সীমা নাই। আর তাহাদের কিসের ভয়?

তখন তাহাদের সাহস বাড়িয়া গেল। এতদিন দেবতাদের ভয়ে ঝোপে জঙ্গলে লুকাইয়া ছিল, এখন আবার সুবিধা পাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে খোঁচাখুঁচি আরম্ভ করিল। কোনোদিন স্বর্গের বাগান ভাঙ্গে, কোনোদিন দেবতাদের বাড়িতে গিয়া ঝগড়া করে, কোনোদিন মুনি-ঋষিদিগের তপস্যা মাটি করিয়া দেয়।

ময় নিজে তেমন মন্দ লোক ছিল না কিন্তু অসুরেরা তাহার কথা শুনিলে তো? তাহারা দল বাঁধিয়া সংসারময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যাহাকে পায়, তাহাকেই ধরিয়া মারে; তাহাদের ভয়ে লোকে স্থির হইয়া ঘরে থাকিতে পারে না।

তখন সকলে ব্রহ্মার নিকটে গিয়া জোড়হাতে বলিল, "হে পিতামহ! আপনি তো অসুরদিগকে বর দিয়াছেন, এখন আমাদের কি উপায় হইবে? অসুরের জ্বালায় আমাদের প্রাণে বাঁচাই যে ভার হইয়াছে। আপনি যদি ইহাদের শাসন না করেন, তবে আর সংসারে দেবতা, মানুষ বা জীবজন্তু কিছুই থাকিবে না।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমি বর দিয়াছি বটে কিন্তু উপায়ও রাখিয়া দিয়াছি। উহাদের ঐ দুর্গ একটি বাণেই ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়। কিন্তু তাহা তোমরা পারিবে না। চল শিবের কাছে যাই। তিনিই এ কাজের উপযুক্ত লোক।"

শিব তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময় তেত্রিশ কোটি দেবতা সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া জোড়হাতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

শিব বলিলেন, "তোমরা কি জন্য আসিয়াছ? বল আমি তোমাদের কি উপকার করিতে পারি; এখনি তাহা করিব।"

দেবতারা বলিলেন, "অসুরেরা তো আর আমাদের কিছু রাখিল না, এখন আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমাদের বাড়ি বাগান সব ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, হাতি ঘোড়া ধরিয়া নিয়াছে, ধনরত্ন লুট করিয়াছে, এরপর প্রাণে মারিবে। দোহাই ঠাকুর! আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

তাহা শুনিয়া শিব বলিলেন, "তোমাদের কোনো ভয় নাই, আমি ত্রিপুর দুর্গ পোড়াইয়া দিতেছি। একখানা ভালোরকম রথ আন তো।"

এ কথায় দেবতারা সকলে মিলিয়া সংসারের সকল ভয়ংকর আর আশ্চর্য জিনিস দিয়া, এমনি চমৎকার এক রথ প্রস্তুত করিলেন সে কি বলিব। রথের দিকে চাহিয়া শিব অনেকক্ষণ ধরিয়া খালি 'বাঃ! বাঃ!' এইরূপই করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "বেশ রথ হইয়াছে। এখন ইহার উপযুক্ত একটি সারথি চাই।"

দেবতারা তো বড়ই সংকটে পড়িলেন। এমন রথের সারথি তো যেমন তেমন হইলে চলিবে না—হায় এখন সারথি কোথায় পাই?

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "চিন্তা কি? আমিই সারথি হইব।" এই বলিয়া ব্রহ্মা যখন রথে উঠিয়া রাশ ধরিয়া বসিলেন তখন সকলের কী আনন্দই হইল। শিবও তখন যারপরনাই সুখী

হইয়া বলিলেন, "এইবার ঠিক সারথি হইয়াছে।"

সেই রথে চড়িয়া শিব যুদ্ধ করিতে চলিলেন, সঙ্গে দেবতা গন্ধর্ব সকলে জয় জয় শব্দে ছুটিয়া চলিল। ষাঁড়ে চড়িয়া নন্দী চলিল, ময়ূরে চড়িয়া কার্তিক চলিলেন, ঐরাবতে চড়িয়া ইন্দ্র চলিলেন, সাপে চড়িয়া বরুণ চলিলেন, মহিষে চাড়য়া যম চলিলেন। শিবের যত ভূত, তাহারাও শিবের রথ ঘিরিয়া গর্জন করিতে করিতে চলিল, হাতির মতো, পাহাড়ের মতো তাহাদের শরীর, মেঘের মতো তাহাদের ডাক।

এদিকে অসুরেরা এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ময় তাড়াতাড়ি অসুরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "সাবধান, সাবধান। ঐ দেখ দেবতারা যুদ্ধ করিতে আসিতেছে। দেখিয়ো, যেন উহাদিগকে সহজে ছাড়িয়ো না।"

এমনি করিয়া ক্রমে দেবতা আর অসুরদিগের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অসুরগুলি দেখিতে যেমন ভয়ংকর, শিবের ভূত সকলও তেমনি বিকট; আর তাহাদের যুদ্ধও হইল বড়ই সাংঘাতিক। অসুরেরা মনে করে যে তাহারা দেখিতে ভারি সুন্দর, তাই ভূতগুলির জানোয়ারের মতো মুখ দেখিয়া, তাহারা আর হাসি রাখিভে পারে না।

সেই ভূতদের সঙ্গে খানিক যুদ্ধ করিলেই আবার তাহাদের সে হাসি শুকাইয়া যায়। তবুও অসুরেরা যেমন তেমন যুদ্ধ করে নাই। ময় আর তারক দুজনে নানারূপ মায়া খেলাইয়া ভূত আর দেবতা সকলকেই যারপরনাই ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কোথা হইতে যে তাহারা যত রাজ্যের আগুন, আর বৃষ্টি, আর ঝড়, আর বাঘ, আর সাপ, আর কুমীর আনিয়া দেবতাদের উপর ফেলিতে লাগিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। তথাপি ক্রমে দেবতাদেরই জয় হইতে লাগিল, নন্দীর হাতে বিদ্যুন্মালী মারা গেল, আর সকল অসুরই কাবু হইয়া পড়িল। তখন ময় দেখিল যে এখন একবার দুর্গের ভিতরে গিয়া একটু বিশ্রাম না করিলে আর চলিতেছে না।

দুর্গের ভিতরে আসিয়া ময় ভাবিতেছে, এখন উপায় কি হয়? এমন দুর্গ করিয়াও দেবতাদের হাতে শেষে এত নাকাল হইতে হইল। বলিতে বলিতে চট্‌ করিয়া তাহার মাথায় বুদ্ধি জোগাইয়াছে, আর অমনি সে মায়ার বলে দুর্গের ভিতরে এক আশ্চর্য পুকুর তৈয়ীর করিয়া ফেলিয়াছে। সে পুকুরের জল অমৃত, সে জল একবার খাইলে বা তাহাতে স্নান করিলে মরা যে সেও বাঁচিয়া উঠে।

তখন আর কিসের ভয়? যত অসুর মরে, সকলকেই আনিয়া সেই পুকুরে স্নান করায়। এমনি করিয়া তাহারা বিদ্যুন্মালীকে আবার বাঁচাইয়া তুলল আর কত মরা অসুর যে বাঁচাইল তাহার তো লেখা জোখাই নাই। বাঁচিয়া উঠিয়াই তাহারা আবার বলিল, "কোথায় গেল শিব? কোথায় নন্দী? কোথায় দেবতা? কোথায় ভূত? মার তাহাদের সকলকে।"

এবারে দেবতারা বড়ই সংকটে পড়িলেন। যত অসুর মারেন, সকলেই খানিক পরে আবার আসিয়া যুদ্ধ করিতে থাকে। একি আশ্চর্য ব্যাপার। মরিয়াও মরে না, বরং তাহাদের গায়ের জোর যেন আরো বাড়িয়া যায়। দেবতাগণ আর ভাবিয়া পথ পাইতেছেন না।

এমন সময় শিবের একটা ভূত ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কর্তা, অসুর মারিয়া আর কি হইবে? এদের ঘরে পুকুর আছে, তাহার জলে চোবাইলে মরাটি চাঙ্গা হয়।"

অসুরেরা তখন বড়ই ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছিল। দেবতারা একে ইহাদের জ্বালায় অস্থির,

তাহাতে আবার শিবের রথের চাকা মাটিতে বসিয়া গিয়াছে, সকলে প্রাণপণে টানাটানি করিয়াও তাহাকে তুলিতে পারিতেছেন না। তখন যদি বিষ্ণু তাড়াতাড়ি এক বিশাল ষাঁড় সাজিয়া শিং দিয়া সেই রথ না উঠাইতেন, তবে না জানি সেদিন কি সর্বনাশই হইত। ইহারই মধ্যে তারকাসুর ঝড়ের মতো ছুটিয়া আসিয়া ব্রহ্মাকে এমনি গুঁতা মারিয়াছিল যে, তিনি হাতের রাশ রথে ফেলিয়া কেবলই হাঁপাইতেছিলেন।

এদিকে বিষ্ণু রথখানিকে শিং দিয়া উঠাইয়া দিয়াই অসুরদিগের দুর্গের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। অসুরেরা তাঁহার বিশাল দেহ আর শিং নাড়া দেখিয়া আর গর্জন শুনিয়া, আর তাঁহাকে আটকাইতে সাহসই পাইল না। তিনি ছুটিতে ছুটিতে সেই পুকুরে গিয়া চোঁ চোঁ শব্দে তাহার সমস্ত জল খাইয়া ফেলিলেন।

ইহার পর আর অসুরেরা ভূতদের সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া উঠিল না; তাহারা ঢিপ্ ঢাপ্ ভূতের কিল খাইতে খাইতে ছুটিয়া দুর্গের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। তাহা দেখিয়া সকলে হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল।”

তখন আর অসুরেরা ভূতের ভয়ে স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাদের দুর্গসুদ্ধ সমুদ্রের উপরে চলিয়া গেল। কিন্তু দেবতারা তাহাদিগকে এত সহজে ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সেইখানে গিয়া আবার তাহাদের সঙ্গে বিষম যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তারকাসুর নন্দীর হাতে মারা গেল, বিদ্যুন্মালীরও সেই দশা হইতে আর অধিক বিলম্ব হইল না।

তারপর ক্রমে সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন চন্দ্র আর সূর্য একসঙ্গে পুষ্যা নক্ষত্রে আসিবেন। সেই পুণ্যযোগে ত্রিপুর দুর্গের তিনটি ভাগও এক জায়গায় আসিয়া মিলিবার কথা। তখন তাহার উপরে শিবের বাণ পড়িলে, এক বাণেই সেই দুর্গ নষ্ট হইয়া যাইবে। শিব তাহার জন্যই ধনুর্বাণ লইয়া প্রস্তুত আছেন। ঠিক সময়টি উপস্থিত হইবামাত্র ভীষণ শব্দে তিনি সেই বাণ ছাড়িয়া দিলেন, অমনি তাহা আকাশ পাতাল আলো করিয়া অসুরদিগের দুর্গের উপর গিয়া পড়িল। সে বাণের তেজ এমনি ছিল যে দুর্গের উপরে তাহা পড়িবামাত্রই দেখিতে দেখিতে সেই দুর্গ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল!

এইরূপে ত্রিপুর দুর্গের শেষ হইল। অসুরেরা আর সকলেই তাহার সঙ্গে পুড়িয়া মরিয়াছিল, কেবল ময় মরে নাই। সে শিবের ভক্ত ছিল, তাই শিব দয়া করিয়া নন্দীকে পাঠাইয়া আগেই তাহাকে সাবধান করিয়া দেন। নন্দীর কথায় সে তাহার থাকিবার ঘরখানি সুদ্ধ পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল।

মহিষাসুর

একটা ভারি ভয়ংকর অসুর ছিল। সে মহিষ সাজিয়া বেড়াইত, তাই সকলে তাকে বলিত মহিষাসুর।

দেবতারা কিছুতেই মহিষাসুরকে আঁটিতে পারিতেন না। একশত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে সে তাঁহাদিগকে হারাইয়া স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া

নিজে আসিয়া ইন্দ্র হইল।

দেবতারা তখন আর কি করেন? তাঁহারা ব্রহ্মাকে সঙ্গে করিয়া মহাদেব আর বিষ্ণুর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "হে প্রভু, মহিষাসুর তো আমাদের বড়ই দুর্দশা করিয়াছে, আমাদিগকে যুদ্ধে হারাইয়া স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে; এখন আপনারা যদি আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তবে আমাদের উপায় কি হইবে?"

অসুরদের অত্যাচারের কথা শুনিয়া শিব এবং বিষ্ণুর বড়ই রাগ হইল। সেই রাগে তাঁহাদের আর সকল দেবতাদের শরীর হইতে এমন একটা তেজ বাহির হইল যে সে বড়ই আশ্চর্য; মনে হইল যেন একটা আগুনের পর্বত আকাশ পাতাল ছাইয়া সকলের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই তেজ জমাট বাঁধিয়া একটি দেবীর মতো হইল।

তাহাকে দেখিয়া দেবতাদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাঁহারা সকলে মিলিয়া কেহ অস্ত্র, কেহ বস্ত্র, কেহ বর্ম, কেহ অলংকার আনিয়া তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। হিমালয় বিশাল একটি সিংহ আনিয়া তাঁহার বাহন করিয়া দিলেন।

দেবীর হাজারখানি হাতে দশদিক ছাইয়া গিয়াছে, তাঁহার মুকুট আকাশ ভেদ কবিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার ভারে পৃথিবী বসিয়া পড়িয়াছে, ধনুর শব্দে আকাশ পাতাল কাঁপিতেছে। তিনি যখন হাজার হাতে হাজার অস্ত্র লইয়া গর্জন করিলেন, তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়া উঠিল; অসুরেরা সেই গর্জন শুনিয়া ছুটিয়া আসিল।

তারপর কি যেমন তেমন যুদ্ধ হইল? মহিষাসুর নিজে যেমন ভয়ংকর তাহাব এক একটি সেনাপতিও তেমনি। তাহাদের একটার নাম চিকুর, আর একটার নাম চামর, আরগুলিব নাম উদগ্র, মহাহনু, অসিলোমা, বাস্কল, পারিবারিত আব বিড়ালাক্ষ। এইসকল সেনাপতি আর কোটি কোটি অসুর লইয়া মহিষাসুর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিল। সকলে মিলিয়া অস্ত্র যে কত ছুঁড়িল তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কিন্তু সে অস্ত্রে দেবীর কিছুই হইল না। তাঁহার এক এক নিশ্বাসে হাজার হাজার ভূত উপস্থিত হইয়া অসুরের দলকে ঠেঙ্গাইয়া ঠিক করিতে লাগিল। দেবীর সিংহও আঁচড়-কামড় দিয়া তাহাদিগকে কম নাকাল করিল না। আর দেবীর নিজের তো কথাই নাই। তাঁহার হাজার হাতে হাজার অস্ত্র; সে অস্ত্রে তিনি অসুরদিগকে কাটিয়া, ফুঁড়িয়া, পিষিয়া, পুঁতিয়া শেষ করিতে লাগিলেন। সেনাপতিগুলিও কোনোটা দেবীর অস্ত্রের ঘায়ে, কোনোটা তাঁহার কিলে আর চাপড়ে, কোনোটা বা সিংহের কামড়ে মারা গেল। তখন আর মহিষাসুর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে শিং নাড়িয়া লেজ ঘুরাইয়া, গর্জন করিতে করিতে দেবীর ভূতগুলিকে এমনি তাড়া করিল যে তাহারা পলাইতে পারিলেই বাঁচিত, কিন্তু বাঁচিতে পারিলে তো পলাইবে। দেখিতে দেখিতে সে ভূতের দলকে শেষ করিয়া দেবীর সিংহের পানে ছুটিয়াছে, তাহার লেজের তাড়ায় সাগর লণ্ডভণ্ড, শিং-এর নাড়ায় মেঘ সব খণ্ড খণ্ড হইতেছে, নিশ্বাসের চোটে পাহাড় পর্বত উড়িয়া যাইতেছে। এমন সময় দেবীর পাশ অস্ত্র আসিয়া তাহাকে এমনি বাঁধন বাঁধিল যে আর তাহার নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু, অসুরের মায়া, সে কি সহজ কথা? চোখের পলকে মহিষটা সিংহ হইয়া বাঁধন ছাড়াইয়া আসিল। দেবী তখনই সেই সিংহকে কাটিলেন। অমনি দেখা গেল যে আর সিংহ নাই, তাহার জায়গায় খড়্গ হাতে একটা মানুষ খেপিয়া আসিতেছে। মানুষ কাটা যাইতে না

যাইতেই কোথা হইতে এক হাতি আসিয়া দেবীর সিংহকে শুঁড় দিয়া জড়াইয়া বসিয়াছে। দেবী খড়্গ দিয়া হাতির শুঁড় কাটিলেন, অমনি হাতি আবার মহিষ হইয়া গেল, সেটা আবার শিং দিয়া দেবীকে পর্বত ছুঁড়িয়া মারে। দেবী এক লাফে সেই মহিষের ঘাড়ে চড়িয়া তাহাকে এমনি শূলের ঘা মারিলেন যে তখন অসুর মহাশয়কে সেই মহিষের ভিতর হইতে বাহির হইতেই হইল। কিন্তু তখনো তাহার তেজ কমে নাই, সে আধাআধি বাহির হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে!

যাহা হউক, যুদ্ধ আর তাহার বেশিক্ষণ করিতে হইল না। কেননা, দেবী সেই মুহূর্তেই খড়্গ দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

তখন তো দেবতাগণের খুব আনন্দ হইবেই। তাঁহারা দেবীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনেক স্তবস্তুতি করিলেন।

দেবী তাহাতে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা কি বর চাও?"

দেবগণ বলিলেন, "আবার কি বর চাহিব? মহিষাসুর মরিয়াছে। তাহাতেই আমাদের ঢের হইয়াছে। এখন শুধু এইটুকু বল যে আমাদের আবার যদি বিপদ হয় তখন ডাকিলে আসিবে।"

দেবী বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আসিব।"

এই বলিয়া তিনি আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

অসুর যতদিন আছে, ততদিন দেবতাদিগের বিপদ হওয়ার আর ভাবনা কি?

কাজেই বুঝিতেই পার যে দেবীকে শীঘ্রই আবার তাঁহাদের ডাকে আসিতে হইয়াছিল।

শুম্ভ-নিশুম্ভ

শুম্ভ, আর তাহার ভাই নিশুম্ভ, এই দুটা অসুর দেবতাদিগকে বড়ই নাকাল করিয়াছিল। তাহারা তাঁহাদিগকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া আর অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে নাই, তাঁহাদের ব্যবসায় পর্যন্ত নিজেরা করিতে আরম্ভ করিল। চন্দ্র, সূর্য, কুবের, পবন, অগ্নি কাহারও ব্যবসাই তাঁহাদের হাতে রাখিল না।

বিপাকে পড়িয়া দেবতারা বলিলেন, "আর কাহার কাছে যাইব। মহিষাসুরের হাত হইতে যে দেবী আমাদিগকে বাঁচাইয়াছিলেন; সেই চণ্ডিকা দেবীকেই ডাকি।" এই বলিয়া তাঁহারা হিমালয় পর্বতে গিয়া চণ্ডিকা দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সময় পার্বতী সেই পথে যাইতেছিলেন, তিনি দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন. "আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন?" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার শরীর হইতে চণ্ডিকা দেবী বাহির হইয়া বলিলেন, "দেবতারা আমাকেই ডাকিতেছেন, শুম্ভ-নিশুম্ভ তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে।" এই বলিয়া চণ্ডিকা দেবী যারপরনাই সুন্দর একটি মেয়ে সাজিয়া হিমালয় পর্বতে বসিয়া রহিলেন।

চণ্ড আর মুণ্ড নামে দুটা অসুর সেইখানে কি করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সেই মেয়েটিকে দেখিতে পাইয়া শুম্ভকে গিয়া বলিল যে, "মহারাজ, হিমালয় পর্বতে কি আশ্চর্য সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখিয়া আসিয়াছি, কি বলিব। এমন আর কেহ কখনো দেখে নাই। মহারাজ, সংসারে যত ভালো ভালো জিনিস, সব আপনারা আনিয়াছেন, কিন্তু এই মেয়েটিকে রানী

করিতে না পারিলে সবই মাটি।"

এ কথা শুনিয়া শুম্ভ তখনই সুগ্রীব নামে একটা অসুরকে ডাকিয়া বলিল, "সুগ্রীব, শীঘ্র যাও। যেমন করিয়া পার সেই মেয়েটিকে খুশি করিয়া এখানে লইয়া আইস।"

সুগ্রীব হিমালয়ে গিয়া দেবীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে লাগিল, "আমার প্রভু যে শুম্ভ আর নিশুম্ভ, তাঁহাদের মতন আর জগৎ-সংসারে কেহই নাই। হে দেবি, ইঁহাদের একজনকে বিবাহ করিলে তোমার আর সুখের সীমা থাকিবে না।"

দেবী বলিলেন, "আহা। তুমি বড় ভালো কথা বলিয়াছ, তোমার যে প্রভু, তাঁহাদের মতন আর কোথাও কেহ নাই। কিন্তু আমার ছেলেমানুষী খেয়াল হইয়াছে, আমাকে যুদ্ধে হারাইতে না পারিলে কেহ আমাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। তোমার প্রভুকে গিয়া বল শীঘ্র আসিয়া আমাকে যুদ্ধে হারাইয়া বিবাহ করুন।"

এ কথা শুনিয়া শুম্ভ কি ভয়ানক চটিল, বুঝিতে পার। সে অমনি তাহার সেনাপতি ধূম্রলোচনকে বলিল. "যাও তো ধূম্রলোচন, সেই ঠেঁটা মেয়েটাকে চুলে ধরিয়া নিয়া আইস।" ধূম্রলোচন অনেক লোক লইয়া ভারি ঘটা করিয়া দেবীকে আনিতে গেল। কিন্তু সে তাঁহাকে ধরিয়া আনিবে কি, তিনি কেবল একটিবার 'হুঁ' করিয়া তাহার দিকে চাহিবামাত্রই পুড়িয়া ছাই, তাহার সঙ্গে আর যত অসুর আসিয়াছিল, দেবীর সিংহই তাহাদিগকে শেষ করিয়া দিল।

তখন শুম্ভ আরো অনেক সৈন্য, রথ, হাতি, ঘোড়া সঙ্গে দিয়া সেই চণ্ড আর মুণ্ডকে পাঠাইল। তাহারা খাঁড়া ঢাল হাতে হিমালয়ে গিয়া বিষম কাঁইমাই শব্দে যেই দেবীকে ধরিতে যাইবে অমনি দেবী ভ্রূকুটি করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইলেন। ভ্রূকুটি করিবামাত্র তাঁহার কপাল হইতে আর একটি দেবতা বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার নাম চামুণ্ডা। তাঁহার চেহারা বড়ই ভয়ংকর। রঙ কালো, চোখ লাল, শরীরে মাংস নাই, খালি হাড় আর চামড়া। হাঁ করিলে পাহাড় পর্বত গিলিয়া ফেলিতে পারেন, চ্যাচাইলে দেব দানব সকলের মাথা ঘুরিয়া যায়। চামুণ্ডা বাঘের ছাল পরিয়া, মানুষের মাথার মালা গলায় দিয়া গদা খড়্গ পাশ হাতে আসিয়াই অসুরদিগকে ধরিয়া মুড়ি-মুড়কির মতো মুখে পুরিতে লাগিলেন। হাতি, রথ, ঘোড়া, মাহুত, সারথি, অঙ্কুশ, জাঠা, গদা, যাহা হাতে উঠে, মনের সুখে চিবাইয়া খান, বাছিবার দরকার হয় না। অসুরদের যত অস্ত্র আসে, সব গিলিয়া ফেলেন, আর হি, হি, হি, হি করিয়া হাসেন। দেখিতে দেখিতে চামুণ্ডা সকল অসুর খাইয়া শেষ করিলেন। বাকি রহিল কেবল চণ্ড আর মুণ্ড! তাহাদের চুলে ধরিয়া মাথা কাটিতেও মুহূর্তেক মাত্র লাগিল।

ইহার পর শুম্ভ আর নিশুম্ভ নিজেই যুদ্ধ করিতে আসিল। তাহাদের সঙ্গে অতি ভয়ংকর ভয়ংকর অসুর যে কত আসিল, আর হাতি, ঘোড়া, রথ, অস্ত্র যে কতরকম আসিল, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। আর যুদ্ধ যাহা হইল, তাহার কথা কি বলিব! দেবীর সঙ্গে চামুণ্ডা আছেন, আর অন্য দেবতারাও নানারকমে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন, আর দেবীর সিংহ তো আছেই। সে সময়ে দেবী এমন বিকট হাসি হাসিতেছিলেন, যে অনেক অসুর তাহাতেই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, আর তখন চামুণ্ডার মতন দেবী নিজেও তাহাদিগকে ধরিয়া মুখে দিতেছিলেন। ইহার পর আর টিকিতে না পারিয়া অসুরেরা ছুটিয়া পলাইতে লাগিল।

অসুরদের মধ্যে একজন ছিল, তাহার নাম রক্তবীজ সে বেটা বড়ই ভয়ংকর;তাহার এক বিন্দু রক্ত মাটিতে পড়িলেই সেখান হইতে একটা বিশাল অসুর দাঁত খিঁচাইয়া উঠিয়া

দাঁড়ায়। সেই রক্তবীজকে লইয়া দেবী প্রথমে একটু মুস্কিলে পড়িলেন। তাহাকে যত কাটেন, ততই রক্ত পড়ে, আর ততই হাজার হাজার অসুর উঠিয়া দাঁড়ায়। অসুরে ত্রিভুবন ছাইয়া গেল, তাহাদের চীৎকারে পাতালের লোক অবধি কালা হইয়া গেল। দেবতারা তো ভাবিলেন, সর্বনাশ বুঝি হয়।

তখন দেবী চামুণ্ডাকে বলিলেন, "এক কাজ কর। অসুরের গায়ে খোঁচা লাগিতে না লাগিতেই তাহার রক্ত চাটিয়া খাইবে। আর সেই রক্ত হইতে অসুর হইতে না হইতেই তাহাকে গিলিয়া ফেলিবে।" চামুণ্ডা বলিলেন, "আচ্ছা", ইহার পর আর রক্তবীজের বেশি বাড়াবাড়ি করিতে হয় নাই। গিলিয়া খাইলে আর অসুর হইয়াই কি করিবে? কাজেই দেখিতে দেখিতে অসুরের দল কমিয়া গেল, রক্তবীজের গায়ের রক্তও ফুরাইয়া আসিল। এতক্ষণ সে ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু রক্ত ফুরাইয়া গেলে আর তাহার কিছু করবার শক্তি রহিল না। দেখিতে দেখিতে দেবী নানা অস্ত্রে তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন।

তখন বাকি রহিল কেবল শুম্ভ আর নিশুম্ভ। নিশুম্ভ খানিকক্ষণ খুব যুদ্ধ করিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। তারপর শুম্ভ একাই যুদ্ধ করিতে লাগিল। শুম্ভের আটটা হাত ছিল, গায়ে জোরও ছিল তেমনি; সে যুদ্ধও করিল খুব। কিন্তু শেষে সেও অজ্ঞান হইয়া গেল।

ততক্ষণে নিশুম্ভের আবার জ্ঞান হইয়াছে। নিশুম্ভের দশ হাজার হাত। সেই দশ হাজার হাতে দশ হাজার অস্ত্র লইয়া সে দেবীর সঙ্গে বিষম যুদ্ধ করিতে লাগিল। মরিবার সময়ও সে সহজে মরিল না। দেবী শূল দিয়া তাহার বুক ভেদ করিয়া ফেলিলেন, সেই বুকের ভিতর হইতে আবার 'দাঁড়া, দাঁড়া,' বলিয়া একটা বিকট অসুর বাহির হইয়া আসিল। যাহা হউক, সে ভালো করিয়া বাহির হইতে না হইতেই দেবী হাসিতে হাসিতে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলাতে, বেচারা যুদ্ধ করিবার অবসর পায় নাই।

শুম্ভ ইহার মধ্যেই আবার উঠিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। ইহাই তাহার শেষ যুদ্ধ। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া বিধিমতে দেবীকে মারিবার চেষ্টা করিল। একটি একটি করিয়া তাহার সকল অস্ত্রই দেবী কাটিয়া ফেলিলেন তারপর বাকি রহিল খালি কিল আর চাপড়। একবার দেবীর চাপড় খাইয়া সে চিৎ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনই আবার উঠিয়া দেবীকে ধরিয়া এক লাফে আকাশে উঠিয়া গেল। তারপর আকাশে থাকিয়াই দুজনের কম যুদ্ধ হইল না। যুদ্ধ করিতে করিতে দেবী তাহাকে বনবন করিয়া ঘুরাইয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন; তাহাতেও কি সে মরে? সে তখনই উঠিয়া কিল বাগাইয়া দেবীকে মারিতে চলিয়াছে। তখন দেবী তাঁহার শূল দিয়া তাহার বুকে এমনি ঘা মারিলেন যে তাহার পর তাহাকে উঠিতে হইল না।

তখন যে দেবতারা দেবীর স্তব খুব ভালো করিয়াই করিয়াছিলেন, তাহা আমি না বলিলেও তোমরা বুঝিয়া লইতে পারিবে। দেবী তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা কি চাও?" দেবতারা বলিলেন, "এমনি করিয়া আমাদের শত্রুদিগকে বধ করিও।"

গণেশ

শিবের সঙ্গে যখন পার্বতীর বিবাহ হইল তখন পার্বতী কৈলাস পর্বতে আসিয়া ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। শিব খেয়ালশূন্য লোক, তাহাতে আবার ভূতের দল নিয়া থাকেন—মেয়েরা বাড়িতে থাকিলে কেমন করিয়া চলাফেরা করিতে হয়, সেদিকে তাঁহার নজর একটু কম। যখন তিনি তাঁহার ভূতদের নিয়া বাড়ির ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হন, পার্বতী আর তাঁর সখীদের তাহাতে বড় অসুবিধা হয়। দরোয়ান নন্দী তাঁহাকে মানা করিলেও তিনি তাহা শোনেন না, তাঁহাকে ধমকাইয়া ঠিক করিয়া দেন।

পার্বতীর সখী জয়া আর বিজয়া ক্রমাগতই বলেন, "ইহারা সকলেই শিবের লোক, কাজেই তাঁহার ধমকে ভয় পায়। আমাদের নিজের একটি ভালো লোক হইলে বেশ হইত।" এ কথায় পার্বতী কাদা দিয়া যারপরনাই সুন্দর একটা খোকা তয়ের করিলেন, তাহার নাম হইল গণেশ। সেই খোকাটিকে তিনি সুন্দর পোশাক আর গহনা পরাইয়া দরোয়ান সাজাইয়া লাঠি হাতে দিয়া দরজায় বসাইয়া দিলেন। গণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে বসে আমি কি করব?" পার্বতী বলিলেন, "বাবা, তুমি এখানে দরোয়ান হবে, কাউকে ঢুকতে দিবে না।"

এই বলিয়া গণেশের মুখে বার বার চুমো খাইয়া পার্বতী স্নান করিতে গেলেন আর তাহার খানিক পরেই শিব তাঁহার ভূতপ্রেত লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন. কিন্তু গণেশ দরজা ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন, "কোথা যাচ্ছ? থামো, মা স্নান করছেন" বলিয়াই তিনি লাঠি তুলিলেন। শিব আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "আরে আমি শিব।" গণেশ বলিলেন, "শিব আবার কে? তুমি কেন যাবে?" শিব বলিলেন, "এ তো দেখছি ভারি রোখা। আরে আমি পার্বতীর স্বামী।" বলিয়া তিনি যেই ঢুকিতে যাইবেন, অমনি গণেশ ধাঁই করিয়া তাঁর পিঠে লাঠি মারিয়া বসিয়াছেন।

তখন তো বড়ই বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইল। শিবের হুকুমে তাঁহার ভূতেরা আসিয়া গণেশকে শাসাইতে লাগিল। গণেশ তাহাদের বিকট চেহারা দেখিয়া একটুও ভয় পাইলেন না। তিনি বলিলেন, "বাঃ! মুখের ছিরি দেখ, যা বেটারা এখান থেকে।"

ভূতেরা বড়ই মুশকিলে পড়িল। তাহাদের হাসিও পাইয়াছে। রাগ হইয়াছে, আবার ভয়ও হইয়াছে। তাহারা এক একবার শিবের কাছে ফিরিয়া যায়। আবার তাঁহার তাড়া খাইয়া গণেশের কাছে আসিয়া দাঁত খিঁচায়। গণেশ লাঠি লইয়া তাড়া করিলে আবার শিবের কাছে ছুটিয়া যায়। যাহা হউক শেষে তাহারা শিবের কথায় খুব সাহস পাইয়া গণেশের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। নন্দী আর ভৃঙ্গী দুজনে আসিয়া তাহার দুই পা ধরিয়া দিল টান, আর গণেশ ঠাস্‌ঠাস্‌ করিয়া তাহাদের দুজনকে মারিলেন দুই থাপ্পড়। তারপর দরজার হুড়কা লইয়া ভূতের দলকে তিনি এমনি ঠেঙ্গান ঠেঙ্গাইলেন যে কি বলিব!

এদিকে নারদ মুনি গিয়া দেবতাদিগকে এই যুদ্ধের সংবাদ দিয়াছেন, দেবতারাও সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা মুনি-ঋষি, অপ্সরা, কেহই আসিতে বাকি নাই। শিব তখন ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, "দেখ তো ঐ ছেলেটিকে বলিয়া

কহিয়া শান্ত করিতে পার কিনা।"

শিবের কথায় ব্রহ্মা মুনি-ঋষিদিগকে লইয়া গণেশকে শান্ত করিতে গেলেন। গণেশ তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি ভূত আসিয়াছে, কাজেই বুঝিতেই পার—ব্রহ্মার মুখে যত দাড়ি ছিল, সব তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মা যত চ্যাঁচান, "দোহাই বাবা, আমাকে মারিও না, আমি যুদ্ধ করিতে আসি নাই," গণেশ ততই আরো বেশি করিয়া তাঁহার দাড়ি ছিঁড়েন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শেষে দরজার হুড়কা লইয়া তাঁহাকে তাড়া করিলেন। তখন আর কাহারও সেখানে থাকিতে ভরসা হইল না, সকলে উর্ধ্বশ্বাসে শিবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তারপর সকল দেবতা আর ভূত মিলিয়া গণেশের সঙ্গে যে যুদ্ধ করিল, সে বড়ই ভীষণ।

পার্বতী দেখিলেন যে গণেশের বড়ই বিপদ উপস্থিত, এখন আর শুধু লাঠি হুড়কা লইয়া যুদ্ধ করিলে চলিবে না, তাই তিনি দুইটা ভয়ংকর শক্তি তয়ের করিয়া গণেশকে দিলেন।

তাহার একটার মুখ এমনি বিকট যে সে হাঁ করিলে পাহাড় পর্বত গিলিয়া ফেলিতে পারে। আর একটা বিজুলীর মতো ঝলমল করে, আর তাহার যে কত হাজার হাত তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। সেই দুই শক্তি দেবতাদের সকল অস্ত্র গিলিয়া ফেলিতে লাগিল, কাজেই গণেশের গদার সামনে তাঁহাদের কেহই টিকিতে পারিলেন না। দেবতা আর ভূত সকলকেই পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইল। তাঁহারা কত যুদ্ধ করিয়াছেন আরো কত যুদ্ধ দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন বিপদে আর কখনো পড়েন নাই। তখন শিব আর বিষ্ণু পরামর্শ করিলেন যে এই ছেলেটাকে ছল করিয়া মারিতে না পারিলে আর উপায় নাই। বিষ্ণু শিবকে বলিলেন, "আমি সম্মুখ হইতে যুদ্ধ করিয়া ইহাকে ভুলাইয়া রাখিব। সেই সময় তুমি পিছন হইতে ইহার প্রাণ বধ করিবে।"

এই বলিয়া বিষ্ণু মায়ার বলে গণেশের শক্তি দুটিকে অবশ করিয়া দিলেন; কিন্তু গণেশ তাহাতে ভয় না পাইয়া এমনি গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে তাহা সামলাইতে বিষ্ণু অস্থির। তাহা দেখিয়া শিব মহারাগে ত্রিশূল হাতে লইলেন। কিন্তু গণেশের গদার ঘায়ে তাহা তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। তাহাতে তিনি পিনাক (শিবের ধনুক) হাতে নিলেন, তাহাও গণেশের গদার ঘায়ে পড়িয়া গেল, আর সেই অবসরে গণেশ তাঁহার পাঁচখানি হাত কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর গণেশ আবার বিষ্ণুকে গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন, কিন্তু বিষ্ণুর চক্রে ঠেকিয়া তাহা গুঁড়া হইয়া গেল। এমনি করিয়া যেই গণেশ আবার বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত হইয়াছেন, অমনি শিব পিছন হইতে আসিয়া ত্রিশূল দিয়া তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

হায়। এই নিদারুণ শোক পার্বতী কিরূপে সহ্য করিবেন? তিনি রাগে আর দুঃখে অস্থির হইয়া এক হাজারটা এমন ভয়ংকর শক্তি তয়ের করিলেন যে, তাহারা দেখিতে দেখিতে সকল সৃষ্টি নাশ করিবার যোগাড় করিল। শিবের কোমর ভাঙ্গিয়া দিল, অন্য দেবতাদিগকে মারিয়া ফেলিতে লাগিল। সে যে কী ভীষণ কাণ্ড তাহা আর বলিবার নয়!

তখন শুধু আর হাতজোড় ভিন্ন উপায় কি, কিন্তু পার্বতীর কাছে আসিতে কাহারও ভরসা হয় না, তাই দূরে থাকিয়াই দেবতাগণ প্রাণপণে সে কাজ করিতে লাগিলেন। অনেক কান্নাকাটির পর শেষে পার্বতী তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আচ্ছা গণেশকে যদি বাঁচাইয়া দাও, আর সকল দেবতার আগে তাহার পূজা হয়, তবে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিব।"

এ কথা শুনিয়া শিব সকলকে বলিলেন, "শীঘ্র তাই কর, নহিলে আর রক্ষা নাই।" অমনি সকলে গণেশকে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে ভারি মুশকিল উপস্থিত—গণেশের মাথাটি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তাহাতে শিব বলিলেন, "তোমরা গণেশের শরীর ধুইয়া তাহার পূজা কর, আর কয়েকজন ছুটিয়া উত্তর দিকে যাও। সে দিকে গিয়া প্রথমে যাহাকে দেখিতে পাইবে, তাহারই মাথাটা কাটিয়া আনিয়া গণেশের দেহের সঙ্গে জুড়িয়া দাও।"

তৎক্ষণাৎ উত্তরদিকে সকলে ছুটিল, আর খানিক দূর গিয়াই একটা এক দাঁতওয়ালা সাদা হাতি দেখিতে পাইল। হাতি হউক, আর যাহাই হউক, উহারই মাথা কাটিয়া নিয়া গণেশের দেহে জুড়িতে হইবে, কাজেই আর কি করা যায়? সেই হাতির মাথা আনিয়া গণেশের দেহে জুড়িয়া মন্ত্র পড়িতেই গণেশ উঠিয়া বসিলেন। তখন পার্বতীরও রাগ দূর হইল দেবতাদেরও বিপদ কাটিল। সেই অবধি গণেশেব হাতির মাথা, আর সেই অবধিই সকল দেবতার আগে গণেশের পূজা হয়।

গণেশের বিবাহ

গণেশ কেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা বলিয়াছি, গণেশের বিবাহ কেমন কবিয়া হইযাছিল আজ তাহা বলিব।

যুদ্ধের পর হইতে শিব গণেশকে যারপরনাই স্নেহ করেন, আর পার্বতীর তো কথাই নাই। কার্তিক যেমন শিব আর পার্বতীর পুত্র, গণেশ তাঁহাদের তেমনি পুত্র হইলেন, আব তাঁহাদের নিকট তেমন স্নেহ পাইতে লাগিলেন।

কার্তিক আর গণেশ যখন বড় হইলেন, তখন একটা কথা লইয়া দুজনের মধ্যে বড়ই তর্ক উপস্থিত হইল; কার্তিক বলেন, "আমি আগে বিবাহ করিব," গণেশ বলেন, "না আমি আগে বিবাহ করিব!"

তাঁহাদের এইরূপ তর্ক শুনিয়া শিব আর পার্বতী বড়ই ভাবনায় পড়লেন। দুই পুত্রকেই তাঁহারা সমান স্নেহ করেন; ইঁহাদের কাহাকে চটাইয়া কাহার বিবাহ আগে দেন? শেষে অনেক ভাবিয়া শিব স্থির করিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে আগে এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া (অর্থাৎ তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া) আসিতে পারিবে, তাহার বিবাহই আগে দিব।"

এ কথা শুনিয়া কার্তিক তখনই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। গণেশের এই বড় ভুঁড়ি, তাহা লইয়া ছুটাছুটি করিবার সুবিধা নাই; তিনি ভাবিলেন, 'তাইতো, এখন করি কি? ক্রোশখানেক যাইতে না যাইতেই আমার হাঁপ ধরে, পৃথিবীর চারিদিক আমি কি করিয়া ঘুরিব?'

যাহাই হউক, গণেশ বড়ই বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি মনে মনে এক চমৎকার যুক্তি স্থির করিয়া, স্নানের পর দুখানি আসন হাতে পিতামাতার নিকট আসিয়া বলিলেন, "বাবা! মা! এই দুইখানি আসনে আপনারা দুজনে বসুন, আমি আপনাদের পূজা করিব।"

এই কথায় শিব আর পার্বতী সন্তুষ্ট হইয়া দুই আসনে দুইজন বসিলেন। গণেশও ভক্তির

সহিত তাঁহাদের পূজা করিয়া, সাতবার তাঁহাদের চারিদিকে ঘুরিলেন। তারপরে জোড়হাতে তাহাদিগকে বলিলেন, "এখন তবে আমার বিবাহ দিন।"

শিব কহিলেন, "বাবা, আমি তো বলিয়াছি, কার্তিকের আগে যদি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে পার, তবে তোমার বিবাহই আগে হইবে।"

তাহাতে গণেশ বলিলেন, "সে কি বাবা, আমি যে সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলাম, তবে কেন এমন কথা বলিতেছেন?"

শিব কহিলেন, "তুমি কখন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে?"

গণেশ বলিলেন, "এই যে আমি আপনাদের পূজা করিয়া সাতবার আপনাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়াছি। বেদে আর শাস্ত্রে আছে যে, পিতামাতাকে পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিলে তাহাতে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল পাওয়া যায়, ইহাতে সংশয় নাই। বেদের কথা যদি সত্য হয়, তবে অবশ্য আমার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে। সুতরাং আমার শীঘ্র বিবাহ দিন, নচেৎ বেদের কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে।"

এ কথায় শিব যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "তাইতো বাবা, তুমি তো ঠিক কথাই বলিয়াছ। বেদে আর শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহাই তুমি করিয়াছ, সুতরাং তোমার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে বৈকি!"

তখনই গণেশের বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। দুটি কন্যাও পাওয়া গেল, রূপে গুণে কুলে শীলে সকলের চেয়ে ভালো, নাম সিদ্ধি আর বুদ্ধি। সুতরাং বিবাহ হইতে আর বিলম্ব হইল না।

এদিকে হইয়াছে কি, গণেশের বিবাহের কিছুদিন পরে কার্তিক প্রাণপণে পৃথিবীর চারিদিকে ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কৈলাসে উপস্থিত হইয়াছেন, আর অমনি নারদ মুনি আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, "দেখিলে ইঁহাদের কাজ? তোমাকে ফাঁকি দিয়া তোমার পিতামাতা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পাঠাইলেন আর সেই অবসরে গণেশের বিবাহ দিলেন। শাস্ত্রে বলে এমন মা-বাপের মুখ দেখিতে নাই, এখন তোমার যেমন ভালো মনে হয়, কর।"

এই বলিয়া যেই নারদ বিদায় হইলেন, অমনি কার্তিকও শিব আর পার্বতীকে প্রণাম করিয়া রাগের ভরে ক্রৌঞ্চ পর্বতে চলিয়া গেলেন।

শিব আর পার্বতী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কোথায় যাইতেছ বাছা? তোমার যে বিবাহ ঠিক করিয়াছি।"

কার্তিক কি তাহাতে থামেন? তিনি বলিলেন, "না, আমি এখানে আর থাকিব না;আপনারা আমাকে ফাঁকি দিয়াছেন।"

সুতরাং কার্তিকের আর বিবাহ হইল না;এইজন্যই তাঁহার আর এক নাম হইয়াছে 'কুমার'।

ইহাতে শিব আর পার্বতীর মনে কিরূপ কষ্ট হইল, বুঝিতেই পার। তাহারা কার্তিককে ফিরাইতে না পারিয়া নিজেরাই সেই ক্রৌঞ্চ পর্বতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কার্তিকের কিনা বড়ই রাগ হইয়াছিল, তাই তিনি তাঁহার পিতামাতাকে আসিতে দেখিয়া ক্রৌঞ্চ পর্বতে থাকিতে চাহিলেন না। দেবতারা অনেক বলিয়া কহিয়া সেখান হইতে বারো ক্রোশের মধ্যে থাকিতে তাঁহাকে রাজি না করাইলে না জানি তিনি কোথায় চলিয়া যাইতেন।

অগস্ত্য

অসুরেরা দেবতাদের শত্রু, তাই তাহাদিগকে মারিবার জন্য দেবতারা সর্বদাই চেষ্টা করেন। একবার ইন্দ্রের হুকুমে অগ্নি আর বায়ু দুজনে মিলিয়া অসুরদিগকে পোড়াইয়া ফেলিতে গেলেন। বাতাস যদি আগুনের সাহায্য করে, তবে তাহার তেজ বড়ই ভয়ংকর হয়। হাজার হাজার অসুর সেই আগুনের তেজে পুড়িয়া মরিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আর সকল অসুরই মারা গেল, খালি পাঁচজন অসুর যে সমুদ্রের ভিতরে লুকাইয়া ছিল, অগ্নি আর বায়ু তাহাদিগকে মারিতে পারিলেন না।

সেই পাঁচটা অসুর যে কেবল জলের ভিতরে ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচাইল তাহা নহে, মাঝে মাঝে জলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সংসারের সকল লোককে বিষম জ্বালাতনও করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র বলিলেন যে, "অগ্নি আর বায়ু সাগর শুষিয়া ফেলুক।" কিন্তু অগ্নি আর বায়ু তাহাতে রাজি হইলেন না, তাঁহারা বলিলেন, "এই সাগরের মধ্যে কত কোটি কোটি জীব আছে, যাহারা কোনো অপরাধ করে নাই;আমরা সাগর শুষিতে গেলে তাহাবা মারা যাইবে। এমন পাপ আমরা করিতে পারিব না।"

এ কথায় ইন্দ্র ভয়ানক চটিয়া বলিলেন, "তোমবা আমার হুকুম অমান্য করিলে, এই অপরাধে তোমাদিগকে মুনি হইয়া পৃথিবীতে জন্মিতে হইবে।"

ইন্দ্র এই কথা বলিবামাত্র অগ্নি আর বায়ু স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পড়িয়া গেলেন. এবং দুজনে মিলিয়া একটি মুনি হইয়া একটা কলসীর ভিতর হইতে বাহির হইলেন। এই মুনির নামই অগস্ত্য। ইনি বড়ই আশ্চর্যরকমের লোক ছিলেন;আর ইনি যে মাঁঝে মাঝে এক একটা কাজ করিতেন তাহাও অতিশয়. অদ্ভুত।

অসুরেরা জলের ভিতর হইতে আসিয়া অত্যাচার করিয়া যখন দেবতাদিগকে নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, তখন বিষ্ণু তাঁহাদিগকে শিখাইয়া দিলেন যে, "তোমরা গিয়া অগস্ত্যকে ধর। তিনি ইচ্ছা করিলেই সাগরের জল খাইয়া ফেলিতে পারেন, আর তাহা হইলে তোমাদেরও অসুর মারিবার খুব সুবিধা হইবে।"

এ কথায় দেবতারা অগস্ত্যের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর আমাদের একটি কাজ তো না করিয়া দিলেই নয়। আপনি যদি দয়া করিয়া একটিবার সাগরের জলটুকু খাইয়া ফেলেন, তবেই আমরা অসুরগুলিকে মারিতে পারি, নচেৎ আমাদের বড়ই বিপদ।"

অগস্ত্য বলিলেন, "আচ্ছা, তবে চলুন।" এই বলিয়া তিনি সমুদ্রের জল খাইতে চলিলেন, আর সংসারের লোক ছুটিয়া তাহার তামাশা দেখিতে আসিল। সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া তাহারা কি আশ্চর্য যে হইয়াছিল, আর অগস্ত্যের কিরূপ প্রশংসা যে করিয়াছিল, তাহা বুঝিতেই পার। দেখিতে দেখিতে অগস্ত্য সাগরের সকল জল খাইয়া শেষ করিলেন, আর দেবতারাও মনের সুখে দুষ্ট অসুরদিগকে ধরিয়া মারিতে লাগিলেন।

ইল্বল আর বাতাপি নামে দুটা দৈত্যকে অগস্ত্য যেমন করিয়া মারিয়াছিলেন, তাহাও অতি আশ্চর্য। ইল্বল বড় ভাই, বাতাপি ছোট ভাই;মণিমতী পুরীতে তাহাদের বাড়ি। একবার ইল্বল

একটি ব্রাহ্মণের নিকট এইরূপ বর চাহিয়াছিল, "আমার যেন ইন্দ্রের সমান একটি পুত্র হয়।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এমন বর তো আমি তোমাকে দিতে পারিব না বাপু।" ইহাতে ইল্বল যারপরনাই চটিয়া গিয়া ব্রাহ্মণ মারিবার এক ফন্দি বাহির করিল।

ইল্বলের একটা বড় আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যে, সে কোনো মরা জন্তুর নাম ধরিয়া ডাকিলে সেই জন্তু অমনি বাঁচিয়া উঠিয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। কোনো ব্রাহ্মণ তাহার বাড়িতে আসিলে সে বাতাপিকে ছাগল সাজাইয়া, সেই ছাগলের মাংস রাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াইত। ব্রাহ্মণ খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বিশ্রাম করিতে বসিলে দুষ্ট দৈত্য ডাকিত, 'বাতাপি! বাতাপি!' অমনি বাতাপি সেই ব্রাহ্মণের পেট ছিঁড়িয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিত। এমনি করিয়া হতভাগা অনেক ব্রাহ্মণ মারিয়াছিল।

এই সময়ে একদিন অগস্ত্য পথে চলিতে চলিতে দেখিলেন যে, এক গর্তের ভিতরে কতকগুলি লোক ঝুলিতেছে, তাহাদের মাথা নীচের দিকে পা উপরদিকে। সেই লোকগুলিকে দেখিয়া অগস্ত্যের বড়ই দয়া হওয়ায় বলিল, "বাপু, আমরা তোমার পূর্বপুরুষ। তুমি বিবাহ কর নাই, তাই আমাদের এই দশা। তুমি যদি বিবাহ কর আর তোমার ছেলে হয়, তবে আমাদের দুঃখ দূর হইতে পারে।"

এ কথায় অগস্ত্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বিবাহের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন কিন্তু কোথাও একটি মনের মতন কন্যা খুঁজিয়া পাইলেন না। শেষে আর কোনো উপায় না দেখিয়া তিনি নিজেই একটি কন্যার সৃষ্টি করিলেন। সংসারের সকল জন্তুর মধ্যে যাহার শরীরে যে স্থানটি সকলের চেয়ে সুন্দর সেইরূপ করিয়া কন্যাটির শরীরে সকল স্থান গড়া হইল। তেমন সুন্দর আর কেহ কখনো দেখে নাই। সেই কন্যা বিদর্ভ দেশের রাজার ঘরে গিয়া তাঁহার মেয়ে হইয়া জন্মগ্রহণ করিল; রাজা তাহার নাম রাখিলেন, লোপামুদ্রা।

লোপামুদ্রা যখন বড় হইলেন, তখন অগস্ত্য আসিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কন্যাটিকে আমি বিবাহ করিব।" ইহাতে রাজা আর রাণী তো বড়ই বিপদে পড়িলেন। এত আদরের কন্যাটিকে কদাকার দরিদ্র মুনির হাতে দিতে কিছুতেই মন উঠিতেছে না; না দিলে আবার মুনি না জানি কি শাপ দেন, এখন উপায় কি হইবে? এমন সময় লোপামুদ্রা বলিলেন, "বাবা আমার জন্য আপনারা চিন্তিত হইবেন না; মুনির সঙ্গে আমার বিবাহ দিন।" সুতরাং শীঘ্রই অগস্ত্য আর লোপামুদ্রার বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পর লোপামুদ্রা তপস্বিনীর বেশে স্বামীর গৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অগস্ত্যের ইচ্ছা হইল, তাহাকে রাজকন্যার মতন সুন্দর বসন-ভূষণ পরাইয়া রাখেন। কিন্তু তিনি অতি দরিদ্র; বসন-ভূষণ কোথায় পাইবেন? কাজেই ইহার জন্য তাঁহাকে ভিক্ষায় বাহির হইতে হইল। এক এক রাজার নিকট যান, আর বলেন, "আমি আপনার নিকট ধন চাহিতে আসিয়াছি। আপনি অন্যের ক্লেশ বা ক্ষতি না জন্মাইয়া যদি আমাকে কিছু ধন দিতে পারেন, তবে দিন।"

এইরূপ করিয়া অগস্ত্য ক্রমে শ্রুতধা, ব্রধ্নস্ব আর ত্রসদস্যুর নিকট গেলেন, কিন্তু ইঁহাদের কাহারও হিসাবপত্র দেখিয়া তাঁহার মনে হইল না যে, তিনি অন্যের ক্লেশ না জন্মাইয়া তাঁহাকে ধন দিতে পারিবেন। কাজেই ইঁহাদের কাহারও নিকট হইতে তাঁহার ধন লওয়া হইল না। তখন রাজারা তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুর! চলুন আপনাকে লইয়া ইল্বল দানবের নিকট

যাই! উহার অনেক ধন আছে।" এই বলিয়া তাহারা অগস্ত্যকে নিয়া ইম্বলের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া ইম্বলের আর সৌজন্যের সীমাই নাই। সে নমস্কার দণ্ডবৎ কতই করিল, তাহার উপর আবার ভাই বাতাপিকে এই বড় পাঁঠা সাজাইয়া তাহার মাংসে চমৎকার কোরমা রাঁধিল। সেই মাংস রান্নার সন্ধান পাইয়া রাজা মহারাজেরা তো কাঁপিয়াই অস্থির, কেননা, তাহা খাইলে যে কি হয়, সে কথা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। যাহা হউক অগস্ত্য তাঁহাদিগকে ভরসা দিয়া বলিলেন, "আপনাদের কোনো চিন্তাই নাই আমি সব ঠিক করিয়া দিতেছি।"

তারপর পাতপিঁড়ি প্রস্তুত হইলে সকলে খাইতে বসিলেন। ইম্বল হাসিতে হাসিতে সেই মাংস পরিবেশন করিতে আসিল, অগস্ত্যও হাসিতে হাসিতে তাহার সমস্তই খাইয়া শেষ করিলেন, রাজাদিগকে দিবার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। তারপর যখন ইম্বল ডাকিল, 'বাতাপি! বাতাপি!' তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাতাপি আর কি করিয়া আসিবে? তাহাকে হজম করিয়া ফেলিয়াছি!"

কেহ কেহ বলেন যে, এ কথায় ইম্বল অগস্ত্যকে মারিতে গিয়াছিল আর অগস্ত্য তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যেরা বলেন যে, ইম্বল অত্যন্ত ভয় পাইয়া অগস্ত্যকে অনেক ধন দিয়াছিল।

আর একবার অগস্ত্য বিন্ধ্য পর্বতকে বড়ই নাকাল করিয়াছিলেন। বিন্ধ্য পর্বতের মাথা ক্রমে এতই উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাতে সূর্যের চলাফেরার পথ বন্ধ হইয়া যায়। বৎসরের মধ্যে একবার সূর্যকে উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতে হয়, আবার দক্ষিণ হইতে উত্তরে আসিতে হয়। বিন্ধ্য পর্বতের মাথা এত উঁচু হইয়া যাওয়াতে সুর্যের সেই কাজটি করা অসম্ভব হইয়া পড়িল।

সূর্য দেখিলেন, তাঁহার ব্যবসায়ই মাটি হইতে চলিয়াছে; কাজেই তিনি অগস্ত্যের নিকটে আসিয়া বলিলেন "ঠাকুর! আমি তো বড়ই সংকটে পড়িয়াছি, এখন আপনি যদি আমাকে উদ্ধার করেন।" অগস্ত্য বলিলেন, "আপনার কোনো চিন্তা নাই, আমি বিন্ধ্য পর্বতের মাথা নিচু করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি যারপরনাই বুড়া একটি মুনি সাজিয়া বিন্ধ্য পর্বতের নিকট গিয়া বলিলেন, "বাপু, আমি তীর্থ করিতে দক্ষিণ দেশে যাইব। কিন্তু আমি বুড়া মানুষ, তোমাকে ডিঙ্গাইতে পারি, এমন শক্তি আমার নাই। তুমি একটু নিচু হও, আমি তীর্থ করিয়া আসি।"

মুনির কথায় বিন্ধ্য পর্বত মাথা নিচু করিয়াছিল। তখন মুনি তাহার উপর দিয়া দক্ষিণে গিয়া বলিলেন, "যতক্ষণ আমি তীর্থ করিয়া ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ এমনিভাবে থাক, নহিলে কিন্তু ভারি শাপ দিব।" কাজেই বিন্ধ্য আর কি করে? সে হেঁট মুখেই পড়িয়া রহিল। তদবধি আর বেচারা অগস্ত্যের দেখাও পায় নাই, শাপের ভয়ে মাথাও তুলিতে পারে নাই।

গঙ্গা আনিবার কথা

অগস্ত্য মুনি সাগরের জল খাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এ কথা তোমরা শুনিয়াছ। সেই সাগর অনেকদিন শুকনোই পড়িয়াছিল; তারপর যে কেমন করিয়া তাহাতে জল আসিল, সে অতি আশ্চর্য ব্যাপার।

অযোধ্যায় এক রাজা ছিলেন; তাহার নাম ছিল সগর। রাজার বড় রানীর একটি ছেলে ছিল, তাহার নাম অসমঞ্জ। তাঁহার ছোট রানীর ষাট হাজার ছেলে ছিল, তাহাদের নাম জানি না।

অসমঞ্জ এমনি দুষ্ট ছিল যে ছোট ছোট ছেলেদিগকে ধরিয়া সে জলে ফেলিয়া দিত আর তাহারা খাবি খাইয়া মরিবার সময় হাসিত। কাজেই রাজা বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। যা হোক, অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান বড় ভালো ছেলে ছিল; রাজা যত্নের সহিত তাহাকে মানুষ করিলেন।

ইহার অনেক বৎসর পরে একবার রাজা খুব ধুমধামের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। ঘোড়ার কপালে জয়পত্র বাঁধিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হয়; সেই ঘোড়া সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া, ফিরিয়া আসিলে তাহার মাংসে যজ্ঞ হয়, সেই যজ্ঞের নাম অশ্বমেধ। জয়পত্রের মানে এই যে, তাহাতে লেখা থাকে, "খবরদার! এ ঘোড়া কেহ আটকাইয়ো না!" সে কথা যে পড়ে, সেই চটে, আর গায়ে জোর থাকিলে তখনি ঘোড়া আটকায়। কাজেই ঘোড়াকে ছাড়াইয়া আনিবার জন্য তাহার সঙ্গে খুব মজবুত লোক দিতে হয়।

সগর অংশুমানকে সঙ্গে দিয়া তাঁহার জয়পত্র বাঁধা যজ্ঞের ঘোড়াটি ছাড়িয়া দিয়াছেন; সে ঘোড়া সেই জয়পত্রসুদ্ধ পড়বি তো পড় স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের সামনেই গিয়া পড়িয়াছে আর ইন্দ্রও অমনি এক রাক্ষসের বেশ ধরিয়া তাহাকে চুরি করিয়া বসিয়াছেন।

এখন উপায় কি হইবে? ঘোড়া না পাইলে তো যজ্ঞই মাটি, আর তাহা হইলে নিতান্তই বিপদের কথা। রাজার ষাট হাজার ছেলে তখনই ব্যস্ত হইয়া ঘোড়া খুঁজিতে ছুটিল। শহর বন্দর, পাহাড় পর্বত, বন মাঠ কিছুই তাহারা বাকি রাখিল না। তাহাতেও ঘোড়ার দেখা না পাইয়া ষাট হাজার ভাই ষাট হাজার খন্তা হাতে মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাতেও ঘোড়া না পাইয়া রাজাকে আসিয়া বলিল, "বাবা, ঘোড়া তো পাওয়া গেল না, এখন কি করি?" রাজা বলিলেন, "আবার খুঁজিয়া দেখ; ঘোড়া না লইয়া ফিরিয়ো না!"

কাজেই বেচারারা আর কি করে, তাহারা আবার প্রাণপণে মাটি খুঁড়িতে লাগিল। খুঁড়িতে খুঁড়িতে পূর্বদিকে গিয়া তাহারা দেখিল যে পর্বতের মতো বিশাল হাতি পৃথিবীটাকে মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই হাতির নাম বিরূপাক্ষ; সে যখন ঘাড় নাড়ে, তখনই ভূমিকম্প হয়। যাহা হউক, বিরূপাক্ষের কাছে সেই ঘোড়া ছিল না, কাজেই রাজপুত্রেরা সেখান হইতে আবার দক্ষিণদিকে খুঁড়িয়া চলিল; খুঁড়িতে খুঁড়িতে দেখিল সেদিকেও মহাপক্ষ নামে তেমনি বিশাল এক হাতি পৃথিবীটাকে মাথায় বহিতেছে। এমনি করিয়া তাহারা পশ্চিমে সৌমনাং আর উত্তরে ভদ্র নামে আরো দুটা হাতি পাইল, কিন্তু ঘোড়াকে পাইল না। কেমন করিয়া

পাইবে? সে ঘোড়া পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ কোনো দিকেই ছিল না, ছিল ঈশান কোণে। সেইখানে যাইবামাত্র রাজপুত্রেরা দেখিল যে, কপিল মুনি সেখানে বসিয়া আছেন, ঘোড়াটি তাঁহার কাছে পাইচারি করিতেছে।

কপিলকে দেখিয়াই রাজপুত্রেরা ভাবিল, 'এই চোর!' অমনি তাহারা ষাট হাজার ভাই মিলিয়া খন্তা, লাঙ্গল, গাছ, পাথর হাতে তাঁহার দিকে ছুটিতে ছুটিতে বলিল, 'বটে রে দুষ্ট, তুই আমাদের ঘোড়া চুরি করিয়াছিস? দাঁড়া! এই আমরা যাইতেছি।'

তখন কপিল ভয়ংকর রাগের সহিত এমনি এক হুংকার ছাড়িলেন যে, সে হুংকারেই সেই ষাট হাজার রাজপুত্র পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

এদিকে রাজা পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার পুত্রেরা ঘোড়া লইয়া আসিবে, তবে যজ্ঞ শেষ হইবে। কিন্তু রাজপুত্রেরা আর ফিরিল না। তখন তিনি আবার অংশুমানকে ডাকিয়া ঘোড়া খুঁজিতে পাঠাইলেন। এবারে অংশুমানের কাজ অনেকটা সহজ, কারণ তাহার খুড়ারা ইহার আগেই পাতালে যাইবার পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। সেই পথে চলিতে চলিতে কিছুদিন পরে সেই ভয়ংকর হাতির সহিত তাঁহার দেখা হইল। অংশুমান তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "হাতি মহাশয়, আপনার মঙ্গল তো? আমি অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান, আমার খুড়াদিগকে খুঁজিতে আসিয়াছি। আপনি কি তাঁহাদের বা আমাদের ঘোড়াটির কোনো সংবাদ রাখেন?" হাতি বলিল, "হাঁ বাপু, এই পথে যাও, ঘোড়া পাইবে।"

এমনি করিয়া ক্রমে সেই চারিটা হাতির প্রত্যেকেব সঙ্গেই অংশুমানের দেখা হইল। তাহার সকলেই বলিল, "যাও বাপু, তুমি ঘোড়া পাইবে।" তাবপর আর কিছুদূর গিয়াই তিনি দেখিলেন, তাঁহার খুড়াদের দেহের ছাই পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাহার কাছেই সেই ঘোড়াটাও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। খুড়াদের এই দুর্দশার কথা ভাবিয়া অংশুমানের মনে বড়ই কষ্ট হইল; কিন্তু এখন তো আর দুঃখ করিয়া ফল নাই, এখন ইহাদের তর্পণ করিতে পারিলে তবেই ইহাদের স্বর্গ লাভ হয়। তর্পণের জন্য অংশুমান জল খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও একটু জল পাওয়া গেল না।

জল খুঁজিতে খুঁজিতে গরুড় পক্ষীর সহিত অংশুমানের দেখা হইল। সেই পাখি ছিল অংশুমানের খুড়াদিগের মামা। সে অংশুমানকে বলিল, "ভাই, তোমার খুড়াদিগের তর্পণের কাজ যে-সে জলে হইবে না। কপিলের তেজে তাহারা ভস্ম হইয়াছে, গঙ্গার জল ছাড়া ইহাদের তর্পণ তো হইবার নয়। তুমি এখন ঘোড়াটি নিয়া দেশে যাও, তোমার পিতামহের যজ্ঞ সমাপন হউক।"

সুতরাং অংশুমান অগত্যা ঘোড়া লইয়া দেশে ফিরিলেন। পুত্রগণের দুর্দশার সংবাদে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সগর যজ্ঞ শেষ করিলেন, কিন্তু গঙ্গার জল দিয়া পুত্রগণের তর্পণের কোনো উপায় তিনি করিতে পারিলেন না। গঙ্গা তো তখন পৃথিবীতে ছিলেন না, তিনি থাকতেন স্বর্গে। সগর আরো ত্রিশ হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই ত্রিশ হাজার বৎসরের মধ্যে তিনি গঙ্গাকে আনিতেও পারেন নাই, তাঁহার পুত্রগণের উদ্ধারও হয় নাই।

সগর গঙ্গা আনিতে পারেন নাই। অংশুমানও পারেন নাই। অংশুমানের পুত্র দিলীপ খুবই বড় রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনিও গঙ্গা আনিতে পারেন নাই।

দিলীপের পরে রাজা হইলেন তাঁহার পুত্র ভগীরথ। তিনি যেমন ধার্মিক ছিলেন, তপস্যাও

করিয়াছিলেন তেমনি আশ্চর্য। চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া, তাহার মাঝখানে বসিয়া তিনি হাত তুলিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। হাজার বৎসরের মধ্যে আর সে হাত নামান নাই, এই সময়ের মধ্যে মাসে শুধু একটিবারের বেশি খানও নাই।

হাজার বৎসর এমনিভাবে চলিয়া গেল। তাহার পরে ব্রহ্মা দেবতাগণকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভগীরথ! আমি তোমার তপস্যায় বড়ই তুষ্ট হইয়াছ। তুমি কি চাহ?"

ভগীরথ ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, জোড়হাতে বলিলেন, "প্রভু! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে দয়া করিয়া আমাকে গঙ্গা আনিবার উপায় করিয়া দিন।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, আমি তাহাই করিয়া দিতেছি। এই যে আমাদের সঙ্গে এই দেবতাটি দেখিতেছ, ইনিই গঙ্গা, হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইনি তোমার কাজ করিতে পৃথিবীতে যাইবেন। কিন্তু এক কথা—ইনি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে লাফাইয়া পড়েন, তবে পৃথিবী তো তাহার চোট সামলাইতে পারিবে না। সে ভয়ংকর চোট খালি একজনে সহিতে পারেন, তিনি হচ্ছেন শিব। সুতরাং তুমি আগে গিয়া শিবকে সেই কাজটি করিতে রাজি করাও, তবেই গঙ্গা পৃথিবীতে নামিতে পারেন।"

তখন ভগীরথ কেবলমাত্র পায়ের বুড়া আঙ্গুলের উপর দাঁড়াইয়া এক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত শিবের স্তব করিলেন। সে স্তব শুনিয়া আর মহাদেব না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। আসিয়াই তিনি মাথা পাতিয়া দাঁড়াইলেন, এখন গঙ্গা নামিলেই হয়।

এদিকে গঙ্গা ভাবিতেছেন, 'দাঁড়াও, এই বুড়োকে ভাসাইয়া পাতালে লইয়া যাইব।' এ কথা যে মহাদেব টের পাইবেন, সে খেয়াল গঙ্গার ছিল না, আর সেই বুড়ার যে কতখানি ক্ষমতা তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন শিবকে নাকাল করিবেন, তাহার বদলে নিজেই নাকালের একশেষ। শিবকে ভাসাইয়া নেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার জটার ভিতরে পড়িয়া আর তিনি বাহির হইবার পথ পান না। সে জটা এখন হিমালয়ের মতো বিশাল হইয়া গিয়াছে, তাহার গলি-ঘুচির ভিতরে গঙ্গাদেবী মা-হারা খুকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

বৎসরের পর বৎসর যায়, গঙ্গা তবুও সেই সর্বনেশে জটার ভিতর হইতে বাহির হইতে পারেন না। ভাগ্যিস ভগীরথ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া আবার প্রাণপণে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, নইলে আরো কতদিন গঙ্গাকে সেখানে থাকিতে হইত কে জানে। ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শিব গঙ্গাকে ছাড়িয়া দিলেন, গঙ্গাও তখন সপ্তধারা হইয়া সাতদিকে বহিয়া চলিলেন।

তখন অবশ্য খুবই একটা তুমুল ব্যাপার হইয়াছিল; আর সকলে ছুটিয়া তাহা দেখিতে আসিয়াছিল। এত জল, এত ফেনার এমন নৃত্য আর কখনো দেখা যায় নাই, এমন ডাকও কেহ কখনো শুনে নাই। মাছ, কুমির কচ্ছপ, শুশুক আর সাপে পৃথিবী ছাইয়া গিয়াছিল।

গঙ্গা সাতটি ধারায় বহিয়া সাতদিকে ছুটিলেন; তাহার একটি ধারা ভগীরথের রথের পিছু পিছু যাইতে লাগিল। যত দেবতা, যত দানব, যত মুনি-ঋষি যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব পিশাচ কিন্নর সকলেই সেই রথের পিছু পিছু গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিল।

সেই পথের ধারে ছিল জহ্নু মুনির আশ্রম। মুনি যজ্ঞ করিতে বসিয়াছেন এমন সময় গঙ্গার জল সোঁ সোঁ শব্দে আসিয়া তাঁহার সকল আয়োজন ভাসাইয়া নিল। মুনি তাহাতে

যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া, আর তাহার চেয়েও বেশি রাগিয়া সেই জল সমস্তই খাইয়া ফেলিলেন। খাইবার সময় সকলে অবাক হইয়া সেই আশ্চর্য ব্যাপারের তামাশা দেখিয়াছিল, মুনিকে বারণ করিতে সাহস পায় নাই। মুনি সকল জল খাইয়া ফেলিলে পর তাহারা তাঁহাকে অনেক মিনতি করিয়া বলিল, "ঠাকুর! দয়া করিয়া গঙ্গাকে ছাড়িয়া দিন; ও যে আপনার মেয়ে!"

এ কথায় মুনি অতিশয় তুষ্ট হইয়া কানের ভিতর দিয়া আবার গঙ্গাকে বাহির করিয়া দিলেন। সেই হইতে গঙ্গার নাম হইয়াছে "জাহ্নবী", অর্থাৎ জহ্নুর মেয়ে।

ইহার পরে আর গঙ্গার কোনো বিপদ ঘটে নাই। তিনি ভগীরথের পিছু পিছু পাতালে গিয়া সগরের সেই ষাট হাজার পুত্রের ছাই ভিজাইয়া দিলেন, আর অমনি তাঁহারা সকলে দেবতার ন্যায় সুন্দর রূপ ধরিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

সেই যে অগস্ত্য মুনি সাগরের জল খাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে এতদিন সেই সাগর শুকনো পড়িয়াছিল। এতদিন পরে গঙ্গার জল আসিয়া আবার তাহাকে ভরিয়া দিল।

তখন ব্রহ্মা ভগীরথকে বলিলেন, "যতদিন পর্যন্ত এই সাগরে জল থাকিবে, ততদিন সগরের পুত্রেরা স্বর্গে বাস করিবে। আর এখন হইতে গঙ্গা তোমার কন্যার মতো হইলেন, সুতরাং লোকে তাহাকে 'ভাগীরথী' বলিয়া ডাকিবে।"

হনুমানের বাল্যকাল

হনুমানের মায়ের নাম ছিল অঞ্জনা। বানরের স্বভাব যেমন হইয়া থাকে, অঞ্জনার স্বভাবও ছিল অবশ্য তেমনিই। হনুমান কচি খোকা, তাহাকে ফেলিয়া অঞ্জনা বনের ভিতরে গেল, ফল খাইতে। বনে গিয়া সে মনের সুখে গাছে গাছে ফল খাইয়া বেড়াইতে লাগিল, এদিকে খোকা বেচারা যে ক্ষুধায় চ্যাঁচাইতেছে, সে কথা তাহার মনেই হইল না।

হনুমান বেচারা তখন আর কি করে? চ্যাঁচাইয়া সারা হইল, তবু মার দেখা নাই, কাজেই তাহার নিজেকেই কিছু খাবারের চেষ্টা দেখিতে হইল। সেটা ছিল ভোরের বেলা, টুকটুকে লাল সূর্যটি তখন সবে বনের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছে সেই টুকটুকে সূর্য দেখিয়াই হনুমান ভাবিল ওটা একটা ফল। অমনি আর কথাবার্তা নাই, সে একলাফে আকাশে উঠিয়া ভয়ানক সোঁ সোঁ শব্দে সেই ফল পাড়িয়া খাইতে ছুটিল।

তোমরা আশ্চর্য হইও না। হনুমান তখন কচি খোকা বটে, কিন্তু সে যে-সে খোকা ছিল না, সে কথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সেই শিশুকালেই তাহার বিশাল দেহ ছিল, আর গায়ের রঙটি ছিল সেই ভোরবেলার সূর্যের মতোই ঝকঝকে লাল। দেব দানব যক্ষ সকলেই তাহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অবাক না হইবেই বা কেন? সেই খোকা এমন ভয়ংকর ছুটিয়া চলিয়াছে যে, তেমন গরুড়েও পারে না, ঝড়েও পারে না। সকলে বলিল, "শিশুকালেই এমন, বড় হইলে না জানি এ কেমন হইবে।"

এদিকে হনুমান গিয়া তো সূর্যের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে আর এক ব্যাপার উপস্থিত। সেইদিন ছিল গ্রহণের দিন, রাহু বেচারা অনেক দিনের উপবাসের পর সেইদিন

সূর্যকে খানিক সময়ের জন্য গিলিয়া একটু শান্ত হইতে পাইবে। সে অনেক আশা করিয়া সূর্যকে গিলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সেখানে হনুমানকে দেখিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে অমনি "বাবা গো!" বলিয়া প্রাণপণে দে ছুট্, ছুটিতে ছুটিতে একেবারে ইন্দ্রের সভায় গিয়া উপস্থিত।

ইন্দ্রের কাছে গিয়া সে নিতান্ত ব্যস্তভাবে বলিল, "আপনারই হুকুমে আমি সূর্যটাকে গিলিয়া ক্ষুধা দূর করি; এখন আবার সেই সূর্য কাহাকে দিয়া ফেলিয়াছেন? আজ তো দেখিতেছি আর একটা রাহু তাহাকে গিলিতে আসিয়াছে।"

এ কথায় ইন্দ্র যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া তখনই ঐরাবতে চড়িয়া দেখিতে চলিলেন, ব্যাপারটা কি? রাহু তাহার আগে ছুটিয়া আবার সূর্যের নিকট গিয়াছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে টিকিতে পারে নাই।

রাহুর কিনা দেহ নাই, শুধুই একটি গোল মাথা, কাজেই হনুমান, তাহাকে দেখিবামাত্র ফল মনে করিয়া ধরিতে আসিল। রাহু তখন "ইন্দ্র! ইন্দ্র!" বলিয়া চ্যাঁচাইয়া অস্থির। ইন্দ্র বলিলেন, "ভয় নাই আমি এটাকে এখনই মারিয়া ফেলিতেছি।"

তখন হনুমান তাড়াতাড়ি ইন্দ্রের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই, ঐরাবতের প্রকাণ্ড সাদা মাথাটা তাহার চোখে পড়িল। সে ভাবিল, এটাও বুঝি একটা ফল। এই ভাবিয়া যেই হনুমান, সেটাকে ধরিতে গিয়াছে, অমনি ইন্দ্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহার উপরে বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলেন।

সেই বজ্রের ঘায়ে একটা পাহাড়ের উপর পড়িয়া 'হনু' অর্থাৎ দাড়ি ভাঙিয়া যাওয়াতেই তাহার 'হনুমান' এই নামটি হইয়াছিল। পাহাড়ের উপর পড়িয়া সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, এমন সময় তাহার পিতা পবন আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া একটা পর্বতের গুহায় লইয়া গেলেন। তারপর তিনি রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, "দাঁড়াও ইহার শোধ ভালো মতেই লইব।"

পবন, অর্থাৎ বায়ু, হইতেছেন সংসারের প্রাণ, সেই বায়ু রাগিয়া বসিলে কি বিপদই না ঘটিতে পারে। সেই রাগের চোটে বাহিরের বায়ু কোথায় চলিয়া গেল, দেহের ভিতরের বায়ু উৎকট হইয়া উঠিল। নিশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া জীবজন্তুর প্রাণ যায় যায়। বায়ুর উৎপাতে সকলের মাথা খারাপ হইয়া গেল, তাহারা এক করিতে আর করিয়া বসে। দেবতাদের অবধি পেট ফাঁপিয়া ফানুসের মতো হইয়া গেল ঠিক যেন উদরীর বেয়ারাম।

সেই অবস্থায় সকল দেবতা কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন, "প্রভু! আমাদের দশা দেখুন। ইহার উপায় কি হইবে?" ব্রহ্মা বলিলেন, "উপায় আর কি? চল বায়ুর নিকট গিয়া তাঁহাকে খুশি করি। ইহা ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই।"

পবন অচেতন হনুমানকে লইয়া কোলে করিয়া গুহায় বসিয়া আছেন এমন সময় ব্রহ্মাকে লইয়া দেবতাগণ সেখানে গিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মা আসিয়া হনুমানের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেই সে সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল, যেন তাহার কখনো কোনো অসুখ হয় নাই। ইহাতে পবন কত দূর খুশি হইলেন বুঝিতেই পার। পবনের রাগ চলিয়া যাওয়াতে কাজেই সংসারের সকল জীবের বিপদও কাটিয়া গেল।

তখন ব্রহ্মা দেবতাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, এই খোকা বড় হইলে তোমাদের অনেক কাজ করিয়া দিবে। সুতরাং তোমরা সকলে ইহাকে বর দিয়া খুশি কর।" এ কথায়

দেবতারা যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া হনুমানকে বর দিতে লাগিলেন। সেই সকল বরের জোরে হনুমান চিরজীবী হইয়া গেল। কোনো দেবতা বা যক্ষ, গন্ধর্ব বা মানুষের কোনো অস্ত্রে তাহার মরণের ভয় রহিল না। কেহ শাপ দিয়া তাহার প্রাণনাশ করার পথ অবধি বন্ধ হইল। তাহা ছাড়া ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি ভগবানকে জানিতে পারিবে, আর যখন যেমন ইচ্ছা, তেমনি রূপ ধরিতে পারিবে।" সূর্য বলিলেন, "আমার তেজের শতভাগের এক ভাগ তোমাকে দিলাম। আর একটু বয়স হইলে আমি তোমাকে লেখাপড়া শিখাইব; তাহা হইলে তুমি খুব বলিতে কহিতে পারিবে।"

বর পাইয়া হনুমান বড় লোক হইয়া গেল। তবে অবশ্য; ইহার সকল ফল ফলিতে সময় লাগি ছিল। শিশুকালে তাহার স্বভাব অন্যান্য বানরছানার চেয়ে বেশি উঁচুদরের ছিল না। মুনিদের আশ্রমে গিয়া সে দৌরাত্ম্যটা যা করিত, সে আর বলিবার নয়। তাহার পিতামাতা কত নিষেধ করিতেন, কিন্তু সে কি নিষেধ শুনিবার পাত্র? তাহার উৎপাতে মুনিদের কোশাকুশী, ঘটি, বাটি, কাপড়-চোপড় কিছু আগলাইয়া রাখিবার জো ছিল না। এদিকে আবার তাহাকে শাপ দিয়াও ফল নাই, কারণ, ব্রহ্মার বরে শাপে মরিবার ভয় তাহার কাটিয়া গিয়াছে আর তাহাকে দেখিয়া তাঁহাদের কতকটা মায়াও হইত। কাজেই তাঁহারা নিরুপায় হইয়া তাহার অত্যাচার সহ্য করিতেন, আর ভাবিতেন, উহাকে বেশি ক্লেশ না দিয়া কি উপায়ে একটু জব্দ করা যায়। শেষে অনেক বুদ্ধি করিয়া তাঁহারা তাহাকে এই শাপ দিলেন, "যা বেটা, তোর যত ক্ষমতা তাহার কথা তুই একেবারে ভুলিয়া যা। বড় হইলে কেহ সেই ক্ষমতার কথা তোকে মনে করাইয়া দিবে, তখন তুই অনেক অদ্ভুত কাজ করিবি।"

তখন হইতে হনুমান সামান্য বানরছানার ন্যায় নিতান্ত ভয়ে ভয়ে চলে, আর দূর হইতে কাহাকেও দেখিলেই প্রাণপণে ছুটিয়া পলায়। কাজেই মুনিদেরও আর তাহার অত্যাচার সহিতে হয় না। যাহা হউক, সে এর মধ্যে সূর্যের নিকটে ঢের লেখাপড়া শিখিয়া ফেলিল। মুনিদের বাড়ি গিয়া সে যাহাই করুক, লেখাপড়ায় যে সে খুব লক্ষ্মীছেলে ছিল, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। কি পরিশ্রম করিয়াই না সে লেখাপড়া শিখিয়াছিল। সূর্য তো আর এক জায়গায় বসিয়া থাকেন না, যে, পুঁথি লইয়া তাঁহার কাছে গিয়া বসিলেই কাজ হইবে। হনুমানকে উদয় হইতে অস্ত পর্বত পর্যন্ত রোজ তাঁহার পিছু পিছু ছুটাছুটি করিয়া পড়া বুঝিয়া লইতে হইত। তাহার ফলে সে বিদ্বানও হইয়াছিল বড়ই ভারি রকমের। এমন পণ্ডিত অতি অল্পই জন্মাইয়াছে।

সূর্যের গৃহিনী

বিশ্বকর্মার নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। বিশ্বকর্মা দেবতাদের কারিগরদের দেবতা। এই দেবতার একটি মেয়ে ছিল, তাহার নাম সংজ্ঞা; কেহ কেহ তাহাকে ঊষা আর সুরেণু বলিয়াও ডাকিত।

বাপের ঘরে সংজ্ঞা সুখেই ছিলেন। কিন্তু, শেষে তাঁহার পিতা যখন সূর্যদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন, তখন হইতেই বেচারীর দুঃখের দিন আরম্ভ হইল। সূর্যের যে কি

ভয়ানক তেজ, তাহা তোমরা সকলেই দেখিতেছ। দূরে থাকিয়াই এত তেজ, কাছে গেলে সে যে কিরকম হইবে, তাহা তো আমরা ভাবিয়াই উঠিতে পারি না। এর উপর আবার সেকালে নাকি সূর্যের তেজ এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ছিল। তখন সূর্যের দেহ এমন সুন্দর গোল ছিল না; কদম ফুলের কেশরের মতো, তাহার চারিদিকে কিরণের ছটা বাহির হইত, তাহার যে কি ভয়ংকর তেজ, তাহা বেচারী সংজ্ঞাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তবু সে তেজ সহিয়া থাকিতে সংজ্ঞা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ঝলসিয়া পুড়িয়া ফোস্কা পড়িয়া, তাঁহার দুর্দশার একশেষ হইল, তবু তিনি অনেকদিন ধরিয়া সূর্যের সেবা করিলেন। ক্রমে, মনু, যম, আর যমুনা বলিয়া তাঁহার তিনটি খোকা-খুকি হইল। খোকা-খুকিরা দূরে দূরে খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহাদের কোনো কষ্ট নাই। যত কষ্ট সংজ্ঞার, কেননা, তাঁহাকে সূর্যের কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয়। এতদিন সে কষ্ট সহিয়া সহিয়া তাঁহার শরীর মাটি হইয়া গেল, আর সহিতে পারেন না।

তখন সংজ্ঞা অনেক ভাবিয়া এক বুদ্ধি বাহির করিলেন। বিশ্বকর্মার মেয়ে, কাজেই অনেকরকম কারিকুরি তাঁহার জানা ছিল। আর সেই কারিকুরিতে এখন তাঁহার বড়ই কাজ হইল। তিনি সকলের অসাক্ষাতে এমন একটি মেয়ে তয়ের করিলেন যে, সে দেখিতে অবিকল তাঁহার নিজেরই মতন, কিন্তু সূর্যের তেজে তাহার কিছুই হয় না। মেয়েটির নাম রাখিলেন ছায়া।

ছায়া তয়ের হওয়ামাত্র হাতজোড় করিয়া সংজ্ঞাকে বলিল, "আমাকে কি করিতে হইবে?" সংজ্ঞা বলিলেন, "আমি বাপের বাড়ি যাইতেছি, তুমি এখানে থাকিয়া ঘরকন্না কর। আমার খোকা-খুকিদের যত্ন করিয়া খাইতে পরিতে দিয়ো। আর, আমি যে চলিয়া গেলাম, এ কথা কাহাকেও বলিয়ো না।"

এইরূপ কথাবার্তার পর সংজ্ঞা ছায়াকে সেখানে রাখিয়া ভয়ে ভয়ে, তাঁহার পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বকর্মা কিন্তু কন্যার দুঃখ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সংজ্ঞাকে দেখিয়া আশ্চর্য তো হইলেনই, বিরক্ত হইলেন তাহার চেয়েও বেশি। তিনি বলিলেন, "তুমি ভারি অন্যায় করিয়াছ, এখনি ফিরিয়া যাও।"

বাপের বাড়িতে আসিয়াও সংজ্ঞার দুঃখ ঘুচিল না। বকুনির জ্বালায় সেখানে টিকিয়া থাকাই তাঁহার দায় হইল। কাজেই তখন আর কি করা যায়? সংজ্ঞা একটি ঘোটকী সাজিয়া সেখান হইতে উত্তর মুখে ছুটিয়া পলাইলেন। সকল দেশের উত্তরে কুরুবর্ষ বা উত্তর কুরু। সেখানকার সুন্দর সবুজ মাঠের কচি কচি ঘাসগুলি খাইতে বড়ই মিষ্ট। সংজ্ঞা ছুটিতে ছুটিতে সেই দেশে গিয়া, সেখানকার সুন্দর মাঠের মিষ্ট ঘাস খাইয়া মনের আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। সেখানে পুড়িয়াও মরিতে হয় না, বকুনিও খাইতে হয় না।

এদিকে সূর্যদেবের ঘরে কাজকম সুন্দর মতেই চলিতেছে। ছায়া দেখিতে ঠিক সংজ্ঞারই মতো, আর কাজেকর্মেও বেশ ভালো। সুতরাং সূর্যদেব টেরই পান নাই যে একটা কিছু হইয়াছে। খোকা-খুকিরা কিন্তু ইহার মধ্যে বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহাদের মা আর তাহাদিগকে ভালোবাসে না। তাহারা জানুক, আর নাই জানুক, ছায়া তো আর তাহাদের মা নয়। সে তাহাদিগকে মার মতো ভালবাসিবে কি করিয়া? মনু শান্ত ছেলে, সে আদর না পাইয়াও চুপ করিয়া রহিল। যম রাগী, সে অভিমানের ভয়ে ছায়াকে পা দেখাইয়া বলিল, "তোমাকে

লাথি মারিব।" ছায়াও তখন রাগে অস্থির হইয়া বলিল, "বটে? এত বড় আস্পর্দা? তোর ঐ পা খসিয়া পড়ুক।"

শাপের ভয়ে যম কাঁদিতে কাঁদিতে সূর্যের নিকট গিয়া নালিশ করিল, "বাবা, মা আমাদের ভালোবাসেন না বলিয়া আমি তাঁহাকে পা দেখাইয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, আমার পা খসিয়া পড়িয়া যাইবে। বাবা আমি তো লাথি মারি নাই, তুমি আমার পা খসিয়া পড়িতে দিয়ো না।" সূর্য বলিলেন, "বাবা, তোমার মা যখন শাপ দিয়াছেন, তখন তো আর তাহা আটকাইবার উপায় নাই। তবে, এইটুকু করা যাইতে পারে যে পোকায় তোমার পায়ের মাংস অল্পে অল্পে লইয়া যাইবে, আস্ত পা খসিয়া পড়ার দরকার হইবে না।"

তারপর সূর্যদেব ছায়ার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মা হইয়া ছেলের সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করিতেছ?" ছায়া প্রথমে চুপ করিয়া রহিল কিন্তু তারপরই যখন সূর্য বিষম রাগের ভরে তাঁহার চুল ধরিয়া শাপ দিবার আয়োজন করিলেন, তখন আর সে না বলিয়া যায় কোথায়?

সে কথা শুনিয়া সূর্য যে কিরূপ ব্যস্তভাবে তাঁহার শ্বশুরের নিকট ছুটিয়া আসিলেন, তাহা কি বলিব। বিশ্বকর্মা দেখিলেন, ঠাকুর বড় বেজায় রকমের চটিয়াছেন, তাঁহার মুখ দিয়া ভালো করিয়া কথাই বাহির হইতে পারিতেছে না। তখন তিনি তাঁহাকে অনেক মিষ্টকথায় শান্ত করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর জানেন তো আপনার তেজ কি ভয়ংকর। আমার মেয়ে সে তেজ কিছুতেই সহিতে না পারিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। তবে, আপনি যদি চাহেন তো আপনার এই তেজ আমি অনেকটা কমাইয়া দিতে পারি। তাহা হইলে সংজ্ঞারও আপনার নিকট থাকিতে কষ্ট হইবে না। আর আপনার চেহারাটাও অনেক মোলায়েম হইয়া যাইবে।"

সূর্য বাস্তবিকই সংজ্ঞাকে অতিশয় ভালোবাসিতেন। কাজেই তিনি তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্মার কথায় রাজি হইলেন। বিশ্বকর্মা আর দেরি না করিয়া তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে কুঁদে চড়াইয়া দিলেন। আগেই বলিয়াছি, সূর্য সে সময়ে তেমন গোল ছিলেন না। কুঁদে চড়াইয়া সোঁ সোঁ শব্দে কয়েক পাক দিতেই তাঁহার উষ্কশুষ্ক কিরণগুলি বাটালির মুখে উড়িয়া গেল আর তাহার ভিতর হইতে তাঁহার ঐ সুন্দর গোল মুখখানি দেখা দিল, তখন সকলেই বলিল, "বাঃ, বেশ হইয়াছে। এখন ঠাকুর যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি দেখিতে ভালো।"

এ কথায় সূর্যদেব যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া সংজ্ঞাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, সংজ্ঞা ঘোটকী সাজিয়া উত্তরদিকে পলায়ন করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাকে কোন দিকে যাইতে হইবে তাহা আর বুঝিতে বাকি রহিল না। সংজ্ঞা সাজিয়াছিলেন ঘোটকী, তিনি সাজিলেন ঘোড়া। তারপর সেই যে সেখান হইতে তিনি চিঁ-হিঁ হিঁ হিঁ শব্দে ছুট দিলেন আর একেবারে সংজ্ঞার সম্মুখে উপস্থিত না হইয়া থামিলেন না। কিন্তু সংজ্ঞাকে তিনি সহজে ধরিতে পারেন নাই, কারণ সে বেচারী কি করিয়া জানিবেন যে ঐ যে চিঁ-হিঁ হিঁ হিঁ শব্দে ঘোড়াটি ছুটিয়া আসিতেছে, সেই হইতেছে তাঁহার স্বামী? কাজেই তিনি তাহাকে দেখিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইয়াছিলেন। যাহা হউক, শেষে সকল গোলই চুকিয়া গেল, আর তখন তো সুখের সীমাই রহিল না।

পিপ্পলাদ

দধীচি মুনির নাম হয়তো তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ। তাঁহার মতন তপস্যা অতি অল্পলোকেই করিয়াছে। মহর্ষি দধীচি অতিশয় শান্ত আর পরম দয়ালু ছিলেন। গঙ্গার ধারে নিজের আশ্রমে থাকিয়া পত্নী প্রাতিথেয়ীকে লইয়া ভগবানের নাম করা, গাছপালার প্রতি যত্ন, সকল জীবে দয়া আর অতিথি আসিলে তাহার সেবা করা, এ সকল ছাড়া তাঁহার আর কাজ ছিল না। কিন্তু এই নিরীহ লোকটির তপস্যার এমনি তেজ ছিল যে, তাহার ভয়ে অসুরেরা তাঁহার আশ্রমের কাছে আসিতেই থরথর করিয়া কাঁপিত। অথচ দেবতাদিগকে সেই অসুরেরা জ্বালাতনের একশেষ করিত। কতকাল ধরিয়া যে ইঁহাদের যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহার ঠিকানাই নাই। সেই যুদ্ধে কখনো দেবতারা জিততেন, কখনো বা অসুরদিগের নিকট হারিয়া বিধিমতে নাকাল হইতেন। যাহা হউক, একবার দেবতারা নানারকমের আশ্চর্য আশ্চর্য অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অসুরদিগকে খুবই হারাইয়া দিলেন। তারপর তাঁহাদের এই চিন্তা হইল যে, এ সকল অস্ত্রের কাজ তো ফুরাইল, এখন এগুলোকে কোথায় রাখা যায়? যুদ্ধ করিয়া শরীর অত্যন্ত কাহিল হইয়াছে, এগুলোকে আর স্বর্গে বহিয়া নেওয়ার শক্তি নাই, সেখানে লইয়া গেলেও হয়তো আবার কোনদিন অসুরেরা আসিয়া কাড়িয়া নিবে।

শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা দধীচির নিকট আসিয়া বলিলেন, "মুনিঠাকুর, আমাদের এই অস্ত্রগুলি যদি দয়া করিয়া আপনার নিকট রাখেন, তবে আমাদের বড় উপকার হয়। আপনার কাছে থাকিলে আর দৈত্যেরা এগুলি চুরি করিতে পারিবে না।" এ কথায় দধীচি সবে বলিয়াছিলেন, "যে আজ্ঞা" অমনি প্রাতিথেয়ী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ওগো, তুমি এই ফ্যাসাদের ভিতরে যাইয়ো না। দেবতা মহাশয়েরা এখন মিষ্ট কথা কহিতেছেন, কিন্তু আমাদের এখানে থাকিয়া যদি জিনিসগুলি নষ্ট হয় বা চুরি যায়, তখন ইঁহারা বড়ই চটিবেন।" দধীচি বলিলেন, "তাই তো এখন আর কি করা যায়? "যে আজ্ঞা" বলিয়া ফেলিয়াছি, এখন তো আর 'না' বলা যাইতে পারে না।

কাজেই অস্ত্রগুলি দধীচির আশ্রমেই রহিল, আর দেবতারা তাহাতে যারপরনাই তুষ্ট হইয়া নিজের নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। তারপর এক বৎসর যায়, দু বৎসর যায়, ক্রমে সাড়ে তিনলাখ বৎসর কাটিয়া গেল, তবুও দেবতাদের আর কোনো খোঁজ-খবর নাই। ততদিনে অস্ত্রে মরিচা তো ধরিয়াছেই, তাহা ছাড়া অসুরদের আবার বেজায় তেজ বাড়িয়া উঠিয়াছে। দিনরাত কেবল ঐ অস্ত্রগুলির উপর তাহাদের চোখ;না জানি কখন কোন ফাঁকে সেগুলিকে লইয়া যাইবে। তখন দধীচি ভাবিলেন যে, দেবতারা তো আসিলেনই না, এখন অস্ত্রগুলি যাহাতে অসুরদের হাতে না পড়ে, তাহার উপায় দেখিতে হয়।

সে বড় আশ্চর্য উপায়। জলে মন্ত্র পড়িয়া অস্ত্রগুলিকে তাহা দ্বারা ধুইবামাত্র, তাহাদের সকল তেজ সেই জলে গুলিয়া গেল। সে জল দধীচি তখনই খাইয়া ফেলিলেন, কাজেই আর কোনো চিন্তার কথাই রহিল না। তারপর দেখিতে দেখিতে অস্ত্রগুলি আপনা হইতেই ক্ষয় হইয়া গেল, তখন অসুরেরা আর কি নিবে?

দধীচি সবে এই কাজটি করিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, আর ঠিক সেই সময়ে দেবতাদের অস্ত্রগুলির কথা মনে পড়িয়াছে। এতদিন বাদে, এত কাণ্ডকারখানার পরে, তাঁহারা আসিয়া দধীচিকে বলিলেন, "ঠাকুর, অসুরেরা তো আবার ভারি মুশকিল বাধাইয়াছে। শীঘ্র আমাদের অস্ত্রগুলি দিন।"

দধীচি বলিলেন, "তাই তো আপনারা এতদিন আসেন নাই, তাই আমি দৈত্যদের ভয়ে সেগুলি খাইয়া ফেলিয়াছি। এখন কি করি বলুন?"

তাহা শুনিয়া দেবতারা বলিলেন, "আমরা আর কি বলিব? আমরা বলি আমাদের অস্ত্রগুলি দিন। অস্ত্র না পাইলে আর আমাদের বিপদের সীমাই থাকিবে না!"

দধীচি বলিলেন, "সে সকল অস্ত্র তো এখন আমার হাড়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আপনারা না হয় সেই হাড়গুলি নিন।"

দেবতারা বলিলেন, "আমাদের অস্ত্রেরই দরকার, আপনার হাড় লইয়া আমরা কি করিব?"

দধীচি বলিলেন, "আমার হাড় দিয়া অতি উত্তম অস্ত্র প্রস্তুত হইবে আমি এখনই দেহত্যাগ করিতেছি।"

কাজেই তখন দেবতারা আর কি করেন? তাঁহারা বলিলেন, "আচ্ছা তবে একটু শীঘ্র শীঘ্র তাহাই করুন।"

দেবী প্রাথিতেয়ী তখন ঘরে ছিলেন না, স্নান করিতে গিয়াছিলেন দেবতারা সেই বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী মেয়েকে বড়ই ভয় করিতেন, তাই তাঁহারা ভাবিলেন যে, তিনি ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই কাজ শেষ করিতে হইবে। দধীচি যোগাসনে বসিয়া একমনে ভগবানের চিন্তা করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার পবিত্র আত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন দেবতারা বিশ্বকর্মাকে বলিলেন, "এখন তুমি ইঁহার হাড় দিয়া অস্ত্রশস্ত্র তয়ের কর।"

বিশ্বকর্মা বলিলেন, "আমি কি করিয়া অস্ত্র তয়ের করিব? ইঁহার দেহ কাটিলে তবে তো হাড় পাওয়া যাইবে। বাপ রে! সে কাজ আমা দ্বারা হইবে না। হাড়গুলি পাইলে আমি এখনই তাহা দিয়া অস্ত্র গড়িয়া দিতে পারি।"

তখন দেবতাদের কথায় গোরুর দল আসিয়া গুঁতাইয়া মুনির দেহ হইতে হাড় বাহির করিয়া দিল, দেবতারাও মহানন্দে তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন। সেই হাড় দিয়া শেষে বিশ্বকর্মা বজ্র প্রভৃতি নানারূপ আশ্চর্য অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এদিকে প্রাতিথেয়ী স্নান আহ্নিকের পর কলসী হাতে আশ্রমে ফিরিয়া দেখেন, মহর্ষি নাই, তাঁহার মাংস, লোম আর চামড়া মাত্র পড়িয়া আছে। ঘরে অগ্নি ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেবী সকল কথাই জানিতে পারিলেন। সেই দারুণ সংবাদ বজ্রাঘাতের ন্যায় তাঁহার চেতনা হরণ করিয়া লইল; তাঁহার দেহ ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। জ্ঞান হইলে পর অনেক কষ্টে শোক সম্বরণপূর্বক তিনি দধীচির দেহের অবশিষ্টটুকু লইয়া আগুনে ঝাঁপ দিলেন। যাইবার সময়ে নিজের নিতান্ত শিশুপুত্রটিকে গঙ্গার নিকটে আর গাছপালার নিকটে সঁপিয়া দিয়া বলিয়া গেলেন, "এই পিতৃমাতৃহীন শিশুটিকে তোমরা দয়া করিয়া দেখিবে।"

দধীচিও গেলেন প্রাতিথেয়ীও গেলেন। আশ্রম অন্ধকার হইল। তপোবনের পশুপক্ষী আর বৃক্ষলতারা তখন কাঁদিয়া বলিল, "হায়! যাঁহারা আমাদের পিতা মাতার মতো ছিলেন,

তাঁহাদের দুজনকেই হারাইলাম। আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আর তো আমরা তাঁহাদের সেই পবিত্র মুখ দেখিতে পাইব না। এখন তাঁহাদের এই শিশুটিকে দেখিয়াই আমাদের মন শান্ত থাকিবে।"

এখন হইতে এই শিশুটিকে পালন করাই হইল তাহাদের একমাত্র কাজ। চন্দ্রের নিকট হইতে অমৃত চাহিয়া আনিয়া তাহারা শিশুটিকে খাইতে দিল, সেই অমৃতের গুণে শিশু দেখিতে দেখিতে শুক্লপক্ষের চাঁদের মতো বাড়িয়া উঠিল। পিপুল (অশ্বত্থ) গাছেরা তাহার বড়ই যত্ন করিয়াছিল, তাই তাহার নাম হইল পিপ্পলাদ।

পিপ্পলাদ জানিত, সে সেই সকল গাছপালারই ছানা। তারপর যখন তাহার বুদ্ধি একটু বাড়িয়াছে, তখন সে একদিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "গাছের ছানা তো গাছের মতোই হয়, মানুষের ছানা মানুষের মতো হয়, পাখির ছানা হয় পাখির মতো আর জন্তুর ছানা জন্তুর মতো। কিন্তু আমি যে তোমাদের ছানা, আমার এমন হাত পা হইল কি করিয়া?"

গাছেরা বলিল, "বাছা, তুমি তো আমাদের ছানা নও। তুমি মুনির পুত্র, তোমার পিতা মহর্ষি দধীচি, মাতা দেবী প্রাতিথেয়ী।"

পিপ্পলাদ বলিল, "আমার বাবা আর মা তবে কোথায় গেলেন?" গাছেরা বলিল, "তোমার পিতা দেবতাদের উপকারের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তোমার মাতা সেই দুঃখে আগুনে ঝাঁপ দিয়াছেন।"

এমনি করিয়া গাছেরা সকল কথাই পিপ্পলাদকে বলিল। তাহা শুনিয়া সে আগে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিল, তারপর গাছেদের মিষ্ট কথায় একটু শান্ত হইয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আমার পিতাকে যাহারা মারিয়াছে, তাহাদিগকে আমি মারিব।"

তখন গাছেরা সেই ছেলেটিকে চন্দ্রের নিকট লইয়া গিয়া সকল কথা বলিল।

তাহা শুনিয়া চন্দ্র বলিলেন, "বৎস পিপ্পলাদ! বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন, রূপ, গুণ, সুখ, মান, যশ, পুণ্য সকলই আমি তোমাকে দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।"

পিপ্পলাদ বলিল, "আমার পিতাকে যাহারা মারিয়াছে, তাহাদিগকে যদি না মারিতে পারিলাম, তবে এ সব লইয়া আমার কি হইবে? আগে বলুন, কোথায়, কোন দেশে, কোন তীর্থে গিয়া, কি মন্ত্র বলিয়া, কোন দেবতাকে ডাকিয়া আমি এ কাজ করিতে পারিব?"

চন্দ্র বলিলেন, "শিবকে ডাক, তোমার কাজ হইবে।"

পিপ্পলাদ বলিল, "আমি যে ছেলেমানুষ, আমি তো কিছুই জানি শুনি না আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিব?"

চন্দ্র বলিলেন, "তুমি চক্রেশ্বর তীর্থে গিয়া ভক্তিভরে তাঁহার কথা ভাব, আর তাঁহাকে ডাক, তবেই তিনি আসিবেন।"

পিপ্পলাদ তখনই সেই তীর্থে গিয়া প্রাণপণে শিবকে ডাকিতে লাগিল সেই ডাকে শিব তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "পিপ্পলাদ, কি চাহ?"

পিপ্পলাদ বলিল, "আমার দেবতুল্য ধার্মিক পিতামাতাকে যাহারা মারিয়াছে, আমি তাহাদিগকে মারিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমাকে দিন।"

শিব কহিলেন, "আচ্ছা, তুমি যদি আমার তিনটা চোখই দেখিতে পার, তাহা হইলে দেবতাদিগকে মারিতে পারিবে।"

কিন্তু পিপ্পলাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার দুইটা বৈ চোখ দেখিতে পাইল না।

তখন শিব বলিলেন, "আর কিছুদিন তপস্যা কর, দেখিতে পাইবে।"

এ কথায় পিপ্পলাদ এমনি ভয়ংকর তপস্যা আরম্ভ করিল যে, অল্পদিনের ভিতরেই সে দেখিল, শিবের কপালে আর একটি চোখ আছে। তখন শিবের সেই চোখ হইতে আগুনের ঘোড়ার মতন একটা ভয়ংকর 'কৃত্যা' (ভূত) বাহির হইয়া ঘোরতর শব্দে পিপ্পলাদকে বলিল, "কি করিব?"

পিপ্পলাদ বলিল, "দেবতাদিগকে ধরিয়া খাও।"

বলিতে বলিতেই সেটা খপ্ করিয়া পিপ্পলাদকে ধরিয়া মুখে দিতে গিয়াছে।

পিপ্পলাদ ভয়ানক থতমত খাইয়া চ্যাঁচাইয়া বলিল, "আরে, আরে, ও কি কর?"

সেটা বলিল, "দেবতাদিগকে খাইতে হইলে, তাহারা যে তোমার শরীর গড়িয়াছে, তাহাও খাইব।"

এ কথায় পিপ্পলাদ আবার শিবের স্তব করিলে, শিব সেই ভয়ংকর জিনিসটাকে বলিলেন, "এ স্থানের এক যোজনের মধ্যে তুমি কাহাকেও খাইতে পারিবে না।" তখন সেই ভূতটা সেখান হইতে দূরে গিয়া এমনই সর্বনেশে আগুন জ্বালাইয়া বসিল যে, আর একটু হইলেই সে দেবতার দলকে পোড়াইয়া শেষ করিত। দেবতারা প্রাণের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শিবের নিকট আসিয়া বলিলেন, "রক্ষা করুন প্রভু! আপনার ভূত আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিল। আপনি রক্ষা না করিলে এ যাত্রা আর আমাদের উপায় নাই।"

শিব তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এইখানে আসিয়া বাস কর। এখানে ওটা তোমাদের কিছু করিতে পারিবে না।"

দেবতারা বলিলেন, "স্বর্গ আমাদের বাসস্থান, তাহা ছাড়িয়া এখানে কি করিয়া থাকি?"

শিব কহিলেন, "তবে এক কাজ কর;সূর্যই হইতেছেন এই সংসারের পিতা। তিনি আসিয়া এখানে বাস করুন, তাহাতেই সকল দেবতার বাস করা হইবে।" এইরূপে তখনকার মতো বিপদ কাটিয়া গেল।

তারপর শিবের উপদেশে পিপ্পলাদের রাগও দূর হইল। তখন শিব অনেকবার পিপ্পলাদকে বর লইতে বলিলেন। পিপ্পলাদ এমন সব বর প্রার্থনা করিল, যাহাতে জগতের উপকার হয়। নিজের জন্য সে কিছুই চাহিল না।

ইহাতে দেবতাগণ যারপরনাই তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, "বাছা, তুমি তো তোমার নিজের জন্য কিছুই চাহিলে না। আমরা তোমাকে বর দিব, তুমি তোমার নিজের জন্য কিছু চাহিয়া লও।"

তখন পিপ্পলাদ জোড়হাতে দেবতাদিগকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আমার পিতামাতার পবিত্র নাম কানে শুনিয়াছি মাত্র, তাঁহাদিগকে দেখিবার সুখ এই অভাগার ভাগ্যে ঘটে নাই, ইহাতে আমার মন বড় অস্থির থাকে।"

দেবতারা বলিলেন, "সেজন্য তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইয়ো না, এখনই তোমার পিতামাতাকে দেখিতে পাইবে।"

এ কথা শেষ হইতে না হইতেই পিপ্পলাদের পিতামাতা দিব্য বেশ পরিয়া, সোনার রথে চড়িয়া স্বর্গ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিপ্পলাদ অমনি তাঁহাদের পায়ে লুটাইয়া

পড়িল, কিন্তু তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া ক্রমাগত চোখের জল ফেলা ভিন্ন আর একটিও কথা কহিতে পারিল না।

দধীচি ও প্রাতিথেয়ী তাহাকে অনেক আদর, অনেক আশীর্বাদ করিয়া, তাহার মনের সকল দুঃখ দূর করিয়া, আবার স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এইভাবে সকল দিকেই সুখ হইল, এখন পিপ্পলাদের সেই ভয়ংকর ভূতটা থামিলেই আর কোনো কথা ছিল না।

দেবতারা বলিলেন, "পিপ্পলাদ, তোমার এটাকে থামাও।"

পিপ্পলাদ বলিল, "সে সাধ্য তো আমার নাই। আপনারা গিয়া উহাকে থামিতে বলুন; আমাকে দেখিলে আবার কি না জানি করিতে চাহিবে।"

সে কথায় দেবতারা সেই ভয়ংকর জিনিসটার কাছে গিয়া তাহাকে থামিতে বলিলেন। সে তাহাতে খেঁকাইয়া বলিল, "তাহা হইবে না! সকলকে খাইব, তবে তো থামিব। তাহার আগে আমার এ আগুন কিছুতেই নিভিবার নয়। বাস্তবিক, ইহাকে থামাইতে দেবতাদের বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। সে অনেক কথা, এখন আমার তাহা বলিবার অবসর নাই।

রেবতীর বিবাহ

এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল রৈবত ককুদ্মী। পশ্চিম সমুদ্রের ধারে, কুশস্থলী নামক নগরে তিনি বাস করিতেন। রৈবতের একটি কন্যা ছিল, তাহার নাম রেবতী। রেবতীর গুণের কথা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। মেয়েটি দেখিতে যেমন অপরূপ সুন্দরী, তেমনি সুশীলা আর মিষ্টভাষিণী, আর বুদ্ধিমতীও যতদূর হইতে হয়।

রেবতী যতই বাড়িয়া উঠিলেন, রাজার মনেও ততই ভাবনা হইল যে, 'আহা! আমার এই স্নেহের মেয়েটিকে এখন কাহার হাতে সমর্পণ করি?'

সংসারের যত ভালো ভালো রাজপুত্র একে একে সকলের সংবাদ রাজা লইলেন, কিন্তু কাহাকেও তাঁহার পছন্দ হইল না। মন্ত্রী, পুরোহিত, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলকেই বলিলেন, কেহই তেমন ভালো একটি পাত্রের সন্ধান করিয়া দিতে পারিল না।

শেষে আর কোনো উপায় না দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, 'ব্রহ্মার কাছে যাই, তিনি অবশ্যই আমার মনের মতন একটি ছেলের কথা বলিতে পারিবেন।'

এই ভাবিয়া রাজা কন্যাটিকে লইয়া ব্রহ্মার সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন হাহা আর হুহু নামে দুইজন গন্ধর্ব সেইখানে বসিয়া ব্রহ্মাকে গান শুনাইতেছিলেন। হাহা আর হুহুর মতো ওস্তাদ আর এই ত্রিভুবনে কখনো দেখা যায় নাই, তাঁহাদের সেই বিচিত্র সংগীত শুনিতে যে কি মিষ্ট লাগিতেছিল, তাহা কি বলিব! সে গান একবার শুনিতে আরম্ভ করিলে আর সকল বিষয়ের কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। যতক্ষণ সে গানের শেষ না হয় ততক্ষণ আর উঠিয়া আসিবার জো থাকে না। সে আশ্চর্য গান একবার আরম্ভ হইলে আর শীঘ্র শেষও হইতে চাহে না। সেটা ছিল ত্রেতাযুগের আরম্ভ। গাহিতে গাহিতে সে যুগ শেষ হইয়া গেল, তারপর দ্বাপর আসিল, তাহাও প্রায় শেষ হইতে চলিল, তবে হাহা হুহু গান শেষ করিয়া

তম্বুরা নামাইলেন। এতকাল যে চলিয়া গিয়াছে, রাজার কিন্তু সে খেয়ালই নাই। তিনি ভাবিতেছেন, 'আহা, এমন সুন্দর গান মুহূর্তের মধ্যেই ফুরাইয়া গেল?'

যাহা হউক, এখন নিজের কাজ সারিয়া লইতে হইবে আর বিলম্ব করা ভালো নহে। এই ভাবিয়া রাজা ব্রহ্মার সিংহাসনের সামনে গিয়া ভক্তিভরে প্রণামের পর জোড়হাতে বলিলেন, "ভগবন্! আমার এই কন্যাটির বিবাহ কাহার সঙ্গে দিব, দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিন। আমি অনেক রাজপুত্রের সন্ধান লইয়াছি, কিন্তু ইহাদের কোনটি যে সকলের চেগে ভালো, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কাহার কাহার কথা ভাবিয়াছ, আমাকে বল দেখি।"

সে কথায় রাজা অনেকের নাম করিয়া বলিলেন, "ইঁহাদের মধ্যে একটি হইলে আমি সুখী হইতাম।" তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তুমি যাহাদের নাম করিলে, এখন তো তাহাদের কেহই বাঁচিয়া নাই; তাহারা ছিল ত্রেতা যুগের লোক, আর এখন হইল দ্বাপরের শেষ। এতদিনে তাহাদের ছেলের ছেলে, নাতির নাতি অবধি মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের রাজ্য, বংশ, নাম অবধি লোপ পাইয়াছে!"

তোমরা হয়তো ভাবিতেছ যে, পৃথিবীর আর সব লোক মরিয়া গেল, আর শুধু রাজা আর তাঁহার মেয়েটি বাঁচিয়া রহিয়াছেন, এ কেমন কথা হইল?

কিন্তু সে যে ব্রহ্মার পুরী, সেখানে তো জরা মৃত্যুর অধিকার নাই। কাজেই তাঁহারা দুজন শুধু যে বাঁচিয়া আছেন তাহাই নহে, ঠিক যেমনটি গিয়াছিলেন তেমনি আছেন, একটুও বুড়া হন নাই!

যাহা হউক, ব্রহ্মার কথায় রাজা নিতান্তই আশ্চর্য হইলেন। আর ভয় পাইলেন, আর ব্যস্ত হইলেন তাহার চেয়েও বেশি।

তিনি বিষম থতমত খাইয়া বলিলেন, "এ্যাঁ, এ্যাঁ! কি সর্বনাশ। তাই তো! প্রভু, এখন উপায়? এখন তবে আমার এই মেয়েটিকে কাহার হাতে দিই? আমার সমকক্ষ রাজা এখন কে কে আছেন?"

ব্রহ্মা বলিলেন, "মহারাজ! এতদিনে কি আর তোমার সে রাজ্য আছে? তোমার রাজ্যও নাই, প্রজারাও নাই। তোমার সেই সুন্দর কুশস্থলী নগরটি অবধি নাই। তাহার জায়গায় এখন দ্বারকা নামক পুরী হইয়াছে। সেই দ্বারকার রাজা কৃষ্ণ, তাঁহার ভাই বলরাম। সেই বলরামের সঙ্গে গিয়া তোমার এই কন্যার বিবাহ দাও। এ মেয়েটি যেমন লক্ষ্মী, বলরামও তেমনি মহাশয় লোক, সকলরকমেই ইহার উপযুক্ত।"

কাজেই রাজা তখন আর কি করেন? তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন বাস্তবিকই তাঁহার রাজ্য, রাজধানী, লোকজন, আত্মীয়স্বজন সব লোপ পাইয়াছে। পৃথিবী আর সে পৃথিবীই নাই। তাঁহাদের সময়ে চৌদ্দ হাত লম্বা এক একটা মানুষ হইত, আর এখনকার লোকগুলি মোটে সাত হাত লম্বা আর তাহাদের চালচলনও যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আর দুঃখ করিয়া কি হইবে? রাজা বলরামকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাঁহার সহিত মেয়ের বিবাহ দিয়া বনবাসী হইলেন।

এদিকে রেবতীকে পাইয়া বলরামের আর আনন্দের সীমাই নাই। কেবল একটি কথায়

তিনি একটু মুশকিলে পড়িয়াছেন, বলরাম হইতেছেন দ্বাপর যুগের লোক, তিনি সাত হাত লম্বা, রেবতী ত্রেতা যুগের মেয়ে, তিনি চৌদ্দ হাত লম্বা, বলরাম প্রাণপণে হাত বাড়াইয়াও তাঁহার মাথা নাগাল পান না!

তখন বলরাম করিলেন কি, তাঁহার লাঙ্গলের আগা দিয়া রেবতীকে চাপিয়া অন্যান্য মেয়েদের মতো বেঁটে করিয়া লইলেন। তারপর আর কোনো অসুবিধা রহিল না।

ইন্দ্র হওয়ার সুখ

দেবতাদের যিনি রাজা, তাঁহাকে বলে ইন্দ্র। তাঁহার কথা তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ। তাঁহার এক হাজার চক্ষু আর সবুজ রঙের দাড়ি ছিল। তাঁহার আসল নাম শক্র, পিতার নাম কশ্যপ, রানীর নাম শচী, পুত্রের না জয়ন্ত, হাতির নাম ঐরাবত, ঘোড়ার নাম উচ্চৈঃশ্রবা, সারথির নাম মাতলি, সভার নাম সুধর্মা, বাগানের নাম নন্দন আর অস্ত্রের নাম বজ্র। তাঁহার সভায় গন্ধর্বেরা গান গাইত, অপ্সরারা নাচিত।

লোকে ভাবিত ইন্দ্র বড়ই সুখে থাকেন আর অনেক সময়ই যে তিনি খুব জাঁকজমকের ভিতরে দিন কাটাইতেন, একথা সত্যও বটে। কিন্তু সময় সময় তাঁহাকে বেগও কম পাইতে হইত না। দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের ভয়ানক শত্রুতা ছিল, আর সেই সূত্রে অসুরেরা মাঝে মাঝে ইন্দ্রকে বড়ই নাকাল করিত। দেবতা আর অসুরের যুদ্ধে একবার বৃত্র নামে একটা অসুর ইন্দ্রকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছিল! দেবতারা তখন অনেক বুদ্ধি করিয়া সেই অসুরটাকে 'জৃম্ভিকা' অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারেন, তাই ইন্দ্র রক্ষা পান, নচেৎ সে যাত্রা আর তাঁহার বিপদের সীমা ছিল না। জৃম্ভিকা অস্ত্রের গুণ অতি আশ্চর্য। সে অস্ত্র গায়ে লাগিবামাত্র অসুরটা ভয়ানক হাই তুলিল, আর ইন্দ্র সেই ফাঁকে তাহার পেটের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

এই যুদ্ধ ভালো করিয়া শেষ হইতে না হইতেই আবার ইন্দ্রের এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। পূর্বে কোনো কারণে তাঁহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। বৃত্রের মৃত্যুর পরে সেই ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। বেচারা ভয়ে অস্থির হইয়া যেখানেই পলাইতে যান, ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে তাড়াইয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হয়। শেষে আর উপায় না দেখিয়া, তিনি একটা প্রকাণ্ড সরোবরের মধ্যে, পদ্মের মৃণালের ভিতরে গিয়া সূতা হইয়া লুকাইয়া রহিলেন। তখন কাজেই ব্রহ্মহত্যা ঠকিয়া গেল। কিন্তু, তথাপি সে তাঁহাকে সহজে ছাড়ে নাই, সে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বৎসর সেইখানে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল।

সাড়ে তিন লক্ষ বছর তো আর একদিন দুইদিনের কথা নয়, দেবতার হিসাবেও তাহা এক হাজার বৎসর। কাজেই দেবতারা তাঁকে এতদিন দেখিতে না পাইয়া ব্যস্তভাবে তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। শেষে ব্রহ্মার কথায় যদিও তাঁহার সন্ধান পাইলেন তথাপি তাঁহাকে ঘরে আনিতে সাহস পান নাই, কারণ ব্রহ্মহত্যা তখনও তাঁহার জন্য সেখানে বসিয়া আছে, সে তাঁহাকে সহজে ছাড়িবে কেন? তখন দেবতারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কোনো পবিত্র নদীতে স্নান করাইয়া ইন্দ্রের শরীরের পাপ ধুইয়া ফেলিবেন, তাহা হইলেই ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে। এই বলিয়া তাঁহারা ইন্দ্রকে গৌতমী নদীতে স্নান করাইতে গেলেন।

সেখানে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। গৌতম যারপরনাই রাগিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "সে হইবে না, এই পাপীকে এখানে স্নান করাইলে আমি তোমাদিগকে শাপ দিয়া ভস্ম করিব! তোমরা শীঘ্র এখান হইতে যাও।"

এ কথায় দেবতারা নর্মদার জলে ইন্দ্রকে স্নান করাইতে গেলেন। সেখানে মাণ্ডব্য মুনির আশ্রম ছিল। মাণ্ডব্য মুনি বিষম ভ্রূকুটির সহিত তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এখানে যদি ইঁহাকে স্নান করাও তবে এখনি তোমাদের শাপ দিয়া ভস্ম করিব।"

যাহা হউক, শেষে দেবতারা অনেক স্তুতি মিনতি করায় মাণ্ডব্য ইন্দ্রকে সেখানে স্নান করাইতে দিলেন। তারপর তাঁহাকে গৌতমীতে নিয়ে গিয়াও স্নান করান হইল। ইহার পর আবার ব্রহ্মা তাঁহার কমণ্ডলুর জল দিয়া ইন্দ্রকে ধুইলেন, তবে সে যাত্রার মতো তিনি একটু নিশ্চিন্ত হইলেন।

বাস্তবিক, ইন্দ্র হওয়া আগাগোড়াই সুখের কথা ছিল না। কিন্তু, লোকে ভাবিত ইন্দ্র বড় সুখী। তাই অনেকে ইন্দ্র হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিত। সেজন্য কাহাকেও খুব তপস্যা করিতে দেখিলেই ইন্দ্র ভাবিতেন সর্বনাশ! এইবার বুঝি বা আমার কাজটি যায়!' তখন তিনি লোকটির তপস্যা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এক এক জন লোক ইন্দ্র হইয়া যাইত!

নহুষ নামে এক রাজা একবার ইন্দ্র হইয়া কি হুলস্থূলই বাধাইয়া ছিলেন! উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবতে তাঁহার মন উঠিল না, তিনি বলিলেন, "আমি বড়-বড় মুনিদের ঘাড়ে চড়িয়া বেড়াইব!"

অমনি এক আশ্চর্য পালকি প্রস্তুত হইল, মুনিরা হইলেন তাহার বেহারা। নহুষ তাহাতে উঠিয়া বসিয়া মুনিঠাকুরদের উপরে অসম্ভব তম্বি জুড়িয়া দিলেন। সে বেচারদের গায়ে জোর কম। ফলমুল খাইয়া থাকেন, পালকি বহার অভ্যাস কাহারও নাই, তাঁহাদের কাজে নহুষের মন উঠিবে কেন? নহুষ তখন বেজায় চটিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের মাথায় ধাঁই শব্দে এক প্রচণ্ড লাথি লাগাইয়া দিলেন। তাহার ফলও পাইলেন হাতে হাতেই, কেননা, তাহার পরমুহূর্তেই মুনির শাপে তাঁহার সেই সুখের ইন্দ্রগিরি ঘুচিয়া গেল, আব তিনি এক প্রকাণ্ড সাপ হইয়া হিমালয়ের নিকটে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন!

আর একবার অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছে, কিন্তু কেহই জয়লাভ করিতে পারিতেছেন না। সেই সময়ে পৃথিবীতে রজি নামে একজন অতিশয় ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। দুই দলই ভাবিলেন, "এই রজিকে আনিয়া আমাদের সঙ্গে জুটাইতে পারিলে নিশ্চয় আমরা জিতিব।'

এই ভাবিয়া দেবতারা রজিকে আসিয়া বলিলেন, "হে রাজন, তুমি আমাদের সঙ্গে মিলিয়া অসুর বধ কর, নহিলে আমরা কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না।" রজি বলিলেন, "আপনারা যদি আমাকে ইন্দ্র করেন, তবে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিতে পারি।"

দেবতারা বলিলেন, "অবশ্য তোমাকে আমরা ইন্দ্র করিব, তুমি শীঘ্র আইস!"

এই বলিয়া দেবতারা সবে চলিয়া গিয়াছেন, অমনি অসুরেরা আসিয়া রজিকে বলিল, "মহারাজ, আপনি আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন।"

রজি দেবতাদিগকে যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনি অসুরদিগকেও বলিলেন, "আপনারা যদি আমাকে ইন্দ্র করেন, তবে আমি আপনাদের কথায় রাজি আছি!"

কিন্তু, অসুরেরা সে কথায় অতিশয় ঘৃণার সহিত বলিল, "এমন সাহায্যের আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ আর কোনো ইন্দ্র আমরা চাই না। আপনি না হয় আমাদের পক্ষে নাই আসিলেন।"

তখন রজি দেবতাদের সঙ্গে জুটিয়া ভয়ানক রাগের সহিত অসুর মারিতে আরম্ভ করিলেন, আর তাহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই দেবতাদের জয়লাভ হইল। ইন্দ্র দেখিলেন, এখন তো বড়ই বিপদ উপস্থিত, রজিকে এখন সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাই তিনি রজি নিজে কিছু বলিবার আগেই তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! লোকে বলে, যে ভয় হইতে রক্ষা করে, সে পিতা। আপনি আমাকে ভয় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কাজেই আপনি আমার পিতা হইলেন। আর তাহাতেই আপনি ইন্দ্রও হইলেন, কেননা ইন্দ্রের পিতা হইলে আর ইন্দ্র হওয়ার চেয়ে বেশি বৈ কম কি হইল?"

রজিও ইন্দ্রের সেই ফাঁকিতে ভুলিয়া আহ্লাদের সহিত দেশে ফিরিয়া আসিলেন, স্বর্গে রাজা হওয়ার কথা আর মুখে আনিলেন না।

এই রজির পাঁচশত মহাবীব পুত্র ছিল। রজির মৃত্যুর পরে এই পাঁচশত বীর মিলিয়া যুক্তি করিল, "দেবতারা ফাঁকি দিয়া আমাদের পিতাকে ইন্দ্রপদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, আইস, আমরা তাহার শোধ লইব!"

এই বলিয়া তাহারা দেবতাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল, আর দেখিতে দেখিতে দলবল সহিত ইন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়া স্বর্গ আর পৃথিবী দুইই দখল করিয়া বসিল।

এই পাঁচশত ভাই যেমন বীর, তেমনি যদি বুদ্ধিমান হইত তবে আর ইন্দ্রের নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইবার কোনো উপায়ই থাকিত না। কিন্তু ইহারা বুদ্ধিমানের মতন ধর্মপথে থাকিয়া রাজ্যপালন করার বদলে, নানারূপ অসৎ কার্যে নিজেদের বিষয় ও বল নষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহার ফলে, অল্পদিনের ভিতরেই ইন্দ্র তাহাদিগকে তাড়াইয়া আবার আসিয়া স্বর্গের রাজা হইলেন।

ইন্দ্র হওয়ার যে কি সুখ, তাহার সম্বন্ধে আর একটা মজার গল্প আছে। একবার অসুরেরা ঘোরতর যুদ্ধে দেবতাদিগকে যারপরনাই ব্যস্ত করিয়া তুলিলে, তাঁহারা সূর্যবংশের রাজা পরঞ্জয়কে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তুমি আমাদের হইয়া অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।"

পরঞ্জয় কহিলেন, "আমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি যদি আপনারা আমার একটি কথায় রাজি হন। আপনাদের যিনি ইন্দ্র, আমি তাঁহার কাঁধে চড়িয়া যুদ্ধ করিব।"

এ কথায় ইন্দ্র আর অন্য দেবতারা সকলেই বলিলেন, "হাঁ, হাঁ—তাহাই হইবে, তুমি আইস!"

তারপর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, ইন্দ্র বিশাল এক ষাঁড় সাজিয়া পরঞ্জয়কে কাঁধে করিয়া লইলেন, পরঞ্জয়ও তাহাতে ভারি খুশি হইয়া দুই দণ্ডের মধ্যে অসুর মারিয়া শেষ করিলেন। সেই ষাঁড়ের 'ককুদ্' অথবা কাঁধে চড়িয়া যুদ্ধ করায় তখন হইতে পরঞ্জয়ের নাম হইল 'ককুৎস্থ'। দশরথের পুত্র রাম এই ককুৎস্থ বংশের লোক ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকেও অনেক সময়ে বলা হয় 'কাকুৎস্থ'।

ইন্দ্রগিরির মজার আর একটা গল্প বলিয়া শেষ করিব। একজন অতি বিখ্যাত মুনি ছিলেন, তাঁহার নাম আত্রেয় (অত্রি মুনির পুত্র)। ঠাকুরটি বিস্তর যাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন, আর তাহাতে তাঁহার ইচ্ছামতো সংসারের সর্বত্র চলাফেরার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।

একদিন তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে ইন্দ্রের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার শোভা দেখিয়া, সেখানকার গীত-বাদ্য শুনিয়া, আর সেখানকার ময়রাদের তৈরি মিষ্টান্ন খাইয়া ঠাকুরের মন এমনই ভুলিয়া গেল যে, তিনি দিনরাতই কেবল ভাবিতে লাগিলেন, 'আহা! এই তো সুখ, এমনিই তো চাই!'

তারপর আশ্রমে ফিরিয়া আর তাঁহার নিজের কুঁড়েঘরটি কিছুতেই তাঁহার পছন্দ হয় না। ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো! এসব কি ছাই খাবার আমাকে খাইতে দাও? এসব কি খাইতে ভালো লাগে? ইন্দ্রের বাড়িতে যে চমৎকার মিঠাই খাইয়া আসিয়াছি, ফলমূলের তরকারি কিছুতেই তেমন করিতে পারিবে না।"

এই বলিয়া তিনি বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন, "আমার এই আশ্রমটিকে ঠিক ইন্দ্রের পুরীর মতো করিয়া দাও। নইলে তোমাকে শাপ দিয়া ভস্ম করিব! ঠিক তেমনি বাড়ি, তেমনি সভা, তেমনি বাগান, তেমনি হাতি, তেমনি ঘোড়া, তেমনি ঝাড়-লণ্ঠন, তেমনি গান-বাজনা, তেমনি মিঠাই-মণ্ডা, লোকজন—সব অবিকল চাই! খবরদার! যেন কোনো কথার একটু তফাত হয় না!"

শাপের ভয়ে বিশ্বকর্মা তখনই তাড়াতাড়ি সেখানে এক ইন্দ্রপুরী তয়ের করিয়া দিলেন। মুনি ঠাকুর সেই পুরীতে থাকেন, আর বলেন, "আহা এই তো সুখ! এমনই তো চাই।"

এমনিভাবে কিছুদিন যায়। ইহার মধ্যে অসুরেরা সেই পুরীর দিকে ভ্রূকুটি করিয়া তাকায় আর বলে, "দেখ ভাই, ইন্দ্র বেটা স্বর্গ ছাড়িয়া চুপিচুপি পৃথিবীতে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। চল, এই বেলা উহাকে ধরিয়া বৃত্রকে মারিবার সাজাটা ভালোমতে দিই!"

অমনি দলে দলে অসুর, "ইন্দ্র বেটাকে মার!" "ইন্দ্র বেটাকে মার!" বলিতে বলিতে আসিয়া সেই পুরী ঘিরিয়া বসিল।

মুনিঠাকুর মনের সুখে খাটের উপর বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে অসুরদের বিকট চীৎকারে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে লাখে লাখে শেল, শূল, মুষল, মুদ্‌গর, গাছ, পাথর, আসিয়া তাঁহার সাধের পুরী চুরমার করিয়া দিতে লাগিল। দু-একটা তীরের খোঁচা যে না খাইলেন তাহাও নহে!

তখন তিনি তাড়াতাড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে অসুরদের সামনে আসিয়া জোড়হাতে বলিলেন, "দোহাই বাবা, আমি ইন্দ্র নহি! আমি মুনি, ব্রাহ্মণ, অতি নিরীহ দীন হীন মানুষ! আমার উপরে তোমাদের এত ক্রোধ কেন?"

অসুরেরা বলিল, "ইন্দ্র নহ, তবে ইন্দ্র সাজিয়াছ কেন? শীঘ্র তোমার এসব সাজগোজ দূর করিয়া দাও।"

মুনি বলিলেন, "এই যে বাপু! এক্ষুণি আমি এসব দূর করিয়া দিতেছি। আমার নিতান্তই মাথা খারাপ হইয়াছিল তাই এমন বেকুবী করিতে গিয়াছিলাম। আর কখনো এমন কাজ করিব না!"

তখন আবার বিশ্বকর্মার ডাক পড়িল।

বিশ্বকর্মা আসিলে মুনি বলিলেন, "ভাই! শীঘ্র এসব দূর করিয়া আমার সেই আশ্রম আবার আনিয়া দাও, নহিলে তো অসুরের হাতে আমার প্রাণ যায় দেখিতেছি!"

বিশ্বকর্মা দেখিলেন মুনির বড়ই বিপদ, কাজেই তিনি তাঁর কথামতো কাজ করিতে আর বিলম্ব করিলেন না। দেখিতে দেখিতে সেই সোনার পুরীর জায়গায় আবার কুঁড়েঘর আর বন হইল। অসুরদেরও রাগ থামিল, মুনিরও বিপদ কাটিল বিশ্বকর্মাও হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে ঘরে চলিয়া গেলেন।

সাপ রাজপুত্র

এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল শূরসেন! রাজার পুত্র না থাকায় তাঁহার মনে বড়ই দুঃখ ছিল। সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি অনেক দান ধ্যান, অনেক যাগযজ্ঞ করিলেন। তাহার ফলে শেষে তাঁহার একটি পুত্র হইল বটে, কিন্তু সে সাধারণ লোকের ছেলেপিলের মতন নহে। সে একটি ভীষণ সর্প! যদিও মানুষের মতো কথা কয়!

রাজা মনের দুঃখে বলিলেন, "হায়, হায়! এই সর্প লইয়া আমি কি করিব? ইহার চেয়ে যে পুত্র না হওয়া আমার অনেক ভালো ছিল।" কিন্তু সাপ সে কথা ভাবিলই না, সে রাজাকে বলিল, "বাবা, আমার চূড়াকরণ, উপনয়ন করাইলে না? আমার হাতেখড়ি দিলে না? বেদ পড়াইলে না? তাহা হইলে যে আমি মূর্খ থাকিয়া যাইব।"

রাজা আর কি করেন? তিনি ব্রাহ্মণ ডাকিয়া সব করাইলেন। সেই সাপ তখন দেখিতে দেখিতে সকল শাস্ত্র শেষ করিয়া মস্ত বড় পণ্ডিত হইয়া উঠিল। তারপর একদিন সে রাজাকে বলিল, "বাবা, আমার বিবাহ দিলে না? তাহা হইলে যে লোকে আমাকে ছেলেমানুষ ভাবিবে, আমার কথা গ্রাহ্য করিবে না। আর তোমারও বংশ লোপ হইয়া যাইবে, তাহার দরুন শেষে তোমাকে নরকে যাইতে হইবে।"

রাজার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "বাছা, তুমি যদি মানুষ হইতে তবে তো কোনো মুশকিল ছিল না, কিন্তু তুমি যে সাপ, তোমাকে দেখিলে পালোয়ানেরাও ছুটিয়া পলায়। তোমাকে কে তাহার মেয়ে দিতে চাহিবে বল?"

সাপ বলিল, "নাই বা চাহিল। রাজাদের তো জোর করিয়া মেয়ে ধরিয়া আনিয়াও বিবাহ হইতে পারে, তাই কেন কর না? আমার যদি বিবাহ না হয়, তবে আমি নিশ্চয় গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।"

এ কথায় রাজামহাশয় তো বড়ই সংকটে পড়িলেন।

এখন উপায় কি? শেষে অনেক ভাবিয়া তিনি তাঁহার অমাত্যদিগকে বলিলেন, "আমার পুত্র এখন বড় হইয়াছে, আর খুব উপযুক্তও বটে! তোমরা তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখ।"

রাজার যে একটি ছেলে আছে, অমাত্যরা সকলেই তাহা জানে, কিন্তু সেটি যে একটি সাপ, সে কথা তাহাদের কেহই জানে না। সে কথাটি রাজামহাশয় গোপন রাখিয়াছেন। কাজেই রাজার কথা শুনিয়া তাহারা খুব উৎসাহের সহিত বলিল, "মহারাজ! আপনার যখন ছেলে, তখন আর চেষ্টার বিশেষ দরকার কি? দেশ-বিদেশে আপনার নাম; আপনি যাহার

নিকট চাহিবেন, সেই মেয়ে দিবে।"

রাজার একটি খুব পুরাতন বিশ্বাসী কর্মচারী ছিল, কিন্তু সে রাজার কথার ভাবে বুঝিয়া লইল যে ইহার মধ্যে কিছু চেষ্টার দরকার আছে। সে বলিল, "মহারাজ! আপনার মনের কথা আমি বুঝিয়াছি। আপনার অনুমতি হইলে, আমি কন্যার চেষ্টায় যাইতে পারি। পূর্বদেশে বিজয় নামে এক রাজা আছেন, তাঁহার রাজ্য ধন লোকজন হাতি ঘোড়ার সীমা নাই। তাঁহার আটটি মহাবল পুত্র আর ভোগবতী নামে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মতো একটি কন্যা আছেন। সেই কন্যাই আপনার বউ হইবার উপযুক্ত।"

সে কথায় রাজা ভারি খুশি হইয়া তখনই বিস্তর টাকাকড়ি ও লোকজন সঙ্গে দিয়া কর্মচারীটিকে পূর্বদেশে রওয়ানা করিয়া দিলেন। কর্মচারী রাজা বিজয়ের সভায় উপস্থিত হইয়া শূরসেনেব পুত্রের জন্য তাঁহার কন্যা ভোগবতীকে প্রার্থনা করিল। সেই সাপকে সে জন্মেও চক্ষে দেখে নাই, জানেও না যে সেটা সাপ। সে তাহাকে মানুষ ভাবিয়া আন্দাজি তাহার কত প্রশংসাই যে করিল, তাহা আর বলিবার নয়। তাহার একটি কথাও সত্য নহে, কিন্তু রাজা বিজয় তাহার আগাগোড়াই বিশ্বাস করিলেন, কাজেই বিবাহেব কথা স্থির হইতে আর বিলম্ব হইল না। তারপর আর দু-একবার লোক আসা যাওয়া করিলেন। বিজয় এ কথায়ও রাজি হইলেন যে, বর বিবাহ করিতে আসিবেন না, নিজেব অস্ত্র পাঠাইযা দিবেন, তাহার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ হইবে। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এরূপ ঘটনা ঢেব হইয়া থাকে, কাজেই তেমনি করিয়া কিছুদিনের মধ্যেই ভোগবতীর বিবাহ হইয়া গেল। কেহই জানিল না যে সে বিবাহ একটা সাপের সঙ্গে হইয়াছে; ভোগবতীও তাহা জানিল না।

সে শ্বশুরবাড়ি গেলে পর প্রথমে কেহই তাহাকে সেই সাপের কথা জানাইতে সাহস পায নাই। কিন্তু শেষে যখন সে সকল কথা জানিল, আর সাপকে দেখিল, তখন সেই সাপকেই তাহার যারপরনাই ভালো লাগিল। সে দিনরাত পরম যত্নে তাহার সেবা করে, অতি মিষ্টভাবে তাহার সঙ্গে কথাবার্তা কহে, আর গান গাহিয়া, বাজনা বাজাইয়া, খেলা করিয়া, বিধিমতে তাহাকে খুশি রাখে।

তখন একদিন সাপ তাহাকে বলিল, "ভোগবতী, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি; পূর্বের কথা এখন আমার মনে হইতেছে। আমি অনন্তের পুত্র মহাবল নাগ; মহাদেবের হাতে আমি থাকিতাম। তখনো তুমি আমার স্ত্রী ছিলে। একদিন শিব আমার উপর চটিয়া আমাকে এই শাপ দেন যে, 'তোমাকে মানুষের ঘরে সাপ হইয়া জন্মাইতে হইবে।' তখন তুমি আর আমি দুজনে মিলিয়া শিবকে অনেক মিনতি করায় তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমরা দুজনে যখন গৌতমী নদীতে গিয়া আমার পূজা করিবে, তখন তোমাদের শাপ কাটিয়া যাইবে।' এখন তুমি আমাকে গৌতমী নদীতে লইয়া চল।"

ভোগবতী তখনই তাহাকে লইয়া গৌতমীতে যাত্রা করিল, আর সেখানে গিয়া শিবের পূজা করিতেই সেই সাপের আবার দেবতার মতো সুন্দর চেহারা হইল।

তখন সে শূরসেনের নিকট গিয়া বলিল, "বাবা, এখন আমার পৃথিবীতে থাকার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে; অনুমতি কর, আমি শিবের নিকট যাই।"

শূরসেন বলিলেন, "বাবা, তুমি হইলে যুবরাজ; কিছুদিন এখানে থাকিয়া রাজ্যভোগ কর, তোমার ছেলেপিলে হউক, আমরা দেখিয়া চক্ষু জুড়াই। তারপর আমার মৃত্যু হইলে শেষে

শিবের নিকট যাইও!"

সে কথায় সম্মত হইয়া মহাবল সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিল।

স্যমন্তক মণি

এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল প্রসেন। প্রসেনের ভ্রাতার নাম ছিল সত্রাজিৎ। সূর্যের সহিত সত্রাজিতের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

একদিন সত্রাজিৎ তোয়কূল নামক নদীতে নামিয়া সূর্যের উপাসনা করিতেছেন, এমন সময় সূর্য স্নেহবশত নিজেই তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্রাজিৎ সূর্যের সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল মূর্তি দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবন্, আকাশে আপনাকে যেমন উজ্জ্বল দেখি, এখনো তেমনি উজ্জ্বল দেখিতেছি। আপনি যে স্নেহ করিয়া আমার নিকট আসিলেন, তাহার দরুন তো আপনার রূপ কিছুমাত্র কোমল হয় নাই।"

সূর্য তখন একটু হাসিয়া নিজের কণ্ঠ হইতে একটি মণি খুলিয়া রাখিয়া দিলেন। তখন দেখা গেল যে তাঁহার মূর্তি অতি সুন্দর এবং স্নিগ্ধ।

সেই যে মণি, উহারই তেজে সূর্যকে এত উজ্জ্বল দেখা গিয়াছিল। সে মণির নাম স্যমন্তক। উহার এতই গুণ যে, যাহার গৃহে উহা থাকে, তাহার কোনো অসুখ বা অকল্যাণ হয় না। যে দেশে উহা থাকে তথা হইতে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি সকল উৎপাত দূর হইয়া যায়।

সেই মণিটি সত্রাজিতের বড়ই ভালো লাগিল, সুতরাং সূর্য যাইবার সময় তিনি তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিলেন, "হে প্রভু! আপনি তো আমাকে কতই স্নেহ করেন, দয়া করিয়া এই মণিটি আমাকে দিয়া যান।"

সে কথায় সূর্য তখনই তাঁহাকে মণিটি দিয়া গেলেন।

সেই মণি লইয়া সত্রাজিৎ যখন নিজের নগরে ফিরিলেন, তখন নগরে সমস্ত লোক নিতান্ত ব্যস্তভাবে "ঐ সূর্য যাইতেছেন!" "ঐ সূর্য যাইতেছেন!" বলিয়া তাঁহার পিছু-পিছু ছুটিল। সে আশ্চর্য মণি যে দেখে সেই অবাক হইয়া যায়। তাঁহার গুণের কথা যে শোনে, সেই ছুটিয়া তাহা দেখিতে আসে।

সে মণি পাইবার জন্য কৃষ্ণের খুবই ইচ্ছা হইয়াছিল, সত্রাজিৎ তাঁহাকে তাহা দেন নাই। কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে উহা সত্রাজিতের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার মতো মহৎ লোকে এমন কাজ কেন করিবেন?

সত্রাজিৎ সেই মণি তাঁহার ভাই প্রসেনকে দেন। প্রসেন প্রায়ই উহা পরিয়া চলাফেরা করিতেন। একদিন সেই মণি গলায় পরিয়া তিনি বনের ভিতর শিকার করিতে গিয়াছেন, এমন সময় ভয়ংকর এক সিংহ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সে ভীষণ সিংহের হাত হইতে আর তিনি রক্ষা পাইলেন না।

কিন্তু কি আশ্চর্য! সিংহ যে প্রসেনকে হত্যা করিল, সে তাঁহাকে খাইবার জন্য নহে, তাঁহার ঐ মণিটি পাইবার জন্য। সে তাঁহাকে মারিয়া মণিটি লইয়া চলিয়া গেল, তাঁহার দেহের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না।

যে বস্তুর প্রতি এক জন্তুর লোভ হয়, অন্য জন্তুরও তাহার প্রতি লোভ হইতে পারে! সিংহ সেই মণি লইয়া বেশিদূর যাইতে না যাইতেই পর্বতের গুহার ভিতর হইতে এক বিশাল ভল্লুক আসিয়া তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া মণিটি কাড়িয়া নিল।

প্রসেন যখন আর ঘরে ফিরিলেন না, তখন তাঁহার আত্মীয়েরা মনে করিল যে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ সেই মণির লোভে তাঁহাকে বধ করিয়াছেন, নহিলে এমন কাজ আর কে করিবে? পূর্ব হইতেই কৃষ্ণের ঐ মণির প্রতি লোভ ছিল, তাঁহারই এই কাজ!

বাস্তবিক এ বিষয়ে কৃষ্ণের কোনো অপরাধই ছিল না, কাজেই এই মিথ্যা অপবাদের কথা শুনিয়া, তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন। আর প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যেমন করিয়াই হউক, এই মণি আনিয়া দিতে হইবে।

প্রসেন যখন শিকারে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন, তখন সহজেই বুঝা যায় যে সেই শিকারের জায়গায় গিয়াই তাঁহাকে খুঁজিতে হইবে! কৃষ্ণ ও বলরাম কয়েকটি সাহসী, চতুর আর বিশ্বাসী লোক লইয়া চুপি চুপি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া প্রসেনের দেহ খুঁজিযা বাহির করিতে তাঁহাদের অধিক বিলম্ব হইল না। প্রসেনেব ঘোড়াটিও সেইখানে মরিয়া পড়িয়াছিল। দুটি দেহের চারিধারে সিংহের পায়ের দাগ, সিংহের নখ, দাঁতে দেহ দুটি ক্ষতবিক্ষত!

সেই সিংহের পদচিহ্ন ধরিয়া কিছুদূর গেলেই দেখা গেল যে উহার দেহও ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাকে যে ভল্লুকে মারিয়াছে পায়ের চিহ্ন দেখিয়া আর, সে বিষযে কোনো সন্দেহ রহিল না। এখন এই ভল্লুককে খুঁজিয়া বাহির কবিতে পাবিলেই হয়। তাঁহাবা অতি সাবধানে সেই ভল্লুকের পায়ের দাগ দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। সে দাগ ক্রমে একটা গুহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল, সেই গুহার ভিতরেই ভল্লুকেব বাড়ি।

এই কথার আরো প্রমাণ তখনই পাওয়া গেল। গুহার ভিতর হইতে একটি স্ত্রীলোকের গলার শব্দ আসিতেছে, একটি ছেলেরও কান্না শুনা যাইতেছে। স্ত্রীলোকটি ছেলেটিকে শান্ত করিবার জন্য বলিতেছে, "কাঁদিয়ো না বাছা! সিংহ প্রসেনকে মারিয়াছিল, তোমার পিতা সেই সিংহকে মারিয়া স্যমন্তক মণি আনিয়াছেন। এখন সেই মণি লইয়া তুমি খেলা করিবে, আর কাঁদিয়ো না।"

কাজেই আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন কৃষ্ণ, বলরাম আর সঙ্গের লোকদিগকে গুহার দরজায় রাখিয়া যেই একা ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি পর্বতপ্রমাণ এক বিশাল, বিকট ভল্লুক ভীষণ গর্জনে পাহাড় কাঁপাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তখন যে তাঁহাদের কি ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। একদিন, দুদিন করিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া গেল, তথাপি সে যুদ্ধের বিরাম নাই।

এদিকে কৃষ্ণের বিলম্ব দেখিয়া আর ভল্লুকের ভয়ংকর গর্জন শুনিয়া, বলরাম আর সঙ্গের লোকেরা দ্বারকায় আসিয়া সকলকে বলিয়াছেন যে কৃষ্ণ আর নাই, তাঁহাকে ভল্লুকে খাইয়াছে।

একুশ দিনের পর সেই যুদ্ধ শেষ হইল। একুশ দিন যুদ্ধ করিয়া ভল্লুক বুঝিতে পারিল যে কৃষ্ণের নিকট হার মানা ভিন্ন আর উপায় নাই। তখন সে অশেষ অনুনয়ের সহিত তাঁহার

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তারপর সে যেই জানিল যে তিনি এই মণির জন্য আসিয়াছেন, অমনি মণি তো তাঁহাকে দিলই সঙ্গে সঙ্গে নিজের কন্যাটিও দান করিল।

কৃষ্ণ সেই মণি আর কন্যা লইয়া মনের সুখে দ্বারকায় চলিয়া আসিলেন। দ্বারকার লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া কি বলিল, তাহা আমি জানি না, তবে সত্রাজিৎ যে মণি পাইয়া খুবই খুশি হইয়াছিলেন, এ কথা নিশ্চয় বলিতে পারি।

সেই ভল্লুকটি যে সে ভল্লুক ছিল না। সে সেই জাম্ববান্, রামায়ণে যাহার কথা তোমরা পড়িয়া নিশ্চয়ই খুব সন্তুষ্ট হইয়াছ। আর তাহার মেয়েটির নাম ছিল জাম্ববতী। সেও কি ভল্লুক ছিল?

কুবলয়াশ্ব

পূর্বকালে শত্রুজিৎ নামে অতি বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ঋতধ্বজ। ঋতধ্বজের গুণের কথা আর কি বলিব। যেমন রূপ, তেমনি বুদ্ধি, তেমনি বিনয়, তেমনি বল, তেমনি বিক্রম। এমন পুত্রলাভ করিয়া রাজা শত্রুজিৎ খুবই খুশি হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ইহার মধ্যে একদিন গালব নামে এক মুনি একটি সুন্দর ঘোড়া লইয়া রাজা শত্রুজিতের নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি বিপদে পড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। একটা দুষ্ট দৈত্য আমাকে বড়ই ক্লেশ দিতেছে। সে কখনো সিংহ, কখনো বাঘ, কখনো হাতি, কখনো আর কোনো জন্তুর বেশে আসিয়া দিবারাত্র আমাকে অস্থির রাখে, উহার জ্বালায় আমার তপস্যাই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আমি ইচ্ছা করিলে শাপ দিয়া উহাকে বধ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তপস্যার হানি হয়, কাজেই আর কি করিব, শুধু নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। এমন সময় একদিন এই ঘোড়াটি আকাশ হইতে আমার নিকট পড়িল, আর দৈববাণী হইল, 'গালব! এই ঘোড়াটির নাম কুবলয়। ইহার কিছুতেই ক্লান্তি নাই, সংসারে ইহার অগম্য স্থান নাই, ইহাকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। রাজা শত্রুজিতের পুত্র ঋতধ্বজ ইহাতে চড়িয়া তোমার শত্রু সেই দুষ্ট দানবকে বধ করিয়া কুবলয়াশ্ব নামে বিখ্যাত হইবে।'

"মহারাজ তাই আমি এই ঘোড়াটি লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার পুত্র যদি ইহাতে চড়িয়া দানবটাকে তাড়াইয়া দেন, তবেই এ ব্রাহ্মণের তপস্যা হয়।"

রাজার আজ্ঞায় তখনই ঋতধ্বজ সেই আশ্চর্য ঘোড়ায় চড়িয়া মুনির সঙ্গে তাঁহার আশ্রমে আসিলেন। তারপর মুনিরা সকলে তাঁহাদের সন্ধ্যাবন্দনা আরম্ভ করিতে না করিতেই সেই দুষ্ট দানব শূকর সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মুনির শিষ্যেরা তাহাকে দেখিয়া প্রাণপণে চ্যাচাইতে লাগিল। রাজপুত্র তখনই সেই ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে তাড়া করিলেন। তাঁহার হাতের অর্ধচন্দ্র বাণের বিষম খোঁচা খাইয়া আর কি দুষ্ট দানব সেখানে দাঁড়ায়? সে প্রাণের মায়ায় কোন পথে পলায়ন করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। পাহাড়ে, বনে, শূন্যে, সাগরে, যেখানে যায়, রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া, ধনুর্বাণ হাতে সেইখানেই গিয়া উপস্থিত হন। এইভাবে চারি হাজার ক্রোশ চলিয়া শেষে সে একটা গর্তের ভিতরে লাফাইয়া পড়িল। রাজপুত্রও

তাহার সঙ্গে সঙ্গেই গর্তে গিয়া ঢুকিলেন বটে, কিন্তু সেখানকার সেই ঘোর অন্ধকারের ভিতরে আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

রাজপুত্র সেই গর্তের পথে দানবকে খুঁজিতে খুঁজিতে একেবারে পাতালে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আর অন্ধকার নাই, সেখানে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় অতি অপরূপ সোনার পুরী। রাজপুত্র তাহারা ভিতরে কতই খুঁজিলেন কিন্তু দানবকে পাইলেন না। মানুষও সেখানে কেহই ছিল না। ছিল কেবল দুটি মেয়ে। তাহার একটি যে কি সুন্দর, সে আর বুঝাইবার উপায়ই নাই।

এই কন্যার নাম মদালসা, ইঁহার বৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বাবসু, তিনি গন্ধর্বের রাজা। একদিন মদালসা তাঁহার পিতার বাগানে খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হইয়া গেল। সে অন্ধকার আর কিছুই নহে, উহা পাতালকেতু নামক দুষ্ট দানবের মায়া। দুরাত্মা সেই অন্ধকারের ভিতর সেই অসহায়া বালিকাকে লইয়া পলায়ন করিল, কেহ সে কথা জানিতে পারিল না। তাঁহার আর্তনাদও কেহ শুনিতে পাইল না।

তদবধি সেই দুষ্ট তাঁহাকে পাতালে আনিয়া নিজ বাড়িতে আটকাইয়া রাখিয়াছে, বলিয়াছে যে, ভালো দিন পাইলেই তাঁহাকে বিবাহ করিবে।

ইহার মধ্যে একদিন মদালসা মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিতে যান, তখন সুরভি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, "বাছা, তোমার কোনো ভয় নাই, এই দুষ্ট দানব তোমাকে বিবাহ করিতে পাইবে না! ইহার মৃত্যু যাঁহার হাতে হইবে, তিনিই অবিলম্বে তোমাকে বিবাহ করিবেন।"

রাজপুত্র মদালসার সঙ্গের মেয়েটির নিকট এ সকল সংবাদ শুনিতে পাইলেন। মেয়েটির নাম কুণ্ডলা! তিনি একজন তপস্বিনী এবং মদালসার সখী। কুণ্ডলা আরো বলিলেন যে, সেদিন পাতালকেতু শূকর সাজিয়া মুনিদের আশ্রম নষ্ট করিতে গিযাছিল, সেখান হইতে এইমাত্র এক রাজপুত্রের হাতে সাংঘাতিক বাণের খোঁচা খাইয়া আসিয়াছে।

তখন আর ঋতধ্বজের বুঝিতে বাকি রহিল না যে তিনিই সেই রাজপুত্র, আর পাতালকেতুই তাঁহার সেই দানব।

সে কথা শুনিয়া মেয়ে দুটির যে আনন্দ হইল!

রাজপুত্রকে দেখিয়াই মদালসার যারপরনাই ভালো লাগিয়াছিল আর সেজন্য তাঁহার মনে দুঃখও হইয়াছিল যতদূর হইতে হয়। কেননা, ইঁহাকে তো আর পাওয়ার কোনো আশাই নাই, যেহেতু সুরভি বলিয়াছেন, 'যে দানব মারিবে, সেই মদালসাকে বিবাহ করিবে' তাঁহার কথা বৃথা হইবার নহে।

যাহা হউক, এখন সে ভয় কাটিয়া গেল, সুতরাং দুঃখের জায়গায় আনন্দ হইল চতুর্গুণ! তবে আর বিলম্ব কেন? তখনই পুরোহিত তম্বুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে পবিত্র আগুন জ্বলিল, ঘৃতের আহুতি পড়িল, মন্ত্রের ধ্বনি উঠিল, শুভকার্য শেষ হইল।

তারপর কুণ্ডলা আবার তপস্যা করিতে গেলেন। রাজপুত্র মদালসা সহ সেই আশ্চর্য ঘোড়ায় চড়িয়া দেশে ফিরিবার আয়োজন করিলেন। অমনি পাতাল কাঁপাইয়া ভীষণ চিৎকার উঠিল, 'নিয়া গেল রে, নিয়া গেল! শীঘ্র আয়, শীঘ্র আয় তোরা!'

তাহার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার দানব কোথা হইতে খাঁড়া ঢাল গদা শূল হাতে আসিয়া

'মার, মার!' শব্দে ঋতধ্বজকে আক্রমণ করিল।

ঋতধ্বজ তখন করিলেন কি, তাঁহার তূণ হইতে ত্বাষ্ট্র নামক অস্ত্রখানি লইয়া, মারিলেন তাহা সেই দানবের ভেঙ্‌চির ভিড়ের উপর ছুঁড়িয়া। অমনি দানবের দল চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে পলকের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, রাজপুত্রও মনের সুখে মদালসাকে লইয়া দেশে চলিয়া আসিলেন। তখন সেখানে না জানি কেমন বাজি, বাদ্য আর ভোজের ঘটা হইল! না জানি সকলে কতদিন ধরিয়া কত কি খাইল!

ইহার পর হইতে ঋতধ্বজের নাম হইল কুবলয়াশ্ব। এখন তিনি রাজার আজ্ঞায় প্রতিদিনই সেই ঘোড়ায় চড়িয়া মুনিদের আশ্রম হইতে দানব তাড়াইয়া বেড়ান। ইহাদের মধ্যে হইয়াছে কি, সেই পাতালকেতুর ভাই ছিল তালকেতু, সে বেটা দিব্য একটি শুদ্ধ শান্ত মুনি সাজিয়া, যমুনার ধারে আশ্রম করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়ায় থাকে, যেন সে ভারি একটা তপস্বী!

কুবলয়াশ্ব ঘোড়ায় চড়িয়া সেই পথে যাইতেছেন, এমন সময় সে চোখ মিট্ মিট্ করিতে করিতে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "রাজপুত্র! আমার একটা যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু দক্ষিণা দিবার পয়সা নাই। আপনি যদি দয়া করিয়া আপনার গলার ঐ হারখানি আমাকে দেন, তবে আমার সাধ পূর্ণ হয়।"

রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ গলার হার তাহাকে দিলেন। তখন সে আবার বলিল, "আপনার জয় হোক! এখন তবে আর একটি কাজ যদি করেন, আমি জলের ভিতরে থাকিয়া বরুণের স্তব করিতে যাইব, ততক্ষণ আমার আশ্রমটির উপর একটু চোখ রাখিবেন।"

রাজপুত্র তাহাতেই সম্মত হইলেন। তালকেতুও চলিয়া গেল। কিন্তু সে তো তপস্যা করিতে গেল না, সে সোজাসুজি কুবলয়াশ্বের বাড়িতে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হায়, হায়! ওগো! সর্বনাশ হইয়াছে! রাজপুত্রকে দানবে মারিয়াছে। মৃত্যুর সময়ে তিনি এই হার আমার হাতে দিয়া বাড়িতে সংবাদ দিতে বলিয়াছেন!"

কুবলয়াশ্বের হার দেখিয়া আর কাহারও এ কথায় অবিশ্বাস করিবার উপায় রহিল না। তখন দেশময় হাহাকার পড়িয়া গেল; সে দারুণ সংবাদ সহিতে না পারিয়া মদালসা প্রাণত্যাগ করিলেন।

ততক্ষণে সেই দুষ্ট তালকেতু আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কুবলয়াশ্বকে বলিল, "আহা! আপনি আমার বড়ই উপকার করিলেন। আপনি এখানে থাকায় আমি প্রাণ ভরিয়া যজ্ঞ করিয়াছি! এখন তবে আপনি ঘরে ফিরিয়া যাউন।"

এ কথায় রাজপুত্র তথা হইতে চলিয়া আসিলে, দুষ্ট ঘরে বসিয়া হো হো শব্দে হাসিতে লাগিল।

কুবলয়াশ্ব সেই মুনিবেশধারী দুষ্ট দানবের আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিলে সকলে কিরূপ আশ্চর্য আর আহ্লাদিত হইল, তাহা বুঝিতেই পার। কিন্তু মদালসার মৃত্যুর কথা শুনিয়া কুবলয়াশ্বের প্রাণে বড়ই কষ্ট হইল। তিনি সেই দুঃখ ভুলিবার জন্য বন্ধুদিগের সহিত মিশিয়া নানারূপ আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে নাগরাজ অশ্বতরের দুইটি পুত্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিতে আসিতেন। ইঁহাদের কথাবার্তা তাঁহার বড় ভালো লাগিত। এইরূপে তাঁহাদের সহিত কুবলয়াশ্বের এমনি বন্ধুত্ব হইয়া গেল যে পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে আর তাঁহাদের

কিছুতেই ভালো লাগিত না। নাগপুত্রেরা সমস্ত দিন কুবলয়াশ্বের নিকটে কাটাইয়া রাত্রে গৃহে যাইতে বড়ই কষ্ট বোধ করিতেন, আর কোনোপ্রকারে রাত্রিটি কাটাইয়া প্রভাত হইবামাত্রই পুনরায় কুবলয়াশ্বের নিকট চলিয়া আসিতেন।

একদিন নাগরাজ অশ্বতর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, এখন তো আর তোমাদিগকে দিনের বেলায় পাতালে দেখিতে পাই না, রাত্রিটি কোনোমতে এখানে কাটাইয়া, প্রভাত হইতেই তোমার পৃথিবীতে চলিয়া যাও। ঐ স্থানটার প্রতি তোমাদের এত অনুরাগ কেমন করিয়া হইল?"

নাগপুত্রেরা বলিলেন, "বাবা, আমরা মহারাজ শত্রুজিতের পুত্র ঋতধবজকে বড়ই ভালোবাসি; তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে আমাদের নিতান্ত কষ্ট হয়। তাই প্রভাতে উঠিয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট চলিয়া যাই। বাবা, এমন সুন্দর, এমন সরল, এমন ধার্মিক, এমন মিষ্টভাষী লোক আর এ জগতে নাই!"

এ কথায় নাগরাজ বলিলেন, "বাছা, এমন মহৎ লোকের সহিত তোমাদের বন্ধুত্ব হইয়াছে, আর তাঁহার নিকটে তোমরা এত সুখ পাইতেছ, তোমরা তাঁহার সুখের জন্য কি কিছু করিয়াছ?"

নাগপুত্রেরা বলিলেন, "বাবা, তাঁহার তো কোনো বস্তুরই অভাব নাই; এমন মহৎ লোকের যোগ্য কি আছে, যাহা দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিতে পারি? তাঁহার কোনো কষ্ট দূর করিতে পারিলে আমরা নিশ্চয় করিতাম। তাঁহার স্ত্রী মদালসার মৃত্যুই তাঁহার একমাত্র কষ্টের কারণ। সেই মদালসাকে আমরা কোথা হইতে আনিয়া দিব?"

কিন্তু, এ কাজটি যতই কঠিন হউক না কেন, ইহা যে একেবারেই অসাধ্য, নাগরাজ তাহা মনে করিলেন না। তিনি অবিলম্বে হিমালয় পর্বতের প্লক্ষাবতরণ নামক তীর্থে গিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সে তপস্যা এমনই চমৎকার হইয়াছিল, আর তখন যে নাগরাজ সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলেন, তাহা সরস্বতীর এত ভালো লাগিয়াছিল যে, তিনি আর সেখানে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না!

সরস্বতী আসিয়া বলিলেন, "হে অশ্বতর! আমি তোমাকে বর দান করিব; বল তোমার কি লইতে ইচ্ছা হয়।"

অশ্বতর অমনি করজোড়ে বলিলেন, "মা, যদি কৃপা হইয়া থাকে, তবে আমাকে আর আমার ভাই কম্বলকে সংগীতে অসাধারণ পণ্ডিত করিয়া দিন!"

একথায় সরস্বতী 'তথাস্তু' বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলে অশ্বতর আর কম্বল দুভাই তৎক্ষণাৎ সংগীত শক্তি লাভ করত অপরূপ তান লয় সহকারে বীণা বাজাইয়া মহাদেবের স্তবগান আরম্ভ করিলেন। অনেকদিন এইরূপ সংগীত আর স্তবের পর, মহাদেবকেও তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর দিতে আসিতে হইল। তখন দুই ভাই তাঁহার পদতলে পড়িয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, "কুবলয়াশ্বের স্ত্রী মদালসা যেমন বয়সে, যেমন বেশে, যেমন শরীরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, অবিকল সেই মূর্তিতে, পূর্বজন্মের সকল কথা স্মরণে রাখিয়া, পুনরায় অশ্বতরের গৃহে জন্মলাভ করুন।"

মহাদেব কহিলেন, "তাহাই হউক! অশ্বতর শ্রাদ্ধ করিতে বসিলে তাঁহার মধ্যম ফণা হইতে মদালসা অবিকল তাঁহার পূর্বের শরীর লইয়া বাহির হইবেন।"

কি আনন্দের কথা হইল! ইহার পর দুই ভাই পাতালে চলিয়া আসিতে আর তিলমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। সেখানে আসিয়া অশ্বতর একটি নির্জন স্থানে চুপিচুপি শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, মহাদেবের কথামতো মদালসা, তাঁহার মধ্যম ফণা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অবিকল সেই মদালসা কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, যেন দুদিনের জন্য কুবলয়াশ্বের নিকট হইতে পাতালে বেড়াইতে আসিয়াছেন। এ ব্যাপারে কেবল অশ্বতরই উপস্থিত ছিলেন, আর কেহ ইহা দেখিলও না, এ বিষয়ে কোনো কথা জানিতেও পারিল না।

তখন নাগরাজ কয়েকটি বুদ্ধিমতী, মিষ্টভাষিণী সখী সঙ্গে দিয়া মদালসাকে একটি সুন্দর ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন।

তারপর সন্ধ্যাকালে নাগপুত্রেরা দুভাই কুবলয়াশ্বের নিকট হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারাও অবশ্য এ ব্যাপারের কিছুই জানেন না। নাগরাজ অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিনও তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ, সেই রাজপুত্রকে একদিন আমার নিকট আনিলে না?"

এ কথায় কুবলয়াশ্ব সম্মত হইলে তিনজনে মিলিয়া তখনই পাতালে যাত্রা করিলেন। কুবলয়াশ্ব কিন্তু জানেন না যে তাহাকে পাতালে যাইতে হইবে বা তাঁহার বন্ধুগণ নাগপুত্র। তিনি জানেন, উঁহারা ব্রাহ্মণকুমার। গোমতী নদীতে আসিয়া নাগপুত্রেরা তাহার জলে নামিতে গেলেন; কুবলয়াশ্ব ভাবিলেন, গোমতীর পরপারে ব্রাহ্মণকুমারদের বাড়ি। এমন সময় নাগপুত্রেরা হঠাৎ তাঁহাকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে কুবলয়াশ্ব ভয় পাইলেন না, কেননা, সে স্থান তাঁহার দেখিতে বাকি নাই। যাহা হউক, সেবারে তিনি দানবের বাড়িই দেখিয়াছিলেন, এবারে সাপের দেশটিও তাঁহার নিকট যারপরনাই আশ্চর্য এবং সুন্দর বোধ হইল। তাঁহার বন্ধুদ্বয়ও ততক্ষণে ব্রাহ্মণের বেশ ছাড়িয়া নিজের রূপ ধারণ করিয়াছেন। সে রূপ যে ঠিক কি প্রকার, তাহা আমি বলিতে পারি না। সে-সকল সাপের ফণার কথা লেখা আছে, স্বস্তিক চিহ্ন[১] এবং মণিরও উল্লেখ দেখা যায়। অথচ মানুষের মতো তাহাদের হাত পা, বেশভূষা, কানে কুণ্ডল, গলায় হার!

যাহা হউক, নাগপুত্রেরা কুবলয়াশ্বকে অবিলম্বেই তাঁহাদের পিতার নিকট নিয়া উপস্থিত করিলেন, সেখানে সেরূপ অবস্থায় যেমন কথাবার্তা, প্রণাম, আশীর্বাদাদির প্রথা আছে, সকলই হইয়া গেল। এত পথ চলিয়া আসাতে সকলই ক্লান্ত, সুতরাং অতঃপর স্নানাহারপূর্বক সুস্থ হওয়া প্রথম কাজ!

আহারান্তে বিশ্রামের পর, নাগরাজ আর কুবলয়াশ্বের অনেক কথাবার্তা হইল।

শেষে নাগরাজ বলিলেন, "বাছা, তুমি আমার পুত্রগণের বন্ধু, সুতরাং আমার পুত্রেরই তুল্য। আমারও তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহ হইয়াছে। আমার বড় ইচ্ছা হয় যে, আমার পুত্রেরা যেমন আমার নিকট যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লয়, তুমিও সেইরূপ কিছু চাহিয়া লও।"

কুবলয়াশ্ব বলিলেন, "আপনার আশীর্বাদে আমার কোনো বস্তুরই অভাব নাই, সুতরাং আমি কি চাহিব? আমি যে আপনাকে দেখিলাম, আপনার পায়ের ধুলা পাইলাম, ইহার উপর আর আমার কিছুই চাহিবার নাই।"

অশ্বতর কহিলেন, "বাবা, তোমার মনে কি কোনো কষ্ট আছে? তাহার কথাই না হয়

১ সাপের ফণায় যে চক্র থাকে।

আমাকে বল, আমি সাধ্য মতো তাহা নিবারণের চেষ্টা করিব।"

এ কথায় নাগপুত্রেরা বলিলেন, "মদালসার মৃত্যুতে ইঁহার বড়ই কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহা তো আর দূর হইবার নহে!"

অশ্বতর বলিলেন, "অবশ্য মরা মানুষকে আর কি করিয়া বাঁচানো যাইবে? তবে মন্ত্রবলে তাহারও মায়ামূর্তি আনিয়া দেখাইতে পারি।"

ইহা শুনিয়া কুবলয়াশ্ব নিতান্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন, "যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে দয়া করিয়া একবার তাহাই দেখান।"

অশ্বতর বলিলেন, "এই কথা? আচ্ছা, তবে দেখাইতেছি। কিন্তু মনে রাখিও, ইহা মায়া!"

তারপর অশ্বতর খুব গম্ভীরভাবে বসিয়া বিড়বিড় করিতে লাগিলেন, যেন কতই মন্ত্রতন্ত্র আওড়াইতেছেন। ততক্ষণে তাহার ইঙ্গিত অনুসারে মদালসাকে সেখানে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সকলে ভাবিল, মন্ত্রের কি জোর! কুবলয়াশ্বও জানেন, উহা মন্ত্রেরই কাজ, মায়ার মূর্তি। তথাপি তাঁহার এত আনন্দ হইল যে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

তারপর যখন অশ্বতর বলিলেন যে, উহা মায়া নহে বাস্তবিকই মদালসা, তখন না জানি ব্যাপারখানা কিরূপ হইয়াছিল!

কুবলয়াশ্ব পাতালেই মদালসাকে পাইয়াছিলেন, এখন সেই পাতালেই তাহাকে আবার পাইয়া মহানন্দে তাহাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। সেখানে অবশ্য ইহা লইয়া খুবই আনন্দ আর উৎসবাদি হইল।

ধ্রুব

সে যে কত কালের কথা, তাহা আমি জানি না। সেই অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। উত্তানপাদের দুই রাণী ছিলেন, একটির নাম সুনীতি, আর একটির নাম সুরুচি।

সুনীতি বড় লক্ষ্মী মেয়ে ছিলেন, কিন্তু সুরুচি ছিলেন ঠিক তাহার উলটা। আব সুনীতিকে তিনি প্রাণ ভরিয়া হিংসা করিতেন। রাজা সেই সুরুচিকে এতই ভালোবাসিতেন, যে তাঁহার কথা না রাখিয়া থাকিতে পারিতেন না। সুরুচি তাঁহার নিকট সুনীতির নামে কত মিথ্যা কথাই বলিতেন, তিনি ভাবিতেন, তাহার সকলই বুঝি সত্য। শেষে রাজা একদিন সুরুচির কথায় সুনীতিকে রাজপুরী হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

দুঃখিনী সুনীতি তখন আর কি করেন? মুনিদের তপোবনে গিয়া আশ্রয় লওয়া ভিন্ন তাঁহার আর উপায় রহিল না। সেইখানে কয়েকদিন পরেই তাঁহার একটি খোকা হইল, তাহার নাম হইল ধ্রুব। তখন হইতে ধ্রুবকে লইয়া তিনি মুনিদের আশ্রমেই থাকেন। খোকাটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল। সে মুনিকুমারদের সঙ্গে খেলা করে, মুনিদের হোম তপস্যা দেখে আর তাঁহাদের মুখে ভগবানের নাম শুনে। এইরূপে শিশুকালেই তাহার প্রাণে ভগবানের প্রতি ভক্তি জন্মিল।

এমনি করিয়া দিন যায়। ক্রমে ধ্রুবের বয়স চারি-পাঁচ বৎসর হইয়াছে। ইহার মধ্যে সে

একদিন শুনিল যে সে রাজার পুত্র, মহারাজ উত্তানপাদ তাহার পিতা। এ কথা শুনিবামাত্র পিতাকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। সে ভাবিল আমি এখনই পিতাকে দেখিতে যাইব।'

রাজা উত্তানপাদ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সুরুচি তাঁহার নিকটেই দাঁড়াইয়া, সুরুচির পুত্র উত্তম রাজার কোলে। এমন সময় ধ্রুব সেখানে আসিয়া তাঁহার কোলে উঠিবার জন্য তাহার ছোট হাত দুখানি বাড়াইয়া দিল। রাজার হয়তো তাহাকে কোলে লইতেন খুবই ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সুরুচির বিষম ভ্রূকুটি করিয়া নিতান্ত কর্কশভাবে ধ্রুবকে বলিলেন, "ছেলের আস্পর্ধা দেখ। এত কষ্ট কেন করিতেছিস্ বাছা? জানিস না কি যে তুই সুনীতির ছেলে? উনি তোর পিতা হইলে কি হয়? আমি তো তোর মা নই। রাজাসনে বসা তোর কপালে নাই, সে শুধু আমার ছেলেরই জন্য।" ধ্রুবের প্রাণে এই নিষ্ঠুর কথাগুলি বড়ই লাগিল। সে আর এক মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব না করিয়া, ঠোঁট দুখানি ফুলাইয়া মার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মা তাহার কাঁদ কাঁদ মুখ আর ছল ছল চোখ দুটি দেখিবামাত্র তাহাকে কোলে লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে বাবা? কেহ কি তোমাকে কিছু বলিয়াছে?"

ধ্রুব কহিল, "মা আমি বাবার কোলে উঠিতে গিয়াছিলাম, সৎমা বলিলেন, আমি তোমার ছেলে বলিয়া নাকি তাঁহার কোলে উঠিতে পাইব না; আমার নাকি কপালে নাই।"

ধ্রুব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এই কথাগুলি বলিল; তাহা শুনিয়া সুনীতির যে কি কষ্ট হইল তাহা লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই। তিনি কোনো মতে চোখের জল থামাইয়া ধ্রুবকে বলিলেন, "বাবা, সুরুচি সত্যই বলিয়াছে। তোমার কপাল মন্দ, তাই তুমি আমার মতো অভাগিনীর পুত্র হইয়াছ। তোমার কপাল ভালো হইলে কেহ তোমাকে এমন কথা বলিতে পারিত না। রাজার আসনে বসা, ভালো ভালো হাতি ঘোড়ায় চড়া, এ সকল যাহার পুণ্য আছে তাহার ভাগ্যেই জোটে। সুরুচির ছেলে উত্তম অন্যজন্মে অনেক পুণ্য করিয়াছিল, তাই এখন সে রাজার কোলে বসিতে পায়। তুমি কর নাই তাই তুমি তাঁহার কোলে বসিতে পাইলে না। সুরুচির কথায় যদি তোমার দুঃখ হইয়া থাকে, তবে যাহাতে তোমার খুব পুণ্য হয় সেইরূপ কাজ কর, তাহা হইলেই তোমার কপাল ভালো হইয়া যাইবে।"

ধ্রুব কহিল, "মা আমার মনে যে বড়ই লাগিয়াছে তোমার কথায় তো আমার দুঃখ যাইতেছে না। আমি এমন কাজ করিব যাহাতে সকলের চেয়ে যে ভালো তাহার চেয়েও ভালো স্থান পাইতে পারি। তোমার ছেলে যে আমি, আমার তেজ তুমি দেখ। বাবার যাহা আছে সবই উত্তমের হউক, অন্যের দেওয়া আমি কিছু চাহি না। আমি নিজে এমন জায়গা দেখিয়া লইব যে বাবাও তাহা পান নাই।"

এই বলিয়াই ধ্রুব ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তারপর একমনে পথ চলিতে চলিতে সে বনের ভিতরে একস্থানে আসিয়া দেখিল যে সেখানে সাতজন মুনি কুশাসনে বসিয়া আছেন। সে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, আমার মার নাম সুনীতি। আমি মনে বড় কষ্ট পাইয়া আপনাদের নিকটে আসিয়াছি" মুনিগণ বলিলেন, "বাছা, তুমি চারি-পাঁচ বৎসরের বালক, তোমার মনে আবার কি কষ্ট হইল।" ধ্রুব কহিল, "আমার বিমাতা আমাকে কটু কথা কহিয়াছেন, তাই আমার মনে কষ্ট হইয়াছে।"

ধ্রুবের নিকট সকল কথা শুনিয়া মুনিরা বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাছা, এখন তুমি কি চাহ? আমরা তোমার কি সাহায্য করিতে পারি?" ধ্রুব কহিল, "আমি সেই স্থান পাইতে চাহি, যাহা অন্য কেহ পায় নাই। সে স্থান কি করিয়া পাইব আপনারা তাহা আমাকে বলিয়া দিন।" মুনিগণ বলিলেন, "যিনি সকলের বড়, যাহা কিছু আছে সকলই যাঁহার, তুমি সেই হরিকে ডাক, তাহা হইলেই তুমি সে স্থান পাইবে।"

ধ্রুব কহিল, "কি করিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি খুশি হইবেন তাহা তো আমি জানি না, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।" মুনিরা বলিলেন, "আর কিছুরই কথা ভাবিবে না, কেবল তাঁহারই কথা ভাবিবে, আর শুধু বলিবে, 'তুমি সকলের, তোমাকে কেহ জানিতে পারে না, তুমি সকলই জান, তোমাকে নমস্কার।' ইহাতেই তিনি তুষ্ট হইবেন। তোমার পিতামহ মনু এইরূপেই তাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছিলেন।"

তখন ধ্রুব সেই মুনিদিগকে প্রণাম করিয়া মনের আনন্দে সেখান হইতে যমুনার তীরে মধুবন নামক বনে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া সে দিনরাত একমনে এমনি ব্যাকুলভাবে হরিনাম করিতে লাগিল যে, আর কেহ কখনো তেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারে নাই। সেই আশ্চর্য তপস্যা দেখিয়া দেবতারা ভয় পাইলেন, পৃথিবী কাঁপিল, সাগর উছলিয়া উঠিল।

ইন্দ্র ভাবিলেন, না জানি এই বালক এমন তপস্যা করিয়া কি বিপদ ঘটাইবে। তখন তিনি আর কতগুলি দেবতার সহিত মিলিয়া ধ্রুবের তপস্যা ভাঙ্গিবার আয়োজন করিলেন। একজন দেবতা সুনীতির বেশে, 'হায় বাছা' 'হায় বাছা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া ধ্রুবকে বলিল, "বাবা, কত আশা করিয়া তোমাকে পাইয়াছি। দুঃখিনীর ধন, আমার যে বাছা আর কেহ নাই, আমাকে কি এমন করিয়া ফেলিয়া আসিতে হয়? তুমি যদি তপস্যা না ছাড়, তবে আমি তোমার সম্মুখেই মরিয়া যাইব।"

কিন্তু ধ্রুবের মন তখন হরির ধ্যানেই মজিয়াছিল সে সকল কপট কান্না শুনিয়াও শুনিল না। তখন সেই দুষ্ট দেবতা "বাবা গো! কি ভয়ানক রাক্ষস আসিয়াছে। পালাও পালাও," বলিতে বলিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অমনি কোথা হইতে ভীষণ রাক্ষসগণ দলে দলে মার্-মার্ কাট-কাট শব্দে ধ্রুবকে খাইতে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে শত শত শিয়াল ডাকিয়া উঠিল। রাক্ষসেরাও তাহাদের সিংহের মতো, উটের মতো, কুমিরের মতো মুখ দিয়া আগুন ফুঁকিতে ফুঁকিতে কতই গর্জন করিল, শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর কতই ঘুরাইল, আর দাঁত খিঁচাইল! ধ্রুব তাহা টেরও পাইল না।

এইরূপে যখন ধ্রুবের তপস্যা ভাঙ্গিবার সকল চেষ্টাই বিফল হইল, তখন দেবতারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীহরির নিকটে আসিয়া বলিলেন, "হে প্রভু, আমাদিগকে রক্ষা করুন। উত্তানপাদের পুত্র অতি ভীষণ তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে, না জানি আমাদের কাহার কাজটি কাড়িয়া নিবে। শীঘ্র উহার তপস্যা থামাইয়া দিন।"

শ্রীহরি বলিলেন, "তোমাদের কোনো ভয় নাই। ধ্রুব কি চাহে, আমি তাহা জানি। তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া আমি তাহার তপস্যা শেষ করিয়া দিতেছি।" তারপর তিনি সেই মধুবন আলো করিয়া ধ্রুবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ধ্রুব! তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিয়াছি; তুমি কি চাহ?" তখন ধ্রুব চক্ষু মেলিয়া

সেই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতাকে সম্মুখে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইল, ভয়ও পাইল। সে অমনি তাঁহার পায়ে লুটাইয়া বলিল, "আমি তো জানি না, কি করিয়া আপনার স্তব করিতে হয়;আমাকে তাহা শিখাইয়া দিন।" বলিতে বলিতে শ্রীহরির কৃপায় তাহার জ্ঞান হইল। তখন সে প্রাণ ভরিয়া অতি মধুর বাক্যে শ্রীহরির স্তব করিতে করিতে বলিল, "বিমাতা আমাকে ধমকাইয়া বলিয়াছেন, যে তাঁহার পুত্র নহি বলিয়া আমি রাজাসনে বসিতে পাইব না। হে প্রভু, আমি আপনার নিকট এমন স্থান চাই যে তাহা সংসারের সকল স্থানের চেয়ে ভালো।" শ্রীহরি বলিলেন, "ধ্রুব, তুমি তাহাই পাইবে। চন্দ্র, সূর্য, বুধ, বৃহস্পতি সকলের উপরে তোমার স্থান হইল। তোমার মাতাও তারা হইয়া তোমার নিকটে থাকিবেন।"

সেই অবধি শ্রীহরির বরে ধ্রুব আকাশে ধ্রুবতারা হইয়া সংসারচক্র ঘুরাইতেছে এইরূপ আমাদের পুরাণে লেখা।

বিষ্ণুর অবতার

পুরাণে আছে যে, বিষ্ণু সময় সময় নানারূপ জন্তু ও মানুষের রূপ ধরিয়া অনেক আশ্চর্য কান্ড করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর এইসকল রূপ ধারণকে তাঁহার এক একটি 'অবতার' বলা হয়।

এই যে সৃষ্টি তাহার জীবন নাকি এক কল্প কাল। এক এক কল্প পরে 'প্রলয়' অর্থাৎ সৃষ্টিনাশ হইয়া আবার নাকি নূতন সৃষ্টি হয়। এখনকার এই জগতের সৃষ্টি হইবার পূর্বে আর এক জগতের প্রলয় হইয়াছিল। বিষ্ণু তাহার পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রলয়ের কাল উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি একটি খুব ছোট মাছের রূপ ধরিয়া কৃতমালা নামক নদীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সূর্যের পুত্র বৈবস্বত মনু সেই নদীর নিকটে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। একদিন মনু কৃতমালার জলে নামিয়া তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখিলেন যে একটি নিতান্ত ছোট মাছ তর্পণের জলের সঙ্গে তাঁহার অঞ্জলির ভিতর উঠিয়াছে।

সেই মাছটিই ছিলেন বিষ্ণু, কিন্তু মনু তাহা জানিতেন না। তিনি মাছটিকে জলে ফেলিয়া দিতে যাইবেন, এমন সময় সে তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলিল, "আমাকে জলে ফেলিবেন না। বড় মাছেরা আমাকে খাইয়া ফেলিবে।" এ কথায় মনু তাহাকে তাঁহার ঘরে আনিয়া কলসীর ভিতরে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু সে মাছ এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে লাগিল যে দেখিতে দেখিতে আর সে সেই কলসীতে ধরে না। কলসী হইতে চৌবাচ্চায় রাখিলেন, খানিক পরেই আর সে তাহাতেও ধরে না; চৌবাচ্চা হইতে পুকুরে রাখিলেন, শেষে তাহাতেও ধরে না, সেখান হইতে হ্রদে রাখিলেন, ক্রমে তাহাও তাহার পক্ষে ছোট হইয়া গেল।

তখন মনু তাহাকে কাঁধে করিয়া সমুদ্রের জলে ফেলিবামাত্র সে লক্ষ যোজন বড় হইয়া যাওয়ায়, তিনি যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "ভগবন্, আপনি কে? আপনি নিশ্চয় স্বয়ং বিষ্ণু! আপনাকে নমস্কার।" মাছ বলিল, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের নিমিত্ত মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছি। আজ হইতে সাতদিনের মধ্যে সকল সৃষ্টি সাগরের জলে ডুবিয়া যাইবে। সেই সময়ে তোমার নিকট একখানি নৌকা

আসিবে, তুমি সপ্তর্ষিদিগকে আর সকল জীবের দুটি দুটিকে সঙ্গে লইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিও তখন আমিও আবার আসিব, আমার শিঙে তোমার নৌকাখানাকে বাঁধিয়া দিও। এই বলিয়া বিষ্ণু চলিয়া গেলেন; তারপর ক্রমে তাঁহার কথামতো সমস্তই ঘটিতে লাগিল। সমুদ্র উথলিয়া উঠিল, নৌকা আসিল, সেই মাছও আসিয়া দেখা দিল—সে এখন দশ লক্ষ যোজন বড়, তাহার দেহ সোনার, আর মাথায় একটা শিং। সেই শিঙে নৌকা বাঁধিয়া দিলে আর কোনো বিপদের আশঙ্কা রহিল না।

ইহাই হইল বিষ্ণুর মৎস্যাবতার, তারপর কূর্মাবতার। সমুদ্রের ভিতর অমৃত ছিল, সেই অমৃত পাইবার জন্য দেবতারা দৈত্যগণের সহিত মিলিয়া সমুদ্রকে মন্থন করিয়াছিলেন। সেই মন্থনের দণ্ড হইয়াছিল মন্দার পর্বত, আর দড়ি হইয়াছিল বাসুকি নাগ। মন্থন আরম্ভ হওয়ামাত্রই সেই পর্বত জলের ভিতরে ঢুকিয়া যাইতে লাগিল, কাজেই দেবতারা দেখিলেন যে তাঁহাদের সকল পরিশ্রমই মাটি হইতে চলিয়াছে। সেই সময় বিষ্ণু বিশাল কচ্ছপের রূপ ধরিয়া পর্বতটাকে পিঠে করিয়া লইয়াছিলেন, নচেৎ নিশ্চয় তাহা একেবারেই তল হইয়া যাইত, মন্থন অসম্ভব হইত, দেবতাদের ভাগ্যেও আর অমৃত খাওয়া ঘটিত না।

কূর্মাবতারের পর বরাহবতার। হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু নামে দুইটা ভারি ভয়ানক দৈত্য ছিল। দেবতাদিগকে যে তাহারা কিরূপ নাকাল করিয়াছিল, সে আর বলিবার নহে। হিরণ্যাক্ষ ছেলেবেলায় হাতি আর সিংহে চড়িয়া সূর্যটাকে লইয়া খেলা করিত। তারপর একদিন সে করিল কি, কুকুর যেমন মুখে করিয়া পিঠা লইয়া ছুট দেয়, তেমনিভাবে সে পৃথিবীটাকে মুখে লইয়া জলের ভিতরে গিয়া ঢুকিল। ইহাতে ব্রহ্মা নিতান্তই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার এমন শক্তি হইল না যে দুষ্ট দৈত্যের মুখ হইতে পৃথিবীটাকে ছিনাইয়া আনেন। তখন তিনি উপায় না দেখিয়া বিষ্ণুর স্তব আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণু একটা শূকরের বেশ ধরিয়া তাঁহার নাকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর সেই শূকর বাড়িতে বাড়িতে পর্বতপ্রমাণ হইয়া জলের দিকে ছুটিয়া চলিল।

সেই জলের নিকটে নারদ মুনি ছিলেন, তিনি সেই শূকরকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়া জোড়হাতে বলিলেন, "আজ্ঞা করুন কি করিব।" শূকর বলিল, "আমি যতক্ষণ হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিব, ততক্ষণ তুমি কেবলই জল শুষিতে থাকিবে।" নারদ দুহাতে জল তুলিয়া ক্রমাগত মুখে দিতে লাগিলেন, যতক্ষণ না হিরণ্যাক্ষের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল, ততক্ষণ তিনি থামেন নাই। সেই যুদ্ধ জলে পাঁচশত বৎসর, আর স্থলে পাঁচশত বৎসর, সব সুদ্ধ এক হাজার বৎসর চলিয়াছিল। তারপর সেই শূকর হিরণ্যাক্ষকে মারিয়া মুখে করিয়া, পৃথিবীকে জল হইতে তুলিয়া আনিয়া ব্রহ্মাকে দিল।

ইহার পর নৃসিংহাবতার। এবারে বিষ্ণু অর্ধেক মানুষের আর অর্ধেক সিংহের মতো অতি ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষের ভাই হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুতে ভয়ানক রাগিয়া গিয়া হিরণ্যকশিপু তাহার প্রতিশোধ লইবার জন দশ হাজার বৎসর ঘোরতর তপস্যা করে। তাহার দেহে গাছ হইল, তাহাতে পাখিরা বাসা করিল, তথাপি সে তপস্যা ছাড়িল না। তখন ব্রহ্মা আর থাকিতে না পারিয়া তাহাকে বর দিতে আসিলে, সে বলিল, "আপনার সৃষ্ট কোনো বস্তু বা জীব আমাকে বধ করিতে পারিবে না, এই বর আমাকে দিন।" ব্রহ্মা সেই বর তাহাকে দিয়া চলিয়া গেলেন, আর অমনি সেই দৈত্য তাহার

জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত মিলিয়া সৃষ্টি তোলপাড় করিয়া তুলিল। ইন্দ্র, বরুণ, কুবের কাহাকেও সে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিল না, সকলেরই ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইল। তখন দেবতাগণ তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া বিষ্ণুর নিকট নিজ নিজ দুঃখ জানাইলে বিষ্ণু বলিলেন, "তোমাদের কোনো ভয় নাই, আমি শীঘ্রই এই দৈত্যকে বধ করিয়া তোমাদের দুঃখ দূর করিব।"

কিন্তু বিষ্ণুর উপরেই হিরণ্যকশিপুর সর্বাপেক্ষা অধিক রাগ ছিল। সে তাঁহার পূজা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করে নাই। তাহার নিজের পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত ছিল, সেজন্য দুষ্ট দৈত্য সেই বালককে কি ভীষণ যন্ত্রণাই দিয়াছিল। কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই হরিনাম পরিত্যাগ করে নাই। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর হরি কোথায় আছে?" প্রহ্লাদ বলিল, "তিনি সর্বত্রই আছেন।" হিরণ্যকশিপু একটা থাম দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই থামের ভিতর আছে?" প্রহ্লাদ বলিল, "অবশ্য আছেন।" হিরণ্যকশিপু তখন খড়্গ লইয়া মহারোষে সেই স্তম্ভে আঘাত করিল। অমনি বজ্রপাতের ন্যায় ভীষণ গর্জনে বিষ্ণু সেই স্তম্ভের ভিতর হইতে বাহির হইলেন, তাঁহার দেহ অর্ধেক মানুষের, অর্ধেক সিংহের ন্যায়; নখ অতি ভীষণ; কেশর উড়িয়া মেঘে ঠেকিয়াছে; মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছে। দৈত্যেরা ক্ষণমাত্র তাঁহার সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিল। কিন্তু সেই ভয়ংকর নৃসিংহ মূর্তি নিজের নিঃশ্বাস দ্বারাই আর সকল দৈত্যকে মুহূর্তে ভস্ম করিয়া, দেখিতে দেখিতে হিরণ্যকশিপুর বুক নখে চিরিয়া তাহার রক্ত খাইতে আরম্ভ করিলেন।

এত করিয়াও সেই ভীষণ মূর্তির রাগ দূর হইল না, তাঁহার মুখের আগুনও নিভিল না। তখন দেবতাগণ যারপরনাই ভয় পাইয়া তাঁহাকে থামাইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন কিন্তু কাহারও তাঁহার নিকটে যাইতে ভরসা হইল না। ইন্দ্র বলিলেন, "আমার চোখ ঝলসিয়া যাইবে।" ব্রহ্মা বলিলেন, "আমার দাড়ি পুড়িয়া যাইবে।"

গণেশ অনেক সাহস করিয়া তাঁহার ইঁদুরে চড়িয়া কিছুদূর আসিয়াছিলেন, কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ নৃসিংহের ফুঁ লাগিয়া তাঁহার ইঁদুরটি উলটিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে তাঁহার সেই বিশাল ভুঁড়িসুদ্ধ গড়াগড়ি যাইতে হইল।

শেষে আর কোনো উপায় না দেখিতে পাইয়া দেবতাগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে, মহাদেব অতি অদ্ভুত শরভের মূর্তি ধরিয়া নৃসিংহের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই শরভকে দেখিবামাত্র নৃসিংহের রাগ থামিয়া গেল, সকলের ভয়ও দূর হইল।

দেবতাদিগের সহিত অসুরেরা চিরকালই ঘোরতর শত্রুতা করিত, আর অনেক সময়ই তাহাদের লাঞ্ছনা করিত যতদূর হইতে হয়। প্রহ্লাদের পিতা কি করিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। প্রহ্লাদের নাতি 'বলি'ও তাহার চেয়ে নিতান্ত কম করে নাই। এদিকে বলি ধার্মিক ছিল খুবই, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? সে যে অসুর, কাজেই দেবতাদের সঙ্গে শত্রুতা না করিয়া থাকিতে পারিত না।

একবার সে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দলবলসুদ্ধ স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিল। তখন দেবতাগণ আর কি করিবেন? তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিষ্ণুর আশ্রয় লইলেন। এদিকে ইন্দ্রের মাতা অদিতিদেবীও একমনে বিষ্ণুকে ডাকিয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে দেব। আমাকে এমন একটি পুত্র দান কর, যে এই সকল অসুরকে বধ করিতে পারে।" কিছুকাল এইরূপে প্রার্থনা করার পর বিষ্ণু তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "মা, তুমি দুঃখ

করিও না, আমি নিজেই তোমার পুত্র হইয়া অসুর বধ করিব।"

সেই পুত্রের নাম বামন। এমন সুন্দর ছোট্ট খোকা আর কেহ কখনো দেখে নাই। ঐরূপ ছোট্ট ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বামন। দেবতারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, আর কত সুন্দর সুন্দর জিনিস যে তাঁহাকে দিলেন কি বলিব। কেহ দিলেন পৈতা, কেহ দিলেন লাঠি, কেহ কমণ্ডলু, কেহ কাপড়, কেহ বেদ, কেহ জপের মালা।

বড় হইয়াও সেই খোকা তেমনি ছোট্টটিই রহিয়া গেলেন। তারপর একবার বলি এক বিশাল যজ্ঞ আরম্ভ করিল, মুনি-ঋষি কত যে তাহাতে আসিলেন তাহার সংখ্যা নাই। বামনও সেই যজ্ঞের কথা শুনিয়া বেদের মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন. বলি দেখিল, কোথা হইতে একটি ছোট্ট মুনি আসিয়াছেন, তাহার মাথায় জটা, হাতে দণ্ড কমণ্ডলু আর ছাতা। সে অতিশয় আদরের সহিত তাহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঠাকুর, আপনার কি চাই?" বামন বলিলেন, "আমি তোমার নিকট তিন পা জমি চাই।"

এ কথায় বলি হাসিয়া বলিল, "সে কি ঠাকুর, তিন পা জমি দিয়া কি করিবে? এ তো ছেলেমানুষের কথা। বড়-বড় গ্রাম চাও, টাকাকড়ি লোকজন যত খুশি চাও।"

বামন বলিলেন, "আমার অত জিনিসের দরকার নাই! আমার তিন পা জমি হইলেই চলিবে। বেশি লোভ করা ভালো নয়।"

তখন বলি বলিল, "আচ্ছা, তবে তুমি তিন পা জমিই নাও।" তারপর হাতে জল লইয়া সে বামনকে তিন পা জমি দান করিতে যাইবে, এমন সময় তাহার গুরু শুক্রাচার্য ব্যস্তভাবে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, কর কি? ওঁকে যে সে লোক ভাবিও না। ইনি আর কেহ নহেন, নিজে বিষ্ণুই বামন সাজিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাকে কিছুই দিও না, দিলে তোমার সর্বনাশ হইবে।"

বলি বলিল, "সামান্য একজন ভিক্ষুককেও আমি অমনি ফিরাই না, ইঁহাকে কেমন করিয়া ফিরাইব? বিশেষত আমি 'দিব' বলিয়াছি।"

এই বলিয়া বলি তিনপাদ ভূমি দান করিবামাত্র দেখিল, সেই খোকা আর খোকা নাই সে এখন আকাশের চেয়েও উঁচু বিরাট পুরুষ হইয়া গিয়াছে। তারপর দেখিতে দেখিতে সেই বিরাট পুরুষের নাভি দিয়া আর একটি পা বাহির হইল। তখন তিনি এক পদে পৃথিবী, এক পদে স্বর্গ আর তৃতীয় পদে স্বর্গেরও উপরে মহর্লোক জনলোক প্রভৃতি ঢাকিয়া ফেলিয়া, বলির যত রাজ্য সকলই কাড়িয়া লইলেন। ইহার পর দুষ্ট অসুরগুলিকে বধ করা তো বিষ্ণুর পক্ষে অতি সহজ কাজ। তিনি সে কাজ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া, পুনরায় ইন্দ্রকে ত্রিভুবনের রাজ্য দিয়া দিলেন।

যাহা হউক, বলি ধার্মিক লোক ছিল; সুতরাং শ্রীবিষ্ণু তাহাকে বধ না করিয়া স্নেহের সহিত বলিলেন, "তুমি এক কল্পকাল বাঁচিয়া থাক। এই ইন্দ্রের পরে তুমি ইন্দ্র হইবে। এখন তুমি সুতল নামক পাতালে গিয়া বাস কর। সে অতি সুন্দর স্থান। দেখিও আর কখনো যেন দেবতাদের সঙ্গে বিরোধ করিও না।" তদবধি বলি পাতালে বাস করিতেছে।

ইহাই হইল বিষ্ণুর বামন অবতার। ইহার পরের অবতার পরশুরাম। সে অবতার বিষ্ণু জমদগ্নি মুনির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

সে কালে ক্ষত্রিয়েরা বড়ই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগকে সাজা দিবার জন্যই পরশুরামের জন্ম।

তখনকার প্রধান ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন কার্তবীর্য, অর্থাৎ কৃতবীর্যের পুত্র, অর্জুন। দত্তাত্রেয়ের বরে অর্জুনের এক হাজার হাত হইয়াছিল। সেই এক হাজার হাতে এক হাজার অস্ত্র লইয়া তিনি দেবতাদিগকে অবধি যুদ্ধে হারাইয়া দিতেন, এজন্য তাঁহার দর্পের আর সীমাই ছিল না।

একবার কার্তবীর্য মৃগয়া করিতে গিয়া বনের ভিতর অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে মহর্ষি জমদগ্নি তাঁহাকে নিমন্ত্রণপূর্বক, নিজের আশ্রমে আনিয়া বিবিধ উপচারে আহার করাইয়াছিলেন। ভালো লোক হইলে ইহাতে সে মুনির প্রতি কতই কৃতজ্ঞ হইত। আর হয়তো তাঁহার কত উপকার হইত। কিন্তু কার্তবীর্য সেরূপ স্বভাবের লোক ছিলেন না। মুনি যে তাঁহাকে কত ক্লেশ হইতে বাঁচাইলেন, সে কথা তাঁহার মনেই আসে না। তিনি একদৃষ্টে কেবল মুনির গাইটিকেই দেখিতে লাগিলেন। সেটি কামধনু, মুনি তাহার নিকট যাহা চাহেন, তাহাই পান, রাজার লোক তাহা খাইয়া শেষ করিতে পারে না। রাজা ভাবিলেন, এ গাইটি তাঁহার না হইলেই চলিতেছে না। কাজেই তিনি মুনিকে বলিলেন, "ভগবন্, গাইটি আমাকে দিন।" মুনি সে কথায় রাজি না হওয়ায় রাজা সেটি তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

পরশুরাম কার্তবীর্যকে বধ করিয়া সেই গাই ফিরাইয়া আনিলেন। তারপর তিনি বনে চলিয়া গিয়াছেন এমন সময় কার্তবীর্যের পুত্রেরা আসিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে মহর্ষি জমদগ্নির প্রাণনাশ করিল।

পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া সেই দারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পৃথিবীর যত ক্ষত্রিয় সব তিনি মারিয়া শেষ করিবেন। তারপর ভীষণ কুঠার হস্তে সেই যে তিনি ক্ষত্রিয় মারিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাদিগকে শেষ না করিয়া আর ক্ষান্ত হইলেন না। একবার নয়, দুবার নয়, ক্রমাগত একুশবার তিনি এইরূপে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। ক্ষত্রিয়ের রক্তে কুরুক্ষেত্রে পাঁচটি কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পিতার তর্পণ করিলে, তবে তাঁহার ক্রোধ কিঞ্চিৎ শান্ত হইল।

ক্ষত্রিয়েরাই ছিল পৃথিবীর রাজা; তাহাদিগকে বধ করিয়া তাঁহাদের সকলের রাজ্যই পরশুরামের হইল। সেই সব রাজ্য তখন তিনি মহর্ষি কশ্যপকে দান করিলেন। দান করিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা হইল যে সকলই তো পরের রাজ্য হইল। এখন কোথায় বাস করি? এই ভাবিয়া তিনি অস্ত্রদ্বারা সমুদ্রের জল সরাইয়া এক নূতন রাজ্যের সৃষ্টি করিলেন। তদবধি উহাই তাঁহার বাসস্থান হইল।

কৃষ্ণের কথা

পূতনা বলিয়া একটা বড়ই ভীষণ রাক্ষসী কংসের রাজ্যে বাস করিত। ছোট ছোট ছেলেদিগকে কৌশলে বধ করাই ছিল ইহার ব্যবসায়। রাত্রিকালে কোনো খোকাখুকি এই হতভাগিনীর দুধ পান করিলে আর তাহাদের রক্ষা ছিল না। সে সব খোকাখুকির দেহ তখনই

চূর্ণ হইয়া যাইত।

যখন জানা গেল যে কংসকে মারিবার লোকের জন্ম হইয়াছে। অমনি সে দুষ্ট এই পূতনাকে ডাকিয়া বলিল যে যত যণ্ডা-যণ্ডা খোকা দেখিবে, সকলকেই বধ করিতে হইবে। তদবধি সেই হতভাগিনী কেবলই লোকের ছোট ছোট খোকা মারিয়া বেড়ায়। এমনি করিয়া কত খোকার প্রাণ যে সে হরণ করিল, তাহার সংখ্যা নাই।

নন্দের একটি খোকা হইয়াছে শুনিয়া, এই রাক্ষসী একদিন গোকুলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কিন্তু তাহার রাক্ষসী মূর্তি ছিল না। সে এমনি সুন্দর একটি মেয়ে সাজিয়া, এমনি সুন্দর বেশভূষা করিয়া, এমনি মিষ্ট হাসি হাসিয়া আসিয়াছিল যে তাহাকে দেখিয়া সকলে ভাবিল, নিশ্চয় স্বয়ং লক্ষ্মী গোকুলে আসিয়াছেন। সে যেদিকে যায়, সকলে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া জড়সড়ভাবে সরিযা দাঁড়ায়। দুষ্ট বাক্ষসী ধীরে ধীরে সূতিকা ঘরে ঢুকিল, কেহই তাহাকে নিষেধ করিল না। সে ঘরে যশোদা ছিলেন, বলবামেব মা রোহিণীও ছিলেন, তাঁহারা তাহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাক্ষসী এক পা দু পা করিয়া আসিয়া বিছানার পাশে বসিল ও হাসিতে হাসিতে যেন কতই আদরে, খোকাটিকে কোলে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতে লাগিল। যশোদাও কিছু বলিলেন না, রোহিণীও কিছু বলিলেন না, রাক্ষসীর মায়ায় তাঁহারা ভুলিয়া গিযাছিলেন।

কিন্তু খোকা সে মায়ায় ভোলে নাই। যিনি স্বযং বিষ্ণু, বাক্ষসীব মায়া তাঁহাব কাছে খাটিবে কেন! রাক্ষসী হাসিতে হাসিতে খোকাকে দুধ খাইতে দিল, খোকা সেই দুধের সঙ্গে অভাগীর প্রাণ অবধি চুষিয়া লইল। তখন যে বাক্ষসী চ্যাঁচাইযা ছিল, তেমন চীৎকার আর গোকুলের কেহ কোনোদিন শুনে নাই। তাহাবা সকলি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তখনই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল কি ভীষণ ব্যাপার! বিকট রাক্ষসী মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, তিন গব্যুতি (ছয় ক্রোশ) পরিমিত স্থানেব গাছপালা তাহাব দেহেব চাপনে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাক্ষসীর এক একটা দাঁত যেন একেকটি লাঙ্গলের ফাল, নাকের ছিদ্র যেন পর্বতের গুহা চোখদুটা যেন দুটা কুয়া। সেই রাক্ষসীর বুকের উপর শুইয়া খোকা আনন্দে হাত পা ছুঁড়িতেছে। তখনই সকলে খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল। আর ক্রমাগত ষাট্ ষাট্ বলিতে বলিতে কত দেবতার নাম যে করিল তাহার অন্তই নাই।

উহারা যদি জানিত যে সেই খোকাটাই রাক্ষসীটাকে মারিয়াছে, তবে না জানি কত আশ্চর্য হইত।

আর একদিন খোকাকে একটা গাড়ির নীচে, একটি ছোট্ট খাটে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। বোধহয় এইভাবে তাহাকে প্রায়ই শোয়াইয়া রাখা হইত। সেদিন বাড়িতে কিসের উৎসব ছিল, সকলে তাহাতেই মত্ত, খোকার কথা আব কাহারও মনে নাই; খোকার কিন্তু এদিকে বড়ই ক্ষুধা হইয়াছে, তাহার দরুন সে পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে একবার তাহার লাথি লাগিয়া, হাঁড়ি কলসীতে বোঝাই সেই প্রকাণ্ড গাড়িখানা উলটিয়া গেল। সে সব হাঁড়ি কলসী তখনই খান্ খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। আর শব্দও অবশ্য যেমন তেমন হইল না। তাহা শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে খোকা চিৎ হইয়া শুইয়া পা ছুঁড়িতেছে। তাহার পাশে গাড়িখানা উলটান, আর হাঁড়ি কলসী চূর্ণ হইয়া তুমুল কাণ্ড উপস্থিত। এত বড় গাড়ি কি করিয়া উলটিল, এ কথা সকলেই তখন ব্যস্তভাবে

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সেখানে আর কয়েকটি বালক ছিল, তাহারা খোকাকে দেখাইয়া বলিল, "এই খোকা পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে গাড়ি উলটাইয়া ফেলিয়াছে; আমরা দেখিয়াছি।" শুনিয়া সকলে হাঁ করিয়া একবার খোকার দিকে একবার গাড়িখানার দিকে তাকাইতে লাগিল।

খোকাটি একটু বড় হইলে তাহার 'কৃষ্ণ' নাম রাখা হইল। রোহিণীর খোকার নাম যে 'বলরাম' তাহাও এই সময়ে রাখা হয়। কি দুরন্ত দুটি খোকাই তাহারা ছিল।

যখন কৃষ্ণ আর বলরাম একসঙ্গে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে শিখিলেন, তখন হইতে আর এক মুহূর্তের জন্যেও কাহারও নিশ্চিন্ত থাকিবার জো রহিল না। ছাই আর গোবর দেখিলেই দুটি খোকা অমনি তাহা লইয়া গায়ে মাখাইবে, যশোদার সাধ্য কি যে তাহাদিগকে বারণ করেন। একটু চোখের আড়াল হইলেই তাহারা গোয়াল ঘরে ঢুকিয়া ছোট ছোট বাছুরগুলির লেজ ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিত। ইহাদের পিছুপিছু ছুটাছুটি করিয়া যশোদা নাকালের একশেষ হইতে লাগিলেন। শেষে একদিন তিনি আর কিছুতেই ইঁহাদিগকে সামলাইতে না পারিয়া, রাগের ভরে বকিতে বকিতে লাঠি হাতে কৃষ্ণকে তাড়া করিলেন। তারপর তাঁহাকে ধরিয়া মোটা দড়ি দিয়া একটা উদূখলের সঙ্গে বাঁধিয়া বলিলেন, "পালা দেখি এখন!"

এই বলিয়া যশোদা নিশ্চিন্ত মনে ঘরের কাজে গিয়াছেন, আর কৃষ্ণও অমনি সেই উদূখল টানিয়া উঠান পাড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উদূখল টানিতে টানিতে তিনি দুটি অর্জুন গাছের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু গাছ দুটি খুব কাছাকাছি থাকায় উদূখলটি সেখান দিয়া গলিতে না পারিয়া আটকাইয়া গেল। তখন কৃষ্ণের টানাটানিতে সেই প্রকাণ্ড গাছ দুটি মহাশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়ায় সকলে ভাবিল, না জানি কি হইয়াছে। তাহারা নিতান্ত ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে খোকা দুইগাছের মাঝখানে বসিয়া, তাহার ছোট ছোট দাঁতকটি বাহির করিয়া হাসিয়া অস্থির, তাহার পেটের সঙ্গে দড়ি দিয়া উদূখল বাঁধা। সেই হইতে কৃষ্ণের একটি নাম হইল 'দামোদর', কিনা 'পেটে দড়ি' (দাম—দড়ি, উদর—পেট)। যা হোক, সে প্রকাণ্ড গাছ ভাঙ্গা যে সেই খোকার কাজ এ কথা কেহ বুঝিতে পারিল না। বুড়োরা বলিল, "এখানে বড়ই উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে দেখিতেছি; গাড়ি উলটিয়া যায়, বিনা ঝড়ে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়ে। এখানে আর থাকা উচিত নয়; চল আমরা বৃন্দাবনে চলিয়া যাই।" এই বলিয়া তখনই সকলে গোকুল ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেল।

শিবের বিয়ে

দুর্গার এক নাম 'পার্বতী', অর্থাৎ পর্বতের মেয়ে। তাঁর পিতা হিমালয়, মা মেনকা। শিবের সঙ্গে যাতে তাঁর বিয়ে হয়, এজন্য পার্বতী অনেকদিন ধরে কঠিন তপস্যা করেছিলেন, তার ফলে শেষে শিবের সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হল।

পার্বতীর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন। কিন্তু বর যে, সে তো আর নিজের কনের বাপের কাছে গিয়ে বিয়ে ঠিক করতে পারে না, তাহলে লোকে হাসে! কাজেই শিব সপ্তর্ষিদের ডেকে পাঠালেন। সপ্তর্ষিরাও তখনই সোনার বল্কল পরে, মুক্তামালা

গলায় দিয়ে, মণি-মাণিক্যের গহনা ঝল্‌মলিয়ে তাঁর কাছে এসে জোড়হাতে বললেন, "আমাদের কি সৌভাগ্য! প্রভু আজ আমাদের স্মরণ করেছেন। আজ্ঞা করুন, আমাদের কি করতে হবে।"

শিব বললেন, "আমি হিমালয় পর্বতের মেয়ে পার্বতীকে বিয়ে করতে চাই; তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে সব ঠিকঠাক কর। দেখো যেন ভালোমতে কাজটি করে আসতে পার।"

সপ্তর্ষিরা তখন নিমেষের মধ্যে আকাশে উড়ে, সেই ঝক্‌ঝকে হিমালয় পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হিমালয় দূরে থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে মেনকাকে বললেন, "না জানি ঐ সাতটি সূর্য কি করতে আমাদের এখানে আসছে!" বলতে বলতেই তিনি দেখলেন, ওসব সূর্য নয়, সাতটি মুনি। তখন তিনি তাড়াতাড়ি তাঁদের কাছে গিয়ে, জোড়হাতে তাঁদের নমস্কার করে বসতে সুন্দর আসন দিয়ে বললেন, "মুনি-ঠাকুরেরা কি মনে করে আমাদের এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন?" মুনিরা বললেন, "শিব তোমার কন্যা পার্বতীকে বিয়ে করতে চেয়েছেন, তাই আমরা এসেছি। এমন জামাই আর পাবে না রাজা, শিবের কাছে তোমার পার্বতীর বিয়ে দাও।"

তা শুনে হিমালয়ের আর আনন্দের সীমাই রইল না। তিনি তখনি ছুটে গিয়ে, পার্বতীকে সাজিয়ে গুজিয়ে এনে মুনিদের কোলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নিন, আমার পার্বতীকে।" এমন সুন্দর লক্ষ্মী মেয়ে আর কখনো হয় নি, হবেও না। পার্বতীকে দেখে স্নেহে মুনিদের মন গলে গেল। তাঁরা তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে, তাঁকে কত আশীর্বাদ করে, বিয়ের সব কথাবার্তা বলে সেখান থেকে পরম আনন্দে হাসতে হাসতে চলে এলেন। স্থির হল যে আর তিনদিন পরেই শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে হবে।

সপ্তর্ষিরা শিবের কাছে এসে এসব কথা জানালে শিব যারপরনাই খুশি হয়ে বললেন, "বেশ বেশ! বিয়ের সময় তোমরা আমার পুরুত হবে কিন্তু। তোমাদের শিষ্যদেরও নিয়ে আসবে।"

মুনিরা সে কথায় 'যে আজ্ঞা' বলে চলে যেতেই শিব বিয়ের আয়োজন করবার জন্য তাঁর ভূত প্রেত নিয়ে কৈলাস পর্বতে চলে এলেন। তারপর তিনি নারদকে ডেকে বললেন, "নারদ, বিয়ের ঠিক করেছি; কনে হচ্ছেন হিমালয়ের মেয়ে পার্বতী। এখন তুমি একটি কাজ কর তো; দেবতাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে এস। মুনি-ঋষিদেরও বলবে; যক্ষ-গন্ধর্বেরাও যেন বাদ না পড়ে। সকলকেই আসতে হবে; যে না আসবে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হবে।"

নারদ মুনি যেমন তেমন চালাক লোক ছিলেন না, শিবের হুকুমমতো সব কাজ করে ফেললেন।

ততক্ষণে কৈলাস-পর্বতে খুবই ধুমধাম পড়ে গেছে; ভূতেরা ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা, সানাই, কাঁসর, করতাল সব বাজিয়ে সৃষ্টি মাথায় করে তুলেছে। তাদের মুখে আজ আর হাসি ধরে না। ক্রমে দেবতারাও একজন দুজন করে এসে উপস্থিত হলেন। হাঁসে চড়ে ব্রহ্মা এলেন, গরুড়ে চড়ে বিষ্ণু এলেন। ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, কেউ আসতে বাকি রইলেন না। গন্ধর্ব আর অপ্সরারা তো এর ঢের আগেই এসে গান বাজনা জুড়ে দিয়েছে। শিবও সেই কখন থেকে সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে আছেন। বরের বেশে তাঁকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছে।

তারপর সকলে শিবকে নিয়ে রওনা হলেন। দেবতারা নিজ নিজ দল নিয়ে বরের আগে

আগে যেতে লাগলেন, বাজনদারেরা মাথা দুলিয়ে নাচতে নাচতে তাদের সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ে চলল।

এদিকে হিমালয়ও চুপ করে বসে থাকেন নি। পার্বতীকে নাইয়ে, সাজিয়ে তাঁরাও প্রস্তুত হয়ে আছেন। বাড়ি ঘর সাজিয়ে, তোরণ বানিয়ে, নিশান উড়িয়ে, স্বপ্নপুরীর মতো সুন্দর করা হয়েছে। পর্বতেরা সকলে সেজেগুজে সপরিবারে এসে কাজকর্মে ব্যস্ত রয়েছেন। শিবকে এগিয়ে আনবার জন্য স্বয়ং গন্ধমাদন পর্বত কখন বেরিয়ে গেছেন। বর এলে তাকে আদর করে আনতে হবে, সেজন্য নিজে হিমালয় ফটকে দাঁড়িয়ে।

বাড়ির ভিতরেও অবশ্যি কেউ চুপ করে নাই। মেয়েদের আজ বড়ই আনন্দ আর উৎসাহ। পার্বতীর মা মেনকাদেবী তো আনন্দে মাথা ঠিকই রাখতে পাচ্ছেন না। তিনি এরই মধ্যে নারদ মুনিকে সঙ্গে করে গিয়ে ছাতে উঠে আছেন—যার জন্যে মেয়ে এত তপস্যা করলেন, সেই শিবকে সকলের আগে দেখতে হবে। সাধারণ দেবতারাই যখন দেখতে এত সুন্দর, শিব না জানি তবে কত সুন্দর।

এমন সময় গন্ধর্বের রাজা বিশ্বাবসু এলেন। তিনি দেখতে খুবই সুন্দর; তাঁকে দেখে মেনকা বললেন, "এই বুঝি শিব!" নারদ তাতে হেসে বললেন, "না, না—ও তো আমাদের বাজনদার; ও কেন শিব হবে? তা শুনে মেনকা তো থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, ভাবলেন, 'বাজনদারই দেখতে এমন, শিব না জানি তবে কেমন!'

তারপর এলেন যক্ষদের নিয়ে কুবের; তিনি গন্ধর্বের রাজার চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর। মেনকা বললেন, "তবে এই শিব!" নারদ বললেন, "না!" শুনে মেনকা আরো আশ্চর্য হলেন।

তারপর এলেন বরুণ, তিনি কুবেরের চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর; তারপর এলেন যম, তিনি বরুণের চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর; তারপর এলেন ইন্দ্র, তিনি যমের চেয়েও দ্বিগুণ সুন্দর। মেনকা এঁদের একেকজনকে দেখে ভারি খুশি হয়ে বললেন, "এ নিশ্চয় শিব!" নারদ তাতে না বললেন, তিনি অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকাতে লাগলেন।

এমনি করে সূর্য, চন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি সকলকে দেখেই মেনকা বললেন, "এই শিব!" যখন শুনলেন যে এঁদের কেউ শিব নন, শিব এঁদের চেয়েও বড়, তখন তাঁর এতই আশ্চর্য বোধ হল যে, তিনি আর ভাবতেই পারলেন না, সেই শিব তবে কত সুন্দর।

এমন সময় ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্যি সব নিয়ে শিব এসে উপস্থিত। এত ভূত আর মেনকা কখনো একসঙ্গে দেখেন নি; তাদের সেই বিকট ভেঙচি দেখেই তাঁর মাথা ঘুরে গেল। তাদের সঙ্গে যে আবার পাঁচমুখো একটা কে ষাঁড়ে চড়ে এসেছে—মাথায় জটা, পরনে বাঘছাল, গায়ে ছাই মাখা, গলায় মড়ার মাথা—সে কথার খবর নিবার খেয়ালই তাঁর রইল না। তখন নারদ সেই দেবতাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—"এই শিব!"

যেই এই কথা বলা, অমনি মেনকা, "ও লক্ষ্মীছাড়া পোড়ারমুখী পার্বতী! করেছিস কি!" বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

শিব সে কথা জানতে পেরে ছুটে এসে মেনকার মাথায় জল ঢেলে অনেক হাওয়া করতে শেষে তাঁর জ্ঞান হল।

তখন যে তিনি শিবকে আর নারদকে বকুনিটা বকলেন! নারদের অপরাধ ছিল এই যে তিনি বলেছিলেন, "শিব বড় ভালো, তাঁর সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে হবে।" বকতে বকতে তাঁর

সেই সাত মুনির কথা মনে পড়ল যাঁরা পার্বতীর বিয়ে ঠিক করতে এসেছিলেন। অমনি তিনি তাঁদের উপর যারপরনাই চটে বললেন, "বেটারা গেল কোথায়? আজ তাদের দাড়ি ছিঁড়তে হবে!" আবার তখনই মাথায় চাপড় মেরে বললেন, "আর তাদেরই বা দোষ কি! ঐ অভাগী মেয়েই তো যত নষ্টের গোড়া!" এই বলে তিনি পার্বতীকে কত গালই দিলেন। শেষে তিনি বললেন, "আমি কিছুতেই এই কদাকার বুড়োর কাছে মেয়ের বিয়ে দিব না। ওর না আছে টাকা, না আছে গুণ, না জানে লেখাপড়া, না পারে একটা ঘোড়া কিনে চড়তে।"

তখন সকলে মিলে মেনকাকে কত বুঝাইলেন, কারও কথায় কিছু হল না। পার্বতী নিজে এসে একবার তাঁকে মিনতি করে দুটো কথা বলেছিলেন, তাতে তিনি দাঁত কড়্‌মড়িয়ে খেপে উঠে পার্বতীকে এমনি কিল আর কনুয়ের গুঁতো মারতে লাগলেন যে, নারদ মুনি তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে ছাড়িয়ে না নিলে সেদিন ভারি মুশকিল হত আর কি!

যা হোক শেষে বিষ্ণু এসে অনেক উপদেশ দিতে মেনকার মন একটু শান্ত হল। ঠিক সেই সময়ে নারদও শিবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁর চেহারা অনেকটা শুধরিয়ে এনে মেনকার সামনে উপস্থিত করলেন। তখন মেনকা দেখলেন যে শিবের মাথায় জটা আর গায়ে ছাই বলে তাঁকে একটু উস্কোখুস্কো দেখায় বটে, কিন্তু আসলে তিনি সকল দেবতার চেয়ে সুন্দর। মেনকা যতই তাঁর মুখের দিকে তাকান, ততই তাঁর মনে হয় যে, 'আহা কি মিষ্টি! কি সরল!'

এমনিভাবে মেনকা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে শিবের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "আহা! আমার পার্বতীর কপাল ভালো যে এমন স্বামী পেয়েছে!" তা শুনে শিবের ভারি লজ্জা হওয়ায় তিনি জড়সড় ভাবে দেবতার কাছে চলে গেলেন।

এদিকে মেয়েদের মহলে ভয়ানক ছুটাছুটির ধুম লেগে গেছে। সবাই বলছে, "আরে, দেখ এসে, পার্বতীর কি সুন্দর বর হয়েছে।" তারা যে যেমন ছিল, তেমনি ভাবে, কেউ রান্না ফেলে, কেউ কলসী কাঁকে, কেউ চুল বাঁধতে বাঁধতে কেউ ঘোমটা টানতে টানতে, কেউ আছাড় খেতে খেতে এসে উপস্থিত হল। শিবকে তারা চন্দন দিয়ে, খৈ দিয়ে, আরো কতরকমে পূজো যে করল তা কি বলব! তাঁকে নিয়ে হাসি তামাশা কত হল, তার তো অন্তই নাই। মেনকা অবধি এসে তাতে যোগ না দিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি শিবের পিছনে গিয়ে, তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে টানতে আরম্ভ করেছিলেন, দেবতারা দেখে ফেলায় হাসতে হাসতে ঘরে পালিয়ে গেলেন।

তারপর শিবকে রেশমী কাপড় পরিয়ে তাঁর গলায় সোনার ফুলের মালা, কপালে তিলক দিয়ে তাঁকে আর পার্বতীকে বিয়ের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। মুনিরা বেদ পড়তে লাগলেন। ব্রহ্মা তাঁদের দিয়ে বিয়ের সকল কাজ করিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর কথায় এসে শিব আর পার্বতীর কপালে খৈ ছড়িয়ে দিতে লাগল। আর, গন্ধর্ব আর অপ্সরারা মিলে গান বাজনা যে খুবই করল, তার তো কথাই নাই।

এমনি করে শিব আর পার্বতীর বিয়ে হয়ে গেল। হিমালয় দেবতাদের সকলকে এমনি আদর অভ্যর্থনা করলেন যে তাঁদের লাজে মাথা হেঁট করে থাকতে হল। তারা হিমালয়কে কত আশীর্বাদ যে করলেন, তার লেখাজোখা নাই। তখন মেনকা লাজে জড়সড় হয়ে তাঁদের কাছে এসে বললেন, "ঠাকুর। আপনাদের কাছে আমি ভারী পাগলামি করেছি, আমার বড় অপরাধ হয়েছে, আমাকে মাপ করতে হবে।" দেবতারা হেসে বললেন, "আপনার কোনো চিন্তা নাই;

আপনি যা করছেন তাতে আমরা আমোদই পেয়েছি। আপনার দিন দিন সৌভাগ্য বাড়তে থাকুক।”

তখন আবার বাজনা বেজে উঠল, সকলে সেজে প্রস্তুত হল, দেবতারা মনের সুখে বর কনে নিয়ে কৈলাসে যাত্রা করলেন। হিমালয় আর মেনকা সকলকে নিয়ে এঁদের গন্ধমাদন পর্বত অবধি এগিয়ে দিয়ে, ঘরে ফিরে এসে ভাবলেন, 'হায়, সব যে অন্ধকার! কোথায় গেল আমাদের পার্বতী?”

রাবণ

রাবণের কথা তোমরা সকলেই জান। রাবণের পিতার নাম বিশ্রবা, মায়ের নাম কৈকসী। বিশ্রবা পরম ধার্মিক মুনি ছিলেন। রাবণ আর তাহার ভাইবোনেরা জন্মিবার পূর্বেই তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহাদের সকলের ছোটটি খুব ধার্মিক হইবে, আর সকলেই ভয়ংকর দুষ্ট রাক্ষস হইবে।

মুনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর তাহাদের বোন সূর্পনখা, ইহাদের এক একটা এমনি বিকট আর দুষ্ট রাক্ষস হইল যে কি বলিব। ইহাদের ছোট ভাই বিভীষণও রাক্ষস ছিল বটে কিন্তু সে যারপরনাই ভালো লোক ছিল।

রাবণের দশটা মাথা আর কুড়িটা হাত ছিল। দাঁতগুলো ছিল থামের মতো বড়-বড়। চুলগুলি আগুনের শিখার মতো লাল, আর শরীরটা কালো পর্বতের মতো বিশাল। তাহার জন্মের সময় পৃথিবী কাঁপিয়াছিল, সূর্য ময়লা হইয়া গিয়াছিল আর সমুদ্রের জল তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছিল। দশটা মাথা দেখিয়া তাহার পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'দশগ্রীব'। উহাই উহার আসল নাম, রাবণ নাম পরে হইয়াছিল।

ছেলেবেলায় রাবণ ভাইদিগকে লইয়া দশ হাজার বৎসর ভয়ংকর তপস্যা করিয়াছিল। এই দশ হাজার বৎসর সে আহার করে নাই। এক এক হাজার বৎসর যাইত আর নিজের এক একটি মাথা কাটিয়া সে আগুনে আহুতি দিত। নয় হাজার বৎসরে নয়টি মাথা সে এইরূপ করিয়া আগুনে দিল। তারপর দশ হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে, যেই সে তাহার বাকি একটি মাথাও কাটিতে যাইবে, অমনি ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, “দশগ্রীব, আমি খুশি হইয়াছি, এখন তুমি বর লও।”

দশগ্রীব বলিল, “আমাকে অমর করিয়া দিন।” ব্রহ্মা বলিলেন, “সেটি হইবে না, অন্য বর লও।” দশগ্রীব বলিল, “তবে এই বর দিন যে দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, পক্ষী ইহাদের কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না।” ব্রহ্মা বলিলেন, “আচ্ছা তাহাই হইবে। তাহা ছাড়া তোমার যে মাথাগুলি কাটিয়া দিয়াছ তাহাও ফিরিয়া পাইবে, ইহার ওপর আবার যখন যেরূপ তোমার ইচ্ছা হয়, তেমনি চেহারা করিতে পারিবে।”

কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণও এই দশ হাজার বৎসর খুব তপস্যা করিয়াছিল, সুতরাং ব্রহ্মা তাহাদিগকেও বর দিতে গেলেন। বিভীষণ বলিল, “আমাকে দয়া করে এই বর দিন, যেন আমার ধর্মে মতি থাকে।” এ কথায় ব্রহ্মা অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাহাকে সে বর তো দিলেনই

তাহা ছাড়া তাহাকে অমর করিয়া দিলেন।

কুম্ভকর্ণকে বর দিবার সময় দেবতারা ব্রহ্মাকে বলিলেন, "প্রভু এমন কাজ করিবেন না, এ বেটা বর পাইলে আমাদের সকলকে খাইয়া ফেলিবে। এর মধ্যেই কতজনকে ধরিয়া খাইয়াছে।

তাইতো, এখন কি করা যায়? তপস্যা করিয়াছে কাজেই বর দিতেই হইবে, আবার বর দিলেও বিপদের কথা, তখন ব্রহ্মা বুদ্ধি করিয়া সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের মুখের ভিতরে ঢুকাইয়া দিলেন। সরস্বতী ঢুকিতেই তাহার মাথায় কি যে গোল লাগিয়া গেল, আর বেচারা ঠিক করিয়া কথা কহিতে পারিল না। ব্রহ্মা বলিলেন, "কুম্ভকর্ণ, কি চাহ?" কুম্ভকর্ণ বলিল, "আমি খালি ঘুমাইতে চাই। ছয়মাস ঘুমাইয়া একদিন উঠিয়া খাইব।" ব্রহ্মা বলিলেন, "বেশ কথা, তাই হোক।" এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগকে লইয়া চলিয়া গেলেন, আর কুম্ভকর্ণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ভাবিল, 'তাইতো। এটা কি করিলাম? দেবতা বেটারা আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল নাকি?"

যা হোক, আমরা দশগ্রীবের কথা বলিতেছি। সে তো বর পাইয়া নিতান্তই ভয়ংকর হইয়া উঠিল; এখন আর কেহ তাহার কোনো কথায় 'না' বলিতে ভরসা পায় না। দশগ্রীবের এক দাদা ছিলেন, তাঁহার নাম কুবের। তিনিও বিশ্রবা মুনির পুত্র, তাঁহার মাতা, ভরদ্বাজ মুনির কন্যা দেববর্ণিনী। কুবের লঙ্কায় বাস করিতেন। দশগ্রীব তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল, "দাদা লঙ্কাপুরীখানি আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

কাজেই তখন কুবের আর কি করেন? ভালোয় ভালোয় না দিলে জোর করিয়া কাড়িয়া নিবে। তাহার চেয়ে তিনি কৈলাস পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। দশগ্রীবও তখন পরম আনন্দে রাক্ষসের দলসমেত লঙ্কায় আসিয়া রাজা হইয়া বসিল।

ইহার কিছুদিন পরেই দশগ্রীব বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক দানবের সহিত সুর্পনখার বিবাহ দিল। তাহাদের তিন ভাইয়ের বিবাহ হইতেও আর বেশি বিলম্ব হইল না। কিন্তু হায়, শুভকার্য শেষ হইতে না হইতেই ব্রহ্মার আজ্ঞায় ঘোর নিদ্রা আসিয়া কুম্ভকর্ণকে ধরিয়া বসিল। তাহার চোখ বুজিয়া আসিল, মাথা ঢুলিয়া পড়িল, সে বিকট মুখে ভীষণ হাই তুলিয়া বলিল, "দাদা, বড়ই ঘুম পাইয়াছে আমার শয়নের জন্য ঘর করিয়া দাও।" তখনই রাবণের হুকুমে চমৎকার ঘর প্রস্তুত হইল। তাহার ভিতরে গিয়া সেই যে কুম্ভকর্ণ শুইল, হাজার হাজার বৎসরেও আর উঠিল না।

এদিকে দশগ্রীবের জ্বালায় ত্রিভুবন অস্থির! সে দেবতা গন্ধর্ব, মুনি-ঋষি কাহাকেও মানে না, এক ধার হইতে সকলকে মারিয়া তাহাদের বাড়ি, ঘর, বাগান সব চুরমার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুবের তাহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাহাকে বারণ করিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। সে দূতের কথা দশগ্রীব তো শুনিলই না; লাভের মধ্যে বেচারাকে কাটিয়া রাক্ষসদিগকে খাইতে দিল। তারপর রথে চড়িয়া এই বলিয়া সে বাহির হইল, "আমি ত্রিভুবন জয় করিব।"

বাহির হইয়াই সে সকলের আগে গিয়া কুবেরের নিকট উপস্থিত হইল, তাহার উপরেই রাগটা বেশি। কুবেরের যক্ষ অনেক যুদ্ধ করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিল না। দশগ্রীবের সঙ্গে ভীষণ রাক্ষসেরা গিয়াছিল; তাহারা যক্ষদের এমনি দুর্গতি করিল যে তাহা আর বলিবার নহে। যক্ষেরা সোজাসুজি সরলভাবে যুদ্ধ করে, আর রাক্ষসেরা নানারকম ফাঁকি দেয়;

কাজেই যক্ষেরা হারিয়া গেল। কুবের নিজে আসিয়াও বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না। দশগ্রীব তাঁহাকে অস্ত্রের আঘাতে অজ্ঞান করিয়া, তাঁহার 'পুষ্পক' নামক রথখানি লইয়া চলিয়া গেল। সে রথ বড়ই আশ্চর্য ছিল। তাহাতে সঙ্গে দানা, পানি, সইস, কোচমান কিছুরই দরকার হইত না! যেখানে যাইবার হুকুম পাইত অমনি সে উড়িয়া গিয়া সেখানে হাজির হইত।

সেই পুষ্পকরথে চড়িয়া দশগ্রীব স্বর্গের বিশাল শরবনে গিয়া উপস্থিত হইল। পর্বতের উপরে সে অতি পবিত্র বন, কার্তিকেয়ের জন্মস্থান, তাহার উপর দিয়া কোনো রথেরই যাইবার হুকুম নাই! বিশেষত শিব আর পার্বতী তখন সেখানে ছিলেন। কাজে কাজেই পুষ্পক রথ সেখানে গিয়া আটকাইয়া গেল। ইহাতে দশগ্রীব যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় শিবের দূত নন্দী আসিয়া তাহাকে বলিল, "দশগ্রীব, মহাদেব এখানে আছেন, তুমি ফিরিয়া যাও।"

নন্দীর চেহারা বড়ই অদ্ভুত ছিল। ছোট্টো-খাট্টো পিঙ্গলবর্ণ লোকটি, হাত দুখানি এতটুকু, মাথাটি নেড়া, মুখখানি বানরের মতো। দশগ্রীব তাহার কথা শুনিবে কি, সে হাসিয়া অস্থির। কিন্তু নন্দী ছাড়িবার পাত্র নহে। সে ছোট হইলেও দেখিতে বড়ই ষণ্ডা, তাহাতে আবার হাতে ভয়ংকর শূল। দশগ্রীব রাগের ভরে রথ হইতে নামিয়া সবে বলিয়াছিল, "কে রে তোর মহাদেব?" অমনি নন্দী তাহাকে দুই ধমক লাগাইয়া দিল। তখন সে ভারি চটিয়া বলিল, "বটে? আমাকে যাইতে দিবি না? আচ্ছা, দাঁড়া তোদের পাহাড় আমি তুলিয়া নিব।" এই বলিয়া সত সত্যই সে গুঁড়িহাতে সেই পর্বতের তলা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সেকি যেমন তেমন টান? টানের চোটে পর্বত নড়িয়া উঠিল, শিবের ভূতগুলি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, পার্বতী যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া মহাদেবকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। মহাদেব কিন্তু কিছুমাত্র ব্যস্ত হইলেন না।

তিনি কেবল পায়ের বুড়ো আঙুলটি দিয়া পর্বতখানিকে একটু চাপিয়া ধরিলেন তাহাতেই সে তাহার জায়গায় বসিয়া গেল, আর অমনি দরজার কামড়ে দুষ্টু খোকার আঙুল আটকাইবার মতন দশগ্রীব মহাশয়ের হাতখানিও পর্বতের চাপনে আটকাইয়া গেল।

তখন তো দশগ্রীব দশমুখে ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দে চ্যাঁচাইয়া অস্থির! চীৎকারে ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল; সাগর উছলিয়া উঠিল, দেবতারা ছুটিয়া পথে বাহির হইলেন!

হাজার বৎসর ধরিয়া দশগ্রীব ঐরূপ চ্যাঁচাইয়াছিল, আর মহাদেবকে ক্রমাগত মিনতি করিয়াছিল। মহাদেবের দয়ার কথা সকলেই জানে। বেচারার এই কষ্ট দেখিয়া তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে ছাড়িয়া তো দিলেনই, তাহার উপর আবার ভারি ভারি কয়েকটি অস্ত্রও তাহাকে দিয়া দিলেন, আর বলিলেন, "দশগ্রীব, তুমি চমৎকার চ্যাঁচাইয়াছিলে, তোমার চীৎকারে সকলেই ভয় পাইয়াছিল। অতএব এখন হইতে তোমার নাম 'রাবণ' (যে চীৎকারে লোকের ভয় লাগাইয়া দেয়) হইল।" দশগ্রীব দেখিল, পাহাড় চাপা পড়িয়া মোটের উপর তাহার লাভই হইয়াছে, কাজেই সে খুব খুশি হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

দশগ্রীব শিবের নিকট বর পাইয়া রাবণ হইল, অস্ত্রশস্ত্রও অনেকগুলি পাইল। তখন হইতে সে ব্রহ্মাণ্ডময় কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়, আর রাজরাজড়া যাহাকে সামনে পায় তাহাকেই বলে,

"হয় যুদ্ধ কর না হয় হার মান।"

উষীরবীজ নামে একটা জায়গায় মরুত্ত নামে এক রাজা যজ্ঞ করিতেছেন, রাবণ পুষ্পক রথে চড়িয়া হেঁইয়ো হেঁইয়ো শব্দে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞের স্থানে দেবতাদের অনেকেই ছিলেন, রাবণকে দেখিয়াই ভয়ে তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। ছুটিয়া যে পলাইবেন, এতটুকুও তাহাদের ভরসা হইল না; কি জানি পাছে ধরিয়া ফেলে। তাই তাহারা সেইখানেই নানা জন্তুর বেশ ধরিয়া লুকাইয়া রহিলেন। ইন্দ্র হইলেন ময়ূর, ধর্ম হইলেন কাক, কুবের হইলেন গিরগিটি, বরুণ হইলেন হাঁস।

এদিকে মরুত্তের সঙ্গে রাবণের খুবই যুদ্ধ বাধিবার জোগাড় দেখা যাইতেছে, গালাগালি আরম্ভ হইয়াছে মারামারিরও বিলম্ব নাই, এমন সময় মরুত্তের গুরু সম্বর্ত মুনি তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই কেননা তাহা হইলে তোমার যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাতে সর্বনাশ হইবে।" কাজেই মরুত্ত চুপ করিয়া গেলেন, আর রাবণ "জিতিয়াছি জিতিয়াছি" বলিয়া খুবই বাহাদুরী করিতে লাগিল। তারপর সেখানে যত মুনি উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের সকলকে খাইয়া যারপরনাই খুশি হইয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তখন দেবতামহাশয়েরা আবার যার যার বেশ ধরিয়া মনে করিলেন, "বাবা, বড্ড বাঁচিয়া গিয়াছি।" যে সকল জন্তুর সাজ তাঁহারা নিয়াছিলেন, তাহাদের উপরে অবশ্য তাঁহারা খুবই খুশি হইলেন, আর তাহাদিগকে বর দিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র ময়ূরকে বলিলেন, "তোমার সাপের ভয় থাকিবে না, আর আমার যেমন হাজার চোখ, তোমার লেজেও তেমনি হাজার চোখ হইবে।" ময়ূরের লেজে আগে শুধুই নীলবর্ণ ছিল, তখন হইতে তাহাতে চমৎকার চক্র দেখা দিল।

ধর্ম কাককে বলিলেন, "তোমার আর কোনো অসুখ হইবে না। মরণের ভয়ও তোমার দূর হইল; কেবল মানুষে যদি মারে তবেই তোমার মৃত্যু হইবে।"

বরুণ হাঁসকে বলিলেন, "তোমার গায়ের রঙ ধব্‌ধবে সাদা হইবে। তখন হইতে হাঁস সাদা হইয়াছে, আগে তাহার আগাগোড়া সাদা ছিল না, পাখার আগা নীল, আর কোলের দিকে ছেয়ে রঙের ছিল।

কুবের গিরগিটিকে বলিলেন, "তোমার মাথা সোনার মতো হইবে।" সেই হইতে গিরগিটির মাথায় সোনালি রঙ।

এদিকে রাবণের আর গর্বের সীমাই নাই। দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরুরবা প্রভৃতি বড় বড় রাজারা তাহার নিকট হার মানিয়া গেলেন। অন্যের তো কথাই নাই। কিন্তু অযোধ্যার রাজা অনরণ্য কিছুতেই তাঁহার নিকট হার মানিতে রাজি হইলেন না। তিনি আগেই অনেক সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, রাবণ তাঁহার রাজ্যে আসিবামাত্র সেইসকল সৈন্য লইয়া তিনি তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হায়, তাঁহার সে সৈন্য রাবণের সৈন্যদের কাছে দুদণ্ডের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল, নিজেও রাবণের হাতে ভয়ানক আঘাত পাইয়া রথ হইতে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিলেন। রাবণ তখন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "কি? আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এখন কেমন হইল?" অনরণ্য বলিলেন, "মরিতে তো একদিন সকলকেই হয়, কিন্তু আমি তোমার কাছে হটি নাই, যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতেছি আর আমি এ কথা তোমাকে বলিতেছি যে, আমাদের এই বংশে দশরথের পুত্র রামের জন্ম হইবে, সেই রামের হাতে তুমি

তোমার উচিত সাজা পাইবে।”

রাজার কথা শেষ হইতে না হইতেই দেবতারা তাঁহার উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রাজাও দেহ ছাড়িয়া সেখানে চলিয়া গেলেন।

একবার রাবণ মানুষ তাড়াইয়া ফিরিতে ফিরিতে দেখিলেন যে মেঘের উপর দিয়া নারদ মুনি হরিনাম গান করিতে করিতে আসিতেছেন। রাবণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, “কি ঠাকুর মহাশয়, মঙ্গল তো? কিজন্য আসিয়াছেন?

নারদ বলিলেন, “আসিয়াছি যে বাপু, একটা কথা আছে। এইসব মানুষ যখন মৃত্যুর বশ, তখন এরা তো মরিয়াই রহিয়াছে;ইহাদিগকে মারিবার জন্য তুমি আবার এত পরিশ্রম কেন করিতেছ? ইহারা আপনা আপনিই একদিন যমের বাড়ি যাইবে! বাস্তবিক যমই যত নষ্টের গোড়া। অতএব, সেই বেটাকে যদি জব্দ করিতে পার, তবে সকলকেই জয় করা হইবে।”

রাবণ বলিল, “বড় ভালো কথা বলিয়াছেন, ঠাকুর মহাশয়! আমি এখনি যাইতেছি।” বলিয়াই আর এক মুহূর্তও দেরি নাই, অমনি রাবণ যমপুরীর পথ ধরিয়াছে। তখন নারদ ভাবিলেন, ‘এবারে মজাটা হইবে ভালো। যাই, একবার দেখিয়া আসি।”

নারদ রাবণের আগেই গিয়া যমের নিকট উপস্থিত হইলেন। যম বিচারাসনে বসিয়া অগ্নিসাক্ষী করিয়া সকলের পাপপুণ্যের বিচার করিতেছিলেন, নারদকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া নমস্কারপূর্বক বলিলেন, “মুনিঠাকুরের আজ কি চাই?”

নারদ বলিলেন, “সাবধান হও বাছা, রাবণ তোমাকে জয় করিতে আসিতেছে। মুশকিল হইতে আটক নাই কিন্তু বেটা বড় বেখাপ্পা লোক।”

বলিতে বলিতেই রাবণের ঝক্‌ঝকে পুষ্পক রথও আসিয়া দেখা দিল! রথ হইতে নামিয়াই সে দেখিল যে নরকের কুণ্ডে দলে দলে পাপী সকল যমদূতগণের তাড়নায় চীৎকার করিতেছে। অমনি আর কথাবার্তা নাই, সে যমদূতগুলিকে বিধিমতে ঠ্যাঙাইয়া সকল পাপীকে ছাড়িয়া দিল। সে বেচারারা হঠাৎ ছাড়া পাইয়া যে কি আশ্চর্য আর খুশি হইল, তাহা আর বলিবার নয়। তখন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সে বড়ই ভয়ংকর। যমপুরীতে অসংখ্য সিপাহী সান্ত্রী থাকে, তাহাদের এক একজন ভয়ানক যোদ্ধা। তাহারা রাবণ আর তাহার লোকগুলিকে মারিয়া রক্তারক্তি করিয়া দিল। মার খাইয়াও কিন্তু রাবণ যুদ্ধ করিতে ছাড়ে না। শূল শক্তি প্রাস গদা গাছ পাথর কত যে ছুঁড়িল তাহার লেখাজোখা নাই। তখন যমের লোকেরা আর রাক্ষসকে ছাড়িয়া কেবল রাবণের উপরেই এমন ভয়ানক অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তাহাতে পুষ্পক রথ অবধি ডুবিয়া গিয়া রাবণের দম আটকিয়া মরিবার গতিক। দুর্দশার একশেষ! রক্তধারায় দেহ ভাসিয়া গেল; কবচ কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। তখন কাজেই তাহাকে রথ হইতে নামিযা আসিতে হইল।

এতক্ষণে আব রাবণের বুঝিতে বাকি রহিল না যে এবারে একটু বেগতিক, একটা বড়রকমের অস্ত্র না ছাড়িতে পারিলে আর চলিতেছে না। কাজেই সে তখন ধনুকে পাশুপত অস্ত্র জুড়িয়া যমের লোকদিগকে বলিল, “দাঁড়া বেটারা, এবারে তোদের দেখাইতেছি।” এই বলিয়া সে সেই ভয়ংকর অস্ত্র ছুঁড়িবামাত্রই, তাহার তেজে যমের সকল সিপাহী ভস্ম হইয়া গেল। তখন রাবণের আর রাক্ষসগণের সিংহনাদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে আর কি?

সেই সিংহনাদ শুনিয়াই যম বুঝিতে পারিলেন যে রাক্ষসদিগের জয় হইয়াছে। তখন

কাজেই রথে চড়িয়া তাঁহাকে স্বয়ংই বাহির হইতে হইল। সে যে কি ভয়ংকর রথ সে কথা আমি বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তাহার উপর আবার স্বয়ং মৃত্যু প্রাস মুদগর লইয়া ভীষণ বেশে যমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কালদণ্ড প্রভৃতি ভয়ংকর অস্ত্রসকল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে।

সেই রথ আর তাহার ভিতর মৃত্যুকে দেখিয়াই রাবণের লোকেরা "বাপ রে। আমাদের যুদ্ধে কাজ নাই" বলিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দিল। কিন্তু রাবণ তাহাতে ভয় না পাইয়া যমের সঙ্গে খুবই যুদ্ধ করিতে লাগিল। অস্ত্রের ভয় তো তাহার নাই, কারণ সে জানে যে ব্রহ্মার বরের জোরে সে মরিবে না! কাজেই অনেক খোঁচা যেমন খাইল, খোঁচা দিলও ততোধিক। খোঁচা খাইয়া যম রাগে অস্থির হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল।

তখন মৃত্যু যমকে বলিল, "আমাকে আজ্ঞা করুন আমি এখনই এই দুষ্টকে মারিয়া দিতেছি! আমি ভালো করিয়া তাকাইলে আর ইহাকে এক মুহূর্তও বাঁচিতে হইবে না।" যম বলিলেন, "দেখ না, আমি ইহাকে কি সাজা দিই।" এই বলিয়াই তিনি রাগে দুই চোখ লাল করিয়া তাঁহার সেই ভীষণ 'কালদণ্ড' হাতে নিলেন। সে দণ্ড যাহার উপর পড়ে তাহার আর রক্ষা থাকে না।

যমকে কালদণ্ড তুলিতে দেখিয়া ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল, কে কোন দিক দিয়া পলাইবে তাহার ঠিক নাই, দেবতাদের অবধি বুক ধড়াস্ ধড়াস্ কবিতেছে। তখন ব্রহ্মা নিতান্ত ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া যমকে বলিলেন, "সর্বনাশ, কর কি? এই কালদণ্ড তুমি ছুঁড়িলেই যে আমার কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে। কালদণ্ড আমিই গড়িয়াছি, বাবণকেও আমি বর দিয়াছি। আমিই বলিয়াছি যে কালদণ্ড কিছুতেই ব্যর্থ হইবে না। আবার আমিই বলিয়াছি যে রাবণ কোনো দেবতার হাতে মরিবে না। এখন এই অস্ত্রে যদি বাবণ মরে, তাহা হইলেও আমার কথা মিথ্যা হয়, যদিনা মরে তাহা হইলেও আমার কথা মিথ্যা হয়। লক্ষ্মীটি আমাব মান রাখ, এ অস্ত্র তুমি ছুঁড়িও-না।"

কাজেই যম তখন আর কি করেন? তিনি বলিলেন, "আপনি হইতেছেন আমাদের প্রভু, সুতরাং আপনার হুকুম মানিতেই হইবে। কিন্তু যদি এ দুষ্টকে মারিতেই না পারিলাম, তবে আর আমার এখানে থাকিয়াই কি ফল?" এই বলিয়া যম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া রাবণ হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বলিল, "দুয়ো! দুয়ো! হারিয়া গেলি! হারিয়া গেলি!" ততক্ষণে অন্য রাক্ষসদেরও খুবই সাহস হইয়াছে, আর তাহারা আসিয়া, "জয় রাবণের জয়।" —বলিয়া আকাশ ফাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ব্রহ্মার কথায় যম যুদ্ধ ছাড়িয়া দিলেন। রাবণ ভাবিল, সেটি তাহার নিজেরই বাহাদুরী। তখন আর তাহার গর্বের সীমাই রহিল না। সে বাছিয়া বাছিয়া বড়-বড় যোদ্ধাদের সহিত বিবাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বরুণের পুত্রগণ তাহার নিকট হারিয়া গেলেন, বরুণ নিজে ব্রহ্মার বাড়িতে গান শুনিতে যাওয়ায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাই তাঁহার মান বাঁচিল। সূর্য যুদ্ধ না করিয়াই বলিলেন, "আমি হার মানিতেছি।" রাবণের ভগ্নিপতি বিদ্যুজ্জিহ্ব বেচারাও তাহার হাতে মারা গেল।

কিন্তু সকল জায়গায়ই যে রাবণ বাহাদুরী পাইয়াছিল তাহা নহে। বলির বাড়িতে গিয়া সে অনেক বড়াই করিয়াছিল। বলি তাহাকে ধরিয়া নিজের কোলে বসাইয়া বলিলেন, "কি চাও বাপু?" রাবণ বলিল, "শুনিয়াছি বিষ্ণু নাকি আপনাকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। আমি

আপনাকে ছাড়াইয়া দিতে পারি।"

এ কথা শুনিয়া বলির ভারি হাসি পাইল। তারপর তিনি কথায় কথায় তাহাকে বলিলেন, "ঐ যে ঝক্‌ঝকে চাকাটি দেখিতেছ ওটি আমার কাছে লইয়া আইস তো?" এ কথায় রাবণ নিতান্ত অবহেলার সহিত গিয়া সেই জিনিসটি উঠাইল, কিন্তু কিছুতেই সেটিকে লইয়া আসিতে পারিল না। সে লজ্জিত হইয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে করিতে শেষে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

খানিক পরে রাবণের জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তখন আর লজ্জায় বেচারা মাথা তুলিতে পারে না। তখন বলি তাহাকে বলিলেন, "এই চাকাটি আমার পূর্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল।"

আর একবার রাবণ পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া একটি দ্বীপে আগুনের মতো তেজস্বী এক ভয়ংকর পুরুষকে দেখিল। তাঁহাকে দেখিয়াই রাবণ বলিল, "যুদ্ধ দাও।" তারপর সে তাঁহাকে কত শূল, কত শক্তি, কত ঋষ্টি, কত পট্টিশের ঘা মারিল, কিন্তু তাঁহার কিছুই করিতে পারিল না। তখন সেই ভয়ংকর পুরুষ রাবণকে টিকটিকির মতন ধরিয়া দুহাতে এমনি চাপিয়া দিলেন যে তাহাতেই তাহার প্রাণ যায় যায়। তারপর তিনি তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া পাতালে চলিয়া গেলেন। কিঞ্চিৎ পরে রাবণ উঠিয়া রাক্ষসদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "সেই ভয়ংকব লোকটা কোথায় গেল?" রাক্ষসেরা একটা গর্ত দেখাইয়া বলিল, "সে ইহারই ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে।" অমনি রাবণও তাড়াতাড়ি সেই গর্তের ভিতর ঢুকিল। তারপর পাতালের মধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে এক জায়গায় গিয়া দেখিল সেই মহাপুরুষ একটা খাটের উপর ঘুমাইয়া আছেন। সেখানে গিয়া রাবণ সবে দুষ্ট ফন্দি আঁটিতেছে, এমন সময় সেই ভয়ংকর পুরুষ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, আর তাহাতেই রাবণ কানে তালা লাগিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। তখন ভয়ংকর পুরুষ তাহাকে বলিলেন, "আর কেন? এই বেলা চলিয়া যাও! ব্রহ্মা তোমাকে অমর হইবার বর দিয়াছেন। কাজেই তোমাকে বধ করা হইল না।" এই ভয়ংকর পুরুষ ছিলেন ভগবান কপিল।

আর একবার রাবণ গিয়াছিল মাহিষ্মতীর রাজা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে। মাহিষ্মতীতে গিয়া সে অর্জুনের মন্ত্রীদিগকে বলিল, "তোমাদের রাজা কোথায়? আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিব।" মন্ত্রীরা বলিলেন, "তিনি বাড়ি নাই।"

এ কথায় রাবণ সেখান হইতে বিন্ধ্যপর্বতে চলিয়া আসিল। বিন্ধ্য অতি সুন্দর পর্বত। সেই পর্বতের নীচ দিয়া নর্মদা নদী বহিতেছে, তাহার শোভা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এমন নির্মল জল, এমন শীতল বায়ু, এতরকমের ফুল আর অতি অল্পস্থানেই আছে। রাবণ মনের সুখে সে জলে নামিয়া স্নান করিল।

ঠিক সেই সময়ে একটা ভারি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতেছিল। নর্মদার জল স্বভাবতই পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে বহিয়া থাকে, কিন্তু সেদিন দেখা গেল যে তাহা এক একবার হঠাৎ উঁচু হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। ইহাতে রাবণ যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া শুক সারণকে বলিল, "দেখ তো ব্যাপারটা কি?"

শুক সারণ তখনই পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল, আর খানিক পরেই ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মহারাজ, প্রকাণ্ড শালগাছের মতো উঁচু একটা লোক নর্মদায় নামিয়া স্নান করিতেছে। উহার এক হাজারটা হাত। সেই হাজার হাতে সে এক একবার নদীর জল

আগলাইয়া ঠেলিয়া দিতেছে, আর তাহাতেই সে জল এত উঁচু হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

এ কথা শুনিয়া রাবণ বলিয়া উঠিল—"অর্জুন"। তারপর আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া অমনি গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিল। অর্জুনের লোকেরা তাহাকে আটকাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাক্ষসেরা তাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া গিলিয়া খাইয়া নাকাল করিয়াছিল।

অর্জুন একথা শুনিতে পাইয়া বিশাল গদা হাতে ছুটিয়া আসিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু সেই গদার সম্মুখে তাহারা কিছুতেই টিকিতে না পারিয়া শেষে ছুটিয়া পলাইল। তখন রাবণ আর অর্জুনের যে যুদ্ধ হইল, সে বড়ই ভয়ানক। দুজনেরই যেমন বিশাল দেহ, হাতে তেমনি ভীষণ গদা। রাবণ ভয়ানক তেজের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু শেষে অর্জুনের গদার ঘায়ে অস্থির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। অর্জুনও অমনি তাহাকে ধরিয়া এমনি বাঁধন বাঁধিলেন যে সে কথা আর বলিবার নয়; তাহা দেখিয়া দেবতাগণের কি আনন্দই হইল। তাঁহারা যে যত পারিলেন, অর্জুনের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

এদিকে রাক্ষসেরা আসিয়া অর্জুনের হাত হইতে রাবণকে ছাড়াইয়া নিতে কত চেষ্টাই করিল, কিন্তু সে কি তাহাদের কাজ? অর্জুন তাহাদিগকে বিধিমতে ঠ্যাঙাইয়া রাবণকে লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন।

এখন রাবণের তো আর সংকটের সীমাই নাই, এ সংকট হইতে তাহাকে কে বাঁচায়? বাঁচাইবার লোক একটিমাত্র আছেন, তিনি হইতেছেন উহার পিতামহ পুলস্ত্য মুনি। মুনিঠাকুর নাতির মায়া এড়াইতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া অর্জুনকে বলিলেন, "বাছা, আমার নাতিটিকে ছাড়িয়া দাও। উহাকে যে সাজা দিয়াছ তাহাতেই তোমার খুব নাম হইবে, আর উহাকে রাখিয়া লাভ কি?"

এ কথায় অর্জুন খুশি হইয়া তখনই রাবণকে ছাড়িয়া দিলেন; সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া চোরের মতো সেখান হইতে চলিয়া আসিল। কিন্তু দুষ্ট লোকের লজ্জা আর কতকাল থাকে? দুদিন পরেই দেখা গেল যে, রাবণ আবার রাজাদিগকে খোঁচাইয়া ফিরিতেছে।

মুনির কথায় অর্জুন রাবণকে ছাড়িয়া দিলেন, আবার তাহার সহিত বন্ধুতাও করিলেন। কাজেই তখন আর তাহার দর্পের সীমা রহিল না। যে কোনো বীরের নাম শুনিলেই সে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া উপস্থিত হয় আর তর্জন গর্জন করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়। এমনি করিয়া একদিন সে কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া তর্জন গর্জন করিতে লাগিল, —"বালী কোথায়? আমি যুদ্ধ করিব!"

বালী তখন বাড়ি ছিল না, সমুদ্রের ধারে সন্ধ্যা করিতে গিয়াছিল। অন্য বানরেরা রাবণকে বলিল, "বালী সন্ধ্যা করিতে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন। ততক্ষণ তুমি এই বিচিত্র সংসারখানি একবার শেষ দেখা দেখিয়া লও; কারণ বালী আসিলে তোমার প্রাণের আশা তিলমাত্রও থাকিবে না। আর, যদি তোমার নিতান্তই শীঘ্র শীঘ্র মরিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে না হয় দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া লও।"

রাবণ তখনই বানরদিগকে বকিতে বকিতে পুষ্পকরথ হাঁকাইয়া চলিয়া গেল, আর খানিক দূর গিয়াই দেখিল, বালী সোনার পাহাড়ের ন্যায় সমুদ্রের ধারে বসিয়া আছে। তাহার

মুখখানি সকালবেলার সূর্যের মতো লাল আর উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। রাবণ ভাবিল, চুপি চুপি গিয়া বানরকে হঠাৎ জাপটিয়া ধরিতে হইবে। এই বলিয়া সে খুবই চুপি চুপি যাইতে লাগিল; সে জানে না যে, বালী ইহার আগেই তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে। আর তাহার মনের কথাটি ঠিক বুঝিয়া লইয়া তাহারই জন্য চুপ করিয়া বসিয়া আছে—একটিবার হাতের কাছে পাইলেই তামাশাটা দেখাইয়া দিবে।

চোখে ভ্রূকুটি, মুখে ঘামাচি, হাত দুটি বিষম ব্যগ্রভাবে বাড়ান, এমনিভাবে আসিয়া রাবণ চোরের মতো বালীর পিছনে দাঁড়াইল; ভাবিল, 'এইবার ধরি!' কিন্তু হায়, তাহার আগেই বালী তাহাকে ধরিয়া বগলে পুরিয়া ফেলিল। সে একটিবার পিছনবাগে তাকাইয়াও দেখে নাই, অথচ ঠিক ফড়িংটির মতো রাক্ষসের বাছাকে ধরিয়া বগলে পুরিয়াছে। রাবণের সঙ্গের রাক্ষসগুলি অবশ্য তখন বড়ই ব্যস্ত হইয়া বালীকে মারিতে গিয়াছিল, কিন্তু বালীর কয়েকটা হাত-পা নাড়া খাইয়াই তাহারা কাঁপিয়া অস্থির, যুদ্ধ আর করিবে কি?

এদিকে রাবণ বালীর বগলে থাকিয়া প্রাণপণে তাহাকে আঁচড় কামড় দিতেছে, কিন্তু বালীর কাছে তাহা পিঁপড়ের কামড়ের মতোও ঠেকিতেছে না। বালী সেসব অগ্রাহ্য করিয়া নিজের সন্ধ্যাবন্দনায় মন দিল। দক্ষিণ সাগরের সন্ধ্যা শেষ হইলে, রাবণকে বগলে লইয়াই সে শূন্যপথে পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া সন্ধ্যা করিতে লাগিল। তারপর উত্তর সমুদ্রে আর পূর্ব সমুদ্রেও ঠিক সেইরূপ সন্ধ্যা শেষ না করিয়া সে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিল না। ততক্ষণে সেই বগলের চাপে আর গন্ধে আর ঘামে রাবণের কি দশা হইয়াছিল, বুঝিয়া লও।

কিষ্কিন্ধ্যায় বালী রাবণকে বগল হইতে বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" রাবণ যাতনায় মিটিমিটি চোখে বলিল, "আমি লঙ্কার রাজা রাবণ, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম। আপনি আমাকে পশুর মতো ধরিয়া এত পথ ঘুরাইয়া আনিলেন, আপনার কি আশ্চর্য ক্ষমতা! আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুতা করিব।" সুতরাং তখন দুজনে বন্ধুতা হইয়া গেল। কাজেই সাজা পাইয়াও রাবণের শিক্ষা হইল না। সে আবার ব্রহ্মাণ্ডময় খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, কোন ছলে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিয়া একটু বাহাদুরী লইতে পারে কি না।

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার একদিন নারদ মুনির সঙ্গে রাবণের দেখা হইয়াছে। রাবণ বলিল, "মুনিঠাকুর, বলুন তো, কোন দেশের লোকের গায়ে সকলের চেয়ে বেশি জোর? তাহাদের সহিত আমি যুদ্ধ করিব।" মুনি বলিলেন, "ক্ষীরোদ সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপ নামে একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের লোকের মতো বলবান আর ধার্মিক মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।" এ কথা শুনিবামাত্রই রাবণ শ্বেতদ্বীপের দিকে পুষ্পকরথ চালাইয়া দিল, মুনিঠাকুরও একটু চিন্তা করিয়া তামাশা দেখিবার জন্য সেইখানেই চলিয়া গেলেন।

তারপর রাক্ষসেরা তো সিংহনাদ করিতে করিতে শ্বেতদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সে স্থানের এমনি তেজ যে তাহারা কিছুতেই সেখানে টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না। হাওয়ায় পুষ্পক রথ উড়াইয়া নিল, রাক্ষসেরা সকলে ভয়ে পলায়ন করিল। কাজেই তখন আর কি করে? সে রথ আর লোকজন সব ছাড়িয়া দিয়া নিজেই গিয়া দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করিল।

সেখানে কয়েকটি মেয়ে বেড়াইতেছিল। তাহারা দেখিল, দশ মাথা আর কুড়ি হাতওয়ালা

একটা লোক পথ দিয়া যাইতেছে, আর প্রাণপণে নিজের চেহারাটাকে ভয়ংকর করিবার চেষ্টা করিতেছে। এসব দেখিয়া তাহাদের বড়ই হাসি পাওয়ায় তাহাদের একজন আসিয়া রাবণের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে বাপু? তোমার বাবার নাম কি? এখানে আসিয়াছ কি করিতে?" এ কথায় রাবণের একটু রাগ হইল। সে খুব গম্ভীর সুরে উত্তর দিল, "আমি বিশ্রবার পুত্র রাবণ। এখানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি, কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।"

শুনিয়া মেয়েরা সকলে খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর তাহাদের একজন এক হাতে রাবণের কোমর ধরিয়া অন্য মেয়েদের সামনে নিয়া তাহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, "দেখ দেখ, আমি কেমন একটা কালো পোকা ধরিয়াছি; এর আবার দশটা মাথা, কুড়িটা হাত!" বলিয়াই সে সেটা আর একজনকে ছুঁড়িয়া দিল, সে আবার দিল আরেকজনের হাতে ছুঁড়িয়া। তখন তো রাবণকে লইয়া খুবই একটা লোফালুফির ধুম পড়িয়া গেল। মেয়েদের তাহাতে আমোদের সীমাই নাই, কিন্তু রাবণ বেচারার প্রাণ লইয়া টানাটানি। কাজেই তখন সে আর কি করে? সে দশ মুখের তিনশত বিশ দাঁতে 'কট্রাশ!' করিয়া এক মেয়ের হাতে এক কামড় বসাইয়া দিল। সে মেয়ে তো তখনই "মা-া-া-া গো-া-া!" বলিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া প্রাণপণে হাত ঝাড়িতে লাগিল। ততক্ষণে আরেকটি মেয়ে তাহাকে ধরিয়া শূন্যে লইয়া গিয়াছিল, তাহার হাতে সে দিল ভয়ানক আঁচড়াইয়া! সে মেয়েটি তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ছুঁড়িয়া একেবারে সমুদ্রের মাঝখানে ফেলিয়া দিল।

নারদমুনি অবশ্য এতক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতেছিলেন, আর আনন্দে অস্থির হইয়া কেবলই হো হো শব্দে হাস্য আর করতালি দিয়া নৃত্য করিতেছিলেন।

বলাবাহুল্য, রাবণের যুদ্ধের সাধ সেদিন সেই সমুদ্রের জল খাইয়া মিটিয়াছিল।

শব্দবেধী

জন্তুকে না দেখিয়া, কেবলমাত্র তাহার শব্দ শুনিয়াই যে তাহাকে তীর দিয়া বিঁধিতে পারে, তাহাকে বলে 'শব্দবেধী'।

রাজা দশরথ এইরূপ 'শব্দবেধী' ছিলেন। যুবা বয়সে অনেক সময় তিনি রাত্রিতে বনে গিয়া এইরূপে কত হাতি, মহিষ, হরিণ শিকার করিতেন। বর্ষার রাত্রে তীর-ধনুক লইয়া চুপিচুপি সরযুর ধারে বসিয়া থাকিতে তাঁহার বড়ই ভালো লাগিত। নদীর ঘাটে নানারূপ জন্তু জল খাইতে আসিত; সেই জলপানের শব্দ একটিবার দশরথের কানে গেলে আর সে জন্তুকে ঘরে ফিরিতে হইত না।

একবার এইরূপ বর্ষার রাত্রিতে দশরথ সরযুর ধারে তীর-ধনুক লইয়া বসিয়া আছেন। মনে আর কোনো চিন্তা নাই, খালি কান পাতিয়া রহিয়াছেন, কখন কোন জানোয়ারের শব্দ শোনা যাইবে। প্রায় সমস্ত রাত্রি এইভাবে কাটিয়া গিয়াছে, ভোর হইতে আর বেশি বাকি নাই। এমন সময় নদীর ঘাট হইতে 'গুড়্-গুড়্-গুড়্-গুড়্' করিয়া একটা আওয়াজ আসিল!

দশরথ চমকিয়া ভাবিলেন, 'ঐ হাতি!' আর সেই মুহূর্তেই সেই শব্দের দিকে একটি

ভয়ংকর বাণ শন্‌শন্‌ শব্দে ছুটিয়া চলিল।

দশরথ জানেন না যে সে বাণে কি সর্বনাশ হইবে। সে শব্দ তো হাতির শব্দ নয়, ঋষির পুত্র ভোরের বেলায় কলসী হাতে ঘাট হইতে জল নিতে আসিয়াছেন, সেই কলসীতে জল পোরার ঐ শব্দ।

অন্ধ পিতামাতা বিছানায় পড়িয়া কষ্ট পাইতেছেন; তাঁহারা একে যারপরনাই বুড়া, তাহাতে আবার নিতান্ত দুর্বল, চলিবার শক্তি নাই। পিপাসায় তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, তাই ছেলেটি ছুটিয়া জল নিতে আসিয়াছেন, এমন সময় কোথা হইতে এই নিদারুণ বাণ আসিয়া তাহার বুকে বিঁধিল। রক্তে দেহ ভাসিয়া গেল, কলসী হাত হইতে পড়িয়া গেল।

ঋষিপুত্র ধূলায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে বলিলেন, "আহা! আমি তো কাহারও কোনো অনিষ্ট করি না। বনে থাকি, ফলমূল খাই আর বৃদ্ধ অন্ধ পিতামাতার সেবা করি! ওগো! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে এমন নিষ্ঠুর সাজা আমাকে দিলে? হায় হায! আমার পিতামাতাকে দেখিবাব যে আর কেহই নাই। আমি মরিলে যে আর তাঁহারা কিছুতেই বাঁচিবেন না!"

ঋষিপুত্রের কথা শুনিয়া দশরথেব হাত হইতে ধনুর্বাণ পড়িয়া গেল। তিনি দুঃখে অস্থির হইযা পাগলের মতো ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন যে সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে!

তখন ঋষিপুত্র অতি কষ্টে তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! আমার কি অপরাধ ছিল? এই এক বাণে আমারও প্রাণ গেল, আমার পিতামাতারও প্রাণ গেল। আহা! মা আর বাবা পিপাসায় কাতর হইয়া পথ চাহিয়া আছেন, আমি গেলে জল খাইতে পাইবেন।"

দুঃখে দশরথেব বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তাঁহার কথা বলিবার শক্তি নাই। তাহা দেখিয়া সেই যাতনার মধ্যেও ঋষিপুত্রের দয়া হইল; তিনি বলিলেন, "মহারাজ! আর এখানে বিলম্ব করিবেন না। এই সরু পথে আমাদেব কুটিরে যাওয়া যায়। শীঘ্র গিয়া আমার পিতাকে এই সংবাদ দিন, আর তাঁহার রাগ দূর করুন, নইলে তিনি আপনাকে ভয়ংকর শাপ দিবেন। আর এই বাণ যে আমার বুকে বিঁধিয়া রহিয়াছে, ইহাব যন্ত্রণা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, শীঘ্র এটাকে তুলিয়া দিন।"

দশরথ ভাবিলেন, "হায়! আমি এখন কি করি? বাণ না তুলিলে ইঁহার যন্ত্রণা যাইবে না, কিন্তু বাণ তুলিলেই ইঁহার মৃত্যু হইবে।"

তখন ঋষিপুত্র বলিলেন, "আপনার কোনো ভয় নাই। বাণ তুলিবার সময় যদি আমি মরিয়া যাই, তাহাতে আপনার ব্রাহ্মণবধের পাপ হইবে না। আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমার পিতা বৈশ্য, মা শূদ্রের মেয়ে।"

এ কথায় দশরথ ঋষিপুত্রের বুক হইতে বাণ টানিয়া বাহির করিলেন, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটির প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তখন সেই কলসী ভরিয়া জল লইয়া দশরথ নিতান্ত দুঃখিত মনে ধীরে ধীরে কুটিরের দিকে চলিলেন। সেখানে অন্ধ মুনি আর তাঁহার অন্ধ পত্নী পিপাসায় কাতর হইয়া পুত্রের আশায় বসিয়া আছেন। দশরথেব পায়ের শব্দ শুনিয়া মুনি বলিলেন, "বাবা, এত বিলম্ব কেন হইল? তোমার জন্য তোমার মা বড় ব্যস্ত হইয়াছেন, শীঘ্র ঘরে আইস। তুমি কি রাগ করিয়াছ বাবা? আমাদের যদি কোনো দোষ হইয়া থাকে, তাহা তোমার মনে করা উচিত নয়। তুমি কথা কহিতেছ না কেন?"

দশরথের চোখ জলে ভরিয়া গেল। তিনি অনেক কষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভগবন্, আমি আপনার পুত্র নহি। আমি ক্ষত্রিয়, আমার নাম দশরথ। আজ এই অভাগার বাণে আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। আমি জন্তু মারিবার জন্য সরযূর ধারে বসিয়াছিলাম। আপনার পুত্রের কলসীতে জল ভরার শব্দ শুনিয়া মনে করিলাম বুঝি হাতির শব্দ। অন্ধকারের ভিতরে সেই শব্দের দিকে বাণ ছুঁড়িলাম, তাহাতেই এই সর্বনাশ হইল। এখন এই পাপীর প্রতি আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন।"

এই বলিয়া দশরথ ছল ছল চোখে জোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মুনি এই দারুণ সংবাদ শুনিয়াও সাধারণ লোকের মতো ব্যস্ত হইলেন না, রাজাকে কোন কঠিন শাপও দিলেন না। তিনি কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "মহারাজ! তুমি না জানিয়া এ কাজ করিয়াছ, তাই রক্ষা পাইলে, নাহিলে আজ তোমার বংশসুদ্ধ নষ্ট হইত। এখন এক কাজ কর, আমরা আমাদের পুত্রের নিকট যাইতে চাহি, একটিবার আমাদিগকে সেখানে লইয়া চল।"

রাজা তখনই তাঁহাদের দুজনকে সরযূর ধারে লইয়া আসিলেন। তাঁহাদের চক্ষু নাই, সুতরাং জন্মের মতো একটিবার পুত্রের মুখ দেখিবার উপায় নাই। তাঁহারা কেবল তাঁহার দেহের উপর পড়িয়া বারবার তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। তারপর চিতা প্রস্তুত করিয়া সেই দেহ পোড়ান হইল।

তখন অন্ধ মুনি নিতান্ত দুঃখের সহিত রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! পুত্রের শোকে আমি এখন যে দুঃখ পাইতেছি, এইরূপ পুত্রশোক তোমাকেও পাইতে হইবে।"

এই বলিয়া তাঁহারা দুজনে সেই চিতায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, আর দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের শরীর ভস্ম হইয়া গেল।

ইহার অনেক বৎসর পরে বৃদ্ধ বয়সে, কৈকেয়ীর ছলনায় দশরথ রামকে বনে দেন, আর সেই রামের শোকে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন অন্ধ মুনির সেই কথাগুলি তাঁহার মনে পড়িয়াছিল—

'পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি।।'

ছোট্ট রামায়ণ

বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে
ছায়া তার মধুময়, বায়ু বহে ধীরে,
সুখে পাখি গায় গান ফোটে কত ফুল,
কিবা জল নিরমল, চলে কুল-কুল।
মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়,
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।
রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
সে বড় সুন্দর কথা শুন মন দিয়া।

আদিকাণ্ড

সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যা নগর,
দেবতার পুরী হেন পরম সুন্দর।
সোনা মণি মুকুতায় করে ঝলমল,
ছায়া লয়ে খেলে তার সরযুর জল।
বড় ভালো দশরথ সে দেশের রাজা,
দুঃখী জনে দেন সুখ, শঠে দেন সাজা।
রাণী তাঁর তিনজন, পরীর মতন,
দেবতা সেবায় সদা কৌশল্যার মন।
কৈকেয়ী রূপসী বড়, থাকেন আদরে,
সুমিত্রা সরলা তাঁর মুখে মধু ঝরে।

ছেলে নাই, আহা তাই ব্যথা বড় মনে,
কত পূজা করে রাজা আনি মুনিগণে।
আসিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিমহাশয়,
শিঙ নেড়ে কথা কন, দেখে লাগে ভয়।
ভাবি যজ্ঞ করিলেন সেই মুনিবর,
'পুত্রেষ্টি' তাহার নাম, দেখিতে সুন্দর
আগুনে ঢালিয়া ঘৃত, যত মুনিগণে
সুগভীর সুরে মন্ত্র পড়েন সঘনে।
সে আগুন হতে তায়, পায়স লইয়া,
লালবেশে দেবদূত আসিল উঠিয়া
কালো মুখে হাসি, তাহে ঘোর দাড়ি জট,
লাল চোখ পাকাইয়া তাকায় বিকট।
রাজারে পায়স দিয়া কহিল সেজন,
"রাণীদের দাও গিয়া করিতে সেবন।"
এতেক বলিয়া দূত গেল মিলাইয়া,
সুখে খান রাণীগণ পায়স বাঁটিয়া।

তাহার পরে বছর গেলে,
রাজার হল চারিটি ছেলে।
আদরে তুলে নিলেন বুকে,
সুখের হাসি ফুটিল মুখে।
বাজনা বাজে মধুর স্বরে,

শঙ্খ বাজে ঠাকুরঘরে।
কাঙাল হাসে কতই পেয়ে,
নড়িতে নারে মিঠাই খেয়ে।

মুনি রাখিলেন নাম, বড় ছেলে হল রাম,
মাতা হন কৌশল্যা যাহার,
কৈকেয়ী রাণীর ঘরে জন্মে যে তাহার পরে
ভরত হইল নাম তার।
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন আর, দুই ছেলে সুমিত্রার,
দুই ভাই ছোট সকলের,
চারিটি চাঁদের মতো চারি ভাই বাড়ে যত
দেখে চোখ জুড়ায় লোকের।
স্নেহে মিলে চারি ভাই খেলা করে এক ঠাঁই,
হয়ে সবে এক প্রাণ মন,
লেখাপড়া যত হয়, সকল শিখিয়া লয়,
যাহা কিছু জানে গুরুজন।
তার খেলা কত মতো শিখিল তা, কব কত?
মহাবীর হল চারি ভাই,
যারে ধরে একবার, আকাশ পাতালে তার
পালাবার নাহি রহে ঠাঁই।

একদিন রাজা আছেন বসিয়া
সিংহাসনে আপনার,
বিশ্বামিত্র মুনি এমন সময়ে
এলেন সভায় তাঁর।
রাজা কন, "প্রভু, কিসের লাগিয়া,
আসিলেন মোর পাশ?"
মুনি কন, "হায় দুষ্ট নিশাচর
সকল করিল নাশ।
লুকায়ে আসিয়া রকত ঢালিয়া
মোর যজ্ঞ করে মাটি;
দিন কয় তরে দেহ গো রামেরে,
রাক্ষস দিবে সে কাটি।"
ত্রাসে দশরথ কহেন কাঁপিয়া,
"তাও কি কখনো হয়?
রাক্ষসের মুখে কেমনে বাছারে

পাঠাইব মহাশয়।"
শুনিয়া অমনি উঠিলেন মুনি
বিষম রোষেতে জ্বলি;
হয় সর্বনাশ দেন বুঝি শাপ,
না জানি কি কথা বলি!
ভয়ে সভাজনে কহে, "মহারাজ!
দেহ দেহ রামে আনি,
ভালো হবে তার, মুনির কৃপায়,
না হবে কোনোই হানি।"
শুনিয়া তখনি রাম লক্ষ্মণেরে
দেন রাজা আনাইয়া।
মহা খুশি হয়ে যান মুনি তায়
দুইটি ভাইকে নিয়া।

রণবেশে দুই ভাই সাজি তারপর,
মুনির সহিত যান লয়ে ধনু-শর।
গুরুজন খান চুমো তাঁদের মাথায়,
দেবতার নাম লয়ে করেন বিদায়।
পথে রাম শিখিলেন সরযূর তটে
দুই বিদ্যা অদ্ভুত মুনির নিকটে।
এক তার 'বলা', তাহে যায় রোগ ভয়,
'অতিবলা' আর, তাতে হয় রণে জয়।
দুইদিন পরে তাঁরা হন গঙ্গা পার,
তারপরে ঘন বন, বড় অন্ধকার।
রামেরে বলেন মুনি, "হেথায়, রে ধন,
তাড়কা রাক্ষসী থাকে বিকট বদন।
রক্তখাকী হতভাগী ভারি বল ধরে,
লোকজন মেরে বন করেছে নগরে,
এই পথে যেই যায়, তারে খায় গিলে,
আপদে মারহ বাপ দুই ভাই মিলে।"

মরিবে রাক্ষসী বুড়ি, রক্ষা নাই তার,
তখনি দিলেন রাম ধনুকে টংকার।
'টং-টং' রবে তার রুষি ভয়ংকর,
দাঁত কড়মড়ি বুড়ি কাঁপে থর্-থর্!
"হাঁই-মাঁই-কাঁই" করি ধাঁই-ধাঁই ধায়,

হুড়মুড়ি ঝোপঝাড় চুরমারি পায়।
গরজি-গরজি বুড়ি ছোটে, যেন ঝড়,
শ্বাস বয় ঘোরতর ঘড়র্-ঘড়র্।
কান যেন কুলো তার, দাঁত যেন মূলো,
জ্বল-জ্বল দুই চোখ জ্বলে যেন চুলো।
হাঁ করেছে দশ গজ, তাহে জিভ খান,
লকলকে চকচকে দেখে ওড়ে প্রাণ।
বিষম ধূলার ঘোরে দোঁহারে ঘেরিয়া,
পাথর ছুঁড়িয়া বুড়ি মারে চেঁচাইয়া।
কোনো ডর নাহি পায় তাহে দুই ভাই,
ডাক শুনি লাখ বাণ মারে সাঁই-সাঁই।
দেখা দিল বুড়ি তাই ফাঁপর হইয়া,
পাহাড় বেরুল যেন দাঁত খিঁচাইয়া।
হাত নাক কান কাটি, বুকে হানি বাণ,
দুজনে তখন তার বধিল পরান।
মুনির মুখেতে হাসি ধরে নাকো আব
"বেঁচে থাক" "বেঁচে থাক" বলে বারবাব।
মহা-মহা শেল শূল দেন কত বামে,
দেবতা অসুব কাঁদি ভাগে যার নামে।
যতনে তখন লয়ে ভাই দুইজনে,
ফিরিয়া গেলেন মুনি নিজ তপোবনে।
যজ্ঞ কবে মুনিগণ বসিয়া সেথায়,
রাক্ষস আসিয়া দেয রক্ত ঢালি তায়।
তারপর পাঁচদিন মিলি দুইজনে,
পাহারা দিলেন সেথা বড়ই যতনে।
যজ্ঞের আগুন জ্বলিল তখন,
মেঘের উপরে হল ভীষণ গর্জন।
তাহা শুনি দুই ভাই দেখেন চাহিয়া,
রাক্ষস খিঁচায় দাঁত আকাশ ছাইয়া।
জালাপানা মুখ আর ঝাঁটাপানা চুল,
কানে আঙুটির গোছা, হাতে শেল শূল।
মেঘের আড়ালে থাকি মারে উঁকি-ঝুঁকি,
পচা রক্ত ঢালি দেয় বারবার শুঁকি।
দুইটা পালের গোদা, বিষম বিকট,
মারীচ, সুবাহু নাম, অতি বড় শঠ।
মানব নামেতে বাণ জুড়িয়া ধনুকে,

ছুঁড়িয়া মারেন রাম মারীচের বুকে।
সেই বাণ খেয়ে বেটা, ঘোরে বন্-বন্,
সাগরে পড়িল গিয়া হয়ে অচেতন।
অগ্নিবাণ খেয়ে গেল সুবাহু মরিয়া,
বায়ুবাণে আরগুলো মরে চেঁচাইয়া।
যজ্ঞের আপদ গেল, দূর হল ভয়,
আনন্দেতে মুনিগণ বলে জয়-জয়।

তখন সবাই মিলে যান মিথিলায়
বোঝাই দিয়ে গাড়ি,
সেথায় যজ্ঞ হলে জবর জাঁকাল
জনক রাজার বাড়ি
আছে ধনুক সেথায় কেউ নাকি তায়
গুণ পরাতে নারে,
শুনে মুনির সাথে দুভাই সুখে
দেখতে চলে তারে।
কত সবুজ মাঠে, নদীর তীরে
পথ গিয়েছে ঘুরে,
আহা, শূন্য পড়ে তাহার ধারে
এ কোন মুনির কুঁড়ে?
মুনি তার কাহিনী করেন রামে
গৌতমেরে স্মরে,
"জায়া অহল্যারে শাপেন তিনি
বিষম দোষের তরে।
হেথায় থাকবে পড়ে ছাইয়ের পরে
বাতাস কেবল খাবে।
হাজার বছর ধরে কেউ তোমারে
দেখতে নাহি পাবে।
শেষে রামকে দেখে দুখ ফুরাবে
ফিরব আমি ঘরে।
বলেই অমনি চলে যান হিমালয়
দারুণ রাগের ভরে।
দেবী ভাবেন হরি হেথায় পড়ি,
কঠিন সাজা সয়ে।
চল, তোমায় দেখে এবার তিনি
উঠুন সুখী হয়ে।"

তখন সবাই মিলে সেদিক পানে
চলেন তাঁরা ধেয়ে,
কুটির উজল করি উঠেন দেবী
রামের দেখা পেয়ে।
তাঁরে দেখতে পেয়ে দুভাই গিয়ে
পড়েন চরণ তলে,
দেবী অমনি তুলে নিলেন কোলে,
ভাসল নয়ন জলে।
গৌতম এলেন ঘরে সেই সময়ে
এলেন ততক্ষণ,
আবার দুজনে মিলে হরির পূজায়
দিলেন তাঁরা মন।

সেথা হতে মিথিলায় যান তিনজন,
দু ভায়ে দেখিয়ে ভোলে সকলের মন।
জনক বলেন, "আহা কেমন সুন্দর!
কাহার কুমার এরা কহ মুনিবর।"
মুনি বলেন, "দশরথ রাজা অযোধ্যার,
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এরা তাঁহার কুমার।
তাড়কা মারীচে মারি এসেছে হেথায়,
তোমার ধনুকখানি দেখিবারে চায়।"
রাজা বলেন, "বাছা সব থাকুক বাঁচিয়া
ধনুক দেখাই আমি এখুনি আনিয়া।
শিবের ধনুক সেটি, দিল দেবগণ,
গুণ দিতে নাহি তায় পারে কোনোজন।
গুণ দিবে দূরে থাক, তুলিতে না পারে,
লাজ পেয়ে শেষে চায় মারিতে আমারে।
সে ধনুকে যদি রাম পারে গুণ দিতে,
সীতার বিবাহ দিব তাহার সহিতে।"

শুনহ সীতার কথা সবে মন দিয়া,
ডিম্বের ভিতরে কন্যা ছিল লুকাইয়া।
চাষ করে মহারাজ লইয়া লাঙ্গল,
সেইকালে চারিদিক হইল উজল।
তখন দেখিল রাজা চাহিয়া সম্মুখে,
আশ্চর্য উঠেছে ডিম্ব লাঙ্গলের মুখে।

দেবতা সমান কন্যা তাহার ভিতরে,
সুখে তারে মহারাজ নিল বুকে করে।
সীতে থেকে উঠে তাই নাম তার সীতা,
জনকেরে কয় সবে সে মেয়ের পিতা।
রাজা কন, "ধনুকেতে যেই গুণ দিবে,
সেই সে সীতারে মোর বিবাহ করিবে।"

না জানি কতই ভারি ছিল ধনুখানি!
অনেক হাজার লোকে আনে তারে টানি।
ভয়ংকর সেই ধনু তুলি বাম হাতে,
হাসিতে-হাসিতে রাম গুণ দেন তাতে।
তারপর গুণ ধরি দিল এক টান,
'মট্' করি হর-ধনু ভেঙ্গে দুইখান।
ভয়ে তায় চোখ বুজি, কানে দিয়ে হাত,
'বাপ!' বলি কত বীর হয় চিৎপাত!
বড়ই হলেন সুখী জনক তখন,
রামেরে আদর করি কত কথা কন।
বিবাহের কথা স্থির হইল ত্বরায়,
লিখন লইয়া দূত যায় অযোধ্যায়।
পত্র পান দশরথ বসিয়া সভায়—
"শ্রীরাম-সীতার বিয়ে এস মিথিলায়।"
রাজা কন, "কি আনন্দ চলহ সকলে।"
অমনি সাজিল সবে 'রাম জয়' বলে।
হাতি ঘোড়া, লোকজন ঢাক ঢোল নিয়া,
মহানন্দে মহারাজ চলেন সাজিয়া।
চারদিনে যান রাজা মিথিলা নগরে,
জনক নিলেন তাঁরে পরম আদরে।
শুন কি সুন্দর কথা হইল তখন।
সেথা ছিল চারি কন্যা লক্ষ্মীর মতন।
ঊর্মিলা নামেতে কন্যা জনক রাজার,
ভাইঝি মাণ্ডবী তাঁর, শ্রুতকীর্তি আর।
সীতারে লইয়া তাহা হয় চারিজন,
চারি পুত্র দশরথ রাজার তেমন।
মুনিগণ বলে, "আহা, কিবা চমৎকার,
ছেলে মেয়ে নাই হেন কোনোখানে আর।
এইসব ছেলে যদি এই মেয়ে পায়,

বড় ভালো, মহারাজ, হইবেক তায়।”
জনক বলেন, “বেশ, ভালো তো কহিলা,
শ্রীরামের দেহ সীতা, লক্ষ্মণে ঊর্মিলা,
শত্রুঘ্নরে শ্রুতকীর্তি, মাণ্ডবী ভরতে,
একদিনে চারি বিয়ে হোক এই মতে।”
তখন মিথিলাপুরী করে টলমল,
কি আনন্দ, কত গান, পূজা কোলাহল।
লাগিল ভোজের ধুম বাজিল বাজনা,
ঢাক, ঢোল, কাড়া, কাঁসি, না হয় গণনা।
আলো করে ঝলমল, ধূপধুনা জ্বলে,
যতনে সাজায়ে কন্যা আনিল সকলে।
অগ্নির সম্মুখে বসি জনক তখন,
চারি বরে কন্যা দেন করিয়া যতন।
কতই মুকুতা মণি দাস-দাসী আর
মেয়েদের দেন রাজা শেষ নাই তার।
তারপর আশীর্বাদ করিয়া সকলে,
বিশ্বামিত্র মুনি যান হিমালয়ে চলে।
মহারাজ দশরথ ছেলে বউ নিয়া,
মনের সুখেতে যান বিদায় লইয়া।

নিয়ে বউ সকলে মনের সুখে
চলেন সবাই ঘরে,
তখন পথের মাঝে কাঁপেন তাঁরা
পরশুরামের ডরে।
সে যে বাঘের মতো বিষম রাগী,
কুড়াল নিয়ে ফেরে।
নাহি ডরায় কারে বড়ই চটে
দেখলে ক্ষত্রিয়েরে।
মুনি কুড়াল দিয়ে তাদের সবে
কেটেছে একুশবার।
তাতেই ভয়েতে তারা হয় যে সারা
নামটি শুনেই তার।
রাজা কতই আদর করেন তারে
‘আসুন-আসুন’ বলে।
মুনি না চায় ফিরে, রামকে দেখে

গেল সে রাগে জ্বলে।
বলে, "শিবের ধনুক ভেঙেই বুঝি
হয়েছ ভারি বীর?
আমার ধনুকটিকে গুণ পরিয়ে
চড়াও দেখি তীর!"
শ্রীরাম ধনুক নিয়ে অমনি তাতে
দিলেন টেনে গুণ,
পরে বাণটি হাতে নিতেই মুনির
মুখ তো হল চুন!
তখন রাম ভাবিলেন, 'এ বাণ খেলেই
যাবেন ঠাকুর মরে,'
কাজেই অপর দিকে দিলেন ছুঁড়ে
সে তীর দয়া করে।
অনেক তপস্যাতে পেলেন মুনি
স্বর্গে যত স্থান,
সে তীর পড়ল গিয়ে সেইখানেতে
বাঁচল মুনির প্রাণ।
ঠাকুর হার মেনে তায় সেখান হতে
গেলেন লাজের ভরে,
রাজা সবায় নিয়ে মনের সুখে
এলেন আপন ঘরে।
তখন আদর করে রাণীরা সবে
বউ লইলেন কোলে,
তাঁদের দিলেন কি যে বলতে হলে
পড়ব বড়ই গোলে।
পরে ভরত গেলেন মামার বাড়ি
শত্রুঘ্নরে লয়ে,
আর শ্রীরাম করেন পিতার সেবা
পরম সুখী হয়ে।

অযোধ্যাকাণ্ড

বয়স হইল ষাট হাজার বছর,
চলিতে কাঁপেন রাজা করি থর্-থর।
ভাবিলেন তাই, 'মোর বল গেছে টুটি,
রামেরে বুঝায়ে কাজ আমি লই ছুটি।'
তখন বলেন রাজা, "শুন সভাজন,
যুবরাজ কর মোর রামেরে এখন।"
শুনিয়া সুখেতে সবে করে কোলাহল,
আনন্দে কৌশল্যা মার চোখে এল জল।
পুরোহিত মহামুনি বশিষ্ঠ তখন,
যতনেতে করিলেন যত আয়োজন।
সুন্দর বসন পরি সাজিল সকলে,
আনন্দে ধুইল মুখ চন্দনের জলে।
মনের সুখেতে তারা করে গণ্ডগোল,
'ডিম্বি-ডিম্বি' 'তাই-তাই' বাজে ঢাক ঢোল।
কৌশল্যা দেবীর স্নান হয়েছে কখন,
হরিনাম করে মাতা হয়ে এক মন।
কৈকেয়ীর ছিল এক আদরের দাসী,
বিষমুখী হতভাগী কুঁজী সর্বনাশী।
মন্থরা নামটি তার, লোকে কয় 'কুঁজী',
কার মেয়ে, কোথা ঘর নাহি পাই খুঁজি।
কুঁজী বলে, "হ্যাঁ গা, এত কিসের বাজনা?"
রামের ধাই-মা কয়, "তাও কি জানো না?
যুবরাজ হবে আজি আমাদের রাম,
তাই এত বাদ্য আর এত ধুমধাম!"
এই কথা ধাই তারে কহিল যখন,
হিংসায় কুঁজীর কুঁজ করে টনটন!
কৈকেয়ীর কাছে গিয়া তখনি সে কয়,
"শোনো, শোনো! আজি রাম যুবরাজ হয়!"
রাণীর মনেতে বড় সুখ হল তায়,
খুলিয়া গলার হার দিল মন্থরায়।
দূরে ফেলি সেই হার কহে দুষ্ট কুঁজী,
"ভালো মন্দ কিসে হয়, নাহি জানো বুঝি!
কুটিল কৌশল্যা রাণী রাজার মা হলে,
হেঁট মুখে রবে তুমি তার পদতলে।

রাম রাজা হলে তোর ভরত মারিবে,
তখন তোমার দশা ভাব কি হইবে।”
শুকাল রাণীর মুখ এ কথা শুনিয়া,
পরান কাঁপিল তার ভরতে ভাবিয়া।
বলে, “কুঁজী বল! বল! কি হবে উপায়?
কেমনে বাঁচাব বল! আমার বাছায়?”
কুঁজী বলে, “ভয় নাই, হলে সেই কাজ
দুই বর তোরে যদি দেয় মহারাজ।
ভরত হইলে রাজা, রাম গেলে বনে
ভয় না থাকিবে আর, ভাবি দেখ মনে।
যুদ্ধে গিয়ে মহারাজ ভারি ব্যথা পায়,
পরানে বাঁচে সে খালি তোমারই সেবায়।
দুই বর দিবে রাজা বলেছে তখন,
সে বর চাহিয়া কেন লহ না এখন?
ভরতে করহ রাজা রামে বনে দিয়া,
তারপর সুখে থাক খাটেতে বসিয়া।”
রাণী বলে, “ভালো যুক্তি দিলি কুঁজী মোর,
আজি বনে যাবে রাম, ভয় নাই তোর।”
তখন কুঁজীর সাথে করি কানাকানি,
বিপদ ঘটাল হায় সর্বনাশী রাণী।
ভাঙিল হীরার বালা সানে আছাড়িয়া,
ময়লা কাপড় আনি পরিল খুঁজিয়া।
এলাইয়া কালো চুল শুইল ধূলায়—
ভালোই পাতিল ফাঁদ মারিতে রাজায়।
আসিয়া দেখেন রাজা একি সর্বনাশ,
মাথায় পড়িল যেন ভাঙিয়া আকাশ।
কতই ডাকেন রাজা, “রাণী, রাণী, রাণী।”
কৈকেয়ী আঁচল শুধু মুখে দেয় টানি।
রাজা কন, “হায়, রাণী নাহি কয় কথা!
হল কি অসুখ ভারি? পাইল কি ব্যথা?
বল রাণী, দুখ দিল কে তোমার মনে,
তলোয়ারে তার মাথা কাটি এইক্ষণে।”
বিনয় করিয়া রাজা কত কথা কয়,
কিছুতে রাণীর হায় দয়া নাহি হয়।
তখন বলেন রাজা, “কি চাই তোমার?
এখনি পাইবে তাহা, বল একবার।”

শুনিয়া কৈকেয়ী তারে নাকি সুরে কয়,
"সত্য করি বল আগে, দিবে তা নিশ্চয়।"
রাজা কন, "দিব, দিব, দিব তা তোমারে।"
তাহা শুনি দুষ্ট রাণী হাসি কয় তারে,
"মনে কর সেই যুদ্ধ অসুরের সাথে,
বড় খোঁচা মহারাজ খেলে তার হাতে।
করিয়া কতই সেবা বাঁচাই তোমায়,
দিতে মোরে দুই বর চাও তুমি তায়।
আজি মোরে সেই বর দেহ মহারাজ,
বিষ খাব, "যদি নাহি কর এই কাজ।"
রাজা কন, "কহ-কহ কিবা সেই বর,
দিব তাহা এইক্ষণ, নাহি কোনো ডর।"
শুনিয়া কৈকেয়ী কয়, "আর কিছু নয়
ভরতেরে যুবরাজ কর মহাশয়।
চৌদ্দ বছরের তরে রাম বনে যাবে,
পরিয়া গাছের ছাল ফল মূল খাবে।"
হায় রে নিষ্ঠুর কথা! হায় দুষ্ট রাণী!
কি ব্যথা রাক্ষসী দিল রাজারে না জানি!
অজ্ঞান হইয়া রাজা পড়িল ধূলায়,
জাগিয়া চাপড়ি বুক করে হায়-হায়।
অস্থির হইয়া রাগে কাঁপে থর্-থর্,
শিশুর মতন কাঁদে হইয়া কাতর।
পাগল হইয়া ধরে কৈকেয়ীর পায়,
আবার অজ্ঞান হয়ে লুটায় ধূলায়।
তবু হায় রাক্ষসীর দয়া নাহি হয়,
লাজ নাই, ভয় নাই, কটু কথা কয়।
এইভাবে গেল রাত কাঁদিয়া-কাঁদিয়া
সকালে আনিল রাণী রামেরে ডাকিয়া।
ফাটিছে রামের বুক দেখিয়া রাজায়,
রাণীরে বলেন, "মাগো, একি হল হায়?
কেন মা এমন দশা হইল পিতার?
কিসের লাগিয়া মুখে কথা নাহি তাঁর?"
রাক্ষসী বলিছে, "বাছা, ওটা কিছু নয়,
লাজেতে তোমার বাপ কথা নাহি কয়।
রাজা বলেছেন, আজ তুমি যাবে বনে,
জানাতে তোমায় তাহা লজ্জা হয় মনে।

পিতার মনের কথা শুনিলে এখন,
লক্ষ্মী ছেলে, বনে যাও ছাড়ি রাজ্যধন!
চৌদ্দ বছরের পর আসিও আবার
ততদিন হবে রাজা ভরত আমার।"
কহিল কঠিন কথা আদর করিয়া
খেতে যেন দিল বিষ মধু মাখাইয়া।
বারণ করিতে তারে না পারেন রাজা,
'বর দিব' বলেছেন, হায় তার সাজা!
শ্রীরাম বলেন, "এই যাই আমি বনে,
তার তরে ভয় মাতা করিও না মনে।
রাজা যদি নাহি হই, কিবা তায় দুখ।
থাকিলে পিতার কথা বনেতেও সুখ।
রাজা হয়ে সুখে থাক ভরত আমার,
পিতারে দেখিও মাগো, কি বলিব আর।"
অযোধ্যার প্রাণ রাম, তিনি যান বনে,
তাঁহাকে ছাড়িয়া লোক বাঁচিবে কেমনে?
রুষিয়া লক্ষ্মণ কন, "মারিব রাজায়!
কৈকেয়ী ভরতে মারি রাখিব দাদায়।"
আদরে বলেন রাম, তারে লয়ে বুকে,
"ভাই রে অমন কথা আনিয়ো না মুখে।
পিতা হন আমাদের দেবতা সমান,
রাখিব তাঁহার কথা দিয়া এই প্রাণ।"
কৌশল্যার দুঃখ আর কি বলিব হায়—
কথায় সে দুঃখ বলে বুঝানো কি যায়?
রামেরে বিদায় দিতে হইল যখন,
না জানি কেমন তাঁর করেছিল মন!
রাম কন, "দেখো মাগো পিতারে আমার,
চৌদ্দ বছরের পরে আসিব আবার।"
সীতা কন, "যেথা রাম, সেথা মোর ঘর,
দুজনে সুখেতে রব বনের ভিতর।"
লক্ষ্মণ বলেন, "দাদা, মোরে লও সাথে,
ফল মূল দিব আনি, তুলি নিজ হাতে।"
সুমিত্রা বলেন, "যাও, যাও রে লক্ষ্মণ,
রামেরে দেখিয়ো বাছা পিতার মতন।
সীতা যেন মা তোমার, এই রেখ মনে,
ঘর ভেবে সুখে বাপ থাক গিয়ে বনে।"

বনে যেতে তিনজন করি তাঁরা মন
কাঙালে করিলা দান যত ছিল ধন।
সুমন্ত্র সারথি আনে রথ সাজাইয়া,
কৈকেয়ী গাছের ছাল দিলেন আনিয়া।
তাহা পরি দুই ভাই করিলেন সাজ,
সীতারে পরাতে নাহি দেন মহারাজ।
বেলা হল, বয়ে যায় যাবার সময়,
প্রণাম করিয়া রাম দশরথে কয়,
"বনে যাই, মহারাজ, দেহ পদধূলি,
দুখিনী মায়ের পানে চেয়ো মুখ তুলি।"
তারপরে তিনজনে চড়ে গিয়ে রথে,
পাগল হইয়া লোকে ছুটে যায় পথে।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা নিজে যান ধেয়ে,
ব্রাহ্মণ সকলে যান, আর যত মেয়ে।
কাঁদিয়া কৌশল্যা যান; হায় রে দুখিনী-
আলুথালু হয়ে মাতা ধায় পাগলিনী।
কেমনে এ দুখ দেখি পরানেতে সয়?
"চল, চল," বলি রাম সারথিরে কয়।
ছুটে যায় রথখানি তীরের মতন,
তার সাথে যেতে আর পারে কয়জন?
তবুও ছুটিয়া রাজা কতদূর যায়,
চলিতে না পারি আর বসিল ধূলায়
চাহিয়া রথের পানে কথা নাহি মুখে,
ঝরিয়া চোখের জল বয়ে যায় বুকে।
চলি গেল রথখানা, দেখা নাহি যায়,
অমনি লুটায়ে রাজা পড়িল ধুলায়!
কৈকেয়ী তুলিতে তারে আইল ছুটিয়া,
"দূর-দূর!" বলি রাজা দিল তাড়াইয়া।
তারপর কৌশল্যার হাতখানি ধরে,
ভাসিয়া চোখের জলে গেল তাঁর ঘরে।
সেথায় শুইল রাজা করি হায়-হায়,
ভাবিয়া রামের কথা বুক ফেটে যায়।

জানি রাম কতদূর যান ততক্ষণ,
কেমনে ছাড়িল তাঁরে অযোধ্যার জন?
তীরের মতন তাঁর রথখানি যায়

কপাল চাপড়ি লোক পিছু-পিছু ধায়।
বলে, "এই ছাই দেশে কে রহিবে আর?
রাম যেথা যান, মোরা সাথে যাব তাঁর।"
বেলা শেষ হল, তারা তবু নাহি ফিরে,
আঁধার হইল আসি তমসার তীরে।
থামিল তখন রথ, বসিল সকলে,
ঘরে না ফিরিল তার সাথে যাবে বলে।
শেষে রাতে উঠি রাম গেলেন চলিয়া,
কেহ না জানিল—সবে ছিল ঘুমাইয়া।
প্রভাতে উঠিয়া তারা করে হায়-হায়,
কাঁদিতে-কাঁদিতে শেষে ঘরে ফিরে যায়।
হেথায় চলেছে রথ তিনজনে লয়ে
নদী বন মাঠ কত যায় পার হয়ে।
শৃঙ্গবের পুরে যেই বেলা গেল চলে,
ইঙ্গুদী গাছের তলে বসিলা সকলে।
সে দেশে নিষাদ-রাজা, গুহ তার নাম,
বড়ই সরল সে যে, তার মিতা রাম।
'রাম এল' শুনে গুহ ছুটে এল সুখে,
"মিতা, মিতা", করি তাঁরে জড়াইল বুকে।
গুহ বললে, "খাবি মিতা? এনেছি মিঠাই!"
রাম কন, "হায় মিতা, কি করিয়া খাই?"
যেতে মোর হবে যে রে, যেথা ঘোর বন,
ফল মূল খেতে হবে মুনির মতন।"
শুনিয়া কাঁদিল গুহ হাউ-হাউ করে,
বিনয় করিয়া রামে কহিল সে পরে,
"থাক্ মিতা মোর হেথা, থাক্ মোর শিরে
ঘর তোর, জন তোর, ডর তোর কি রে?
নাচি-নাচি বই জুতা, ফিরি তোর সনে,
রাজা হয়ে থাক্ মিতা, কেন যাবি বনে?"
রাম কন, "তা তো ভাই হয় না রে হায়,
তায় যে পিতার কথা মিছা হয়ে যায়!"
গঙ্গা জল খেয়ে রাম থাকেন সে রাতে,
জাগিয়া কাঁদিল গুহ লক্ষ্মণের সাথে।
প্রভাতে গুহের কাছে লইয়া বিদায়,
তিনজনে গঙ্গা পার হলেন নৌকায়।
বনের ভিতরে তাঁরা যান তারপরে

সুমন্ত্র কাঁদিল ফিরি অযোধ্যা নগরে।
বাঘ ভালুকের ঘর ঘোরতর বন,
তাহা ভিতর দিয়া যান তিনজন।
দিন গেল, রাত গেল, সন্ধ্যা এল ফিরে,
প্রয়াগে এলেন তাঁরা যমুনার তীরে।
যেথায় আসিয়া গঙ্গা মিলে যমুনায়,
মহামুনি ভরদ্বাজ থাকেন যেথায়।
মুনি বলে, "জানি রাম এলে কি কারণ,
আমার নিকটে বাপ থাক তিনজন।"
শ্রীরাম বলেন, "হেথা লোকজন চলে,
নিরিবিলি কোথা পাই মোরে দিন বলে।"
মুনি বলে, "চিত্রকূট পর্বতের তলে,
ছায়ায় লুকায়ে নদী মন্দাকিনী চলে।
দুই কূলে আছে গাছ ফল। ফুলে ঝুঁকি,
হরিণ ময়ূর আসি দেয় সেথা উঁকি।
বনেতে কোকিল গায়, জলে হাঁস খেলে,
সুখেতে থাকিবে রাম সেইখানে গেলে।"
মুনির পায়ের ধূলা লইয়া তখন
যেথা সেই চিত্রকূট যান তিনজন।
সেথায় কুটির বাঁধি লতায়-পাতায়,
মনের সুখেতে তাঁরা রহিলেন তায়।
হেথা রাজা দশরথ পড়ে বিছানায়
ফেলেন চক্ষের জল করি হায়-হায়।
এমন সময়ে তাঁরে করিয়া প্রণাম,
কাঁদিয়া সুমন্ত্র কয়, "গিয়াছেন রাম।"
সে কথা সহিতে রাজা নারিলেন আর,
সেই রাতে গেল প্রাণ দেহ ছাড়ি তাঁর।
কাঁদিয়া-কাঁদিয়া সবে ছিল অচেতন,
কেহ না জানিল রাজা মরিল কখন।
পাগল হইলা তারা সকালে উঠিয়া,
ভরতের লাগি লোক চলিল ছুটিয়া।
রাজারে ডুবায়ে রাখি তেলের ভিতরে,
পথ চেয়ে রয় তারা ভরতের তরে।

সবে কাঁদে, কৈকেয়ীর মুখে শুধু হাসি,
সে ভাবে, 'ভরত বড় সুখী হবে আসি!'

ভরত ফিরিয়া ঘরে কহিলেন তায়,
"কি বিপদ হল মাগো, বল তো আমায়।
কোথা পিতা দাদা আর লক্ষ্মণ আমার?
কেন এ সোনার পুরী হেরি ছারখার?"
রাণী বলে, "পিতা তোর নাই রে বাছনি,"
কাঁদিয়া ভরত তায় পড়েন অমনি।
হায়-হায় করি কন কাতর হইয়া,
"না জানি গেলেন পিতা কি কথা কহিয়া।"
রাণী বলে, "তিনি এই বলেন তখন—
'হায় রাম! হায় সীতা! হায় রে লক্ষ্মণ!'"
ভরত বলেন, "এ কথা কি কথা ভয়ঙ্কর
কি হল তাঁদের মাতা, বলহ সত্বর।"
রাণী বলে, "মরে নাই, রয়েছে বাঁচিয়া,
দিয়াছি রাজায় বলি বনে পাঠাইয়া।
আপদ হইল দূর বাছারে তোমার,
রাজা হয়ে সুখে থাক, ভয় নাই আর।"
এই কথা দুষ্ট রাণী কয় হাসি মুখে,
ছুরি যেন মারে হায় ভরতের বুকে।
রুষিয়া বলেন তিনি, "কি বলিব হায়,
মা না হলে কাটিতাম এখনি তোমায়।
কভু না হইবে, যাহা আছে তোর মনে,
দাদারে আনিতে আমি এই যাই বনে।"
যাহার লাগিয়া রাণী করে হেন কাজ,
খাইয়া তাহার গালি পায় বড় লাজ।

কুঁজী ভাবে, পায় জানি কিবা পুরস্কার,
যত ভাবে, তত কুঁজ উঁচু হয় তার।
মুখ ভরা হাসি আর গাল ভরা পান,
মাকড়ির ভারে যেন ছিঁড়ে দুই কান!
চকচকে চীন শাড়ি, চন্দনের ফোঁটা,
হাতে বালা, নাকে নথ, এই মোটা-মোটা।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ছিল সখীদের সাথে,
দরোয়ান ধরে দিল শত্রুঘ্নের হাতে।
শত্রুঘ্ন বলেন, "ভালো পাইলাম দেখা—
আজি কিছু সাজা তোর কপালেতে লেখা।"
চুল ধরি পরে যেই দিলেন আছাড়,

ভেড়ার মতন কুঁজী ডাকে চমৎকার।
মরিত সেদিন বেটি আছাড় খাইয়া,
ভাগ্যেতে ভরত আসি দেন ছাড়াইয়া।
ছাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি পলাইল ছুটি,
বাতাসেতে ফড়্ফড়্ উড়ে তার ঝুঁটি!
তখন সকলে মিলি, ভরতের সনে,
রামেরে আনিতে সুখে চলিলেন বনে।
বশিষ্ঠ সুমন্ত্র যান, যায় লোকজন,
কৌশল্যা সুমিত্রা আর দাসদাসীগণ।
কৈকেয়ী চলেন লাজে মাথা হেঁট করি,
লাখে-লাখে যায় সেনা খাঁড়া ঢাল ধরি।
গুহের দেশেতে যেই আসিল সকলে,
গুহ বলে, "দেখ, দেখ, ভরতীয়া চলে!
সেটি মোর মিতাটিকে মারিবেক বটে—
লাগা টাঙ্গি ঝট্পট্, ঘরে যাক হটে!"
ভরত কি চান গুহ শুনিল যখন,
আনন্দে কবিল তাঁর কতই যতন।
পাঁচশত তরী দিয়া করে গঙ্গা পার,
নাচিতে-নাচিতে যায় সাথে-সাথে তাঁর।
ভরদ্বাজ মুনি সনে দেখা হয় পরে,
ভুলিল সবার মন মুনির আদরে।
ঘোল, চিনি, ক্ষীর, সর, দধি, মালপুয়া,
রাবড়ি, পায়স, পিঠা, পুরী, পানতুয়া।
যত চায়, তত পায়, নাহি ধরে পেটে,
গিলিতে না পারে আর, তবু দেখে চেটে।
মুনি বলিলেন, "রাম থাকে চিত্রকূটে,"
অমনি চলিল সবে সেই পথে ছুটে।
আনন্দে চলেছে তারা হইয়া চঞ্চল,
রামের কুটিরে গেল তার কোলাহল।
গাছে উঠে দেখি তায় কহেন লক্ষ্মণ,
"ভরত আইল দাদা লয়ে লোকজন।
মোদের মারিতে দুষ্ট আসিছে হেথায়,
মাথা কেটে তার সাজা দিব আমি তায়।"
রাম কন, "ভরতের কোনো দোষ নাই,
তাহারে এমন কথা কেন বল ভাই?"
লাজেতে আসেন তায় নামিয়া লক্ষ্মণ,

কুটিরে গেলেন পরে ভাই দুইজন।
ভরত শত্রুঘ্ন আহা তখনি আসিয়া,
লুটায়ে ধূলার পরে পড়েন কাঁদিয়া।
গড়াগড়ি দিয়া তাঁরা কাঁদেন দুজন,
কাঁদেন তাঁদের লয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পরে বলিলেন রাম, "ভাই রে ভরত,
কি লাগি সহিয়া দুঃখ এলে এত পথ?
কেন রে গাছের ছাল দেখি তোর গায়,
কেন রে আইলে হেথা ছাড়িয়ে পিতায়?"
ভরত কহেন, "হায়, কোথা পিতা আর?
কাঁদিয়া তোমার তরে প্রাণ গেল তাঁর।"
কাঁদেন তখন সবে 'পিতা' 'পিতা' বলে,
কাঁদিয়া তাঁদের ঘিরি আসিয়া সকলে।
দুঃখের ভিতরে রাম পান কিছু সুখ,
এমন সময়ে দেখি জননীর মুখ।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রার পায়,
প্রণাম করেন রাম লুটায়ে ধূলায়।
কাঁদিয়া রামের পায় পড়ি তারপরে
ভরত বলেন, "দাদা, চল যাই ঘরে।"
রাম বলিলেন, "ওরে পরানের ভাই,
থাকুক পিতার কথা আমি এই চাই।
তুমি হবে রাজা, আর আমি রব বনে,
পিতার এ কথা ভাই পালিব দুজনে।"
ভরত যতই তাঁরে করেন বিনয়,
শ্রীরাম কহেন শুধু, "কেমনে তা হয়?"
বশিষ্ঠ বুঝান কত, কাঁদে রাণীগণ,
কিছুতেই না ফিরিল শ্রীরামের মন।
ভরত কাঁদিয়া তাঁরে কহিলেন শেষে,
"যদি কিছুতেই দাদা না যাইবে দেশে,
তোমার খড়ম খুলে দাও দয়া করে,
তারেই করিব রাজা অযোধ্যা নগরে।
পরিয়া গাছের ছাল, ফল মূল খেয়ে
চৌদ্দ বছরের তরে রব পথ চেয়ে।
তারপরে তুমি যদি না আস ফিরিয়া,
নিশ্চয় মরিব দাদা আগুনে পুড়িয়া।"
রাম বলিলেন, "আমি আসিব তখন,

মায়েরে দেখিয়ো ভাই করিয়া যতন।"
এই বলি রাম তাঁরে করেন বিদায়,
ভরত খড়ম লয়ে যান অযোধ্যায়।
পুরীর ভিতরে কিন্তু নাহি যান আর,
নন্দীগ্রামে রহিলেন, নিকটেই তার।
রামের খড়ম রাখি উঁচু সিংহাসনে,
তাহার উপরে ছাতা ধরেন যতনে।
বাতাস করেন তারে চামর লইয়া,
না করেন কোনো কাজ তারে না বলিয়া।
পরেন গাছের ছাল, খান শুধু ফল,
মনের দুঃখেতে তাঁর চোখে ঝরে জল।

অরণ্যাকাণ্ড

তার পরে সীতা আর লক্ষ্মণেরে নিয়া
দণ্ডক বনেতে রাম গেলেন চলিয়া।
দণ্ডক বনেতে যেতে লাগে বড় ডর,
হাতি সিংহ বাঘ সেথা ফেরে ভয়ংকর।
বিরাধ বলিয়া থাকে রাক্ষস সেথায়,
না বিঁধে ব্রহ্মার বরে অস্ত্র তার গায়।
খিঁচাইয়া রাখে দাঁত পথ-ঘাট জুড়ি।
কড়্মড়ি হাতি খায়—এই বড় ভুঁড়ি!
রামেদের দেখে বেটা আইল ধাইয়া,
তাড়াতাড়ি দিল ছুট সীতারে লইয়া।
শ্রীরাম কাঁদেন তায় করি হায়-হায়,
লক্ষ্মণ বলেন রুষি, "মারহ বেটায়।"
শুনিয়া বিরাধ কয়, "ঝাট্ পালা ঘরে!
হেথেরটি মোর গায়ে বিন্ধিবে না করে!"
সাত বাণ যদি রাম মারিলেন তারে,
খেঁকায়ে আইল বেটা রাখিয়া সীতারে।
ঝেড়ে ফেলে বাণ সব, ধায় শূল নিয়া,
রাম দেন সেই শূল বাণেতে কাটিয়া।
তাহে দুষ্ট দিল ছুট দুভাইকে লয়ে,
কতই তখন সীতা কাঁদিলেন ভয়ে।
ভাঙিলা দুভাই তবে রাক্ষসের হাত

অমনি চেঁচায়ে বেটা হল চিৎপাত।
কিন্তু সে আপদ যে রে কিছুতে না মরে,
পাথরে না পিষা যায়, খড়্গে নাহি ধরে।
পুঁতিলেন তাই তারে মিলি দুই ভাই,
চলিলেন তারপর ছাড়ি সেই ঠাঁই।
মুনিদের ঘরে-ঘরে ফিরি তারপর,
সুখেতে কাটিয়া গেল দশটি বৎসর।
পরে আসিলেন তাঁরা পঞ্চবটি বনে,
সেথায় হইল দেখা জটায়ুর সনে।
অতি বড় পাখি সে যে, সম্পাতির ভাই,
রামেরে বলিল, "বাবা থাক এই ঠাঁই।
তোমার পিতার বন্ধু আমি যে রে ধন,
সীতারে দেখিব আমি করিয়া যতন।"
ভারি চমৎকার সেই পঞ্চবটী বন,
নানা রঙে ফুল ফল, দেখে ভরে মন।
দুলিয়া সুন্দর পাখি খেলে ডাল ধরি,
কুলকুল করি বয় নদী গোদাবরী।
সেই পঞ্চবটী বনে, সুন্দর কুটিরে,
সুখেতে থাকেন তাঁরা গোদাবরী তীরে।
হেনকালে কি হইল শুনহ সকলে—
রাক্ষসী আইল সেথা সূর্পনখা বলে।
লঙ্কায় রাবণ থাকে, দশ মাথা যার,
এই বুড়ি হতভাগী বোন হয় তার।
হাঁ করে সীতারে বুড়ি কয় গিয়ে ধেয়ে,
"মুঁহি গিন্নী হব এই বুড়িডারে খেয়ে!"
খাইত সীতারে বুড়ি নিশ্চয় তখন,
ভাগ্যে তার নাক কান কাটেন লক্ষ্মণ।
ব্যথায় অভাগী তায় মরে মাথা কুটি,
"বাপ্পুরে! মাইরে!" বলি ঐ যায় ছুটি!
গেল বুড়ি খর আর দুষণের ঠাঁই।
সেই দুটা হয় তার মাসতুত ভাই।
লোকজন লয়ে তারা থাকে জনস্থানে,
কাটা নাক নিয়া বুড়ি গেল সেইখানে।
পরে যা হইল সে যে বড় ভয়ংকর;
রাক্ষসের ডাকে বন কাঁপে থর্‌থর্‌।
দেখিতে-দেখিতে তারা, খাঁড়া ঢাল নিয়া,

হাজারে-হাজারে সেথা আইল ছুটিয়া।
শ্বাস ফেলি ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ভেঙচায় রাগে,
দাঁত কড়্মড়ি শুনি বড় ডর লাগে!
লাঠি গদা, শেল শূল, কুড়াল কাটারি,
রোষেতে ছুঁড়িয়া তারা মারে ভারী-ভারী
রামের বাণেতে সব হল খান-খান,
দুই দণ্ডে গেল যত রাক্ষসের প্রাণ।
একটা রহিল শুধু, অকম্পন বলে,
চেঁচায়ে লঙ্কায় সেটা ছুটে গেল চলে।
রাবণের কয় কাঁপি, "হেই মোহারাজ!
আরে তোর খরটি তো মরিলেক আজ!
দুসনিয়া ফুসনিয়া যেতো মাল ছিলো,
সবেক মানুসা বেটা বামা কাটি দিলো!"
পরেতে আসিয়া সেই নাককাটি বুড়ি
হাই-মাই করি সেথা কাঁদে মাথা খুঁড়ি।

লাফায়ে তখন উঠিল রাবণ
বাগেতে আগুন হয়ে,
সারথিরে কয়, "আয় তো রে মোর
গাধাটানা রথ লয়ে!"
সেই রথে চড়ি চলিল রাবণ
যেথায় মারীচ থাকে,
বলে, "চল যাই রামের নিকটে
সাজা দিব আজ তাকে।"
শুনিয়া মারীচ বলে, "হায় বাপ!
মুই তো না সেথা যাব!
বেটা বড় ভূত, লাগাবেক তীর,
লাট্টু পাক মোরা খাব!"
রাবণ কহিল, "নাহি যাস যদি
এখনি কাটিব তোরে!"
মারীচ কহিল, "যাব, যাব, মুই!
কি করিবি লিয়ে মোরে?"
রাজা কয়, "তুমি সোনার হরিণ
সাজিয়া সেথায় যাবে,
সীতার নিকটে নাচিয়া-নাচিয়া
লতা-পাতা খুঁটে খাবে।

রামেরে তখন দিবে সে পাঠায়ে
তোমারে ধরিয়া নিতে,
দূরে নিয়া তারে চেঁচাইবে তুমি
হা লক্ষ্মণ, হায় সীতে!
তাহা শুনি আর নারিবে লক্ষ্মণ
বসিয়া থাকিতে ঘরে,
আমিও তখন সীতারে লইয়া
ছুট দিব রথে করে।”
সাজি লয়ে সীতা তুলিছেন ফুল,
মারীচ তখন এল,
হরিণ সাজিয়া তাঁহার ।নকটে
নাচিতে-নাচিতে গেল।
তাবে দেখি সীতা আনেন অমনি
শ্রীরাম লক্ষ্মণে ডাকি,
লক্ষ্মণ বলেন, “বুঝেছি, এসব
মাবীচ বেটার ফাঁকি।”
হেলা করে সীতা নাহি দেন কান
লক্ষ্মণের সে কথায়,
মিনতি করিয়া পাঠান বামেবে
হরিণ ধরিতে হায়।
সে পোড়া হবিণ বামেরে লইযা
কত দূব গেল চলে,
বাণ খেয়ে শেষে ডাকিল কাতবে,
“হায় রে লক্ষ্মণ!” বলে।
শুনি তা অমনি লক্ষ্মণেরে সীতা
কাঁদিয়া কহেন ভয়ে,
“হায়, বুঝি তারে খাইল রাক্ষস
যাহ ধনু-শর লয়ে!”
লক্ষ্মণ বলেন, “মারীচের ফাঁকি
নহে গো এ কিছু আর,
রাম বড় বীর, মারিবে তাঁহায়,
এত জোর আছে কার?
একলা হেথায় রাখিয়া তোমায়
যাইব কেমন করে?
কোনো ভয় নাই আসিবেন রাম
এখনি ফিরিয়া ঘরে।”

রুষিয়া তখন কহিলেন সীতা,
"বুঝিনি সকলই হায়,
ওরে দুষ্ট, তুমি এই চাও, যাতে
রাক্ষসে তাঁহারে খায়।"
কঠিন কথায় ব্যথা পেয়ে হায়
গেলেন লক্ষ্মণ চলি,
অমনি সেথায় আইল রাবণ,
"হর হর বোম!" বলি।
যোগীর মতন সেজেছে রাবণ
চেনা নাহি যায় তারে,
টিকি দোলাইয়া হাসিয়া-হাসিয়া
আসিল কুটির দ্বারে।
যোগী ভাবি সীতা বসিতে আসন
দিলেন যতন করে,
ঘরে ছিল ভাত, আনিয়া আদরে
খাইতে দিলেন পরে।
কহিছে রাবণ, "কার মেয়ে তুমি?
কেমনে আইলে বনে?"
সীতা কন, "আমি জনকের মেয়ে
এসেছি পতির সনে।"
শুনি দুষ্ট কয়, "ভিখারীর সাথে
রয়েছ কিসের তরে?
বনের ভিতরে বাঘ থাকে ভারি
খাইবে তোমারে ধরে।
মোর সাথে চল, আমি সেই রাজা,
রাবণ যাহারে কয়,
খাটেতে বসিয়া পাইবে সকল
যা তোমার মনে লয়।"
সীতা কন তারে, "বটে রে অভাগা
এত বড় মুখ তোর!
আজি তোর দাঁত ভাঙিবেন রাম
দাঁড়া দেখি দুষ্ট চোর।"
কুড়ি চোখ তায় ঘুরায় রাবণ
রাগেতে পাগল হয়ে,
বিশ পাটি দাঁত করি কড়্মড়্
চলে রে সীতায় লয়ে।

রথখানি তার আইল অমনি
লাফায়ে উঠিল তায়,
দূরে দুই ভাই জানি কোন ঠাঁই
দেখিল না হায়-হায়!
গাছের উপরে বসিয়া তখন
ঘুমায় জটায়ু পাখি,
চমকি শুনিল ঐ যেন সীতা
কাঁদেন তাহারে ডাকি!
অমনি জটায়ু যমের মতন
ধরিল রাবণে গিয়া,
আধমরা করে ছাড়িল বেটারে
আঁচড় ঠোকর দিয়া।
ভাঙি রথখানি মারি তার ঘোড়া
ছিঁড়ি সারথির মাথা,
কাড়িল ধনুক ঝেড়ে ফেলে বাণ
পিষিল চামর ছাতা।
দেবতার বর পেয়েছে রাবণ,
সে যে মরিবার নয়,
দশ মাথা তার ছিঁড়ে কতবার
আবার নতুন হয়।
বুড়া পাখি হায় কত পারে আর?
বল তার গেল টুটি,
হাত-পা তাহার কাটিয়া রাবণ
সীতা লয়ে যায় ছুটি।

ঘরে ফিরে দুই ভাই না পান সীতায়
কাতরে কাঁদেন রাম করি হায়-হায়।
খুঁজিলেন বনে-বনে গুহায়-গুহায়,
গোদাবরী তীরে আর যত ঝরনায়।
কোথাও না পান তাঁরা দেখিতে সীতারে,
কেহ নাই, তাঁর কথা জিজ্ঞাসেন যারে।
পরে আইলেন তাঁরা জটায়ু যেথায়,
রয়েছে অবশ হয়ে পড়ে যাতনায়।
রোষেতে বলেন রাম দেখিয়া তাহারে,
"এই দুষ্ট খাইয়াছে আমার সীতারে!
রাক্ষস পাখির মতো রয়েছে সাজিয়া—

ঘুমায় কেমন দেখ, সীতারে খাইয়া।"
এই বলি তারে রাম যান মারিবারে
কষ্টেতে তখন পাখি কহিল তাঁহারে—
"মেরে তো আমায় বাপ গিয়েছে রাবণ,
তারপরে তুমি আর মেরো না রে ধন।
পলায়ে গিয়েছে দুষ্ট লয়ে সীতা মায়,
প্রাণ গেল, না পারিনু রাখিবারে তাঁয়।"
জটায়ুরে বুকে লয়ে দুভাই তখন,
কাঁদেন কাতর হয়ে, শিশুর মতন।
কিন্তু হায়, সেই ক্ষণে প্রাণ গেল তার
কিছুই কহিতে পাখি পারিল না আর।
সেথা হতে তারপর সীতারে খুঁজিয়া,
চলিলেন দুই ভাই ঘন ব' দিয়া।
কবন্ধ রাক্ষস ছিল তাহাব ভিতর,
কি আর কহিব সে যে কত ভয়ংকর।
মাথা নাই, গলা নাই, আছে শুধু ভুঁড়ি,
হাঁ করে রয়েছে ভাই সারা বন জুড়ি।
থামের মতন তার বড়-বড় দাঁত,
যোজন জুড়িয়া দুই সর্বনেশে হাত।
একখানা চোখ দিয়া চায় কট্‌মট্‌,
হাতি ঘোষ যাই দেখে, ধরে চট্‌পট্‌।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যান সেই বন দিয়া,
খপ্‌ করে নিল বেটা তাঁদেরে ধরিয়া।
তখন বলেন তাঁরা, "খায বুঝি গিলে,
এই বেলা কাটি হাত দুই ভাই মিলে।"
এই বলি দুই ভাই তলোয়ার দিয়া,
তাড়াতাড়ি হাত তার ফেলেন কাটিয়া।
গড়াগড়ি দিয়া কিবা চেঁচাইল তায়,
কহিল সে, "কে তোমরা? বল তা আমায়।"
শুনিয়া তাঁদের নাম বিনয়ে সে কয়,
"ভাগ্যেতে আমার হেথা এলে মহাশয়
এখন পোড়াও মোরে যদি দয়া করে
ঘুচিবে আমার দুঃখ, যাব নিজ ঘরে।"
আগুন জ্বালিয়া ভারি দুজনে তখন
কবন্ধে পোড়ান তায় শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অমনি দেখেন তাঁরা, কিবা চমৎকার,

পরম সুন্দর দেহ হইল তাহার।
আগুন হইতে উঠি তখন সে কয়,
"সুগ্রীবের কাছে তুমি যাও মহাশয়।
ঋষ্যমূক পরবতে, পম্পা নদী-তীরে,
থাকে সে লইয়া সাথে বড়-বড় বীরে।
ত্বরায় তাহারে বন্ধু কর মহাশয়,
করিয়া সীতার খোঁজ দিবে সে নিশ্চয়।"
তাহা শুনি দুই ভাই যান সেথা হতে,
যেথায় সুগ্রীব থাকে সেই পরবতে।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

তাবপর পম্পা নদী পার হয়ে শেষে,
আসিলেন দুই ভাই বানরের দেশে।
বানর কতই সেথা থাকে ভাবী-ভাবী,
পর্বত ছুঁড়িয়া মারে লম্বা লেজ নাড়ি।
বাজা তার বড় বীর, বালী নাম ধবে,
সুগ্রীব তাহাব ভাই, কাঁপে [illegible] [illegible]রে।
কিষ্কিন্ধ্যায় থাকে বালী লোকজন লয়ে
ঋষ্যমূক নাহি যায় মাতঙ্গের ভয়ে।
সেই মুনি এই শাপ দিয়েছিল তায়,
"মাথা ফেটে যাবে তোর, আসিলে হেথায়।"
সেই ভয়ে ঋষ্যমূকে নাহি যায় বালী
দূর থেকে সুগ্রীবেরে দেয় শুধু গালি।
পর্বত হইতে দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
বড়ই হইল ভয় সুগ্রীবের মনে।
মন্ত্রী হনুমানে ডেকে বলিল তখন,
"কি লাগি আইল হেথা মানুষ দুজন?
বালী বুঝি পাঠাইল, মারিতে আমায়,
নিশ্চয় জানিয়া হনু আইস ত্বরায়।"
গোপ-দাড়ি পরে হনু সাজিল সন্ন্যাসী
রামের নিকটে পরে দেখা দিল আসি।
বড়ই পণ্ডিত হনু, ভারি বুদ্ধিমান,
হাসি-হাসি কথা কয়, মধুর সমান।
রামেরে করিল সুখী মিষ্ট কথা কয়ে,

কাঁধে করে গেল পরে দুজনেরে লয়ে।
সুগ্রীব রামের কাছে জোড়হাতে কয়,
"দয়া করে মোর মিতা হও মহাশয়।
কত দুঃখ দিয়া বালী দিল তাড়াইয়া
রাজা কর মোরে রাম তাহারে মারিয়া।"
শ্রীরাম কহেন তাবে, "আমি তাই চাই,
হইতে তোমার মিতা এনু এই ঠাঁই।
বালীরে মারিয়া রাজা করিব তোমায়,
দয়া করে দাও মিতা খুঁজিয়া সীতায়।"
সুগ্রীব কহিল, "মিতা, নাহি কোনো ভয়
সীতারে খুঁজিয়া মোরা আনিব নিশ্চয়।
সেদিন রাবণ গেল এইখান দিয়া,
দেবতার মতো এক মেয়েকে লইয়া।
কেঁদেছিল সেই কন্যা তোমাদের ডাকি,
সকলে শুনিনু মোরা এইখানে থাকি।
ফেলি গেল অলংকার মোদের দেখিয়া
যতন করিয়া তাহা দিয়াছি রাখিয়া।"
কতই কাঁদেন রাম দেখে অলংকার,
"সীতা, সীতা" বলে বুক ফাটে যেন তাঁর
সুগ্রীব কহিল তাঁরে, "কাঁদিয়ো না মিতা,
নিশ্চয় কহিনু মোরা এনে দিব সীতা।"
তখন রামের বড় সুখ হল মনে,
হাসিয়া কহেন কথা সুগ্রীবের সনে।
সুগ্রীব কহিল, "মিতা, বড় ভয় পাই,
বালীর সমান বীর কোথাও যে নাই।
দুন্দুভি দানবে বালী ফেলে দিল ছুঁড়ে,
যোজন দূরেতে এসে পড়িল সে উড়ে।
ঐ দেখ পড়ে সেই দুন্দুভির হাড়,
দেখ, তায় কত বড় হয়েছে পাহাড়।
হেসে বালী শালগাছ ফোঁড়ে শূল দিয়া,
পর্বতের চূড়া লয়ে খেলে সে লুফিয়া।
দুন্দুভির হাড় তুমি পার কি ছুঁড়িতে?
তীর মারি শালগাছ পার কি ফুঁড়িতে?"
পায়ের আঙুলে রাম সেই হাড় ঠেলে,
দিলেন যোজন দশ দূরে তাহা ফেলে।
গাঁথা গেল সাত শাল তাঁর এক তীরে,

পর্বত পাতাল ফুঁড়ে এল তাহা ফিরে!
তখন সুগ্রীব ধরি শ্রীরামের পায়,
নাচিতে-নাচিতে ধূলা লইল মাথায়।
যত ভয় ছিল তার, গেল দূর হয়ে,
চলিল সে কিষ্কিন্ধ্যায় শ্রীরামেরে লয়ে।
লাফায়ে-লাফায়ে সেথা করে গরজন,
"কোথায় গেলে হে দাদা? এস-না এখন।"

সে ডাক শুনিয়া বালী সহিবে কেমনে?
ঝড়ের মতন ছুটে এল সেই ক্ষণে।
দুজনে বিষম যুদ্ধ হল তারপর,
কিবা তার লাথি কিল আঁচড় কামড়।
ঢিপ্, ঠাস্, ধুপ্, ঘট্, ঘোঁৎ, হুপ্, ধাই,
কত শব্দ হল তায়, শেষ তার নাই।
হোথায় দাঁড়ায়ে রাম তীর হাতে নিয়া,
বালীরে মারিতে চান সেই তীর দিয়া।
কিন্তু তিনি পড়েছেন বড ভাবনায়,
কে বা বালী, কে বা মিতা, বুঝা নাহি যায়
বালীরে মারিতে পাছে মিতা যায় মবে,
বাণ না মারেন রাম এই ভয় করে।
কিল গুঁতা খেয়ে মিতা ছুটে এল হটে,
হাঁপায়ে রামেরে আসি কহিল সে চটে,
"এই মোর মিতা তুই! এই তোর কাজ!
তোর লাগি এত কিল খাইলাম আজ।"
শ্রীরাম বলেন, "মিতা করিও না রোষ,
চিনিতে নারিনু তোরে তাই হল দোষ।
গলে বেঁধে এই লতা যাও তুমি ফিরে
মারি কি না মারি দেখ তখন বালীরে!"
সুগ্রীব সে লতাখানি পরিল গলায়,
চেঁচায়ে ডাকিল পরে, "আয়, দাদা আয়!"
আবার বিষম যুদ্ধ করিল দুজন,
রামের বাণেতে বালী মরিল তখন।
এমতে বালীরে মারি শ্রীরাম ত্বরায়,
সুগ্রীবেরে করিলেন রাজা কিষ্কিন্ধ্যায়।
অঙ্গদেরে যুবরাজ করিলেন পরে,
সে হয় বালীর পুত্র, ভারি বল ধরে।

তখন ছুটিল যত বানরের দল,
ধূলা উড়াইয়া আর করি কোলাহল।
দেশে-দেশে ফিরি তারা খুঁজিল সীতারে,
পর্বতে নগরে বনে সাগরের পারে।
খুঁজিয়া-খুঁজিয়া পুবে পশ্চিমে উত্তরে,
কোথাও না পেয়ে তাঁরে ফিরে এল ঘরে।
দক্ষিণের লোক ফিরে আসে নি কেবল,
সেথা গেছে হনুমান লয়ে তার দল।
আঙুটি খুলিয়া রাম দিয়াছেন তারে,
পাইলে সীতার দেখা দেখাতে তাঁহারে।
খুঁজেছে নদীর তীরে, পর্বত উপরে,
ঘন বনে, অন্ধকার গুহার ভিতরে।
কোথাও সীতার দেখা না পাইয়া তারা
সাগরের ধারে আসি কেঁদে হল সারা।
বলে, "আর কোন মুখে ফিরে যাব ঘরে?
না খেয়ে মরিব মোরা এইখানে পড়ে।"

তখন কি হল, সবে শুন মন দিয়া,
সেইখানে ছিল পাখি সম্পাতি বসিয়া।
পাখা নাই তার, তাই উড়িতে না পারে,
সেথায় বসিয়া থাকে সাগরের ধারে।
বানর এসেছে এত, দেখিয়া সম্পাতি,
তাদের সকল কথা শোনে কান পাতি।
বানর বসিল সেথা মরিবার তরে,
পাখি বলে, "বেশ হল, খাব পেট ভরে!"
বানর কহিল যবে জটায়ুর কথা,
শুনিয়া বড়ই মনে পাইল সে ব্যথা।
বানর সীতার কথা কহিল যখন,
সম্পাতি কহিল, "তাঁরে নিয়েছে রাবণ।
একশো যোজন এই রয়েছে সাগর,
তারপরে লঙ্কা, সেথা রাবণের ঘর।
সূর্যের তেজেতে পাখা পুড়িল আমার,
সীতার সংবাদ দিলে হবে তা আবার।
নিশাকর মুনি এই কহিল আমারে,
সেই হতে বসে আছি সাগরের ধারে।"
তখন দেখিল চেয়ে যতেক বানর,

সম্পাতির লাল পাখা হইল সুন্দর।
আনন্দে আকাশে উড়ে গেল সে চলিয়া,
কোলাহল করে যত বানর মিলিয়া।
তখন অঙ্গদ কয় সকলেরে ডাকি,
"এখন সাগর শুধু ডিঙ্গাইতে বাকি।
তোমরা তো বড় বীর, তায় ভুল নাই,
সাগর ডিঙ্গাবে কেবা, বল দেখি ভাই?"
সকল বানর তায় পায় বড় লাজ,
বড়ই বিষম যেন লাগে সেই কাজ।
এমন সময় উঠি কহে জাম্ববান,
"সাগর ডিঙ্গাতে পারে বীর হনুমান।"
চুপ করে ছিল হনু বসে একধারে
সাগর ডিঙ্গাতে কয় জাম্ববান তারে।
হনু বলে, "চল যাই মহেন্দ্র পর্বতে
সাগর ডিঙ্গাতে লাফ দিব সেথা হতে।"

সুন্দরকাণ্ড

হনুমান বড় বীর, ডিঙ্গাবে সাগর,
কিচির-মিচির করে যতেক বানর।
ফুলিয়া হইল হনু পর্বতের মতো,
গুছায়ে লইল গায় জোর ছিল যত।
তারপরে দুই পায়ে যেই দিল ভর,
পর্বত নিঙাড়ি জল ঝরে ঝরঝর।
আকাশ ফাটিয়া যায়, উছলে সাগর,
লাফাইল হনুমান বড় ভয়ংকর।
মেঘের উপর দিয়া ছোটে যেন তারা,
দেবতা অসুর সবে ভয়ে হয় সারা।
সুরসারে কয় ডাকি দেবতারা পরে,
"দেখ তো মা, হনুমান কত বল ধরে?"
সুরসা নাগের মাতা, যে সে কেহ নয়,
পৃথিবী গিলিতে পারে যদি মনে লয়।
হনুমান বলে, "বাবা! না জানি কে ইনি!
হাঁ করেছে কত ক্রোশ, দেখ চমৎকার,
বড় যদি নাহি হই, গিলিবে এবার।"

ফুলে ওঠে হনুমান মনে ভয় পেয়ে
সুরসা হাঁ করে ঢের বড় তার চেয়ে।
ফুলে-ফুলে হয় হনু নব্বুই যোজন,
হাঁ করে যোজন শত সুরসা তখন।
হনু বলে, "তাই তো রে, গিলিবেই নাকি?
সে হবে না ঠাকরুণ—হনু জানে ফাঁকি।"
শরীর গুটায়ে হনু লইল তখন,
পলকে হইল তেলাপোকার মতন।
ঝাঁ করে ঢুকিল গিয়া সুরসার মুখে,
তখনি বাহির হয়ে পলাইল সুখে।
ঠকিয়া সুরসা হাসি ফ্যাল্-ফ্যাল্ চায়,
কোথা দিয়ে গেল হনু ভাবিয়া না পায়।
ডাকিয়া কহিল তারে, "যাও বাছাধন
সুখেতে নিজের কাজ কর গে এখন।"
বলিয়া সুরসা যায় আপনার দেশে
আকাশে ছুটিয়া হনু যায় হেসে-হেসে।
সিংহিকা রাক্ষসী এল সুরসার পরে,
মুখ মেলি হনুমানে গিলিবার তরে।
হনু বলে, "বুড়ি তুই ভালো ভোজ খাবি,
অসুখ না হয় পরে, তাই শুধু ভাবি।"
ছোট হয়ে গেল হনু রাক্ষসীর পেটে,
নাড়ি ভুঁড়ি সব তার নখে দিল কেটে।
হাঁ করে রাক্ষসী মরে, হাসে দেবগণ,
আকাশে ছুটিয়া হনু যায় ততক্ষণ।
লঙ্কার সোনার পুরী দেখে তারপরে,
ঝলমল করে তাহা জলের উপরে।
হনু ভাবে, 'বড় হয়ে যদি সেথা যাই,
রাক্ষসে করিবে দেখি ভারি কাঁই-মাঁই।'
খুব ছোট হয়ে তাই, পাখির সমান,
ত্রিকূট পর্বতে গিয়া নামে হনুমান।
লুকায়ে রাহল বনে দিনের বেলায়,
আঁধার হইলে গেল খুঁজিতে সীতায়।

চুপিচুপি যায় হনু, ছোট হয়ে ভারি,
বিকট রাক্ষসী তায় দেখে এল তাড়ি।
গালি দিল দুশো দাঁত করি কড়্মড়্,

তালগাছপানা হাতে কষে দিল চড়।
হনু তারে এক কিল দিল বাম হাতে,
পড়িল রাক্ষসী মুখ সিঁটকায়ে তাতে।
তখন খুঁজিয়া হনু ফেরে ঘরে-ঘরে,
কত মাঠে, কত পথে, রথের উপরে।
মন্দিরে-মন্দিরে খোঁজে, ঘাটে আঙিনায়,
কোথাও সীতায় নাহি দেখিবারে পায়।
হনু বলে, "হায়-হায়! বুঝিনু এখন,
নিশ্চয় খেয়েছে তাঁরে অভাগা রাবণ।"
কত সে কাঁদিল, ভাবি এই কথা মনে
তারপরে এল এক অশোকের বনে।
সেই বনে গিয়া হনু দেখিল সীতায়,
কেবলই কাঁদেন তিনি পড়িয়া ধুলায়
ময়লা কাপড় তাঁর, আলুথালু চুল,
রাক্ষসে ঘিরেছে তাঁরে লয়ে শেল শূল।
হনু বলে, "এই সীতা, চিনিনু এখন,
ইঁহারেই সেইদিন আনিল রাবণ।"
বিকট রাক্ষসী হনু দেখিল সেথায়
ভালুকের মতো রোঁয়া তাহাদের গায়
বাঘমুখী কেউ, কারু গোদ বড় ভারি,
কারু শিঙ, কারু শুঁড়, কেউ নাড়ে দাড়ি
কারু নেই মাথা, আর কেহ এক পেয়ে,
উটপানা, বকপানা আছে কত মেয়ে।
সীতারে ঘিরিয়া তারা খিঁচাইছে দাঁত
কিল দেখাইছে, তুলি এই বড় হাত।
রাবণ সীতারে আসি কত কথা কয়,
বাঁধিয়া খাইবে বলি দেখায় সে ভয়।
ছিঁড়িয়া খাইতে চায় রাক্ষসীরা তাঁরে,
কুড়াল তুলিয়া তাঁরে যায় মারিবারে।
সীতা কন, "তাই হোক ওরে বাছাগণ,
মরিলে তো যাই বেঁচে, মার এইক্ষণ।"

গাছে বসে হনুমান দেখিছে সকল,
কেমনে কহিবে কথা ভাবিছে কেবল।
এমন সময় সীতা এলেন সেখানে,
কত সুখ হল তাঁর পেয়ে হনুমানে

রামের অঙ্গুরী দিয়া হনু কয় তাঁরে,
"কাঁধে ওঠ, যাই মাগো লইয়া তোমারে।"
সীতা কন, "বাছা তুই এতটুকু হয়ে
কেমনে যাইবে বল মোরে কাঁধে লয়ে?"
শুনিয়া তাঁহার কথা হেসে হনুমান,
দেখিতে-দেখিতে হয় পর্বত সমান।
সীতা কন, "বুঝিলাম, ভারি বল তোর,
কিন্তু বাপ্, মাথা যে রে ঘুরে যাবে মোর।'
হনু কয়, "তবে মাতা কাজ নাই গিয়া,
রাম লক্ষ্মণেরে মোরা হেথা আসি নিয়া।
একখানি অলংকার দাও মা আমারে,
রামেব নিকট গিয়া দেখাইতে তাঁরে।"
শুনিয়া মাথার মণি দেন সীতা খুলি,
বিদায় হইল হনু লয়ে পদধূলি।
যাবার সময় হনু মনে-মনে কয়,
'রাক্ষস কেমন বীর না দেখিলে নয়।'
হুপ্-হাপ্, ধুপ্-ধাপ্ করি তারপর,
অশোকের বন হনু ভাঙে মড়্মড়্।
বড়-বড় গাছ তোলে দিয়া এক টান,
গাছ দিয়া বাড়ি-ঘর করে খান্-খান্।
তখন রাক্ষস যত করি "মার্-মার্,"
ক্ষেপিয়া আইল লয়ে ঢাল তলোয়ার।
হনু বলে, "জয় রাম! কে মরিবি আয়।"
শতেক রাক্ষস মরে তার এক ঘায়।
যত আসে তত মরে, তবু আসে আর,
সাগরের ঢেউ যেন, শেষ নাই তার।
"জয় রাম! জয় রাম!" হাঁকে হনুমান।
রাক্ষসের মাথা পড়ে হয়ে খান্-খান্।
হাতি দিয়া হাতি মারে, ঘোড়া দিয়া ঘোড়া,
রাক্ষসে রাক্ষস ঠোকে লয়ে জোড়া-জোড়া।
জাম্বুমালী, বিরূপাক্ষ, ভাসকর্ণ আর,
দুর্ধর প্রঘসে মারি করে চুরমার।
যুপাক্ষের হাড় ভাঙে শাল গাছ দিয়া,
অক্ষেরে করিল গুঁড়া সানে আছাড়িয়া।
রাবণের ছেলে অক্ষ মরিল যখন,
বড় ছেলে ইন্দ্রজিতে পাঠাল রাবণ।

বড় শঠ সেই বেটা, ভারি ফন্দি জানে,
ব্রহ্মাস্ত্রে বাঁধিল আসি বীর হনুমানে।
হনু ভাবে, 'লয়ে যাক রাবণের কাছে,
দেখে নিব, পেটে তার কত বিদ্যা আছে।'
তখন রাক্ষস যত ছুটে গেল নাচি
হনুরে বাঁধিল কষে আনি কত কাছি।
তায় কি হইল, সবে শুন মন দিয়া—
ব্রহ্মাস্ত্র খুলিয়া গেল দড়িতে ঠেকিয়া।
দড়ি ঠেকাইতে কভু না হয় সে বাণে,
অবোধ রাক্ষসগণ তাহা নাহি জানে।
হাততালি দিয়া তারা হাসে খিলি-খিলি,
"হেঁইয়ো, হেঁইয়ো!" বলি টানে সবে মিলি।
চিমটি কাটিছে কত কি হবে তা কয়ে,
এই মতে রাবণের কাছে গেল লয়ে।

যতেক রাক্ষস ছিল সভার ভিতরে,
হনুরে দেখিয়া তারা রহিল হাঁ করে।
তারা বলে, "আরে বাপ! কি বড় বান্দর।
কেন রে আসিলি তুই? কোন দেশে ঘর?
বোনটি ভাঙিলি কেনে? কে পেঠালো তোরে
মিছাটি কহিবি যেবে, খাব তোকে ধরে।"
হনুমান বলে, "আমি শ্রীরামের দূত,
হনুমান মোর নাম পবনের পুত।
সীতাকে ফিরায়ে যদি না দেয় রাবণ,
কাটিবেন মাথা তার শ্রীরাম লক্ষ্মণ।"
ঘুরায়ে কুড়িটা চোখ, বলিছে রাবণ,
"কাট্ তো রে অভাগারে, কাট্ এইক্ষণ।"
সেথা ছিল বিভীষণ, রাবণের ভাই,
সে বলে, "দূতেরে কভু মারিতে তো নাই।"
রাবণ কহিল, "তবে কাজ নেই মেরে,
লেজটি পোড়ায়ে তার, দে বেটাকে ছেড়ে।"
কাপড় হনুর লেজে জড়ায়ে তখন,
তেল ঢালি দিল জ্বালি সেই দুষ্টগণ।
হো-হো করে হনুমান হেসে তায় সুখে,
ঘষে দিল সেই লেজ দুষ্টদের মুখে।
ছোট হল তারপর, ইঁদুর যেমন

খুলিয়া পড়িল তায় দড়ির বাঁধন।
অমনি লাফায়ে উঠে চালের উপরে,
আগুন লাগায়ে হনু ফেরে ঘরে-ঘরে।
না পোড়ে শরীর তার সীতার কথায়
সকল পোড়ায় হনু যাহা কিছু পায়।
জ্বলিল আগুন ভারি করি দাউ-দাউ
ভয়েতে রাক্ষস যত করে হাউ-মাউ।
ছুটাছুটি করে শুধু পাগলের মতো,
আগুনে পুড়িয়া মরে না জানি বা কত।

তারপর হনুমান সাগরে নামিয়া,
লেজের আগুন সব দিল নিবাইয়া।
এমন সময়ে হনু ভাবে, 'হায়-হায়!
পোড়ায়ে মারিনু বুঝি মোর সীতা মায়!
অমনি গেল সে ছুটে অশোকের বনে,
ভালো দেখে তাঁয় বড় সুখ পেল মনে।
আবার পায়ের ধুলা লইয়া তাঁহার,
সাগর ডিঙায়ে হনু দলে ফিরে তার।

আনন্দে তখন দেশে চলিল সকলে,
আকাশ ফাটিয়া যায় তার কোলাহলে।
দেখিতে-দেখিতে হনু এসে কিষ্কিন্ধ্যায়,
রামের পায়ের ধূলা লইল মাথায়।
সীতার মানিক দিয়া কহিল সকল,
আনন্দেতে শ্রীরামের চোখে এল জল।

লঙ্কাকাণ্ড

তারপরে মিলিয়া সকলে,
লঙ্কায় চলিল দলে-দলে,
গণিয়া না হয় শেষ, ধূলায় ছাইল দেশ
আকাশ ফাটিল কোলাহলে।
সভা মধ্যে বসিয়া রাবণ
বলিছে, "কহ তো সভাজন,
একেলা বানর আসি সকলই যে গেল নাশি,
উপায় কি হইবে এখন?"
সবে কয়, "কেনে কর ডর?
লাখো মাল বান্ধিবে কোম্মর,
হেথের লিবেক ভারী, বান্দর দিবেক মারি,
তুই থাক্ বসে গদ্দিপর!"
সেইখানে ছিল বিভীষণ,
বিনয়ে সে কহিল তখন,
"সীতারে রাখিলে ধরে, সকলে মরিব পরে,
ফিরায়ে দেহ গো এইক্ষণ।"
ভালো কথা কহিল যে জন,
গালি দিল তাহারে রাবণ,
মনের দুঃখেতে তাই, গিয়া শ্রীরামের ঠাঁই
বন্ধু তাঁর হল বিভীষণ।
তারপরে যতেক বানর
বড়-বড় আনিল পাথর,
গাছ কত ভারী-ভারী, আনে তা কহিতে নারি,
তাহে নল বাঁধিল সাগর।
নলের কি বুদ্ধি চমৎকার,
তেমন দেখে নি কেহ আর।

জলের উপর দিয়া দিল সেতু বানাইয়া
সাগর হইল সবে পার।
লঙ্কাপুরী ছাইল বানরে
কাঁপে মাটি তাহাদের ভরে।
কে কবে এসেছে কত? গাছে পাতা নাই তত,
দেখিয়া রাবণ কাঁপে ডরে।
তবু তো সে বড়াই না ছাড়ে,
বলে, "কেবা মোর সাথে পারে?"
মুকুট মাথায় দিয়া, কিবা বুক ফুলাইয়া,
দাঁড়ায়েছে লঙ্কার দুয়ারে।
সুগ্রীব তা দেখিল চাহিয়া
অমনি এল সে লাফ দিয়া,
রাবণের ঘাড়ে এসে, পড়িল সে হেসে-হেসে
দিল তাব বড়াই ভাঙিয়া!
হায়-হায়! কহিল সকলে,
রাবণ তো গেল রেগে জ্বলে,
কাড়িয়া মুকুট তাব, সাজা কিছু দিয়া আর,
হাসিয়া সুগ্রীব গেল চলে।
পরেতে অঙ্গদ বীর গিয়া
রাবণেরে কহে গালি দিয়া,
"তুই বেটা পাবি সাজা, বিভীষণ হবে রাজা
যুদ্ধ কর্ বাহিরে আসিয়া।"
বড় তায় চটিয়া রাবণ,
"কাট্! কাট্!" কহিল তখন
হাঁই-মাঁই করি তায়, অঙ্গদে ধরিতে যায়
চারি বেটা যমের মতন।
তারা এল "হাঁই-মাঁই" বলে,
সে তাদেরে পুরিল বগলে,
"রাম জয়" বলি তবে, আছাড়ি মারিল সবে,
তারপর ঘরে এল চলে।

তখন হইল যুদ্ধ বড় ভয়ংকর,
না জানি মরিল কত রাক্ষস বানর।
দিন নাই, রাত নাই, করে কাটাকাটি,
রক্তেতে বহিল নদী, লাল হল মাটি।
"মার্-মার্" "কাট্-কাট্" মহা গণ্ডগোল,

অস্ত্র করে ঝন্‌ঝন্‌, বাজে ঢাক ঢোল।
হেথায় রামের বাণ ছোটে যেন তারা,
পলায় রাক্ষস তায় হয়ে দিশাহারা।
অঙ্গদ রুষিয়া গেল দেখি ইন্দ্রজিতে,
পিষিল সারথি তার বিষম লাথিতে।
তাহে দুষ্ট ইন্দ্রজিত পেয়ে বড় ডর,
মেঘে লুকাইয়া যুদ্ধ করে তারপর।
শুন বলি হল তায় কি যে সর্বনাশ,
চোর বেটা মারে বাণ নাম নাগপাশ!
বড়-বড় অজগর ছুটে এল তায়,
বিষম জড়াল রাম লক্ষ্মণের গায়।
সাপে বাঁধা দুই ভাই নড়িতে না পান,
বাণেতে তাঁদের দুষ্ট করিল অজ্ঞান।
ঘরে গিয়া তারপর কয় রাবণেরে,
"মানুষ দুটাকে আমি আসিয়াছি মেরে।"
হেথায় কি হল তাহা শুন মন দিয়া—
কাঁদিছে সকলে রাম লক্ষ্মণে ঘিরিয়া।
আইল গরুড় পাখি তখন সেথায়,
সাপেরে দেখিলে ধরে অমনি সে খায়।
জটায়ুর জ্যেঠা সে যে, ভারি ভয়ংকর,
উড়িলে পর্বত কাঁপে, বড় বয় ঝড়।
তারে দেখি অজগর দুভাইকে ছাড়ি,
'বাপ!' বলি পলাইয়া গেল তাড়াতাড়ি।
গরুড়ে করেন রাম কতই আদর,
উঁচু লেজ করি নাচে যতেক বানর।
কিচির-মিচির শুনি কহিছে রাবণ,
"রাম তো মরিল, তবে গোল কি কারণ?"
রাক্ষসেরা কয়, "আরে রামা হল চাঙ্গা,
চিল্লায়ে বান্দর বেটা নাচে ধিঙ্গা তাঙ্গা।"
শুনিয়া রাবণ বলে, "সব হল মাটি,"
কোথা রে ধূম্রাক্ষ! এস বেটাদের কাটি!"
ধূম্রাক্ষ চলিল তায় গদা হাতে নিয়া,
বাঘমুখো গাধা সব রথেতে জুড়িয়া।
সঙ্গেতে রাক্ষস কত লেখাজোখা নাই,
দাঁত কড়্‌মড়ি তারা করে হাঁই-মাঁই।
ছোট-ছোট বানরের তেজ বড় ভারি,

রাক্ষসের হাড় ভাঙে কিল চড় মারি।
ক্ষেপিল ধূম্রাক্ষ তায় যমের মতন,
ভয়েতে মর্কট যত পলায় তখন।
ছোট বানরের দল যায় পলাইয়া,
দূর হতে হনুমান দেখিল চাহিয়া।
অমনি আনিয়া এক পর্বতের চূড়া,
ধাঁই করি ধূম্রাক্ষেরে করিল সে গুঁড়া।
বড়ই বিষম যুদ্ধ বানরেরা করে,
রাক্ষসেরে নাহি দেয় ফিরে যেতে ঘরে।
থাপ্পড় লাগায় ভারি, ছিঁড়ে নাক কান,
গলায় জড়ায়ে লেজ কষে দেয় টান।
যেই আসে তারে মারে, নাহি করে ভয়,
মাথাটি ফাটায় তার বলে, "রাম জয়!"
বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন, যুদ্ধে যেন যম,
কুম্ভহনু, নরান্তক, নহে কেহ কম।
প্রহস্থ কেমন বীর, কি হবে তা বলে?
বানরের হাতে এরা মরিল সকলে।
কেমনে ঘরেতে বসে থাকিবে রাবণ?
নিজেই আসিল তাই লয়ে লোকজন।
ইন্দ্রজিত, অতিকায় সাথে এল তার,
ত্রিশিরা নিকুম্ভ, কুম্ভ মহোদর আর।
লাফায়ে বানর ধায় পর্বত লইয়া,
রাক্ষসেরে নাহি দেয় ফিরে যেতে ঘরে।
রাগিয়া রাবণ মারে চোখা-চোখা বাণ,
পর্বত ভাঙিয়া তায় হয় খান্-খান্।
বড় যুদ্ধ করে বেটা ভূতের মতন,
আঁটিতে নাহিক তারে পারে কোনোজন।
সুগ্রীব অজ্ঞান হল বুকে বাণ ফুটে,
গবয়, ঋষভ, নল, পলাইল ছুটে।
কিল বাগাইয়া তায় এল হনুমান,
দুজনে হইল যুদ্ধ সমান-সমান।
দুজনে মারিল সে কি যে সে কিল চড়?
অন্য লোক হলে তায় ভাঙিত পাঁজর।
বড় বীর ছিল তাই মরে নাই তারা,
ব্যথায় চেঁচিয়ে কিন্তু হয়েছিল সারা।
তখন রাবণ দিল হনুমানে ছাড়ি,

নীলেরে মারিতে পরে গেল তাড়াতাড়ি।
বড় চটপটে নীল ছুঁচোবাজি মতো,
চোখের পলকে লাফ দেয় দুই শত।
ছুটে উঠে রাবণের রথের চূড়ায়,
টিপ্ করে পড়ে নীল বেটার মাথায়।
তিড়িঙ-বিড়িঙ নাচি ফেরে হেথা-হোথা,
রাবণ পড়িল গোলে—বাণ মারে কোথা?
হাসিল বানর সব, চটিল রাবণ,
ভয়ংকর বাণ হাতে লইল তখন।
অজ্ঞান হইয়া নীল পড়িল সে বাণে,
ধাইয়া রাবণ গেল লক্ষ্মণের পানে।
দুইজনে হল যুদ্ধ বড়ই বিষম,
দুইজনে ভারি বীর কেহ নহে কম।
রাবণ লক্ষ্মণে মারে কড়্মড়ি দাঁত,
লক্ষ্মণ করেন তারে বাণে চিৎপাত।
তখন রাগেতে বেটা কাঁপি থর্থর্,
ছুঁড়িয়া মারিল এক শক্তি ভয়ংকর।
ব্রহ্মার নিকটে তাহা পাইল রাবণ,
বারণ করিতে তারে নাবে কোনোজন।
পড়িল আসিয়া শক্তি বজ্রের সমান,
বুকে বিঁধি লক্ষ্মণেরে করিল অজ্ঞান।
ছুটিয়া রাবণ তায় এল তারে নিতে,
নিয়ে যাবে দূরে থাক, নারিল নাড়িতে।
এমন সময়ে এসে বীব হনুমান,
এক কিলে অভাগারে করিল অজ্ঞান।
লক্ষ্মণেরে তারপরে কোলেতে করিয়া
রামের নিকটে তাঁরে গেল সে লইয়া।
আপনি তখন শক্তি পড়ে গেল খুলে,
হেসে উঠিলেন তিনি সব দুঃখ ভুলে।

নিজেই তখন রাম লয়ে ধনু-শর,
রাবণেরে দিতে সাজা চলেন সত্বর।
পিঠে করে লয়ে তাঁরে যায় হনুমান,
বাগে পেয়ে তারে দুষ্ট কষে মারে বাণ।
হনুরে মারিয়া বাণ কত হবে কাজ?
শ্রীরামের বাণ খেয়ে বাচুক তো আজ।

রথ ঘোড়া সব তার গেল তাঁর বাণে,
সারথি মরিল, নিজে মরে বুঝি প্রাণে।
মুকুট গিয়েছে উড়ে, মাথা যায়-যায়,
অবশ হয়েছে হাত, বল নাই গায়।
হাসিয়া তখন তারে কহিলেন রাম,
"আজি তবে ঘরে গিয়া করহ বিশ্রাম।"
লাজে আর রাবণের কথা নাহি সরে,
হেঁট করে কালামুখ পলাইল ঘরে।
বসিয়া সভার মাঝে বলিছে রাবণ,
"উপায় কি হবে, সবে কহ তো এখন।
মানুষেরে ধরে খাই, নাহি করি ডর,
কে জানে সে বেটা হয় এত ভয়ংকর?
হায় আমি তার কাছে গেলাম হারিয়া!
কোন বীর দিবে এই মানুষ মারিয়া?
শীঘ্র গিয়া কুম্ভকর্ণে জাগাও এখন,
মানুষ মারিবে সেই যদি করে মন।"
কুম্ভকর্ণ ভাই হয় রাবণ রাজার,
ছুটিয়া পলায় যম দেখা পেলে তার।
এমন বিকট জন্তু দেখে নাই কেহ,
পাহাড়ের মতো তার ভয়ংকর দেহ।
ব্রহ্মা দিল বর, 'শুধু ঘুমাইবে' বলে
নহিলে গিলিয়া বেটা খাইত সকলে।
ছয় মাস ঘুমাইয়া জাগে একদিন,
হাজারে-হাজারে খায় মহিষ হরিণ।
ঘরের ভিতরে তার নাহি হয় ঠাঁই,
পর্বত গুহায় গিয়া ঘুমায় সে তাই।
ঝড়ের মতন শ্বাস বয় নাক দিয়া,
যে যায় নিকটে, তারে নেয় উড়াইয়া।
তারে জাগাইতে সবে গেল তাড়াতাড়ি,
ফুঁকিল কানের কাছে শাঁখ ভারী-ভারী।
তালি দিয়া চটাপট্ চেঁচাইল কত,
কষে নাড়া দিল গায়, যে পারিল যত।
এত করি তবু তারে নারি জাগাইতে,
সকলে মিলিয়া তারে লাগিল মারিতে।
কষে মারে কিল-গুঁতা যত মতো হয়,
চিমটি কাটে যে কত, বলিবার নয়।

দু-হাতে টানিয়া চুল ছিঁড়ে গোছা-গোছা,
হাঁচির ভয়েতে নাকে নাহি দেয় খোঁচা!
কানে জল ঢেলে তায় লাগায় কামড়,
আরো নাক ডাকে তায়, ঘড়র্-ঘড়র্।
হাজার পাহাড়পানা হাতি দিয়া তবে,
ঘুরিয়া-ঘুরিয়া তারে মাড়াইল সবে।
সুখ বড় পেল তায়, চোখ মেলে তাই,
উঠিয়া তুলিল বেটা এই বড় হাই!
অমনি সকলে আনি খেতে দিল তারে,
শুয়োর, হরিণ, মোষ হাজারে-হাজারে।
সকল করিয়া শেষ কুম্ভকর্ণ কয়,
"কি লাগি জাগালে মোরে এমন সময়?"
জোড়হাতে কয় সবে, "বড়, বড় ডর!
মারি কাটি দিল সব, মানুষ-বান্দর!"
তাহা শুনি কুম্ভকর্ণ চলিল ত্বরায়,
যেথায় রাবণ আছে বসিয়া সভায়।
ভয়েতে বানর সব, তাহারে দেখিয়া,
"মাগো!" বলি দুই লাফে যায় পলাইয়া।
রাবণের কাছে গিয়া কুম্ভকর্ণ কয়,
"কি লাগি জাগালে মোরে, কহ মহাশয়।"
রাবণ সকল তারে কহিল যখন,
সে কহিল, "কেন কাজ করিলে এমন?"
তায় কিন্তু রাবণের রাগ হল ভারি,
যুদ্ধে তাই কুম্ভকর্ণ যায় তাড়াতাড়ি।
শূল হাতে ধায় সে যে পর্বতের মতো,
বানর ধরিয়া খায়, কাছে পায় যত।
রুষিয়া কামড় তারা মারে তার গায়,
সে কামড়ে কুম্ভকর্ণ সুখ শুধু পায়।
বানরেরা কিছু তার করিতে না পারে,
শরভ, ঋষভ, নীল সকলেই হারে।
অঙ্গদ অজ্ঞান হল, হনু গেল হেরে,
সুগ্রীব পর্বত লয়ে এল তায় তেড়ে।
পর্বত ভাঙিল ঠেকে রাক্ষসের গায়,
রুষিয়া তখন বেটা শূল হাতে ধায়।
ভাগ্যেতে ভাঙিল শূল আসি হনুমান,
নইলে যাইত তায় সুগ্রীবের প্রাণ।

ক্ষেপিয়া উঠিল তবে কুম্ভকর্ণ ভারি,
পর্বতের চূড়া নিল তুলে তাড়াতাড়ি।
ঠাঁই করে সুগ্রীবেরে ঠুকিল তা দিয়া,
ঘরে লয়ে গেল তারে অজ্ঞান করিয়া।
জাগিয়া ভাবিল মনে বানরের রাজা,
রাক্ষস বেটারে কিছু দিয়া যাই সাজা।
যেই কথা সেই কাজ করে বুদ্ধিমান,
দাঁতে ছিঁড়ে নাক তার, হাতে ছিঁড়ে কান
পায়ের আঁচড়ে নিল ছিঁড়ে দুই পাশ,
চেঁচাল রাক্ষস তায় ফাটায়ে আকাশ।
বিষম ভয়েতে দিল সুগ্রীবেরে ছাড়ি,
পলায়ে বানর রাজা গেল তাড়াতাড়ি।

বোঁচা হয়ে কুম্ভকর্ণ আইল তখন—
নাক নাই, কান নাই ভূতের মতন।
দেখিয়া বানর সব যায় পলাইয়া,
পিছনের পানে আর না চায় ফিরিয়া।
ধনুক ধরিয়া তায় এলেন লক্ষ্মণ,
হাসি কুম্ভকর্ণ তাঁরে কহিল তখন,
"ছেলেমানুষেরে মারি কিবা কাজ মোর?
মারিতে আসিনু আজ দাদাটাকে তোর।"
গদা লয়ে ধায় বেটা শ্রীরামের পানে,
অমনি পড়িল গদা কেটে তাঁর বাণে।
রাগে সে তখনি তুলে লইল পাথর,
পাথর ভাঙিলে নিল লোহার মুদগর।
ছুটিয়া রামের বাণ আসে শত-শত,
লাফায়ে বানর ঘাড়ে উঠেছে বা কত।
আঁচড়-কামড় মেরে করিছ পাগল,
দাঁতে হাতে পায়ে চুল ছিঁড়িছে কেবল,
কিছুতেই কুম্ভকর্ণ না হয় কাতর,
ফিরায় সকল বাণ ঘুরায়ে মুদগর!
রোষে রাম বায়ুবাণ মারেন ত্বরায়,
মুদগর সহিতে তার হাত কাটে তায়।
ব্যথায় তখন বেটা চেঁচায় বিকট,
আর হাতে তালগাছ নিল চট্‌পট্।
সে হাত কাটেন রাম ইন্দ্র অস্ত্র মেরে,

তবু সে খিঁচিয়ে দাঁত আসে ডাক ছেড়ে।
দুই পা কাটিল তবু যায় গড়াইয়া—
হাঁ কার খাইতে যায় রামেরে গিলিয়া।
তখন বাণের ছিপি মুখ তার এঁটে,
ইন্দ্র অস্ত্রে মাথা তার দেন রাম কেটে।
ভয়েতে চেঁচাল তায় রাক্ষসের দল,
আনন্দে দেবতাগণ করে কোলাহল।
কাঁদিয়া রাবণ কয়, "কি হবে উপায়?
ভাই বিভীষণে গালি কেন দিনু হায়!"
এমন করিয়া কত কাঁদিল রাবণ,
বড়-বড় ছয় বীর সাজিল তখন।
চলে সাজি অতিকায়, ত্রিশিরারে নিয়া,
দেবান্তক, নরান্তক চলিল সাজিয়া।
মহাপার্শ্ব, মহোদর চলিল দুজন,
ভারি যুদ্ধ করে তারা মিলিয়া তখন।
বানরের কিল খেয়ে মরে গেল পরে,
শুধু অতিকায় বীর সহজে না মরে।
'অক্ষয় কবচ' এক আছে তার গায়,
শেল, শূল, তীর, কিছু নাহি বিঁধে তায়।
লক্ষ্মণ মারেন বাণ বাছিয়া-বাছিয়া,
কবচে ঠেকিয়া সব আইসে ফিরিয়া।
তখন পবন এসে কন তাঁর কানে,
"ব্রহ্মাস্ত্র মারহ, বেটা মরিবে সে বাণে।"
তখন লক্ষ্মণ ছুঁড়ে মারেন সে বাণ,
তাহা দেখি রাক্ষসের উড়িল পরান।
শত অস্ত্র মারি তাহা নারে ফিরাইতে,
মাথা কাটি পড়ে তার দেখিতে-দেখিতে।
রাতে এল ইন্দ্রজিত মেঘে লুকাইয়া,
লুকায়ে মারিল বাণ আড়ালে থাকিয়া।
বাণেতে অজ্ঞান হয়ে পড়িল সকলে
হাসিতে-হাসিতে তায় গেল বেটা চলে।
লঙ্কায় ফিরিয়া বেটা কয় তারপর,
"মারিয়া আসিনু যত মানুষ-বানর।"
হেথায় পড়েছে সবে হয়ে অচেতন
বাকি শুধু হনুমান আর বিভীষণ।
সবারে খুঁজিয়া তারা ফেরে আলো নিয়া,

না জানি কোথায় কেবা রয়েছে পড়িয়া।
মরার মতন ঐ পড়ে জাম্বুবান
চাহিতে না পারে, চোখে বিঁধিয়াছে বান।
কহিল অনেক কষ্টে চিনি হনুমানে,
"তুমি বাঁচাইলে আজি বাঁচি হে পরানে।
ডিঙ্গাইয়া হিমালয় যাও বাছাধন,
কৈলাস পর্বত পাবে দেখিতে তখন।
আর এক পর্বত পাবে তার কাছে,
চারিটি ঔষধ বাছা সেইখানে আছে।
বিশল্যকরণী আর মৃতসঞ্জীবনী,
আর যে সন্ধানী আর সুবর্ণকরণী।
এ চারি ঔষধ নিয়া আইস ত্বরায়,
নহিলে আজ তো আর না দেখি উপায়।"
আকাশে ছুটিল হনু, ঝড় যেন বয়,
চোখের পলকে পার হল হিমালয়।
তখন দেখিল হনু, ঔষধ সকল,
কৈলাসের কাছে ঐ করে ঝলমল।
পরে যে কোথায় তারা লুকাইল হায়,
কাছে গিয়া হনু আর খুঁজিয়া না পায়।
হনুমান বলে, "আমি তায় নাহি ভুলি—
পর্বত মাথায় করে লয়ে যাব তুলি।"
এতেক বলিয়া রোষে বীর হনুমান,
পর্বত ধরিয়া দিল কষে এক টান।
চড়্‌চড়্ করি তায় এল তাহা উঠি,
মাথায় লইয়া তবে যায় হনু ছুটি।
লঙ্কায় সে ফিরে যেই এল তাহা নিয়া,
ঔষধের গন্ধে সবে উঠিল বাঁচিয়া।
আনন্দে বানর গায় নেচে আর হেসে,
পর্বত লইয়া হনু রাখে তার দেশে।
সেদিন সন্ধ্যায় মিলে বানরসকলে
লঙ্কায় আগুন লয়ে যায় দলে-দলে!
হনু বাকি রেখেছিল যাহা পোড়াইতে,
সকল করিল ছাই দেখিতে-দেখিতে।
ভয়েতে রাক্ষসগুলি হইল পাগল,
কপাল চাপড়ি তারা চেঁচায় কেবল।
আগুন জ্বলিছে হেথা লঙ্কার ভিতর,

হোথায় চলেছে যুদ্ধ বড় ভয়ংকর।
রাক্ষস না জানি সাজি আসিয়াছে কত,
ক্ষেপিয়া ধাইছে তারা পর্বতের মতো।
বজ্রের সমান পড়ে বানরের চড়,
তাহাতে রাক্ষস মরে করি ধড়্‌ফড়্‌।
কুম্ভ নামে এক বেটা যুদ্ধ করে ভারি,
দ্বিবিদ, অঙ্গদ গেল তার কাছে হারি।
এমন সময় সেথা সুগ্রীব আসিয়া,
কুম্ভের ধনুকখানি লইল কাড়িয়া।
দুজনে তখন খুব হল হুড়াহুড়ি,
সুগ্রীব ফেলিল তারে সাগরেতে ছুঁড়ি
ভিজিয়া-তিতিয়া বেটা উঠে তারপর,
সুগ্রীবের বুকে কিল দিল ভয়ংকর।
তখন সুগ্রীব তারে দিল এক কিল,
গুঁড়া হল কুম্ভ তায় হয়ে তিল-তিল।
রাগেতে কুম্ভের ভাই নিকুম্ভ তখন,
পরিঘ লইয়া ধায় অসুর যেমন।
ঠেকিয়া হনুর বুকে সে পরিঘ তার,
বালির হাঁড়ির মতো হয় চুরমার।
রোষেতে নিকুম্ভ তায় ধরি হনুমানে,
টানিয়া চলিল তারে লয়ে লঙ্কাপানে।
হনু তারে এক কিল মারিল যখন,
কুঁজো হয়ে গেল বেটা 'হ'-এর মতন।
তারপর হনু তার বুকে হাঁটু দিয়া,
মহারোষে মাথা তার ছিঁড়িল টানিয়া।
পরে যে আইল, তার মকরাক্ষ নাম,
হাসিতে-হাসিতে তারে মারিলেন রাম।
আবার সে ইন্দ্রজিত এল তারপরে,
লুকায়ে মারিল বাণ সবার উপরে।
রোষে রাম কন, "আজ মারিব ইহারে,
দেখিব কোথায় গিয়া বাঁচিতে সে পারে।"
তাহা শুনি ইন্দ্রজিত সেথা হতে গিয়া,
মায়ার পুতুল এক এল রথে নিয়া।
সীতা নয়, কিন্তু তাহা ঠিক তাঁরই মতো
"হা রাম!" "হা রাম।" বলি কাঁদিল সে কত
চুলে ধরে ইন্দ্রজিত নিয়ে এল তারে,

তলোয়ার দিয়া তারে চায় কাটিবারে।
রুষিয়া কহিল হনু, "শোন্ দুষ্ট চোর,
মায়েরে কাটিলে আজ রক্ষা নাহি তোর।"
সে কথায় ইন্দ্রজিত নাহি দেয় কান,
কাটিয়া মায়ার সীতা করে দুই খান।
তখন কাঁদিল সবে হায়-হায় করি,
"সীতা, সীতা!" বলে রাম দেন গড়াগড়ি।
বুঝায়ে তখন তাঁরে কহে বিভীষণ,
"সীতারে কেটেছে, তাহা হয় কি কখন?
ফাঁকি দিয়া দুষ্ট বেটা ভুলায়ে তোমারে,
নিকুম্ভিলা নামে যজ্ঞ গেল করিবারে।
সে যজ্ঞ হইলে শেষ হারাবে সবায়,
নহিলে মরিবে নিজে, ভুল নাহি তায়।
ত্বরায় ধনুক লয়ে চলহ লক্ষ্মণ,
এ যজ্ঞ হইতে শেষ না দিব কখন।"
তখনি লক্ষ্মণে সাথে লয়ে বিভীষণ,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ যায় করিতে বারণ।
খেঁকায়ে রাক্ষস এল তাদের দেখিয়া,
শব্দ শুনি ইন্দ্রজিত আসিল ছুটিয়া।
লাগিল বিষম যুদ্ধ তখন সেথায়,
যজ্ঞ শেষ করা আর না হইল তায়।
লক্ষ্মণ হনুর পিঠে, ইন্দ্রজিত রথে,
দুইজনে কত যুদ্ধ হয় কত মতে।
মারিল সারথি ঘোড়া রাক্ষস বেটার,
হাতের ধনুক তার কাটিল দুবার।
নূতন সারথি আনে রথ সাজাইয়া,
বিভীষণ ঘোড়া তার পিষে গদা দিয়া।
রোষে নিল ইন্দ্রজিত শকতি তখন,
কাটিয়া দিলেন তাহা অমনি লক্ষ্মণ।
ইন্দ্র অস্ত্র মারিলেন ধনুকে জুড়িয়া,
অসুর কাটেন ইন্দ্র যেই অস্ত্র দিয়া।
তাহা দেখি রাক্ষসের উড়িল পরাণ,
সেই অস্ত্রে মাথা তার হল দুইখান।
নাচিল বানর তায় 'জয়-জয়' বলে,
দুন্দুভি বাজাল সুখে দেবতা সকলে।
হেথায় সবারে ডাকি কহিছে রাবণ,

"রামেরে মারহ ঘিরি আছ যত জন।
যদি সে না মরে তবু, কাবু হবে তায়,
তখন তাহারে আমি মারিব ত্বরায়।"
বিকট রাক্ষস যত এ কথা শুনিয়া,
রামেরে মারিতে গেল খাঁড়া ঢাল নিয়া।
বিষম রোষেতে তারা গিয়া সেইখানে,
চেঁচায়ে মরিল সবে শ্রীরামের বাণে।

আর বীর নাই রাবণের দেশে,
সকলে গিয়াছি মরে,
নিজেই তখন চলিল রাবণ
সাজিয়া বাগের ভরে।
যতেক রাক্ষস আছিল বাঁচিয়া
সবারে লইল সাথে,
দাঁত কড়্মড়ি চলিল সকলে
হাতিয়ার লয়ে হাতে।
কৃষি শেল শূল ছুঁড়িল তাহারা
চেঁচায়ে খিঁচায়ে মুখ,
আছাড়ি তাদের মারিল বানর,
পাথরে পিষিল বুক।
ধনুক ধরিয়া ধাইল রাবণ
রাগেতে আগুন হয়ে,
সাঁই-সাঁই বাণ বিষম ছুঁড়িল,
বানর ভাগিল ভয়ে।
বাণেতে তখন কাটেন লক্ষ্মণ
ধনুক সারথি তার,
ঠেঙায়ে ভাঙিল ভাই বিভীষণ
ঘোড়া চারিটার ঘাড়।
রোষেতে রাবণ মারিল তাহারে
শকতি ছুঁড়িয়া ভারী,
পথের মাঝেতে দিলেন লক্ষ্মণ
কাটি তাহা তাড়াতাড়ি।
ত্বরায় রাবণ আরেক শকতি
লইল তুলিয়া তবে,
ঝলমল করি জ্বলে আলো তায়
দেখিয়া কাঁপিল সবে।

মরে বুঝি হায় যায় বিভীষণ!
কে বাঁচাবে তার প্রাণ?
এই ভাবি মনে রাবণে লক্ষ্মণ
মারেন কতই বাণ।
রথের উপরে বসিয়া রাবণ
কাঁপে রাগে থরথর্,
জ্বলে কুড়ি চোখ বিশ পাটি দাঁত
করে তার কড়্মড়্।
ছাড়ি বিভীষণে লক্ষ্মণেরই পানে
শকতি ছুঁড়িয়া মারে,
মহা শব্দে তাহা পড়ি তাঁর বুকে
অজ্ঞান করিল তাঁরে।
'হায়-হায়' বলে বানর সকলে
শকতি খুলিতে ধায়,
বাণেতে বারণ করিল রাবণ—
হায়, কি হবে উপায়!
কেঁদে-কেঁদে রাম তোলেন শকতি
নিজে আসি তারপর
কত বাণ তাঁরে মারিল রাবণ
তাহে নাই কিছু ডর।
রোষে দেহ তাঁর উঠিল কাঁপিয়া
শুকাল চোখের জল,
ধনুকেতে বাণ সূর্যের মতন
করি ওঠে ঝলমল।
আকাশ পাতাল ছাইয়া তখন
ডাকিয়া ছুটিল বাণ,
আধমরা হয়ে অভাগা রাবণ
পলায় লইয়া প্রাণ।
সেথা ছিল বুড়া সুষেণ বানর
কবিরাজ বড় ভারি,
হনুরে পাঠায়ে তখনি ঔষধ
আনায় সে তাড়াতাড়ি।
বাস পেয়ে তার হাসিয়া লক্ষ্মণ
সুখেতে বসেন উঠি
অমনি আবার বিষম রোষেতে
রাবণ আইল ছুটি।

ঝন্-ঝনা-ঝন্, ঘট্-ঘটা-ঘট্
ঘোর যুদ্ধ হয় তায়,
দেবতা অসুর সকলে তখন
ছুটিয়া দেখিতে যায়।
আকাশ হইতে আসিল ইন্দ্রের
ঝক্‌ঝকে রথখানি,
কবচ ধনুক, অস্ত্র কত আব
নাম তার নাহি জানি।
সেই রথে তুলে লইল রামেরে
মাতলি সারথি তার,
কি যুদ্ধ তখন হইল বিষম
কি তাহা কহিব আর!
ঐ দেখ হায় বামেরে রাবণ
অস্থির করিল বাণে,
তখনি আবাব সাজা পেয়ে তার
মরে বুঝি বেটা প্রাণে।
যতেক দেবতা, কহেন সকলে,
"রামের হউক জয়!"
"তা নয়, তা নয়, রাবণের জয়!"
রুষিয়া অসুর কয়!
হেথায় রাবণ হয়েছেন কাবু
শ্রীরামের হাতে পড়ে,
রথের উপরে নারেন বসিতে
ধনুকখানিকে ধরে।
দশা দেখে তার, দয়া করে রাম
দিলেন বেটারে ছাড়ি,
রথ ফিরাইয়া সারথি পলায়
তারে লয়ে তাড়াতাড়ি।
রথের উপরে পড়ে সে তখন
খাবি খেতেছিল খালি,
ঘরে গিয়া বেটা সাহস পাইয়া
সারথিরে পাড়ে গালি।
"ওরে বেটা গরু, কি করিলি তুই
লোকে কি কহিবে মোরে?
রথ লয়ে বেটা এলি যে পলায়ে?
বল তো কি করি তোরে?"

সারথি কহিল, "ভাগি নি তো রাজা
ঘোড়াকে পিলানু জল।
যা কহিবি তুই, সে করিব মুই—
এবে কি করি সে বল্।"
হাসিয়া রাবণ কহিল তখন
সারথিরে দিয়ে বালা,
"রামকে না মারি না ফিরিব ঘরে—
চালা তুই রথ, চালা!"
সেই যে ফিরিয়া আইল রাবণ
আর না ফিরিল ঘরে,
বড় কিন্তু তার কঠিন পরান।
বেটা কি সহজে মরে?
মাথা কাটা গেলে তখনি আবার
আর মাথা হয় তার,
মারিতে তাহারে না পারেন রাম
কাটি মাথা শতবার।
তখন মাতলি কহিল তাঁহারে,
"ব্রহ্মাস্ত্র মারহ ছুঁড়ি,"
অমনি সে বাণ লইয়া শ্রীরাম
ধনুকে দিলেন জুড়ি।
পাহাড় কাঁপিল আকাশ ফাটিল,
সাগর উঠিল তীরে,
রাবণ বেটার বুক ভাঙি বাণ
তখনি আইল ফিরে।
মরিল রাবণ, ঘুচিল আপদ,
ভয় না রহিল আর,
হাসিল গাইল ছিল যত লোক,
সুখ না হইল কার?
লাফায়ে-লাফায়ে নাচিল বানর
তা-ধিন্ তা-ধিন্ করে,
স্বরগের ফুল পড়ে ঝরঝর্
তাদের মাথার পরে।
যতেক রাক্ষস করি হায়-হায়
কাঁদিল সকলে তারা,
কাঁদে রাণীগণ, নিজে বিভীষণ
কাঁদিয়া হইল সারা।

সোনার দোলায় তুলিয়া রাবণে
. শ্মশানে আনিল পরে,
চন্দনের চিতা সাজায়ে তাহারে
পোড়াল যতন করে।

দুঃখিনী সীতার কথা শুন তারপর,
মায়ের চোখেতে জল ঝরে ঝরঝর্
ময়লা কাপড়ে মাতা পড়িয়া ধূলায়,
এমন সময় হনু আইল সেথায়।
হনু বলে, "শুন মাগো, মরিল রাবণ,
মুছ মা চোখের জল, উঠগো এখন।"
সুখেতে সীতার মুখে কথা নাহি সরে,
পাবেন রামের দেখা এতদিন পরে!
হায় রে দুঃখের কথা কহিব কি আর—
সেই রাম না করিল আদর সীতার!
ভ্রূকুটি করিয়া তিনি কহিলেন তাঁরে,
"যেথা ইচ্ছা যাও সীতা, চাহি না তোমারে।
ছিলে তুমি এতদিন রাক্ষসের সনে,
বাস কিনা ভালো আর কহিব কেমনে?"
সীতা বলিলেন, "হায়, একি শুনি আজ?
হায় রে, আমার আর বাঁচিয়া কি কাজ?
আগুন জ্বালিয়া তবে দাও গো লক্ষ্মণ
তাহাতে পুড়িয়া সীতা মরিবে এখন!"
কাঁদিয়া লক্ষ্মণ দেন জ্বালাইয়া চিতা,
অমনি ঝাঁপায়ে তায় পড়িলেন সীতা।
"হায়-হায়" করি সবে কাঁদিল তখন,
আগুন শীতল হল জলের মতন।
না পোড়ে মায়ের চুল, না পোড়ে আঁচল
সূর্যের মতন মাতা হলেন উজ্জ্বল!
যতনে তখন অগ্নি কোলে লয়ে তাঁরে,
উঠিয়া কহেন আসি সভার মাঝারে,
"লহ রাম, লহ এই সীতারে তোমার,
নাই-নাই-নাই দোষ কিছু নাই তাঁর!"
আদরে সীতারে রাম নিলেন এবার,
তখন সুখের সীমা না রহিল আর।
আনন্দ করিল কত সকলে মিলিয়া,

এলেন দেবতাগণ দশরথে নিয়া।
পিতার পায়ের ধূলা লইয়া তখন,
ভুলিলেন সব দুঃখ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তুষ্ট হয়ে দেবগণ শ্রীরামেরে কন,
"কি বর চাহ রে বাছা, লহ এইক্ষণ।"
শ্রীরাম বলেন, "তবে দিন এই বর,
বাঁচিয়া উঠুক যত মরেছে বানর।"
অমনি উঠিল বাঁচি বানর সকল,
প্রভাতে জাগিল যেন বালকের দল!
বালির ভিতর হতে ওঠে লাফ দিয়া,
সাগর হইতে উঠে লাঙুল নাড়িয়া।
শ্রীরাম বলেন, "শুন মিতা বিভীষণ,
দেশে যাই, দেহ ভাই বিদায় এখন।"
সারথি পুষ্পক রথ আনে সাজাইয়া,
হাঁসে লয়ে যায় তাহা আকাশে উড়িয়া।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা উঠিলেন তাতে,
বানর সকলে কয়, "মোরা যাব সাথে।"
রাম কন, "কি আনন্দ! চলহ সকলে!"
অমনি সকলে রথে উঠে দলে-দলে।
সুগ্রীব অঙ্গদ উঠে, আর জাম্ববান,
সকল বানর লয়ে উঠে হনুমান।
যতেক রাক্ষসী উঠে বিভীষণ সনে,
সবারে লইয়া রথ উড়ে সেইক্ষণে!
যখন থামিল রথ কিষ্কিন্ধ্যায় যেয়ে
লাফায়ে উঠিল যত বানরের মেয়ে।
প্রয়াগে আসিল রথ লইয়া সবায়,
সেই মুনি ভরদ্বাজ থাকেন যেথায়।
চৌদ্দটি বছর রাম থাকিবেন বনে
সেই সময়ের শেষ হল সেইক্ষণে।
তখন বলেন রাম হনুরে ডাকিয়া,
"অযোধ্যায় যাও বাছা সংবাদ লইয়া।
গুহ মিতা সনে দেখা হইবেক পথে,
কহিয়ো আমার কথা তারে ভালোমতে।"

আকাশে ছুটিয়া হনু যায় তাড়াতাড়ি,
দেখিতে-দেখিতে গেল গুহকের বাড়ি।

সংবাদ বলিয়া তারে চলিল ত্বরায়,
কাঁদেন রামেরে ভাবি ভরত যেথায়
জোড়হাতে হনুমান তাঁহে গিয়া কয়,
"দেশে আইলেন রাম শুন মহাশয়।
মোরে পাঠালেন নিতে সংবাদ তোমার,
ত্বরায় দেখিবে তাঁরে কাঁদিয়ো না আর।"
আহা কি আনন্দ আজ অযোধ্যা নগরে,
দেশে আসিছেন রাম এতদিন পরে!
"কি আনন্দ! কি আনন্দ!" এই শুধু বলে
রামেরে দেখিতে যায় ছুটিয়া সকলে।
রাণীগণ যান সবে দোলায় চড়িয়া,
বুড়োরা সকলে যায় নড়ি ভর দিয়া।
রামের খড়ম দুটি লইয়া মাথায়,
ভরত সবার আগে চলেন ত্বরায়।
পথপানে চেয়ে যায় সকলে ছুটিয়া,
হোথায় রামের রথ আসিছে উড়িয়া!
চূড়াখানি যেই তার দেখিল কেবল,
"ঐ রাম!" বলি সবে হইল পাগল।
"দেখি-দেখি, সর!" বলে করে ঠেলাঠেলি,
খোঁড়া বেটা আগে যায় সকলেরে ফেলি।
থামিল যখন রথ, নামিলেন রাম,
লুটায়ে ভরত তাঁরে করেন প্রণাম।
খড়ম পরায়ে পায়ে বলেন তখন,
"ফিরায়ে এখন দাদা লহ রাজ্যধন।"

এমনি করিয়া শেষে রাম আইলেন দেশে,
বড়ই হইল সুখ তায়,
তখন মিলিয়া সবে "রাম জয়-জয়" রবে
রাজা করে তাঁরে অযোধ্যায়।
পুরোনো নাপিত যারা ক্ষুরে শান দিয়া তারা
সাজিয়া আইল তাড়াতাড়ি,
রামের যতেক জট চেঁছে দিল চট্‌পট্‌
যতনে কামায়ে দিল দাড়ি।
সোনার সভায় তবে রামেরে বসায়ে সবে
মুকুট মাথায় দিল তাঁর,
ভাই শত্রুঘ্ন আসি ধরিলেন হাসি-হাসি
সাদা ছাতা অতি চমৎকার।
দাঁড়াইয়া দুই ধারে চামর ঢুলায় তাঁরে
সুখেতে সুগ্রীব বিভীষণ,
স্ববগ হইতে আনি মুকুতার মালাখানি
পরাইয়া দিলেন পবন।
মিলিয়া দেবতাগণ, ভুলায়ে সবার মন,
কিবা গান গাইল তখন!
"রাম জয়! রাম জয়!" নাচিয়া সকলে কয়
রাজা পেয়ে মনের মতন।

কবিতা ও গান

খুকুমণি

এই যে আমাল থোনাল বাবা, থ্যাকলা দিল গলে,
লাঙ্গা তুলি থিল হাতে, খেলতে গেল পলে।
নিদে হাতে তিপ পলেথি, কলে আঙ্গুল দিয়ে,
থোত্ত কাকাল দোয়াত থেকে কালি তলে নিয়ে।
দেক আমাল কেমন কাপল মা দিয়েছে ভাই,
ধূলোল উপল বথব নাকো, নোংলা হবে তাই।
দিদি দিল লাল ফিতা বেঁধে আমাল তুলে,
বাবা খেল এত্ত তুমু কোলেল উপল তুলে।
তাই ত আমাল তুল এথেথে তোখেল উপল তলে,
দাদা বলবে নোংলা মেয়ে নেবে না আল কোলে।
থবি আমি কলতে পালি, তোমলা দেখ বথে,
এক্ষুণি তুল থিক কলে দি, বুলুথ দিয়ে ঘথে।

রেলগাড়ির গান

ঠনং ঠনং ঠনং বাজে ঘন্টা,
আমবা সবাই রেলেব গাড়ি।
ছুটে আয় ঘবমুখো ভাই, তলপী নিয়ে টিকিট কিনে,
পৌঁছে দেব তাড়াতাড়ি।
মোবা কবব নাকো দেরি,
বব মিনিট দুই চাবি।
শেষে পোঁ পোঁ ভক্ ভক্! ভকত্ ভকত্ ভকত্ ভকত্!
পলক মাঝে মুলুক যাব ছাড়ি।
মোদের কলের ঘোড়া, দেখবে কেমন চলবে ছুটে ঝড়ের মতন,
য়েমনি দেবে নিশানখানি নাড়ি।
সে না খায় ডাল খিচুড়ি ঘোল চিনি দই পোলাও পুবী উদর ভরি,
শুধু জল কয়লা খেয়ে খুশি হয়ে,
দিনে সে দেয় মাসের পথে পাড়ি।
জলদি চলে আয় রে তোরা, নাইরে দেরি,
ঘরমুখো ভাই, কোনখানে তোর বাড়ি।

কম্‌লা নাপিত

ঘোড়া চেপে কম্‌লা নাপিত যাচ্ছে তাড়াতাড়ি,
রাত না হতেই কোনমতে ফিরতে হবে বাড়ি।
বন-জঙ্গল পেরিয়ে যেতেই সন্ধ্যা হল অতীত,
বনের পাশের গাঁয়ে গিয়ে রাত্রে হল অতিথ।
রাত পোহাবার আগে ঘরে না ফিবলেই নয,
যেতেই হবে শেষ বাত্রে, ভাবল কিসের ভয়?
বাঘ একটা এমন সময় ঘোডাব গন্ধ পেযে,
বন থেকে এল চলে আস্তাবলে ধেয়ে।
কম্‌লা নাপিত উঠে তখন লাগাম চাবুক নিযে,
ঘোড়ায চড়্‌বে বলে হাজিব আস্তাবলে গিযে।
বাড়ির লোক বলে, "কমল, রাত্রে কোথা যাবে?
পথে আছে বন-জঙ্গল, বাঘে ধবে খাবে।"
হেসে বললে কম্‌লা নাপিত, "আমি বাঘেব চাঁই,
বাঘেব ঘাডে চড়ি আব সিংহ ধবে খাই।"
চাঁইযের কথা শুনে বাঘ বিপদ গণে মনে,
ভয়ে হয়ে জড়সড় দাঁড়াল এক কোণে।
"আয়, ঘোড়া, আয" বলে কথা কয় মিঠে।
আঁধাব ঘরে দিল হাত বুড়া বাঘেব পিঠে।
থরহরি কাঁপে বাঘ, লাগাম নিল মুখে,
কম্‌লা নাপিত বসল তার পিঠে চেপে সুখে।
বাঘ দেখলে কম্‌লা নাপিত! নযকো বাঘেব চাঁই।
কম্‌লা নাপিত দেখলে বাঘ! ভাবে কোথা যাই।
ধরে একটা আমের ডাল, লাফিয়ে উঠল গাছে,
রেগেমেগে বাঘ তখন গেল বনের মাঝে।
যেতে যেতে বললে বাঘ, "তুই একটা ঠক ত!
আচ্ছা থাক। বাগে পেলেই খাব তোব বক্ত।"

(২)

একদিন কিনা কম্‌লা নাপিত লাঙ্গল নিয়ে কাঁধে
ক্ষেতে গেছ্‌ল চাষ করতে। আব কে লাঙ্গল ফাঁদে!
বাঘ এসে বললে তখন, "তুই না বেটা চাঁই?
কোথা যাবি কম্‌লা নাপিত, তোরে ধরে খাই!"

নাপিত বললে. "ওরে বাঘ! তুই যে ভারি বোকা!
ভরবে না পেট এখন খেলে, দেখছিস্ আমি রোগা।
ধান হলে ভাত খেয়ে হব মোটা তাজা;
তখন বরং আমায় খেয়ে দিস্ রে ব্যাটা সাজা।"
বাঘ ভাবলে ভালই কথা, "ধান হবে কবে?"
"তোমরা এসে লাঙ্গল টান, জলদি হবে তবে।"
বুড়া বাঘ বন থেকে আরেক বাঘ এনে,
চায করে দিল ক্ষেত, লাঙ্গল টেনে টেনে।
তারপরে হল ধান; বাঘেরা সব মিলে
ধানের বোঝা বয়ে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দিলে।
ঘরের দুয়ার বন্ধ করে বললে নাপিত আস্তে,
"ল্যাজে বেঁধে ফুটো দিয়ে, দাও ত বাঘ, কাস্তে।'
বুড়া বাঘ লেজ বাড়িয়ে কাস্তে যেই দিল,
অমনি নাপিত কুচ করে লেজটি কেটে নিল।
বেজায় রেগে বাঘের পাল বলে, "ওরে দুষ্ট!
বাগে পেলেই করব তোরে ভাত খাইয়ে পুষ্ট!"
বনে গেলে বাঘের পাল, নাপিত বলে হেসে—
"আমি হচ্ছি বাঘের চাঁই, নইকো আমি যে সে।"

(৩)

জামালপুরের বাজার থেকে ফিরছে নাপিত একা,
ঘিরল তারে বাঘের পালে। লাগল ভেবা-চাকা!
তালের গাছ ছিল সেথা চন্দনা তীরে,
উঠল নাপিত সেই গাছে, বাঘ বলল, "কি রে,
গাছে উঠেই পার পাবি? একের পিঠে অন্যে
উঠে আজকে ধরব তোরে, এসেছি স-সৈন্যে।"
বাঘের উপর উঠছে বাঘ, বুড়া রইল নীচে,
নাপিত দেখলে এখন আর ভাবা-চিন্তে মিছে।
ক্ষুর দিয়ে তালের কাঁদি কেটে নিয়ে ধীরে
বললে, "আজ বাঘের মরণ ভরা গাঙ্গের তীরে।
ব্রহ্ম তাল, বিষ্ণু তাল, আর তাল হেঁড়ে,
পড় গিয়ে বাঘের ঘাড়ে, নীচে আছে বেঁড়ে।"
লেজকাটা ভাবল মনে আমায় মাল্লে আগে,
অমনি কিনা বুড়ো বাঘ জলদি করে ভাগে।
টপাটপ পড়ল বাঘ, মরল আছাড় খেয়ে,
বেঁড়ে পড়ল হোঁচট খেযে, নাপিত চলল ধেয়ে।

ক্ষুর দিয়ে গলা কেটে, চন্দনার জলে
ফেলে দিল যত বাঘ। জিৎ বুদ্ধির বলে

বেচারা

হতভাগা পাজি বলে কে দিয়েছে কানটি মলে, কে বলেছে মন্দ?
বেচারা গো, গোবেচারা, মুখখানি খাঁচাঘেরা, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ!
ভুলে সব খেলাধূলা একা একা সারাবেলা বসে আছে চুপটি।
সাজা পায় বিনাদোষ? তাই এত ফোঁসফোঁস, কাঁদ-কাঁদ মুখটি?
সাত পাঁচ কি যে ভাবে, অভিমানে ঠোঁট কাঁপে, বুক ফাটে দুঃখে,
দুটি আঁখি ছলছল, ঐ বুঝি ভরা জল ফেটে পড়ে চক্ষে!
কারে দেখে মিছামিছি করেছিলে চেঁচামেচি? কে দিয়েছে শাস্তি?
শাসিয়েছে বুঝি কেউ, "চোপরাও, ঘেউ ঘেউ মৎ কর যাস্তি।"
ও বাড়িতে ছেলেপিলে, সেথা গিয়ে খেলেছিলে কাদা মেখে ঘরদোর?
কবে মেলা হুড়াহুড়ি ভেঙেছিলে ঝুড়ি-ঝুড়ি আসবাব পত্তোর?
করেছ বেড়াল তাড়া, ভয়ে তারা লেজ খাড়া, ছুটেছিল বন-বন?
ফের বুঝি খেলা করে মাস্টারের ঠ্যাঙে জোরে কামড়েছিলে প্রাণপণ?
ছুতো পেলে ছুটে বুঝি নোংরা পায়ে সোজাসুজি উঠবে গিয়ে বিছানায়?
এমনি যারা মিটমিটে দুষ্টু যারা ডানপিটে শাস্তি তাদের মিছে নয়!

শিশুর কথা

শিশুদের কথা শুন শুন পিতা
করহে করুণা মোদের পরে।
মিলিয়া সকলে তব পদতলে,
নমি করজোড়ে ভকতিভরে।
করি এ মিনতি দেহ শুভমতি,
রাখ চিরদিন তোমার ঘরে।
রাখ দীনজনে অভয় চরণে,
হে ভুবন রাজা, মাগি কাতরে।

কবিতা

মাতার মাতা রূপে,
পিতার পিতা রূপে
যতনে পালিছ সবে
তুমিই করুণাময়।
তোমারি স্নেহ জ্যোতি
গগনে ভরে উঠে,
তোমার স্নেহের হাসি
প্রভাত কুসুমে ফুটে,
স্নেহের পরশ তব
বাতাস বহিয়া আনে।
তোমারি স্নেহ গাথা
বিহগ গাহে বনে।
স্নেহের বাহু ডোরে
ঘেরিয়া আছ মোরে,
তুমিই, তুমিই প্রভু,
তুমিই ত প্রেমময়।
আশিস ধারা তব
সতত পড়িছে ঝরি;
মোদের মাথার পরে
সতত পড়িছে বারি:
এ ক্ষুদ্র সন্তান, নাথ,
নির্ভয় আনন্দ প্রাণ,
গাহিছে আজি তাই
তোমার জয়গান।
আমার এ জীবন
সকল দেহ-মন,
তোমারি, তোমারি, প্রভু,
জয় হে তোমার জয়

সুখের চাকুরী

মনিব মিলেছে মোর মনের মতন
বছর তিনেব সে যে রমণী রতন।
ননীর শরীরে তার লাঠিমের লীলা;
বদনে চাঁদের আলো, কণ্ঠে কোকিলা।
সে যে হাসে খল-খল,
সে যে নাচে থৈ-থৈ,
তার চোখে ছোটে বিজলী,
তার মুখে ফোটে খই।
জবর জুটিল সে যে, নোকরী নূতন,
বেতনের নাহি নাম, না মিলে ভোজন।
উপরী আছে চুমু, চলে শুধু তায়,
কৃপণার ধন তাও, না হয় আদায়।
সে যে দাড়ি দেখে চটে,
সে যে থাকে চোখ বুজে,
পড়ে শয্যায় লজ্জায়

মুখখানি গুঁজে।
কি করিতে হয় মোর, চাহ সে খবর?
সে বড় মাথার কাজ, ভার গুরুতর।
সুর-অসুরের তাল-বেতালের খেলা
যে খেলেছে, সেই জানে তার ঠেলা।
আমি নাচি ধিন-ধিন, আমি গাই তান ধরে,
সে যে শোনে সুখে বসি মোর শিরোপরে!

শিশুর জাগরণ

আইল নামি বিমল উষা
উঠিল আলো খেলি,
তরুর কোলে পুলকে ফুল
হাসিল আঁখি মেলি।
বহিল ধীরে শীতল বায়,
গাহিল পাখি বনে,
খোকামণি ঘুমায় ঘরে,
ভাবনা নাহি মনে।
জানালা দিয়ে সোনার আলো
চুমিল তারে আসি,
নয়ন মেলি মায়ের পানে
চাহিল খোকা হাসি।

চাঁদের বিপদ

চাঁদটাকে ভাই দেখেছিলুম থালার মত গোল,
এই যে দুদিন আগে;
আজকে যেন আমার চোখে কেমনতর ঠেকে,
নতুনতর লাগে।
খানিকটা তার খসে গেছে, ওরে ও ভাই কেমন করে
নাই কো তা ত জানা।
চাঁদের বুড়ি অসাবধানী ফেলে দিয়ে ভাই, বুঝি
ভেঙ্গেছে তার কানা।
বৃষ্টি পড়ে ধুয়ে গেছে, হতেও পারে তাও,

অনেকখানি সুধা;
চকোর পাখি জব্দ এবার, কেমন করে ভাই,
মিটাবে তার ক্ষুধা?
আয় না রে ভাই, ছুটে যাই, খুঁজি চারিদিকে,
পাতি পাতি করে,
সুধার বাশি কোথায় জড়, চাঁদের কণাটুকু,
কোথায় আছে পড়ে?

প্রার্থনা

বিজন বনে কুসুম কত বিফলে বাস বিলায়ে যায়,
নীরবে আহা ঝরিয়া পড়ে কেহ ত ক্ষতি মানে না তায়।
তবু ত প্রভু তাহারো তরে করুণা ধারা তোমার বয়,
বরষা বারি ধরায় ঝরে, উথলে আলো ভুবনময়।
তোমারি প্রেমে শিশির সুধা ফুলের ক্ষুধা করে গো নাশ,
তোমারি রবি বিকাশে আসি সে চারু হাসি বিমল বাস।
অতুল তব সেই সে দয়া রাখিছে মোরে রজনী দিন,
জয় হে দেব! জীবন মম রহুক তব চরণে লীন।
মায়ের কোলে পালিছ মোরে অমৃতধারে করায়ে স্নান,
বরণ রস লহরী মাঝে পুলকে মম মজায়ে প্রাণ।
ফুটায়ে যদি ফুলের মত তুলিছ এত যতনে নাথ,
ফুলেরি মত চরণতলে রাখিয়ো মোরে দিবস রাত।

বাবার চিঠি

মাগো আমার সুখলতা, টুনি, মণি, খুশি, তাতা,
কাল আমি খেয়েছি শোন, কি ভয়ানক নেমন্তন,

জলে থাকে একটা জন্তু দেখতে সে ভয়ানক কিন্তু!
মাছ নয়, কুমির নয়, করাত আছে ছুতার নয়,
লম্বা লম্বা দড়ি রাখে, লাঠির আগায় চোখ থাকে;
তার যে কতগুলো পা ঢের লোকে তা জানেই না;
দুটো পা যে ছিল তার, বাপরে সে কি বলব আর!
চিমটি কাটত তা দিয়ে যদি ছিঁড়ে নিত নাক অবধি!

তার মাথাটা কচকচিয়ে খেয়েছিলাম মুলো দিয়ে!
আর একটা সে কিসের ছা নাইকো মাথা নাইকো পা!
কিন্তু তার মাকে জানি তার আছে পা দুখানি!
আরেকটা সে কি যে ছিল, খেতে খেতে পালিয়ে গেল!

ময়মনসিংহের চিঠি

সৈত্যাদ্দা, হা হা হা, কথাডা শুইন্যা যা,
কৈলকাত্তা বইস্যা খা দৈ ছানা ঘি পাঁঠা।
ময়মনসিং ঘোড়াড্ডিম! দেখবার নাই কিচ্ছু তাই,
সার্ভেন্ট ইজ্ ইস্টুপিড, রাইন্ধ্যা থোয় যাইচ্ছাতাই!

ঋতু

মোরা কালের সাথে বেড়াই ঘুরে মায়ের শিশুর মত,
মোরা আপন কাজে আপন মনে থাকি সদাই রত।
গগন মাঝে মেঘের কোলে
অচল শিরে নদীর নীরে
বরণ গন্ধ গীত ছন্দ জাগাই অবিরত।

গ্রীষ্ম : মোরা নিদাঘ দিনে,
তার ভীষণ রোষে সাগর শোষে, দহে ধরার অঙ্গ,
তপ্ত পবন বহে সঘন, কাঁপেন বসুন্ধরা
রবির প্রখর করে, হরে জীবন, ঝরে অনল ধারা।

বর্ষা : মোরা শীতল করি পৃথিবীরে, নির্মল বরষা নীরে,
ঘোর গগনতল ছল ছল নীল জলদ ঘন ঘোরে।
নীরদ গুরু গুরু গম্ভীর গরজে, দুরু দুরু হৃদয়ে,
অবিরল বর্ষণ ঝর ঝর প্লাবিত সকল চরাচর।
চমকি চমকি চপলা চলে, চঞ্চল কুটিল বিভঙ্গে;
রাজিত ইন্দ্র-শরাসন সুন্দর জলধর অঙ্গে।

শরৎ : মোরা ধরার দেহে ফুটাই কান্তি মুখে সুখের হাসি,
নিশার গলে তারার মালা, ভালে বিমল শশী
মোহন বেশে, ধরায় আসে গোধূলি রূপসী,
অঞ্চলে শেফালি শোভে শিরে কিরণ রাশি।

হেমন্ত : মোরা শরৎ শেষে মলিন বেশে
যখন যেথায় আসি,
ভাঙি ধরার সুখের খেলা
স্বপন মোহের হাসি;
মলিন রবি, মলিন শশী, ম্লান গগন তলে,
ঢাকি ধরার বদন খানি কুয়াসা অঞ্চলে।

শীত : মোরা থামাই মনের মধুর গীতি হরষ কোলাহল;
তরুলতার নয়ন বাহি ঝরে অশ্রু জল।
মোদের চরণ ভরে তুষার ঝরে, অবশ দিবাকর,
মোদের হাসির সুরে প্রাণ শিহরে কাঁপে চরাচর।

বসন্ত : মোরা মুছাই ধরার নয়ন বারি জাগাই নবীন প্রাণে,
নূতন সুখে নূতন সুরে নূতন ভজন গানে।
সাজায় তাহারে দিই কিশলয় ভারে
মুকুল দোলে ফুলের চারু হারে, কতই যতন করে!
আনন্দ জাগিয়া রহে সুনীল অম্বরে,
সুধা ঝরে চরাচরে প্রেম উথলে অন্তরে।

মধুপুরের চিঠি

রেলের যে সবুজ গাড়ি, তাতে ছিল এক বুড়ি—
জালার মত মোটা আর কয়লার মত কালো,
বসে ছিল সব ঢেকে তাই তার ভিতর থেকে
বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না ভালো।
নেমে এলাম তাড়াতাড়ি, চড়লাম গিয়ে সাদা গাড়ি।
তারপর জানলা দিয়ে বাড়িয়ে দিলাম গলা—
যেই বাড়ির সামনে এলাম, তোমাদের দেখতে পেলাম,
কিন্তু আমি ভুলে গেলাম গুড্ মর্ণিং বলা!

গান

এক দিন জিব বলে "শোন ভাই
পেটটার একটুও কাজ নাই।
খেটে মরি মোরা সবে হায় রে,
ও যে শুধু বসে বসে খায় রে।"
হাত বলে, "হাঁ হাঁ ভাই তাই ত,

পেটটার কোনো কাজ নাই ত,
ওরি জন্য কত কষ্ট সহিয়া
মুখে তুলে ভাত দিই বহিয়া।"
পা বলিছে, "চড়ে মোর ঘাড়ে
ব্যথা করে দিল মোর হাড়ে,
পেট যায় নেমন্তন্নে
আমি হেঁটে মরি তার জন্যে।
আচ্ছা ভাই বল দেখি তোরা,
আমি কি রে হই ওর ঘোড়া?"
শুনে সবাই রেগে বলে ভারি "পেটের সঙ্গে কর সবে আড়ি
সবাই খবরদার ওর সাথে আর কেউ কর নাকো কারবার
গলা গিলবে না, ঠোঁট খুলবে না, দিবে দাঁত কপাটি,
হুড়কা আঁটি খাটাখাটি হাঁটাহাঁটি যাবে মিটি।"
এইভাবে দিন গেল দুই তিন, পেটে নাহি দানাপানি।
সবে বলে, "ভাই, বল নাহি পাই, মোদের কি হল জানি।
ঐ জিব দুষ্ট সব কৈল নষ্ট মন্দ কথা বলে কানে।"
হেন মতে সবে কাঁদে উচ্চ রবে গালি দিয়া রসনারে।
মন্দ কথা ভাই কহিতে না চাই, নাহি চাহি শুনিবারে।

পাখির গান

কত পাখি আছে, তাহা কর মোর কাছে,
আহা, কত মত সাজে তারা ফেরে ধরা মাঝে।
তারা বলে কত বুলি, তারা করে কত খেলা,
দুখ নাহি কারো মনে, কারো কাজে নাহি হেলা।
নাচে খঞ্জন বাটে মাঠে, আর কোকিল গাহে ডালে,
আর কিবা মনে করে কাকা বসে আসি চালে।
মুনিঠাকুরেরি মত বক থাকে ঝিম ধরে,
মাছ এলে মুখ মেলে তারে গেলে কপ করে।
কহে হুতোমেরে প্যাঁচা, 'মুই বলি, শোন চাচা,
এই যে হাঁড়ি মুখে দাড়ি, এর বাহার বড় ভারি!'
শ্যামা, বুলবুল গাহে বনে, মিলি দোয়েলের সনে,
এসে চড়াই ঘরে বড়াই করে শঙ্কা নাহি মনে।
বলে শঙ্খচিল কেন যত ঘটিবাটি পাবে
আর গোদা বেটা কেন খালি ঘাড়ে লাথি খাবে?

কহ সে বা কোন পাখি যার বৌ না কহে কথা?
কিবা নামটি যার চোখে বড্ড হায় ব্যথা?
বটে চালাক বড় শালিক, রাখে দুনিয়ার খবর,
আর ময়না কাকাতুয়া তারা কথায় বড় জবর।
তার গলে দোলে ঝোল্লা, গায়ে কালো আলখাল্লা,
রূপের কিবা হয় জেল্লা, হাই তুল্লে হাড়গিল্লা!
আছে গগনবেড়, গৃধিনী, শাঁচানি, শকুনি,
পায়রা, ঘুঘু, ফিঙ্গা, পানকৌড়ি মাছরাঙ্গা
কাঠঠোক্‌রা, কাঁদাখোঁচা, হরবোলা, হাঁড়িচাচা,
টিয়া, টুনটুনি, টিঠিপাখি—কহ কত আর বাকি!

গ্রীষ্মের গান

বড় গরম! ভারি গরম! ঠাণ্ডা সরবৎ আনো!
হাত পা কেমন করছে ছন্‌ছন্‌! জোরে পাখা টানো!
খালে বিলে নাই রে জল, সব শুকিয়ে গেল!
তাতে মাটি ফাটে কাঠ, গ্রীষ্ম ঐ রে এল!
নৌকা নাহি চলে আর হায় রে টানাটানি।
মাঝি মাল্লা বলে "আল্লা! গাঙ্গে নাইকো পানি।'
বুনো হাঁস বলে, 'মোর মাথা গেল তেতে।
এই বেলা সেই ঠাণ্ডা দেশে পলাই উত্তরেতে।'
মহিষ গরু যত ছিল, গেল রোগা হয়ে—
দেশে নাহি মিলে ঘাস, বাঁচে কিবা খেয়ে।
ঠাণ্ডা মাটি আগুন হল, তেতে গেল হাওয়া।
ঘরে বসে রাখি প্রাণ, রইল পথে যাওয়া।
হাঁ করিয়া থাকে শালিক বসে মনোদুঃখে—
শুকায়েছে গলা তার কথা নাহি মুখে!
গ্রীষ্মে লোকে বলে 'ভাই, কেন তুমি এলে?'
গ্রীষ্ম বলে 'এনু তাই আম খেতে পেলে!
দুটো মাস থাক এই গরমেরে সয়ে—
ফল শস্য পাকে যদি, খাবে খুশি হয়ে।'

যখন বড় হব

আমি তাই ভাবি ব'সে ছেলেবেলা ক'দিন রবে,
শেষে যখন বড় হব তখন কিবা করব সবে।
তখন মোরা সবাই হব অতিশয় সুস্থির,
আর ভারি বিদ্বান্ আর বড় গম্ভীর।
থাকব নাক দিন রাত শুধুই খেলা নিয়ে,
কব কাজের কথা (সবাই) শুনবে মন দিয়ে।
বড় লোক হই যদি কাজ করব ভারি,
না হলেও করব কাজ যতটুকু পারি।
সব কাজ কাজ ভাই ছোট বড় হোক যাই,
ভাল পথে খেটে খাই তাতে লাজ নাই ভাই।
দোকান করিলে দিব জিনিসটি খাঁটি,
হক্ দর ঠিক্ মাপ কাজ পরিপাটি।
ডাক্তার হই যদি কব নাকো ভয়,
মিষ্টি ওষুধ দিব খেতে তেতো ঝাঁঝি নয়।
লিখি যদি বই তার দাম হবে অল্প,
রাঙা ছবি পাতে পাতে আর শুধু গল্প।
মোরা যদি রাঁধি খেয়ে হবে খুশি,
নুন দিব ঠিক ঠিক, ঝাল নাই বেশি।

ব্রহ্মসংগীত

সিন্দুরা। তেওরা

কে ঘুচাবে হায় রে প্রাণের কালিমা রাশি,
কৃপা-বারি করি সিঞ্চন।
যাবে কি দিন এইভাবে, হায় রে,
আর কবে পুরিবে প্রাণের আশা।
লুটায়ে ধরণীতলে, ডাকিলে দয়াল বলে,
তাপিত প্রাণে পায় পাপী মধুর করুণা-বারি;
আর কি আছে হে দীনহীনের সম্বল বিনা
সেই করুণাময়ের করুণা?

বেহাগ মিশ্র। কাওয়ালি

চরণ-তলে পড়ে রহিব! প্রভু হে যে ইচ্ছা তোমার!
মোরা আর কিছু নাহি জানি; প্রভু হে, যে ইচ্ছা তোমার!
বাধা নাহি ছিল কিছু দিতে শুধু দুখ, তবু দয়াময় দিলে কত সুখ,
প্রভু, দীনে নিলে কিনে, কি বলিব আর!
ভকতি করিয়া করি তব গুণগান,
সুখে দুখে দেহ পিতা পদতলে স্থান;
হউক প্রার্থনা এই জীবনের সার।

মুলতান। কাওয়ালি

জয় দীন-দয়াময়, নিখিল-ভুবন-পতি,
প্রেমভরে করি তব নাম।
আজি ভাই ভগিনী মিলি পরাণ ভরিয়া সবে
তব গুণ গাই অবিরাম।
ভকতি করিয়া নাথ পূজি তোমারে,
প্রভু গো তোমারেই চাহে সবার প্রাণ;
হাত জুড়িয়া মোরা বিনয়ে প্রণতি করি, আশিস' আশিস' প্রাণারাম!
হায়, অন্ধ সবে মোরা চক্ষু থাকিতে নাথ, ধূলিতে পড়িয়া অসহায়;
আর কে বা আছে গো হেন, কাছে থাকিয়া সদা
ডাকে, "পাপী, আয় আয় আয়!"
রেখো না রেখো না নাথ ফেলিয়ে আঁধারে, কোথায় এলেম পথ নাহি হেরি;
প্রভু এই জগতে তব থাকি যতদিন মোরা,
তব শান্তিসুধা করি পান;
আর ভুলিয়া অপর সব মনের হরষে যেন
করি সদা তব গুণগান!
শেষে পৃথিবীর যবে ফুরাইয়ে খেলা,
তোমারি আদেশে ত্যজিব এ দেহে;
ডাকিয়া লইও পিতা তোমার সুখের দেশে, চিরশান্তিময় যেই স্থান।

বিভাস। একতালা

বল দেখি ভাই; এমন করে ভুবন কেবা গড়িল রে!
গগন ভরে তারার মাণিক ছড়ায়ে কে রাখিল রে!
উজল উষায় আলোক-খেলা, তাহে মোহন মেঘের মেলা,
নবীন রবি শোভন শশী হেরে নয়ন ভুলিল রে!
শীতের পবন বহে ধীরে, দোলা দিয়া নদী-নীরে,
দুলিয়ে কমল, বকুল ফুলে, সুবাস নিয়ে যায় গো হরে।

সুধায় সুখে শোভায় সুরে কে রাখিল ভুবন পুরে!
এমন দয়াল বল কে ভাই, দেহ জীবন যে দিল রে!
দয়াল আমা দয়া করে, ধরায় জনম দিলেন মোরে,
মায়ের পরাণ দিলেন দয়াল, গলায়ে ভাই আমার তরে।
দয়ার ত নাই তুলনা রে, দয়ালকে ভাই ভুলো না রে,
দয়াল মোদের বাসেন ভালো, দয়াল বল বদন ভরে!

দক্ষিণী সুর। একতালা

বালক। বরষ পরে, পিতার ঘরে, মিলিনু সকলে;
বালিকা। চল সবে ভাই, সবে মিলে গাই, জয় পিতা বলে।
বালক। সুখের দিনে, দেখ গো প্রাণে, কতই বাসনা;
বালিকা। কত সাধ মনে, পিতার চরণে, করিব অর্চনা।
বালক। শিশু যে অতি, অল্পমতি, কি জানি আমরা;
বালিকা। তবু যাহা পারি, প্রাণপণ করি, চল করি ত্বরা।
বালক। দুঃখী লোকে, কব ডেকে, পিতার বারতা;
বালিকা। কব, "আঁখি মেল, দেখ দ্বারে এল জগতের পিতা।"
বালক। ভাই বোনেতে, তাঁর কাজেতে, কত সুখে রব;
বালিকা। কত সুখে রব, কত কিছু পাব, সকলে দেখাব!
বালক। শিশুর কথা, শুনেন পিতা, কি তাঁর করুণা!
বালিকা। মোরা তাঁরে ছেড়ে, পাপ-লোভে পড়ে কোথাও যাব না।
সকলে। শুন গো পিতা, তোমার হেথা, রাখ গো মোদেরে;
কভু তোমা ছেড়ে, নাহি যাব দূরে, সেবিব তোমারে।
না বুঝে কভু, দোষী প্রভু হলে ও চরণে;
ক্ষমো দয়া করে, বুঝায়ো স্নেহভরে, মধুর বচনে।
কি গুণ আছে, তোমার কাছে, পারি যাইবারে;
তুমি দয়া করে, নিলে যাব তরে; প্রণমি তোমারে!

সুর : "সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে"

মিশ্র। কাওয়ালি

জাগো পুরবাসি, ভগবত-প্রেমপিয়াসি!
আজি এ শুভ দিনে কি বা বহিছে করুণা-রস-মধু-ধারা,
শীতল বিমল ভগবত-করুণা-রস-মধু-ধারা!
শূন্য হৃদয় লয়ে নিরাশায় পথ চেয়ে, বরষ কাহার কাটিয়াছে?
এস গো কাঙ্গাল জন, আজি তব নিমন্ত্রণ, জগতের জননীর কাছে।
কার অতি দীন হীন বিরস বদন?
(ও গো) ধূলায় ধূসর মলিন বসন?

কে বা আছ, শুন গো বারতা,
ডেকেছেন তোমারে জগতের মাতা।

অসন্তোষ

(কলিকাতা রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের উপহার বিতরণ উপলক্ষে অভিনীত)

সকলে : শুনিলে অবাক্ হবে, যদি বলি, সে কথা যদি বলি,
মোরা যে থাকি মলিন মুখে খালি,
সে কথা যদি বলি।
আমাদের সুখ যে কেন নাহি মনে;
হাসি যে নাইকো মোদের বদন কোণে,
কেন যে কথায় মোরা সুধাধারা
পারি না দিতে ঢালি।

১ম দল : আমাদের খেলার সময় পড়ায় নাশে হয়,
২য় দল : না দিতেই মিঠাই মুখে, ক্ষুধা চলে যায়,
৩য় দল : আমাদের ঘুম না হতেই কেমন করে
রজনী যায় গো চলি!

সকলে : অবিচার সহি কত বলি তাহা কায়?
দিয়েছে ছোট করে পাঠিয়ে ধরায়!
হায় রে হায়, তাইতে মোদের কেউ মানে না,
চলে যায় অবহেলি!

দেবদূত : কে তোরা কাঁদিস হেথা?
তোদের মনে কিসের ব্যথা?
সকলে : আমাদের—ছোট বলে—সবাই ঠেলে যথাতথা!
আমাদের এমনি কপাল
কত মতে হই গো নাকাল!

২য় দল : ক্ষিধে ফুরায় খাবার আগেই,
৩য় দল : ঘুমাতে আসে সকাল,
প্রথম : যদি যাই খেলতে মোরা,
অমনি উঠে পড়ার কথা!

দেবদূত : তোরা কি চাহিস তবে?
সকলে : মোদের মতেই সকল হবে!
দেবদূত : ভাল মতে মিলে মিশে থাকিস যদি তাহাই হবে।
সকলে : কি মজা হলো মোদের,
নাচে রে মন, ঘোরে মাথা!
প্রথম : ঘুচিল পড়ার জ্বালা, এখন হতে শুধুই খেলা!
তৃতীয় : না ভাই শুধুই ঘুমের পালা!
দ্বিতীয় : তা নয়, আসুক লুচির থালা!
তৃতীয় : তোরা ত কুটিল ভাবি,
বলিস না কেউ ঘুমের কথা।
১ম ও ২য় : চলে যা! কে চায় তোরে?
প্রথম : খেলাই হবে।
দ্বিতীয় : খাবার পবে!
১ম ও ২য় : ছিছি, পেটুক!
দ্বিতীয় : চুপ। বেযাদব, লক্ষ্মীছাড়া!
১ম ও ৩য় : দাঁড়া তবে!
১ম ও ৩য় : হায় বে হায়, বিবাদ কবে সবি যে রে হলো বৃথা।
দেবদূত : কে তোবা কাঁদিস হেথা,
আবার তোদের কিসেব ব্যথা?

১ম ও ৩য় দল : সে কথা যদি বলি, শুনিলে অবাক হবে,
যদি বলি, সে কথা যদি বলি।

দেবদূত : তোমাদের বদনে ছাই, গালে কালি!
এ মধুর মানব জীবন পেয়ে যাবা
দিবারাত অসুখেতে হয় সারা,
তাহাদের পোড়া কপাল,
তাদের জীবন কেঁদেই যাবে চলি।

রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'নদী'
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী-অঙ্কিত চিত্রাবলী

তাই ঝুরুঝুরু ঝিরিঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।

সেথায় বাস করে শিঙ-তোলা
যত বুনো ছাগ দাড়ি-ঝোলা।

শেষে পাহাড় ছাড়িয়া এসে
নদী পড়ে বাহিরের দেশে।
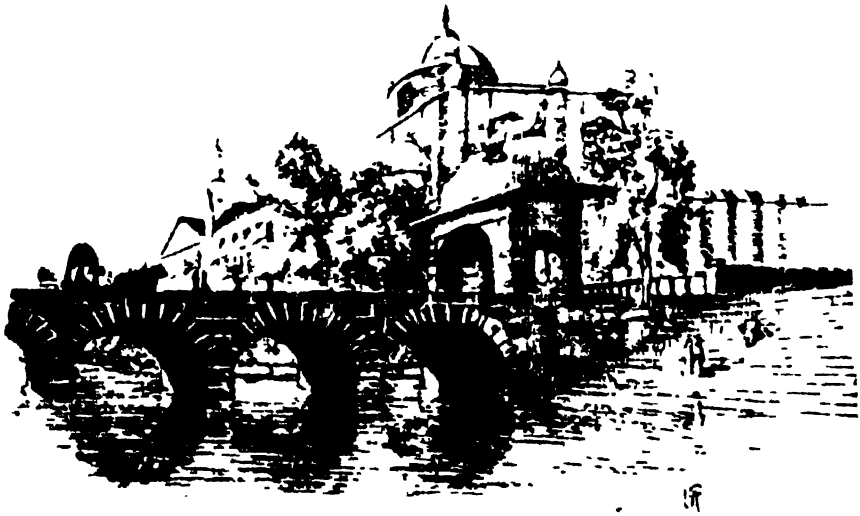
সেথায় নবাবের বড়ো কোঠা,
তারি পাথরের থাম মোটা,
তারি ঘাটের সোপান যত
জলে নামিয়াছে শত শত।

তাহার দুই কূলে উঠে ঘাস,
সেথায় যতেক বকের বাস।

সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি
কত খেয়াতরী দেয় পাড়ি

সেকালের কথা

গ্রন্থকারের নিবেদন

অবসরকালে পড়িয়া বালক-বালিকাগণ শিক্ষা এবং আনন্দ লাভ করিবে, এই আশায় এই পুস্তকখানি লিখিত হইল। বিষয়টি বৈজ্ঞানিক হইলেও, সে হিসাবে তাহার কোনরূপ চর্চার চেষ্টা হয় নাই; বালক-বালিকাদিগকে প্রাচীন কালের কাহিনী শুনাইবার জন্য এই পুস্তক লেখা; বিজ্ঞানের কথা বলা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ছেলেদিগকে যেরূপ করিয়া জানোয়ারের গল্প শুনাইলে তাহারা আমোদ পায়, সেইরূপ সহজ কথায় সরলভাবে এই পুস্তকখানি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং সকল কথাই বিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে মাপিয়া বলা সম্ভব হয় নাই, আর তাহার আবশ্যকও বোধহয় নাই। আশাকরি, এ সম্বন্ধে ত্রুটি অল্পই হইয়াছে, এবং আমার উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলে তাহাও মার্জনা করিবেন।

এই পুস্তকে ১৭ খানি বড়-বড় ছবি আছে। এই সকল ছবি এই পুস্তকের জন্যই বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল; ইহাদের একটিও ইংরাজি পুস্তকের ছবির নকল নহে। পুস্তকের ভাষা ও বিষয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এই ছবিগুলির সম্বন্ধেও আমার তাহাই বক্তব্য। ছবিগুলি আঁকিবার সময় উহাদিগকে যথাসম্ভব নির্দোষ করিতে যতদূর চেষ্টা ছিল, শিশুদিগের হিসাবে সুন্দর করিতে তদপেক্ষা অধিক চেষ্টা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যত ভাল করিয়া আঁকা উচিত ছিল, তাহা পারি নাই। তথাপি আশা করি, এই সকল ছবিতে বৈজ্ঞানিক হিসাবে গুরুতর ত্রুটি লক্ষিত হইবে না; কারণ এই ছবিগুলি দেখিয়া একজন উচ্চপদস্থ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্ণিত জন্তুগুলির ইংরাজি নামই রাখিয়াছি। এই সকল নামকে বাংলায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল কিনা জানি না। আমি ইংরাজি নামগুলির বাংলা অর্থ বলিয়া দিয়াই যথেষ্ট মনে করিয়াছি। ইহাদের যথোচিত বাংলা পরিভাষা রচনা করা, আমার সাধ্যের অতীত। আর তাহা আমাদের প্রয়োজনেরও বহির্ভূত; কারণ, এখানি গল্পের বই—বৈজ্ঞানিক পাঠ্য পুস্তক নহে।

কলিকাতার জাদুঘরের কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে জাদুঘরে রক্ষিত কোন কোন দ্রব্যের ছবি মুদ্রিত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এজন্য, এবং এতদুপলক্ষ্যে আমি তাঁহাদের নিকট যে সরল সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

'সেকালের কথা' প্রথমে 'মুকুল' নামক মাসিক পত্রিকায় বাহির হয়। তাহাকেই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া এই পুস্তক হইয়াছে। মুকুলে যেসকল ছবি বাহির হইয়াছিল, তাহা এ পুস্তকে গ্রহণ করা হয় নাই; ইহার ছবিগুলি সমস্তই নূতন।

ইতি—

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সেকালের কথা

যাহা কেহ দেখে নাই, তাহা কেমন ছিল, তাহা কি বলা যায়?

অনেক সময় যায় বইকি? তোমরা সেই ফকির আর হারানো উটের গল্প শুন নাই? ফকির উটটাকে না দেখিয়াই বলিয়াছিলেন যে, সেটা পলাতক, কানা এবং খোঁড়া; সেটার একটা দাঁত নাই, আর পিঠে চিনি এবং মধুর বোঝা।

স্কুলে বেত খাইলে, বাড়িতে আসিয়া তাহা বলিবার জন্য কেহ ব্যস্ত হয় না। কিন্তু বাড়ির লোকে পিঠে দাগ দেখিয়া অনেক সময়ই তাহা বুঝিয়া ফেলে। অথচ বেত খাইবার সময় সচরাচর বাড়ির লোক স্থলে উপস্থিত থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঘটনার সময় সেখানে না থাকিলেও তাহার কথা জানা একেবারে অসম্ভব নহে, কারণ তাহার চিহ্ন বর্তমান থাকিতে পারে।

পৃথিবীতে এইরূপ অনেক ঘটনার চিহ্ন রহিয়াছে। যে সকল ঘটনা ঘটিতে আমরা কেহ দেখি নাই, কিন্তু তাহার চিহ্ন দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। এই রূপে পৃথিবী এবং জীব জন্তুর প্রাচীনকালের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা জানা গিয়াছে।

আমরা হয়ত মনে করি যে, এই পৃথিবীকে এখন আমরা যেরূপ দেখিতেছি সে চিরকালই এইরূপ ছিল। কিন্তু পৃথিবীতে অতীত কালের যে সকল ঘটনার চিহ্ন রহিয়াছে, তাহার কথা ভাবিয়া দেখিলে আর এ ভ্রম থাকে না। এই মনুষ্য জাতিটারই যে কতরূপ অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

পৃথিবীর স্থানে স্থানে প্রাচীনকালের নানা জাতীয় মনুষ্যের চিহ্ন অদ্যাপি দেখা যায়। সে সকল লোক আর এখন নাই, কিন্তু এই চিহ্নগুলির ভিতরে তাহারা তাহাদের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। পর্বতের গুহায় প্রাচীনকালের মানুষের হাড় আর তাহাদের ব্যবহারের নানারকম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এইসকল জিনিস দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, আজকাল মানুষের অবস্থা যতই ভাল হউক না কেন, অতি প্রাচীনকালে তাহার নিতান্ত হীন অবস্থা ছিল। আমি লেখাপড়া বা টাকাকড়ির কথা বলিতেছি না। যখন মানুষের ঘর-বাড়ি ছিল না, বাসনপত্র প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা ছিল না, পাথরের কুচি, জন্তুর হাড় বা গাছের কাঁটা ভিন্ন অস্ত্র ছিল না, তখন তাহার অবস্থা কিরূপ ছিল একবার ভাবিয়া দেখ।

এই সকল মানুষের বুদ্ধি কতখানি ছিল, তাহাদের মাথার হাড় পরীক্ষা করিয়া এখনকার পণ্ডিতেরা তাহা স্থির করিয়াছেন। সে বুদ্ধি অনেক স্থলে একটা বানরের বুদ্ধির চাইতে বেশি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কয়েক বৎসর পূর্বে খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম যে, কথা কহিতে জানিত না—সে শক্তিটাই তাহার ছিল না—এমন মানুষের হাড়ও নাকি পাওয়া গিয়াছে। বানরেরও ভাষা আছে, এ কথা আজকালকার কোন কোন পণ্ডিত বলেন;এমনকি, তাঁহারা সেই ভাষা শিক্ষার জন্য চেষ্টাও করিতেছেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে, ঐ ভাষাহীন মানুষটার বুদ্ধি বানরের বুদ্ধির চাইতেও কম ছিল।

মানুষ তো সেদিনকার জন্তু। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় মনুষ্য জাতির বয়স অতি সামান্যই বলিতে হইবে। এখন মানুষ মনে করে যে, সে পৃথিবীর রাজা, কিন্তু দুদিন আগে এই

পৃথিবীতে তাহার নামও কেহ জানিত না।

আমাদের এই পৃথিবী যে কতদিনের তাহা কেহ বলিতে পারে না; কিন্তু এ কথা বেশ বুঝা যায় যে, তাহার ঢের বয়স হইয়াছে। ইহার মধ্যে তাহার ভিতরে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

আর্কিঅপ্টেরিক্স্

প্রথমে পৃথিবী আগুনের মত গরম ছিল, পরে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া তাহার বর্তমান অবস্থা পাইয়াছে! এখন যেরূপ জীবজন্তু আর গাছপালা দেখিতেছি, কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বে তাহার কিছুই ছিল না। আবার অতি প্রাচীনকালে পৃথিবী একেবারেই জীবজন্তুর বাসের অনুপযুক্ত ছিল। তারপর সে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়াছে, আর তাহার অবস্থার উপযোগী জীবসকল জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

সকলের আগে কিরূপ জন্তু জন্মাইয়াছিল, তাহা বলা সম্ভব নহে। পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সে সকল জন্তু লোপ পাইয়াছে, আর হয়ত কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই।

জন্তু আবার লোপ পায়?

হ্যাঁ, পায়। বর্তমান সময়ে বলিতে গেলে আমাদের চোখের সামনেই কতকগুলি জন্তু লোপ পাইয়াছে। নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপে 'মোয়া' নামক একপ্রকার অতি বৃহৎ পক্ষী ছিল। প্রাচীন ভ্রমণকারীদের কেহ কেহ এই পক্ষী দেখিয়াছেন, এমন কথাও শুনা যায়। কিন্তু এখন আর সে পাখি নাই। মোয়ার ডিম এবং কঙ্কাল এখনো মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু জীবিত মোয়া আর দেখা যায় না। মাদাগাস্কার দ্বীপে 'ডোডো' নামক আর এক প্রকার পাখি ছিল। এই পাখি পায়রার জাতীয়। সে উড়িতে জানিত না, অথচ খাইতে খুব ভাল ছিল। কোন কোন সাহেব এই পাখি খাইয়া তাহার অতিশয় সুমিষ্ট বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা খাইতে এত ভাল লাগে, তাহাকে যদি এত সহজে শিকার করা যায়, তবে মানুষের মত রাক্ষস তাহাকে দুদিনে খাইয়া শেষ করিবে, তাহা বিচিত্র কি? বৃহৎ 'অক্' নামক আর একটি পাখিও এইরূপে অতি অল্পদিন যাবৎ লোপ পাইয়াছে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূলে এক সময়ে এই পক্ষী লাখে লাখে বাস করিত। ইহারও উড়িবার শক্তি ছিল না, কিন্তু জলে সাঁতরাইবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। স্থলে ইহারা ভালরূপ চলিতে পারিত না। ঐ পথে যাতায়াত করিবার সময় জাহাজের লোকেরা লাঠি দ্বারা এই পক্ষী মারিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইত।

'ম্যামথ্' নামক একপ্রকার লোমওয়ালা হাতি ছিল, তাহাও খুব বেশিদিন হয় নাই লোপ পাইয়াছে। প্রাচীন অসভ্য লোকেদের সময়ে এই জন্তু বর্তমান ছিল। তাহারা ইহার চেহারা আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে।
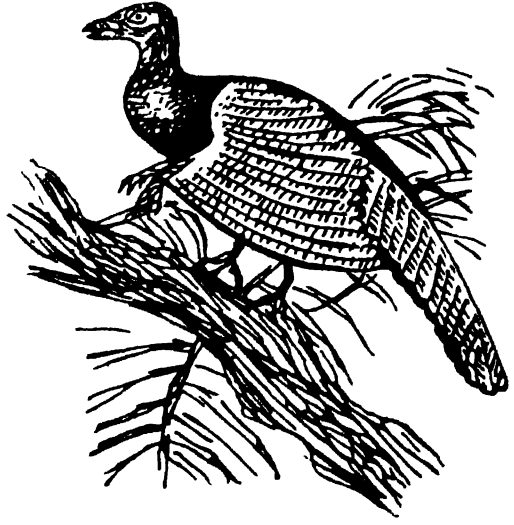
আয়ার্ল্যাণ্ড দেশে 'এলক্' নামক একপ্রকার হরিণের হাড় পাওয়া যায়। এখন সে জন্তু জীবিত নাই। এই জন্তু যখন ছিল, তখন মানুষও নাকি ছিল; আর তাহারা তাহাকে মারিয়া খাইত, এরূপ অনেকের বিশ্বাস। এল্‌কের হাড়ে নাকি অনেক সময় সেই প্রাচীন মনুষ্যের অস্ত্রের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুতরাং জন্তু যে লোপ পায়, এ কথায় সন্দেহের কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপে কত জন্তু যে লোপ পাইয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। অদ্যাপি যাহাদের চিহ্ন রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু সকলেই তো আর চিহ্ন রাখিয়া মরিবার অবসর পায় না। একশতটির মধ্যে একটির এরূপ সৌভাগ্য হয় কি না সন্দেহ। মাংস চামড়া ইত্যাদি কোমল জিনিস তো পচিয়াই যায়। অস্থানে পড়িলে হাড়েরও সেই দশাই হয়। শরীরের মধ্যে কেবল দাঁতগুলিই যা একটু মজবুত; সেগুলি অনেকদিন থাকে। এইজন্য জন্তুর অন্যান্য অংশের চাইতে দাঁতই বেশি পাওয়া যায়। কোন কোন জন্তুর কেবল দাঁতই পাওয়া গিয়াছে, আর কিছু এখনো পাওয়া যায় নাই।

এইরূপ সামান্য চিহ্ন দেখিয়া একটা জন্তুর পরিচয় সংগ্রহ করা কম ক্ষমতার কার্য নহে। যাঁহারা সমস্ত জীবন ধরিয়া খালি জন্তুর শরীর গঠন সম্বন্ধে চর্চা করেন তাহাদেরই ঐরূপ ক্ষমতা জন্মানো সম্ভব হয়। জন্তুর স্বভাবের উপযোগী করিয়া তাহার শরীরের প্রত্যেক অংশ গঠিত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা রীতিমত এ বিষয়ে চর্চা করিয়াছেন, তাঁহারা সামান্য একটি হাড়ের টুকরা মাত্র দেখিয়াই অনেক সময় বলিতে পারেন যে, সেই হাড় কিরূপ জন্তুর এবং সেই জন্তুর স্বভাব কিরূপ ছিল।

এইরূপে সেকালের জন্তুদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়াছে। এই সকল জন্তুর কোন্‌টা ঠিক কতদিন পূর্বে পৃথিবীতে ছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই, তবে মোটামুটি কোন্ জন্তুটা আগেকার, কোন্‌টা পরের, তাহা অনেক সময় সহজেই স্থির হইতে পারে। পৃথিবীর শরীরটা নানারকম মাটি এবং পাথর দিয়া গড়া। মোটামুটি এ কথা বলা যায় যে, নীচের মাটি অথবা পাথর আগেকার, উপরের মাটি অথবা পাথর পরের। যদি এরূপ দেখা যায় যে, কোন একপ্রকারের মৃত্তিকা সর্বদাই অন্য কোনপ্রকারের মৃত্তিকার উপরে থাকে, নীচে কখনো থাকে না, তবে এ কথা মনে করা অসঙ্গত হয় না যে, ঐ নীচেকার মাটি উপরকার মাটির চাইতে পুরাতন। এইরূপ করিয়া নানারকম মাটি এবং পাথরের বয়স স্থির হইয়া থাকে এবং ঐ সকল মাটিতে অথবা পাথরে যে জন্তুর চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহারও ঐরূপ বয়সই সাব্যস্ত হয়।

এইরূপে দেখা যায় যে, শামুক, গুগলি প্রভৃতি জাতীয় জন্তু সকলের আগে জন্মিয়াছিল। মাছ, কুমির ইত্যাদি তাহার পরে। শেষে স্তন্যপায়ী* জন্তু এবং তাহাদের ভিতরে আবার মানুষ সকলের শেষে জন্মিয়াছে।

আমরা একবার চুনার গিয়াছিলাম। সেখানে বেলে পাথরের পাহাড় আছে। সেই পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া আনিয়া লোকে ঘর-বাড়ি তয়ের করে। সে পাথর কি করিয়া কাটে, জান? কাঠ চিরিবার মতন করিয়া করাতের দ্বারা তাহা কাটা যায় না। ইহার উপায় অন্যরূপ।

পুস্তকে যেমনভাবে পাতাগুলি থাকে, সেইসকল পাহাড়ে তেমনি করিয়া পাথরের পাত

* অর্থাৎ যাহারা শিশুকালে মায়ের দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করে। সকল জন্তুর মধ্যে এই শ্রেণীর জন্তুই শ্রেষ্ঠ। মানুষও এই শ্রেণীর জন্তু।

সাজানো থাকে, ঐসকল পাতের মাঝখানে লোহার ছেনি ঢুকাইয়া তাহাতে হাতুড়ির ঘা মারিলে পাথরখানা আপনা হইতেই চিরিয়া দুভাগ হইয়া যায়। এইরূপ করিয়া প্রকাণ্ড পাথর হইতে পাতলা তক্তা বাহির করিতে হয়। তক্তাগুলি অনেক সময় এমনি পরিষ্কার বাহির হয় যে, তাহা দেখিলে বিশ্বাস করিবে না যে ওগুলি এক একখানা করিয়া হাতে প্রস্তুত করা হয় নাই।
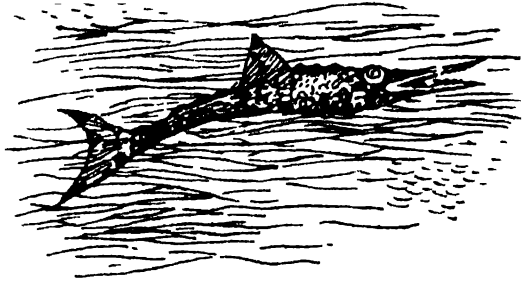
মাছের মতন চেহারাওয়ালা অতি ভয়ঙ্কর সেকালের কুমির। প্রায় ৪০ ফুট লম্বা হইত

আমি অনেকবার দাঁড়াইয়া ঐরূপ পাথর চেরা দেখিয়াছি। আর সেই সময়ে মাঝে মাঝে আর যে একটা ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহা অতি আশ্চর্য। নদীর চড়ায় বালিতে যেমন ঢেউয়ের দাগ থাকে, অনেক সময় ঐসকল পাথরের গায়ে অবিকল সেইরূপ দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তোমার সাধ্য নাই যে উহাকে ঢেউয়ের দাগ ভিন্ন আর কিছু বল। কথাটা যতই আশ্চর্য বোধ হউক না কেন, উহা যে ঢেউয়ের দাগ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। নদীর তলায় নানা রকমের পোকা চলাফেরা করে, নরম মাটিতে তাহার দাগ পড়ে। বেলে পাথরে অনেক সময় সেই দাগগুলি পর্যন্ত অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়। চুনারের পাথরে আমি অনেক খুঁজিয়াও ঐরূপ দাগ দেখিতে পাই নাই বটে, কিন্তু ঐরূপ দাগওয়ালা পাথর অন্য স্থান হইতে কলিকাতার জাদুঘরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। যাহাদের সুবিধা আছে, ইচ্ছা করিলেই গিয়া দেখিয়া আসিতে পার। উড়িষ্যার অন্তর্গত তালচিরের পাহাড়ে এইরূপ পাথর পাওয়া যায়।

বেলে পাথর আর নদীর তলার বালিতে প্রভেদ খালি এই যে, একটা এখনো কোমল রহিয়াছে, আর একটা কোন কারণে জমাট বাঁধিয়া পাথর হইয়া গিয়াছে। জিনিস একই।

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে ঐ বেলে পাথর হয়ত কোন নদী অথবা হ্রদের তলায় ছিল। আজ তাহার কাছে দাঁড়াইয়া যেন সেই লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের পৃথিবীকে হঠাৎ সামনে দেখিতে পাইতেছি। তখনকার পৃথিবী কিরূপ ছিল? তখনো কি আমাদের আজকালকার গাছপালার মতন গাছপালা হইত? মানুষ তখন ছিল কি?

কি আশ্চর্য! দেখ বড়-বড় রাজারা মৃত্যুর পরে তাঁহাদের চিহ্ন রাখিয়া যাইবার জন্য কত ব্যস্ত হন, কিন্তু কালে সেইসকল চিহ্নের কিছুই থাকে না। পাথরের গোরস্থান বল, কীর্তিস্তম্ভ বল, এ সকল আর ক-হাজার বৎসর থাকে? কিন্তু এই যে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার পোকা—মনুষ্য জাতির জন্মের কত যুগ পূর্বে কোন্‌খান দিয়া সে চলাফেরা করিয়াছিল, তাহার পায়ের দাগ আজও পাথরে খোদা রহিয়াছে।

পৃথিবীর পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করিলে আমাদের অহঙ্কার একটু কমে। দুদিন আগে আমরা কোথায় ছিলাম, দুদিন পরে হয়ত বা কোথায় থাকিব! এরপর আবার কোন্‌দিন হয়ত আমাদের চাইতে ঢের বুদ্ধিমান কোন জন্তু পৃথিবীতে আসিবে। তাহারা পাথর খুঁড়িয়া আমাদের হাড় বাহির করিয়া তাহার সম্বন্ধে যাহা বলিবে, তাহা আমাদের পক্ষে সুখ্যাতির

বিষয় না হইতেও পারে! প্রাচীনকালের জন্তুরা যেমন তাহাদের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, সেরূপ সৌভাগ্য আমাদের হইবে কি না, তাহাই বা কে জানে।

যাহা বলিতেছিলাম। চুনারের পাথরে ঢেউয়ের দাগ দেখিয়াছি। অবশ্য, এ কথাটা সহজেই বুঝিতে পারি যে, পাথরের উপরে ঢেউয়ের দাগ পড়া সহজ নহে। সুতরাং ঐ ঢেউয়ের দাগ যখন পড়িয়াছিল, তখন যে ঐ জিনিসটা সাধারণ নদীর তলার মতনই কোমল ছিল, পাথর ছিল না, এ কথা নিশ্চয়। শেষে কোন কারণে ঐ জিনিস জমাট বাঁধিয়া পাথর হইয়াছে।

বালি জমাট বাঁধিয়া বেলে পাথর হয়, কাদা জমাট বাঁধিয়া স্লেট পাথর হয়। অনেক সময় নদী ঝরনা ইত্যাদির জলে এমন সব জিনিস মেশানো থাকে যে, সেই জলে বেশিদিন ভিজিলে গাছপালা পর্যন্ত পাথর হইয়া যায়।

কেন এরূপ হয়, তাহা এখন বলিতে বসি নাই। কিন্তু এরূপ যে হয় তাহা বলার দরকার, কারণ এইরূপ অবস্থায়ই অনেক সময় প্রাচীনকালের জীবজন্তুর হাড় পাওয়া যায়। হাড়ের গঠন অবিকল রহিয়াছে, কিন্তু তাহা হয়ত আর এখন হাড় নাই—পাথর হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ পাথর হইয়া না গেলে, হয়ত সে হাড় এতদিন থাকিত না, আর আমরাও তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিতাম না।

পাথর খুঁড়িতে গিয়া জীবজন্তুর চিহ্ন অনেক সময়ই পাওয়া যায়। আগেকার লোকেরা ঐরূপ চিহ্ন পাইলে তাহাকে খুব একটা তামাশার ভাবে দেখিত বটে, কিন্তু উহা যে বাস্তবিকই একটা জন্তুর চিহ্ন, তাহা তাহারা মনে করিত না। অনেক সময় গোল আলুতে মানুষের মতন নাক মুখ থাকে। কলিকাতার মহামেলায় একটা লাউ দেখিয়াছিলাম, তাহাতেও ঐরূপ নাক মুখ ছিল। এরূপ ঘটনা অবশ্য হঠাৎ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া বাস্তবিকই যে উহা মানুষের নাক মুখ, তাহা নহে। ঐ পাথরগুলি সম্বন্ধেও আগে লোকে ঐরূপ মনে করিত। ইহাদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে অনেক সময় লাগিয়াছে।

এক জিনিসকে সকলে সমানভাবে দেখে না। সাধারণ লোকে যাহা দেখিয়া একটা সাদাসিধা অর্থ করে, আর অনেক সময়ই হয়ত ভুল করে, বিদ্বান লোকেরা ঠিক সেই জিনিস দেখিয়াই তাহা হইতে এক নূতন কথা বাহির করেন। হাতির হাড়কে মানুষের হাড় মনে করিয়া কতবার লোকে ঠকিয়াছে। একটি ভদ্রলোক অনেকদিন কোন পাহাড়ে জায়গায় ছিলেন। সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, সেদেশে নাকি এখনো দানবের হাড় পাওয়া যায়, আর সেই হাড় নাকি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন; উহা যে হাতির হাড়, তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। ফ্রান্স দেশে একবার এইরূপ কতকগুলি হাড় পাওয়া গিয়াছিল। এক ডাক্তার সেই হাড়গুলি কিনিয়া সকলকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, ওগুলি রাজা টিউটোবোকসের হাড়—সে একটা প্রকাণ্ড গোরের ভিতরে তাহা পাইয়াছে। সে আরো বলিল যে, সেই গোরটা ৩০ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট চওড়া ছিল, আর তাহার উপরে লেখা ছিল—

"রাজা টিউটোবোকস"।

এই কথা যে শুনে সেই অবাক হয়। ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুই পর্যন্ত ঐ হাড় দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। রিয়োলাঁ নামক একজন পণ্ডিত ঐ হাড়গুলি দেখিয়া বলিলেন যে, ওগুলো মানুষের হাড় নয়, হাতির হাড়। ইহাতে প্রথমে অনেকেই তাঁহার উপর ভারি বিরক্ত হইল। যাহা হউক, শেষে ইহাই স্থির হইল যে, উহা মানুষের হাড়ও নহে, অথচ ঠিক আজকালকার হাতির হাড়ও নহে। ওগুলি যে একপ্রকার হাতির হাড়, তাহা ঠিক বটে, কিন্তু ওরূপ হাতি এখন আর পৃথিবীতে নাই। ইহার পরে ঐ জন্তুর আরো অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা ইহাকে এখন বেশ ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, আর ইহার নাম দিয়াছেন "ম্যাস্টোডন"। এই জন্তু হাতির চাইতেও বড় ছিল। যে কঙ্কালের কথা বলিলাম তাহা পচিশ ফুট লম্বা, আর দশ ফুট চওড়া।
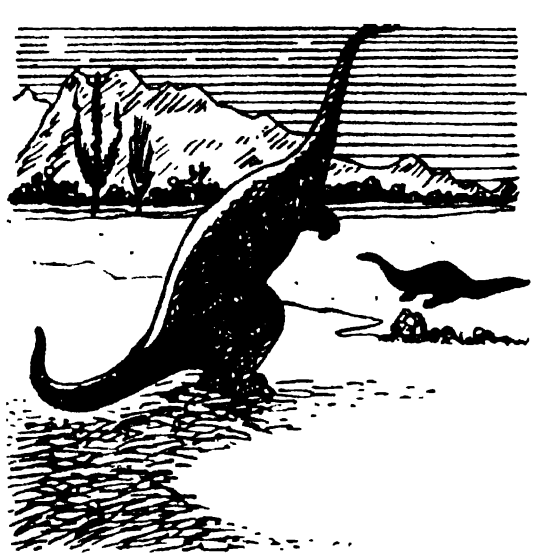
ব্রণ্টোসোরস
১৫৬ ফুট লম্বা নিরামিষভোজী ডাইনোসর। তিমি ভিন্ন এত বড় জন্তু আর পৃথিবীতে নাই

এই ঘটনা হইতেও এ কথা জানিতে পারিতেছি যে, প্রাচীনকালে এমন জন্তু ছিল, যাহা এখন আর নাই। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকালে এমন জন্তুর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিই এখন বাঁচিয়া নাই; সব লোপ পাইয়াছে। এমন সব অদ্ভুত জন্তু এক সময়ে পৃথিবীতে ছিল যে, দিদিমার গল্পের ভিতরেও তেমন আশ্চর্য জন্তুর কথা থাকে না।

পৃথিবীর প্রাচীনকালের ইতিহাস অতি আশ্চর্য। তোমরা গল্প শুনিয়া কত আমোদ পাও, কিন্তু পৃথিবীর কথা শুনিলে হয়ত মনে করিবে যে, গল্পের চাইতে সত্য কথার ভিতরেই বেশি আমোদ।

পৃথিবীর সম্বন্ধে কোন কথা যদি ঠিক করিয়া বলা যায়, তবে তাহা এই যে, এখন যেমন দেখিতেছ, পৃথিবী চিরকাল তেমন ছিল না। কিছুদিন আগে আমরা কেহই এ পৃথিবীতে ছিলাম না; আর একথাও নিশ্চয় যে, আর কিছুদিন পরে আমরা কেহই এ পৃথিবীতে থাকিব না। এই যে কলিকাতা শহর, দুইশত বৎসর আগে এই শহরই কোথায় ছিল! এখন যেখানে সুন্দর সুন্দর বাড়িতে সাহেবেরা বাস করেন, দুইশত বৎসর আগে সেখানে কুমিরেরা রোদ পোহাইত, আর বাঘেরা শিকার খুঁজিয়া বেড়াইত। এমন লোক এখনো বাঁচিয়া আছে, যাহারা ছেলেবেলায় কলিকাতার অনেক স্থানে প্রকাণ্ড বন দেখিয়াছে, সেখানে দিনে দুপুরে ডাকাতি

হইত।

এ সকল তো নিতান্তই আজকালকার কথা, প্রাচীনকালের অবস্থা আর এখনকার অবস্থায় ইহা অপেক্ষা আরো ঢের বেশি তফাত ছিল। বাণীগঞ্জ অঞ্চলে এমন সব চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে যে, তাহাতে বোধ হয় যেন সেসকল স্থান এক সময়ে বরফে ঢাকা ছিল। অধিক কথায় কাজ কি, এই যে হিমালয় পর্বত—যাহার সমান উঁচু পর্বত পৃথিবীতে নাই বলিয়া আমরা এত অহঙ্কার করি—এই হিমালয় এককালে ছিল না। অন্তত তাহা এত বড় ছিল না।

মিগালোসোরস্

মাংসখেকো ডাইনোসর। বাঘের মতন হিংস্র ছিল, হাতির মতন বড় ছিল, ক্যাঙারুর মতন লাফাইতে পারিত, মানুষের মতন দু-পায় ছুটিয়া বেড়াইত।

তোমরা শুনিলে আশ্চর্য হইবে যে, হিমালয়ে এমন সব জন্তুর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে যে তাহারা সমুদ্রে থাকে। যদি এ কথা সত্য হয় যে ওখানে এক সময়ে সমুদ্র ছিল, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, আমাদের ভারতবর্ষের চেহারাটা তখন কিরকম ছিল।

ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে যে সকল পাহাড় আছে তাহার অনেকগুলির অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, এক সময়ে ভারতবর্ষ ঐ সকল পাহাড়ের সমান উঁচু ছিল। ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি নানা কারণে পৃথিবীর উপরটা ক্রমেই ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। এইরূপ কারণে এক সময়ের সেই উঁচু ভারতবর্ষ ক্রমে ক্ষয় হইয়া আজকাল ঐ পাহাড়গুলি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

কেবল ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর সকল স্থানেই এইরূপ। উত্তর মেরুর কাছে প্রাচীনকালের যেসকল চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, এক সময়ে সে স্থানটি আমাদের দেশের মতন গরম ছিল।

যেখানে যাও, সেখানেই এইরূপ দেখিবে। ঠাণ্ডা দেশ হয়ত এককালে গরম ছিল, গরম দেশ এককালে ঠাণ্ডা ছিল। ঐ যে উঁচু পর্বত, সমুদ্রের তলায় তাহার জন্ম হইয়াছিল; আর ঐ যে সমুদ্র দেখিতেছ, এক সময়ে তাহার স্থানে একটা দেশ ছিল।

পৃথিবীর জন্মাবধি এ পর্যন্ত তাহাতে কত পরিবর্তন যে হইয়াছে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। পাথর পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা ইহার কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও অতি সামান্যই বলিতে হইবে; কারণ, পাথরে আর কত বিষয়ের চিহ্ন থাকা সম্ভব হয়? তথাপি এই সামান্য যেটুকু জানা গিয়াছে তাহাও কম আশ্চর্যের বিষয় নহে।

আজকাল মানুষেরা পৃথিবীতে খুব প্রভুত্ব করিতেছে, কিন্তু দু-তিন লক্ষ বৎসর আগে হয়ত মানুষ বলিয়া একটা জানোয়ারই পৃথিবীতে ছিল না। তখন হাতিদের রাজত্ব ছিল। উত্তর সাইবেরিয়ার এক এক স্থানে এত হাতির হাড় পাওয়া যায় যে, আজও তাহা দ্বারা

প্রকাণ্ড কারবার চলিতেছে। ইহা অপেক্ষা প্রাচীনকালের পাথরে হাতির চিহ্নও পাওয়া যায় না। তখনকার বড়লোক ছিলেন কুমির আর গোসাপ মহাশয়েরা। সে কি যেমন-তেমন কুমির আর গোসাপ? আজকালকার কুমিরেরা তো তাহাদের সামনে টিকটিকি! তাহাদের মাঝারিগুলি চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট লম্বা হইত, বড়-বড় গুলি একশ দেড়শ ফুটের কম হইত না। তাহাদের এক একটা আবার পিছনের পায় ভর দিয়া উঠিয়া চলিতে পারিত। বাস্তবিক, জন্তু হইতে হইলে ঐরকমই হওয়া ভাল! আমরা কি জন্তু? আমরা তো পিঁপড়ে!
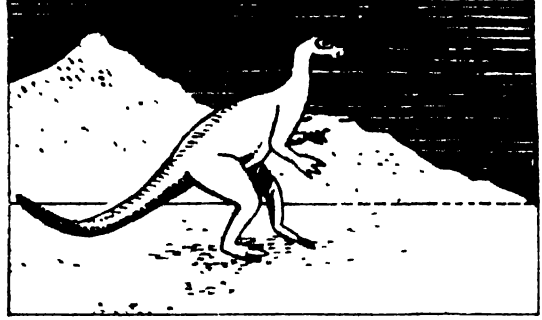
ইগুয়ানোডন্
ত্রিশ ফুট লম্বা নিরামিষভোজী ডাইনোসর

যাহা হউক, আরো কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বে কুমিরও পৃথিবীতে ছিল না। তখন ছিল খালি মাছ, শামুক আর কাঁকড়া জাতীয় জন্তু। তাহারও পূর্বে হয়ত খালি গাছপালাই ছিল।

তাহার পূর্বে?

তাহার পূর্বে পৃথিবীতে জীবজন্তু বা গাছপালা কিছুই ছিল না। পৃথিবী এত গরম ছিল যে, তখন তাহাতে জীবজন্তু থাকা সম্ভবই হইত না। আকাশ ধোঁয়ায় আর মেঘে অন্ধকার ছিল, সূর্যের আলো তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পাইত না। পৃথিবীর উপরিভাগ তপ্ত কড়াব মতন গরম ছিল। তাহাতে বৃষ্টি পড়িয়া আবার তখনই উড়িয়া যাইত। ভূমিকম্প ক্রমাগতই হইত। সেই ভূমিকম্পের বেগে মাটি ফাটিয়া পৃথিবীর ভিতরকার গলিত জিনিস বাহির হইত। পণ্ডিতেরা বলেন যে, আজও পৃথিবীর ভিতরটা এত গরম রহিয়াছে যে, তাহাতে সকল জিনিসই গলিয়া যায়। মাঝে মাঝে আগ্নেয় পর্বতের ভিতর দিয়া ঐ গলানো জিনিস বাহির হয়।

তাহারও পূর্বে পৃথিবী ধোঁয়ার মতন ছিল। তখন সে ঐ সূর্যের ন্যায় জ্বলিত।

বাস্তবিক, সূর্যেরও কালে পৃথিবীর দশা হইবে। সূর্যটা কিনা খুব প্রকাণ্ড, তাই তাহার ঠাণ্ডা হইতে ঢের সময় চাই। এক চাম্‌চে গরম দুধ শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইয়া যায়; কিন্তু এক কড়া দুধ হইলে তাহা অনেকক্ষণ গরম থাকে। এইজন্য পৃথিবী শীঘ্র-শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, আর সূর্য এখনো ঠাণ্ডা হইতে পারিতেছে না। চন্দ্র আরো ছোট, তাই সে ইহারই মধ্যে একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

সূর্যের প্রায় সমস্তটাই হয়ত এখনো ধোঁয়ার মতন আছে। পৃথিবীর বাহিরের খানিকটা (অনেকে বলেন, প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল) জমাট বাঁধিয়া একটা খোলার মতন হইয়াছে। ভিতরের অবস্থা কিরূপ, তাহা এখনো সম্পূর্ণরূপে স্থির হয় নাই। পূর্বে অনেকে বলিতেন যে, নারিকেলের যেমন ভিতরে জল, বাহিরে মালা, পৃথিবীরও তেমনি ভিতরে তরল পদার্থ, বাহিরে কঠিন আবরণ। কিন্তু আজকালকার বড় বড় পণ্ডিতদিগের এই মত যে, পৃথিবীর

ভিতরে অতিরিক্ত পরিমাণে তরল পদার্থ থাকা খুব সম্ভব নহে। তবে, সে স্থানটা যে অতিশয় গরম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চন্দ্রের আগাগোড়াই জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক এ সকল কথায় আমাদের এখন প্রয়োজন নাই। আমরা পৃথিবীর ছেলেবেলার খবর লইতে চলিয়াছিলাম, তাহা কতক পাইয়াছি। এখন খালি একটা কথা বলিলেই উপস্থিত কাজটা শেষ হয়। পৃথিবীতে যতরকমের পাথর আছে তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। পৃথিবীর ভিতরকার গলিত জিনিস বাহিরে আসিয়া কতকগুলি পাথর হইয়াছে। আর পৃথিবীর উপরকার জিনিস ভাঙিয়া চুরিয়া বা অন্য কোন কারণে বদলাইয়া গিয়া আর কতকগুলি পাথর হইয়াছে। বেলে পাথর, স্লেট পাথর, খড়ি, কয়লা ইত্যাদি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পাথরের দৃষ্টান্ত। জীবজন্তু বা গাছপালার চিহ্ন যাহা পাওয়া যায়, তাহা এই সকল পাথরেই পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে আগে জন্তু হইয়াছিল, কি গাছপালা হইয়াছিল, এ কথার উত্তর দেওয়া একটু কঠিন; তবে গাছপালা আগে হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। গাছেরা মাটির রস টানিয়া লইয়াই বাঁচিতে পারে, কিন্তু জন্তুদের পক্ষে খালি মাটির রস চুষিয়া বাঁচিয়া থাকা কঠিন।

গাছই বল, আর জন্তুই বল, পৃথিবীর সেই প্রথম অবস্থায় ইহাদের কাহারই খুব বেশি উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। গাছের মধ্যে নানা রকমের শেওলা আর জন্তুর মধ্যে নানা রকমের পোকা, ইহারাই পৃথিবীর প্রথম জীব। গুগলি আর চিংড়ি মাছের জাতীয় জন্তুও প্রায় এই সময়েই দেখা দেয়। তখনকার এক একটা শামুক প্রায় এক একটা গাড়ির চাকার মতন বড় হইত। চিংড়িগুলিও নিতান্ত কম ছিল না। তাহার দু একটা কোন পুকুরে আছে জানিতে পারিলে, সে পুকুরে নামিয়া কাহারো স্নান করিতে ভরসা হইত কি না সন্দেহ। আধ হাত লম্বা চিংড়িটা জীবিত থাকিলে তাহার কাছে যাইতে ভয় হয়। সুতরাং সেকালের ছয় ফুট লম্বা চিংড়িগুলি যে এক একটা ভয়ংকর জানোয়ার ছিল ইহাতে আর সন্দেহ কি? ইহাদের বিদ্যাসাধ্যিও কম ছিল না। কেহ চিত হইয়া সাঁতরাইত, কেহ কেন্নোর মতন তাল পাকাইয়া থাকিতে পারিত, কেহ আবার পিছনভাগে হটিয়া গিয়া মাটির ভিতরে ঢুকিতে পারিত।

এ সকল চিংড়ি মাছ যে ঠিক আজকালকার চিংড়ি মাছের মতন ছিল না, তাহা ছবি দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে। সকলগুলি আবার এই ছবির মতনও ছিল না। আবার, কোন-কোন বিষয়ে আজকালকার বিচ্ছুগুলির সঙ্গে ইহাদের খুব সাদৃশ্য দেখা যায়।

চিংড়ির পরে পৃথিবীতে মাছের জন্ম হইয়াছিল। এই সকল মাছের চেহারা কিরূপ ছিল, তাহার নমুনা দেওয়া গেল। এক একটা দেখিতে কি অদ্ভুত ছিল দেখ, ডানাদুখানি যেন কাঁকড়ার দাড়া! শরীরটা একটা শক্ত খোলায় ঢাকা। কেবল লেজটিতে মাত্র যা একটু মাছের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময়ে পৃথিবী অবশ্য এখনকার চাইতে বেশি গরম ছিল। পৃথিবীর জলের ভাগের বেশিটা হয়ত মেঘের আকারেই ছিল। সুতরাং আকাশ প্রায়ই মেঘলা থাকিত, সেই মেঘের ভিতরে সূর্যের আলো সহজে প্রবেশ করিতে পাইত না। আজকাল যেমন পৃথিবীর মাঝখানটা খুবই গরম, আর উত্তর দক্ষিণ খুবই ঠাণ্ডা সেকালে তেমন ছিল না বলিয়াই বোধহয়। তখন আগাগোড়াই প্রায় এক ভাবের গরম ছিল। বড় বড় সমুদ্র ছিল, কিন্তু তাহা বেশি গভীর ছিল

না। ডাঙা নিচু ছিল, মাটি স্যাঁৎসেঁতে ছিল।

স্যাঁৎসেঁতে গরম মাটি পাইয়া গাছপালা খুবই বাড়িয়াছিল। তখনকার বনগুলির মতন গভীর বন হয়ত আজকাল দেখা যায় না। তখনকার গাছপালা দেখিতে বেশ সুন্দরই ছিল, আর খুব বড়ও হইত। যে সকল গাছের ছবি দেখিতেছ, তাহাদের এক একটা ত্রিশ চল্লিশ ফুট হইতে প্রায় একশত ফুট উঁচু হইত। কিন্তু আমাদের
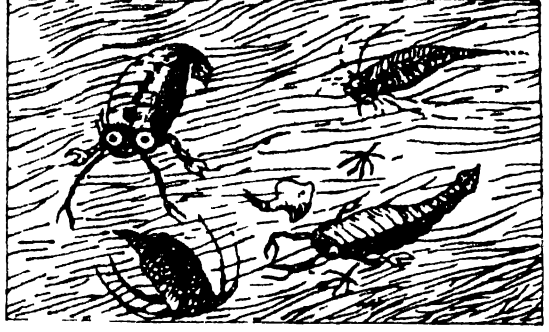
সেকালের চিংড়ি
ইহাদের এক একটা ছয় ফুট লম্বা হইত

আজকালকার তুলনায় এ সকল গাছ অতি নিম্নশ্রেণীর ছিল। ইহাদের না হইত ফুল, না হইত আমাদের আম কাঁঠালের ন্যায় মিষ্ট মিষ্ট ফল। দেখিতে বড় ছিল, কিন্তু ভিতরে সার, অর্থাৎ যাহাকে কাঠ বলে তাহা ছিল না।

বাস্তবিক এ সকল বন নিতান্তই অদ্ভুত ছিল। ফুল নাই, ফল নাই, পাখির গান নাই। গাছগুলি খালি ছাল আর ছোবড়া, তাহাতে চড়িয়া যে একটু আমোদ করিবে তাহারও জো নাই। পোকা ফড়িঙের অভাব ছিল না। এই সকল বনের ভিতরে একটা ফড়িং পাওয়া গিয়াছে, তাহার ডানা মেলিলে চৌদ্দ ইঞ্চি চওড়া হয়।

আমি বলিতেছিলাম 'এই সকল বনের ভিতরে একরকম ফড়িং পাওয়া গিয়াছে।' তবে কি সে সব বন আজও আছে নাকি?

হাঁ আছে বইকি! কিন্তু তাহা মাটির নীচে। সে সকল গাছকে আর এখন গাছ বলিয়া চিনিতেই পারিবে না— তাহারা কয়লা হইয়া গিয়াছে।

যে পাথুরে কয়লা রাণীগঞ্জ, বরাকর, গিরিডি ইত্যাদি অঞ্চল হইতে মাটি খুঁড়িয়া তুলিতে হয়, যাহাতে রান্না হয়, রেল চলে, গ্যাস তৈয়ের করে—তাহা যে আবার এককালে প্রকাণ্ড বন ছিল, এ কথা কি সহজে বিশ্বাস হয়? কিন্তু একটিবার স্বচক্ষে দেখিলে আর বিশ্বাস না করিবার জো থাকে না। গাছের ডাল, গাছের পাতা, গাছের গুঁড়ি, গাছের শিকড়— সমস্তই সেখানে দেখিতে পাইবে। কোন কোন খনিতে ডালপালা শিকড় সুদ্ধ আস্ত গাছ পর্যন্ত পাওয়া যায়। গাছ আর এখন গাছ নাই - সে কয়লা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহার গঠন অবিকল রহিয়াছে।

এরূপ মনে করিও না যে, একটা কয়লার খনিতে ঢুকিলেই সেকালের গাছপালাগুলিকে তোমার চোখের সামনে খাড়া দেখিতে পাইবে। আমাদের চোখের সামনে অনেক জিনিসই থাকে, কিন্তু দেখিতে না জানিলে আমরা তাহার কটিকে দেখিতে পাই? আমি যখন কয়লার খনি দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন খনির একটি বাবু অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সব দেখাইতেছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কয়লা খুঁড়িবার সময় তাঁহাদের লোকেরা কোন গাছপালার চিহ্ন পায় কি না? এই কথার উত্তরে বাবুটি বলিলেন যে, ওরূপ কোন চিহ্ন

সেকালের মাছ

পাওয়া যায় নাই। অথচ ঐ সকল খনি হইতে ঐরূপ অনেক গাছের চিহ্ন আনিয়া এখানকার জাদুঘরে রাখা হইয়াছে। দুই-তিন শত হাত মাটির নীচে অন্ধকারের ভিতরে মুটেরা কয়লা খোঁড়ে। দিনমানের মধ্যে যত কয়লা তুলিতে পারিবে ততই তাহারা বেশি পয়সা পাইবে, এই কথাই তখন তাহারা ভাবে। সেই কয়লার ভিতরে আবার কোন গাছপালার চিহ্ন থাকিতে পারে, এত কথা তাহারা জানেও না, জানিলেও ঐ অন্ধকারের ভিতরে তাহা সহজে চোখে পড়ে না; চোখে পড়িলেও তিন ঘন্টা ধরিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া সেটুকুকে আস্ত বাহির করিবার অবসর তাহাদের হয় না। তাহারা তো আর পণ্ডিত নহে, যে সেকালের খবরটা তাহাদের না লইলেই নয়' তাহারা গরিব লোক, পেটের দায়ে কয়লা খুঁড়িতে আসিয়াছে। সুতরাং খনিতে গাছপালার চিহ্ন থাকিলেও তাহারা তাহা দেখিতে না পাইয়া কোদ্‌লাইয়া গুঁড়া করিয়া দেয়। এই জন্যই কয়লার খনির লোকেরা ইহার কোন খবর রাখে না।

কিরূপ করিয়া এত বড়-বড় বন শেষে পাথুরে কয়লা হইল, আর কিরূপ করিয়াই বা তাহা এত মাটির নীচে চাপা পড়িল, এরূপ হইতে না জানি কতদিন লাগিয়াছিল, এ সকল কথা ভাবিতে গেলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। পণ্ডিতেরা বলেন যে, ষাট ফুট পুরু কয়লার থাক হইতে লক্ষ বৎসরেরও অধিক সময় লাগে। ষাট ফুট কয়লা অনেক খনিতেই আছে; কোন কোন খনিতে প্রায় ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ কয়লা পাওয়া গিয়াছে। ইহার পর যদি এ কথা ভাবিয়া দেখা যায় যে, এই একশত কুড়ি ফুট কয়লার সমস্তটা এক সময়ে হয় নাই, তাহা হইলে মানিতে হয় যে, এই পরিমাণ কয়লা হইতে দুই লক্ষ বৎসরের অনেক বেশি সময় লাগিয়াছিল। একটা কয়লার খনিতে মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, সেখানে এক থাক কয়লা, এক থাক মাটি, এরূপ করিয়া প্রায় একশত থাক কয়লা আছে, কেবল কয়লা মাপিলে একশত কুড়ি ফুট হয়, আর মাটি আর কয়লা একসঙ্গে করিয়া মাপিলে দশ হাজার ফুটেরও বেশি হয়। এত কয়লা আর মাটি জমিতে কত লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

শুধু কি কত লক্ষ বৎসর? কত গাছপালা পচিয়া এত কয়লা হইতে পারে, তাহাই একবার ভাবিয়া দেখ না! ষোল ফুট কয়লা হইতে প্রায় তিনশত ফুট গাছপালার দরকার হয়। একশত ফুট কয়লা হইতে যে গাছপালা চাই তাহাতে প্রায় দুই হাজার ফুট উঁচু পাহাড় হয়! এত গাছপালা যাহাতে ছিল সে সকল বন না জানি কত প্রকাণ্ড ছিল।

গাছপালা জলের নীচে পচিতে পচিতে গরম আর চাপ পাইয়া শেষটা কয়লা হইয়াছে।

পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গাছপালাকে এইরূপ অবস্থায় পচাইতে পারিলে তাহা পাথুরে কয়লা হইয়া যায়। মাটি যে অনেক স্থলে একটু একটু করিয়া উঁচু নিচু হয় তাহা বোধ হয় তোমরা জান। পৃথিবীর অনেক স্থলেই এরূপ হইতেছে। সেকালে এই ব্যাপারটা আরো বেশি হইত। তখন একটা প্রকাণ্ড বন জলে ডুবিয়া যাওয়া কিছুই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। আর কয়লা হইবার সময় যে এরূপ ঘটনা হইয়াছে, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। কয়লার ভিতরে যেসকল জিনিস আছে, গাছপালা জলের নীচে পচিয়া তাহা জন্মিয়া থাকে। খনিতে এক এক থাক কয়লার উপরে এবং নীচে এক এক থাক মাটি থাকে, সে মাটি, আর পুকুর বিল ইত্যাদির তলার কাদা একই জিনিস। ঘোলা জল থিতাইয়া ঐরূপ মাটি উৎপন্ন হয়।

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এক একটা বন পচিয়া এক এক থাক কয়লার জন্ম হইয়াছিল। মাটি নিচু হইয়া যাওয়াতে হয়ত একটা বন জলে ডুবিয়া গেল। সেই জল থিতাইয়া পলি পড়িয়া (ঘোলা জলে মিশানো কাদা তলায় পড়িয়া যাওয়ার নাম 'পলি পড়া') সেই বন ঢাকা পড়িল। আবার কালে হয়ত সেই জায়গাটা উঁচু হওয়াতে পুনরায় সেখানে শুকনো মাটি হইল, তাহার উপরে আবার বন হইল, আবার তাহা ডুবিয়া গেল। এইরূপ করিয়া যে এক এক থাক কয়লা আর এক এক থাক মাটি ক্রমে সঞ্চয় হইতে পারে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার উপরে যখন দেখি যে অনেক সময় এক একটা মাটির থাকে তাহার উপরকার গাছপালার শিকড়গুলি পাওয়া যায়, তখন আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না।

সেকালের বন

ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে বেলে পাথরের পাহাড় আছে। এই পাথরে মাঝে মাঝে একপ্রকার অদ্ভুত জন্তুর পায়ের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দাগগুলি কতকটা মানুষের হাতের দাগের মতন। এজন্য এই জন্তুর নাম কাইরোথীরিযম্ (হস্ত-জন্তু) রাখা হইয়াছে। ইহার দাঁতের ভিতরকার গঠন অত্যন্ত জটিল বলিয়া ইহার আর এক নাম ল্যাবিরিন্থোডন্ (জটিল দন্ত)। এই জন্তু প্রায় ষাঁড়ের মতন বড় হইত। ইহার হাড়ে ব্যাঙের লক্ষণও আছে, কুমিরের লক্ষণও আছে। স্তন্যপায়ী জন্তুর লক্ষণও আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহার মাথার হাড় দেখিয়া অনেকে সন্দেহ করেন যে, ইহার কপালে হয়ত একটি ছোট অতিরিক্ত চক্ষু ছিল।

ডর্সেটশায়ারের পাথরে অনেক প্রাচীন জন্তুর চিহ্ন পাওয়া যায়। সেইসকল চিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করিয়া বিক্রয় করিলে যে পয়সা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা অনেকের দিন চলে। একটি মেয়ে এইরূপ করিয়া পয়সা উপার্জন করিত। ১৮১১ সালে একদিন সেই মেয়েটি প্রাচীন জন্তুর চিহ্ন খুঁজিতে গিয়া দেখিল যে, একটা জন্তুর হাড় পাহাড়ের গা হইতে খানিক বাহির

হইয়া আছে। আর একটু খুঁজিয়া সে দেখিতে পাইল যে, ঐ হাড়গুলি একটা মস্ত জন্তুর কঙ্কালের অংশ। তখন সে সেই স্থানের আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া সমস্তটা কঙ্কাল বাহির করিল। তারপর মুটে ডাকিয়া পাথরসুদ্ধ সেই কঙ্কালটাকে খুঁড়িয়া তোলা হইল।

এই কঙ্কাল যে জন্তুর, সেটা ত্রিশ ফুট লম্বা ছিল। ইহার পরে এই জাতীয় জন্তুর আরো কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে; তাহার কোন কোনটা প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা। ইহার গঠন কোন কোন বিষয়ে মাছের মতন, কোন কোন বিষয়ে গোসাপ আর কুমিরের মতন। এইজন্য ইহার নাম ইক্‌থিয়োসোরস্, ("ইক্‌থিয়স্"—মাছ, "সোরস্" কুমির গোসাপ ইত্যাদি জাতীয় জন্তু) বা 'মাছ-কুমির' রাখা হইয়াছে।

ইহার মেরুদণ্ডের হাড় মাছের হাড়ের মতন ছিল। মাথা কুমিরের মতন। হাত পা নৌকার দাঁড়ের মতন অর্থাৎ খালি একটা চ্যাটালো মাংসল জিনিস, তাহাতে আঙুল নাই - অথচ তাহা মাছের ডানার মতনও নহে। তিমির ডানা ঠিক এইরূপ থাকে।

ইক্‌থিয়োসোরস্ যে সময়ে পৃথিবীতে ছিল, তখন তাহার সমকক্ষ আর কোন জন্তু ছিল না। তাহার দু-ইঞ্চি লম্বা দেড়শত দুইশত ভয়ানক দাঁত দিয়া সে একটিবার যাহাকে ধরিত, তাহার আর রক্ষা ছিল না। নৌকার দাঁড়ের মতন ঐ চারিখানি পা আর ঐ লেজটির সাহায্যে সে জলের ভিতরে না জানি কিরূপ ভয়ানক বেগে ছুটিতে পারিত! পলাইয়া তাহাকে এড়াইবার ভরসা খুব কমই ছিল। তারপর তাহার চোখ দুটি বড় একটা ইক্‌থিয়োসোরসের চোখের গর্ত প্রায় চৌদ্দ ইঞ্চি চওড়া হইত। এত বড় চোখ দিয়া সে আমাদের চেয়ে ঢের বেশি দেখিতে পাইত, তাহাতে সন্দেহ কি? এই চোখের গঠন আবার এমনি যে, তাহা দ্বারা ইচ্ছামত দূরবীক্ষণ অথবা অণুবীক্ষণের কাজ চলে। নিতান্ত ছোট জন্তু আর ঢের দূরের জন্তুকেও সে বেশ পরিষ্কার দেখিত।

ইহারা কখনো ডাঙায় উঠিত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইহাদের পায়ের গঠন দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহা দিয়া নৌকার দাঁড়ের কার্যই বেশি হইত, ওরূপ পা লইয়া ডাঙায় চলা নিতান্ত সহজ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে মাঝে মাঝে ডাঙায় উঠিয়া রোদ পোহানোটা চলিত। নিশ্বাস লইবার জন্য ইহারা কুমিরের মতন এক একবার ভাসিয়া উঠিত।

ইক্‌থিয়োসোরসেরা হয়ত মাছই বেশি খাইত। অনেক ইক্‌থিয়োসোরসের পেটের ভিতরে খুব ছোট ছোট ইকথিয়োসোরসের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, হয়ত ক্ষুধার সময় অন্য জন্তু না মিলিলে, নিজের বাচ্চাগুলিকে ধরিয়া গিলিতে তাহাদের বেশি আপত্তি ছিল না। আবার অনেকে বলেন ইকথিয়োসোরসের মৃত্যুর সময়ে তাহার পেটে যে বাচ্চা ছিল, ওগুলি তাহাদেরই কঙ্কাল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইরূপ কঙ্কাল কেবল এক জাতীয় ইক্‌থিয়োসোরসের পেটের ভিতরেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, অন্য ইক্‌থিয়োসোরসেরা ডিম পাড়িত, আর এই জাতীয় ইক্‌থিয়োসোরস্‌গুলির বাচ্চা হইত।

এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে বোধ হয় যেন ইক্‌থিয়োসোরস্‌দের হঠাৎ মৃত্যু হয়, আর মৃত্যুর পরেই তাহারা মাটি চাপা পড়ে। কিরূপ ভয়ানক দুর্ঘটনায় এরূপ হইয়াছিল, তাহা এখন ঠিক করিয়া বলা সহজ নহে।

ইক্‌থিয়োসোরস্ এই সময়ের জন্তুদের মধ্যে সকলের চাইতে ভয়ানক ছিল বটে, কিন্তু

এই সময়ের সকলের চাইতে আশ্চর্য জন্তুর কথা বলিতে হইলে আর একটি জন্তুর উল্লেখ করিতে হয়। ইহার নাম প্লীসিয়োসোরস। 'প্লীসিয়স' বলিতে কাছাকাছি—অথবা অনুরূপ বুঝায়। এই জন্তুর শরীরের গঠন ইক্‌থিয়োসোরসের তুলনায় অনেকটা গোসাপ আর কুমিরের কাছাকাছি ছিল।

এ জন্তুটা নিতান্তই অদ্ভুত ছিল। গোসাপের মুখ, কুমিরের দাঁত, সাপের গলা তিমির ডানা। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহারা চেহারা দেখিলে হঠাৎ মনে হয়, যেন একটা সাপের গায় একটা কচ্ছপকে গাঁথিয়া দিয়াছে।

খুব বড় প্লীসিয়োসোরসগুলি প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা হইত বটে কিন্তু ইহারা ইকথিয়োসোরসগুলির ন্যায় ভয়ানক জন্তু ছিল বলিয়া বোধ হয় না। গড়ন হালকা, গায় জোর কম, হাত পা তেমন বেগে ছুটিবার উপযোগী নহে যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রও সামান্যই বলিতে হইবে। সুতরাং ইহাদিগকে সকল বিষয়েই ইকথিয়োসোরস অপেক্ষা নিকৃষ্ট দেখা যাইতেছে। হয়ত ইহারা ইকথিয়োসোরসকে বড়ই ভয় করিয়া চলিত, আর তাহাকে দেখিতে পাইলে অবিলম্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিত।

অল্প জলে ঝোপ জঙ্গলের ভিতরে গা ঢাকা দিয়া থাকাকেই প্লীসিয়োসোরস অধিক নিরাপদ মনে করিত বলিয়া বোধ হয় এই বুঝি ঈশ্বর তাহাকে দয়া করিয়া বকের মতন লম্বা গলা দিয়াছিলেন—যেন শিকার কাছে আসিলেই ঐ গলাটি বাড়াইয়া খপ করিয়া তাহাকে ধরিতে পারে।

ইকথিয়োসোরসের ন্যায় ইহাদেরও ডাঙ্গায় চলার ক্ষমতা কম ছিল—হয়ত ছিলই না। জলের ভিতরেও খুব গভীর স্থানে চলাফেরা করা অপেক্ষা অল্প জলে থাকিতেই ইহাদের সুবিধা হইত। অনেক সময় হয়ত ইহারা হাঁসের মতন গলা বাকাইয়া জলের উপরে সাঁতরাইত।

ইক্‌থিয়োসোরস আর প্লীসিয়োসোরস অনেক রকমের হইত। কোনটা বড় কোনটা ছোট, কোনটার মাথা ভারি কোনটার গলা মোটা কোনটার ঠোঁট লম্বা। সুতরাং তখনকার সমুদ্র যে নানা জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল এ কথা সহজেই বুঝা যাইতেছে, নহিলে এতগুলি মাংসাশী জন্তু কি খাইয়া বাঁচিত?

কোথায় কুমির আর কোথায় পাখি। কিন্তু পণ্ডিতদের অনেকে বলেন যে, কুমির হইতেই পাখির সৃষ্টি হইয়াছে। অন্তত এ কথা নিশ্চয় যে, সেকালের কুমিরগুলির ভিতরে অনেক স্থলে পাখির লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়। পিছনের পা আর কোমরের হাড়গুলির গঠন আজকালকার উটপাখিগুলির কোমরের হাড় আর পায়ের গঠনের সঙ্গে আশ্চর্যরূপে মিলে।

চলিবার সময় ইহাদের সকলে না হইলেও অন্তত অনেকে পাখির মতন শুধু পিছনের পায় ভর দিয়াই চলিত। সামনের পা দুখানি পিছনের পায়ের চাইতে ঢের ছোট ছিল, সে দুখানিকে তাহারা পাখির ডানার মতন করিয়া বুকের কাছে গুটাইয়া রাখিত।

পায়ের আঙুলগুলি অনেক স্থলে ঠিক পাখির আঙুলের মতন ছিল। চলিবার সময় তাহাদের পায়ের যে দাগ হইত, তাহাও ঠিক পাখির দাগের মতন। এই সকল দাগ দেখিয়া প্রথমে লোকে পাখির পায়ের দাগই মনে করিয়াছিল, এবং এই কথা লইয়া দিনকয়েকের জন্য পণ্ডিত মহাশয়েরা বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলেন। চিন্তার বিষয় হইল এই যে, পৃথিবীতে এ সময়ে পাখি ছিল না, অথচ এত বড় বড় পাখির পায়ের দাগ কোথা হইতে আসিল? কোন-

কোন স্থলে প্রায় কুড়ি ইঞ্চি লম্বা দাগ দেখা গিয়াছে;আর তাহার এক একটা দাগ প্রায় পাঁচ ফুট অন্তর পড়িয়াছে।

যাহা হউক এগুলি যে পাখির পায়ের দাগ নয়, দু-একটা জানোয়ারের হাড় আবিষ্কার হইলেই তাহা জানা গেল।

এই সকল জন্তুকে সাধারণভাবে একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া মোটের উপর তাহাদের নাম 'ডাইনোসর' রাখা হইয়াছে। ডাইনোসর শব্দের অর্থ 'ভয়ানক কুমির'। কুমির বলিলেই আমরা তাহাকে যথেষ্ট ভয়ানক মনে করি;তাহার উপর আবার ভয়ানক কুমির' সেটা যে কতখানি ভয়ানক ছিল একবার কল্পনা কর। সাধারণ কুমিরগুলি হাজার ভয়ানক হইলেও তাহারা হামাগুড়ি দিয়া চলে আর জল ছাড়িয়া বেশি দূরে যাইতে পারে না। কিন্তু একটা ডাইনোসর আসিলে সে দশ বার মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিতে কিছুমাত্র আপত্তি করিবে না; আর একটিবার সাক্ষাৎ পাইলে তোমারই মতন দুপায়ে ছুটিয়া তোমাকে তাড়া করিবে। ইহার উপর যদি সে একটা হাতির মতন, কি তাহার চাইতেও বড় হয়, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া ঘাড়ে পড়িবাব বদ অভ্যাসটাও তাহার থাকে, তবে ব্যাপাবখানা কিরকম দাঁড়ায়, বুঝিতেই পার। বড় ভাগ্য যে এরা এখন আর পৃথিবীতে নাই।

যাহা হউক, সকল ডাইনোসরই যে খুব ভয়ানক ছিল তাহা নহে। একে তো ইহাদের সকলগুলি এত বড় হইত না, তাহার উপর আবার খুব প্রকাণ্ড গুলিবও অনেকে নিরামিষভোজী নিরীহ জন্তু ছিল।

সকলের চাইতে বড় যে ডাইনোসরের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই শ্রেণীব নিরীহ জন্তু। ইহার নাম 'ব্রন্টোসোবস্' অর্থাৎ বজ্র-কুম্ভীব। তিমি ভিন্ন এত বড় জন্তু আর পৃথিবীতে নাই। এই জন্তু চলিবার সময় নিশ্চয় মাটি কাঁপিত, আর তাহার পায়ের ধুপ্ ধাপ্ শব্দ অনেক দূর হইতে শুনা যাইত। আজকালকার এক একটা টিকটিকি যেমন ট্যাক্-ট্যাক্ শব্দ করে, ব্রন্টোসোরসের তেমন করার অভ্যাস থাকিলে, সে শব্দ যে বাজ পড়ার শব্দের চাইতে কম হইত, তাহা বোধ হয় না। একটা হাতি চ্যাঁচাইলে তাহা দুই তিন মাইল দূর হইতে শুনা যায়। হয়ত দশ মাইলের কম তাহার আওয়াজ যাইত না।

কয়েক বৎসর হইল, আমেরিকার 'ইয়োমিং' নামক প্রদেশে একটা ব্রন্টোসোরসের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এই কঙ্কাল একশো ছাপ্পান্ন ফুট লম্বা। ইহার ওজন প্রায় পৌনে ছয়শত মণ। আস্ত জন্তুটা দেড় হাজার মণের কম ভারি ছিল না। তাহার পাঁজরের ভিতরে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোকের স্থান হয়।

পিছনের পায় ভর দিয়া চলার অভ্যাস ইহার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে বেজি যেমন এক একবার হাত গুটাইয়া উঠিয়া বসে, ব্রন্টোসোরসেরও হয়ত মাঝে মাঝে ঐরূপ করিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিবার অভ্যাস ছিল। উঁচু গাছের কচি পাতাগুলি খাইতে হয়ত মাঝে মাঝে তাহার লোভ হইত। তাহা ছাড়া আশেপাশে ভয়ানক শত্রুর বাস, তাহাদের কোন্‌টা কোন্‌দিক হইতে আসিয়া আক্রমণ করে, তাহার ঠিকানা ছিল না। সুতরাং এক একবার চারিদিক দেখিয়া লইবার প্রয়োজনও ছিল।

ব্রন্টোসোরস্ উঠিয়া বসিলে প্রায় একশো ফুট উঁচু হইত। আজকালকার প্রকাণ্ড তাল গাছ আর নারিকেল গাছগুলির আগা খুঁটিয়া খাওয়া তাহার পক্ষে নিতান্তই সোজা কাজ ছিল

বলিতে হইবে। ঐ ছোট মাথাটি সুদ্ধ তাহার ঐ সরু লম্বা গলাটি গলি-ঘুঁচির ভিতরে অনেক দূর অবধি ঢুকাইয়া সে নিশ্চয়ই অতি সহজে খাবার জিনিস খুঁজিয়া আনিতে পারিত।

এত বড় জানোয়ারের পক্ষে তাহার মাথাটি একটু বেশি ছোট বলিতে হইবে; তাহার ভিতরে মস্তিষ্ক খুব বেশি থাকা অসম্ভব। বাস্তবিক, বুদ্ধিটা একটু মোটা গোছের ছিল বলিয়াই বোধ হয়। আজকাল নিরীহ লোক বলিলেই তোমরা বেকুব বুঝিয়া লও। সেকালেও এর দস্তুরটা কতক ছিল দেখিতেছি। অস্ত্র-শস্ত্র তাহার শরীরে কিছু ছিল না বলিলেও হয়; বড় বড় নখ-দাঁতওয়ালা মাংসখেকো ডাইনোসরগুলির হাত এড়াইবার জন্য তাহার পলায়ন ভিন্ন আর উপায় দেখা যায় না। এখনকার তিমিগুলিরও কতকটা এইরূপ দশা। তিমি জাতীয় ছোট ছোট হিংস্র জানোয়ারদের ভয়ে তিমি সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকে। তিমিকে দেখিতে পাইলেই উহারা আসিয়া তাহাকে কামড়াইয়া খাইতে আরম্ভ করে। ব্রন্টোসোরসেরও এইরূপ প্রতিবেশী গুটিকতক ছিল। ইহাদের ভয়ে হয়ত অনেক সময়ই বেচারী জলে নামিয়া গা ঢাকা দিয়া থাকিত। সেখানে গাছপালারও অভাব ছিল না; আর কেহ তাড়া করিলে সাঁতরাইয়া তাহাকে ফাঁকি দেওয়াও যাইত। ইহার শরীরের গঠন দেখিলে মনে হয় যে, এই জন্তু সাঁতরাইতে খুব পটু ছিল।

এই সকল জন্তুর চিহ্ন অনেক সময় এরূপ স্থানে এবং এরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় যে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় তাহারা কাদায় ডুবিয়া মারা পড়িয়াছিল। খাল, বিল, হ্রদ ইত্যাদির ধারে অনেক সময় ভয়ানক কাদা থাকে, সেই কাদায় পড়িয়া কত জন্তু এখনো মারা যাইতেছে। জলের গাছপালার ঠাণ্ডা রসাল ডগাগুলি অনেক জন্তুরই খুব প্রিয় বস্তু। বিশেষত সেই জল যদি লোনা হয়, তবে তাহার ধারের পাঁক চাটিয়া নিরামিষভোজী জন্তুরা যারপরনাই সুখ পায়! যতক্ষণ পেটে স্থান থাকে, ততক্ষণ বসিয়া তাহা খাইতে হয়। এদিকে পাঁকের ভিতরে পা ঢুকিয়া যাইতেছে, তাহার খবর নাই। ব্রন্টোসোরসের মতন লম্বা গলা থাকিলে একস্থানে বসিয়াই অনেকক্ষণ পর্যন্ত খাইবার সুবিধা হয়: আর ততক্ষণে তাহার পা হয়ত এতটা বসিয়া যায় যে, খাওয়া শেষ হইলে আর চলিয়া আসিবার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং সেইখানেই তাহার জীবনের শেষ হয়।

আজকালকার কুমিরদের ডিম হয়। ব্রন্টোসোরসের ডিম হইলে, তাহার এক একটা না জানি কত বড় হইত! কিন্তু ডাইনোসরেরা ডিম পাড়িত কি না, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের সন্দেহ আছে।

অনেক বড়-বড় ডাইনোসর সেকালে ছিল, কিন্তু তাহাদের সকলের কথা লিখিবার স্থান এই পুস্তকে নাই। এই সকল ডাইনোসর অনেক সময় খুব বড়-বড় হইত বটে, কিন্তু তাহারা সাধারণত নিরামিষভোজী সাদাসিধে জন্তু ছিল।

মাংসখেকো ডাইনোসরগুলি এর চাইতে ছোট ছিল। তাই বলিয়া তাহারা নিতান্তই অবহেলার পাত্র ছিল, এমন ভাবিও না। আজকালকার বাঘ ভাল্লুকগুলিকে কি তোমরা একটুও হিসাব কর না? লেজসুদ্ধ বার ফুট লম্বা বাঘ অতি অল্পই আছে। কিন্তু এক একটা মাংসখেকো ডাইনোসর ত্রিশ ফুট লম্বা হইত! বাঘ হাতির সমান বড় হইলে, তবে এইরূপ একটা জন্তুর সঙ্গে তুলনা হয়।

একটা মাংসভোজী ডাইনোসরের নাম 'মিগালোসোরস্ (ভীষণ কুম্ভীর)। ইহার চোহারা

দেখিলে আজকালকার ক্যাঙারুগুলির কথা মনে হয়। ইহাদের পিছনের পায়ের হাড়গুলির গঠন অনেকটা উটপাখির হাড়ের গঠনের মতন। পিছনের দুই পায় ভর করিয়াই সচরাচর চলিত, চলিবার সময় সামনের পা বেশি ব্যবহার করিত না। কুমিরের দাঁত কেমন ভয়ানক তাহা সকলেই দেখিয়াছি। মিগালোসোরসের ইহার চাইতেও ভয়ানক করাতের মতন দাঁত, এবং এর উপর আবার ভয়ানক ধারালো নখ ছিল। লাফাইবার আর ছুটিবার ক্ষমতাও অসাধারণ। সে সময়ে বাঘ ভাল্লুক ছিল না, তাহার বদলে ইহারাই ছিল।

ডাইনোসর খুব প্রকাণ্ড ছিল, ভয়ানকও ছিল, আবার এক একটা নিতান্ত অদ্ভুতও ছিল। একটা ডাইনোসর ছিল, তাহাকে এখন পণ্ডিতেরা 'ইগুয়ানোডন' (অর্থাৎ ইগুয়ানার মতন দাঁত যার – ইগুয়ানা একরকম গোসাপ) বলিয়া থাকেন। প্রথমে এই জন্তুর দাঁত পাওয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া তখনকার সকলের চেয়ে বড় পণ্ডিত কুভিয়ে বলিলেন 'এটা হিপোপটেমাসের দাঁত।' কিছুদিন পরে ঐ জন্তুর সামনের পায়ের বুড়ো আঙুলের একটা নখ পাওয়া গেল। তাহা দেখিয়া কুভিয়ে বলিলেন 'এটা গণ্ডারের শিং'। তোমরা হাসিও না। কুভিয়ে যেমন তেমন পণ্ডিত ছিলেন না। যে 'কম্পারেটিভ অ্যানাটমি' শাস্ত্রের গুণে আজ সেকালের জন্তুদের সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এত কথা জানিতে পারিয়াছেন, আর আমি তাহা পড়িয়া তোমাদিগকে ডাকিয়া এতগুলি আশ্চর্য কথা শুনাইতে বসিয়াছি কুভিয়ে সেই 'কম্পারেটিভ অ্যানাটমি' শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা। কুভিয়ের ভুল হইয়াছিল, ইহাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, জন্তুটার গঠন নিতান্তই অদ্ভুত ছিল।
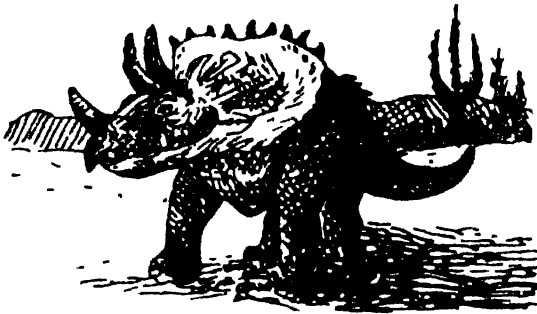
ট্রাইসিরেটপ্স

তিন শিংওয়ালা নিরামিষভোজী ডাইনোসর ২৫ ফুট লম্বা ছিল

ইগুয়ানোডনের দাঁতের বিষয়টা শীঘ্রই পরিষ্কার হইল, কিন্তু তাহার ঐ 'গণ্ডারের শিং-এর' মতন হাড়খানার অর্থ বুঝিতে কিছু সময় লাগিয়াছিল। আমরা ছেলেবেলায় ইগুয়ানোডনের যে সকল ছবি দেখিতাম, তাহাতে উহার নাকের উপর কতকটা গণ্ডারের শিং-এর মতন একটি ছোট শিং থাকিত। শেষে ঐ জন্তুর আরো অনেক হাড় পাওয়া গেলে পরে জানা গিয়াছে যে, উহা তাহার শিং নহে, হাতের বুড়ো আঙুলের নখ। এই জন্তু নিরামিষ খাইত।

ইগুয়ানোডনের শিং ছিল না বটে, কিন্তু শিংওয়ালা ডাইনোসর সেকালে বিস্তর ছিল। এইরূপ একটা মাংসাশী জন্তুর নাম কিরাটোসোরস্ (শৃঙ্গী কুম্ভীর)। এই জন্তু প্রায় মিগালোসোরসের সমান বড়, আর ইহার নখ দাঁতও তেমনি ভয়ানক। ইহার নাকের উপর আবার গণ্ডারের শিং-এর মতন একটা ভয়ানক শিং।

আর একটার নাম ট্রাইসিরেটপ্স (ত্রিশৃঙ্গানন, অর্থাৎ তিন শিংওয়ালা মুখ যার) ইহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন বেচারার গণ্ডার হইতে ভারি সাধ হইয়াছিল, আর তাহার জন্য সে বিশেষ চেষ্টাও করিয়াছিল—পারিয়াছিল কি না, পাঠক-পাঠিকারা বলিবেন। যদি না পারিয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ দুঃখের কারণ দেখি না। গণ্ডারের এক শিং, ইহার তিন শিং। গায়ের

স্টিগোসোরস্

চামড়াটি গণ্ডারের চামড়ার চাইতেও উঁচুদরের। ইহার উপর আবার গলায় হাঁসুলি! তোমরা হয়ত বলিবে 'গোদের উপর বিষফোঁড়া'। ইহাতে আমার আপত্তি নাই, তবে বিষফোঁড়াটা দেখিতেছি গোদের চাইতেও বড় হইয়া গেল। লম্বায় এই জন্তু প্রায় পঁচিশ ফুট হইত। সুতরাং এ বিষয়ে ও গণ্ডারের জ্যাঠামহাশয়।

এরপর যাহার ছবি দেওয়া যাইতেছে তাহার নাম 'স্টিগোসোরস' (চাল কুমির) ইহার ২৫ ফুট লম্বা নিরামিষখেকো ডাইনোসর। ইহার দুইটি মস্তিষ্ক ছিল পিঠ দেখিলে খড়ো ঘরের চালের কথা মনে হয়, তাই এই নাম হইয়াছে। এই জন্তু প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা হইত।

স্টিগোসোরসের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য একটা কথা আছে। এই জন্তুর কোমরের নীচে এমন একটা স্থান আছে যে, তাহা দেখিলে মনে হয়, উহার ঐ স্থানেও মস্তিষ্ক ছিল। একটা জন্তুর দুইটা মস্তিষ্ক, এ কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ইহার মাথায় যতটুকু মস্তিষ্কের স্থান তাহার দশগুণ বেশি মস্তিষ্কের স্থান কোমরের কাছে। এত মগজ যাহার, তাহার না জানি কতটা বুদ্ধি ছিল! মাঝে মাঝে এক একটা দশ বার বছরের ছেলে দেখিতে পাই--সে চুরুট খাইতে শিখিয়াছে, আর ইহারই মধ্যে এত জিনিসের খবর লইয়াছে যে, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। তখন আমার এই স্টিগোসোরসের কথা মনে পড়ে, আর একটিবার সেই ছেলের কোমরের দিকে চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, ওখানেও একটা বুদ্ধির ঝুলি আছে কি না! তোমরা তাহাকে দেখিলে হয়ত বলিবে 'জ্যাঠা'। কিন্তু আমার মতে ইহাকে 'চাল কুমির' বলিলে অধিক সঙ্গত হয়।

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে কুমির গোসাপ ইত্যাদি জাতীয় জন্তু হইতেই পাখির উৎপত্তি, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইক্‌থিয়োসোরস্, প্লীসিয়োসোরস্ প্রভৃতির ভিতরে পাখির লক্ষণ ছিল না। তারপর ডাইনোসরগুলির ভিতরে পাখির লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। ইহাদের কোমরের হাড়, পিছনের পা প্রভৃতি পাখির মতন ছিল;ইহাদের পায়ের দাগ দেখিলে পাখির পায়ের দাগ বলিয়া ভ্রম হয়।

ঠোঁটওয়ালা ডাইনোসর, ইক্‌থিয়োসোরস্ ও প্লীসিয়োসোরসের সময় হইতেই ছিল। ইহাদের ঠোঁট পাখির ঠোঁটের মতনই ছিল, তাহার উপর আবার অনেক সময় ইহাদের দাঁতও থাকিত। ইহাদের অনেকেই উড়িতে পারিত। কিন্তু তাহাদের পাখা পাখির পাখার মতন ছিল না;কতকটা বাদুড়ের পাখার মতন ছিল। ইহাদের সাধারণ নাম টেরোড্যাক্টাইল (অঙ্গুলি পক্ষ) । আজকাল যেমন ছোট-বড় নানাপ্রকার পাখি আছে, তেমনি ইহারাও নানারকমের হইত। কোন কোনটা চড়াই পাখির মতন ছোট ছিল;আবার কোন কোনটা ডানা মেলিলে ২৫ ফুট

জায়গা ঢাকিয়া ফেলিত। খুব বড়গুলির দাঁত ছিল না। ইহাদের কোনটার লম্বা লেজ ছিল, আবার কোনটার লেজ প্রায় ছিল না বলিলেই হয়।

রামফোরিংকস বলিয়া একরকম ছোট টেরোড্যাক্টাইল ছিল। ইহার লেজটি বেশ লম্বা; তাহার আগার গড়ন কতকটা গাছের পাতার মতন। খুব লম্বা বোঁটার আগায় একটা ছোট পাতা থাকিলে যেমন দেখায়, রামফোরিংকসের লেজ অনেকটা সেইরূপ ছিল। উড়িবার সময় এই লেজ দিয়া হালের কাজ চলিত। রামফোরিংকসের লেজের কথা ভাবিলে পাখির পালকের কথা মনে হয়।

লিথোগ্রাফারেরা যে পাথরের উপর ছবি আঁকে, জার্মানি দেশে ঐরূপ পাথরের খনিতে রামফোরিংকসের চিহ্ন পাওয়া যায়। ঐ জাতীয় পাথরের খনিতে কাজ করিবার সময় মাঝে মাঝে দু-একটি পাখির পালকও দেখিতে পাওয়া যাইত। শেষে একবার একটা পাখির অনেকগুলি হাড় ও পালক পাওয়া গেল। এইসকল চিহ্ন ঠিক যেরূপ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, তাহার ছবি দেওয়া যাইতেছে। ইহাই পৃথিবীর প্রথম পক্ষী। যে স্থানে এই সকল চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল, তাহার নাম সোলেনহফেন। এইজন্য অনেক সময় ইহাকে 'সোলেনহফেনের পাখি' বলা হয়। কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক নাম আর্কিওপটেরিক্স (পুরাতন পাখি)।

এই চিহ্নগুলি দেখিলে পাখি ভিন্ন অন্য কোন জন্তুর চিহ্ন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি মনে কর যে এটা ঠিক আজকালকার পাখির মতন ছিল, তবে বড় ভুল হইবে। ছবিখানিকে একবার ভাল করিয়া দেখ। ইহাতে এই পাখির লেজটা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এ লেজ ত ঠিক পাখির লেজের মতন নয়! পালকগুলি পাখিব পালকের মতন, তাহাতে ভুল নাই; কিন্তু আসল লেজটি যে গোসাপেব; তাহা হাড় কয়খানি দেখিলেই বুঝা যায়। গোসাপের লেজে জোড়া জোড়া করিয়া পালক পরাইয়া এই অদ্ভুত জন্তুর লেজ তৈয়ার হইয়াছে।

মাথায় কতকটা পাখির মতন ঠোঁট আছে, আবার কুমিরের মতন দাঁতও আছে। ডানা দুখানি হঠাৎ দেখিলে পাখির ডানা বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, উহা ঠিক আজকালকার পাখির ডানা নহে। এখন আমরা কোন পাখির ডানায় আঙুল দেখিতে পাই না (অর্থাৎ বাহির হইতে দেখিতে পাই না। পালকের ভিতরে খুঁজিয়া দেখিলে এখনো কোন পাখির ছোট ছোট আঙুল দেখিতে পাওয়া যায়।) কিন্তু এই আশ্চর্য পাখির প্রত্যেক ডানায় তিনটি করিয়া আঙুল। শরীরের হাড়গুলি কতক পাখির মতন, কতক গোসাপের মতন। এই পাখি কাকের মতন বড় হইত।

আজকাল কোন পাখির মুখে দাঁত দেখা যায় না, কিন্তু সেকালের অনেক পাখির মুখে দাঁত ছিল। এই সকল দাঁতওয়ালা পাখির চিহ্ন আমেরিকায় পাওয়া গিয়াছে, একটার নাম 'হেস্পারনিস' অর্থাৎ পশ্চিমের পাখি। আমেরিকা ইওরোপের পশ্চিমে, সুতরাং সেখানে যে পাখি পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাম পশ্চিমের পাখি। এই পাখি অনেকটা পেংগুইন পাখির মতন ছিল। ইহার উড়িবার ক্ষমতা ছিল না; জলে সাঁতরাইয়া বেড়াইত। এইরূপ আর একটা পাখির চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাম 'ইক্‌থিয়র্নিস' অর্থাৎ মাছ-পাখি। ইহার মেরুদণ্ডের হাড়গুলি মাছের হাড়ের মতন ছিল, তাই ওরূপ নাম হইয়াছে!

বাস্তবিক সেকালের জন্তুগুলির ভিতরে মাছ, কুমির, পাখি ইত্যাদিতে কেমন একটা খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছিল। একটাকে ধরিয়া খাইতে পারিলে অনেক প্রকারের জন্তু খাওয়ার ফল হইত। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে তেমন আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। আজকাল ওরূপ জন্তু দু-একটা বাঁচিয়া থাকিলে আমরা উহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই আশ্চর্য মনে করিতাম না। এখন নাকি ওরূপ কিছু নাই, তাই এগুলি এত অদ্ভুত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জন্তুর কথা বলিতে গিয়া সময়ের কথা কতকটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ডাইনোসর সবগুলি যে পৃথিবীতে ঠিক একই সময়ে দেখা দিয়াছিল, তাহা নহে। যাহাদের কথা আগে বলিয়াছি তাহারাই যে আগে ছিল, আর যাহাদের কথা পরে বলিয়াছি তাহাদের সকলেই যে পরে আসিয়াছিল, তাহাও নহে। টেরোড্যাক্টাইলগুলি, ইক্‌থিয়োসোরস্ প্রভৃতির সময় হইতেই ছিল। ইগুয়ানোডন প্রভৃতি টেরোড্যাক্টাইল ও আর্কিওপটেরিক্সের পরে জন্মিয়াছিল। আবার, প্লীসিয়োসোরস্‌গুলি প্রায় ইগুয়ানোডন প্রভৃতির সময় পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল। শুধু যে বাঁচিয়াছিল তাহা নহে, শেষকালের প্লীসিয়োসোরস্‌গুলিই বেশি বড় হইত।
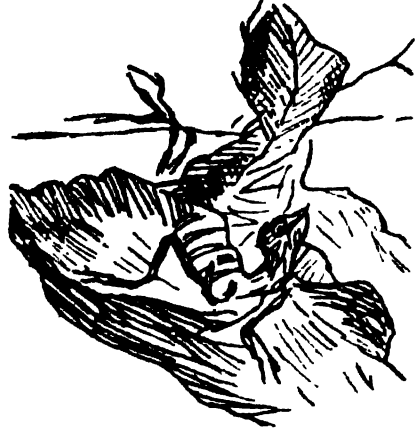
আর্কিঅপ্টেরিক্সের হাড়

যে সকল ডাইনোসরের কথা বলিয়াছি, তাহা ছাড়াও ছোট বড় অনেক ডাইনোসর ছিল। আট্‌লান্টোসোরস্ আশি নব্বই ফুট লম্বা হইত। ডিপ্লোডোকস্ নামক আর একটা ডাইনোসর প্রায় ৫০ ফুট ছিল।

ডাইনোসরেরা উভচর ছিল; অর্থাৎ তাহারা জলেও থাকিতে পারিত আর ডাঙায়ও থাকিতে পারিত। তবে অধিক সময় যে তাহারা ডাঙাতেই কাটাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাইনোসর ছাড়া অনেক কুম্ভীর-জাতীয় জলচর জন্তুও তখন ছিল। ইহাদের দস্তুরমতন পা ছিল না, ইক্‌থিয়োসোরস্, প্লীসিয়োসোরসের মতন ডানা হইত। এই সকল জন্তুর অনেকগুলি খুব সরু আর খুব লম্বা—দেখিতে সাপের মতন ছিল। ইহাদের মধ্যে মোসাসোরস্ প্রায় আশি ফুট লম্বা হইত। ইলাস্‌মোসোরস্ ৫০ ফুট ছিল।

এ কথা সহজেই মনে হইতে পারে যে এতদিনে পৃথিবীর বয়স ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। এই সময়ে পৃথিবীর অবস্থা অনেকটা এখনকার গরম দেশগুলির মতন ছিল। মেরুর কাছের স্থানগুলি তখন এত ঠাণ্ডা ছিল না; সেখানে এত বরফও ছিল না। গ্রীনল্যাণ্ডে তখন আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের গাছপালার ন্যায় গাছপালা বিস্তর জন্মিত। আজকালকার বড়-বড় গাছের মতন অনেক গাছ ছিল। তাল নারিকেল জাতীয় গাছেরও অভাব ছিল না।

এই সময়েই পৃথিবীতে খড়ির উৎপত্তি হয়। তোমরা যে খড়ি দিয়া বোর্ডে লেখ, দাঁত পরিষ্কার কর, সেই খড়ি অসংখ্য শামুক ঝিনুকের খোলা পচিয়া এই সময়েই জন্মিয়াছিল।
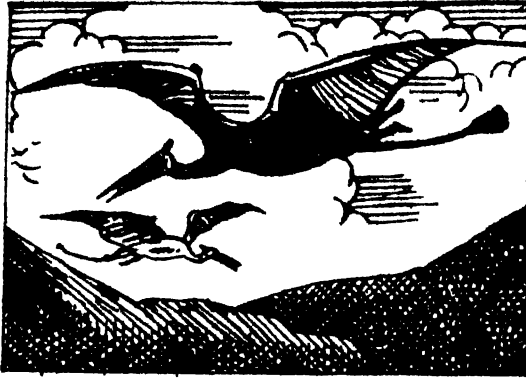
রামফোরিংকস

এখনো সমুদ্রের তলায় অনেক স্থানে এইরূপ জিনিস জন্মিতেছে; তাহা যে কালে খড়ি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্বেই স্তন্যপায়ী জন্তু দেখা দিয়াছিল। প্রথম স্তন্যপায়ী জন্তু বেশি বড় ছিল না—বড়জোর বিড়ালটার মতন হইবে। এইসকল জন্তু ক্যাঙারু, অপোসম্ ইত্যাদির জাতীয়। এইরূপ দুটি জন্তুর নাম 'আম্‌ফিথীরিয়ম' আর 'ফাস্কলোথীরিয়ম'।

আমাদের এই পৃথিবী আগে খুব গরম ছিল; তারপর ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া তাহার বর্তমান অবস্থায় আসিয়াছে। পৃথিবীর ভিতরটা এখনো যে খুব গরম আছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে, সেই গরম স্থানটা অনেকখানি মাটির নীচে থাকায়, আমরা সহজে তাহা বুঝিতে পারি না। পৃথিবীর উপরকার খোলাটা এখন বেশ পুরু হইয়াছে, তাহা ভেদ করিয়া ভিতরকার গরম সহজে বাহিরে পৌঁছাইতে পারে না।

পৃথিবীর খোলা যখন এত পুরু ছিল না, তখন তাহার ভিতরকার আগুনের তেজে তাহার বাহির অবধি বেশ গরম থাকিত। তখনকার পৃথিবী এখনকার পৃথিবী অপেক্ষা অনেক গরম ছিল; আর সেই গরমটা পৃথিবীর সর্বত্র সমান ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর খোলা সকল স্থানেই সমান পুরু, সুতরাং তাহার ভিতর দিয়া সকল স্থানেই সমান পরিমাণ উত্তাপ বাহিরে আসিত। সূর্যের তখন পৃথিবীর উপরে এতটা প্রভুত্ব ছিল কি না সন্দেহ। তখন এত গরম ছিল বলিয়া আজকালকার চাইতে সে সময়ে অনেক বেশি জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং আকাশ তখন খুব মেঘলা ছিল। সেই মেঘের ভিতর দিয়া সূর্যের তেজ অধিক পরিমাণে পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারিত না।

সে সময়ে আর এ সময়ে একটা মস্ত প্রভেদ তবে এই দেখা যাইতেছে যে, তখন পৃথিবী নিজের তেজেই গরম ছিল, আর এখন সূর্যের তেজটুকু না হইলেই সে শীতে কষ্ট পায়। এখন যে শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতুর পরিবর্তন হয় তাহার কারণ ঐ সূর্য। সেকালের প্রথম এবং মধ্য অবস্থায় পৃথিবীর উপরে সূর্যের প্রাধান্য খুবই কম ছিল; সুতরাং আজকালকার ন্যায় এরূপ শীত গ্রীষ্মের পরিবর্তন হইত না। তখন বার মাসই গ্রীষ্মকাল; আকাশ মেঘলা; জমি স্যাঁৎসেতে। মেরুর কাছেও তখন এত বরফ ছিল না। গরম দেশের গাছপালা তখন মেরুতেও জন্মিত।

সেকালের কথা বলিতে বলিতে আমরা এখন এমন একটা সময়ে আসিয়াছি যে, তখন পৃথিবীর নিজের তেজ কমিয়া গিয়া কতকটা আজকালকার মতন অবস্থা হইয়াছে। শীত, গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতুর পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। আজকালকার মতন গাছপালা আর জন্তু ক্রমে অধিক পরিমাণে দেখা দিতেছে। ইহাই সেকালের শেষ অবস্থা। এখন হইতে স্তন্যপায়ী

জন্তুর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া শেষে মনুষ্যের জন্ম হয়। যখন মানুষ আসিল, তখন আর 'সেকাল' রহিল না—তখন 'একালের' আরম্ভ হইল। সেকালের এই অবশিষ্ট অংশটুকুর কথা শেষ হইলেই এবারকার মতন পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ছুটি চাহিতে পারি।

প্রথম স্তন্যপায়ী জন্তুগুলি খুব ছোট ছোট ছিল। তাহাদের কথা ইতিপূর্বে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। সেকালের বড় বড় স্তন্যপায়ী জন্তুগুলি প্রায়ই স্থূলচর্মী (অর্থাৎ যাহাদের চামড়া মোটা—যেমন, হাতি, গণ্ডার, টেপির, শুয়োর প্রভৃতি) জাতীয় ছিল।

এই জাতীয় যে জন্তুটির হাড় প্রথমে আবিষ্কৃত হয়, তাহার নাম প্যালিয়োথীরিয়ম, অর্থাৎ পুরাতন জন্তু। এই জন্তু দেখিতে অনেকটা টেপিরের মতন ছিল। নিরামিষখেকো নিরীহ ভালমানুষ জন্তু। কাহারো কোন অনিষ্ট করিত না। অনেকগুলি একত্রে দল বাঁধিয়া থাকিতে ভালবাসিত।

ইহার কিছুকাল পরে পৃথিবীতে নানা জাতীয় হাতি দেখা দিল। পৃথিবীর অনেক স্থানেই এইসকল হাতির চিহ্ন পাওয়া যায়। ইহাদের অনেকগুলি আমাদের আজকালকার হাতির চাইতে বড় হইত।
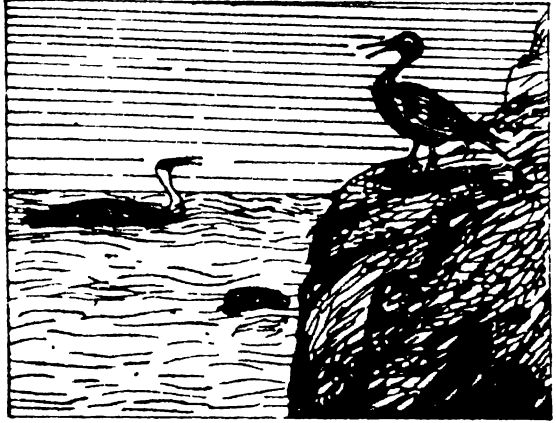
প্রথমে যে হস্তীজাতীয় জন্তুর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল, পণ্ডিতেরা তাহার নাম রাখিয়াছেন ডাইনোথীরিয়ম, অর্থাৎ ভয়ানক জন্তু। ছবিখানি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, অন্তত চেহারায় জন্তুটা নিতান্তই ভয়ানক। এত বড় স্থলচর জন্তু পৃথিবীতে বেশি হয় নাই। এই জন্তুর একটা মাথা পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রায় তিন হাত লম্বা, আর দুই হাতেরও বেশি চওড়া। ইহার দাঁত দুটা কেমন অদ্ভুত ছিল দেখ। এরকম দাঁত দিয়া উহার কি কাজ হইত বলা কঠিন। উহা দ্বারা গুঁতাইবার সুবিধা খুব কমই দেখা যাইতেছে। তবে, গাছের পাতা খাইবার সময় শুঁড় দিয়া বড়-বড় ডাল বাঁকাইয়া ঐ দাঁতের দ্বারা তাহা আটকাইয়া রাখার সুবিধাটা বেশ ছিল বোধ হয়। তাহা ছাড়া এখনকার মহিষগুলির ন্যায় এই জন্তুও হয়ত জলে পড়িয়া থাকিতে ভালবাসিত। ওরূপ অবস্থায় ঘুম পাইলে দাঁতগুলিকে কোন জিনিসে আটকাইয়া নিদ্রা যাওয়া মন্দ ছিল না। নহিলে স্রোতে ভাসাইয়া নেওয়া আশ্চর্য কি? যাহা হউক, নামটি এবং চেহারাটি ভয়ানক হইলেও ইহার স্বভাব হিংস্র ছিল না। গাছপালাই ইহার একমাত্র আহার ছিল।

হেস্পারর্নিস ইকথিয়র্নিস

সেকালের পাখি

ম্যাস্টোডন নামক আর এক প্রকারের জন্তু ছিল, তাহার চেহারা অনেকটা হাতিরই মতন। কিন্তু তাহার শরীরের গঠন একটু লম্বাটে ধরনের, আর পাগুলি মোটা মোটা ছিল। আজকালকার হাতির দুইটা দাঁত, কিন্তু অনেক ম্যাস্টোডনের চারিটা দাঁত হইত। দুটা উপরে,
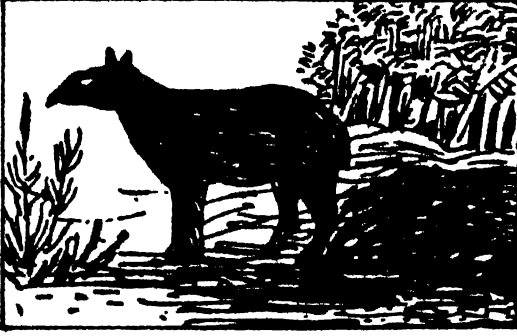
প্যালিয়োথীরিযম
টেপির জাতীয় নিরামিষভোজী সেকালেব জন্তু

দুটা নীচে। জন্তুটি বৃদ্ধ হইলে অনেক সময় তাহার নীচের দাঁত পড়িয়া যাইত।

আমেরিকায় বিস্তর ম্যাস্টোডন ছিল। এখনো সেখানকার একজাতীয় অসভ্য লোকদিগের মধ্যে এমন সব গল্প চলিত আছে যে, তাহা শুনিলে বোধ হয়, তাহাদের পূর্বপুরুষেরা ম্যাস্টোডন দেখিয়াছে। ম্যাস্টোডনের হাড়কে তাহারা বলে, 'ষাঁড়ের বাপের হাড়।' তাহাদের বিশ্বাস যে, 'ষাঁড়ের বাপটা' একটা ভারি ভয়ঙ্কর জন্তু ছিল; আর তখন পৃথিবীতে তেমনি বড় বড় মানুষও ছিল। মহাপুরুষ তাঁহার বজ্র দিয়া তাহাদের সকলকে মারিয়া ফেলেন। একদল ষাঁড়ের বাপ জুটিয়া মানুষের পোষা হরিণ, মহিষ ইত্যাদি জন্তুকে মারিয়া ফেলিতেছিল। মহাপুরুষ তাঁহার বজ্র দিয়া তাহাদের আর সকলকেই মারিয়া ফেলিলেন, খালি পালের গোদাটাকে মারিতে পারিলেন না। সে তাঁহার বজ্র ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল। শেষে পাঁজরে বজ্রের ঘা খাইয়া বড় বড় হ্রদের দিকে পলাইয়া গেল। সেখানে সে আজও আছে।

আর এক রকমের হাতি ছিল, তাহার নাম ম্যামথ্। ইউরোপ এবং এশিয়ার অনেক স্থানে ম্যামথের দাঁত এবং হাড় পাওয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, এই সকল দাঁত কুড়াইয়া এখনো অনেক লোকে ব্যবসায় চালাইতেছে। ম্যামথ্ হাতির মত বড় হইত। সাইবেরিয়ায় এখনো অনেক ম্যামথের দেহ পাওয়া যায়। জন্তু মরিবার সময় বরফ চাপা পড়িলে, যতদিন না সেই বরফ গলিয়া যায় ততদিন সেই জন্তু পচে না। সাইবেরিয়ায় শীত খুব বেশি। সেখানে এত বরফ পড়ে যে, অনেক স্থলেই সেই প্রাচীনকাল হইতে তিন চারিশত ফুট উঁচু হইয়া বরফ পড়িয়া আছে, আজও তাহা গলে নাই। এইসকল বরফের মধ্যে অনেক সময় মরা ম্যামথ্ পাওয়া যায়। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে যে ম্যামথ্ (হয়ত বরফ চাপা পড়িয়া) মরিয়াছিল, তাহা একটুও পচে নাই, এমনও দু-এক স্থলে দেখা গিয়াছে।

বেঙ্কেন্‌ওর্ফ নামক রুশিয়া দেশীয় ইঞ্জিনীয়ার ১৮৪৬ সালে ইন্দিগার্কা নদীতে এইরূপ একটা ম্যামথ্ পাইয়াছিলেন এই ম্যামথ্‌টা ১৩ ফুট উঁচু আর ১৫ ফুট লম্বা ছিল। এক একটা দাঁত ৮ ফুট লম্বা, শুঁড় ৬ ফুট লম্বা। লেজ আর কানে লোম নাই, তাহা ছাড়া সমস্ত শরীরে লোম। পিঠে আর কাঁধে এক ফুট লম্বা মোটা মোটা কেশরের মতন লোম। সেই মোটা লোমের নীচে খুব ঘন মোলায়েম পশম। লেজের আগায় একগোছা লোম ছিল। জন্তুটার চেহারাটা দেখিতে বড়ই বিকট। হাতির চেহারা তাহার কাছে কিছুই নয়।

মরিবার পূর্বে এই ম্যামথ্‌টা ডালপালা দিয়া জলযোগ করিয়াছিল। এতদিন পরে তাহার পেট চিরিয়া সেই সমস্ত ডালপালা পাওয়া গেল। তাহার অধিকাংশই একপ্রকার ঝাউগাছের ডাল ও পাতা। সেরকম গাছ আজও ঐ সকল স্থানে জন্মায়।

ম্যামথ্ যে মানুষের সময় পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল, তাহাতে আর কোন ভুল নাই। প্রাচীনকালের মানুষ আর ম্যামথের চিহ্ন একত্রে পাওয়া যায়। ম্যামথের দাঁতে প্রাচীনকালের চিত্রকর ম্যামথের ছবি আঁকিয়াছিল; সেই ছবিসুদ্ধ সেই দাঁত পাওয়া গিয়াছে। আমরা এই আশ্চর্য ছবির নমুনা দিলাম। ইহা অপেক্ষা পুরাতন ছবি পৃথিবীতে নাই। তখনকার মানুষ ধাতুর জিনিস প্রস্তুত করিতে জানিত না; পাথরের কুচি দিয়া অস্ত্রের কাজ চালাইত। বোধহয় ঐ পাথরের কুচির আঁচড় দিয়াই এই ছবিটি আঁকিয়াছিল। এমত অবস্থায় ছবিটি এমন মন্দই বা কি হইয়াছে! আর, ভাল হউক আর মন্দ হউক, উহা তো ম্যামথেরই চেহারা। চিত্রকর ম্যামথ্ না দেখিয়া কখনই তাহা আঁকিতে পারে নাই, এ কথা নিশ্চয়।

ডাইনোথীরিয়ম
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হস্তী

আমাদের দেশে অনেক প্রকারের হাতি ছিল, তাহার একটির নাম টিগোডন্ গণেশ। এই হাতির একটি মাথা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দাঁতসুদ্ধ চৌদ্দ ফুট লম্বা। এক একটি দাঁত সাড়ে দশ ফুট লম্বা।

আর একটি জন্তু আমাদের দেশে ছিল, তাহার নাম শিবথীরিয়ম্ (শিবের জন্তু)। এই জন্তু হরিণ আর জিরাফের মাঝামাঝি। ইহার চারিটি শিং ছিল। আকৃতি গণ্ডার অপেক্ষাও বড়।

আমাদের দেশে একপ্রকারের অতি বৃহৎ কচ্ছপ ছিল; তাহার একটা খোলা তোমাদের অনেকেই কলিকাতার জাদুঘরে দেখিয়া থাকিবে। এই খোলা দশ ফুট লম্বা আর তাহার উপযুক্তরূপ উঁচু এবং চওড়া। ইহার ভিতরে তিন-চারিজন লোক অনায়াসে ঢুকিয়া থাকিতে পারে। পুরাতন ভ্রমণ-বৃত্তান্তের পুস্তকে এমন একটা দেশের উল্লেখ দেখা যায় যে, সেখানকার লোকেরা এক একখানা আস্ত কচ্ছপের খোলা দিয়া ঘরের চাল প্রস্তুত করিত। এ সকল গল্প সত্য কি মিথ্যা বলিতে পারি না। কিন্তু জাদুঘরের ঐ কচ্ছপের খোলাটা দিয়া সন্ন্যাসী-গোছের একজন লোক থাকিবার মতন একটা ঘরের চাল অনায়াসে হইতে পারে।
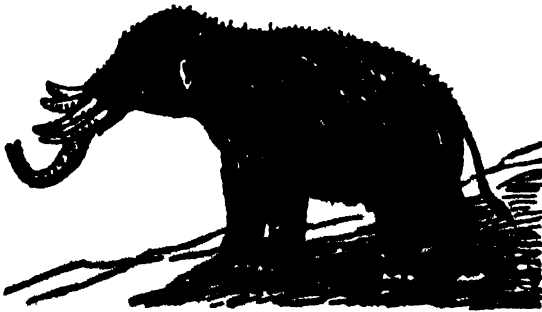
ম্যাস্টোডন
চারি দাঁতওয়ালা সেকালের হাতি

দেরাদুনের নিকট শিবলিক পর্বতে এইসকল জন্তুর হাড় পাওয়া গিয়াছে। নর্মদা নদীর ধারেও
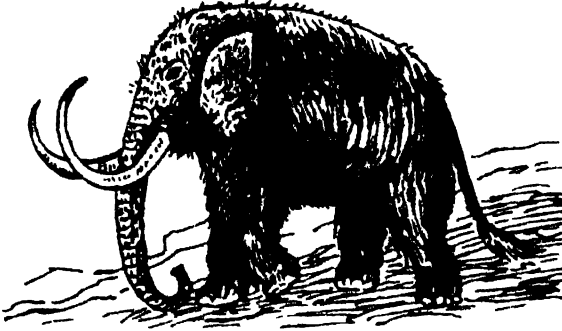
ম্যামথ

লোমওয়ালা সেকালের হাতি। এই হাতি মানুষের সময় পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল।

অনেক জন্তুর হাড় পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকায় শ্লথ্ জাতীয় কয়েকটি জন্তুর হাড় পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুটির নাম মিগাথীরিয়ম্ আর মাইলোডন্। মিগাথীরিয়ম্ শব্দের অর্থ ভয়ঙ্কর জন্তু। এই জন্তু হাতির সমান বড় হইত। লম্বায় প্রায় আঠার ফুট।

ইহার পিছনের পা, লেজ এবং কোমরের হাড় হাতির হাড়ের চাইতেই বড় আর মজবুত। ঐ সকল অঙ্গে যে উহার কত জোর ছিল, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই জন্তু গাছের পাতা খাইত। কিন্তু এত বড় জন্তুর গাছে উঠিয়া পাতা সংগ্রহ সম্ভব নহে, কাজেই সে গাছ ভাঙিয়া গাছ মারিত। বাস্তবিক এমন প্রকাণ্ড আর ষণ্ডা একটা জন্তুতে ধরিয়া টানাটানি করিলে, বড় বড় গাছও ভাঙিয়া যাইবার কথা। এই জন্তুর একটা কঙ্কাল জাদুঘরে আছে।

মাইলোডন্ মিগাথীরিয়ম্ অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল। কেহ কেহ বলেন যে মাইলোডন্ নাকি আজও জীবিত আছে। এমনকি, একদল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ইহার অনুসন্ধানে পাটাগোনিয়া দেশে গিয়াছেন। তাঁহাদের খুব আশা আছে, সেখানকার বনে অনুসন্ধান করিয়া ইহাদের দু-একটাকে ধরিয়া আনিতে পারিবেন। মাইলোডন্ শব্দের অর্থ 'জাঁতার মত দাঁত'।

নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপে মোয়া নামক একপ্রকার পক্ষীর হাড পাওয়া যায়। এই পাখি প্রায় বার-তের ফুট উঁচু হইত। দেখিতে অনেকটা উটপাখির মতন ছিল। পাখা না থাকায় উড়িবার ক্ষমতা ছিল না; লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইত। এই পাখি খুব অল্পদিন হইল লোপ পাইয়াছে। এমনকি, কোন কোন প্রাচীন ভ্রমণকারী বলেন যে, তাঁহারা উহা দেখিয়াছেন। কিন্তু আজকাল অনেক খুঁজিয়াও জীবন্ত মোয়া কেহ দেখিতে পায় না। মাদাগাস্কার দ্বীপে ইপিঅর্নিস নামক একপ্রকার পাখির হাড় আর ডিম মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহা চৌদ্দ ইঞ্চি লম্বা। তাহার ভিতরে প্রায় দেড়শত মুরগির ডিমের সমান জিনিস ধরিত।

শিবথীরিয়ম্

গণ্ডার অপেক্ষাও বৃহৎ হিমালয়বাসী সেকালের জন্তু

সেকালের জন্তু সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয় নাই। সে সকল কথা তোমরা বড় হইয়া পড়িবে। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, পৃথিবীটা বুঝি খালি আমাদের জন্যই হইয়াছিল। আশাকরি এতক্ষণে আমাদের এই ভুলটা

একটু শোধরাইতে চলিয়াছে। জলে বুড়বুড়ি উঠে, আবার তখনই তাহা জলে মিশিয়া যায়। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এ পর্যন্ত জন্তুসকল এইরূপভাবেই আসিতেছে যাইতেছে। সকলেরই দুদিনের খেলা দুদিনে ফুরাইয়াছে। এখন মানুষ যে তাহার চাইতে বেশিদিনের জন্য আসিয়াছেন, এ কথা মনে করিবার আমাদের অধিকার কি? যাহা হউক, পাঠক পাঠিকারা এ সকল কথা ভাবিয়া মন খারাপ করিবেন না। শেষে যাহাই ঘটুক আমাদের তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই। পৃথিবীর বয়সের হিসাবে যাহা দুদিন, আমাদের পক্ষে তাহা ঢের দিন। সুতরাং এখন শেষ করি।

বিবিধ প্রবন্ধ

মাকড়সা

অনেকে মাকড়সা মারাকে অবশ্য কর্তব্যকর্ম মনে করেন। 'মাকড়সা মেরো না' বলিলে তাঁহারা হয়তো চমকিয়া উঠেন। মাকড়সার পূর্বপুরুষ কেহ বড়লোক ছিল না, সুতরাং বেচারা আমাদের নিকট আদর পায় না।

মাকড়সা দেখিতে অনেকটা কাঁকড়ার মতো। পিঁপড়ে প্রভৃতির সঙ্গেও কিছু সাদৃশ্য আছে। একটা গোল আঁক দিয়া তার চারিদিকে আটখানি পা বসাইয়া দিলেই মনে করিতে পার একটি কাঁকড়া হইল। কাঁকড়ার পেছনে আর একটি গোলাকার রেখা সংযুক্ত কর মাকড়সার কাছাকাছি যাইবে! মাকড়সার মাথায় বড় পাগড়ি থাকিলে পিঁপড়ে জাতীয় পোকার মতো দেখা যাইত— তবে ঠ্যাং দুখানা বেশি হইত। মাকড়সার মুখে ভয়ানক দুটি অস্ত্র; তার দু-একটি 'চিম্‌টি' খাইলে হয়তো বড় সুবিধা বোধ করিবেন না। এই দুইটিকে মাকড়সার সাঁড়াশী (দাঁত নয়) বলা যাইতে পারে। যুদ্ধ এবং শিকারের সময় এইগুলি কাজে আসে। মাথায় বড়-বড় দুটি চোখ। তার 'আশেপাশে' খুঁজিলে ছোট-ছোট আরো চার-পাঁচটি দেখিতে পাইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর. "এত চোখ কেন?" আমি বলিব, "জানি না।"

মাকড়সার নাম লইলেই তাহার জালের কথা মনে পড়ে। জালে দুই কাজই চলে; বাড়ি করিয়া থাকা হয়, শিকারেরও সাহায্য হয়। মাকড়সার পেটের উপর গোরুর বাঁটের মতো ছোট-ছোট কয়েকটি বাঁট আছে। এই বাঁটের মুখ দিয়া একপ্রকার আঠা বাহির হয়। তাহাই বাতাসে শক্ত হইয়া দড়ির কাজ করে। এই দড়ি দিয়া জাল তৈরি হয়। এর এক-একটা এত সরু যে চোখে দেখা যায় না, তবুও বড়-বড় মাকড়সা তাহাতে ঝুলিয়া থাকে। কোনো হতভাগ্য পোকা একবার যদি মাকড়সার জালে পড়িল তবে তাহার রক্ষার সম্ভবনা অল্পই থাকে। হুড়োহুড়ি যত বেশি করে ততই গোলমাল আরো বাড়িতে থাকে। শেষে নিরুপায় হইয়া পড়ে। জালওয়ালা এতক্ষণ মধ্য হইতে শান্তভাবে চাহিয়াছিল। যেই দেখিল জোগাড়টা পাকাপাকি হইয়াছে অমনি আস্তে আস্তে কাছে আসিল। দড়ি সঙ্গেই আছে; চারিদিক উত্তমরূপে দেখিয়া অম্লান বদনে হতভাগাকে বাঁধিতে লাগিল। বাঁধা শেষ হইলে আহার। মাথা ছিঁড়িয়া শরীরের রস চুষিয়া লয়, আর কিছু খায় না; মাঝে মাঝে দুই-একটা বোলতা আসিয়া জালে পড়ে। তখন আমাদের ইনি মনে করেন আপদ গেলেই বাঁচি! বোলতা চড়্‌পড়্‌ করিয়া জালের খানিকটা ছিঁড়িয়া পালায়।

জালের কোনো অংশ ছিঁড়িয়া গেলে 'লোকটা' যত্নপূর্বক তক্ষণাৎ তাহা মেরামত করিয়া রাখে। এক জাল অকর্মণ্য হইয়া গেলে আর-একটা করিয়া লয়। এরূপে দড়ির পুঁজি ফুরাইয়া যায়। তখন প্রতিবেশী কেহ থাকিলে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার জাল দখল করে। অন্যের জাল নিকটে না থাকিলে কি করে? গোল্‌ডস্মিথ সাহেবের মনেও এই প্রশ্ন হইয়াছিল। তিনি একটা মাকড়সার পেছনে লাগিলেন। সে তাঁহার থাকিবার ঘরেই বাড়ি করিয়াছিল। তিনি তাহার সমস্ত জাল ভাঙ্গিয়া তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সে বারবার জাল গড়িতে লাগিল, সাহেবও ভাঙ্গিতে ত্রুটি করিলেন না। একটা পোকার পেটে আর কত দড়ি

থাকে! ভালোমানুষ নিরূপায় ভাবিয়া অগত্যা নিকটস্থ জাল দেখিতে গেল। জালের কর্তা 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া প্রচন্ড লড়াই করিলেন। কিন্তু সাহেবের মাকড়সারই জয় হইল। সাহেব ইহা দেখিয়া ঘরের সমস্ত জাল ছিঁড়িয়া দিলেন। এবার বেচারা বড় বিপদে পড়িল। কিন্তু ছোট জন্তু বলিয়া বুদ্ধি কম নয়। সাহেবের কাগজপত্রের মধ্যেই বাড়ি করিল। ক্ষুধা হইলে এ জায়গায় মড়ার মতো পড়িয়া থাকিত, কোনো পোকা কাছে আসিলেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিত।

মাকড়সা খায় কি? এ কথায় উত্তর আমি তত সহজে দিতে পারিতেছি না। আমি এ পর্যন্ত এমন কিছু দেখি নাই যাহা পাইলে সে খুশি না হয়। জালে যাহাই পড়ুক না, নড়িলে চড়িলেই হইল; কি পড়িয়াছে কে খোঁজ লয়? মশা মাছির ত কথাই নাই, ক্ষুধার সময় স্বজাতীয় দুই-একটি হইলেও চলে। কেহ কেহ ছোট-ছোট পাখি ধরিয়া খান।

সকলের বড় যে মাকড়সা তাহাব নাম 'টরান্টুলা।' এই জাতীয় মাকড়সাই নাকি পাখি ধরিয়া খায়। এক সাহেব একবার তিনটি টরান্টুলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনটিকেই এক খাঁচায় (খাঁচায় থাকিবার যোগ্যও বটে, এক-একটা যে বড়!) বাখা হইল। প্রথম প্রথম কয়েকদিন তাহারা কিছুই খাইল না। তারপর কয়েক খন্ড মাংস চাটিয়া যেন তাহাদের ক্ষুধা বাড়িয়া গেল। তখন একটা আর দুইটাকে ধরিয়া খাইযা ফেলিল। শেষটি আনিযা সাহেব বিলাতের প্রাণীশালায় উপহার ছিলেন। সেখানে তাহাকে ছোট-ছোট ইঁদুর খাইতে দেওয়া হইত। প্রথম প্রথম ইঁদুরটির কিছুই ফেলা হইত না, শেষটা যেন টবান্টুলা মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে ইঁদুরের অভাব হইবে না। তখন থেকে কেবল মাথাটি খাইতে লাগিলেন।

গায়ের কাপড় ময়লা হইলে আমারা ধোপার নিকট দিই. মাকডসাব ধোপা নাই, কিন্তু সেও একটা খোলস পুরানো হইলে সেটাকে বদলাইয়া ফেলে। তোমরা অনেক সময় দেখিয়াছ মরা মাকড়সাটা হাত পা কোঁকড়াইয়া জালে ঝুলিতেছে—বাস্তবিক হয়তো সেটা মাকড়সার খোলসমাত্র। এক-একটি খোলস এত পরিপাটি যে চিনিবার জো নাই। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমগুলি পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাইতেছে।

মাকড়সার বড় বুদ্ধি। একটি বাড়ির বারান্দায় একটা মাকড়সা জাল পাতিয়াছিল। বাতাস আসিলেই জালের নীচের দিকটা উঠিয়া আসিত;বেচারা বড় জ্বালাতন হইত। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে একখানা ছোট লাঠি টানাটানি করিয়া লইয়া আসিল। বাসায় আসিবার সময় সেই লাঠিখানা জালে ঝুলাইয়া দিত; তাহাতে নঙ্গরের কাজ হইত।

মাকড়সার জালে বড় পোকা পড়িলে দড়ি কাটিয়া তাহার যাইবার সহায়তা করে।

একপ্রকার মাকড়সা আছে, তাহারা মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া ঘর বাঁধে। ভিতরে সাটিনের মতো মসৃণ। দেখিতে কাবুলী মেওয়া-ওয়ালাদের টুপির মতো ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছে। একটি দরজাও আছে। দরজাটি মুখে এমন সুন্দরভাবে লাগে যে ভিতর হইতে ঠেলিয়া না দিলে খোলা যায় না। দরজার গায়ে ছোট-ছোট ছিদ্র আছে তাহাতে নখ দিয়া ভিতর হইতে ধরিয়া রাখে। দরজার বাহিরের দিকে মাটি মাখাইয়া এমন করিয়া রাখে যে সহসা চেনা যায় না।

মাকড়সার প্রস্তাব আমরা শেষ করিলাম। ভরসা করি তোমরা আর মাকড়সা দেখিলেই মারিতে যাইবে না।

একটি অন্ধ সীলের[১] কথা

সে প্রায় চল্লিশ বছরের কথা। ব্লু উপসাগরে একটি সীলের ছানা ধরা পড়ে। সমুদ্রের ধারেই একটি ভদ্রলোক থাকিতেন, তিনি তাকে তাঁর রান্নাঘরে পুষিতে লাগিলেন। সে খুব বাড়িতে লাগিল; চাকরদের সঙ্গে তাহার খুব ভাব, বাড়ির এবং লোকের প্রতি বেশ মমতা। স্বভাবটি অতি মৃদু, কারুর কিছু ক্ষতি করে না, ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে, আর কর্তার ডাক শুনলেই কাছে হাজির হয়। তার প্রভুভক্তির কথা বলিতে হইলে বুড়ো বলিতেন 'যেমন কুকুরটি;' আর আমোদ তামাশার কথা বলিতে হইলে বলিতেন 'যেমন বিড়ালছানাটি।'

সীলটি রোজ মাছ ধরিতে যাইত, আর নিজের জোগাড় হইলে পর প্রায়ই কর্তার জন্য দু-একটি মাছ আনিত। গ্রীষ্মের সময় রৌদ্রে বসিয়া থাকিত আর শীতের সময় ঘরের আগুনের এক পাশে একটা জায়গা পাইলে বড় খুশি হইত। আর হুকুম পাইলে তুন্দুরটার[২] ভিতর যাইয়া বাসা লইত।

বারো বছর এইরূপে সীলটিকে পোষা হইল। এরপর একবার কর্তার 'গোয়ালে' একপ্রকার রোগ দেখা দিল। কতকগুলি পশু মরিয়া গেল; অন্যান্য পশুদের রোগ ধরিল। অন্যলোকের গোরু স্থান পরিবর্তনে ভালো হয়; কিন্তু কর্তার গোরুর তাহা হইল না। কর্তা একটি স্ত্রী-ওঝার নিকট পরামর্শ লইলেন। সে বলিল 'ওগো! তুমি ওটা কি ধরে এনেছো, তাতেই তোমার গোরু মরে যায়। ওটাকে তাড়িয়ে দাও নৈলে আমার ওষুধেও ধরবে না, রোগও সারবে না।' সুতরাং সীলটিকে একটি নৌকায় তুলিয়া অনেক দূরে গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, সেখানে তার যা খুশি তাই করুক। নৌকা ফিরিয়া আসিল; বাড়ির সকলে ঘুমাইল। সকালে একটি চাকরানী আসিয়া কর্তাকে খবর দিল 'সীল তুন্দুরের ভিতরে শুয়ে আছে।' বাড়ির মায়ায় বেচারা রাত্রি করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। একটি জানালা খোলা পাইয়া ঘরে ঢুকিয়া তাহার জায়গা দখল করিয়া বসিয়াছে।

পরদিন আর একটি গোরুর ব্যারাম হইল। সীলটাকে আর রাখা হইল না। অনেক দূর হইতে জেলে-নৌকা মাছ লইয়া আসিয়াছিল, তাহার মাঝি দু-তিন দিনের পথ লইয়া গিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার পাইল। তাহাই করা হইল। একদিন একরাত্রি গেল। পরদিন সন্ধ্যার সময় চাকর আগুন উস্কিয়া দিতেছিল, এমন সময় দরজার কাছে খট্‌মট্ শব্দ হইল। চাকর মনে করিল কুকুরটা বুঝি; অমনি দরজা খুলিয়া দিল—আর থপ্‌থপ্ করিয়া সীলটা ঘরে আসিল। অনেক পথ হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া বাড়ি আসিয়াছে তাই একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ করিয়া মনের সন্তোষ জানাইল, তারপর হাত-পা ছড়াইয়া আগুনের কাছে সুখে নিদ্রা গেল।

এই অমঙ্গলের খবর কর্তার কানে গেল। কর্তা বিপদ ভাবিয়া 'জান'কে জাগাইয়া পরামর্শ চাহিলেন। জান বলিল, 'সীল মার্‌লে অশুভ হয়, তবে' চোখ দুটো খুঁড়ে ফের সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এসো।" কর্তার বুদ্ধি চড়ায় ঠেকিয়াছে, কর্তা তাহাতেই রাজি। নিষ্ঠুরেরা সেই নির্দোষ

১. প্রাণীবৃত্তান্তে সীলের বাঙ্গালা মকর লেখা হইয়াছে, আমাদের বড় ভালো না লাগাতে, আমরা 'সীল'ই রাখিলাম।

২. রুটি প্রস্তুত করিবার বড় উনুনকে 'তন্দুর' বলে।

বেচারার চক্ষু দুটি নষ্ট করিয়া ফেলিল। পরদিন সকালে বেচারা যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে এরূপ অবস্থায় তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইল।

এক সপ্তাহ কাল গেল। কর্তার অমঙ্গল যেন জো পাইল। গোরু ক্রমাগত মরিতে লাগিল। শেষটা ওঝা আসিয়া বলিলেনস, "ওগো আমি আর পারি নে। তোমায় বড় ভূতে পেয়েছে; আমার আর সাধ্যি নেই।"

আটদিনের দিন ভয়ানক তুফান হইল। মাঝে মাঝে বিরামের সময় দরজার নিকট কান্নার শব্দের মতো শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। সকালে দরজা খোলা হইল। সিঁড়ির উপর সীলটি মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

শেয়ালের গল্প

মানুষের মধ্যে নাপিত যেমন, পাখির মধ্যে কাক যেমন, দেবতাদের মধ্যে নারদ মুনিঠাকুর যেমন ছিলেন, লোকে বলে জানোয়াবদের মধ্যে শেয়াল তেমন। শেয়াল পণ্ডিত ;সেকালে তাহার কত প্রতাপই ছিল। কুমিরের সাত ছেলে; শুনিয়াছি সবগুলিকে নাকি শেয়ালের নিকট পড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল। শেয়ালপণ্ডিতও স্ত্রীর সঙ্গে যুক্তি করিয়া সাতদিনে সাতটার সদ্‌গতি করিয়াছিল। তারপর কি হইল সকলেই জানে। কিন্তু পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এখন আর শেয়ালের সেদিন নাই। ইস্কুলে যত মাস্টারি খালি হয়, একটা শেয়ালকেও তাহাতে দরখাস্ত পাঠাইতে শুনি না। কত শক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, এখন আর তাহাব মীমাংসার জন্য শেয়ালের কাছে যাওয়া হয় না। তবুও শেয়ালের যাহা আছে তাহাতে নাম রক্ষার কাজ চলে।

শুনিয়াছি শেয়াল কুকুরের জাতি। হইতেও পারে; নহিলে তাহাদের মধ্যে এত শত্রুতা কেন? তা ছাড়া অনেক সময়-কুকুর ঠিক শেয়ালের মতন ডাকিতে পারে; শেয়ালও মাঝে মাঝে কুকুরের ভাষায় আলাপ করিয়া থাকে। শেয়ালের ডাক সম্বন্ধে অনেকে কথা কহিয়া থাকেন। অনেকে ঐ ডাকের অর্থ বেশ বুঝিতে পাবেন। আমি বহু অনুসন্ধানে তিনপ্রকারের ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিয়াছি ঃ—

১. প্রথম শেয়ালের পায়ে কাঁটা ফুটিল। সে কাঁদিল—"উ !আ!" দূর হইতে অন্য শেয়াল জিজ্ঞাসা করিল "ক্যা হুয়া?" গোলমাল শুনিয়া অন্যেরা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "ক্যা-ক্যা-ক্যা-ক্যা হুয়া?" তারপর সকলে মিলিয়া কতক্ষণ "আহা" "আহা" করিল; শেষে আহত শেয়ালকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিল যে, "হুয়া তো হুয়া!"

২. প্রথম শেয়াল বলিল, "আরে ওয়া? হা হা-হা!" দ্বিতীয় শেয়াল জিজ্ঞাসা করিল, "ক্যা হুয়া?" উত্তর হইল, "মৈ রাজা হুয়া," শুনিয়া সকলে মিলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, "আচ্ছা হুয়া!" "আচ্ছা হুয়া!"

৩. শেয়াল অন্য জন্মে তামাকখোর ছিল। অধুনা সে-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া ভয়ানক কষ্ট পাইতেছে। তাই প্রহরে প্রহরে সেই হুঁকো যন্ত্রের কথা তাহার মনে হয়; আর বেচারা ঘন ঘন "হুক্কা" "হুক্কা" শব্দ উচ্চারণপূর্বক মনের অভাব জানায়।

প্রতি প্রহরেই শেয়াল ডাকে তাহাতেই তাহাকে যামঘোষ উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। শেয়ালের ডাক শুনিয়া এক রাজার মনে বড়ই কষ্ট হইল; তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মন্ত্রী, ওরা কি চায়?" মন্ত্রী বলিলেন, " বড় খিদে পেয়েছে কিছু খাবার চায়" অমনি হুকুম হইল দশ হাজার টাকার সন্দেশ কিনিয়া ওদের বাড়ি পাঠাইয়া দাও। ধূর্ত মন্ত্রী দশ হাজার টাকা লাভ হইল, এক প্রহর পরে আবার শেয়াল ডাকিল।" এবারে কি চায়?" "বড় শীত, গরম কাপড় চায়।" হুকুম হইল লক্ষ টাকার বনাত কিনিয়া দাও। এক প্রহর পরে আবার শেয়াল ডাকিল। "এখন কি চায়?" "বড় মশা, মশারি চায়।" আরো লক্ষ টাকা মঞ্জুর। আবার এক প্রহর পরে শেয়াল ডাকিল "এবারে কি চায়?" "এবারে কিছু চায় না, মহারাজকে আশীর্বাদ করে।" অমনি রাজা মহাসন্তুষ্ট হইয়া কোটি টাকা মূল্যের শাল মন্ত্রীকে দিয়া ফেলিলেন।

শেয়ালের একটা দুর্বলতা আছে। এক শেয়াল ডাকিলে আর গুলি চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। আমার কোনো বন্ধুর বাড়িতে একটা শেয়াল খাবার খুঁজিতে আসিয়াছিল। স্বাভাবিক ধূর্ততার সাহায্যে কেহ দেখিতে পাইবার পূর্বেই সে একটা ঘরের ভিতর যাইয়া মাচার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখানে কতক্ষণ ছিল বলা যায় না, কিন্তু সে সেখানে থাকিতে থাকিতেই জঙ্গলে একটা শেয়াল ডাকিল। অমনি আর কথা নাই, বেচারা দেশকাল সব ভুলিয়া গিয়া সেই ঘরের ভিতর হইতেই "ক্যা হুয়া" "ক্যা হুয়া" প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। প্রশ্নের উত্তর আর জঙ্গল হইতে শুনিতে হইল না। বাড়ির লোকেরা আসিয়াই সে বিষয়ে তাহার জ্ঞান পরিষ্কার করিয়া দিল।

শেয়ালের ধূর্ততা সম্বন্ধে সকলেই কিছু কিছু জানেন। আমাদের একজন চাকর একবার একটা শেয়ালকে লক্ষ্য করিয়া ইঁট ছুঁড়িয়াছিল। দৈবাৎ ইঁটটা শেয়ালের কপালে লাগিল। লাগিবামাত্রই শেয়াল 'হিক্' শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। শেয়াল মরিয়াছে শুনিয়া সকলেরই আনন্দ। তাহাকে টানিয়া উঠানে আনিয়া সকলে বৃত্তাকার তাহার চারিদিক দাঁড়াইলেন। অনেক মন্তব্য প্রকাশের পর একজন বলিলেন, "আমার সন্দেহ হয়, এটা মরে নি।" এবিষয়ে কিঞ্চিৎ তর্ক-বিতর্ক হইল, তারপর একজন বলিলেন, "এত কথায় কাজ কি, একটা লাঠি এনে দু ঘা মেরে সন্দেহ দূর করে দাও না?" এই বলিয়া তিনি লাঠি আনিতে চলিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়াতে যে একটুকু ফাঁক হইয়াছিল, শেয়ালটাও সময় বুঝিয়া সেইখান দিয়া চম্পট করিল।

এক পাদরি সাহেব পাড়াগাঁয়ে থাকিতেন। সেখানে শেয়ালের বড় অত্যাচার; তাঁহার সবগুলি মুরগি খাইয়া ফেলিত। সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া খুব শক্ত একটা কাঠের ঘর করিলেন, তাহার ভিতরে মুরগি রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া রাখা হইত। একদিন সাহেবের চাকরানী মুরগি ঘরে যাইয়া দেখে, যে একটা শেয়াল ঘরের ভিতরে আসিয়া প্রায় সবগুলি মুরগি মারিয়া ফেলিয়াছে। কেবল কয়েকটি মাত্র প্রাণভয়ে উপরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেগুলিকেও উদরসাৎ করিবার জন্য চেষ্টায় আছে। চাকরানীকে দেখিয়াই ধূর্ত শেয়াল মৃতপ্রায় হইয়া রহিল। সাহেব আসিয়া শেয়ালকে মৃতপ্রায় দেখিলেন এবং তাহার একটু আহ্লাদের বিষয় এই হইল যে, খাইতে খাইতে পেট ফাঁপিয়া শেয়ালটাও মরিয়া গিয়াছে। এখন তাহার প্রেতাত্মার উদ্দেশে ইচ্ছামতো গালিবর্ষণ করিয়া তাহাকে অনেক দূরে মাঠে ফেলিয়া দিয়া আসা হইল। যিনি ফেলিয়া দিতে গিয়াছিলেন তিনি একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন যে শেয়ালটা দৌড়িয়া পলাইতেছে!

ভোঁদড়

অনেক স্থানেই ভোঁদড় দেখিতে পাওয়া যায়। তোমাদের অনেকেই কলিকাতার পশুশালায় গিয়াছ; সেখানে একটা গোল চৌবাচ্ছায় যে কয়েকটা ভোঁদড় রাখা হইয়াছে তাহাদের কাছে দশ-পাঁচ মিনিট দাঁড়াইয়াছ কি? আমি যতদিন সেগুলিকে দেখিতে গিয়াছি, একদিনও তাহাদের কোনোটাকে স্থির হইয়া বসিতে দেখি নাই। একবার ডুব দেওয়া আর কিছুদূর গিয়া মুখ ভাসাইয়া পুনরায় ডুব দেওয়া, কাজের মধ্যে ত এই; ইহা লইয়াই বেচারারা এত ব্যস্ত যে, দেখিলে বোধহয় ঐ জলটুকুর প্রত্যেক পরমাণুর সহিত তাহাদের পরিচয় থাকার উপরই ব্রহ্মাণ্ড নির্ভর করিতেছে। তোমরা ইহা দেখিয়া হয়তো মনে করিয়াছ যে, ঐরূপ করিয়া তাহারা জলের ভিতর মাছ খোঁজে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মাছ খুঁজিতে হইলেও ঐরূপ করা সম্ভব বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময় কেবল আমোদ করিবার জন্যই ইহারা ঐরূপ করিয়া থাকে।

ভোঁদড়গুলি অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। স্বাধীন অবস্থায় তাহাদের বাসস্থানের নিকটবর্তী জলার ধারে পরিবারস্থ সকলে মিলিয়া যখন খেলা করে, তখন তাহাদিগকে দেখিলে বোধহয় যেন পৃথিবীতে তাহাদের চাইতে সুখী জীব আর নাই। আমি বন্য ভোঁদড়ের খেলা কখনো স্বচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে, তাহার চাইতে আমোদজনক দৃশ্য বড় অধিক নাই। দিনের বেলায় কিন্তু ইহারা তত মন খুলিয়া আমোদ করিতে পারে না, সূর্য অস্ত গেলেই তাহাদের আনন্দের সময় হয়। তাহাদের খেলার একটা বেশ নিয়ম আছে। প্রথমে সংগীত তারপর ব্যায়াম। কোনো কোনো সময় ব্যায়াম এবং সঙ্গীত এক কালেই চলিতে থাকে। তাহারা কোন্ রাগিনী কোন্ তাল অবলম্বন করিয়া কি গান গায়, তাহা আমি বলিতে সক্ষম নহি; তবে ব্যাপারটা কিরূপ হয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। অনেক ছেলের গান গাইবার একটা বাতিক আছে। তাহাদের গানে পৃথিবীর সকল প্রকারের রাগিনী এবং সকল প্রকারের তালই সময়ে ব্যবহার হয়। মনে কর এইরূপ কুড়িজন ছেলে তিন রাত্রি বাহিরে বসিয়া চ্যাঁচাইল, আর হিম লাগিয়া তাহাদের গলা বসিয়া গেল—এখন কথা কহিতে গেলে কেবল একটা সাঁই সাঁই শব্দ মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। এখন যদি এই কুড়িজন ছেলে রাত্রিতে নদীর ধারে কোনো নির্জন বনে গিয়া গান গায়, আর ম্যাও ম্যাও করে, আর শেয়ালের ডাক ডাকে, আর কাশে, আর নাকে কাটি দিয়া ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করিয়া হাঁচে, তবে ভোঁদড়-পরিবারের গানের নকল করিতে পারে। ইহাদের ব্যায়াম উল্টাবাজি। তোমাদের ব্যায়াম-শিক্ষক হয়তো তোমাদিগকে দুই-তিনজনে মিলিয়া মাটির উপর উল্টাবাজি করিতে হইলে কিরূপ করিতে হয় তাহা বলিয়া দিয়াছেন। না দিয়া থাকিলেও আমাদের দেশী বাজিকরদিগকে ঐরূপ করিতে অবশ্যই দেখিয়াছ। ভোঁদড়েরা কুড়ি-পঁচিশটি মিলিয়া একটা পিণ্ডের আকার ধারণপূর্বক ঐ বাজি করে। তবে তোমাদের উল্টাবাজিতে আর তাহাদের উল্টাবাজিতে একটু তফাত আছে। তোমরা সমান জমির উপর উল্টাবাজি কর, তাহারা ডাঙ্গার হইতে উল্টাবাজি করিয়া গড়াইয়া জলে পড়ে।

আমি যখন খুব ছেলেমানুষ ছিলাম, তখন আমাদের বাড়িতে একটি ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁহার বাড়ির কাছে অনেক ভোঁদড় আছে। তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে ভোঁদড়ের প্রতিহিংসা লইবার বৃত্তিটা বড় প্রবল। কাহারো উপর কোনো কারণে চটিলে তাহাকে সহজে ছাড়িয়া দিতে চাহে না। ঐ ভদ্রলোকটির মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি প্রায়ই রাত্রিতে ছোট নৌকায় উঠিয়া মাছ ধরিতে যাইতেন। একদিন নৌকায় সম্মুখে একটা ভোঁদড় দেখিতে পাইয়া তাহাকে এক খন্ড বাঁশ দিয়া গুঁতা মারিলেন। গুঁতা খাইয়া ভোঁদড়টা ক্যাঁচ্‌ম্যাচ্‌ করিয়া উঠিল; আর অমনি নৌকাব চারিধাবে কতকগুলি ভোঁদড় মাথা জাগাইল। তিনি বলিয়াছেন যে, "সৌভাগ্যের বিষয় সেখানে অনেকগুলি ভোঁদড় ছিল না, সুতরাং তাহারা নৌকা আক্রমণ করিতে সাহস পায় নাই, নতুবা সেদিন তাঁহার প্রাণ লইয়া ঘরে আসাই দায় হইত।"

ভোঁদড়েরা মাছ ধবিয়া খায়; মাছ ধরিতে ইহারা এত পটু যে, কোনো কোনো দেশের জেলেরা ইহাদের সাহায্যে মাছ ধরিয়া বিস্তর পয়সা উপার্জন করে। ভোঁদড়দের সাহায্যে মাছ ধরারটা খুব সহজ ব্যাপার মনে কবিও না। ভোঁদড় মাছ ভালো ধরিতে পারে সত্য; কিন্তু ধরিলে কি হইবে, পেটুক দুষ্টু ছেলের হাতে সন্দেশ দিলে যেরূপ হয়, অশিক্ষিত ভোঁদড়ের উপর মাছ ধরিবার ভাব দিলেও সেইরূপ হয়। ভোঁদড় মাছ পাইলেই খাইয়া ফেলে। খাইতে খাইতে পেট ভরিয়া গেলেও মাছ ধরিতে ছাড়ে না। পেট ভরিলে মাছ খায় না, কিন্তু ধরিয়া তাহাকে দাঁতে টুক্‌রা টুক্‌রা করে। সুতরাং তখন ভোঁদড় মাছ না খাইলেও ওরূপ জন্তুকে মাছ ধরিতে দিয়া মৎস্যব্যবসায়ীর লাভ অতি অল্পই হয়।

ভোঁদড়কে দিয়া মাছ ধবাইবার ইচ্ছা থাকিলে খুব ছোট ছানা ধরিয়া আনিতে হয়। সেই ছানাকে মাছ খাইতে দিবে না; কেবল নিবামিষ খাওয়াইয়া তাহাকে পুশিবে। ভোঁদড় সহজেই কুকুরের মতন পোষ মানে। কোনো জিনিস ছুঁড়িয়া ফেলিলে কুকুরের ন্যায় ভোঁদড়ও তাহা আনিয়া দিতে শিখিতে পারে। প্রথমত, তাহাকে এরূপে নানাপ্রকারের জিনিস আনিয়া দিতে শিখাইতে হয়। এই বিষয়টা খুব ভালোরূপ শিক্ষা হইলে শুক্‌নো মাছ দিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। মাছের ছালের ভিতর খড় পুরিয়া তাহা দ্বারা প্রথমত পরীক্ষা করিলে আরো ভালো হয়। শুক্‌নো মাছ আনিয়া দিতে শিক্ষা হইলে, অর্থাৎ যদি দেখ যে ভোঁদড় সেই শুক্‌নো মাছটাকে খাইয়া ফেলিবার মতো কোনো ভাব প্রকাশ না করে— তাহা হইলে তাহাকে মরা মাছ আনিতে দিবে। মরা মাছের পাঠ ভালোরূপ শিক্ষা হইলে তাহাকে নির্ভয়ে জলে ছাড়িয়া দিতে পার।

ভোঁদড়ের লোম অতি কোমল। এইজন্য অনেক লোকে ভোঁদড় মারিয়া তাহার ছাল বিক্রয় করে। সেই ছালে বড়লোকের পা রাখিবার আসন তৈয়ারি হয়; আরো অনেক জিনিস তৈয়ারি হয়।

অনেক স্থানে দেখিয়াছি নদীর পাড় ঢালু হইলে ছেলেরা তাহাকে জল দিয়া পিছল করিয়া লয়, এবং তাহার উপর দিয়া জলে পিছলাইয়া পড়িয়া খেলা করে। কানাডা দেশীয় ভোঁদড়গুলিও এই খেলা জানে। সেখানে ঢালু ও মসৃণ বরফের উপর উপুড় হইয়া ভোঁদড়গুলি খেলা করিয়া থাকে। অনেক সময় তাহারা এইরূপে চল্লিশ হাত পর্যন্ত পিছলাইয়া যায়।

গরিলা

আফ্রিকা দেশে গরিলার বাড়ি। গরিলারা বনে থাকে। সে-সকল বনে মানুষের বড় একটা চলাফেরা নাই। সভ্য লোকেরা ত সে স্থানে যাইতে চাহেনই না, সে দেশবাসী অসভ্যেরাও গরিলার ভয়ে সেই-সকল বন হইতে দূরে থাকে। শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যদিগের মধ্যে হনুমান মহাশয় যেরূপ ছিলেন, সেদেশী জন্তুদের মধ্যে গরিলাও সেইরূপ। রামায়ণে হনুমানের কথা যাহা পরিয়াছি তাহাতে তাহার উপর একপ্রকার ভালো ভাবই জন্মিয়াছে। আমি অনেক সময় ভাবিয়া থাকি যে হনুমান এত বড় লোক (থুড়ি, বড় বাঁদর) ছিলেন, কিন্তু হনুমান বলিলে আমরা এত চটি কেন? এ বিষয় হনুমান বেচারার একটু বিশেষ দুর্ভাগ্যই ছিল বলিতে হইবে, নতুবা হনুমান খাইয়াছেন বলিয়া কলার মৌখিক আদর কমিল কেন? মৌখিক বলিতেছি, কারণ খাইতে দিলে কাহারো যত্নের ত্রুটি দেখা যায় না। যাহা হউক এ বিষয়টি আমার আলোচনার সামগ্রী নহে। আমি গরিলাদের কথা বলিতেছি, তোমরা তাহাতে মনোযোগ দেও। আমি বলিতেছিলাম হনুমান খুব মহাশয় ব্যাক্তি ছিলেন, কিন্তু গরিলা এত প্রধান জীব হইলেও তাহার আচার ব্যবহারগুলি ভালো নহে।

জাতিতে হনু— নিবাস আফ্রিকা; এইদুই বিষয়ের মধ্যে বিশেষ আশাপ্রদ কিছুই নাই। এর পরেই চেহারা। এ বিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব! আমি এরূপ বলিতেছি না যে আমরা মানুষ, সুতরাং আমরা সুন্দর, আর গরিলা হনু, সুতরাং সে কুৎসিত। সুন্দরই হউক আর কুৎসিতই হউক, দেখিতে যে অত্যন্ত ভয়ানক সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গরিলা যে বনে বাস করে, সেই বনে একপ্রকার বাদাম জন্মে; এই বাদামই গরিলার প্রধান আহার। এই বাদাম এত শক্ত যে একটা হাতুড়ি দিয়া খুব জোরের সহিত ঘা না মারিলে তাহাকে ভাঙ্গা যায় না। ইহারই আধমণ ত্রিশ সের পরিমাণ অক্লেশে উদরস্থ করিয়া গরিলা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। এই বিষয়টি ভাবিলেই ইহাদের শরীরে যে কি ভয়ানক বল তাহা বুঝিতে পার। এরপর আবার তাহার স্বভাবটি। সেটি বাঘ ভল্লুকেরও অনুকরণের সামগ্রী। গরিলার দেশের লোকেরা তাহার নামেই ভয় পায়। ইহাদের উৎপাতের সম্বন্ধে বিস্তর গল্প বলা হইয়া থাকে। একবার নাকি একদল গরিলাতে আর সে দেশের কতকগুলি মানুষেতে একটা প্রকান্ড যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে গরিলারা জয়লাভ করিল এবং কতকগুলি মানুষকে ধরিয়া লইয়া গেল। কয়েকদিন পরে এই লোকগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিল; গরিলারা তাহাদের পায়ের আঙ্গুল ছিঁড়িয়া রাখিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে!

সেদেশীয় লোকের বিশ্বাস যে গরিলারা এক কালে মানুষই ছিল। কালক্রমে তাহাদের আচার-ব্যবহার অধোগামী হওয়াতে তাহারা অসভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ ঘৃণাজনক আকার পাইয়াছে।

পুরুষ গরিলার হাতে অনেক সময় একটি ছোট মুগুর থাকে। সে দেশের লোকেরা বলে যে এই মুগুর লইয়া গরিলা হাতির সহিত যুদ্ধ করে। তোমরা মনে করিতে পার যে হাতি নিরীহ ভালোমানুষ, তাহার সঙ্গে গরিলার শত্রুতা হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? কারণ

বিশেষ কিছুই নাই, কিন্তু গরিলা মনে করে যে এত বড় জানোয়ারের আহারের পর তাহার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। এই কারণেই সে হাতির উপর এত চটা। এই কারণেই সে হাতি দেখিবামাত্র লাঠি হাতে তাড়া করে। প্রাণপণে হাতির শুঁড়ের উপর একটি আঘাত করিলে আর দ্বিতীয় আঘাতের দরকার হয় না, হাতি ফ্যাঁ ফ্যাঁ শব্দ করিয়া পলায়ন করে।

সে দেশের লোকেরা হাতির হাড় খুঁজিতে মাঝে মাঝে বনে যায়। তখন তাহাদের একটি ভয় বড়ই প্রবল থাকে— পাছে জঙ্গলে কখনো একটা গরিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। গরিলা পথের ধারে গাছের পাতার ভিতরে লুকাইয়া থাকে। দৈবাৎ কোনো হতভাগ্য লোক যদি সেই পথ দিয়া যায়, তবে আর তাহার রক্ষা নাই। দুই পায়ে গাছের ডাল শক্ত করিয়া ধরিয়া মুহূর্তের মধ্যে হাত বাড়াইয়া তাহাকে গাছে তুলিয়া লয়, তাহার পরক্ষণেই দুই হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া প্রচন্ড বলের সহিত বুকের উপর চাপিয়া ধরে আর তাহার পাঁজর চূর্ণ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়।

মাঝে মাঝে কেহ কেহ গরিলা মারিতে চেষ্টা করেন। এক গুলিতে যদি গরিলা মরিল, তবে ভালোই। কিন্তু যদি গুলি খাইয়াও তাহার শরীরে প্রাণ থাকে, তবেই বিপদ। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। একবার একটা গরিলা মরিবার সময় একটা বন্দুকের নল বাঁকাইয়া এবং দাঁতে চ্যাপ্টা করিয়া ফেলিয়াছিল।

দুশেলু নামক এক সাহেব গরিলার কথা শুনিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য আফ্রিকায় গিয়াছিলেন, তিনি প্রকান্ড এক গ্রন্থে তাঁহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই পুস্তকে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প লেখা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তোমাদিগকে তাহার দুই-একটার অধিক উপহার দিতে সাহস পাইতেছি না। উইনউড্‌রীড নামক এক সাহেব দুশেলুর কিছু পরে আফ্রিকায় গিয়াছিলেন। দুশেলুর কথাগুলি কত দূর সত্য তাহা জানিবার জন্য তিনি বিস্তর অনুসন্ধান করেন। দুশেলুর পুস্তকে যে-সকল লোকের উল্লেখ আছে, তিনি তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাহাদের সহিত এ সম্বন্ধে অনেক আলাপ করেন;তাহাতে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, দুশেলুর সকল কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। রীড সাহেব গরিলার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া তারপর গরিলা সম্বন্ধে দুই-একটি গল্প বলিয়া আমরা শেষ করিব।

দুশেলু সাহেব নিম্নলিখিত গল্পটি বলিয়াছেন—'আমরা একটা অন্ধকারময় উপত্যকার দিকে চলিলাম। গ্যাম্বো (দুশেলুর আফ্রিকা দেশীয় ভৃত্য) বলিয়াছিল, সেখানে শিকার (গরিলা) মিলিবে। আমাদের দলের লোকেরা পৃথক হইয়া চলিল। গ্যাম্বো আর আমি একত্র থাকিলাম।একজন সাহসী লোক একা একদিক-পানে চলিল, সে মনে করিয়াছিল সেই দিকে গেলে গরিলা পাওয়া যাইবে। অবশিষ্ট তিনজন অন্য-একদিকে চলিল। এইরূপে পৃথক হইয়া আমরা একঘন্টা কাল ছিলাম, এমন সময়ে গ্যাম্বো আর আমি আমাদের অতি অল্প দূরে একটা বন্দুকের শব্দ শুনিলাম। তার পরক্ষণেই আর-একটা আওয়াজ হইল। আমরা অবিলম্বে সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিলাম;আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, একটা মরা গরিলা দেখিতে পাইব। এই সময়ে ভয়ানক শব্দে বন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গ্যাম্বো অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আমার বাহু ধরিল। আমরা খুব তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম, মনে অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। বেশি দূর যাইতে না যাইতেই দেখিলাম, আমরা যাহা ভয় করিতেছিলাম তাহাই

হইয়াছে। যে বেচারা সাহস করিয়া একাকী চলিয়া গিয়াছিল, তাহাকে সেই স্থানে পতিত দেখিলাম। তাহার রক্তে সেই স্থান ভাসিয়া যাইতেছিল। প্রথমে বোধ হইয়াছিল যেন তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার নাড়িভুঁড়ি পেট ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পাশেই বন্দুকটা পড়িয়া আছে—বন্দুকের কাঠের অংশটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নলটা চ্যাপ্টা হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। গরিলার দাঁতের দাগ তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আমরা তাহাকে তুলিলাম। আমার কাপড় ছিঁড়িয়া তাহার ঘায়ে পটি বাঁধিয়া দিলাম। একটু ব্রান্ডি খাইতে দিলে পর তাহার চৈতন্য হইল—অতি কষ্টে সে কথা কহিতে লাগিল। সে বলিল যে হঠাৎ সে গরিলাটার সামনে পড়িয়া গিয়াছিল; তখন সেটা পলাইতে চেষ্টা করে নাই। সেটা একটা মস্ত পুরুষ গরিলা; দেখিতে ভয়ানক হিংস্র বলিয়া বোধ হইল। জঙ্গলের সে স্থানটা অন্ধকার ছিল, বোধহয় অন্ধকারের জন্য তাহার লক্ষ্য ঠিক হয় নাই। সে বলিল যে সে খুব মনোযোগপূর্বক সন্ধান করিয়াছিল, এবং কেবলমাত্র আটফিট দূর হইতে গুলি করিয়াছিল। গুলিটা এক পাশে লাগিয়াছিল। গুলি খাইয়াই সেটা বুক চাপড়াইতে লাগিল আর ভয়ানক রাগিয়া তাহার দিকে আসিতে লাগিল। দৌড়িয়া পালানো তখন অসম্ভব, দশ পা যাইবার পূর্বেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। সে দাঁড়াইয়া রহিল, এবং যত শীঘ্র সম্ভব পুনরায় বন্দুক ভরিল। পুনরায় গুলি করিবার জন্য যেই সে বন্দুক উঠাইতেছিল, অমনি গরিলাটা তাহার হাত হইতে সেটাকে কাড়িয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। পড়িবার সময় সেটা ছুটিয়া গেল। তারপব ভয়ানক শব্দ করিয়া সেই জানোয়ারটা তাহার পেটে আঘাত করিল। সেই আঘাতেই পেট কাটিয়া নাড়িভুঁড়ির কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। রক্তাক্ত শরীরে সে মাটিতে পড়িয়া গেল। গরিলাটা তাহাকে ছাড়িয়া বন্দুকটা ধরিল ইহা দেখিয়া সে বেচাবা মনে করিল যে বুঝি বন্দুক দিয়া তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে। কিন্তু গরিলা বোধহয় সেটাকেও শত্রু মনে করিয়াছিল—সুতরাং সে তাহাকে দাঁতে চিবাইয়া চ্যাপ্টা করিয়া দিল।'

আর-এক স্থানে তিনি বলিযাছেন—"আমরা নিঃশব্দে যাইতেছিলাম, হঠাৎ একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর তখনই একটা স্ত্রী-গরিলাকে দেখিলাম। একটি অতি শিশু গরিলা তাহার বুকে ঝুলিয়া দুধ খাইতেছে। মাতা তাহার পিঠ চাপড়াইতেছিল আর স্নেহেব সহিত তাহাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। দেখিয়া আমার এত ভালো বোধ হইল এবং আমাব প্রাণে এত লাগিল যে, আমি সহসা গুলি করিতে চাহিলাম না। আমি ইতস্তত করিতেছি, এমন সময় আমার সঙ্গের একজন শিকারী তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল, সেটা অমনি পড়িয়া গেল। মাতা পড়িয়া গেলে ছানাটি তাহাকে জড়াইয়া ধরিল আর চিৎকার করিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিল। আমি সেই স্থানে গেলাম। আমাকে দেখিয়া বেচারা তাহার মায়ের বুকে মাথা লুকাইল। ছানাটি চলিতেও পারিত না; কামড়াইতেও শিখে নাই; সুতরাং আমরা সহজেই তাহাকে ধরিতে পারিলাম। আমি সেটিকে লইয়া চলিলাম; সঙ্গের লোকেরা তাহার মায়ের শরীরটা বাঁশে করিয়া বহিয়া আনিল। যখন আমরা গ্রামে আসিলাম, তখন আর-এক দৃশ্য দেখা গেল। লোকেরা মরা গরিলাটাকে মাটিতে রাখিল, আমি ছানাটিকে কাছে রাখিলাম। তাহার মাকে দেখিবামাত্র সে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কাছে গেল এবং দুধ খাইতে চেষ্টা করিল। দুধ না পাইয়া হয়তো মনে করিল যে একটা কিছু হইয়াছে।" তখন সে অতিশয় দুঃখের সহিত হূ হূ হূ! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, আমার প্রাণে বড়ই দুঃখ

হইল। সে দুধ ছাড়া আর কিছুই খাইতে পারিত না, আমিও দুধের জোগাড় করিতে পারিলাম না। সুতরাং দুইদিন পরে বেচারা মরিয়া গেল।” পশুদের প্রতি কি নির্দয় ব্যবহার! পাঠক-পাঠিকা শুনিয়া হয়ত তোমাদের মনে ঘৃণা জন্মিবারই কথা।

মশা

আমরা ছেলেবেলায় মশার বাসা খুঁজিতে যাইতাম। ঢেঁকি গাছে মশা বাসা করে এই আমাদের বিশ্বাস ছিল। লাল রঙের একপ্রকার বড় পিঁপড়ে যেমন গাছের পাতা দিয়া বাসা প্রস্তুত করে, ঢেঁকি গাছে সেই রূপ অতি ক্ষুদ্র বাসা পাওয়া যায়। এগুলি কিসের বাসা তাহা আমি আজিও জানিতে পারি নাই, কিন্তু আমার ছেলেবেলায় এই সংস্কার ছিল যে, এগুলি মশার বাসা বই আর কিছুই নহে। বাস্তবিক এই সকল বাসার প্রায় প্রত্যেকটিতে এক-একটি করিয়া মশা পাওয়া যায়।

যে-সকল মশা আমাদের রক্ত খাইতে আইসে তাহারা সকলেই স্ত্রী-মশা। পুরুষ-মশা নিরীহ লোক; সে ফুলের মধু খাইয়া জীবন ধারণ করে। উহাদের স্ত্রী পুরুষের মুখের গঠনেরও কতকটা তফাত আছে।

ডিম পাড়িবার সময় হইলে স্ত্রী-মশা উপযুক্ত একটি জলাশয় খুঁজিয়া লয়। নির্জন পুকুরগুলি এই কার্যের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু তিন-চারদিন ধরিয়া ঝি যে জলের হাঁড়ি ঘরের কোনে রাখিয়া দিয়াছে, তাহার খোঁজ পাইলেও মশার মা নিতান্ত দুঃখিত হইবে না। একেবারে অনেকগুলি ডিম পাড়া হইবে। পেছনের দুইখানি পায়ের সাহায্যে ডিমগুলিকে একত্র করিয়া একটি ক্ষুদ্র নৌকার আকারে সাজানো হইবে;এই নৌকাটি জলে ছাড়িয়া দিলেই সে ভাসিতে থাকিবে। ডিমের সরু দিকটা উপরে থাকে, সুতরাং কিরূপে নৌকার আকার হয় তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। উপযুক্ত সময় হইলেই ডিম ফুটিয়া মশার ছানা বাহির হয়। এই সময়ে এগুলিকে দেখিলে কেহই মনে করিতে পারে না যে, ইহারাই কালে মশা হইয়া মানুষ খাইতে আসিবে। তোমরা নিশ্চয়ই গরমের দিনে স্থির জলে মশার ছানাগুলিকে তিড়িং তিড়িং করিয়া নাচিতে দেখিয়াছ; কিন্তু তাহাদিগকে চিনিতে পার নাই। ডিম হইতে বাহির হইয়া ইহারা জলে খেলা করিতে থাকে। ঝি অনেক সময় না দেখিয়া খাবার জলের সহিত গেলাস করিয়া যে কতগুলি পোকা আনিয়া দেয় তাহা এই মশার ছানা। ইহাদের নিশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র ল্যাজের কাছে। নিশ্বাস ফেলিবার সময় ল্যাজের অগ্রভাগটি জলের উপরে ভাসাইয়া দিয়া ঝুলিতে থাকে। চোয়ালে একপ্রকার লোম আছে, সেই লোমগুলি কেমন করিয়া যেন জলের উপর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আবর্ত প্রস্তুত করে। সেই আবর্তে ঘুরিয়া নানারকমের খাদ্যাখাদ্য আসিয়া মুখের ভিতর পড়ে। মশার ছানা এই উপায়ে জীবন ধারণ করে।

তিনবার চর্ম পরিবর্তনের পর ইহার আর-এক প্রকারের আকার ধারণ করে, তাহাতে মশার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি মোটামুটি সকলই বর্তমান থাকে। কিছুকাল পরে পূর্ণাবয়ব মশা ইহার ভিতর হইতে বাহির হয়। খোলসটা জলের উপর ভাসিতে থাকে; মশা তাহারই উপর বসিয়া উড়িবার জন্য যথেষ্ট বল লাভের অপেক্ষা করে। অল্পক্ষণ রোদ বাতাস লাগিলেই

তাহার হাত-পা শক্ত হয়। তখন সে শূন্যে উড়িয়া অপরাপর সঙ্গীদের সহিত খেলা করে।

মশাগুলি বড় লোভী। গায়ে বসিবামাত্রই যদি তাহাকে তাড়াইয়া না দেও তবে সে আস্তে আস্তে শুঁড়টি চামড়ার ভিতর ঢুকাইয়া দিবে। রক্ত খাইতে খাইতে সে এতই আরাম পায় যে শেষে আর তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না-আমরা এত খাইলে বোধহয় খবরের কাগজওয়ালারা এতদিন আমাদের নাম ছাপিয়া দিত। যখন গায়ে বসে, তখন দেখিবে যে, তাহার শরীরটি ছুঁচের অগ্রভাগের ন্যায় সরু। ক্ষুধায় তাহার এই দশা হইয়াছে;কিন্তু কিছুকাল তাহাকে খাইতে দাও, দেখিবে শীঘ্রই সে ফুলিয়া উঠিবে, তাহার পেটটি লাল হইয়া আসিবে। এই সময়ে তাহার দুই পাশে আঙুল দিয়া চাপিয়া সেই স্থানের চামড়া টান করিয়া ধরিলেই সে আটকিয়া পড়ে। শুঁড়টি ঢুকাইবার জন্য যে ফুটো করিতে হইয়াছিল টান করিয়া ধরিলে সেই ফুটো সরু হইয়া যায়। সুতরাং শুঁড় আর বাহির হইতে পারে না। রাত্রিকালে মশারির ভিতরে দুই-একটি মশা জোগাড়যন্ত্র করিয়া প্রায়ই ঢুকিয়া যায়। সকালবেলা আর তাহারা উদর লইয়া চলিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় অনেক মশাকে ধরিয়া টিপিয়া মারা গিয়াছে।

একটি গল্প বলিয়া শেষ করিতেছি। গল্পটি বোধহয় সত্য নহে, কিন্তু ইহাতে মজা আছে। কতকগুলি আইরিস সাহেব একবার এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনো মশা দেখেন নাই, সুতরাং প্রথমে মশারি কিনেন নাই। রাত্রিতে শুইযাই বুঝিতে পারিলেন যে এদেশের কান্ডকারখানা অন্যরকম। অনেক ধমকাইলেন, অনেকবার হত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভয় দেখাইলেন, দাঁত খিঁচাইলেন কিন্তু মশারা কোনোমতেই ভয় পাইল না। অবশেষে লেপদ্বারা সর্বশরীর ঢাকিয়া কিয়ৎকালের জন্য নিরাপদ হইলেন। কিছুকাল পরে একজন লেপের এক কোণ সরাইয়া দেখিলেন যে ঘরের ভিতর একটা জোনাকী পোকা আসিয়াছে। দেখিয়াই তিনি চ্যাঁচাইয়া উঠিলেন, "ওরে আর রক্ষা নাই। লেপ মুড়ি দিয়া কি করিবে? ঐ দেখ জানোয়াবগুলি একটা লণ্ঠন লইয়া আমাদিগকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে!"

গ্লাটন

গ্লাটন্ নামক জানোয়ারের বাড়ি আমাদের দেশে নয়। উত্তরের শীতপ্রধান দেশ-সকলে ইহারা বাস করে;কামস্কট্কা উপদ্বীপে ইহারা খুব বেশী পরিমাণে থাকে। ঐ-সকল শীতপ্রধান দেশে ভোঁদড় জাতীয় অনেক প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু বাস করে; তাহারা নিশাচর বৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করে। তাহাদের জ্বালায় সেখানকার লোকেরা সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে। গৃহপালিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আহারীয় পশুপক্ষীর প্রতি ইহাদের বড়ই অনুরাগ। এই কারণে ঐ-সকল দেশের অধিবাসীদিগের সহিত ইহাদের শত্রুতা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। তাহার উপর আবার এই-সকল পশুর চর্ম অতিশয় মূল্যবান। সুতরাং ইহাদিগকে বধ করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হয়। এরূপ লোক আছে যে, নানাপ্রকার কৌশল করিয়া ঐ-সকল জন্তু ধরাই তাহাদের ব্যবসায়। আমরা যে জন্তুর কথা কহিতেছি, সেও এই জাতীয়; কিন্তু তাহার স্বাভাবিক ধূর্ততা এত বেশি যে, তাহাকে কেহই ধরিতে পারে না।

গ্লাটনের সম্বন্ধে পূর্বকালে লোকের অনেক আশ্চর্য সংস্কার ছিল। তখনকার একটা

পুস্তকে লেখা আছে যে ঐ গ্লাটন যদি কোনো বড় জন্তুর মৃত শরীর দেখিতে পায় তবে অমনি উহাকে খাইতে আরম্ভ করে। খাইতে খাইতে যখন পেটটা ঢাকের মতন ফুলিয়া উঠে, আর তাহাতে জিনিস ধরে না, তখন গ্লাটন্ খুব নিকট অবস্থিত দুটি গাছের মধ্য দিয়া শরীরটাকে নিয়া যাইতে চেষ্টা করে। এইরূপ করাতে ভয়ানক চাপ পড়িয়া তাহার পেটের ভিতরের সব জিনিস বাহির হইয়া যায়। এইরূপে পেট খালি হইলে গ্লাটন্ আবার আসিয়া খাইতে আরম্ভ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত আহার্য পদার্থ একেবারে ফুরাইয়া না যায়, ততক্ষণ এই উপায়ে ক্রমাগত ভক্ষণ এবং উদগীরণ চলিতে থাকে।

অনেক বলিয়াছেন যে, গ্লাটন্ কোনো গাছে উঠিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, নীচে কোনো বড় জন্তু আসিলে অমনি তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে। এইরূপে হঠাৎ পড়াতে তেমন প্রকান্ড জানোয়ারটাও ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া যায় আর আত্মরক্ষা করিতে পারে না। গ্লাটন্ এই অবস্থায় তাহাকে সহজেই মারিয়া ফেলিতে পারে। যাহা হউক আধুনিক অনেক পন্ডিতের এই মত যে, গ্লাটন গাছে উঠিতে তত পটু নহে; সুতরাং এই-সকল গল্পকে গল্পের ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্লাটন্ জানোয়ারটি আড়াই ফুটও লম্বা হইবে না, কিন্তু তাহার বুদ্ধি বড় বেশি। শিকারীরা অন্যান্য জন্তু ধরিবার জন্য যে ফাঁদ পাতে, গ্লাটন অনায়াসে তাহার ভিতরের খাবারটুকু খাইয়া যায়। ফাঁদে কোনো ছোট জানোয়ার পড়িলে তাহাও উদরস্থ করে। গ্লাটন্‌কে এপর্যন্ত খুব কম লোকেই ফাঁদ পাতিয়া ধরিতে পারিয়াছে। নিম্নে একজন শিকারীর লিখিত একটি গল্প অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"একবার একটা বৃদ্ধ গ্লাটন্ আমার মার্টেন (ভোঁদড় জাতীয় আর-এক প্রকার ক্ষুদ্র জন্তু) ধরিবার ফাঁদগুলির খোঁজ পাইল। আমি পনেরো দিন পর একদিন ফাঁদগুলি দেখিতে যাইতাম, সে তার চাইতে ঘন ঘন আসিতে লাগিল। ইহাতে আমি বড়ই চটিয়া গিয়া মনে করিলাম যে, যেরূপেই হউক উহার চৌর্যবৃত্তি বন্ধ করিতেই হইবে। এই ভাবিয়া আমি ভিন্ন ভিন্ন ছয় স্থানে ছয়টা মজবুত ফাঁদ প্রস্তুত করিলাম এবং তিনটা লোহার ফাঁদও সংগ্রহ করিলাম। তিন সপ্তাহকাল চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। সে এই-সকল ফাঁদের কাছেও গেল না। কিন্তু আমার মার্টেন ধরিবার ফাঁদগুলিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। যে-সকল মার্টেন ফাঁদে পড়িত, সেগুলিকে এবং ফাঁদে যে-সকল আহার দেওয়া হইত তাহাও খাইয়া ফেলিতে লাগিল। তখনকার দিনে বিষ খাওয়াইয়া মারার নিয়ম ছিল না, সুতরাং এরপর আমি বন্দুক পাতিয়া তাহাকে মারিতে চেষ্টা করিলাম। বন্দুকটিকে এরূপভাবে রাখা হইল যে গ্লাটন্ সেই পথে যাইবার সময় তাহা দেখিবেই। এরপর প্রথম যেদিন সেই স্থান দেখিতে গেলাম সেদিন দেখিলাম যে, গ্লাটন্ সেখানে আসিয়াছিল: কিন্তু আহারটাকে ছোঁয় নাই, কেবল শুঁকিয়াই চলিয়া গিয়াছে। ইহার পরের বারে আসিয়া প্রথমেই যে দড়ি দ্বারা বন্দুকের কলের সহিত আহারের সংযোগ ছিল সেই দড়িটিকে কাটিয়াছে, (কাটিয়াছে আবার বন্দুকের মুখের একটু পেছনে, যেন কাটিবার সময়ে হঠাৎ বন্দুক ছুটিয়া গেলেও গুলি গায়ে না লাগে) তারপর নিশ্চিন্ত মনে আহারটি লইয়া গিয়া পুকুরের ধারে বসিয়া খাইয়াছে। সেইখানে গিয়া আমি দড়িগাছ পাইলাম। ইচ্ছাপূর্বক এত বুদ্ধি খরচ করিয়াছে ইহা আমি কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না; কারণ ঐরূপ

করিতে হইলে ঠিক মানুষের বুদ্ধির সমান বুদ্ধির আবশ্যক করে। সুতরাং আমি আবার কল পাতিয়া রাখিলাম। দড়িটি যেখানে ছিঁড়িয়াছিল সেইখানে বাঁধিয়া দিলাম। কিন্তু ক্রমাগত তিনবার অবিকল একইরকম ফল পাইলাম। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে দড়িটি যে জায়গায় বাঁধিয়া দেওয়া গিয়াছে প্রত্যেকবার তাহার একটু পেছনে কাটিয়াছে, কি জানি যদি ইহার মধ্যেও আমি তাহার বিনাশের জন্য কোনোরূপ সন্ধান করিয়া রাখিয়া থাকি। এই-সকল দেখিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, এইরূপ বুদ্ধিমান জন্তুর বাঁচিয়া থাকাই উচিত।"

বিড়াল

আগে ঠাকুরমার কাছে বিড়ালের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলাম; দুঃখের বিষয় তাহার সবগুলি এখন মনে হইতেছে না। আজ যদি সেই বৃদ্ধা বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে তাঁহার কাছে আসিয়া বিড়াল সম্বন্ধে তোমাদের কত বৃহৎ কুসংস্কার দূর করিতে পারিতে। অতি শৈশবকালে, যখন প্রথম জানিতে পারিলাম যে আমার একজন ঠাকুরমা আছেন, তখন হইতেই জানিয়াছিলাম যে তাঁহার একটি বিড়ালীও আছে। ঠাকুরমা বলিলেই আমার মনে হয়, এক বুড়ি দরজার ধারে কুশাসন বিছাইয়া নামাবলী মাথায় দিয়া জপ করিতেছেন আর এক বিড়ালী তাঁহার অঞ্চলে গা ঢাকিয়া হাত-পা গুটাইয়া চক্ষু মুদিয়া ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে।

ঠাকুরমা বিড়ালীকে আদর করিতেন, কিন্তু হুলো বেড়াল দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। বিড়ালীর ছানাগুলি যখন হইত তখনই হুলোগুলিকে ধরিয়া থলের ভিতরে পুরিয়া গ্রামান্তরে নির্বাসিত করা হইত।

কি করিয়া বাঘের মাসি বোন্‌পোয়ের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, মানুষের বাড়িতে আসিয়া বিড়াল-রূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিল; তদবধি কি প্রকারে বাঘ তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ক্রমাগত খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; এবং সেই ভয়ে বিড়াল কিপ্রকারে নিজ অস্তিত্বের চিহ্ন পর্যন্ত লোপ করিবার জন্য গর্ত খুঁড়িয়া মলত্যাগ করিয়া তাহা আবার যত্নপূর্বক মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদন করে; ইত্যাদি সকল কথাই ঠাকুরমা আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই-সকল বিষয়ে মাথা ঘুরাইয়া অদ্যাপিও কোনো মীমাংসায় আসিতে পারেন নাই। তাঁহারা যদি আমার ঠাকুরমার নাতি হইতেন, তাহা হইলে শৈশবকালেই এ-সকল প্রশ্নের অতি সন্তোষজনক উত্তর পাইতেন।

বিড়াল মানুষের ঘরের জন্তু, মানুষ তাহার নিকটে অনেক উপকারও পাইয়া থাকে; কিন্তু তথাপি বেচারীকে— কেন জানি না, কেহই দেখিতে পারে না। কুকুর ঐ বিষয়ে ভাগ্যবান। ঠাকুরমা বলিতেন—"কুকুরটির ইচ্ছা করে, বাড়ির কর্তার ছেলে হউক, তবেই তাহার খাবার সময় সে পেট ভরিয়া ভালো ভালো জিনিস খাইতে পাইবে। আর বেড়াল ইচ্ছা করেন গিন্নির চোখ কানা হউক, তবেই সে অলক্ষিতে মাছ-ভাজা মুখে লইয়া চম্পট দিতে পারিবে।

এদেশে যেমন, অন্যান্য দেশেও তেমনি কতকটা দেখা যায়। ইংলন্ড প্রভৃতি দেশের অজ্ঞ লোকে বিড়ালকে ভূত-পেত্নীর চর বলিয়া মনে করিত। পূর্বে সেখানকার লোকের এবিষয়ে অনেক কুসংস্কার ছিল। জাদুকর স্ত্রীলোকদের প্রত্যেকে এক-একটি করিয়া বিড়াল থাকিত।

এরূপ গল্প আছে যে, একবার এই শ্রেণীর কতকগুলি স্ত্রীলোক একটা বিড়ালের নামকরণ করিয়া রাত্রিযোগে তাহাকে লীথ্ নগরের সামনে রাখিয়া আসিল। এরপর সেই নগরে এমন এক ঝড় হইল যে, তেমন ঝড় সেখানকার কেহ কখনো দেখে নাই। সাধারণ লোকের এইপ্রকার কুসংস্কার থাকাতে অনেক সময় অনেক ভয়ানক ঘটনা হইত। কোনো স্থানে হয়তো ক্রমাগত কতগুলি দুর্ঘটনা হইল; অমনি সকলে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল যে, নিশ্চয়ই কেহ জাদু করিয়াছে। গ্রামের এক কোণে এক গরিব বুড়ি বাস করে, সংসারে তাহার কেহ নাই। হয়তো তাহার মনটা একটু হিংসুকে ; হয়তো গ্রামের একজন একদিন তাহাকে আপনমনে বকিতে দেখিয়াছে ; আর একজন হয়তো বুড়িকে একদিন লাঠি হাতে করিয়া কাক তাড়াইতে দেখিয়াছে। গ্রামের লোকের বুড়ির উপর ভারি সন্দেহ হইতে লাগিল। এরপর যদি বুড়ির একটা কালো বিড়াল থাকে, তবেই সর্বনাশ! বুড়ি নিশ্চয়ই ডাইনী। এমন সময় গ্রামের একজন চাষার মনে হইল যে, একদিন তাহার গোরু বুড়ির শসা গাছ খাইয়া ফেলিয়াছিল, সেইজন্য গোরুকে বুড়ি "তোর মুনিব উচ্ছন্ন যাউক" বলিয়া গালি দিয়াছিল, তারপর হইতে সেই চাষার ক্ষেতে ইন্দুর আসিয়াছে। আর রক্ষা নাই—বুড়ি ডাইনী; বুড়ির বিচার হইবে।

বিচারটা আবার কিরূপ জান? বুড়ির হাত-পা বাঁধিয়া তাহাকে পুকুরে ফেলিয়া দেওয়া হইবে; ইহাতে যদি সে ডুবিয়া মরে তবে সে নির্দোষ, আর যদি তাহা না হয়, তবে সে দোষী, তাহাকে পোড়াইয়া ফেলা হইবে।

যাহা-হউক, আমরা বিড়ালের কথা ভুলিয়া যাইতেছি। আমি বলিতেছিলাম, বিড়ালকে কেহই দেখিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া বিড়ালের কোনো সদ্‌গুণ নাই, এমন কথা বলা উচিত নয়। প্রথমে দেখ, বিড়ালের যদি কোনো গুণই না থাকিবে তবে এত লোকে বিড়াল পোষে কেন? চেহারার জন্য? ঠিক তাহা নহে। ইঁদুর মারে বলিয়া? তাহাই-বা কেমন করিয়া বলি। অনেক বড়লোক এক-একটা বিড়ালকে যারপরনাই ভালোবাসিয়া গিয়াছেন। ইংলন্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার জন্‌সনের 'হজ্' নামে একটা বিড়াল ছিল। হজ্ জন্‌সনের বাড়িতে থাকিয়া ক্রমে বৃদ্ধ হইল, তাহার শেষকাল আসিল। এই সময়ে জন্‌সন্ হজের যেপ্রকার শুশ্রূষা করিতেন, অনেক বাপ ছেলের জন্য তেমন করে না। জন্‌সন্ স্বয়ং বাজারে গিয়া হজের আহারের জন্য ঝিনুক কিনিয়া আনিতেন।

ইটালীর একজন খুব বিখ্যাত পাদরির তিনটা এঙ্গোরা বিড়াল ছিল। খানার সময় টেবিলের পাশে পাদরি-সাহেবের জন্য যেমন চেয়ার দেওয়া হইত, তেমন বিড়ালগুলির জন্যও চেয়ার থাকিত। হাজার বড়লোক পাদরি সাহেবের সঙ্গে খানা খাইতে আসুন-না কেন, তাঁহাকেও সেই বিড়ালগুলির সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়া খানা খাইতে হইত।

বিলাতের আর-একজন বড়লোকের কথা শুনিয়াছি। তিনি অবিবাহিত ছিলেন, একটা বিড়ালী বৈ তাঁহার আর সঙ্গী ছিল না। এই বিড়ালীও সাহেবের সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়া খানা খাইত। এমন কি, একটা খাবার জিনিস আসিলে তাহার এক টুক্‌রা আগে বিড়ালীর পাতে দেওয়া হইত, তারপর সাহেব অবশিষ্টটুকু আহার করিতেন। এই সাহেবের একজন বন্ধু একবার তাঁহার বাড়িতে অতিথি হইলেন। খানার সময় সাহেব মাংসের টুক্‌রা কাটিয়া প্রথমে বন্ধুর পাতে দিলেন। এই সম্মানটুকু এতদিন বিড়ালীর ছিল। আজ তাহার অন্যথা হওয়াতে সে এতদূর অপমানিত বোধ করিল যে, একলাফে টেবিলের উপরে উঠিয়া

সাহেবের নাক-মুখ আঁচড়াইয়া দিল। এই আঁচড়ের দাগ সাহেব এ জীবনে আর দূর করিতে পারিলেন না।

তোমাদের অনেকই বিখ্যাত হুইটিংটন্ সাহেবের কথা পড়িয়াছ। হুইটিংটন্ বাল্যকালেই পথের ভিখারি হইয়াছিলেন। হুইটিংটনের অনেক সদ্‌গুণ ছিল, এবং একটি অতি প্রিয় বিড়ালও ছিল। এরূপ গল্প আছে এই-সকল সদ্‌গুণের জোরে এবং বিড়ালের বিশেষ সাহায্যে হুইটিংটন্ শেষে বড়লোক হইয়াছিলেন। হুইটিংটন্ এবং তাঁহার বিড়ালের গল্প অতিশয় আমোদজনক; এবং যদিও ইহার সমুদয় অংশ সত্য নহে, তথাপি ইহার ভিতরে সুন্দর উপদেশ আছে।

এই সকল গল্প পড়িয়া তোমরা ইহাই বুঝিবে যে অনেক বড়লোক বিড়ালকে ভালোবাসিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিড়ালের যে বিশেষ কোনো সদ্‌গুণ আছে, এ-সকল হইতে তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু এরূপ প্রমাণেরও কোনো অভাব নাই। নিম্নে এ সম্বন্ধে দুই-তিনটি গল্প বলিয়া শেষ করিতেছি।

কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে একটা বিড়ালী ছিল। বিড়ালীকে সকলেই বিশেষ ভালবাসিত। একদিন রাত্রিতে বৈঠকখানার ঘরে ঘন্টার শব্দ শুনিয়া সকলেরই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাড়িতে চোর ঢুকিয়াছে মনে করিয়া সকলেই সশস্ত্র হইয়া বৈঠকখানার দিকে ছুটিলেন। দেখা গেল যে, বৈঠকখানার দরজা যেরূপভাবে বাহিরের দিক হইতে অর্গল দিয়া রাখা হইয়াছিল ঠিক তেমনি আছে, কিন্তু ভিতর হইতে ঘন্টার শব্দ আসিতেছে। দরজা খুলিয়া দেখা গেল যে, বিড়ালী চাকরদের ডাকিবার ঘন্টার কাছে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত তাহা নাড়িতেছে। ঘন্টাটি এমন স্থানে ছিল যে তাহাকে বাজাইতে হইলে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সন্ধ্যার সময় বিড়ালী ঐ ঘরে অজ্ঞাত সারে আট্‌কা পড়িয়াছিল। বাহির হইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা সে এই কষ্টটুকু স্বীকার করিয়াছে। অন্যান্য দিন ঐ ঘন্টা বাজিলেই ঘরে লোক আসে, তাহা সে দেখিয়াছে। সুতরাং সে চেয়ারের উপর উঠিয়া, পিছনের দুই পায়ে দাড়াঁইয়া, এক হাতে ঘন্টা বাজাইতে আরম্ভ করিল। ইহার ফল কি হইল, প্রথমেই শুনিয়াছ। বিড়ালী যে কেবল ঐদিন এরূপ করিয়াছিল, তাহা নহে। যখনই ঘরে সে আট্‌কা পড়িত, তখনই ঐ উপায় অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিত।

একবার এক বৃদ্ধা উইল করিয়া তাহার সমস্ত বিষয় তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দিল। ইহার কিছুদিন পরেই বৃদ্ধার মৃত্যু হইল। ভ্রাতুষ্পুত্র উকিল, বৃদ্ধার অন্ত্যেষ্টির পরেই সে তাহার ঘরে আসিয়া তাহার উইল পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধের একটি প্রিয় বিড়াল ছিল। এই বিড়াল, বৃদ্ধাকে এত ভালোবাসিত যে, একবারও তাহার কাছ-ছাড়া হইত না। এমন-কি, মৃত্যুর পরেও সেই মৃত শরীরের কাছে বসিয়া রহিল। বৃদ্ধার ভাইপো যখন বৃদ্ধার ঘরে বসিয়া উইল পড়িতেছিল, সেই সময়ে বিড়ালটি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতের ন্যায় সেই ঘরের দরজার বাহিরে ছুটাছুটি করিতেছিল। কিছুকাল পরে যেই দরজা খোলা হইল, অমনি বিড়াল ছুটিয়া আসিয়া উকিল ভাইপোর গলা কামড়াইয়া ধরিল — অনেক কষ্টে তাহাকে ছাড়ানো হইল। এই ঘটনার আঠারো বৎসর পরে ভাইপোর মৃত্যু হইল। মৃত্যুশয্যায় সে স্বীকার করিল যে, বৃদ্ধার টাকাগুলি শীঘ্র শীঘ্র পাইবার জন্য সে তাহাকে খুন করিয়াছিল।

এক পরিবারে একটি অতি সুন্দর বিড়াল পালিত হইয়াছিল। সেই পরিবারের জ্যেষ্ঠ

সন্তানটিকে সে বড় ভালোবাসিত। সেই ছেলেটির সঙ্গে সে খেলা করিত এবং তাহার সকলপ্রকার অত্যাচার সে অতিশয় ভালোমানুষের ন্যায় সহ্য করিত। এইরূপে অনেকদিন চলিয়া গেল। অবশেষে ছেলেটির বসন্ত রোগ হইল। প্রথম কয়েকদিন বিড়ালটি কিছুতেই তাহার বিছানার পাশ ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। ব্যারাম যখন বাড়িয়া চলিল, তখন বিড়ালটিকে স্থানান্তরিত করিয়া এক ঘরে তালা দিয়া রাখিতে হইল। ছেলেটি মারা গেল। বিড়ালকে ছাড়িয়া দিবামাত্র সে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তাহার খেলার সঙ্গীকে দেখিতে আসিল — কিন্তু ইহার পূর্বেই তাহার মৃত শরীর সে ঘর হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। তাহার পর সে বাড়িময় ছোটাছুটি করিয়া অবশেষে সে ঘরে মৃতদেহ রাখা হইয়াছিল সেই ঘরে আসিল। এই স্থানে সে শোকে অধীর হইয়া শুইয়া রহিল। তাহাকে আবার তালা দিয়া রাখিবার দরকার হইল। ছেলেটিকে গোর দেওবার পরে বিড়ালটিকে দেখা গেল না। পনেরোদিন পরে নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া সেই বালকটি যে ঘরে মারা গিয়াছিল, সেই ঘরে বিড়াল ফিরিয়া আসিল। এরূপ অবস্থায়ও তাহাকে কিছু খাওয়ান গেল না। তাহার সংগীকে না দেখিয়া সে করুণস্বরে চিৎকার করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। অবশেষে যখন ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইল, তখন খাইবার সময় কোনোপ্রকারে ঘরে আসিত, কিছু আহার করিয়াই আবার চলিয়া যাইত। অন্য সময় সে কোথায় থাকিত কেহই জানিত না। অবশেষে একদিন তাহার পশ্চাৎ যাইয়া দেখা গেল যে, সে সেই বালকটির গোরের পাশে পড়িয়া থাকে। এই পরিবারটি ঐ স্থানে পাঁচ বৎসর কাল ছিলেন। এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সেই বিড়ালটিকে সেই বালকের গোরের পাশে দিনরাত পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে ঐ বিড়ালটির উপরে সকলেরই অতিশয় ভালোবাসা জন্মিয়া গিয়াছিল, এমন-কি তাহাকে একপ্রকার ভক্তির ভাবে দেখা হইত।

টিয়াপাখি

অনেকেই পাখি পুষিয়া থাকেন। বোধহয় পাঠকবর্গের কাহারো কাহারো একটি টিয়াপাখিও আছে। ইহাদের সম্বন্ধে আজ আমরা কিছু বলিব। টিয়াপাখি অনেক জাতীয় আছে। ইহাদিগকে প্রধান চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। ১ কাকাতুয়া, ২ টিয়া, ৩ নুরি, ৪ মরু। উহাদের মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণীর টিয়াই আমরা এদেশে সচরাচর দেখিয়া থাকি। চতুর্থ শ্রেণীর পাখিগুলির বাসস্থান আমেরিকা। এই-সকল পাখি সাধারণত খুব বড় এবং উজ্জ্বল রঙ-বিশিষ্ট হয়, কিন্তু ইহাদের চেহারা তত সুন্দব নহে। আমরা সচরাচর যে-সকল টিয়া দেখিতে পাই, তাহারাও আবার সকলে এদেশীয় নহে। অতিশয় সুন্দর পাখিগুলি প্রায়ই অস্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়া থাকে, জাহাজী গোরারা অনেক সময়ে অস্ট্রেলিয়া হইয়া আসিবার সময় এক-একটি পাখি কিনিয়া আনে, এবং কলিকাতা আসিয়া টিরেটীবাজারে পাখিওয়ালাদের নিকট অধিক মূল্য লইয়া বিক্রয় করে। পাখিওয়ালারা আবার অধিকতর লাভ করিয়া এখানকার শৌখিন লোকদিগকে সে-সকল পাখি গছাইয়া দেয়। ভালো ভালো কাকাতুয়া এবং নুরিগুলি প্রায়ই অস্ট্রেলিয়া হইতে আইসে। আমাদের দেশী যে-সকল টিয়া, তাহার মধ্যে সাধারণত

সবুজ টিয়া, লাল গলাবন্ধওয়ালা টিয়া, ময়না, চন্দনা, ফুলটুসী, কাজলী, করিদি ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। 'হীরেমন' 'লালমন' ইত্যাদি আমির গোছের পাখিগুলির অধিকাংশই বিদেশী।

বিদেশী পাখিগুলিকে অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি স্থান হইতে আনে, আর দেশী পাখিগুলিকে কি করিয়া পায় জান? দেশী পাখির অনেকগুলিকে বাচ্চা অবস্থায়ই তাহাদের বাসা হইতে ধরিয়া আনা হয়। ইহা ছাড়া ধাড়ি পাখিগুলিকেও জাল দিয়া ধরে। এই-সকল ধাড়ি পাখি কিছুতেই পোষ মানে না। ইহাদিগকে জলে ছোপাইয়া ধোঁয়া লাগাইয়া প্রয়োজন হইলে কিঞ্চিৎ আফিমের ব্যবস্থা করিয়া 'ভালোমানুধ' করা হয়। অল্পবুদ্ধি খদ্দের খুব সন্তুষ্ট হইয়া ইহাদিগকে কিনে, কিন্তু বাড়িতে আনিয়াই আপনার ভ্রম বুঝিতে পারে।

তোমাদের অনেকেই হয়তো নিম্নলিখিত গল্পটি পড়িয়াছ। এক ব্যক্তি একটা টিয়াপাখি পুষিয়াছিল, সেটা কেবলমাত্র, একটা কথা বলিতে জানিত — 'তাতে আর সন্দেহ কি?' পাখিটা আর কোনো কথা কহিতে পারে না দেখিয়া সেই ব্যক্তি তাহাকে বিক্রি করিবার জন্য বাজারে লইয়া গেল। একজন শৌখিন লোক আসিয়া পাখির দাম জিজ্ঞাসা করিল, উত্তর হইল, 'দুই হাজার টাকা'। ক্রেতা কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল — 'বটে! তোমার পাখির এত দাম বলিতেছ, সে কি এত দামের উপযুক্ত?' পাখিওয়ালা বলিল, 'পাখিকেই জিজ্ঞাসা করুন।' শ্রোতা পাখিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরে, তুই কি এত দামের উপযুক্ত?' পাখি বলল, 'তাতে আর সন্দেহ কি?' এই কথাগুলিতে সেই ব্যক্তি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া দুই হাজার টাকায় সেই পাখি কিনিল।

অল্পদিন পরেই পাখির গুণ বাহির হইয়া পড়িল। তখন দুঃখিত হইয়া সেই ব্যক্তি বলিল, 'এত টাকায় এই পাখিটা কিনিয়া বড়ই নির্বোধের কাজ করিয়াছি।' এমন সময় পাখি বলিল, 'তাতে আর সন্দেহ কি?'

টিয়াপাখিগুলি অনেক সময় অতিশয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকে। আমি একটা পুস্তকে পড়িয়াছি যে এক ভদ্রলোক, তিনি তোৎলা ছিলেন, একবার কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়াছিলেন। সেই বন্ধুর বাড়িতে 'পলি নামক একটা কাকাতুয়া ছিল। আমোদ দেখিবার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প-প্ প প পলি, ক-ক্‌ক-কটা বেজেছে?' পলি উত্তর করিল 'চা-চ্-চ্ চা চারটে!'

জানোয়ারের শিক্ষা

সার্কাসওয়ালারা নানারকম জন্তুর তামাশা দেখায়। যাহারা দেখে, তাহারা খুবই আমোদ পায়, কিন্তু এই-সকল জন্তুকে শিখাইতে কত বুদ্ধি, কত পরিশ্রম, কি পরিমাণ সাহস এবং কতদূর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা অল্প লোকেই ভাবিয়া দেখে।

গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিবার কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু বনের হিংস্র জন্তুকে, ধরিয়া আজকাল লোকে তাহার দ্বারা যে-সকল আশ্চর্য কাজ করাইয়া লইতেছে, তাহার কথা ভাবিয়া দেখিলে গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করা (অর্থাৎ গাধার মতন নির্বোধ এবং ঠ্যাঁটা জন্তুকে

দিয়া ঘোড়ার ন্যায় বুদ্ধিমান এবং বাধ্য জন্তুর মতন কাজ করাইয়া লওয়া) তেমন আশ্চর্য বিষয় বলিয়া মনে হয় না। অন্তত এ কাজে বিশেষ কোনো বিপদের আশংকা নাই।

কিন্তু একটা বাঘকে বন হইতে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে আদবকায়দা শিখাইতে গেলে যে, ব্যাপারখানা কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে কাহাকেও পরামর্শ দিই না। যাঁহারা এ কাজ কখনো করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনা যায় যে, ইহার মতো বিপদজনক কাজ অতি অল্পই আছে। এ কথা তাঁহারা বিশেষ করিয়া না বলিলেও আমরা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি।

এ-সকল জন্তুর মেজাজের উপরে কোনোরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না। নিতান্ত ভালোমানুষ সিংহটাও কখন যে হঠাৎ হাসি থামাইয়া তাহার গুরুর ঘাড় মটকাইয়া দিবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। বনের স্বাধীন সুখ ছাড়িয়া অবধি খাঁচার ভিতরে থাকিয়া সে যত অপমান সহ্য করিয়াছে, তাহা তাহার মনে চিরকাল থাকিয়া যায়, এবং কোন মুহূর্তে যে তাহার প্রতিশোধ লইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

কত অপমান? আচ্ছা মনে কর তো দেখি, কতখানি নাকাল হইলে তবে একটা মানুষের মাথা মুখের ভিতরে পাইয়াও বাঘের তাহা একটিবার চিবাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে না। প্রথমে যখন সে বন হইতে আসিয়াছিল, তখন বুঝি তাহার মেজাজ এমনি ঠান্ডা ছিল! তখন তাহার স্বভাব কিরূপ ছিল, তাহা তাহার প্রথম কয়েকদিনের ব্যবহার হইতেই বুঝিতে পারা যায়। একটা ইংরাজি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে যাহা পড়িয়াছি, তাহা এইরূপ—

'বাঘ সিংহকে পোষ মানান অনেক দিনের আর বড় বিপদের কাজ। কিন্তু তাহাকে প্রথম বাগ মানাইবার উপায়টি অতি সহজ এবং অদ্ভুত। জানোয়ারকে ধরিয়া আনা হইল। তাহার বাড়ি হইতে তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া খাঁচার ভিতরে কয়েদ করা অবধি তাহার ভবিষ্যৎ প্রভুর নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত প্রত্যেক মুহূর্তে তাহার রাগ বাড়িয়া আসিয়াছে, সে রাগ কাহারো উপরে একবাব ঝাড়িতে পারিলে হয়, তাই সে কেহ খাঁচার নিকটে গেলেই দাঁত খিঁচাইয়া গর্জন করিতে থাকে। এ সময়ে তাহার শিক্ষক খাঁচার ভিতরে গেলে তাহাকে তখনই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে।'

'সিংহ হইলে, এই সময়ে তাহার রাগ থামাইবার জন্য তাহাকে বেশ করিয়া খাওয়ানো হয়, আর এমন একটা-কিছু তাহাকে দেওয়া হয়, যাহার উপরে সে রাগ ঝাড়িতে পারে। সে জিনিসটা আর কিছু নহে, একখানি সাধারণ চেয়ার।'

'চেয়ারখানিকে খুব সাবধানে খাঁচায় ঢুকাইয়া দেয়, আর নিমেষের মধ্যে সিংহটা তাহার উপরে লাফাইয়া পড়ে। তাহার পরের মুহূর্তে আর সে চেয়ারের কিছু অবশিষ্ট থাকে না, খালি তাহার টুকরাগুলি চারিধারে ছড়ানো থাকে। পরদিন ঐরূপে আর-একখানি চেয়ার খরচ করা হয়। তৃতীয় দিন আর-একখানি। এইরূপ দিনের পর দিন চলিতে থাকে। শেষে সিংহের ইহাই বিশ্বাস হয়, যে ঐ চেয়ারের আর শেষ নাই। কাজেই তাহার উৎসাহ কমিয়া যায়। সে মনে করে, যে এইরূপ বৃথা পরিশ্রম করিয়া লাভ কি? না হয়, এ বিষয়ের তর্ক ছাড়িয়াই দিলাম। সুতরাং শিক্ষকের এইটুকু লাভ।'

'ইহার পর একদিন কৌশলে তাহাকে ঘুমের ঔষধ গিলাইয়া দেওয়া হয়, আর ঘুম আসিলে সেই অবস্থায় তাহাকে বেশ করিয়া মজবুত শিকল দিয়া খাঁচার শিকের সহিত বাঁধা

হয়। ঘুম হইতে উঠিয়া সে দেখে, যে তাহার মাস্টার খাঁচার ভিতরে চেয়ারে বসিয়া আছে।

সিংহটা গর্জন করিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য লাফ দেয়, কিন্তু শিকলির টানে তাহা করিতে পারে না, বরং তাহার নিজেরই দম আটকাইয়া যায়। এইরূপ আট দিন চলে। মানুষকে ধরিবার বিফল চেষ্টায় সিংহের বলক্ষয় হয়, আর মানুষটা সিংহের আস্ফালন গ্রাহ্য না করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া থাকে। কাজেই শেষটা সিংহকেই হার মানিতে হয়।

ইহার পরে সিংহের শিকল খুলিয়া দিয়া খাঁচায় প্রবেশ করিতে হয়। ইহাই সর্বাপেক্ষা সংকটের সময়, ইহাতে প্রাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সিংহ প্রায়ই এই সময় তাহার শিক্ষকের প্রাণবধ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিক্ষকও অবশ্য তখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। পূর্বের অভিজ্ঞতা দ্বারা সে অনেকটা বুঝিয়া লইয়াছে যে, এইরূপ স্থলে কিরূপ বিপদের সম্ভাবনা। সুতরাং সে তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে। গলায় পুরু চামড়ার গলাবন্ধ, শরীরে খরের বর্ম। (খড়ের মধ্যে সহজে নখ বসে না, পিছলাইয়া যায়)। জন্তুটা বেশি মারাত্মক স্বভাবের হইলে শিক্ষক নিজের মাথাটাকে একটা লোহার খাঁচার মতন আবরণের দ্বারা সুরক্ষিত করে।

এক হাতে একটা মজবুত ত্রিশূলের মতন জিনিস আর-এক হাতে সেই চেয়ার। এবাবে চেয়ার ঢালের কাজ করিবে। সিংহ লাফাইয়া খাইতে আসিবে ঐ চেয়ার দিয়া তাহার মাথাটাকে চাপিয়া ধরিতে হয়, আর সেই সময়ে কোনো কোমল স্থানে ত্রিশূলের খোঁচা লাগাইতে হয়। সিংহ খালি হাওয়ায় থাবা মারিয়াই ফিরিয়া গিয়া আবার লাফাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। শিক্ষক গলদ্‌ঘর্ম হইলেও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ত্রিশূলের গোড়া দিয়া সিংহের নাকে মারে, ঐখানটায় সিংহের বড় লাগে। তাহাতে বেদনায় আর্তনাদ করিয়া সিংহ আবার হটিয়া যায়।

এইরূপে ক্রমাগত কয়েকদিন করিতে পারিলে শেষে সে জাঁনোয়ারকে হার মানিতেই হয়। তাহার পর আর সে তাহাকে মারিতে চেষ্টা করে না, কিন্তু চিরদিনই তাহাকে বিষ নজরে দেখে।

একজন প্রসিদ্ধ জানোয়ার-ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, বনের জন্তুকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে রাজি করিতে শিখাইতে তাহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ কর কিনা? তিনি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'তাহা তো নয়ই, বরং ইহাতে তাহাদের বেশ আমোদ হয়, আর শরীরও ভালো থাকে।' কিন্তু উপরের বর্ণনায় সিংহের আমোদ কোন্‌খানটায় তাহা তো বুঝিলাম না।

আমাদের চাইতে ভয়ের কথাই অধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বেড়া ডিঙ্গানো শিখাইবার সময় প্রথমে জ্বলন্ত লোহা দিয়া বেচারার পিছনে 'ছ্যাঁকা' লাগাইয়া দেয়। তাহার পর জ্বলন্ত লোহার পরিবর্তে কোনো-একটা উজ্জ্বল পদার্থ দেখিলেই তাহার ভয়ে সে বেড়া ডিঙ্গায়। শিক্ষকের হাতের ছড়ির আগায় কোনো-একটা উজ্জ্বল পদার্থ এমন-কি, সাদা পালক বাঁধিয়া দিলেই সিংহের 'ছ্যাঁকা' লাগার কথা মনে হয়। ইহার মধ্যেও আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই।

অনেক স্থলে কোনো-একটা কঠিন কাজ শিখাইতে হইলে আগে জানোয়ারটাকে ঘুমের ঔষধ দিয়া তাহার হাত-পা বাঁধা হয়। তাহার পর সেই বাঁধা অবস্থায় বলপূর্বক দড়ির আর কপিকলের সাহায্যে তাহাকে শিক্ষকের ইচ্ছানুরূপ করিয়া হাত-পা নাড়িতে বাধ্য করে। শেষে দড়ি খুলিয়া লইলেও সে ঐরূপ করিয়া হাত-পা নাড়িতে পারে, এই উপায়ে গোলার

উপর চড়া ট্রাইসিকলে চালানো প্রভৃতি শিখানো হয়।

আমাদের কথা না বলিলেই ভালো ছিল। অন্তত সিংহ বাঘ প্রভৃতির পক্ষে এ কথা খাটে না। তবে ভালুকগুলি নাকি এ-সব তামাশা করিতে অনেক সময় আমোদ পায়। তাহা হইতে পারে, কিন্তু সে কি এমন আমোদ, যে তাহাতে তাহার কারাবাসের দুঃখ কিছুমাত্র কমে? তাহা যদি হইত, তবে শিক্ষকের উপরে তাহাদের এত রাগ হইত বলিয়া বোধ হয় না। শিক্ষক তাহাদের ভালোবাসা আকর্ষণ করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করে। নিজের হাতে সর্বদা জন্তুকে খাওয়ায়। তথাপি এমন তো শুনিতে পাই না যে, এ-সকল শিক্ষকের একজনকেও তাহার জানোয়ারগুলি বড় ভালোবাসে। বাঘ সিংহকে যাহারা খাওয়ায় তাহাদের প্রতি সেই-সকল জন্তুর ভালোবাসা হওয়ার কথা অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু এই-সকল শিক্ষকের জন্য এরূপ ভালোবাসা কেন হয় না? ভালোবাসা হওয়া দূরে থাকুক, বরং এরূপই শুনিতে পাই যে, ইহারা শিক্ষকের ঘাড় ভাঙ্গিবার জন্য সবর্বদা প্রস্তুত থাকে। এ সম্বন্ধে উপরের উল্লিখিত ইংরাজি প্রবন্ধে এইরূপ মন্তব্য আছে।

'মানুষ বনের জন্তুকে পোষ মানায় আর তাহার সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করে, এ কথা সত্য। কিন্তু সমুদ্র যেমন ঝড়ে মাতিয়া তাহার কর আদায় করে (অর্থাৎ অনেক মানুষের প্রাণ সংহার করে), সেইরূপ সিংহ ব্যাঘ্র অথবা অপর হিংস্র জন্তুরাও তাহাদের অপহৃত স্বাধীনতার এবং যে অপমান তাহারা ক্রমাগত সহিয়া আর সহিতে পারে নাই, তাহার মূল্যের দাবি করে এবং তাহা আদায়ও করিয়া থাকে। উত্তেজক আমোদের ব্যবস্থা করিতে গিয়া যে-সকল লোক হত আহত হইযাছে, তাহার তালিকা দীর্ঘই হইবে।

এই-সকল জন্তুকে শিখাইবার সময় কোনোরূপ অনাবশ্যক নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু বাধ্য হইয়া যেটুকু ক্লেশ দেওয়া হয়, তাহার জন্যই তাহারা অসন্তুষ্ট থাকে। ইহার অতিরিক্ত কর্কশ ব্যবহার করিলে উহারা একেবারেই সহ্য করিতে পারে না। অত্যাচারের সময় কিছু না বলিলেও তাহা মনে করিয়া রাখে এবং সুযোগ পাইলে প্রতিশোধ লয়।

একটা হাতিকে একজন শিক্ষক অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে অঙ্কুশের খোঁচা মারিয়াছিল। হাতিটা তখন তাহাকে কিছুই বলিল না। পরদিন শিক্ষকটি ছয় সপ্তাহের ছুটি লইয়া চলিয়া গেল। ছুটির পরে ফিরিয়া আসিয়া সে যেই হাতিগুলির কাছে গিয়াছে, অমনি সেই হাতিটা হুঙ্কার করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। শুঁড় দিয়া তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া নিকটবর্তী মাঠে একটা পুকুরের দিকে গেল। সেখানে গিয়া মাষ্টারমহাশয়কে ক্রমাগত তিনবার যথোচিত গাম্ভীর্যের সহিত জলে ছোপাইয়া আবার তাহাকে সার্কাসে লইয়া আসিল। সেখানে আসিয়া একরাশ করাতের গুঁড়ার মধ্যে তাঁহাকে খানিক গড়াইয়া লইয়া, নিজের জায়গায় গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হাতি অতিশয় মহানুভব জন্তু, তাই শিক্ষকমহাশয়কে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়াই ছাড়িয়াছিল। বাঘ কিম্বা সিংহ হইলে সে যাত্রা তাহার প্রাণ থাকিত কি না সন্দেহ।

সিংহের চাইতে বাঘ আবার আরো বেশি হিংস্র। সিংহের কতকটা মহত্ত্ব আছে, সদয় ব্যবহার করিলে তাহার একেবারে ভুলিয়া যায় না। কিন্তু বাঘের কাছে নাকি ভদ্রতার কোনোরূপ মূল্য নাই। সিংহীগুলির মন নাকি অনেকটা ভালো। একবার একটা সিংহ তাহার শিক্ষককে (শিক্ষয়িত্রী) আক্রমণ করিয়াছিল, এমন সময় একটা সিংহী আসিয়া সিংহটার ঘাড়ে পড়িয়া শিক্ষককে বাঁচাইয়া দিল।

অবশ্য, শিক্ষকের ভরসা কেবলমাত্র তাহার অকুতোভয়তা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছাড়া আর কিছুরই উপরে নহে। তাহা ছাড়া আর কিছু যদি থাকে, তবে তাহা একটি স্বাভাবিক শক্তি, যাহার প্রভাবে কেবলমাত্র তাহার একটি ভ্রূকুটিতেই হিংস্র জন্তুর মনে আতংকের সঞ্চার করিয়া দিতে পারে।

যেমন করিয়াই হউক, জন্তুগুলির মনে এমন একটা বিশ্বাস থাকা চাই যে, 'ইহাকে আমরা কিছুতেই আঁটিতে পারিব না। এ ব্যক্তি যাহা বলে, তাহাই আমাদের করিতে হইবে।' কোনো কারণে এ ভয় একবার ভাঙ্গিয়া গেলে আর সে ব্যক্তির সে জন্তুর উপরে কোনো প্রভুত্ব থাকে না। শিক্ষক যদি কখনো মাতাল হইয়া জন্তুর খাঁচায় ঢোকে, জন্তুগুলি অমনি তাহার দুরবস্থা বুঝিতে পারে। তখন যদি ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় সে প্রাণ লইয়া খাঁচার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সৌভাগ্য বলিতে হয়।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথা বলিতেছিলাম, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিই। একজন শিক্ষক কোনো কারণে ভযানক রাগিয়া গিয়া একটি বাঘকে চাবুকের সীসে বাঁধান গোড়াটা দিয়া কয়েকটা কঠিন আঘাত করিয়াছিল। ইহাতে মুহূর্তের জন্য বাঘটা একটু কাহিল হইল বটে, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই হাঁ করিয়া শিক্ষককে আক্রমণ করিল। শিক্ষক তখন আর কি করে, তাড়াতাড়ি তাহার চাবুকের গোড়াটা সেই হাঁ-র ভিতর দিয়া একেবারে বাঘের গলার ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। ইহাতে বাঘটা ক্ষণেকের জন্য ভারি অপ্রতিভ হইয়া গেল। ততক্ষণে শিক্ষকের চিৎকাব শুনিয়া দুইজন লোক ছুটিয়া আসিল। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে আগুন ছিল, আর তাহাতে একটা লোহা তাতিয়া একেবারে লাল হইয়াছিল। একজন লোক তাড়াতাড়ি সেই জ্বলন্ত লোহাটা লইয়া খাঁচার ভিতরে ঢুকিয়া বাঘটাকে সেই লোহা দিয়া খোঁচা মারিল। তাহার পর বাঘটা যেই ভয়ানক গর্জন করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়াছে, অমনি একেবারে, তাহার মুখে লাল লোহার 'ছ্যাঁকা' লাগাইয়া দিল। বাঘ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া খাঁচার কোণে গিয়া লুকাইল, আর অমনি শিক্ষক আর তাহার লোক খাঁচার বাহিরে আসিয়া দরজা আটকাইয়া দিল।

অনেক সময় বিনা কারণে অথবা অতি সামান্য কারণেও এক-একটা জানোয়ার হঠাৎ ক্ষেপিয়া যায়। বাস্তবিক, যাহারা ইহাদের খাঁচার ভিতরে যায় তাহাদিগকে প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। নিতান্ত ভালো জানোয়ারটাও কখন হঠাৎ ক্ষেপিয়া আক্রমণ করিবে, তাহার ঠিক নাই। আবার একটা যদি আক্রমণ করে, তাহা হইলে অন্যগুলিও খুব সম্ভবত তাহার পক্ষ হইয়া তাহাতে যোগ দিবে।

যাহারা সর্বদা এ কাজ করে, তাহাদের এত বিপদ। কিন্তু এমন পাগলও পৃথিবীতে আছে, যে কখনো এ কাজ করে নাই, অথচ খাঁচার ভিতরে গিয়া বাহাদুরি উপার্জন করিবার জন্য ব্যস্ত। একবার একজন ধর্মযাজক এইরূপে প্রাণ হারাইয়াছিল। বেচারা স্বভাবতই একটু উকন্দ্র, ইহার মধ্যে আবার একদিন তাহার কেমন খেয়াল চাপিল, সে মনে করিল যে, বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়া বক্তৃতা করিতে পারিলে অনেক লোক শুনিতে আসিবে, আর তাহাতে খুব জমাট প্রচার হইবে। সুতরাং সে নিকটবর্তী এক সার্কাস ওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, অমুক দিন তাহার বাঘের খাঁচার ভিতর হইতে সে বক্তৃতা করিবে। সার্কাসওয়ালা প্রথমে রাজি হয় নাই। সে বলিল, 'তুমি ভয় পাইবে।'

ধর্মযাজক বলিল, 'আমার কিছুতেই ভয় নাই।'

সার্কাসওয়ালা বলিল 'আচ্ছা তবে যাও। আমরা সেখানে থাকিব। আশা করি, কিছু হইবে না। মনে রাখিও, তিন মিনিটের বেশি বক্তৃতা করিতে পাইবে না। আর দোহাই, অঙ্গভঙ্গি করিও না!'

সে রাত্রিতে অসম্ভব লোক হইল। পাদ্রি বেচারা শুষ্ক মুখে খাঁচায় প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত। হয়তো তখন তাহার ভয় হইয়াছিল, কিন্তু আর ফিরিবার সময় নাই। প্রকাণ্ড খাঁচা, তাহাতে দুটা বাঘ, তিনটা সিংহ আর তাহাদের 'শিক্ষয়িত্রী' ছিলেন। বক্তৃতা আরম্ভ হইল। প্রথমে গলার আওয়াজ একটু কাঁপিতে ছিল। জন্তুগুলি শান্তভাবে শুনিয়া যাইতেছিল। ইহাতে সাহস বাড়িয়াই হউক বা অন্য কোনো কারণেই হউক, পাদ্রি বেচারা সুর চড়াইয়া হাত ছুঁড়িতে লাগিল। সেই মুহূর্তেই বাঘিনীটা তাহার উপরে লাফাইয়া পড়িল। তাহাকে সাহায্য করিবার সময় পর্যন্ত পাওয়া গেল না। অনেক কষ্টে বাঘ তাড়াইয়া দেখা গেল, যে পাদ্রির তাহার পূর্বেই প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। বাঘিনী আক্রমণ করিবার সময় সামান্য একটু চকিত চিৎকার ভিন্ন বেচারা আর একটি শব্দ করিবারও অবসর পায় নাই।

কেবল জানোয়ারের খাঁচার ভিতর গেলেই যে বিপদ, তাহা নহে, আরো বিপদের কারণ আছে। অনেক সময় জানোয়াবগুলি খাঁচা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়ে। তখন তাহারা কাহার প্রাণ নাশ করে, তাহার ঠিক নাই। এক বার একজন সহকারীর অসতর্কতায় দরজা খোলা পাইয়া এক সার্কাস হইতে একটা হাতি, তিনটা বাঘ, দুটো সিংহ আর দুটো মার্কিন ভল্লুক বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সার্কাসের লোকদের কিরূপ আতঙ্ক হইয়াছিল, বুঝিতেই পার। আর শহরের লোকদের আতংকের কথা না বলিলেও চলে! তাহারা ঘরে দরজা আঁটিয়া ছাতে উঠিয়া তথাপি নিশ্চিন্ত নহে। সার্কাসের লোকেরা অবশ্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রাণপণে ছুটিয়া তখন সেখানে উপস্থিত হইল। কিন্তু ইহারই মধ্যে একটা ভালুক একটা মানুষ মারিয়া ফেলিয়াছে। একটা বাঘ একটি ছোট ছেলেকে মুখে করিয়া লইয়া আবার কি মনে করিয়া তাহাকে রাখিয়া দিল। সেই অবসরে সার্কাসের একজন লোক গুলি করিয়া বাঘটাকে মারিয়া ফেলিল। আশ্চর্যের বিষয়, ছেলেটির গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নাই। হাতিটা ইতিমধ্যে এক খেলনার দোকানে ঢুকিয়া অনেক খেলনাই পরীক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বাহির হইবার পথ পাইতেছে না। আর অবশেষে বাঘ আর সিংহগুলি এক কসাইর দোকান পাইয়া এতই মোহিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে সেখানে আটকাইতে কোনো মুশকিল হইল না।

জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, এত বিপদ সহ্য করিয়া লোকে এ কাজ করিতে যায় কেন? এ কথার উত্তরে তাহার বলে যে, এ কাজ তাহাদের এতই ভালো লাগে যে, বিপদ-সত্ত্বেও তাহারা ইহা না করিয়া পারে না। একজন জানোয়ার শিক্ষক তাহার পুত্রকে ধর্মযাজক করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, আর মনে একরকম নিশ্চিন্ত ছিল যে ছেলে বড় হইলেই পাদ্রি হইবে। ইহার মধ্যে একদিন দেখে যে সেই ছেলে জানোয়ারের খাঁচায় ঢুকিয়া আছে। ভয়ে বেচারার প্রাণ উড়িয়া গেল, সে ছেলেকে বলিল, 'বাবা যদি প্রাণ নিয়ে বাহিরে আসিতে পার, এমন ঠেঙ্গানি দিব, যে জন্মে তেমন ঠেঙ্গানি খাও নাই।' কিন্তু ছেলে বাহিরে আসিলে তাহাকে আর কিছু বলিল না। সুতরাং সে ছেলেও কালে জানোয়ারের ব্যবসায়ই অবলম্বন করিল।

কিন্তু এই ব্যবসায় যাহারা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাদের অন্য কারণও ছিল দেখা যায়। মার্টিন

নামক এক ব্যক্তি এই ব্যবসায়ের পথপ্রদর্শকদিগের মধ্যে একজন। সে যে কারণে ইহাতে হাত দিয়াছিল, তাহা এই — মার্টিন সহিসের কাজ করিত, এক সার্কাসওয়ালার ভগ্নীর প্রতি তাহার ভালোবাসা জন্মিল। কিন্তু সার্কাসওয়ালা সহিসের কাছে ভগ্নীর বিবাহ দিতে রাজি হইল না। মার্টিন কিন্তু নিরাশ না হইয়া ইহার এক উপায় স্থির করিল। দিন কয়েক পরে সে সার্কাসওয়ালাকে এক বাঘের খাঁচার ভিতরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিমন্ত্রণ করিল। সার্কাসওয়ালা মনে করিল, বেচারা পাগল হইয়াছে। কিন্তু গিয়া দেখিল, যে মার্টিন সহাস্যবদনে সেখানে বসিয়া আছে, আর বাঘ অতিশয় স্নেহের সহিত তাহার হাত চাটিতেছে। এই এক ঘটনাতেই মার্টিনের মনুষ্যত্ব এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির লক্ষ্মণ দেখিয়া সার্কাসওয়ালা আর তাহার ভগ্নীকে তাহার সহিত বিবাহ দিতে আপত্তি করিল না।

মাছরাঙ্গার স্কুল

আমার তাঁবুর কাছে একটি ছোট নদী ছিল। ঐ নদীতে অনেক ছোট ছোট মাছ থাকিত। একদিন সকালে আমি নদীর ধারে গাছের নীচে বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটি মাছরাঙ্গা উড়িয়া আসিয়া নদীর অন্য পারের মাটির ভিতর কোথায় ঢুকিয়া গেল। সেখানে মাটির নীচে একটা গাছের শিকড়ের আড়ালে লুকান, তাহার বাসা। আমি অনেক দিন মাছ ধরিযাছি, চারিদিকে অনেক মাছরাঙ্গাও দেখিয়াছি, কিন্তু এতদিন তাহার বাসাটি দেখিতে পাই নাই। আমি যখনি যাইতাম, মাছরাঙ্গাগুলি খুব গোলমাল করিয়া নদীর উপরে উড়িয়া বেড়াইত, বোধহয়, তাহার আমাকে বুঝাইতে চাহিত, যে তাহাদেব বাসা উপবেব দিকে কোথাও হইবে।

ইহার পর হইতে মাছ ধরিবার সময়ে আমি ঐ বাসাটাকে খুব লক্ষ্য কবিযা দেখিতাম এবং এইরকমে মাছরাঙ্গাদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য নূতন বিষয় জানিয়াছিলাম। এক মাছরাঙ্গা কখনো অপরের জলে মাছ ধরিতে যায় না, আর অপরকেও নিজের জলে আসতে দেয় না। পরিষ্কারই হউক, আর ময়লাই হউক, নদীর কোনখানে বেশি মাছ, আর কোনখানে কম মাছ, তাহা তাহারা সকল সময়েই বুঝিতে পারে, আর ঢেউ-এর অনেক নীচ দিয়া মাছ দৌড়িয়া গেলেও তাহারা ধরিতে পারে।

এতদিনে আমার চেনা মাছরাঙ্গার ছানাগুলি একটু বড় হইয়াছে। একদিন সকালে একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়া মাছরাঙ্গার গর্ত দেখিতেছি, এমন সময়ে ছানাদের মা তাহার ভিতর হইতে উঁকি মারিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। নদীর ধারে একটা জলো সাপ শুইয়াছিল, মাছরাঙ্গী এক লাফে তাহার উপর গিয়া পড়িল, সে তো ভয়ে দৌড়। কিছুদূরে অল্প জলে কতকগুলি হাঁসের ছানা কোলাহলপূর্বক খেলা করিতেছে, তাহার ভালোমানুষ কাহকেও কিছু বলে না, তবুও মাছরাঙ্গী ছুটিয়া গিয়া বকিয়া ধমকিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। পথের মাঝখানে এক বেচারী ব্যাঙ রোদ পোহাইতেছে, তাহারও ঘাড়ে পড়িয়া মাছরাঙ্গী তাহাকে না তাড়াইয়া ছাড়িল না। তখন সে আবার চারিদিক দেখিয়া, আর যদি কেহ লুকাইয়া থাকে, তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য খুব জোরে একবার শব্দ করিয়া দৌড়িয়া গর্তে ঢুকিল।

খানিক পরে দেখি, একটা ছোট মাছরাঙ্গা গর্তের ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়াছে। বাহিরের জগতের সহিত তাহার এই প্রথম পরিচয়। তাহার চারিদিক দেখা শেষ হইতে না হইতেই কে যেন পিছন হইতে তাহাকে এক ঠেলা দিল। সেও অমনি আর কিছু না বলিয়া উড়িয়া নদীর অন্যপারে একটা মরা গাছের ডালে গিয়া বসিল। তাহার পর আর একটি তাহার পর আরো একটি ঠিক ঐরকম করিয়া বাহির হইল, যেন প্রত্যেককে কি করিতে হইবে, কোথায় যাইতে হইবে, তাহা আগে হইতেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে সবগুলি ছানা সার দিয়া বসিল, তাহাদের নীচে পরিষ্কার জল, উপরে নীল আকাশ, আর চারিদিকে গাছপালা।

এই তাহাদের হাতেখড়ি এবং ইহার জন্য পুরস্কারের অভাব ছিল না। তাহাদের বাবা ভোর হইতে ছোট মাছ ধরিয়া এক জায়গায় জড়ো করিয়াছে। সেই মাছ এখন তাহাদিগকে খাইতে দিয়া সে তাহার নিজের ভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, এতদিন তাহারা যে অন্ধকার গর্তে ছিল, এই পৃথিবী সেরকম নয়। এখানে ভালো-ভালো খাবার জিনিস অনেক পাওয়া যায় সুখও খুব আছে।

ছোট-ছোট মাছরাঙ্গাগুলির এখন মাছ ধরিতে শিক্ষা চাই। একটা নিরিবিলি জায়গায় তাহাদের স্কুল বসিল। এখানে খুব কম জল আর জলের নীচে কাদার উপরে মাছ স্পষ্ট দেখা যায়। জলের উপর একটা গাছের ডাল ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, বড় মাছরাঙ্গা দুইটা অনেকগুলি ছোট-ছোট মাছ মারিয়া ঐ ডালের নীচে জলে ছড়াইয়া রাখিল। তাহার পর ছানাগুলিকে আনিয়া ডালের উপর বসাইয়া, নিজেরা এক-একবার ডুব দিয়া দেখাইয়া দেয়, আর তাহাদিগকেও সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিতে বলে। ছোট মাছরাঙ্গাদের ক্ষুধা পাইয়াছিল কাজেই মরা মাছগুলি ধরিতে তাহাদের উৎসাহের কোনরূপ ত্রুটি হইল না। যাহারা একটু ভীতু, প্রথমে জলে নামিতে ভরসা পায় নাই, লোভে পড়িয়া শেষে তাহাদেরও সাহস হইল।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন নদীর ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি একটা ছোট জলা জায়গা দেখিতে পাইলাম। ঐ জলের সঙ্গে নদীর কোনো যোগ নাই। জলের মধ্যে কতকগুলি মাছ যেন হঠাৎ কোনো অচেনা জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে, এইভাবে ছুটাছুটি করিতেছে। আমি ভাবিতে লাগিলাম, মাছগুলি কি করিয়া নদী ও ঐ জলের মাঝখানের জায়গাটুকু পার হইল। এমন সময়ে দেখি যে, একটি মাছরাঙ্গা মাছ মুখে করিয়া উড়িয়া আসিতে আসিতে আমাকে দেখিয়াই ঘুরিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। তখন মনে করিলাম, বুঝি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য আরো কোন অদ্ভুত উপায় বাহির হইয়াছে। এই ভাবিয়া ঝোপের আড়ালে লুকাইলাম। ঘন্টাখানেক পরে মাছরাঙ্গাটি চুপিচুপি আসিয়া একবার সাবধানে সকল দিক দেখিয়া, আবার ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে তাহার সমস্ত পরিবার লইয়া সেই জলার ধারে উপস্থিত। মাছ ধরা আরম্ভ হইল। ছানাগুলি তাহাদের মা-বাপকে ডুব দিতে দেখিয়া আর তাহাদের ধরা মাছের আস্বাদন পাইয়া নিজেরাও ডুব দিতে লাগিল। প্রথমবার কিছুই ধরিতে পারিল না। তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বড় মাছরাঙ্গারা কয়েকটা আহত মাছও অন্যান্য মাছের সঙ্গে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহারা বেশি ছুটিতে পারে না, কাজেই তাহাদিগকে ধরা সহজ। ছোট মাছরাঙ্গারা প্রথমে সেই-সব মাছ ধরিল। দু-একটা ধরিয়াই তাহারা যেন মাছ ধরিবার সন্ধান বুঝিয়া ফেলিল। তাহার পর ঠোঁট নীচের দিকে

ও লেজ উপরের দিকে করিয়া টুপ্‌ করিয়া জলে পড়ে, আর মাছ ধরে।

নদীতে খুব স্রোত, সেখানে মাছ ধরা শক্ত, আর যেখানে কম জল, সেখানে মাছও কম। সেইজন্য মাছরাঙ্গা বুদ্ধি করিয়া এই জলটুকু বাহির করিয়াছে, আর নিজে মাছ আনিয়া তাহাতে ছাড়িয়াছে। প্রথম শিখিবার সময়ে মরা মাছ ছিল, কিন্তু এবারের মাছ জীয়ন্ত। তাহাদের নদীতে পলাইবার পথ নাই, চারিদিক বন্ধ। কাজেই বাচ্চাদের মাছ ধরিবার সুবিধা, কারণ যত ইচ্ছা সময় লইতে পারে।

ইহার পর আবার যখন এই মাছরাঙ্গা পরিবারের সহিত আমার দেখা হইল, তখন তাহারা সকলেই খুব মাছ ধরিতে শিখিয়াছে। এখন আর আহত করা কিম্বা কয়েদ করা মাছের দরকার হয় না। তাহারা সকলেই খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। একদিন তাহাদের এক চমৎকার খেলা দেখিলাম। আমি আগে আর কখনো মাছরাঙ্গার খেলা দেখি নাই।

জলের উপর তিনটা ডালে তিনটি মাছরাঙ্গা বসিয়াছে। হঠাৎ ঠিক একসঙ্গে ঠোঁট নীচু করিয়া তিনজনেই ডুব দিল, আর তখনই উঠিয়া নিজের নিজের জায়গায় গিয়া বসিল। প্রত্যেকের মুখে এক-একটি মাছ। সেই মাছ গিলিবার জন্য তাহারা বেজায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কাহারো বিষম খাইবার জোগাড়! এই খেলার উদ্দেশ্য, কে আগে ডুব দিয়া মাছ আনিয়া গিলিতে পারে। যে একবারে মাছ পায় না সে বেচারী মুখ ভার করিয়া নিজের ডালে গিয়া বসে। খেলা শেষ হইলে সকলে মিলিয়া নাচে, আর তাহাদের নিজের ভাষায় গান করে। ইহাদের জীবনের কাজই কেবল খাওয়া আর আনন্দ করা।

সুন্দরবনের জানোয়ার

কয়েকটি সাহেব জাহাজে করিয়া সুন্দরবন দেখিতে গিয়াছেন। জাহাজ-খানি রায়মঙ্গল নদীতে নঙ্গর করিয়াছে, সাহেবরা একটি ছোট্ট স্টীম বোটে কবিয়া একটা খালে ঢুকিয়াছেন। প্রায় সমস্ত দিন নালায় নালায় ঘুরিয়া বিকাল বেলায় একটি ছোট নদীতে আসিয়া তাঁহাদের বোট থামিল।

নদীর অপর পারে কয়েকটি শুয়োরছানা তাহাদের মায়ের সঙ্গে সঙ্গে মাটি খুঁড়িয়া বেড়াইতেছে। জলে অনেকগুলি কুমির নাক জাগাইয়া রহিয়াছে।

হঠাৎ একটা বাঘ ঝোপের ভিতর হইতে লাফ দিয়া আসিয়া একটি শুয়োরছানাকে ধরিয়া লইয়া গেল, তাহাতে আর শুয়োরগুলি চ্যাঁচাইয়া আকাশ ফাটাইয়া দিতে লাগিল। তাহার পরের মুহূর্তেই তাহাদের বাপ বিশাল এক বরা বন হইতে আসিয়া বাঘের সামনে দাঁড়াইয়াছে। বাঘও তখন শুয়োরছানাটিকে রাখিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। খানিক দুজনেই দুজনের দিকে তাকাইয়া আছে, কেহ কিছু বলে না। তারপর বাঘ ঘন ঘন লেজ নাড়িতে নাড়িতে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, বরাও রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া তাহার উত্তর দিল।

বাঘের চেষ্টা সে তাহার পিছনে গিয়া তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে, কিন্তু বরা তা করিতে দিবে কেন? বাঘ যতই বরার পিছনের দিকে ঘুরিয়া যাইতে চাহে, বরা ততই তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়। এমনি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যেই দুজনে কাছাকাছি হইয়াছে, অমনি

বরা গুলির মতো ছুটিয়া বাঘকে মারিতে গেল। বাঘও তৎক্ষণাৎ পাশ কাটিয়া বরাকে ভয়ংকর এক চাপড় মারিল। সে চাপড় বরার পিঠে পড়িলে তাঁহার পিঠই ভাঙ্গিয়া যাইত, কিন্তু বরা তাহা কাঁধ পাতিয়া লওয়াতে তাহার কিছুই হইল না, কেন না তাহার সে জায়গা লোহার মতো মজবুত। এই গোলমালে বাঘ একটু অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছিল, সেই হইল বরার সুযোগ। সে আর বাঘকে সামলাইতে না দিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার পেটে দাঁত বসাইয়া দিল। সেই যে দাঁত বসাইল, আর বাঘ কিছুতেই সে দাঁতকে ছাড়াইতে পারিল না। সে প্রাণপণে বরাকে আঁচড় কামড় দিতে লাগিল বটে, কিন্তু বরা তবুও তাহার সমস্ত শরীর চিরিয়া ফালিফালি করিয়া দিল। বাঘ মরিয়া গিয়াছে, তথাপি বরা তাহাকে ছাড়ে না। শেষে বরা চলিয়া গেল তখন দলে দলে কুমির আসিয়া সেই বাঘটাকে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

বেলা শেষ হইয়া আসিল, সাহেবরাও তাড়াতাড়ি বোট ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার খানিক দূরে আসিয়াছেন এমন সময়ে অনেকগুলি শুয়োরছানা ছুটিয়া আসিয়া প্রাণপণে সাঁতারাইয়া নদী পার হইতে আরম্ভ করিল। অমনি দেখাগেল যে চারিদিক হইতে কুমিরেরা তাহাদিগকে খাইবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার পরের মুহূর্তেই একটি শুয়োরছানা চ্যাঁচাইয়া উঠিল, আর তাহাকে দেখা গেল না। আর একটা পিছনে ঠ্যাং ধরিয়া সাহেবের আরদালী তাহাকে বোটে তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কুমিরও জলের ভিতর হইতে মাথা ভাসাইয়া হাঁ করিয়া সেটাকে ধরিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু নাগাল পাইল না, লাভের মধ্যে সাহেবদের বন্দুকের গুলীতে তাহার নাক উড়িয়া গেল। শুয়োরটা ততক্ষণে বোটের তলায় শুইয়া বিষম চ্যাঁচামেচি জুড়িয়াছে। সেই শব্দে চারিদিক হইতে কুমির আসিয়া বোটে উঠে আর কি! শুয়োর যতই চ্যাঁচায় কুমিরগুলিও ততই ক্ষেপিয়া যায়। শেষে একটা একেবারে বোটের ধারে মাথা তুলিয়া দিয়া হাঁ করিয়া একজন খালাসীকে খাইতে আসিল। সাহেবরা সকলে মিলিয়া আর সব কুমিরের উপর গুলি চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহার ভয় পাইবার নয়। যাহারা গুলি খাইয়াছে, তাহারা ছট্‌ফট্ করিতেছে, আর গুলি বোটের চারধারে অসিয়া দাঁত কট্‌মটাইতেছে। একটাতো আসিয়া এক কামড়ে একজনের বন্দুকই কাড়িয়া নিল, আর একটু হইলে সেই লোকটিকে অবধি লইয়া যাইত। বাস্তবিক সেদিন সাহেবদের একটু বেগতিকই হইয়াছিল, হঠাৎ বুদ্ধি না জোগাইলে কি হইত কে জানে? কোনোমতেই কুমিরগুলিকে তাড়াইতে না পারিয়া শেষে তাহারা অনেকটা কেরসিন তেল বোটের চারিদিকের জলে ঢালিয়া দিলেন। কুমির মহাশয়দের চোখ দুটি থাকে ঠিক জলের সমানে সমানে। কাজেই দেখিতে দেখিতে সেই কেরসিন তেল তাঁহাদের চোখে গিয়া ঢুকিল। এমন ওষুধ আর কখনো তাঁহারা চোখে মাখেন নাই, এমন চিড়বিড়ির মজাও বোধ হয় আর জীবনে কখনো পান নাই।

শুয়োর খাওযার শখ তো তাঁহাদের মিটিলই, তখন তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলায়ন করিতে পারিলেই তাঁহারা বাঁচেন। ইহার পর আর সাহেবদের কোন বেগ পাইতে হয় নাই, তাঁহারা ভালোয় ভালোয় জাহাজে আসিয়া পৌঁছলেন।

বাঘের গল্প

বাঘ যে কেমন ভয়ঙ্কর জন্তু সে কথা আর আমাদিগকে বলিয়া বুঝাইতে হয় না। এই ভয়ঙ্কর জন্তু যে মাঝে মাঝে হাসির কাজও করে, সেই কথাই আমি আজ বলিতে আসিয়াছি। দুঃখের বিষয়, গল্পগুলির প্রত্যেকটিই সত্য কিনা, এ কথা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে, এইমাত্র বলিতে পারি যে, যাহারা প্রথমে গল্পগুলি বলিয়াছিল তাহারা খুব গম্ভীরভাবেই বলিয়াছিল।

বাঘের যদি কোনরকম খাবার না জোটে, তবে দু-একটা মাছ ধরিয়া খাইতে তাহার আপত্তি নাই। একটি ভদ্রলোক আমাকে বলিয়াছিলেন যে একবার তাঁহাকে নৌকায় চড়িয়া কয়েক মাস সুন্দরবনে থাকিতে হয়। সেই সময়ে তিনি রোজ ভোরবেলায় একটা বাঘকে দেখিতে পাইতেন, সে জলের ধারে ধারে চলিয়া যায়, আর মাঝে মাঝে খপ্ করিয়া যেন একটা কিছু ধরিয়া সেটাকে কাদায় গুঁজে রাখে। খানিকবাদে আবার সে ফিরিয়া আসে, আর সেই জিনিসগুলি তুলিয়া খায়। ভদ্রলোকটি ভাবিলেন, বিষয়টা কি, না দেখিলে তো নয়। তিনি খুব সাহসী লোক ছিলেন, শিকার করাই ছিল তাঁর কাজ। তাই পবদিন ভোরবেলায় বাঘ আসিবামাত্রই তিনি বন্দুক হাতে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। বাঘ শিকার ধবিয়া কাদায় গুঁজিতে গুঁজিতে যখন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনিও নৌকা হইতে নামিযা সেই পথে চলিলেন। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বাঘ যে শিকার ধরিয়াছে, সেগুলি ছোট-ছোট মাছ। বাঘের মেজাজটা বোধ হয় একটু শৌখিন-গোছের ছিল, খাইতে খাইতে শিকাব ধরাটা সে পছন্দ করিত না। তাই সে আগে অনেকগুলি মাছ ধরিয়াঁ লইয়া, তারপর মনের সুখে সেগুলি খাইত। যাহা হউক, সেদিন অন্তত তাহার মাছ ধরাই সার হইয়াছিল, খাইবার সুবিধা আর হয় নাই।

আর-এক বাঘ এক বিলের ধারে গিয়াছিলেন, মাছ ধরিয়া খাইতে গিয়াই তিনি দেখিলেন, জলের উপরে একটা মাছ ছট্‌ফট্ করিতেছে। বাঘ মহাশয় তো তখনই তাহাকে কপ্ করিয়া গিলিয়া বসিয়াছেন, সেটা যে একটা প্রকাণ্ড বঁড়শিতে গাঁথা ছিল সেদিকে খেয়াল করেন নাই। বঁড়শি তো মাছের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে তাঁহার পেটে গিয়া বিঁধিয়া বসিয়াছে, তারপর বাঘ মহাশয় যখন চলিয়া যাইতেছেন তখন সে বলে, 'কোথায় যাও?' সে রাত্রে বাঘের চিৎকারে আর আশপাশের গ্রামের লোকের ঘুম হয় নাই। তার পরদিন সকালবেলায় তাহারা আসিয়া দেখে, বাঘ বঁড়শি গিলিয়া হাঁ করিয়া মরিয়া রহিয়াছে।

আর-এক বাঘ গিয়াছিল এক কুয়ার ধারে, বাছুর খাইতে, বেটা এমনি আনাড়ি ছিল যে, লাফাইয়া কোথায় বাছুরের ঘাড়ে পড়িবে, না সে কুয়ার ভিতরে। তখন সে চিৎকার! কিন্তু চ্যাঁচাইলে কি হইবে? তাহাতে তো আর কুয়া হইতে উঠিয়া আসা যাইবে না, লাভের মধ্যে বাঁশ লইয়া গ্রামের লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর যাহা হইল, বুঝিতেই পার।

আর-এক বাঘ গাছে উঠিয়া বসিয়াছিল। মতলবটা এই যে, সেই পথে গোরু বাছুর আসিলে তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে। গোরু যখন আসিল তখন সে লাফ দিল বটে,

কিন্তু গোরুর ঘাড়ে পড়িবার আগেই পেটে বিষম বাঁশের খোঁচা লাগিয়া তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। একটা সরু বাঁশ কেহ ট্যারচা কোপে কাটিয়া নিয়াছিল, তাহার গোড়ার দিকটা ছুরির মতন ধারাল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাঘ তাহা দেখিতে পায় নাই।

সান দেশে ভয়ানক বন, আর তাহাতে বাঘও তেমনি। সেই দেশে আমাদের একজন জরীপ করিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে লোকজন অনেক ছিল, আর ছিল তাহার চাকর শশী। সকালে উঠিয়াই চারটি খাইয়া জরীপে বাহির হইতে হয়, তাহার আগে রান্না শেষ হওয়া চাই, তাই শশী রাত চারটায় উঠিবার জন্য ঘড়িতে 'য়্যালার্‌ম' চড়াইয়া রাখে। থাকিতে হয় তাঁবুতে। শশীর এক তাঁবু, তাহার মনিবের এক তাঁবু, আর সকলের আলাদা তাঁবু। রাত্রে বাঘ আসিয়া শশীর তাঁবুতে মাথা ঢুকাইয়াছে। একেবারে ভিতরে আসিতে পারে নাই, তাঁবুর বেড়ার তলা দিয়া কোমর অবধি ঢুকাইয়া ঠেলাঠেলি করিতেছে, আর চারিদিক হাতড়াইতেছে,—আর আধ হাত আসিলেই শশীর মাথা পাইবে। এমন সময় "ক্ক-ড়্-ড়্-র্-র্—!" শব্দে য়্যালার্‌ম বাজিয়া উঠিল। বাঘ ভাবিল "সর্বনাশ! বুঝিআকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।" সে বেজায় চমকিয়া গিয়া এমনি এক লাফ দিল যে, তাহাতে তাঁবুর দড়ি ছিঁড়িয়া, খোঁটা উঠিয়া একেবারে তাঁবুসুদ্ধ উলটপালট! গোলমাল শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল কি ভয়ানক ব্যাপার! তাঁবুর ভিতরে বাঘের বুকের দাগ আর নখের আঁচড় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ভগবানের কৃপায় ঠিক সময়টিতে য়্যালার্‌ম না পড়িলে আর উপায়ই ছিল না।

ইতর প্রাণীর বুদ্ধি

শুনিয়াছি, ঘোড়ায় নাকি গনিতে শিখিয়াছে, কুকুর নাকি গান গাওয়ার কথা কয়। এ-সকল তো খুবই বুদ্ধির কাজ তাহাতে ভুল কি? কিন্তু আমি সেরকম বুদ্ধির কথা বলিতে যাইতেছি না। উপস্থিত ঘটনায় যে ইতর প্রাণীদিগকে ভাবিয়া চিন্তিয়া বুদ্ধি খাটাইতে দেখা যায়, তাহারই কথা কিছু বলিব।

একটা বড় ঘরেব ভিতরে কড়ির নিচে দিয়া কার্ণিশ গাঁথা আছে, একটা প্যাঁচা সেই কার্ণিশে বসিয়া আছে। দুটো কাক বাহির হইতে তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'বাঃ এখন তো এ ব্যাটাকে খোঁচাইবার বেশ সুবিধা।' তাহারা দুজন ঘরের ভিতর আসিয়া প্যাঁচাটার দু পাশে বসিল। প্যাঁচাটা তাহাতে ব্যস্ত হইয়া যেই একটা কাকের দিকে চোখ রাঙাইয়া ফিরিয়াছে, অমনি আর একটা তাহার লেজ ধরিয়া দিয়াছে এক টান। তাহাতে বেচারা থতমত খাইয়া যেই সেটার দিকে ফিরিয়াছে, অমনি এ কাকটা আবার দিয়াছে এক টান। প্যাঁচা তো ভারি মুস্কিলে পড়িল। এর দিকে ফিরিলে ও মারে, ওর দিকে ফিরিলে এ মারে, এখন সে করে কি? তখন তাহার মাথায় এই বুদ্ধি জোগাইল যে ঘরের কোণে গিয়া বসিলে আর কেহ তার লেজ ধরিতে পারিবে না। অথচ কাহারও পানে না ফিরিয়াও দুজনকে চোখ রাঙানো যাইবে। সুতরাং সে ঘরের কোণে গিয়া বসিল। তখন কাকেরা দেখিল যে এ খেলায় আর মজা নাই, কাজেই তাহারা আর সেখানে সময় নষ্ট করিল না।

একটা বাড়িতে কাঙ্গালীদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। একটি ছোট জানালা আছে, সেইখানে একটি দড়ি ঝুলিতেছে। সেই দড়ি ধরিয়া টানিলে একটা ঘন্টা বাজে, অমনি ভিতর হইতে

কে যেন একসরা খাবার বাহির করিয়া দেয়। কাঙ্গালীরা দেখিতে পায় না কে খাবার দিল, যে দেয় সেও দেখিতে পায় না কে খাবার নিল এখন হইয়াছে কি, যত জন কাঙ্গালী আসে, রোজ দেখা যায় যে তাহার চেয়ে এক সরা খাবার বেশি দিতে হয়। ব্যাপারখানা কি দেখিবার জন্য পাহারা বসান হইল। তখন দেখা গেল যে কাঙ্গালীরা চলিয়া গেলে সেই বাড়ির একটা কুকুর আসিয়া ঘন্টার দড়ি ধরিয়া টানে, আর খাবারের সরাটি বাহির হইলে তাহা মুখে করিয়া ছুট দেয়। তাহা দেখিয়া সকলে খুব হাসিল। এখন হইতে রোজ একসরা খাবার লইয়া যাইত, কেহ তাহাকে কিছু বলিত না।

আমাদের 'ভিকু' বলিয়া একটা কুকুর ছিল। সে রাত্রে পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া বাড়ির দরজা বন্ধ দেখিলে ঠিক মানুষের মতো করিয়া দরজা নাড়িত। বাড়ির লোক ভাবিত কে যেন আসিয়াছে, তা তাহারা ব্যস্ত হইয়া দরজা খুলিয়া দিত, আর দেখিত ভিকু লেজ নাড়িতেছে।

ভিকু যে খালি এমনি করিয়া লেজ নাড়িত তাহা নহে। সে তাড়া খাইলে একটা ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিতে শিখিয়াছিল।

সাধারণত সে অপরিচিত লোক দেখিলে বকিয়া তাড়াইয়া দিত। পাখি, ইন্দুর, বিড়াল পঞ্চাশ হাত দূর দিয়া গেলেও তাহাকে গালি না দিয়া ছাড়িত না, কাছে আসিলে তো ধরিয়াই খাইত। কিন্তু আসলে সে বড় মহাশয় লোক ছিল। একবার আমাদের ছাতের উপর একটা পায়রাকে বাজ ধরিয়া তাহার চোখ কানা করিয়া দেয়। পায়রাটা অন্ধ হইয়া নিচে পড়িয়া গেল, আর পড়িল ঠিক ভিকুর সামনে। অন্য সময় হইলে ভিকু তাহাকে মারিয়া ফেলিত, কিন্তু সেই পায়রাটাকে সে তেমন কিছুই করিল না। সে খালি খানিক মনোযোগের সহিত তাহাকে দেখিল। তারপর যেই বুঝিল যে পায়রাটার কোনো বিপদ হইয়াছে, অমনি সে তাহাকে পাহারা দিতে বসিল, আর সেখান হইতে উঠিল না। বিড়ালগুলি পায়রাটাকে খাইবার জন্য উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল—কিন্তু ভিকুর ভয়ে তাহার কাছে আসিতে পারে নাই।এমনি করিয়া দুদিন গেল। তাহার পরের দিন কোন কারণে ভিকুকে হাসপাতালে পাঠাইবার দরকার হয়। সেই দিন রাত্রেই বিড়ালেরা সুবিধা পাইয়া পায়রাটাকে খাইয়া ফেলিল।

আলিপুরের বাগানে একটি ছোট বানরকে বিস্কুট দেওয়া হইতেছে। সেই বিস্কুটের সঙ্গে একটি মারবেলও তাহার হাতে দেওয়া গেল। মারবেলটি পাইয়াই সে মুখে পুরিয়া দিল, ভাবিল ওটাও বুঝি একরকমের বিস্কুট। বারকতক ওটাকে কামড়াইয়া যখন সে দেখিল যে সেটা ভারি শক্ত, দাঁতে ধরে না, তখন সে তাহাকে জলে ভিজাইয়া রাখিল। ভিজাইলে শক্ত জিনিস নরম হয় এ কথা সে জানিত, কিন্তু সকল জিনিসই যে নরম হয় না, এটুকু তখনো তাহার শিক্ষা হয় নাই।

আর একটি বানরের গল্প এক ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, কতদূর সত্য বলিতে পারি না। বানরটি একটা হাসপাতালের কাছে থাকিত, লোকের অসুখ হইলে সেখানে যায় আর ডাক্তারবাবু তাহাদের হাত দেখিয়া ঔষধ দেন, ইহা সে দেখিত। তারপর একদিন তাহার নিজের অসুখ করিলে সেও গিয়া খুব গম্ভীর ভবে তাঁহাকে হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

একটা কুকুরের পা ভাঙ্গিয়া যায়, একজন ডাক্তার ঔষধ দিয়া তাহাকে ভালো করিয়া

দেন। তাহার কয়েকদিন পরে ডাক্তাব দেখিলেন যে সেই কুকুরটা আর একটা খোঁড়া কুকুর আনিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত করিয়াছে।

একটা বাঘের কথা পড়িয়াছিলাম, সে মানুষ খাইতে বড় ভালোবাসিত। সে গোরু খাইত না, কিন্তু গোরুর দড়ি ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বনের কাছে নিয়া আটকাইয়া রাখিত। তারপর সেই গোরু খুঁজিতে খুঁজিতে মানুষ গিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলে আর তাহাকে ধরিয়া খাইতে বেশি মুস্কিল হইত না।

স্যান্ডার্সন নামে এক সাহেব লিখিয়াছেন যে একবার তাঁহাদের ছাউনি হইতে ক্রমাগত চাউল চুরি হইতে আরম্ভ হয়। চাকরেরা চাউলের বস্তা মাথায় দিয়া ঘুমাইয়া থাকে, তাহাদের মাথার নিচ হইতে কে সেই চাউল চুরি করিয়া লইয়া যায়, তাহারা তাহা টের পায় না। শেষটা চোর ধরিবার জন্য সাহেব নিজেই রাত জাগিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। তখন দেখিলেন যে তাহাদের সর্যূ নামে একটা হাতি ছিল, সেইটা অনেক রাত্রে আসিয়াছে। একজন লোক চাউলের বস্তা মাথায় রাখিয়া ঘুমাইতেছে, সর্যূ আসিয়া প্রথমে শুঁড় দিয়া ভারি যত্নের সহিত তাহার মাথাটি আলগোছ্ ধরিল। তারপর চাউলের বস্তাটি আস্তে আস্তে সরাইয়া নিজের একখানি পা লোকটির মাথার নিচে রাখিয়া দিল। লোকটি ইহার কিছুই টের পায় নাই, সে নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে, আর সেই অবসরে সর্যূ চাউল শেষ করিয়া বস্তাটি পুঁটুলি পাকাইয়া আবার তাহার মাথার নিচে রাখিয়া দিয়াছে।সাহেব এতক্ষণ তামাশা দেখিতেছিলেন, হাতির বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়া আর তাহার খাওয়ার বাধা দেন নাই। খাওয়া শেষ হইলে তিনি ডাকিলেন সর্যূ! অমনি সর্যূ সেখান হইতে দে ছুট!

বিলাতে এক সাহেবের প্রকান্ড এক বানর ছিল, সে তাঁহার খোকাটিকে বড় ভালোবাসিত। একদিন সাহেবের বাড়িতে আগুন লাগিল। সকলেই সেই আগুন নিবাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এদিকে খোকা যে উপরে রহিয়াছে আর সিঁড়িতে আগুন ধরিয়া গিয়াছে কাহারও সে হুঁস নাই। খোকার কথা মনে হইলে সকলে কপাল চাপড়াইতে লাগিল—হায় হায়! এখন উপায় কি হইবে, আর তো উপরে যাইবার সাধ্য নাই। এমন সময় দেখা গেল, বানরটা খোকাকে লইয়া জানালা দিয়া বাহির হইতেছে। তারপর সে খোকাকে সুদ্ধ ধীরে ধীরে নিচে নামিয়া আসল, বিপদও কাটিয়া গেল! তখন হইতে সেই বানরের কি রকম আদর হইয়াছিল, তাহা বুঝিতেই পার।

শিয়ালের বুদ্ধির কথা আর কি বলিব, তোমরা সকলেই তাহা জান, অনেক সময় বেগতিক দেখিলে শিয়াল মুখ সিঁটকাইয়া মরিয়া থাকে। মরা শিয়াল মনে করিয়া কেহ তাহাকে কিছু বলে না। তারপব মুস্কিল চলিয়া গেলে সে আস্তে আস্তে উঠিয়া ঘরে যায়। কুকুরের ছানা হইলে দুটা শিয়াল মিলিয়া দু-দিক হইতে তাহাকে ভ্যাঙচাইতে আসে। কুকুরটা তাহাতে ভারি চটিয়া যেই একটাকে তাড়া করে, অমনি অপরটা ছানা লইয়া ছুট দেয়।

তিমিঙ্গিল

তিমিকে যে গিলে, সে তিমিঙ্গিল। আমাদের দেশের পুরাতন পন্ডিতেরা বলিয়াছেন, যে "তিমি মাছ একশত যোজন (৮০০ মাইল) লম্বা; তিমিঙ্গিল সেই তিমিকে গিলে। তিমিঙ্গি

লকে গিলে এমন মাছও আছে; তাহাকে বলে রাঘব।"

তোমরা তো এ কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে। বাস্তবিক, আটশত মাইল লম্বা মাছের জায়গা সমুদ্রে ভিতরেও হইবে না, তাহাকে যাহারা গিলিবে, তাহাদের জায়গা হওয়া তো পরের কথা। কিন্তু তাই বলিয়া এমন কথা মনে করিও না যে সেকালের লোকে তিমি দেখে নাই। আমাদের এই বঙ্গ সাগরেই তিমি আছে। এইরকম একটা জানোয়ারের দেহ অনেক বৎসর আগে আরাকানের নিকট পাওয়া গিয়াছিল, তাহার চোয়ালের হাড় দুখানি আমাদের যাদুঘরে এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের 'বনের খবর' যিনি লেখেন, তিনি একবার বর্মা যাইবার সময় একটা তিমি দেখিতে পাইয়াছিলেন। 'রঘুবংশে' লেখা আছে যে তিমিরা হাঁ করিয়া জীবজন্তু সুদ্ধ নদীর মুখের জল টানিয়া লয়, তারপর মুখ বন্ধ করিয়া মাথার ছিদ্র দিয়া সেই জল বাহির করিয়া দেয়। বাস্তবিকই তিমির মাথায় ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া পিচকারীর মতো জল বাহির হয়।

আসল কথাটা বোধহয় এই যে, সে কালের লোকেরা জাহাজে করিয়া সমুদ্রে যাইত আর তিমি দেখিতে পাইত। দেখিয়া তাহাদের এমনি আশ্চর্য বোধ হইত যে, তাহাদের হিসাব করিবার অবসরই হইত না, জিনিসটা কতখানি বড়। ষাট হাত হইলে তাহারা হয়তো ভাবিত একহাজার হাত। ইহার উপরে হয়তো আবার দেশে ফিরিয়া গল্প করিবার সময় লোকের তাক লাগাইয়া দিবার ইচ্ছাও যে একটু না থাকিত এমন নহে, কাজেই হাজার হাতের জায়গায় দেখিতে দেখিতে দশহাজার হাত হইয়া যাইত। তারপর সেই গল্প শুনিয়া কবিরা যখন তাহার কথা লিখিতে বসিতেন, তখন তো বুঝিতেই পার।

এমন ঘটনা সকল দেশেই ঘটিয়াছে। আরব্য উপন্যাসে সিন্ধবাদের গল্প তোমরা পড়িয়াছ কি? তাহারা সমুদ্রের চড়ায় উঠিয়া রান্নার আয়োজন করিয়াছিল; জানিত না, যে সে চড়া নয় একটা মাছ। আগুনের তাত লাগিয়া মাছটা জলে ডুব দিল, আর সিন্ধবাদ আর তাহার দলের লোকেরা সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

এ ত ঢের দিনের কথা, গত পৌনে দুইশত বৎসরের ভিতর একজন নরওয়ে দেশীয় পাদ্রি এইরূপ অদ্ভুত জানোয়ারের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সেই জানোয়ারের নাম নাকি ক্র্যাকেন (Kraken); সে ভাসিয়া উঠিলে নাকি আধমাইল চওড়া একটি ছোট্টখাট দ্বীপ হয়।

যা হোক আমি শুধু আষাঢ়ে গল্প বলিতে আসি নাই। আমি বলিতে চাই যে, সেকালের লোকেরা এত বেশি বাড়াইয়া বলিতে গিয়াই সব মাটি করিয়াছে; নহিলে আমরা সহজেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম যে তাহারা মাঝে মাঝে অতি বিশাল একটা জানোয়ার সমুদ্রে দেখিতে পাইত। তাহাব সবগুলিই একরকমের জন্তু না হইতে পারে, কিন্তু তাহার কোন কোনটা হয়ত তিমির চেয়ে বড় ছিল। সেইগুলিকেই হয়ত আমাদের দেশের সেকালের লোকেরা 'তিমিঙ্গিল', 'রাঘব,' ইত্যাদি নাম দিয়াছিল।

এখনো মাঝে মাঝে 'সাগরের সাপ' (Sea Serpent) বলিয়া একটা বিশাল জন্তুর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মাসখানেক আগেও খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম যে এক জাহাজের লোকেরা আবার একটা সাগরের সাপ দেখিয়াছে। এ-সব কথা শুনিয়া কেহ বিশ্বাস করে কেহ হাসে। যাহা হউক ভালো ভালো লোকে এরূপ জন্তু দেখিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আসিয়া তাহার সংবাদ দিয়াছে, এ কথা সত্য। ইহাদের কথা যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে

আমি বলি, সেই জন্তুই তিমিঙ্গিল।

১৮৭৫ সালে পলিন (Pauline) নামক একখানি জাহাজ ভারত সাগর দিয়া যাইতেছিল। একদিন সেই জাহাজের লোকেরা দেখিল যে, তিনটা বড়-বড় তিমি জাহাজ হইতে খানিক দূরে খেলা করিতেছে। সকলে জাহাজের উপর দাঁড়াইয়া সেই খেলা দেখিতেছে। এমন সময় ভয়ঙ্কর এক সাপ জলের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া সকলের বড় তিমিটাকে জড়াইয়া ফেলিল। তিমিটা প্রায় আশি ফুট লম্বা ছিল। সেই প্রকান্ড জানোয়ারের গায়ে দুই ফের দিয়া সাপটা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, তিমিটা সমুদ্র তোলপাড় করিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই পারিতেছে না। এক-একখানি করিয়া তিমির পাঁজরের হাড় মট্‌মট্ শব্দে ভাঙ্গিতে লাগিল, আর মনে হইতে লাগিল যেন ছোটখাট কামানের শব্দ হইতেছে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আর তিমিটার নড়িবার চড়িবার শক্তি রহিল না, তখন সাপটা তাহাকে লইয়া সমুদ্রে ডুব দিল।

সেই জাহাজের লোকেরা এক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট গিয়া এই ঘটনার সংবাদ দেয়, ম্যাজিস্ট্রেট তাহা লিখিয়া রাখেন।

এরূপ জানোয়ার আরো অনেকে দেখিয়াছে, কিন্তু সেগুলি এত বড়ও নয়, আর তাহাদের কেহ তিমি ধরিয়াও খায় নাই। আর, এই-সকল জানোয়ারের চেহারার কথা যেমন শোনা যায়, তাহাতে সন্দেহ হয় যে ইহার সবগুলি হয়তো একরকমের জন্তু নহে। কেহ দেখিয়াছে সাপের মতো, কেহ দেখিয়াছে বান মাছের মতো, কেহ কেহ আবার দেখিয়াছে লম্বা গলাওয়ালা কুমিরের মতো।

পূর্বেই বলিয়াছি, পন্ডিতদের সকলে এ-সকল কথা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু বিশ্বাস করেন, এমন ভালো ভালো পন্ডিতও আছেন

মাকড়সা

ছেলেবেলায় অনেক সময় বড়রা আমাদের বলত, "মাকড়সা মেরো না, পাপ হবে।" "কেন পাপ হবে?" জিজ্ঞাসা করলে বলত, "জান? মাকড়সা আমাদের কত উপকার করে? মানুষ মরে গেলে যম রাজার সামনে তার বিচার হয়। তখন সংসারের যত সবাই এসে বলে, মানুষ ভারি দুষ্টু, মানুষ আমাদের বড্ড জ্বালাতন করে, খালি মাকড়সা বলে, মানুষ আবার কার কি করে? আমি এত বড় জাল পেতে রাখি, কই একটা মানুষকেও তো তাতে পড়তে দেখি না!"

মাকড়সার জাল তোমরা সকলেই দেখেছ। কিন্তু ভালো করে দেখেছ কি? ভারি বুদ্ধি খাটিয়ে সে তার জালখানি তয়ের করে। জালের সরু সরু সূতাগুলি কেমন চমৎকারভাবে সাজানো থাকে তা সকলেই জান।

আমি বলছি মাকড়সার জাল, কিন্তু মাকড়সা নাকি বলে সেটা তার বৈঠকখানা। "ওগো তুমি একটিবার আমার বৈঠকখানায় আসবে?" বলে সে নাকি মাছিকে ডাকে। বোকা মাছি যদি সে কথায় ভোলে তা হলেই সে মারা যায়। মাকড়সার পক্ষে সেটা বৈঠকখানা হতে

পারে, কিন্তু মাছির পক্ষে সেটা জাল বৈ তো আর কিছুই নয়। সে জালে একটিবার পড়লে আর বেচারার পালাবার উপায় থাকে না।

জালের সূতার গায়ে বিন্দু-বিন্দু আঠা থাকে, সেই আঠায় তখনি তাকে আটকে যেতে হয়, তার উপর আবার মাকডসা ছুটে এসে দড়ি দিয়ে তাকে জড়িয়ে ফেলে আর কামড়িয়ে অবশ করে দেয়।

মাকড়সার মুখের চেহারা কি ভয়ংকর। দুপাশের দুটো কাঁটা দিয়ে শিকারকে চিমটি দিয়ে ধরে, অমনি সেই কাঁটার আগা দিয়ে একরকম বিষ বেরিয়ে তাকে অজ্ঞান করে দেয়। তার উপর আবার বেশ করে সূতা দিয়ে জড়িয়ে নিলে শিকারের আর নড়বার চড়বার জো-ই থাকে না। এই সূতা বড়ই আশ্চর্য জিনিস। মাকড়সার পিছনের দিকে গোরুর বাঁটের মতন বাঁট থাকে! সেই বাঁটের ভিতর থেকে আঠা বেরোয় সেই আঠায় হাওয়া লাগলেই তা শুকিয়ে সূতার মতো হয়ে যায়, তাই দিয়ে মাকড়সা জালও বোনে শিকারকেও বাঁধে।

একজন সাহেব একটা মাকড়সার জাল ছিঁড়ে দিলেন, তখন মাকড়সা আর একটা জাল বুনল। এইরকম বার কতক করে দেখা গেল যে মাকড়সার বাঁটেব আঠা ফুরিয়ে গেছে, সে আর জাল বুনতে পারে না। তখন থেকে তার ব্যবসা হল ডাকাতি, অর্থাৎ অন্য মাকড়সাকে তার জাল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সেটা দখল করে নেওয়া।

মাকড়সার জাল না থাকলে তার শিকার ধরার পক্ষে একটু মুশকিল হয়। তখন মরবার ভান করে পড়ে থাকা, মাছি কাছে এলে ঝাঁ করে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়া, এইরকম সব ফন্দির দরকার হয়ে পড়ে। অনেক সময় মাকড়সা শুধু কট্‌মটিয়ে তাকালেই শিকারের ভেবাচাকা লেগে যায়। সে তো আর যেমন তেমন চাহনি নয়। চারটে, ছটা কারুর-বা আটটা আগুনপারা চোখ; সে চোখের নজরে পড়লে শিকার বেচারা আপনি হতেই ঘুরে ফিরে এসে মাকড়সার মুখে পড়ে। তাকে তাড়িয়ে ধরবার দরকার হয় না।

মাকড়সা যদি বাঘের মতো বড় হত, তবে তাকে দেখলে হয়তো আমাদেরও অনেকের ভেবাচেকা লেগে যেত। বাস্তবিক মাকড়সার চেহারা বাঘের চেহারার চেয়েও ভয়ানক। একে তো মুখের গড়নই বিকট, তাতে এর বড় দুই দাঁড়া, তার পেছনে ভয়ানক দাঁতের সার—এর উপর আবার এতগুলো চোখ ঝল্‌মল্‌ করছে। রোঁয়ায় ভরা আটটা পা, তাতে ধারালো নখ। এমন জানোয়ারের কাছে বাঘ আর কত ভয়ানক হবে?

মাকড়সার খোলস দেখেছ? সাপে যেমন খোলস ছাড়ে, মাকড়সাও তেমনি খোলস ছাড়ে। ঘরের কোণে, দরজার পিছনে, এমনি সব জায়গায় অনেক সময় মাকড়সার খোলস দেখতে পাওয়া যায়। জিনিসটা অবিকল মাকড়সার মতো। হাত-পা, নাক-মুখ, নখ-দাঁত, এমন-কি, প্রত্যেকটি রোঁয়া অবধি তাতে বজায় আছে, খালি ভিতরে জিনিস নাই, হাতে নিয়ে দেখলে বোঝা যায় সেটা শুধু খোলা! আমাদের যেমন ভুঁড়ি বড় হয়ে গেলে জামা বদলাতে হয়, তেমন মাকড়সাকেও বাড়তে গেলে খোলস বদলাতে হয়। ডিম থেকে সে যখন বেরোয়, তখন একটি সর্ষের মতো ছোট্ট থাকে। ছোট বটে, কিন্তু দেখতে ঠিক তার মা-বাপের মতো; চেহারার তফাৎ একটুও নাই। তারপর ক্রমে বড় হয় আর খোলস বদলায়।

মাকড়সার মা-বাপের কথা বলতে হলে আর-একটা কথাও বলতে হয়। এদের মধ্যে গিন্নীটিই হচ্ছেন আসল কর্তা; কর্তামশাইকে তার কাছে নিতান্তই জড়সড় হয়ে জোড়হাতে

থাকতে হয়। গিন্নীর মরজি হলে হয়তো বা এক-আধবার কর্তার একটু খাতির করেন। কিন্তু তারপরে হয়তো দেখা যায় যে তিনি তাকে চিবিয়ে খেয়ে মুখ হাত ধুয়ে দিব্যি হাসিমুখে বসে পান চিবোচ্ছেন।

আমার একটু ভুল হল। মাকড়সা চিবিয়ে খায় না, তারা শুধু চুষে রস খায়। ওদের ঐ-সব ধারালো দাঁত শুধু শিকারকে ধরে রাখার আর মারবার জন্য, তাতে খাবার কোনো সাহায্য হয় না। জিভ আছে, ঠোঁট আছে, তা দিয়ে রস চুষে খাওয়ার বেশ সুবিধা হয়।

ছেলেবেলায় মাকড়সার হেঁয়ালী শোনা যেত, তাতে আছে, 'ছয় পা আঠারো হাঁটু।' মাকড়সার যে আটটা পা, তা তোমরা গুনে দেখলেই বুঝবে। যে ঐ হেঁয়ালীটা তয়ের করেছিল, সে হয়তো ছয় পা-ওয়ালা একটা মাকড়সা দেখেই করে থাকবে— সে মাকড়সার দুটো পা কোন কারণে ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেই লোকটি মাসখানেক বাদে আবার যদি সেই মাকড়সাটাকে দেখত, তবে দেখতে পেত সে তার সেই দুটো পা আবার গজিয়েছে। মাকড়সাদের পা ছিঁড়ে গেলে আবার পা হয়। আমার কিন্তু খুব সন্দেহ হয় যে সেই হেঁয়ালীওয়ালা কখনো মাকড়সা ভালো করে দেখেনি; যদি দেখত তবে আঠারো হাঁটু বলত না, কেননা মাকড়সার ষোলোটা বৈ হাঁটু নাই।

মাকড়সানী একবারে প্রায় ছয়-সাতশো ডিম পাড়ে। তারপর সেই ডিমের চারিধারে কাপড়ের মতো ওয়াড় বুনে চমৎকার পুঁটুলি তয়ের করে। কেউ কেউ সেই পুঁটুলিটি সঙ্গে করে নিয়ে বেড়ায়, কেউ কেউ আবার কয়েকটি ছোট পুঁটুলি বানিয়ে তাদের শিকেয় ঝুলিয়ে বৈঠকখানায় রেখে দেয়। ছানাগুলি ডিম থেকে বেরিয়ে প্রথমে কিছুদিন এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকে। তারপর আব একটু বড় হলে তারা যে যার পথ দেখতে বেরোয়। তখন হতে আর কেউ কাবও ধার ধারে না।

শুকপাখি

টিয়া, কাকাতুয়া, চন্দনা, নুরী, ফুলটুসী, ময়না, এবা সকলেই শুকপাখি। অতি প্রাচীনকাল থেকে লোকে এই পাখিকে পুষে আসছে, আর তার কত আদর করছে তার সীমাই নাই। সংস্কৃতে এই পাখির অনেক নাম আছে। খুব বুদ্ধিমান, তাই তার নাম 'মেধাবী'; ঠোঁটটি বাঁকা তাই সে 'বক্রচঞ্চু' বা 'বক্রতুন্ড'; ঠোঁট লাল তাই 'রক্ততুন্ড'; দেখতে ভালো তাই 'প্রিয়দর্শন'; সুন্দর কথা কয়, তাই 'মঞ্জুপাঠক'; 'কী' এমনি শব্দ করে তাই 'কীর'; কথা সঞ্চয় করে অর্থাৎ স্মরণ করে রাখে তাই 'চিমি'।

ঠোঁট লাল বলে শুকের নাম 'রক্ততুন্ড'। এ থেকে এই মনে হচ্ছে যে, যেগুলোকে আমরা টিয়া আর চন্দনা বলি, সেগুলোই আসলে আমাদের শুক, আর গুলোর অনেকেই বিদেশ থেকে আসে। এগুলো গরম দেশের পাখি, পৃথিবীর সকল গরম স্থানেই এদের দেখা যায়। এশিয়ায় আছে, আমেরিকায় আছে, আফ্রিকায় আছে, অস্ট্রেলিয়ায় আছে।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমে যখন সাহেবরা গিয়েছিলেন তখন এই-সকল পাখির জ্বালায় তাদের চাষবাস করাই দায় হয়ে উঠেছিল। পঙ্গপালেব মতো আকাশ অন্ধকার করে তারা শস্যের ক্ষেতে এসে পড়ত, আর শস্যের শীষ কেটে মুখে করে নিয়ে গাছে বসে মনের আনন্দে

খেত। এখন ক্ষেতের সংখ্যা বেশি হয়েছে, এ-সব পাখিও দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে, তাই এখন আর এক-একটা ক্ষেতের উপরে তত বেশি টিয়া দেখা যায় না। আগে যখন ক্ষেতের সংখ্যা অল্প ছিল, তখন এক-এক ক্ষেতে ত্রিশ চল্লিশ হাজার করে টিয়া এসে পড়ত।

টিয়ার ঠোঁট দেখেছ, কি চমৎকার! টিয়া তার ঠোঁট দিয়ে যেমন সহজে আর পরিষ্কার করে শস্যের খোসা ছাড়িয়ে শাঁসটুকু খায় আর কোনো পাখি তেমন পারে না। জিবখানি ঠিক যেন মানুষের জিবের মতো। অনেকে বলেন যে এইজন্যেই টিয়া এমন পরিষ্কার কথা বলতে পারে।

আমার একটি টিয়া ছিল, সে এমন সুন্দর কথা কইত যে, তেমন সুন্দর কথা আর আমি কোনো পাখিকে বলতে দেখি নি। কেউ তার সামনে আছাড় খেলে সে "হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ" করে হাসত। কুকুর দেখলে তাকে 'আ তু!' বলে ডাকত। যে-সব লম্বা কথা সে আওড়াত, তার মধ্যে দুটি হচ্ছে এই—

কৃষ্ণ কথা! কৃষ্ণ কথা!
কৃষ্ণ কথা কওরে প্রাণ,
কৃষ্ণ ভজিলে পরিত্রাণ।
"চক্রধর কৃষ্ণ জগত করতা
ত্বরিতে তরাও কৃষ্ণ তুমি সে ভরসা।"

এই পাখিটি আমাকে বড্ড ভালোবাসত। আমি তার দাঁড়ের কাছে মুখ নিলেই সে খুব মিষ্টি সরু সুরে "উঁ—!" বলে, তার ঠোঁটটি এনে আমার নাকে ঠেকিয়ে রাখত।

এ হচ্ছে টিয়ার চুমো খাওয়া। অনেক টিয়াই এমনি করে থাকে। একবার এই কথা নিয়ে ভারি মজা হয়েছিল।

এক সাহেবের টিয়া চুরি যায়, আর তাই নিয়ে কাছারিতে মোকদ্দমা হয়। টিয়াটি পুলিসের লোকে কাছারিতে এনে হাজির করেছে, এখন সেটি যে সেই সাহেবের, সে কথা প্রমাণ করতে হবে। সাহেব খাঁচার কাছে মুখ নিয়ে গেলেন, অমনি পাখিটি তাড়াতাড়ি এসে আদরের সহিত তাঁকে চুমো খেল। তাতে একটা ছোকরা বলল যে, যে খাঁচার কাছে মুখ নেবে তাকেই পাখি চুমো খাবে। এ কথা প্রমাণ করে দেবার জন্য সে খাঁচার কাছে গিয়ে বলল, "আমাকে একটা চুমো খাতো।" অমনি মাথা ফুলিয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে তার ঠোঁট এমনি কামড়ে ধরল যে ঠোঁটসুদ্ধ ছিঁড়ে নেবার গতিক! সে ছোকরা যতই ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চ্যাঁচায়, টিয়া ততই আরো বেশি করে ঠোঁট বসিয়ে দেয়! অনেক কষ্টে শেষে তাকে ছাড়ানো হয়েছিল।

তারপর গোলমাল থেমে গেলে সেই সাহেব টিয়াটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কুকুর কি বলে?" টিয়া বলল, "ভৌ, ভৌ, ভৌ!" 'বিড়াল কি বলে?' "মিউ মিউ মিউ!"

এক দোকানীর একটা টিয়া দুটি কাজ জান্‌ত। সে শিস দিতে পারত, আর বলতে পারত "ভাগ, বেটা!" একদিন পাখিটা খাঁচায় বসে শিস্ দিচ্ছিল, তাই শুনে একটা কুকুর ভাবল বুঝি তার মুনিব তাকে ডাকছে। এই ভেবে বেচারা যেই ছুটে খাঁচার কাছে এসেছে, অমনি পাখিটা চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, "ভাগ্, বেটা!" তা শুনে কুকুর থতমত খেয়ে তখনি লেজ গুটিয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

আর একটা টিয়া স্পেন দেশে একটা বাড়িতে থাকত সেইখানে সে কয়েকটা স্পেন দেশী কথা শিখেছিল। তারপর একজন ইংরাজ কাপ্তেনের কাছে তাকে বেচে ফেলা হয়। কাপ্তেনের সঙ্গে ইংলন্ডে এসে দিনকতক পাখিটি বড়ই বিষন্ন হয়ে থাকত, কিন্তু সেটা ক্রমে শুধরে এল। শেষে সে ইংরাজী শিখে স্পেন দেশী কথা সব ভুলেও গেল। এমনিভাবে অনেক বছর যায়। ততদিন বুড়ো থুরথুরে হয়ে বেচারার এমনি অবস্থা হল যে সে কিছু খেতে পারে না, এমন-কি, ভালো করে দাঁড়ে উঠে বসতেও পারে না। এমন সময় একদিন স্পেন দেশ থেকে একটি ভদ্রলোক সেই বাড়িতে এলেন। তার মুখে স্পেন দেশী কথা শুনেই পাখিটির হঠাৎ সেই ছেলেবেলার সব কথা মনে পড়েছে। অমনি সে আনন্দে অধীর হয়ে পাখা মেলে চীৎকার করে উঠল আর সেই ছেলেবেলায় যে-সব স্পেন দেশী কথা শিখেছিল অনেক বছর ধরে যার একটি বর্ণও বলে নাই, সেই কথাগুলি আওড়াতে আওড়াতে মরে গেল।

ব্রেজিল দেশে একটা টিয়া নাকি এমনি বুঝে শুনে কথা উত্তর দিতে পারত যে তা শুনে সে দেশের শাসনকর্তা সেটাকে দেখবার জন্য আনালেন। পাখিটা এসেই সেখানে অনেক সাহেব দেখে বলল, "কত সাহেব।" শাসনকর্তাকে দেখিয়ে সকলে জিজ্ঞাসা করল 'ইনি কে?" টিয়া বলল, "সেনাপতি হবে!" সে কোথা থেকে এসেছে, কার পাখি সব সে শাসনকর্তাকে বলল। শেষে শাসনকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই কি করিস?" সে বলল, "হ্যাঁ মুরগির ছানা দেখি।" শাসনকর্তা হেসে বললেন, "তুই মুরগির ছানা দেখিস্?" সে বলল, "হ্যাঁ খুব পারি।" এই বলে ঠিক মুরগি যেমন করে তার ছানাদের ডাকে, তেমনি শব্দ করতে লাগল।

আর একটা টিয়ার মাথা গরম জলে ঝল্‌সে নেড়া হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে সে টাকপড়া লোক দেখলেই বলত, "মাথা ঝলসে গেছে!"

টিয়াপাখি অনেকদিন বাঁচে। একশো বছরের টিয়াপাখিও নাকি দেখা গিয়াছে। কিন্তু সাধারণত এদের আয়ু কুড়ি-তিরিশ বছর হয়ে থাকে। বেশি বুড়ো হলে এদের ঠোঁট এত বেশি বেঁকে যায় যে আর তা দিয়ে খাবার তুলতে পারে না।

টিয়াপাখিরা এমন কথা কইতে পারে, গানও গাইতে পারে শুনেছি, কিন্তু তাদের স্বাভাবিক ডাক বড়ই কর্কশ। এই ডাকটি শুনেই এই পাখির 'কীর' নাম রাখা হয়েছিল। এরা আবার অনেকগুলি মিলে দল বেঁধে থাকে, আর সকালে বিকালে সবাই জুটে প্রাণ ভরে চ্যাঁচায়। তখন ব্যাপারখানা কেমন হয় মনে করে দেখ।

এদের মধ্যে আমাদের দেশী টিয়া আর আফ্রিকার ছেয়ে রঙের টিয়া খুব কথা কইতে পারে। আমেরিকার বড়-বড় টিয়াগুলির নাম ম্যাকাও (MacaW)। এদের গায়ে পালক থাকে না, আর এরা তেমন কথাও কইতে পারে না। কিন্তু এদের গায়ের রঙ ভারি জমকাল।

টিয়াপাখিরা পরস্পরকে খুব ভালোবাসে। একটির কোনোরকম বিপদ হলে আর গুলো কিছুতেই তাকে ফেলে যেতে চায় না। এমন ঘটনাও হয়েছে যে শিকারীর বন্দুকের গুলিতে সঙ্গীদের দলে দলে মরতে দেখেও তারা তাদের ছেড়ে পালায়নি, বরং প্রাণের ভয় ছেড়ে দিয়ে তাদের নিয়ে দুঃখ করেছে, আর তাই দেখে লজ্জা পেয়ে শিকারীদের বন্দুক ছোঁড়া বন্ধ করতে হয়েছে।

সাপের খাওয়া

আমার একবার তিনটা বড়ি একসঙ্গে জল দিয়া গিলিয়া খাইতে হইয়াছিল, তখন আমার মনে হইয়াছিল যে এমন কঠিন কাজও করিতে হয়? সে কথা যদি কোনো একটা সাপে শুনিত, তবে সে আর কিছুতেই হাসি থামাইয়া রাখিতে পারিত না।

সাপেরা মস্ত মস্ত জিনিস গিলিয়া খায়। খাবার জিনিসটা তাহার নিজের চেয়ে ঢের মোটা হইলেও সে সহজে তাহাকে ছাড়ে না, অন্তত একবার গিলিতে চেষ্টা করে। ছবিতে দেখ, সাপটা তাহার চেয়ে কতখানি মোটা একটা ব্যাঙকে গিলিতে যাইতেছে। ব্যাঙটাও কি বোকা। কোথায় লাফাইয়া পালাইবে, তাহার বদলে সে নিশ্চিন্তে বসিয়া আছে। সাপটা আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া খপ্ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলে পর বেচারার টানাটানি দেখ। কিন্তু এখন আর টানাটানি করিয়া ফল কি? সাপে যখন একবার ধরিয়াছে, তখন আর ছাড়িবে না; তাহাব সাক্ষী শেষ তিনখানা ছবি।

চতুর্থ ছবিখানিকে একটু ভালো কবিয়া দেখিবে। সাপটার হাঁ টা কতখানি বড় হইয়াছে। তুমি হাজার চেষ্টা করিলেও এত বড় হাঁ করিতে পারিবে না। আমাদেব চোয়ালের হাড কানের কাছে কব্জা আটকান। এ অবস্থায় যত বড় হাঁ করা সম্ভব, আমরা ততবড় হাঁই করিতে পারি। কিন্তু সাপের চোয়াল আলগা, তাহাব কোনো জায়গা কিছুতেই আটকানো নাই, কাজেই দবকার হইলে সে আমাদেব চেয়ে বড অর্থাৎ তাহাব গালের চামডা যত লম্বা হয়, ততবড় হাঁ করিতে পারে।

দুঃখের বিষয় এ ছবিগুলিতে এই ঘটনাব শেষ দেখান হয় নাই। ব্যাঙটাকে গিলিয়া শেষ করিলে পর সাপের কেমন চেহারা হয়, সেটা দিখিবার জিনিস। সেরূপ চেহারার একটা ছবি দেওয়া গেল। এ ছবির কথা বোধ হয় আমার আব বুঝাইয়া বলিবাব দরকার নাই। খুব খাইলে পেট ভারি হয়, এ কথা আমরা সকলেই মাঝে মাঝে বলি; কিন্তু যথার্থ পেট ভারি যে কাহাকে বলে এইরূপ একখানা ছবি দেখলে তবে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এ উদরটি লইয়া যে ছুটাছুটি করিতে একটু অসুবিধা হইবে, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে। এমন অবস্থায় সাপকে পাইলে তাহাকে ঠেঙ্গাইয়া মারা খুবই সহজ।

ছবির সাপটি একটি বোরা সাপ, তাহার পেটের ভিতরে একটি ছাব্বিশ সের ওজনের ছাগল। সাতদিন আগে এই সাপটি সাড়ে দশ সের ওজনের একটি ছাগল আর একুশ সের ওজনের একটি হরিণ ছানা দিয়া জলযোগ করিয়াছিলেন। ইহার চেয়েও বড় জন্তুকে গিলিতে পারে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এই ছাব্বিশ সের ওজনের ছাগলটা তাহাকে দেওয়া হয়। কেহই মন করে নাই যে এটাকে সে গিলিতে পারিবে, কিন্তু সে ফটোওয়ালা আসিবার আগেই সেকাজ শেষ করিয়া ফেলিল। যাহা হউক ইহাতে তাহার খুব পরিশ্রম হইয়াছিল। আর সে অনেকবার গোঙাইয়াছিল।

কোনো জন্তুকে গিলিবার আগে বোরা সাপ সেটাকে জড়াইয়া ধরে। সে জড়ানো এমনি ভীষণ জড়ানো যে তাহার চাপেই জন্তুটা থেঁৎলা হইয়া যায়। তারপর সাপটা সেটাকে

গিলিতে থাকে। একটা বোরা সাপ এমনি করিয়া দেড় ঘন্টার মধ্যে একমণ ছয় সের ওজনের একটা ছাগলকে গিলিয়া ফেলিয়াছিল।

একবার একটা জন্তুকে গিলিতে আরম্ভ করিলে নাকি সাপের আর থামিবার শক্তি থাকে না। জন্তুটাকে গিলিয়া শেষ করিতে হয়।

সাপের ছাগল গেলার সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। কাফ্রীরা একটা দেওয়ালে ছিদ্র করিয়া তাহার দুপাশে দুটা ছাগল বাঁধিয়া রাখিল। বোরা সাপ আসিয়া দেখিল ফলার প্রস্তুত এখন পাতে বসিলেই হয়!

সে আগে একটি ছাগলকে গিলিল, তারপর দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া গলা বাড়াইয়া আর একটিকেও খাইল. তাতে মজা হইল এই যে, দেওয়ালের দুপাশে দুই ছাগল সাপের গায়ে দুই প্রকান্ড পুঁটুলির মতো হইয়া আছে, সে পুঁটুলি আর দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া গলিতে চাহে না, কাজেই সাপ মহাশয় ছাগুলে গেরোয় বাঁধা পড়িলেন! এমনটি যে হইবে, তাহা জানিয়াই কাফ্রীরা দুটা ছাগল খরচ করিয়াছিল, আর আগে থাকিতেই সাপ মহাশয়ের জন্য বড় বড় মুগুরের জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল। তারপরে যেই তাহারা দেখিল যে তাঁহার ভোজন শেষ হইয়াছে, এখন আঁচাইবার সময়. অমনি—বুঝিতেই পার।

একটা খাঁচার ভিতরে একটা প্রকান্ড বাঘ ছিল, আর সেই খাঁচার পাশে একটা বোরা সাপ ছিল। ইহার মধ্যে কেমন করিযা সাপটা আসিয়া বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়াছে। বাঘ বোধহয় ইহার পূর্বে আর এমন অদ্ভুত জন্তু দেখে নাই, তাই সে ভারি আশ্চর্য হইয়া তাহার তামাশা দেখিতে লাগিল; সে মনে করে নাই যে উহার পেটে কোনো দুরভিসন্ধি আছে। এমন সময় সাপটা হঠাৎ তাহাকে জড়াইয়া ফেলিল। বাঘের তখন বিপদের আর সীমা নাই। গলায় বুকে আর সামনের দুপায়ে বাঁধন পড়িযাছে, দুখানি পাঁজর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যুদ্ধ করিবার বড়-বড় হাতিয়ার গুলি সবই আটকা. বেচারা এখন কি দিয়া প্রাণ বাঁচায়? যাহা হউক , তাহার পিছনের পা দুখানি খোলা ছিল; তাই দিয়া সে প্রাণপণে সাপের গায়ে আঁচড়াইতে লাগিল। হাজার হোক বাঘের আঁচড়। সে আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত হইয়া দেখিতে দেখিতে সাপ মরিযা গেল।

বোরা সাপ যেমন বাঘের হাতে জব্দ হইযাছিল, ছোট-ছোট সাপ (বিশেষত ঢোড়া সাপ) অনেক সময়—তেমনি কই মাছের কাছে জব্দ হয়। কই মাছের কাঁটা বড়ই ভয়ংকর! তাহাকে গিলিতে গেলে সেই কাঁটা গলায় আটকাইয়া যায। তখন আর সাপের বাছা গিলিতেও পারেন না, ফেলিতেও পারেন না। কেবল ওযাক্ তোলাই সার হয়, আর সেই অবস্থায় তাঁর প্রাণটি বাহির হইয়া যায়।

তিমি শিকার

মেরুর নিকটে যে-সকল সাগর আছে, তাহাতে বিস্তর তিমি থাকে। তিমির তেলে বাতি জ্বলে, কাজেই সেটা ভারি দরকারি জিনিস। এই তেলের ব্যবসায়ে বৎসরে প্রায় এক কোটি টাকা লাভ হয়, সেই টাকার লোভে ঢের লোক জাহাজে করিয়া তিমি শিকার করিতে যায়।

এ কাজে বিপদ অনেক। একে তো সেই সকল সমুদ্রই খুব ভয়ানক স্থান। এই সেই দিন দুখানি খুব ভালো জাহাজ তিমি শিকারে গিয়াছিল, সেই দুখানিই খোয়া গিয়াছে। একখানি জাহাজ বরফের পাহাড়ের চাপনে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার কয়েকটি মাত্র লোক অতি কষ্টে রক্ষা পাইয়াছে; আর একটি জাহাজের যে কি হইয়াছে, তাহার কোনো ঠিকানাই নাই।

এ-সকল বিপদ তো আছেই; যতটা সম্ভব তাহার হাত এড়াইবার জন্য লোকে গ্রীষ্মকাল দেখিয়া এই কাজে বাহির হয়। কেননা গ্রীষ্মকালে বরফের ভয় কম থাকে। কিন্তু তিমির মতো এমন বিশাল একটা জন্তুকে মারিতে যাওয়ারই যে ভয়ংকর বিপদ, বরফের বিপদ তাহার চেয়ে বেশী নহে।

তিমিকে শীতের ভিতরে বাস করিতে হয়, কাজেই তাহার গায়ে গরম একটা কিছু না থাকিলে চলে না। উহার চামড়াই হইতেছে সেই গরম জিনিস। সে চামড়ার অধিকাংশই চর্বি, তাহার ভিতর দিয়া শীত প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। সমুদ্রের মাংসখেকো মাছেরা সেই চামড়া খাইতে যারপরনাই ভালোবাসে; তিমি পাইলেই তাহারা দলসুদ্ধ আসিয়া মহানন্দে তাহাকে খাইতে থাকে। তখন ডুব দিয়া একেবারে সমুদ্রের তলায় চলিয়া যাওয়া ভিন্ন আর বেচারার উপায় থাকে না। ছোট-ছোট মাছের নিতান্ত গভীর জলে যাইবাব সাধ্য নাই, কাজেই সেইখানে গিয়া তিমি একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।

কিন্তু সেই গভীর জলে আবার চিরকাল বসিয়া থাকিবার জো নাই, কেননা তাহার খোরাক যে ছোট-ছোট মাছ, তাহারা থাকে উপরে। ইহা ছাড়া, যদিও অনেকে তিমিকে মাছ বলে, তথাপি সে আসলে হাতি ঘোড়ার মতো জানোয়াব। মাছের রক্তের মতো উহার রক্ত ঠান্ডা নহে, কিন্তু হাতি ঘোড়ার রক্তের মতো গরম। শিশুকালে সে হাতি ঘোড়ার বাচ্চার মতো মায়ের দুধ খায়, আর, সেইটাই আসল কথা, হাতি ঘোড়ার মতো তাহারও নিশ্বাস ফেলা চাই। কাজেই আর কোনো কাবণে না হউক শুধু নিশ্বাস ফেলিবাব জন্যই শিশুর মতো তাহাকে বারবার উপরে আসিতে হয়।

তিমির নিশ্বাস ফেলা এক চমৎকার ব্যাপার। আমরা যেমন নাক দিয়া নিশ্বাস ফেলি, তিনি তাহা করে না; উহার শ্বাস প্রশ্বাসের ছিদ্রটি ঠিক মাথার উপরে, একটি ছোট ঢিপির আগায়। শ্বাস ফেলিবার সময় জল আর হাওয়া মিলিয়া সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া শোঁ শোঁ শব্দে প্রকান্ড ফোয়ারা বাহির হয়, আর অমনি মাস্তুলের উপর হইতে শিকারীদের পাহারাওয়ালা "ঐ জল ফুকিতেছে।" বলিয়া চ্যাঁচায়। তখন যে খুব একটা হুলস্থুল পড়িয়া যায়, তাহা বুঝিতেছ।

নৌকা প্রস্তুতই থাকে, আর থাকে হাজার হাজার হাত রশি বাঁধা বড়-বড় দেহাতি বল্লম। মুহূর্তের মধ্যে সেই-সব নৌকা নিঃশব্দে তীরের মতো ছুটিয়া বাহির হয়। শিকারী বল্লম হাতে নৌকার আগায় খাড়া থাকে আর সকলে প্রাণপণে দাঁড় টানে। তিমি এত বিপদের কথা কিছুই জানে না, ইহার মধ্যে বল্লমের বিষম খোঁচা লাগিয়া তাহার প্রাণ চমকাইয়া দেয়। অমনি সে সাগর তোলপাড় করিয়া সেই বল্লম সুদ্ধ ভয়ংকর বেগে তলার দিক পানে ছোটে। বল্লমের দড়ি হুস্ হুস শব্দে খুলিতে থাকে। তখন যদি ক্রমাগত তাহাতে জল না ঢালা হয় তবে তাহা ভয়ানক তাতিয়া নৌকায় আগুন ধরিয়া যাইতে পারে। যদি কাহারও পা উহাতে জড়াইয়া যায়, তবে তখনি পাখানি কাটিয়া যাইবে, না হয় দড়ির টানে লোকটি চিরদিনের

মতো জলের নিচে যাইবে। যদি নৌকায় দড়ি আটকাইয়া যায় তবে নৌকারও সেই দশা হইতে পারে। আর তিমি ডুব দিবার সময় যদি তাহার লেজের বাড়ি নৌকায় লাগে, তবে তো তাহার চুরমার হইয়া যাওয়া ধরা কথা।

দেখিতে দেখিতে তিমি একেবারে সমুদ্রের তলায় গিয়া উপস্থিত হয়, আর এতই বেগে গিয়া উপস্থিত হয় যে তলায় ঠেকিয়া মাঝে মাঝে তাহার মাথা কাটিয়াও যায়। কিন্তু সেখানে গিয়াও আর বেশিক্ষণ থাকিবার জো নাই, আবার নিশ্বাস ফেলিবার জন্য উপরে আসিতেই হয়। নিষ্ঠুর শিকারীরাও বল্লম লইয়া প্রস্তুত থাকে, তিমি ভাসিয়া উঠামাত্রই আর-একটি বল্লম তাহার গায়ে বিঁধাইয়া দেয়, কাজেই আবার বেচারা প্রাণের ভয়ে পাগল হইয়া তলার দিকে ছোটে।

এইরূপে একবার ভাসা, একবার ডোবা, আর ক্রমাগত বল্লমের খোঁচা খাওয়া, এমনি করিয়া বেচারা ক্রমেই কাহিল হইতে থাকে, ইহার পর তাহার মৃত্যু হইতেও আর বেশি দেরি হয় না। তখন তাহাকে টানিয়া জাহাজের কাছে আনিয়া ছুরি কোদাল দিয়া তাহার চামড়া কাটিয়া ফেলা হয়। সেই চামড়া টুকরো করিয়া পিপায় পোরা হইলে, আর একটি কাজ বাকি থাকে, তাহার কথা এখন কিছু বলা দরকার।

তিমি এত বড় জন্তু, কিন্তু তাহার গলার ছিদ্র নিতান্তই ছোট। পুঁটি বাটার চেয়ে বড় মাছ সে গিলিতে পারে না। সে হাঁ করিয়া মাছের ঝাঁক-সুদ্ধ জল মুখের ভিতরে টানিয়া নেয়, তারপর জলটুকু ছাড়িয়া দেয়, মাছ মুখের ভিতরে আটকা পড়ে। যে তিমি লোকে শিকার করিতে যায় তাহার দাঁত নাই, তাহার জায়গায় চিরুনীর মতো একটি জিনিস থাকে। সে চিরুনীর ফাঁক দিয়া মাছ গলে না, কিন্তু জল বাহির হইয়া যয়। এই চিরুনী যে জিনিসের তৈরি, তাহাই 'কাচকড়া'। ইহা অনেক কাজে লাগে, কাজেই ইহাতেও ঢের লাভ হয়। তিমির চামড়া তুলিয়া লওয়া শেষ হইলে, এই কাচকড়ার চিরুনীটি কাটিয়া বাহির করারও নিতান্ত দরকার। সে কাজ হইয়া গেলে আর তিমির শরীরটা দিয়া শিকারীদের কোনো প্রয়োজন থাকে না; কাজেই তাহারা তখন সেটাকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া অন্য শিকার খোঁজে। তারপর সেখানকার যত পাখি, যত মাছ, যত শেয়াল, যত ভাল্লুক সকলে আসিয়া মহানন্দে সেই দেহ ভোজন করে।

এই তিমি গ্রীনল্যান্ড দেশের নিকটে থাকে, তাই ইহার নাম "গ্রীনল্যান্ড তিমি"।ররকাল (Rorqual) বলিয়া ইহাদের চেয়ে বড় আর-এক রকমের তিমি আছে, কিন্তু তাহার এত চর্বি নেই, কাচকড়াও খুব কম। তাহাতে আবার উহার স্বভাবটাও হিংস্র, নৌকাসুদ্ধ কামড়াইয়া ধরিতে চায়। কাজেই ইহাকে শিকার করিতে লোকের তত উৎসাহ নাই।

জানোয়ারের বয়স

জানোয়ারের মধ্যে তিমি মাছ নাকি সবচেয়ে বেশি দিন বাঁচে। অনেকের মতে তিমি মাছ হাজার বৎসর বাঁচে—কিন্তু কথাটা কতদূর সত্য বলা যায় না। হাতি সাধারণত একশো বৎসর বেশ বাঁচতে পারে। গ্রীক রাজা আলেক্‌জান্ডার যখন এসেছিলেন তখন তিনি একটা

হাতি এখান থেকে নিয়ে যান। সেটা নাকি সাড়ে তিনশো বৎসর বেঁচেছিল। কচ্ছপ আর কুমির খুব অনেক দিন বাঁচে, তার অনেক প্রমাণ আছে। আমেরিকার এক চিড়িয়াখানায় এক পোষা কুমির আছে তার বয়স দু-তিনশো বৎসরের কম নয়। সে এখনো বেশ মজবুত আছে।

প্রায় একশো বছর আগে একটা বড় কচ্ছপকে ধরে তার গায়ে তারিখ ইত্যাদি লিখে দেওয়া হয়েছিল—সেই কচ্ছপ এখনোও বেঁচে আছে। ঘোড়া তিরিশ-চল্লিশ বৎসরের বেশি বড় বাঁচে না কিন্তু উট প্রায় একশো বৎসর বেশ বেঁচে থাকতে পারে। শেয়াল, ভালুক, নেকড়ে প্রভৃতি পনেরো-কুড়ি বৎসরের বেশি সাধারণত বাঁচে না। বেড়ালেরও প্রায় ঐরকমই।

পাখিদের মধ্যে রাজহাঁস খুব দীর্ঘজীবী—একশো বৎসর বয়সের রাজহাঁস তো দেখা গেছেই—কোনো কোনোটা নাকি তিনশো বৎসর পর্যন্ত বাঁচে! কাক, বিশেষত দাঁড়-কাক, অনেকদিন পর্যন্ত বাঁচে—আশি নব্বই একশো পর্যন্ত পার হয়ে যায়। কাক যে অনেকদিন বাঁচে এই বিশ্বাস লোকের মনে বরাবরই আছে। আমরা ছেলেবেলায় ভূষন্ডি কাকের কথা শুনেছি— সে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখে বলেছিল "এর চাইতে রামায়ণের যুদ্ধ আর দেবতা অসুরের যুদ্ধটা ভালো হয়েছিল। তখন আমি হাঁ করে কাছে বসে থাকতাম আর আপনা থেকে রক্ত এসে মুখে পড়ত!" ঈগল পাখিও প্রায় একশো বছর পর্যন্ত বাঁচে। আমবা একটা টিয়া পাখির কথা জানি সেটা প্রায় পাঁচশো বছর বেঁচেছিল।

পেঙ্গুইন পাখি

দক্ষিণ মেরুর কাছে অনেক পেঙ্গুইন থাকে। পেঙ্গুইনদের চালচলন বড় মজার; যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বলেন, ঠিক যেন মানুষের মতো। তাদের পিঠের পালক কালো, সামনের পালক সাদা,—সাদা জামার উপরে যেন কালো চোগা। এমনিতর পোশাক পরে, তারা ঠিক মানুষের মতো সোজা হয়ে চলে। দুখানি ডানা আছে বটে, কিন্তু তাতে উড়বার কাজ চলে না, কেন না তাতে পালক নেই। সাঁতরাবার সময় ডানা দুখানিতে খুব কাজ দেয়, আর ঝগড়ার সময় তা দিয়ে ঘুঁষোঘুষি করারও বিশেষ সুবিধা।

আমাদের দেশে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ মেরুতে, পেঙ্গুইনদের দেশে তখন শীতকাল। সে বড় ভয়ানক শীত ;বরফের তাড়ায় তখন মেরুর কাছে থাকবার জো নেই। কাজেই পেঙ্গুইনরাও সেই সময়টা একটু উত্তর দিক পানে এসে কাটিয়ে যায়। মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর, এ কয়মাস তাদের এমনিভাবেই চলে; আর এসময়টাতে কাজকর্মও বেশি থাকে না।

তারপর অক্টোবর মাস এলে তাদের বসন্তকাল উপস্থিত হয়, আর তখন তাদের বাড়ির আর ঘরকন্নার কথা মনে পড়ে। তখন দেখা যায়, দলে দলে পেঙ্গুইন বরফের উপর দিয়ে দক্ষিণ মুখে রওনা হয়েছে। কেউ বেজায় গম্ভীর হয়ে পাড়াগাঁয়ের বড়লোকের মতো দুলতে দুলতে চলেছে, আবার কেউ যাচ্ছে মুখ থুবড়ে পড়ে, পিছলাতে পিছলাতে। বরফ না থাকলে তারা জলের উপর দিয়েই সাঁতরে যাবে। যেমন করেই হক, শেষটা ঠিক গিয়ে তারা

তাদের দেশে পৌঁছাবে, পথ ভুলে যাবে না।

তাদের দেশ কিরকম জান? সে আর কিছু নয়, খোলা সমুদ্রের ধারে খানিকটা খালি জায়গা, সেখানে অনেক নুড়ি পাথর, আর ছোট বড় অনেক টিপি আছে, কিন্তু বরফ বেশি নাই। সেখানে বড্ড হাওয়া, তাতে বরফ উড়িয়ে নিয়ে যায়।

এই হল তাদের দেশ। তোমার আমার কাছে যেমনই লাগুক, ওদের কাছে ঐ ভালো। এইখানে তাদের জন্ম হয়েছিল; তাদের খোকাখুকিরা সকলেই এইখানে হয়েছে। বছর বছরই তারা লাখে লাখে এইখানে আসে কত যুগ যুগান্তর ধরে এমনি চলেছে, তার ঠিকানা নাই।

দেশে পৌঁছেই গিন্নীরা সকলেই এক্কেকটি ছোট্ট টিপি খুঁজে বার করে, তার উপর একটি ছোট্ট গর্ত খুঁড়ে নিয়ে, তাতে খুব গম্ভীর হয়ে বসবে। আরেক বাড়ির গিন্নী যদি এর খুব কাছে আরেকটা টিপিতে এসে বাসা নেয়, তবে এ ওর হাওয়া আটকাচ্ছে বলে দুজনায় বিষম বচসা লেগে যাবে, আর নিজের বাসা না ছেড়ে ঠোকরাবার সুবিধা পেলে তাতেও কসুর হবে না।

এদিকে বাড়ির যে কর্তা, সে বেচারা এখনো বাড়িতে ঢুকতেই পায় নি। চার-পাঁচজনে সকলেই বলছে, "আমি কর্তা! আমি কর্তা!" এখন এর মধ্যে কার কথা ঠিক, তাই নিয়ে ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেছে। পেঙ্গুইনেরা ভারি ভদ্রলোক, তারা ঠোকরাঠুকরি করাকে অসভ্যতা মনে করে। যুদ্ধের সময় তারা শত্রুকে কাঁধ দিয়ে ঠেলে বাব করে দিতে চেষ্টা করে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আর-এক হাতে ধাঁই ধাঁই থাপ্পড় লাগায়।

এমনি করেই সকল শত্রুকে তাড়াতে পারলেই যে কর্তার সব আপদ চুকে যায়, তা নয়। গিন্নী যেই দেখে যে কর্তার জয় হয়েছে, অমনি সে এসে তাকে প্রাণপণে ঠোকরাতে থাকে।

কর্তা খুব বীরপুরুষ হলেও, গিন্নীর ঠোকরগুলি সে নিতান্ত ভালো মানুষের মতো চোখ বুজে শুয়ে হজম করে। সে বেশ বুঝতে পারে যে এতদিন তার একটি মনিব জুটেছে, এখন থেকে এর হুকুম মেনে চলতে হবে।

এরপর কর্তা খুঁজে খুঁজে নুড়ি আনবে, গিন্নীর টিপির উপর বসে তাই দিয়ে বাসা বানাবে। কর্তাদের মধ্যে আবার দু-একজন চোরও আছেন, তাঁরা পরিশ্রম করে নুড়ি কুড়ানোর চেয়ে, অন্যের বাসা থেকে না বলে নিয়ে আসতে খুব মজবুত! ধরা পড়লে এঁদের সাজাটাও হয় তেমনি।

বাসা তয়ের হলে গিন্নী তাতে একটি কি দুটি ডিম পেড়ে দিনরাত উপোস থেকে তাতে তা দিতে আরম্ভ করে। কর্তা ততক্ষণ সমুদ্রে গিয়ে দিন পনেরো খুব খেয়েদেয়ে নেয়। তারপর সে নিজে এসে ডিমের উপর বসে গিন্নীকে ছুটি দেয়। গিন্নীও তখন সমুদ্রে গিয়ে দিনকতক স্নানাহারে কাটায়।

ছানা হলে দুজনায় মিলে তাদের খাওয়ানো নিয়ে ব্যস্ত হয়, আর প্রাণপণ তাদের বিপদ আপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। বিপদ সেখানে অনেক আছে। পাড়ায় গুন্ডার অভাব নাই। তারা বাড়ি ঘরের ধার ধারে না, খালি অন্যের বাসা ভেঙ্গে আর ছানা মেরে বেড়ায়। তাছাড়া একরকম পাখি আছে, তারা সুবিধা পেলেই এসে ডিম খেয়ে যায়। সমুদ্রে নানারকম জানোয়ার থাকে, তারা অনেক সময় ধাড়ী পাখিগুলোকে মেরে ফেলে, তখন ছানাগুলির বড়ই বিপদ হয়।

পেঙ্গুইনদের মধ্যে আবার কতকগুলি স্কুলমাস্টার থাকে। পেঙ্গুইনদের ছানারা একটু বড় হলে তাদের এই-সব স্কুল মাস্টারের জিম্মা করে দেওয়া হয়। স্কুল মাস্টারদের কাছে নানারকম আদব-কায়দা শিখে তারা দেখতে দেখতে পাকা পেঙ্গুইন হয়ে দাঁড়ায়।

ততদিনে গ্রীষ্মকাল ফুরিয়ে আসে, পেঙ্গুইনেরাও সে বছরের মতো ঘরকন্না শেষ করে আবার শীত পড়বার আগে উত্তরে চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়।

লড়াইয়ের বেলা

একটা ষন্ডা আর একটা রোগা লোকে ঝগড়া হচ্ছে। ষন্ডাটা বলল, "মারব তোকে একলাথি!" রোগাটা বলল, "আমার কি পা নেই?" ষন্ডা বলল, "বটে? তোর পা দিয়ে তুই কি করবি?"রোগা বলল, "কেন? ছুটে পালাব!" তখন দুজনেবই খুব হাসি পেল, আর মিটমাট হয়ে গেল।

তবে দেখা যাচ্ছে, সকলের বেলায় যুদ্ধের কায়দা এক বকম হয না। একটা রোগা কুকুর আস্তাকুঁড়ে দাঁড়িয়ে এঁটো পাতা চাটছিল, এরমধ্যে একটা ষন্ডা কুকুর এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। তখন যে দুজনায় লড়াই হল, একটি ছেলে তার এইরকম বর্ণনা দিয়েছিল।--ষন্ডাটা গলা ভার করে বলল, "কুছ্ হ্যা-া-া-া-া-য়?" রোগাটা খেঁকিয়ে বলল, "হে নাই!" অমনি ষন্ডাটা আর কিছু না বলে রোগটার ঘাড় টিপে ধবল, আব তখন রোগাটা "হ্যায়! হ্যায! হ্যায়! হ্যায়!" বলে প্রাণপণে চ্যাঁচাতে লাগল। তোমরা যদি কেউ এরকম ঝগড়া স্বচক্ষে দেখে থাক, তবে বুঝতে বারবে, ছেলেটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছে।

নিজেকে বাঁচিয়ে, দুষমনকে মার—এই হোল যুদ্ধের উত্তম কায়দা। মাবতে না পার, নিদেন নিজেকে বাঁচিয়ে চল, এ কথাও মন্দ নয়। বেগতিক দেখলে ছুটে পালাবারও একটা দস্তুর আছে। অনেক জন্তু অনেকরকম কায়দা করে নিজেকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচায়।

কচ্ছপের ক্ষমতা থাকলেও সে তার শত্রুকে এমনি বিষম কামড়িয়ে ধরে যে সে কামড় ছাড়ানো বড়ই কঠিন হয়ে ওঠে। আর যখন তার ক্ষমতায় অতটা কুলায় না, তখন নিজের খোলার ভিতরে গলা হাত-পা সবগুটিয়ে নিয়ে চুপ কবে বসে থাকে। তখন অনেককেই সেই খোলার কাছে হার মানতে হয়।

এ ফন্দিটা কচ্ছপ ছাড়া আরো কোনো কোনো জন্তুর জানা আছে। তাদের কারও গায়ে কাঁটা, কারও গায়ে শক্ত শক্ত আঁশ। শত্রু এলে তারা হাত পা গুটিয়ে, লেজ মুখ গুঁজে একটি গোলারমতো হয়ে যায়। তখন আর সহজে কেউ তাকে মারতে পারে না। কেন্নো যে টোকা দিলে টাকা হয়ে যায় তা তোমরা সকলেই দেখেছ।

কোনো কোনো জানোয়ার এমন আছে, তারা ভালো করে না লুকিয়েই মনে করে 'খুব লুকিয়েছি'। উটপাখি অনেক সময় লুকোতে হলে গাছের ঝোপে বা কোনো গর্তে মাথা ঢুকিয়ে থাকে— মনে করে কেউ বুঝি দেখতে পাচ্ছে না।

গাঁধি পোকা দেখেছ? তাকে যদি ধরতে যাও তবে সে তার পিছনে থেকে এমনি ঝাঁঝালো একরকম রস ফুকে দিবে যে তার জ্বালায় তোমার চামড়ায় ফোস্কা পড়ে যায়।

একরকম পোকা আছে, তাকে বলে (Bombardier Beetle) অর্থাৎ কামানবাজ পোকা।

বড়-বড় পোকারা যখন তাকে তাড়া করে তখন সে একরকম নীল রঙের ধোঁয়া ছাড়তে থাকে তাতে শত্রুর দম আটকে যায়।

স্কাংক (Skunk) বলে একরকমের জন্তু আছে, তার কায়দাটাও অনেকটা এইরকমের। তার কাছেও এক রকমের রস থাকে। সে রসে ঝাঁজ নাই, কিন্তু তার এমনি বিদঘুটে গন্ধ যে, সে গন্ধ নাকে গেলে ভূতকেও 'বাপ্পোইস্ রে!' বলে পালাতে হয়।

শিয়ালেরও এইগোছের একটা বদনাম আছে। আমাদের একজন বুড়ো চাকর বলেছিল, "কুকুর শিয়ালের কি করবে? গন্ধে তার কাছে ঘেঁষতে পারলে তো? শিয়াল ভারি অসভ্য!"

অনেক মাছ আছে, তারা প্রায়ই পুকুর বা নদীর তলায় সঙ্গে মিশে থাকে। ধরতে গেলে সেখানকার জল এমনি ঘোলা করে দেয় যে তখন তাকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে আর সেই ফাঁকে সে সেখান থেকে চম্পট দেয়।

সমুদ্রের ভিতরে অক্টোপাস বলে একরকম জানোয়ার আছে। ভগবান তাদের প্রত্যেককে একটি করে কালির থলে দিয়েছেন। বিপদের সময় সেই কালি ছড়িয়ে তারা জল ঘোলা করে দেয়। তখন আর তাদের পালাতে কোনো মুশকিল হয় না।

টিকটিকি নিতান্ত ফাঁপরে পড়লে তার লেজটি ফেলে রেখে ছুট দেয়। লেজটি পড়েই লাফাতে থাকে, আর শত্রুতা দেখে আশ্চর্য হয়ে টিকটিকির কথা ভুলে যায়। তার কিছুদিন পরেই টিকটিকির আরেকটা নতুন লেজ বেরয়।

যাহোক পালানই তো আর যুদ্ধের একমাত্র উপায় নয়, আর সে উপায় কিছু জন্তুরা পছন্দও করে না। সে-সকল জন্তুর কথা বলা হল, তারাও নিজেদের ভিতরে খুবই তেজের সঙ্গে লড়াই করে থাকে। আব সে সময় তাদের অনেকরকম অদ্ভুত কায়দা খেলাতেও দেখা যায়।

ছাগলে ছাগলে যখন লড়াই হয়, তখনকার কাণ্ডটা নিশ্চয় তোমরা সকলেই দেখেছ। কাজেই আর তার কথা বাড়িয়ে বলবার দরকার নাই। প্যাঁচার যুদ্ধের আয়োজনটি তার চেয়েও সরেশ। যুদ্ধের সময় কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়াতে হয়, এই তো আমরা জানি। কিন্তু প্যাঁচা তা না করে সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে ছেলেবেলায় একবার আমি একটা আম গাছে উঠতে গিয়ে হঠাৎ একটা প্যাঁচার বাসা দেখতে পেলাম। বাসায় তিনটা ছানা ছিল, তারা সকলেই আমাকে দেখে মস্ত মস্ত হাঁ করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি তো তাতে হেসেই অস্থির। সেখানে একজন বুড়ো মানুষ ছিলেন, তিনি তখন আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে ঐ হচ্ছে প্যাঁচার লড়াইয়ের কায়দা। ওদের গলা ছোট বলে ঠোঁট বাড়িয়ে ঠোকরাবার তেমন সুবিধা হয় না। কাজেই নখ দিয়ে লড়াই করতেই তারা বেশি ভালোবাসে, আর সে কাজটা চিৎ হয়ে করতে পারিলেই যুদ্ধটি জমাট হয়।

মোরগের লড়াইও বেশ মজার। ঠিক ছোট কুস্তিওয়ালার মতো দুটো মোরগ এসে এক-পা বাড়িয়ে স্থির ভাবে সামনা সামনি হয়ে দাঁড়ায়, আর গলা নিচু করে প্রাণপণে চোখ রাঙ্গা রাঙ্গি করতে থাকে। হঠাৎ একবার দেখবে, দুজনেই উছলে উঠছে, আর গলা ফুলিয়ে বিষম ঠোকরাঠুকরি জুড়ে দিয়েছে। দুজনের চেষ্টা কিসে শত্রুর ঘাড়ে কামড়ে ধরে তাকে জয় করবে। মোরগ দুটো বাচ্চা হলে, যুদ্ধ ততদূর গড়াবার আগেই হয়তো একটা বড় মোরগ ছুটে এসে তাদের ধমকিয়ে থামিয়ে দেয়।

মাকড়সার আটটি পা। যুদ্ধের সময় সে তার চারটিতে ভর দিয়ে আর চার পা সুদ্ধ মাথাটি উঁচু করে ভয়ংকর মূর্তি ধরে দাঁড়ায়। তার আসল হাতিয়ার হচ্ছে তার মুখের কাছের ঐ সাঁড়াশী দুটি। চারটি পা তুলে ধরার মতলব এই যে, তা দিয়ে শত্রুর চোট সামলাতে হবে। শত্রু যদি তার দু-একটা ছিঁড়ে ফেলে, তাতেও ক্ষতি নাই, কেননা তার জায়গায় নূতন পা গজাতে বেশি দিন লাগবে না। গঙ্গা ফড়িং যুদ্ধের সময় এমনিভাবে সামনের পা উঁচু করে দাঁড়ায়।

দুঃখিনী

তার নাম কি, তাতে আমার কাজ নাই। বেচারি বড়ই দুঃখিনী। বাড়ি নাই, ঘর নাই, কি খাবে তার ঠিক নাই। দয়া করে যদি খানকতক তরকারির খোসা দাও, তাই খেয়ে সে যারপরনাই খুশি হবে।

এর আগে সে আরেকজনদের বাড়ি থাকত; তাঁরা চলে গেলে নিতান্ত জড়সড় হয়ে আমাদের দরজায় দাঁড়াল। মাথা হেঁট করে শুধু লেজ নাড়ছে আর এক-একবার ভয়ে ভয়ে মুখের পানে তাকাচ্ছে; জানে না রাখবে কি তাড়িয়ে দেবে। শরীরটি রোগা, মুখখানি মলিন, কিন্তু চোখদুটি দিয়ে যেন বুদ্ধি ফুটে বেরুচ্ছে। ঘরের ভিতর বসে খাচ্ছি আর সেই উঠান থেকে সে ভুরু কুঁচকিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে, কান খাড়া করে, তার খবর নিচ্ছে। আমার হাত-পাত থেকে মুখে যাওয়া-আসা করছে, ওর মুখখানিও তার সঙ্গে সঙ্গে উঠছে নামছে।

ওর নাকি মা আছে, সে তার খবর নেয় না। বোন আছে, সে কামড়িয়ে তাকে খোঁড়া করে দিয়েছে। তাই তাকে দাঁড় করিয়ে ছবি আঁকা ভালো মনে হল না; খোঁড়া পা দেখিয়ে বেচারাকে লজ্জা দিয়ে কি ফল?

আমাদের এখানে এসে দুঃখিনীর তিনটি ছানা হল, দুটি খোকা, একটি খুকি। আমরা ভাবলাম, যা হোক, তবু এদের নিয়ে ওর একটু সুখে দিন যাবে। সে কি আর ওর ভাগ্যে আছে? আমাদের হঠাৎ একটু কাজ পড়ল আমরা চলে গেলাম। ভাবলাম, চাকর রইল, সে দুঃখিনী আর তার ছানাগুলোকে দেখবে। আমাদের ও বাড়িতে ঢের ভাত ফেলা যায়, দুঃখিনীর খাবার কষ্ট হবে না। কিন্তু ও বাড়িতে গিয়ে আর দুঃখিনীর খাওয়া হল না। ছানাগুলোকে খানিকের তরেও ফেলে যেতে মার প্রাণ চাইল না। কাজেই মাসখানেক প্রায় উপোস করেই তার দিন কাটাতে হল। আমরা এসে দেখি, বেচারার হাড়গুলো আর চামড়াখানি ছাড়া আর কিছুই নাই। চলতে গেলে টলতে থাকে, প্রাণটি কেবল কোনোমতে দেহে টিকে আছে ছানাগুলো আবার ততদিনে এমনি ডানপিটে হয়ে উঠেছে, দুধ খেতে গিয়ে মাকে কামড়িয়ে কামড়িয়ে ঘা করে দিয়েছে। সেই ঘায়ের যন্ত্রণায় এখন ওরা খেতে গেলেই সে খেঁকিয়ে ওঠে।

একদিন দেখি, দুঃখিনী শুয়ে আছে, ছানাগুলো তার কাছে দুধ খেতে গিয়েছে। ভাবলাম, এবারে দুঃখিনী তাদের ঠেঙাবে। কিন্তু দুঃখিনী তা না করে, উঠে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। ছানাগুলো ভাবল, বাঃ, কি মজা! তারাও তার সঙ্গে সঙ্গে ধেই ধেই করে নাচতে

লাগল। দুঃখিনী নাচতে নাচতে একটু একটু করে খিড়কির দরজার দিকে যাচ্ছে, ছানাগুলোও নাচতে নাচতে তার সঙ্গে চলেছে।

দুঃখিনী তড়াক করে দরজার চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে গেল; ছানাগুলো দেখল এবারে একটু মুশকিল। কিন্তু তারা ছাড়বার পাত্র নয়। দু একবার আছাড়-পাছাড় খেয়ে তারাও শেষে চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে পাঁচিলের বাইরে গিয়ে উপস্থিত হল। তখন দুঃখিনী দুই লাফে পাঁচিলের ভিতরে এসে, আবার তার সেই জায়গাটিতে শুয়ে রইল। ছানাগুলো তখন বুঝল যে মা বড্ড ফাঁকি দিয়েছে।

ভারি চঞ্চল এই ছানাগুলো; আর দিনরাত ঝগড়াটা যে করে! যখন দেখবে তারা ঝগড়া করছে না, তখন নিশ্চয় বুঝতে হবে যে হয় তাদের ঘুম পেয়েছে, না হয় বড্ড শীত লেগেছে। ঝগড়া যেন তাদের খেলারই সামিল; অন্তত গোড়াতে খেলা নিয়েই আরম্ভ হয়। খেলা নানারকমের; তার মধ্যে, একটা কিছু কামড়িয়ে ছিঁড়তে পেলে, সেই হচ্ছে সকলের চেয়ে সরেশ খেলা। এ খেলাটি ছেলে কুকুর, বুড়ো কুকুর সকলেই ভারি পছন্দ করে। আমাদের ও বাড়িতে 'কেলো' হচ্ছে ছেলেদের ভারি আদরের কুকুর।

তার বিছানা আছে, চামড়ার কলার আছে, সুন্দর শিকলি আছে। সেই শিকলিতে যখন সে বাঁধা থাকে, তখন বিষম চ্যাঁচায় আর যখন খোলা থাকে,তখন ছেলেদের সঙ্গে খুব খেলা করে। একদিন ছেলেরা সব কোথায় গিয়েছে, কেলোর সাথী নাই। সে ভাবল, তাই তো, এখন কি করি! সে দেখল খাটের উপব কতকগুলো কাপড় রয়েছে; কাজেই সে তাই নিয়ে খেলা করতে লাগল। ছেলেরা ফিবে এসে দেখল, কেলো তাদের শখের কাপড় সব ফালি ফালি করে রেখেছে। তখন কেলোকে ঠেঙ্গিয়ে তারা সে কাপড়ের দাম আদায় করে নিল।

আরেক রকম খেলা হচ্ছে একটা কিছু বেয়ে ওঠা। তুমি তাদের সামনে দাঁড়াইলেই, তারা লেজ নেড়ে লাফাতে লাফাতে এসে তোমার পা বেয়ে উঠতে চেষ্টা করবে, না পারলে অন্ততঃ চটিখানা কামড়িয়ে দেখবে। আর তোমার পায়ে যদি মোজা থাকে, তবে তো সোনায় সোহাগা।

তোমাকে যদি গাছে উঠতে দেখে, তবে তারা ভাববে, 'আমরাও পারি।' সে বিদ্যা অবশ্যি তাদের জানা নেই, কিন্তু তারা চেষ্টা করে খুবই। আর চেষ্টা করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে। এখন তড়াক তড়াক করে উঠে যায়; কিন্তু যখন তা পারত না, তখন ঐ কাজটাই তারা প্রাণপণ করত। ওঠার চেয়ে তখন চিৎপাত হয়ে পড়াই হত বেশি। তখন গা ঝেড়ে উঠে কাউকে সামনে পেলে, তার উপর ভারি চটত।

ঐটুকু ছোট জানোয়ারের পক্ষে তাদের তেজ আছে খুবই বলতে হবে। দরকার হলে তোমাকেও তারা খেউ খেউ করে শাসাতে রাজি আছে। আগে কাক দেখলেই তাড়াত। এখন কাকেরা এখনো তাদের খুব খাতির করে আর কাছে গেলে সরে দাঁড়ায়। আগে এক বেটা মোরগ আমাদের বাড়ি এসে ভারি বড়াই করত। এখন তাকে দেখতে পেলে, ছানাগুলি এমনি তাড়া করে যে সে বেটা কক্ কক্ করে কোনখান দিয়ে পালাবে তার ঠিক পায় না।

হায়, দুঃখিনী! এখন আর তোমার সবকটি ছানা নাই। তার খুকিটি একদিন ফটকের বাইরে তামাশা দেখতে গেল, অমনি কোথাকার একটা কালো ভূতের মতো মিঙ্গে এসে তাকে ধরে নিয়ে ছুট দিল। তারপর থেকে আর দুঃখিনী তার বাকি ছানাদুটিকে বেশি বকে না।

হাতি

আমাদের দুটো করে হাত আছে, বানরের আছে চারটি। কিন্তু আমাদের কেউ হাতি বলে না, হাতি বলে, যার একটাও হাত নেই, তাকে। আমার অনেকগুলো দাঁত পড়ে গেছে, তবু যা আছে, হাতির ততগুলি নাই। কিন্তু আমি দন্তী হতে পারলাম না, দন্তী হল হাতি।

হাতি যা দিয়ে হাতের কাজ করে, সে হচ্ছে তার নাক। সেটি যে কি আশ্চর্য জিনিস, তা তোমরা সকলেই জান। তাকে যদি হাত বলতে রাজি হও, তবে এ কথাও মানতে হবে যে, এমন আশ্চর্য হাত আর জগতে নাই। আর হাতির দাঁতের কথা ভেবে দেখ, সে জিনিসটিও কম আশ্চর্য নয়। এই আশ্চর্যের খাতিরেই বোধহয় ঐদুটি নাম দেওয়া হয়ে থাকবে।

এখন আমরা হাতির ঘাড়ে চেপে বেড়াই, কিন্তু আমাদের উচিত তাকে মান্য করে চলা, কেননা, এককালে সেই পৃথিবীর রাজা ছিল। তখন মানুষের জন্ম হয়নি, আর কুমিরের বাদশাই চলে গেছে। সেই সময়ে ছোট-বড় শত শত রকমের হাতি মনের আনন্দে এই পৃথিবীময় চরে বেড়াত। এখন আমরা মোটে দুরকমের হাতি দেখতে পাই, আমাদের দেশের হাতি, আর আফ্রিকার হাতি। কিন্তু সেকালে নানারকমের হাতি ছিল। কোনটার চার দাঁত,[১] কোনোটার দুই দাঁত, কোনোটার দাঁত উপরের চোয়ালে, কোনোটার দাঁত নিচের চোয়ালে; কোনোটার শুঁড় লম্বা, কোনোটার শুঁড় ছোট; কোনোটার রোঁয়া নেই, কোনোটা রোঁয়ায় ভরা; কোনোটার বাড়ি গরমের দেশে।

আমাদের দেশে একরকম পুরনো হাতির হাড় পাওয়া গিয়াছে, তার একেকটা দাঁত প্রায় চৌদ্দ ফুট লম্বা ছিল। কলিকাতার জাদুঘরে গেলে এই হাতির হাড় দেখতে পাওয়া যায়। সে যে কতকালের পুরনো হাড়, সে কথা আর এখন ঠিক করে বলবার উপায় নাই। সে হাড় এখন পাথর হয়ে গেছে। পণ্ডিতেরা এ-সব হাড় পরীক্ষা করে দেখেছেন, সেগুলো ঠিক আজকালকার হাতির হাড়ের মতো নয়; সুতরাং এই হাতিগুলো ছিল একটু ভিন্ন রকমের। তাই ওদের একটা নূতন নাম দেওয়া হয়েছে—'স্টেগোডন্ গণেশ'।

আরেকটা হাতির নাম হয়েছে 'ডাইনোথীরিয়ম্'। ইউরোপে এর অনেক হাড় পাওয়া গেছে; আমাদের দেশেও নাকি কিছু কিছু পাওয়া গেছে শুনেছি। এর দাঁত দুটি ছিল নীচের চোয়ালে; একটু বেঁটে গোছের আর নীচের দিকে বাঁকানো। আর একটার ছিল চারটে দাঁত; দুটো উপরে, দুটো নীচে। পণ্ডিতেরা একে বলেন 'ম্যাস্টোডন'।

সাইবিরিয়ার বরফের ভিতরে আরেক রকম হাতি পাওয়া গিয়াছে, তার নাম হয়েছে 'ম্যামথ্'। এর কিনা বরফের উপরে চলাফেরা করতে হত, কাজেই তার গায় মুনিদের দাড়ির মত লম্বা লম্বা রোঁয়া ছিল। মাঝে মাঝে এ-সকল হাতির আস্ত শরীর পাওয়া যায়, তাতে এখনো মাংস চামড়া আর লোম রয়েছে; বরফের মধ্যে থাকায় কিছু পচতে পায় নি। পুরানো হাতির মধ্যে এগুলোই হচ্ছে সকলের চেয়ে নূতন। মানুষের জন্মের পরেও এরা বেঁচে ছিল। আমার বোধহয় ম্যাস্টোডনও ছিল। সাবেক মানুষের হাতের আঁকা এদের ছবি পাওয়া

১. আমি বড় বড় মূলোরমত দাঁতগুলোর কথাই বলছি। এছাড়া অবশ্য হাতির কসে আরও দাঁত আছে।

গিয়াছে।

হাতি ভারি হুঁশিয়ার জন্তু। সে জানে যে তার দেহখানি অনেক মণ ভারি, নরম জমিতে তার পা বসে যেতে পারে। তাই পথের অবস্থা ভালো মতো পরীক্ষা না করে সে কখনো চলে না। কোনো জায়গায় হুচট খেলে, সে কথা চিরকাল মনে করে রাখে। লোকে বলে, 'হাতিরও পিছলে পা'। তার মানে এই যে নিতান্ত সতর্ক লোকেরও মাঝে মাঝে ভুলচুক হয়। হাতির পা পিছলাতে তোমরা দেখেছ? আমি দেখেছি! ভালো মতেই দেখেছি, কেননা আমরা কয়েকজন তখন তার পিঠের উপরে ছিলাম। আর, পিঠের উপরে ছিলাম বলেই, আর কতকটা অন্ধকার রাত ছিল বলেও, আসল ব্যাপারখানা যে কি হয়েছিল তা বুঝতে পারি নি। তবে, এইটুকু বলতে পারি যে হাতিটা বসে পড়েছিল, গড়ায়নি, তাই আজ এই গল্পটি তোমাদের শোনাবার অবসর পাচ্ছি। এটা যে নিতান্তই একটা হাসির ব্যাপার হয়েছিল, সে কথা তোমাদের মানতেই হবে, যদিও ঠিক সেই সময়টাতে আমাদের আদপেই সে কথা খেয়াল হয় নি।

আর হাসির ব্যাপার হয়, যখন কপিকল দিয়ে হাতিকে জাহাজে তোলে। শূন্যে লটকে থাকতে আমার তেমন ভালো লাগে না, এ কথা আমি সরলভাবে বলছি। হাতি নাকি তখন বড্ড বেজায় রকমের চ্যাঁচায়, তা ছাড়া আরো অনেক কাজ করে তার কথা লেখার দস্তুর নাই।

আর হাসির কান্ড হয়, হাতি যখন হাঁচে। এক-একটা মানুষের হাঁচি শুনে চল্লিশ হাত দূরে থেকে চমকে উঠতে হয়, হাতির হাঁচির তো কথাই নাই। হাঁচবার আগে সে কেমন একটু ব্যস্ত আর জড়সড় হয়, তারপর একবাব চ্যাঁচায়, তারপর হাঁচে। তখন যে তার অর্থ বোঝে সেও ভারি আশ্চর্য হয়, আর যে বোঝে না, তার তো প্রাণ-ই উড়ে যায়।

হাতি ভারি বুদ্ধিমান; মাহুতের কত কথাই তার বুঝে চলতে হয়। 'বৈঠ্' বললে বসে, 'ধৎ' বললে থামে, 'মাইল' বললে দাঁড়ায়; (আর খুব হুঁশিয়ার হয়), 'দেলে' বললে ধরে, 'ভরি' বললে ছাড়ে; 'পিচ্ছো' বললে হটে; 'জুগ্' বললে মাথা নোয়ায়; 'থৈরে' বললে শোয়; 'হৈ' বললে সরে; 'বোল্' বললে চ্যাঁচায়, 'ডোগ্' বললে ডিঙ্গায়; 'মার' বললে মারে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, অত বড় জানোয়ার এতটুকু মানুষের ধোকায় পড়ে কেন এত নাকাল হতে যায়? ওকে যে ফাঁকি দিয়ে ধরে, তার কথা শুনলে হাসিও পায়, দয়াও হয়। দুঃখের বিষয়, আজ আর সে কথার জায়গা নাই।

জানোয়ার ডাক্তার

একজন লোক শিকার করতে গিয়েছিল, বনের ভিতরেই তার রাত হয়ে গেল। তখন সে আর বাড়ি ফিরবার পথ না পেয়ে, একটা গাছে উঠে বসে রইল। খানিক বাদে সেখানে একটা প্রকান্ড সাপ এসে একটা হাতিকে ধরে গিলে ফেলল। হাতি খেয়ে তার পেট এমন ভারি হল যে আর সে ভালো করে চলতেই পারে না। তখন সে অনেক কষ্টে একটা গাছের কাছে গিয়ে তার একটুখানি ছাল খুঁটে খেল, আর অমনি দেখা গেল যে, হাতিটাতি সব হজম হয়ে তার পেট আবার কমে গিয়েছে।

পরদিন সকালে শিকারী গাছ থেকে নেমেই সেই গাছের খানিকটা ছাল চেঁছে নিল। তারপর বাড়ি ফিরে চাকরকে বলল। "একটা পাঁঠা কিনে আন।" রাত্রে সেই পাঁঠা রেঁধে, তার সবটাই সে একলা খেয়ে, তারপর সেই গাছের ছাল একটু খেয়ে শুয়ে রইল। পরদিন সকালে চাকর এসে দেখে যে শিকারীর হাড়, মাংস, নাড়িভুড়ি সব হজম হয়ে গেছে, খালি চামড়াখানি আর চুলগুলি পড়ে আছে।

এক গৃহস্থের ছেলেকে সাপে কামড়েছিল। গৃহস্থের একটি পোষা নেউল সেই সাপটাকে মেরে ওষুধ আনতে চলে গেল। গৃহস্থ তখন বাড়ি ছিল না, সে বাড়ি ফিরে দেখল তার ছেলেটি মরে রয়েছে, নেউলটি কোথায় পালিয়ে গেছে। তা দেখে সে ভাবল যে নিশ্চয়ই নেউলেরই এই কাজ, নইলে সে পালাবে কেন? এমন সময় সেই নেউলটি ওষুধ নিয়ে ফিরে এল, কিন্তু গৃহস্থ সে কথা বুঝতে না পেরে লাঠি দিয়ে তাকে মেরে ফেলল। তারপর সে দেখল যে নেউলের মুখে একখানা কিসের শিকড। ছেলের বিছানার কাছে যে একটা সাপ মরে আছে তাও তখন তার চোখে পড়ল। তখন সে মাথায় হাত দিয়ে ভাবল, 'হায় হায়! কি করলাম? আমার ছেলেকে বোধহয় সাপেই কামড়িয়েছে, নেউল তাকে বাঁচাবার জন্য ঐ ওষুধ নিয়ে এসেছে!' সত্যি সত্যিই, সেই শিকড়টুকু বেটে ছেলেটির মুখে দিতে মাত্র সে উঠে বসল।

এ-সব গল্প। রূপকথার ভিতরে অনেক জন্তুর ওষুধ জানার কথা শুনতে পাওয়া যায়। সাপ, শুকপাখি, কোলাব্যাঙ, এরা সকলেই সময় বিশেষে ডাক্তার হয়ে বসে। বেজী যে সাপের ওষুধ জানে, এ কথা আজও অনেকে বিশ্বাস করে।

কুকুরের পেট ভার হলে নাকি সে ঘাস চিবিয়ে খায়। আমি কুকুরকে ঘাস খেতে দেখেছি; কিন্তু তখন তার পেট ভার হয়েছিল কিনা, আর ঘাস খেয়ে সে বেরাম সারল কিনা, এ কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার মনে ছিল না।

যাহক, কুকুরের ডাক্তারির বিষয়ে এর চেয়ে ঢের বেশি ভালো প্রমাণ আছে। কাউন্ট্ ম্যাটি অতি প্রসিদ্ধ লোক, তিনি অনেক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর একটা পুস্তকে আমি পড়েছি যে তিনি একটা কুকুরের কাছ থেকে একটা ভালো ওষুধের সন্ধান পান। কুকুরটার গায় ঘা ছিল; সে রোজ গিয়ে একটা গাছের পাতা চিবিয়ে খেত। তারপর সাহেব পরীক্ষা করে দেখলেন যে সেই গাছের পাতা ঘায়ের খুব ভালো ওষুধ।

আর একবার কোনো ইংরাজি কাগজে আমি একটা প্রকাণ্ড মাকড়সা আর একটা কোলাব্যাঙের যুদ্ধের কথা পড়েছিলাম। মাকড়সাটা অতি ভয়ানক ছিল; সে-সব মাকড়সায় পাখি ধরে খায়। এক সাহেব একদিন দেখলেন যে, একটা কোলা ব্যাঙের সঙ্গে সেটার যুদ্ধ লেগেছে। মাকড়সাটার ভয়ানক বিষ, কিন্তু ব্যাঙ তার কামড়কে গ্রাহ্য করছে না। সে খালি যুদ্ধ করতে করতে এক-একবার গিয়ে একটা গাছের পাতা খেয়ে আসছে। এমনি করে সে মাকড়সার কয়েকটা পা ছিঁড়ে দিল। তখন সাহেবের হঠাৎ মন হল যে ঐ গাছের পাতা খেয়ে বোধহয় ব্যাঙটা বিষের জ্বালা দুর করে। এ কথার পরীক্ষা করবার জন্য সাহেব সেই গাছটা ছিঁড়ে ফেলে দেখতে লাগলেন এরপর ব্যাঙটা কি করে। ব্যাঙটা যুদ্ধ করতে করতে আবার ছুটে এসে যখন দেখল, সে গাছটা নাই, তখন বেচারা বিষের জ্বালায় অস্থির হয়ে অবশের মতো পড়ে রইল; আর তার যুদ্ধ করার শক্তি নাই।

এতে জানোয়ারদের ওষুধ জানার কথা প্রমাণ হয় কিনা, সে কথা ভেবে আমাদের দরকার নাই; কিন্তু অনেক জানোয়ার যে ওষুধের মর্ম বোঝে, এর পরিচয় তাদের কাজেই পাওয়া যায়। একবার একটা কুকুরের পা ভেঙ্গে যায়, এক ডাক্তার তাতে পটি বেঁধে ওষুধ লাগিয়ে সারিয়ে দেন। তারপর একদিন ডাক্তার দেখলেন যে সেই কুকুর আরেকটা কুকুরকে নিয়ে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, সেটারও একটা পা ভাঙ্গা।

একটি ভদ্রলোক আমাকে একটা বানরের গল্প বলেছিলেন, সে একটা হাসপাতালের কাছে থাকত। হাসপাতালের রোজ ডাক্তার আসেন, রোগীরা গিয়ে তাঁকে হাত দেখায়, বানরটা তার সবই দেখে নিয়েছে। তারপর একদিন আর রোগীর সঙ্গে সেও গিয়ে ডাক্তারবাবুর সামনে তার হাতখানি বাড়িয়ে দিল। ডাক্তারবাবু দেখলেন, সত্যি সত্যি তার অসুখ হয়েছে!

আর-এক ডাক্তার সাহেবের পোষা বানরের গল্প পড়েছিলাম, সে রোজ দেখত সাহেব একটা টেবিলের উপরে মড়া রেখে অস্ত্র দিয়ে কাটেন।তারপর আরেকদিন সাহেব সেই টেবিলের কাছে আসতেই বানরটা তাঁকে তার উপর চিৎ করে ফেলে চেপে ধরল। সে এমনি বেজায় ষন্ডা বানর যে সাহেব কিছুতেই হাত ছাড়িয়ে টেবিল থেকে উঠতে পারলেন না। টেবিলের কাছেই সাহেবের অস্ত্রের ব্যাগ; বানরটা ক্রমাগতই হাত বাড়িয়ে সেইটে আনবার চেষ্ট করছে, কিন্তু অল্পের জন্য নাগাল পাচ্ছে না। বেগতিক দেখে সাহেব চ্যাঁচাতে লাগলেন, আর তা শুনে লোকজন ছুটে এসে তাঁকে বাঁচাল, নইলে সেদিন বানর দেখে নিত, তাঁর পেটের ভিতর কি আছে!

কুকুর যে তার ঘা চাটে সেও একরকম ডাক্তারি বলতে হবে। আমাদের কুকুর ছানাটার কানে ঘা হয়েছিল; তার মা রোজ বসে সেই ঘা চাটত। অবশ্য আমরাও ওষুধ দিতাম। তাতেই ঘা সারল, না, চাটাতে সারল, সে কথা বলতে পারি না।

বাঘের ঘা হলে নাকি সে নানান জিনিস দিয়ে তার ভিতর গুঁজতে থাকে, আর তাই নাকি তার ঘাও সারে না। এটা ডাক্তারির সামিল কিনা, সে কথা বলা একটু শক্ত। আর কাচপোকা যে হুল ফুটিয়ে আরশুলাকে অবশ করে, তাকেও ডাক্তারি না বলে বরং ডাকাতি বলাই ভালো।

জার্মানের কুকুর

আজকালকার ভীষণ গোলাগুলির সামনে খোলা ময়দানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা বড়ই কঠিন কাজ। আজকালকার সৈন্যেরা প্রায়ই গর্তের ভিতর থেকে যুদ্ধ করে। একদল ফরাসী সৈন্য তাদের গর্তে বসে আছে, জার্মানরা দল বেঁধে তাদের মারতে আসছে। আর-একদল ফরাসী সৈন্য একটা বনের ভিতরে থেকে 'লাখমারী' বন্দুক দিয়ে সেই জার্মানগুলোকে তাড়াচ্ছে।

'লাখমারী' বন্দুক দিয়ে ভয়ানক তাড়াতাড়ি গুলি ছোঁড়া যায়। এ-সব বন্দুকের ইংরাজী নাম হচ্ছে ''Mitrailleuse''। এর কোনো বাংলা নাম নাই; কিন্তু লাখমারী বললে বোধহয় তোমরা সকলেই বুঝতে পারবে।

যা বলছিলাম। জার্মানরা লাখমারীর গুলিতে জ্বালাতন হয়ে ভাবল যে ওগুলোকে ঐ বন থেকে দূর করতে না পারলে চলছে না। তাই দুপুর রাতে ভয়ানক অন্ধকারের মধ্যে তাদের

দু দল সৈন্য সঙ্গিন বাগিয়ে সেই বনের দিকে রওনা হল। তারা খুবই চুপি চুপি যাচ্ছিল, কিন্তু ফরাসীরা তবু তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে তাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। জার্মানরা ভেবেছিল যে, কাছে এসেই ফরাসীদের উপরে ভয়ংকর আলো ফেলবে। তা হলেই তাদের মারতে খুব সুবিধা হবে। কিন্তু সেই ভয়ংকর আলো যখন দপ্ করে জ্বলে উঠল, তখন তা পড়ল জার্মানদের মুখের উপরে, আর ফরাসীরা মনের সাধ মিটিয়ে গুলি করে তিন মিনিটের মধ্যে সেগুলোকে মেরে শেষ করে দিল। সকালে দেখা গেল যে দুশো আশি জন জার্মান সেখানে মরে পড়ে আছে।

সেই জার্মানদের একজনের একটি কুকুর ছিল। সে তার প্রভুকে এতই ভালবাসতো যে এমন ভীষণ সময়েও তার কাছছাড়া হয় নি। জার্মানটি কপালে গুলি খেয়ে চিৎ হয়ে মরে পড়ে আছে, কুকুরটি গুলিতে খোঁড়া হয়েও, অতিকষ্টে তিনপায়ে দাঁড়িয়ে প্রভুর কপালের সেই গুলির দাগটা চাটছে, আর করুণ স্বরে তার মনের দুঃখ জানাচ্ছে।

একটি ফরাসী কাপ্তানের তাকে দেখে বড়ই মায়া হল, কিন্তু তিনি অনেক মিষ্ট কথা বলেও তাকে ভুলাতে পারলেন না। তাঁর সেই-সব মিষ্ট কথার উত্তরে সে ভালো করে একবার তাঁর দিকে তাকালও না, বরং অতি গম্ভীর স্বরে তাঁকে শাসিয়ে দিল। শেষে তিনি তাঁর লোকদের বললেন, জার্মানটিকে গোর দাও।' প্রভুকে তার কাছ থেকে নিয়ে যাবে, এ কথা কুকুরটির প্রাণে কিছুতেই সহ্য হল না। যতক্ষণ তার সাধ্য ছিল, ততক্ষণ কারও ক্ষমতা হল না যে তার প্রভুর কাছে যায়। তারপর যখন দূর থেকে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে, মুখে মুখোস পরিয়ে দেওয়া হল, তখন আর বেচারা কি করবে? সে বাধ্য হয়ে তখন নিতান্ত দুঃখের সহিত সকলের সঙ্গে তার প্রভুর সমাধি কার্য দেখতে চলল।

গোর দেওয়া শেষ হয়ে গেলে সেই জার্মানটির টুপি আর তলোয়ার ছাড়া আর কিছুই রইল না। ফরাসী কাপ্তান সেই তলোয়াব আর টুপি শুঁকিয়ে কুকুরটিকে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন কুকুরটিও তার প্রভুর এই শেষ চিহ্নদুটিকে চিনতে পেরে তাদের মায়ায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাঁর সঙ্গে চলল। মুখোস তখনো তার মুখে রয়েছে, সেটা খুলতে সাহস হচ্ছে না।

কাপ্তান এই ভাবে কুকুরটিকে তাঁর শোবার জায়গায় নিয়ে একটা বিছানা, —অর্থাৎ কতগুলো খড় একটা কাঠের বাক্সে রেখে দেওয়া হয়েছে, তাই তাঁদের বিছানা, তারই উপরে শুইয়ে দিলেন। সেই জার্মানটির টুপি আর তলোয়ারখানিও তার পাশে রেখে দেওয়া হল, যদি তাতে তার মন একটু ঠাণ্ডা থাকে।

এ-সব দেখেশুনে কুকুরের মনও যেন একটু গলল। কাপ্তান তাকে আদর করতে গেলে এখন আর সে গর্‌গর্ করে না। শেষে একবার একটু লেজ-ও নাড়ল। তখন কাপ্তান বুঝলেন যে আর তার মনে রাগ নাই। রাগ থাকলে কুকুর কখনো লেজ নাড়ে না, সেটি হচ্ছে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা। সেই কৃতজ্ঞতার আরো প্রমাণ এই পাওয়া গেল যে, সে এখন মুখ তুলে তাঁর মুখের পানে স্নেহের সহিত তাকায়। অমনি তার মুখোস খুলে দিয়ে তাকে একটু জল খেতে দেওয়া হোল। তারপর ডাক্তার এসে তার ভাঙ্গা পায়ে ওষুধ লাগিয়ে কাঠ দিয়ে বেঁধে দিলেন। সে সেই বাঁধনশুদ্ধই লাফিয়ে উঠে তার নতুন বাসস্থানটির এদিক সেদিক ঘুরে দেখে নিল। তারপর যখন তার জন্য বাটি ভরা সুরুয়া আর খাবার এসে

উপস্থিত হল, তখন তো আর তার আনন্দের সীমাই রইল না। সেই সুরুয়া খাওয়া হলে কাপ্তান যেই বললেন, "এখন শোও গিয়ে", অমনি নিতান্ত লক্ষ্মীটির মতো সে তার সেই খড়ের বিছানায় উঠে শুয়ে রইল।

এতদিনে সেই কাপ্তানটির সঙ্গে তার খুবই বন্ধুত্ব হয়েছে। এখন আর তাঁকে ছেড়ে সে এক মুহূর্তও থাকতে রাজি হয় না, খানার সময়ই হোক, আর যুদ্ধের সময়ই হোক, ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছেই।

বানরের বাঁদরামি

তোমরা বানরের গালের থলি দেখেছ? বানর তার এই থলি দুটার ভিতরে খাবার পুরে রাখে, তারপর অবসর মতো সেগুলোকে থলি থেকে বার করে খায়। থলির ভিতরে বেশি খাবার পুরলে সেটা ফুলে ওঠে, তখন বানরের চেহারাখানি দেখতে বেশ মজার হয়।

একবার এক চিড়িয়াখানায় একটা বানরের এই থলির ভিতরে একটা বাদাম আটকে গেল, সেটাকে সে কোনোমতেই বার করতে পারল না। তার দরুন তার বড় যন্ত্রণা হতে লাগল, ক্রমে থলিসুদ্ধ টাটিয়ে লাল হয়ে উঠল, তখন সেই থলি কেটে বাদামটি বার করে আবার থলি সেলাই করে দেওয়া ভিন্ন উপায় রইল না।

তোমরা হয়তো বলছ, 'আহা বেচারা!' কিন্তু সেই বানর ভাবল যে কি মজাই হয়েছে। সে তখনি চিমটিয়ে সেলাই খুলে ফেলে সেই ফুটোর ভিতর দিয়ে যা-তা ঢুকিয়ে দিতে লাগল, শুধু যে বাইরের জিনিস সে সেখান দিয়ে মুখের ভিতর ঢোকাত, তা নয়, মুখের ভিতরের জিনিসও সেই ফুটোর ভিতর দিয়ে বার করে আনত। যখন সে এ-সব কাণ্ড করত, তখন তার খাঁচার আর সব বানরের আর আশ্চর্যের সীমাই থাকত না। তারা তার চারদিকে ঘিরে বসে হাঁ করে তামাশা দেখত। সেও তাতে খুব মজা পেয়ে লম্বা লম্বা খড় মুখে দিয়ে, সেগুলোকে সেই থলির ফুটোর ভিতর দিয়ে টেনে বার করে তাদের আরো তাক লাগিয়ে দিত।

বাস্তবিক এটা বানরের পক্ষে বাহাদুরীর কাজ হয়েছিল বলতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতে তার ঘা শুকাবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা হতে লাগল। তখন কাজেই তাকে সেই খাঁচা থেকে সরিয়ে নিতে হল, যাতে তার আর তামেশগির না জোটে। কয়েক দিন সে খুব নরম জিনিস ছাড়া আর কিছু খেতে পেলে না, তাকে শোবার জন্য খড় দেওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। তখন আর সে কাকে ম্যাজিক দেখাবে? আর কি দিয়েই বা দেখাবে? কজেই তার ঘা সারতে আর বেশি দেরি হল না।

আর-এক জায়গায় একটা বানর আর একটা হুণ্ডার (হায়না) পাশাপাশি ঘরে থাকত। দুই ঘরের মাঝখানে কাঠের দেয়াল, সেই দেয়ালে একটি দরজা চাবি দিয়ে বন্ধ থাকে। সেই চাবির ফুটো দিয়ে তাকালে এ ঘর থেকে ও ঘরের ভিতর দেখা যায়। বানরটার ক্রমাগতই চেষ্টা যে, নানারকম শব্দ করে সেই হুণ্ডারটাকে এনে যাতে সেই চাবির ফুটোর ভিতর দিয়ে উঁকি মারাতে পারে। শব্দ শুনে যেই হুণ্ডারটাকে এসে সেখান দিয়ে উঁকি মারে, অমনি বানরটা খড় দিয়ে তার চোখে খোঁচা বসিয়ে দেয়।

খাঁচার সামনের গরাদের ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে হুণ্ডারটাকে নাকে শুড়শুড়ি দেওয়া বানরটার ভারি আমাদের বিষয় ছিল। সে হুণ্ডারটিকে দেখতে পেত না, অথচ আন্দাজের উপরেই ক্রমাগত ঘন্টার পর ঘন্টা তার নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে পাগল করে তুলত। হুণ্ডারটা অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই বানরটার হাতে কামড়াতে পারত না, বেচারা খালি ক্ষেপে অস্থির হওয়াই সার হত।

প্রবাসী পাখি

কতগুলো বক হাঁটু-জলে নেমে ভারি গম্ভীরভাবে মাছ ধরবার ফন্দি আঁটাছে, একসময় একটি রাজহাঁস উড়ে এসে সেইখানে নামল। বকগুলো তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলল, 'বাঃ চোখ লাল, মুখ লাল, পা লাল, তুমি কে হে?'

হাঁস বলল, 'আমি হাঁস।'

বকেরা বলল, 'তুমি কোত্থেকে আসছ?'

হাঁস বলল, 'মানস সরোবর থেকে।'

'সেখানে কি আছে?'

'সোনার পদ্মবন আছে, অমৃতের মতো জল আছে, আর মণি-মাণিকের বেদীওয়ালা গাছ আছে।'

'শামুক সেখানে আছে কি?'

'না।'

এ কথায় বকগুলো হো হো করে হেসে বলল, 'তবে সে ছাই-জায়গা। শামুক নেই, খাব কি?' তারা ঠিক কথাই বলে ছিল, যেখানে খাবার মিলে না, অন্তত আমি তো সেখানে গিয়ে থাকতে রাজি নই, তা সেখানে সোনার পদ্মফুলই থাক, আর মাণিকের বেদীই থাক।

মানস সরোবরে ঢের লোক গিয়াছে। সেখানে সোনার পদ্মফুলও নাই, মাণিকের বেদী বাঁধানো গাছও নাই, হাঁসের এ-সব নিতান্তই বাজে কথা। তবে, তার কথার মধ্যে এইটুকু সত্য হতে পারে যে সে মানস সরোবর থেকে এসে ছিল।

আমি পোষা হাঁসের কথা বলছি না, কিন্তু বুনো হাঁসগুলো যখন শীতকালে আমাদের দেশে আসে, তখন বাস্তবিকই তারা হিমালয় পার হয়ে আসে। মানস সরোবর থেকেও আসতে পারে, তার চেয়েও উত্তর থেকে, এমন-কি, সাইবিরিয়া থেকেও আসতে পারে।

এ কথা অবিশ্বাস করার কোনে কারণ নেই, এ-সকল পরীক্ষিত বিষয়। অনেক পাখির এরকম অভ্যাস আছে। তাদের কারও বেশি শীত সয় না, কারও গরম সয় না, কারও কোনোটাই সয় না। হাঁসগুলো শীতকালে এসে আমাদের দেশে দেখা দেয়, বৈশাখ মাসে চলে যায়। শীতকালে বাংলা দেশের কোনো কোনো জায়গায় এদের কলরবে লোকের ঘুমানো অসম্ভব হয়। তারপর গরম পড়তেই তারা এ দেশ ছেড়ে পালাবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। কেন পাগল হয় তা আমি ঠিক বলতে পারি না। গরমের ভয়ে হতে পারে, আরো কারণ থাকতে পারে। যে কারণেই হোক, নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে তারা তখন চলে যাবেই।

সে সময়ে সন্তানের মায়াও তাদের আটকে রাখতে পারবে না। তারপর আবার শীতকাল এলেই তারা এদেশে ফিরে আসবে।

শুধু যে এ দেশে আসবে তা নয়, ঠিক যে জায়গাটিতে আগে শীত কাটিয়ে গিয়েছিল হয়তো সেই জায়গাটিতেই ফিরে আসবে। কলকাতার চিড়িয়াখানায় একবার হাঁসের গায়ে চিহ্ন দিয়ে এ বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। সেখানকার একটা ডোবায় কতগুলো বুনো হাঁস থাকত, গ্রীষ্মকালে তারা চলে গেল, আবার শীতকালে এসে সেই ডোবায় উপস্থিত হল।

আমি আগেই বলেছি, অনেক পাখিরই এরকম অভ্যাস আছে। এজন্য তারা কত কষ্টই স্বীকার করে। এদেশ থেকে হিমালয় পার হয়ে সাইবিরিয়া চলে যাওয়া কিরূপ কঠিন কাজ, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। অনেক পাখি বড়-বড় সাগর পার হয়ে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যায়। এদের মধ্যে গগন-বেড়ের মতো বড়-বড় পাখিও আছে, তাদের এক-একটার ওজন প্রায় আধমণ। আবার খঞ্জনের মতো ছোট-ছোট পাখিও আছে, যার ওজন এক ছটাকের বেশি হবে না।

আমি ভাবি এই ছোট-ছোট পাখিগুলো কি করে এত বড় সাগর পার হয়ে যায়। না জানি সে কিসের টান, যাতে তাদের এত কষ্ট সইবার শক্তি এনে দেয়। অন্ধকার রাত্রে সেই অকূল পাথারে কে তাদের পথ দেখায়?

আর, কত পাখি! লাখ লাখ, কোটি কোটি। এর কত যে যেতে যেতে পথে মারা যায়, তার সীমা সংখ্যা নাই। শুধু পথের কষ্টে যে তারা মরে তা নয়, চলা ফেরার সুবিধার জন্য সমুদ্রে ধারে জায়গায় জায়গায় বাতি-ঘর থাকে, সেখানকার বাতিগুলো ভয়ানক উজ্জ্বল। আগুন দেখে পোকা উড়ে আসে, ঠিক তেমনি এই পাখিগুলো বাতিঘরের বাতি দেখে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তাদের অনেকে সোজাসুজি সেই ঘরের দেয়ালে পড়ে ঢুঁ খায়, অমনি আর তাদের উড়তে হয় না। বড়-বড় গগন-বেড়গুলোকে এমনি করে একেবারে থেঁৎলা হয়ে যেতে দেখা গিয়েছে।

যারা বাতি-ঘরটাকে এড়িয়ে এ-বিপদ থেকে রক্ষা পায়, তারা ক্রমাগত সেই বাতি-ঘরের চারধারে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে। ঘুরে ঘরে এসে শেষে আর উড়বার শক্তি থাকে না, তখন সেই বাতি-ঘরের আশেপাশে বিশ্রামের জায়গা না থাকলে অমনি করে ঘুরতে ঘুরতেই কত বেচারার প্রাণ বেরিয়ে যায়। এক-একটা বাতিঘরের কাছে এমনি করে এক রাত্রের ভিতরে চার-পাঁচশো পাখি মরতে দেখা গিয়েছে। হল্যাণ্ড দেশের উপকূলে একটা প্রকাণ্ড বাতি-ঘর আছে তার ধারে নাকি একদিন একহাজার পাখি এমনিভাবে মারা গিয়েছিল।

এজন্য কোনো কোনো জায়গায় বাতি-ঘরের গায়ে পাখিদের জন্য 'দাঁড়' বসিয়ে দেওয়া হয়। ঘুরে ঘুরে নিতান্ত ক্লান্ত হলে পাখিরা তাতে বসে বিশ্রাম করে, তারপর আবার ঘুরতে থাকে। এমনি করে তাদের সারারাত কেটে যায়,. প্রভাতের আলোক ফুটে উঠলে তবে তাদের চোখের ধাঁধা ভাঙ্গে। দাঁড় বসাবার কাজটি খুব হিসেব করে করা চাই। দাঁড় আলোর বেশি কাছে হলে পাখিরা তাতে বসতে চায় না, বেশি দূরে হলে তাকে তারা দেখতে পায় না।

বরাহ শিকার

এক সাহেব গিয়েছিলেন বরাহ শিকার করতে। তার আগে তিনি কখনো বরাহ শিকার করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল যে, একটা শুয়োর মারা এ আর এমনকি কঠিন! বনের মধ্যে ঢুকে তিনি এক শুয়োর দেখেই তাকে বল্লম নিয়ে তাড়া করলেন, ভাবলেন, শুয়োর মাটিতে, আমি ঘোড়ার উপরে, ও আমার কি করিবে?

সকলে বারণ করল, তিনি তা না শুনে সোজা বরাহের উপর ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলেন। তারপর চোখের পলকের মধ্যে যে কি হল তা কেউই ঠিক বুঝতে পারল না। শুয়োরটা হঠাৎ 'ঘঁৎ' করে ঘোড়ার ঠ্যাঙের ভিতর দিয়ে এমনি তেড়ে বেরুল যে ঘোড়াটা একেবারে ডিগ্‌বাজি খেয়ে উলটে গেল—আর শিকারী মশাই ঠিক্‌রে যেখানে পড়লেন আধঘন্টা চোখ বুজে সেইখানেই শুয়ে রইলেন।

বাস্তবিক শুয়োররে মতো বদ্‌মেজাজী জানোয়ার কমই আছে আর তার সাহসও বড় কম নয়। বাঘের পাশে দাঁড়িয়ে জল খেতে আর কোনো জানোয়ারই বোধহয় সাহস পায় না।

একবার কতগুলো লোক শিকার করতে গিয়ে দেখে একটা বাঘ একটা নদীর ধারে জল খেতে এসেছে আর তার কয়েক হাত দূরে একটা বরাহ জল খাচ্ছে। বাঘটা ভয়ানক রেগে শুয়োরটার দিকে চেয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল।

শুয়োর তাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে জল খাওয়া শেষ করে তারপর বাঘের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে 'হুঁস' করে তাকে এক ধমক দিল। তারপর ঘাড় বাগিয়ে পিঠের লোম খাড়া করে সে দাঁড়িয়ে রইল। এইরকম খানিকক্ষণ মুখোমুখি থেকে বাঘটা একলাফ দিয়ে একেবারে শুয়োরের পিঠে পড়ল। দুই-তিন থাবা মেরে শুয়োরের ঘাড় থেকে খাবল খাবল মাংস তুলে ফেলল। বাঘের চড় বড় সহজ চড় নয়! শুয়োর যে তাতে একটু কাবু হয়েছিল সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু এরই মধ্যে সেও বেশ দু চারটা গুঁতো মেরে বাঘের গায়ে দাঁত বসাতে ছাড়েনি।

শুয়োরটা বারবার বাঘের হাত এড়িয়ে আবার ঘুরে তেড়ে আসে। কিন্তু শুয়োরের অস্ত্র খালি দাঁতের গুঁতো — বাঘের যেমন দাঁত তেমনি নখ, তার উপর তার থাপ্পড়টিও আছে। সুতরাং খানিকক্ষণ পর্যন্ত মনে হলো যেন বাঘেরই জিত। সে শুয়োরের ঘাড়ে পিঠে গলার ঠ্যাঙে কামড়ে আঁচড়ে একেবারে রক্তারক্তি করতে লাগল। এর মধ্যে একবার শুয়োরটা একদৌড়ে খানিকটা দূর গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, মন হল যেন তার আর দম নাই। কিন্তু বাঘটা যেই আবার লাফ দিয়ে তার ঘাড়ে পড়তে গেল, শুয়োরটা চট্‌ করে নিচু হয়ে কি রকম একটা গাঝাড়া দিল, তাতেই বাঘটা একেবারে ডিগবাজি খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল।

আর যায় কোথা। শুয়োর একলাফে তার উপর চড়ে দাঁত দিয়ে তিন চার গুঁতোয় তার পেট ফুঁড়ে দিয়ে তারপর হয়রান হয়ে মাটিতে পড়ে রইল। এদিকে বাঘেরও আর উঠবার সাধ্যি নেই—দুজনেই মাটির উপর পড়ে হাঁপাচ্ছে।

তখন শিকারীরা গুলি মেরে তাদের শেষ করে দিল।

বরাহ্ যখন ক্ষেপে বসে, তখন তার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না — আর সে যে কখন ক্ষেপে বসে তারও কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। হয়তো শিকারীরা একটা শুয়োরকে তাড়া করেছে, শুয়োরটা দৌড়ে পালাচ্ছে, হঠাৎ কেমন করে একটা পাথরে পা লেগে শুয়োরটা পড়ে গেছে, অমনি আর কথাবার্তা নেই! সামনে গাছ জঙ্গল যা থাকে সে তাতেই তেড়ে গুঁতিয়ে সব ভেঙ্গে উপড়িয়ে সাবাড় করে দিল! ওদিকে শিকারীরা যে তাকে ধরে ফেলছে সে হুঁস তার নেই।

একজন বড় শিকারী বলেছেন যে শুয়োর যখন তেড়ে আসে, তখন যদি তাকে এড়িয়ে চট্ করে তার পিছনের পা ধরে তোলা যায় তবে নাকি সে আর কিছু করতে পারে না। কথাটি সত্যি কিনা জানি না, কিন্তু আমায় যদি শুয়োরে তাড়া করে আমি তার ঠ্যাং ট্যাং ধরতে যাচ্ছি না, একেবারে একদৌড়ে একটা গাছের উপর চড়ে বসব!

জ্বালাতন

পোকার জ্বালায় অস্থির হলাম—আর ব্যাঙের জ্বালায়। মাস দুই আগে ব্যাঙগুলো, মাছির মতো ছোট্ট-ছোট্ট ছিল, তখন তাদের দেখলে ভারি মায়া হত। ঠিক বুড়ো ব্যাঙদের মতোই তারা লাফিয়ে লাফিয়ে হাওয়া খেতে বেরুত, ধরতে গেলেও তেমন ব্যস্ত হত না, হাতের তেলোয় তুলে বসিয়ে দিলেও ভয় পেত না। এখন সেগুলো বড় হয়েছে, এখন সিঁড়ি বেয়ে ঘরে উঠতে পারে। ঘর যেন আমাদের নয়, যেন তাদেরই ঘর। ভারি গম্ভীর হয়ে তারা তার ভেতরে বেড়িয়ে বেড়াবে, আমাদের গ্রাহ্যও করবে না। তাড়াতে গেলে ব্যস্ত হয়ে গলিঘুচির ভেতরে ঢুকতে যাবে, কিন্তু বাইরে যাবার নামও করবে না। এদের মারবার সাধ্য নাই, মুখখানি দেখলেই দয়া হয়। যেন বেচারারা কিছু জানে না, কারও মন্দ ভাবে না।

মাঝে মাঝে ওরা ঘরের কোণে এসে দু পাশের দেয়ালে পা ঠেকিয়ে বেয়ে উঠবার বিষম চেষ্টা করে। তখন তাদের দেখলে বড়ই হাসি পায়। আর, যখন ছুটতে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে হাত-পা ছোঁড়ে, তখনোও মজা কম হয় না। কাজেই তাদের আর মারা যায় কি করে? ওদের জব্দ করার এক উপায় হচ্ছে খালি কাগজ দিয়ে ধরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। তখন তারা ভারি আশ্চর্য হয়ে, খানিক কি যেন ভাবে, তারপর আবার লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে, যেন কিছুই হয়নি।

পোকার কথা আর কি বলব? আগে এদের বড় দেখতে পাই নি, বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছে। এদের জ্বালায় রাত্রে আলো জ্বালিয়ে খাবার জো নাই, লাফিয়ে এসে ভাতে পড়তে চায়। এত রকমের পোকাও হয়! গঙ্গা ফড়িং, পিঁপড়ে, সাপের মাসি, গাঁধি, রাউটি, কত নাম করব? দশটার মধ্যে একটারও নাম জানি না হয়তো। চেহারাই-বা কতরকমের, রঙই-বা কতরকমের, গন্ধ ই-বা কতরকমের, রীতিনীতিই-বা কতরকমের, তার উপর আবার কামড়ের জ্বালাও আছে। গাঁধির আবার কামড়াতেও হয় না, তোমায় শুধু ফুঁকেই ফোস্কা ধরিয়ে দিতে পারে। মাঝে মাঝে এক-একটা ফড়িং আসে, সে এমনি গোঁয়ার যে, লাফিয়ে

এসে ঘাড়ে বসে, গোদা পায়ের লাথি লাগিয়ে চলে যাবে।

একদিন একটা ফড়িং এসেছিল, সেটা দেখতে এমনি অদ্ভুত যে কি বলব। চুপ ক রে বসে থাকলে কখনো তাকে দেখে বলতে পারবে না যে সে খানিকটা গাছের ছাল নয়, সে একটা ফড়িং। হাত-পাগুলো গাছের ডালের মতো, পাখাগুলো গাছের ছালের মতো, রঙটি অবিকল শুকনো গাছের মতো।

জানোয়ারের মধ্যে যেমন ব্যাঙ, পোকার মধ্যে তেমনি গুবরে পোকা। ওগুলোর কাণ্ড দেখে আমার বড্ড হাসি পায়। বোঁ—ওঁ—ওঁ!! করে এসে ঘরে ঢুকবে— ঢুকেই অমনি দেয়ালে ঢুঁ খেয়ে চিৎ হয়ে মেঝেয় পড়ে প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়তে থাকবে। তখন তাড়াতাড়ি বাটি চাপা দিলেই, বেটারা জব্দ হয়। জব্দ হয় বটে, কিন্তু সে কথা মানার দস্তুর তাদের নাই। চাপা দিবার খানিক পরেই দেখবে, সে তোমার বাটি ঠেলে নিয়ে চলেছে। সারারাত যদি অমনিভাবে বাটি চাপা দিয়ে রাখ, তবে সারা রাতই শুনবে খালি বাটি ঠেলার খন্‌খন্‌ শব্দ।

একদিন একটা গুবরে পোকা এসেছিল, সেটা প্রায় দু ইঞ্চি লম্বা। দেখতে কালো, তার উপরে এই বড়-বড় সাদা ফুট্‌কি। মাথায় দুটো দাঁড়া, সে কি ভয়ানক! তাকে বাটি চাপা দিতেই অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। তোমার হাতে বাটি দেখলেই সে তোমার মতলব এঁচে নেবে, তারপর কি ছুটই দেবে! ছুটে গিয়ে কপাটের আড়ালে ঢুকে, সেখান থেকে উঁকি মেরে তোমাকে দেখতে থাকবে। এগুলোর কামড়ে নাকি বিষ আছে, তার ঘা শিগ্‌গির শুকোয় না।

রাত্রে এই-সব, আর দিনের বেলায় মাছি আর বোলতা। মাছির কথা আর কি বলব? সে তো সকলেই জানে। এরাই নাকি গায়ে হাতে করে ভয়ানক ভয়ানক বেয়ারামের বীজ এনে আমাদের গায়ে আর খাবারের ভিতর রেখে যায়। তবেই ভাব, এরা আমাদের কিরকম শত্রু। দুপুরবেলায় একটু ঘুমুতে গেলে এরা এসে নাকে মুখে সুড়সুড়ি দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলে। ক্ষুদে মাছিগুলো আবার এর চেয়েও দুষ্টু। আমি লিখছি আর ওরা পিন্ পিন্ পিন্ করে এসে খালি আমার নাকের আর চোখের ভিতর ঢুকতে চেষ্টা করছে। চোখে চশমা আছে, তাতেও ওদের গ্রাহ্য নেই, চশমার পাশ দিয়ে একেবারে চোখের ভিতরে গিয়ে উপস্থিত হয়, তখন তাকে মারবারও জো নেই, তা হলে চশমা ভেঙ্গে যাবে। সেদিন ঠিক এমনি করে চোখের ভিতর থেকে ক্ষুদে মাছি তাড়াতে গিয়ে এক বাবুর থাপ্পড় লেগে তাঁর চশমা উড়ে গিয়েছিল।

পিঁপড়েগুলোও কম নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক্ষুনি একটা এসে আমাকে, উঃ, কি কামড়ই দিল। এক-এক সময় আট-দশটা মিলে একসঙ্গে কামড়াতে আসে।

এদের সকলের চেয়ে অবশ্যি বোলতাকেই আমার বেশি ভয় করে। আজ অন্যদিনের চেয়ে এদের একটু কম আনাগোনা দেখছি, তবে এরই মধ্যে দু তিনজন এসে আমার খবর নিয়ে গেছে। চার বছর আগে একটা বোলতা আমাকে কামড়িয়েছিল, এখনো তার দাগটি আমার হাতে আছে। ছেলেবেলায় এদের কত কামড়ই খেয়েছি। তখন থেকেই এই পোকাগুলোকে আমি ভারি ভয় করি। একবার একটার তাড়া খেয়ে এমনি ছুট দিয়েছিলাম যে সিকি মাইল আমার পিছু পিছু তাড়িয়ে সেটা আমাকে ধরতে পারে নি। আমাদের বাড়ির কর্ত্রীকে যে বোলতায় কামড়িয়েছিল, তার কথা এখনো তিনি মাঝে মাঝে দুঃখের সহিত

বলেন।

কাজেই বোলতা ঘরে এলেই আমরা একটু ব্যস্ত হই; কখন কাকে কামড়ায়, তার ঠিক কি? এর ওষুধ হচ্ছে পাখা হাতে নিয়ে বসা, আর বোলতা খানকা বেশি কাছে এলে তাকে ঠাই করে মারা। তখন সে মাটিতে পড়ে ফড়্ফড়্ করে ঘুরতে থাকে, বেশি লাগলে অজ্ঞান হয়ে যায়, কিন্তু সহজে মরে না। খানিক বাদেই দেখবে, সে উঠে বসেছে; আর খানিক বাদে উড়তে থাকবে। তখনো হয়তো তার মাথা ঘোরা একেবারে সারবে না; হয়তো সে মাতালের মতো টলতে টলতে উড়বে, আর দেয়ালে টক্কর খেতে খেতে ভাববে 'বড্ড সামলে গেছি!' যাহোক, আর-একটু পরেই সে বেরিয়ে চলে যাবে।

যদি বোলতা মরে যায়, তবে অমনি পিঁপড়েরা এসে তাকে নিয়ে যাবার আয়োজন করবে। একটা বোলতাকে নিয়ে যেতে কটা পিঁপড়ে লাগে আমি তার হিসাব করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম যে কাজটি বড়ই কঠিন। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটি পিঁপড়ে একটা বোলতাকে ধরেছে, কিন্তু তাদের সকলে একদিকপানে টানছে না। একদল যেদিকে টানছে, আরেকদল টানছে ঠিক তার উল্টো দিকে। তার মধ্যে আবার দশ-বারোজন বোলতাটার উপরে উঠে খালি পাইচারি করছে। তারা টানছে তো না-ই, লাভের মধ্যে অনর্থক বোঝা বাড়াচ্ছে। আমি জানতাম যে, পিঁপড়েরা ভারি বুদ্ধিমান জীব; এখন দেখছি, তারা মাঝে মাঝে নিতান্ত বোকার মতো কাজও করে। কাজেই আমার আর হিসাব করা হল না; শুধু এইটুকু বুঝলাম যে বুঝে শুনে টানলে, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটার চেয়ে ঢের কম পিঁপড়েতে একটা বোলতাকে সমান জমির উপরে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

অনেক সময় বোলতাটা মরবার আগে পিঁপড়েগুলো এসে তাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। তখন বোলতা তাদের এক-এক জনকে এমনি লাথি মারে যে, তাতেই তাদের দু-তিনশ হাত (পিঁপড়ের হাতে) দূরে গিয়ে ছিটকিয়ে পড়তে হয়।

আমি যে বোলতাগুলোর কথা বলছি, তারা দেখতে ভারি সুন্দর। গায়ের রঙটা, তোমরা যাকে চকোলেট রঙ বল, তেমনি। কপাল আর দুটি শুঁড়ের গোড়া দুটি খানিক হলদে, খানিক চকোলেট। দুপাশে দুটি বড়-বড় চোখ, তার প্রত্যেকটি হাজার-হাজার চোখ দিয়ে তয়ের হয়েছে। তাছাড়া মাথার উপরে আরো তিনটি ছোট-ছোট চোখ আছে।

ফ্ল্যামিঙ্গো

জানোয়ারের মধ্যে যেমন জিরাফ, পক্ষীর মধ্যে তেমনি ফ্ল্যামিঙ্গো। শরীরের আন্দাজে ঠ্যাং দুটি বেখাপ্পারকম লম্বা আর তেমনি লম্বা গলাটি। পৃথিবীর নানা জায়গায়—আমেরিকায়, আফ্রিকায়, এমন-কি, আমাদের দেশেও কোনো কোনো জায়গায় এ-পাখি দেখা যায়। এরা জলের ধারে দল বেঁধে থাকে। আমেরিকার কোনো কোনো জায়গায় এক সঙ্গে হাজার হাজার ফ্ল্যামিঙ্গো বাস করে এমন অনেক সময়েই দেখা যায়। জলের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে শামুক গুগলি চিংড়ি আর ছোট-ছোট মাছ ধরে খেতে ফ্ল্যামিঙ্গোরা খুবই ভালোবাসে কিন্তু তা যদি না জোটে, তা হলে ধান, শস্য, খুদ, এমন-কি, রান্না পায়েস পর্যন্ত খেতে তার

আপত্তি নেই।

ফ্ল্যামিঙ্গোর গায়ের রঙ সব দেশে একরকম নয় তবে প্রায়ই সাদা না-হয় লালচে গোছের হয়। সব চেয়ে সুন্দর রঙ আমেরিকার ফ্ল্যামিঙ্গোদের। উজ্জ্বল গোলাপী রঙের পালক, লাল চোখ, লাল ঠোঁট, লাল পা। জলে হেঁটে বেড়ান, সাঁতার কাটা, আকাশে ওড়া, এ-সব বিষয়ে ফ্ল্যামিঙ্গোরা খুব ওস্তাদ। কিন্তু শরতের শেষে যখন তাদের পালক প'ড়ে নূতন পালক ওঠে, তখন বেচারাদের দুরবস্থার একশেষ! তারা না পারে উড়তে, না পারে সাঁতার কেটে পালাতে এইসময় মানুষেরা তাড়া করে সহজেই তাদের ধরে আনে আর তাদের পালক নিয়ে বাজারে বিক্রি করে।

যেমন অদ্ভুত পাখি তেমনি অদ্ভুত তার বাসা। পা দিয়ে কাদার ঢিপি বানিয়ে তার মধ্যে গর্ত করে নীল রঙের ডিম পেড়ে রাখে। ডিমে তা দিবার সময় পা গুটিয়ে সেই ঢিপির উপর বসতে হয়।

জন্তুর পরিচয়

লোকে বলে, বিড়াল নাকি বাঘের মাসি হয়; আর শেয়াল নাকি হয় তার ভাগ্নে। বিড়াল যে বাঘের মাসি, এ কথা মানতে আমি কতক রাজি আছি; কিন্তু শেয়াল যে তার ভাগ্নে, এটা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। সেই ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি যে, ভাগ্নের চেহারা তার মামার মতো হয়। কিন্তু শেয়ালের চেহারা কি বাঘের মতো? বাঘের মুখ হাঁড়িপানা, শেয়ালের মুখ ছুঁচাল। বাঘের মতো শেয়ালেরও বড়-বড় ধারাল দাঁত আছে বটে, কিন্তু সে তেমন ধারালও নয়, তেমন বড়ও নয়। তারপর পায়ের নখগুলোর দিকে চেয়ে দেখ। বাঘের বাঁকা বাঁকা নখগুলো কি ধারাল আর মজবুত, আর সেগুলোকে ইচ্ছামতো কেমন খাপে ঢুকিয়ে রাখতে আর বার করতে পারা যায়।

বাঘের নখ পরীক্ষা করে দেখবার সুবিধা হবে না? আচ্ছা, না হয় বিড়ালের নখই দেখ। তোমাদের 'মেনী' যখন তোমাদের সঙ্গে খেলা করে, তখন তার পায়ের দিকে চেয়ে দেখ তো। তখন সে যত্নের সহিত তার নখগুলিকে খাপে ঢুকিয়ে রাখে। তখন তো আর তার নখের দরকার নাই। সকল সময় নখ বার করে রাখলে সে ঘষায় ঘষার ভোঁতা হয়ে যাবে যে; তাহলে তো তার একটি মস্ত হাতিয়ারই মাটি হয়ে গেল। তাই কাজের সময় ছাড়া অন্যসময় মেনী তার নখ বার করে না। কিন্তু একটি ইঁদুর তার সামনে আসুক তো, তখন দেখবে সে কেমন নখ বার করে তাকে খাবলে মেরে ধরবে। আমি কতবার দেখেছি।

অবশ্যি তোমাদের মেনীটি পোশাকী হতে পারে। তার হয়তো ইঁদুর ধরার অভ্যাস নাই। আর অভ্যাস থাকলেও তোমাদের তামাশা দেখাবার খাতিরে এক্ষনি একটি ইঁদুর এসে তার সামনে হাজির হচ্ছে না। যাহোক এর আর একটা উপায় আছে। মেনীকে যদি এমন কোনো জায়গায় তুলে দিতে পার যে, সেখান থেকে তাকে পিছলে পড়তে হয়, তা হলে দেখবে সে কেমন নখ বার করে আটকে থাকবার চেষ্টা করে।

মেনীটি যদি শান্ত হয়, আর তার আঁচড়াবার অভ্যাস না থাকে, তা হলে, সকলের চেয়ে

ভালো উপায় হচ্ছে, তাকে কোলে নিয়ে ধীরে সুস্থে তারা থাবা পরীক্ষা করে দেখ। থাবার উপরে আর নিচে আঙুল দিয়ে টিপ দাও, অমনি নখগুলি বেরিয়ে আসবে। টিপ ছেড়ে দাও, আবার সেগুলো ভিতরে ঢুকে যাবে। বাঘের থাবায় ধরে দেখাবার সুবিধা নাই;আর, থাকলেও সেকাজ করতে তোমাদের কখনো বলি না,—যদি সেটা মরা বাঘ না হয়। কিন্তু দেখতে পারলে বুঝতে যে, বাঘ আর বিড়াল একই রকমের জানোয়ার, খালি ছোট বড়র তফাত। বাঘ, সিংহ এরা সব বিড়ালেরই কুটুম্ব। গরম দেশে এরকমের জন্তু ঢের আছে। কোনোটা হলদে, কোনোটা ছেয়ে কোনোটা কটা, কোনোটা কালো;কোনোটার গায়ে ডোরা, কোনোটার গায়ে চক্র। কোনোটা মস্ত বড়, তাকে বলি বাঘ; কোনোটা ছোট, তাকে বলি বিড়াল। আসলে এরা সকলেই ভাই বেরাদর; এরা হচ্ছে বিড়াল বংশ।

তাই বলছিলাম, বিড়াল যে বাঘের মাসি, এ কথা আমি কতক মানি। কিন্তু শেয়াল যে বাঘের ভাগ্নে, এটা নিতান্ত বাজে কথা; শেয়াল বাঘের কেউ নয়। শেয়ালের দাঁত নখ ছোট-ছোট আর সরু-সরু। বাঘের নখ দাঁতের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। আর শেয়ালের এমন ক্ষমতা নাই যে ইচ্ছামতো তার নখ বার করে বা গুটিয়ে রাখে। তার সোজা নখগুলো খোঁটার মতো তার আঙ্গুলের আগায় বসান থাকে।

ভেবে দেখতে গেলে, কুকুরের সঙ্গে শেয়ালের চেহারা খুব মিলে। কুকুরের নখ দাঁত শেয়ালেরই মতো। নেকড়েরও তাই। এরা সব ভাই বেরাদর —এরা কুকুর বংশ।

এক হিসাবে কিন্তু বাঘ বিড়াল আর শেয়াল কুকুর এক বংশ না হলেও, একদল বলা যেতে পারে। এরা সকলে মাংস খায়। গোরু ঘোড়া মাংস খায় না, তারা আরেক দল। এদের দাঁত আর নখও মাংস-খেকো জানোয়ারের দাঁতের মতো ধারাল নয়। যাহোক এখন আমাদের অত খুঁটিনাটির খবর না নিলেও চলবে। তার চেয়ে কাজের কথা এই হচ্ছে যে এই যে বাঘ শেয়াল আর গোরু ঘোড়ার দুটো দল হল, এদেব মধ্যে আবার এক বিষযে মিল আছে—এরা সকলেই শিশুকালে মায়ের দুধ খায়। কাজেই এদের দুটো দল হলেও, ধর্মটা একই দেখা যাচ্ছে। পাখিরা শিশুকালে মায়ের দুধ খায় না, মাছেরাও খায় না'তাদের ধর্ম অন্যরকম। আবার, বাঘ, শিয়াল, গোরু, ঘোড়া, পাখি, মাছ, এদের মধ্যেও একটা মস্ত কথায় এমন মিল আছে যে, তাতেই এদের সকলের এক জাত করে দিয়েছে। পিঠে একটি শিরদাঁড়া, আর গায়ে হাড় এদের সকলেরই আছে।

হাড় কি সকল জন্তুর থাকে? ফড়িঙের হাড় নাই, কেঁচোর নাই, শামুকের নাই,—আরো কত জন্তুর নাই। যাদের শিরদাঁড়া আছে, আর যাদের নাই, এই হল তবে প্রাণীদের দুই জাত। একটা জন্তুর পরিচয় জানতে হলে, দেখ, কত কথার, কত খবর নিতে হয়। আগে দেখব সে কোন জাতের, তারপর দেখব সে কোন ধর্মের, তারপব দেখব সে কোন দলের, তারপর দেখব সে কোন বংশের। এত করে তবে তার যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যাবে। ঠিক যেন চিঠির ঠিকানা— অমুক শহরে, অমুক গলিতে, এত নম্বরের বাড়িতে, পরমকল্যাণীয়, শ্রীমান অমুকের হাতে পঁহুছে। তা হলে তো শ্রীমান চিঠিখানি পাবেন, নইলে শুধু খাম টিকিটের পয়সা খরচ।

প্রাচীনকালের জন্তু

শ্রীযুক্ত এইচ্, এন্, হচিন্‌সন্ কৃত "Extinct Monsters" নামক পুস্তক হইতে ইগুয়ানোডোনের আবিষ্কারের নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সংগ্রহ করা গেল।

১৮২২ সালে ডাক্তার জি, এ, ম্যান্টেলের সহধর্মিনী ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি টিল্‌গেট্ ফরেষ্ট্ নামক স্থানের প্রস্তরে এই জন্তুর একটি দন্ত প্রাপ্ত হন। তৎপর তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে অনুসন্ধান করিয়া ঐরূপ আরো অনেকগুলি দন্ত বাহির করেন। এ সকল দন্তের অনেকগুলিরই অগ্রভাগ পুনঃ পুনঃ চর্বণজনিত ঘর্ষণে মসৃণ হইয়া গিয়াছে। গো মহিষাদি শষ্পাহারী স্তন্যপায়ী জন্তুদিগেরই কেবল ঐ রূপ দন্ত দেখা যায়; সুতরাং ঐ দন্ত যে জাতীয় জন্তুর, তাহারা যে শষ্পাহারী ছিল, এবং খাদ্য দ্রব্যকে চর্বণ করিত, তাহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু এই সন্দেহের অভাবই আর এক গুরুতর সন্দেহের কারণ হইয়া উঠিল। যে প্রস্তরে ঐ সকল দন্ত পাওয়া গিয়াছিল, তাহা সরীসৃপ যুগের প্রস্তর। অর্থাৎ ঐ সময়ের প্রস্তরে সরীসৃপ জাতীয় জন্তুর চিহ্নই পাওয়া যায়; পৃথিবীতে তখনও স্তন্যপায়ী জন্তুর সৃষ্টি হয় নাই। সরীসৃপেরা কখনও তাহাদের খাদ্য চর্বণ করিয়া আহার করে না, তাহাদের আহার কেবল গলাধঃকরণ। সুতরাং ডাক্তার ম্যাণ্টেল ঐ দাঁতগুলিকে লইয়া বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। উহাদিগকে সরীসৃপের দন্ত বলিতে ভরসা হইতেছে না, কারণ সরীসৃপদিগকে কখনও চর্বণ করিতে দেখেন নাই। দাঁতগুলি দেখিতে কোন বৃহৎকায় স্থূলচর্মী চর্বণকারী জন্তুর দাঁতের মতন। কিন্তু ঐরূপ চর্বণকারী জন্তুরা আজকাল সকলেই স্তন্যপায়ী অথচ সে সময়ে স্তন্যপায়ী ছিল না।

এরূপ অবস্থায় ডাক্তার ম্যাণ্টেল অদ্বিতীয় পণ্ডিত কুভিয়ের শরণাপন্ন হইলেন। কুভিয়ে ঐ দন্ত দেখিয়াই বলিলেন যে উহা গণ্ডারের দাঁত! ইহার কিছুদিন পরে ঐ সকল প্রস্তরে জন্তুবিশেষের পায়ের হাড় কয়েকখানা পাওয়া গেল। ঐ হাড় দেখিয়া কুভিয়ে বলিলেন যে উহা গণ্ডারের খড়গ। যে প্রস্তরে কোনদিন কোনরূপ স্তন্যপায়ী জন্তুর চিহ্ন পাওয়ার কথা শোনেন নাই, তাহাতে হঠাৎ এতগুলি স্তন্যপায়ীর সমাবেশ ডাক্তার ম্যাণ্টেলের মনে স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং তিনি শ্রমজীবীদিগকে পুরস্কার দানে উৎসাহিত করিয়া বিশেষভাবে অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। ইহার ফলস্বরূপ অনেকগুলি নিখুঁত দন্ত আবিষ্কৃত হইল। তখন দেখা গেল যে ঐ সকল দন্তের আকৃতি বর্তমান সময়ের ইগুয়ানা নামক গোধিকার দন্তের ন্যায়।

ডাক্তার ম্যাণ্টেলের প্রথমাবধিই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে প্রাচীনকালে চর্বণকারী শষ্পাহারী সরীসৃপ ছিল, এ সকল দন্ত তাহাদেরই। সুতরাং ইগুয়ানার দন্তের সহিত ঐ সকল দন্তের উক্তরূপ সাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহার সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। (ইগুয়ানা কীট এবং বৃক্ষপত্রাদি ভক্ষণ করে। কিন্তু তাহা সে কেবল গলাধঃকরণই করিয়া থাকে, চর্বণ করে না।) কিন্তু দেশীয় অন্যান্য পণ্ডিতেরা কেহই ডাক্তার ম্যাণ্টেলের মতের সমর্থন করিলেন না।

যাহা হউক, ঐ নূতন দন্তগুলি দেখিয়া কুভিয়ে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, এবং মহাজনোচিত সরলতা সহকারে তাহা স্বীকার করিলেন। ডাক্তার ম্যাণ্টেল্‌কে তিনি লিখিলেন

যে ঐরূপ দাঁত তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই। তিনি ইহারও বলিলেন যে "এতদ্দ্বারা একটি নূতন জন্তুর আবিষ্কার হইল—শষ্পাহারী সরীসৃপ।"

বন্ধু দিগের পরামর্শে ডাক্তার ম্যাণ্টেল এই নূতন জন্তুর "ইগুয়ানোডন" নামকরণ করিলেন অর্থাৎ ইগুয়ানার মতন দন্তবিশিষ্ট জন্তু। এইরূপ দন্তের লক্ষণানুসারে জন্তুর নামকরণ প্রত্ন-প্রাণীবিদ্যা শাস্ত্রে বিরল নহে। প্রাচীনকালের অনেক জন্তুর নামকরণ এইরূপে হইয়াছে। যে জন্তুর ইগুয়ানার ন্যায় দন্ত, তাহার নাম ইগুয়ানোডন। যাহার স্তনের ন্যায় দন্ত, তাহার নাম ম্যাস্টোডন (ম্যাস্টস্ শব্দে গ্রীক ভাষায় স্তন বুঝায়)। যাহার যাঁতার ন্যায় দন্ত, তাহার নাম মাইলোডন্ (মাইলস্ = যাঁতা)। যাহাব দন্তের গঠন অত্যন্ত জটিল, তাহার নাম ল্যাবিরিন্থোডন (ল্যাবিরিন্থস = গোলোক ধাঁধা) যাহার দন্তের আকৃতি ঘরেব চালের ন্যায, তাহার নাম স্টিগোডন (স্টিগস্ = চাল) ইত্যাদি।

যাহা হউক, আমরা ইগুযানোডনেব বিববণ এখনও শেষ করি নাই। এই জন্তুর আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে একদিকে যেমন এই কথা জানা যায যে পণ্ডিতেরাও অনেক সময় ভুল করেন, অপরদিকে তেমনি ইহাও প্রমাণ হয় যে সদ্‌যুক্তির সাহায্যে অতি সামান্য পদার্থ হইতেও মূল্যবান্ সত্য সংগ্রহ করা যায়।

ঐ দাঁতগুলিব সহিত অনেক হাড পাওয়া গিয়াছিল। সুতবাং ইহা স্বভাবতঃই অনুমিত হইল যে দাঁত যাহাব, হাডও তাহাবই। এক এক-খানি উরুব হাড একগজেবও অধিক দীর্ঘ। বর্তমান সমযেব কুম্ভীব গুলিব দেহেব ঐ হাড় এক ফুটের অধিক লম্বা হয় না। সুতরাং জন্তুটি যে অতিশয বৃহৎ ছিল, তাহা সহজেই বুঝা গেল। ইহার কযেক বৎসর পরে জর্মনি দেশে অন্য এক জাতীয অনেকগুলি ইগুয়ানোডনের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। এই জাতীয় ইগুয়ানোডন প্রথমোক্ত ইগুযানোডন অপেক্ষাও বৃহৎ। প্রথমোক্ত ইগুয়ানোডনগুলি প্রায় ২৪ ফুট লম্বা হইত, কিন্তু শেষোক্তগুলি ৩০ ফুটের কম হইত না।

ডাক্তাব ম্যাণ্টেল যে স্থানে সেই দাঁত এবং হাড়গুলি পাইয়াছিলেন, সে স্থানে একপ্রকার বৃহৎ জন্তুর পদচিহ্নও দৃষ্ট হয়। ঐ পদচিহ্নও যে ইগুয়ানোডনের তাহাতে সন্দেহ কবিবার বিশেষ কারণ ছিল না। এবং কিছুদিন পরে যখন ঐ জন্তুর আবও অস্থি পাওয়া গেল, তখন দেখা গেল যে উহা যথার্থই ইগুয়ানোডনের পদচিহ্ন।

এই পদচিহ্ন দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইগুয়ানোডন্ পক্ষীর ন্যায় পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর করিয়া চলিয়া বেড়াইত। সম্মুখের পা দুখানিকে সে মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে দিত না। দিলে, তাহাদেরও চিহ্ন অবশ্য দেখা যাইত; কিন্তু ওরূপ চিহ্ন কেহ দেখিতে পায় নাই। পশ্চাতের পদদ্বয় এবং কটিদেশের গঠন অনেকাংশে পক্ষীর ঐ সকল অঙ্গের গঠনের অনুরূপ ছিল।

এইরূপে ক্রমে এই অদ্ভুত জন্তুর সম্বন্ধে সকল কথাই পরিষ্কার হইয়া আসিল। বাকি রহিল কেবল সেই শৃঙ্গাকৃতি অস্থিখণ্ড, যাহাকে কুভিয়ে প্রথমতঃ গণ্ডারের খড়্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। ডাক্তার ম্যাণ্টেল বলিলেন যে উহা ইগুয়ানোডনের শৃঙ্গ। কিন্তু পণ্ডিত ওয়েন নানা কারণে উহাকে শৃঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে উহা তাহার হাতের কিছু হইবে। বাস্তবিককালে এই জন্তুর অক্ষুন্ন কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইলে দেখা গেল যে ওয়েনের কথাই ঠিক। ঐ জিনিসটা ইগুয়ানোডনের হস্তের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ।

এরূপ সৃষ্টিছাড়া অঙ্গুষ্ঠ দিয়া উহার বিশেষ কি কাজ হইত, তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। ইচ্ছা করিলে উহা যে সাংঘাতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধকালে শত্রুর শরীরে মূলাদি অন্বেষণ কালে মৃত্তিকায়, আহারের সময় নারিকেলাদি ফলের কঠিন আবরণে, ইত্যাদি নানা অবস্থায় ইহার নানারূপ ব্যবহার সম্ভব দেখা যায়।

ইগুয়ানোডনের অস্থির সঙ্গে নানারূপ উদ্ভিদের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়া বোধহয় যে ঐ সময় তাল, নারিকেল প্রভৃতি জাতীয় বৃক্ষাদির প্রাদুর্ভাব ছিল।

সরীসৃপ জাতীয় জন্তু। সে পক্ষীর ন্যায় দুইপদে ভর করিয়া চলিত, আর গো মহিষাদির ন্যায় চর্বণ করিয়া শাকসব্জি ভক্ষণ করিত। সুতরাং ইহার রীতিনীতি কিয়ৎ পরিমাণে শাস্ত্র বহির্ভূত হইবারই কথা।

চলনের ভঙ্গী এবং পদাদির অস্থির গঠনের সহিত পক্ষীর মিল এরূপ জন্তু আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। এই সকল জন্তুকে পণ্ডিতেরা সরীসৃপের শ্রেণী হইতে পৃথক করিয়া "ডাইনোসর" নামক এক নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি করিলেন। "ডাইনোসর" শব্দের অর্থ ভীষণ সরীসৃপ। ইহাদের সকলেই ইগুয়ানোডনের ন্যায় নিরামিশাষী ছিল না;অনেকেই ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক মাংস খাইয়া জীবনধারণ করিত। ইঁদুরের মত ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া তিমির মত বড় পর্যন্ত সকল আকারেরই ডাইনোসর ছিল। হস্তী অপেক্ষা বৃহৎ, অশ্ব অপেক্ষা বেগবান, ব্যাঘ্র অপেক্ষা হিংস্র ডাইনোসর অনেক ছিল। জল স্থল ব্যোম সর্বত্রই ইহারা বিচরণ করিত। চেহারার কথা আর কি বলিব! কাহারও শরীর বর্মাবৃত কাহারও কলেবর কণ্টকাকীর্ণ। এক ব্যক্তির ২৫ ফুট দীর্ঘ বিশাল দেহে এবম্বিধ সজ্জার উপরেও আবার গলায় একটি হাঁসুলী কপালে দুটি শৃঙ্গ, নাকের উপর একটি খড়্গ এবং মুখের চঞ্চু র আভাস। রীতিমতন চঞ্চুবিশিষ্ট ডাইনোসরেরও অভাব ছিল না।

সর্বশেষে পক্ষবিশিষ্ট ডাইনোসর। ইহাদের চঞ্চুও ছিল, পক্ষও ছিল। পাখা দুটি পক্ষীর পাখার মতন নয়, কতকটা বাদুড়ের পাখার মতন।

এইরূপে দেখা যায় যে ডাইনোসরদিগের সহিত পাখীর সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক পণ্ডিতদিগের সাধারণ মত এই যে পাখীরা হয় ডাইনোসরদের বংশধর, না হয় অতি নিকট আত্মীয়।

ইহার প্রমাণ স্বরূপ প্রাচীনকালের একটি পাখীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। ইহা অপেক্ষা পুরাতন কোন পক্ষীর চিহ্ন অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিতেরা ইহার নাম রাখিয়াছেন "আর্কি অপ্টোরিক্‌স্‌" (পুরাতন পক্ষী)।

ইহার চঞ্চুও আছে, দন্তও আছে। পক্ষীর ন্যায় ডানা অথচ তাহাতে তীক্ষ্ণ নখযুক্ত অঙ্গুলি। সরীসৃপের ন্যায় দীর্ঘ লাঙ্গুল, কিন্তু সেই লাঙ্গুলের প্রত্যেক গ্রন্থির দুই পার্শ্বে দুটি পালক। মেরুদণ্ডের অস্থি সরীসৃপের ন্যায়।

প্রাচীনকালের অনেক পক্ষীর মুখে দাঁত এবং হাড়ে সরীসৃপ অথবা মাছের লক্ষণ দেখা যায়। কেবল পক্ষীতেই যে এইরূপ নানা শ্রেণীর জন্তুর লক্ষণ মিশ্রিত দেখা যায় তাহা নহে, অন্যান্য অনেক জন্তুই সরীসৃপ স্তন্যপায়ী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীর লক্ষণ এক শরীরে ধারণ করিত।

বলিতে গেলে ইহার মধ্যে তেমন বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। প্রাচীনকালের রীতি এখনকার

রীতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ছিল, এই মাত্র। আর বর্তমান সময়েও যে এরূপ মিশ্রণের দৃষ্টান্ত একেবারেই নাই, তাহাই বা কি করিয়া বলি। অস্ট্রেলিয়ায় "ডাক মোল"(duck mole)নামক একটি ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জন্তু অদ্যাপি জীবিত আছে। উহা স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত; কিন্তু পক্ষী সরীসৃপাদির ন্যায় ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, এবং উহার মুখে হংসের চঞ্চু র ন্যায় চঞ্চু ।

পৃথিবীতে প্রথমে যে সকল জীবের জন্ম হইয়াছিল, তাহারা নিতান্তই নিকৃষ্ট জাতীয় ছিল। নানারূপ কীট এবং শম্বুকাদি পৃথিবীর প্রথম প্রাণী তৎপর চিংড়ি কর্কটাদি; তৎপর মৎস্য; তৎপর সরীসৃপ। এক সময়ে এই সরীসৃপেরা পৃথিবীতে অপ্রতিরথ প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে। সংখ্যায়, বলে, বিশালতায় কোন বিষয়েই ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ডাইনোসরেরা ইহাদেরই দলভুক্ত ছিল। ইহার পরে পৃথিবীতে পক্ষী আসিয়াছিল। সর্বশেষে স্তন্যপায়ী জন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে আবার মানুষ সকলের কনিষ্ঠ।

স্তন্যপায়ীদিগের মধ্যে হস্তি, গণ্ডার প্রভৃতি স্থূলচর্মী জন্তুর এক সময়ে পৃথিবীতে বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। পৃথিবীর নানা স্থানে নানা আকারে ইহারা বিরাজ করিত। এইরূপে অতিশয় বিচিত্র গতিতে পৃথিবীতে জীবপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। এই এই বিচিত্রতার মধ্যে এক বিষয়ে লক্ষ্যের বিশেষ স্থিরতা দেখা যায়। জীবপ্রবাহের গতি ক্রমিক উন্নতির দিকে। পৃথিবীতে ক্রমেই উন্নত হইতে উন্নততব জীব জন্মগ্রহণ করিতেছে।

বাদশাহি সারকাস

রোমনগরের লোকেরা নানারকম জন্তু এবং মানুষের লড়াই দেখিতে বড় ভালবাসিত। এ সম্বন্ধে অনেক কথা তোমরা সময় সময় মুকুলে পড়িয়াছো। এক সময়ে আমাদের দেশেও যে ঐরূপ তামাসা হইত, তাহা হয়ত সকলের জানা নাই।

আগে বিলাতে 'ওরিএন্ট্যাল্ য়্যানুয়েল' নামক একখানি বার্ষিক পত্রিকা বাহির হইত। ১৮৩৮ সালে উহার যে খণ্ড ছাপা হয়, তাহাতে এইরূপ তামাসার কিছু বর্ণনা আছে। এক সাহেব তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

একটা ছোট পুকুরে দুইটা কুমীর রাখা হইয়াছিল। ক্রমাগত দুমাস তাহাদের মুখ লোহার তার দিয়া বাঁধা ছিল;এই দু'মাস তাহারা কিছুই খাইতে পায় নাই। এরপর তাহাদিগকে ধরিয়া ডাঙ্গায় তুলিয়া তাহাদের মুখের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইল। বাঁধন খুলিয়া ছাড়িয়া দিতে তাহারা আবার জলের ভিতরে গিয়া ঢুকিল। দু'মাস একসঙ্গে এক পুকুরে থাকিয়া তাহাদের মধ্যে কতকটা বন্ধুতা হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা কোনরূপ ঝগড়া করিবার চেষ্টা করিল না। পুকুরটির জল বেশী গভীর ছিল না, সুতরাং তাহাদের চাল-চলন বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। তামাসার জায়গায় বিস্তর লোকের জনতা হইয়াছিল কিন্তু কুমীরেরা তাহা বড় গ্রাহ্য করিল না। এমন কি, লম্বা বাঁশের খোঁচা দু-একটা না খাইলে, তাহাদের বড় একটা নড়িবার চড়িবার মতলবও দেখা গেল না।

এমন সময় একটা মরা ভেড়া আনিয়া ছোট কুমীরটার মুখের কাছে ফেলিয়া দেওয়া

হইল। ছোট কুমীরটা ভারি ব্যস্ত হইয়া যেই সেটাকে মুখে লইয়াছে, অমনি বড় কুমীরটা তীরের মতন ছুটিয়া তাহাতে ভাগ বসাইতে আসিল। এরপর কিছুকাল তাহারা জলের নীচে কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। খানিক পরে একটাই ভাসিয়া উঠিল; তখন দেখা গেল, যে সে ভেড়ার কতকটা মুখে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। সেটুকু খাওয়া হইলে সে আবার ডুব দিল, আর আবার নূতন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধের চোটে ছোট পুকুরটি তোলপাড় হইয়া উঠিল, তাহার জল কাদায় ঘোলা আর রক্তে লাল হইয়া যাইতে লাগিল। দর্শকদেব উৎসাহের কথা বুঝাই যায়। ভেড়া শেষ হইয়া গেলে, দুইটাতে পুকুরের দু জায়গায় ভাসিয়া উঠিল। তখন দেখা গেল, যে ছোট কুমীরটার গলায় ভয়ানক একটা গর্ত, আর বড় কুমীরটার সামনের পা একেবারে চৌচির। তাহাদের রক্তে জল লাল হইয়া যাইতেছে; কিন্তু বেশী কিছু কষ্ট যে তাহাদের হইতেছে, এইরূপ বোধ হইল না।

এরপর আর একটা ভেড়া আনিয়া জলে ফেলা হইল; সুতরাং যুদ্ধও আবার আরম্ভ হইল। এবারে যুদ্ধ বেশীক্ষণ থাকিল না; কারণ ভেড়াটা এত পচা ছিল যে সহজেই ছিঁড়িয়া গেল। সেদিনকার তামাসা এই পর্যন্ত। পরদিন বাঘে কুমীরে লড়াই। বাঘটা একটা প্রকাণ্ড চিতা বাঘ। সেই আগের দিনের দুটা কুমীরের সঙ্গে তার লড়াই হইবে। ছোট কুমীরটাকে দেখিয়াই বোধ হইল, যে আগের দিনের সেই গলার আঘাতে সে বড়ই কাবু হইয়াছে—যুদ্ধের মেজাজ তাহার একেবারেই নাই।

বাঘটাও যেন কুমীর দেখিয়া একটু ভয় পাইয়াছে। সে সহজে খাঁচার বাহিরে আসিতে চায় না। —তাহাকে খোঁচাইয়া বাহির করিবার দরকার হইল। বাহিরে আসিয়া সে একবার কুমীরের কাছে যায়—আর এক একবার ওৎ পাতিবার যোগাড় করে—আবার ভয় পাইয়া থামে। বাঘটা বেশী কাছে আসিলে কুমীর গুলা একটু একটু লেজ নাড়ে। এমন সময় কতকগুলি পট্‌কায় আগুন ধরাইয়া বাঘের পিছনে ফেলিয়া দেওয়া হইল।

পট্‌কার শব্দে বাঘটা চম্‌কাইয়া আর চটিয়া এক লাফে গিয়া ছোট কুমীরটার উপরে পড়িল। সে বেচারা আগে হইতেই কাবু হইয়া আছে, সুতরাং তাহার গলার দাঁত বসাইয়া তাহাকে মারিতে বাঘের কিছুই মুশকিল হইল না।

তিন দিন যাবৎ বাঘটা কিছু খাইতে পায় নাই; ক্ষুধায় সে আগেই গরম হইয়াছিল। এর উপরে এখন রক্তের লোভ পাইয়া সে আরো খেপিয়াছে; আবার একটা কুমীরকে এত সহজে মারিয়া তাহার ভয়ও ভাঙ্গিয়াছে। সুতরাং সে ইহার পরেই লাফাইয়া বড় কুমীরটার ঘাড়ে পড়িতে গেল। কিন্তু বড় কুমীরটা ভয়ানক তাড়াতাড়ি মাথা সরাইয়া নেওয়াতে, বাঘ ত তাহার ঘাড়ে পড়িতেই পাইল না, বরং বাঘ সাম্‌লাইয়া উঠিবার আগেই কুমীর তাহার মাথাটি কামড়াইয়া ধরিল। ইহার পর এক পালোয়ান বল্লম দিয়া কুমীরটাকে মারিয়া ফেলিল।

আর একবার একটা বড় বাঘ আর একটা মহিষে যুদ্ধ হইয়াছিল। মহিষটা প্রকাণ্ড আর ভয়ানক রাগী। মুহূর্তের মধ্যে সে বাঘ মহাশয়কে তাড়াইয়া কোণঠাসা করিল। বাঘ তখন আর কি করে, লাফাইয়া মহিষের ঘাড়ে পড়া ভিন্ন তাহার অন্য উপায় নাই। সে মহিষের ঘাড়ে পড়িয়া আঁচড় কামড়ে তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিল, কিন্তু মহিষের তাহাতে গ্রাহ্য নাই। সে এমনি জোরে এক ঘা ঝাড়া দিল যে, বাঘ আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেল; আর মহিষ শিঙের গুঁতায় তাহার নাড়িভুঁড়ি বাহির করিয়া দিল। যতক্ষণ

বাঘের প্রাণ ছিল ততক্ষণ মহিষ তাহাকে গুঁতাইয়াছিল আর মাড়াইয়াছিল। তারপর পাগলের মত ছুটিতে লাগিল। তাহার গা দিয়া দর দর করিয়া রক্ত পড়িতেছে, মুখ দিয়া ফেনা ঝরিতেছে, চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে! মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া, পায়ে মাটি খোঁড়ে আর ভয়ানক গর্জন করে।

তারপর একটি ছোট গণ্ডার আনা হইল। সে তামাসার জায়গায় এক পাশে দাঁড়াইয়া আড় চোখে মহিষকে দেখিতে লাগিল, কিন্তু কিছুমাত্র ব্যস্ত হইল না। মহিষটা মাঝখানে দাঁড়াইয়া ছিল। সে সেখান হইতে শিং নীচু করিয়া গণ্ডারের দিকে ছুটিল। মহিষ কাছে আসিবামাত্র গণ্ডার পাশ কাটিয়া তাহাকে এড়াইয়া গেল, আর তাহার নিজের খড়্গ দিয়া মহিষকে গুঁতাইয়া দিল। গুঁতা মহিষের গায় ভাল করিয়া লাগিল না; খালি একটা লম্বা আঁচড় পড়িল। এতক্ষণে গণ্ডারটা রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতেছে, তাহার চোখদুটি যেন জ্বলিতেছে! মহিষ এতক্ষণে আবার ফিরিয়া আসিয়া গণ্ডারের কাঁধে এক গুঁতা লাগাইল, কিন্তু গণ্ডারের চামড়া এমন শক্ত, যে সে গুঁতায় তাহার বিশেষ কিছুই হইল না। গুঁতা খাইয়াই গণ্ডার তৎক্ষণাৎ মহিষের পাঁজরার ভিতরে তাহার খড়্গ ঢুকাইয়া দিল; তারপর তাহাকে খড়্গে তুলিয়া খানিক দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। মহিষও মাটিতে পড়িয়া তখনই মারা গেল।

শেষে একটা প্রকাণ্ড ভালুক আর তিনটা বুনো কুকুরের যুদ্ধ। বেশ গভীর অথচ মুখ লম্বা চওড়া একটা গর্তের মতন স্থানের মাঝখানে একটা থাম পোঁতা আছে। ভালুকটা সেই থামের আগায় চড়িতে ভারি ব্যস্ত। এমন সময় কুকুরগুলিকে ভিতরে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ভালুককে থামের উপরে দেখিয়াই কুকুরগুলি ভয়ানক ঘেউ ঘেউ আরম্ভ করিল। শেষে অনেক কষ্টে গর্তের এককোণে গিয়া কুকুরগুলিকে সামনে করিয়া বসিয়া, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। একটা কুকুর তাহার গলা কামড়াইয়া ধরিল। সে দুহাতে চাপিয়া কুকুরটাকে মারিয়া ফেলিল। কুকুর মরিল, কিন্তু কামড় ছাড়িল না। ততক্ষণে আর দুটা কুকুর আসিয়া তাহাকে কামড়াইয়া ধরিল। প্রথম কুকুরটা কখন মরিয়া গিয়াছে; কিন্তু ভালুক সেই যে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, আর কিছুতেই ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। এদিকে দুই কুকুর তাহাকে কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। বেচারা নাকাল হইয়া শেষটা আবার চ্যাচাইতে লাগিল।

শেষে আর উপায় না দেখিয়া ভালুক মাথা গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। কুকুরগুলি তাহার পিঠে কামড়াইয়া বিশেষ কিছু করিতে পারিল না—সেখানকার চামড়াও মজবুত আর লোমগুলিও লম্বা লম্বা সুতরাং কামড়াইবার সুবিধা হয় না। যাহা হউক যতক্ষণ তাহাদের কিছুমাত্র দম ছিল, ততক্ষণ তাহারা ভালুককে ছাড়ে নাই। শেষে যখন একেবারেই হাঁপাইয়া পড়িল, তখন তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হইল। ভালুকও "বড্ড বেঁচে গিয়াছি" মনে করিয়া মরা কুকুরটাকে ফেলিয়া দিয়া, আবার তাহার থামে চড়িতে ব্যস্ত হইল।

ধূমকেতু

যাত্রায় যেমন সং, আকাশে তেমনি ধূমকেতু। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রগুলির সকলেরই এক একটা নিয়মিত কাজ আছে কিন্তু ধূমকেতুগুলিকে দেখিলে হঠাৎ মনে হইতে পারে, যে

ইহাদের কোন বাঁধা কাজ নাই। কোথায় যায় কোথায় থাকে তাহার ঠিক নাই, খালি মাঝে মাঝে এক একবার লেজ পরিয়া আসিয়া, দিন কয়েক তামাসা দেখাইয়া যায়।

আমি দেখিয়াছি, যাত্রায় সং আসিলে, কোন কোন ছোট ছেলে ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। ধূমকেতু দেখিলে কেহ কাঁদে কি না জানি না। কিন্তু সেকালে অনেক লোকেরই বিশ্বাস ছিল, যে ধূমকেতু উঠিলে বড়ই ভয়ের কারণ হয়। হয় ভয়ানক মারিভয় হইবে, না হয় দুর্ভিক্ষ হইবে; আর কিছু না হইলেও অন্ততঃ একটা রাজা টাজা কেহ মরিবে।

ক্রমে ইহাদের সম্বন্ধে লোকে যতই বেশী জানিয়াছে, ইহাদের সম্বন্ধে ভয়ও ততই কমিয়াছে। কিন্তু তাহা খুব অল্পদিনে হয় নাই।

ধূমকেতু কি জিনিস, তাহা এখনও একেবারে স্থির হয় নাই। ইহাতে জিনিস যে খুব সামান্য—আর যাহা আছে, তাহাও যে ধোঁয়ার মতন, তাহা অনেকদিন আগেই বুঝা গিয়াছিল। একটু শক্ত ভারি জিনিসের অমন খামখেয়ালী চালচলন হয় না।

খামখেয়ালী নয়? আচ্ছা অত বড় একটা লেজের তার কি দরকার বল দেখি! কোন কোনটির আবার একটি লেজে মন উঠে না। দুটি তিনটি— একটার আবার ছটি লেজ দেখা গিয়াছিল। আর একটা প্রথমে ভাল মানুষের মতন আসিয়াছিল; তারপর দুদিনের ভিতরে কোথা হইতে ছয় কোটি মাইল লম্বা এক লেজ বাহির করিল। কেহ কেহ আবার একলাটি আসেন, তারপর দুটিতিনটি হইয়া যান।

এ সকল দেখিলে এই কথাই বলিতে হয়, যে শক্ত জিনিসের ওরূপ করা সম্ভব না। ধোঁয়া হইলে সবই সম্ভব হয়। ধোঁয়া যে, তাহা আর একটা বিষয় হইতে বেশ বুঝিবে। এক একটা ধূমকেতু এত মোটা, তাহার লেজটা লক্ষ মাইল পুরু, তথাপি তাহার ভিতর দিয়া পিছনের তারাগুলিকে পরিষ্কার দেখা যায়।

এমন যন্ত্র আছে, যে তাহার ভিতর দিয়া কোন জ্বলন্ত জিনিসের আলোক পরীক্ষা করিলে, সেই জ্বলন্ত জিনিসটা কি তাহা বলিয়া দেওয়া যায়। এই যন্ত্রের নাম বর্ণবীক্ষণ (Spectroscope)। এই যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে ধূমকেতুতে অঙ্গার লোহা, সীসে ইত্যাদির জ্বলন্ত বাষ্প আছে। এই বাষ্প এত পাতলা অবস্থায় আছে, যে মোটের উপরে তাহাদের পরিমাণ অতি সামান্য। এমন কি, কোন উপায়ে যদি একটা ধূমকেতুকে ধরিয়া ঘন করা যাইত, তাহা হইলে হয়ত তোমরা তাহাকে পকেটে পুরিতে পারিতে। খুব বড় ধূমকেতুর ওজনও কয়েক সেরের বেশী হইবে না।

ডাক্তার হেলী নামক এক জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পুরাতন পুস্তকাদি পড়িয়া দেখিলেন যে ১৫৩১, ১৬০৭ এবং ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে এক একটা ধূমকেতু উঠিয়াছে। মোটামুটি প্রায় একই সময় অন্তর এক একটা ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া, ডাক্তার হেলী মনে করিলেন, যে হয়ত একই ধূমকেতু ঐরূপ ৭৫।৭৬ বৎসর লাগে। এ কথা যদি সত্যি হয়, তবে ১৭৫৯ সালে ঐ ধূমকেতুর আবার ফিরিয়া আসিবার কথা। বাস্তবিক ১৭৫৯ সালে ঐরূপ এক ধূমকেতু আসিয়া উপস্থিত হইল। এরপর আর বুঝিতে বাকি রহিল না, যে ঐ ধূমকেতুটি এক নির্দিষ্ট পথে চলে, এবং একবার সেই পথ ঘুরিয়া আসিতে ৭৫।৭৬ বৎসর লাগে। ডাক্তার হেলী এই কথা প্রথম প্রমাণ করিলেন, সুতরাং এই ধূমকেতুর নাম "হেলীর ধূমকেতু" রাখা হইল।

ইহার পর হইতে এ পর্যন্ত জ্যোতিষশাস্ত্রর অনেক উন্নতি হইয়াছে, আর খুব ভাল ভাল দূরবীক্ষণ প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকলের সাহায্যে এখন হামেশাই ছোট বড় বিস্তর ধূমকেতু দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষে ইহার সবগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই আমরা বুঝিতে পারি না, যে ধূমকেতু এমন সচরাচর দেখা সম্ভব। এখন আর পুরাতন পুঁথি খুঁজিয়া ধূমকেতু উঠিবার সময় স্থির করিতে হয় না। দিনকতক একটা ধূমকেতুকে দেখিলেই এখন জ্যোতির্বিদেরা তাহার নাড়ী-নক্ষত্র সমস্ত বলিয়া দিতে পারেন। সে কোন্ পথে চলে, কয় দিনে ফিরিয়া আইসে, ঘণ্টায় ক'মাইল যায়—ইত্যাদি সকল কথাই এখন স্থির করা যায়।

এমন ধূমকেতু আছে, যে তাহা সওয়া তিন বৎসর পর পর একবার ফিরিয়া আইসে। আবার এক লক্ষ বৎসর পরে একবার আইসে এমন ধূমকেতুও আছে। আবার ধূমকেতুর পথ বাহির করিতে গিয়া এমন ধূমকেতুও পাওয়া গিয়াছে, যে তাহারা আর কদাপি ফিরিয়া আসিবে না।

ধূমকেতুগুলি এত বড় বলিয়া তাহাদিগকে দেখিলে সহজে বিশ্বাস হয় না, যে তাহারা এত হাল্কা। আগেকার লোকেরা অনেক সময় এই মনে করিয়া ভয় পাইত, যে এই ধূমকেতুগুলির যখন এত বুনো মেজাজ, তখন একটা পাগলা ধূমকেতু যদি ছুটিয়া আসিয়া পৃথিবীকে ঢুঁ মারে, তবে কি ভয়ানক কাণ্ডই হয়। কিন্তু এরূপ হাল্কা জিনিসের দ্বারা পৃথিবীর কোন অনিষ্ট হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা দেখা যায় না। ১৮৬১ সালে একটা অতি প্রকাণ্ড ধূমকেতু উঠিয়াছিল। অনেকে বলেন, যে সেই সময়ে পৃথিবী সেই ধূমকেতুর লেজের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কাহারও বিশেষ কিছু হয় নাই। আর একবার একটা ধূমকেতু বৃহস্পতিকে ঘেঁসিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে বৃহস্পতির কিছুই হয় নাই। বৃহস্পতির কিছু হয় নাই বটে, কিন্তু ধূমকেতু বেচারা কেমন থতমত খাইয়া পথ ভুলিয়া গেল। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, জগতের সকল জিনিসই সেইরূপ পরস্পরকে টানে। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সকলেই পরস্পরকে টানে। ধূমকেতু বৃহস্পতির কাছ দিয়া যাইবার সময় বৃহস্পতিও তাহাকে ঐরূপ টানিয়াছিল। ধূমকেতুগুলি সূর্যের কাছে আসিয়া ভয়ানক গোঁ করিয়া ছুটে। এই গোঁ করিয়া ছুটিয়াছিল বলিয়াই সে যাত্রা সেই ধূমকেতু বৃহস্পতির হাত এড়াইয়া গেল— কিন্তু সেই টানাটানিতে আর তাহার পথ ঠিক রহিল না। আগে এই ধূমকেতু ৫১/২ বৎসর অন্তর এক-একবার আসিত। কিন্তু ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃহস্পতির কাছে তাড়া খাইয়া সেই যে সে পলাইয়াছে, এ পর্যন্ত আর ফিরে নাই।

আমি বলিতেছিলাম, যে ধূমকেতু সূর্যের কাছে আসিলে খুব ছুটে। বাস্তবিক ইহার চরিত্র অতি অদ্ভুত। সূর্যের নিকটে আসিলেই ইহার মাথায় গোল লাগিয়া যায়। তখন ইহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন কুকুরের সামনে বিড়াল পড়িয়াছে। দূরে থাকিতে ধীরে ধীরে চলিয়াছিল—এত ধীরে ধীরে, যে ইচ্ছা করিলে আমরাও তেমনি ছুটিতে পারি। তখন তাহার তেমন ভয়ানক লেজও ছিল না; দূরবীন দিয়া তাহাকে একটা ঝাপ্‌সা তুলার ডেলার মতন দেখা যাইত। ক্রমে যতই সূর্যের কাছে আসিতে লাগিল ততই উজ্জ্বল আর গরম হইতে লাগিল। এত উজ্জ্বল, যে অনেক সময় দুপুরবেলায় সূর্যের কাছেও তাহাকে দেখা যায়। ক্রমে লেজটি দেখা দিল, আর সেই লেজটিকে অতি সাবধানে সূর্যের দিক হইতে ফিরাইয়া রাখিতে লাগিল। বেগ প্রায় লক্ষগুণ বাড়িয়া গেল। আবার সূর্যের নিকট হইতে চলিয়া

যাইবার সময় ক্রমেই শান্তভাব ধারণ করিল।

একবার একটা ধূমকেতু হঠাৎ দুইভাগ হইয়া যায়। সেই দুইভাগ স্বতন্ত্র দুইটা ধূমকেতুর মতন একই পথে চলিতে থাকে। এই ধূমকেতুর নাম "বিয়েলার ধূমকেতু" অর্থাৎ বিয়েলা নামক একজন পণ্ডিত ইহার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বিয়েলার ধূমকেতু ৬১/২ বৎসর পরপর ফিরিয়া আসিত। ১৮৪৫ সালে এই ধূমকেতু দুভাগ হইয়া গেল; আবার ১৮৫২ সালে সেই দুইভাগ একসঙ্গে ফিরিয়া আসিল। ইহার পর আর এ পর্যন্ত তাহাদিগকে দেখা যায় নাই। কিন্তু এই ধূমকেতু আকাশে যে পথে চলিত, পৃথিবী সেই পথের কাছ দিয়া যাইবাব সময় ক্রমাগত তিনবার খুব উল্কাবৃষ্টি হইয়াছে। পণ্ডিতেরা বলেন, যে বিয়েলার ধূমকেতু হইতেই এই উল্কাগুলির উৎপত্তি। ১৮৮২ সালে খুব বড় একটা ধূমকেতু উঠিয়াছিল। ইহার পর আর এত বড় ধূমকেতু দেখা যায় নাই এই ধূমকেতুর লেজ দশকোটি মাইল লম্বা ছিল। এই ধূমকেতুর ছবিতে দেখ, তারাগুলি তাহার ভিতর দিযা কেমন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইহার মাথার চারিদিকে এবং সামনে খানিকদূর পর্যন্ত খুব পাতলা একখানি আবরণেব মত দেখা যায়। লেজটি কেমন একটু বাঁকা দেখ। মাথাটাই খুব উজ্জ্বল, আর সেই দিকে সূর্য আছে। অনেক সময় মাথার ভিতরে আবার একটি বীচিব মতন দেখা যায়। মোটামুটি ধূমকেতুর চেহারা এইরূপ হয়; তবে কোন দুইটি ধূমকেতুব চেহারাই অবিকল একরূপ হয না।

স্যাণ্ডো

একটা ষণ্ডা ছেলে একটা রোগা ছেলেকে মারিয়াছিল। রোগা ছেলেটা উল্টাইয়া মারিতে সাহস পাইল না। সে বলিল যে, "আমার গায়ে খুব জোর থাকলে তোকে দেখাইতাম।"

বাস্তবিক গায়ে খুব জোর থাকাটা নেহাত মন্দ নয়। পাঠক পাঠিকারা কি মনে করেন জানি না; কিন্তু আমি যদিও খুব বেশী রোগা নই, তবু আমার মনে হয়, যে গায়ে আরো অনেকখানি জোর থাকিলে ভাল হইত।

নিজের গায়ে জোর থাকিলে ত ভাল লাগিবারই কথা। অন্যের গায়ে জোর থাকিলে, তাহার কথা বলিয়াই কত সুখ পাওয়া যায়। সেই জন্যই হনুমান্, ভীম, ইঁহারা সকলের এত প্রিয় হইয়াছেন। আর সেই জন্যই আজ স্যাণ্ডো সাহেবের সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে।

স্যাণ্ডো জাতিতে জর্মান। পৃথিবীতে এখন ইনিই সকলের চাইতে বলিষ্ঠ লোক। ছেলেবেলা ইনি রোগা ছিলেন। এমন কি, ইহার মা-বাপ মনে করিয়াছিলেন, যে ইনি খুব বেশিদিন বাঁচিবেন না। এই স্যাণ্ডো খালি নিজের চেষ্টায় এখন পৃথিবীর মধ্যে সকলের চাইতে বলবান। আর, তিনি বলেন যে, চেষ্টা করিলেই সকলেই তাঁহার মত হইতে পারেন।

আঠার বৎসর পর্যন্ত স্যাণ্ডো খুবই রোগা ছিলেন। ইহার পর এনাটমি শাস্ত্র পড়িয়া, তিনি এক নূতন ব্যায়াম প্রণালী অনুসারে ব্যায়াম করাতে, তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার শরীরের বল ভয়ানক বাড়িয়া গেল।

এই সময়ে স্যাম্‌সন্ আর তাহার ছাত্র সাইক্লপ্, এই দুজনে পালোয়ান, লণ্ডন নগরে

তামাসা দেখাইতেছিল। তাহাদের গায়ের জোর দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া যাইত। স্যামসন্ বিজ্ঞাপন দিয়াছিল, "সাইক্লপের তামাসা গুলি যে করিতে পারিবে, সে ১৫০০ টাকা পাইবে। আর আমাকে যে হারাইতে পারিবে, সে ১৫০০০ টাকা পাইবে।"

এই সংবাদ শুনিয়া স্যাণ্ডো লন্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্যাম্সন্ রোজ তামাসা শেষে চেঁচিয়া বলে, "সাইক্লপের তামাসাগুলি যে করিবে, তাহাকে দেড়হাজার, আর আমাকে যে হারাইবে, তাহাকে পনের হাজার টাকা দিব।" কিন্তু এ পর্যন্ত কেহ তাহার কথায় উত্তর দেয় নাই। সেদিনও সে ঐ কথাগুলি বলিয়া নিয়ম রক্ষা করিল। স্যাম্সন্ মনে করে নাই যে কেহ উত্তর দিতে দাঁড়াইবে। এমন সময় স্যান্ডোর পক্ষ হইতে একজন উঠিয়া বলিলেন, "তোমার টাকা কোথায় দেখাও। আমার একজন পালোয়ান আছে।" স্যামসন ১৫০০ টাকার একখানা নোট উপস্থিত করিল।

স্যান্ডো আস্তে আস্তে স্টেজে (অর্থাৎ যেখানে তামাসা দেখান হয়, সেইখানে) গেলেন। সাধারণ ভদ্রলোকের পোষাক পরিয়া তিনি গিয়াছিলেন, সে পোষাকে তাঁহাকে তেমন ষণ্ডা দেখাইতেছিল না; তাই প্রথমেই অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। স্বয়ং স্যাম্সন্ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। যাহা হউক স্যান্ডো যখন কোট খুলিলেন, তখন আর এত হাসির অবসব রহিল না।

সাইক্লপ্ প্রথমে ২৮ সেব ওজনের দুইটা জিনিস দুহাতে লইয়া সেগুলিকে মাথার উপরে তুলিল। ইহার মধ্যে তাহার হাত আগাগোড়াই ঠিক সোজা রহিল। স্যান্ডো অবিকল সেইরূপ করিলেন।

তারপর সাইক্লপ ৩ মন ওজনের একটা বারবেল (লম্বা লোহার ডাণ্ডা, তাহার দুই মাথায় দুইটা গোলা) দুহাতে মাটি হইতে মাথার উপরে তুলিল। স্যান্ডো যখন তাহাও করিলেন, তখন সকলে হাততালি দিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া স্যান্ডো এক হাতেই সেই বারবেলটাকে মাটি হইতে উপরে তুলিয়া দেখাইলেন।

এরপর সাইক্লপ একহাতে দুই মণ পনের সের ওজনের একটা ডম্বেল্ উঠাইয়া, সেই হাতটাকে সোজা করিয়া বাড়াইয়া রাখিল; এবং আর এক হাতে একমণ ওজনের একটা ডম্বেল্ মাথার উপরে তুলিল। স্যান্ডোও সেইরূপ করিলেন।

সাইক্লপ্ এই সকল তামাসাই দেখাইত, সুতরাং সকলেই মনে করিল, যে স্যান্ডোর জিৎ হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে স্যামসন গোলমাল করিতে লাগিল। সেখানকার গণ্যমান্য লোকদের একজন মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, সাইক্লপ্ আর দুইটা তামাসা দেখাইবে, তাহা যদি স্যান্ডো করিতে পারেন, তবেই স্যান্ডোর জিৎ হইবে। স্যান্ডো বলিলেন যে, 'দুইটা কেন, কুড়িটা বলুন, তাহাতেও রাজি আছি।" সাইক্লপ্ চিৎ হইয়া শুইয়া তিন মণ ওজনের একটা জিনিস তুলিল, সে জিনিসটার উপর আবার দুজন লোক উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর লোক দুজন নামিয়া গেল, আর সাইক্লপ্ সেই ভারি জিনিসটাকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। স্যাণ্ডোও ঠিক ঐরূপ করিলেন।

সকলের শেষে প্রায় সওয়া ছয়মন একটা পাথরের সঙ্গে আরো একমণ ষোল সের বাঁধিয়া দেওয়া হইল। সাইক্লপ্ দুটা চেয়ারের উপরে দাঁড়াইয়া এক আঙ্গুলে এইগুলিকে মাটি হইতে প্রায় চার ইঞ্চি উঠাইল। ইহাও যখন স্যাণ্ডো করিয়া দেখাইলেন, তখন সাইক্লপের হার

মানা ভিন্ন আর উপায় রহিল না। সুতরাং এক হাজার পাঁচশত টাকার পুরস্কারটা তাঁহাকে দিতে হইল। পুরস্কার পাইয়া স্যান্ডো বলিলেন, "আমি শুধু ১৫০০ টাকার জন্য আসি নাই। ১৫০০০ টাকার পুরস্কারটাও লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি।" কিন্তু স্যাম্‌সন্ সেদিন আর কিছু করিতে রাজি হইল না। বলিল, "আগামী শনিবারে এস।"

শনিবারে লোকের ভিড় এত বেশী হইল, যে সামনের দরজা দিয়া কিছুতেই স্যান্ডো ঢুকিতে পাইলেন না। পিছনের দরজায় গিয়া দেখিলেন, সেটাও বন্ধ। দরজার পিছনে লোক আছে, অথচ সে কিছুতেই দরজা খুলিয়া দেয় না। শেষটা আর উপায় না দেখিয়া দরজার পিছনে এমনি এক ঘা লাগাইলেন, যে দরজার কব্জা খুলিয়া গেল। ভিতরের লোকটা ইহাতে খুব চোট পাইল। তাহাকে একশত পঞ্চাশ টাকা বক্‌সিস্ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া স্যান্ডো ঘরে ঢুকিলেন।

এইদিকে স্যাম্‌সন স্যান্ডোর দেরী দেখিয়া বলিতে লাগিল, "এই দেখ সে আসিল না। আমি জানিতাম, সে আসিবে না। আমি আর দশ মিনিট দেখিব।"

যাহা হউক এই দশ মিনিটের আধ মিনিট থাকিতে স্যান্ডো আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তামাসা আরম্ভ হইল; স্যামসন্ যাহা যাহা দেখায়, স্যান্ডোও তাহা করিয়া দেখাইলেন। এই সকল তামাসা সাইক্লপের তামাসার চাইতে ঢের শক্ত।

প্রথম তামাসা—প্রকাণ্ড একটা লোহার ডাণ্ডা এক হাতে লইয়া আর এক হাতের উপর মারিয়া সেটাকে বাঁকান।

দ্বিতীয় তামাসা—জাহাজ বাঁধা লোহার দড়ি বুকে জড়াইয়া বুক ফুলাইয়া তাহা ছেঁড়া।

তৃতীয় তামাসা—শিকল হাতে জড়াইয়া তাহা ভাঙ্গা। স্যান্ডো এর সমস্তই করিলেন। তারপর বলিলেন, "এখন আমি যাহা করি, তাহা কর দেখি"? এই বলিয়া তিনি দুইটা ডম্‌বেল্ লইয়া কস্‌রৎ করিলেন; তাহার একটা তিন মণ কুড়ি সের, আর একটা দুই মণ কুড়ি সের ভারি।

এবারে স্যাম্‌সন্ বলিয়া উঠিল, "ও ঢের দেখিয়াছি! ওসব ফাঁকি।" মধ্যস্থেরা কিন্তু বলিলেন যে, "স্যান্ডোর জিৎ হইয়াছে, এখন টাকা কোথায়?" স্যাম্‌সন্ বলিল, "টাকা কাল পাবে।" এই "কাল পাবে" বলিয়া গোলমাল করিয়া আর সে টাকা দিল না। শেষটা সেই নাট্যশালার কর্তৃপক্ষেরা সওয়া পাঁচ হাজার টাকা দিয়া স্যান্ডোকে সন্তুষ্ট করিলেন।

স্যান্ডো একবার প্যারিসে বেড়াইতে গেলেন। সেখানে ছেলেবেলার একটি বিশেষ প্রিয় বন্ধুর সহিত তাঁহার দেখা হইল। ১০ বছর বয়সের পর আর দু'জনের দেখা হয় নাই; কাজেই দু'জনার খুব আনন্দ হইল। ছেলেবেলায় দু'জনে খুব বিলিয়ার্ড খেলিতেন; সেই কথা মনে হওয়াতে তাঁহারা একটা হোটেলে বিলিয়ার্ড খেলিতে গেলেন। সেখানে আর কতকগুলি ফরাসী লোক উপস্থিত ছিল। তাহারা স্যান্ডো আর তাঁহার বন্ধুর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করিতে লাগিল, আর তাঁহাদের খেলা শেষ না হইতেই তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে চাহিল। যাহা হউক হোটেলের লোকেরা বলিল যে, "উহাদের ওরূপ করিবার কোন অধিকার নাই, তোমরা যতক্ষণ ইচ্ছা খেলিতে পার।" সুতরাং স্যান্ডো আর তাঁহার বন্ধু একবার খেলা শেষ করিয়া আর একবার খেলিতে লাগিলেন। তাঁহারা জার্মান ভাষায় কথা বলিতেছেন; ফরাসীরা তাহা না বুঝিয়া মনে করিল যে বুঝি তাহাদিগকে বিদ্রূপ করা হইতেছে। সুতরাং তাহারা আরো চটিয়া গেল।

খেলা শেষ হইলে দুই বন্ধু একটা টেবিলে বসিয়া কিছু জলযোগ করিতেছেন, এমন সময় সেই ফরাসীদের মধ্য হইতে খুব একটা লোক আসিয়া স্যাণ্ডোর সঙ্গে ঝগড়া বাধাইল।

স্যাণ্ডো প্রথমে খুব শান্তভাবে উত্তর দিতেছিলেন। এমন কি দুবার চড় খাইয়াও তিনি সহ্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বন্ধু তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে চাহিলে, তিনি হাতে ধরিয়া তাঁহাকে বারণ করিয়াছিলেন। স্যাণ্ডো অবশ্য খুব স্নেহের সহিতই বন্ধুর হাত ধরিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ধরাতেই বন্ধুর হাতখানি ভাঙ্গিয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছিল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, যে স্যাণ্ডো আর এখন সে লোক নহেন।

সেই ফরাসী কিন্তু স্যাণ্ডোর শান্তভাব দেখিয়া ক্রমেই চটিতেছিল। শেষটা তাঁহাকে নাকে এমনি এক কীল মারিল যে, নাক দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তাহার ধাক্কায় টেবিলে প্লেট হইতে ঝোল পড়িয়া স্যাণ্ডোর সবে সেইদিন পরা নূতন সুটটি মাটি হইয়া গেল। এমন অবস্থায় কাহার না রাগ হয়? স্যাণ্ডোও ত মানুষ। সুতরাং তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া ফরাসীর ঘাড় আর এক হাতে তাহার দুই-পা ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। তারপর তাহার হাঁটু আর মাথায় ঠোকাঠুকি করিয়া তাহাকে টেবিলে আছড়াইয়া ফেলিলেন। সেই আছাড়ে টেবিলের চাল ভাঙ্গিয়া ফরাসী ভায়া মেঝেতে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া রহিল। দেড়দিন সে হাসপাতালে এই অবস্থায় ছিল। অবশ্য এই ঘটনায় স্যাণ্ডোকে পুলিশে যাইতে হইয়াছিল। প্রথমে একটা পুলিশ তাঁহাকে ধরিতে আসিলে, হোটেলের লোকেরা তাহাকে বলিল যে, "আরো জনকতক সঙ্গে করিয়া আইস, এ বড় ভয়ানক লোক।" যাহা হউক স্যাণ্ডো থানায় যাইতে কোন আপত্তি করিলেন না। স্যাণ্ডোর সঙ্গে তাঁহার বন্ধু এবং সেই ফরাসীর বন্ধুরাও গেল। এই ঘটনায় স্যাণ্ডোর কোন দোষ ছিল না আগাগোড়াই সেই ফরাসীর দোষ, একথা সেই বন্ধুরা থানার লোকদিগকে বলাতে, তাহারা সহজেই স্যাণ্ডোকে ছাড়িয়া দিল।

স্যাণ্ডোর রাগ থামিয়া গেলে পর, সেই লোকটাকে এত আঘাত দিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার মনে খুব ক্লেশ হইতে লাগিল। তিনি তাহাকে হাসপাতালে দেখিতে গেলেন। কিন্তু সে তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিল না।

প্যারিসের সেই ঘটনার কিছুদিন পরে স্যাণ্ডো লণ্ডনে আসিলেন। সেখানে এক রাত্রিতে তিনি তামাসা দেখাইতেছেন, এমন সময় একটি ভদ্রলোক তাঁহার সহিত দেখা করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। ভদ্রলোকটিকে কোথায় দেখিয়াছেন বলিয়া স্যাণ্ডোর মনে হইল, কিন্তু ঠিক চিনিতে পারিলেন না। ভদ্রলোকটি অনেক সৌজন্য দেখাইয়া কিছু জলযোগের জন্য স্যাণ্ডোকে নিয়া এক হোটেলে গেলেন। তখন ভদ্রলোকটি বলিলেন, "মিস্টার স্যাণ্ডো, বোধহয় আমাকে চিনিতে পারেন নাই?" স্যাণ্ডো বলিলেন, "না মহাশয়।"

তখন ভদ্রলোকটি বলিলেন, "চিনিলে হয়ত আমার সঙ্গে কথাই কহিতেন না।" ক্রমে জানা গেল, যে সেই ভদ্রলোক আর কেহ নহেন, সেই প্যারিসে স্যাণ্ডো যাঁহাকে ঠেঙ্গাইয়াছিলেন, তিনিই। তিনি বলিলেন, "আমি আমার বন্ধুদের মধ্যে সকলের চাইতে ষণ্ডা। কিন্তু আমি কি জানিতাম, যে আপনি স্যাণ্ডো। তাহা হইলে কি আর আমি আপনার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করি।" এইরূপ কথাবার্তার পর ভদ্রলোকটি সেইখানে স্যাণ্ডোর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন, এবং তাহার নিদর্শনস্বরূপ স্যাণ্ডোকে ১৫০০ টাকা মূল্যের একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিলেন।

একবার স্যাণ্ডো আমেরিকা গিয়াছিলেন। সেখানে অনেক বড় বড় শহরে তামাশা দেখাইয়া লোককে আশ্চর্যান্বিত করেন। কিন্তু সকলের চাইতে আশ্চর্য কাণ্ড হইয়াছিল, সানফ্রান্‌সিস্কো নগরে, এক সিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ।

একটা প্রকাণ্ড সার্কাসে সিংহ এবং ভালুকের যুদ্ধ হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু দুইটা পশুকে এরূপ করিয়া ছেঁড়া ছিঁড়ি রক্তরক্তি করান আইনবিরুদ্ধ বলিয়া, পুলিসের লোক তাহা হইতে দিল না, অনেক লোক উৎসুক হইয়া টিকিট কিনিয়াছিল; তামাসা হইল না বলিয়া, তাহারা একটু নিরাশ হইল। তখন স্যাণ্ডো বলিলেন, "আমি ঐ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করিব!" সিংহটা ছয় মণ ভারী। স্বভাবটি তার সিংহের পক্ষেও একটু একটু বেশী রকম হিংস্র। দিন সাতেক আগে তাহার রক্ষকটিকে জলযোগ করিয়াছে। স্যাণ্ডো বলিলেন, "এই সিংহের সহিত যুদ্ধ করিব!"

সিংহের সঙ্গে খালি বলেরই পরীক্ষা। সিংহ নখ দিয়া আঁচড়াইবে, দাঁত দিয়া কামড়াইবে। মানুষের ত আর তেমন নখ দাঁত নাই; সুতরাং একটা ছোরা বা অন্য কোনরকম অস্ত্র না হইলে কিরূপে আত্মরক্ষা হয়? কিন্তু অস্ত্র দিয়া পশুকে খোঁচাইলে নিষ্ঠুরতা হইবে; সুতরাং পুলিশ এ কথায় বাধা দিল। তখন অগত্যা ইহাই স্থির হইল যে, সিংহকে মুখোশ আর মোজা পরাইয়া দেওয়া হইবে। খালি গায়ের জোরের পরীক্ষা।

ইহাতেও স্যাণ্ডোর বন্ধুরা কহিতে লাগিলেন, "সিংহের এত জোর, যে এক চড় মারিয়া তোমার মাথা ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে।" যাহা হউক স্যাণ্ডো লড়িবেনই। দেশময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

যে তাঁবুতে তামাসা দেখান হয়, তাহাতে কুড়িহাজার লোক ধরে। এত লোকের সামনে তামাসা দেখাইতে হইলে, আগে একটু প্রস্তুত হইয়া লওয়াই দরকার। সুতরাং তামাসার আগে একদিন গোপনে সিংহের সহিত পরিচয় করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইল।

অনেক লোক মিলিয়া, শিকল দিয়া বাঁধিয়া, সিংহ মহাশয়কে মোজা আর মুখোশ পরাইয়া দিল। সিংহ বিস্তর আপত্তি করিয়াছিল, সুতরাং তাহাকে এসকল পরাইতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগিল।

যে খাঁচায় লড়াই হইবে তাহা সত্তর ফুট লম্বা। লোকজন অতি অল্পই ছিল; কিন্তু যাহারা ছিল, তাহারা মনে করে নাই যে, স্যাণ্ডো এই খাঁচার ভিতরে ঢুকিয়া আবার বাহির হইয়া আসিবেন। খালি হাতে খালি গায়ে স্যাণ্ডো খাঁচার ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

স্যাণ্ডোকে দেখিয়া সিংহ ভয়ানক রাগের সহিত লাফাইয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়িতে গেল। কিন্তু স্যাণ্ডো হঠাৎ পাশ কাটাইয়া যাওয়াতে তাহা পারিল না। স্যাণ্ডো আর তাহাকে মাটিতে পড়িয়া আশ্চর্য হইবার অবসর দিলেন না। একহাতে গলা আর এক হাতে কোমর জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে কাঁধের সমান উঁচুতে তুলিলেন; তারপর আছড়াইয়া মেঝেতে ফেলিয়া দিলেন।

এমন ব্যবহারে সিংহের রাগ হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক, তা'তে সেই সিংহটা আবার ভয়ানক রাগী। সে এমনি এক চড় উঠাইল, যে স্যাণ্ডো মাথা সরাইয়া না ফেলিলে, হয়ত তাহা গুঁড়াইয়া যাইত। কিন্তু স্যাণ্ডো তাড়াতাড়ি মাথা সরাইয়া লইয়া, তাহাকে আবার সাপ্‌টাইয়া ধরিলেন। সিংহের তখন প্রায় কলে ইঁদুর পড়ার গোছ হইল। সে কত চেষ্টা করিল, কিছুতেই স্যাণ্ডোর হাত ছাড়াইয়া যাইতে পারিল না। তারপর স্যাণ্ডো নিজেই তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

এতক্ষণে সিংহটা এমন ভয়ানক রাগিয়াছে, যে সকলেই স্যাণ্ডোকে বাহিরে চলিয়া আসিতে বলিতে লাগিল। কিন্তু স্যাণ্ডোর ইচ্ছা, আর একবার শেষ পরীক্ষা হয়। তাই তিনি সিংহের দিকে পিছনে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন সে কি করে। সিংহও সেই মুহূর্তেই লাফাইয়া তাঁহার পিঠে চড়িয়া বসিল। তখন স্যাণ্ডো তাঁহার মাথার উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া দুহাতে সিংহের গলা ধরিলেন; তারপর একটানে তাহাকে নিজের মাথার উপর দিয়া আনিয়া মেঝেতে আছড়াইয়া ফেলিলেন।

স্যাণ্ডো বাহিরে আসিলে দেখা গেল, যে মোজা পরা সত্ত্বেও সিংহ তাঁহাকে খুব আঁচড়াইয়াছে, তাঁহার সমস্ত শরীর বহিয়া রক্ত পড়িতেছে। স্যাণ্ডো তাহা গ্রাহ্যই করিলেন না। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, যে এখন আর ঐ সিংহের সঙ্গে প্রকাশ্যে লড়াই করাতে কোন মুশকিল হইবে না।

তামাসার দিন মোজা আর মুখোশ পরাইবার সময় সিংহটা এমনি রাগিয়া গেল, যে দুইটা শিকল ছিঁড়িয়া বাহির হইল। যাহারা তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা এখন প্রাণ লইয়া পলাইবার পথ পায় না। চারিদিকে খালি চেঁচামেচি আর ছুটাছুটি, এমন সময় সিংহ দেখিতে পাইল, যে স্যাণ্ডো তাহার পানে তাকাইয়া আছেন। অমনি তাহার সেই রাগ আর তেজ কোথায় মিলাইয়া গেল—তাহার আর নড়িবার শক্তি রহিল না। তখন সুযোগ বুঝিয়া তাহার খাঁচাটা কাছে আনা হইল। তারপর স্যাণ্ডো এক ধাক্কা দিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া খাঁচার ভিতরে ফেলিয়া দিলেন, আর তৎক্ষণাৎ খাঁচার দরজা আঁটিয়া দেওয়া হইল। দুঃখের বিষয়, এত কষ্ট করিয়া সিংহকে মোজা মুখোশ্ পরাইয়া খালি কষ্টই সার হইল। সে সিংহ এতক্ষণে স্যাণ্ডোকে বেশ চিনিয়া ফেলিয়াছে; সে আর কিছুতেই যুদ্ধে প্রস্তুত নহে। ধাক্কা খোঁচা, গুঁতো, কিছুতেই আর রাগ হয় না—নিতান্ত ভাল মানুষের ন্যায় সে সকল প্রকার অপমান সহ্য করিতে লাগিল। শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া স্যাণ্ডো সিংহের লেজটাকে দিয়া দড়ি পাকাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে যদিও সিংহ খুব রাগিয়া লাফ দিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিল, কিন্তু একবার সাপটিয়া ধরিয়া আছাড় দিবার পরই সেই রাগটুকু চলিয়া গেল। তখন সিংহ হয়ত মনে মনে বলিতেছে যে, "তুই মোর দাদা!" সে যুদ্ধ ত আর করিলই না; বরং স্যাণ্ডো যখন তাহাকে ধরিয়া কাঁধে তুলিয়া পাইচারি করিতে লাগিলেন, তখনও সে ছোট খোকাটির মতন চুপ করিয়া রহিল, যেন ঐরূপ করিয়া চলাই তাহার অভ্যাস।

আজকাল স্যাণ্ডো যেসকল তামাসা দেখান তাহার কথা কিছু বলিয়া আমরা এই গল্প শেষ করিব।

এক জোড়া (৫২খানা) তাস লইয়া সেই আস্ত জোড়াকে ছিঁড়িয়া দুভাগ করা, যেমন তেমন বীরের কর্ম নয়—একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেই পার। স্যাণ্ডো তিন জোড়া তাস উপরি উপরি সাজাইয়া তাহা ছিঁড়িয়া দুভাগ তারপর সেই দুভাগকে আবার উপরি উপরি রাখিয়া ছিঁড়েন। অর্থাৎ ছয় জোড়া তাস একসঙ্গে ছিঁড়িলে যাহা হয়, তাহাই করেন।

দশ মণ ওজনের একটি পোল বুকে লইয়া স্যাণ্ডো চিৎ হইয়া শয়ন করেন। তারপর দুজন লোক সেই পোলের উপর দিয়ে একখানি এক ঘোড়ার গাড়ি হাঁকাইয়া যায়। এই সকল জিনিসের ওজন সর্বশুদ্ধ প্রায় চল্লিশ মণ!

স্যাণ্ডো বলেন যে, বলবান্ হওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব। তিনি ছেলেবেলা নিতান্তই

রোগা ছিলেন; তারপর নিজের আবিষ্কৃত প্রণালী অনুসারে ব্যায়াম করিয়া অদ্বিতীয় বীর হইয়াছেন। এই প্রণালী অনুসারে নিয়মমত ব্যায়াম করিলে, সকলেই তাঁহার মতন হইতে পারে, এই কথা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। স্যান্ডো Strength And How to obtain it নামক একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার জীবন এবং ব্যায়াম প্রণালীর বিবরণ লেখা আছে আমার পরিচিত অনেকেই এই প্রণালীতে ব্যায়াম করিয়া বিশেষ উপকার পাইতেছেন। এই প্রণালীর বিশেষ গুণ এই যে, ইহা অন্য সকল প্রণালী অপেক্ষা সহজ। ইহাতে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কোন আঁটাআঁটি নাই; ব্যয় অতি সামান্য; আর খুব শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়।

প্রার্থনা করি, তোমরা স্যান্ডোর ন্যায় বলশালী হও; আর স্যান্ডোর চাইতে সেই বলের অধিকতর সদ্ব্যবহার কর।

বিড়ালের জাত

আমাদের ঘরের বিড়ালগুলি দেখিতে ছোট বটে, কিন্তু পদে খুব বড়। শুনিয়াছি, বাঘ না কি বিড়ালের বোন-পো হয়।

সিংহ তাহার কে হয়, তাহা সঠিক বলিতে পারি না। তবে পণ্ডিতেরা বলেন যে, সেও না কি বিড়ালেরই জাত-ভাই।

সিংহ পশুর রাজা, একথা অনেকবার পুস্তকে পড়িয়াছি। কে তাহাকে রাজা করিল; কি দেখিয়া করিল; কোন্ বিশেষ গুণে, না কি খালি দাড়ি-গোঁফের জোরে; —এ সকল কথার পরিষ্কার উত্তর এখন খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইবে। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যে সকল দেশেই তাহাকে পশুর রাজা বলে।

দেখিতে খুব জমকালো তাহাতে সন্দেহ নাই। মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইলে, নেহাৎ কেও-কেটা বলিয়া উড়াইয়া দিতে ভরসা হয় না। কিন্তু গায়ের জোরে সে বাঘের চাইতে বড় কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়।

বাঘে সিংহে লড়াই দেখা গিয়াছে—দুবারই কিন্তু পোষা বাঘ আর পোষা সিংহে। একবার বিলাতে এইরূপ লড়াই হয়, তাহাতে সিংহটা জিতে; আর একবার কলিকাতায় এইরূপ হয়; তাহাতে বাঘটা জিতে। সুতরাং জয়-পরাজয় কাহারও হয় নাই বলিতে হয়।

শুনিয়াছি, সিংহের মেজাজটা না কি খুব রাজার মতন। কিন্তু ইহার অর্থ কি বুঝিব, জানি না। অনেকগুলি রাজার কথা শুনিলে তাহাদিগকে খুব ছোট লোক বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া সিংহের বিরুদ্ধে আজকাল এ বিষয়ে ঢের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; তাহার সকল কথা সত্য হইলে, লজ্জার বিষয় বলিতে হইবে। সাহসের কথা যদি বল, তবে সিংহ এ বিষয়েও খুব প্রশংসার পাত্র নহে। শিকারীর সামনে পড়িলে, অন্য দশটা জানোয়ারের ন্যায় সেও চম্পট দিতে কুণ্ঠিত হয় না। অনেক বড় বড় শিকারীর মুখে শুনা গিয়াছে, যে সিংহের ব্যবহার মোটের উপরে অনেকটা কাপুরুষেরই মতন। বিদঘুটে ভেংচি দেখিয়া, আর বিকট চীৎকার শুনিয়া সিংহকে ভয় পাইতে দেখা গিয়াছে। তবে একথা শুনিয়াছি, যে একবার ক্ষেপিয়া দাঁড়াইলে, সিংহ কিছুতেই ভয় পায় না।

পক্ষান্তরে বাঘেরও মহত্ত্বের কথা শুনা গিয়াছে। একবার একটা বাঘ শিকারীর তাড়া খাইয়া পলাইতেছিল, এমন সময় একটি ছোট ছেলে গাছের উপর হইতে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, যে 'ঐ বাঘ।' ছেলেটি যে গাছের ডালে বসিয়াছিল, তাহা বেশী উঁচুতে ছিল না। বাঘ এক লাফে সেখানে উঠিয়া, একেবারে সেই ছেলের মাথাটা কামড়াইয়া ধরিল; কিন্তু এমনি আলগোছে ধরিল, যে দাঁত বসিল না। অর্থাৎ যেমন করিয়া তাহারা বাচ্ছা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়, সেইরূপ করিয়া ধরিল। এইরূপে তাহাকে গাছ হইতে নামাইয়া রাখিয়া বাঘ চলিয়া গেল। ছেলেটি ভয়ে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার একটুও লাগে নাই। জ্ঞান হইলে, সে খালি বলিয়াছিল, "উঃ! কি গন্ধ!" এই গল্পটা শুনিলে কি এরূপ মনে হয় না, যে অত ছোট ছেলেকে কঠিন আঘাত দিতে বাঘের ইচ্ছা হয় নাই।

যাহা হউক বিড়াল জাতীয়দের মধ্যে বাঘ আর সিংহ এই দুজনেই শ্রেষ্ঠ। এ দুজনের যিনিই রাজা হউক, তাহাতে ফলের বড় ইতর বিশেষ দেখি না।

আজকাল আমাদের দেশে সিংহ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন কবিদিগের বর্ণনা দেখিলে বোধহয়, যেন আগে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই সিংহ ছিল। কিন্তু এক গুজরাট ভিন্ন অন্যান্য স্থান হইতে সিংহ অনেকদিন হইতেই লোপ পাইয়াছে। গুজরাটেও যে আর বেশী দিন সিংহ পাওয়া যাইবে, তাহা বোধহয় না। সিংহের আদত জায়গা এখন আফ্রিকা। সেখানকার বার্বেরী দেশীয় সিংহই সকলের প্রধান। তাহার চেহারা যেমন দেখিতে জমকালো, গায় বলও তেমনি প্রচণ্ড।

আমেরিকায় সিংহ বলিয়া একটা জন্তু আছে। সে বাস্তবিক সিংহ নহে। রংটা অনেকটা সিংহের মতন বটে, কিন্তু আকৃতি সিংহের চাইতে অনেক ছোট, আর তাহার কেশর নাই। এই জন্তুর আসল নাম "পুমা"। পুমা খুব সাহসী, আর বড় প্রতিহিংসা-প্রিয়।

আমেরিকার সিংহ যেমন সিংহ নহে, তেমনি আমেরিকার বাঘও ঠিক বাঘ নহে। এই জন্তুর নাম "জ্যাগুযার"। ইহার পরাক্রম খুব বেশী, তাই সেখানকার লোকেরা অনেক সময় ইহাকে টাইগার বলে। যাহার গায় লম্বা লম্বা ডোরা সেই বাঘই টাইগার। জ্যাগুয়ারের গায় চক্র থাকে।

এতক্ষণ বাঘের কথা বলিয়া দু-একটা বাঘের গল্প না বলিয়া শেষ করা ভাল দেখায় না।

দুই বন্ধুর বড়ই মাছ ধরিবার সখ। কোথায় একটা খালের ধারে মাছ ধরিবার ভারি সুবিধা; তাই দুজনায় পরামর্শ করিল, যে পরদিন ভোরে সেখানে মাছ ধরিতে যাইবে। ভোরবেলা একজন খালের ধারে গিয়া দেখিল, যে সেখানে আর একজন ইতিপূর্বেই আসিয়াছে। এই ব্যক্তি অবশ্য তাহার বন্ধুই হইবে, এইরূপ মনে করিয়া সে তাহার কানের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কটা ধরলে?" তখনও ভাল করিয়া ফরসা হয় নাই, আর লোকটির দৃষ্টিশক্তিও বোধহয় একটু ক্ষীণ ছিল। সুতরাং সে বুঝিতে পারে নাই, যে ওটা তাহার বন্ধু নয়, বাঘ আসিয়া আছে। বাঘও মাছ খাইতে নিতান্তই ব্যস্ত ছিল, সুতরাং পিছন হইতে কে আসিতেছে, তাহার খবর রাখে নাই। আর তাহার ওরূপ কানের কাছে গিয়া বোধহয় ইতিপূর্বে কেহ কোন কথা বলে নাই। সুতরাং সে ভারি চমকাইয়া গেল, আর থতমত খাইয়া যাওয়াতে, সেই লোকটিকে দু-একটা আঁচড় দিয়াই ছুটিয়া পলাইল। তদবধি ঐ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেই পাড়ার ছেলেরা পিছন হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, 'কটা ধরলে?'

একদল শিকারী শূয়র মারিবার জন্য একটা বন ঘেরাও করিয়াছে;অন্য লোকেরা খানিক দূরে থাকিয়া তামাসা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এক দুধওয়ালা দুধ বেচিয়া কেঁড়ে হাতে বাড়ী ফিরিতেছিল; সেও একটা উই ঢিপির উপরে উঠিয়া বসিয়াছে। বনের ভিতরে শূয়র ছিল কি না জানি না, কিন্তু একটা ছোট বাঘ সেখানে ছিল; সে বেচারা বেগতিক দেখিয়া পলাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। বনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সে চুপি চুপি ঐ উইঢিপির নীচ দিয়া চলিয়াছে, এমন সময় দুধওয়ালা তাহাকে দেখিতে পাইল। এত বড় শিকার সামনে দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিলে কে চুপ করিয়া থাকিতে পারে? বিশেষতঃ যদি একটা দুধের কেঁড়ে হাতে থাকে? সুতরাং দুধওয়ালা দুহাতে কেঁড়ে উঠাইয়া তাহার দ্বারা বাঘের মাথায় যথাশক্তি এক ঘা লাগাইল। সে জানিত না, যে দুধের কেঁড়ের চাইতেও বাঘের মাথাটা শক্ত হয়! কেঁড়েটি তো গুঁড়া হইয়া গেলই, বাঘ বড় হইলে সে যাত্রা প্রাণটিও যাইত। যাহা হউক একে বাঘ ছোট ছিল, তাহাতে আবার প্রাণের ভয়ে ব্যস্ত থাকায়, তাহার যুদ্ধ করিবার অবসর অল্পই ছিল। তথাপি সে দুধওয়ালা মহাশয়কে কয়েক চড় দিতে ছাড়ে নাই। তখন তাহারা তাহাকে হাসপাতালে লইয়া চলিল। সেখানে গিয়া তাহার জ্ঞান হইলে পর, সে এই বলিয়া আপ্‌সোস্ করিতে লাগিল যে, 'হায় রে, আমার চার আনার কেঁড়েটা ছিল।

এক কুয়ার ধারে একটা গরু ঘাস খাইতেছে, ঝোপের ভিতরে থাকিয়া বাঘের চেষ্টা, যে তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে। ঠিক লাফ দিবার সময় গরুটা হঠাৎ টের পাইয়া সরিয়া পড়িল, আর বাঘ মহাশয় বেমালুম কূয়ার ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন। বাঘের মতন জন্তু চুপচাপ একটা কূয়ার ভিতরে পড়িয়া থাকিতে রাজি হইবে, এরূপ কিছুতেই আশা করা যায় না;সুতরাং তখন ভারি একটা সোরগোল শুনিয়া দুনিয়ার লোক আসিয়া সেখানে জড় হইল, আর এরূপ অবস্থায় শাস্ত্রে যেমন লেখে, তদনুযায়ী লগী, বাঁশ ইত্যাদিব সদ্‌ব্যবহার করিল।

শীতকালের সন্ধ্যাবেলায় এক ব্যক্তি ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আগুন পোহাইতে ছিলেন, এমন সময় একটা বাঘ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঘটা যখন উঠানের মাঝখানে আসিয়াছে, তখন সেই ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া মনে করিলেন, যে ওটা বুঝি বাছুর! সুতরাং তিনি ঐরূপ সন্ধ্যার সময়েও বাছুর বাহিরে রাখার দরুন চাকরকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বাঘ কিন্তু ততক্ষণে একেবারে পৈঠার উপরে আসিয়া উঠিয়াছে,এখন তাহাকে বাঘ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন কিন্তু পলাইবার আর সময় নাই। তখন তিনি আর কি করেন—তাড়াতাড়ি হাঁড়িশুদ্ধ আগুন বাঘের মুখে ঢালিয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজা আঁটিলেন। বাঘের জীবনে আর কখনও এরূপ অভ্যর্থনা জোটে নাই, সুতরাং সে আর সেখানে বিলম্ব না করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

রামজীবন

রামজীবন বলিলাম বটে, কিন্তু তাঁর নাম রামজীবন ছিল, কি আর কিছু ছিল তাহা জানি না।

সে অনেকদিনের কথা; এদেশে তখন ইংরাজের রাজত্ব ভাল করিয়া হয় নাই। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ তখন হিন্দু রাজার অধীন ছিল। রামজীবন ঐ সময়ে পূর্ব বাঙ্গালার একটি ক্ষুদ্র বিভাগের শাসনকর্তা ছিলেন। রামজীবনের বংশ, এবং তাঁহার সেই সুন্দর বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান।

বামজীবন য্যরপরনাই ধার্মিক লোক ছিলেন; এবং প্রজাদিগকে অতিশয় স্নেহের সহিত পালন করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সাধু সজ্জনের প্রতি তাঁহার সদ্ব্যবহারের সুখ্যাতি সমস্ত বাঙ্গালায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নবদ্বীপ হইতে বড় বড় পণ্ডিতগণ রামজীবনের সুখ্যাতি শুনাইয়া তাঁহার সভায় আসিতেন, এবং সেখানে আশাতিরিক্ত অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আশীর্বাদ কবিতে করিতে দেশে ফিরিতেন।

ইহার মধ্যে একবাব বাঙ্গালাব ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইল। পূর্ব বাঙ্গালার সেই সকল স্থান অতিশয উর্ববা বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্য স্থানে যখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, তখনও সেখানকার লোকেবা না খাইয়া মবে না। কিন্তু যে বারের কথা বলিতেছি, তখনকার মতন দুর্ভিক্ষ বুঝি আর কখনও হয নাই। অতিশয় বৃদ্ধ লোকদের মুখে শুনিয়াছি—তাঁহারাও আবার তাঁহাদের ছেলেবেলার বৃদ্ধদের নিকট শুনিয়াছিলেন—যে সেই সময়ে ভদ্রলোকেরাও বনের কচু সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবনধারণ করিয়াছিলেন। শেষটা কচু ফুরাইয়া গেলে নাকি কলাগাছের থোড়, মোচা, এমনকি, শিকড় পর্যন্ত খাইতে হইয়াছিল।

এই দারুণ দুর্ভিক্ষে প্রজাব ক্লেশ দেখিয়া রামজীবন নিতান্তই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। যাহারা নিতান্ত গরীব, তাহাদের খাজনা মাপ করিয়া দিলেন। যাহাদের তাহাতেও কুলাইল না, তাহাদিগকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। রাজসরকার হইতে যে বেতন পাইতেন, তাহা নিতান্তই অল্প ছিল না; কিন্তু দেশ সুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে তাহাতে কুলায় না। বেতনের টাকা ফুরাইয়া গেলে, ঘরের সঞ্চিত টাকা বাহির করিয়া দিলেন। এইরূপ করিয়া যখন নিজের অবস্থাও অন্যের অবস্থার ন্যায় হইয়া দাঁড়াইল, তখন "যা করেন ভগবান" বলিয়া রাজকোষ প্রজার জন্য মুক্ত করিয়া দিলেন। এতটার পর বুঝি দুর্ভিক্ষের মনেও লজ্জা বোধ হইল! —তাহার কঠোরতা ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। দেশের মধ্যে স্বচ্ছলতা আবার ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া রামজীবন সকল চেষ্টা সফল জ্ঞান করিলেন।

যে স্থানের কথা বলিতেছি, সে স্থান তখন ফাগ এবং তঞ্জের বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এবং বার্ষিক রাজকর টাকায় না লইয়া, এই দুই জিনিসের দ্বারা আদায় করাই নিয়ম ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় লোকে খাইতে পায় নাই; সুতরাং তাহারা উদরের চিন্তাতেই দিন কাটাইয়াছে। সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনিবার অথবা সুন্দর রঙ প্রস্তুত করিবার অবসর তাহাদের হয় নাই। তাহা ছাড়া রামজীবন নিজে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন, আর রাজকোষের অর্থ দ্বারা প্রজার প্রাণ রক্ষা

করিয়াছেন; সুতরাং বার্ষিক রাজকরের জন্য প্রস্তুত হইবার তাঁহার কোন উপায়ই ছিল না। কর পাঠাইবার সময় আসিলে সে বৎসর রামজীবনের প্রেরিত কোন লোক রাজসরকারে হাজির হইল না।

এখনকার কায়দা আর তখনকার কায়দায় অনেক বিষয়েই ঢের তফাৎ ছিল। আজকাল কোন রাজকর্মচারীদের কার্যে শৈথিল্য দেখা গেলে, তাহার কৈফিয়ৎ তলব, তাহার জবাবদিহি, তাহার তদন্ত, তাহার বিচার ইত্যাদি কত কারখানাই না হয়; ততক্ষণে অপরাধী বেচারা অন্ততঃ একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া একটা হাঁপ ছাড়িবার অবসর পায়। কিন্তু তখনকার দস্তুর ছিল অন্যরকম। সেকালে পানটুকু হইতে চুনটুকু খসিলেই বাঁধিয়া লইয়া যাইত। এখন হয় আগে বিচার, তারপর সাজা, তারপর তোমার ভাগ্যে যাহা থাকে।

রামজীবন এ সমস্তই জানিতেন, এবং কখন রাজসরকারের সিপাহী আসে তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সিপাহীরা আসিতে বেশী বিলম্ব করিল না, আর আসিয়াও বেশী কথাবার্তায় সময় নষ্ট করিল না। তাহারা বলিল, "জলদি খাজানা হাজির কর।" রামজীবন করযোড়ে সজলনেত্রে কহিলেন "বাবা, বিধাতা বাম ছিলেন, খাজনা সংগ্রহ করিতে পারি নাই; দুদিন মাপ কর।" কিন্তু মাপ করিবার হুকুম তাহারা লইয়া আসে নাই। তাহারা খাজানা নিবে, নয়ত বাঁধিয়া নিবে এই তাহাদের হুকুম। সুতরাং তাহারা রামজীবনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। রামজীবনের অপরাধের কোনরূপ বিচার হইয়াছিল কিনা জানি না; কিন্তু রামজীবন তখন অন্য দশজন অপরাধীর ন্যায় জেল খাটিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে অন্যান্য কয়েদীদিগের ন্যায় কোদালী হাতে তাহাকে রাস্তা মেরামত করিতেও হইত।

এইরূপে কিছুদিন যায়। পরে একদিন কয়েকটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজধানীর রাস্তা দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ রামজীবনকে দেখিতে পাইলেন, তিনি রাস্তায় মাটি ফেলিতেছেন, তাঁহার পায়ে বেড়ী। ইহারা অনেকবার রামজীবনের অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন, সুতরাং সকলেই তাঁহাকে চিনেন। অথচ রামজীবনের মতন লোকের ঐরূপ অবস্থা হইতে পারে, ইহাও সহজে বিশ্বাস হয় না। তাঁহাদের একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তোমার নাম কি? তোমার নিবাস কোথায়?" রামজীবন পণ্ডিত মহাশয়দিগকে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে নিজের নাম-ধাম নিবেদন করিলেন। পণ্ডিতেরা শুনিয়া যারপরনাই বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে?" এই প্রশ্নের উত্তরে রামজীবন সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন।

রামজীবনের কথা শুনিয়া সেই সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কানে হাত দিয়া বলিলেন, "দুর্গা, দুর্গা! ধর্ম গেল।" আর এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া একেবারে রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মুখে সকল কথা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ রামজীবনকে ডাকাইয়া আনিলেন। এরপর কি হইল, সহজেই বুঝিতে পার। রামজীবন মুক্তি তো পাইলেনই; তাহা ছাড়া, দুর্ভিক্ষে তাঁহার যত ক্ষতি হইয়াছিল, রাজসরকার হইতে তাহা পূরণ করিয়া দেওয়া হইল; প্রাপ্য খাজানা মাপ হইল; এবং প্রচুর পুরস্কার, প্রশংসা ও সম্মানের সহিত তাহাকে বিদায় দেওয়া হইল।

হাফ্‌টোন্‌-ছবি

ফটোগ্রাফীর সাহায্যে পুস্তকাদিতে ছাপিবার জন্য ছবি খোদাই হইবার কথা অনেকেই জানেন। হাফ্‌টোন্‌ নামক যে সকল ছবি আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই প্রণালীতে খোদিত।

কোন জিনিসের ছবি তুলিতে হইলে ফটোওয়ালারা তাহার সামনে ক্যামেরা স্থাপন করিয়া কত প্রকারের কসরৎ করে তাহা সকলেই দেখিয়াছে। ক্যামেরার ভিতরে যে তখনই ঝাঁ করিয়া একটা জিনিসের ছবি আঁকা হইয়া যায়, তাহা কিন্তু নহে। ক্যামেরার ভিতরে একখানা মসলা মাখান কাচে সামনের জিনিসের একটা ছবি পড়ে। সেই ছবি পড়ার দরুন সেই কাচে মাখান মসলাটাতে কেমন একটা পরিবর্তন হয়। সে পরিবর্তন তখন দেখা যায় না, কিন্তু তারপর সেই কাচখণ্ডকে আর কতকগুলি প্রক্রিয়ার অধীন করিলে তাহার পৃষ্ঠে জিনিসের একটা উল্টা ছবি (negative) ফুটিয়া উঠে। উল্টা ছবি বলিবার অর্থ এ নয়, যে আপনার পদদ্বয় ঊর্দ্ধে উঠিবে, আর শিরোব্রজে গমনাগমনের ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, ঐ কাচে অঙ্কিত ছবিতে আলোকের স্থানে অন্ধকার, এবং অন্ধকারের স্থানে আলোক দেখা যাইবে। প্রকৃত ছবির যে স্থান যত কাল হওয়ার দরকার নেগেটিভের সেই স্থানটি ততই স্বচ্ছ হইবে, আর প্রকৃত ছবির যে স্থান যত ফরসা হওয়ার দরকার, নেগেটিভের সেই স্থান ততই কাল হইবে।

এখন এই নেগেটিভকে একখণ্ড মসলা মাখান কাগজের অথবা অন্য কোন উপযোগী জিনিসের উপরে স্থাপন করিয়া আলোতে ধরিলে সেই কাগজে একখানি প্রকৃত (Positive) ছবি (অর্থাৎ যাহাতে আলো ও ছায়া যথাযথরূপে ব্যক্ত হইয়াছে সেইরূপ ছবি) পাওয়া যাইবে। ইহাকেই আমরা ফটোগ্রাফ বলি।

কথাটাকে নিতান্তই মোটামুটি বলা হইল। কিন্তু যাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছু জানেন, তাঁহাদের পক্ষে এ সকল কথা অনাবশ্যক এবং বিরক্তিকর হইতে পারে। আর যাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁহাদিগকে সাময়িক পত্রের প্রবন্ধে দুকথা বলিয়া ইহার চাইতে পরিষ্কার জ্ঞান দেওয়া খুব কঠিন বোধহয়। উপযুক্ত নেগেটিভ, আর উপযুক্ত মসলা মাখানো ধাতুর পাত হইলে সেই ধাতুর পাতে পজিটিভ ছবি মুদ্রিত করা যায়। আর সেই ছবির এমন গুণ হইতে পারে যে, যে আরকে ডুবাইলে ধাতুর পাত গলিয়া যায়, সে আরকে এই ছবিখানির কোন অনিষ্ট হয় না। ছবি অক্ষত থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য স্থানের ধাতু গলিয়া গিয়া তাহা গর্ত হইয়া যায়। এরূপ হইলেই তো আপনারা যাহাকে 'এনগ্রেভিং' বলেন তাহা হইল। ফটো মানে আলোক। মূলতঃ আলোকের সাহায্যে এই এনগ্রেভিং নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে 'ফটো এন্‌গ্রেভিং'।

দেখা যাইতেছে যে ফটো এন্‌গ্রেভিং-এর মূল প্রক্রিয়া তিনটি : ১) নেগেটিভ প্রস্তুত, ২) ধাতুর পাতে পজিটিভ ছবি মুদ্রণ এবং ৩) উপযুক্ত আরকের সাহায্যে সেই ধাতুকে খোদাই (etch) করা।

এ স্থলে একটা কথার আলোচনা হওয়া দরকার হইতেছে। মনে করুন, একখানা ফটো অথবা পেন্‌সিল কিম্বা তুলির আঁকা ছবি উড্ এন্‌গ্রেভারকে এন্‌গ্রেভ করতে দিয়েছেন। আপনার প্রদত্ত ছবিতে যে উপায়ে আলো ও ছায়া ফলান হইয়াছে, সে উপায়ে কাঠের ব্লকে আলোছায়া ফলানো সম্ভব নহে। আপনার প্রদত্ত ছবিতে সাদা কাগজ হইতে আরম্ভ করিয়া মিশমিশে কালো পর্যন্ত অসংখ্য প্রকারের শেড্ রহিয়াছে। এই অসংখ্য প্রকারের নয় সাদা নয় কাল শেড্‌কে ইংরাজি ভাষায় 'হাফ্‌টোন্' বলে। (উপেন্দ্রকিশোরের ফুট নোট্ঃ ক্রমাগত ইংরেজী কথা ব্যবহারের ত্রুটি মার্জনা করিবেন। এই সকল কথার এক একটা বাংলা প্রতিশব্দ ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাদের অর্থ আর খানিক পরে স্বয়ং বুঝিতে পারিব কিনা, সে বিষয়েই গভীর সন্দেহ হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।)

যাহা বলিতে ছিলাম। তুলিতে ছবি আঁকিবার সময় চিত্রকর যে উপায়ে হাফটোন ফলান, এন্‌গ্রেভারের সে উপায় অবলম্বন করা অসম্ভব। তুলির কাজে কালো রঙে যথেচ্ছ জল মিশাইয়া তদ্বারা যেরূপ শেড্ ইচ্ছা প্রস্তুত করা যায়। এন্‌গ্রেভার কি তাহা পারেন? এন্‌গ্রেভারের ব্লক একই কাগজে একই কালিতে ছাপা হইবে—জল মিশাইয়া সেই কালিকে আবশ্যক মত এক স্থানে পাতলা অপর স্থানে গাঢ় করিবার ব্যবস্থা তাহাতে খাটিবে না। ব্লকের যে সকল স্থান গর্ত, তাহা একেবারে সাদাই থাকিবে, আর যে সকল স্থান উঁচু তাহা একেবারে কালোই হইবে। অথচ আপনার চাই যে, সাদা হইতে কালো পর্যন্ত যত প্রকারের মাঝামাঝি শেড্ মূল ছবিতে আছে, ব্লক হইতে ঠিক তেমনটি ছাপা হয়—নইলে সে জিনিসটি হইবে না। সুতরাং এন্‌গ্রেভারকেও সকল প্রকার হাফ্‌টোন্ ফলাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। একখানি এন্‌গ্রেভিং-এর ছাপ পরীক্ষা করিয়া দেখুন সে ব্যবস্থা কিরূপ।

খুব সরু সরু কতকগুলি রেখা খুব কাছাকাছি টানিলে, একটু দূর হইতে তাহাদিগকে পৃথক পৃথক রেখার ন্যায় দেখা যায় না; কিন্তু তাহাদের একটি "শেডের" মতন দেখায়। রেখাগুলি যত মোটা আর তাহাদের পরস্পরের ব্যবধান যতখানি, তাহার উপর সেই শেড্‌টির গাঢ়তা নির্ভর করে। রেখার পরিবর্তে বিন্দু দ্বারাও ঐরূপ শেড্ প্রস্তুত করা যায়। বিন্দুগুলির পরস্পরের ব্যবধান (ব্যবধান বলিতে, এক বিন্দুর ঠিক মধ্যস্থল পর্যন্ত যে দূরত্ব তাহাই বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র দুই বিন্দুর মাঝখানের সাদা অংশটুকুকে বুঝিলে চলিবে না।) যদি ঠিক রাখা যায়, তবে খালি তাহাদের আয়তনের উপর শেডের গাঢ়তা নির্ভর করে। যে স্থান একেবারে সাদা, সেখানে বিন্দু থাকিবে না, তার চাইতে একটু ময়লা হইলেই অতিশয় সূক্ষ্ম বিন্দুর আবশ্যক হইবে। ক্রমে যতই ঘোর রঙের দিকে যাইবেন, ততই বড় বড় বিন্দু দিতে হইবে। বিন্দুগুলি বড় হইতেছে, কিন্তু তাহাদের ব্যবধান ঠিক রহিয়াছে; সুতরাং শেষে এমন হইবে যে, এক বিন্দু অপর বিন্দুর গায় আসিয়া ঠেকিবে। বিন্দুর আকৃতি ভেদে এরূপ অবস্থায়ও তাহাদের মাঝখানে থাকিতে পারে, যেমন গোল বিন্দুর মাঝখানে থাকে। কিন্তু ইহার চাইতে বড় হইলে আবার সেই ফাঁকটুকুও চলিয়া যাইবে। তখন একেবারে কালো রঙে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। এই উপায়ে এন্‌গ্রেভার হাফটোনের ব্যবস্থা করেন। যে ছবি প্রেসে ছাপা হইবে, তাহার সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যবস্থা প্রযোজ্য নহে।

এখন কথা এই যে, একখানি ফটো হইতে আগাগোড়া ফটোগ্রাফীর সাহায্যে যদি ব্লক করা দরকার হয়, তাহা হইলে হাফ্‌টোনের ব্যবস্থা কি করিয়া হইতে পারে? তার জন্য একটা

ব্যবস্থা না হইলে প্রেসে ছাপিবার উপযুক্ত ব্লক প্রস্তুত হইতেছে না।

প্রস্তাবিত সমস্যার মীমাংসার জন্য অনেক প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সকলটার ফল সন্তোষজনক হয় নাই। আজকাল চৌদ্দ আনা হাফ্‌টোন্ এন্‌গ্রেভার যে উপায়ে ব্লকের দানা (grain) উৎপাদন করেন, তাহা এই।

পরিষ্কার কাচের ফলকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সরলরেখা সমান্তরালভাবে সমান সমান দূরে অঙ্কিত করিতে হয়। রেখাগুলি অতিশয় পরিষ্কার হওয়া চাই, আর তাহাদের স্থূলতা এবং ব্যবধানের একটুও উনিশ বিশ না হওয়া চাই। এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের ভিতর এইরূপ ৭৫ হইতে ১৭৫ অবধি রেখা সাধারণ কার্যের জন্য ব্যবহার হয়। বিশেষ বিশেষ স্থলে মোটার দিকে ৫০ এবং মিহির দিকে ২৪০ পর্যন্ত ব্যবহার হইতে পারে।

এইরূপে দুইখণ্ড কাচে রুল কাটিয়া তাহার একখানিকে আর একখানির উপর স্থাপন করিতে হইবে। এরূপভাবে স্থাপন করিতে হইবে, যেন তাহাদের রুলকাটা দিক ভিতরে থাকে, এবং একখানা কাচের রুল আর একখানার উপর আড়ভাবে পড়িয়া জাফ্রি বা জালের ন্যায় হয়। এইরূপ অবস্থায় কাচ দুখানিকে শক্ত করিয়া মুড়িতে পারিলেই ছবিতে দানা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র নির্মিত হইল। এইরূপ কাচকে স্ক্রীন (screen) বলে।

সহজেই বুঝা যায় যে, এরূপ স্ক্রীন ইচ্ছা করিলেই প্রস্তুত করা যায় না। অতিশয় সতর্ক এবং বুদ্ধিমান লোক বহুমূল্য যন্ত্রাদির সাহায্যে হীরের দ্বারা কাচের উপরে ঐরূপ লাইন কাটিতে পারেন। কিন্তু এ কার্য এত কঠিন যে, পৃথিবীতে তিনটি মাত্র লোক সম্প্রতি ইহা কবিতেছেন। তন্মধ্যে আমেরিকার ম্যাক্স লেভিই প্রধান।

ক্যামেরার ভিতরে মসলা মাখান কাচের উপর যে ছবি পড়ে, সেই সময়ে একখানা স্ক্রীন তাহার সামনে ধরিতে হয়। তাহা হইলেই নেগেটিভ খানা সাধারণ ফটোগ্রাফীর নেগেটিভের মতন না হইয়া দানাযুক্ত হইয়া পড়ে। এই দানাযুক্ত নেগেটিভ হইতে ধাতুর পাতে ছবি মুদ্রিত করিলে তাহাও দানাযুক্ত হয়। দূর হইতে তাহাকে মোটামুটি ফটোর মতন দেখায়, কিন্তু নিকট দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, তাহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুর সমষ্টি। এখন এই দানাযুক্ত ছবি বিশিষ্ট ধাতু ফলককে এচ্ করিলে বিন্দুগুলি ভিন্ন অন্য স্থল গর্ত হইয়া যায়। তাহা হইলেই হাফ্‌টোন্ ব্লক প্রস্তুত হয়।

হাফ্‌টোন ছবি খুব বেশি দিন প্রচারিত হয় নাই; কিন্তু ইহার মধ্যেই এতদ্বারা সচিত্র পুস্তকাদির ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। যে সকল গুণে এই শ্রেণীর ছবি লোকেব এত প্রিয় হইয়াছে, তাহা এই—

১। ইহাতে অবিকল আদর্শের অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। উড্ এন্‌গ্রেভারের নিকট এ বিষয়ে সকল সময়ে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় না।

২। অল্পসময়ে কাজ হয়।

৩। সস্তায় কাজ হয়।

৪। ভাল হাফ্‌টোন ছবি দেখিতে যারপরনাই মোলায়েম হয়।

পক্ষান্তরে হাফ্‌টোন ছবির কতগুলি ত্রুটি আছে; যথা—

১। হাফ্‌টোন্ ছবির দানা ঐরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়াতে দেখিতে একটু অস্বাভাবিক দেখায়। খুব সরু স্ক্রীন ব্যবহার করিয়া এই দোষ নিবারণ করা যায়, কারণ দানা খুব সরু হইলে তাহা

মালুম হয় না। কিন্তু ইহাতে ছাপিবার হাঙ্গামা ও খরচা বাড়িয়া যায়।

২। ছবিখানি আদর্শের চাইতে ঝাপ্‌সা হয়। যত মোটা স্ক্রীন ব্যবহার করা যায়, এ দোষ ততই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। খুব সরু স্ক্রীনে ইহা প্রায় দেখা যায় না।

৩। ছবির উজ্জ্বল স্থানগুলিতে আলো ও ছায়ার তারতম্য তেমনভাবে রাখা যায় না। হাতে কাজ করিয়া ইহার আংশিক প্রতিকার হইতে পারে, কিন্তু তাহা সকল সময় বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ তাহাতে চেহারা বদলাইয়া যাওয়ায় আশঙ্কা আছে।

৪। হাফ্‌টোন্ ছবি মাত্রেরই কাজ খুব সূক্ষ্ম; সুতরাং তাহা ছাপিতে পরিশ্রম ও ব্যয় বেশী পড়ে। ভাল কাগজ, ভাল কালি, ভাল ছাপা না হইলে ভাল হাফ্‌টোন্ ছবি হয় না।

এই সকল দোষগুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সহজেই বোঝা যাইতে পারে যে উড্‌কাট্ অপেক্ষা হাফ্‌টোন্ ছবি কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, আর কোন্ বিষয়ে নিকৃষ্ট। উড্‌কাট্ ছাপিতে মুশকিল নাই, আর তাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সহজেই দেখান যায়। সুতরাং ছোট ছোট জিনিসের পরিষ্কার আভাস দিতে হইলে, আর অল্প ব্যয়ে ছাপিবার দরকার হইলে, উড্‌কাট্ ব্যবহার করাই প্রশস্ত। সাধারণতঃ দোকানদারের ক্যাটালগে, অল্প মূল্যের স্কুলপাঠ্য বহি, ইত্যাদিতে উড্‌কাটই বেশী ফল দেয়। (এ স্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক। ফটোগ্রাফীর সাহায্যে হাফ্‌টোন্ ভিন্ন অন্য এক প্রকারের ব্লক প্রস্তুত হইতে পারে। আদর্শটি এইরূপভাবে অঙ্কিত করা যাইতে পারে যে, তাহাতে ব্লক করিতে আর স্ক্রীনের সাহায্যে দানা ফলাইবার প্রয়োজন হয় না। সাদা কাগজে, গাঢ় কৃষ্ণ কালিতে কলমের দ্বারা ছবি আঁকিলে, সে ছবি এই শ্রেণীর হয়। ফটো এন্‌গ্রেভিং প্রণালীতে এইরূপ ছবি হইতে অবিকল আদর্শের অনুরূপ ব্লক প্রস্তুত হয়; তেমন ব্লক উড্ এন্‌গ্রেভিং দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে। অবশ্য, ইহাকে হাফ্‌টোন্ ব্লক বলে না, ইহার নাম 'লাইন ব্লক'। ভাল 'কালি কলমের' ছবি আদর্শ হইলে তাহা হইতে উড্‌কাট্ না করাইয়া লাইন ব্লক করাইলে অধিকতর সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।)

কিন্তু যেখানে সুন্দর মোলায়েম ছবি চাই, চেহারা অক্ষুণ্ণ থাকা চাই, খরচপত্র পরিশ্রমে আপত্তি নাই, একটু ঝাপসা হইলেও ক্ষতি নাই, সেখানে হাফ্‌টোনের দরকার।

অবশেষে, যদি বেয়াদবি না হয়, তবে হাফ্‌টোন্ ব্লকের ভাল মন্দ কিসে হয়, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন করি। আদর্শের শেড্‌লাইট—বিশেষতঃ উজ্জ্বল স্থানগুলিতে—যে পরিমাণে রক্ষিত হইবে, সেই পরিমাণে ব্লকটিকে ভাল বলিব। ইহার উপরে ছবিখানি দেখিতে যত মোলায়েম হইবে, ততই তাহা আরও উঁচুদরের হইবে। অতঃপর (মুদ্রাকরের দিক হইতে) ছাপিবার সময় যে ব্লকখানি যত কম নাকাল করিবে, অবশ্য তাহা এক হিসাবে ততই প্রশংসনীয় হইবে। কিন্তু এই শেষ কথাটার সম্বন্ধে একটু বক্তব্য এই যে, ছবি খুব মোলায়েম রাখা, আর মুদ্রাকরকে ষোল আনা সন্তুষ্ট করা, এ দুটি ব্যাপার এক সময়ে ঘটান সুকঠিন। মুদ্রাকরের যন্ত্র, মালমসলা এবং যোগ্যতা যথোচিত হইলে এ বিষয়ে চিন্তার কারণ থাকে না বটে, কিন্তু এ দেশকালে তাহা সচরাচর ঘটে কই?

যেমন তেমন একটা হাফ্‌টোন্ ব্লক প্রস্তুত করা অতি সহজ কাজ কিন্তু আদর্শের মর্যাদা রক্ষা করিয়া ছবিখানিকে মোলায়েম করা একটু বেশী রকমের কঠিন।

এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সংগীত

অনেক সময় দেখা যায়, পণ্ডিতেরা যে সকল বিষয় লইয়া গলদ্‌ঘর্ম হয়েন, সাধারণ লোকে তাহাদের একটা মোটামুটি মীমাংসা সহজেই করিয়া ফেলে। সংগীত সম্বন্ধেও যে কতকটা সেরূপ হয় নাই, তাহা নহে। আমাদের দেশীয় ওস্তাদদিগকে যদি ইউরোপীয় সংগীত সম্বন্ধে মত দিতে বলা যায়, তবে তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই নানারূপ জানোয়ারের ডাকের দৃষ্টান্ত দিয়া কাজ সারেন। পক্ষান্তরে আমাদের দেশীয় সংগীত সম্বন্ধে সাহেবদের সাধারণ মতও ঐরূপ। আসল বিষয়টা কতকটা "সোনার ঢাল রূপার ঢাল" গোছের—এক এক দল এক এক দিক হইতে দেখেন, আর সেইরূপ বলেন। এ বিবাদে প্রকৃত মীমাংসা করিবার ক্ষমতা লেখকের নাই, আর এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। এ বিষয়ে উভয় পক্ষের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সকল মত লেখকের গোচরে আসিয়াছে, সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ তাহার কিছু কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে। ইহাতে সাধারণ লোকের পক্ষে একটা সাদাসিধা মীমাংসার সুবিধা হইতেও পারে।

প্রথম দেশীয় সংগীত আর ইউরোপীয় সংগীতের বিশেষ প্রভেদ কোথায়, তাহা দেখা উচিত। পরস্পরের সহিত নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ বিশেষ রক্ষা করিয়া যখন মিষ্ট ধ্বনি সকল একটির পর একটি বিচিত্র নিয়মে বাদিত হয়, তখন তাহা শুনিতে খুব ভাল লাগে। ইহাকেই আমরা রাগ রাগিণী (Melody) বলি; আর এই বিষয়টার আমাদের দেশে খুব চর্চা হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, ধ্বনি যতই মধুর হউক না কেন, একাকী সে কার্যকর হইতে পারে না। কোন্ ধ্বনিটির পর কোন্ ধ্বনিটি হইল, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তবে তাহার একটা মূল্য দাঁড়ায়। একটি ধ্বনির পর আর একটি ধ্বনি হইলে কিরূপ শুনায় আমরা তাহা বেশ করিয়া দেখিয়াছি। একাধিক ধ্বনি একসঙ্গে বাজিলে যাহা হয়, যন্ত্রাদির সুর বাঁধিবার সময় আমরা তাহার সাহায্য লইয়া থাকি। কিন্তু সেই ব্যাপারটার ভিতরে যে সংগীতের কোন্ মূল্যবান অংশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমরা ততটা তলাইয়া দেখি নাই। সাহেবেরা এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়া এই ব্যাপারটাকেই তাঁহাদের সংগীতের প্রধান অঙ্গ করিয়া লইয়াছেন। ইহার নাম হারমনি (harmony)।

এই মেলোডি আর হারমনি লইয়াই প্রধানতঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংগীতের প্রভেদ। আমাদের মেলোডি আছে, হারমনি নাই। সাহেবদের হারমনিই প্রধান, মেলোডি তাহার অনুগামী।

আমরা খালি মেলোডিকে "সবে ধন নীলমণি" পাইয়া তাহাকেই ঘসিয়া মাজিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া সিংহাসনে বসাইয়াছি। সাহেবেরা নাকি মেলোডিকে তেমন একাধিপত্য দেন নাই, কাজেই তাঁহাদের মেলোডি অনেকটা সাদাসিধে গোছের। খালি মেলোডিতে অলঙ্কার অভাবে তেমন বিচিত্রতা হয় না, সুতরাং তাহাতে অলঙ্কারের দরকার। হারমনি থাকিলে তাহাতেই যথেষ্ট বিচিত্রতা হয়, সুতরাং অলঙ্কার অনাবশ্যক।

আমরা হারমনির রস গ্রহণ করিতে শিখি নাই, সুতরাং সাহেবদের হারমনিকে বাদ দিয়া কেবল তাঁহাদের নিরলঙ্কার মেলোডিকে লইয়া তাহাদের সংগীতের বিচার করিতে যাই। ইহাতে ফল এই যে, জিনিসটার প্রকৃত সৌন্দর্যটুকু দেখিতে পাই না, আর আমরা যাহাকে

সুন্দর বলিয়া জানি, তাহা তাহাতে খুঁজিয়া পাই না, সুতরাং সন্তোষ হয় না।

সাহেবরাও আমাদের সংগীতের অলঙ্কারগুলির রস গ্রহণ করিতে পারেন না, অথচ তাহাতে হারমনির অভাবের দরুন একটা মস্ত ত্রুটি দেখেন। সুতরাং তাঁহাদের ভাল লাগে না।

যাহা বলা হইল, তাহাতে কোন্ সংগীত উৎকৃষ্ট, কোন সংগীত নিকৃষ্ট, তাহার কোন মীমাংসা হইবে না। তাহাতে কেবল এইটুকুই বুঝা যাইতেছে যে ভাল লাগে না বলিয়াই বাস্তবিক জিনিসটাতে কোন দোষ থাকা প্রমাণ হয় না। বুঝিবার গোলেও ভাল না লাগিতে পারে। অতপর, যাহা বলিতে বসিয়াছি।

সাহেবেরা প্রাচ্য সংগীতের নিন্দা করিবার সময় তিনটি বিশেষণ বার বার ব্যবহার করেন, —"নাকী", "বেসুরা", "একঘেয়ে"।

আমরাও তাঁহাদিগকে সহজে ছাড়ি নাই। এক বিশেষজ্ঞ একস্থানে বলিয়াছেন যে হারমনি অসভ্য গথ্ জাতির দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সুতরাং ইহার ব্যবহার অসভ্যতার চিহ্ন! মানুষ অসভ্যাবস্থায় অনেক ভাল বিষয়েরই সূত্রপাত করিয়াছিল, সংগীত তাহার মধ্যে একটি। সুতরাং ইহা কি বলিতে হইবে যে গান করাটা অসভ্যতা? এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের ইহাই বিশ্বাস যে "আমাদের যাহা, তাহার মতন আর ন ভূতো ন ভবিষ্যতি"। ইহাতে আর কিছু প্রমাণ না হউক, অন্য দেশের সম্বন্ধে আমরা যে কি পরিমাণ কম খবর রাখি, তাহা সুন্দর প্রমাণ হয়।

ফটোগ্রাফীর চর্চা

একজন চিত্রকর একটা সুন্দর স্থানের ছবি আঁকিতেছিলেন, এক চাষা তাহা দেখিতেছিল। কিছুকাল দেখিয়া চাষা চিত্রকরকে বলিল "এর চাইতে ফটো তুলিয়া লইলেই তো পারিতেন। তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র হইত, আর জায়গার চেহারাটাও এর চাইতে খাঁটি হইত।"

গল্পটি একখানি ইংরাজি সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, তাহাতে খুব প্রসিদ্ধ একজন চিত্রকরের উল্লেখ ছিল। সুতরাং ঘটনা সত্য হওয়া অসম্ভব নহে। সত্য হউক আর না হউক, ইহা দ্বারা একটি অতি প্রয়োজনীয় কথার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। চাষা যাহা বলিয়াছিল, তাহা যে তাহার সাদাসিধা হিসাবে ঠিকই বলিয়াছিল, এ কথায় হয় তো কাহারও সন্দেহ হইবে না। অপর দিকে চাষা যাহা এত সহজে বুঝিয়া ফেলিল, তাহা যে চিত্রকরের মাথায় ঢোকে নাই, একথাও বিশ্বাসযোগ্য নহে; এ বিষয়ের মীমাংসা এইরূপ যে, হিসাবের স্থূলত্ব এবং সূক্ষ্মতা হইতে পারে, এবং তাহার ফলে এক বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা হইতে পারে। চাষা সেইস্থানের কেবলমাত্র চেহারাটাই দেখিয়াছিল, কিন্তু চিত্রকর তাহার সৌন্দর্যের চর্চা করিতেছিলেন। কুৎসিতকে বাদ দিয়া সুন্দরকে গ্রহণ করা শিল্পীর কাজ। চাষা এত হিসাবের ধার ধারে না। হয়ত এইরূপ কারণেই চাষা বলিলে আমরা চটিয়া থাকি। চাষার দেখাতে বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞানলিপ্সা, সৌন্দর্যস্পৃহা বা কবিত্ব, কোনটারই চর্চা হয় না, তাই ওরূপ দেখার মূল্য এত কম। যাহার দেখার ভিতরে উল্লিখিতরূপ কোন একটা ভাল উদ্দেশ্য আছে, তাহার দেখাই যথার্থ দেখা।

চক্ষে দেখা আর কলে দেখাতে উপায়ের প্রভেদ আছে, কিন্তু কাজ একইরূপ এবং ফলও

একই প্রকৃতির। ফটোগ্রাফী বাস্তবিক কলে দেখা। এরূপ দৃষ্টির চর্চা আজকাল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। দেখার মতন দেখা হইলে ইহা খুবই আশাজনক। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ফটোগ্রাফীর চর্চা যেরূপ নিতান্ত সুখ মিটাইবার জন্য উদ্দেশ্যবিহীন হালকাভাবে হইতে দেখা যায়, তাহা মালমসলা বিক্রেতা ভিন্ন আর কাহারও পক্ষেই শুভলক্ষণ নহে।

ফটোগ্রাফীর চর্চা উচিত রূপ হইলে অনেক উপকারের আশা করা যায়। উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া ছবি তোলার প্রয়োজন কোন স্থলেই হয় না। নিতান্ত প্রথম শিক্ষার্থীও এমন জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন যে তাহার কোনরূপ মূল্য আছে। হয়ত তাহা হইতে কিছু শিক্ষা করা যায়, না হয় ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য কোন হিসাবে তাহা কৌতুহলোদ্দীপক, না হয় কোন ঐতিহাসিক অথবা জনশ্রুতিমূলক অথবা অন্য কোন কারণে স্মরণীয় ঘটনার সহিত তাহার সংস্রব আছে। ছবি তুলিবার সময় এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখা কঠিন নহে। আর ছবিখানি ভাল হইলে তাহা মুদ্রিত করিয়া সংগ্রহ করা এবং কাচখানি যত্ন করিয়া রাখিয়া দেওয়াতেও তেমন কিছু মুশকিল দেখা যায় না। কিন্তু যদি এই দুটি কাজ নিয়মিতরূপে করিতে পারেন, তবে দেখিয়া আশ্চর্য হইবেন যে কিরূপ মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডার অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সঞ্চিত হইতে পারে।

এ সম্বন্ধে "ভাণ্ডার" পত্রিকায় কয়েকটি সুন্দর পরামর্শ মুদ্রিত হইয়াছিল। এ স্থলে এ বিষয়ে আর অধিক বলার প্রয়োজন দেখা যায় না। কেবলমাত্র দুটি আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। ১) অঙ্কিত বস্তুটি কত বড়, তাহা বুঝিবার কোনরূপ উপায় রাখা বাঞ্ছনীয়। ছবির মধ্যে যদি এমন একটি জিনিস থাকে যাহার আয়তন জানা আছে, তাহা হইলে তাহার সাহায্যে অন্য সকল জিনিসের আয়তন সহজেই উপলব্ধ হয়। ২) ছবি তোলার তারিখটি লিখা থাকিলে অনেক সময় তাহাতে কাজ দেখে।

যে রূপ বিষয়ের কথা বলা হইল, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়েও ফটোগ্রাফীর কার্যকারিতা আছে। চিত্রবিদ্যায় যেমন কবিত্ব ও সৌন্দর্যচর্চার অবকাশ থাকে, ইহাতেও সেইরূপ। অবশ্য এ বিষয়টি অতিশয় কঠিন; অনেক যত্ন আর পরিশ্রমে ইহাতে কিঞ্চিৎ ফললাভ হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়েও আজকাল অনেককে চেষ্টা করিতে দেখা যায়। বর্তমানে এই চেষ্টায় ফল তেমন শ্লাঘার বিষয় না হইলেও ভবিষ্যতে ইহাতে অনেক উপকার হইতে পারে। শ্রাবণের প্রবাসীতে শ্রীমান সুকুমার রায় চৌধুরীর কৃত "প্রবাসীর" ছবি এবং বর্তমান সংখ্যায় অধ্যাপক শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "হর্ষবিষাদ", এই দুটি ছবি দৃষ্টান্তস্বরূপ মুদ্রিত হইল। "প্রবাসীর" ছবিখানি প্রবাসীর আবরণের জন্য বিশেষভাবে তোলা হইয়াছিল। প্রবাসীর পাঠকবর্গের অনেকেরই হয়ত এ বিষয়ে অল্পাধিক চর্চা আছে। তাঁহাদের কার্যের নমুনা দেখিতে পাইলে প্রবাসী সম্পাদক আনন্দিত হইবেন। উপযুক্ত বোধ হইলে তাহা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইতেও পারে।

এই শ্রেণীর ফটোগ্রাফী চর্চায় উপকার আছে; সুতরাং তাহা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরূপ আশা করার সময় এখনও হয় নাই, যে এখন হইতেই আমরা সূক্ষ্ম শিল্পের হিসাবে নির্দোষ চিত্র রচনা করিতে সক্ষম হইব। যে সকল দেশের লোক এ বিষয়ে অগ্রগামী, সে সকল স্থানেও অপেক্ষাকৃত অল্প লোকেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে এদেশেও ভেদ্‌বার প্রভৃতি দু-একজন ইহাতে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং চেষ্টা হইলে সুফলের আশা করা যায়।

হারমোনিয়াম—শিক্ষা
সুর ও সপ্তক

একটি গান গাইতে বা বাজাইতে হইলে প্রধানতঃ দুটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়; গানটিতে কি কি সুর লাগিতেছে, আর কোন্ সুরটি কতক্ষণ থাকিতেছে।

প্রত্যেকটি সুরের জন্য হারমোনিয়াম যন্ত্রে এক একটি করিয়া "পর্দা" থাকে। প্রধান সুরগুলির নাম 'স্বাভাবিক' সুর, ইহাদের জন্য সাদা পর্দা; অন্য সুরগুলির নাম 'বিকৃত' সুর, ইহাদের জন্য কাল পর্দা।

সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—সুরের এই সাতটি নাম। এত সুর থাকা সত্ত্বেও যে সাতটির অধিক নাম নাই, তাহার কারণ আছে। সুরের ধর্ম এই যে, সাতটির পর আবার গোড়ার সুরটি ফিরিয়া আইসে। সা রে গা মা পা ধা নি ক্রমে সাত সুর চড়িয়া, আর এক ধাপ উঠিলেই দেখা যায় যে পুনরায় অবিকল 'সা'র মতন একটি সুরে উপস্থিত হওয়া গিয়াছে। এই 'সা' প্রথম 'সা' হইতে অবশ্য অনেকখানি চড়া; কিন্তু তথাপি ইহাদের ভিতরে এরূপ আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে যে ইহাদিগকে পৃথক নাম দেওয়া চলে না। সুতরাং এই নূতন সুরেরও নাম 'সা'। এইরূপে, ইহার পরের সুরটি 'রে' তাহার পরেব সুরটি 'গা' এইরূপ করিয়া ক্রমে আবার ঐ সা রে গা মা পা ধা নি সাতটি সুর পাওয়া যায়। হারমোনিয়মে এই সকল সুরের জন্য সাদা পর্দা থাকে। এগুলি স্বাভাবিক সুর। বিকৃত সুরগুলি স্বাভাবিক সুরের মধ্যবর্তী। হারমোনিয়মে এইরূপ বিকৃত সুর সা ও রে'র মধ্যে একটি, রে ও গা'র মধ্যে একটি, মা ও পা'র মধ্যে একটি, পা ও ধা'র মধ্যে একটি, এবং ধা ও নি'র মধ্যে একটি আছে। গা ও মা'র মধ্যে এবং নি ও সা'র মধ্যে কোন বিকৃত সুর নাই।

বিকৃত সুরগুলিকে আর পৃথক কোন নাম দেওয়া হয় নাই। বিকৃত সুরটি যে দুটি স্বাভাবিক সুরের মধ্যে, তাহাদেরই নামে তাহারও নাম হয়। সা ও রে'র মধ্যে যে বিকৃত সুরটি, তাহা কড়ি সা বা কোমল রে। কড়ি সা, কিনা সা'র চাইতে কড়ি অর্থাৎ চড়া। কোমল রে, কিনা রে'র চাইতে কোমল অর্থাৎ খাদ। এইরূপ কড়ি রে বা কোমল গা, কড়ি মা বা কোমল পা, কড়ি পা বা কোমল ধা, কড়ি ধা বা কোমল নি। সা ও মা-এর কোমল নাই; নি ও গা-এর কড়ি নাই।

সা রে গা মা পা ধা নি এই সাতটি সুরকে লইয়া 'সপ্তক' হইয়াছে। খুব খাদ হইতে খুব চড়া পর্যন্ত অনেকগুলি সপ্তক আছে। হারমোনিয়মে ৩ হইতে ৫ সপ্তক সুর পাওয়া যায়, কিন্তু কণ্ঠে তিনটির অধিক সপ্তক সচরাচর বাহির হইতে দেখা যায় না। এইজন্যই হিন্দু সংগীতে তিনটি মাত্র সপ্তকের উল্লেখ দেখা যায়। এই তিনটি সপ্তকের তিনটি নাম আছে; খাদ সপ্তক 'উদারা', মধ্য সপ্ত 'মুদারা', চড়া সপ্তক 'তারা'।

লিখিবার সময় সপ্তকের সাতটি সুরকে এইরূপে লেখা হয়—সা ঋ গ ম প ধ নি। কোমল সুর বুঝাইতে হইলে সুরের মাথায় ত্রিকোণ চিহ্ন এবং কড়ি বুঝাইতে হইলে ঐ স্থানে (...) পতাকা চিহ্ন দিতে হয়; যেমন গ (কোমল গ), ম (কড়ি মধ্যম)। উদারার সুরের নীচে

বিন্দু দিতে হয়; যথা সা। তারার সুরের মাথায় বিন্দু দিতে হয়; যথা সা। মুদারার সুর সাদা; যেমন সা।

মাত্রা

গানে যে সকল সুর লাগে, তাহাদের জন্য যন্ত্রে এক একটি "পর্দা" আছে। কোন্ পর্দায় কোন্ সুরটি বাজে, তাহা একবার জানিয়া লইলেই কাজ চলিয়া যাইবে। এক্ষণে সুরের স্থায়িত্ব নির্দেশ করিবার উপায় দেখা চাই।

ব্যাপার বিশেষের স্থায়িত্ব সচরাচর ঘন্টা, মিনিট, সেকেণ্ড ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে ব্যক্ত হয়। ঘন্টা, মিনিট ইত্যাদি বলিলে কতটুকু সময়কে বুঝায়, আমরা পূর্বেই তাহা জানিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং প্রয়োজন হইলে এই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া যে কোন ঘটনার স্থায়িত্ব লিপিবদ্ধ করিতে পারি। সংগীতেও সুর সকলের স্থায়িত্ব এইরূপ উপায়েই ব্যক্ত হয়। তবে, সেখানে ঘড়ি ধরিয়া কাজ হয় না, সুতরাং মিনিট সেকেণ্ড ইত্যাদি শব্দেরও আবশ্যক হয় না। সুবিধা মতন একটি সময়কে আদর্শ ধরিয়া তাহারই সাহায্যে সুরের স্থায়িত্ব নির্ধারিত হয়। এই আদর্শ সময়টির নাম 'মাত্রা'।

এই আদর্শের পরিমাণ আগাগোড়া স্থির রাখার ক্ষমতা অনেকেরই আছে। যাঁহার নাই তিনিও সহজেই তাহা উপার্জন করিতে পারেন। যাঁহারা হারমোনিয়ম বিক্রয় করেন, তাঁহাদের নিকট "মেট্রনোম" নামক একপ্রকার যন্ত্র অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়। এই যন্ত্রে ঘড়ির দোলকের ন্যায় একটি দোলক আছে। যন্ত্রে দম দিয়া একবার এই দোলকটিকে নাড়িয়া দিলে তাহা ঠিক সমান ওজনে দুলিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠক্ ঠক্ করিয়া একটা শব্দ হয়। যন্ত্রের গতি যথেচ্ছা 'ঠা' 'দূন' করা যায়। আবার ইহাতে এমন বন্দোবস্ত আছে যে, ইচ্ছা হইলে প্রত্যেক দুই, তিন, চারি অথবা ছয়টি 'ঠকের' পর একটি ঘন্টা বাজিবে। সুতরাং শব্দগুলিকে অতি সহজে গণিতে পারা যায়। এই যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন তালি দিতে অভ্যাস করিলে অতি সহজেই সঙ্গীতের আদ্যোপান্ত সময়ের আদর্শ স্থির রাখিবার ক্ষমতা জন্মিবে। আদর্শের পরিমাণ আগাগোড়া এইরূপ স্থির রাখাকেই 'লয়' বলে।

মেট্রনোমের অভাবে ঘড়ির টক টক শব্দের সাহায্য লওয়া যায়। মেট্রনোম সকলের সংগ্রহ করা সম্ভব না হইতে পারে।

ডাক্তার ফ্রান্জ্ হারমান মূলার

যাঁহার কথা আজ তোমাদিগকে বলিতে যাইতেছি, তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ছিলেন। বয়স ত্রিশের অধিক হয় নাই, কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি একজন অতিশয় বিদ্বান এবং বিচক্ষণ লোক বলিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। চিকিৎসায় তাঁহার খুবই সুখ্যাতি ছিল, কিন্তু তিনি যে গরীব দুঃখীদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেন, সেজন্য সকলে তাঁহাকে আরও ভালবাসিত। শিক্ষকতারও তাঁহার যশ কম ছিল না।

ভারতবর্ষে যখন প্লেগের আক্রমণ আরম্ভ হইল, তখন ভিয়েনার বৈজ্ঞানিক চতুষ্পাঠি হইতে একদল কৃতবিদ্য লোককে এই ব্যাধির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বোম্বাই পাঠান হয়। ডাক্তার মূলার এই দলের নেতা হইয়া তখন এদেশে আসেন। বোম্বাই শহরে ইঁহারা তিন মাস ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ডাক্তার মূলার এক হাজারেরও বেশি রোগীকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যেখানে প্লেগ সকলের চাইতে বেশি, সেইসকল জায়গা খুঁজিয়া বাহির করিয়া রোগীদিগকে দেখিতেন এবং তাহাদের বেয়ারামের অবস্থা লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপে তিন মাস প্লেগের সম্বন্ধে নানারূপ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ইঁহারা দেশে ফিরিলেন।

যাইবার সময়ে ইঁহারা প্লেগের বীজ সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সেই বীজ নানারূপ ইতর জন্তুর শরীরে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বৈজ্ঞানিক চতুষ্পাঠি ডাক্তার মূলারের উপর ভার দিলেন। সেখানকার একটা বড় হাসপাতালের এক অংশে এই কার্যের জন্য স্থান নির্দেশ করা হইল। প্লেগের বীজের ন্যায় মারাত্মক জিনিস লইয়া কাজ করিতে হইলে যত রকম সতর্কতার প্রয়োজন হয়, তাহার সমস্তই অবলম্বিত হইয়াছিল।

এই কার্যের জন্য যে ঘর নির্দিষ্ট ছিল তাহা ও ব্যবহৃত যন্ত্রাদি পরিষ্কার রাখা, এবং যে সকল জন্তুর শরীরে পরীক্ষা হইতেছিল তাহাদের যত্ন করা, তাহাদের খাঁচা পরিষ্কার করা, কোনটা মরিয়া গেলে তাহাকে পোড়াইয়া ফেলা—এইসকল কাজের জন্য বারিশ নামক এই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইল। এই কার্যে কিছুমাত্র অসতর্ক হইলে কিরূপ বিপদের আশঙ্কা তাহা বারিশকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; বারিশও এক বৎসর পর্যন্ত সকলপ্রকার নিয়ম যথাসাধ্য পালন করিয়াছিল। এই এক বৎসরের মধ্যে কোনরূপ দুর্ঘটনা হয় নাই। কিন্তু ক্রমে সাহস বাড়িয়া যাওয়াতে বেচারা শেষে অসতর্ক হইয়া পড়িল। সে জানিত না, যে এইরূপ অসতর্কতার দরুন তাহার প্রাণ যাইবে।

বার বার নিয়মভঙ্গ করাতে বারিশের প্লেগ হইল। ডাক্তার মূলার দিন রাত হাজির থাকিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। নিজের রোগীদিগকে অন্যের হাতে দিয়া এবং ছাত্রদিগকে পড়াইবার জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, এমনকি একরকম নিজের খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করিয়া, তিনি বারিশের জন্য খাটিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। চারিদিনের অসুখে বারিশ মারা গেল।

বারিশের মৃতদেহ ছুঁইয়া পাছে অন্যের প্লেগ হয়, সেই ভয়ে তাহাকে কফিনে পুরিবার কাজটা মূলার আগাগোড়া নিজ হাতেই করিলেন। তারপর সেই ঘর ধুইয়া ফেলা, ঘরের জিনিসপত্র মাজা ঘসা ইত্যাদি সকল কাজ একাই শেষ করিলেন—পাছে অন্যকে করিতে দিলে তাহারও প্লেগ হয়। ডাক্তার মূলার ব্যতীত আর দুটি লোক (দুইজন শুশ্রূষাকারিণী) বারিশের শুশ্রূষা করিয়াছিল। বারিশের মৃত্যুর দুই দিন পরে ইহাদের একজনের প্লেগ হইল। বারিশের চিকিৎসা করিয়া ডাক্তার মূলার খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তিনি বারিশকে যেমন যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলেন, ইহাকেও তেমনি যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। রোগ পরীক্ষা করা, ঔষধ দেওয়া, উপদেশ আর মিষ্ট কথা দ্বারা সান্ত্বনা করা ইত্যাদিতে রাত্রির অধিকাংশ চলিয়া গেল; শেষ রাত্রিতে তাঁহার অতিশয় কাঁপনি ধরিল। তখন শীতকাল ছিল, সুতরাং প্রথমতঃ সেই কাঁপনিকে তিনি তত গ্রাহ্য করিলেন না। ঘরে ঢুকিবার সময় তাঁহার শরীর ভয়ানক দুর্বলবোধ হইতে লাগিল; তখন তাঁহার মনে একটু সন্দেহ হইল, বুঝিবা তাঁহারও প্লেগ

হয়। এই সামান্য সন্দেহটুকুকে মন হইতে তাড়াইয়া দিয়া, তিনি তাঁহার পিতামাতার নিকট চিঠি লিখিতে বসিলেন। চিঠিতে এই কথাটিও লিখিলেন যে, "এমন গুরুতর সময়ে যদি রোগীকে পরিত্যাগ করে, তবে তাহার কাপুরুষতা হয়।" চিঠি শেষ করিয়া চেয়ার হইতে উঠিবার সময় তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। আরশীতে দেখিলেন যে, তাঁহার চেহারা বড়ই ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু থার্মোমিটার দিয়া জ্বর পাইলেন না; সুতরাং আবার নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা গেলেন। পরদিন তাহার শরীরের অবস্থা আরও খারাপ বোধ হইল। এবারে নিজেকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলেন যে, সম্ভবতঃ তাঁহার প্লেগই হইয়াছে, তবে আরো দু-একটা লক্ষণ দেখা না দিলে নিশ্চয় বলা যায় না।

সেই সময়ে তাঁহার অবস্থা এরূপ, যে তিনি ভাল করিয়া দাঁড়াইতে পারেন না। কিন্তু এই অবস্থাতেই তিনি তাঁহার রোগিনীকে দেখিতে চলিলেন। সেখানে ঘন্টাখানেক থাকিয়া তাহার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া শেষে যখন আর থাকা অসম্ভব হইল, তখন নিজের ঘরে ফিরিলেন। সেখানে আসিয়া নিজের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া নিশ্চয় বুঝিলেন যে, তাঁহার প্লেগ হইয়াছে, আর তাঁহার জীবনের আশা নাই। তখন তিনি তাঁহার জানালার সারশিতে এইরূপ বিজ্ঞাপন টাঙ্গাইয়া দিলেন—

"আমার প্লেগ নিউমোনিয়া হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট ডাক্তার পাঠাইবেন না; চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই যে আমার মৃত্যু হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ডাক্তার মূলার নিজের রোগের অবস্থা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। নিজে যেন ডাক্তার, রোগী যেন আর কেহ, এই রূপ করিয়া পরীক্ষা করেন আর লেখেন। নিজের কথা কিছু লিখিবার না থাকিলে বারিশের পীড়ার রিপোর্ট লেখেন। এই সমস্ত বিবরণ লেখা হইলে, আবার তাহা জানালায় টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। একজন ধর্মযাজিকা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে আসিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও ঘরে ঢুকিতে দেওয়া হয় না।

যখন আর নিজের লিখিবার ক্ষমতা রহিল না, তখন সেই শুশ্রূষাকারিণী ধর্মযাজিকা দ্বারা লেখাইতে লাগিলেন। জিব আওড়াইয়া যাইতে লাগিল, তথাপি ডাক্তার মূলার ক্লান্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "এগুলি লিখিয়া রাখিলে অন্য ডাক্তারদের কাজে আসিবে।" ক্রমে জ্ঞান লোপ পাইতে লাগিল। কিন্তু ইহার মধ্যে যখনই একটু জ্ঞান হইত, তখনই আবার রোগের অবস্থা লেখাইতেন।

পক্ নামক একটি ডাক্তার তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে ঘরে ঢুকিতে দিতে চাহেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "আরোগ্যের কোন আশা নাই, না হ'ক আপনি নিজেকে বিপদে ফেলিতেছেন কেন?" যাহা হউক ডাক্তার পক্ই তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ডাক্তার মূলার ধর্মযাজিকাকে দিয়া পিতামাতার নিকট বিদায়সূচক একখানা পত্র লেখাইলেন। সেই পত্রে এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃতদেহ যেন গোর না দিয়া পোড়াইয়া ফেলা হয়, কারণ পোড়াইলে অন্যের বেয়ারাম হইবার আশঙ্কা কম। আর তাহাতে এ কথাও লেখা ছিল, যে তিনি অনেক সময় পিতামাতার মনে ক্লেশ দিয়াছেন, তাঁহার অপরাধ যেন মার্জনা করেন।

ডাক্তার পক্ আসিলেই মূলার সেই শুশ্রূষাকারিণীর খবর লইতেন, এবং আর কাহারও

অসুখ করিয়াছে কিনা ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন।

শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হইলে নিজের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে পাদ্রী ডাকাইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু পাদ্রীকে ঘরে ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই। তিনি সার্সী আঁটা জানালার বাহিরে থাকিয়াই ভগবানের নাম করিলেন।

দুই দিনের অসুখেই এই পরদুঃখকাতর মহাত্মার মৃত্যু হইল। পরের জন্য আপনাকে বিসর্জন দিয়া ডাক্তার মুলার এই জগতে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোকে আজ সহস্র হৃদয় ম্রিয়মাণ!

তিব্বত

হিমালয় পর্বতের উত্তরে তিববত দেশ—সেই, যে দেশে আংটির মতন একটা হ্রদ আছে; ছেলেবেলা ভূগোলে পড়িয়াছিলাম যে, এই দেশের ছাগলের লোমে শাল হয়, আর সেখানে নাকি একটা মস্ত লামা থাকে।

বাস্তবিক এই দেশটা আমাদের এত কাছে হইলেও আমরা ইহার সম্বন্ধে খুব কম খবর রাখি। ইহার প্রধান কারণ দুটি ঃ ১) আমাদের এ দেশ হইতে তিববতে যাইতে হইলে হিমালয় পার হইয়া যাইতে হয়; ২) তিববতের লোকেরা বিদেশী লোককে সহজে তাহাদের দেশে ঢুকিতে দেয় না।

হিমালয় পর্বত পার হইয়া যাওয়া যে ভারী মুশকিলের কথা, এটা নিশ্চয়ই তোমরা অনেকটা বুঝিতে পার; কিন্তু ভাল করিয়া বুঝিতে পার কি না জানি না। হিমালয় পর্বত ভয়ানক উঁচু। তাহাকে ডিঙ্গাইতে হইলে লোকে অবশ্য তাহার অপেক্ষাকৃত নীচু স্থানটাই ডিঙ্গায়। কিন্তু এই পর্বতে ১৭০০০ (সতের হাজার) ফুটের চাইতে নীচু ডিঙ্গাইবার পথ নাই। সারা বছর সেখানে বরফ পড়িয়া থাকে। সেই বরফের উপর দিয়া পায় হাঁটিয়া চলিবার সাধ্য নাই—এমনকি, ঘোড়াও তাহার উপর দিয়া সহজে যাইতে পারে না। চমরী গরুর পিঠে চড়িয়া এই সকল স্থান পার হইতে হয়। শীতের তো কথাই নাই, তাহা ছাড়া খাওয়া দাওয়ার অসুবিধাও খুব বেশি। তোমরা ডাল ভাত খাও, কিন্তু তিববতের পথে ডাল ভাত মিলে না। চিঁড়ে, ছাতু, চমরীর দুধ, এইসব খাইয়াই কাজ সারিতে হয়। গ্রীষ্মকালে বরফ কমে; তখন সকল স্থানে এত কষ্ট পাইতে হয় না; কিন্তু এরূপ সুবিধা দু'মাসের বেশি থাকে না। এসকল পথে ভল্লুকের ভয়ও আছে। তাহা ছাড়া শুধু বরফের দরুনই কত রকমের বিপদ হইতে পারে, তাহা শুনিলে আশ্চর্য হইবে। হাত পায়ের আঙ্গুল দুটা-একটা পচিয়া পড়া তো ধর্তব্যের ভিতরেই নহে। পথে চলিতে চলিতে বরফের ভিতর ডুবিলেই সর্বনাশ! এক এক স্থান এমন ভয়ানক যে, মাথার উপরে পর্বত প্রমাণ বরফ আলগোছে ঝুলিতেছে, সামান্য একটু ছুতা পাইলেই ঘাড়ে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে তিব্বত যাইবার আশা মিটাইয়া দিবে। একটু অসতর্ক হইয়া পথ চলা, এমনকি, একটি গান ধরা, এরূপ সামান্য কারণ হইতে এইরূপে বরফ চাপা পড়িয়া দলসুদ্ধ লোক মারা যাইবার কথা শুনা গিয়াছে।

এত কষ্ট করিয়া তিববতে যাইতে হয়, সেখানকার লোকেরা আবার তাহাদের দেশে ঢুকিতে দিতে চায় না! সাধু সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য লোক এ দেশ হইতে তিববতে খুব অল্পই

গিয়াছেন। যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশই অতি কষ্টে অল্প দিন মাত্র সেখানে থাকিয়া শেষটা—অনেক সময় প্রাণের ভয়ে—চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। এইজন্যই তিব্বত দেশের এত কম খবর এ দেশে আসে। যাহা আসে, তাহারও কতটা খাঁটি তাহার নিশ্চয় নাই।

তিব্বত দেশটা খুব উঁচু। আমাদের এ দেশের চাইতে মোটের উপরে দু মাইল উঁচু হইবে। অবশ্য ইহার চাইতে কম উঁচু স্থানও আছে, তেমনি আবার তিন মাইল উঁচু স্থানও আছে। পাহাড়ে দেশ; কাঁকরে মাটি। বৃষ্টি বাদ্‌লা বড় একটা নাই। শীতকালে অসম্ভব শীত, আবার গ্রীষ্মকালে কয়েকটা দিন ভয়ানক গরম। হাওয়া যারপরনাই শুকনো। সেদেশে জিনিস পচিতে পায় না। মাংস শুকাইয়া এমন হইবে যে, টিপিলে গুঁড়া হইয়া যায়; কিন্তু তাহাতে গন্ধ হওয়া বা পচা ধরা—তাহা কখনই হইবে না।

তিব্বতের অনেক স্থানই অনুর্বর, তাহাতে গাছপালা বেশি জন্মে না। কিন্তু অনেক উর্বরা মাঠও আছে, তাহাতে খুব ঘাস হয়, আর অনেক জীব জন্তু তাহাতে বাস করে। চমরী, ঘোড়া, গাধা আর ভেড়াই ইহাদের মধ্যে প্রধান।

এ দেশের প্রধান শস্য যব, রুটি, ছাতু ইত্যাদি প্রধান খাদ্য। মাখন খুব পুরাতন হইলেই বেশি পছন্দ হয়। ছাগলের চামড়ার থলিতে মাখন রাখিয়া দেওয়া হয়। সে মাখন যত পুরাতন হয়, ততই তার দাম বাড়ে, এক পুরুষের লোকেরা মাখন রাখে, হয়ত তার পরের, এমনকি, তারও পরের পুরুষের লোকেরা তাহা ব্যবহার করিবে। খুব উঁচু দরের মাখন ৪০/৫০ বৎসরেরও হয়। এত ভাল মাখন অবশ্য সর্বদাই খাইতে পাওয়া যায় না। বিবাহাদি বড় বড় উৎসব ভিন্ন তাহার থলি খোলা হয় না।

তিব্বতীরা চা খুব কম খায়। তবে ঘৃতের ন্যায়, চা-টাও একটু নূতন ধরনের। তাহাতে নুন থাকে, আর খানিকটা মাখনও থাকে। এই চা প্রস্তুত করিবার সময় তাহা খুব ঘাঁটিতে হয়।

তিব্বতের লোকেরা ভাল চা-ও প্রস্তুত করিতে জানে। এক সাহেব তিব্বতের প্রধান সেনার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন; সেখানে তাঁহাকে চা খাইতে দিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, সে চা খাইতে খুব ভাল। তাঁহার সবটাই খাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ না হইতেই পিয়ালা লইয়া গেল। তিব্বতে মানুষ মরিলে তাহাকে কুকুর দিয়া খাওয়ায়। গরীব লোক মরিলে তাহাকে সাধারণ কুকুরেই খায়; কিন্তু বড় লোকদের জন্য মঠ মন্দিরেতে ভাল কুকুর রাখা হয়। কেহ মরিলেই তখনি কিন্তু তাহাকে কুকুর দিয়া খাওয়ায় না। মড়াটা পাছে উঠিয়া ঘরের লোকের উপর উৎপাত করে, সেই ভয়ে, মরিবার পরেই তাহাকে বেশ করিয়া বাঁধিয়া, দেওয়ালে হেলান দিয়া দাঁড় করাইয়া কয়েক দিন রাখিয়া দেয়।

তিব্বতীরা বেঁটে ও বলিষ্ঠ। দেখিতে কতকটা চীনেদের মতন। ইহাদের স্বভাব বড় নোংরা। বৎসরে একদিন স্নান করে। কাপড় পরিয়া সেটা ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা না হইলে, আর তাহা ছাড়ে না। ইহারা বেশ পরিশ্রমী। পুরুষদের চাইতে স্ত্রীলোকেরা বেশী পরিশ্রম করে। পশমের সুতা পাকান, আর তাহা দ্বারা নানারকম জিনিস প্রস্তুত করা পুরুষদের একটা প্রধান কাজ।

ইহারা মহিষের চামড়ার ভিতরে হাওয়া পুড়িয়া তাহা নদীতে ভাসাইয়া দেয়। নদী পার হইতে হইলে ইহাই তাহাদের খেয়া। এ খেয়াতে দাঁড়, লগী বা হালের প্রয়োজন হয় না। তুমি

চামড়ার উপরে উঠিয়া যেমন করিয়া পার বসিয়া থাকিবে; আর খেয়ানী দুপায় জল কাটিয়া সাঁতরাইবার কায়দায় তোমাকে ও-পারে লইয়া যাইবে।

স্থলে যাতায়াতের প্রধান উপায় চমরী এবং ঘোড়া। চমরীগুলির স্বভাবটা বড় বুনো; কখন কি করিয়া বসে, তাহার ঠিক নাই। নাকে দড়ি না লাগাইলে তাহাকে চালানই ভার। তাহার পিঠে বসিয়া তুমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পার না। তোমাকে গুঁতাইবার অবসর পাইলে সে তো তাহা সন্তোষের সহিত করিবেই। আর কিছু না পারিলে অন্ততঃ তোমাকে লইয়া একটা বেখাপ্পা ছুট দিবে। পাহাড়ে উঠিবার সময় ইহারা ভারি হুঁশিয়ার; কিন্তু তাহা খালি তাহার নিজের সম্বন্ধেই—তোমার সম্বন্ধে নহে। খাদের পাশে নিয়া তোমাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার সুযোগ পাইলে, সে অম্লানবদনে তাহা করিবে।

তিব্বতীরা পাহাড়ে উঠিতে হইলে অনেক সময় এক নূতন কায়দায় ঘোড়া চড়ে। অর্থাৎ ঘোড়ায় না চড়িয়া, তাহার লেজ ধরিয়া ঝুলিতে থাকে; ঘোড়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়।

তিব্বতীদের ভূত-পেত্নীর ভয়টা বড়ই বেশী। তোমাদের মধ্যে যাহারা দার্জিলিং গিয়াছ, তাহারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, ভুটিয়ারা কেমন নেকড়ের নিশান টাঙ্গায়। ঐ নেকড়ের নিশান ভূত তাড়াইবার ঔষধ! ভূত তাড়াইবার মন্ত্র তাহাতে লেখা আছে। ঘরে দরজায়, পথে ঘাটে, সকল স্থানেই ঐ সকল নিশান দেখিতে পাইবে।

ভুটিয়ারা তিব্বতের ধর্ম পালন করে। তিব্বতের ধর্মটা মোটামুটি বৌদ্ধ ধর্মই বটে; কিন্তু সেই বৌদ্ধ ধর্মের ভিতরে তিব্বতীরা তাহাদের দেশের ভূত-পেত্নীগুলির জন্য অনেকখানি জায়গা করিয়া লইয়াছে। তাহাদের "লামারা" এই সকল ভূত তাড়াইবার মন্ত্র লিখিয়া সাধারণ লোকের নিকট বিক্রয় করে। "লামা" বলিতে, সেই যার ছাগলের মতন গা, আর উটের মতন মুখ, যার লোমে গেঞ্জি তৈয়ার হয়—সেই জন্তুটাকে মনে করিও না। এই সকল লামা তিব্বতীদের প্রধান পুরোহিত এবং শাসনকর্তা। তিব্বতীয়েরা একেবারে স্বাধীন নহে, কোন কোন বিষয়ে চীনেদের অধীন। চীনেরা ইহাদের নিকট হইতে কর নেয়।

দলাই লামার নীচে আরো অনেক লামা আছেন, তাঁহারা পদ অনুসারে অল্প বেশী সম্মান লাভ করেন। একজন লামার ছবি দেওয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার পরিচ্ছদাদির বিষয় অনেকটা বুঝিতে পারিবে। ছবিতে লামা পূজায় নিযুক্ত আছেন। এক হাতে ঘন্টা আর এক হাতে বজ্র। সামনে একটি ডমরু পড়িয়া আছে। ডমরু একটি খুব ছোট ঢাক। আকৃতি কতকটা মোড়ার ন্যায়। আমাদের বাজিকরেরা অনেক সময় ইহা বাজায়। এই সকল জিনিস লামারা ভূত তাড়াইবার জন্যে ব্যবহার করেন।

লামার ডানদিকে একটা ঘটির মুখে ঝুমঝুমির ন্যায় যে জিনিস দেখিতেছ, তাহা তাঁহার "যপ-চক্র"। এই যপ-চক্র অতি অদ্ভুত জিনিস। ইহার ভিতরে ইহাদের সর্বপ্রধান মন্ত্র অনেকবার লেখা আছে। হাতলে ধরিয়া পাক দিয়া চক্র ঘুরাইতে হয়। চক্র এক পাক ঘুরিয়া আসিলে ঐ মন্ত্র হয়ত দশ হাজার বার (যতবার তাহা লেখা আছে) যপ করিবার ফল হইবে। চক্র আবার ঘুরাইবার উল্টা সোজা আছে। উল্টা ঘুরাইলে ফলও উল্টা হইবে, এ চক্রটি নিতান্তই ছোট। এমন চক্রও আছে, যে তাহা ঘুরাইতে দুজন বলিষ্ঠ লোকের দরকার। তাহার ভিতরে অনেক কাগজ ধরে, সুতরাং মন্ত্রও অনেকবার লেখা যায়, আর তাহাতে ফলও সেই পরিমাণে বেশী হয়। বড় বড় মঠে ১০ হাত ২০ হাত উঁচু প্রকাণ্ড যপ-চক্র খাটান থাকে। পয়সা

থাকিলে একজনকে নিযুক্ত করিয়া যতক্ষণ ইচ্ছা সেই চক্র ঘুরাইতে পার; আর এইরূপে বিনা মেহনতে অনেক ফল পাইতে পার। অনেক যপ-চক্র হাওয়ার অথবা জলের জোরে চলে, তাহাকে যে একবার চালাইয়া দেয়, তাহার ঢের ফললাভ হয়। এক লামা এইরূপ চক্র চালাইয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী চলিয়াছেন, এমন সময় আর এক লামা আসিয়া চক্র থামাইয়া পুনরায় নিজের জন্যে তাহাকে চালাইয়া দিলেন। প্রথম লামা তাহা দেখিতে পাইয়া ভয়ানক রাগিয়া গেলেন; সুতরাং দুজনে বিবাদ আরম্ভ হইল। এমন সময় আর একজন বৃদ্ধ লামা আসিয়া, তাঁহাদের বিবাদের কারণ জানিয়া বলিলেন, "বাপু সকল, তোমাদের বিবাদ করিয়া দরকার নাই; আমি তোমাদের জন্য চক্র ঘুরাইতেছি, তোমরা ঘরে যাও।"

চালনি বলেন ছুঁচ ভাই তুমি কেন ছেঁদা

কেনারাম সম্মুখের লোকটিকে দেখাইতেন। তাঁর নিজের পিঠের দিকে একবার দেখিলে হইত। নিজের দোষগুলিকে সকলেই পিছনে ফেলিয়া দিতে চায়। আমি চেঁচাইয়া বলিলাম, "লোকনাথ বড় রাগী, আমি তাহাকে ভালোবাসি না," বল দেখি ভাই, আমার সম্বন্ধে তুমি কিরূপ মনে করিতেছ? অন্যের ছেঁড়া মোজা দেখিয়া বিরক্ত হওয়ার আগে, নিজের জুতার ভিতর চাহিয়া দেখা ভালো। আমি যতক্ষণ বসিয়া থাকিব, ততক্ষণ তুমি হাঁটিতেছ না বলিয়া আমার বিরক্ত হওয়ার অধিকার কি? আর যদি এমন হয় যে আমি হাঁটিতেছি, তাহাতেই বা কি হইল।

অন্যের তিলটিকে তাল করিবার পূর্বে নিজের তালটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া ভালো। গম্ভীরভাবে বক্তৃতা করিলে কি হয়, পরক্ষণেই যদি বক্তা নিজের অসারত্ব হাতে কলমে বুঝাইয়া দেন, তবে লাভ কি হইল? লাভ হইল যে, অন্য কেহ ঐ বিষয় নিয়া আমাকে কিছু বলিলে, আমি তাহাকে বলিব, "আরো একজন একবার বলিয়াছিলেন।" আমার দোষ দেখিয়া তোমার কষ্ট বোধ হইয়াছে? ভালো। কিন্তু কষ্ট পাইয়া যদি তুমি আসিয়া মুরুব্বি লোকের মতন আমাকে বকিতে থাক, তবে হয়তো লাভের মধ্যে এই হবে যে, তোমাতে আমাতে যে ভালোবাসাটুকু ছিল তাহা আর থাকিবে না। ক্লাশে একটি নূতন ছেলে আসিল—বেচারাকে যেন খেলার সামগ্রী পাইলে; অত বোকা বুঝি আর কেহ কখনো দেখে নাই। কিন্তু মনে পড়ে কি? তোমাকে যখন ধরিয়া বাঁধিয়া ইস্কুলে মাস্টারমহাশয়ের কাছে দিয়া যাওয়া হইয়াছিল, তখন তুমিও একটি জানোয়ারের মতন ছিলে কি না? অন্যের ত্রুটি নিয়া হাসি-তামাশা করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহাদের অনেকেরই দেখা যায় মেজাজটি বড় উগ্র—কথা সয় না। ইঁহারা যদি অন্যের উপর ঢিল ছুঁড়িবার সময় নিজের গায়ে মারিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বড় ভালো হয়। না হয় প্রতিপক্ষের পাটকেলটির সময় যেন মুখ বিকৃত না করেন। বাস্তবিক ওরূপ লোকের ঐ ঔষধ—আমি বলিলাম 'খক্' তুমি বলিলে 'খুঃ'। বেশ সমানে সমানে গেল। এরূপ বারকয়েক হইলেই দেখিবে আমার রোগ সারিয়াছে, আমি ভালোমানুষ হইয়াছি।

ভালো ঠাট্টা কয়জন করিতে পারে? কথা শুনিয়া হাসিলাম; উপকারও হইল; এরূপ কথা কয়জন বলিতে পারে? প্রায়ই তো দেখি, তুমি বলিলে, আমি হাসিলাম, আর যদু চটিল।

আমাদের দেশের একজন প্রতিভাশালী লোক বলিয়াছেন—'কবির আমোদ, কিন্তু বিপিনের ক্লেশ, লোষ্ট্রক্ষেপী বালকের সুখে যথা ভেক।' তুমি তো এক কথা বলিয়া মজা করিলে; আমি বেচারা যে তাহাতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলাম। ঠাট্টা মাঝে মাঝে ভালো লাগে, কিন্তু বিদ্রূপকে বড় ভয় করি। যিনি স্বভাবত কাহারো মনে ক্লেশ না দিয়া নির্দোষ কথা বলিয়া সকলকে আমোদ দেন, তিনি বড় ভালো লোক। আর যাহাদের দোষ সংশোধন করিবার ক্ষমতা নাই, কেবল বিদ্রূপ করিবার জন্য অন্যের সমালোচনা করিয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে ছেলেবেলায় পড়িয়াছি, 'খলেরা কেবল পরের দোষই অণ্বেষণ করে—'।

রাগ

বাবা! কি রাগ গো! বাবুর মুখের উপর রাগ হইয়াছে! তাইতো মুখ ব্যাটার জ্বালায় বাবু এখন আর আরশির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন না। অমন মুখ আবার বাবুলোকের থাকে? —তাই বাবু রাগ করিয়া মুখকে জব্দ করিবার নিমিত্ত মুখের নাকটা কাটিয়া ফেলিতেছেন। এবারে মুখ একাকার হইয়া যাইবেন।

রাগ হইলে বিচার শক্তি একটু কমিয়া যায়। আমরা কোনো ফকিরের কথা শুনিয়াছি। ফকিরের এক শত্রু ছিল, তাহাকে জব্দ করিবার জন্য নিজের ছেলেকে বলিল, "তুই আমাকে মারিয়া ওদের দরজায় ফেলিয়া রাখ।' ছেলে তাহাই করিল। বল দেখি জব্দ হইল কে? ছেলেবাবুদের অনেককে দেখিয়াছি মার উপর রাগ হইয়াছে, সুতরাং সেদিনের মতো আহার পরিত্যাগ করিলেন পাকা লোক হইলে পাছে মা বিরক্ত করিতে আসেন, তাই গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকেন! এই হইল মার শাস্তি। ক্ষুধা কিন্তু রাগ বোঝে না, তাহার সময় হইলে সে হাজির হইবেই। রাগের ফল হইল ক্লেশ; ক্লেশের ফল অনুতাপ।

সকলেই মাঝে মাঝে অন্যায় করিয়া বলিয়া থাকেন, 'রাগের মাথায় করিয়াছি।' বলি, রাগের মাথাটা কি? অর্থাৎ তখন বিচারশক্তি ছিল না। ততক্ষণ আমি পাগল, সুতরাং আমার সাত খুন মাপ! খুনটা নিজের উপর দিয়াই অনেক সময় হইয়া যায়। রাগের মাথায় যত কম কাজ করা যায় ততই ভালো। যদুর ছোট বোন তাহার ছবির বই-এর একখানা পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, যদু 'রাগের মাথায়' তৎক্ষণাৎ বইখানাকে উনুনের ভিতর রাখিয়া আসিল। এ রোগ অনেকেরই আছে।

রাগ হইলেই অনেকে মনে করেন যে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে পারেন, অন্যের তাতে কিছু বলিবার অধিকার নাই। রাগ হইলে অনেকে নিজেকেই কষ্ট দেন—আহা বেচারা!

শেষে একটা কথা বলি। ভাই, রাগকে বিশ্বাস করিও না। রাগ যখন তোমার ভিতরে আসিবেন তখন খুঁজিলে দেখিবে যে বুদ্ধিটি পলায়ন করিয়াছে। রাগ আসিয়া তোমাকে তাঁহার করিয়া লইবেন। তখন আমি গাধা, গরু, ষাঁড়, মহিষ, যা কিছু হই না কেন, তোমাতে আমাতে কোনো প্রভেদ নাই।

তাই আজ বাবুর নাকের উপর চোট্!

সংকেত

আমার মনের ভাব উপরের কথায় হয়তো অনেকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন না। মুখে কথা না বলিয়া অন্য কোনো চিহ্নবিশেষ দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করার নাম সংকেত। অর্থাৎ আমি এ প্রস্তাবে যতবার সংকেত কথাটা ব্যবহার করিব ততবারই ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

কোনো না কোনো আকারে সংকেত সকল স্থানেই প্রচলিত আছে। আমরা দিনের মধ্যে কতবার সংকেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি! বন্ধু আসিয়া একটা কিছু করিতে অনুরোধ করিলেন, তুমি মাথা নাড়িলে; আমি তোমার উপর চটিয়া গিয়া ভয় প্রদর্শন করিলাম, তুমি মুখে কিছু না বলিয়া অঙ্গুলি বিশেষ উন্নত করত আমাকে হনুমানের খাদ্য খাইতে বলিলে; ইত্যাদি, আর কত বলিব। এ সকলই সংকেত। এই প্রকারের সংকেত সকলেই কিছু কিছু ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইংলণ্ডে বোবা এবং কালারা এইরূপ সংকেতের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। হাতের এক এক প্রকার ভঙ্গি করিয়া তাহারা ইংরাজি বর্ণমালার এক একটা অক্ষর বুঝায়। অক্ষর হইলে আর শব্দ রচনা শক্ত থাকে না। আমাদের দেশেও আছে।

'অহি, কুম্ভ, চক্র, টংকার, তরল, পবন, জাঁতা।'

হস্ত থাকিতে কেন মুখে কথা বলি। অর্থাৎ সাপের ফণার মতো করিয়া হাত তুলিলেই একটি স্বরবর্ণ বুঝাইবে। এক হাতের মুষ্টির উপর আর এক হাতের মুষ্টি রাখিয়া কুম্ভের অনুকরণ (!) করিলেই ক-বর্গের একটি অক্ষর বুঝাইবে। হাত ঘুরাইয়া চক্র, বাতাসে টোকা দিয়া টংকার, হাতে বাতাসে ঢেউ তুলিতে চেষ্টা করিয়া তরল, পাখার কার্য হাতে করিয়া পবন, ও হাতে হাতে চাপিয়া জাঁতা করিলে, আর চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ, প-বর্গ, য-বর্গ (য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ক্ষ ইত্যাদি) সকলই ক্রমান্বয়ে হইতে লাগিল।

স্বরবর্ণ বলিয়া পাঁচ আঙ্গুল দেখাইলে পঞ্চম স্বরবর্ণ (উ) বুঝাইল; প-বর্গ বলিয়া তিন আঙ্গুল দেখাইলে আর প-বর্গের তৃতীয় বর্ণ (ব) বুঝাইল। ইত্যাদি। একটা শব্দ শেষ হইয়াছে ইহা বুঝাইতে হইলে হাততালি দিতে হয়। সুতরাং প্রত্যেক শব্দের শেষে হাততালি পড়িবে।

প্রচলিত টেলিগ্রামের অধিকাংশই সাংকেতিক। জাহাজের লোকেরা নানা প্রকারের নিশান ব্যবহার করিয়া সাংকেতিক আলাপ করিয়া থাকে। কখনো বা একটিমাত্র নিশান হাতে লইয়া, তাহাকে নানা প্রকারে নাড়িয়া সংকেত করা হয়। কখনো মাথার টুপী হাতে করিয়া তদ্দ্বারা সংকেত করা হয়। আরো কতপ্রকারে সংকেত করা হয় যে কি বলিব। কোনো সময় এত দূরের লোককে সংকেত হয় যে এ সকল কিছুই তত দূর হইতে দেখা যায় না। তখন খুব উঁচু জায়গায় ঘর করিয়া তাহার একটা দিক কেবল খড়্‌খড়ি দ্বারা বন্ধ করা হয়। ঘরের ভিতরে আলো থাকে। খড়খড়ি খুলিলে সেই আলো অনেক দূর হইতে দেখা যায়। খড়্‌খড়ি খুলিয়া কিছুকাল পর বন্ধ করিলে, একপ্রকার সংকেত বুঝায়; আর খুলিয়া অমনি বন্ধ করিলে অন্য প্রকারের সংকেত বুঝায়। এই দুই প্রকারের সংকেত দ্বারা সব অক্ষর বুঝানো যাইতে পারে। খড়্‌খড়িওয়ালা ঘরের পরিবর্তে অনেক সময় খুব উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করা হয়। তখন তাহাকে একখানা তক্তা দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিলেই কাজ চলে। সংকেত করিবার

সময় তক্তাখানা সরাইতে হয়, তবেই আলোটা দেখা যায়। তক্তা সরাইয়া অল্পক্ষণ রাখিলে একপ্রকার সংকেত আর অধিকক্ষণ রাখিলে অন্যপ্রকার সংকেত বুঝায়।

সংকেতের কথা আমরা শেষ করিলাম। টেলিগ্রাফে যে সংকেত ব্যবহার করা হয় তন্মধ্যে মর্স সাহেবের সংকেত-প্রণালীই অধিক প্রচলিত। মর্সের টেলিগ্রাফের সংকেত এই প্রণালীতে করা হয়—মর্সের টেলিগ্রাফে টাক্ টিক্ করিয়া শব্দ হয়, তাহার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা অনুসারে দুই প্রকারের সংকেত হইতে পারে। শেষে যতপ্রকার সংকেতের কথা বলা হইল, সবগুলিই কেবল হ্রস্ব দীর্ঘ লইয়া হইয়াছে। শব্দ কি আলোক অধিকক্ষণ থাকিলে তাহা দীর্ঘ, তাহার চিহ্ন (—) এইরূপ। অল্পক্ষণ থাকিলে তাহা হ্রস্ব, চিহ্ন (-) এইরূপ।

মূল বর্ণ

রামধনু বিষয়ক একটি প্রস্তাব গত বর্ষের 'সখা'য় লেখা হইয়াছিল তাহাতে এক জায়গায় লেখা ছিল যে, 'লাল সবুজ আর ভায়োলেট এই তিনটি মূল বর্ণ; আব অন্য কযেকটি বর্ণ ইহাদের হইতে উৎপন্ন।' লাল, নীল এবং পীত এই তিনটি মূল বর্ণ, এইরূপ বিশ্বাসই সাধারণে প্রচলিত; সুতরাং আমাদের চিঠিও পাইয়াছি। চিঠিখানি পডিয়া আমরা অতিশয সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং আহ্লাদের সহিত এ বিষয়ে আমবা যাহা জানি, পত্রলেখকের সন্দেহ দূব করিবার জন্য তাহা লিখিতেছি।

প্রথমে অবান্তর কথা দু-একটি বলা আবশ্যক হইয়াছে। এ বিযযটি ভালো কবিয়া বুঝিতে হইলে 'সখা'র এই প্রবন্ধে কুলাইবে না। কিন্তু কিছু একটু বুঝাইতে চেষ্টা করার পূর্বেও আলোক সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আলোক আছে বলিয়াই আমরা জিনিসের বঙ দেখিতে পাই। রঙটা বাস্তবিক জিনিসের নয়, রঙটা আলোকের। জিনিসটা কিছু আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে না; আমরা যে সকল জিনিস দেখি, সেগুলি যদি আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ার দরকার হইত, তবে এতদিনে অন্ধ হইয়া যাইত ম! জিনিস হইতে আলো আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়ে। সেই আলোকের যে রঙ জিনিসটারও সেই রঙ দেখা যায়। জিনিস হইতে আলোক দুই প্রকারে আসিয়া আমাদের চক্ষে পডিতে পারে। এক জিনিসটার ভিতর দিয়া আসিতে পারে, আর তাহার গায়ে পড়িয়া উলটিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়িতে পারে। আর এক কথা, ভিতর দিয়াই আসুক, উলটিয়াই আসুক, জিনিসে যত প্রকারের আলো পড়ে, সাধারণত তাহার সকলগুলি আমাদের চক্ষে আসিতে পারে না। আলো পড়িবামাত্র জিনিসটা তাহার কিছুটা খাইয়া ফেলে, বাকি আমাদের কাছে আসিতে দেয়। কোনো জিনিস লাল আলো ছাড়া আর সকল রঙের আলো খাইয়া ফেলে, তাহাকে লাল দেখা যায়; যে জিনিস সবুজ ছাড়া আর সব আলো খায়, তাহাকে সবুজ দেখা যায়। সে জিনিস সকল প্রকারের আলোই খায়, তাহাকে কালো দেখা যায়। যে জিনিস কোনো প্রকারের আলোই খাইতে জানে না, সে সাদা। জিনিসে যত আলো পড়ে, তাহার সব যদি সে খাইয়া ফেলে, তবে তাহাকে কালো দেখাইবে। সবুজ জিনিসে সবুজ ছাড়া আর যেরূপ

আলোই পড়ুক না, সে তাহা খাইয়া ফেলিবে এবং কালো দেখাইবে।[১] আমরা সাধারণত যে আলোতে দেখি তাহা সাদা। সাদা আলো সকল প্রকারের আলোর সমষ্টি; সুতরাং তাহাতে সকল প্রকারের জিনিসই স্বাভাবিক বর্ণের দেখা যায়। সাদা জিনিস কোনোরূপ আলোকই খায় না, সুতরাং তাহাতে যখন যে রঙের আলো পড়ে, তখন সেই রঙ দেখায়। ইত্যাদি।

লাল রঙের কাচ লাল কেন? না তাহার ভিতর দিয়া সে কেবল লাল রঙের আলো আসিতে দেয়, আর সব খাইয়া ফেলে। সবুজ কাচের ভিতর দিয়া কেবল সবুজ আলো আসিতে পারে, সেইজন্য সে সবুজ ইত্যাদি। এখন মনে কর একখানা লাল রঙের কাচের উপর একখানা সবুজ রঙের কাচ রাখিয়া দুখানারই ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলে কি দেখিবে? লালে সবুজে মিশিয়া যে রঙ হয়? না; সবুজ কাচখানা আলোর সব রঙ খাইয়া কেবল সবুজ আলো আসিতে দিয়াছিল, লালখানায় তাহাও খাইয়া ফেলিল। সুতরাং কোনো রঙই দেখিবে না। দেখিবে কেবল কালো।

কাচের উপর আলো পড়িলে তাহার কতকটা উপর হইতেই উলটিয়া আইসে; কিন্তু সে অতি অল্প। অবশিষ্ট আলো ভিতরে যায়। কাচে রঙ থাকিলে আবার এই যে ভিতরে আসিল ইহাদের কতকগুলিকে সে খাইয়া ফেলে। এখন যাহারা থাকিল তাহাদের কিছু অপর পৃষ্ঠে লাগিয়া ফিরিয়া আইসে, অবশিষ্ট ওপিঠে বাহির হইয়া যায়; এই দুইরকম আলোর দরুনই কাচের রঙ দেখা যাইবে। যত প্রকার জিনিসের রঙ দেখা যায়, (তাহাদের যদি নিজের আলো না থাকে) সকল প্রকার জিনিসের ভিতরেই আলো গিয়া ফিরিয়া বাহিরে আসিয়াছে ইহা নিশ্চয়; কারণ বাহির হইতে যে আলোক ফিরিয়া আইসে তাহার রঙের পরিবর্তন হইতে পারে না। পরিবর্তন হওয়ার অর্থ এই যে, যতগুলি ছিল, তাহার কিছু খাইয়া ফেলিয়াছে। যাহার নিজের আলো নাই তাহা দ্বারা আর কোনোরূপ পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নহে। অনেকে মনে করেন যে, যে জিনিস স্বচ্ছ নহে, তাহার ভিতরে আলো যাইতে পারে না, তবে তাহার রঙ হয় কি করিয়া? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, এমন জিনিস নাই, যাহা অল্প পরিমাণেও স্বচ্ছ নয়। খুব পাতলা হইলে ধাতুর পাতের ভিতর দিয়াও আলো আসিতে পারে।

এখন কাজের কথা হউক। আমাদের সাধারণ বিশ্বাস, নীল পীত মূল বর্ণ, তার যোগে সবুজ হইয়াছে। এখন জানিলাম, লাল সবুজ মূল বর্ণ, তার যোগে পীতের উৎপত্তি এবং সবুজ ভায়োলেট মূল বর্ণ, তার যোগে নীলের উৎপত্তি। আমাদের প্রমাণ নীল রঙের আর পীত রঙের জিনিসের চূর্ণ মিশাইয়া দেখা। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐরূপভাবে মিশ্রিত চূর্ণ হইতে যে আলো আইসে তাহার অধিকাংশই দুই প্রকারের চূর্ণের ভিতর দিয়াই আসিয়া থাকে। সুতরাং ঐরূপ আলোর যে রঙ মিশ্রিত চূর্ণেরও প্রায় সেই রঙ হইবে। নীল পীত যদি মূল বর্ণ হইত, তবে নীল চূর্ণ আলোর সমস্ত অংশ খাইয়া কেবল নীল অংশ রাখিত, সেই অংশ আবার পীত চূর্ণের ভিতর দিয়া যাইবার সময় ভক্ষিত হইয়া যাইত। সুতরাং লাল এবং সবুজ কাচের ভিতর দিয়া আসিয়া আলোর যে দশা হইয়াছিল এখানেও তাহাই হইত। দুই চূর্ণ মিশিয়া প্রায় কালো রঙ হইত। কিন্তু নীল পীত উভয়ের মধ্যেই সবুজ

১ সবারে নুন মিশাইয়া তাহাতে পলতে ভিজাইয়া আলো জ্বালিলে সে আলো বিশুদ্ধ পীতবর্ণের হয়। সেই পীতবর্ণের আলোতে পীত ছাড়া অন্য রঙের জিনিস কালো দেখাইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইলে প্রথমত, ঘর সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে করিয়া লইতে হইবে।

থাকায় সবুজ আলোটা উভয় প্রকার চূর্ণের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিতে পারে, কেহই তাহাকে খাইয়া ফেলেনা। সুতরাং মিশ্রের রঙ সবুজ দেখায়। সেইরূপ লাল চূর্ণ আর সবুজ চূর্ণ মিশাইয়া আমরা একটা ধূঁয়ার মতন রঙ পাই। তাহাতেই মনে করি, বুঝি লাল আলো আর সবুজ আলো মিশিয়াও ঐ রঙই হইবে। কিন্তু লাল আলো আর সবুজ আলো মিশিয়া যে রঙ হয় সে কিরূপ, জান? সে সাদা মতন! অতএব দুই-তিন রঙের চূর্ণ মিশাইয়া সেই রঙের আলো মিশাইয়া ফেলিয়াছি, মনে করিলে চলিবে না।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে আমাদের বক্তব্য বিষয়টাকে খুব পরিষ্কার করিতে পারিয়াছি এরূপ ভরসা করি না। একটি কথা মনে রাখিতে চেষ্টা করিবেঃ দুই-তিন প্রকারের চূর্ণ মিশাইলে একের বর্ণের সহিত অন্যের বর্ণের যোগ করা হইল না; উভয়ের সাধারণ অংশটুকু রাখিয়া অবশিষ্ট অংশটুকুকে ধ্বংস করা হইল মাত্র। কারণ, প্রথম যার ভিতর দিয়া আলো আসিল, তার যে রঙ তাহা ছাড়া অন্য সকল প্রকারের আলো সে খাইয়া ফেলিল। অবশিষ্ট আলোটুকু যখন দ্বিতীয় চূর্ণের ভিতর দিয়া গেল সেও তাহাই করিল ইত্যাদি। একটি দৃষ্টান্ত দিই—সিন্দুর লাল, আল্ট্রামেরিণ পরিষ্কার নীল। সিন্দুরে আল্ট্রামেরিণে মিশাইলে আমাদের হিসাবে বেগুনে রঙ হওয়া উচিত। কিন্তু কাজে দেখি প্রায় কালো রঙ হয়। লাল মূল বর্ণ, নীলে সবুজ এবং ভায়োলেট আছে, এই দুয়ের মধ্যে সাধারণ কিছুই নাই, সুতরাং মিশ্রিত জিনিস কালো দেখাইবারই কথা। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, আমরা যেরূপ বিশ্বাস করি, তার মতন কাজ হইল না। আমরা লাল রঙের জিনিস এবং নীল রঙের জিনিস অন্য জায়গায় মিশাইয়া বেগুনে পাইয়াছিলাম, তাহার কারণ এই ছিল যে, আমরা তখন যে নীল ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহা বিশুদ্ধ নীল ছিল না, তাহাতে লালের অংশ কিছু ছিল। সুতরাং সেই লালের আভা দেখিয়া আমরা ভ্রমে পড়িয়াছিলাম। পণ্ডিতেরা এইরূপ অনেক শেষে স্থির করিয়াছেন যে, আমরা সচরাচর যাহা ভাবি তাহা নয়। বাস্তবিক লাল এবং ভায়োলেটই মূল রঙ।

(Deschanel's Natural Philosophy নামক গ্রন্থের বর্ণ বিষয়ক পরিচ্ছেদে ইহার সবিস্তর বর্ণনা আছে।)

পূজার ছুটির আমোদ

বিদেশী পাচক অনেকেই পূজার ছুটিতে বাড়ি চলিলেন। এই ছুটিতে অনেকেই অনেক প্রকারের আমোদ করিবেন। নূতন রকমের আমোদ দেখিবার জন্য সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করে। একখানি ইংরাজি বই পড়িয়া যেসব নূতন আমোদের কথা এবারে শিখিয়াছি, তাহার কিছু কিছু সংক্ষেপে লিখিতেছি, একবার নিজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

ঘরের মাঝামাঝি একটা পর্দা টাঙাইয়া তাহার একপাশে আলো রাখিয়া তাহাতে আপনারা থাকিবেন। অপর পার্শ্ব অন্ধকার করিয়া তাহাতে কতকগুলি দর্শক ডাকিয়া বসাইবেন। এখন আপনারা আলো এবং পর্দার মাঝখানে দাঁড়াইয়া যেরূপ অঙ্গভঙ্গি করিবেন, পর্দায় তাহার যে ছায়া পড়িবে, তাহাতে তার চেয়ে ঐ সকল অঙ্গভঙ্গি আরো সুন্দর দেখাইবে।

খুব সরু সূতার দ্বারা একটা পুতুল টাঙাইয়া তাহার পেছনে যতগুলি আলো ধরা যায়,

পর্দায় ঐ পুতুলের ততগুলি ছায়া আসিয়া পড়িবে। এখন এক একটি আলোকে ইচ্ছামতো নাচাইতে থাকুন, পর্দার ছবিও ঐরূপ নাচিবে। দুই-তিনজন লোক হইলে ইহাতে বেশ আমোদ পাইতে পারেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকে যদি দুহাতে দুটা আলো ধরিতে পারেন তাহা হইলে উত্তম হয়।

আলোটা একটা টেবিলের উপরে রাখিয়া তাহারা সামনে হাত ধরিলে পর্দায় ঐ হাতের ছায়া পড়িবে। এখন বুদ্ধি খাটাইতে পারিলে হাতটিকে কি হাত দুটিকে এরূপভাবে রাখা যাইতে পারে যে, পর্দায় যে ছায়াটা পড়িবে, তাহাকে একটা না একটা জানোয়ারের মতন দেখাইবে। হাত কিরূপভাবে রাখিলে কোন জানোয়ার হইবে, তাহা মুখে বলা তত সহজ নহে। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক যদি একবার ছবিগুলির দিকে তাকান, তাহা হইলে আমার লেখার অপেক্ষা অনেক বেশি পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন। জানোয়ারগুলি অবিকল হইল না। কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহা দেখিয়াই দর্শকেরা বেশ সন্তুষ্ট হইবেন।

বেলুন ঃ ১

তোমাদের অনেকেই বেলুন দেখিয়াছ। আসল বেলুন না দেখিয়া থাকাই সম্ভব, কিন্তু বেলুনের নকল সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। বেলুনে চড়িয়া মানুষ আকাশে উঠে এ কথাও অনেকে শুনিয়া থাকিবে। অনেক সময় হয়তো তোমরা কেহ কেহ ভাবিয়াছ যে, ওরূপ একটা বেলুনে চড়িতে পারিলে না জানি কি মজাই হয়! তোমাদিগকে বেলুনে চড়াই, আমার তেমন সাধ্য নাই, কিন্তু যাহাতে তোমরা চারি-পাঁচ দিন স্বপ্নে পড়িয়া বেলুনে চড়িতে পার আজ একটা পুস্তক হইতে তাহারই কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করা যাইতেছে।

ইউরোপে জোজেফ্ মন্ট গল্‌ফিয়র এবং ষ্টীভ্‌ন মন্ট গল্‌ফিয়র নামে দুই ভাই থাকিতেন, তাঁহারাই প্রথমে বেলুন উড়াইতে শিখেন। তাঁহারা দেখিলেন যে ধোঁয়া উর্দ্ধে উঠে। ইহাতে তাঁহার মনে করিলেন যে, ধোঁয়াকে যদি খুব হালকা একটা থলের ভিতর পুরিয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ থলেটাও ধোঁয়ার সঙ্গে উর্দ্ধে উঠিবে। এই মনে করিয়া তাঁহার একটা কাপড়ের থলে প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাকে একটু উচ্চ স্থানে রাখিয়া তাহার নীচে আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। কিছুকাল পরেই বেলুনটা উঠিতে লাগিল এবং প্রায় দেড় মাইল দূরে গিয়া মাটিতে পড়িল।

মন্ট গল্‌ফিয়রদের এই অদ্ভুত কীর্তির বিবরণ লোকে শুনিয়া হাঁ করিয়া থাকিতে লাগিল— অনেকে বিশ্বাস করিল না। প্যারিস নগরে মসু চার্লস্ নামে একজন লোক থাকিতেন, তিনি কিন্তু এরূপ করিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, শুধু ধোঁয়ার মধ্যে এমন কিছু থাকিতে পারে না যে, তাহাতে বেলুনটাকে ঠেলিয়া আকশে তুলিতে পারে। ধোঁয়াটা যতক্ষণ খুব গরম, ততক্ষণ সেটা বাতাসের চাইতে অনেক হালকা থাকে। হালকা থাকে বলিয়াই বেলুনটাকে ঠেলিয়া তুলিতে পারে। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বাতাসের চাইতে হালকা অন্য কোনো জিনিস দিলেও ঐরূপ হইবে। তিনি কাপড়ের একটা বেলুন প্রস্তুত করিলেন। বেলুনের ভিতর হইতে বাতাস যেন পলাইতে না পারে, এইজন্য তাহাতে বেশ করিয়া ভালো আঠা মাখাইয়া দিলেন। এই বেলুনের ভিতর জলযান বায়ু পুরিয়া তাহাকে শূন্যে উড়াইবেন সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি প্যারিস নগরে বিজ্ঞাপন দিলেন যে, '২৭-এ অগাস্ট

(১৭৮৩) আমি একটা প্রকাণ্ড গোলাকার জিনিস শূন্যে ছাড়িয়া দিব; আর সে আপনা আপনি ঊর্দ্ধে চলিয়া যাইবে।' যে স্থান হইতে উড়াইবার কথা হইল, ২৭-এ অগাস্ট সেখানে লোকে লোকারণ্য। যাহারা সেখানে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই চার্লস্ সাহেবের কথায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিল। তাহারা মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল যে পক্ষী ফড়িং ছাড়া আর কোনো জিনিস আপনা হইতেই ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। চার্লস সাহেবের গোলাকার জিনিসটা যখন উঠিতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে, তখন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম উপদেশ প্রদানের যুক্তিও স্থির করিয়া আসিয়াছিল। নিরূপিত সময়ের একটু পূর্বেই অনেকে অধৈর্য প্রকাশ করিতে লাগিল। যখন ছাড়িবার সময় হইল তখন যে দড়ি দ্বারা বেলুন বাঁধা ছিল তাহা খুলিয়া দেওয়া হইল; আর দেখিতে দেখিতে সেই প্রকাণ্ড জিনিসটা তিন হাজার ফিটেরও বেশি ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। দর্শকগণের মনে তখন কিরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ফ্রান্স দেশের একটি ছোট গ্রামে বেলুনটি পড়িল। সেখানকার লোকেরা মনে করিল, এটা না জানি একটা কি? উচ্চ হইতে নীচে পড়িবার সময় সকল জিনিসই লাফায়; বেলুনটাও সেইরূপ লাফাইতে লাগিল। শহরে যে বেলুন উড়ান হইয়াছে, এ গ্রামের অধিবাসীগণ তাহা জানিত না; সুতরাং এ সব দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে এ জানোয়ারটা একটা মস্ত পাখি বৈ আর কিছুই নহে। চারিধারে গণ্ডী করিয়া লোকের সার দাঁড়াইয়াছে; বুকের ভিতর একটু-একটু গুর্‌গুর্ করিতেছে। ইচ্ছা আছে জানোয়ারটাকে দুই-একটা খোঁচা দিয়ে তামাশা দেখে, কিন্তু সাহস হইতেছে না—পাছে ঠোক্‌রায়! শেষে কয়েকজন সাহসী লোক অনেক কষ্টে কোমর বাঁধিয়া অনেক বার অগ্রসর এবং অনেকবার পশ্চাৎপদ হইয়া অল্পে অল্পে তাহার কাছে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে যে খুব সাহসী সে খোঁচা দিবার উপযোগী একটা যন্ত্র হাতে লইয়া অগ্রসর হইল। একবার এদিক একবার ওদিক হইতে সেই যোদ্ধা বিস্তর সংগ্রাম কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। শেষে সাহসে নির্ভর করিয়া প্রাণপণে জানোয়ারের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিল; অমনি সেটা ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিতে লাগিল, আর যে দুর্গন্ধ— গ্রামবাসীরা রণে ভঙ্গ দিল। কিছুকাল পরে জানোয়ারটা যেন খুব শুটকাইয়া গেল; তখন তাহারা মনে করিল যে এবারে আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছে। অবিলম্বে জানোয়ারটাকে বন্দী করত গ্রামবাসী ভট্টাচার্য মহাশয়দের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহারা দেখিয়া বলিলেন, 'ইহা এতাবৎকাল অপরিজ্ঞাত জন্তু বিশেষের চর্ম।

প্রথমবারেই এইরূপ সুন্দর ফল লাভ করিয়া চার্লস সাহেবের সাহস বাড়িল। তিনি আর একটা বেলুন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্বক আকাশে উঠিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

বেলুন

বাতাসের চাইতে হালকা জিনিস ভিতরে পূরিয়া দেওয়াতেই বেলুন উপরে উঠে, এই কথা তোমরা পূর্বেই শিখিয়াছ। এখন তোমাদিগকে আরো কতগুলি কথা বলিব।

মনে কর অনেক দূর উঠিয়া বেলুন আর উঠিতে চাহিতেছে না। তখন যদি তোমার আরো উঠিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কি করিবে? তাহার সংকেত বলি, শুন। বেলুনে চড়িবার পূর্বে কয়েক বস্তা বালি বেলুনে তুলিয়া দিতে হয়। বেলুন যখন আর উঠে না, তখন

এর একটি বস্তা খুলিয়া কিঞ্চিৎ বালি ফেলিয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই বেলুন একটু হালকা হইল, এখন আর কিছু নিরাপদে উঠিবে। এইরূপে যখন বালির বস্তা ফুরাইয়া যাইবে, তখন তোমার নামিয়া আসার জোগাড় দেখাই ভালো। অনেক সময় কোনো সমুদ্রের উপর আসিয়া বেলুন পড়িয়া যাইবার জোগাড় করে। সমুদ্রে পড়িলে কি হয়, তা তো জানই; সুতরাং তখন বাধ্য হইয়া উপরের লিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কখন কখন আবার ইহাতেও কুলায় না, তখন একটি দুইটি করিয়া সঙ্গের জিনিসপত্র পর্যন্ত ফেলিয়া দিতে হয়। তাহাতেও যদি না কুলাইল তবেই বিপদ।

আচ্ছা, মনে কর এমন হইল যে বেলুন এত উপরে উঠিয়াছে যে তুমি তাহাতে সুবিধা মনে কর না;তখন যদি আর উঠিতে ইচ্ছা না হয়, কিম্বা যদি নামিয়া আসিতে ইচ্ছা হয়;তখন কি করিবে? তখনকার জন্য দুই প্রকারের ব্যবস্থা আছে। প্রথম—বেলুনের গায়ে একটি ছিদ্র করিয়া দিতে পারিলেই ভিতরের হালকা জিনিসটা বাহির হইয়া যাইবে, তখন বেলুনটিকে বাধ্য হইয়া নামিতে হইবে। অনেক সময় বেলুনটিকে উপরে রাখিয়াই নিজে নামিবার জোগাড় করিতে হয়। তাহার জন্য দ্বিতীয় উপায়টি উত্তম।

দ্বিতীয় উপায়—কাপড়ের একটা মস্ত ছাতা কর। ছাতাটা শুধু কাপড়ের হইবে, তাহাতে শিক বাঁট দিতে হইবে না। ছাতার মাঝখানটায় একটা গোল ছিদ্র রাখ—ছিদ্রটা যেন খুব বড় হয়। তারপর ছাতার চারিধারে লম্বা দড়ি বাঁধিয়া সমস্তগুলি দড়ির মাথা একত্র করিয়া বাঁধ। যেখানে দড়ির মাথাগুলি বাঁধিয়াছ, সুবিধা হইলে সেখানে বসিবার কোনোরূপ উপায় কর। এই যন্ত্রটিও বেলুনে তুলিয়া লইতে হয়। নামিতে ইচ্ছা হইলে যেখানে বসিবার উপায় করিলে, সেই স্থানটা অবলম্বন করিয়া বেলুনের সহিত ছাতার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হয়। বাতাসে ছাতাটা আপনা আপনি ফুলিয়া উঠে। তখন ধুপ্ করিয়া পড়িয়া যাইবার আশংকা থাকে না।

ছাতার মাঝখানে ঐ ছিদ্রটি না থাকিলে ছাতা ভয়ানক দুলিত, ও তোমার পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হইত। ঐ ছিদ্রটি থাকাতে দেখা গিয়াছে যে, ঐরূপ দুলিবার কোনো ভয় থাকে না। (বল দেখি কেন এরূপ হয়?)

অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, লোকে কেবলমাত্র আমোদের জন্যই বেলুনে উঠে। অনেকে আমোদের জন্য বেলুনে উঠে বটে, কিন্তু তাছাড়া বেলুনে উঠাতে অনেক উপকার হয়। ইংরিজি বইতে একটি ছবি দেখিলাম। ঐ ছবিতে যে দুইজন লোক বসিয়া আছেন, তাঁহাদের একজন গ্লেশার আর একজন কক্সওয়েল সাহেব। ইঁহারা ইংলণ্ডের দুইজন বৈজ্ঞানিক। পৃথিবী হইতে কত ঊর্দ্ধে বাতাসের অবস্থা কিরূপ, জানিবার জন্য ইঁহারা বেলুনে চড়িয়াছেন। গ্লেশার সাহেবের সম্মুখে বাতাস পরীক্ষা করিবার উপযোগী যন্ত্রগুলি সাজানো রহিয়াছে। একটি যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায় যে 'এত' ঊর্দ্ধে উঠা হইয়াছে। অন্য একটি যন্ত্র বলিয়া দিতেছে যে সেখানকার বাতাসে 'এত' জলীয়বাষ্প আছে। আর একটি বলিতেছে যে সেখানকার বাতাস 'এত' গরম ইত্যাদি।

আমরা একস্থানে বলিয়াছি যে, 'বেলুন এত উপরে উঠিয়াছে যে তুমি তাহা সুবিধা মনে কর না।' ইহার অর্থ হয়তো অনেকেরই বুঝিতে একটু গোল হইয়াছে, সুতরাং অত্যন্ত উচ্চে উঠিলে যে অসুবিধা হয়, তাহার দু-একটি উল্লেখ করা যাইতেছে। কিছু উপরে উঠিলেই

দেখিবে শ্বাস ফেলিতে একটু কষ্ট হয়—বাতাস যেন কমিয়া গিয়াছে। এই অসুবিধাটা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। এর চাইতে আরো উপরে উঠিলে দেখিবে তোমার গায়ের চামড়া ফাটিয়া যাইতেছে। আরো উপরে উঠিলে তোমার নাকের লোমকূপগুলি দিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত বাহির হইবে। তাই বলিতেছিলাম অধিক উপরে উঠিলে অসুবিধা হইবে।

একটা গল্প বলিয়া শেষ করিতেছি। নেডার নামক এক সাহেব খুব জোগাড়যন্ত্র করিয়া একটা প্রকাণ্ড বেলুন প্রস্তুত করিলেন। তাহার ভিতরে কত কিছু ব্যাপারেরই আয়োজন হইল; সাহেব মনে করিলেন গরু হারাইলে ইহার ভিতর তাহাও পাওয়া যাইবে। সকলে শশব্যস্ত হইয়া তামাশা দেখিতে আসিল; মনে করিল, 'এটা যখন শূন্যে উঠিবে তখন না জানি একটা কি ব্যাপারই হয়।' 'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া', বেলুনটা কত দূর উঠিয়াই পড়িয়া গেল। যাহারা তামাশা দেখিতে গিয়াছিল তাহারা বাড়ি আসিয়া হাসিতে লাগিল।

বেলুন ঃ ৩

মার্চ মাসের সখায় বেলুনের একটা ছবি ছিল, তাহাতে একটা নঙ্গর আঁকা ছিল। কেহ কেহ আমাদিগকে প্রশ্ন করিয়াছেন, 'ঐ নঙ্গরটা ওখানে কেন আসিল?'

নঙ্গরটা ওখানে নঙ্গরের কার্য করিতেই আসিয়াছে। নৌকার নঙ্গর জলে ফেলিলে নৌকা যেমন আর চলিতে পারে না, বেলুনের নঙ্গরও সেইরূপ। অনেক সময় বাতাসে ঠেলিয়া বেলুনটাকে এমন স্থানে লইয়া যাইতে চাহে যে বেলুনের আরোহী তাহা পছন্দ করেন না। তখন ঐ নঙ্গর নীচে নামাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করিয়া যদি নঙ্গরটাকে নিম্নস্থ কোনো গাছ বা অন্য কিছুতে আটকাইয়া দেওয়া যায় তবেই বেলুন আর চলিয়া যাইতে পারে না।

সম্প্রতি প্যারিস নগরে একপ্রকার বেলুন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে জাহাজের ন্যায় যেখানে ইচ্ছা সেইখানে চালাইয়া নেওয়া যায়। এই বেলুনের আকৃতি ময়রার দোকানে যে চম্‌চম্ বিক্রি হয় তাহার ন্যায়। চম্‌চম্‌টাকে থালের উপরে যেভাবে কাত করিয়া রাখে এই বেলুনও শূন্যে ঠিক সেইভাবে থাকে। বাতাসের ভিতর দিয়া চলিবার সময় যাহাতে বিশেষ বাধা না পায় তাহার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে। এই চম্‌চমের এক মাথায় একটি হাল। আরোহীদের বসিবার দোলা চমচমের গায়ে ঝুলিতেছে। এই দোলায় বেলুন চালাইবার কল। কলটি তড়িতের বলে চলে। এই বেলুন চালাইতে তিনটি লোকের আবশ্যক। একজন হাল ধরে; আর একজন কল চালায়; আর একজন বালির বস্তাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখে—অর্থাৎ বেলুন নামিয়া পড়িতে চাহিলে বালির বস্তা খালি করিয়া তাহাকে হালকা করে।

নানা প্রসঙ্গ ঃ ১

একটি ছোট দীপের নীচে একটি বড় দীপ ধর। ছোট দীপটি নিবিয়া যাইতে চাহিবে কেন, জান? দীপ জ্বালাতে অঙ্গারাম্ল নামক একপ্রকার বায়ু জন্মে। সেই বায়ু প্রদীপের শিখায় মুখ হইতে বেগে ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়। বাতাসে অম্লজান নামক বায়ু আছে, তাহা আছে বলিয়াই

আগুন জ্বলিতে পারে। বড় দীপটি ছোট দীপের নীচে ধরিলে, তাহা হইতে অঙ্গারাম্ল বায়ু উঠিয়া ছোট দীপটিকে ঘিরিয়া ফেলে, আর বাতাসের অম্লজান আসিয়া তাহাকে জ্বালাইতে পারে না। কাজেই সে নিবিয়া যায়।

ছোট দীপটি নিবিয়া যাওয়ামাত্রই তাহার জ্বলন্ত পলিতাটি আনিয়া বড় দীপের নীচে (খুব কাছে, কিন্তু একটু ব্যবধান রাখিয়া) ধর; যেন ছোট দীপের পলিতা হইতে যে ধূম এখনোও বাহির হইতেছে তাহা বড় দীপটায় লাগিতে পারে। এখন দেখিবে বড় দীপ হইতে একটু আগুন নামিয়া আসিয়া ছোট দীপটিকে পুনরায় জ্বালাইয়া দিবে। ইহাতে এই বুঝা যায় যে পলিতা হইতে যে ধোঁয়া গিয়া বড় দীপটার গায়ে লাগিয়াছিল, তাহাতে এমন কিছু জিনিস ছিল যাহা জ্বলে। এই জিনিসটা পলিতার ভিতর হইতেই বাহির হইতেছিল; অত্যন্ত গরম লাগিলেই জিনিসটা বাহির হয়। এই জিনিসটা শূন্যে উঠিয়া যাইবার সময় জ্বলে, আর তাহাকে আমরা দীপের শিখা বলি। গরমে এই জিনিসটা বাহির হইয়া গেলে অনেক সময় আর কতগুলি জিনিস পড়িয়া থাকে, তাহাকে আমরা অঙ্গার, ভস্ম ইত্যাদি নাম দিই।

কাঠের কয়লা জ্বালাইলে তাহা হইতে শিখা বাহির হয় না, পাথর কয়লা জ্বালাইলে তাহা হইতে শিখা বাহির হয়। যে জিনিসটা জ্বলিয়া শিখা হয়, কাঠ জ্বলিবার সময়ই সেই জিনিসটা ফুরাইয়া গিয়াছে—তারপর কয়লা পাইয়াছ। কাজেই কাঠের কয়লায় সেই জিনিসটা নাই, আর তাহা জ্বালবার সময় শিখাও দেখা যায় না। পাথর কয়লায় কিন্তু সেই জিনিসটা আছে, সুতরাং পাথর কয়লা জ্বলিবার সময় শিখা দেখা যায়। পাথর কয়লার এই পদার্থটা কৌশলক্রমে বাহির করিয়া তাহা দ্বারা কলিকাতার রাস্তায় রাত্রিকালে আলো দেওয়া হয়। তাহাকে তোমরা গ্যাসের আলো বল। পাথর কয়লা হইতে গ্যাস বাহির করিয়া ফেলিলে যাহা থাকে, তাহার নাম কোক্ কয়লা। কোক্ কয়লা হইতে পাথর কয়লার ন্যায় শিখা বাহির হয় না। তাহার কারণ এই যে, যে জিনিসটা জ্বলিয়া শিখা হয়, তাহার অধিকাংশ অগ্রেই বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

দুই পয়সা দিয়া সাহেবদের তামাক খাইবার একটা চীনা মাটির পাইপ ক্রয় কর। তাহার বাটিটির ভিতরে একখণ্ড পাথর কয়লা পুরিয়া বাটিব মুখ অতি উত্তমরূপে শিব গড়িবার মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দেও। এখন সেই কয়লা-পূর্ণ পাইপের মাথাটি আগুনে ফেলিয়া দেও, নলটি যেন আগুন হইতে বাহির হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে ঐ নলের মুখে আগুন দিলে সুন্দর গ্যাসের আলো জ্বলিবে।

এইগুলি তোমরা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। কেবল আমরা বলিতেছি বলিয়া ভালোমানুষের মতো মানিয়া লইবার কোনো প্রয়োজন নাই। ছোট দীপ আর বড় দীপের পরীক্ষাটি করিবার সময় দেখিবে যেন ছোট দীপটা বড় দীপ অপেক্ষা অনেক ছোট হয়, আর দীপগুলি যেন না কাঁপে।

২

অনেকদিন হইল একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক আয়র্ল্যাণ্ড দেশ দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি ছেলে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া নানাস্থানে লইয়া গিয়াছিল। বাড়ি আসিয়া সাহেব ঐ ছেলেটিকে কিছু পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিলেন। সাহেব মদ খাইতে ভালোবাসিতেন সুতরাং পকেট হইতে একটি বোতল বাহির করিয়া তাহাকে কিছু মদ খাইতে দিলেন, ছেলেটি

মদ খাইতে চাহিল না। সাহেব তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন তোমাকে আট আনা দিব, তুমি খাও। সে খাইতে অস্বীকার করিল। তারপর সাহেব এক বোতল বাহির করিয়া তাহাকে কিছু মদ খাইতে দিলেন, ছেলেটি মদ খাইতে রাজি হইল না। সে অতি গরিব ছেলে, তাহার গায়ের জামা ছেঁড়া ছিল, কিন্তু সে এত প্রলোভনেও বিচলিত না হইয়া পকেট হইতে একটি মেডেল বাহির করিল, সেটি মদ্যপান নিবারণী সভার মেডেল। সেই মেডেলটি সাহেবকে দেখাইয়া বলিল, 'আমি মদ খাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আপনার যত টাকা আছে তাহা সমস্ত দিলেও আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না।' এই ছেলেটির বাপ অত্যন্ত মদ খাইতেন, শেষে মদ্যপাননিবারণী সভার যত্নে তিনি মদ খাওয়া ছাড়িয়া ভালো লোক হইয়াছিলেন। মরিবার সময় এই মেডেলটি তিনি ছেলেকে দিয়া গিয়াছিলেন। বালকের কথা শুনিয়া সাহেব মদের বোতল নিকটবর্তী একটা পুকুরে ফেলিয়া দিলেন, এবং 'নিজে আব কখনও মদ খাইব না' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, যাহাতে অন্যেরাও মদ না খায় সেই চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

নানা প্রসঙ্গ ঃ ২

১

দুষ্কর্মের প্রতিফল

এক-একটা জানোয়ারের এক-এক প্রকার দুর্বলতা থাকে। একজন লোক শুনিল যে গায়ের পিরাণ খুলিয়া ফেলিবার মতন করিয়া পা উলটাইয়া মাথার উপর পর্যন্ত আনিয়া, তারপর মাথা নোয়াইয়া পেছনের দিকে হাঁটিয়া কুকুরের কাছে গেলে বড় ভয়ানক কুকুরটাও ভয় পায়। এই ব্যক্তির প্রতিবেশীর একটি সুন্দর ফলের বাগান ছিল। প্রতিবেশী অতিশয় কৃপণ স্বভাব ছিল। তাহার বাগানের দরজায় আবার একপ্রকাণ্ড কুকুর বাঁধা থাকিত। সুতরাং ফলগুলি দেখিয়া তাহার ক্ষুধাই বাড়িত, কিন্তু তাহাব নিবৃত্তি হইবার কোনো আশা ছিল না। সে কুকুর সম্বন্ধে এই কথা শুনিয়াই ভাবিল যে এইবার প্রতিবেশীর ফলের বাগানে যাইতে হইবে। যাহা ভাবিল, কাজেও তাহা করিল। আস্তে আস্তে কুকুরের দিকে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল। বুঝি কুকুর পলাইয়াছে— বুঝি এইবার বাগানের ভিতর আসিয়াছি। কুকুর কিন্তু ভয় পায় নাই, তাহার গলায় বাঁধা শিকলটা লম্বা ছিল না বলিয়া সে এতক্ষণ চুপ মারিয়াছিল। উলটোদিকে হাঁটিতে হাঁটিতে যেই লোকটি তাহার কাছে আসিয়াছে, অমনি সে তাহার পাছা হইতে একবারের জলযোগের মতন এক টুকরা মাংস কামড়াইয়া লইল।

অন্যায় কাজ করিতে গেলে তাহারই শাস্তি পাওয়া যায়।

২

আশ্চর্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

একজন স্পানিয়ার্ড আফ্রিকা দেশে পাখি মারিতে গিয়াছিল। পাখি শিকার করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পথে একটা সিংহ আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। পশুরাজের মুখভঙ্গি দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে কেবলমাত্র কুশল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার আগমন

হয় নাই। তাহার বন্দুক পাখি মারিবার জন্য প্রস্তুত করা ছিল। ইহা ভিন্ন আর গুলি বারুদ তাহার সঙ্গে ছিল না। গুলি করিলে সিংহ মরিবে না, কেবলমাত্র বিপদ বাড়িবে। সুতরাং সে অন্য উপায়ে রক্ষা পাইবার পথ দেখিতে লাগিল। তাহার মাথার টুপিতে অনেকগুলি উটপক্ষীর পালক বাঁধা ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে টুপি মুখে করিয়া লইল। পালকগুলি কেশরের মতন হইয়া তাহার বুক মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে চক্ষু দুটি মিট্ মিট্ করিতে লাগিল। এইরূপ চেহারা করিয়া সে হামাগুড়ি দিয়া সিংহের দিকে যাইতে লাগিল। সিংহ ভাবিল যে এরূপ জানোয়ার তো সে কোনোদিন খাইতে যায় নাই—তবে-বা এটাই তাহাকে খাইতে আসিল। সুতরাং এরূপ কিম্ভুতকিমাকারের সামনে অধিকক্ষণ থাকা নিতান্তই আশংকাজনক মনে করিয়া, সে ইহাপেক্ষা নিরাপদ স্থানে যাইবার পন্থা দেখিল।

একজন লোক নানাপ্রকার শব্দ ও বিদ্‌ঘুটে মুখভঙ্গি করিতে পারিত। এই লোকটাকে একবার সিংহে তাড়া করিল। সে বেচারা প্রাণপণে দৌড়িয়াও দেখিল যে আর বাঁচিবার আশা নাই এবারে নিশ্চয়ই সিংহ তাহাকে ধরিবে। এমন সময় সে হঠাৎ থামিল। থামিয়াই সিংহের দিকে তাকাইল — আমরা যেরকম করিয়া একে অন্যের পানে তাকাই সেরূপ করিয়া তাকাইল না, সিংহের দিকে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া মাথা নোঙাইয়া দুই ঠ্যাঙের মধ্যস্থ ফাঁক দিয়া তাকাইল, আর তখন মুখের এমনি একখানা চেহারা করিল যে তেমন চেহারা আর সে কখনো করে নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই ভয়ানক শব্দগুলির ভিতর হইতে বাছিয়া, যে শব্দটি সকলের চাইতে অস্বাভাবিক, সেই শব্দটি করিল। সিংহ থামিল এবং একটু চিন্তান্বিত হইল, আর এক মুখ বিকৃতি, আর-এক চীৎকার—সিংহ ভয় পাইল এবং ফিরিল। আর-এক চীৎকার—সিংহ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল।

হঠাৎ কোনোস্থানে বিপদে পড়িলে ভয়ে জড়সড় না হইয়া বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় ভাবা উচিত।

৩
অভিমানী রাজপুত্র

রুশিয়ার যুবরাজের পুত্র সকালে উঠিয়া মুখ ধুইতে চাহিতেন না। এক-দিন তাঁহার মাস্টার আসিয়া নালিশ করিল, 'ছোট-কর্তা মুখ ধুইতেছেন না।'

যুবরাজ বলিলেন, 'বটে? আচ্ছা দেখা যাবে, এরপর সে কেমন করিয়া মুখ না ধুইয়া থাকে।'

রাজপরিবারের ছেলে বুড়ো সকলকেই পাহারাওয়ালারা সেলাম করিবে, এরূপ নিয়ম। পরদিন চারি বৎসরের শিশু-কর্তাটি মাস্টারের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলেন। একজন পাহারাওয়ালার কাছ দিয়া তাঁহারা গেলেন, সে তাল-গাছপানা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সেলাম করিল না।

যুবরাজের ছেলেকে সকলেই সেলাম করিয়া থাকে, সুতরাং তিনি ইহাতে একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। একটু পরেই তাঁহারা আর একজন পাহারাওয়ালার নিকট দিয়া গেলেন। এই ব্যক্তিও কোনোরূপ সম্মান প্রদর্শন করিল না। যুবরাজনন্দন অত্যন্ত চটিয়া মাস্টারকে বলিলেন। এইরূপ বেড়াইবার সময় অনেক সিপাহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, কেহই

তাঁহাকে সেলাম করিল না। তিনি দৌড়িয়া যুবরাজের কাছে গিয়া বলিলেন—

'বাবা! বাবা! তোমার বরকন্দাজগুলিকে চাবুক মার। আমি যাইবার সময় এরা আমাকে সেলাম করিতে চাহে না।'

যুবরাজ বলিলেন, 'বাছা, তাহারা ভালোই করে। পরিষ্কার সিপাহীরা কখনো অপরিষ্কার ছোট-কর্তাকে সেলাম করে না।' এর পর হইতে যুবরাজ নন্দন প্রত্যহ প্রাতে স্নান করিতেন।

যুবরাজপুত্রের অভিমানই তাহার কু-স্বভাব সংশোধন করাইল।

নানা প্রসঙ্গ ঃ ৩
সাহসী বালক

একদিন আমরা স্কুলে যাইতেছি এমন সময় দেখিলাম আমাদের সহপাঠী একটি বালক নিকটস্থ মাঠের দিকে একটা গোরু লইয়া যাইতেছে। পথে একদল ছেলের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। ঐ দলের জ—ঠাট্টার বিষয় পাইলে কখনও ছাড়িত না। জ—বলিয়া উঠিল, 'কিহে! দুধের দাম কত? বলি উ—তুমি কোন ঘাস খাও? গোরুর শিঙ্গে যে সোনাটুকু আছে তাহার দাম কত? ওহে, তোমরা দেখ! যদি নূতন ফ্যাশন্ দেখিত চাও তবে এই জুতা জোড়াটার পানে তাকাও।'

উ— একটু হাসিয়া আমাদিগকে নমস্কার করিল, তারপর মাঠের চারিধারে যে বেড়া ছিল তাহার দরজা খুলিয়া গোরুটিকে ভিতরে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই স্কুলে আসিল। বিকালে স্কুলের ছুটির পর গোরুটিকে বাহির করিয়া লইয়া গেল, কোথায় নিল আমরা কেহই জানিতে পারিলাম না। দুই-তিন সপ্তাহ ধরিয়া সে রোজই এই কাজ করিতে লাগিল।

এই স্কুলের ছেলেরা প্রায়ই ধনীর সন্তান। ইহাদের কতকগুলি আবার এমন মূর্খ ছিল যে, গোরু মাঠে লইয়া গিয়াছিল-বলিয়া উ-কে ঘৃণা করিত।

ইহারা উ-র মনে কষ্ট দিবার জন্য নানারকম বিশ্রী কথা বলিত। উ-তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া সে-সকল সহ্য করিত। একদিন জ-বলিল, 'কিহে উ—তোমার বাবা কি তোমাকে গোয়ালা করিতে চাহিতেছেন নাকি?'

উ—বলিল, 'ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি কিছু নয়, তবে দেখো যেন কেঁড়ে ধুইয়া তাহাতে খুব বেশি জল রাখিয়া দিও না।'

সকলে হাসিল। উ—কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া উত্তর করিল, 'তার কোন ভয় নাই। আমি যদি কোনোদিন গোয়ালা হই, তবে খাঁটি ওজনে খাঁটি দুধ দিব।'

এই কথাবার্তার পরদিন স্কুলের পরীক্ষার প্রাইজ দেওয়া হইল। তাহাতে নিকটবর্তী স্থান সকলের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের অধ্যক্ষ প্রাইজ দিলেন। উ— আর জ— উভয়েই খুব ভালো নম্বর পাইয়াছে, পড়াশুনায় তাহারা সমকক্ষ। পুরস্কার বিতরণ শেষ হইলে অধ্যক্ষ বলিলেন যে আর একটি পুরস্কার আছে, সেটি একটি সোনার মেডেল। এই পুরস্কারটি সচরাচর দেওয়া হয় না। ইহাতে অনেক টাকা লাগে বলিয়া যে দেওয়া হয় না

তাহা নহে, পুরস্কারের উপযুক্ত ছেলে পাওয়া যায় না বলিয়াই দেওয়া হয় না। পুরস্কারটি সৎসাহসের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে। তিন বৎসর হইল প্রথম শ্রেণীর একটি ছেলে একটি গরিব বালিকাকে জল হইতে উঠাইয়া বাঁচাইয়াছিল, তাহাকে এই পুরস্কারটি দেওয়া হইয়াছিল।

অধ্যক্ষ তারপর উপস্থিত সকলের অনুমতি লইয়া একটি ছোট গল্প বলিলেন—

'অনেক দিনের কথা নয়, কতকগুলি বালক রাস্তায় ঘুড়ি উড়াইতেছে, এমন সময় একটি ছেলে ঘোড়ায় চড়িয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। ঘোড়াটা ভয় পাইয়া ছেলেটিকে ফেলিয়া দিল। তাহাতে সে এত আঘাত পাইল যে, কয়েক সপ্তাহ তাহাকে শয্যাগত থাকিতে হইল। যাহাদের জন্য এই বিপদ ঘটিল তাহারা কেহই আহত ছেলেটির সঙ্গে গেল না। কিন্তু একটি ছেলে দূর হইতে এই ঘটনা দেখিয়াছিল, সে যে কেবল আহত ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে গেল এমন নহে, শুশ্রূষা করিবার জন্য তাহার কাছে থাকিল।'

'এই ছেলেটি শীঘ্রই জানিতে পারিল যে আহত বালকটি একটি গরিব বিধবার নাতি। বিধার এক গোরু আছে, সেই গোরুর দুধ বিক্রি করিয়া সে সংসার চালায়। বিধবা বৃদ্ধ এবং খোঁড়া, এই নাতিটি ছাড়া, তাহার গোরু মাঠে নিয়া যায় এমন লোক নাই। সেই নাতিটি আঘাত পাইয়া এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে। বালক বলিল, 'আপনার কোন চিন্তা নাই আমি আপনার গোরু মাঠে লইয়া যাইব।'

'কিন্তু এইখানেই তাহার সৎকার্যের শেষ হইল না। ঔধধের জন্য টাকার আবশ্যক হইল। বালক বলিল, 'মা আমাকে বুট কিনিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন সম্প্রতি আমার বুট না কিনিলেও চলে।' বিধবাটি বলিল, 'তাহা হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের ঘরে একজোড়া জুতা আছে। আমার নাতির জন্য কিনিয়াছিলাম, সে পরিতে পারে না। তুমি যদি এইগুলি কিন, তাহা হইলেই বেশ হয়।' বালক সেই কুৎসিত জুতা জোড়া কিনিল এবং এখনো সে তাহা পরিতেছে।

'স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা দেখিল যে একজন ছাত্র একটা গোরু লইয়া যাইতেছে, সুতরাং তাহার উপরে হাসি এবং বিদ্রূপ বর্ষণ হইতে লাগিল: তাহার গোরুর চামড়ার জুতা দুইটার উপর তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু সে প্রফুল্ল চিত্তে বীরের ন্যায় সেই মোটা চামড়ার জুতা পরিয়া বিধবার গোরু চালাইতে লাগিল। অন্যেরা তাহাকে যে-সকল ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল, এই সরল বালক সে কথা ভাবিলও না। ভালো কাজ করিতেছে, ইহা মনে করিয়াই সে সন্তুষ্ট থাকিল। গোরু চালাইবার কারণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে সে চেষ্টা করে নাই, কারণ সৎকার্য করিয়া গর্ব করাটা তাহার ভালো লাগিত না। ঘটনাক্রমে তাহার শিক্ষক কাল এ-সকল কথা জানিতে পাবিয়াছেন।

'এখন আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই বালকের আচরণে কি আপনারা প্রকৃত বীরত্ব দেখিতে পান নাই? উ—বাবু তুমি ব্ল্যাক-বোর্ডের পেছনে পলাইও না। বিদ্রূপের সময় তুমি ভয় পাও নাই, প্রশংসারকালে ভয় পাইলে কেন?'

উ—নত মুখে জড়সড় হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল।

সেই কুৎসিত জুতা দুইটা এখন তাহার পায়ে কেমন শোভা পাইল। তাহার মাথায় মুকুট দিলেও হয়তো তেমন সাজিত না। মেডেল তাহাকে দেওয়া হইল, সকলে আনন্দে উচ্চ

করতালি দিতে লাগিল। অন্যান্য যে-সকল ছেলেরা উ—কে বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহারা এখন যারপরনাই লজ্জিত হইল, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহার সহিত বন্ধুতা করিতে আসিল।

নানাপ্রসঙ্গ ঃ ৪

তোমাকে কেহ যদি লাঠি দিয়া লইয়া মারিতে আইসে, তবে তুমি কি কব? দৌড়াইয়া পালাও। আততায়ীর হাত এড়াইবার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু অনেক জানোয়ার ইহা অপেক্ষা অন্যরূপ উপায় অবলম্বন করে।

অনেক জানোয়ার এইরূপ অবস্থায় পড়িলে মড়ার মতো হইয়া পড়িয়া থাকে। এইরূপে অনেক সময় বিপদ হইতে রক্ষা পায়।

পীউইট্ পাখির বাসার কাছে মানুষ গেলে পীউইট্ ভাব দেখায় যেন সে ভালো করিয়া উড়িতে পারে না। এরূপ পাখিকে ধরা সহজ মনে করিযা অনেকেই তাহার পিছনে যায়। এইরূপে পাখি তাহাকে ভুলাইয়া বাসা হইতে দূরে লইয়া যায়।

কেন্দ্রাইকে বিরক্ত করিলে সে শরীর গুটাইয়া গোলাকার হইয়া থাকে। ইহা হইতেই কেন্দ্রাই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হেঁয়ালিটি উৎপন্ন হইয়াছে—

'ছ'কুড়ি ছ'খানা পা,
রক্তবরণ গা,
টোকা দিলে টাকাটি হয়
তাকে তুই খা।'

উটপক্ষীকে কুকরেরা তাড়া করিলে যখন সে মনে করে যে আর ইহাদের হাত এড়ানো গেল না তখন মাথাটি বালির নীচে গুঁজিয়া রাখে। অবশ্য ইহাতে বিপবীত ফলই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু উটপক্ষী প্রথমে মনে করে যে বড়ই নিরাপদ হইয়াছে।

একপ্রকারের পোকা আছে তাহারা নিজের বাড়িঘর সঙ্গে লইয়া বেড়ায়। কোনোরূপ ভয় পাইলেই ঘরের ভিতর লুকাইয়া থাকে।

একপ্রকারের ফড়িং আছে, তাহারা পাখা দুটি একত্র করিলে দেখিতে ঠিক গাছের পাতার মতন হয়। তখন আর তাহাদিগকে সহজে চিনিতে পারা যায় না। এইরূপে তাহারা ফড়িং-খাদক পাখিদের হাত হইতে রক্ষা পায়।

গুগলিরা যখন নিতান্তই বেকায়দা দেখে, তখন তাহার মুখের কাছের দরজাটি বন্ধ করিয়া দেয়।

শম্বুকজাতীয় অনেকপ্রকার জলজীব আছে, তাহার যখন দেখে যে শত্রুর হাত হইতে বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই, তখন একপ্রকার কালো জিনিস পেটের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহাতে জলটা অনেক দূর পর্যন্ত এত কালো হইয়া যায় যে, আর তাহার ভিতর দিয়া কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অবসরে সে পলাইয়া কোনো নিরাপদ স্থানে যায়।

কচ্ছপগুলির কাণ্ড-কারখানা সকলেই দেখিয়াছ, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার আবশ্যক দেখি না। একপ্রকারের কচ্ছপ আবার শুধু গলাটি আর হাত-পাগুলি ভিতরে লইয়া গিয়াই সন্তুষ্ট হয় না। তাহার শরীরের আবরণটা কবাটের মতো হইয়া সেই হাত-

পাগুলিকে ঢাকিয়া রাখে।

শেয়ালগুলি যে কতবার মরিয়া থাকে তাহার আর কি বলিব। এ বিষয়ে শেয়ালের সঙ্গে আর কেহ পারিবে না।

বুনোরোহিতের আঁইস বলিয়া একপ্রকার আঁইস অনেক জায়গায় বিক্রয় হয়, অনেকে তাহাতে আংটি প্রস্তুত করিয়া হাতে দেয়। বাস্তবিকই জঙ্গলে কোনোরূপ রোহিত মাছ থাকে, বা ঐগুলি যে মাছেরই আঁইস, তোমরা এরূপ মনে করিও না। ঐ-সকল আঁইস একপ্রকার চতুষ্পদ জানোয়ারের। আমাদের দেশে এইরূপ জানোয়ার অতি অল্পই আছে, সুতরাং আমরা উহাদিগকে সচরাচর দেখিতে পাই না, দক্ষিণ আমেরিকায় এই জাতীয় অনেক জন্তু বাস করে। এইসকল জন্তুকে আর্মাডিলো বলা হয়। আর্মাডিলো অনেকপ্রকারের হইয়া থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক বাঁদর থাকে, তাহাদের জ্বালায় আর্মাডিলো বড় ব্যতিব্যস্ত হয়। বাঁদরগুলি তাহাদিগকে প্রথমে খোঁচায়। যদি তাহার গর্তে প্রবেশ করে তবে লেজ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া যারপরনাই বিড়ম্বনা করে। কেবলমাত্র এক জাতের আর্মাডিলোর নিকট বানরেরা কিঞ্চিৎ জব্দ থাকে। এই আর্মাডিলোর নাম বল্ আর্মাডিলো (Ball Armadillo)। বল্ আর্মাডিলো উপায়ান্তর না দেখিলে হাত-পা গুটাইয়া লেজ-মাথা গুঁজিয়া পা'গুলা সামনে টানিয়া লইয়া বেশ একটি নিরেট গোলাকার জিনিস হইয়া থাকে।

বাঁদরেরা আর তখন ধরিয়া টানিবার মতো কোনো জিনিস পায় না, সুতরাং অপ্রতিভ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে হয়।

নানাপ্রসঙ্গ ঃ ৫

১

একদিন বড় ঝড় হইতেছিল। দশ-বারোজন লোক একটা ঘরে আশ্রয় লইল। মেঘে আকাশ অন্ধকার হইয়াছে। এমন সময় একখানা কালো মেঘ ঘরের উপরে আসিয়া থামিল। মেঘখানা ভয়ানক কালো, দেখিলেই ভয় হয়। ইহা দেখিয়া একজন বলিল, 'মেঘটা অবশ্যই কিছু চায়, হয়তো আমাদের মধ্যে একজন মহাপাপী আছে, তাহার মাথায় বাজ ফেলিয়া মেঘটা তাহাকে মারিতে আসিয়াছে।' আর একজন বলিল, 'একজন দোষীকে মারিতে গিয়া তাহার সঙ্গে এতগুলি নির্দোষীকে বধ করিবে, বোধহয় এইজন্যই বাজ পড়িতে দেরি হইতেছে। কিন্তু দেরি আর কতক্ষণ হইবে, দোষী ব্যক্তি যদি শীঘ্র পৃথক হইয়া না যায় তবে আর সকলেও তাহার সঙ্গে মারা যাইবে।' আর-একজন বলিল, 'ইহা কখনই হইতে পারেনা, চল আমরা প্রত্যেকেই এক-একবার করিয়া বাহিরে যাই। যে দোষী সে বাহিরে গেলেই তার ঘাড়ে বাজ পড়িবে।' এই পরামর্শ বেশ সঙ্গত বোধ হইল তারপর এক-একজন করিয়া বাহিরে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে একজন ছাড়া আর সকলেই বাহিরে গিয়া আসিল, কিন্তু তাহাদের কাহারো মাথায় বাজ পড়িল না। শেষ, ব্যক্তির পালা যখন আসিল তখন সে আর কোনমতেই বাহিরে যাইতে চাহে না। অন্যান্যেরা মনে করিল, 'এই ব্যক্তিই দোষী, ইহাকে ঘর ছাড়িয়া যাইতে হইবে, নতুবা ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মারা পড়িব।'

এই ভাবিয়া সকলে ঠেলিয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিল, আর অমনি ঘরের উপর বাজ পড়িয়া তাহারা মরিয়া গেল। যাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিল সে বাঁচিল।

২

একটি ছোটছেলের বাপ-মা মরিয়া যাওয়াতে সে বড়ই দুঃখে পড়িল। সে মনে করিল যে এরূপ দুঃখ সহ্য করার চাইতে মরিয়া যাওয়াই ভালো। এই ভাবিয়া সে একটা গর্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। এমন সময়ে এক পুত্রহীন সওদাগর সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সে সেই ছেলেটিকে ঐরূপ গর্ত খুঁড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বালক উত্তর করিল, 'আমার মা নাই, বাপ নাই, আমার আর বাঁচিয়া ফল কি? আমি এই গর্তে পড়িয়া মরিব।' সওদাগরের বড় দয়া হইল, সে বলিল, 'তোমার মরিয়া কাজ নাই, তুমি আমার সঙ্গে এস, আমরাই তোমার বাপ-মা হইব।' বালক সওদাগরের সঙ্গে তাহার বাড়িতে গেল, সেখানে সে খুব যত্ন পাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে সওদাগরের এক ছেলে হইল। সওদাগর ও তাহার স্ত্রী এখন সেই দুঃখী ছেলেটিকে অত্যন্ত হিংসা করিতে লাগিল। তাহাদের হিংসা এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে তাহারা সেই ছেলেটিকে মারিয়া ফেলিবার জন্য একটা গভীর কূপ খুঁড়িয়া রাখিল— মনে করিল, 'একবার তো কূপে পড়িয়াই মরিতে গিয়াছিল, এবারে কূপ প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিলে অবশ্যই তাহাতে ঝাঁপিয়া মরিবে।' কিন্তু সেই দুঃখী সন্তান ইহার কোনো খবর পাইবার পূর্বেই সওদাগরের নিজের ছেলে সেই কূপ দেখিতে গেল এবং হঠাৎ তাহাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

গল্পগুলি সত্য না হউক ইহাদের ভিতর বেশ উপদেশ আছে। পরের মন্দ ভাবিও না। দেখ এই সকল লোক পরের অনিষ্ট করিতে গিয়া কি শাস্তিই পাইল।

মুদ্রাযন্ত্র

চীনেদের বড় বুদ্ধি। গ্রাম্য লোকদিগের অনেকে এখনো বিশ্বাস করে যে স্টীম-এঞ্জিন্, টেলিগ্রাফ্ ইত্যাদি বড়-বড় কলকারখানা সব চীনেদের তৈরি। বাস্তবিক চীনেদের সম্বন্ধে লোকের এরূপ বিশ্বাস হইবার কারণ আছে। পূর্বকালে যখন অন্যান্য দেশের লোকেরা এ-সব বিষয়ে কিছু জানিত না, তখন চীনেরা অনেকরকম কল ও সংকেত জানিত তখন যাহা কিছু আশ্চর্য হইত, প্রায় সবই চীনেরা প্রস্তুত করিত। এইরূপেই চীনেদের এরূপ নাম হইল।

যে ছাপাখানা দ্বারা পৃথিবীর এত উপকার হইয়াছে, তাহারও প্রথম মতলবটা চীনেদেরই মাথায় খেলিয়াছিল। গল্প আছে খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে চীন রাজমন্ত্রী ফুং তেও প্রথম ছাপিবার সংকেত আবিষ্কার করেন। অনেক হুকুম, ঘোষণাপত্র ইত্যাদি এত অধিকবার লিখিতে হইত এবং তাহাতে এত অধিক সময় লাগিত যে তাহাতে রাজকার্য সুন্দররূপ চলিবার বড়ই ব্যাঘাত হইত। সুতরাং তিনি মনে করিলেন যে ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় একটা বাহির করা আবশ্যক। তিনি দেখিলেন যে সেই-সকল হুকুম কাঠে খোদাই করিয়া তাহাতে কালি দিয়া, তাহা হইতে ছাপ তুলিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে তিনি মুদ্রাঙ্কনের মূলমন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। সেই সময়ে পী চিং নামক একজন কর্মকার বাস করিত। সে

দেখিল যে মস্ত একটা হুকুম কাঠে খোদাই করার চাইতে আলাদা আলাদা অক্ষর খোদা থাকিলে সেইগুলি আবশ্যক মতো একত্র করিয়া অতি সহজেই কাজ চালানো যাইতে পারে। সে মাটির অক্ষর তৈরি করিয়া তাহাদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যে পৃথক অক্ষর রাখিলে বেশ কাজের সুবিধা হয়। কিছুদিন পরে পী চিং মরিয়া গেল। তাহার ছেলেদের বুদ্ধি ততটা পাকা হয় নাই, সুতরাং তাহারা মনে করিল যে বাবা কি ছেলেখেলা নিয়াই জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছেন। এই ভাবিয়া তাহারা পী চিঙের অক্ষরগুলি ফেলিয়া দিল। শীলমোহরের গোছ করিয়া কাঠ খোদাই করা ভিন্ন ছাপার কার্যের আর অধিক উন্নতি চীনাদের দ্বারা হইল না।

জার্মানি দেশে গুটেন্‌বার্গ নামক একজন লোক ছিলেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার করেন। তিনিও প্রথমে খোদাই করা কাঠ হইতেই ছাপ তুলিলেন। ফষ্ট্‌ নামক এক ব্যক্তি গুটেন্‌বার্গের আবিষ্কারে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার সহিত যোগ দিয়া এই কার্যে তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরেই গুটেন্‌বার্গ বুঝিতে পারিলেন যে হাতে ছাপ না তুলিয়া ছাপ তোলার জন্য কোনোরূপ যন্ত্র থাকিলে বড়ই ভালো হয়। তিনি একটি যন্ত্রের কথা ভাবিয়া কনরেড্‌ সামপাক্‌ নামক একজন ছুতোরকে বলিলেন, সে তাঁহাকে এক কাঠের ছাপাখানা প্রস্তুত করিয়া দিল। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে (১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে) কষ্টাব নামক একজন লোক প্রথমে পৃথক অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইল। সর্বপ্রথমে তাঁহারা বাইবেল গ্রন্থ ছাপিতে আরম্ভ করেন। এই প্রথম মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থ এখন অতি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। অল্পদিন হইল নিউইয়র্ক নগরে (আমেরিকায়) ইহার একখণ্ড নিলামে বিক্রয় হইয়াছিল, তাহার মূল্য ১৮০০০্‌ (আঠারো হাজার) টাকা হইয়াছিল।

ইংরাজেরা জর্মানদের নিকট হইতেই এই বিদ্যা লাভ করেন। উইলিয়ম ক্যাক্‌স্টন্‌ নামক এক ব্যক্তি কলোন্‌ নগরে আসিয়া ছাপার কাজ শিক্ষা করেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলে ইংলণ্ডের রাজা ১৪৭৪ খৃস্টাব্দে তাঁহাকে একটি ছাপাখানা স্থাপন করিতে অনুমতি দেন। ওয়েস্টমিন্‌স্টার এবি নামক গীর্জাতে সেই ছাপাখানা স্থাপিত হয়।

ইংলণ্ডে ক্যাক্‌স্টনের যে গৌরব, আমাদের দেশে মহাত্মা কেরীরও সেই গৌরব হওয়া উচিত। কেরী সাহেবই প্রথমে এদেশে ছাপাখানা আনয়ন করেন। তাঁহারই যত্নে প্রথম বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত হইল। শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। তখনকার ছাপা এখন দেখিলে হয়তো তোমরা হাসিবে। আমি বহুকালের পুরাতন একখানি অভিধান দেখিয়াছি। তাহাতে বাঙ্গালা শব্দের ইংরাজি অর্থ লেখা আছে। অভিধানখানি ঠিক ওয়েবস্টারের বড় ডিক্সনারির ন্যায় বড় হইবে। ইহার বাঙ্গালা অক্ষরগুলি দেখিতে হাতের লেখা অক্ষরের মতো, কিন্তু বেশ পরিষ্কার। এখন অক্ষরের অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু এক কথা মনে রাখিও, কেরী সাহেবের নিকট আমরা এই-সকলের জন্য ঋণী।

আজকাল ছাপাখানার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা আমাদের দেশের দুই একটি প্রেস দেখিয়া বুঝিতে পারিবে না। নিম্নে প্রধান পাঁচটি ছাপার কলের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে—

১ ম্যারিননির-কৃত। এই কল প্রতি ঘন্টায় ১৫০০০ হইতে ২০০০০ করিয়া ছাপে।

২ জুলিস ডেরী-কৃত। এই কল প্রতি ঘন্টায় ১৬০০০ হইতে ৩২০০০ করিয়া ছাপে।

৩ হো সাহেব-কৃত। আমেরিকার তিনটি প্রধান খবরের কাগজ ছাপিতে এইরূপ তিনটি

কল ব্যবহৃত হয়। এই কল খবরের কাগজ ছাপিয়া কাটিয়া আঠা দিয়া জুড়িয়া এবং ভাঁজ করিয়া দেয়। এবং এত কাজ করিয়াও ঘন্টায় ২৫০০০ হিসাবে ছাপে।

৪ এলুজে কোম্পানির প্রেস। এই প্রেসে ঘন্টায় ৩৫০০০ হইতে ৭০০০০ করিয়া ছাপা হইতে পারে।

৫ স্কট্ রোটারি প্রেস। ইহাতে ঘন্টায় ৩০০০০ হিসাবে আট পৃষ্ঠা বিশিষ্ট কাগজ ছাপা কাটা ও ভাঁজ করা হয়।

জলকণার গল্প

খোকার জল খাইবার ছোট গেলাসটিতে বিরানববই লক্ষ কোটি জলের অনু আছে। তাহা কি সকলেই একস্থান হইতে আসিয়াছে? ঝি তাহাদিগকে কলসী হইতে আনিয়াছে বটে, রামা চাকর কলসীতে করিয়া তাহাদিগকে পুকুর হইতে আনিয়াছিল বটে, কিন্তু পুকুরে তাহারা কোথা হইতে আসিল? খোকা এই কথা ভাবিতেছে। জলকণাবা যদি কথা কহিত, আর খোকা যদি তাহাদিগকে এই-সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, তবে অবশ্যই তাহারা তাহার উত্তর ভালোরূপ দিতে পারিত। ইহার উত্তরে তাহারা কত আশ্চর্য গল্পই বলিতে পারিত। মনে কর খোকা এক-একটিকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আর তাহারা উত্তর দিতেছে :

১ আমরা তিনহাজার জড়াজড়ি করিয়া টুপ্ করিয়া আকাশ হইতে লাফাইয়া পুকুরে পড়িয়াছিলাম।

২ আমরা ষাটলক্ষ রাত্রিকালে গাছের পাতায় বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিলাম, সেখান হইতে গড়াগড়ি করিয়া পুকুরে পড়িয়াছিলাম।

৩ আমরা ডাঙ্গা হইতে পুকুরে নামিয়াছিলাম।

৪ আমরা দলে দলে পর্বত হইতে সমুদ্রে যাইতেছিলাম। পথে বালুকণার ফাঁকের ভিতরে বেড়াইতে গিয়া পথ হারাইয়া ফেলিলাম। শেষে কষ্টেসৃষ্টে সেই বালির ভিতর দিয়া এখানে আসিয়াছে।

খোকার ক্ষুদ্র মাথায় গোল লাগিয়া গেল। তাহার জিজ্ঞাসা ফুরাইল না। সে আরো কত শত কথাই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল। কত কথাই সে শিখিল। ইহারা বলিল, 'এককালে আমরা সকলেই সমুদ্রে ছিলাম। এখন খোকাবাবু আমাদিগকে গেলাসে পুরিয়া গিলিয়া ফেলিতেছে, তখন আমরা তোমাদের বড়-বড় জাহাজগুলিকে ইচ্ছা করিলে গিলিয়া ফেলিতে পারিতাম। সমুদ্র হইল কি না আমাদের সমাজ। সমুদ্র আর কি? আমরাই তো সমুদ্র। সমুদ্রে যখন ছিলাম, বেশ ছিলাম।'

'একবার বড় গরম হইল। গরম হইলে অনেকগুলি গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া থাকিতে বড় কষ্ট হয়। আমরা ফাঁক ফাঁক হইয়া বাতাসে মিশিয়া আকাশে উঠিলাম। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কত স্থানেই গেলাম, কত তামাশাই দেখিলাম। তখন কিন্তু আমাদিগকে কেহই দেখিতে পাইত না, আমরা বাতাসের ভিতরে ছিলাম।'

'একদিন বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। আমরা তখন বাতাসের বাহিরে আসিয়া দলবদ্ধ হইলাম, মনে করিলাম নীচে নামিয়ে দেখি কেমন লাগে। তখন তোমরা আমাদিগকে দেখিতে

পাইলে, আর মেঘ বলিয়া ডাকিলে। যখন আমরা পড়িতে লাগিলাম, তখন তোমরা বলিলে 'বৃষ্টি হইতেছে'। আমাদের কেহ কেহ তোমাদের পুকুরে পড়িলাম। কেহ কেহ অন্য স্থানে পড়িয়াও শেষে কেমন করিয়া পুকুরেই আসিল। আর সকলের কি হইল বলিতে পারি না—'

এমন সময় খোকার পাতে সন্দেশ পড়িল। খোকা অমনি সব ভুলিয়া গিয়া সন্দেশ লইয়া ব্যস্ত হইল। ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। খোকার লোভ একটু কম হইলে আমরা জলকণাদের নিকট আরো কত গল্প শুনিতে পাইতাম।

দাসত্বপ্রথা ঃ ১

তোমাদের অনেকেই টম্‌কাকার কুটির পড়িয়াছ, এবং দাস-ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক কথা জান। ইউরোপের সভ্য সাহেবগণ আমেরিকায় যাইয়া চিনি, তুলা ইত্যাদির চাষ করিতেন, এবং ইউরোপের বাজারে সেই-সকল জিনিস বিক্রয় করিয়া ধনী হইতেন। এই-সকল কারবারে ক্ষেতে খাটিবার জন্য অনেক লোকের দরকার হইত। মাহিয়ানা করিয়া চাকর রাখিতে গেলে বিস্তর পয়সা লাগে, লাভ তত বেশি হয়না, সুতরাং অল্প পয়সায় যাহাতে কাজ চলে, সাহেবেরা শীঘ্রই তাহার একটা উপায় স্থির করিলেন।

আফ্রিকায় নিগ্রোজাতির বাস। নিগ্রোরা বলিষ্ঠ, কর্মক্ষম, সরল এবং শান্ত স্বভাব। একদল লোক ইহাদিগকে বলপূর্বক ধরিয়া আমেরিকায় আনিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল, এইরূপে দাস-ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইল। এই-সকল লোকদের উপর কিরূপ পশুর মতন নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইত, নিম্নলিখিত গল্পটি পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

লাইবেরিয়া একজন নিগ্রো পাদরি আছেন। বাল্যকালে তাঁহাকে দাস ব্যবসায়ীদের হাতে পড়িয়া ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে ধরিবার সময় পাষণ্ডেরা তাঁহার গায়ে যে আঘাত করিয়াছিল, এই বৃদ্ধ বয়সেও তাহার চিহ্নসকল আছে। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহাকে চুরি করিয়া আনে। তাঁহার পিতা আফ্রিকার ঐস্থানের একজন ধর্মযাজক ছিলেন। একটি ছোট গ্রামের একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটিরে তাঁহারা বাস করিতেন। ইহার নিকটেই তাঁহাদের কাঠের ছোট কালো দেবতাটির মন্দির ছিল। রোজ দুবেলা ছেলেদের সেই দেবতার কাছে লইয়া গিয়া হাতজোড় করিয়া পূজা করিতে শিখাইতেন। এইরূপ নির্দোষ সুখে তাঁহাদের জীবন চলিত, ভবিষ্যতের দারুণ দুঃখের কথা তাঁহারা স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই।

এই গ্রামের নিকটেই আর-একদল নিগ্রো বাস করিত। ইহারা টাকার লোভে পর্টুগীজ দাস-ব্যবসায়ীদিগকে এই গ্রামে পথ দেখাইয়া আনিল। এক-দিন রাত্রিতে সকলে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময় একদল সশস্ত্র লোক গ্রামে প্রবেশ করিয়া যতজনকে ধরিতে পারিল, বন্ধন করিল। মৃত লোককে বিক্রি করা যাইবে না, সুতরাং অধিক লোককে মারা হইল না।

পিতা তিনটি সন্তানকে লইয়া সময় থাকিতেই জঙ্গলে পালাইতে পারিয়াছিলেন। মাতা কনিষ্ঠ শিশুটিকে লইয়া গ্রামান্তরে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। পনেরো দিবস তাঁহারা সেই স্থানে ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে আত্মীয়েরা অবশিষ্ট তিনটি সন্তান এবং তাঁহাদের পিতার সন্ধান লইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কোনোরূপ খবরই

পাওয়া গেল না। পনেরো দিনের পর একদিন রাত্রিতে দাস-ব্যবসায়ীরা এই গ্রামে আসিয়া সকলকে আক্রমণ করিল। আত্মীয়েরা কোথায় পলাইয়া গিয়াছিলেন, মাতা এবং পুত্র বন্দী হইলেন। ইঁহাদিগকে পর্টুগীজদিগের ছাউনীতে লইয়া আসিল। সেখানে সপ্তাহকাল তাঁহাদের উপর বিশেষ কোনো অত্যাচার হয় নাই, কারণ পর্টুগীজেরা এদিক ওদিক মানুষ ধরিতে ব্যস্ত ছিল। সেখানেও অন্য অনেক লোকের উপরে নানারকম লোমহর্ষণ অত্যাচার হইয়াছিল। অনেক পিতা পরিবারের জন্য যুদ্ধ করিয়া বন্দুকের গুলিতে হত হইলেন, অনেক মাতা শিশুসন্তানকে লইয়া পলায়নের চেষ্টা করাতে অস্ত্রাঘাতে প্রাণ হারাইলেন।

যখন অনেকগুলি 'দাস' সংগৃহীত হইল তখন ইহাদিগকে একটা 'ডিপোতে' লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে চারিশতের বেশি লোককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এরপর ইহাদিগকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া আফ্রিকার সেই ভয়ানক রৌদ্রে একশত আশি মাইল পথ লইয়া গেল, এই সময় তাহাদের যে কি নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ছেলেগুলি চোখের সামনে থাকিলে তাহাদের কষ্ট দেখিয়া পিতামাতা নিরুৎসাহ হইতে পারে, এই বলিয়া বলপূর্বক তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইল। অনেক সময় স্ত্রীলোক এবং শিশুরা আর চলিতে না পারিয়া রাস্তায় পড়িয়া যাইত, তখন চাবুক মারিয়া তাহাদিগকে উঠিতে বাধ্য করিত। চাবুকে না কুলাইতে লোহার তীক্ষ্ণ লাঠিদ্বারা খোঁচা মারিত। বহু সংখ্যক লোক এত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিল। আমাদের পরিচিত শিশুটির মাতা তাহার মধ্যে একজন। শিশুটি কাঁদিতে কাঁদিতে বিষম প্রহার খাইয়া প্রাণের ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

এইরূপে চলিয়া শেষে সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য জাহাজ প্রস্তুত। জাহাজ দেখিয়া তাহাদের মনে অধিকতর আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তাহারা জাহাজ দেখিয়া মনে করিল যে, এটা বুঝি একটা ভয়ানক জানোয়ার, আর এটাকে খাওয়াইবার জন্য তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছে। ভয়ে হতভাগ্যেরা চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাদিগকে বলপূর্বক জাহাজে তোলা হইল।

জাহাজের 'ভিতরে' আলমারিতে বই রাখিবার মতন করিয়া দাসদিগকে রাখা হইত। পরিণত বয়স্কদের জন ছয় ফুট লম্বা আর এক ফুট চার ইঞ্চি উঁচু স্থান আর পাশাপাশি যত লোক ধরে — বেচারাদের পাশ ফিরিবার সম্ভাবনা থাকিত না। ছেলেদের জন্য পাঁচ ফুট লম্বা এক ফুট উঁচু স্থান। এইরূপে তাহাদের দুই মাস কাল থাকিতে হইত। সাত-আট দিন পর একদিন কেবলমাত্র এক ঘন্টা কালের জন্য তাহাদিগকে উপরে আসিতে দেওয়া হইত।

এত অত্যাচারে কয়জন বাঁচিয়া থাকিবে? তিনজনের ভিতরে দুইজন সাধারণত জাহাজেই মারা যাইত, অবশিষ্টেরাও জন্মের মত বিকলাঙ্গ হইয়া থাকিত।

দাসত্বপ্রথা ঃ ২

আমরা যাহাদের কথা বলিতেছি তাহাদের উপর ঈশ্বর সদয় হইলেন। জাহাজ ছাড়িবার পর এক সপ্তাহের ভিতরেই ইংলণ্ডের একখানা যুদ্ধ জাহাজ তাহাদের পিছু পিছু আসিয়া দাস-ব্যবসায়ীদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিল। দাস-ব্যবসায়ীরা পলায়নদ্যত হইল। জাহাজ

হালকা করিবার জন্য পিপায় পুরিয়া নিগ্রোদিগকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া ইংরাজদের জাহাজ অধিকতর বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং শীঘ্রই দাস-ব্যবসায়ীদিগকে ধরিয়া ফেলিল। কিছুকাল ভয়ানক যুদ্ধের পর পর্টুগীজেরা পরাজিত হইল, জাহাজ ইংরেজদের হস্তগত হইল, দাসদিগকে উপরে আনিয়া খাইতে দেওয়া হইল এবং তাহারা সেইখানেই থাকিতে পাইল। এরপর জাহাজ লাইবেরিয়ার দিকে চলিল দেখিয়া বেচারা নিগ্রোদের মনে আনন্দ হইল।

লাইবেরিয়াতে আনিয়া তাহাদিগকে নানা স্থানে পাঠাইয়া যাহাতে তাহাদের জীবিকা উপার্জনের পন্থা হয় তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল। আমাদের পরিচিত নিরাশ্রয় মাতৃহীন শিশুটিকে এবং অন্যান্য অনেক শিশুকে মিশনারিদের ইস্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। এইখানে থাকিয়া তিনি লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন। মিশনারিরা মাঝে মাঝে তাহাকে উপশিক্ষকের কাজ করিতে দিতেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া, সন্তুষ্ট হইয়া একটি স্কুলমাস্টারিতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে ইঁহাকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া জন্‌সাউথ নাম দেয়া হয়। জন্‌সাউথ অনেকদিন এই কার্যে ছিলেন, শেষটা তাহাকে প্রচারকের পদে নিযুক্ত করা হইল। এই কার্যে তিনি বিশেষরূপে লোকের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আকর্ষণ করিয়াছেন।

দাসদিগের দুঃখের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। পথে কিরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে হইত তাহাই বলিয়াছি। এরপর যাহারা তাহাদিগকে কিনিত, তাহাদিগের নিকট আরো অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। সমস্ত দিন ক্রমাগত খাটিতে হইত। সে যে কি ভয়ানক খাটুনি তাহা আর কি বলিব! এত খাটিয়াও প্রভুর সন্তোষ নাই, অল্প কাজ হইয়াছে বলিযা বেত্রাঘাত হইত। সামান্য একটু অবাধ্যতা হইলে তাহাকে মারিয়া তাহার হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত। যাহারা টম্‌কাকার কুটির পড়িয়াছ তাহার জান টমের মতন একজন ভালো লোককেও অকারণ এইরূপ প্রহারে একটা পশুর মতন লোকের হাতে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। অনেক হতভাগ্য পলাইয়া এই পাশব অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিত। দেশের এরূপ আইন ছিল যে এই-সকল লোকদিগকে যে আশ্রয় দিবে তাহারই শাস্তি হইবে। পলাতক দাস যদি একবার ধরা পড়িত তবে আর তাহার যাতনার সীমা থাকিত না। এই-সকল লোককে দিনের বেলায় জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া কেবল রাত্রিতে চলিতে হইত। ইংরাজ রাজ্য হইতে প্রথমে দাস-ব্যবসায় উঠিয়া যায়। আমেরিকার উত্তরে ইংরাজাধিকৃত কানাডা দেশ, পলাতক দাসেরা একবার এই দেশে আসিতে পারিলেই পুনরায় স্বাধীন হইবে, ইহা তাহারা জানিত। তাহারা জানিত যে ধ্রুবতারা সকল সময়েই উত্তর দিকে থাকে, সুতরাং এই তারার দিকে গেলেই উত্তরের সেই কানাডা দেশে যাওয়া যাইবে। এইরূপে রাত্রিতে ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে আসিতে আসিতে অনেকে শেষে কানাডায় আসিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কতজন জঙ্গলে বন্য জন্তুর গ্রাসে প্রাণ হারাইয়াছে। এইরূপ একজন পলাতক দাস এখন কানাডা দেশের একজন সম্মানিত লোক। তিনি পলাইয়া আসিবার সময় কিরূপে সাপের হাতে পড়িয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা বলিয়াছেন।

'আমি তাড়াতাড়ি লাফাইয়া একটা গর্ত পার হইবার সময় একটা কোমল পিচ্ছল জিনিসের উপর পড়িয়া আছাড় খাইলাম। আমি উঠিতে না উঠিতেই একটা কি যেন আমাকে জড়াইয়া

ধরিতে লাগিল। আমি বুঝিতে পারিলাম আমাকে সাপে ধরিয়াছে। আমাকে এমন আঁটিয়া ধরিয়াছে যে আমি দুই হাতে মাথা ঢাকিয়া ছিলাম। ভয়ে ও কষ্টে নিজের অবস্থা বুঝিবার শক্তি ছিল না। ক্রমে আমরা পাঁজরা ভাঙিবার উপক্রম হইল। আমি প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াছি, এমন সময় আমার বন্ধু দিগের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাঁহাদের একজন কাটারি দিয়া সাপের গলা কাটিয়া ফেলিলেন, কিন্তু তবু তাহার শরীরটা আমাকে পূর্বের ন্যায়ই আঁটিয়া ধরিয়া থাকিল। এমন সময় আমার বন্ধুরা ল্যাজের দিকে প্রায় দুই ফিট কাটিয়া ফেলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বন্ধন মুক্ত হইলাম, কিন্তু তখন আর উঠিবার, কি কথা বলিবার শক্তি নাই। সুখের বিষয় জল নিকটেই ছিল, আমি শীঘ্রই সুস্থ হইলাম। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিলাম, অজগরটা ষোলো ফুট লম্বা হইবে এবং তাহার শরীরের খুব মোটা জায়গাটা একজন বলিষ্ঠ লোকের ঠ্যাঙের মতন মোটা। সাপটা বিষধর ছিল না, কিন্তু আমার এক হাতে এমন দুই-একটি আঁচড় দিয়াছিল যে, অনেক বৎসর পর্যন্ত তাহার দাগ যায় নাই। অনেকদিন পর্যন্ত সাপ দেখিলে, এমন-কি, সাপের নাম শুনিলেই আমার গা শিহরিয়া উঠিত। অনেকদিন পর্যন্ত আমি ঘুমের ভিতরে মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতাম। আজ পর্যন্তও আমার সেদিনকার ভয়টা দূর হয় নাই।

দাসত্বপ্রথা আমেরিকা হইতে উঠাইয়া দিতে অনেকদিন লাগিয়াছিল। অনেক মহৎলোকের বহু দিনব্যাপী চেষ্টার পর দাসত্বপ্রথা রহিত করিবার আইন হইল। কিন্তু যাহারা দাসদিগকে খাটাইত তাহারা এ আইন কিছুতেই মানিতে চাহিল না। অবশেষে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া, ভয়ানক যুদ্ধ করিল। অনেক লোকের প্রাণনাশের পর, সাধু লোকদেরই জয় হইল। দাসগণ স্বাধীনতা পাইল। ইহার কিছুদিন পরেই দাস-ব্যবসায়ীদের একজন লোক আমেরিকার সভাপতি লিংকন্‌কে হত্যা করিল। লিংকন্ পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, দাসব্যবসায়ীগণ বিনামী চিঠি লিখিয়াছিল যে, দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিলে তাঁহার প্রাণ যাইবে। কিন্তু লিংকনের ন্যায় মহৎলোক অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই-সকল চিঠি একটা পুলিন্দায় রাখিয়া দিতেন, সেই পুলিন্দার উপরে লেখা ছিল, 'খুনের চিঠি'। কিন্তু সেই-সকল চিঠির ভয়ের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া, তিনি নির্ভয়ে দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিলেন। এইজন্য একটা দুর্বৃত্ত থিয়েটারের ভিতর তাহাকে খুন করিল। দাসগণ যখন লিংকনের মৃত্যু-সংবাদ শুনিল তখন তাহারা পাগলের ন্যায় রাস্তায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। জীবিতাবস্থায় যখনই দাসগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইত তখনই দু হাতে সেলাম করিয়া নৃত্য করিত আর বলিত, 'ধন্যা পরমেশ্বর! ধন্য পরমেশ্বর! প্রভু লিংকাম!' লিংকন্ শব্দ নিগ্রোরা উচ্চারণ করিতে না পারিয়া 'লিংকাম্' বলিত। অনেক নিগ্রোর বিশ্বাস হইয়াছিল যে, লিংকন্ পরমেশ্বর। একবার একজন নিগ্রো ধর্মযাজক তাঁহার শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন — 'হে ভাইসকল, প্রভু লিংকাম্ তিনি সকল স্থানেই আছেন, প্রভু লিংকাম্ আমরা যাহা বলি সবই শোনেন, প্রভু লিংকাম্ আমাদের মনের কথা সব জানেন।'

দক্ষিণ আমেরিকায় এতদিন দাসত্বপ্রথা ছিল, কিছুদিন হইল তাহাও উঠিয়া গিয়াছে।

এতক্ষণ অন্যান্য দেশে অতীতকালে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই বলিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমান কালেই ছোটখাটো রকমে সেই-সকল ব্যাপার ঘটিতেছে। আসামে অনেক সাহেবের 'চা'র চাষ আছে। চা-ক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য অনেক কুলির প্রয়োজন হয়। এই-সকল কুলির

উপর অনেক সময় ভয়ানক অত্যাচার হইয়া থাকে। ভয়ানক খাটুনি, অমানুষিক অত্যাচার এই সকলই এই কুলিদিগকে অনেক সময় সহ্য করিতে হয়। অল্প কয়েকজন দয়ালু লোক আছেন, যাঁহাদের বাগানে কুলিদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার হয় এবং তাহারা অনেক পরিমাণে সুখে থাকে, কিন্তু এরূপ পাশব প্রকৃতির অনেক লোক আছে যাহারা কুলিদিগকে আমেরিকার দাসের ন্যায় ব্যবহার করে। ইংরাজ রাজ্যে বলপূর্বক লোককে ধরিবার সাধ্য নাই, সুতরাং কুলি সংগ্রহ করিবার জন্য ইহাদের নিযুক্ত লোকেরা, (ইহাদিগকে আড়কাঠি বলে), অন্যরকম উপায় অবলম্বন করে। তাহারা ধার্মিকের বেশে গ্রামে গ্রামে যায় এবং অল্পবুদ্ধি লোকদিগকে কম কাজ এবং বেশি বেতনের লোভ দেখাইয়া ভুলাইয়া আনে। একবার ইহাদিগকে হস্তগত করিয়া আড্ডায় (ডিপো) আনিয়া ফেলিতে পারিলে আর সহজে নিস্তার নাই। এইরূপ করিয়া যাহারা লোক সংগ্রহ করে তাহার সম্ভবত কখনই তাহাদের উপর পরে ভালো ব্যবহার করে না। জন্‌সাউথ রাস্তায় যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন এই-সকল আড়কাঠিদের হাতে কুলিরাও প্রায় সেইরূপ ক্লেশ পায়। কিছুদিন ভালো ব্যবহার করে, সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হইলেই অন্য মূর্তি ধারণ করে। আধপেটা খাওয়া, কথায় কথায় প্রহার, অযত্নে থাকা ইত্যাদি তো আছেই, ইহার মধ্যে যাহার কোনোরূপ রোগ হয় সে বেচারার আর রক্ষা নাই। অনেকে সময় থাকিতে টের পাইয়া এই-সকল পশুর নিকট হইতে পলায়ন করে। আমাদের একটা ঝি একবার ইহাদের হাতে পড়িয়াছিল। ইহারা যে আড়কাঠি, তাহা সে প্রথমে জানিতে পারে নাই। তাহার সঙ্গে আরো দুইজন ছিল। ইহাদিগকে আড়কাঠিরা বলিয়াছিল যে ভালো ব্রাহ্মণের বাড়িতে কাজ করিতে হইবে, ছয় টাকা মাইনে আর খোরাক-পোশাক পাইবে। তাহারা সহজেই রাজি হইল এবং সেই লোকগুলির সঙ্গে একটা বাড়িতে আসিল। সেখানে তাহাদিগকে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল। আমাদের ঝি একটু ব্যস্ত হইল এবং শীঘ্র শীঘ্র কাজ পাইবার জন্য তাগাদা করিতে লাগিল। আড়কাঠিরা তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, 'সাহেব আসিবেন, তিনি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করেন সব কথাতেই হাঁ বলিও, তা হইলেই তোমার কাজ হইবে।' ঝির তো শুনিয়া চক্ষুস্থির —'ওমা! সে কিগো! বামুনের বাড়িতে কাজ কোত্তে এলাম, তা আবার সাহেব কেন আসবে গো?' ঝির প্রাণে বিষম খট্‌কা বাধিল। সে আড়কাঠিদের কথা কিছু কিছু জানিত, তাহার মনে গুরুতর সন্দেহ হইল। সে কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে খাইতে দিল, সে কিছুই খাইল না। এইরূপে বেলা শেষ হইয়া আসিল। বিকালবেলায় অনেক কথাবার্তা, তর্ক, বিতর্ক, সন্দেহ, প্রবোধ ইত্যাদি চলিতে লাগিল, ইহার মধ্যে আমার ঝি— বোঁ করিয়া ছুট্! একেবারে বাড়িতে! অন্যকয়টির শেষটা কি দশা হইল সে বলিতে পারে না।

আড়কাঠির কথা এখন এত প্রসিদ্ধ হইয়াছে যে এখন হঠাৎ কেহ অদৃশ্য হইলেই উহাদের কথা মনে হয়। এ বিষয়ে লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার ভিতরে একটি ঘটনা হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করি।

আমাদের একটি ভাগ্নে আমার দাদার বাড়িতে থাকিত। একদিন সকালে সে অদৃশ্য হইল। বারোটার সময়ও বাড়ি ফিরে নাই দেখিয়া দাদা আমাদের বাড়িতে লোক পাঠাইলেন। সকালে সে আমাদের এখানে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু আটটার পূর্বেই চলিয়া গিয়াছিল। জোড়াসাঁকোতে তাহার জ্যেঠামহাশয় থাকেন, সেখানে লোক পাঠাইয়া জানা গেল, সে সেখানেও যায় নাই। দেখিতে দেখিতে দুইটা বাজিল, তখন সকলেই চিন্তিত হইলাম।

কলকাতার থানা এবং ডাক্তারখানা একটিও বাকি রহিল না, নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানেও অনুসন্ধানের ত্রুটি হইল না, কিন্তু তাহার কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। বাড়ির মেয়েরা ইহার অনেক পূর্ব হইতেই কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই-সকল অনুসন্ধানে রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। এমন সময় আমাদের মনে হইল যে, হয়তো সে আড়কাঠিদের হাতে পড়িয়াছে। এই চিন্তায় আমাদের মনের কিরূপ অবস্থা হইল সহজেই বুঝিতে পার।

আমাদের একজন বন্ধু, (তাঁহাকে বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিব), আড়কাঠিদের সম্বন্ধে অনেক খবর রাখেন। ইনিই প্রথমে কুলিদের অবস্থার প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় যেই খবর শুনিলেন, অমনি তিনি লাঠি হাতে করিয়া অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। এ বিষয়ে কলিকাতার যত সন্দিগ্ধ স্থান আছে, তিনি তাহার প্রায় সকলগুলির কথাই জানেন, কিন্তু যত জায়গায় গেলেন, কোথাও কোনরূপ সন্ধান পাইলেন না। শেষে যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে কতগুলি ষণ্ডা লাঠি লইয়া তাঁহাকে তাড়া করিয়াছিল। তিনি অনেক পুণ্যের জোরে সেই ভয়ানক সংকীর্ণ গলির ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া বড় রাস্তায় আসিয়া বাঁচিলেন।

বারোটাব সময় বিদ্যারত্ন মহাশয় ক্ষুন্ন মনে ঘরে ফিরিলেন। স্টেশনে স্টেশনে লোক গিয়াছিল তাহারা ইহার অনেক পূর্বেই ফিরিয়াছে। সকলেই স্তব্ধ, কাহারো মুখে কথাটি নাই। যেরূপে রাত্রি কাটিল, তাহার কিঞ্চিৎ কেহ কেহ বুঝিতে পারিবেন, আমার বলিবার সাধ্য নাই।

ভোরে উঠিয়া আবার সকলে অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। কেবলমাত্র দাদা বাড়িতে রহিলেন। সাতটার সময় একজন লোক আসিয়া দরজায় ঘা দিল। প্রশ্নের পর সে বলিল, 'আমি ময়রা, মহাশয়ের বাড়িতে একটি ছেলের নিকট জলখাবার দরুন টাকা পাইব। কাল সকালে বিশেষ করিয়া তাগাদা করাতে বলিয়াছিল আমার সঙ্গে এস। আমরা লোক সঙ্গে দিলাম, তাহাকে এই বাড়ির দরজায় দাঁড় করাইয়া ভিতরে গেল। কিছুকাল পরে বাহিরে আসিয়া বলিল, 'এখানে নয়, ও বাড়ি (লেখকের বাড়ি) চল।' ও বাড়িতে কিছুকাল থাকিয়া আমায় বলিল — 'বিকালে'। তাই আমি আসিয়াছি, টাকাটা এখন পাইব কি? এত ছোটছেলেকে ওরকম করিয়া ধারে সন্দেশ কেন খাওয়াইলে জিজ্ঞাসা করাতে ময়রা তাহার কোনো ভালো উত্তর দিতে পারিল না। অপ্রতিভ হইয়া সম্প্রতি সরিয়া পরিল।

আমার ভাগ্নের সম্বন্ধে প্রকৃত কথা এখন একটু একটু বুঝিতে পারা গেল। তাহার জ্যাঠামহাশয়ের বাড়িতে তৎক্ষণাৎ পুনরায় লোক পাঠানো হইল। সেখানে গিয়া দেখা গেল যে, সে ঠোঙ্গায় করিয়া জলখাবার খাইতেছে। দূর হইতে কে আসিতেছে দেখিয়াই ঠোঙ্গাটি রাখিয়া বসিয়া রহিল। অনেক প্রশ্নের পর তাহার ইতিহাস বলিল আর বলিল যে, 'তোমরাই কি শুধু পরিশ্রম করিয়াছ? আমিও ঢের ঘুরিয়াছি।'

আমাদের ওখান হইতে বাহির হইয়া সে কালীঘাট গিয়াছিল। তাহার সঙ্গে একটিও পয়সা ছিল না, সুতরাং এই রাস্তাটুকু হাঁটিয়াই যাইতে হইয়াছিল। ময়রার ভীষণ মূর্তি তাহার প্রাণে জাগিতেছিল। তারপর ময়রা যদি মাতুল মহাশয়কে বলে, তবে নিতান্তই লজ্জার বিষয় হইবে এবং শাস্তিরও বিশেষ সম্ভাবনা বোধ করিল। কাজেই তাহার কাছে আসিতে কিছুতেই ভরসা হইতেছিল না। কালীঘাটে পরিচিত স্থান নাই, সুতরাং শীঘ্রই সেখান হইতে ফিরিতে হইল। এরপর হাইকোর্টের দিকে চলিল। গড়ের মাঠের মাঝামাঝি আসিয়া বড়ই ক্লান্তি বোধ করিতে

লাগিল, সুতরাং কাছে বটগাছতলায় একটা বেঞ্চ দেখিতে পাইয়া সেখানে কয়েক ঘন্টা নিদ্রা গেল। তারপর হাইকোর্ট, হাওড়া স্টেশন ইত্যাদি পরিদর্শন করিয়া পাঁচটার সময় তাহার জ্যাঠামহাশয়ের বাড়ি উপস্থিত। সেখানে আসিয়াই ঢক্ ঢক্ করিয়া জল পূর্ণ একটি গ্লাসকে খালি করিল। সে বাড়ির লোকেরা তাহার চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু তাহাকে কিছু খাইতে দিয়া প্রকৃতিস্থ না করিয়া কোনো প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না। কিছুকাল বিশ্রামের পর শেষে সে উপরিলিখিত বিবরণটি বলিল। সন্ধ্যার সময় তাহার জ্যাঠামহাশয় একজন লোক সঙ্গে দিয়া বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। অর্ধেক পথ আসিয়া হঠাৎ সে ছুট্ দিল। সঙ্গের লোকটি কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিল না। মাইল খানেক তাহার পশ্চাতে দৌড়িয়া শেষটা তাহাকে বলিল যে, 'তোমার বাড়ি যাইবার দরকার নাই, আমাদের বাড়িতে আইস।' সে আশ্বস্ত হইল, এবং তাহার জ্যাঠামহাশয়ের বাড়িতে ফিরিয়া আসিল।

সে বাড়ি ফিরিয়া আসিতে কিছুতেই রাজি হইল না।

জ্যেষ্ঠতাত

একশ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগকে দেখিলেই চোখ বুজিতে ইচ্ছা করে, তাহারা যদি কথা কয় তবে কানে হাত দিতে ইচ্ছা হয়। অনেক ঘরের কোণে অতিশয় কদাকার একপ্রকার ব্যাঙ বাস করে, তাহারা যখন মাঝে মাঝে কট্‌কট্ শব্দ করিয়া উঠে তখন প্রাণ চমকিয়া যায়, হঠাৎ যদি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চোখের সামনে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে ছুটিয়া পলাইতে ইচ্ছা করে। জানোয়ারের মধ্যে এগুলি যেমন, মানুষের মধ্যে জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়েরা ততোধিক। ইহাদের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হইলে আর জীবনে ইহাদিগকে ভুলিতে পারা যায় না।

এক নম্বরে, খবরওয়ালা জ্যেষ্ঠতাত। জগতে এমন ঘটনা নাই, যাহার কথা ইনি শুনিয়া রাখেন নাই। তুমি যদি তাহার কোনো সামান্য বিষয়ে অজ্ঞতা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে ইনি অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইবেন। যদি কোনো কথা তুমি অন্যরূপ জান বলিয়া প্রকাশ কর, তবে তোমার আর রক্ষা নাই, তোমাকে এমন একটা সার্টিফিকেট দিয়া বসিবেন যে, তেমন সার্টিফিকেট সচরাচর কেহ কাহাকেও দেয় না। কিন্তু হয়তো এর পরেই তোমার নিকট হইতে উঠিয়া যাইবেন।

দুয়ের নম্বরে, পণ্ডিত জ্যেষ্ঠতাত। ইনি 'খবরওয়ালা' মহাশয়েরই বড় ভাই। ইহার স্বভাবও অনেকটা তাঁহারই মতন। ইনি যে শ্রেণীতে পাঠ করেন, তাহার তিন-চারি ক্লাশ উপরের পাঠ্যপুস্তক লইয়া নাড়াচাড়া করেন। যে-সকল পুস্তক কোনোদিন চক্ষে দেখেন নাই, তাহাতে কি লেখা আছে, সেই কথাটা বিশেষ করিয়া তোমাকে বার বার বলিলেন। ইস্কুলে গিয়া মাস্টারমহাশয়কে যে-সকল পুস্তকের কথা বলিতে হইবে, তাহার খবর খুব কমই রাখেন। এই শ্রেণীর অনেক জ্যেষ্ঠতাত দেখিয়াছ। এরা প্রায়ই একটু নীচ-প্রকৃতির হইয়া থাকে। ছাত্রসভায় বক্তৃতা করিতে হইলে বই মুখস্থ করিয়া আইসে। এই শ্রেণীর একজন আমাকে একবার চিঠি লিখিয়াছিল, সেই চিঠিখানি মেকলে সাহেবের একখানা পত্রের অবিকল নকল।

তিনের নম্বরে, মুরব্বি জ্যেষ্ঠতাত। তোমার কোন বিষয়ে কি ত্রুটি আছে, তাহা বাহির করিয়া তোমাকে তিরস্কার করা ইঁহার ব্যবসায়। কোনো-এক কাজ যদি না করিয়া থাক, তবে

তোমার বড়ই অন্যায় হইয়াছে, আর যদি করিয়া থাক, তাহা হইলে কাজটা ভালো হয় নাই। ইনি যদি তোমার সহপাঠী হন, তবে তোমাকে এমন সকল আঁক কষিতে দিবেন, যাহা তাঁহার বিদ্যাতে কিছুতেই কুলায় না। তাহাতে যদি তোমার একটু দেরি হয় তবে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিবেন যে, তিনি খুব অল্প সময়েই এরূপ আঁক সব কষিয়া ফেলেন। যদি খুব শীঘ্রই আঁকটা কষিয়া ফেলিতে পার, তবে বলিলেন, 'বড় ঘুরিয়াছ।' যদি একটা কোনো সহজ উপায় দেখাইয়া দিতে বল, তবে হয়তো বলিবেন যে, তাঁর অনেক কাজ আছে, সময় কম। এই বলিয়া প্রস্থান করিবেন।

এই শ্রেণীর একটা লোক এমনভাবে কথাবার্তা বলিত যেন তাহার মতন ভালো জিনিস কিনিতে কেহ জানে না। অন্য কেহ একটা কোনো জিনিস কিনিয়া আনিলেই বলিত, 'তোমাকে ঠকাইয়াছে। আমি এর চাইতে কম দামে আনিতে পারিতাম। অনর্থক পয়সাগুলি জলে ফেলিয়াছ।' নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অতি কমই ছিল। কিন্তু সেই বাড়িতে যে-সকল কলেজ-ক্লাশের ছেলে থাকিত তাহাদের পড়াশুনা কেমন চলিতেছে তাহার খবরটা রীতিমতো রাখা হইত। মাঝে মাঝে তাহাদের বই খুলিয়া দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইত। এই ব্যক্তি একদিন চিৎপুর রোড দিয়া যাইবার সময় দেখিল যে দুইজন লোক কতকগুলি সোনার ফুল কুড়াইয়া পাইয়াছে, আর একজন তাহাকে সেগুলি লইয়া যাইতে দিতেছে না। জ্যেষ্ঠতাতকে দেখিয়া তাহারা উভয়েই মধ্যস্থ মানিল। বিচারের মীমাংসা এই হইল যে, ফুলগুলিকে তিনভাগ করিয়া তিনজনে পাইবে, এবং যে ব্যক্তি প্রথমে কুড়াইয়া পাইয়াছিল তাহাকে অপর দুজনে সামান্য মূল্য দিবে। জ্যেষ্ঠতাতের সঙ্গে তিনটি টাকা ছিল, তাহা দিয়া সে কুড়িটি ফুল কিনিল। বাড়ি আসিয়া সে সেদিন আর আস্তে কথা কহিতে পারে না। অধিক বুদ্ধি থাকিলে ব্যাপারটা কিরূপ হয় সকলকে ডাকিয়া তাহাই বুঝাইয়া দিতে লাগিল। একজন একটি ফুল হাতে লইয়া দেখিল যে ফুলটি পিতলের, তাহার উপর সামান্য গিল্টি। এই কথা যখন জানা গেল, তখন হাসির ধুম পড়িল। এর পরে অনেকদিন পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতাত কোনো উৎপাত করে নাই।

চতুর্থ নম্বরে — বড়লোক জ্যেষ্ঠতাত। যাহার সমকক্ষ, তাহাদের সহিত ইহারা কথা কহিবে না। যাহারা নিজের অনেক উপরে তাহাদের সঙ্গে মিশিতে চাহিবে এবং তাহাদের পদলেহন করিবে। ক্লাশে মাস্টারমহাশয়ের সঙ্গে ইয়ারকি দিবে, লোকের নিকট টাকা ধার করিয়া বাবুগিরি করিবে। টাকা চাহিলে বিরক্ত হইবে। নিজের যেমন অবস্থা তেমনি অবস্থার লোকদিগকে ঘৃণা করিবে, কোনো ভালো কাজের জন্য কিছু দিতে বলিলে খাতায় স্বাক্ষর করিবে না—যদি করে, তবে নিশ্চয়ই তাহা দিবে না। ঘৃণায় যাহাদের সহিত কোনোদিন মিশে না, মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-একবার তাহাদের নিকট অত্যাধিক আত্মীয়তা দেখাইতে আসিবে। তাহাদের সামান্য কোনো জিনিস থাকিলে তাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বেশি দাম দিয়া একটা ভালো জিনিস কিনিতে বলিবে। সেই উপলক্ষে নিজের কেমন সব উচ্চদরের জিনিস না হইলে ব্যবহার হয় না, বড়-বড় বই না হইলে পড়া হয় না, তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিবে। এরপর নিজের একটা খুব বড় কাজ করিতে হইবে, আর অধিক সময় নাই, এই বলিয়া বিদায় লইবে। যাইবার সময় হয়তো বলিবে, 'ভাই কিছু টাকা দিতে পার? কাল দিব।' নাহয় এমন একটা কোনো কাজের ভার দিবে যে তাহা হয় তাহার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, নাহয় তাহা নিজে করিতে সে লজ্জিত হয়, পাছে লোকে তাহাকে ছোটলোক মনে করে।

এরপর সমালোচক জ্যেষ্ঠতাতের কথা বলিয়া শেষ করিব। এমন বিষয় নাই। যাহা লইয়া এ ব্যক্তি নাড়াচাড়া না করিবে। এমন লোক নাই নিজের চাইতে সে যত বড় লোকই হউক-না কেন, যাহার সম্বন্ধে সে দু-চার কথা না বলিবে—নিজের যাহা নয়, বা নিজে যাহা করে নাই, সাধ্য সত্ত্বেও তাহার প্রশংসা করিবে না। যদি দায়ে পড়িয়া নেহাত দুই কথা বলিতে হয়, তবে এমন একটা খট্‌কা দিয়া রাখিয়া দিবে যে তাহাতেই তাহার নিজের কাজ সিদ্ধ হয়। এমন কিছু প্রশংসকার কাজ হইতে পারে না যাহা সে মনে করে যে সে করিতে পারে না, এতদিন যে তাহা করিয়া ফেলে নাই তাহা তাহার অনুগ্রহ। অন্যের যাহা দেখিয়া নিন্দা করিবে, সে জিনিসটা নিজের হইলে আবার তাহারই প্রশংসা করিবে।

পুরাতন কথা ঃ ১

পরিষ্কার আকাশ হইলে ক্রমাগত চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। চিলগুলি ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ কত উঁচুতে উঠিতেছে। দু-একটা শকুন আবার এর চাইতেও কত উপরে উঠিয়া গিয়াছে। নীল আকাশে তাহাদিগকে এক-একটি কালো বিন্দুর মতো দেখায়। কতদিন দেখিয়াছি, আকাশের একস্থানে কোথা হইতে এখটি অতি হালকা সাদা মেঘ আসিয়াছে। কোথা হইতে আসিল কিছুই বলিতে পারিতেছি না। মুহূর্তেক আগে সেটি সেখানে ছিল না, অন্য কোনোদিক দিয়া কখনই আসে নাই—তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম।

মেঘটি কোথা হইতে আসিল? আবার ঐ দেখ সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরমা বলিয়াছিলেন, 'পাহাড়ে গাছের কচি পাতা খাইবার জন্য অভ্রেরা দল বাঁধিয়া শূন্য পথে চলিয়া যায়, আমরা তাহাদিগকে মেঘ বলি, কিন্তু পাহাড়ের লোকেরা বল্লম হাতে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে তাহাদের অপেক্ষা করিতেছে। এরা যেই পাহাড়ে পৌঁছাইবে, অমনি ইহাদিগকে বধ করিয়া বাজারে বিক্রি করিতে আনিবে।' কিন্তু ঠাকুরমার কথা তো দেখিতেছি এখানে খাটিতেছে না।

মেঘেরা তবে কে? মেঘেরা অতি সূক্ষ্ম জলকণার সমষ্টি। গরম বাতাসের ভিতরে জলীয়বাষ্প মিশ্রিত থাকে, তখন আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না। বরং শুষ্ক বায়ুর ভিতর দিয়া দূরের জিনিস যেমন দেখিতে পাইতাম, জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকার দরুন তার চাইতে পরিষ্কার দেখি। ঠাণ্ডা লাগিলে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম জলের কণাসকল বায়ু হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। তখন তাহাদিগকে আমরা মেঘ বলি। ইহারা যখন আরো ঘন হইয়া মাটিতে পড়িবে, তখন বৃষ্টি হইবে। নদী পুকুর ইত্যাদিতে জল দাঁড়াইবে। ঠাণ্ডা দেশে আবার কত জায়গায় এই জল জমিয়া বরফ হইবে।

মেঘের বেলায় যাহা হইয়াছে, পৃথিবীর বেলাও বিস্তৃত আকারে কতকটা তেমনি হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী এককালে বাষ্পের আকারে ছিল, ক্রমে শীতল হইয়া তরল হয়, শেষটা তাহার বর্তমান কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এখনো পৃথিবীর সমস্তটা কঠিন হয় নাই। আগ্নেয়গিরি হইতে মাঝে মাঝে অতিশয় গরম গলানো জিনিস সব বাহির হয়, এ কথা তোমরা জান। ঐগুলি পৃথিবীর ভিতরকার জিনিস। ঘি জ্বাল দিয়া রাখিলে যেমন প্রথমে তাহার উপরে খানিকটা জমে, কিন্তু ভিতরটা তরল অবস্থায়ই থাকে, পৃথিবীরও এখন সেই

অবস্থা। আরও কয়েক শত কোটি বৎসর পরে পৃথিবী এত ঠাণ্ডা হইবে যে, তাহার ভিতর অবধি জমিয়া যাইবে। তখন শীত এত বাড়িবে যে, পৃথিবী আর জীবজন্তুর বসবাসের উপযোগী থাকিবে না। চন্দ্র বেচারির এখন এই দশা হইয়াছে। তাহার ভিতরকার আগুন অনেককাল নিবিয়াছে। অনেককাল হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে— আমরা তাহার কঙ্কালমাত্র দেখিতেছি। কি ভাগ্য, ভাই, অমর হই নাই। তাহা হইলে সেই ভয়ানক শীতের সময় কি কষ্টই হইত। তুলার গাছ মরিয়া যাইত, সুতরাং কাপড় পরিতে পাইতাম না। ভেড়াগুলি মরিয়া গেলে শীত নিবারণের উপায় থাকিত না। খাবার জিনিস যাহারা জোগায়, তাহাদের মৃত্যু হইলে ক্ষুধায় চিরকালটা ক্লেশ পাইতাম।

সূর্যের ঘূর্ণনের চোটে মাঝে মাঝে তাহার এক-এক টুকরা তাহার ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল। ঐ সকল টুকরা শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে গোল আকার ধারণ করিল। প্রথমে ইহারা সূর্যের ন্যায় গরম ছিল। এক কড়া গরম দুধ হইতে এক চামচে দুধ তুলিয়া লইলে যেমন চামচের দুধ শীঘ্র ঠাণ্ডা হয় কিন্তু কড়ার রাশিকৃত দুধ তত শীঘ্র শীতল হইতে পায় না। সেইরূপ এই নকল টুকরা শীঘ্র শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইয়া প্রথমে তরল তৎপরে কঠিন হইয়াছে, কিন্তু সূর্য আজিও অতিশয় গরম বাষ্পের আকারে রহিয়াছে। এইরূপ একটি টুকরার সঙ্গে আজকাল আমাদের বড়ই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে এবং আমরা 'পৃথিবী' বলিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছি।

পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন হইয়াও অনেককাল খুব গরম ছিল। পৃথিবীর জলভাগ তখন বাষ্পের আকারে ছিল। ক্রমে পৃথিবী আরো ঠাণ্ডা হইল, তখন তাহার পূর্বে জল জমিতে আরম্ভ হইল। এইরূপে সমুদ্রগুলির জন্ম হইল।

বস্তু সকল যতই ঠাণ্ডা হইতে থাকে, ততই তাহাদের আয়তন কমিতে থাকে। কঠিন পদার্থের চাইতে তরল পদার্থের আয়তন খুব শীঘ্র শীঘ্র কমে। পৃথিবীর ভিতরকার তরল জিনিস শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যত ছোট হইতেছে, বাহিরের কঠিন আবরণ দেরিতে কমার দরুন, তত ছোট হইতে পারিতেছে না, সুতরাং সে কোঁকড়াইয়া যাইতেছে। এইরূপে পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমশ অধিক উঁচু-নিচু হইতেছে। এই ব্যাপার আমাদের চক্ষের সামনে অবিরত ঘটিতেছে। এককালে পৃথিবীর কোনো স্থান সমুদ্রের নীচে ছিল, তাহা জাগিয়া উঠিতেছে, কোনো স্থান-বা আগে উঁচু ছিল, এখন ক্রমে নিচু হইতেছে। কোনো স্থান-বা প্রথমে একবার উঁচু থাকিয়া, মাঝে নিচু হইয়া, শেষে আবার উঁচু হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুন্দরবনে কোনো সময়ে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, এখন জলে ডুবিয়া যাইতেছে। হিমালয় পর্বতের অনেক স্থানে সামুদ্রিক জীবের চিহ্নসকল পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং হিমালয় পর্বতের ঐ-সকল স্থান এক সময়ে সমুদ্রের নীচে ছিল। ইটালিতে একস্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছিল। সেই স্থান ক্রমশ নিচু হইয়া মন্দিরের স্তম্ভ গুলির কিয়দংশ পর্যন্ত ডুবিয়া যায়। আবার সেই স্থান উঁচু হইতে আরম্ভ করিয়াছে। নরওয়ের অনেক স্থান নিচু হইতেছে। সুইডেনের অনেক স্থান উঁচু হইতেছে। বল্টিক সমুদ্রের তলা ক্রমশ উঁচু হইয়া তাহার গভীরতা কমিয়া যাইতেছে। এইরূপে সাগর শুকাইয়া দেশ হইতেছে এবং দেশ ডুবিয়া সাগর হইতেছে। ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে অনেক সময় খুব শীঘ্র শীঘ্র ভূপৃষ্ঠে গুরুতর পরিবর্তন সকল ঘটে। দক্ষিণ আমেরিকায় একবার ভূমিকম্প হইয়া এক দেশের কিয়দংশ একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল।

পুরাতন কথাঃ ২

বৃষ্টি হইলে নিচু জায়গায় জল দাঁড়ায়। বুদ্ধিমান গৃহস্থেরা উঠান উঁচু রাখেন, আর ছোট-ছোট নালা কাটিয়া জল সরিবার বন্দোবস্ত করেন। বৃষ্টির সময় ঐ-সকল নালা ছোট-ছোট নদীর আকার ধারণ করে, ছেলেবেলায় তাহাতে মোচার খোলার নৌকা ভাসাইয়া আমোদ দেখিয়াছি। উঠানের যত কিছু ধূলা, মাটি, খড় কুটা সকলেরই নমুনা বৃষ্টির জলের সঙ্গে ঐ-সকল নালা দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। নালার জল ভারি ঘোলা হইয়াছে। ঐ জল হয়তো একটা বড় গর্তে যাইয়া পড়িতেছে। গর্তের কাছে গেলে দেখিবে, সেখানে অনেক জল দাঁড়াইয়াছে। বৃষ্টি হইয়া গেলে ঐ জল থিতাইয়া ক্রমে পরিষ্কার হইবে, ক্রমাগত কয়েকদিন বৃষ্টি না হইলে শুষিয়া যাইবে। এখন যদি একবার ঐ গর্তের তলাটা পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে যে তলায় অতি মিহি মোলায়েম কাদা জমিয়াছে। ঐ কাদা উঠান হইতে আসিয়াছে। উঠান হইতে ভারী জিনিস যাহা কিছু আসিয়াছিল, তাহা ঐ কাদায় ঢাকা পড়িয়াছে।

বর্ষাকালে নদীর জল বাড়ে। চৈত্র বৈশাখ মাসে ছোট নদীটি ঝির্ ঝির্ করিয়া কোনমতে দিনপাত করে। তাহার পরিষ্কার টল্‌টলে জলটুকু দিন দিন শুকাইয়া যায়, দেখিলে দুঃখ হয়। বর্ষাকাল আসুক, দেখিবে তাহার আর সে অবস্থা নাই। তখন এ স্বচ্ছ জল থাকিবে না, দুরন্ত রাখাল বালকেরা তখন আর চৌপব দিন ধরিয়া স্নান করিতে থাকিবে না, তখনকার সেই দেশ ভাসানো ঘোলা জল আর তার বেগ দেখিলেই মনে একটা কুমির-কুমির ভাব আসে। এভাবেও কিছু আর চিরদিন যাইবে না। বর্ষা চলিয়া গেলে আবার নদীর পরিসর কমিতে থাকিবে। ঘোলা জল থিতাইয়া ক্রমে পরিষ্কার হইবে। নদীর দুই ধারে যে-সকল জায়গা ডুবিয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার একটু একটু করিয়া জাগিবে। এখন দেখিবে তাহাদের উপরেও অতি মিহি মোলায়েম কাদা জমিয়াছে। সাধারণ কথায় বলিবে, 'পলি পড়িয়াছে।'

উঠানের নালার জল যেমন গর্তে পড়িয়াছিল, নদীর জলও তেমনি হয়তো সমুদ্রে পড়িতেছে। নদীর জলে কত জিনিস — কত গাছপালা, কত জন্তুর মৃত শরীর ভাসিয়া যায়, তাহাদেরও অনেকে সমুদ্রে যাইয়া পড়িতেছে। সেখানে কয়েকদিন ভাসিয়া তারপর তলাইয়া যাইতেছে। এইরূপে নদী যে-সব জায়গার ভিতর দিয়া আসিয়াছে, তাহাদের কিছু কিছু নমুনা সমুদ্রের তলায় আসিয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক বর্ষার ঘোলা জল হইতে পলি পড়িয়া আবার ইহাদিগকে ঢাকিতেছে। এইরূপে এক-এক বৎসরের এক এক স্তর পলি আর সেই সকল স্তরের মাঝে নানানরকমের জিনিসের নমুনা জমিতেছে।

জোয়ার-ভাঁটা অনেকেই দেখিয়াছ, না দেখিয়া থাকিলেও তাহার বিষয় পড়িয়াছি। সমুদ্রের জল দিনে দুইবার করিয়া বাড়ে কমে, তাহাকেই আমরা জোয়ার-ভাঁটা বলি। সমুদ্রের সহিত যে-সকল নদীর সংযোগ আছে সেই সকল নদীতেও জোয়ার-ভাঁটা হয়। সমুদ্রের দিকে নদীর জল গড়াইয়া চলে, কিন্তু জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল উঁচু হওয়ার দরুন সমুদ্রের জল নদীর ভিতরে আসে। নদীতে তখন জল বাড়িতে থাকে, এবং দুধারের জমি অনেক দূর অবধি ডুবিয়া যায়। আবার ভাঁটার সময় জল সরিয়া আসে। জোয়ারে ডোবা জায়গাগুলি আবার ভাসিতে থাকে। তখন দেখা যায়, তাহাদের উপরে পলি পড়িয়াছে। নদীর জল যত

অধিক ঘোলা হয়, এই পলি ততই পুরু হইয়া পড়ে, আর জোয়ার যত বেশি হয় নদীর দুপাশের জমি ততই দূর অবধি ডুবিয়া যায়।

অমাবস্যা পূর্ণিমায় যত জোয়ার হয়, অষ্টমীর দিন তাহার চাইতে অনেক কম হয়। অমাবস্যার দিন অনেক দূর অবধি ডুবিয়া পলি পড়িয়াছে। আবার পূর্ণিমা না আসিলে এত দূর জল আসিবে না। এর মধ্যে যদি বৃষ্টি না হয়, তবে এই পলি শুকাইয়া শক্ত হইয়া যাইবে। যখন এই পলি কোমল ছিল, তখন ইহার উপর দিয়া কত পশুপক্ষী চলিয়াছে, কত গাছের পাতা বাতাসে উড়িয়া আসিয়া ইহার উপরে পড়িয়াছে। মিহি কাদায় সেই-সকল পশুপক্ষীর পা এবং সেই-সকল পাতার অতি চমৎকার ছাঁচ রহিয়াছে। এর মধ্যে যদি দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেকটি ফোঁটার দাগ রহিয়াছে। একবার শুকাইতে পারিলেই এই সকল দাগ ও ছাঁচ চিরস্থায়ী হইয়া রহিল। পূর্ণিমার সময় ইহার উপর আবার একস্তর পলি পড়িবে, কিন্তু সে পলিতে এই-সকল দাগের কোনো অনিষ্ট হইবে না। প্রতিদিন সকালে অনেক ঘরের মেঝেতে মাটির লেপ দেওয়া হয়। এই সকল লেপের স্তর একটির সঙ্গে আর একটি মিশিয়া যায় না। পুস্তকের পাতার মতো তাহারা পৃথক পৃথক থাকে। পলি পড়ার সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি। এক স্তর পলি যদি শুকাইতে পাইল, তবে আর এক স্তর পলি তাহার উপরে পড়িলেও দুটি স্তর পৃথক পৃথক থাকিবে।

পুরাতন কথা ঃ ৩

এতক্ষণ যাহা বলা গিয়াছে, তাহা হইতে কি শিখিলাম, দেখা যাউক্‌ —

১ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে ক্রমাগত পরিবর্তন হইতেছে। দেশ ডুবিয়া সাগর হইতেছে, সাগর ডুবিয়া দেশ হইতেছে।

২ জল থিতাইয়া পলি পড়ার দরুন নানারূপ গাছপালা জীবজন্তু ইত্যাদির চিহ্ন থাকিয়া যাইতেছে।

এই দুইটি কথা বেশ করিয়া মনে রাখ। তারপর যাহা বলি শ্রবণ কর।

অনেক সময় জলে এমন সব জিনিস সব মিশ্রিত থাকে যে, তাহার সাহায্যে জলে ডোবা বস্তুগুলি পাথর হইয়া যায়। একবার এইরূপে পাথর হইতে পারিলে আর সে-সব জিনিসের ধ্বংস হয় না—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাহাদের চিহ্ন বর্তমান থাকে। পাথর মানুষের অতিশয় প্রয়োজনীয় বস্তু, সুতরাং মানুষেরা তাহা সংগ্রহ করিতে যায়। এইরূপে পাথর আনিতে গিয়া তাহার ভিতরে অনেক সময় নানাপ্রকার জীবজন্তুর হাড় পাওয়া যায়। সেই-সকল হাড় দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিতে পারেন, তাহা কিরূপ জন্তুর হাড় ছিল। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে কোনো নদীর তলায় পলি পড়িয়াছিল, তখন একটা জন্তুর মৃতদেহ তাহাতে ঢাকা পড়িয়াছিল। জলে এমন কোনো পদার্থ ছিল, যাহার জন্য ঐ-সকল পলি এবং হাড় পাথর হইয়া গেল। কালক্রমে সে স্থানের মাটি উঁচু হইয়া সেখানে একটা পাহাড় হইল। আজকাল সেই পাহাড়ের কাছে মানুষ বলিয়া একরকম জন্তু চলাফেরা করে। তাহাদের ঘরদোর তয়ের করিবার জন্য পাথরের দরকার হয়, সেই পাথর তাহার ঐ পাহাড়ের গা হইতে কাটিয়া বাহির করিতে গিয়া ঐ হাড়গুলি পাইল। অনতিবিলম্বে পালিয়ন্টলজিস্ট নামক একপ্রকারের পণ্ডিত

মানুষ আসিয়া চশমা চোখে, নোটবই হাতে তাহাদের পরীক্ষা করিতে লাগিল। পরীক্ষায় স্থির হইল যে, এ হাড় যে জানোয়ারের, তাহার মতন জন্তু আর এখন পৃথিবীতে নাই।

কোটি বৎসর পূর্বে হয়তো কোনোস্থানে প্রকাণ্ড বন ছিল। একদিন তাহা ধসিয়া গিয়া জলাতে পরিণত হইল। লক্ষ বৎসর ধরিয়া সেই জল হইতে ঐ বনের গাছপালার উপর পলি পড়িল, তাহার ঢাকা পড়িল। কালে জলার চিহ্ন পর্যন্ত লোপ হইয়া সেস্থান সমান জমিতে পরিণত হইল। তাহার নীচে সেই যে বহুকালের পুরাতন বনের গাছপালাগুলি ঢাকা পড়িয়াছে, এতদিনে তাহাদের কি হইয়াছে জান? এতদিনে তাহাদের শরীরের গঠনের উপকরণগুলি রূপান্তরিত হইয়া পাথর-কয়লার আকার ধারণ করিয়াছে। এই-সকল পাথর-কয়লার মধ্যে স্থানে স্থানে এক-একটা আস্ত গাছের গোড়া, নানারকমের পাতা ইত্যাদি পাওয়া যায়। তাহার আকৃতি ঠিক বজায় রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা পাথর-কয়লা হইয়া গিয়াছে। এই-সকল গাছপালার চিহ্ন দেখিয়াও পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে তাহাদের অনেকেই বর্তমান গাছপালা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন।

বড়-বড় জলার ধারে কত জানোয়ার জল খাইতে আসে। জলে যে সব লতা-পাতা জন্মে তাহা খাইতেও ছোট-বড় কত জন্তু আসে। এইসকল জলাতে প্রায়ই ভয়ানক কাদা হয়। আজকালও অনেকের গোরু-বাছুর এইরূপ কাদায় ডুবিয়া মারা যায়। প্রাচীনকালে এইরূপ ঘটনা ঘটিত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। জলার ধারে আসিয়া একবার যদি গভীর কাদায় পা পড়িল, তবে আর রক্ষা নাই। যতক্ষণ জন্তুটি পানাহারে ব্যস্ত, ততক্ষণে পাগুলি অজ্ঞাতসারে অনেক দূর বসিয়া গিয়াছে। চলিয়া যাইবার সময় পা উঠে না। ভয়ে জন্তুটি যতই হুড়াহুড়ি করিতেছে, পাগুলি ততই অধিক বসিয়া যাইতেছে। অবশেষে শরীরটি অবধি ডুবিয়া সেই ভয়ানক কাদার ভিতরে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইল। আমেরিকায় এরূপ অনেক জলা ছিল, তাহাদের অনেকগুলি আজ একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। এই-সকল স্থান খুঁড়িয়া পণ্ডিতেরা অনেক অত্যাশ্চর্য জন্তুর অস্থি, কঙ্কাল, এমন-কি, অনেক সময় আস্ত শরীর অবধি পাইয়াছেন। আয়র্ল্যান্ডি এবং স্কটল্যান্ডের স্থানে স্থানেও এমন হইয়াছে। সাইবেরিয়াতেও সময় সময় এরূপ ঘটনার চিহ্ন পাওয়া যায়।

পূর্বকালে কিরূপ জন্তুসকল ছিল, তাহা কিরূপে জানা যায়, এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছ। অনেক সময় কেবলমাত্র পদচিহ্ন দেখিয়া জন্তুবিশেষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কোনো সময় অস্থিখণ্ডমাত্র দেখিয়া তাহার স্বভাব-চরিত্র নির্ণয় করিতে হইয়াছে। কোনোস্থানে আস্ত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, কোনোস্থানে সমস্ত শরীরটাও পাওয়া গিয়াছে। তখন তাহাদের পেট কাটিয়া পরীক্ষা করা গিয়াছে। একবার একজন পণ্ডিত এইরূপে প্রাপ্ত একটা জন্তুর হাড় হইতে সুপ প্রস্তুত করিয়া অন্যান্য পণ্ডিতদের উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহারা খাইয়া কি বলিলেন, জানিতে পারি নাই।

পৃথিবীর সকল স্থানেই এইরূপ লুপ্ত জন্তুর চিহ্ন পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও তাহা নিতান্ত বিরল নহে। ঐ-সকল জন্তু কতদিন হইল লোপ পাইয়াছে, তাহা অবশ্য সকল স্থলে বলা যায় না। কিন্তু কোনটি পুরাতন, কোনটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এ কথা অনেক স্থলেই বলা সম্ভব। আবার দুইশত বৎসর পূর্বে লোকেরা দেখিয়াছে, এখন তাহা নাই, এরূপ জন্তুও নিতান্ত কম নহে। পুরাতন প্রাণীবৃত্তান্তের পুস্তকে, এবং প্রাচীন নাবিকদিকের লিখিত প্রবন্ধাদিতে

অনেক সময় অনেক জন্তুর বিবরণ এবং চিত্র পাওয়া যায়। আজকাল সে-সকল জন্তুর চিহ্ন পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে।

আদবকায়দা

দেশ ভেদে আদব কায়দার কত প্রভেদ হয়! আবার একস্থানেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিতরে এ বিষয়ে কত মতভেদ দেখা যায়। গল্প আছে যে, একবার অতিশয় নিম্নশ্রেণীর একজন লোক লেখাপড়া শিখিয়া বড়লোক হইয়াছিল। তাহার বড়ই ইচ্ছা হইল যে স্বজাতীয় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিবে। আয়োজন অনেক হইল, সমাদরের সীমা নাই। ইহাতে কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। তাহারা সহজবুদ্ধি লোক। তাহারা যখন দেখিল যে, যে-সকল কথা বলিয়া দশ জায়গায় নিমন্ত্রণের সময় তাহাদিগকে আদর করে, যে-সকল জিনিস চিরকাল ঐরূপ স্থলে তাহারা খাইয়া থাকে, এ জায়গায় তাহার কিছুই নাই, তখন তাহাদের বড়ই বেখাপ্পা বোধ হইতে লাগিল। তাহার বলিল, 'এরা আদবকায়দা কিছু জানে না, এখানে খাওয়া হবে না।' — এই বলিয়া সকলে যাইতে উদ্যত হইল। বাড়ির কর্তা ইহাতে বড় ব্যস্ত হইলেন, কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। এই সময়ে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিলেন, 'কোনো চিন্তা নাই, আমি সব করিয়া দিতেছি।' এই বলিয়া তিনি 'আপনি' 'মহাশয়' ইত্যাদি সম্ভ্রার্থক শব্দ পরিত্যাগ করিয়া 'তুই' 'তোরা' ইত্যাদি শব্দে তাহাদিগকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। বসিতে আসন দেওয়া হইয়াছিল, সে-সব তুলিয়া ফেলিলেন। লুচির পরিবর্তে মোটা ভাত, শুকনো মাছ আর লঙ্কার চচ্চড়ি, আর কিঞ্চিৎ দধির জোগাড় করিলেন। নিমন্ত্রিতগণ অমনি মহানন্দে কোলাহল করিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

পথে দেখা হইলে, ভক্তিভরে কাহারও পায়ের ধুলা নিই, কাহাকে একটি 'কুডুলে' নমস্কার করিয়াই যথেষ্ট মান্য হইয়াছে মনে করি, আবার কোনো অল্পভাগ্য লোককে কেবলমাত্র দন্তপঙ্ক্তি দেখাইয়া বিদায় দিই।

ফ্রান্স দেশে ভদ্রলোকে ভদ্রলোকে দেখা হইলে, অনেক স্থলে পরস্পরকে চুম্বন করিবার রীতি আছে। একজন ফরাসী একবার তাঁহার এক ইংরাজ বন্ধুকে দেখিতে গেলেন। ফরাসী আসিয়াছেন শুনিয়াই ইংরাজ তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে গিয়া মুখময় সাবান মাখিয়া আসিলেন। ফরাসীকে অগত্যা বন্ধুর টাক পড়া তালুতে চুম্বন করিয়া ভদ্রতা রক্ষা করিতে হইল।

আফ্রিকা দেশে এক জাতীয় লোক আছে। তুমি যদি তাহাদের বাড়িতে যাও, আর যদি গৃহস্বামী তোমাকে যৎপরোনাস্তি সমাদর করিতে ইচ্ছা করেন, তবে চাকরকে দুই বাটি রঙ আনিতে বলিবেন, একবাটিতে সাদা রঙ অপর বাটিতে কালো রঙ। রঙ আসিলেই তিনি তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া যত্নের সহিত মুখে মাখিতে থাকিবেন। তুমিও যদি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ না কর, তবে তোমাকে ভাবি অসভ্য, আদবকায়দা-বিহীন জংলী জানোয়ার মনে করিবেন।

একবার একজন বড় ইংরাজ কোনো অসভ্য জাতির সহিত সন্ধি করিতে গিয়াছিলেন। সেই জাতির দলপতির দরবারে সাহেবকে লইয়া যাওয়া হইল। দলপতি পরম সমাদরে

গাত্রোত্থান করিয়া সাহেবকে অভ্যর্থনা করিলেন। সাহেবও অবিকল সেইরূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া প্রতিনমস্কার জানাইলেন। নিকটস্থ হইলে দলপতি সস্নেহে সাহেবের হাতখানি টানিয়া লইলেন, এবং ধীরে ধীরে তাহার ঠিক মধ্যস্থলে অতি সুন্দর এক বিন্দু থুথু ফেলিলেন, সাহেবের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু পাছে অসভ্যতা হয়, তাই বাহ্যিক কিছু প্রকাশ করিলেন না। দলপতি নিবৃত্ত হইবামাত্রই সাহেব তাঁহার হাতখানি টানিয়া লইয়া নূতন শিক্ষিত প্রণালী অনুসারে যথাসাধ্য সদ্ভাব জ্ঞাপন করিলেন। সাহেবের এই ব্যবহারে উপস্থিত সকলেই যারপরনাই খুশি হইলেন এবং সন্ধি হইতে আর কোনো গোল হইল না।

অন্ধদের বই পড়া

ডাক্তার মূনের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। ১৮৩৫ সালে ইনি অন্ধ হন। সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা। এত কাল ইনি অন্ধদের জন্য খাটিয়াছেন, বিশেষত কিরূপ অক্ষরে পুস্তক ছাপা হইলে তাহাদের পক্ষে বেশি সুবিধা, তাহার সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছেন।

অন্ধেরা কিরূপে পড়িতে পারে, এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পার। যাহাদের চোখ নাই, তাহারা যে আমাদের মতো চোখের সাহায্যে পড়িতে পায় না, এ কথা সহজেই বুঝা যায়। অন্ধেরা হাতের সাহায্যে পড়ে। প্রায়ই দেখা যায় যাহাদের একটা শক্তি নাই, আরেকটা শক্তি তাহাদের খুব প্রখর হয় আর তা হওয়াও স্বাভাবিক, একটা শক্তি না থাকিলে অপর একটার দ্বারা তাহার কাজ চালাইতে হয়, কাজেই সেটার চালনা খুব বেশি হয়। চালনার দ্বারা শক্তি বাড়ে।

কোন জিনিসটা কিরূপ পরীক্ষা করিতে হইলে, তাহার উপর হাত বুলাইয়া দেখ। এইরূপ ক্রমাগত হাত বুলাইয়া তাহাদের স্পর্শ শক্তিটা আমাদের চাইতে অনেক প্রখর হয়। অন্ধকে মুখে হাত বুলাইয়া মানুষ চিনিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমরা তাহা পারিনা, কারণ আমাদের স্পর্শ শক্তি তেমন চালনা হয় নাই। অক্ষর যদি কালিতে লেখা না হইয়া খোদা হয়, তবে অন্ধ তাহাতে হাত বুলাইয়া, সহজেই তাহার চেহারাটা মনে করিয়া লইতে পারে। অক্ষরগুলি খোদা না হইয়া, উঁচু হইলে আরো সুবিধা হয়।

অন্ধদের পুস্তকের অক্ষর সব উঁচু-উঁচু। অন্ধরা তাহাতে হাত বুলাইয়া বেশ পড়িয়া যাইতে পারে। তবে আমরা যেমন ছোট-ছোট অক্ষর পড়িতে পারি, অন্ধেরা তাহা পারে না। তাহাদের খুব বড়-বড় অক্ষরের দরকার হয়। তোমাদের জন্যে যেমন 'সখা ও সাথী' বাহির হইয়াছে, অন্ধদের জন্য ইহারা ষোলো-সতেরো খানার মতন এক-একখানা 'সখা ও সাথী' বাহির করিলে, তবে ইহার সকল কথা তাহাতে ধরিত।

অন্ধদের জন্য নানাপ্রকার লিখিবার প্রণালী বাহির হইয়াছে। মূন সাহেব সেগুলির দোষগুণ বিচার করিয়া, তার চাইতে অনেক সহজ উপায় স্থির করিয়াছেন। এই নূতন উপায়ে এখন বিস্তর ছাপা হইতেছে। তোমরা স্কুলে যতরকম বই পড়, তাহার সবই এখন অন্ধরা পড়িতে পারে—তোমাদের অঙ্ক, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, ইত্যাদি সব। অন্ধেরা ম্যাপ দেখে, ছবি দেখে, স্বরলিপি দেখিয়া গান শিখে, সব ঐরূপে উঁচু-উঁচু করিয়া লেখা। তোমরা চোখে দেখ, তাহারা হাত বুলাইয়া দেখে।

অন্ধদের জন্য যে ছবি প্রস্তুত করা হয়, তাহা তোমাদের ছবির মতো নহে। তাহাদের কোনোরকম রঙ নাই, একটি কালো লাইন পর্যন্তও নাই। যাহারা জন্মান্ধ তাহারা তো কখনো রঙ দেখে নাই, সুতরাং তাহা যে কেমনতর তাহা তাহারা মনেও করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে মূন সাহেব যে গল্প বলিয়াছেন, তাহা বলিয়া আমার এই প্রস্তাব শেষ করিব।

লিখিবার সময়ে আমরা যেমন লাইনের পর লাইন বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ডাইনে শেষ করি, অন্ধদের তাহাতে ভারি অসুবিধা হয়। ওরূপ লেখা পড়িতে তাহারা সহজেই পথ হারাইয়া ফেলে। অন্ধদের লাইন একটি আমাদের লাইনের মতন বাম হইতে ডাইনে, তার পরেরটি পারসীর মতন ডান হইতে বামে, তার পরটি আবার বাম দিক হইতে ডাইনে, এইরূপ করিয়া লেখা হয়। এরূপ হইলে, যেখানে একটি লাইন শেষ হইল, সেইখানেই আরেকটি লাইনের গোড়া পাওয়া গেল, খুঁজিয়া বেড়াইবার আর দরকার হয় না। মূন সাহেবের সেই গল্প আমরা অন্ধদিগের কায়দায় লিখিতেছি। মূন সাহেব বলিতেছেন—

> 'অন্ধ হইবার পূর্বে আমার কুড়ি বৎসর বয়স হইয়াছিল, তাই কোন কিরকম চেহারা বাড়ির, দেখাইত কেমন সব জন্তু মানুষ ছিল কেমন রঙটা ছিল, সবই আমার বেশ মন আছে; কিন্তু আমি একটি মেয়েকে জানিতাম, পা চারি ঘোড়ার যে করিত মনে সে। ছিল অন্ধ অবধিই জন্মিয়া সে তাহার দুটিতে ভর করিয়া সে চলে। আর দুটিকে আমাদের হাতের মতন, করিবার প্রস্তুত ছবি জন্য অন্ধদিগের হইতেই ইহা। রাখে তুলিয়া করিয়া কথা আমার মনে হয়। আমি আমাদের বই লেখার মতন করিয়া উঁচু মেয়েটি অন্ধ সেই। করিলাম প্রস্তুত ছবি বাড়ির একটি দিয়া লাইন প্রথমে মনে করিল সেটা একটা জন্তু, সে কিনা পৃথিবীর কোনো জিনিসই আর সঙ্গে তাহার কিন্তু। করিয়াছিল মনে ওরূপ তাই নাই দেখে কখনো একজন ছিলেন, তিনি অল্পদিন যাবৎ অন্ধ হইয়াছেন। তিনি ছবি খানির একটা এযে মেয়ে বোকা! লিজি উঠিলেন বলিয়া বুলাইয়াই হাত উপর বাড়ি, বেশ বড় বাড়ি।'

সখা ও সাথী—১৩০১

বান ডাকা

এদেশের অনেক নদীতে জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়। চবিবশ ঘন্টার ভিতর দুবার করিয়া সমুদ্রের জল বাড়ে আর কমে, তাহাকেই জোয়ার আর ভাঁটা বলা হয়। যে-সকল নদীর সঙ্গে সমুদ্রের যোগ আছে, সমুদ্রের জোয়ারের জল তাহাতে প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতরেও জোয়ার ভাঁটা জন্মায়। তখন নদীর স্রোত কমিয়া যায়, অথবা একেবারে ফিরিয়াই যায়। কোনো কোনো নদীতে 'বান' ডাকে।

'বান ডাকা' কাহাকে বলে জান? সমুদ্রের জল নদীতে প্রবেশ করিবার সময় কখনো কখনো নদীর জলের চাইতে অনেকখানি উঁচু হইয়া আসে, ইহাকেই বলে 'বান ডাকা'। বানের মুখে নৌকা পড়িলে ভারি মুস্কিল, সুতরাং ঐ সময়ে নৌকার মাঝিরা ভারি ব্যস্ত হয়। ঘাটে যে-সকল লোক স্নান করে, বান ডাকিবার সময় তাহারা তাড়াতাড়ি ডাঙ্গায় উঠিয়া

আসে। দৈবাৎ দু-একজন সময়ে উঠিয়া আসিতে না পারিলে, যারপরনাই হাবুডুবু খায়। বান বেশি উঁচু হইয়া আসিলে, অনেক সময় তাহাতে পড়িয়া লোক মারা যায়।

কলিকাতায় বান অনেক সময় পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু হইয়া আসে। এবারে শুনা গিয়াছিল যে, আর বারের চাইতে অনেকখানি উঁচু হইয়া বান আসিবে। নদীর ধারের বাঁধগুলি নাকি এইজন্য উঁচু করা হইয়াছিল। নদীর ধারের বড়-বড় অফিস, কারখানা, ডক্ ইত্যাদি রক্ষা করিবার জন্যও নাকি দেয়াল গাঁথা হইয়াছিল। বানের তামাশা দেখিবার জন্যও হাজার-হাজার লোক কাজকর্ম ফেলিয়া গঙ্গার ধারে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, অনেক ফটোগ্রাফার ক্যামেরা খাটাইয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু বান আসিল না।

অমাবস্যা পূর্ণিমায় জোয়ার ভাঁটা খুব বেশি হয়, সাধারণত সেই সময়েই বান ডাকে। সকল অমাবস্যা পূর্ণিমাতেই যে বান ডাকে তাহা নহে, আবার নদীতে জোয়ার ভাঁটা থাকিলেই যে, সে নদীতে বান ডাকিবে তাহাও নহে।

জোয়ারটি যেমন প্রবল, নদীর স্রোতও তেমনি প্রবল হওয়া চাই। নদীর মুখ যদি বেশ চওড়া থাকে, তবে সমুদ্রের জল তাহাতে অনেক পরিমাণে ঢুকিতে পায়। নদীর মুখে চড়া না থাকলে, এই জল ক্রমে নদীর জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। কিন্তু নদীর মুখে চড়া থাকিলে সে জল সেখানে সঞ্চয় হইয়া বললাভ করে।

এই তিন বস্তু—নদীর স্রোত প্রবল থাকা, তাহার মুখ চওডা থাকার দরুন সমুদ্রের জোয়ারের জল বেশি পরিমাণে প্রবেশ করা, আর চড়ায় বাধা পাইয়া সেই জল রাশিকৃত হওয়া—এক জায়গায় হইলেই জোয়ারের সময় নদী আর সমুদ্রে মধ্যে একটা তুমুল যুদ্ধের জোগাড় পাকিয়া আসে। তখন সমুদ্রের সেই রাশিকৃত জল চড়া ডিঙ্গাইয়া নদীর ভিতরে প্রবেশ করে। নদীর পরিসর ক্রমে যতই কমিয়া আসে, ততই এই জল ছাড়াইবার স্থান না পাইয়া উঁচু হইয়া উঠে, আর তাহার বেগও ক্রমে ততই বাড়িতে থাকে। রেলের মতন বেগে সেই জল সোঁ সোঁ শব্দে অগ্রসর হয়, তাহার সামনে যে পড়ে, তাহার আর রক্ষা নাই।

চীন দেশে সিন্-তাং-কিয়াং নামক একটি নদী আছে। তাহাতে বড় ভয়ানক বান ডাকে। বান আসিবার এক ঘন্টা পূর্বে তাহার গর্জন শুনা যায়। নদীর জল হইতে বান বারো ফুট উঁচু হইয়া আসে! ঘন্টায় চৌদ্দ মাইল তাহার বেগ হয়।

চীন দেশের লোকেরা বানকে বড় ভয় করে। সিন্-তাং-কিয়াং নদীর বানের সম্বন্ধে তাহাদের দেশে একটি গল্প আছে। তাহারা বলে যে, প্রাচীন কালে তাহাদের দেশে একজন সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার মতন যোদ্ধা কেহ ছিল না। তিনি এত যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া শেষটা স্বয়ং সম্রাটের মনে হিংসা হইল। এইজন্য সম্রাট তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়া, শরীরটা সিন্-তাং-কিয়াং নদীতে ফেলিয়া দিলেন। সেই সেনাপতির প্রেতাত্মা আজও সে কথা ভুলিতে পারে নাই, তাই সে রাগের ভরে এক-এক-বার সমুদ্রের জল আনিয়া দেশ ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করে।

সিন্-তাং-কিয়াং নদীর বান হয়তো পৃথিবীর মধ্যে সকলের চাইতে উঁচু হয়। কিন্তু 'আমেজন' নদীর বানের পরিসর পৃথিবীর মধ্যে সকলের চাইতে বেশি। সে দেশের লোকেরা এই নদীর বানকে বলে, 'প্ররোরক'—অর্থাৎ 'সর্বনেশে'। এই নামটি হইতে ব্যাপারটির কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

আকাশের কথা ঃ ১

অন্ধকার রাত্রিতে যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, তাহা হইলে তারাগুলি বড় সুন্দর দেখায়। তখন ছাতে বসিয়া আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিতে বেশ লাগে। তারাগুলি কেমন মিট্‌মিট্ করে, দেখিয়াছ? দু-একজন হাসি-খুশি লোক আছে, তাহাদের যত হাসি সব চোখ দুটির ভিতরে। তারাগুলিকে দেখিলে আমার ঐরূপ লোকের চোখের কথা মনে হয়। বোধ হয়, যেন আমাকে দেখিয়া তাহাদের বড়ই হাসি পাইয়াছে।

বাস্তবিক, উহাদিগকে দেখিয়া আমরা যেমন আশ্চর্য হই, তাহা জানিতে পারিলে উহারা নিশ্চয়ই হাসিয়া ফেলিত। সেই কবে পৃথিবীতে প্রথম মানুষ জন্মিয়াছিল, আর আজ এই উনিশ শত সালের জুলাই মাস। এতদিন ধরিয়া ক্রমাগত তাহাদিগকে দেখিতেছে, তথাপি মানুষের দেখিবার সাধ মিটে নাই, বরং ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। লোকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া দূরবীন তয়ের করে, সারারাত জাগিয়া সেই দূরবীন দিয়া আকাশ দেখে। যাহারা এরূপ করে, তাহার নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। অঙ্কশাস্ত্রে তাহাদের মতো বড় পণ্ডিত খুব কমই আছে।

আজকাল ভালো-ভালো দূরবীন এবং অন্যান্য অনেকরকম যন্ত্র হইয়াছে। আগে এ-সব ছিল না। তখন শুধু চোখে যাহা দেখা যাইত, তাহাতেই লোকে সন্তুষ্ট থাকিত। দেখিতে জানিলে শুধু চোখেই কি কম দেখা যায়? আমরা শুধু চোখে আকাশের যাহা দেখিতে পাই, তাহা কম আশ্চর্য নহে। রোজ দেখিয়া সেগুলি আমাদের কাছে পুরাতন হইয়া গিয়াছে, কাজেই আমরা তাহাদিগকে তেমন আশ্চর্য মনে করি না। চন্দ্র, সূর্য, তারা এ-সকল যদি কিছুই আগে না থাকিত, আর তারপর একদিন হঠাৎ আসিয়া দেখা দিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই খাবার ফেলিয়া ছুটিয়া দেখিতে আসিতাম।

তোমাদের সকলে ধূমকেতু দেখ নাই, কিন্তু ধূমকেতুর কথা অনেক শুনিয়াছ। আচ্ছা, বল দেখি ভাই, একটা ধূমকেতু দেখিবার জন্য তোমাদের মনটা ব্যস্ত হইয়া আছে কিনা? কিন্তু ধূমকেতু যদি রোজ উঠিত, 'তবে তাহার এত খবর কেহ লইত কি না সন্দেহ।'

যাহা রোজ ঘটিতেছে, তাহাও অতিশয় আশ্চর্য। এই যে আমরা পৃথিবীর পিঠে চড়িয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে শূন্যে ছুটিয়া চলিয়াছি, বলিতে গেলে এটাই কি একটা কম আশ্চর্যের ব্যাপার? আমাদের পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে বৎসরে একবার সূর্যের চারিদিক বেড়াইয়া আইসে। সূর্যটা যদি এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত, আর পৃথিবী তাহার চারিদিকে ঘুরিত, তবে পৃথিবীর পরিশ্রম একটু কম হইত। কিন্তু এ জগতে কাহারও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার হুকুম নাই। সুতরাং সূর্য ও পৃথিবীকে লইয়া নিজে ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশের একদিক পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

পৃথিবীর চারিধারে চন্দ্র ঘোরে, চন্দ্রকে লইয়া পৃথিবী সূর্যের চারিধারে ঘোরে, আবার চন্দ্রসুদ্ধ পৃথিবীকে লইয়া সূর্য কোথায় চলিয়াছে! শেষে গিয়া সে কোথায় ঠেকিবে! আর এই আকাশটাই কত বড় যে, এতদিন ছুটিয়াও সূর্য তাহার শেষ পাইল না। একটা তারার দিকে সূর্য ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেই তারাটা দুশো বৎসর আগে যত দূরে দেখাইত, এখনও তত দূরেই দেখায়। সেই তারাটাই-বা কত দূরে যে, এতকাল ছুটিয়াও সূর্য তাহার কিছুমাত্র কাছে পৌঁছিতে পারিল না। সূর্য এত দূরে থাকিলে আমরা তাহাকে দেখিতে

পাইতাম কি না সন্দেহ। সেই তারাটা বোধ হয় সূর্যের চাইতেও অনেকখানি বড় আর উজ্জ্বল। সেটা খুব বড় সূর্য, আমাদের এটি একটি ছোট সূর্য।

ঐ তারাগুলি কি তবে সকলেই সূর্য? সূর্যের মতন বড় আর জমকালো না হইলে এত দূরে তাহাদিগকে দেখাই যাইত না। উহারা সকলেই সূর্য। আমাদের সূর্যের চারিধারে যেমন পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি, প্রভৃতি গ্রহ ঘোরে, উহাদের চারিধারেও হয়তো তেমনি অনেক গ্রহ ঘোরে, কিন্তু এত দূরে থাকিয়া সে-সকল গ্রহকে দেখিবার আমাদের কোনো উপায় নাই। যাহা হউক, এইটুকু দেখা গিয়াছে যে, ঐ-সকল সূর্যের কোনো কোনোটার চারিধারে আর-একটা সূর্য ঘুরিতেছে। এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে যে, ঐ-সকল তারার কোনো কোনোটার এমন এক-একটি সঙ্গী আছে যে, তাহাদের নিজেদের আলো নাই। নিজেদের আলো নাই বলিয়া তাহারা আমাদিগকে দেখা দিতে পারিতেছে না, কিন্তু অন্য উপায়ে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তাহারা আছে। উহাদের নিজেদের আলো নাই সুতরাং উহারা সূর্য নহে, গ্রহ, অর্থাৎ, আমাদের পৃথিবী যাহা, তাহাই। আমাদের এই ছোটখাটো সূর্যের সঙ্গে এতগুলি গ্রহ, ঐ-সকল বড়-বড় সূর্যের সঙ্গে গ্রহ নাই? এটা একটা কথাই নহে!

আমরা নিতান্তই ছোট, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে আমরা খুব বড়। আমরা ভাবি, 'আমরা যে মানষ! আহা, আমাদের মতন আর-একটি জন্তু বুঝি হয় না! আমাদের যে পৃথিবী— ইস্! সে কতখানি বড়!' কিন্তু আমরা যে যথার্থই কত ছোট, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য ঈশ্বর আকাশকে রাখিয়াছেন। দেখ, ওখানে কত সূর্য। ঐ-সকল সূর্যের সঙ্গে কত পৃথিবী আছে। আর, তাহাতে মানুষের মতন, বা, তাহার চাইতে ঢের বেশি বুদ্ধিমান জীব থাকা কোনমতেই অসম্ভব নহে। উহারা হয়তো আমাদের চাইতে ঢের বেশি কথা জানে, আর এখানকার দূরবীনের চাইতে অনেক বড়-বড় দূরবীন দিয়া আকাশ দেখে। কিন্তু আমাদের খবর কি তাহারা পাইয়াছে? তাহার ভরসা নিতান্তই কম বলিতে হইবে। উহাদের মধ্যে যাহারা আমাদের একটু কাছে থাকে, তাহা হয়তো আমাদের সূর্যকে একটি ছোট তারার মতো দেখিতে পায়। কিন্তু ইহার বেশি দেখা সম্ভব নহে। পৃথিবী, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতির কথা তাহারা কিছুই জানে না।

আর মানুষ? হায় হায়, আমাদের কথাও তাহারা জানে না। কোনোদিন যে জানিবে তাহারও আশা নাই। ডাকিলে তো উহারা শুনিবেই না। পৃথিবীর সকল মানুষ জুটিয়া চ্যাঁচাইলেও শুনিবে না। চিঠি লিখিয়াও জানাইবার উপায় নাই। চিঠি কে লইয়া যাইবে? কোন পথে যাইবে? আর যদিই-বা লোক মিলে আর পথ হয়, তবে সে চিঠি কয় দিনে পৌঁছাইবে? তোমার চিঠিওয়ালা যদি রেলে চড়িয়া ঘণ্টায় ষাট মাইল করিয়া যায়, তাহা হইলেও সকলের চাইতে কাছের তারাটিতে সে সাড়ে চারি কোটি বৎসরের কমে পৌঁছাইতে পারিবে না! সেই চিঠির জবাব আসিতে আর সাড়ে চারি কোটি বৎসর লাগিবে!

সকলের চাইতে নিকটের তারাটির সম্বন্ধে যদি এমন হয়, তবে দূরের তারাগুলির কথা কি বলিবে! চক্ষে যাহাদিগকে দেখিতে পাই, তাহারা যে আমাদের কাছে, মোটের উপরে এ কথা মানিয়া লওয়া যায়। কিন্তু এই কাছের তারাগুলিও কত দূরে, তাহা উপরের ঐ দৃষ্টান্তটির দ্বারাই বুঝিতে পার। বাস্তবিকই উহারা এত দূরে যে, সকলের চাইতে বড় দূরবীন দিয়াও উহাদিগকে আমরা কিছুমাত্র বড় দেখিতে পাই না। শুধু চোখে যেমন একটা কিছু মিট্ মিট্

করিতেছে দেখি, দূরবীন দিয়াও তেমনি একটা কিছু মিট্‌মিট্‌ করতে দেখি। একটু উজ্জ্বল দেখি বটে, কিন্তু কিছুমাত্র বড় দেখি না।

অবশ্য শুধু চোখে যাহা দেখি, দূরবীন দিয়া তাহার চাইতে অনেক বেশী তারা দেখিতে পাই। দূরবীন যত ভালো হয়, তাহাতে তত বেশি তারা দেখা যায়। এত দুরেও তারা আছে যে, সেখানে দূরবীনেরও দৃষ্টি পৌঁছায় না। তাহারা যে কত দূরে, তাহা ভাবিতেও পারি না।

বাস্তবিক আকাশের কথা অতি আশ্চর্য। কিন্তু শুধু আশ্চর্য বলিয়াই যে লোকে আকাশের খবর এত করিয়া লয়, তাহা নহে। এ-সকল কথা জানাতে আমাদের বিস্তর উপকারও আছে। এমন-কি, আকাশের সম্বন্ধে লোকে এতদিন ধরিয়া যত কথা শিখিয়াছে, এখন যদি হঠাৎ তাহার সমস্তই ভুলিয়া যাওয়া যায়, তবে ভারি মুস্কিল হইবে। প্রথম কথা দেখ, আমাদের সময়ের ঠিক থাকিবে না। সূর্যের দিকে চাহিয়া আমরা সময় ঠিক করি। মোটামুটি সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত, সকল কথাই সূর্যের মুখ চাহিয়া। তাহার চাইতে বেশি হিসাবের কথা—অর্থাৎ ঘন্টা, মিনিট, সেকেণ্ড ইত্যাদি ঘড়ির হিসাবের কথা—যদি বল, সেখানেও দেখিবে, আকাশকে ছাড়িয়া কাজ চলে না।

একটার সময় কলিকাতায় তোপ পড়ে। তখন সকলে নিজের ঘড়ি ঠিক করিয়া লয়। তোপ কি করিয়া পড়ে জান? আকাশের সম্বন্ধে যত কথা জানা গিয়াছে তাহা লইয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরাজিতে ইহাকে বলে Astronomy। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা ইহাদের কোনটা আকাশের কোন স্থানে কোন সময়ে থাকে, জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা অঙ্ক কষিয়া তাহা স্থির করা যায়। ঐরূপে অঙ্ক কষিয়া এ-সকল কথা স্থির করিয়া পুস্তকে লিখিলে তাহাকে বলে পঞ্জিকা। কোনদিন ঠিক কোন সময়ে সূর্য আমাদের মাথার উপরে আসিবে, পঞ্জিকা দেখিয়া জানা যায়। সূর্য আমাদের মাথার উপরে আসিবার সময় যদি ঘড়িতে ঠিক সেই সময়টি দেখায়, তবেই বলিতে পারি, ঘড়ি ঠিক। তাহা যদি না হয়, তবে ঐ সময় পঞ্জিকার সঙ্গে মিলাইয়া ঘড়ি ঠিক করিয়া দিতে হয়। সময় দেখিবার জন্য একটা আপিস আছে। এই আপিসে একটা ভালো ঘড়ি আছে। সূর্য মোটামুটি বারোটার সময় আমাদের মাথার উপরে আইসে। ঐ সময়ে ঐ আপিসের লোকের দূরবীন দিয়া সূর্য দেখিয়া ঘড়ি ঠিক করে। তারপর একটার সময় ঐ ঘড়ি দেখিয়া তোপ ফেলা হয়। সূর্য, তারা, এ-সকলের সাহায্য না পাইলে ঘড়ি ঠিক রাখা সম্ভব হইত না। তার ফল এই হইত যে, তোমরা কেহ দশটার সময়ই ইস্কুলে গিয়া বসিয়া থাকিতে, আর কেহ বারোটার সময় যাইতে। মাস্টারমহাশয়ের নিতান্তই অসুবিধা হইত, তোমাদেরও পড়াশুনা ভালো করিয়া হইত না। যখন ইস্কুলে জলখাবারের ছুটি হইত, বাড়ির লোক হয়তো তখন খাবার পাঠাইত না। রেলে যাইতে হইলে আরো মুস্কিল হইত!

সমুদ্রে জাহাজগুলি যদি আকাশ দেখিতে না পায়, তবে তাহাদের পথ চিনিয়া চলাই অসম্ভব হয়। আজ যদি সকলে আকাশের কথা ভুলিয়া যায়, তবে সমুদ্রে জাহাজ চলাও বন্ধ হইয়া যাইবে। যে-সকল জাহাজ এখন সমুদ্রে আছে, তাহারা সকলেই পথ ভুলিয়া যাইবে। আমরা যে নুনটুকু খাই, তাহাও জাহাজে আসে। সুতরাং জাহাজ চলা বন্ধ হইলে বড়ই মুস্কিল হইবে।

আকাশের কথা জানিলে যেমন আনন্দ, তেমনি উপকার। এইজন্যই লোকে এত কষ্ট করিয়া আকাশের খবর লইতে ব্যস্ত হয়। ভালো করিয়া আকাশের খবর লইতে হইলে অনেক রকম যন্ত্র আর অনেক লেখাপড়া জানিবার দরকার। আমাদের যদিও তাহার কিছুই নাই, তথাপি আমরা

এই বিষয়ের অতি সামান্য একটু চর্চা করিতে পারি, তাহাতেও যথেষ্ট আনন্দ আছে।

আকাশকে আমরা সচরাচর যেমন করিয়া দেখি, তাহাতে তাহার সম্বন্ধে বেশি কথা জানিবার সম্ভাবনা নাই। তাহাকে রোজ দেখিতে হয়, আর খুব সতর্ক হইয়া দেখিতে হয়। এইরূপ করিয়া কিছুদিন দেখিলেই অনেক আশ্চর্য কথা জানিতে পারিবে।

আকাশের কথা ঃ ২

শুধু চোখে আকাশের যতখানি দেখা যায়, তাহার সম্বন্ধে আজ দুই-একটি কথা বলিব। আকাশে আমরা সচরাচর সূর্য, চন্দ্র, তারা ইত্যাদিকে দেখিতে পাই। মাঝে মাঝে এক-একটা ধূমকেতুও দেখা দেয়। সূর্য, চন্দ্র, ইত্যাদিকে চিনাইয়া দিবার বোধহয় দরকার হইবে না, ধূমকেতু আসিলে তাহাকে চিনিবার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে।

তারাগুলি নিতান্তই ছোট-ছোট, আর ইহাদের সংখ্যাও খুব বেশি। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদিগকে চিনিবার চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয় নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতেই লোকে ইহাদের কথা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছে। আগে অনেকে বিশ্বাস করিত যে, ঐ তারাগুলি আর কিছুই নহে, ধার্মিক লোকের আত্মা। মহাভারতে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। একবার ইন্দ্রের সারথি মাতলি অর্জুনকে রথে করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইতেছিলেন।[১] পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশের ভিতর দিয়া যাইবার সময়, অর্জুন অনেকগুলি উজ্জ্বল মানুষ দেখিতে পাইলেন। তিনি আশ্চর্য হইয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহারা কে?' তাহাতে মাতলি বলিলেন, 'তুমি পৃথিবী হইতে যে-সকল তারা দেখিয়াছ ঐ তারাসকল পুণ্যবান লোক। পৃথিবীতে থাকিতে তাঁহারা যে-সকল সৎকার্য করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহারা এখন তারা হইয়াছেন।'

প্রাচীন গ্রীক পুরাণে পার্সিয়ুস্ এবং আন্ড্রোমীডার গল্প আছে। আন্ড্রোমীডা রাজকন্যা ছিলেন। মহারাজ কীফিয়ুস্ তাহার পিতা, রানী কাসিয়োপিয়া তাঁহার মাতা। বিনা দোষে আন্ড্রোমীডার হাত-পা শিকলে বাঁধিয়া, একটা সামুদ্রিক রাক্ষসের আহারের জন্য তাহাকে সমুদ্রের ধারে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। মহাবীর পার্সিয়ুস্ অনেক অসাধ্য সাধন করিয়া তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, এবং তৎপর তাঁহাকে বিবাহ করেন। প্রাচীন গ্রীক পুরাণে লিখিত আছে যে, 'ইঁহাদের মৃত্যুর পর গ্রীক-দেবতা আথেনী, ইঁহাদিগকে আকাশে তুলিয়া লয়েন। আজও পরিষ্কার রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। আন্ড্রোমীডার হাত-পা বাঁধা, পার্সিয়ুসের যুদ্ধের বেশ। কীফিয়ুস্ দণ্ড হাতে মুকুট মাথায় রাজকাজে নিযুক্ত, কাসিয়োপিয়া হাতির দাঁতের চেয়ারে বসিয়া চুল আঁচরাইতে ব্যস্ত।'

পৃথিবীর যেমন ম্যাপ আছে, আকাশেরও তেমনি ম্যাপ আছে। পৃথিবীতে যেমন নানাদেশ আর নানান সমুদ্র, আকাশেও তেমনি অনেকগুলি নক্ষত্রমণ্ডলী (Constellation) কল্পনা করা হইয়াছে। এই-সকল নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রত্যেকটার এক-একটা নাম আছে। সে-সকল নাম শুনিলে হয়তো তোমাদের হাসি পাইবে। মানুষের নাম আর জন্তুর নাম তাহাতে বেশি, মাঝে মাঝে দুই একটা জিনিসপত্রের নামও দেখা যায়। মানুষের মধ্যে পার্সিয়ুস্, আন্ড্রোমীডা, কীফিয়ুস্, কাসিয়োপিয়া, ওরায়ণ, হার্কিউলিস্ ইত্যাদির নাম দেখা যায়। জন্তুর মধ্যে বড় সিংহ, ছোট সিংহ বড় ভল্লুক, ছোট ভল্লুক, বড় কুকুর, ছোট কুকুর, ষাঁড়, ভেড়া, ছাগল,

[১] মহাভারত, বনপর্ব ঃ ইন্দ্রলোকাভিগমন পর্বাধ্যায়।

নেকড়ে, বাঘ, জিরাফ, খরগোশ, ঈগল, হাঁস, পায়রা, গোসাপ, কাঁকড়া, বিছে ইত্যাদি। জিনিসপত্রের মধ্যে মুকুট, বীণা, দাঁড়িপাল্লা, জাহাজ ইত্যাদি।

এইসকল নাম কি দেখিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা এখন বলিবার উপায় নাই। কোনো কোনো স্থলে দেখা যায় যে, তারাগুলি মিলিয়া কোনো-একটা মানুষ বা জিনিসের চেহারার মতন হইয়াছে, কিন্তু অনেক স্থলেই এরূপ চেহারার মিল দেখা যায় না। যাহা হউক ইহাতে কাজের সুবিধা হইয়াছে, তাহার ভুল নাই। সুতরাং ওসকল নাম কে রাখিয়াছিল, কেন রাখিয়াছিল, এত কথার আমাদের দরকার কি?

নক্ষত্রমণ্ডলীর যেমন এক-একটা নাম আছে, তেমনি অনেকগুলি নক্ষত্রের নিজের এক-একটা নাম আছে। একটা নক্ষত্র আছে, তাহার নাম 'ধ্রুব' অর্থাৎ 'স্থির'। এই নক্ষত্রের উদয় অস্ত নাই, চিরকাল ইহা প্রায় একই স্থানে থাকে, এইজন্য ইহার ঐরূপ নাম হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে পরে আরো কিছু বলিব।

সকলের চাইতে বড় যে নক্ষত্র তাহার নাম সিরিয়স্। আমাদের দেশে জ্যোতিষশাস্ত্রে ইহাকে বলে মৃগব্যাধ। এখানে একটা কথা বলার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তারা বলিতে মোটামুটি আমরা আকাশের যতগুলি জিনিসকে বুঝিয়া লই, তাহাদের সবগুলি ঠিক এক জিনিস নহে। যতগুলিকে আমরা তারা বলি, বাস্তবিক তাহাদের কতকগুলি গ্রহ, আর বাকি নক্ষত্র।

আমাদের সূর্য যেমন, নক্ষত্রগুলির সকলেই তেমনি এক-একটি সূর্য। ইহাদিগকে যতবার দেখ একই স্থানে দেখিতে পাইবে।[১] কিন্তু একটা গ্রহকে আজ যদি এক স্থানে দেখ, কাল দেখিবে সে সেস্থান হইতে একটু দূরে চলিয়া গিয়াছে। অবশ্য বেশি দূরে নয়, কিন্তু এতটা দূরে যে, নক্ষত্রগুলির সঙ্গে তুলনা করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সে নড়িয়াছে।

আমাদের পৃথিবীও একটা গ্রহ। আর গ্রহগুলিও এক-একটা পৃথিবী। ইহারা সকলেই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। এইজন্যই ইহাদিগকে আকাশে স্থান পরিবর্তন করিতে দেখা যায়।

আমি বলিতেছিলাম যে, সকলের চাইতে বড় নক্ষত্রটার নাম সিরিয়স্। আমি যখন নক্ষত্রের কথা বলিতেছি, তখন গ্রহগুলিকে অবশ্যই বাদ দিয়া লইতে হইবে। দুটি গ্রহ আছে, যাহারা সিরিয়সের চাইতে উজ্জ্বল। ইহাদের একটি বৃহস্পতি, আর একটি শুক্র—যাহাকে শুকতারা বলে। ইহারা গ্রহ, সুতরাং ইহারা স্থান পরিবর্তন করে। অতএব ইহাদিগকে চিনিতে বেশি মুস্কিল হইবে না। অবশ্য এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, একবার বসিয়া ঘন্টাখানেক তাকাইয়া থাকিলেই ইহাদিগকে স্থান পরিবর্তন করিতে দেখা যাইবে না। কারণ, ইহারা খুব ধীর গতিতে চলে। ক্রমাগত দুই-তিন দিন মনোযাগ করিয়া দেখলে, অনায়াসেই ইহাদের চঞ্চলতা ধরা পড়িবে।

আকাশের ম্যাপ প্রস্তুত করিবার সময় গ্রহগুলিকে বাদ দিয়া লইতে হয়। যে নড়িয়া বেড়ায় তাহার একটা স্থান নির্দেশ করা সম্ভব কি? যে ময়রার দোকানের সামনে একটা ষাঁড় দাঁড়াইয়া আছে, সেই ময়রার নিকটে গিয়া সন্দেশ খাইতে যদি কেহ আমাকে হুকুম দেয়, তবে আমার মিষ্টমুখ করার ভরসা বড়ই কম থাকে। কারণ, ষাঁড়টির ততক্ষণে ময়রার

[১] (অবশ্য নক্ষত্রদেরও অনেকেরই উদয় অস্ত আছে, সুতরাং একস্থানে দেখা যাওয়ার অর্থ উদয়াস্তের কথাটাকে বাদ দিয়া বুঝিতে হইবে। পৃথিবী ঘুরিতেছে, এইজন্যই ইহাদের উদায়স্ত হয়, এ কথা বোধ হয় তোমরা সকলেই জান। সুতরাং উদয়াস্ত হয় বলিয়া যে উহারা বাস্তবিকই নড়ে, তাহা নহে।)

দোকান ছাড়িয়া জুতাওয়ালার দোকানের সামনে চলিয়া যাওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। গ্রহগুলিও মনে কর যেন এই চলন্ত ষাঁড়ের মতন, উহারা কখন কোথায় থাকে তাহা ম্যাপে লিখিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। তবে ষাঁড়ের সঙ্গে ইহাদের একটা মস্ত তফাত আছে। ষাঁড়ের চলাফেরার একটা হিসাব কিতাব নাই, যখন যেখানে খুশি চলিয়া যায়। কিন্তু গ্রহেরা ভারি আইনজ্ঞলোকের মতন চলে, বেহিসাবী এক পাও ফেলে না। সুতরাং উহাদের কে কখন কোথায় থাকিবে তাহা হিসাব করিয়া স্থির করা যায়। এ সম্বন্ধে এর পরে আরো কথা হইবে। এখন আমরা আকাশের সঙ্গে আর একটু পরিচয় করিতে চেষ্টা করি।

যখন অন্ধকার রাত্রিতে আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে, তখন কি আমরা খালি গ্রহ আর নক্ষত্রগুলিকেই দেখিতে পাই? আর কিছুই দেখি না? আর একটা জিনিস আছে, সেটাকে হয়তো তোমাদের কেহ কেহ দেখিয়াও থাকিবে। এই জিনিসটার চেহারা পাতলা সাদা মেঘের মতন, সুতরাং অনেকেই ইহাকে মেঘ মনে করিয়া অগ্রাহ্য করে। আচ্ছা, এখন হইতে এই জিনিসটার একটু খোঁজ লইতে চেষ্টা কর দেখি? দুদিন (দুদিন কেন কয়েক ঘন্টা) ধরিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, আকাশে এমন একটা জিনিস আছে, যাহাকে এতদিন হয়তো মেঘ মনে করিয়া আসিয়াছ, অথচ সে মেঘ নহে। মেঘ চলিয়া যায়, কিন্তু উহা নক্ষত্রগুলির ন্যায় স্থির থাকে। মেঘের আকার বদলায়, কিন্তু উহার আকার সর্বদাই একরকম থাকে। এই জিনিসটার নাম 'ছায়াপথ'। আকাশের এক ধার হইতে আর এক ধার পর্যন্ত ছায়াপথ নদীর আকারে বিস্তৃত রহিয়াছে। একবার দেখিলে উহাকে আর ভুলিবার জো নাই।

তোমরা অবশ্য পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ইত্যাদি দিক চিনিতে পার। যদি না পার তবে—চুপ! অন্য কাহাকেও বলিয়ো না—চুপিচুপি মার কাছে জানিয়া আইস। যাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বোধোদয়' পড়িয়াছ, তাহারা নিশ্চয় জান যে, যেদিকে ভোরে সূর্য উঠে, সেটা পূর্বদিক। পূর্বদিকে ডান হাত করিয়া দাঁড়াইলে, সম্মুখে উত্তর, বামে পশ্চিম আর পিছনে দক্ষিণ দিক থাকে।

আমাদের সূর্যের মতন কোটি কোটি সূর্য লইয়া ছায়াপথের সৃষ্টি। সেসকল সূর্য কত দূরে, কে বলিবে? আমরা এখানে থাকিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে পাইতেছি না, খালি মোটের উপরে ছায়াপথের স্থানটা একটু ফরসা দেখি।

আকাশের গলায় পৈতার মতন ছায়াপথ তাহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে। একবারে আমরা তাহার অর্ধেকের বেশি দেখিতে পাই না, কিন্তু কিছুদিন অপেক্ষা করিলে উহার অপর অর্ধেকও দেখিতে পাইব। আজকাল রাত সাড়ে নয়টার সময় যে অর্ধেককে মাথার উপরে দেখিতে পাও, ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, উহা আর ঐ সময়ে আমাদের মাথার উপরে থাকে না, কিন্তু আরো পশ্চিমে চলিয়া যায়। কিছুদিন পরে দেখিবে যে সে সন্ধ্যার সময়ই আমাদের মাথার উপরে আসিয়া হাজির হয়। তখন শেষরাত্রিতে আকাশের পূর্বদিকে ছায়াপথের অপর অর্ধেককে দেখিতে পাওয়া যাইবে। আজকাল সেই অর্ধেক দিনেরবেলায় উঠে (অর্থাৎ আকাশের যে ভাগে সূর্য সেই ভাগে সে আছে) বলিয়া আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না। শীতকালে সেই অর্ধেক সমস্ত রাত্রি আকাশে থাকিবে। সন্ধ্যাবেলা সে পূর্বদিকে দেখা দিবে, মধ্যরাত্রে আমাদের মাথার উপরে আসিবে, ভোরের বেলা পশ্চিমে অস্ত যাইবে।

এই ছায়াপথ আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, আমরা ইহারই ভিতরে বাস করিতেছি। আকাশের রাজ্যে যেমন দূরের জিনিস লইয়া কারবার, তাহাতে এ কথা সহজেই মনে হয় যে, আমরা হয়তো ঐ ছায়াপথেরই লোক। আমাদের সূর্য হয়তো এই ছায়াপথেরই একটি অতি গরিব অধিবাসী!

আকাশের কথা : ৩

যদিও আমরা এখন গ্রহের কথা বলিতে বসি নাই, তথাপি একটা কথা বলিলে তত দোষের হইবে না। প্রথম রাত্রিতে যে-সকল উজ্জ্বল তারা দেখা যায়, তাহাদের তিনটি গ্রহ। একটি লাল্চে রঙ্গের, সেটিকে পশ্চিমে দেখা যায়, আর প্রথম রাত্রিতেই সে অস্ত যায়। এটি মঙ্গলগ্রহ। ইংরাজিতে ইহার নাম Mars। আর-একটি প্রথম রাত্রির তারার মধ্যে সকলের চাইতে বড়। ইহার নাম বৃহস্পতি (Jupiter)। গ্রহদের মধ্যে এইটিই সকলের চাইতে বড়। এই গ্রহটি মঙ্গলের কিছুপরে অস্ত যায়। আকাশের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে উহার খোঁজ লইবে। আর-একটি গ্রহ ছায়াপথের উপরে। ইহার নাম শনি (Saturn)। দূরবীন দিয়া দেখিবার পক্ষে ইহার মতন সুন্দর জিনিস আর আকাশে নাই। এইসকল গ্রহকে আকাশের দক্ষিণ ভাগে দেখিতে পাইবে।

আজকালকার প্রথম রাত্রির আকাশে সম্প্রতি আমাদের পরিচয় করিবার উপযুক্ত বেশি জিনিস নাই। কিন্তু যদি রাত্রিতে জাগিতে পার, তাহা হইলে কয়েকটা দেখিবার আছে।

রাত্রি প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে উঠিলে পূর্বদিকের আকাশে দুটা খুব উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাইবে। ইহাদের মধ্যে যেটা বেশি উজ্জ্বল, সেটা নক্ষত্র নহে, গ্রহ। ইহাকেই শুকতারা (Venus) বলে। শুকতারার চাইতে কম উজ্জ্বল যেটা, সেটার নামই সিরিয়স্। নক্ষত্রের মধ্যে এইটাই সকলের চাইতে উজ্জ্বল।

সিরিয়সের খুব কাছেই ছায়াপথটাকে বেশ পবিষ্কার দেখিতে পাওয়া যাইবে। আচ্ছা, ওটাকে ধরিয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে যাই। অবশ্য, ঠিক উত্তর হইবে না, মোটামুটি উত্তর।

খানিক দূর গেলেই দেখিবে যে অনেকগুলি উজ্জ্বল তারা মিলিয়া এই ছবির[১] একস্থানের মতন দেখিতে হইয়াছে। এই নক্ষত্রমণ্ডলীকে প্রায় সকলেই চিনে। ইহার বাঙ্গালা নাম কালপুরুষ, ইংরাজি নাম ওরায়ণ (Orion)। অনেকে ইহাকে আদম সুরৎও বলে। মোটামুটি ইহাকে দেখিতে একটা মানুষের মতন। চারি কোণের চারিটা তারা যেন হাত-পা। একটা কোমরবন্ধও আছে, তাহাতে আবার একটা তলোয়ার ঝুলিতেছে। খুব যোদ্ধা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আকাশের একটা ম্যাপ দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, তাহাতে ওরায়ণের চেহারা দেওয়া হইয়াছে। উহা কাল্পনিক বলিয়া এখানে তাহা দেওয়ার বিশেষ দরকার বোধ হইতেছে না। কিন্তু ম্যাপের সেই ছবিখানি দেখিতে হাসি পায়। ওরায়ণের বাঁ হাতে একটা জন্তুর ছাল, ডান হাতে এক প্রকাণ্ড গদা! কোথাকার এক ক্ষ্যাপা ষাঁড় শিং বাগাইয়া গুঁতাইতে আসিতেছে, ওরায়ণ তাহার সঙ্গে সাংঘাতিক যুদ্ধ করিতেছেন!

ওরায়ণের কোমরবন্ধের ভিতর দিয়া একটা লাইন টানিলে তাহার একদিক সিরিয়সের কাছ দিয়া যায়, অপর দিক প্রায় ষাঁড়ের মাথায় গিয়া ঠেকে। ষাঁড়ের মাথার মধ্যে সকলের

[১] পত্রিকার পাতায় ছবিটি বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় দেওয়া সম্ভব হল না।

চেয়ে বড় তারাটির নাম রোহিণী। ইংরাজিতে ইহাকে বলে Aldebaran। ওরায়ণের ডান হাতের তারাটির নাম আর্দ্রা, বাম হাতের তারাটির নাম মৃগশিরা।

এই ষাঁড়ই আমাদের পঞ্জিকার বৃষরাশি। সূর্য এক-এক মাসে আকাশের এক-এক স্থানে থাকে। সেই স্থানগুলিকে এক-একটা রাশি বলে। বৈশাখ মাসে আকাশের যে স্থানে সূর্য থাকে, তাহার নাম মেষরাশি। এইরূপে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন—বারো মাসে এই বারোটা রাশির ভিতর দিয়া সূর্য ঘুরিয়া আইসে। অবশ্য সূর্য যে বাস্তবিকই বৎসরে এতটা পথ হাঁটিয়া আইসে, আর আমরা এক জায়গায় গালে হাত দিয়া বসিয়া তাহা দেখি, এরূপ নহে। আসলে আমরাই সূর্যের চারিধারে ঘুরিতেছি বলিয়া এরূপ দেখা যায়।

রাশিগুলির কোনটা কোথায় আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা তোমাদের পক্ষে সহজ হইবে না। বৃষরাশিটাকে চিনিলে। ছায়াপথের এধারে বৃষরাশি, ওধারে মিথুনরাশি। তারপর কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক ঘুরিয়া আসিলেই আবার ছায়াপথে উপস্থিত হওয়া যায়। আজকাল শনিগ্রহটি ইহারই নিকটে দেখিতে পাইবে।

সিরিয়স্ হইতে সোজা চলিয়া ওরায়ণের কোমরবন্ধ, তৎপর বৃষরাশির মাথা। এই লাইন ধরিয়া আর খানিক দূর গেলে আর একটি খুব ছোট নক্ষত্রমণ্ডলী পাওয়া যায়। ছোট-ছোট কয়েকটি নক্ষত্র এক জায়গায় দল বাঁধিয়া আছে, দেখিলে সহজেই চিনিতে পারিবে। এই নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম কৃত্তিকা। ইংরাজিতে ইহাদিগকে বলে the Pleiades আমাদের দেশের সাধারণ লোকে বলে, কৃত্তিকারা সাত বোন অর্থাৎ, সাধারণ চক্ষে ঐ স্থানে সাতটি ছোট-ছোট তারা দেখা যায়। কিন্তু দৃষ্টি খুব প্রখর হইলে ইহা অপেক্ষা বেশিও দেখা যায়। আবার একটু কানা গোছের হইলে সাতটিও দেখিতে পায় না। তোমরা এই তারাগুলি গণিয়া পরীক্ষা করিতে পার, কাহার চশমার দরকার।

এই তারাগুলিকে অনেকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে, কিন্তু তাহা ভুল। সপ্তর্ষিমণ্ডলকে ইংরাজিতে বলে Great Bear (বড় ভল্লুক)। উহার সামনের দুটি তারার ভিতর দিয়া লাইন টানিলে ধ্রুবতারাকে পাওয়া যায়। এইজন্য এই তারা দুটির নাম হইয়াছে 'প্রদর্শক' (the pointers)।

পৃথিবীর মেরুদণ্ডটাকে খুব লম্বা করিয়া বাড়াইয়া দিলে ঐ ধ্রুবতারার খুব কাছ দিয়া যায়। এইজন্যই ধ্রুবতারার উদয় অস্ত নাই, উহা সর্বদাই একস্থানে রহিয়াছে। উহার কাছের অন্যান্য তারাগুলিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে উহারা এই ধ্রুবতারারই চারিদিকে ঘোরে। আসলে ধ্রুবতারাও একেবারে স্থির নহে, কারণ, সে আকাশের সুমেরুর ঠিক উপরে নাই। ধ্রুবতারা আকাশের সুমেরুর চারিধারে ঘোরে। কিন্তু সে আকাশের সুমেরুর খুব কাছে বলিয়া এত অল্প স্থানের ভিতর ঘোরে যে, সহজ চক্ষে আমরা তাহাকে স্থির বলিয়াই মনে করি।

যাহারা পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে (বিষুবরেখার উপরে) আছে, তাহারা ধ্রুবতারাকে আকাশের প্রান্তে দেখিতে পায়। বিষুবরেখার দক্ষিণের লোকেরা ধ্রুবতারা দেখিতে পায় না। বিষুবরেখা হইতে যত উত্তরে আসিবে, ধ্রুবতারাকে তত ঊর্দ্ধে দেখিতে পাইবে। সুমেরুতে দাঁড়াইতে পারিলে, উহা একেবারে মাথার উপরে আসিবে। ঠিক মাথার উপর হইতে আকাশের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত স্থানটুকুকে তিন ভাগ করিলে যতখানি হয়, আমরা আকাশের প্রান্ত হইতে ধ্রুবকে মোটামুটি ততখানি উপরে দেখিতে পাই। সুতরাং ঠিক উত্তর দিকটি একবার স্থির করিয়া

লইতে পারিলে, ধ্রুবকে বাহির করা মুস্কিল হইবে না। তবে একটু সহিষ্ণুতার ও সাবধানতার প্রয়োজন হইবে, কারণ ধ্রুব বেশি উজ্জ্বল তারা নহে।

ঠিক খাড়া জিনিসের ছায়া বেলা ঠিক বারোটার সময় যেদিকে পড়ে সেইটা উত্তরদিক। দড়ির আগায় ভার বাঁধিয়া ঝুলাইলে সেই দড়িকে ঠিক খাড়া মনে করা যায়। বারোটার সময় ঐরূপ দড়ির ছায়া কোথায় পড়ে, তাহা খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিয়া লইবে। রাত্রিতে ঐ খড়ির দাগ দেখিয়া উত্তর দিক স্থির করিবে। তারপর ধ্রুবতারা খুঁজিয়া বাহির করিবে।

প্রাচীনকালে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ছিল না। তখনকার নাবিকেরা ধ্রুবতারা দেখিয়া দিক স্থির করিত।

আমরা ধ্রুবকে আকাশের প্রান্ত হইতে অনেকখানি উপরে দেখিতে পাই। তোমরা যদি ধ্রুবকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পার, তবে দেখিবে যে, ধ্রুব হইতে আকাশের প্রান্তের মধ্যে যে তারাগুলি আছে, তাহাদেরও উদয় অস্ত নাই।

আকাশের কথা ঃ ৪

নক্ষত্রগুলিকে হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন উহাদের সংখ্যা নাই, কিন্তু একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, প্রথমে যত বেশি বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক তত বেশি নক্ষত্র আমরা দেখিতে পাইনা।

শুধু চোখে যাহা দেখা যায়, তাহার কথাই বলিতেছি, দুরবীন দিয়া যাহা দেখা যায়, তাহার কথা নহে। যাহাদের দৃষ্টি খুব প্রখর, তাহারও একবারে চার-পাঁচ হাজারের বেশি নক্ষত্র দেখিতে পায় না। চার-পাঁচ হাজার নক্ষত্র আর তেমন একটা বেশি কি? ইহাদিগকে গণিয়া, চিনিয়া, আঁকিয়া খাতায় লিখিয়া কবে শেষ করা হইয়াছে। একখানা সাধারণ বড় ম্যাপে গ্রামগুলি যেমন ঘেঁষাঘেঁষি থাকে, আকাশে নক্ষত্র সকলকে তাহার চাইতে বরং কম ঘেঁষাঘেঁষি দেখা যায়।

আমাদের সূর্যও যে একটা নক্ষত্র, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সূর্য আমাদের এত কাছে বলিয়াই তাহার এত সম্মান। কিন্তু ঐ নক্ষত্রগুলির ভিতরে এর চাইতে ঢের বড়-বড় সূর্য আছে। উহাদের একটা আমাদের কাছে আসিলে, আমরা হয়তো পুড়িয়াই মরিতাম। আর, আমাদের সূর্য ঐ নক্ষত্রগুলির কাছে গেলে, হয়তো আমরা তাহাকে দেখিতেই পাইতাম না।

জিনিস যত দূরে থাকে, ততই ছোট দেখায়। থালাখানাকে দূরে লইয়া গেলে, তাহা রেকাবীখানার মতন দেখায়। আরো দূরে নিলে হয়তো টাকাটির মতন দেখাইবে। এইরূপে তাহাকে যত দূরে লইয়া যাওয়া যায়, ততই সে ক্রমে আধুলিটির মতন, তারপর সিকিটি, তারপর দুয়ানিটি, তারপর আল্‌পিনের মাথাটির মতন ছোট হইয়া, শেষে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া যাইবে। এক ফুট চওড়া থালাখানাকে এক মাইল দূরে লইয়া গেলে, তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। মোটামুটি বলিতে গেলে, যে জিনিস যত লম্বা চওড়া, তাহার পাঁচ হাজার গুণ দূরে লইয়া গেলে, তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। এক ফুট চওড়া থালাখানিকে এক মাইল দূর হইতে দেখিতে পাইবে না; কিন্তু একটি উজ্জ্বল আলো জ্বলিলে তাহাকে এক মাইলের চাইতে ঢের বেশি দূর হইতেও দেখা যায়। তখন আমরা যে বাস্তবিকই আলোর শিখাটা অবধি দেখিতে পাই, তাহা নহে; আমরা উহার ঝিকিমিকিটুকু মাত্র দেখি। আলোকের শিখাটি সে অদৃশ্য হইয়া যাইবে; তারপর যাহা দেখিব, সে কেবল উহার জ্যোতি—আসল জিনিসটা নহে।

নক্ষত্রগুলিকেও আমরা এইরূপই দেখি। শুধু চোখে দেখিলে হয়তো অনেক সময় মনে ভ্রম হইতে পারে যে, বুঝিবা উহাদের একটা কোনোরূপ চেহারা দেখা যাইতেছে। কিন্তু দূরবীন দিয়া দেখিলে, ঐ ভ্রমটুকু চলিয়া যায়। দূরবীন দিয়া উহাদের কোনোরূপ চেহারা দেখা যাওয়া দূরের কথা, বরং দূরবীন যত ভালো হয়, তাহা দিয়া তারাগুলিকে ততই ছোট দেখা যায়। আরো ছোট বোধ হইবে! ছোট বটে, কিন্তু বেশি উজ্জ্বল।

কথাটা নিতান্ত সামান্য হইল না। এই-সকল নক্ষত্রকে যদি আমাদের সূর্যের সমান মনে করা যায়, তবে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, উহারা কত দূরে!

আমাদের সূর্য সাড়ে আটলক্ষ মাইলেরও বেশি চওড়া। এত বড় জিনিসটাকে অদৃশ্য করিতে হইলে, তাহাকে অন্তত চারিশত পঁচিশ কোটি মাইল দূরে লইয়া যাইতে হয়। এত দূরে লইয়া গেলে, শুধু চোখে তাহার খালি জ্যোতিটুকু ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইবে না। কিন্তু দূরবীন দিয়া দেখিলে তখনোও তাহাকে একটা মস্ত গোলার মতন দেখা যাইবে।

ঐ নক্ষত্রগুলি এত দূরে যে, দূরবীন দিয়াও তাহাদিগকে কিছুমাত্র বড় দেখা যায় না। বড়-বড় দূরবীনগুলি দূরের জিনিসকে তিনহাজার গুণ নিকটে আনিয়া দেখাইতে পারে, কিন্তু তাহারাও নক্ষত্রগুলিকে কিছুমাত্র লম্বা চওড়া দেখাইতে পারে না। সুতরাং উহারা যে চারিশত পঁচিশ কোটি মাইলের অন্তত তিনহাজার গুণ বেশি দূরে, এ কথা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক, উহারা ইহার চাইতেও কত বেশি দূরে আছে, তাহা কে বলিতে পারে? যত দূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে উহারা যে ইহারও অনেক বেশি দূরে তাহাই প্রমাণ হয়।

নক্ষত্রগুলি কত দূরে, তাহা মাপিবার চেষ্টা হইয়াছে। এরূপ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হইলে, ভয়ানক শক্ত শক্ত অঙ্ক কষিবার দরকার হয়। সে-সকল অঙ্কের কথা আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই, কিন্তু অঙ্ক কষিয়া কি ফল পাওয়া গেল, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। যে তারাটা খুব কাছে—সেই যেখানে কিছুদিন আগে আমাদের চিঠি পাঠাইবার কথা হইতেছিল—সে তারাটাও সূর্যের চাইতে প্রায় ২৭১৪০০ দুই লক্ষ একাত্তর হাজার চারিশত গুণ দূরে। ইহার চাইতেও কাছে কোনো নক্ষত্র আছে কিনা, তাহা বলা যায় না। কিন্তু আর প্রায় সকল নক্ষত্রই ইহার চাইতে বেশি দূরে। অনেকগুলি নক্ষত্রই এত দূরে যে, তাহারা কত দূরে, তাহা এ পর্যন্ত কেহ অনুমানও করিতে পারে নাই।

যে নক্ষত্রটাকে বেশি উজ্জ্বল দেখা যায়, আমরা হয়তো মনে করিতে পারি যে, তাহা আমাদের বেশি কাছে। কিন্তু ইহা ভুল। এ কথা যদি ঠিক হইত, তাহা হইলে সিরিয়স্ অন্যান্য সকল নক্ষত্রের চাইতে আমাদের বেশি নিকটে হইত। কিন্তু সূর্য আমাদের এখান হইতে যত দূরে, সিরিয়স্ তাহার চাইতে দশলক্ষ গুণ বেশি দূরে। আমাদের সূর্যকে ওখানে লইয়া গেলে, তাহার নিতান্তই দূরবস্থা হইত! সিরিয়সের মতন এত উজ্জ্বল তো তাহাকে দেখা যাইতই না, বরং তাহাকে নিতান্ত মিট্‌মিটে একটা ছোট তারা বলিয়াই মনে হইত।

সিরিয়স্‌টা যে কত বড় সূর্য, এ কথা হইতে তাহা কতক বুঝা যাইতেছে। গণিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা সূর্যের চাইতে যেমন আকারে বড়, তেমনি আবার তুলনায় উজ্জ্বলও অনেক বেশি। আমাদের সূর্যের মতন কুড়িটা সূর্য একসঙ্গে করিলে, সিরিয়সের মতন বড় একটা সূর্য হয়, কিন্তু আমাদের সূর্যের মতন আটচল্লিশটা সূর্যের কমে সিরিয়সের মতন আলো দিতে পারিবে না।

এই সিরিয়সের আবার একটা সঙ্গী আছে, সেটাও প্রায় সাতটা সূর্যের মতন বড়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উহার আলো নিতান্তই কম। এইজন্যই খুব ভালো দূরবীন না হইলে, উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সূর্য হইতে পৃথিবী যত দূরে, সিরিয়স্ হইতে তাহার সাঁইত্রিশ গুণ দূরে থাকিয়া সিরিয়সের এই সঙ্গীটি তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। আমাদের উনপঞ্চাশ বৎসরে উহার একটি বৎসর হয়। এই সঙ্গীটিকেসুদ্ধ সিরিয়স্ নিজে মিনিটে একহাজার মাইল করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, অথচ আমরা শুধু চোখে দেখিয়া উহাকে স্থিরই মনে করিতেছি।

শুধু চোখে যাহা দেখা যায়, তাহার কথা বলিতে গিয়া, আমরা এমন সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, তাহার খবর দূরবীন ভিন্ন পাওয়া যায় না। বাস্তবিক ইহার পূর্বে দূরবীনের কং কিছু বলা উচিত ছিল। তবে যে এখান এ-সকল কথা উঠিল, তাহার কারণ এই যে, নক্ষত্রগুলির সম্বন্ধে কোনো কথা বলিবার সুযোগ আর যে হইবে, এমন বোধ হয় না। সুতরাং এ কথাগুলি বলিতে হইলে, এইখানেই বলা ভালো।

সিরিয়সের যেমন একটি সঙ্গী আছে তেমনি আরো অনেক নক্ষত্রেরই আছে। কোনো কোনো স্থানে তিন-চারিটা নক্ষত্রকেও দল বাঁধিয়া ঘুরিতে দেখা যায়। ইহারা সকলেই সূর্য। ইহাদের সঙ্গে গ্রহ (অর্থাৎ, যেমন আমাদের পৃথিবী। গ্রহদের নিজের আলো নাই, সূর্যের নিকট হইতে আলো পায়, আর তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়) আছে কিনা, তাহা বলা কঠিন। কারণ গ্রহ থাকিলেও এত দূরে তাহাদিগকে দেখা যাইবে না।

নক্ষত্রগুলিকে একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, উহাদের সকলের রঙ একরূপ নহে। কোনোটা সাদা কোনোটা একটু লাল্‌চে। সিরিয়স্ খুব সামান্য একটু নীল মিশানো সাদা রঙের। রোহিণীর (Aldebaran) রঙ অনেকটা লাল! দূরবীন দিয়া অনেক রঙিন তারা দেখা যায়। লাল, নীল, সবুজ, হল্‌দে, বেগুনি — প্রায় সকল রঙের তারাই আছে। ইহাদের কোনো কোনোটার রঙ আবার বদলায় বলিয়া বোধ হয়। সিরিয়স্ এখন সাদা, কিন্তু প্রাচীনকালের এক পণ্ডিত ইহাকে আগুনের মতন লাল রঙের বলিয়াছেন।

এখন তারাগুলির সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিলেই, আমার আজকার কাজ শেষ হয়।

জিনিস হইতে আলো আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়িলেই, আমরা সেই জিনিস দেখিতে পাই। একটা ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করিয়া তাহাকে যদি অন্ধকার কর, আর সেই ঘরের দরজা বা দেয়ালের কোনো স্থানে যদি একটি শ্লেট-পেন্সিল ঢুকিবার মতো ছিদ্র থাকে, তবে সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো আসিবে। এই ছিদ্রের সামনে এক খণ্ড সাদা কাগজ বা কাপড় ধরিলে দেখিবে যে, তাহাতে বাহিরের জিনিসের সুন্দর ছবি পড়িয়াছে। চক্ষের ভিতরেও এইরূপ করিয়া জিনিস হইতে আলো আসিয়া পড়ে, আর তাহার জন্যই আমরা সেই জিনিস দেখিতে পাই।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, একটা জিনিস হইতে আলো বাহির হয়, তারপর খানিক পথ চলিয়া, সেই আলো আমাদের চক্ষে পড়ে, এইরূপ করিতে তাহার সময় লাগে। যত বেশি পথ চলিতে হয়, তত বেশি সময় লাগে।

আলো বড় ভয়ানক ছুটিয়া চলে। এত ছুটিয়া চলে যে, এই পৃথিবীর মধ্যে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে তাহার নিতান্তই কম সময় লাগে। তত কম সময়ে আমরা যন্ত্রের সাহায্যে ভিন্ন কোনো খবরই লইতে পারি না।

কিন্তু খুব দূরের কথা যখন ধরা হয়, তখন দেখা যায় যে, তত দূরে আলো চলিয়া যাইবার সময়ের একটা বেশ মোটা হিসাব দাঁড়ায়।

সূর্য হইতে আলো পৃথিবীতে আসিতে সাড়ে সাত মিনিট সময় লাগে। সূর্য যদি আগে না থাকিত আর এখন হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত, তবে আমরা আরো সাড়ে সাত মিনিট পরে তাহাকে দেখিতে পাইতাম। এখন যদি হঠাৎ সূর্য নিবিয়া যায়, তবে আরো সাড়ে সাত মিনিট পর্যন্ত আমরা এই দুর্ঘটনার কোনো খবর পাইব না। এই মুহূর্তে আমরা সূর্যকে যেমন দেখিতেছি, তাহা তাহার সাড়ে সাত মিনিট আগেকার চেহারা।

আলোক এক সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশিহাজার তিনশত মাইল যায়। এইরূপ করিয়া সওয়া চার-বৎসর চলিলে, তবে সে সকলের চাইতে কাছের তারা হইতে পৃথিবীতে পৌঁছাইতে পারিবে। ধ্রুবতারা হইতে পৃথিবীতে পৌঁছাইতে তাহার চুয়াল্লিশ বৎসর লাগে। এইরূপ, যে তারা যত দূরে, সেখানকার আলো পৃথিবীতে পৌঁছাইতে তত বেশি সময় চাই। এত দূরেও নিশ্চয় তারা আছে যে তাহার জন্মের সময় হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াও তাহার আলো এ পর্যন্ত পৃথিবীতে পৌঁছাইতে পারে নাই। আজ যদি সেই আলো আসিয়া এখানে পৌঁছায়, আর আমরা তাহাকে দেখিতে পাই, তবে মনে করিতে হইবে যে, এ তাহার আজিকার চেহারা নহে — সেই সে যখন জন্মাইয়াছিল, তখনকার চেহারা।

পৃথিবী যখন জন্মাইয়াছিল, তখন হইতেই তো তাহার আলো চারিদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। উহার জন্মের সময় হইতে যে আলো রওয়ানা হইয়া গিয়াছিল, তাহা না জানি এত দিনে কোথায় গিয়া পৌঁছাইয়াছে। মনে কর, সেখানে বুদ্ধিমান জীব আছে, আর তাহাদের ভয়ংকর এক-একটা দূরবীন আছে সেই দূরবীন দিয়া যেন এই পৃথিবীর মানুষকে ঠিক একটা মানুষের মতনই বড় দেখা যায়। সেখানকার পণ্ডিতেরা দূরবীন দিয়া কিরকম পৃথিবী দেখিতে পাইতেছে? সেই তাহার জন্মের সময় পৃথিবী যেমন ছিল, তাহারা তাহাই দেখিতেছে। এখানকার এই নদনদী, পাহাড় পর্বত, দেশ গ্রাম, জাহাজ, রেল, এ-সকলের কিছুই তাহারা দেখিতেছে না। তাহারা হয়তো দেখিতেছে, একটা প্রকাণ্ড ধোঁয়াটে জিনিস, আর সেটা হয়তো ঐ সূর্যের মতন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে!

উহার চাইতে ঢের কাছে যদি কেহ সেইরূপ ভয়ংকর দূরবীনওয়ালা থাকে, সে হয়তো পৃথিবীকে ইক্‌থিয়োসরস্, প্লীসিয়োসরস্ ইত্যাদি জন্তুতে পরিপূর্ণ দেখিবে!

সূর্যে যদি তেমন কেহ থাকে, তবে সে হয়তো, তুমি জল খাবার খাইয়া আঁচাইতে যাইবার সময় দেখিবে যে, তুমি এই সবে খাইতে বসিতেছ।

দূরবীন

হ্যান্স্ লিপার্সী নামক একজন ওলন্দাজ চশমাওয়ালা প্রথমে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করে। সেই সময়ে গ্যালিলিও নামক ইটালী দেশীয় বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি ঐ দূরবীক্ষণের কথা শুনিয়া নিজে ঐরূপ একটি দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিলেন।

তখনকার দূরবীক্ষণগুলি অবশ্য নিতান্তই ক্ষুদ্র ছিল। কিন্তু ঐ দূরবীক্ষণ দিয়াই গ্যালিলিও আকাশের সম্বন্ধে এমন সকল কথা জানিতে পারিয়া ছিলেন, যে লোকে তাহা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। এমন কি, অনেকে তাহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া গ্যালিলিওকে

নানারূপে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেও ছাড়ে নাই।

গ্যালিলিও তাঁহার দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেন যে চন্দ্রের বড়-বড় পর্বত আছে; বৃহস্পতি গ্রহের চারিটি চন্দ্র আছে; শুক্র গ্রহের হ্রাস বৃদ্ধি হয়; অর্থাৎ আমাদের চন্দ্র যেমন পূর্ণিমার রাত্রিতে ঠিক গোল থাকে, তারপর দিন দিন একটু একটু কমিয়া শেষে অমাবস্যায় একেবারেই মিলাইয়া যায়, তারপর আবার একটু একটু বাড়িয়া আবার পূর্ণিমা ফিরিয়া আসিলে ঠিক গোল চাঁদটি হয়, শুক্র গ্রহেরও সেইরূপ হইতে দেখা যায়।

গ্যালিলিও তাঁহার দূরবীন দিয়া দেখিয়া যখন বলিলেন যে, সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ আছে, তখন সকলে হাসিয়া উঠিল। অনেকে বলিল যে, 'ও কালো দাগ তোমার চোখেই আছে।'

যাহা হউক, এখন আমরা জানি, যে গ্যালিলিও ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন। গ্যালিলিওর সময় হইতে এ পর্যন্ত ক্রমেই ভালো ভালো, বড় বড় দূরবীন প্রস্তুত হইয়াছে। সেই সকল দূরবীন দ্বারা আজকালকার লোক যাহা দেখিতেছে, গ্যালিলিও তাহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কালে আরো বড় বড় দূরবীন প্রস্তুত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের সাহায্যে যাহা জানা যাইবে, না জানি তাহা কত আশ্চর্য।

দূরবীনের কথা বলিতে গেলে পণ্ডিত হর্শেল সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকা যায় না। ইনি প্রথমে সিপাহী ছিলেন; তৎপর সৈন্যদল হইতে পলায়ন করিয়া শাস্তির ভয়ে নিজের জন্মস্থান জার্মানি দেশ হইতে ইংলণ্ডে আসিয়া গান বাজনার ওস্তাদের ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই ব্যবসায়ে তাঁহার বেশ পশার হইয়া ছিল, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে এই ব্যবসায়ও ছাড়িতে হইল। হার্শেল দূরবীন দিয়া আকাশ দেখিতে বড়ই ভালোবাসিতেন; কিন্তু তাঁহার ভালো দূরবীন ছিল না। একটু ভালো দূরবীনের জন্য তখনকার একজন বড় কারিকরকে লেখাতে সে ব্যক্তি ভয়ানক দাম চাহিয়া বসিল। হর্শেল গরিব মানুষ, এত টাকা তিনি দিতে পারিলেন না; অথচ একটা ভালো দূরবীন তাঁহার চাই। সুতরাং তিনি স্থির করলেন যে একটা দূরবীন নিজে তয়ের করিয়া লইবেন।

দূরবীক্ষণের নল অথবা তাহার স্ক্রুপগুলি সহজেই প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু উহার মধ্যে আসল জিনিস যে ঐ কয়েক খণ্ড কাচ, তাহাই প্রস্তুত করিতে ভয়ানক বুদ্ধি আর পরিশ্রমের দরকার। বড় কাচখানি গড়িতে এত পরিষ্কার হাতের দরকার হয় যে, উহার কোনো জায়গায় এক ইঞ্চির কুড়ি হাজার ভাগের একভাগ মাত্র ভুল হইলেও তাহাতে কাজ আটকায়। ঐ বড় কাচখানিই দূর-বীক্ষণের প্রাণ। দূরবীক্ষণের দামের অনেকটা এই কাচের জন্যই দিতে হয়। কোনো কোনো দূরবীক্ষণে এই কাচখানির পরিবর্তে একখানি আরশি থাকে। হার্শেলের সময়ে খুব বড় কাচওয়ালা দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিবার উপায় জানা ছিল না, আর কাচওয়ালা দূরবীক্ষণের অপেক্ষা আরশিওয়ালা দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিতে পরিশ্রম কম; সুতরাং তিনিও এইরূপ আরশিওয়ালা দূরবীক্ষণই প্রস্তুত করিবেন স্থির করিলেন।

হর্শেল সমস্ত দিন তাঁহার ওস্তাদী ব্যবসায় করিতেন, সন্ধ্যার পরে দূরবীক্ষণের জন্য আরশি পালিশ করিতে বসিতেন। এরূপ করিয়া খুব ভালো দূরবীন প্রস্তুত করা কিরূপ কঠিন কাজ তাহা বুঝিতেই পার। কিন্তু হর্শেল যে কেবলমাত্র ভালো দূরবীন প্রস্তুত করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নহে—তিনি এত ভালো দূরবীন প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে তেমন ভালো

দূরবীন সে সময়ে আর কেহই প্রস্তুত করিতে পারিত না। কি ভয়ানক খাটুনিই তাঁহার খাটিতে হইয়াছিল! ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত, স্নান নাই, আহার নাই, —হর্শেল ক্রমাগত বসিয়া আরশিই পালিশ করিতেন। তাঁহার ভগিনী ক্যারোলীন সর্বদা তাঁহার কাছে থাকিয়া ক্ষুধার সময় মুখে খাবার তুলিয়া দিতেন, আর অতিরিক্ত পরিশ্রমের ক্লেশ কমাইবার জন্য তাঁহাকে আরব্য-উপন্যাস পড়িয়া শুনাইতেন।

এইরূপ পরিশ্রম করিয়া হর্শেল দূরবীক্ষণ তয়ের করিয়াছিলেন। একটি নয়, দুটি নয়, অনেকগুলি। রাজারা অবধি তাঁহার তৈয়ারি দূরবীক্ষণ পাইলে যারপরনাই খুশি হইতেন। তখনকার দূরবীক্ষণগুলির মধ্যে হর্শেলের তৈয়ারি কয়েকটা দূরবীক্ষণই সকলের চাইতে বড় ছিল।

হর্শেল ক্রমে ওস্তাদী ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া দূরবীক্ষণ নির্মাণ এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা লইয়াই দিন কাটাইতে লাগিলেন। কালে তিনি একজন প্রধান জ্যোতির্বেত্তা হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার সকলের অপেক্ষা বড় কাজ দূরবীক্ষণ-নির্মান নহে—তাহা ইউরেনস্ গ্রহের আবিষ্কার। বাস্তবিক জ্যোতির্বেত্তা বলিয়াই হর্শেলের অধিক খ্যাতি। তবে, আমরা নাকি এখন দূরবীক্ষণের কথা লইয়াই একটু ব্যস্ত আছি, সুতরাং অন্য বিষয়ের কথা এখন না পাড়াই ভালো।

হর্শেল অনেক দূরবীন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার বড়খানির আরশিটি চার ফুট চওড়া ছিল। ইহার পরে লর্ড রস্ এর চাইতেও বড় একটা দূরবীন প্রস্তুত করেন, তাহার আরশিখানি ছয় ফুট চওড়া। এত বড় কাচওয়ালা দূরবীন এপর্যন্ত কেহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। সকলের অপেক্ষা বড় কাচওয়ালা দূরবীক্ষণের কাচ পঞ্চাশ ইঞ্চি চওড়া;গত প্যারী প্রদর্শনীতে এই দূরবীক্ষণটি দেখানো হইয়াছিল।

তোমরা অনেকেই দূরবীন দেখিয়াছ। একটা নল, তাহার দুমাথায় কাচ পরানো—দূরবীনের চেহারা মোটামুটি এইরূপ। একদিকের কাচ বেশ বড়, ইহা দ্বারা দূরবীনের নলের ভিতরে দেখিবার জিনিসের ছবি তৈয়ার হয়। অন্য দিকের কাচ ছোট, ইহাতে সেই ছবিখানিকে খুব বড় করিয়া দেখায়। বড় দেখাইলেই আমাদের বোধ হয় যেন জিনিসটাকে কাছে দেখিতেছি।

বড় কাচখানির ইংরাজি নাম (অব্জেক্ট গ্লাস) object glass অর্থাৎ জিনিসের কাচ। যে জিনিসটাকে দেখিতে যাইতেছ, এই কাচখানিকে তাহার পানে ফিরাইয়া ধরিতে হয়, এইজন্যই উহার নাম জিনিসের কাচ। আর ছোট কাচের পিছনে চোখ রাখিয়া তাকাইয়া দেখিতে হয়, এইজন্য উহার নাম (আই পীস্) eye piece অর্থাৎ চোখের কাচ। এক কথা, আমার কথা শুনিয়া হয়তো বোধ হইতে পারে যে object glassটি বুঝি একখানি কাচ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। একখানি কাচ দিয়া object glass তৈয়ার করিলে তাহাতে জিনিসের চারি ধারে রামধনুর মতন রঙ দেখা যায়। সুতবাং এই দোষ দূর করিবার জন্য দুরকমের দুখানি কাচ দিয়া object glass প্রস্তুত করা হয়। অবশ্য যেমন তেমন দুখানি কাচ লইলেই তাহা দ্বারা অব্জেক্ট গ্লাস প্রস্তুত করা যায় না;ইহার একটা হিসাব আছে। কিন্তু সেই হিসাবটা নাকি একটু কঠিন, সুতরাং এখানে তাহার চর্চা হইতে পারে না।

আই পীস্ও সচরাচর একখানি কাচের হয় না। একখানি কাচের আই পীস্ দিয়া একেবারেই কাজ চলে না এমন নহে অব্জেক্ট গ্লাস ভালো হইলে, একখানি কাচের আই পীস্ দিয়াও বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু যাহা দেখা যায় তাহা সবই উলটা। ঐরূপ আই পীসের

ভিতর দিয়া আমাকে দেখিলে দেখিবে আমার পা উপর দিকে মাথা নীচের দিকে।

আকাশ দেখিবার সময় ঐরূপ আই পীস্ ব্যবহারে কোনো দোষ হয় না; কিন্তু পৃথিবীর গাছপালা, মানুষ, গোরু, বাড়িঘর ইত্যাদিগকে উলটা দেখিতে একেবারেই ভালো লাগে না। সুতরাং পৃথিবীর জিনিসপত্র দেখিতে হইলে যাহাতে সোজা দেখা যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হয়। এইজন্য আরো অন্তত দুখানি কাচের প্রয়োজন। ইহা ছাড়াও ভালো করিয়া দেখিতে হইলে শুধু একখানি কাচের আই পীসে সকল সময় কাজ চলে না। সুতরাং আকাশ দেখিবার জন্য সচরাচর দুখানি কাচের আই পীস্ ব্যবহার হয়। অবশ্য তাহাতেও জিনিস উলটাই দেখা যায়; কিন্তু হইলেও, দেখায় বেশ পরিষ্কার।

খানিক আগে যে আরশিওয়ালা আর কাচওয়ালা দূরবীনের কথা বলিতেছিলাম, এখন তাহার অর্থ বেশ বুঝিতে পারিবে। আমরা সচরাচর যে-সকল দূরবীন দেখিতে পাই, তাহা কাচওয়ালা দূরবীন; কেন না, ইহাদের অব্জেক্ট্ গ্লাস কাচের। অব্জেক্ট্ গ্লাসের কাজ, দূরবীনের ভিতরে জিনিসের ছবি তৈয়ার করা। এই কাজ আরশি দ্বারাও হইতে পারে। সুতরাং এমন দূরবীনও হয়, যাহাতে অব্জেক্ট্ গ্লাসের বদলে একখানি আরশি আছে। তাহাকেই বলে আরশিওয়ালা দূরবীন।

এই-সকল কাচ এবং আরশি প্রস্তুত করা যে বড়ই কঠিন কাজ, এ কথা বলিয়াছি। যে কোনোরকমের একটা আরশি বা কাচ হইলেই তো হইল না, ইহার একটা বিশেষ গড়ন আছে। আরশিখানির গড়ন সরার ন্যায়—মাঝখানটায় গর্ত। কাচ দুখানি গোল—তাহাদের একখানার মাঝখানটা পুরু ধার পাতলা, আর একখানার পাশ পুরু মাঝখানটা পাতলা। আর কোন জায়গায় কতখানি পুরু, বা কতখানি পাতলা, বা কতখানি গর্ত, এ-সকলের হিসাবও যেমন তেমন হিসাব নহে।

সুতরাং কাজ কঠিন হইবারই কথা। আরশির বেলা পরিশ্রম অনেক কম কারণ তাহার একপিঠ গড়িতে পারিলেই হইল। কিন্তু কাচ দুখানিতে চারিটি পিঠ সুতরাং তাহাতে চারিগুণ পরিশ্রম। এত পরিশ্রমের অর্থ ঢের খরচ এ কথা সহজেই বুঝিতে পার। একটা বড় দূরবীনের কথা যদি বলি, তাহা হইলে কথাটা আরো পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে।

একটা খুব বড় দূরবীক্ষণের ছবি[১] দেওয়া গেল। আমেরিকার কালিফর্ণিয়া দেশে হ্যামিল্টন্ পর্বতের উপরে একটি মানমন্দির (অর্থাৎ নক্ষত্র দেখিবার আফিস) আছে। এই মানমন্দিরের নাম লিক্ মানমন্দির। এই মানমন্দিরে একটি বড় দূরবীক্ষণ আছে।

দূরবীনটির নলটি প্রায় ৫৭ ফুট লম্বা। বড় কাচখানি (অবজেক্ট্ গ্লাস) তিনফুট চওড়া। যে স্তম্ভের উপরে দূরবীনটি আছে, তাহা ৩৮ ফুট উঁচু।

আটত্রিশ ফুট উঁচুতে দূরবীন থাকিলে দেখিবার সময় খুব মুস্কিল হয় না? আকাশের মাঝখানের অর্থাৎ আমাদের মাথার উপরের কোনো জিনিস দেখিতে হইলে বেশি মুস্কিল না হইতে পারে, কারণ তখন দূরবীনের গোড়ার দিকটা আমাদের চোখের খুব কাছে থাকে, কিন্তু দেখিবার জিনিসটি যদি আকাশের এক পাশে থাকে, তবে তো তাহার দিকে দূরবীন ফিরাইতে গেলেই তাহার গোড়ার দিকটা ভয়ানক উঁচুতে উঠিয়া যাইবে, তখন কি মই দিয়া উঠিয়া দেখিতে হইবে নাকি? মই দিয়া উঠিয়া যে না দেখা যায় এমন নহে। কিন্তু এরূপ করিয়া বেশি উঁচুতে

[১] পত্রিকার পাতায় ছবিটি বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় দেওয়া সম্ভব হল না।

উঠিয়া দেখা সুবিধাজনক নহে। ঘরের মেঝের নীচে এমন কল আছে যে, দরকার হইলে সমস্ত মেঝেটাকে ইচ্ছামতো উঁচু-নিচু করা যায়। দূরবীনের গোড়া যখন খুব উঁচুতে উঠিয়া যায়, তখন তাহার সঙ্গে তাহার সঙ্গে মেঝেটাকেও উঁচু করিলে আর গোল থাকে না।

যে স্তম্ভের উপরে দূরবীনটা আছে, তাহার ভিতরটা ফাঁপা। তাহাতে ঘড়ির মতন একটা প্রকাণ্ড কল আছে। দূরবীনটাকে একবার আকাশের কোনো জিনিসের পানে ফিরাইয়া ঐ কল চালাইয়া দিলে, আর সে জিনিস দূরবীনের ভিতর হইতে চলিয়া যাইতে পারে না। মনে কর, একটি তারা সন্ধ্যার সময় পূর্বদিকে দেখা দিয়াছে, আর তোমার ইচ্ছা হইল যে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ঐ তারাটিকে দেখিবে। এখন তুমি যদি একটিবার ঐ তারাটিকে দূরবীনের ভিতরে আনিয়া কল চালাইয়া দাও, তাহা হইলে তারাটি ক্রমাগতই দূরবীনের ভিতরে থাকিবে। তারাটি যেমন ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিয়া মধ্যরাত্রে মাথার উপরে আসিবে, দূরবীনও তেমনি ক্রমে একটু একটু ঘুরিয়া মধ্যরাত্রে মাথার উপরের দিক লক্ষ্য করিবে। ভোরবেলা তারাটি যখন পশ্চিমে অস্ত যাইবে, দূরবীনও তখন ঠিক সেই দিকে মুখ ফিরাইবে।

ছবির দিকে একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে দূরবীনের গায় ছোট-ছোট কয়েকটি দূরবীন আঁটা রহিয়াছে। বড় দূরবীন দিয়া আকাশের জিনিসগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করা খুব কঠিন কাজ; এইজন্য ঐ ছোট দূরবীনগুলি উহার গায়ে পরানো রহিয়াছে। একটা জিনিসকে বড় দূরবীন দিয়া দেখিতে হইলে আগে ঐ ছোট দূরবীনের কোনো একটা দিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। সেই জিনিসটি যখন ঐ ছোট দূরবীনের ঠিক মাঝখানে আইসে, তখন বড় দূরবীনের ভিতরেও তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

দূরবীনের গোড়ার দিকে অনেকগুলি খুঁটিনাটি জিনিস দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি ডাণ্ডা দেখা যায়, তাহাদের মাথায় এক-একটা চাকা পরানো। এই চাকাগুলিকে পাক দিয়া দূরবীনটাকে ইচ্ছামতো ঘুরানো ফিরানো ইত্যাদি নানান কাজ করা যায়।

দূরবীনটা একটা ঘরের ভিতরে রহিয়াছে। ঐ ঘরের উপরটা গম্বুজের মতন। সেই গম্বুজের গোড়া হইতে আগা পর্যন্ত একদিকে ফাঁক আছে; ঐ ফাঁকের ভিতর দিয়া আকাশ দেখিতে হয়। দূরবীন যখন যেদিকে ফিরে, সমস্ত গম্বুজটাকে ঘুরাইয়া তাহার ফলকটিকে সেই দিকে আনিতে হয়। এই কাজ যাহাতে সহজে হইতে পারে, তজ্জন্য গম্বুজের নীচে চাকা পরানো আছে।

এত কথার পর ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, এরূপ একটা দূরবীনে ঢের টাকা ব্যয় হয়। লিক্ মানমন্দিরের দূরবীনটিতে সওয়া ছয়লক্ষ টাকা খরচ পড়িয়াছিল। এই টাকার চারিভাগের একভাগ অর্থাৎ একলক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা শুধু তিন ফুট চওড়া অব্‌জেক্ট্‌ গ্লাসটির দাম।

জেম্‌স্ লিক্ নামক এক সাহেবের টাকায় হইয়াছিল বলিয়াই লিক্ মানমন্দির নামটি হইয়াছে। লিক্ সাহেব অতিশয় দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। লেখাপড়া অধিক শিখিতে পারেন নাই, কিন্তু ব্যবসায় করিয়া অনেক টাকা উপার্জন করেন। তাঁহার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকায় এই সমস্ত টাকা তিনি একটি দূরবীক্ষণ এবং মানমন্দির নির্মাণের জন্য দিয়া গেলেন। তাহার উইলে লেখা ছিল যে এমন একটি দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিতে হইবে যে তেমন দূরবীক্ষণ আর হয় নাই। কিন্তু ঐ দূরবীক্ষণ প্রস্তুত হওয়ার পরে ইহার চাইতেও বড় দুইটি দূরবীক্ষণ তৈয়ার হইয়াছে।

পুরী

১

আজকাল রেল হইয়া পুরী যাইবার বেশ সুবিধা হইয়াছে, তাই এখন অনেকেই শখ করিয়া সেখানে গিয়া থাকেন। যাইবার পথটি বেশ। অনেকগুলি সুন্দর-সুন্দর নদী পার হইতে হয়। আর বালেশ্বর ছাড়াইলে পথের দুধারে অনেক পাহাড়ও দেখা যায়। নদীগুলির এক-একটা খুব চওড়া, তাহার উপরে বড়-বড় পোল আছে। পার হইবার সময় দু-একটা কুমিরও যে না দেখা যায়, এমন নহে। পাহাড়গুলিও নিতান্ত ছোট নহে, আর দেখিতেও বেশ। মাঝে মাঝে দূর হইতে এক-একটা মস্ত পাহাড় দেখা যায়, তাহার মাথা মেঘে ঢাকা। আবার পথের পার্শ্বেই এক-একটা লাল রঙের পাহাড়ে ছোট-ছোট ঝোপের শোভাও চমৎকার লাগে।

হাবড়া হইতে বালেশ্বর পর্যন্ত পথের দুধারেই প্রকাণ্ড মাঠ, কাছে লোকের বসতি বড় বেশি দেখা যায় না। কাঁকর মাটি তাহাতে খুব বেশি, গাছপালাও জন্মায় না। সুতরাং এই পথটুকু ভালো না লাগিবারই কথা। সুখের বিষয় এই যে, রাত্রির মধ্যেই ট্রেন এইসকল স্থান পার হইয়া যায়। বালেশ্বর গিয়া ভোর হয়।

তবে এই মাঠের ভিতরেও যে দেখিবার একেবারে কিছুই নাই, তাহা নহে। হাঁটিয়া শ্রীক্ষেত্র যাইবার সেই পুরানো পথ এই মাঠের উপর দিয়াই গিয়াছে। রেল হইতে বার বার সেই পথ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিবার যে উহাতে এমন বিশেষ কিছু আছে, তাহা নহে। আমাদের দেশী বিশ্রীগোছের পাকারাস্তা যেমন হইয়া থাকে, এও সেইরূপ। তোমরা দেখিলে উহাকে কিছুমাত্র ভালো বলিবে না। তথাপি আমি উহাকে বার বার দেখিয়াও ক্লান্ত হই নাই। আমার যে বড়ই সুন্দর লাগিয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু ঐ পথটাকে দেখিয়া আমার ছেলেবেলার অনেক কথা মনে হইতেছিল। ঐ পথ দিয়া কত লোক শ্রীক্ষেত্র গিয়াছেন। ছেলেবেলা তাঁহাদের অনেকের মুখে এই পথের বর্ণনা শুনিয়াছি। মাথা-ফাটানো রৌদ্রের মধ্যে তপ্ত কাঁকরের উপর দিয়া পথ চলা। পা ফুলিয়া যায়, পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তথাপি উৎসাহের ত্রুটি নাই। পুরুষদের চাইতে স্ত্রীলোকদেরই উৎসাহ বেশি। একটি বৃদ্ধা গ্রামের কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রসাদ, জগন্নাথের ছবি, সমুদ্রের ফেনা, হোগলার ঠোঙ্গা, হোগলার পাখা প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য জিনিস লইয়া দেশে ফিরিলে পর, বহুদিন পর্যন্ত আমরা তাঁহাকে মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করিতে দিই নাই। জগন্নাথের চেহারা কেন ওরূপ হইল? সুভদ্রা ঠাকুরুণ ভাইদের মাঝখানে অমন জড়সড় হইয়া আছেন কেন? কালাপাহাড় কিরকম ভয়ানক লোক ছিল? ইত্যাদি কথা শুনিতে শুনিতে আমাদের মুখের হাঁ আর চোখ ক্রমে গোলাকার হইয়া উঠিত। আর শেষকালে সেই বৃদ্ধা যখন '—' ঠাকুর ফুলা পায় খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কিরূপ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার অভিনয় করিয়া দেখাইতেন, তখন ব্যাপার যাহা হইত সে আর কি বলিব!

সেই '—' ঠাকুর এই পথে শ্রীক্ষেত্র গিয়াছিলেন। এই পথে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামটি পর্যন্ত এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু তথাপি কিরূপ করিয়া তিনি এই পথে গিয়াছিলেন তাহা যেন স্পষ্ট মনে হইতেছিল।

আর মনে হইতেছিল সেই বুড়ো ওড়িয়া পাণ্ডাটির কথা, শিশুকালে যাঁহার সহাস্য মুখখানি

দেখিলে আমরা কতই আনন্দিত হইতাম। পাণ্ডার নিজের সম্বন্ধে এমন বিশেষ সংবাদ আমরা কিছুই জানিতাম না, যাহাতে তাঁহাকে দেখিলে আমাদের ভারি সুখ হইবার কথা। কিন্তু তাঁহার একটি আশ্চর্য লম্বা থলে অথবা তাহার ভিতরকার প্রসাদের খাতিরেই শিশুকাল হইতে এপর্যন্ত তাঁহার কথা মনে করিয়া রাখিয়াছি। সেই প্রসাদের থলেসুদ্ধ সেই বুড়ো পাণ্ডা নিশ্চয় এই পথে গিয়াছিলেন। তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া ছিলেন কি না তাহা আর এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ক্লেশ তাঁহার খুবই হইয়াছিল, এ কথা বলিতে পারি।

এই পথ ভিন্ন আরো দেখিবার জিনিস আছে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে দুপুরবেলায় ঐ-সকল স্থানে মরীচিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সময়ে একবার কটক গিয়াছিলাম, তখন আমি দেখিয়াছি, তাহার পূর্বে কেবল পুস্তকেই উহার কথা পড়িয়াছিলাম, চক্ষে দেখা হয় নাই। মরুভূমিতে মরীচিকা দেখিতে পাওয়া যায় এ কথাই জানিতাম। ও জিনিস যে মরুভূমি ছাড়িয়া আমাদের এত কাছে আসিয়া বসিয়া আছে, তাহা কি আর আমি জানি। কাজেই তখন আমি তাহার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া উহাকে জলই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু কটক হইতে ফিরিবার সময় আমার এ ভ্রম দূর হইল। তখন একজন সাহেব আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখেছ কেমন মরীচিকা?" আমি অবাক হইয়া বলিলাম, "উহা জল নয়?" তিনি বলিলেন, "না, উহা মরীচিকা। সমুদ্রের কাছে গেলে আরো স্পষ্ট দেখা যায়।" তখন অনেক মনোযোগ করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, উহা জল নয়।

রাত্রিতে হাবড়া স্টেশন হইতে রওয়ানা হইয়া সকালে বালেশ্বরে গিয়া যখন ঘুম ভাঙ্গে, তখন বেশ বুঝা যায়, যে একটা নূতন স্থানে আসা গিয়াছে। স্টেশনের নামে আর বাঙ্গালা অক্ষর নাই, তাহার স্থানে ওড়িয়া ভাষা হইয়াছে। আমরা যেমন করিয়া বাঙ্গালা আর দেবনাগর অক্ষরে মাত্রা দিই, ওড়িয়া অক্ষরের মাত্রা তেমন করিয়া দেওয়া হয় না। সোজা কসিটির বদলে তাহাতে পুঁটুলী পাকাইয়া আনিতে হয়;আসল অক্ষরটি তাহাতে তলায় পড়িয়া থাকে। অনেক অক্ষরেরই আসল অংশটুকু সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালা অক্ষরের ন্যায়।

এইরূপ ওড়িয়া অক্ষর দেখিয়া, আর ওড়িয়া ভাষা শুনিয়া বেশ আমোদেই পথ ছাড়ায়। ইচ্ছা হইলে ইহার সঙ্গে ওড়িয়া জলখাবারের বিষয়টাও যোগ করিতে হানি নাই। তবে, তাহাতে আমোদ কতখানি হইবে, আর ক্ষুধাই-বা কতটুকু কমিবে, তাহা যে খাইবে তাহার মেজাজ এবং দাঁতের উপর নির্ভর করে। অন্তত আমি একবার বালেশ্বর স্টেশনের জলখাবারের যে নমুনা দেখিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিকই যদি ঐ অঞ্চলের গুণপনার নমুনা হয়, তবে এ কথা বলিতে পারি, তাহাদের জিনিস খুব মজবুত। খাইবার সময় তাহা যেমন মজবুত, পেটের ভিতর গিয়াও যে তাহার চাইতে কম টেকসই হইবে তাহা মনে হয় না। সুতরাং এক ঠোঙ্গা কিনিলে ক্ষতি কি! আর কিছু লাভ না হউক, পুরী পর্যন্ত অবশিষ্ট মাইল শতেক এই এক ঠোঙ্গা মিঠাইয়ের চর্চাতেই উত্তমরূপে কাটানো যাইবে।

পথে ভুবনেশ্বর স্টেশনের কাছে একটু সতর্ক হওয়া আবশ্যক, কারণ ট্রেন হইতে তথাকার মন্দিরগুলির দৃশ্য দেখিতে খুব সুন্দর। আর খুরদা স্টেশনে নামিয়া যে গাড়ি বদলাইতে হয়, সে কথাটাও না ভুলাই ভালো;কারণ তাহাতে পুরী পৌঁছাইবার ব্যাঘাত হইতে পারে। তবে,

আমার দাদা যেরূপ সতর্ক হইয়াছিলেন, এতটা না হইলেও চলিবে। তিনি নাকি বড়ই হুঁসিয়ার লোক, তাই কটক হইতে পুরী আসিবার পথে তিনি ভুবনেশ্বরেই তাড়াতাড়ি নামিয়া গাড়ি বদলাইতে ছুটিলেন। গাড়ি যে পাইলেন না তাহা বোধ হয় আর আমার না বলিলেও চলিবে, ততক্ষণে তিনি যে ট্রেনে আসিয়াছিলেন, তাহাও ছাড়িয়া গেল! কিন্তু '—' দাদা সহজে দমিবার লোক নহেন! তিনি বলিলেন, "ভালোই হইল ভুবনেশ্বর দেখিয়া যাই!"

পুরী পৌঁছাইবার চারি-পাঁচ মাইল থাকিতেই জগন্নাথের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। যেন একটা প্রকাণ্ড ভুট্টা। ভুট্টার দানা যেরূপ করিয়া সাজানো থাকে, মন্দিরের আকৃতিও কতকটা ভুট্টারই মতন। মন্দিরের এই দৃশ্যটি দেখিতে বেশ সুন্দর, কিন্তু কাছে গিয়া আমার তাহা এত সুন্দর বোধ হয় নাই বিশাল সবুজ মাঠের মাঝখানে বিস্তৃত জলাশয়, তাহার পাশে সেই প্রকাণ্ড মন্দির, গাছপালা তাহার কোমরের নীচে পড়িয়া আছে। দেখিলে বাস্তবিকই তাহাকে একটা যেমন তেমন জিনিস বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু মনের এই আনন্দটুকু অল্পক্ষণই থাকে যতই কাছে যাওয়া যায়, ততই ছোট-ছোট জিনিসে মন্দিরকে আড়াল করিয়া ফেলে। সে সবুজ মাঠ আর বিশাল জলাশয়ের নির্মল জল দেখা যায় না। সমুদ্রের বালি, আর হাড্ডিসার গাছপালা তাহার স্থান অধিকার করে। ইহার উপর আবার যেই স্টেশনে নামিলাম অমনি,

'—দক্ষিণে, বামে, পিছনে সম্মুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।'

আমি তীর্থ করিতে পুরী যাই নাই, বেয়ারাম সারাইবার জন্য গিয়াছিলাম। কিন্তু বার বার সবিনয়ে বলাতেও পাণ্ডা মহাশয়েরা আমার কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। আমি যত বেশি করিয়া বলি, তাঁহারাও ততই আরো যত্নপূর্বক আমাকে আহ্বান করেন। শেষটা গাড়িতে উঠিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম বটে, কিন্তু বাসায় আসিয়া দেখি, সেখানে একজন আসিয়া আছেন!

যাহা হউক, শেষটা ইঁহাকেও বুঝিতে হইল যে এ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়াই ভালো। আমিও রক্ষা পাইয়া নিজের অবস্থা এবং বাসস্থান বিষয়ে মনোযোগী হইলাম।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। আমি বেয়ারাম লইয়া সেখানে গিয়াছিলাম। নিয়ম পালন করিতেই আমার সমস্ত সময় কাটিয়া যাইত। চারিদিকে বেড়াইয়া দেখিবার অবসর আমার হয় নাই। বেড়াইবার অবসর যখন হইত, তখন সমুদ্রের ধারে চলিয়া যাইতাম। মন্দিরের ওদিকে দু-একদিন মাত্র গিয়াছিলাম। আমার ভিতরে যাইবার উপায় ছিল না। বাহির হইতে যাহা দেখা যায়, তাহাই দেখিয়াছি। সুতরাং মন্দিরের সম্বন্ধে আমার বেশি কথা বলিবার নাই।

মন্দিরটা খুব বড়। আর প্রাচীর সিংহদ্বার প্রভৃতি লইয়া দেখিতেও বেশ জমকাল। কিন্তু কাছে গিয়া কারুকার্য তেমন ভালো বোধ হয় না। সামনের রাস্তাটি খুবই চওড়া; আমি আর কোথাও এমন প্রশস্ত পথ দেখি নাই। এই পথে জগন্নাথের রথ চলে। পথের এক প্রান্তে রথখানি রহিয়াছে। সেখানকার বড় পর্ব রথযাত্রা। রথযাত্রার সময় দুই তিন লক্ষ লোক পুরীতে জড়ো হয়। এই কয়দিন ইহারা জগন্নাথের প্রসাদ খাইয়াই দিন কাটায়। প্রসাদ বাজারে বিক্রয় হয়, কিনিয়া খাইলেই হইল। যাহা খাইতে পারে খাইবে অবশিষ্ট আর একবার খাইবার

জন্য রাখিয়া দিবে। জগন্নাথের প্রসাদ ফেলিয়া দিবার জো নাই। বাসি হইয়া পচিয়া গেলেও তাহা খাইতে হইবে। জগন্নাথের প্রসাদ খাইতে জাতির বিচার নাই। চণ্ডাল যদি ব্রাহ্মণকে প্রসাদ আনিয়া দেয়, তাহাও তাঁহাকে খাইতে হয়।

পুরীতে গোদের প্রাদুর্ভাবটা কিছু বেশি। সেখানকার লোকের নাকি এই বিশ্বাস যে, জগন্নাথের প্রসাদ মাড়াইলে গোদ হয়।

পুরীতে গিয়া প্রথমেই একটা ব্যাপার একটু আশ্চর্য বোধ হয়। সমুদ্রের ধারের স্থানগুলিতে গাছপালা বাড়িতে পায় না। বড়গাছগুলি আমগাছের মতন। নিমগাছ কুলগাছের মতন। অনেকগুলি গাছই আবার একপেশে। একদিকে কারো ডালপালা বেশ বাড়িয়াছে, কিন্তু আর এক দিকে বেশি ডাল নাই আবার যাহা আছে তাহাতেও পাতা খুব কম। সমুদ্রের ধারের বালি হাওয়ায় উড়াইয়া আনিয়া এই-সকল গাছের ঐরূপ দুর্দশা করে। হাওয়ার দিন সমুদ্রের ধারে এই কথাটি বেশ বুঝিতে পারা যায়। খুব শুকনো দিনে বেশি হাওয়া হইলে, তাহার চোটে বালির কণাসকল ছুটিয়া আসিয়া গায়ে পড়ে। আর এত জোরে পড়ে যে, খালি চামড়ায় পড়িলে অনেক সময় তাহাতে পিঁপড়ের মতন বেদনা বোধ হয়। এই হাওয়ায় তাড়ানো বালির দৌরাত্ম্যে গাছের কচি পাতাগুলি প্রায় মারা যায়।

সমুদ্রের হাওয়া সমুদ্র ছাড়িয়া বেশি দূরে যায় না। সুতরাং সমুদ্রের কাছের গাছপালারই এইরূপ দুরবস্থা। সমুদ্র হইতে দূরে বড় বড় গাছের অভাব নাই। তাহা ছাড়া এক এক রকমের গাছ সে দেশের মাটিতে স্বভাবত খুব বাড়ে বলিয়া বোধ হইল। প্রথমে পুরীর বাসায় ঢুকিয়াই দুটি পেঁপে গাছ দেখিলাম; তেমন বড় পেঁপেগাছ আমি আর কখনো দেখি নাই। সে দেশে পেঁপের নাম 'অমৃত ভান্ড'। এমন জমকাল নামের গরিমায়ই-বা সেখানকার পেঁপেগাছ ফুলিয়া এত বড় হয়! আর তাহার ডালপালাই বা কত! বাড়ির পাশেই কয়েকটা বট গাছ ছিল। সে গাছগুলি যেমন উঁচু পেঁপেগাছগুলি বরং তাহার চাইতে একটু বেশি উঁচু। তবে, পরিসরে অবশ্য ঢের কম।

একপ্রকার মনসাগাছও সেখানে খুব জন্মায় সেগাছের পাতা দেখিতে সাপের চক্রের মতন। একটা পাতার টিকির ভিতর দিয়া আর একটা বাহির হয়। ফুল-ফলও পাতার আগাতেই হয়। কুমড়ো ফুলের মতন বড়-বড় হলদে। সেই ফুলগুলি দেখিতে খুব সুন্দর।

সে দেশের ঘরবাড়ি আমি বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না। তিনটি চলনসই শয়ন ঘর, ভাঁড়ার, রান্না ঘর, একটি অতিশয় ক্ষুদ্র স্নানের খোপ, আর সেইরূপ আর একটি জায়গা তাহাতে কাঠ রাখা চলে। তিনটি বারান্দা, পাঁচিল ঘেরা আঙ্গিনা, ভিতরে একটি কূয়া। এইরূপ একটি বাড়ির জন্য আমাকে মাসে সত্তর টাকা করিয়া দিতে হইয়াছিল। দূরে ঐ বাড়ির চেহারা দেখিয়া ছেলেরা বলিয়াছিল, "য়্যা! বিচ্ছিরি বাড়িটি যদি আমাদের হয়" শেষটা সেই "বিচ্ছিরি" বাড়িতেই গাড়ি থামিল। গাড়ি হইতে নামিয়া দেখি, একটি কুকুর সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। একটি সে-দেশী চাকরও ছিল; কিন্তু তাহার কথা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। কুকুরটা তাহার চাইতে ঢের ভালো লোক। কুকুর হইলেও সে আমাদিগকে আদর-যত্ন করিতে ত্রুটি করে নাই।

কুকুর আর সেই চাকর ভিন্ন সে বাড়িতে আরো অনেকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু তাহারা মানুষ নয়, ছোট ছোট ব্যাঙ। একটা দুটো নয়, অনেকগুলি। ভাবে বোধ হইল,

যেন তাহারাই সচরাচর ঐখানে থাকে। এমন নিশ্চিন্তভাবে পরের ঘরে থাকিতে আর কোনো জন্তু পারে না। কাজের মধ্যে তো দেখিলাম, খালি থপ্‌থপ্ করিয়া দেওয়ালের ধারে বেড়ানো, আর কোণে পৌঁছাইলে সেই কোণ বাহিয়া দেওয়ালে উঠিবার চেষ্টা। কাজটি অতিশয় কঠিন। দুই পা ছড়াইয়া দুদিককার দেয়ালে প্রাণপণে ঠেস্ না দিলে এ কাজ হইবার জো নাই। আর ছড়ানোও যেমন তেমন হইলে হইবে না। ব্যাঙ ভিন্ন অন্য কোনো জন্তুর সেরূপভাবে পা ছড়াইবার ক্ষমতা আছে কি না, বিশেষ সন্দেহের বিষয়। আর তাহা দেখিলে কি হাসিই পায়, তাহা কি বলিব! কিন্তু ব্যাঙ খুব ধীর প্রকৃতির জানোয়ার, যারপরনাই গম্ভীরভাবেই সে এ কাজ করিতে থাকে।

এই ব্যাঙ তাড়ানোই কিছুদিন ছেলেদের কাজ হইল। সহজে কি তাহারা যায়! ধমকাইলে যে তাহারা কানে শোনে, তাহার কোনো প্রমাণই পাওয়া গেল না। লাঠি দিয়া খোঁচাইতে গেলে খালি একটু ব্যস্ত হয়, কিন্তু ঘরের বাহিরে যে যাইতে হইবে, এ কথা তাহাদের মাথায়ই আসে না। শেষটা একটি ছেলে এক ফন্দি বাহির করিল। কাগজের ঠোঙ্গা সামনে ধরিয়া পিছনে তাড়া করিলে অতি সহজেই ব্যাঙ তাহাতে লাফাইয়া উঠে। তাহার পর তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিলেই হইল।

এইরূপ করিয়া ব্যাঙের উপদ্রব কমিল বটে, কিন্তু উই দেখা দিল। ঐ উইয়ের লোভেই এত ব্যাঙ আসিয়াছিল। উইয়েরা আমাদের জিনিসপত্র কাটিয়া আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। বই আর জুতার উপরেই তাহাদের বেশি আক্রমণ, বিশেষত জুতা যতই মজবুত হয়, ততই যেন উহা তাহার মিষ্ট লাগে। লোহা, পিতল ভিন্ন আর কিছুই তাহার দাঁতের কাছে টেকে না, খালি কেরসিন তেল এক জিনিস আছে, যাহার কাছে উই জব্দ থাকে।

৩

পুরীর ঘরের কথা বলিতে ব্যাঙ আর উইয়ের কথা উঠিয়াছিল তাহার পর দেশের মানুষের কথা আসা স্বাভাবিক। সেদেশের লোক আমরা এখানে বসিয়াই ঢের দেখিতে পাই। তাহারা কেমন কথা কয়, কেমন পান খায়, কেমন রাঁধে, কেমন সুরে পালকি বয় এ-সকল কাহারো অজানা নাই। একটা কথা অবশ্য মনে রাখা উচিত। আমাদের এখানে যাহারা পালকি বহিতে, চাপরাসী গিরি আর মুটের সর্দারি করিতে ও রাঁধিতে আসে, তাহাদের দেখিয়া সে-দেশের ভদ্রলোকের সম্বন্ধে বিশেষ জানা যায় না। দুঃখের বিষয়, সেখানে গিয়াও আমি সেদেশের ভদ্রলোকদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাই নাই। সেখানে গিয়াও সেই ওড়িয়া ব্রাহ্মণ আর ওড়িয়া চাকর লইয়াই ব্যস্ত হইয়াছি, আর সেই ওড়িয়া পালকিওয়ালার চ্যাচানিতেই কান ঝালাপালা হইয়াছে। একটা বড়রাস্তার পাশেই আমার বাসা ছিল, আর সেই রাস্তার সংলগ্ন একটি ঘরে দিনের বেলায় আমি বসিতাম। সুতরাং ওড়িয়া পালকি বেহারার সংগীত শুনিতে আমার ত্রুটি হয় নাই। এখানকার ওড়িয়ারা তেমন গান গাহিতে জানেই না। সেখানে কোনো স্থান দিয়া একটা পালকি গেলে সিকি মাইল পর্যন্ত তাহাদের আক্ষেপ শুনিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, যেন তাহারা বড়ই বিপদে পড়িয়াছে, আর সেই বিপদটা যেন তাহাদের পাল্কীর ভিতরে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে সওয়ারটি ভারী হইলে নাকি ঐরূপ করিয়া তাহারা গালি দেয়। ইহা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে পালকিতে উঠিবামাত্র সকলেই হঠাৎ ভয়ানক ভারী হইয়া যায়। আসল কথা কিন্তু তাহার কিছুই নহে। উহাদের ঐ

চীৎকারের ভিতরে একটা শৃঙ্খলা আছে। সামনের একজন যেন চ্যাঁচাইয়া বলিল, 'ওরে বাবা রে!' পিছনের একজন যেন উত্তর দিল, 'কি হল রে!' সামনের লোক বলিল, 'ওগো মাগো!' পিছনের লোক বলিল, 'কোথায় যাব গো!' 'মাগো' 'বাবা গো' বলে না আর কিছু যে বলে, তাহাও আমি জানি না, কথাগুলি নাকি বড়ই উৰ্দ্ধশ্বাসে বলে তাহাতেই এরূপ মনে হয়। উহাতে বেশ একটা ছন্দ আছে, তাহাতে মনে হয়, যে একসঙ্গে পা ফেলিবার সুবিধার জন্য ঐরূপ করে, কারণ এক সঙ্গে পা ফেলিয়া চলাতে সওয়ারির আরাম আছে। অনেক সময় এরূপ বুঝা যায়, যে সামনের ব্যক্তি সর্দার, সে ঐ উপায়ে চলার সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। আসল কথাটা যে কি, তাহা উহারাই বলিতে পারে।

এই তো গেল পালকী বেহারার কথা। তাহার পর চাকর বামুনের কথা। কিন্তু তাহা বলিবার আগে একটু সতর্ক করিয়া দেওয়া দরকার। তীর্থস্থানে সাধারণত বিস্তর অপদার্থ অলস লোক আসিয়া জড়ো হয়। বিশেষত পুরীর মতন যদি তীর্থস্থান হয়, যেখানে রান্না-বান্নার ঝঞ্ঝাট নাই, অতি অল্প পয়সার প্রসাদ কিনিয়া খাইলেই চলে। চাকর বামুনের সংবাদ লইতে গেলেই এই হতভাগারা আসিয়া উপস্থিত হয়, কাজেই ভালো লোক সেখানকার কে তাহা জানিবার উপায় থাকে না। হয় নিতান্ত বেকুব, না হয়, বেজায় পাজি, এইরূপ লোকই প্রায় আমার ভাগ্যে জুটিয়াছিল।

চাকর আসিল, তাহার দুই পায়ে দুই গোদ, সেই গোদ ভরাট করিতে যেন শরীরের অন্যান্য স্থানের মাংস খরচ হইয়া গিয়াছে। সে ব্যক্তি আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'কি কাজ করিতে হইবে?'

'এই জল তুল্‌বি ঘর ঝাঁট দিবি, বাসন মাজ্‌বি, এইসব কাজ করবি।'

'সওদা করিব না?'

'না। তাহার লোক আমাদের আছে।'

'সওদা করিব না, ত কঁড় করিব?' বলিয়া বেচারা একেবারেই নিরুৎসাহ হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, সে ব্যক্তি আর আমাদের কাজে আসে নাই। অন্য বিষয়ে বুদ্ধি যেমনই থাক, 'সওদা' অর্থাৎ বাজার করার মর্ম, সে বেশ বুঝিয়াছে। বুদ্ধির নমুনাও কিঞ্চিৎ দিতেছি।

সেখানকার একজন পদস্থ বাঙ্গালি ভদ্রলোকের এক ওড়িয়া চাকর ছিল। সে লোক ভালো, সুতরাং তাহার বুদ্ধিটা একটু মোটা। মনে কর, যেন তাহার নাম গদাধর।

একদিন বাবুর একটি অতিশয় পরিচিত বন্ধু দূর দেশ হইতে আসিলেন। বাবু তখন আপিসে গিয়াছে, সুতরাং গদা বলিল, 'বাবু নাই!' বন্ধুটি একটু নিরাশ হইয়া বলিলেন, 'পরিবার তো আছেন?' গদা বলিল, 'না, না, পরিবার নাই!' বন্ধু আর কি করেন, তিনি ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন। বাড়ির কর্ত্রী সবই শুনিয়াছেন, কিন্তু চ্যাঁচাইয়া তো আর কিছু বলিতে পারেন না। তিনি গদার ব্যবহারে যারপরনাই আশ্চর্য হইলেন, আর সে ভিতরে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে গদা, তুই যে বলিলি পরিবার নাই?'গদা নিতান্ত সরলভাবে বলিল, 'আমি তো ভালোই করেছি, বাবু 'পরিবা' নিতে এসেছিল, আমি নাই বলে বাঁচিয়ে দিয়েছি।' সে দেশে 'পরিবা' বলিতে তরকারি বুঝায়। গদা মনে করিয়াছে, বাবু তরকারি চায়। সে মনিবের হিতৈষী লোক, তাহার ইচ্ছা নহে যে তাঁহার তরকারি লোকসান হয়, সুতরাং সে আগন্তুক বাবুকে, 'পরিবা' নাই বলিয়া বিদায় করিয়াছে!

যেমন চাকর তেমনি পাচক। তবে এ কথা বলার দরকার যে, আমি যে কয়েকটিকে পাইয়াছিলাম, তাহাদের কেহই বোকা নহে। সুতরাং—আর থাক সে-সব কথা বলিয়া আর এখন লাভ কি? জিনিস তো আর ফিরিয়া পাইব না। উহাদের গায়ে যে হনুমানের মতন জোর ছিল না, ইহাই আমার সৌভাগ্য। নতুবা একদিন ভোরে উঠিয়া হয়তো দেখিতাম, যে আমরা ময়দানে বাস করিতেছি, বাড়িঘর কোথায় গিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমি সেখানকার সাধারণ লোকের সহিত মিশিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না। দুইটা বিষয় আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তাহারা গায়ে হলুদ মাখিতে খুব ভালোবাসে। আর তাহাদের কেমন একটা বেখাপ্পা কৌতূহল আছে। পথ চলিতে চলিতে তোমাকে ডাকিয়া তোমার আবশ্যক অনাবশ্যক দশটা খবর লইয়া যাইবে। কবে এসেছ? কত দিয়ে ঘর ভাড়া করিলে? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর এত বার দিতে হইয়াছে, যে আমি চটিয়া যে গল্পের সেই রামা চাকরের মতন একটা কিছু করিয়া বসি নাই ইহা আমার বিশেষ প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে। রামা বাজারে মাছ কিনিয়াছে, সকলেই তাহার দাম জিজ্ঞাসা করে, তাহাতে রামার রাগ হইল। তখন রামা মাছ মাটিতে রাখিয়া রাস্তায় পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল, আর হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল। বাজারের সমস্ত লোক কাজকর্ম ফেলিয়া রামার কাছে আসিয়া উপস্থিত। সকলেই বলে, 'কি হইয়াছে? কি হইয়াছে?' রামা যখন বুঝিল, যে আর বেশি অবশিষ্ট নাই, প্রায় সকলেই আসিয়াছে, তখন সে আস্তে আস্তে উঠিয়া গা ঝাড়িল, আর মাছটি উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল, 'ওগো, আর কিছু নয়, আমার এই মাছটা সাড়ে সাত আনা হয়েছে, তোমরা সবাই শুনে রাখ! সাড়ে সাত আনা!! সাড়ে সাত আনা!!!'

মাছের কথা শুনিয়া হয়তো অনেকেই ভাবিতেছেন, সেখানে মাছ পাওয়া যায়। মাছ খুব পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার কথা আজ বলিলে চলিবে না। অনেক কথা। আর একদিন খালি মাছের কথা বলা যাইবে।

তরকারি বেশি পাওয়া যায় না। কচু, কুমড়া আর কাঁচকলার নাম লইলেই প্রধান জিনিসগুলির কথা একপ্রকার শেষ হয়। আলু তো জগন্নাথ খানই না, সুতরাং তাহা সেখানে জন্মায়ও না। ফলের সময় সেখানে যাই নাই, কাজেই কি কি ফল পাওয়া যায়, আর তাহা খাইতে কেমন, তাহা বলিতে অক্ষম। কলা বেশ, আর আম, পেঁপে, আতা, নোনা, কুল ইত্যাদির গাছ দেখিয়াছি, সুতরাং তাহাও পাওয়া যায়। তবে খাইতে কেমন, তাহা জানি না।

দুধের বড়ই কষ্ট। দুধের দোষে নয়, গোয়ালার গুণে। দুদিন সেখানকার দুধ খাইয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, সে কলিকাতার গোয়ালার চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। ডাক্তার বলিলেন, 'গাই না কিনিলে তোমার অসুখ সারিবে না।' পরদিন সকালে গাই কিনিতে লোক পাঠাইলাম, একটি ছোট ছেলে তাহার সঙ্গে গেল। বেলা একটার সময় ষোলো টাকায় কচি বাছুর সমেত এক কালো গাই কিনিয়া তাহারা ঘরে ফিরিল। উহাদের দেরি দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম, না জানি ক্ষুধায় ছেলেটির কতই কষ্ট হইতেছে, কিন্তু ফিরিবার সময় দেখি, তাহার গালভরা হাসি। একটা গরু কিনিলাম, আর একটা সঙ্গে দিয়াছিল বলিয়া সে মহা সন্তুষ্ট। তাহার খুব আশা হইয়াছে, যে আর দুমাস পরে ছোট গরুটার দুধও খাওয়া যাইবে।

গরুর কথা বলিতে সেখানকার দুটা ষাঁড়ের কথা মনে হইতেছে। দুইটাতে সাংঘাতিক

শত্রুতা, একটা আরেকটাকে ক্রমাগত খুঁজিয়া বেড়ায়, আর পরস্পরের উদ্দেশ্যে আক্রোশ প্রকাশ করে. দেখা হইলেই যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ইহাদের জ্বালায় অনেক সময় পথ চলা কঠিন হইত। অথচ মানুষের সহিত ইহাদিগকে কখনো খারাপ ব্যবহার করিতে দেখি নাই। বরং একটা একদিন আমাদের ঘরে ঢুকিয়া যেরূপ অপ্রস্তুত হইয়া গেল, তাহাতে উহাদিগকে নিতান্ত ভালোমানুষ ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। আমরা অবশ্য খুবই ভয় পাইয়াছিলাম. ততোধিক কোলাহল করিয়াছিলাম। আর একটা বাখারি আনিয়া তাহার চোখের সামনে নাড়িতেও ত্রুটি করি নাই। এই বাখারি দেখিয়াই ভয় পাইয়া থাকুক. না হয় আমাদের বাঙ্গলা কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে উৎকট গালি মনে করিয়া থাকুক, যে কারণেই হউক, বেচারা যেন তাহার জীবনে আর কখনো এমন সঙ্কটে পড়ে নাই, এইরূপ তাহার ভাব হইল। আর দরজা খুলিয়া দিবামাত্র সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

৪

পুরীর সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সমুদ্র দেখেন নাই তাঁহারা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন. 'সমুদ্র কেমন দেখিলে?' আমিও সমুদ্রের কথা বলিবার জন্যই এতক্ষণ ধরিয়া সুযোগ খুঁজিতেছিলাম।

'সমুদ্রটা কেমন?' —এর উত্তরে আমি এমন কোনো কথাই খুঁজিয়া পাইতেছি না, যাহা বলিলে যে সমুদ্র দেখে নাই, সেও মনে মনে তাহার একটা চেহারা কল্পনা করিয়া লইতে পাবে। একটি শিশু পুকুর দেখিয়া বলিয়াছিল, 'কত বড় চৌবাচ্ছা!' সে যাহা আগে দেখিয়াছে, নূতন জিনিসকে তাহারই পরিচয়ে চিনিতে চেষ্টা করিয়াছে। অবশ্য সমুদ্রের কূল-কিনারা দেখা যায় না, তখন তাহাকে চৌবাচ্ছা মনে কবা শিশুর পক্ষেও সম্ভব না হইতে পারে। আর চৌবাচ্চাটাকে মনে মনে বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার কূল-কিনারা দূর করিয়া দিতে পারিলেও তাহা ঠিক সমুদ্রের মতন হইবে না।

সমুদ্র বড় তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া তাহাকে যেটুকু বড় দেখা যায়. তাহা তেমন কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে। পদ্মা প্রভৃতি বড়-বড় নদীর এক-এক স্থান সোজাসুজি দেখিতে প্রায় এইরূপই বোধহয়। হিমালয়ে উঠিবার সময় মাঠের দৃশ্য যে দেখিয়াছে, সে ঐরূপ সমুদ্রের চাইতে বড় জিনিসই দেখিয়াছে। যত উঁচুতে উঠা যায়, ততই বেশি দূর অবধি দেখিতে পাওয়া যায়। পুরীর কাছে সমুদ্র আসলে সাত হাজার মাইল লম্বা হইলে কি হইবে? তাহার কূলে দাঁড়াইয়া পনেরো-কুড়ি মাইলের অধিক দেখা যায় না। কিন্তু দার্জিলিং-এর পথে এক এক জায়গায় নীচের দিকে তাকাইলে মাঠের উপর দিয়া ষাট-সত্তর মাইল পর্যন্ত দৃষ্টি চলে।

সমুদ্রের সম্মান কেবল তাহার মস্ত শরীরটার জন্য নহে, তাহার আরো গুণ আছে। দেশের সাধারণ লোকেরাও সমুদ্রকে একটা দেবতা বলিয়াই মনে করে। এ কথার প্রমাণ সমুদ্রের ধারে গেলেই পাওয়া যায়।

পুরী তীর্থস্থান, সেখানে অনেক দূর হইতে যাত্রীরা আসে। এ সকল যাত্রী যে সমুদ্র দেখিবার জন্য আসে, তাহা নহে, তাহাদের উদ্দেশ্য জগন্নাথ দেখা। ভক্তিমান যাত্রীরা অনেকে রেল হইতে জগন্নাথের মন্দির দেখিবামাত্রই হাত জোড় করে, আর মন্দিরে আসিয়া জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া তবে সে হাত নাবায়। কিন্তু জগন্নাথের ওখান হইতে বিদায় হইয়াই

যে সে যথেষ্ট মনে করিবে তাহা নহে, সমুদ্রকে একবার না দেখিয়া, তাহাকে পূজা না করিয়া, তাহাকে কিছু ফল না খাওয়াইয়া আর তাহার ঢেউ না খাইয়া দেশে ফিরিলে তাহার সকলই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

নিতান্ত গরিব, আর নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে লোক, পূজা করিবার পয়সা নাই, ঢেউ খাইবার ভরসা নাই, এমন লোকও সমুদ্রকে একবার সেলাম না করিয়া দেশে ফিরিবে না। আমি প্রায়ই দুপুরবেলা সমুদ্রের ধারে গিয়া বসিয়া থাকিতাম, তখন এইসকল লোককে দেখিতে আমার বড়ই ভালো লাগিত। উহাদের অনেকেই দূর দেশ হইতে আসিয়াছে;হয়তো খোকাখুকি, অথবা ছোট ভাই বোন, না হয় আর কেহ। উহাদের জন্য দু-একটি সুন্দর উপহার প্রায় সকলেই কিনিয়াছে। রঙিন বাঁশের ছাতা, সরু সরু বেত, বিচিত্র বর্ণের থলে এইরূপ দু-একটি জিনিস প্রায় প্রত্যেকেরই হাতে। পুঁটুলির ভিতর হয়তো আরো কত জিনিস আছে। কেহ কেহ আবার দুটি করিয়া ছাতা কিনিয়াছে। বাঁশের ছাতা গুটাইবার জো নাই;কাজেই দুটিকেই মাথায় দিয়া চলিতে হইতেছে। তাহাতে চেহারাখানি খুলিয়াছে ভালো। মাঝে মাঝে আবার এক একজনের মাথায় এক একটা কড়া। তাহাতে ছাতার কাজও চলিতেছে, টুপির কাজও হইতেছে, আবার দরকার হইলে রান্নার কাজও চলিবে।

ইহারা যে কতখানি কৌতূহল আর আগ্রহের সহিত সমুদ্র দেখিতে আসিয়াছে, তাহা ইহাদের মুখ দেখিলেই বোঝা যায়। আর সমুদ্রকে দেখিয়া যে তাহারা কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহাও উহাদের সম্ভাষণেই প্রকাশ! 'হাঁ রে! সমুদ্রের মহারাজ!' ইহারা সাধারণত দূর হইতে সমুদ্রের প্রতি ভক্তি দেখাইয়াই চলিয়া যায়। কদাচিৎ দুই-একজন কাছে যাইতে সাহস করে। যাহারা কাছে যায়, তাহাদের উদ্দেশ্য একটু সমুদ্রের জল তুলিয়া মাথায় দেওয়া। একাজটি অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে। যেদিন সমুদ্রে ঢেউ বেশি থাকে, সেদিন এরূপ করিতে বেশ একটু সাহসের আবশ্যক। একস্থানে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের জল হাতে পাওয়া অতি অল্প সময়ই সম্ভব হয়। ঢেউয়ের সঙ্গে জল এক একবার ছুটিয়া কাছে আসে, আবার অনেকদূর হটিয়া যায়। তাহাও যে শান্তভাবে করে, তাহা নহে। তুমুল বিক্রম আর তর্জন-গর্জনের সহিত ঢেউ আসিয়া ডাঙ্গায় ভাঙ্গিয়া পড়ে;তাহা দেখিলে মনে ভয় হওয়ারই কথা। ইহার সামনে সাহস করিয়া জল লইতে যে অল্প লোকেই যায়, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। আর, ইহারাও যে একটু জল ছুঁইয়া মাথায় দিতে পারিলে মুহূর্তকালও সেখানে বিলম্ব করে না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

মানুষের দেহে যেমন মুখখানিই সকলের আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমুদ্রের এই ঢেউগুলি সেইরূপ। সমুদ্রকে দেখিতে পাওয়ার অনেক আগেই ঢেউয়ের কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়। এ কোলাহলের আর নিবৃত্তি নাই। যেন দেশের সব রেলগাড়ি আর ঝড়েদের মধ্যে বচসা। এদিকে হয়তো হাওয়ার লেশমাত্র দেখা যায় না, কিন্তু সমুদ্রে গিয়া দেখ, ঢেউয়ের নৃত্যের বিরাম নাই। লম্বা-লম্বা ঢেউ পনেরো-কুড়ি হাত চওড়া, চারি-পাঁচ হাত উঁচু, আর একশত গজ হইতে সিকি মাইল পর্যন্ত লম্বা। কোথা হইতে ক্রমাগত তীরের সঙ্গে এই খেলা ভিন্ন উহাদের আর কোনো কাজ নাই। ঢেউটা তীরের উপর আসিয়া পড়িল, আবার তীরের ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া চলিল। ততক্ষণে পিছন হইতে আর এক ঢেউ আসিয়া উপস্থিত, কাজেই দুটিতে ঠোকাঠুকি হইয়া গেল। তখনকার দৃশ্য দেখিতে অতিশয় অদ্ভুত। বাজপড়ার

মতন একটা ভয়ানক শব্দ হয়; আর সেখানকার জলগুলি চুরমার হইয়া তুবড়িবাজির পাহাড়ের আকারের মতন লাফাইয়া উঠে।

দূরে সমুদ্রের ভিতরের দিকে তাকাইলে এ সকলের কিছুই দেখিতে পাইবে না। সেখানকার ঢেউ অন্যরূপ। গভীর জল ছাড়িয়া যতই কম জলের দিকে আসা যায়, ততই এই সকল তীরমুখী লম্বা-লম্বা ঢেউ দেখিতে পাওয়া যায়। ঢেউগুলি অবশ্য সমুদ্রের ভিতরের দিক হইতেই আসে; কিন্তু গভীর জলে তাহারা তেমন উঁচু থাকে না, কাজেই তাহারা চোখে পড়ে না। তারপর যত কম জলের দিকে আসিতে থাকে, ততই ক্রমে উঁচু হইয়া শেষটা ভাঙ্গিয়া পড়ে। খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বোধহয় যেন ঢেউয়ের সামনের জলের বেগ কম, এমনকি, অনেক স্থলে ঠিক বিপরীত দিকেই তাহার গতি। এই উলটামুখো জলের সহিত ঠেলাঠেলির দরুনই তীরের কাছে এমন তুমুল কাণ্ড হয়। তীরে ঠেকিয়া সকল ঢেউকেই আবার ফিরিতে হয়। ইহা হইতেই ঐ উলটামুখো জলের উৎপত্তি। ঢেউগুলি তীরে ঠেকিয়া যখন ফিরিয়া চলে, তখন তাহাদিগকে অনেক দূর অবধি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পথে আর একটা ঢেউয়ের সঙ্গে বিবাদ হইলেও তাহারা লোপ হয় না, বিবাদ থামিয়া গেলে আবার তাহাকে অনেকখানি অগ্রসর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মোটের উপর দেখা যায়, যে তীরমুখী ঢেউয়ের জোর বেশি। এই কারণেই সমুদ্রে একটা কিছু জিনিস ফেলিয়া দিলে খানিক বাদে সেটা আবার তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। লোকে বলে 'সমুদ্র কাহারো কিছু গ্রহণ করে না; যাহা দেওয়া যায়, তাহা সে আবার ফিরাইয়া দেয়।'

খানিক আগে যে যাত্রীদের সমুদ্রকে খাইতে দিবার কথা বলিয়াছি, তাহার জিনিসপত্রও এইরূপে সমুদ্র ফেরত দেয়। খাইতে দেওয়া আর কিছুই নহে, কোনোরূপ ফল সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া, তাহা হইলেই সমুদ্রের আহার করা হইল। যিনি ফল দিলেন, তিনি এ জীবনে আর সে ফল খাইতে পারিবেন না। আবার যেমন তেমন ফল দিলে হইবে না— অন্তত তাহাতে পুণ্যকর্ম—নিজের অতিশয় প্রিয় ফল হইলেই হইল। সমুদ্রের ধারে যে সকল ফলের নমুনা দেখিয়াছি, আর বাজারে সমুদ্রের আহারের জন্য যেরূপ ফল বিক্রি হইতে দেখিয়াছি, তাহাতে বোধহয়, যে ছোট ছোট ভিন্ন অন্যরূপ ফল সমুদ্র মহারাজের ভাগ্যে অল্পই জুটিয়া থাকে। নচেৎ মানিতে হয় যে ভালো বড় ফল পাইলে মহারাজ তাহা ফিরাইয়া দিতে বিশেষ কুণ্ঠিত হন। আমি যে-সকল নারিকেল তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে দেখিয়াছি, তাহার আকার সাধারণত কামরাঙ্গার চাইতে বড় হইবে না, পটলের মতনও ছিল।

তারপর সমুদ্রের ঢেউ খাওয়ার কথা। সে অতি চমৎকার ব্যাপার; তাহার কথা একটু বেশি করিয়া না বলিলে অন্যায় হইবে। সমুদ্রে নামিয়া স্নান করিতে গেলেই উহার ঢেউয়ের অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। এই অত্যাচারটি এমন বিধিপূর্বক হইয়া থাকে যে, একবার উহার আস্বাদান পাইলে আর কখনো তাহা ভুলিতে পারা যায় না। ইহাই 'ঢেউ খাওয়া', ইহাতে আমোদ যথেষ্ট আছে, উপকারও আছে, আবার আশঙ্কাও আছে। ঢেউয়ের বাড়িতে অনেকে গুরুতর আঘাত পায়, এমনকি, অনেকের মৃত্যু হয়। অনেক সময় কোনো হতভাগ্য লোক ঢেউয়ের টানে পড়িয়া জন্মের মতো অদৃশ্য হয়।

অবশ্য এরূপ দুর্ঘটনা অনেক সময় অসতর্কতা আর সাঁতার না জানার দরুনই ঘটিয়া থাকে। ঢেউয়ের সঙ্গে লড়িতে গেলে তাহার আঘাত তো লাগিবেই। তাহার সামনে বেকুবের

মতন শরীর পাতিয়া দিলেও বিপদের আশঙ্কা আছে। ঢেউ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে বাম পাশ এবং ঘাড় পাতিয়া লইতে হয়। লাফাইতে আপত্তি না থাকিলে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া শরীরকে উহার সমান উঁচু রাখিতে পারিলেও ছোট ছোট ঢেউয়ের সময় কাজ চলিয়া যায়। বড় ঢেউ হইলে ডুব দিয়া উহার নিচে চলিয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ঢেউ অধিক উঁচু হইলে শেষে ফাটিয়া যায়। এই ফাটিবার সময় উহা হইতে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা। এই সময়ে উহা হইতে দূরে থাকিয়া অথবা আগেই উহার নিচে চলিয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। ফাটিবার পূর্বে ঢেউ হইতে কোনো ভয় নাই—অবশ্য যাহারা সাঁতার জানে তাহাদের পক্ষে। যাহারা সাঁতার জানে না, তাহাদের জলে না নামাই ভালো। সাঁতার না জানিয়া জলে নামার বিপদ এই যে, অল্প জলও অনেক সময় হঠাৎ অধিক জল হইয়া যায়। তখন সাঁতার ভিন্ন আত্মরক্ষার উপায় থাকে না। তাহা ছাড়া হাজার সতর্ক হইলেও নাড়াচাড়ার হাত এড়াইবার সাধ্য নাই। বড়-বড় ঢেউ এক একটা এমন আসে, যে তাহার সামনে আর কিছুতেই গাম্ভীর্য রক্ষা করা যায় না। সে আসিয়া তোমাকে লাটিমের মতন ঘুরাইয়া দিবে, ময়দার মতন ঠাসিয়া দিবে, তোমার অতিশয় গম্ভীর মুখখানি কখন হাঁ করিয়া ফেলিবে, তাহা তুমি টেরও পাইবে না; ততক্ষণে সেরখানেক লোনাজল তোমার উদরস্থ হইয়া অন্তত কয়েক ঘন্টার জন্য তোমার মনের শান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি এমনি, তবে সে কাজ করিতে যাওয়া কেন?' ইহার উত্তরে অনেক কথা বলা যায়।

প্রথমত যে পুণ্য করিতে আসিয়াছে, সে লাঞ্ছনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। তাহার পুণ্য চাই, লাঞ্ছনা হইলে তাহাতে বরং পুণ্যের দাম বাড়িবে।

স্বাস্থ্যের জন্য যে আসিয়াছে সে অবশ্য জল বাড়িতে লইয়া গিয়া তাহাতে স্নান করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে উপকার কম। ঐ নাড়াচাড়ায় উপকার বেশি।

আর ঐ লাঞ্ছনার জন্যই যে আসিয়াছে, তাহাকে ওরূপ প্রশ্ন করা তো স্পষ্টই অনাবশ্যক বোধ হইতেছে। ঐ লাঞ্ছনার ভিতরে ভারি একটা আমোদ আছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের বুড়োরা ঐ জলে পড়িয়া নাকাল হয়, আবার চ্যাঁচাইয়া হাসেও। ঢেউয়ের পর ঢেউ মাথার উপর দিয়া যাইতেছে, শরীরটাকে ধোপার বাড়ি দিবার ফল অনেকক্ষণ যাবৎ হইয়া গেছে, তথাপি তাহারা উঠিতে চাহে না। তাহার কারণ এই যে, এই নাড়াচাড়াতে তাহাদের শরীর মনে এমন একটা স্ফূর্তি আনিয়া দিতেছে যে অতি অল্প অবস্থায়ই তাহা লাভ করা যাইতে পারে।

আমি জানি, অনেকে ইহার উলটা কথা বলেন। সমুদ্রে স্নান করিলে নাকি তাঁহাদের গা চট্‌চট্ করে, আর চুলে নাকে মুখে কানে বালি ঢোকে, কাজেই সমুদ্রে স্নান সারিয়া আবার ঘরে আসিয়া তাঁহাদের পরিষ্কার জলে গা ধুইতে হয়। হইতে পারে, কিন্তু আমি ওরূপ কোনো অসুবিধা ভোগ করি নাই, আর তাঁহাদের কেন যে ওরূপ হয়, তাহারও একটি ভিন্ন অন্য কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। সে কারণটি এই। অনেকে হয়তো সাঁতার জানেন না, অথবা জানিলেও হয়তো তাঁহারা খুব সতর্ক লোক, অধিক জলে নামিতে ইচ্ছা করেন না। ইঁহারা যেখানে কোমর জলের বেশি হয় না, এইরূপ জায়গায় দাঁড়াইয়া স্নান করেন। ঢেউ যখন আসে, তখন ওখানে ঐ পরিমাণ জল হয়; কিন্তু ঢেউ চলিয়া সে স্থান একেবারেই শুকাইয়া যায়। এরূপ করাতে আশঙ্কার কারণ খুবই কম; কারণ কোমর জলে যে ডুবিয়া মরিবে,

তাহার ডাঙ্গাতেই আর ভরসা কি? আমি অনেককে ঐরূপ করিতে দেখিয়াছি, আর তাঁহাদের দুর্দশাও দেখিয়াছি। ঢেউ আসিয়া অনেক দূর অবধি ডুবাইয়া ফেলিল, আবার হটিয়া গিয়া অনেকটা স্থান খালি করিয়া দিল। তখন ঐ খালি জায়গায় গিয়া একজন দাঁড়াইলেন। সে সময়ে তাঁহার চেহারা ঠিক পালোয়ানের মতন। ঢেউ আসিয়া উপস্থিত! তাহার ফলে মুহূর্তের মধ্যে সেই চেহারা আগে খুব ওস্তাদ বাজিকরের মতন, তারপরে উলটান কচ্ছপের মতন হইয়া গেল! ঢেউ ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে, আর স্নানের সখও একপ্রকার মিটিয়াছে; এখন এই সুযোগে ডাঙ্গায় উঠিয়া আসিতে পারিলে হয়। কিন্তু উঠিবার চেষ্টায় কচ্ছপের অবস্থা হইতে প্রথমে ব্যাঙের, তারপর হাতির অবস্থায় আসিতে না আসিতেই পিছন হইতে আর এক ঢেউ আসিয়া তাঁহাকে আগের কুমিরের মতন করিয়া ফেলিল, শেষে কলাগাছের মতন করিয়া কূলের কাছে রাখিয়া গেল। সেখান হইতে নিতান্ত ঝড়ের কাকের মতন অবস্থায় ডাঙ্গায় উঠিয়া আসিলেন। বাড়ি আসিয়া ইঁহার কয় কলসী পরিষ্কার জলের দরকার হইয়াছিল, তাহা জানি না। যাহা হউক, তাহাতে নাকের মুখের আর কানের বালি অনেক পরিমাণ দূর হইলেও, আর চুলের বালি খানিকটা কমিলেও পেটের ভিতরে যে বালি ঢুকিয়াছিল, তাহার যে কিছুই হয় নাই, এ কথা নিশ্চয়। বিচারে যত দোষ, সব অবশ্য ঐ সমুদ্র স্নানেরই সাব্যস্ত হইয়াছিল! ডাঙ্গার কাছের ঘোলাজল আর বালিতে যাহারা স্নান করে, তাহাদের কতকটা এইরূপ দশা হয়। ভিতরকার জল পরিষ্কার, সেখানে স্নান করিলে এ সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যাহা হউক, এ কথা স্বীকার করিতে হয়, যে ধারের বালিতে লুট্‌পাট্ হওয়ার ভিতরেও অনেককে যথেষ্ট আমোদ পাইতে দেখিয়াছি। যাঁহার বর্ণনা উপরে দেওয়া হইয়াছে, তিনি ঐ দুর্দশার ভিতরেও প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছিলেন।

আমি বলিতেছিলাম যে সমুদ্র স্নান করিতে গেলে প্রায় সকলকেই বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়;অথচ অনেকে সেই লাঞ্ছনার ভিতরেই ভারি একটা আমোদ অনুভব করেন। ইহা শুনিয়া অনেকের হয়তো সেই জর্মান সৈনিক পুরুষের কথা মনে পড়িবে। একজন সৈনিকের একশত বেতের হুকুম হইল। বেত খাইবার সময় কোথায় সে চ্যাঁচাইবে, না, তাহার হাসি আর থামেই না! সকলে জিজ্ঞাসা করিল, 'হইয়াছে কি? এত হাসিস কেন?' সৈনিক আরো হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, 'আরে আমি নয়! যে বেত খাইবে, সে অন্য লোক!'

ইহাতে প্রমাণ হয়, যে সুখ-দুঃখ অনেকটা মেজাজের উপরে নির্ভর করে। আমি এমন বলিতেছি না, যে বেত খাইলেও আমাদিগকে হাসিতে হইবে। কিন্তু এ কথা ঠিক, যে হাঁড়িমুখো লোকের ভাগ্যে সুখ বেশি জোটে না। যাক, এখন আবার সমুদ্রের কথা বলি। সমুদ্রের জল আর হাওয়া উভয়ই স্বাস্থ্যকর। জলে লবণ প্রভৃতি জিনিস থাকে, আর ক্রমাগত নাড়াচাড়া পাইয়া তাহার সঙ্গে বায়ু অধিক পরিমাণে মিশিতে পায়। সেখানকার বায়ুও খুব পরিষ্কার, আর তাহাতে ওজোনের (Ozone) ভাগ বেশি। অক্সিজেন ঘন হইয়া ওজোন উৎপন্ন হয়; উহা খুব স্বাস্থ্যকর। তারপর সমুদ্রের ধারে রৌদ্রের গুণও একটু বিশেষরকম দেখা যায়। তাহা খুব উজ্জ্বল কিন্তু তত গরম নয়। ইহাতেও শরীরের উপকার আছে। এ সকলের ফল পাইতে হইলে সমুদ্রের জলে স্নান করা, আর সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার দরকার; সমুদ্রের ধারের বাড়িতে বাস করা, দুবেলা সমুদ্রের ধারে বেড়ানো, সমুদ্রের ধারের বালিতে বসিয়া থাকা, এ সকলের দ্বারা খুব উৎকট রোগও সারিতে দেখা যায়।

বাড়ীটি কিন্তু যতদূর সম্ভব, সমুদ্রের কাছে হওয়া চাই। সমুদ্রের উপর দিয়া যে স্বাস্থ্যকর বায়ু বহিয়া আসে, তাহা সমুদ্রের কূল ছাড়িয়া বেশি দূরে যায় না। সমুদ্রের কূল হইতে খানিক দূরে গিয়াই এই হাওয়া ক্রমে থামিয়া যায়, আর সেইখান হইতেই জ্বর জারির মুল্লুক আরম্ভ হয়। পুরীতে এ বিষয়ে খুব অসুবিধা। সমুদ্রের ধারে সেখানে বেশি বাড়ি নাই, যাহা আছে তাহার অতি অল্পই দেশী লোকেরা পায়। যাহা হউক, দু-একটা সুন্দর বাড়ি দেশী লোকদের জন্যও আছে। আর ডাকবাঙ্গালা তো আছেই; তাহার কুয়ার জলও অতি চমৎকার।

সেখানে কুয়ার জলই খাইতে হয়। সমুদ্রের জল লোনা। সে জল খাইতে তো বিশ্রী লাগেই, খাইলে গা বমিবমি করে, পেটের অসুখও হয়। যদি বেশি করিয়া ক্রমাগত খায়, তবে গলা ফুলিয়া যায়, আর আরো কত অসুখ হয়, তাহা আমি জানি না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেখানকার ডাকবাঙ্গালার কুয়াটি সমুদ্রের খুব কাছে, সমুদ্রের ধারের বালির উপরেই খোঁড়া হইয়াছে, অথচ তাহার জল লোনা হওয়া দূরে থাকুক, তেমন পরিষ্কার মিষ্ট জল পুরীর আর কোনো কুয়াতে নাই!

ডাকবাঙ্গালার জায়গাটি অতি সুন্দর। বাঙ্গালাটি সমুদ্রের বালির উপরেই, তাহার বারান্দায় বসিয়াই সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

সমুদ্রের সৌন্দর্যের কথা আর একটু বেশি করিয়া না বলিলে হয়তো অনেকেরই রাগ হইবে, আর আমারও ভালো লাগিবে না। সমুদ্রের অনেক ব্যাপার অতি সুন্দর; দেখিলে আমোদও হয়, শিক্ষাও হয়, চোখের তৃপ্তি তো আছেই। সমুদ্রের সাধারণ দৃশ্য সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, জীবজন্তু প্রভৃতি সকলের কথাই বলা আবশ্যক।

যাহারা আর কখনো সমুদ্র দেখে নাই, তাহারা প্রথমে সমুদ্র দেখিয়া অনেক সময় নিরাশ হয়। তাহারা মনে করিয়াছিল, আরো ঢের বড় দেখিব। সমুদ্রটা ঘরের মেঝের মতন সমান নহে, কচ্ছপের পিঠের মতন চিপিপানা। তাহার মাঝখানটা উঁচু হইয়া পিছনের অংশকে আড়াল করিয়া দেয়। তোমরা হয়তো বলিবে, 'ইহা তো অতি সহজ কথা, আমরা সকলেই জানি।' তোমরা যে অনেক কথা জানো তাহাতে আমি কোনোরূপ সন্দেহ উপস্থিত করিতে যাইতেছি না। তোমাদের মতন থাকিতে আমরাই কি আর কম জানিতাম। 'গ্রামের ইজ্‌দি ডিস্‌পিক্‌শন অফ দি আর্থ', 'কমলালেবুর দক্ষিণে ২৭ মাইল চাপা'; 'জাহাজ সমুদ্রে যেতে ডুবে যায়; কোমর জলে খানিক ডোবে, মাঝারি জলে মাঝারি ডোবে, বেশি জলে মাস্তুল অবধি ডোবে' এসব আমাদের ছেলেবেলায়ও ছিল। তবে, এখন নাকি আমাদের অনেক বয়স হইয়া গিয়াছে, তাই অত কথা আর চট্‌ করিয়া মনে পড়ে না। একদিন সমুদ্রের ধারে গিয়া দেখি যে জেলেরা ডোঙ্গায় চড়িয়া অনেক দূরে মাছ ধরিতেছে। এ ডোঙ্গা কিন্তু আমাদের দেশের ডোঙ্গার মতন নয় অর্থাৎ তাহা ডোঙ্গাই নয়। বাঁকা বাঁকা তিন-চার খানা আস্ত কাঠ জলে ভাসে। এই কখানাকে দড়ি দিয়া বাঁধিলে হাতের অঞ্জলির মতন হয়, তাহার নাম 'কাটামারণ'; তাহাতেই চড়িয়া ওখানকার জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরিতে যায়। তাহার কথা পরে বলিব। এখন যাহা বলিতেছিলাম শুন। কাটামারণে চড়িয়া জেলেরা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। ডাঙ্গার উপর হইতে দেখিলাম যে উহাদের অনেক পিছনেও সমুদ্র দেখা যায়। তারপর ডাঙ্গা হইতে নামিয়া জলের কাছে গেলাম; তখন দেখি যে সেই কাটামারণগুলির পিছনে আর সমুদ্রের ততখানি দেখা যায় না। তখন আমার সেই পুস্তকে পড়া বিদ্যার কথা

মনে হইল। যাহা মুখস্থ করিয়া রাখা গিয়াছিল, এতদিনে তাহা হাতে কলমে দেখা গেল। দেখিয়া আমার মনে হইল যে, জাহাজ আসিবার সময় কেমন হয় দেখিতে হইবে। ইহার কিছুদিন পরেই একটা জাহাজ আসিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা সকালবেলায় পূর্বদিক হইতে আসাতে তাহাকে ভালো করিয়া দেখিবার সুবিধা পাই নাই। সমুদ্রের সেই অংশটা তখন সূর্যের আলোকে এমনি ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল যে, সেদিকে ভালো করিয়া তাকানো গেল না। যাইবার সময় সেটা আমাকে ফাঁকি দিয়া রাত্রিতে চলিয়া গেল।

পুরীর কাছে সমুদ্র একটুও গভীর নহে, তাই জাহাজ সেখানে কূলের কাছে ভিড়িতে পায় না, প্রায় আধ মাইল দূরে থাকে। জিনিসপত্র নৌকায় করিয়া তুলিয়া দিতে হয়, সে সকল নৌকায় দড়ির গাঁথুনি। লোনা জলে লোহা দুদিনেই মরিচা ধরিয়া ভাঙিয়া যায়; সুতরাং নৌকার তক্তা জুড়িতে লোহা ব্যবহার হয় না। এইসকল নৌকায় করিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া জাহাজে চাউল বোঝাই হইয়াছিল; আর কোনো জিনিস উঠিতে দেখি নাই। জাহাজ হইতে কোনো জিনিস সেখানে নামেও নাই।

সমুদ্রের রঙ অতি সুন্দর। তাহা যে জমকালো তাহা নহে, কিন্তু যারপরনাই কোমল এবং সুন্দর। দেখিলে নীল রঙের কোনো দামী পাথরের কথা মনে হয়। বড়-বড় ঢেউগুলির পিঠে আসমানী রঙ, কোলে সবুজ রঙ, তাহাতে সাদা ফেনাগুলি যে কি সুন্দর দেখায় তাহা কি বলিব। লম্বা-লম্বা ঢেউগুলি যখন গড়াইয়া তীরের দিকে আসিতে থাকে, তখন তাহাদের নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সেই ফেনাগুলি ফুলের মালার মতন দুলিতে থাকে।

এইরূপ রঙ প্রায় দুপুরবেলায়ই বেশি দেখা যায়। সকালে বিকালে আকাশের রঙ অন্যরূপ থাকে, তখন সমুদ্রের রঙও অন্যরূপ হয়। সেসব রঙ দেখিতে আরো সুন্দর। কিন্তু আমি যদি এখানে তাহার বর্ণনা করিতে বসি, তবে অনর্থক পুঁথি বাড়িয়া যাইবে, অথচ যাহা চোখে দেখিবার ব্যাপার, মুখে বকিয়া তাহার কিছুই বুঝাইতে পারিব না।

সকালে বিকালে সকলের চাইতে দেখিবার জিনিস সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত। বৎসরের মধ্যে কয়েকমাস পুরীতে এই দুইটিই দেখিতে পাওয়া যায়। খুব ভোরে উঠিতে হয়। তখনো সূর্য উঠে নাই, পূর্বদিকে একটু ঝিকিমিকি দেখা দিয়াছে মাত্র। সে দিকটা ক্রমেই উজ্জ্বল হইতেছে, আর মনটাও তেমনি উৎসুক হইয়া উঠিতেছে—খালি 'কখন উঠিবে' 'কখন উঠিবে' এই ভাব। সে যেন আর উঠিতেই চায় না! শেষে একবার চট্ করিয়া একটুখানি আগুনের কণার মতো দেখা দিল। তখন তাহার চেহারা আমওয়ালা চাখিতে দিবার জন্য ছুরির আগায় করিয়া যে টুকরা বাহির করে সেইরূপ। ঢেউগুলি যেন তাহাকে লইয়া লুফালুফি করিতে থাকে। ক্রমে কণার মতন, পুলির মতন, গম্বুজের মতন হইয়া শেষে হাঁড়ির মতন হইয়া যায়। উপরের দিকটা গোল, তারপর খানিকটা একটু সরু হইয়া তলার দিকটা আবার চওড়া। শেষটা একবার ঝাঁ করিয়া জল হইতে আলগা হইয়া যায়।

সূর্যোদয়ের ন্যায় সূর্যাস্তও দেখিতে খুব সুন্দর। তখনকার আকাশের রঙ প্রায়ই বেশি জমকাল হয়। চন্দ্রের উদয় অস্তও এইরূপ। তবে চাঁদের আলো কম, সুতরাং তাহার উদয় অস্ত তেমন উজ্জ্বল হয় না।

কিন্তু পূর্ণিমার সময় চাঁদের আলোতে সমুদ্রের এমন একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য হয় যে অনেকের নিকট তাহাই সর্বাপেক্ষা সুন্দর লাগে।

এসব তো গেল আলোকের কথা। অন্ধকারের সময় সমুদ্র দেখিতে কেমন সুন্দর, এ কথা শুনিয়া কেহ হাসিবেন না। খুব অন্ধকার রাত্রিতে সমুদ্রের জলে একপ্রকার আলোক দেখা যায়। অবশ্য উহা হইতে প্রদীপের আলোর ন্যায় আলো বাহির হয় না; খালি জলে একরকম ঝিকিমিকি মাত্র দেখা যায়। ঢেউ ভাঙ্গিবার সময় মনে হয় অসংখ্য জোনাকী জলের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি দেখিতে পাই নাই, কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে, তাহা ভারি সুন্দর। সমুদ্রের জলে নাকি একরকম জীবাণু আছে, তাহা নাড়া পাইলে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই জীবাণু ঐরূপ আলোকের কারণ।

জীবাণুর কথায় জীবজন্তুর কথা সহজেই মনে হইতে পারে; সুতরাং এখন তাহার কথা বলাই সঙ্গত মনে হইতেছে।

সমুদ্রের জীব বলিলেই সকলের আগে আমার কাঁকড়ার কথা মনে হয়। তারপর শামুক ঝিনুকের কথা, তারপর মাছের কথা ও যাহারা মাছ ধরে তাহাদের কথা।

কাঁকড়া আর শামুক ঝিনুকের কথা আগে মনে হইবার কারণ এই যে, সমুদ্রের ধারে গেলেই ঐগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের ধারে বেড়াইবার অর্ধেক আমোদ উহাদিগকে লইয়া। দুঃখের বিষয় অন্য অনেক স্থানে যেমন নানরকমের সুন্দর-সুন্দর শামুক ঝিনুক পাওয়া যায়, পুরীতে তেমন নাই। তথাপি যাহা আছে তাহার মতন সুন্দর শামুক ঝিনুক আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। সে সকল ঝিনুকের এমন সুন্দর রঙ আর এমন সুন্দর গড়ন যে দেখিলেই কুড়াইতে ইচ্ছা করে। আমরা অনেক ঝিনুক কুড়াইয়াছিলাম।

কাঁকড়ার কথা আর কি বলিব! এমন সরেস জন্তু আর যে খুব বেশি আছে এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। সমুদ্রের ধারের বালিতে প্রথমে তাহাদের পায়ের দাগ দেখিতে পাই। একটা ছোট গোলার গায় লম্বা-লম্বা কাঁটা বিঁধাইয়া সেই কাঁটাসুদ্ধ গোলাটাকে গড়াইয়া দিলে যেমন দাগ পড়িতে পারে, সেইরূপ দাগ। একটা দুটা নয়, অসংখ্য। যেদিকে চাও খালি ঐরূপ দাগ। আমি তো অবাক হইয়া গেলাম। এরূপ অদ্ভুত চিহ্ন কিসের হইতে পারে, তাহা আমার মাথায়ই আসিল না। খানিক অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, এইরূপ এক সার দাগ একটা গর্তের কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আর গর্তের মালিকও দরজায় বসিয়া আছে। কিন্তু আমাকে দেখিয়া সে বেচারা এত তাড়াতাড়ি গর্তের ভিতর ঢুকিয়া গেল যে, আমি ভালো করিয়া তাহার পরিচয়ই লইতে পারিলাম না।

আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম বুঝি মাকড়সা। আকারে একটা মাঝারি মাকড়সার চাইতে বেশি বড় হইবে না, আর রঙটাও কতকটা সেই রকমের। সে যে কাঁকড়া, তাহা আমার আদবেই মনে হয় নাই, কারণ কাঁকড়া এমন ছুটিতে পারে তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক আমার ভ্রম দূর হইতে বেশি সময় লাগিল না। কারণ উহার আশেপাশে ঐরূপ আরো অনেক গর্ত ছিল, আর প্রায় অনেক গর্তের দরজায় এক একটি ছোট্ট কাঁকড়াও বসিয়াছিল। উহারা যে কিরূপ বিস্ময় এবং কৌতূহলের সহিত আমাকে দেখিতেছিল তাহা না দেখিলে বুঝিতে পারিবে না। কাঁকড়ার মুখশ্রীতে বিস্ময় কৌতূহল প্রভৃতি ভাব প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নহে, এ কথা তোমরা বলিবার পূর্বেই আমি স্বীকার করিতেছি। তথাপি ঐ সময়ে উহাদের নিতান্তই কৌতূহল হইয়াছিল, এ কথা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। উহাদের অনেকেই আমাকে দেখিবার জন্য গর্ত ছাড়িয়া খানিক অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, আর আমি

একটু নড়িলে চড়িলে উহারাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কাঁকড়ার চেহারা দেখিলে আমার ভারি হাসি পায়। প্রথমত উহার চক্ষু দুটি। এক একটি চোখ এক একটি বোঁটার আগায় বসান। ঐরূপ দুই চক্ষু দিয়া যখন সে তোমার দিকে তাকাইবে, তখন তোমার মনে হইবে যেন তোমাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য সে দূরবীন লাগাইয়াছে। ভয়, বিস্ময় বা কৌতূহল হইলে চোখ কেমন বড় হইয়া উঠে দেখিয়াছ? হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন চোখ দুটি একটু বাহির হইয়া আসিয়াছে। বোধহয়, এইজন্যই কাঁকড়ার চেহারায় এতটা কৌতূহলের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর উহার দুটি গোদা হাত, অর্থাৎ দাঁড়া। আমি যে কাঁকড়াগুলির কথা বলিতেছি, তাহাদের আবার একটি দাঁড়া আর একটির চাইতে ঢের বড়। কাহারো ডাইনেরটি বড় কাহারো বামেরটি বড়। বেশি ভারী কাজ হইলে বড় দাঁড়াটা ব্যবহার করে। ছোটটি হালকা কাজের জন্য। কাঁকড়ার মুখ তাহার বুকের কাছে, দাঁড়ায় করিয়া তাহাতে খাবার তুলিয়া দেয়। আমরা যেমন করিয়া হাঁ করি, কাঁকড়া তাহা করে না; তাহার ঠোঁট আলমারীর দরজার মতন পাশাপাশি খোলে।

বালির উপরে কত কাঁকড়ার গর্ত যে রহিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কাছে গেলেই উহারা ভয় পাইয়া গর্তের ভিতরে চলিয়া যায়। কিন্তু যদি কোনোরূপ গোলমাল না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাক, তাহা হইলে খানিক পরেই উহারা আবার বাহিরে আসিবে। গর্তটিকে পরিষ্কার রাখা উহাদের এক প্রধান কাজ। সকলের গর্তের সামনেই খানিকটা নূতন মাটি দেখিতে পাইবে। হয়তো তোমার চোখের সামনেই আবার খানিকটা মাটি আনিয়া উহার উপরে ফেলিবে। দুহাতে সাপটিয়া ধরিয়া গর্তের ভিতর হইতে মাটি লইয়া আসে। দরজার বাহিরে আসিয়াই তাহা ছুঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দেয়! কাঁকড়ার পক্ষে অনেকখানি দূরেই ফেলে বলিতে হইবে। মাকড়সার মতন বড় কাঁকড়াটি মটরের মতন বড় একরাশ মাটি প্রায় ছয় ইঞ্চি দূরে ফেলিতে পারে। মনোযোগ দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, মাটি ছুঁড়িয়া ফেলিবার সময় বড় দাঁড়াটিকেই বেশি ব্যবহার করে।

গর্তের সামনে কোনো একটি ছোট জিনিস ছুঁড়িয়া ফেলিলে কাঁকড়া তাড়াতাড়ি তাহার কাছে ছুটিয়া আসে। তারপর বেশ করিয়া সে জিনিসটাকে হাত বুলাইয়া দেখে; পছন্দ হইলে তাহাকে তুলিয়া মুখে দেয়। একদিন আমি লম্বা সূতায় রুটির টুকরা বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। একটা কাঁকড়া আসিয়া সেটাকে পরীক্ষা করিলে, তারপর তাহাকে টানিয়া গর্তের ভিতরে লইয়া গেল। গর্তটা বেশ গভীর ছিল; প্রায় সওয়া ফুট সূতা ট্যারছাভাবে ভিতরে ঢুকিয়া গেল তারপর আমি সূতা ধরিয়া টানিলাম। সহজ টানে কি তাহা বাহির হয়! কাঁকড়াটা বোধহয় কিছুতেই রুটিটুকুকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিল না; তাই সে যতক্ষণ পারিল প্রাণপনে তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিল। শেষে অগত্যা রুটির সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত! তখনো সে তাহা ছাড়ে নাই। ঐটুকু খাদ্যের মায়ায় সে এতটা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, এদিকে আমি যে তাহাকে একেবারে আমার কাছে টানিয়া আনিয়াছি তাহা সে যেন বুঝিতেই পারে নাই। অবশেষে হঠাৎ একবার যখন রুটির সঙ্গে সঙ্গে সে শূন্যে ঝুলিতে লাগিল, তখন তাহার চৈতন্য হইল। এবারে রুটি ছাড়িয়া দিয়া যে গর্তের ভিতরে ঢুকিল শত প্রলোভনেও আর সে বাহিরে আসিল না।

ইহারা কেমন ছোটে, তাহা আগেই বলিয়াছি। ভালো মানুষের মতন সোজাসুজি সামনের

দিকে যে চলে তাহা নহে, সে চলিবে পাশাপাশি—দেখিলেই তাড়া করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাড়া করিতে গেলে দেখা যায় যে তাহাকে ধরা কাজটি বড় সহজ নহে। তুমি খুব চট্‌পটে শয়তান গোছের লোক হইলে অবশ্য শেষে তাহাকে ধরিতে পার, কিন্তু তাহার পূর্বে সে তোমাকে একশো ফাঁকি দিয়া হাজার ঘুরপাক খাওয়াইয়া তবে ছাড়িবে।

এই জাতীয় কাঁকড়া যেমন ছুটিতে পারে, তেমনি আবার এমন কাঁকড়াও আছে যে তাহারা ছুটিবে দূরে থাকুক, শুকনো মাটিতে চলিতেই পারে না। একদিন সমুদ্রের ধারে গিয়া দেখি যে ইঁহাদের একজন চিৎপাত হইয়া পড়িয়া আছেন। দেখিতে বেশ গাঁট্টা-গোঁট্টা জোয়ান কাঁটালের মতন কাঁটাওয়ালা খোলা পরিয়া সঙ্গিন সিপাই সাজা হইয়াছে। কিন্তু এদিকে দুরবস্থার একশেষ। কখন কে চিৎ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে তদবধি সেইভাবেই রহিয়াছেন; সোজা হইবার শক্তিটুকু নাই। দেখিয়া আমার হাসিও পাইল, দয়াও হইল। চেহারাটি আবার অতিশয় উৎকট, গায় হাত দিতে ভরসা হয় না। সুতরাং আমি ছাতার আগা দিয়াই উলটাইয়া দিলাম। কিন্তু খালি উলটাইয়া দিলে কি হইবে, যদি হাঁটিবার ক্ষমতা না থাকে। নৌকার দাঁড়ের মতন কখানি পা; তাহাতে সাঁতার কাটিবার পক্ষে যতই সুবিধা হউক, ডাঙ্গায় চলার কাজ একেবারেই চলে না। দুই পা না যাইতে যাইতেই আবার ডিগবাজি খাইয়া যেই চিৎ সেই চিৎ। ইহার পরে ঐরূপ আরো অনেক কাঁকড়া জেলেদের জালে ধরা পড়িতে দেখিয়াছি, এ কাঁকড়া কেহ খায় না, সুতরাং জেলেরা এগুলিকে ফেলিয়া দেয়। যেটাকে যেখানে ফেলে, সেটা আর সেখান হইতে দূরে যাইতে পারে না। কারণ হাঁটিতে গেলেই উলটাইয়া যায়, আর সেইভাবেই তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হয়। জালে আর একরকম কাঁকড়া ধরা পড়ে, তাহার স্বভাব একটু আশ্চর্য রকমের। এই কাঁকড়ার খোলা নাই, অথচ খোলা না থাকিলে কাঁকড়ার বাঁচিয়া থাকাই ভার হয়। তাই সে বিস্তর বুদ্ধি খরচ করিয়া বেশ এক ফন্দি ঠাওরাইয়াছে। সমুদ্রে শঙ্খ শামুক ইত্যাদির খালি খোলার অভাব নাই। এই কাঁকড়া এইরূপ একটা খালি খোলার ভিতরে ঢুকিয়া থাকে। নরম শরীরটির সমস্ত খোলার ভিতরে; কেবল হাত পা গুলি বাহিরে থাকে, তাহাও ইচ্ছা করিলেই গুটাইয়া লইতে পারে। এইরূপে পরের খোলা পরিয়া ইহারা জীবন কাটাইয়া দেয়, চলাফেরা সমস্তই ঐ খোলাসমেত হইয়া থাকে। যেন সেটা তার নিজেরই খোলা। আমি এইরূপ যতগুলি কাঁকড়া দেখিয়াছি, তাহাদের সকলেই লম্বা-লম্বা কাঁটাওয়ালা একরকম ছোট শঙ্খের ভিতরে ছিল। কাঁটা থাকায় অন্য কোনো জন্তু আসিয়া খপ্ করিয়া তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিবার ভয় ছিল না। এই কাঁকড়ার নাম সন্ন্যাসী কাঁকড়া (Hermit carb)।

জালের আর কাঁকড়ার কথা যখন উঠিয়াছে, তখন মাছের কথাও উঠিবে। মাছ সেখানে সমুদ্রেও ধরা হয়, আর নদী বিল পুকুর ইত্যাদিতেও ধরা হয়। তাহাকে বলে 'মু-ধু-র' মাছ। ('মধুর' পড়িও না। 'মু-ধু-র'। উড়িষ্যার সব কথাই 'কটক বড় মড়ক'-এর মতন করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, হসন্তের ব্যবহার সে দেশে প্রায় নাই।) ইহা ছাড়া চিল্কা হ্রদ হইতেও মাছ আসে। নদী প্রভৃতিতে আমাদের দেশের সাধারণ মাছের মতন মাছই থাকে, তাহার কথা আর বেশি করিয়া কি বলিব। চিল্কার মাছের চেহারাও অনেকটা এইরূপ সুতরাং সমুদ্রের মাছের কথাই আজ বলা যাউক।

সমুদ্রের মাছের নাম শুনিয়াই হয়তো তোমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছ। মনটাকে হয়তো কত বড়-বড় জিনিসের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতেছ। সমুদ্রের বড়-বড় জন্তু অনেক আছে,

তাহাতে আর ভুল কি? দুটা একটা তিমি যে বঙ্গোপসাগরে না দেখা যায় এমন নহে;তাহার প্রমাণ তো জাদুঘরে গেলেই দেখা যায়। কিন্তু আমি এখানে পুঁথি খুলিয়া গল্প ফাঁদিতে বসি নাই, যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিতে যাইতেছি, সুতরাং 'সমুদ্রের সাপ' (Sea Serpent) তিমি প্রভৃতির কথা বলার অবসর আমার হইবে না। আমি যে সমুদ্রের সাপ দেখিয়াছি, তাহা সাড়ে তিন হাতের অধিক লম্বা হইবে না। দেখিতে কতকটা ঢোঁড়া সাপের মতো। গায়ে ডুমোডুমো দাগ আছে, ল্যাজটা চ্যাটাল। এইরূপ একটা সাপ সমুদ্রের ধারে মরিয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রের সাপগুলির ল্যাজ প্রায়ই চ্যাটাল হয়, তাহাতে সাঁতরাইবার খুব সুবিধা। যা হউক আমি মাছের কথাই এখন বলিব। তবে মাছ শব্দটা এখানে একটু খোলাভাবেই ব্যবহার হইতেছে। এরূপ অনেক জানোয়ার যে তাহাদের চৌদ্দ পুরুষের কেহ মাছের ধার ধারে নাই, অথচ তাহারা 'মাছ'। যেমন জেলী মাছ, চিংড়ি মাছ, কট্‌ল্ মাছ ইত্যাদি। ইহাদের কেহ শামুক, কেহ পোকা, আর কেহ যে কি তাহা এক কথায় বলা ভারি মুশকিল। যাহা হউক লোকে উহাদিগকে মাছই বলে, সুতরাং আমিও তাহাই সুবিধাজনক মনে করিতেছি।

সমুদ্রের মাছ হইলেই যে আমাদের দেশী মাছের চাইতে অনেক ভিন্ন হইবে এমন কোনো কথা নাই। তাহার প্রমাণ এই যে, ইলিশ মাছ সমুদ্রেরই মাছ, সেখান হইতে নদীর ভিতর দিয়া এখানে আইসে। চাঁদা মাছ, ফ্যাঁসা মাছ, চ্যালা মাছ ইত্যাদি সমুদ্রে বিস্তর আছে। বাস্তবিক এইরূপ ঝক্‌ঝকে রুপোলি রঙের মাছই সেখানে বেশী দেখিলাম। এইসকল মাছ এক এক দিন জাল বোঝাই হইয়া উঠিতে দেখিয়াছি। রুই, কাতলা জাতীয় মাছ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

যত মাছ দেখিয়াছি দুঃখের বিষয় তাহার সবকটার নাম শিখিয়া আসিতে পারি নাই। চ্যালার নাম 'খশু বানিয়া', তাহার এক একটা প্রায় এক ফুট লম্বা হয়। খাইতে নেহাত মন্দ নহে, কিন্তু বাপ্ রে! তাহাতে কাঁটা, কি কাঁটা! 'কো-কি-র' খয়রা মাছের মতন। পিঠের রঙ কাল্‌চে। খাইতে বেশ। 'চাঁদি' হচ্ছে চাঁদা। ইহা সমুদ্রের এক উৎকৃষ্ট মাছ। চাঁদির অনেক প্রকার ভেদ আছে। ছোট, বড়, সাদা, পাঁশুটে সকলরকম চাঁদিই খাইতে ভালো, তবে বড়গুলিরই প্রশংসা বেশি। একরকম ছোট-ছোট চাঁদি আছে, সে যে দেখিতে কি সুন্দর তাহা কি বলিব! রঙটি যেন ঠিক মুক্তার মতন, আর দেখিতে এত কোমল এবং পরিষ্কার যে মনে হয়, যেন তাহাকে অমনি খাওয়া যাইবে। উহার ঝোল চমৎকার লাগিত। সমুদ্রের বেলে মাছের নাম 'মেইলা'। ইহার গায়ের চেহারা বেলের মতো; ইহার পেটের ভিতরটি পরিষ্কার, কিন্তু মুখ ছুঁচল আর দাড়ি গোঁফ একেবারেই নাই। 'বোঁদ' মাছ বলিয়া আর একটা মাছ আছে, দাড়ি গোঁফ আর চেহারার জাঁকজমকে সে বেলে মাছকে পরাস্ত করিয়াছে। উজ্জ্বল হলদে রঙের পরিপাটিতে কালো কালো দাগ; দেখিতে খুব জমকাল—আরো বড় হইলে (লম্বায় দশ ইঞ্চি আন্দাজ হইবে) ভয়ঙ্কর বলা যাইত। এ মাছ কেহ খায় না। জেলেরা উহাকে ধরিয়া ফেলিয়া দেয়। আর একটা অখাদ্য মাছের নাম 'বে-ঙ মাছ। এ মাছ খুব ছোট ট্যাংরা মাছের মতন। মুখের চেহারা অনেকটা ব্যাঙের মতন। চোখ উঁচু-উঁচু, রঙ হলদে, অন্ধকার রাত্রিতে নাকি এ মাছ ঝক্‌ঝক্ করে, আর ইহা খাইলে নাকি অসুখ করে। তারপর 'শিরোমুণ্ডী' মাছ। আমাদের চাকর বলিয়াছিল 'রসমুণ্ডী'। তাহা শুনিয়া তোমরা হয়তো ভাবিতেছ মাছটা খাইতে বুঝি বড়ই সুস্বাদ। স্বাদের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার গন্ধের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছি। সে কিরূপ পরিচয় তাহা এ কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবে যে ঐ মাছ কুটিয়া যে ঘটি লইয়া হাত ধুইয়াছিল, সে

ঘটি আর সেদিন কেহ ব্যবহার করিতে পারে নাই, মাছ খাওয়া তো দূরের কথা।

সে দেশে হাঙ্গরের নাম 'ম-গ-র' (মকর)। এদেশে হাঙ্গরে মানুষ খায়, আর সেদেশে মানুষে হাঙ্গর খায়। হাঙ্গরও মানুষকে বাগে পাইলে তাহার 'গোড় কাটি পক্কাই'তে (পা কাটিয়া নিতে) ছাড়ে না। 'হাতুড়ে' হাঙ্গরের মাথাটা ঠিক যেন একটা হাতুড়ির মতন, সেই হাতুড়ির দুই মুখে দুটি চোখ। সুখের বিষয় এই যে, বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে বড়-বড় মানুষখেকো হাঙ্গর কূলের কাছে আসে না। তবে দূরে গভীর জলে যে ভয়ানক রাক্ষস সব আছে, তাহার প্রমাণ প্রায়ই পাওয়া যায়। একদিন দুপুরবেলা আমি সমুদ্রের ধারে বসিয়া আছি, এমন সময় প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা প্রকাণ্ড মাছ লাফাইয়া উঠিল। এতদূর হইতে মাছটাকে একটা মানুষের সমান বড় দেখা যাইতেছিল। সেটা লাফাইয়া জল ছাড়িয়া প্রায় দশ হাত উঁচুতে উঠিয়াছিল। ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল, যে না জানি কতদূর বেগের সহিত সে ছুটিয়াছিল, যাহাতে এমন ভয়ানক লাফ দিতে পারিয়াছে। আর যাহার তাড়ায় এমন অসম্ভব বেগে ছুটিয়াছিল, সেটা না জানি কিরূপ ভয়ানক জানোয়ার।

আর একটা মাছ আছে তাহার নাম 'শাকস্' মাছ। ইহার চেহারা ভারি অদ্ভুত। শরীরটি রুইতনের টেক্কার মতন। তাহার দুই কান হাতির কানের মতন পাতলা। আর এক কোণে ছোট-ছোট দুটি চোখ, আর এক কোণে চাবুকের মতন লম্বা কাঁটাওয়ালা এক লেজ। ঐ লেজ উহার এক ভয়ানক অস্ত্র। উহা দ্বারা অনেকে চাবুক তয়ের করে। শাকস্ মাছের মাংস নাকি বেশ সুখাদ্য।

ইংরাজিতে যাহাকে 'সোল' (Sole) বলে, সেই জাতীয় মাছও সেখানে পাওয়া যায়। এই মাছের চোখ একপেশে। মাছটি চাঁদা মাছের মতন পাতলা। ছেলেবেলায় উহার দুটি চোখ দুপাশেই থাকে আর রঙ সাদা থাকে। কিন্তু ইহার ক্রমাগত বালির উপরে এক পাশে কাৎ হইয়া পড়িয়া থাকার স্বভাব হওয়াতে শেষটা নীচের পাশের চোখটি ক্রমে উপরের পাশে চলিয়া আসে। তাহা ছাড়া উপরের পাশের রঙটি ক্রমে চারিপাশের বালির রঙের মতন হইয়া যায়, কিন্তু নীচের পাশের রঙ সাদাই থাকিয়া যায়।

বোধহয় মাছের কথা ঢের বলা হইয়াছে। এখন যাহারা মাছ নয়, অথচ মাছ বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কথা কিছু বলা আবশ্যক।

ইহাদের মধ্যে সকলের আগে 'জেলী' মাছের (Jelly fish) আর 'তারা' মাছের (Star fish) কথা বলিতে হয়। জন্তুর মধ্যে ইহারা সকলের চাইতে নিম্নশ্রেণীর। সাধারণ লোকে ইহাদিগকে দেখিয়া কখনই বলিবে না, যে ইহারা কোনোরূপ জন্তু। বরং ইহাদের চেহারা দেখিলে হঠাৎ গাছপালার কথাই মনে হইতে পারে। যাহা হউক, ইহারা জন্তু। ইহাদের আবার নানারকম শ্রেণীভেদ আছে, যদিও আমি একরকম তারা মাছ সেখানে দেখিতে পাই নাই। এই মাছের চেহারা পাঁচ কোণা তারার মতন। তাহার নাক মুখের কোনোরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাদের স্বভাব-চরিত্র অতিশয় আশ্চর্য। দুঃখের বিষয়, আমি তাহার কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই, পুস্তকে পড়িয়াছি মাত্র। ইহারা ছোট-ছোট শামুক ঝিনুক খাইয়া জীবনধারণ করে। পুরীতে যে তারা মাছ দেখিয়াছিলাম, তাহার ভিতরে খুব ছোট-ছোট ঝিনুকের খোলা পাইয়াছি। কিন্তু এতদ্ভিন্ন উহাদের আচার ব্যবহারের আর কোনো পরিচয় পাই নাই। এগুলি দেখিতে একটুও সুন্দর নয়। একদিকের রঙ কালো আর একদিকের রঙ ফ্যাকাসে। মনে হয়,

যেন পুরানো জুতার পচা চামড়া আর হাড়ের কুচি দিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। কিন্তু আমি পুস্তকে পড়িয়াছি যে অতিশয় সুন্দর তারা মাছ আছে। আর তাহাদের কোনো কোনোটার এই একটা আশ্চর্য স্বভাব আছে, যে তাহারা ভয় পাইলে আত্মহত্যা করে। সমুদ্রের ভিতরে অনেক নাড়াচাড়া সহ্য করে; কিন্তু জল হইতে তুলিলেই সে দেখিতে দেখিতে তাহার হাত পা ফেলিয়া দেয়। তারা মাছের মাঝখানটায় তাহার মুখ থাকে; চারিধারের পাপড়ি অথবা ডালপালার মতন জিনিসগুলি তাহার হাত পা। কোনো কোনোটা সাঁতরাইতে পারে, শিকার আঁকড়িয়া ধরিতেও পারে। কিন্তু কোনো কোনোটার হাত পা নাড়িবার বেশি ক্ষমতা আছে বলিয়া বোধহয় না। আবার চলাফেরা করিতেই পারে না, একটা বোঁটা দ্বারা কোনো জিনিসের গায়ে আটকানো থাকে, এরূপ তারা মাছও আছে।

জেলী মাছ সেখানে অনেকরকম আছে। আকারে আধুলি হইতে ঝুড়ির মতন পর্যন্ত জেলী মাছ দেখিয়াছি। ইহাদিগকে দেখিলে তালশাঁস অথবা থক্‌থকে সাগুর কথা মনে হয়। সকলগুলিরই সাধারণ আকৃতি ছাতা অথবা টুপির মতন, কোনো কোনোটা ওড়িয়া বেয়ারাদের পানের থলের মতন। আবার সকলেরই কোনোরকমের ঝালর আছে। রঙ সাদা অথবা লালচে, তাহাতে অনেক সময় সবুজ কারিকুরি থাকে। ইহারা জলে সাঁতরাইয়া বেড়ায়, আর ভয় পাইলে শরীর কোঁচকাইয়া হাত পা গুটাইয়া (ঐ ঝালর উহাদের হাত পা, মাঝখানে মুখ) সমুদ্রের তলায় পড়িয়া যায়। কোনো কোনোটা বাত্রিতে জ্বলে। অনেকগুলি আবার এমন আছে যে তাহা গায়ে লাগিলে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়। এই যন্ত্রণা কতকটা বিছুটির জ্বালার মতন, কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি, আর ইহাতে বুকের ভিতরে কেমন একটা কষ্ট বোধহয়। জালে পড়িয়া বিস্তর জেলী মাছ উঠে; জেলেরা জেলী মাছকে বলে 'সৎরাং'। ইহাদের ইংরাজি নাম 'জেলী ফিশ' আর 'সাগর বিছুটি' (Sea nettle)। ইহাদের কোনোটা নির্দোষ আর কোনোটা বিষাক্ত, জেলেরা তাহা বেশ বুঝিতে পারে। সাধারণত তাহারা এগুলিকে দুহাতে ঘাঁটে, রাঁধিয়া নাকি খায়ও। কিন্তু একদিন একটা খুব উজ্জ্বল স্বচ্ছ আর সবুজ কারিকুরিওয়ালা জেলী মাছ দেখিয়া যেই তাহার কাছে গিয়াছি, অমনি একজন জেলে আমাকে নিষেধ করিয়া বলিল, 'বাবু, বিন্ধিব।' অবশ্য আমি আর তাহার কাছে যাই নাই। আর আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যে উহার চেহারা আমি কখনো ভুলিব না। অতঃপব আবার তাহাকে দেখিতে পাইলে আমিও বলিতে পারিব— 'বিন্ধিব'। এরপর 'কট্‌ল্‌' মাছের (cuttle fish) কথা বলি, তবেই শেষ হয়। এ মাছ যে, মাছ নয়, তাহা তো বলিয়াই রাখিয়াছি। ইহারা শামুক জাতীয় জন্তু; কিন্তু শামুকের মতন ইহাদের খোলা নাই, যদিও একটা নরম গোছের হাড় আছে। এই হাড় সমুদ্রের ধারে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সাদা-সাদা শশা বিচির মতন আকৃতি, কিন্তু শশা বিচির চাইতে ঢের বড়। এক ইঞ্চি হইতে আট ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হাড সচরাচর দেখা যায়। অন্যান্য জন্তুর হাড়ের মতন ইহা তত মজবুত নহে। কতকটা খড়ির মতন সহজেই গুঁড়া হইয়া যায়। সাধারণ লোকে যত্নপূর্বক এই হাড় কুড়াইয়া আনে, বাজারে বিক্রয়ও করে। এই হাড়ে নাকি অনেক ভালো-ভালো ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার চলিত নাম 'সমুদ্রের ফেনা'। অনেকের বিশ্বাস, সমুদ্রের ফেনা জমিয়া এই জিনিস জন্মায়। আসলে অবশ্য তাহা নহে, ইহা কট্‌ল্‌ ফিশের হাড়। ইংরাজিতে এ জিনিসকে 'কট্‌ল্‌ বোন্‌' (cuttle bone) বলে।

৬

সেবারে আমি সবে কট্‌ল্‌ ফিশের কথা পড়িয়াছিলাম, আর বলিয়াছিলাম, উহাতে ঔষধ হয়। ঐ হাড়ের গুঁড়া পালিসের কাজে লাগে; অনেকে উহা দিয়া দাঁত মাজে।

জাত বিশেষে কট্‌ল্‌ ফিশ এক একটা খুব বড় বড়ও হয়, কিন্তু আমি নিতান্ত ছোট-ছোটই দেখিয়াছি। উহাদের অবশ্য কোনোরকম দেশী নাম আছে; দুঃখের বিষয় আমি তাহা জানি না। একটি জেলের ছেলে চার পাঁচটা কট্‌ল্‌ ফিশ হাতে করিয়া সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমি উহার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওগুলো কি?' উদ্দেশ্য, নামটা শিখিয়া লই। ছেলেটি বড় ভীতু; কেমন জড়সড় হইয়া উত্তর দিল। তাহাতে নাম যদি বলিয়াও থাকে, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমি খালি এই কথাটা একটু বুঝিলাম, যে সে তাহা দিয়া 'তরকারি পাকাইবে'। সবে আমার এইটুকু জ্ঞানলাভ হইয়াছে, আরো ঢের হইবে বলিয়া আশা করিতেছি, এমন সময় কোথা হইতে এক সাহেব আসিয়া আমার সব গোলমাল করিয়া দিল। সে বলে, ওটা নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর মাছ। আমি বলিলাম ওটা মাছ নয়, শামুক জাতীয় জন্তু। সাহেব আমার সে কথায় আমলই দিল না। ততক্ষণে সেই ছোকরা কোথায় যে সরিয়া পড়িল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

সেই কট্‌ল্‌ মাছগুলিকে দেখিয়া আমার ছোট-ছোট শুকনো কচুগাছের কথা মনে হইয়াছিল। শরীরগুলি যেন মুখী কচু (রঙ কিন্তু ঘোর খয়েরি) আর হাত পা গুলি যেন তাহার শুকনো ডালপালা। এক একটার এইরূপ আটটি কি দশটি করিয়া হাত (অথবা পা, যাই বল) থাকে। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহার কটা হাত ছিল, গুনিবার অবসর পাই নাই; কিন্তু উহার আকৃতি যেরূপ দেখিলাম তাহাতে বোধ হইল, যেন উহার দশ হাত। আর, দুটি হাত যেন অন্যগুলির চাইতে বেশি লম্বা বলিয়া বোধ হইয়াছিল; ইহাও দশ হাতওয়ালা কট্‌ল্‌ ফিশের একটা লক্ষণ। কট্‌ল্‌ ফিশের বড়-বড় উজ্জ্বল দুটো চোখ, আর টিয়া পাখির মতন ঠোঁটও আছে। ঠোঁটটি কিন্তু হাত পায়ের জঙ্গলের ভিতরে লুকানো থাকে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

এ জন্তুগুলি যেন সমুদ্রের সঙ। অনেক দেশ ইহাদিগকে 'শয়তান মাছ' (devil fish) বলে। বাস্তবিক এমন বিকট বিদ্‌ঘুটে চেহারা আর কোনো জন্তুর আছে কিনা সন্দেহ। চালচলন আবার চেহারার চাইতেও অদ্ভুত। আট দশটা পা থাকিলে তাহার চলাফেরা সম্বন্ধে অন্তত আমাদের সাদাসিধা হিসাবে আর কোনো ভাবনার কথা থাকে না। কিন্তু ইহারা এতগুলি পা লইয়াও সন্তুষ্ট নহে; উহাদের আরো একরকম চলিবার কায়দা চাই। পাগুলি দিয়া পায়ের কাজ আর হাতের কাজ দুইই চলে; অর্থাৎ চলাফেরাও হয় আবার শিকারকে জড়াইয়া ধরাও যায়। সাধারণ চলাফেরার সময় এই পাগুলিই ব্যবহার হয়। কিন্তু পলায়নের সময় এমন পুরাতন পাড়াগেঁয়ে দস্তুর উহারা পছন্দ করে না; তখনকার জন্য একটা কোনোরূপ নূতন কায়দার নিতান্তই দরকার। সুতরাং চম্পট দিবার কাজটি দমকলে না হইলে উহাদের মন উঠে না। দমকলের বন্দোবস্ত বিধাতা উহাদের শরীরের মধ্যেই করিয়া দিয়াছেন; তাহা দ্বারা উহারা ইচ্ছা করিলেই পিচকারির মতন বেগে জল ফুঁকিয়া (অবশ্য মুখে ফুঁকিয়া নয়, সেই কলে ফুঁকিয়া) বাহির করিতে পারে। সে জলের এমনি ধাক্কা যে, সেই ধাক্কায় তীরের মতন বেগে পিছু হটিয়া উহারা তিলার্ধে অর্ধ ক্রোশ দূরে গিয়া উপস্থিত হয়।

ইহাদের প্রত্যেকের আবার এক থলে করিয়া কালি থাকে। তেমন বেখাপ্পা গোছের

কোনো শত্রু আসিলে ফস্ করিয়া তাহার সামনে একরাশ কালি বাহির করিয়া দেয়। কালিতে জল ঘোলা হইয়া গেলে শত্রুর ধাঁধা লাগিয়া যায়। ততক্ষণে সে শয়তান দমকল ফুঁকিয়া কোথায় গিয়া গা ঢাকা দেয় তাহা টেরই পাওয়া যায় না। ইহার উপরে আবার ইহাদের চলাফেরার অভ্যাস রাত্রিতেই বেশি। সুতরাং ইহাদিগকে সঙ বা ভূত পেত্নী বলিলে এমন অন্যায় আর কি হয়।

আমি পুরীতে যেমন ছোট ছোট কট্‌ল্ ফিশ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার হাসিই পাইয়াছিল। কিন্তু এই জাতীয় জন্তু বড় হইলে নিতান্তই ভয়ানক হয়। একরকম আট পেয়ে কট্‌ল্ ফিশ (octopus) আছে, তাহার এক একটা হাত পা ছড়াইলে আট-দশ ফুট জায়গা জুড়িয়া বসে। এক একটা পা-ই তার দশ-বারো ফুট লম্বা, এমন অক্টোপাসও আছে। হাতির শুঁড়ের আকৃতি এক একটা পা, তাহার ভিতর দিক দিয়া ছোট ছোট বাটির মতন একপ্রকার জিনিস সার সার সাজানো থাকে। এইসকল বাটির মতন জিনিসের প্রত্যেকটি একটি জোঁকের মুখের মতন কাজ করে। অর্থাৎ যাহাতে লাগে, তাহাকেই উহারা এমন ভয়ানক চুষিয়া ধরে যে তাহার প্রাণ পর্যন্ত চুষিয়া বাহির করিবার গতিক হয়। যাহাকে একবার ধরে, তাহার কি আর রক্ষা আছে। আট হাতে জড়াইয়া ধরিয়া একটিবার ঐ ভয়ানক টিয়া পাখির ঠোঁটের মধ্যে লইয়া ফেলিতে পারিলেই বেচারার জীবন শেষ হয়। এইরূপে অক্টোপাসের হাতে পড়িয়া মানুষের প্রাণ হারাইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ছোটখাটো নৌকা কট্‌ল্ ফিশের টানে উলটিয়া গিয়াছে, এরূপ ঘটনাও ঘটিয়া থাকে।

ঐ চোষণীগুলির সাহায্যে উহারা এমন সব অসম্ভব কাজ করিতে পারে, যে লোকে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য হয়। নিতান্ত ছোট ফাটলের ভিতর ঢুকিয়া থাকা, নিতান্ত অসম্ভব স্থানে বাহিয়া উঠা, এ সকল এবং অন্যান্য রকমের মানুষ বাজিকরের অসাধ্য অনেক কাজ ইহারা নিতান্ত সহজভাবে প্রত্যহই করিয়া থাকে।

ইহারা আঙ্গুরের মতন থোকা থোকা ডিম পাড়ে। শামুকেরাও ঐরূপ করে, তবে শামুকের ডিম অবশ্য খুব ছোট-ছোট। ডিমগুলিকে কোনো নিরাপদ জায়গায় আটকাইয়া রাখিয়া কট্‌ল্ মাছ অতি যত্নে পাহারা দেয়। ইহাদের শরীরের রঙ সকল সময় একরকম থাকে না, ক্রমাগত বদলায়। যে স্থানের যেমন রঙ, উহাদের শরীরের রঙও উহারা অনেকটা সেইরূপ করিতে পারে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে একটি ছেলের হাতে ছোট-ছোট কট্‌ল্ মাছ দেখিয়াছিলাম। আর সে বলিয়াছিল যে উহা রাঁধিয়া খাইবে। অনেকে এই জন্তুর মাংস খুব আদরের সহিত আহার করে, আর ইহাদিগকে শিকার করিবার জন্য বিস্তর ক্লেশ ও বিপদ সহ্য করে। এ সকল লোকের বাস আমাদের দেশে নহে; কিন্তু আমি একটা পুস্তকে এ কথা লেখা দেখিয়াছি যে ভারতবর্ষের বাজারে নাকি কট্‌ল্ ফিশের মাংস বিক্রয় হয়। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা আমি বলিতে পারি না; তবে এ দেশের কেহ কেহ যে উহা খায়, তাহার প্রমাণ তো ঐ জেলের ছেলেটার কাছেই পাওয়া গেল।

এই সকল জেলে মাদরাজি; ইহাদিগকে নোরিয়া বলে। চেহারায় কথাবার্তায়, চাল-চলনে, সকল বিষয়েই ইহারা উড়িয়াদের চাইতে অনেক বিভিন্ন। সেখানকার দেশীয় জেলেও আছে, কিন্তু তাহারা সমুদ্রের মাছ ধরে না, তেমন সাহস আর উদ্যোগ তাহাদের নাই।

ভারতবর্ষের গরিব লোকেরা কি পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আর ক্লেশ পাইয়া দুবেলা দুই মুঠা

ভাতের জোগাড় করে তাহা এই নোরিয়াদিগকে দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য আমাদের দেশের জেলেরাও কম কষ্ট পায় না। শীত, গ্রীষ্ম, রোদ, বৃষ্টি, কুমিরের ভয় ইহাদের বেলাও খুব আছে। কিন্তু সমুদ্রে মাছ ধরার যে ক্লেশ দেখিয়াছি, তাহার কাছে ঐ সকল কিছুই নহে।

সচরাচর তিনরকম উপায়ে ইহারা মাছ ধরিয়া থাকে। এক উপায় ছোট ছোট জাল লইয়া সমুদ্রের কূলে কূলে ছোট-ছোট মাছ ধরা। হাত পনেরো লম্বা আর হাত দেড়েক চওড়া একখানি জাল, তাহার মাঝে মাঝে এড়োভাগে সরু-সরু কাঠি পরানো। দুজন লোক জালের দুই মাথায় ধরিয়া জলের ধারে ধারে চলিতে থাকে। যেই একটা ঢেউ আসিয়া ডাঙ্গার উপরে খানিক দূর অবধি উঠিয়া যায়, অমনি তাহার ফিরিবার পথে জালখানিকে দুজনে বেড়ার মতন খাড়া করিয়া ধরিয়া তাহার পথ আগলায়। কাঠির সাহায্যে জালখানি বেশ দাঁড়াইয়া থাকে, সুতরাং জল সরিবার সময় তাহাকে জালের ভিতর দিয়া সরিতে হয়, আর মাছ আটকা পড়ে। বড় ঢেউ থাকিলে ঐ উপায়ে মাছ ধরা চলে না, আর ইহাতে ছোট-ছোট মাছই পড়ে, তাহাও বেশি নহে।

দ্বিতীয় উপায়, কাটামারণে করিয়া সমুদ্রের ভিতরে গিয়া জাল দিয়া মাছ ধরা। ঐ জাল কিরকম তাহা দেখি নাই। কারণ যাইবার সময় উহা গুটানো থাকে, আর মাছ ধরিবার কাজটা সমুদ্রের ভিতরে এত দূরে হয় যে, ভালো করিয়া দেখাই যায় না। জেলেরা সকাল-সকাল উঠিয়া মাছ ধরিতে বাহির হয়, আর দুপুরবেলায় ফিরিয়া আসে। যাইবার সময় ঢেউয়ের হাতে ইহাদিগকে বিস্তর লাঞ্ছনা পাইতে হয়। কতবার কাটামারণসুদ্ধ উলটাইয়া জলে পড়ে। আবার সেই ঢেউয়ের অত্যাচারের ভিতরেই কাটামারণ সোজা করিয়া পুনরায় উঠিয়া বসিতে হয়। কাটামারণের কাঠগুলি কর্কের মতন জলে ভাসে, আর খুব হালকা। কাটামারণ উলটিয়া গেলে তাহাকে সহজেই সোজা করা যায়। তবে টুপি পরিয়া মাথাটাকে বাঁচাইবার কতক চেষ্টা হইয়া থাকে বটে। ঐ ঢেউয়ের মুখে সোজা করাই অসম্ভব হইত, তাহার উপর আবার উহার আবার উহার জল সেঁচার দরকার। এই জন্যই ঐ স্থলে নৌকা ব্যবহার হইতে পারে না। আর নৌকায় করিয়া ঐ প্রণালীতে মাছ ধরাও সহজ হইত না।

ছোট-ছোট এক একটি কাটামারণে দুজন লোক ধরে। দুজনে মিলিয়া মাছও ধরে, কাটামারণও সামলায়, আর তাহা করিতেই তাহাদের সময় চলিয়া যায়। শরীরের যত্ন করিবার অবসরও হয় না, সুতরাং তাহার কোনো চেষ্টাও হয় না। তবে টুপি পরিয়া মাথাটাকে বাঁচাইবার কতক চেষ্টা হইয়া থাকে বটে। ঐ সকল টুপি উহারা বাঁশের চটা দিয়া নিজেই বুনিয়া থাকে। দেখিতে ঠিক সেঁউতীর মতন।

এ সকল উপায়ে মাছ ধরিতে ছোট-ছোট জালই ব্যবহার হয়। নভেম্বর মাস হইতে উহারা বড়-বড় জাল দিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করে। আর সেই সময় হইতেই মাছ ধরা দেখিবার আমোদ আরম্ভ হয়। তখন আর কাটামারণে কাজ চলে না, নৌকার দরকার হয়। নৌকায় করিয়া অনেক দূর অবধি জাল ফেলিয়া আসে; তারপর ডাঙ্গায় আসিয়া তাহাকে টানিয়া তোলে। এক একটা জালের পিছনে কুড়ি-পঁচিশ জন করিয়া লোক খাটিতে হয়। স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সকলে মিলিয়া ইহাতে যোগ দেয়।

আসল যে জাল, সেটা একটা প্রকাণ্ড থলে; তাহার ভিতরে কুড়ি-বাইশ জন মানুষ পুরিয়া

রাখা যায়। এই থলের বিনুনী খুব ঘন আর মজবুত; একটা ডান্‌কোনা মাছও তাহার ফাঁক দিয়া গলিতে পারে না। থলের মুখের দুই পাশ হইতে খুব লম্বা লম্বা দুখানা জাল বাহির হইয়াছে; তাহার একধার জলের উপরে ভাসে, আর একধার জলের নীচে ডুবিয়া ঝুলিতে থাকে। এই যে দুপাশের দুখানা জাল, তাহার বুনট থলের মতো এত ঘন নহে; আর থলের মুখ হইতে যতই দূরে যাওয়া যায়, ততই উহার ফোকর বড় হইয়া শেষটা এত বড় হয় যে তাহার ভিতর দিয়া তুমি আমিও ইচ্ছা করিলে গলিতে পারি। এত বড় ফোকরের ভিতর দিয়া মাছ কেন গলিয়া পলায় না, আমি অনেক সময় এ কথা ভাবিয়াছি।

জালখানিকে রীতিমত সমুদ্রে ফেলা হইলে, প্রায় সিকি মাইল জায়গা ঘেরা হয়। সিকি মাইল দূরে সমুদ্রের ভিতরে থলেটা থাকে। তাহার মুখের এক পাশ জলের উপরে, এক পাশ জলের নীচে থাকে; যেন সে মাছগুলিকে গিলিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে। এই হাঁ করা মুখের দুপাশ হইতে দুখানি জালের বেড়া ডাঙ্গা অবধি গিয়াছে; মাঝখানে মাছ রহিয়াছে। তাহাদের সমূহই বিপদ, কিন্তু তখনো তাহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। যদি পারিত তবে তাহাদের অধিকাংশই অনায়াসে ঐ সকল বড়-বড় ফোকরের ভিতর দিয়া গলিয়া বাঁচিতে পারিত। কিন্তু তাহারা তো তখনো সেই সিকি মাইল দূরের সর্বনেশে থলের সংবাদ পায় নাই। তাহারা প্রথমে থাকে :সেই বড়-বড় ফোকরের মধ্য দিয়া পলায়ন করিবার সুযোগ তাহাদের চলিয়া যায়।

এদিকে জেলেরা ডাঙ্গায় থাকিয়া দুই বেড়ার দুই মাথা একত্র করিয়া জালে টান ফেলিয়াছে। তাহাদের দুজন জলে নামিয়া ক্রমাগত জাল ঠিক রাখিতেছে, যাহাতে ঢেউয়ের তাড়ায় জাল জড়াইয়া গিয়া মাছ পলাইবার সুবিধা না হয়। ইহাদের গোলমালে মাছগুলি একদিকে যেমন জাল হইতে দূরে থাকিতেছে, আরেক দিকে তেমনি ডাঙ্গার দিক হইতে থলের দিকে গিয়া জড় হইতেছে। সেদিকে জালের ফোকর ক্রমেই ছোট-ছোট, সুতরাং সে পথে পলাইবার আর ভরসা নাই। তখন ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক, ঐ থলের ভিতরেই তাহাদিগকে ঢুকিতে হয়। 'ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ!' অর্থাৎ যাহারা বোকা, বিপদ হইয়া গেলে পরে তাহাদের চৈতন্য হয়, সারা বছর নিদ্রায় কাটাইয়া পরীক্ষার সময় অনেক ছাত্র-বাবুদের যে দশা হয় সেইরূপ।

এত পরিশ্রম করিয়া জালে কি উঠে, তাহা জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে ফল বড়ই অনিশ্চিত! এক একদিন থলে এমনি বোঝাই হইয়া উঠে যে সকলে মিলিয়া তাহাকে টানিয়া ডাঙ্গায় আনাই কঠিন হয়। আবার একদিন দেখিলাম যে একটা জালে এককেপে মোটে সাড়ে পাঁচ আনার মাছ উঠিল। যে জেলের জালে ঐরূপ হইয়াছিল সে আমাকে বলিল 'বাবু, কাল খুব মাছ পাইয়াছিলাম, তিনশো টাকার মাছ বেচিয়াছি।'

জালে জেলী ফিশটা খুবই উঠে। জাল ডাঙ্গায় উঠিবার পূর্বেই এ কথা বলা যায় যে আর কিছু উঠুক না উঠুক, ঝুড়িখানেক জেলী ফিশ উঠিবে। আর একটা বিষয় এই দেখা যায় যে এক একটা জালে এক এক জাতীয় মাছই খুব বেশি পড়ে। খণ্ডবালিয়া উঠিল তো দেখিবে খালি খণ্ডবালিয়াতেই জাল বোঝাই। কোনোদিন হয়তো দেখিবে থলের প্রায় প্রত্যেক ফোকরেই একটা কাঁকল মাছের ঠোঁট বাহির হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে এই সকল মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়ায়, আর জালে পড়িলে ঝাঁকসুদ্ধই পড়ে। খুব বড় মাছ আমি জালে পড়িতে দেখি নাই।

৭

সমুদ্রের ধারে বালির উপদ্রব একটু বেশি এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। হাওয়ায় বালি উড়াইয়া সেখানকার টালিবাঁধানো রাস্তাটিকে ক্রমাগতই ডুবাইয়া দেয়; তাই মাঝে মাঝে লোক লাগাইয়া তাহাকে আবার খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়। সেখানকার ছোট গির্জাটির আঙ্গিনায়ও এইরূপ বালির অত্যাচারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরীর রেলের স্টেশনের কাছে সমুদ্রের ধারে চক্রতীর্থ নামক একটি স্থান আছে। দুই-একটি মন্দির ভিন্ন সেখানে আর কিছু নাই। যে নিমকাঠ দিয়া জগন্নাথের মূর্তি গড়া হইয়াছে, সেই নিমকাঠ সমুদ্রের জলে ভাসিতে ভাসিতে ঐ চক্রতীর্থে আসিয়া লাগিয়াছিল, তাই উহা তীর্থস্থান হইয়াছে। ওখানকার একটি মন্দিরের দেবতা হনুমান। তীর্থযাত্রীরা সেই হনুমানের মন্দির প্রদক্ষিণ করে, আর তাঁহার পূজা দেয়। লোকের বিশ্বাস এই যে হনুমান ওখানে থাকাতে দেশ সমুদ্রের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইতেছে নচেৎ মহা মুশকিলই হইত।

চক্রতীর্থের কাছেই একটা বালির ঢিপির উপরে আর একটি ছোট মন্দির আছে। চৈতন্যদেব পুরীতে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ যে স্থানে আসিয়া তীরে লাগিয়াছিল, ঐ ছোট মন্দিরটি সেইখানে তয়ের করা হইয়াছে। সেখানে গেলে চৈতন্যদেবের খড়ম প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের ধারের আর দুইটি বিষয়ের কথা বলিলেই পুরীর পালা শেষ করিতে পারি। পুরীতে মাঝে মাঝে জাহাজ আসে এ কথা বলিয়াছি। সুতরাং পুরী যে একটি জাহাজের স্টেশন এ কথা আর বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলে। এখান হইতে বিলাত প্রভৃতি স্থানে যে সকল জাহাজ যায়, তাহারা পুরীর কাছ দিয়া যায় না; তাহাদের পথ পুরী হইতে প্রায় ষাট মাইল দূরে সমুদ্রের ভিতর দিয়া। কিন্তু এমন অনেক জাহাজ আছে, যাহার রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে। পুরী এইসকল জাহাজের স্টেশন।

এই সকল স্টেশনে দুইটি বিষয়ের বন্দোবস্ত রাখিতে হয়। ১) একটা নিশান, ২) রাত্রিকালের জন্য একটা আলো। সাধারণ নিশান এবং আলোর সঙ্গে এই নিশান আর আলোর একটু প্রভেদ আছে, তাই ইহাদের কথা এখানে উল্লেখ করিয়াছি।

নিশানের দ্বারা জাহাজের লোকদিগকে নানারূপ সংবাদ দেওয়া যায়। ছোট-ছোট অনেক রকমের নিশান আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির আকার এবং রঙ ভিন্ন রকমের আর প্রত্যেকটির এক একটা বিশেষ অর্থ আছে। এই সকল নিশান আর তাহার অর্থের দস্তুর মতন অভিধান থাকে, তাহার সাহায্যে নিশানের ভাষায় কথাবার্তা চালানো যায়।

বাস্তবিক এরূপ একটা উপায় না থাকিলে জলযুদ্ধের সময় ভারি মুশকিল হইত। যিনি সেনাপতি, তিনি হয়তো যুদ্ধের সময় ইচ্ছা করিলেন যে নিজের জাহাজগুলিকে কোনো একটা বিশেষ হুকুম দিবেন। এখন সে হুকুম দেওয়া যায় কি করিয়া? স্থলে হইলে হয়তো দূত পাঠাইয়া সংবাদ দেওয়া সম্ভব হইতে পারিত, (স্থলযুদ্ধের জন্যও নানারূপ সংকেতের ব্যবস্থা আছে) কিন্তু নৌযুদ্ধে এরূপ সংবাদ কে লইয়া যাইবে? আর কেহ লইয়া যাইতে পারিলেও হয়তো সংবাদ পৌঁছাইবার পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে। এইজন্য নৌযুদ্ধে ঐরূপ নিশানের দরকার। এই সকল জাহাজের লোকেরাই তৎক্ষণাৎ তাহা দেখিতে পায়, আর হুকুম মতো কাজ করে।

ট্রাফালগারের যুদ্ধের সময় সেনাপতি নেলসন এইরূপে তাঁহার দলের জাহাজগুলিকে নিম্নলিখিত সংবাদ দিয়াছিলেন 'ইংলণ্ড আশা করেন যে, প্রত্যেক লোক তাহার কর্তব্য করিবে।' গত রুশ-জাপান যুদ্ধে যেদিন সেনাপতি টোগো রুশিয়ার জাহাজ সকল চূর্ণ করেন, সেদিন তিনিও এই উপায়ে সৈন্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে, 'আজিকার যুদ্ধের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।'

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ঐরূপ নিশান দিয়া দস্তুর মতন কথাবার্তা চালান যাইতে পারে। জাহাজের সঙ্গে ষ্টেশনের লোকদেরও এই উপায়ে কথাবার্তা চলে। ইহা ছাড়া ঝড় বৃষ্টির অবস্থা জানাইবার জন্য আবার বিশেষ রকমের সংকেত আছে। এ সকল সংকেত বিফল করিয়া দিতে পারে, তাই এজন্য কোনোরূপ কঠিন জিনিস ব্যবহার হয়। জিনিসটি গোল হইলে এক অর্থ, চৌকা হইলে এক অর্থ তিন কোনা হইলে এক অর্থ। আবার ইহাদের একটির সঙ্গে আর একটি মিলাইলে তাহারাই কতরূপ অর্থ হইতে পারে। এইরূপে অতি অল্প কয়েকটি জিনিস দিয়া অনেকরকম কথা বুঝানো যায়। যেমন 'ভয় নাই।' 'ঝড়!' 'বড় বিপদ!' 'সাবধান' ইত্যাদি। এই সকল সংকেত দেখিয়া জাহাজের লোকেরা পূর্বেই সতর্ক হয়।

সমুদ্রে যাইবার সময় পথে ঝড়-বৃষ্টির অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা জাহাজের লোকের চাইতে ডাঙ্গার লোকের বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ জাহাজের লোকেরা চারিদিকে কয়েক মাইলের বেশি দেখিতে পায় না। পরিষ্কার দিনে হয়তো জাহাজ ছাড়িল, কিন্তু আর চারি ঘন্টা পরেই এমন একটা স্থানে গিয়া তাহাদের উপস্থিত হইতে হইবে যেখানে ভয়ানক ঝড় চলিতেছে। জাহাজের লোকের সে স্থানের খবর সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। কিন্তু ডাঙ্গার লোকেরা এক স্থানে ঝড়ের সংবাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ সকল দেশে তার করিয়া সংবাদ দিতে পারে। এইরূপ কার্যের জন্য রীতিমতো সরকারি আফিস প্রায় সকল স্থানেই আছে। উহাদের কাজ কেবল ঝড় বৃষ্টি আর বায়ু ও আকাশের অবস্থার খবর লওয়া, এবং সর্বত্র সেই খবর দেওয়া। এইরূপে এক জায়গায় ঝড়ের নমুনা হইলে দেখিতে দেখিতে তাহার খবর জাহাজের ষ্টেশনে ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হয়, আর অমনি সেখানকার লোকেরা তাহা নিশানা লটকাইয়া দেয়। জাহাজের লোকেরা ক্রমাগত ঐ সকল নিশানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলে।

আলোর দ্বারা অবশ্য এতরকম খবর দেওয়ার ব্যবস্থা নাই; তথাপি আলোকটি দেখিলে অন্তত এ কথা বুঝিতে পারা যায়, যে অমুক ষ্টেশনের কাছে আসিয়াছি। এই সকল আলোর লণ্ঠন বিশেষ রকমের। তাহার সামনের কাচখানার গড়ন এমনি, যে তাহাতে ভিতরকার আলোটাকে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে না দিয়া সোজা সামনের দিকে পাঠাইয়া দেয়। তাহার ফলে অনেক দূর হইতে এই আলো দেখিতে পাওয়া যায়। আতসী কাচের গড়ন যেরূপ, এই লণ্ঠনের কাচের গড়ন কতকটা সেইরূপ, কিন্তু তাহার চাইতে অনেক জটিল।

পুরীর লণ্ঠনটি অতি সামান্যরকম। কিন্তু এই জাতীয় লণ্ঠন এক একটা খুব বড়-বড় হয়, আর তাহার আলো সাধারণ আলোর চাইতে অনেক বেশি। অনেক স্থলে আবার এরূপ বন্দোবস্ত থাকে যে আলোটি ক্রমাগত না জ্বলিয়া একবার নিভিবে (অথবা লণ্ঠনটি ঘুরিবে, যাহাতে একবার তাহার সামনের দিক, একবার পিছনের দিক দেখা যায়, আর দূর হইতে মনে হয় যেন আলো জ্বলিতেছে আর নিভিতেছে)। এই উপায়ে বিশেষ বিশেষ স্থানের আলো দেখিয়া জাহাজের লোকেরা বুঝিতে পারে যে, উহা অমুক স্থানের আলো। পৃথক স্থানের

আলো জ্বলা নিভার এক একটি বিশেষ হিসাব আছে। কোনোটার সহজ হিসাব; যেমন 'এত সময়ে এতবার।' কোনোটার হিসাব একটু জটিল; যেমন 'এতক্ষণ পর পর ক্রমাগত এতবার জ্বলিয়া তারপর এতক্ষণ।' এইরূপ অসংখ্য হিসাব হইতে পারে।

এইসকল আলোর কোনটা কি হিসাবে জ্বলে, জাহাজে জাহাজে তাহার একটা তালিকা থাকে। সেই তালিকা দেখিয়া কোন স্থানের কোন আলো তাহা চিনিয়া লইতে হয়।

আবার পুরীতে

১

এবারে আবার পুরী গিয়াছিলাম। দু বৎসর আগে আর একবার যাই। এই দু বৎসরের মধ্যে স্থানটির সমুদ্রের ধারেব চেহারা অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। যেসকল জায়গায় আগে বালি ভিন্ন কিছুই ছিল না, এখন সেখানে অনেকগুলি নূতন বাড়ি হইয়াছে। ইহারই একটি ছোট বাড়িতে আমরা ছিলাম। প্রথমবারের বাড়িটির চেয়ে এ বাটীটি সমুদ্রের অনেক কাছে।

এ বাড়িতে আসিয়াই কতকগুলি কাঁকড়া আর কুকুরের সহিত পরিচয় হইল। কাঁকড়াগুলি আমাদের উঠানেই থাকিত; বাড়ি হইবার পূর্বে এ সকল জমি তাহাদেরই ছিল। কুকুরগুলি বোধহয় বাড়ি হইবার আগে এখানে আসিয়াছিল। বেচারারা নিতান্তই গরিব। চেহারা দেখিয়া মনে হইল, যেন পেট ভরিয়া আহার তাহাদেব অল্পই জোটে; কিন্তু এরূপ কষ্ট এবং অযত্নের মধ্যে থাকিয়াও তাহাদের স্বভাবের মিষ্টতা হারায় নাই। প্রথমে ইহাদের একটিই ঐ বাড়িতে ছিল, সুতরাং প্রথম পরিচয় তাহার সঙ্গেই হয়। জীর্ণ শীর্ণ অস্থি-চর্মসার শরীরটিতে যেমন একদিকে তাহার দারিদ্র্যের লক্ষণ দেখা গেল, তেমনি লম্বা লম্বা হাত-পা, লম্বা লেজ এবং স্নিগ্ধ মুখশ্রীতে তাহার ভদ্রতাব আভাসও ছিল। সেই লম্বা লেজটি নাড়িয়া সে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। আমরা অল্প কয়টি লোক, আমাদের পাতের ভাতে ভালো করিয়া তাহার পেট ভরিত কিনা সন্দেহ, কিন্তু তাহার জন্যই সে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইয়া সমস্ত রাত্রি আমাদের বাড়িতে পাহারা দিত।

ক্রমে আর দুটি কুকুর আসিয়া জুটিল। ইহাদের একটা একটু বুনোগোছের ছিল, ভদ্রতার ধার বড় একটা ধারিত না। শিশুকালে কে তাহার লেজ কাটিয়া দিয়াছিল, এখন তাহার তিন আঙ্গুল মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা ঘনিষ্ঠতা করিতে গেলে সে ঐ তিন আঙ্গুল লেজটুকুই গুটাইয়া অবিশ্বাস প্রকাশ করিত। অন্যান্য কুকুরগুলির তুলনায় ইহার মনটাও একটু কুটিল ছিল বলিয়া বোধহয়; কিন্তু আমাদের সঙ্গে সে কোনোরূপ মন্দ ব্যবহার করে নাই।

তারপর আবার একটা মস্ত কুকুর আসিল। যতদিন কেবল আমরাই ছিলাম ততদিন তাহাকে দূরে দূরে দেখিতে পাইতাম বটে, কিন্তু সে আমাদের কাছে বড় একটা ঘেঁষিত না। কিন্তু যখন আমাদের বাড়িতে ছোট-ছোট ছেলেরা আসিল, তখন দেখি যে কুকুরটা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া বসিয়াছে। ছেলেদের সঙ্গে সে এমনি উৎসাহ করিয়া খেলিত যে, একদিন লাফ দিয়া তাহাদের মাথার উপর দিয়াই চলিয়া গেল।

এই কুকুরগুলিকে ছাড়িয়া আসিতে কষ্ট বোধ হইয়াছিল। আসিবার পূর্বে তাহাদের যথেষ্ট ভাত আর মাছ রান্না করিয়া তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইলাম। খাইবার সময় তিনটি কুকুর আসিয়া উপস্থিত হইল, বড় কুকুরটাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এত খাবার বোধ হয় আর

কোনোদিন তাহারা পায় নাই। লেজকাটা কুকুরটা অনেক ভাত দেখিয়া এতই ব্যস্ত হইয়া উঠিল যে সে পারিলে সব ভাত একাই খায়। সে তাহার নিজের ভাগ পায়ে ঢাকিয়া অন্য দুটা কুকুরের ভাগ খাইতে লাগিল। কাজেই শেষটা তাহার ভাগ খাইবার বেলা আর তাহার পেটে স্থান রহিল না।

পরদিন বড় কুকুরটা আসিয়া উপস্থিত। সে কোথায় যেন গিয়াছিল, সে অবধি তাহার কিছুই খাওয়া হয় নাই। যাহা হউক, তাহার জন্য খাবার যথেষ্ট রাখা হইয়াছিল।

সেবারে পুরীর ব্যাঙ আর উইয়ের কথা বলিয়াছিলাম। এ বাড়িটিতে এই দুই জন্তু দেখিতে পাই নাই। টিকটিকি আর গিরগিটি অনেকগুলি ছিল। আমাদের বারান্দায় একটা তালপাতার বেড়া ছিল। রাত্রিতে বাহিরের বাতাস আর শীতের তাড়ায় যত গিরগিটি আসিয়া এই বেড়ায় আশ্রয় লইত। তাহাদের ঘুমাইবার ভঙ্গির কথা মনে হইলে এখনো আমার হাসি পায়। শরীরটাকে যত উৎকৃষ্ট রকমের বাঁকাইতে পারে ততই বোধহয় উহাদের ঘুমাইবার সুবিধা। কেহ যদি দড়ির আগায় ঝুলিতে ঝুলিতে পা ঘাড়ে তুলিয়া মাথা নীচের দিকে দিয়া ডিগবাজি খাইবার মাঝখানে ঘুমাইয়া পড়ে, তবে হয়তো সে গিরগিটির নিদ্রার মর্ম খানিকটা বুঝিতে পারে।

পুরীর বিড়ালগুলি এবারে আমাদিগকে বড়ই জ্বালাতন করিয়াছে। আমরাও যে তাহাদের সহিত বন্ধুতা করিতে পারি নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য। আমার লাঠিটার কথা কহিবার শক্তি থাকিলে এ বিষয়ে তোমরা অনেক আশ্চর্য সংবাদ শুনিতে পাইতে। দুঃখের বিষয়, এত করিয়াও উহাদের সংশোধন হয় নাই। এরূপ নির্লজ্জ জন্তু আর বেশি আছে কি না সন্দেহ। যত মার খায়, ততই আরো বেশি করিয়া দৌরাত্ম্য করে। মারের চোটে কোমরও যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবুও সামনের দুপায় হিঁচড়াইয়াই ছুট দিবে। খানিক দূর যাইতে না যাইতেই দেখিবে তাহার কোমর সোজা হইয়া গিয়াছে। আর খানিক গেলে হয়তো বেদনার কথা একেবারেই ভুলিয়া যাইবে। কাজেই আর বেশি দূর যাইবার পূর্বেই সে ফিরিয়া আসিয়া রান্নাঘরের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারিবে। সেখানে যদি কেহ থাকে, তবে হয়তো তাহাকে বলিবে 'মিঞাও! কি মিঞা? বড় যে মারিয়াছিলে?' আর যদি কেহ না থাকে, তবে তো বুঝিতেই পার। বল দেখি, এমন অবস্থায় নিতান্ত সাধু মহাপুরুষ ভিন্ন সাধারণ লোকের রাগ হয় কিনা?

সাধু লোকের কথায় পরলোকগত পূজাপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবজন্তুর প্রতি অসাধারণ দয়ার কথা মনে পড়ে। পুরীতে নরেন্দ্র সরোবরের ধারে গোস্বামী মহাশয়ের সমাধির স্থানে একটি আশ্রম আছে। সেই আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ে অনেক আশ্চর্য কথা শুনিয়াছি। ইতর প্রাণীরা অনেক সময় যথার্থ দয়ালু লোককে চিনিতে পারে, এবং অন্য লোক দেখিয়া তাহাদের মনে যেরূপ ভয় আর অবিশ্বাস হয়, ঐসকল দয়ালু লোকের সম্বন্ধে তাহা হয় না। গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। বিড়ালের জন্য দুধ রোজ বরাদ্দ করা, গরু ছাগলকে নিয়মিত আহার দেওয়া এ সকল তো তাঁহার ছিল। ইঁদুর আরশুলাগুলি পর্যন্ত নাকি ক্ষুধার সময় তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। উহারা আসিয়া তাঁহার গা খুঁটিতে আরম্ভ করিলেই উনি বলিতেন, 'ওহে, ইহাদের আহার চাই, কিছু খাইতে দাও।' খাবার দেওয়া হইলে পর উহারা সন্তুষ্ট হইয়া যথাস্থানে চলিয়া যাইত। যে সাপকে আমরা দেখিবামাত্র তাহার মাথা গুঁড়া করিয়া দিই, গোস্বামী মহাশয় সেই সাপকে পর্যন্ত যত্ন করিয়া রোজ দুধ-ভাত খাওয়াইছেন। একটা সাপ

ধ্যানের সময় আসিয়া তাঁহার শরীরে বাহিয়া উঠিত, কিন্তু কখনো কোনো অনিষ্ট করিত না।

সকলের চাইতে বানরগুলি তাঁহাকে বেশি করিয়া ভালোবাসিত। আব্দারও তাঁহার নিকট কম করিত না। তাঁহার গায়ে হাত দিয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া টিপিয়া নানা উপায়ে তাঁহার নিকট হইতে খাবার তো আদায় করিতই; খাবার জিনিস মনঃপুত না হইলে আবার আঁচড়াইয়া তাঁহাকে সাজাও দিত। তিনি ইহাতে রাগ করা দূরে থাকুক, বরং হাসিয়া বলিতেন, 'ওহে, কি দিয়াছ, উহার পছন্দ হয় নাই; ভালো জিনিস দাও!'

বানরগুলি তাঁহার নিকট ছানা রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে অন্য কাজে মন দিত, কিছুমাত্র সন্দেহ করিত না। একদিন গোস্বামী মহাশয়ের পরিচিত একটা বানর তাহার বানরীকে লইয়া উপস্থিত হইল। বানরী কখনো সেখানে আসে নাই, কাজেই তাহার সংকোচ হওয়া স্বাভাবিক। তাই সে দরজা অবধি আসিয়া আর কাছে আসিতে চাহিল না। বানরটা আগে নানান উপায়ে তাহাকে উৎসাহ দিল। তবুও যখন সে আসিল না, তখন বানর গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আসিয়া তাঁহার হাতখানি টানিয়া নিজের হাতের ভিতরে লইয়া বানরীর দিকে চাহিয়া রহিল, যেন তাহাকে এই কথা জানাইল যে 'দেখ, এ বড় ভালোমানুষ, কিছু করে না।' ইহার পর বানরী আর কাছে আসিতে কোনো আপত্তি করিল না।

গোস্বামী মহাশয় এইসকল বানরকে বুড়ো দাদা, কাণী, লেজকাটি ইত্যাদি নামে ডাকিতেন। ইহাদের অনেকে নাকি এখনো পুরীর লোকনাথের মন্দিরের কাছে বাস করে। এ কথা শুনিয়া একদিন লোকনাথের মন্দিরের ফটো তুলিতে গেলাম। মন্দিরের আঙ্গিনায় অনেক বানরও উপস্থিত ছিল। কিন্তু উহাদের ছবি তোলা আমাদের ঘটিল না। একজন পাণ্ডা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের সঙ্গে কি চামড়া আছে?' আমরা বলিলাম, 'হাঁ আমাদের ক্যামেরায় চামড়া আছে।' তাহা শুনিয়া সে ব্যক্তি বলিল, 'তবে শীঘ্র বাহিরে যাও, এখানে চামড়া আনিতে নাই।' কাজেই আমরা বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

যাহা হউক, আমরা একেবারে শুধু হাতে ফিরিয়া আসিতে রাজি ছিলাম না। মন্দিরের আঙ্গিনার বাহিরে বাগান, সেইখানেই যত বানর থাকে। সুতরাং আমরা পুকুরের ধারে কলা ছড়াইয়া বানরের দলকে নিমন্ত্রণ করিলাম। একজন চ্যাচাইয়া ডাকিতে লাগিল, 'আয়, আয়, আয়।' অমনি কয়েকটি বানর আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরাও তাহাদের ছবি লইয়া বাড়ি ফিরিলাম। ইহাদের মধ্যে 'কাণী' 'লেজকাটি' প্রভৃতির কেহ আছে কিনা জানি না।

২

আগেই লোকনাথের মন্দিরের নিকট বানরের ছবি তোলার কথা বলেছি। দুঃখের বিষয়, সেবারের ছবিটির নীচে নরেন্দ্র সরোবরের নাম লেখা হইয়া গিয়াছে। আমার কিন্তু দোষ নাই, ও নাম উহাতে কি করিয়া লেখা হইল, তাহা আমি জানি না।

যাহা হউক, কথাটা যদি উঠিল, তবে না হয়, নরেন্দ্র সরোবরের ছবিটাও দেওয়া যাউক। পুরীতে এই পুকুরটি অতিশয় প্রসিদ্ধ। আর ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যে উহা যেমন তেমন পুকুর নহে। কলিকাতার লালদীঘি হইতে উহা অনেক বড়, আর তাহার চারিধার পাথর দিয়া বাঁধানো, জল বেশ পরিষ্কার, কিন্তু তাহাতে কুমির থাকায় নামিয়া স্নান করাটা তেমন নিরাপদ নহে। প্রত্যহ অনেক লোক ইহাতে স্নান করে বটে, কিন্তু ইহাদের দু-একটিকে

মাঝে মাঝে কুমিরে ধরিয়াও থাকে।

পুকুরের মাঝখানে যে একটি ছোট মন্দিরের মতন দেখা যায়, উহা জগন্নাথের গ্রীষ্মাবাস। গ্রীষ্মের সময় কিছুদিন জগন্নাথকে এই স্থানে আনিয়া রাখা হয়। স্থানটি অতি সুন্দর, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছবিটি তেমন ভালো উঠে নাই। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল, তাই ভালো করিয়া ফটো তোলা গেল না।

ফটো তুলিবার জন্য এবারে পুরীর অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি, তাহাদের কথা ক্রমে বলিব। আমরা সমুদ্রের কাছেই ছিলাম, সুতরাং সমুদ্রের নিকটবর্তী অনেকগুলি জায়গায় ছবি তোলা হইয়াছে। আমাদের বাড়ি হইতে খানিক পশ্চিমে গেলেই নরিয়াদিগের গ্রাম। তাহারা সারি সারি ঘর বাঁধিয়া বাস করে। পাশাপাশি দুখানি ঘরের মাঝখানে কিছুমাত্র ফাঁক রাখে না। দরজা জানালার ধার অতি অল্পই ধরিয়া থাকে। হাওয়া তো ঘরের ভিতরে খেলেই না। জিজ্ঞাসা করিলে একজন বলিল, 'অতটুকু ঘরে আবার কত হাওয়া খেলিবে? ঘরে, উঠানে, বাগানে, আঁস্তাকুড়ে ঘন্ট পাকাইয়া তাহার ভিতরে উহারা বাস করে।

ইহারা একরকম হিন্দু। ইহাদের দেবদেবী আছে, পুরুত আছে, মন্দির আছে। মন্দির বলিতে একটা কিছু কাণ্ডকারখানা করিয়া বসিও না। সকলের চাইতে বড় মন্দিরটি ছাড়া আর কোনোটির ভিতরে মানুষ ঢুকিবার জায়গা নাই। অধিকাংশ মন্দিরই বাক্স প্যাঁটরার মতন ছোট ছোট চালাঘর মাত্র, উহার ভিতরে লাল, কালো, হলদে রঙের ছোট ছোট দেবতারা বড় বড় চোখ মেলিয়া যেন আশ্চর্য হইয়া বসিয়া থাকে। একটি দেবতার আবার ঘর পছন্দ হয় না, সে হাঁড়ির ভিতরে থাকিতে ভালোবাসে। মাঝে মাঝে পুরুত আসিয়া ইহাদের পূজা করিয়া যায়। নরিয়ারা ইহাদিগকে খুব মান্য করে, আর ইহাদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা বলে। দুঃখের বিষয়, আমি দেবতাগুলির নাম ভুলিয়া গিয়াছি। একজন আছে, তাহাকে হাতি ঘোড়া দিয়া পূজা করিতে হয়। উহার মন্দিরের পাশে বিস্তর হাতি ঘোড়া পড়িয়া আছে। ছোট ছোট মাটির জিনিস। এক সময়ে ঠিক এইরকম হাতি ঘোড়া আমাদের কুমারেরা গড়িত। ছেলেবেলায় আমরা তাহা দিয়া খেলা করিয়াছি। কিন্তু আজকালকার খোকাদের হয়তো তাহা পছন্দই হইবে না। নরিয়াদের দেবতা ঐ হাতি ঘোড়া পাইয়াই যারপরনাই খুশি হয়। জানোয়ারগুলির অধিকাংশেরই হাত পা ভাঙ্গা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভাঙ্গা হাতি ঘোড়া কেন দিয়াছ?' নরিয়া বলিল, 'আমরা কেন ভাঙ্গা দিব? ঠাকুর উহাতে চড়িয়া চড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিয়াছে।' তখন শুনিলাম, যে রোজ নাকি রাত দুপুরের সময় ঐ দেবতা বেড়াইতে বাহির হয়। এ সকল হাতি ঘোড়া তখন আর ওরূপ ছোট ছোট থাকে না, উহারা সত্য সত্যই বড় বড় হাতি ঘোড়া হইয়া যায়, আর ঠাকুর তাহাদের পিঠে চড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া আইসে।

এ কথা শুনিয়া একজন বলিল, আমি তো এইখানেই থাকি; কই আমি তো একদিনও তোমাদের ঠাকুরকে ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইতে দেখি নাই।' নরিয়া বলিল, 'দেখিলে কি না তুমি আবার বলিতে আসিতে।' অর্থাৎ উহাদের বিশ্বাস, যে সে সময়ে কেহ ঠাকুরের সামনে পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

নরিয়ারা বড়ই গরিব আর পরিশ্রমী। উহাদের কেহ সহজে ভিক্ষা করিতে চাহে না। সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলে নরিয়া ছেলেরা আসিয়া পয়সার জন্য বিরক্ত করে বটে, কিন্তু আমি কখনো তাহাদিগকে এমন কথা বলিতে শুনি নাই, যে ভিক্ষা দাও। কেহ হয়তো কতকগুলি

কড়ি আনিয়া বেচিতে চাহিবে, না হয় বলিবে, 'পানিমে যায়গা?' অর্থাৎ তুমি যদি একটা পয়সা দাও, তবে সে সমুদ্রের জলে নামিয়া তোমাকে কিছু তামাশা দেখাইতে প্রস্তুত আছে। তুমি রাজি হইলে উঁহারা নানারকম সাঁতার কাটিয়া দেখাইবে। রাজি না হইলে বার বার ঐ কথা বলিয়া তোমার কান ঝালাপালা করিয়া দিবে। তাহাতেও কাজ না হইলে ভেংচি কাটিয়া ডিগবাজি খাইয়া তোমাকে খ্যাপাইয়া তুলিবে। একদিন ইহারা একটা সং লইয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়া বেজায় সোর সরাবৎ আরম্ভ করিয়া দিল। গোলমালের জ্বালায় অস্থির হইয়া আমি বাহিরে আসিয়া দেখি, একটার গায়ে ঘাস জড়াইয়া সেটাকে এক অদ্ভুত জন্তু সাজাইয়াছে, আর সবগুলি মিলিয়া তাহাকে লইয়া কোলাহল করিতেছে, ইচ্ছা, কিছু বকসিস আদায় করে। আমি তখন একটা দরকারি কাজে ব্যস্ত ছিলাম, কাজেই বকসিস দেওয়া দূরে থাকুক, আমি তাহাদিগকে তাড়াইতে পারিলে বাঁচি। সুতরাং আমি করিলাম কি, ঘরের ভিতর হইতে মোটা লাঠিগাছ লইয়া, দাঁত মুখ খিঁচাইয়া, চোখ ঘুরাইতে ঘুরাইতে দুই লাফে একেবারে তাহাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত। তাহারা তখন আমাকে ঝড়, না ভূমিকম্প, না ইঞ্জিন, না পাগলা হাতি, কি মনে করিয়াছিল তাহা উহারাই জানে, কিন্তু একবার আমাকে দেখিয়া আর কেহ দুবার দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিল না। সংটাই সকলের আগে ছুটিয়া পলাইল।

বাস্তবিক সমুদ্রের ধারের অসুবিধার মধ্যে এই নরিয়া ছেলেগুলিকে ধরিলেও অন্যায় হয় না। ইহাদের লম্ফঝম্প দেখিয়া মাঝে মাঝে আমোদ বোধহয় বটে, কিন্তু স্ত্রীলোক অথবা নিরীহ লোক দেখিলে ইহারা অনেক সময় বড়ই অভদ্রতা করিয়া থাকে। আরার ইহাদের কোনো কোনোটার চুরির অভ্যাসও আছে।

এবারেও যে সমুদ্রে স্নান করিয়া খুব আনন্দ পাইয়াছি তাহা বলাই বাহুল্য। এখনো আমার হাঁটুতে তাহার দাগ আছে। তিন মাসের মধ্যে একটি দিন মাত্র আমার স্নান বাদ গিয়াছিল সেদিন সমুদ্রে সাইক্লোন হইতেছিল। তখন সমুদ্রের চেহারা দেখিয়া আর নামিতে ভরসা হয় নাই। তারপরেই পূর্ণিমার জোয়ার ছিল; তখনো সমুদ্র খুবই চঞ্চল, কিন্তু স্নান বন্ধ হয় নাই। তবে সেদিনকার সেই পাগলা ঢেউয়ের হাতে যে শক্ত দুইটা আছাড় খাইয়াছিলাম, তাহার কথা অস্বীকার করিতে পারি না। প্রথমে একটা ঢেউ আসিয়া আমাকে নাকি মুখ থুবড়িয়া দিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতে আমি একটু পিছন বাগে জোর করিয়া সাবধান হইলাম, যেন আর থুবড়িয়া ফেলিতে না পারে। কিন্তু তাহার পরের ঢেউটা যখন আমাকে বালির উপরে চিৎ করিয়া ফেলিয়া কুড়ি হাত লম্বা বিষম এক ধাক্কা দিল, তখন বুঝিলাম যে এর চেয়ে মুখ থুবড়িয়া পড়া ঢের ভালো ছিল।

সূর্য গ্রহণের দিন স্নানের ঘটা খুব বেশি হয়; এবারে সূর্যগ্রহণের সময় পুরীতে ছিলাম। গ্রহণ আরম্ভ হইবার পূর্বেই বিস্তর লোক আসিয়া সমুদ্রের ধারে জড় হইল। অমাবস্যার জোয়ারে সমুদ্রের তেজ খুবই বেশি হয়, কাজেই সেদিনকার স্নান খুব কষ্টকর হইয়া থাকে। কিন্তু স্নানের সময় উপস্থিত হইলে প্রায় কেহই কষ্ট অথবা বিপদের দিকে তাকাইল না। যাহারা নিজে স্নান করিতে পারে না, তাহাদিগকে অপর বলিষ্ঠ লোকেরা সাহায্য করিতে লাগিল। এক এক জায়গায় দেখিলাম, দশ-পনেরোজন হাত ধরাধরি করিয়া স্নান করিতে নামিয়াছে। আমার বোধহয়, সেদিন বেশি ভিড়ের সময় প্রায় কুড়ি হাজার লোক সমুদ্রের ধারে উপস্থিত ছিল। সর্বসুদ্ধ যে ইহার অনেক বেশি লোকে স্নান করিয়াছিল, তাহাতে

কোনো সন্দেহ নাই।

গ্রহণের সময় আমরা কালো কাচের ভিতর দিয়া সূর্য দেখিতেছিলাম। একটি কানা উড়িয়া স্ত্রীলোক সেই কাচের ভিতর দিয়া সূর্য দেখিয়া ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল। সে মনে ভাবে নাই যে, সূর্যটাকে ওরূপ আধখানা দেখিতে পাইবে। খানিক ভাবিয়া সে বলিল, আমি কিনা একচোখে দেখি, তাই আধখানা বৈ দেখতে পাইনি।

মেঘের মুলুক

১

ছিলাম মাঠে, এসেছি মেঘের মুলুকে দার্জিলিঙে। কলকাতার চেয়ে সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে। সাড়ে সাত হাজার ফুটে প্রায় দেড় মাইল হয়; সেটা যে ঠিক কতখানি উঁচু, মনের ভিতরে তার একটা পরিষ্কার আন্দাজ করা ভারি শক্ত।

শকুনগুলো অনেক সময় প্রায় হাজার ফুট উঁচুতে উঠতে পারে। আবার বর্ষার মেঘও মাঝে মাঝে হাজার ফুট নিচু অবধি নেমে আসে; হয়তো তার চেয়েও নীচে নামে, বা শকুন যত উঁচুতে উঠতে পারে, সাড়ে সাত হাজার ফুট তার চেয়েও পাঁচ-সাত গুণ উঁচু।

আমরা ছেলেবেলায় বুড়োদের মুখে শুনতাম যে মেঘেরা বাঁশের পাতা খেতে পাহাড়ে যায়, তখন কোচেরা (একরকম পাহাড়ী লোক, যাদের নামে কুচবিহার হয়েছে)। তাদের বল্লম দিয়ে মারে। সেই মেঘ তারা নাচের লোকদের কাছে বেচতে আনে, তাকেই আমরা বলি অভ্র!

এ কথা যে ঠিক নয়, তা অবশ্যি তোমরা সকলেই জান। টিপিপানা মেঘে রোদ পড়লে তার চেহারা অনেকের কাছে অভ্রের মতো ঠেকতে পারে। মেঘ হাওয়ায় ভেসে ভেসে ক্রমাগতই গিয়ে পাহাড়ের গায়ে ঠেকছে আর সেখানে বাঁশেরও অভাব নাই। এখন যেমন দার্জিলিং অবধি রেল হয়েছে, আগে তো আর তেমন ছিল না। সেকালের লোকেরা দূর থেকেই এসব দেখে, অভ্রের গল্প তয়ের করেছিল।

শোনা যায় একজন সাহেব পাহাড়ী মুটের ঝাঁকায় চড়ে প্রথমে দার্জিলিং এসেছিলেন। সে অবশ্যি অনেকদিনের কথা, তখন পাহাড়ে উঠবার কোনো রকমের পথই ছিল না। জানোয়ার চলবার পথ ছিল, সেই পথ ধরে পাহাড়ীরা গভীর বনের ভিতর দিয়ে নীচে নেমে আসত আর লোকজনের উপর ভারি দৌরাত্ম্য করত। সেই পাহাড়ীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করবার জন্য আমাদের সরকার পাহাড়ের নীচে, বনের ধারে পাহারা রাখতেন।

পাহাড়ের নীচেকার এসব জায়গার নাম তরাই। তরাই বড় ভয়ানক স্থান, তখন আরো ভয়ানক ছিল। সেখানে গেলে দু-তিন মাসের ভিতরে জ্বর আর পিলেয় ভুগে হাড্ডিসার হয়ে যেতে হত। সরকারি পাহারাওয়ালারা এমনি করে ভুগত আর পাহাড়ীদের মুখে শুনত যে পাহাড়ের উপরকার জায়গা বড়ই খাসা। শেষে দু-একজন লোক সাহস করে উপরে গিয়ে দেখে এল সত্যিসত্যিই সে সকল জায়গা খুব ভালো।

এমনি করে লোকে প্রথমে দার্জিলিঙের কথা জানতে পেরেছিল। দার্জিলিং যাবার পথটি যখন প্রথম তয়ের হয়, তখন তার প্রত্যেক মাইলে ষাট হাজার টাকা খরচ পড়ে। সেই পথের ধারে ধারেই এখন রেলের লাইন বসেছে। খেলনার মতন ছোট ছোট গাড়ি দেখলে হাসি পায়। ছোট একটি ইঞ্জিন, তার পিছনে এরকম আট-দশখানা গাড়ি জুড়ে ট্রেন হয়েছে, তারই

ভিতরে গুটিসুটি হয়ে বসে, হাঁ করে পথের শোভা দেখতে দেখতে দার্জিলিং যেতে হয়।

দার্জিলিঙের পথে বনের শোভা বড় চমৎকার। একলা সে বনের ভিতর যেতে হলে প্রাণটি হাতে করে যেতে হয়, কিন্তু ট্রেনে যেতে কোনো ভয় নেই। একবার কিন্তু ট্রেনের সামনে একটা মস্ত বুনো হাতি পড়েছিল। সে হয়তো ট্রেনটাকে নতুনরকমের কোনো জানোয়ার মনে করে থাকবে, তাই বোধহয় লাইনের উপর দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল যে সেটার সঙ্গে লড়বে কি ভাগবে। এমন সময় ড্রাইভার পোঁ করে বাঁশি বাজিয়ে ট্রেনখানাকে খুব জোরে চালিয়ে দিল আর হাতিও তা দেখে মাগো! বলে লেজ গুটিয়ে দে প্রাণপনে ছুট!

ট্রেনখানি সেই বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কেন্নোর মতো এঁকেবেঁকে চলে। ত্রিশ ফুট পথ এগুলে তার এক ফুট উঁচুতে ওঠা হয়। পথের ধারে বিশাল বড়-বড় সব গাছ, তাতে নানা রঙের ফুলও আছে; কোনো কোনোটাকে প্রকাণ্ড লতার জালে জড়িয়ে রেখেছে, কোনো কোনোটার গায়ে লম্বা-লম্বা দাড়ির মতো শ্যাওলা ঝুলছে। নীচের দিকে তাকাই—উঃ! কি ঘন বন! পাহাড়ের গা ঢেকে দিনকে রাত করে রেখেছে। যদি গাড়ি থেকে পড়ে যাই, তাহলে অমনি বনের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে কোথায় চলে যাব। উপরের দিকে তাকাই বাবা! কি উঁচু সব গাছ! জাহাজের মাস্তুলের মতো সোজাসুজি সেই কোথায় উঠে গিয়াছে। ত্রিশ-চল্লিশ হাত অবধি তাদের অনেকের গা একেবারে খালি, শুধু মাথায় খানিকটা ডালপালা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় না যে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনোরকম পরিচয় আছে। কিন্তু একটু ভালো করে দেখলে মাঝে মাঝে এক একটা শিমুল, কদম বা আর কোনো জানা গাছ ধরা পড়ে, তাদেরও সেইরকম হাড়গিলেপানা চেহারা।

গাছের আলো না হলে চলে না। সেই আলোর জন্য ব্যস্ত হয়ে তারা রেষারেষি করে কেবলই উঁচু হতে থাকে। কেননা, ঘন বনের ভিতরে পাশ দিয়ে আলো খুব কমই আসতে পারে, পাশাপাশি বাড়বার জায়গাও নাই। এসব বনে যে বাঁশ যথেষ্ট আছে, সে কথা আগেই শুনেছ। এসব বাঁশের এককেটা এমনি মোটা যে খুব রোগা একজন লোকের কোমরের সঙ্গে তার একটাকে মেপে বাঁশটাই মোটা দাঁড়িয়েছিল।

এর এক একটা চোঙ্গায় এক কলসী জল অনায়াসে ধরে। পাহাড়ী লোকেরা এই চোঙ্গা দিয়েই কলসীর কাজ চালায়। কলসীর চেয়ে এগুলো নিয়ে পাহাড়ে চলতে ফিরতে অনেক সুবিধা, তাতে আবার এগুলো সহজে ভাঙ্গে না। বনের ভিতরে বড়-বড় অনেক কলাগাছও দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে কলা বানরেও খেতে পারে কিনা সন্দেহ, তাতে এতই বীচি।

এমনি বনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ঝাঁ করে ট্রেনখানা এক একটা ফাঁকা জায়গায় আসে; তখন দেখা যায় ইস্, কত উঁচুতে উঠে এসেছি, বাঙ্গালার মাঠ ঐ ধূ-ধূ করছে। বড়-বড় নদীগুলি সাদা আঁচড়ের মতো সেই কোথায় চলে গিয়েছে।

দেড় হাজার ফুট উঁচুতে উঠলে মেঘের সঙ্গে দেখা হয়। দেশে বসে আকাশের পানে তাকিয়ে আমরা যেসব ভারী ভারী মেঘ দেখতে পাই, তারা মোটামুটি এইরকম উঁচুতেই থাকে। ক্রমে হয়তো ট্রেন তার ভিতরে ঢুকে যায়। তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে আমরা যাকে কুয়াশা বলি, এ ঠিক সেই জিনিস। দূরে থেকে তাকে দেখলেই সে মেঘ, আর ভিতরে ঢুকে দেখলেই সে কুয়াশা।

ততক্ষণে বনের শোভা একটু কমে এসেছে, আর মেঘের আর মাঠের শোভা বাড়ছে।

মাঝে মাঝে একেকটা সুন্দর ঝরনাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আগে পাগলাঝোরা বলে একটা খুব বড় ঝরনা ছিল, তার পাগলামি একটু বেশি হলেই সে রেলের পথটা ভেঙ্গে ঠিক করে দিত। এখন পাহাড়ের গায়ে নানান দিকে পথ করে তাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কাজেই আর তার তেমন রাগ রঙ্গ নাই। তিন হাজার ফুটের উপরে উঠলে এই ঝোরাটাকে দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমে যেসব মেঘের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এরপর থেকে তারা ক্রমেই নীচে পড়ে যেতে থাকে। তারপর ক্রমে মাঠের যে কী শোভা হতে থাকে, সে না দেখলে বুঝবার সাধ্য নাই। তখন আমাদের দেশের ভারী ভারী মেঘগুলোকে দেখে মনে হয় যেন তারা দল বেঁধে ঘাস খাবার জন্য মাঠে গিয়ে নেমেছে।

এক মাইল উঁচুতে উঠলে প্রায় নববুই মাইল দূর অবধি মাঠ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এত দূর থেকে বিশেষ কিছুই বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু মনের ভিতরে কি যে একটা আনন্দ হয় সে কি বলব!

এতক্ষণে আর একটা খুব আনন্দের ব্যাপার ঘটে যায়। প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট অবধি ট্রেনখানা বড়-বড় পাহাড়ের দক্ষিণদিক বেয়ে চলতে থাকে; সেসব পাহাড়ের উত্তরে যে কি আছে তা দেখা যায় না। তারপর যেই হঠাৎ একবার মোড় ফিরে, সেই পাহাড়গুলোকে ডান হাতে ফেলে সে উত্তরমুখো হয়, অমনি দেখা যায়, হিমালয়ের সাদা সাদা বরফে ঢাকা চুড়োগুলো রোদে ঝিকমিক করছে।

তারপরে শীতটিও ক্রমে জেঁকে উঠতে থাকে, তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে এবারে এক নতুন রাজ্যে আসা গেছে, তার নতুন রকমের হাওয়া, নতুনরকমের শোভা, সেখানে নতুন ধরনের মানুষ, নতুনতর মেঘের খেলা।

২

দার্জিলিঙের পথে সবচেয়ে উঁচু ষ্টেশন হচ্ছে ঘুম। দার্জিলিং তারই এক ষ্টেশন পরে, আর খানিকটা নীচে। এই পথটুকু ট্রেনখানি আপনি গড়িয়ে যায় ইঞ্জিনের আর তাকে টানতে হয় না। নেমে আসবার সময় দার্জিলিং থেকে ঘুম অবধি ট্রেনখানাকে ইঞ্জিনে টেনে পৌঁছে দেয়; তারপর ঘুম থেকে সুকনা অবধি ট্রেন অমনি চলে আসে। ইঞ্জিনখানা তাকে সামলে রাখবার জন্য সঙ্গে থাকে বটে, কিন্তু তাকে টানতে তো হয়ই না, ব্রেক কষে একটু পিছনভাগে ঠেলে রাখতে হয়।

ঘুম থেকে দার্জিলিং মোটে পাঁচ মাইল, এইটুকু যেতে আর বেশি সময় লাগে না। চলতে চলতে হঠাৎ একবার মোড় ফিরেই দার্জিলিং শহরটি দেখতে পাওয়া যায়। ময়রার দোকানে যেমন করে মিঠাইয়ের থালাগুলি সাজিয়ে রাখে, পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলি অনেকটা সেইভাবে সাজানো। দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। কিন্তু দার্জিলিঙের আসল শোভা ঘর-বাড়িতে নয়, সে হচ্ছে মেঘের আর হিমালয়ের আর আলো আর ছায়ার শোভা।

দেশে থেকে ঘরে বসে আমরা এই মেঘকেই দেখতে পাই; এই মেঘই সমুদ্রের কোলে জন্মলাভ করে, বাঙ্গালার মাঠের উপর দিয়ে এতখানি হাওয়া বেয়ে এসে দার্জিলিঙে উপস্থিত হয়েছে। দেশে বসে তো শিশুকাল থেকে একে দেখে দেখে বুড়ো হয়ে গেছি, তবে আবার এখানে এসে এর এত নতুন শোভা হল কোত্থেকে?

শোভা হয়েছে এইজন্য যে আমাদের দেশে থাকতে দূর হতে উপরভাগে চেয়ে, তার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকতাম, আর এখন তার নিজের দেশে এসে, তার পেটের

ভিতর ঢুকে তার নাড়ী-নক্ষত্র সব টের পাচ্ছি। আগে ছিলাম বিদেশী, এখন হয়েছি তা: দেশের লোক। সে হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, আমাদের ঘরের ভিতরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যায়। বেড়াতে বেরুলে আমার দাড়ি ভিজিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতা করে। হাত ভিজাবে না, নাক মুখ কান কিচ্ছু ভিজাবে না, ধুতি ভিজাবে না, ছাতা ভিজাবে না; ওর যত ঝোঁক আমার ঐ ঝাঁকড়া দাড়িগোঁফগুলোর উপরে আর পশমী কাপড় চোপড়ের উপরেও কতক। এসবের উপরে মুক্তার বিন্দু ছড়ানোই যেন তার কাজ।

অনেকদিন ভোরের বেলায় উঠে দেখি, পাহাড়ের পিঠের উপরে মেঘের খোকারা ঘুমিয়ে আছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে হিমালয়ের ঝাপসা ছেয়ে রঙ্গের চূড়াগুলি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তখনো সূর্য উঠে নি, পুবের আকাশে লাজুক হাসির মতো একটু আলো দেখা দিয়েছে মাত্র। ক্রমে হিমালয়ের মুখ রাঙা হয়ে উঠতে লাগল, ব্যস্ত হয়ে রঙ ঢেলে তুলি নিয়ে বসলাম, মনে হল কতই কিছু আঁকব।

দুষ্টু মেঘের খোকা! রোদের গন্ধ পেয়ে সে বেচারাও তাদের বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছে। তারপর এক পা দু পা করে, না জানি কোন দেশের পানে তারা রওয়ানা হল। হিমালয় দিল ঢেকে, আমার আঁকবার আয়োজন সব দিল মাটি করে। দেখতে দেখতে তারা পাহাড় বন বাড়ি ঘর সব গ্রাস করে ফেলল। তখন আর আশপাশের বাড়ি ঘর গাছপালা কিছুই দেখবার জো নেই। আমাদের বাড়িখানা যে মজবুত পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, পুষ্পক রথের মতো শূন্যে উড়ে পরীর মুলুকের পানে ছুটে চলছে না, এ কথাটি বিশ্বাস করা ভার হয়ে উঠল। আবার তার দশ মিনিট পরেই দেখা গেল যে মেঘ উড়ে গিয়ে চারদিক রোদ ঝকমক করছে।

সারাদিন ভরে এমনিতর খেলা। কখনো গোঁড়ির মতো হামা দিয়ে পাহাড় বেয়ে ওঠে, কখনো ভেড়ার পালের মতো পাহাড়ের গায়ে বসে দল বেঁধে বিশ্রাম করে, কখনো বিশাল দৈত্যের মতন উঠে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি আড়াল করে ফেলে। ঐ যে ভারী ভারী মেঘগুলো জল ঢেলে আমাদের দেশ ভাসিয়ে দেয়, তাদের এক একটা যে কত উঁচু, তা এখানে এলে বেশ বুঝতে পারা যায়।

ঐ দেখ সকল পাহাড়ের হাঁটুর নীচে, বাংলাদেশের মাটির কাছে, তার তলা থেকে বৃষ্টির ধারা নামছে, আর তার মাথা দশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড় ছাড়িয়ে আরো প্রায় দশ হাজার ফুট উপরে উঠে গিয়েছে।

সারাদিন ভরে এমনিতর খেলা। তারপর সন্ধ্যাবেলায় শীত লেগে, আবার হয়তো তাদের ঘুমের কথা মনে হয়; অমনি তারা পাহাড়ের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, না হয় দুই পাহাড়ের মাঝখানের গর্তে নেমে, তাকে পরিপূর্ণ করে, বিশ্রাম করতে থাকে। দেখলে মনে হয়, না জানি কোন ধুনুরী মেঘের তুলো ধুনে রেখে দিয়েছে, তা দিয়ে ঘুম পাড়ানী মাসির লেপ তয়ের হবে।

মনে করো না যে রোজই এমনিতর হয়। এর শোভা নিত্য নূতন। কখনো বা মেঘে আর রোদে মিলে পাহাড়ের গায়ে রঙ বেরঙের ঢেউ খেলিয়ে চোখ জুড়িয়ে দেয়, কখনো বা ঘড়্ ঘড়্ গর্জনে দিক বিদিক্ আঁধার করে, দিনের পর দিন খালি জলই ঢালতে থাকে। বর্ষাকালের আগাগোড়াই প্রায় এমনি ভাব। তখন প্রাণ ঝালাপালা হয়ে যায়, আর এদেশে থাকতে ইচ্ছা

হয় না।

বৎসরের মধ্যে শরৎকালটি এখানে সকলের চেয়ে সুন্দর, তখন আকাশ পরিষ্কার থাকে আর হিমালয়ের অতি চমৎকার শোভা হয়। কিন্তু তার কথা আরেক দিন বলব।

৩

যত উঁচুতে ওঠা যায়, ততই শীত। কলকাতার চেয়ে দার্জিলিঙে বেশি শীত, আবার দার্জিলিঙের চেয়ে হিমালয় পর্বতের উপরে বেশি শীত। সেখানে বারো মাসই বরফ পড়ে থাকে, তাই সেসব পাহাড় দেখতে সাদা।

অবশ্য দার্জিলিঙও হিমালয়ের উপরে, কিন্তু তত উঁচুতে নয়। আগে কতকগুলো ছোট-ছোট পাহাড় পার হয়ে তবে হিমালয়ে পৌঁছাতে হয়। দার্জিলিঙ সেই ছোট পাহাড়ের উপরে। এগুলোকে বলে উপ-হিমালয়। দার্জিলিং থেকে উত্তরদিকে তাকালে হিমালয় যে কি সুন্দর দেখা যায়, কি বলব। এত উঁচু পাহাড় পৃথিবীতে আর কোথাও নাই; এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সারবাঁধা এতগুলো বিশাল পর্বতও আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। নীচের দিকে তাকাও, রঙ্গিত নদী দেখতে পাবে, সে প্রায় বাংলার মাঠের সমানই নিচু। উপরের দিকে তাকাও, দেখবে হিমালয় চূড়াগুলি যেন আকাশের গায়ে ঠেকে আছে; তার সকলের চেয়ে উঁচুটি পাঁচ মাইলেরও বেশি উঁচু। রঙ্গিতের ধারে প্রায় আমাদের এখানের মতনই গরম, আর হিমালয়ের উপরে ভয়ংকর ঠাণ্ডা। সেখানে আজও কেউ যেতে পারে নি, যদিও অনেক চেষ্টা করছে। গাছপালা সেখানে জন্মায় না, খুব উপরে জীবজন্তু থাকবার জো নাই।

এত উঁচুতে বাতাস এমন হাল্কা যে নাক দিয়ে ভালো করে নিশ্বাস ফেলাই কঠিন। কুড়ি হাজার ফুট উঁচুতে গেলেই হাঁপ ধরে অস্থির করে দেয়; কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরে গেলে কেমন হবে, তা তো কেউ বলতেই পারে না। কাঞ্চনজঙ্ঘাই হচ্ছে দার্জিলিঙের ওখানকার সবচেয়ে উঁচু পর্বত, ২৮১৫৬ ফুট উঁচু, তারপর জানু, ২৫৩০৪ ফুট, তারপর কব্রু, প্রায় ২৪০০০ ফুট, তারপর পণ্ডিম, ২২০১৭ ফুট, তারপর নর্সিং, ১৮১৪৫ ফুট। এমনি করে পরপর কত যে দাঁড়িয়ে আছে, আমি তা বলে শেষ করতে পারব না। আর এই বুড়া বয়সে তাদের সব কটার নাম মুখস্থ করতে গেলে আমার প্রাণই বেরিয়ে যাবে।

আমরা বলি কাঞ্চনজঙ্ঘা, কিন্তু আসলে নাকি সেটা বাংলা কথা নয়। আসল কথাটি হচ্ছে 'খাঁচেন-ঝ-ঙ্গা'। তার মানে বলছি, শুন। 'খাঁচেন' কিনা বড্ড হিম; 'ঝ' মানে পাঁচ; আর 'ঙ্গ' হচ্চে পর্বত।

অর্থাৎ কিনা পাঁচটি পর্বত মিলে ঐ পর্বতটি হয়েছে আর সেখানে বড্ড হিম। এ কথা আমি একটি পুস্তকে পড়েছিলাম, সুতরাং সত্য হওয়া আশ্চর্য নয়।

হিমালয়ের আরেকটা চূড়া আছে সে কাঞ্চনজঙ্ঘার চেয়েও উঁচু। তোমরা অনেকেই তার নাম শুনেছ। ইংরাজরা তাকে বলে এভারেস্ট, দেশী লোকেরা বলে গৌরীশঙ্কর, পাহাড়ীরা নাকি বলে ধেও-গঙ্গা। তার মানে যে কি, সে কথা আমি বলতে পারব না। আরেকটু হলেই এই পর্বতটি দার্জিলিং থেকে দেখা যেত। সিঞ্চল থেকে তার আগা দেখতে পাওয়া যায়।

এতগুলো বড়-বড় পর্বত এক জায়গায় থাকার একটু অসুবিধা আছে। এ বলে, 'আমাকে দেখ।' ও বলে, 'আমাকে দেখ।' কাজেই ওরা যে বাস্তবিকই কত বড়, সে কথা চট করে

মাথায় আসে না। আমাদের বাংলার মাঠে এর একটাকে পাওয়া যেত, তবে তার আদর বেশ ভালো করেই হত। এদেশের পরেশনাথ পর্বতখানি ৪৫০০ ফুট মাত্র উঁচু, তাকে দেখেই কত লোকে অবাক হয়ে যায়।

আর এক কথা এই হচ্ছে যে এ সকল পর্বত যে দার্জিলিঙের খুবই কাছে, তা নয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা সেখান থেকে সোজাসুজি পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে। কিন্তু পাহাড়ের পথ দিয়ে সেখানে পৌঁছাতে প্রায় দুশো মাইল হাঁটতে হয়। অথচ, সেখানকার হাওয়া যারপরনাই পরিষ্কার বলে তাকে এতই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যে তাকে এত দূরের জিনিস বলে বোঝাই কঠিন হয়। কাজেই সে আসলে যত বড়, দেখলে মনে হয় যেন তার চেয়ে ঢের ছোট।

যে হিমালয়ে না গিয়েছে, সে বুঝতেই পারবে না সেখানকার হাওয়া কত পরিষ্কার। দশ মাইল দূরের জিনিসটিকে এত স্পষ্ট দেখা যায় যে মনে হয় যেন সে দু-তিন মাইল মাত্র দূরে। কুড়ি মাইল, পঁচিশ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে বাড়ি আছে, পরিষ্কার দিনে তাতে রোদ পড়ে ঝক ঝক করতে থাকে। এত দূর থেকে নিতান্তই বিন্দুটির মতো ছোট দেখায়, নইলে তার দরজা জানলা গুণে দেওয়া যেত।

এই পরিষ্কার বাতাসেই হিমালয়কে এমন ঝকঝকে করে রেখেছে। সেখানকার রোদের একটা জ্যোতি আছে, যা আমাদের এই ধুলোমাখা রোদে নাই। তার উপরে আবার ঝকঝকে বরফ। তার উপরে রোদের খেলা একবার যে দেখেছে, সে আর জন্মে তা ভুলতে পারবে না। যদি পারে, সে বড় দুঃখী লোক।

ভোরে আর সন্ধ্যায় যখন ঘন ঘন রোদের রঙ বদলাতে থাকে, তখন হিমালয়ের চেহারাও পলে পলে নূতন হতে থাকে। এই মিছরির কুঁদোর মতো, এই আগুনের মতো, এই সোনার মতো, এই মুক্তোর মতো, এই গরদের উপর চাঁদির কাজের মতো, এই খড়ির মতো যেন জাদুকরের ভেল্কি। এমনি করে দিনটি কেটে গিয়ে বিকালে আবার সোনার মতো, পাহাড়ের মাথায় সেই মানিকের মতো বরফ, সে যে কি সুন্দর, তার তুলনা কোথাও নাই। রাজরানীর বহুমূল্য পোশাক আর মুকুট তার কাছে লাজে মাথা হেঁট করে।

এমনি করে রাত্রি এসে উপস্থিত হয়। তখন যদি আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ থাকে, তবে তার শোভা হয় যেন আরো চমৎকার। অবশ্য তাতে তেমন তাক লাগিয়ে দেয় না, কাজেই সকলের কাছে তার তেমন আদর নাও হতে পারে। কিন্তু যে বোঝে, সে দেখেই বলে, 'আহা!'

লোকে বলেছে ওখানে দেবতাদের বাস। এমন সুন্দর জিনিস দেখে ও কথা বলবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। ও যে কতখানি সুন্দর, এসব কথায় তাই বোঝা যাচ্ছে।

যা হোক, দূরে থেকে সুন্দর হলেও, ও সকল বড় ভয়ংকর স্থান। হিমালয় পার হয়ে তিব্বত যেতে হয়, কিন্তু পার হওয়ার মতো নিচু জায়গা ওতে বেশি নাই। যে কয়েকটি জায়গা আছে, তার কোনটাই প্রায় পনেরো ষোলো হাজার ফুটের কম উঁচু হবে না। তাতেও আবার শীতকালে যাবার জো নাই, কারণ তখন সেসব জায়গা বরফে ঢাকা থাকে। গ্রীষ্মকালে চমরীর পিঠে চড়ে, ঝড়ের শীতের আর বরফের তাড়ায় নাকাল হয়ে, অনেক কষ্টে সে পথে চলতে হয়।

মহারাজা সায়াজী রাও গাইকোয়াড়

আজ তোমাদিগকে ভারতের এক স্বাধীন নৃপতির জীবনের কথা বলিব। (বর্তমান কালের আমাদের দেশে যে সমুদয় মহানুভব ব্যক্তি জীবিত আছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন।) রাজ ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া ইনি যে প্রকার প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বে অগ্রসর হইয়াছেন, সচরাচর তেমন দেখা যায় না। উপরে উপরে দেখিলে মনে হইতে পারে, যাহারা ধনৈশ্বর্যের মধ্যে বর্ধিত তাহাদের পক্ষে মহৎ জীবন লাভ করা সহজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে ধনী অপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণীর মধ্য হইতেই জগতের অধিকাংশ মহাজন উদ্ভূত হইয়া থাকেন। ইহার কারণ নির্দেশ করাও কঠিন নহে। সংগ্রামে বিপদে ও পরীক্ষায় মানব চরিত্রের গূঢ় শক্তি সকলের বিকাশ হয়। সম্পদেব ক্রোড়ে যাঁহারা লালিত, প্রায়ই ভোগবিলাসের তরঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ের উচ্চ ভাবসকল ভাসিয়া যায়। সকল দেশেই ধনী ও সম্পদশালী লোকদের মধ্যে প্রকৃত মহত্ত্ব বিরল। বিশেষত ভারতবর্ষে ধন এবং মহত্ত্বের একত্র সমাবেশ অতি অল্পই দেখা যায়। বরোদার বর্তমান গাইকোয়াড় মহারাজা সায়াজী রাওয়ের জীবনে কিন্তু এই উভয়ের সুন্দর সম্মিলন হইয়াছে। একদিকে তিনি যেমন রাজা, বংশগৌরবে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, অপরদিকে জ্ঞানে তিনি তৃতীয় স্থানীয়। কিন্তু সেজন্য তাহার মহত্ত্ব নহে। তাঁহাব সমকক্ষ গুণে এবং চরিত্রের প্রভাবে তিনি সর্বজনপ্রিয়। ভারতের রাজন্যগণের মধ্যে এবং তাঁহার অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী রাজা তো অনেকে আছেন। আপন আপন রাজ্যের বাহিরে তাঁহাদিগের নাম অধিক শুনা যায় না। কিন্তু বরোদাব মহারাজা সায়াজী রাও-এর নাম ভারতের সর্বত্র সুবিখ্যাত। সম্প্রতি তাঁহাব রাজ্যারোহণের পঞ্চবিংশ বাৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। তাহাতে সকল প্রদেশেব লোক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বাস্তবিকই আদর্শ নরপতি। বিধাতা তাঁহাকে যে উচ্চপদ দিয়াছেন, প্রচুর ধনৈশ্বর্য এবং শক্তি দিয়াছেন এ সমুদয়ই তিনি আপনার প্রজা এবং সমগ্র ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। অন্যান্য রাজাদের ন্যায় ভোগবিলাসে, আমোদ প্রমোদে, আলস্য বা ইংরাজ রাজপুরুষদের তোষামোদে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয় না। তিনি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে, পাঠ আলোচনা, রাজকার্য পরিদর্শন এবং জনহিতকর কার্যে যাপন করেন। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞানে তিনি সুপণ্ডিত। তাঁহার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে কম আছে। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে তিনি বহু চিন্তা করিয়াছেন এ সকল বিষয়ে তিনি অনেক সময়ে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ভারতবাসিগণ তাঁহাকে আপনাদের একজন প্রধান নেতা বলিয়া মনে করেন। আর তিনিও আপনাকে একজন বলিয়া মনে করেন। তিনি অনেক সময়ে বলিয়াছেন যে আমরা সকলেই এক ভারতমাতার সন্তান। তাঁহার বেশভূষায় বা ব্যবহারে, কোনোপ্রকার আড়ম্বর নাই। অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সামান্য লোকের মতো তিনি সকলের সঙ্গে মিশিয়া থাকেন। তাঁহার আচরণে পদৈশ্বর্যজনিত গর্বের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না।

আমাদের দেশের সকলপ্রকার জনহিতকর কার্যের সঙ্গে তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং যাহা ভালো বুঝিয়াছেন, কাহারো দিকে দৃকপাত না করিয়া তিনি তাহা করিয়া যান। অনেকবার তিনি জাতীয় মহাসমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজন্যবর্গের কথা দূরে থাক, অনেক ক্ষুদ্র জমিদারেরা পর্যন্ত গবর্ণমেন্টের ভয়ে অনেক সময়ে এইসকল সভায় উপস্থিত

হইতে সাহস করেন না। অনেকে মনে করেন যে, গবর্ণমেন্ট এজন্য তাঁহার প্রতি বিরক্ত। কিন্তু তিনি গবর্ণমেন্টের অনুরাগ বিরাগ তুচ্ছ করিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশের লোকের রাজনৈতিক আকাঙ্খার সমর্থন করিয়াছেন। এ দুর্ভাগ্য দেশের প্রধান শত্রু ভয়,—রাজভয়, লোকভয়, সমাজভয়ে দেশের লোক অস্থির। মহারাজা সায়াজীরাও ইহার কোনো ভয়ই গ্রাহ্য করেন নাই। তোমরা হয়তো মনে করিতে পার, রাজার আবার ভয় কি? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজাদেরই ভয়ের কারণ অধিক। বড় গাছেই বড় বাজ পড়ে। সামান্য লোকে যেসব কাজ করিলে কেহই কিছু বলে না, রাজা বা বড় লোকেরা তাহা করিলে সকলেরই দৃষ্টি তাহাতে আকৃষ্ট হয়। এই কারণে রাজা ও উচ্চপদস্থ লোকদিগকে সাবধানে চলিতে হয়। ভয়ের কারণ অধিক না থাকিলেও রাজাদের ভয় যে বেশি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার প্রমাণ, এই যে কোনো সৎসাহসের কার্যে তাঁহাদিগকে অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে মহারাজা সায়াজী রাও একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল বলিলে অত্যুক্তি না। একদিকে তিনি যেমন রাজভয়কে তুচ্ছ করিয়া কংগ্রেস প্রভৃতি সাধারণ জনহিতকর কার্যে প্রকাশ্যভাবে যোগ দিয়াছেন, অপরদিকে তিনি সামাজিক ভয়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সমুদ্রযাত্রা, বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতি সংস্কারে স্বয়ং দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। মহারাজা সায়াজী রাও একাধিকবার ইউরোপ এবং আমেরিকা গমন করিয়াছেন! অল্পদিন হইল তিনি মহারাণীকে সঙ্গে লইয়া আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। প্রকাশ্য সভাতে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খৃস্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকলের সঙ্গে বসিয়া আহার করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, বিধবা বিবাহ প্রচলন, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি সমাজ সংস্কারে তিনি অতিশয় উৎসাহী। তিনি বরোদা রাজ্যে আইন দ্বারা বাল্যবিবাহ প্রথা দণ্ডনীয় করিয়াছেন। ইহাতে প্রজারা অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বোধহয়, তিনি জনসাধারণের অপ্রিয়ও হইয়াছিলেন। কিন্তু লোকভয় অগ্রাহ্য করিয়া যাহা কল্যাণকর বোধ করিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার সুশাসনে বরোদা রাজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে। দেশে শিক্ষা বিস্তার, ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা, শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া তিনি জনসাধারণের গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অপরদিকে তাঁহার চরিত্র এবং পারিবারিক জীবন আদর্শস্থানীয়। সাধারণত যে সকল দুর্নীতি সম্পদশালী ব্যক্তিদিগের চরিত্র কলঙ্কিত করে, মহারাজা সায়াজী রাওয়ের চরিত্রে তাহার ছায়াও স্পর্শ করে নাই। তিনি আদর্শ স্বামী এবং আদর্শ পিতা। নিজে যেমন আড়ম্বরশূন্য কর্মশীল জীবন যাপন করিতেছেন, পুত্র কন্যাদিগকেও সেইপ্রকার শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স ফতেসিংহ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া এখন রাজকার্য শিক্ষা করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স জয়সিংহ ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত হ্যারো স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন;তৃতীয় পুত্র প্রিন্স শিবাজী রাও বোম্বাই নগরীতে শিক্ষালাভ করিতেছেন। একমাত্র কন্যা রাজকুমারী ইন্দিরা বরোদার প্রিন্সেস স্কুলে শিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছেন। মহারাজা সায়াজী রাও আদর্শ জীবন যাপন করিতেছেন। অতুল ঐশ্বর্যের প্রচুর শক্তি লাভ করিয়া, ভোগ বিলাসের সকল উপকরণ সত্ত্বেও যিনি নির্মল জীবন যাপন করিতে পারেন এবং রাজভয় লোকভয় তুচ্ছ করিয়া একান্ত মনে কর্তব্যের পথে চলিতে পারেন, তিনি কি ধন্য নন? বরোদার গাইকোয়াড় মহারাজ সায়াজী রাও বর্তমান ভারতের গৌরব।

ছেলে সুবিমলকে লেখা বাবার চিঠি।

A System of diaphragms for use with regular grained half-tone screens

Regular grained refers to all those screens, (whether existing or otherwise) in which all the transparent spots have their centres arranged in parallel and equidistant straight rows running in at least two different direction, it being absolutely immaterial what these directions are and what angles they make with each other.

The chief features of this system are the following:

(1) That each diaphragm can be made complete in itself

In making halftone negatives, good operators generally employ different single aperture kinds of stops during different portions of the same exposure. This [illegible] takes much time and the results are not so satisfactory,

লেখকের ইংরাজী হস্তাক্ষরের নমুনা

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়

U Ray

লেখকের নানা ছাঁদের স্বাক্ষর